প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭১, দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০১০, গ্রন্থস্বত্ব : যাহেদ করিম, প্রচ্ছদ : সুখেন দাস, দিলীপ রায় কর্তৃক নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারী দাস রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং বিজয় রায় কর্তৃক অনু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২ জয় চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

লেখক			

বিজ্ঞানী

সমাজসেবী-সমাজ সংস্কারক

দার্শনিক-চিন্তাবিদ

সাধক-ধর্মগুরু-পর্যটক

[illegible]

রাষ্ট্রনায়ক-বিপ্লবী-রাজনীতিবিদ

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস



ভারতীয় ধর্মীয় জীবনে গুরু রূপে পূজিত যে মহান তাপস তিনিই হলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। এই কারণে তাঁর জন্মতিথি শ্রাবণী পূর্ণিমাকে গুরুপূর্ণিমা রূপে পালন করা হয়।

একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় মহর্ষি দ্বৈপায়ন ব্যাসের মধ্যে। তিনি ভারতের পুরাণ ও মহাকাব্যের এক উল্লেখযোগ্য ঋষি চরিত্র।

ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারতের রচয়িতা তিনিই। কেবল তাই নয়, তিনি মহাভারতের নায়কও বটে। মহাকাব্য-কাহিনীর প্রতিটি সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়।

বেদের বহু মন্ত্রের রচয়িতা এবং বহু শাস্ত্রের জনক ঋষি পরাশর ছিলেন দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা। মাতার নাম সত্যবতী।

তাঁর নামের প্রতিটি শব্দই অর্থময়। যমুনা নদীর একটি দ্বীপে জন্মেছিলেন বলে দ্বৈপায়ন, গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ তাই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। আর অখন্ড বেদশাস্ত্রকে গুণানুযায়ী বিভক্ত করেছিলেন বলে বেদব্যাস।

মহাভারতে তাঁর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা মোটেই ঋষিসুলভ ছিল মনে হওয়ার কারণ নেই। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের বিশাল বপু ব্যাসদেবের মাথাজুড়ে ছিল পিঙ্গল জটাভার। রীতিমত ভীতি উদ্রেককারী চেহারা।

তাঁর অদ্ভুত জন্মকাহিনী মহাভারতেই লিপিবদ্ধ আছে। রাজা উপরিচর বসু এবং অদ্রিকার কন্যা ছিলেন সত্যবতী। তাঁর শরীর থেকে মাছের গন্ধ নির্গত হত বলে তাঁর আরেক নাম হয়েছিল মৎস্যগন্ধা।

সত্যবতী প্রতিপালিতা হয়েছিলেন যমুনার তীরবর্তী এক দাসরাজের গৃহে।

যৌবনে পালক পিতার নির্দেশে সত্যবতী নদীর ঘাটে নৌকা পারাপারের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বনের মধ্যে একাকী সত্যবতী লোকজনকে নদী পারাপার করে দিতেন।

একবার তীর্থপর্যটনে বেরিয়ে ঋষি পরাশর নদীর কাছে এসে অপূর্বসুন্দরী সত্যবতী তথা মৎস্যগন্ধাকে দেখতে পান। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে ঋষি তাঁকে গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

সত্যবতী তাঁকে তাঁর দুঃখের কথা জানালেন। পরাশর আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমার দেহের মৎস্য গন্ধ আমার বরে পদ্ম গন্ধ হবে। এবং তাই হল, এই কারণে তাঁর আর এক নাম হল পদ্মগন্ধা।

এক যোজন দূর থেকে এই গন্ধ পাওয়া যেত বলে, যোজনগন্ধা বলেও সত্যবতী পরিচিত হয়েছিলেন।

ঋষি পরাশরের বরে দুই জনের মিলনের অল্প সময় পরেই এক দ্বীপে জন্ম হয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের।

তপস্যাপ্রবণ এবং বৈরাগ্যবান হয়েই জন্মালেন তিনি। জন্মের পরেই পিতা পরাশরের সঙ্গে তপস্যা করতে চলে যান। যাওয়ার সময় মাতা সত্যবতীকে বলে যান, আমাকে যখনই তুমি স্মরণ করবে, সেই মুহূর্তেই আমি তোমার কাছে উপস্থিত হব।

পরবর্তী সময়ে সত্যবতীর বিয়ে হয় হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর সঙ্গে। রাজগৃহে তাঁর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুজনেই যুবা বয়সে মারা যান।

দুই পুত্রের অকাল মৃত্যুতে হস্তিনাপুরের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল হন সত্যবতী। তিনি শান্তনু ও গঙ্গার পুত্র ভীষ্মের সঙ্গে পরামর্শ করে কন্যাকা অবস্থার পুত্র ব্যাসদেবকে স্মরণ করেন।

মাতার আহ্বানে ব্যাস উপস্থিত হন এবং মাতার অনুরোধে তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মসম্মত রীতি অনুযায়ী বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন করেন।

এইভাবে অম্বিকার গর্ভে জন্ম হল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের এবং অম্বালিকার গর্ভে জন্মান পাণ্ডুবর্ণের হতশ্রী পুত্র পাণ্ডু।

মাতা সত্যবতীর অনুরোধে ব্যাসদেব এক ভক্তিমতী দাসীর গর্ভে যে পুত্রের জন্ম দেন তিনিই হলেন সর্বগুণান্বিত মহাজ্ঞানী বিদুর।

ঋষির ঔরসজাত এই তিন পুত্র হলেন কুরুবংশের উত্তরাধিকারী এবং মহাভারতের কাহিনীর তিন স্তম্ভ।

ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল সরস্বতী নদীর তীরে, সেখানেই তিনি তপস্যা করতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন একটি চড়াই পাখি তার দুই ছোট্ট শাবককে খাবার খাইয়ে দিচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে ব্যাসদেবের অপত্যস্নেহ জাগরিত হয়। তিনি দেবর্ষি নারদকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এর পরই অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে ব্যাসদেবের যে পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে তাঁর নাম শুক।

কুরুবংশে ধৃতরাষ্ট্র এবং পান্ডুর জন্মদানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাসদেব প্রকৃতপক্ষে বিশাল মহাভারত কাহিনীর প্রেক্ষাপটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

তাঁর আশীর্বাদেই গান্ধারীর শতপুত্রের জন্ম সম্ভব হয়েছিল। তাঁর উপদেশেই প্রসূত মাংসখণ্ডটিকে একশত একটি টুকরো করে গান্ধারী শতপুত্র ও একটি কন্যার জননী হতে পেরেছিলেন।

পান্ডবদের সঙ্গে পাঞ্চালী দ্রৌপদীর বিবাহ নিয়ে সঙ্কট উপস্থিত হলে ব্যাসদেব উপস্থিত হয়ে সময়ানুগ উপদেশ দেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলে ব্যাসদেব একদিন রাজসভায় উপস্থিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যদৃষ্টি দান করতে চাইলেন, যাতে তিনি এই ধর্ম অধর্মের যুদ্ধ নিজচোখে দেখতে পান।

বস্তুতপক্ষে বাহ্যত দৃষ্টিহীন এবং পুত্রস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রই ছিলেন অধর্মের পালক। তাই তিনি এই ধর্মযুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে ভীত হয়ে দিব্যদৃষ্টি গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হন।

তখন ব্যাসদেব সারথী সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দান করেন। সেই দৃষ্টিবলেই সঞ্জয় আঠারো দিনের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের বিবরণ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়েছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শতপুত্রের মৃত্যু হলে শোকাতুরা গান্ধারী অভিশাপ দিয়ে পান্ডবদের ধ্বংস করার সঙ্কল্প করেন। ব্যাসদেবই তাঁকে এই সর্বনাশা কর্ম থেকে নিরস্ত করেন।

এইভাবে মহাভারতের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য নাটকীয় মুহূর্তে ব্যাসদেবের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়।

এ যেন নিজের সৃষ্ট এক জগতে বহুরূপে তাঁর নিজেরই জগৎ ও জীবনকে উপভোগ করার এক দুর্জ্ঞেয় লীলা।

সঞ্জয়ের অনুরোধেই মহাযুদ্ধের পর মহাভারতের কাহিনী লেখায় প্রবৃত্ত হন ব্যাসদেব।

কথিত হয় তিনি মহাভারতের শ্লোকগুলি রচনা করেছেন মুখে মুখে আর তা লিপিবদ্ধ করেছেন সিদ্ধিদাতা গণেশ।

মহাভারত কেবল ঐতিহাসিক কাহিনী মাত্র নয়, এতে বিবৃত হয়েছে ভারতবর্ষের চিরকালীন ধর্ম, দর্শন, তপস্যা, রাজনীতি, জীবনচর্যা, লোকাচার প্রভৃতি।

বস্তুত সর্ব অঙ্গ ও প্রাণ নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষই বিবৃত হয়েছে মহাভারত কাহিনীতে। এই কাহিনীর বিশালতা ও ব্যাপ্তি অনস্বীকার্য।

মহাকাব্য মহাভারত রচনা ছাড়াও, সমগ্র বেদকে ঋক, সাম, যজু, অথর্ব—এই চারভাগে ভাগ করেছিলেন ব্যাসদেব। মহাভারতকে বলা হয়ে থাকে পঞ্চমবেদ। বেদান্তের রচয়িতাও ব্যাসদেব।

এছাড়া ভারতের ঋষিকুলে প্রচলিত সুপ্রাচীন কাহিনী সংগ্রহ করে আঠারোটি পুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণ রচনা করেছেন তিনি।

মহাভারত থেকে ব্যাসদেবের যে শিষ্যদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন, অগ্নিবর্চস, অকৃতব্রন, অসিত, দেবল, মিত্রায়ুস, বৈশম্পায়ন, সাবর্ণি, সুমন্ত, সুত।

নিজপুত্র শুককেও তিনি শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন। শিষ্যদের তিনি বেদ ও মহাভারত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

মহাভারতের বিশাল ঘটনা কণ্ঠস্থ করে তাঁরাই তা প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন বিভিন্ন দিকে।

সরস্বতী তীরে নিজ সাধনভূমি বদরিকাশ্রমে সমাধি অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন ব্যাসদেব।

মহর্ষি বাল্মীকি



ভারতবর্ষের অন্যতম মহাকাব্য রামায়ণ। পারিবারিক জীবনের বাইরে যে এক বিশাল কর্মধারা প্রবহমান, তার নীতি নির্ধারণ করেছে মহাভারত। আর রামায়ণ বিবৃত করেছে পারিবারিক জীবনের মহান জীবনাদর্শ।

গৃহ মাত্রই হল আশ্রম, এই আশ্রমের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে সম্পর্কের আদর্শ কত মহান ও সুন্দর হতে পারে, রামায়ণ পাঠে তা জানা যায়।

বস্তুতঃ এই রামায়ণ গ্রন্থই ভারতীয় পরিবারের অনুকূল আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে।

যুগ যুগ ধরে ভারতের পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে রামায়ণ কাহিনী। এখানেই এই মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থের তুলনা নেই।

ঋষি বাল্মীকি একাধারে এই মহাকাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র তথা প্রাণপুরুষ এবং রচয়িতাও। অতি আশ্চর্য তাঁর জীবন-কাহিনী।

শুভ, অশুভ, ভাল ও মন্দ মিশিয়েই মানুষ। কিন্তু শুভবোধ একজন মানুষের জীবনকে কিভাবে আমূল পাল্টে দিতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাল্মীকির জীবন।

প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন নরঘাতক দস্যু—দস্যু রত্নাকর। এই দস্যুই একদিন হয়ে উঠলেন ঋষি বাল্মীকি।

প্রাচীনকালে সুমতি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। দেবদ্বিজে ভক্তিমান এই ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্রের নাম ছিল রত্নাকর।

ব্রাহ্মণসন্তান হলেও রত্নাকর ছিলেন দেবদ্বিজে ভক্তিহীন। ব্রাহ্মণ্য আচার নিষ্ঠা ও শাস্ত্রপাঠে তার কোন রুচি ছিল না।

সর্বোপরি তিনি ছিলেন পিতামাতার অবাধ্য সন্তান। তাই তার পিতাকেই সংসারের সমস্ত দায় বহন করতে হত।

সুমতি যেখানে বাস করতেন, একসময় সেখানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। পরিবার প্রতিপালন কঠিন হয়ে পড়ায় সুমতি স্ত্রী পুত্র সহ অন্যত্র বাস করবেন বলে গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন।

নানা দেশ ঘুরে ঘুরে একসময় তারা গভীর জঙ্গলে এসে পৌঁছলেন। ব্রাহ্মণ সুমতি সেখানেই কুটির নির্মাণ করে বসবাস শুরু করলেন।

ততদিনে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। কাজকর্মেও শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। ফলে সংসারের তিনটি মানুষের অন্ন সংস্থানে বাধা পড়ল।

রত্নাকর উপার্জন করে সংসার চালাবেন সেই ক্ষমতা তাঁর কোথায়? তিনি বিদ্যাহীন, কাজেই বাধ্য হয়েই তাকে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করতে হল।

সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথিকদের চলার পথ। রত্নাকর দিনভর সেই পথের ধারে বসে থাকেন। বনের পথে কোন যাত্রী উপস্থিত হলেই তিনি তার সর্বস্ব লুঠ করে পরে হত্যা করেন।

রত্নাকর এইভাবেই বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণ করে চললেন।

দীর্ঘদিন কাটল এইভাবে। জঙ্গলের বাইরে দেশেদেশে ছড়িয়ে পড়ল দস্যু রত্নাকরের বিভীষিকা।

এই সময়ে জগতের মঙ্গলের ইচ্ছাতেই বুঝি বিধাতাপুরুষ বেছে নিলেন দস্যু রত্নাকরকে। তাকে দিয়ে রূপায়িত করতে চাইলেন এর মহৎ আদর্শ।

বিধাতার নির্দেশে একদিন সপ্তর্ষিগণ ছদ্মবেশে রত্নাকরের জঙ্গলের পথ দিয়ে তীর্থযাত্রা করলেন।

দস্যু ঝোপের আড়ালেই আত্মগোপন করে ছিলেন। তীর্থযাত্রীরা কাছে আসতেই ভয়ানক হাঁক ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বললেন, তোমাদের সঙ্গে ধনসম্পদ যা আছে বের করে দাও। আর শেষবারের মত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে নাও। আমি তোমাদের হত্যা করব।

দস্যু রত্নাকরের সঙ্গে একবার যার এপথে দেখা হয় সে প্রাণ নিয়ে কখনো ফিরতে পারে না।

সপ্তর্ষিদের মধ্যে ঋষি অত্রি রত্নাকরকে তখন বললেন, হে দস্যু, বধ করবার আগে আমার দুটি কথা শোন।

আমরা তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি। ধন সামান্যই আমাদের সঙ্গে রয়েছে। এই সামান্য ধনের জন্য তুমি ঋষি হত্যার পাপ কেন করতে চাইছ?

রত্নাকর নিষ্ঠুর হেসে বললেন, ঋষিবর, আমি পাপের ভয়ে ভীত নই। কারণ আমি দস্যুবৃত্তি নিজের জন্য গ্রহণ করিনি।

অত্রি জানতে চাইলেন, তবে কার জন্য?

রত্নাকর বললেন, আমি পথিকদের মেরে যে ধন লুঠ করি তা দিয়ে বৃদ্ধ পিতামাতা ও স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ করি। কাজেই এই কাজের পাপের দায় তাঁরাই গ্রহণ করবেন।

অত্রি হেসে বললেন, মূর্খ দস্যু, তুমি যে কাজ করছ তাব দায় একা তোমারই — তোমার পাপের ভাগ সংসারের আর কেউই গ্রহণ করবেন না।

এইকথা শুনে রত্নাকর প্রতিবাদ জানালে অত্রি পুনরায় জানালেন, তুমি আমাদের কোন গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে তোমার বাড়িতে যাও। সেখানে তোমার পিতামাতা স্ত্রী-পুত্রকে জিজ্ঞাসা করে জেনে এসো, তাঁরা তোমার পাপের ভাগ নিতে রাজি আছেন কিনা।

রত্নাকর দস্যু হলেও ধার্মিক ব্রাহ্মণের সন্তান। ধর্মচিন্তা বা ধর্মকর্মে তার মতি না থাকলেও জন্মগত ভাবে কর্মফলের চিন্তা ও পাপভয় সূক্ষ্ম ভাবে তার মনে বর্তমান ছিল।

তিনি চিন্তিত হলেন। পরে ঋষিদের একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দ্রুত ঘরে ফিরে গেলেন।

প্রথমেই তিনি গেলেন বৃদ্ধ পিতার কাছে। জানতে চাইলেন, পিতা, আমি দস্যুবৃত্তির দ্বারা আপনাদের ভরণপোষণ করছি। দস্যুবৃত্তির ফলে আমার যে পাপ হচ্ছে সেই পাপের ভাগ কি আপনি নেবেন?

ছেলের কথা শুনে বৃদ্ধ সুমতি বললেন, পুত্র, বৃদ্ধ পিতার ভরণপোষণ করা প্রত্যেক পুত্রেরই কর্তব্য। তুমি আমার পুত্র। তোমার কাছ থেকে আমি সেবা নিতে পারি। কিন্তু তোমার পাপ আমি গ্রহণ করতে পারি না।

পিতার কথা শুনে রত্নাকর ব্যথিত হলেন। তিনি এবারে গেলেন স্ত্রীর কাছে। সেখানেও একই উত্তর পেলেন।

এরপর মায়ের কাছে এবং পুত্রের কাছে জিজ্ঞেস করেও জানতে পেলেন, তাঁর পাপ তারা কেউই গ্রহণ করতে রাজি নয়।

এবারে দস্যু রত্নাকরের অন্তরেব দৃষ্টি খুলে গেল। তিনি দেখলেন সংসারে তিনি একান্তই একা।

যাদের মুখের খাদ্য সংস্থানের জন্য তিনি দিনের পর দিন পাপ কাজ করে চলেছেন, তারা কেউই তার পাপের দায় গ্রহণ করতে রাজি নয়। সংসারে তার সমব্যথী কেউ নেই।

রত্নাকর সেই মুহূর্তেই ঘর ছাড়লেন। ছুটে এলেন গাছতলায় ঋষিদের কাছে। তাঁদের বাঁধন খুলে দিয়ে তিনি ঋষি অত্রির পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাতর ভাবে তার পাপমুক্তির উপায় জানতে চাইলেন।

মহর্ষি তাকে আশ্বস্ত করলেন, বললেন একমাত্র পবিত্র রাম নামেই তোমার পাপ দূর হতে পারে।

এরপর তিনি রত্নাকরকে একাগ্রচিত্তে রাম নাম জপ করতে উপদেশ দিলেন।

ঋষিরা চলে গেলেন নিজেদের পথে। রত্নাকর বসলেন রাম নাম জপ করতে। পাপভয়ে কাতর তার হৃদয়। আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আত্মশুদ্ধির তাগিদে।

এরপর দিনের পর দিন কেটে গেল। রত্নাকর সেই যে গাছতলায় আসন করে বসেছেন, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে এক ভাবেই নিমগ্ন হয়ে আছেন। নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে উচ্চারণ করে চলেছেন পবিত্র রাম নাম।

একসময় রত্নাকরের চারপাশে আগাছা গজিয়ে উঠল। সমস্ত শরীর বল্মীক বা উইপোকার মাটিতে ঢেকে গেল।

ঋষি অত্রির কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভের পর সাধনার দীর্ঘ সময়ে রত্নাকরের দেহ বল্মীকে আচ্ছাদিত হয়েছিল বলে তাঁর নাম হয় বাল্মীকি।

রাম নাম জপ করে আত্মজ্ঞান লাভ করে তিনি হলেন মহা ঋষি।

বল্মীক আস্তরণের মতই নৃশংস দস্যুর সমস্ত পরিচয় ঝরে গিয়ে এক নতুন কলেবর নতুন পরিচয় আত্মপ্রকাশ করল রত্নাকরের।

ঋষি বাল্মীকি আশ্রম স্থাপন করলেন তমসা নদীর তীরে। অন্যান্য ঋষিদের মতই তিনিও হলেন আশ্রমবাসী। ঋষি ভরদ্বাজ ছিলেন তাঁর শিষ্য।

একদিন দেবর্ষি নারদ এলেন বাল্মীকির সঙ্গে ধর্মালাপ করতে। সেই সময় বাল্মীকি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে দেবর্ষি, ত্রিভুবনের কোন খবর আপনার অগোচর নয়, আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে জানান সম্প্রতি পৃথিবীতে গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী আদর্শ পুরুষ কে আছেন।

তাপসশ্রেষ্ঠ নারদ বললেন, হে ঋষিবর, বহুগুণে গুণান্বিত যে শ্রেষ্ঠ পুরুষের কথা আপনি জানতে চাইছেন, তেমন চরিত্র আজকের দিনে দুর্লভ। তবে ইক্ষ্বাকু বংশের দশরথের পুত্র রাম বর্তমানে পৃথিবীতে রয়েছেন। আমি তার কাহিনী আপনাকে শোনাচ্ছি।

এরপর নারদ অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের জীবনকাহিনী বর্ণনা করলেন।

রাজা রামচন্দ্র ছিলেন ঋষি বাল্মীকিরই প্রায় সমসাময়িক। তাঁর রাজধানী অযোধ্যার দক্ষিণে গঙ্গা। গঙ্গার উপকূল ধরে বিশাল অরণ্য। সেই অরণ্যের মধ্য

দিয়ে কুলুকুলু রবে প্রবাহিত হয়েছে তমসা। এই তমসার তীরেই ঋষির মনোরম আশ্রম।

নারদ রামচরিত বর্ণনা করে দেবলোকে চলে গেলে বাল্মীকি তমসা নদীতে চললেন অবগাহন স্নান করতে। তাঁর মন জুড়ে রয়েছে রামচরিত্রের মাধুর্য। শিষ্য ভরদ্বাজ গুরুর বল্কল নিয়ে চললেন সঙ্গে।

নিবিড় বনপথ ধরে তাঁরা যখন নদীর দিকে যাচ্ছেন সেই সময় একজোড়া ক্রৌঞ্চ বা কোঁচ বক গাছের শাখায় মনের সুখে বিহার করছিল।

এক ব্যাধ জঙ্গলের আড়াল থেকে দেখতে পেয়ে ক্রৌঞ্চটিকে তীরবিদ্ধ করল। মাটিতে পড়ে পাখিটিমৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। ক্রোঞ্চী সঙ্গীর অবস্থা দেখে করুণ স্বরে চিৎকার করতে লাগল।

এই দৃশ্য দেখে বাল্মীকির হৃদয়ে যুগপৎ ক্রোধ ও করুণার উদয় হল। শোকার্ত ক্রৌঞ্চীর বেদনায় আবিষ্ট ঋষির মনপ্রাণ মথিত করে মুখ দিয়ে সেই মুহূর্তে তাঁর নিজেরই অজান্তে বেরিয়ে এল ছন্দবদ্ধ ভাষা ঃ

মা নিযাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।

হে নিষাদ, এই জঘন্য কাজের জন্য তুই চিরকাল সমাজে নিন্দিত হয়ে থাকবি।

বাল্মীকি নিজেই নিজের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গেলেন। এমন ছন্দবদ্ধ শোকগাথা কি করে তিনি আবৃত্তি করলেন। বিস্মিত ঋষি শিষ্য ভরদ্বাজকে তখন বললেন, হে ভরদ্বাজ আমার মুখ দিয়ে এই যে ছন্দবদ্ধ সুললিত বাণী নির্গত হল, তা শোক থেকে উৎসারিত তাই এ শ্লোক নামে খ্যাত হবে।

ঋষি বাল্মীকির মুখনিঃসৃত এই ছন্দবদ্ধ সুললিত কথাই আদি শ্লোক। রামের বৃত্তান্ত এই শ্লোকবদ্ধ কথায় রচনা করেছিলেন বলে বাল্মীকিকে বলা হয় আদি কবি।

শিষ্য ভরদ্বাজের সঙ্গে বাল্মীকি যখন কথা বলছেন সেই সময় সেখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা উপস্থিত হলেন। তিনি বাল্মীকিকে বললেন, হে ঋষিবর, আজ আমার ইচ্ছায় তোমার মুখ দিয়ে এই শ্লোক নির্গত হল। তুমি নারদের কাছে যে রামজীবনী শুনেছ, তা শ্লোকবদ্ধ করে প্রচাব কর।

ব্রহ্মার আদেশে এরপর বাল্মীকি রামকাহিনী লিখতে বসলেন। প্রায় চব্বিশ হাজার শ্লোকে অনুষ্টুপ ছন্দে লিখিত হল সেই কাহিনী। কালে তাই রামায়ণ নামে খ্যাত হল।

মহাকবি কালিদাস



ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিদের মধ্যে বাল্মীকি ও বেদব্যাসের পরেই নাম করা হয় কবি কালিদাসের।

বর্তমানকালে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের পন্ডিতগণও এবিষয়ে একমত হয়েছেন যে পৃথিবীতে সর্বদেশে সর্বকালে যত কবি আবির্ভূত হয়েছেন মহাকবি কালিদাস তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে স্থান পাবার যোগ্য। কালিদাসের কাব্যই তাঁকে এই দুর্লভ গৌরবের অধিকারী করেছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, কালিদাসের ব্যক্তিগত জীবন এবং তাঁর কাল সম্বন্ধে খুব কমই জানা সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষে কালিদাস সম্বন্ধে লোকশ্রুতিতে অনেক গল্প প্রচলিত। কিন্তু কেবল লোকশ্রুতি নির্ভর করে কোন মানুষের জীবনকাহিনী জানা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় না।

কালিদাসকে নিয়ে যেসব গল্প প্রচলিত তাতে এরকম একটা ধারণা স্পষ্ট হয় যে নিতান্ত অজ্ঞ অবস্থা থেকে তিনি নিজের চেষ্টায় কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন।

শিপ্রা নদীর কুলে উজ্জয়িনী নগরের কাছে বাস করতেন কালিদাস। তাঁর এমনই জ্ঞানবুদ্ধির বহর যে কাঠের সন্ধানে গাছে উঠে, যে ডালে বসতেন তারই গোড়া কাটতে শুরু করতেন।

কাটা ডালের সঙ্গে একসময় যে তাঁকেও মাটিতে ছিটকে পড়তে হবে সেই সামান্য বোধটুকুও নাকি তাঁর ছিল না।

যাইহোক, ঘটনাচক্রে এই কালিদাসের সঙ্গে এক বিদুষী রাজকন্যার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের রাতেই রাজকন্যা তাঁর স্বামীর মূর্খতার পরিচয় পেয়ে গেলেন। সকালে তিনি অপমান করে কালিদাসকে তাড়িয়ে দিলেন।

মূর্খ হলেও স্ত্রীর কাছ থেকে অপমান পেয়ে কালিদাস যে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। তিনি রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নদীর ধারে গিয়ে বসলেন।

নদীর পাথর বাঁধানো ঘাটে মেয়েরা জল নিতে আসে। তখন সবে দিন শুরু হয়েছে। গ্রামের মেয়েদের আনাগোনা শুরু হয়েছে ঘাটে। কালিদাস লক্ষ্য করলেন, ঘাটের ধারে একটি পাথর ক্ষয়ে গেছে। মেয়েরা জল তুলে কলসীটা কাঁখে তুলে নেবার আগে ওই পাথরে একবার রাখে। কলসীর এই সামান্য ছোঁয়াতেই পাথর ক্ষয়ে গেছে।

এই দৃশ্য কালিদাসের বোধোদয় ঘটাল। তাঁর হঠাৎ মনে হল, তাহলে তো চেষ্টা করলে তিনিও নিজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। বিদ্যা নেই বলেই আজ তাঁকে অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হতে হয়েছে। এখন থেকে চেষ্টা করলে তাঁর পক্ষেও বিদ্যা অর্জন করা অসম্ভব নয়।

তারপর থেকেই কালিদাস বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতী হলেন। এবং দীর্ঘ দিনের শ্রম, একাগ্র নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় বলে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, অন্যান্য পুরাণ, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলেন।

সেই যুগে রামায়ণ এবং মহাভারতের বাইরে সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখিত হয়নি।

কালিদাস স্থির করলেন, তিনি কাব্য রচনা করবেন। সেইভাবে চেষ্টা করতেই তাঁর ভেতরের সুপ্ত কবিত্ব প্রতিভা জেগে উঠল।

এরপরই একে একে তাঁর কলম থেকে কবিতার মত ছন্দে সৃষ্টি হল অভিজ্ঞান শকুন্তলম, রঘুবংশম, কুমারসম্ভবম, মেঘদূতম প্রভৃতি অসাধারণ রচনা।

এ সকল জনশ্রুতি ছাড়া কিছুই নয়। তবে একটিমাত্র জনশ্রুতি পন্ডিতদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। সেটি হল, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের রাজসভার একজন বরণীয় কবি ছিলেন।

এই ক্ষীণ সূত্রটিই কালিদাসের জীবনকাল নির্ণয়ের প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছে।

ভাবতীয়গণ মনে করেন যে খ্রিঃ পূঃ ৫৭ অব্দে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে কালিদাস বর্তমান ছিলেন।

কিন্তু সমস্যা হল, ঐতিহাসিকগণ উক্ত সময়ে কোন বিক্রমাদিত্যের সন্ধান পাননি। অথচ লোকশ্রুতি বলে, সম্রাট বিক্রমাদিত্যেরই নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন মহাকবি কালিদাস।

ভারতের ইতিহাসে শকারী বিক্রমাদিত্য নামে যিনি খ্যাত হয়ে আছেন তিনি শক আক্রমণকারীদের বিতাড়ন করে শকারী নাম গ্রহণ করেছিলেন ৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দে।

তিন তাঁর ছয়শো বছর পূর্ববর্তীকালকে আরম্ভ ধরে নিজের নামে ভারতবর্ষে বিক্রমাব্দ প্রতিষ্ঠা করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের এই মত বিচারে টিকল না। কেন না, পঞ্চম শতকে পশ্চিম ভারত গুপ্তসাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল। কাজেই ষষ্ঠ শতকে হূণ বিতাড়নের প্রশ্ন অবান্তর।

এই শতকের গোড়ায় যিনি হূণদের ভারত থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, তিনি কোন বিক্রমাদিত্য নন। তাঁর নাম যশোবর্মন বিষ্ণুবর্মন।

পন্ডিতগণ মনে করেন যে, গুপ্তযুগের চরম সমৃদ্ধি যার রাজত্বকালে সম্ভব হয়েছিল, তিনি হলেন সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০ ৪১৩ খ্রিঃ)। ইনিই

বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে উজ্জয়িনীতে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

মহাকবি কালিদাস ছিলেন এই বিক্রমাদিত্যেরই সভাকবি। ইনি সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্ত (৪১৩- ৮৫৫ খ্রিঃ) এবং তাঁর পুত্র স্কন্দগুপ্তের কালেও বর্তমান ছিলেন।

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য রচিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। মহাকবি কালিদাসের রচনা সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য গীতিকাব্য ও নাটক এই তিনটি ধারাকেই পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে।

তাঁর রচিত মহাকাব্য কুমারসম্ভব এবং রঘুবংশ, গীতি কাব্য মেঘদূত এবং নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলম, মালবিকাগ্নিমিত্র এবং বিক্রমোর্বশী।

অপর একটি গীতিকাব্য ঋতুসংহার সাধারণভাবে তাঁর রচনা বলে স্বীকৃত হলেও কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন।

এছাড়াও কালিদাসের রচনা নয় অথচ তাঁর নামে প্রচারিত এমন কিছু গ্রন্থও রয়েছে, যেমন নলোদয়, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গারতিলক, চিদ্গগনচন্দ্রিকা, ভ্রমরাষ্টক, শ্রুতবোধ, শৃঙ্গারসার, মঙ্গলাষ্টক প্রভৃতি।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি, রাজাদের রাজ্যশাসন প্রণালী এমন কি বিভিন্ন স্থানের নিখুঁত ভৌগোলিক বিবরণ কালিদাসের বিভিন্ন রচনা থেকে পাওয়া যায়। তাঁর রচনায় ব্যবহৃত অনুপম উপমাও তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাই দেশে বিদেশে কালিদাস বিদগ্ধজনের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছেন।

কৃত্তিবাস ওঝা



বাংলার আদি কবি কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ এমন একটি অসাধারণ গ্রন্থ যা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে কি গরীবের ঝুপরিতে কি ধনীর প্রাসাদে সর্বত্র সমান মর্যাদায় পঠিত হয়ে আসছে। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে কবি কৃত্তিবাসের তুলনা একমাত্র তিনিই।

বাল্মীকি রচিত রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ তিনি করেননি। রামকাহিনীতে সংযোজিত করেছেন নিজের কল্পিত এমন অনেক বিষয় যা রামায়ণকে আধুনিক মন ও মননের উপযোগী করে তুলেছে। এই গ্রন্থই বাঙালীর ঘরে ঘরে রামের মহৎ জীবন প্রচার করে চলেছে।

আপামর মানুষের মধ্যে কবি কৃত্তিবাসের এমন আশ্চর্য সমাদর লক্ষ্য করে একদিন বাংলার অপর এক কবি মাইকেল মধুসূদন এমনি একজন সার্থক কবি হয়ে

ওঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

যাঁর রচনা, চণ্ডীমণ্ডপে, বটতলায়, মুদিখানায় পঠিত হবে আবার সমান আগ্রহে ও যত্নে ধনীর প্রাসাদেও ধ্বনিত হবে।

কবি কৃত্তিবাসের সঠিক জন্ম তারিখ পাওয়া যায়নি। এমনকি তাঁর রচিত মূল পাণ্ডুলিপিও আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি।

প্রাচীন কবিরা প্রচলিত প্রথা অনুসারে নিজের রচনার ভণিতাতে জন্মসাল বা সময় উল্লেখ করতেন। কৃত্তিবাসের রচনায় তা অনুপস্থিত।

তিনি আত্মপরিচয় হিসাবে যা বিবৃত করেছেন তা থেকে কেবল কবির জন্মদিনটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

সেটি এই রকম ঃ

আশ্চর্যের বিষয় যে কবি রচিত এই আত্মকাহিনীটিও কালের কবলে হারিয়ে যেতে বসেছিল। সুবিখ্যাত সমালোচক রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এটি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে অপর একটি পুঁথি থেকেও কবির আত্মকাহিনী উদ্ধার করেছিলেন ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

কবি কখন বর্তমান ছিলেন সেই কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই আত্মকাহিনীই হল মূল আকর। এর সহায়তায় আজ আমরা বলতে পারছি বঙ্গভারতীর বরপুত্র বঙ্গদেশে কখন কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আত্মকাহিনীতে কবি জানিয়েছেন, আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাসে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

পুঁথিটি যারা নকল করেছিলেন, তাঁদের বিভ্রান্তির জন্য কোথাও কোথাও পুণ্য শব্দটি পূর্ণ রূপে লেখা হয়েছে। ফলে এ নিয়েও গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

যাইহোক দীনেশচন্দ্র সেনই প্রথম জানিয়েছিলেন কবির জন্ম হয়েছিল ১৪৪০ খ্রিঃ। জন্মদিনটি মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী তিথি রবিবার।

এই হিসেব অনুযায়ী কবির জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রামে স্মৃতিফলক প্রোথিত হয়েছে।

অবশ্য পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদগণ অনেকেই এই কালটির সঙ্গে একমত হতে পারেন নি।

বর্তমান গবেষকগণ Indian Ephemeries-এর সাহায্যে সঠিক সালটি নিরূপণ করেছেন রবিবার এবং শ্রীপঞ্চমী তিথিকে ধ্রুব করে। এই হিসাবে কবি কৃত্তিবাসের জন্ম হয়েছিল ১৪৪৩ খ্রিঃ ৬ই জানুয়ারী।

জন্ম সাল-তারিখ জানা সম্ভব হলেও মৃত্যুর সাল-তারিখ জানা সম্ভব হয় নি। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের সূত্র ধরে জানা যায়, কবি কৃত্তিবাস চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত ১৪৯৩ খ্রিঃ অবধি জীবিত ছিলেন।

কবির আত্মকাহিনী থেকে জানা যায়, তাঁরা ছিলেন মুখটি বংশের কুলীন এবং পূর্বতন পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের অধিবাসী।

সেই দেশে আকাল উপস্থিত হলে কবির বৃদ্ধ প্রপিতামহ পন্ডিত নরসিংহ ওঝা সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে এক গ্রামে চলে আসেন।

পূর্বে মাঝিরা এই গ্রামে নিজেদের বাসস্থানে মনোরম ফুলবাগান তৈরি করত। তাই গ্রামের নাম হয়েছিল ফুলিয়া।

এই গ্রামের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে গঙ্গা প্রবাহিত। এখানেই নরসিংহ ওঝা পুত্রপৌত্রাদি নিয়ে বাস করতে থাকেন।

নরসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর। গর্ভেশ্বরের তিন পুত্র মুরারি, সূর্য ও গোবিন্দ। মুরারির সাত পুত্র। তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভৈরব রাজসভায় সমাদৃত হয়েছিলেন। অপর পুত্র বনমালী। তাঁর ছয় পুত্র এক কন্যা। কৃত্তিবাস বনমালীর জ্যেষ্ঠপুত্র।

কৃত্তিবাসের মায়ের নাম মালিনী। অবশ্য বিভিন্ন পুঁথিতে কবির মায়ের নাম বিভিন্ন দেখা যায়। যেমন, মেনকা, মানিকী, মানিকি, মালিকা ইত্যাদি।

কবি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন পিতা ও পিতামহের কাছেই। বারবছর বয়সে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে পাঠানো হয় (১৪৫৪ খ্রিঃ ৪ই জানুয়ারী) গৌড়ের বিখ্যাত পন্ডিত রায়মুকুট আচার্য চূড়ামণি বৃহস্পতি মিশ্রের কাছে। এরপর তিনি যান উত্তরবঙ্গে আচার্য দিবাকরের কাছে।

পাঠ শেষ হলে আচার্য দিবাকর সর্বসাধারণের জন্য বঙ্গভাষায় রামায়ণ গান বা পাঁচালী বচনার আদেশ করেন।

শিক্ষাগুরুর আদেশে কৃত্তিবাস রামায়ণ পাঁচালী রচনা শুরু করেন।

বাইশ বছর বয়সে বাড়ি ফিরে এসে তিনি তৎকালীন গৌড়ের অধিপতি রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের দরবারে উপস্থিত হন এবং সাতটি শ্লোক রচনা করে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

কৃত্তিবাসের কবিত্বে সন্তুষ্ট হয়ে গৌড়াধিপতি তাঁকে রাজকীয় মর্যাদায় ভূষিত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি সগর্বে জানান ঃ

কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ।।

তবে রাজসম্মান সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করলেও তিনি জনগণদ্বারা ফুলিয়ার কবি হিসাবে সংবর্ধিত হয়েছিলেন।

বিভিন্ন পুঁথি থেকে জানা যায় রামায়ণ গান রচনায় কবি গৌড়েশ্বরের আন্তরিক সমর্থন পেয়েছিলেন।

তৎকালীন সমাজের কৌলিন্য প্রথা অনুযায়ী কবি তিনবার বিবাহ্ করেছিলেন। তাঁর এক পুত্র ও চার কন্যা লাভ হয়েছিল।

বর্তমানে কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে যেটি প্রচলিত তার সপ্তকান্ডের অনেকখানিই সংগ্রহ্ করেছিলেন ন্যাথানিয়াল ব্রাসি হ্যালহেড। গ্রন্থাকারে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৩ খ্রিঃ শ্রীরামপুর মিশন থেকে।

কাশীরাম দাস

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।



এই পরিচিত ভণিতা প্রায় তিনশ বছর ধরে বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়ে চলেছে।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারত। এটি কেবল পুণ্যকাহিনী মাত্র নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর স্বরূপ। ভারত তথা মানবজাতির সর্বজনীন বিধি-নীতির আধার।

প্রাচীন ভারতের বেদ উপনিষদ সহ সমস্ত পুরাণের সার হল মহাভারত মহাগ্রন্থ। তাই তাকে বলা হয় পঞ্চম বেদ।

আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেব-দেবী, যোগী, গৃহী, রাজা, প্রজা, পাপী, পুণ্যবান, দৈত্য-দানব, যক্ষ-রাক্ষস, পিশাচ, মাতঙ্গ, ভুজঙ্গ, কুরঙ্গ, পর্বত, জঙ্গম, সমুদ্র প্রভৃতি, এককথায় বিশ্বের সমস্ত জীবের ইতিহাস স্বরূপ এই গ্রন্থ।

যাট লক্ষ শ্লোকে মহাভারত প্রথম রচনা করেন মহামুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। এই যাট লক্ষ শ্লোকের মধ্যে ত্রিশ লক্ষ দেবলোকে, পনের লক্ষ পিতৃলোকে চৌদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে এবং বাকি লক্ষ শ্লোক মর্তলোকে প্রচারিত হয়েছিল।

এই লক্ষ শ্লোক পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের প্রাজ্ঞ পন্ডিতমন্ডলী মূল সংস্কৃত থেকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেন।

বাংলা ভাষায় যে অনুবাদটি সর্বজন প্রিয় ও বহুল প্রচলিত তা রচনা করেছিলেন কাশীরাম দাস।

তার আগে আরও অনেক কবি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, কিন্তু কালজয়ী হয়েছেন কাশীরাম দাস নিঃসন্দেহে।

কাশীরামের পূর্ববর্তী অনুবাদকগণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় মূল গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন। ভক্তি ও ভাব তাঁদের চিন্তাকে সঞ্জীবিত করেনি।

কাশীরামের সঙ্গে এখানেই এই সকল কবিদের রচনার প্রভেদ। তিনি কেবল অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হননি। নিজের অন্তর্নিহিত ভাব ও ভক্তিধারায় তাঁর রচনাকে পুষ্ট করেছিলেন।

সরল, প্রাঞ্জল অথচ সুন্দর সরস ভাষায় পয়ার ছন্দে রচিত কাশীরাম দাসের মহাভারত যুগের পর যুগ বাংলার গ্রামে গঞ্জে, নগরে, বন্দরে ভক্ত ও রসিক নরনারীর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়ে চলেছে।

পুণ্যশ্লোক কাশীরাম দাসের জীবনকাহিনী আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তিনি নিজের রচনায় যেটুকু আত্মপরিচয় প্রকাশ করেছেন, তাই আমাদের সম্বল।

কবি লিখেছেন,

ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।।
কায়স্থ-কুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাসসুত সুধাকর নাম।।
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।।

এই পাঠ থেকে জানা যায় ইন্দ্রানী পরগনার অন্তর্গত সিদ্ধি নামক গ্রাম কবির জন্মস্থান। তাঁর বাসস্থান ছিল ভাগীরথীর কূলে আর সেখানে বারটি তীর্থ অবস্থিত ছিল।

বিশেষ অনুসন্ধানে জানা যায়, বর্ধমান কাটোয়ার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী নামক পরগনায় প্রাচীনকালে সিদ্ধিগ্রাম অবস্থিত ছিল।

এই গ্রামের কাছেই গঙ্গার কূলে বারটি তীর্থ অর্থাৎ ঘাটের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান।

কাশীরামের কৌলিক উপাধি ছিল দেব। কিন্তু দেব দ্বিজে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য তিনি নিজেকে 'দাস' যুক্ত করে বিনয় নম্রতা প্রকাশ করেছেন।

মহাভারতে নিজ রচনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি দাস শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

কাশীরামের প্রপিতামহের নাম ছিল প্রিয়ঙ্কর। পিতামহের নাম সুধাকর এবং পিতার নাম কমলাকান্ত। কাশীরাম ছিলেন পিতার মধ্যম পুত্র। তাঁর অগ্রজের নাম কৃষ্ণদাস ও কনিষ্ঠের নাম গদাধর

উত্তরাধিকার সূত্রেই কমলাকান্তের পুত্রগণ কবি প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস ভাগবতের বঙ্গানুবাদ করে শ্রীকৃষ্ণবিলাস কাব্য রচনা করেন। কনিষ্ঠপুত্র গদাধর জগন্নাথ মঙ্গল কাব্যের রচয়িতা।

কাশীরাম মহাভারতের আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব পর্যন্ত রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। ইতিমধ্যেই তাঁর অকালমৃত্যু ঘটলে মহাভারতের অবশিষ্ট পর্বের অনুবাদ করে যেতে পারেননি।

গদাধরের পুত্র নন্দরামকে অন্তিম সময় তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার আদেশ করে যান। জ্যেষ্ঠতাতের আদেশে নন্দরাম মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন।

কাশীরামের মহাভারতের প্রথম চার পর্ব সর্বপ্রথম শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮০১-০৩ খ্রিঃ ছাপা হয়। ১৮৩৬ খ্রিঃ এই প্রেস থেকেই জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় মহাভারতের সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কাশীরামের বাসস্থান সিদ্ধিগ্রাম বর্তমানে সিঙ্গিগ্রাম নামে পরিচিত। অনুমান করা হয় সিদ্ধিগ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদার এই গ্রাম নিজ গ্রামের সঙ্গে যুক্ত করায় সিদ্ধিগ্রাম নামটি লোপ পায়।

অনেকের মতে দাইহাটের নিকট সিদ্ধিগ্রাম অঞ্চলেই কবির পৈতৃক ভিটা বর্তমান ছিল।

কবি কাশীরামদাস মেদিনীপুর জেলার আবাসগড়ের রাজার আশ্রয়ে একটি পাঠশালা স্থাপন করে শিক্ষকতা করতেন।

প্রায়ই রাজবাড়িতে কথক-গায়কদের সেই সময় আগমন ঘটত এবং তাঁরা মহাভারত পুরাণাদি পাঠ করতেন।

কথকদের মুখে কথকতা শুনেই কবির মনে বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনার আগ্রহ জন্মে। পরবর্তী কালে তাঁর রচিত মহাভারতই কালোত্তীর্ণ হয়ে বাঙালীর ঘরে ঘরে স্থান লাভ করে।

কাশীরামের জীবনের আর যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে জানা যায়, কবি নিজ গ্রামে অপর সকলের উপকারের কথা চিন্তা করে একটি পুকুর খনন করান। সেই পুকুর এখনো বর্তমান, কেশেপুকুর নামে তার পরিচিতি।

কবির বাস্তুভিটা তাঁর পুত্র ১০৮৫ খ্রিঃ তাঁদের কুলপুরোহিতকে দান করেন। এই দানপত্র থেকে অনুমান করা হয় কাশীরাম ১০০০ খ্রিঃ কিছুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কাশীরামের রচিত অপর গ্রন্থগুলো হল, সত্যনারায়ণের পুঁথি, স্বপ্নপর্ব, জলপর্ব ও নলোপাখ্যান।

সাধক কবি রামপ্রসাদ



সাধক কবি রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যিনি সর্বপ্রথম অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি বাংলার আর এক সুখ্যাত কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তিনি লিখেছিলেন, 'বঙ্গদেশের মধ্যে যে কয়জন মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ, তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন।'

প্রাচীন বাংলার কবি রামপ্রসাদ সম্পর্কে কবি ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত এবং গবেষণালব্ধ তথ্যই এখনো পর্যন্ত পন্ডিত-গবেষক মহলে স্বীকৃত।

রামপ্রসাদী সংগীতের জনপ্রিয়তা গত তিনশ বছরে এতটুকু কমেনি। বরং ভক্ত, সাধক, ভাবুক, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও কাব্যরসিকের আগ্রহ ও সমাদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছে। রামপ্রসাদের মাতৃসঙ্গীতে কে না আবিষ্ট হয়।

অথচ এই সর্বজনপ্রিয় কবির জীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় খুবই কম। নানা গল্প কিংবদন্তিতে ভরা তাঁর জীবনকাহিনী।

রামপ্রসাদের জন্মের সঠিক সন তারিখ নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছেন ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

তিনি কবির জন্মকালীন গ্রহসংস্থান ধরে হিসেব করে অনুমান করেছেন তাঁর জন্মমাস আশ্বিন, সন ১১২৭ (১৭২০ খ্রিঃ)। ঈশ্বর গুপ্তও মোটামুটি ১৭২০ খ্রিঃ-ই সিদ্ধান্ত করেছেন।

চব্বিশ পরগনা জেলার হালিশহরের অন্তর্গত ভাগীরথী তীরে অবস্থিত কুমারহট্ট গ্রাম। এখানেই রামপ্রসাদের আবির্ভাব হয়। তাঁর কৌলিক নাম রামপ্রসাদ সেন। পিতার নাম রামরাম সেন।

রামপ্রসাদ একাধারে শক্তিসাধক, কবি ও গায়ক। তাঁর রচিত গানের গীত-ভঙ্গীই রামপ্রসাদী সুর নামে খ্যাত। তাঁর রচিত ভক্তিগীতি বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। লোকগীতি ও পল্লীগীতির মতই তাঁর নিজস্ব সুরে গাওয়া গীত বহুযুগ পূর্ব থেকে শোনা যায় বাংলার পথে ঘাটে, অরণ্যে প্রান্তরে।

চাষী হল চালনা করছে, মাঝি নৌকায় দাঁড় বাইছে, উদাসী পথিক পথ চলছে, সকলেরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয় রামপ্রসাদের গান।

অল্প বয়সেই রামপ্রসাদ বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দী ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শিক্ষানুরাগের পাশাপাশি তাঁর মধ্যে উপ্ত ছিল শক্তিতত্ত্বের বীজ। শক্তিরূপিনী মায়ের নামে বিভোর থাকেন তিনি দিবানিশি।

পিতার মৃত্যুর পরে সংসারে দেখা দেয় অনটন। তখন বড় দুঃখে তিনি গাইলেন,

এ সংসারে এনে মাগো করলি আমায় লোহা-পেটা।
তবু আমি কালী বলে ডাকি—
সাবাস আমার বুকের পাটা।

ঈশ্বর ভক্তি আর কবিশক্তি জন্মগত ভাবেই পেয়েছিলেন রামপ্রসাদ। কিন্তু তা দিয়ে তো গ্রাসাচ্ছাদন চলে না, বাধ্য হয়ে তাঁকে গরানহাটার জমিদার দুর্গাচরণ মিত্রের সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ নিতে হল।

রামপ্রসাদ চলে এলেন কলকাতায়। কিন্তু সেরেস্তার হিসেবের খাতায় শ্যামাবিষয়ক গীতরচনা করে লিখে রাখতেন।

ম্যানেজারের কাছে নালিশ শুনে দুর্গাচরণ তলব করেন হিসেবের খাতা। দেখেন জমা-খরচের পরিবর্তে লেখা শুধু গান—মাতৃসঙ্গীত।

গানগুলির অন্তর্নিহিত ভাব অভিভূত করে দুর্গাচরণকে। তিনি মাসিক তিনটাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে রামপ্রসাদকে পাঠিয়ে দিলেন স্বগ্রামে।

সহৃদয় মনিবের বদান্যতায় এভাবে সংসারচিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে রামপ্রসাদ ভগবৎ সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

সংসার সামলান স্ত্রী সর্বানী দেবী, রামপ্রসাদ গঙ্গাতীরে বসে প্রাণ-আকুল করা সুরে গান করেন। ভক্তিবাদী রামপ্রসাদের গানের সহজ সরল কথায় ব্যক্ত হয় প্রাণের আর্তি, গূঢ় ঈশ্বর-তত্ত্বের সহজ প্রতীকী-রূপ। সেই গান শুনে গঙ্গাবক্ষে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বজরা থেমে যায়। বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার চোখে জল আসে।

মুগ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রদ্ধা ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সাধক-কবিকে দান করেন একান্ন বিঘা নিষ্কর জমি।

বাড়ির উঠোনে একবার বেড়া বাঁধছিলেন রামপ্রসাদ। মেয়ে জগদীশ্বরীকে বলেছেন বেড়ার অপর দিক থেকে খুঁটির দড়িটা বাড়িয়ে দিতে।

ছেলেমানুষ জগদীশ্বরী পিতার আদেশ ভুলে মায়ের সঙ্গে সংসারের কাজে চলে গেছে। এদিকে রামপ্রসাদ শ্যামামায়ের গান ধরেছেন আর বেড়া বাঁধছেন। একসময় সুষ্ঠুভাবেই বেড়া বাঁধার কাজ শেষ করেন তিনি।

বেড়ার দড়ি ফেরানোর কথা যখন মনে পড়ল জগদীশ্বরী ছুটে এলেন বাবার কাছে। এসে দেখেন বাবার বেড়া বাঁধা শেষ হয়ে গেছে।

দুজনেই আশ্চর্য! দুজনের মনেই প্রশ্ন দেখা দেয়। কে সেই মেয়ে, সারা বেলা বেড়ার অপর দিক থেকে রামপ্রসাদকে দড়ি ফিরিয়ে দিয়েছেন?

সাধক বুঝলেন, ব্রহ্মময়ী মা কন্যারূপে এসে এতক্ষণ সন্তানকে সাহায্য করে গেছেন। আকুল হয়ে কেঁদে গেয়ে উঠলেন ভক্ত কবি—

নয়ন থাকতে দেখলে না মন
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে
বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া।

একবার ঘটনাচক্রে রামপ্রসাদ রওনা হয়েছেন কাশীধামে, সেখানে অন্নপূর্ণাকে গান শোনাবেন বলে।

পথ চলতে চলতে শ্রান্ত রামপ্রসাদ ত্রিবেণীতে গঙ্গার ধারে বিশ্রাম করতে বসলেন। নিদ্রায় জড়িয়ে এলো চোখ।

এখানে ঘুমে স্বপ্ন দেখলেন, বিশ্বজননী বলছেন তোমাকে কাশী আসতে হবে কেন, আমি যে ভক্তের হৃদয়েই থাকি। এখানেই শোনাও তোমার মধুর কণ্ঠের গান। অত কষ্ট করে অত দূরের পথে নাই বা গেলে প্রসাদ।

জেগে উঠে রামপ্রসাদ গান ধরলেন—

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে
গয়া-গঙ্গা-বারানসী।।

এখান থেকে ফিরে গিয়েই তন্ত্র সাধনমতে পঞ্চমুন্ডীর আসন পাতলেন রামপ্রসাদ। এখানেই তন্ত্রাচার্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এসে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন তাঁকে। গুরুর কৃপাবলে এখানেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন রামপ্রসাদ।

সিদ্ধিলাভের কিছুকাল পরেই একদিন মরদেহ ত্যাগ করে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন ভক্ত কবি রামপ্রসাদ। বাষট্টি বছর বয়সে, ১৭৮৬ খ্রিঃ।

বঙ্গভূমিতে যত কবি জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় গীতিকাব্য রচনা করে তাতে সুর সংযোজন করেন এবং সঙ্গীতক্ষেত্রে অভিনব এক স্থায়ী সঙ্গীত-রীতি ও সুরের প্রবর্তন করেন।

রামপ্রসাদের কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন নামে দুটি ছোট কাব্য রয়েছে। এছাড়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্যও রচনা করেছিলেন। তিনি কবিরঞ্জন উপাধি লাভ করেছিলেন।

চণ্ডীদাস



প্রাচীন বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। তাঁর রচিত পদ এক সময়ে বাঙ্গালীর মুখে মুখে ফিরত। আধুনিককালেও সহজিয়া সাধকদের ঐশীভাবনা ও প্রেরণার আধার চণ্ডীদাসের পদ।

প্রাকআধুনিককালের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি চণ্ডীদাসের নাম ও রচনা ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে জানবার সুযোগ খুবই কম।

চৈতন্যদেবের জীবনীকারদের মধ্যে অনেকের লেখায়ই পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব নিজেও চণ্ডীদাসের পদের অনুরাগী ছিলেন।

চৈতন্যদেবের সমকালীন রূপ গোস্বামীর রচনাতে চণ্ডীদাসের রচনার উল্লেখ রয়েছে।

এই দুটি সূত্রই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে জানবার প্রাথমিক মাধ্যম। এ থেকে জানা যায়; কবি চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তীকালে বর্তমান ছিলেন।

খুব বেশি দিনের কথা নয়। বর্তমান শতাব্দীতেই চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত বেশ কিছু পদ ও একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে।

পুঁথিটির নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বিশেষজ্ঞদের অনুমান পুঁথিটির মূল নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। বসন্তরঞ্জন রায় এই পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

পুঁথিটি পালাগানের আকারে লিখিত। ভণিতায় নাম পাওয়া যায় বড়ুচণ্ডীদাস এবং অনন্ত বড়ুচণ্ডীদাস।

এই পুঁথি আবিষ্কারের পর থেকেই চণ্ডীদাস বিষয়ে নানারকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যা হল পুঁথির প্রায় কোন পদের সঙ্গেই প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদের মিল নেই।

তাছাড়া পুঁথির ভাষাও অত্যন্ত প্রাচীন এবং এর বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কোন প্রভাব দেখা যায় না।

দীর্ঘকাল পন্ডিতদের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ চলে। পরে সিদ্ধান্ত হয় উক্ত পুঁথির রচয়িতা বড়ুচণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তীযুগে বর্তমান ছিলেন।

চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন বলে জানা যায় ইনি তিনি নন। এই ভাবেই এক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়।

চৈতন্যদেব যাঁর পদ আস্বাদন করতেন তিনি হলেন দ্বিতীয় চন্ডীদাস। অনুমান করা হয় তাঁর আর্বিভাব হয়েছিল প্রাকচৈতন্যকালে অথবা প্রায় সমকালীন সময়ে। এই দ্বিতীয় চন্ডীদাসের পদই দীর্ঘকাল বঙ্গভূমে প্রচলিত। পুথির ভণিতায় রচয়িতার নামের সঙ্গে কোন উপাধিযুক্ত হয়নি।

অবশ্য অনেকের অনুমান এঁর রচনাগুলিতেই কেবল দ্বিজচন্ডীদাস ভণিতা যুক্ত হয়েছে।

প্রথম চন্ডীদাস বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হবার কিছুকাল পূর্বে নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় চন্ডীদাস পদাবলী। এই সংকলনে অনেক নতুন পদের সন্ধান মেলে। পদের অনেকগুলিরই ভণিতায় পাওয়া যায় দীন চন্ডীদাস নাম। কিছুকাল পরে এই ভণিতাযুক্ত আরও অনেক নতুন পদ প্রকাশিত হয় মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত 'দীন চন্ডীদাসের পদাবলী' গ্রন্থে।

বিচারে নিরূপিত হয়েছে এই চন্ডীদাস নামাঙ্কিত পদগুলি ভাবে ও ভাষায় অত্যন্ত দীন। পূর্ববর্তী দুই চন্ডীদাসের পদাবলীর তুলনায় নিতান্তই খেলো ও অকিঞ্চিৎকর।

অনুমান করা হয়, ইনি চৈতন্যপরবর্তীযুগে আবির্ভূত হন এবং তৃতীয় চন্ডীদাসরূপেই তাঁকে বিবেচনা করা হতে থাকে।

চন্ডীদাস নামাঙ্কিত কিছু পদ আছে যাতে সহজপন্থী সাধনার পরিচয় স্পষ্ট। এগুলির ভণিতায় পাওয়া যায় তরুণীরমণ প্রভৃতি নাম। অনাথ সহজিয়া, রজকিনী, রামী প্রভৃতি শব্দও এই পদগুলিতেই পাওয়া যায়।

পন্ডিতজনের অনুমান ইনিই সহজিয়া সাধন মার্গের সাধক চন্ডীদাস এবং চতুর্থ চন্ডীদাস রূপেই এঁকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

প্রাকআধুনিক যুগের বাঙ্গালীর সর্বাধিক প্রিয় কবি চন্ডীদাস সম্পর্কে আলোচনায় এই চারজন চন্ডীদাসকেই স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নিতে হয়।

চন্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক কাহিনী বঙ্গদেশে প্রচলিত। এই সব কাহিনী পাওয়া যায় 'চন্ডীদাসের জীবনী' বলে একখানি প্রাচীন গ্রন্থে। তবে এই গ্রন্থটির প্রামাণিকতা স্বীকৃত হয়নি।

গল্পগুলি কল্পিত কাহিনী বলেই বিবেচিত হয়েছে।

তবে এটা ঠিক, অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন কোন বৈষ্ণব কড়চায় চন্ডীদাস ও রজকিনী কাহিনীর আভাস পাওয়া যায়।

এতে জানা যায় কোন এক চন্ডীদাস সহজিয়াপন্থী ছিলেন। তাঁরই সাধন সঙ্গিনী ছিলেন এক রজকিনী।

এই রজকিনীর নাম কিন্তু সর্বত্র এক নয়। কোথাও রামী, কোথাও তারা, কোথাও রামতারা।

চন্ডীদাসের জন্মভূমি বলে বহুকাল থেকে দুটি স্থানের নাম বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। তাদের একটি বীরভূম জেলার নানুর গ্রাম। অন্যটি বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রাম।

কথিত যে, চন্ডীদাস দেবী বাশুলীর উপাসক ছিলেন। উক্ত দুই গ্রামেই বাশুলীদেবীর মন্দির বর্তমান।

এই দুই গ্রাম নিয়েও পন্ডিতদের বাদানুবাদের অন্ত নেই। কোনটি চন্ডীদাসের প্রকৃত জন্মস্থান তা সঠিকভাবে নিরূপণ সম্ভব না হলেও নানুরে চন্ডীদাসের স্মরণে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত মেলা ও সহজিযাপন্থী বাউল সম্প্রদায়ের সমাবেশ দেশ বিখ্যাত।

চন্ডীদাসের একটি বিখ্যাত পদ উদ্ধৃত হল ঃ

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।
সখি! কি মোর করমে লেখি!
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু।
ভানুর কিরণ দেখি।।
উচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে।।
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মানিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মানিক লুকাল
অভাগী-করম-দোষে।।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চন্ডীদাস শ্যামের পীরিতি
মরণ-অধিক শেকল।।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ খ্রিঃ ২৬ সেপ্টেম্বর, মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তাঁর বাবার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম ভগবতী দেবী। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁদের পরিবারের খ্যাতি ছিল, কিন্তু আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি কেটেছিল কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে।

আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ঠাকুরদাসকে অল্প বয়সেই বীরসিংহ গ্রাম ছেড়ে অর্থোপার্জনের জন্য কলকাতায় যেতে হয়। সেখানে নামমাত্র বেতনে এক ব্যবসায়ীর খাতা লেখার কাজে নিযুক্ত হন।

ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, অধ্যবসায় ও স্বাধীনচেতা মনোভাব সম্বল করে তিনি কালক্রমে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পিতার এই সব গুণ পরবর্তিকালে পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও পূর্ণমাত্রায় দেখা গেছে।

কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতে হলেও ঈশ্বরচন্দ্রের মনোবল ছিল অসীম। গ্রামের পাঠশালার পড়াশুনায় কখনো অমনোযোগী হননি।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে বাংলা ১২৩৫ সনের শেষ দিকে তিনি বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। সেই সময় তাঁর বয়স নয় বছর। কথিত আছে, পথে আসতে আসতেই তিনি অসাধারণ মেধা বলে ইংরাজি সংখ্যা এক থেকে দশ পর্যন্ত শিখে নিয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র কলকাভায় বড়বাজার অঞ্চলে ভাগবতচরণ সিংহের বাড়িতে বাবার সঙ্গে বাস করতে থাকেন। ভর্তি হন সংস্কৃত কলেজে—ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে।

অপরিসীম অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনা করে তিনি স্কুলের পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং মাসিক পাঁচটাকার বৃত্তি লাভ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠানুরাগ এমনই ছিল যে তেলের অভাবে ঘরে আলো জ্বালাতে না পারলে পথের ধারে গ্যাসের আলোতে বসে পড়া তৈরি করতেন। এমনি অবিরাম কষ্টের মধ্যেই তাঁকে স্কুলের পড়া চালাতে হয়েছিল।

ব্যাকরণ শ্রেণীর পাঠ শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র ইংরাজি শ্রেণীতে পড়া আরম্ভ করেন। এরপর সাহিত্য শ্রেণীর পাঠ শেষ করেন ১৮৩৩ খ্রিঃ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। সাহিত্য শ্রেণীতে তিনি কৃতি শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালংকারের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন।

১৮৩৫ খ্রিঃ বিদ্যাসাগর ভর্তি হন অলংকার শ্রেণীতে। এই শ্রেণীতে তিনি এক বছর পড়াশুনা করেন। এবারেও পরীক্ষায় প্রথম হয়ে প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন।

এরপর যথাক্রমে বেদান্ত শ্রেণী ও স্মৃতিশ্রেণীতে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি, জ্যোতিষ এবং ন্যায়শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন। ১৮৩৯ খ্রিঃ তিনি হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর বিদ্যাসাগর উপাধিটি পরীক্ষার শেষে প্রশংসাপত্রে তাঁর নামের আগে ব্যবহার করা হয়।

বিদ্যাসাগর বিয়ে করেন পনের বছর বয়সে। তাঁর স্ত্রীর নাম দিনময়ী দেবী।

১৮৪১ খ্রিঃ ২৯ শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় কর্মজীবন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পন্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এত কম বয়সে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করা বিদ্যাসাগরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। উক্ত কলেজের সেক্রেটারি জি. টি. মার্শালের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও বিশেষ সুপারিশে তা সম্ভব হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঁচ বছর কর্মনিযুক্ত ছিলেন তিনি।

১৮৪৬ খ্রিঃ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে যোগদান করেন। সেই সময়ে কলেজের সম্পাদক ছিলেন রসময় দত্ত। সেই বছরেই বিদ্যাসাগর শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি বিধানে এক মূল্যবান রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। এ বিষয়ে সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে মতবিরোধ উপস্থিত হলে তিনি ১৮৪৮ খ্রিঃ জুলাই মাসে চাকরি ছেড়ে দেন।

পুনরায় যোগ দেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কাজে। সম্পাদক জি.টি. মার্শালের আগ্রহে প্রথমে তিনি কলেজের প্রধান করনিকের পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে ১৮৫০ খ্রিঃ সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

১৮৫৬ খ্রিঃ এই কলেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হলে বিদ্যাসাগরকে ওই পদে নিযুক্ত করা হয়।

এবারে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান। কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও অন্যান্য সংস্কারমূলক কাজে মনোনিবেশ করেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁর কর্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর মাসিক বেতন ১৫০ টাকার স্থলে ৩০০ টাকা করে দেন।

এই সময় অতিরিক্ত কাজ হিসাবে বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্বও তাঁকে বহন করতে হয়।

বিদ্যালয় পরিদর্শকের কর্তব্য পালনের জন্য বিদ্যাসাগরকে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হতো। কখনো পায়ে হেঁটে কখনো পাল্কীতে চেপে। এই সময়ে বাংলার গ্রামের মানুষের অশিক্ষা ও কুসংস্কার প্রত্যক্ষ করে তিনি খুবই মর্মপীড়া বোধ করেন।

গ্রামবাসীদের শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি দুমাসের মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কুড়িটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

সেই সময়ে নারীশিক্ষা খুবই অবহেলিত ছিল। বিদ্যাসাগর বুঝতে পারেন স্ত্রীজাতির উন্নতি এবং সমাজের উন্নতির জন্য নারীজাতির যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় মেয়েদের জন্য সর্বপ্রথম বাংলার গ্রামে গ্রামে ত্রিশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

বিদ্যাসাগরের উদ্যম ও কর্মনিষ্ঠা দেখে বাংলাব ছোটলাট ফ্রেডারিক হ্যালিডে মুগ্ধ হন এবং বিদ্যাসাগরের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৮৫৪ খ্রিঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ উঠে গিয়ে সেখানে স্থাপিত হল বোর্ড অব এগজামিনার্স। বিদ্যাসাগরকে বোর্ডের সক্রিয় সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হল। এই সময় ফ্রেডারিক হ্যালিডের ইচ্ছায় বঙ্গদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির সহকারী পরিদর্শকের পদ লাভ করেন বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের সঙ্গেই তাঁকে এই কাজ করতে হত।

বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে এবং কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় মধ্যকলকাতায় ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সদস্য। ক্রমে তিনি সম্পাদক পদে ব্রতী হন।

১৮৬৪ খ্রিঃ বিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। পরবর্তিকালে এই প্রতিষ্ঠানেরই নাম হয় বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়।

শিক্ষা সংস্কারের পাশাপাশি বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারের কাজও আরম্ভ করেছিলেন। নারীজাতির দুর্গতি মোচনকে তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রিঃ ২৬শে জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়।

এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। নিজের পুত্রের সঙ্গে বিধবার বিবাহ দিয়ে তিনি এই আইনের বাস্তবতার নজীর স্থাপন করেন।

বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রয়াসেরই ফলে সমাজে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বন্ধ হয়।

বিদ্যাসাগরকে বলা হয় বাংলা গদ্যের জনক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই অভিধায় ভূষিত করেন। তিনি সংস্কৃত হিন্দী ও ইংরাজি থেকে বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, বেতাল পঁচিশ এবং কথামালার গল্প সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া তাঁর রচিত বর্ণ পরিচয়, বোধোদয় এবং আখ্যানমঞ্জরী গ্রন্থগুলি আজও শিক্ষার গোড়াপত্তনে অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়।

বিশাল ও বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের স্বীকৃতি স্বরূপ বিদ্যাসাগর ১৮৬৪খ্রিঃ ইংলন্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। ১৮৮০ খ্রিঃ ভারত সরকার তাঁকে সি.আই.ই উপাধিতে সম্মানিত করেন।

কঠোর পরিশ্রমজনিত কারণে বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। তাই অবশিষ্ট জীবন তিনি বিহারের অর্ন্তগত কর্মাটারে কাটান। সাঁওতালদের অনাড়ম্বর সরল জীবনযাত্রা তাঁকে মুগ্ধ করে। তাদের অবহেলিত অবস্থা দেখে তিনি তাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৮৯১ খ্রিঃ ২৯ শে জুলাই এই মহামানব লোকান্তরিত হন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত



উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব হয়েছিল নতুন জীবনমন্ত্র, তেজ ও বীর্যের পূর্ণবেগ নিয়ে। তাঁর জীবন কাহিনী তাঁর বর্ণময় সাহিত্যের মতই ছিল বহুবিচিত্র ও বিস্ময়কর।

যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রিঃ ২৫ জানুয়ারী মধুসূদনের জন্ম। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

মধুসূদনের শৈশব শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল গ্রামের পাঠশালায় মাতা জাহ্নবীদেবীর তত্ত্বাবধানে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর প্রতি আকর্ষণের প্রেরণা এই সময়ে মায়ের কাছ থেকেই তিনি প্রথম লাভ করেছিলেন।

উত্তরকালে মধুসূদন-প্রতিভার বিকাশ পুষ্টি ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল এই মূলগত প্রেরণাকে ভিত্তি করেই।

কর্মসূত্রে বিশিষ্ট আইনজীবী রাজনারায়ণ সপরিবারে কলকাতার খিদিরপুরে যখন বসবাস শুরু করেন তখন মধুসূদনের বয়স সাত বছর। ১৮৩৩ খ্রিঃ তিনি হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে ভর্তি হন। ১৮৪২ খ্রিঃ পর্যন্ত এখানেই তাঁর শিক্ষালাভ ঘটে।

এই কলেজেই তিনি সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ্র প্রমুখদের। পরবর্তীকালে তাঁরা সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

মদুসূদনের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে হিন্দু কলেজের শিক্ষাপর্বের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। একদিকে তিনি যেমন লাভ করেছিলেন মানব-মন্ত্রে বিশ্বাস ও গভীর ইংরাজী সাহিত্য-প্রীতি; তেমনি তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছিল দেশীয় আচার ও ভাবনার প্রতি অশ্রদ্ধা।

ছাত্র হিসাবে বরাবরই তিনি ছিলেন কৃতি। কলেজের পরীক্ষায় বৃত্তি পেতেন। নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। ইংরাজিতে লেখা কবিতা বিভিন্ন সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হত। এই সূত্রেই কবির মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়—বড় কবি হতে হলে বিলেত যাওয়া দরকার।

মধুসূদন যখন সিনিয়র বিভাগের ছাত্র সেই সময় ১৮৪৩ খ্রিঃ ৯ ফেব্রুয়ারী অকস্মাৎ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।

মিশনরো-এর চার্চে আর্চ ডিকন ডিয়ান্ট্রি তাঁকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর নতুন নাম হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বিলাত যাবার অদম্য বাসনায় পিতার নির্বাচিত পাত্রীকে বিবাহ করার অনাগ্রহ এবং রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপবতী বিদুষী কন্যার প্রতি আসক্তি—মধুসূদনের ধর্মান্তর গ্রহণের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

খ্রিষ্টান ছাত্রদের হিন্দু কলেজে পড়বার অধিকার না থাকায় মধুসূদন শিবপুরে বিশপস কলেজে ভর্তি হন ১৮৪৪ খ্রিঃ। রাজনারায়ণ তখনো ধর্মান্তরিত পুত্রের খরচ বহন করতেন।

বিশপস কলেজে বহুভাষাবিদ বিশপ পন্ডিতদের কাছ থেকে তিনি ক্লাসিক রুচি ও শিল্পচেতনা এবং বহুভাষা শিক্ষার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বহুভাষাবিদ রূপে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছিলেন।

১৮৪৮ খ্রিঃ মধুসূদন অজ্ঞাত কারণে অকস্মাৎ কলেজ ত্যাগ করে মাদ্রাজ চলে যান। সেখানে দেশীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের চেষ্টায় মাদ্রাজ মেল অরফ্যান এসাইলাম বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিক্ষকের পদে চাকুরি গ্রহণ করেন। পরে ১৮৫২ খ্রিঃ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বিদ্যালয় বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেন।

মাদ্রাজে মধুসূদন সাত বৎসর ছিলেন। এই সময় শিক্ষক, সাংবাদিক এবং কবি হিসেবে খ্যাতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ইংরাজি পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ ও কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। Timothy Penpoem ছদ্মনামে সনেট গীতি কবিতা ও খন্ডকাব্য এই সময় তিনি লিখেছিলেন।

The visions of the past; The captive Lady নামের দুটি দীর্ঘ কবিতা এক সঙ্গে পুস্তকাকারে মাদ্রাজ থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ খ্রিঃ।

মাদ্রাজে অবস্থানকালে কবির জীবনে উল্লেখযোগ্য কতগুলি ঘটনা ঘটেছিল। ১৮৪৮ খ্রিঃ তিনি অরফ্যান এসাইলামের বালিকা বিভাগের ছাত্রী রেবেকা ম্যাস্টাভিসকে বিয়ে করেন।

কবির এই দাম্পত্য জীবন বিশেষ সুখের ছিল না বলে অনুমান করা হয়। তবে তাঁদের চারটি সন্তান হয়েছিল।

১৮৫১ খ্রিঃ মধুসূদনের মাতৃবিয়োগ ঘটে। ইতিমধ্যে হেনরিয়েটা নামের এক ইংরাজ কন্যার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। রেবেকা বিবাহবিচ্ছেদে রাজি না হওয়ায় হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর আইনানুগ বা ধর্মানুগ বিবাহ সম্ভব হল না।

তথাপি হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তাঁর উত্থান-পতনময় সুখ দুঃখের জীবনে হেনরিয়েটা ছিলেন আমৃত্যু জীবনসঙ্গিনী। হেনরিয়েটার সম্পূর্ণ নাম ছিল এমেলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া। তাঁর পিতার নাম ছিল জেমস প্রেমব্রুক ক্রপলি।

১৮৫৬ খ্রিঃ মধুসূদন হেনরিয়েটাকে নিয়ে কলকাতা চলে এলেন। এবারে দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হল। সূচিত হল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়।

ইউরোপ যাত্রার পূর্বে মাত্র ছয় বৎসরকাল সময়ের মধ্যে একে একে তিনি রচনা করলেন রত্নাবলী নাটকের ইংরাজি অনুবাদ, শর্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন, তিলোত্তমাসম্ভব, ব্রজাঙ্গনা, মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্য ও কবিতা এবং দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজি অনুবাদ।

তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে কেন্দ্র করে দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল ভাবান্দোলনের সৃষ্টি হল। নতুন প্রাণসম্পদে পূর্ণমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল বাংলা সাহিত্য। বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ের শীর্ষ আসনে সংবর্ধিত ও প্রতিষ্ঠিত হলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১৮৬২ খ্রিঃ ৯ই জুন ব্যারিস্টারি পড়বার উদ্দেশ্যে মধুসূদন ইংলন্ড যাত্রা করলেন।

পিতৃসম্পত্তি বিক্রয় ও বিলিব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসের ওপর ভরসা করে স্ত্রী ও সন্তানদের কলকাতায় রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর ইউরোপ যাত্রার কয়েক মাসের মধ্যে তারা সকলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় আর্থিক দুর্বিপাকে পড়লেন হেনরিয়েটা। অবশেষে ১৮৬৩ খ্রিঃ ২রা মে তিনি

কোন ক্রমে অর্থ সংগ্রহ করে পুত্রকন্যাদের নিয়ে ইংলন্ডে মধুসূদনের কাছে চলে গেলেন।

সপরিবারে এবারে কবি বিদেশে আর্থিক অনটনের শিকার হলেন। ঋণে জর্জর মধুসূদন এই সময় যে দুর্বিপাকে পড়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহৃদয় সহযোগিতা ও অর্থসাহায্যে তা থেকে তিনি উদ্ধারলাভ করেছিলেন।

১৮৬৫ খ্রিঃ ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কবি দেশে ফিরে এলেন ১৮৬৭ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারী মাসে। ইউরোপে ফ্রান্সের ভার্সাই বাসকালে মধুসূদন শিক্ষা করেছিলেন ফরাসি, ইতালি ও জার্মান ভাষা।

দেশে ফিরে এলে মধুসূদন কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসাবে যোগ দেন এবং অল্পকালের মধ্যেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় ভোগবাদী ভাবধারায় বর্ধিত কবির জীবনে আয় ও ব্যয়ের সমতা বিধান হত না। ফলে অমিতব্যয়ী উশৃঙ্খল জীবনে অবিলম্বেই নেমে এল দুর্বিপাক। নষ্ট হল পসার।

অর্থাগমের অনিশ্চয়তা দূর করবার জন্য তাঁকে ব্যারিস্টারি ছেড়ে গ্রহণ করতে হল মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনের প্রিভি কাউন্সিল আপীলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের চাকরি।

কিন্তু দুবছর পরেই এই কাজ ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ফিরে এলেন আইন ব্যবসায়ে। কবির স্বাস্থ্য তখন নানা রোগে জীর্ণ।

আইন ব্যবসায়ে ব্যর্থ হয়ে ১৮৭২ খ্রিঃ গোড়ার দিকে মধুসূদন গ্রহণ করলেন মানভূমে পঞ্চকোট রাজার আইন উপদেষ্টার চাকুরি। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই এই কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হন।

কবির শেষ জীবন রোগযন্ত্রণা, অর্থাভাব ও ঋণের ভারে হয়ে উঠেছিল দুর্বিসহ। এরই মধ্যে নানা সামাজিক কারণে রচনা করেছিলেন কিছু সনেট ও কবিতা; মায়াকানন নামে একটি নাটক এবং হেক্টর বধ নামে একটি গদ্য আখ্যান। বেশ কিছু রচনা তিনি আরম্ভ করেও শেষ করে উঠতে পারেননি।

ক্রমে মধুসূদন অসুস্থ ও অসক্ত হয়ে পড়লেন। অসুস্থ হলেন হেনরিয়েটাও। ১৮৭৩ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে তিনি বেনেপুকুরের বাড়ি থেকে সপরিবারে এসে উঠলেন পাবলিক লাইব্রেরির দোতলায়।

কিন্তু এখানে রোগের উপশম না হওয়ায় ফিরে এলেন বেনেপুকুরে। জুন মাসের শেষের দিকে তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় ভর্তি করা হল জেনারেল হাসপাতালে। ১৮৭৩ খ্রিঃ ২৬শে জুন কবির জীবনসঙ্গিনী হেনরিয়েটা পরলোক গমন করলেন। মাত্র কয়েকদিন পরে ২৯শে জুন রবিবার বেলা দুটোর সময় বঙ্গভারতীর দামালপুত্র কবি মধুসূদনের জীবনাবসান হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রিঃ ২৬ শে জুন, বাংলা সন ১২৪৫, ১৩ই আষাঢ় নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকুরি করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যাদবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র যথাক্রমে শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে লেখক হিসেবে সঞ্জীবচন্দ্র খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র। পরবর্তীকালে বঙ্কিম-জীবনের বহু অজ্ঞাত মূল্যবান তথ্য তাঁর কাছ থেকে জানা সম্ভব হয়েছে।

ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র পৈতৃক নিবাস কাঁঠাল পাড়াতেই থাকেন। পাঁচ বছর বয়সে এখানেই তাঁর হাতেখড়ি হয় কুলপুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের কাছে।

শিশুবয়স থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একদিনেই বাংলা বর্ণমালা আয়ত্ত করেছিলেন।

পুত্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে যাদবচন্দ্র তার শিক্ষার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ও যত্নবান ছিলেন।

১৮৪৪ খ্রিঃ ছয় বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে এসে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন।

নম্র ব্যবহার ও নিরীহ প্রকৃতির জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এখানে সকলের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন। ক্লাসের পাঠেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি সকলকে চমৎকৃত করেন।

১৮৪৯ খ্রিঃ বঙ্কিম আবার কাঁঠাল পাড়ায় ফিরে আসেন। এই সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই নারায়ণপুর গ্রাম নিবাসী পাঁচ বছরের এক বালিকার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের সময়ে বঙ্কিমের বয়স হয়েছিল এগারো।

১৮৫৩ খ্রিঃ বঙ্কিমের জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বছরেই সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার কবিতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কুড়িটাকা পারিতোষিক লাভ করেন।

তাঁর কবিতার নাম ছিল- "কামিনীর উক্তি। তোমাতে লৌ ষডঋতু"। কবিতাটি যথারীতি সংবাদ প্রভাকরে মুদ্রিত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে হুগলী কলেজে পড়ার কালেই বঙ্কিমচন্দ্র কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শে সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদ সাধুরঞ্জনে গদ্য ও পদ্য রচনা আরম্ভ করেন। পরে তাঁর বহু গদ্য ও পদ্য রচনা এই দুই কাগজে প্রকাশিত হয়।

হুগলী কলেজে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় (১৮৫৬ খ্রিঃ) সকল বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে বঙ্কিমচন্দ্র দুই বছরের জন্য কুড়িটাকা বৃত্তি লাভ করেন। এই বৎসরই তিনি হুগলী কলেজ পরিত্যাগ করে আইন পড়বার জন্য কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। একই বছরে তাঁর ললিতা, পুরাকালিক গল্প, তথা মানস নামক কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়।

তাঁর গদ্য, পদ্য রচনা প্রকাশে কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ সহায়তার কথা পরবর্তীকালে মুক্তকণ্ঠে তিনি প্রকাশ করেন।

১৮৫৭ খ্রিঃ জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রবর্তন করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

পরের বছর ১৮৫৮ খ্রিঃ প্রথমবারেব মত বি. এ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মোট দশজন ছাত্র প্রথমবারে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। উত্তীর্ণ হয়েছিলেন কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র আইন পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। কিন্তু পরীক্ষার আগেই তিনি সেই বছরেই যশোর জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটিকালেক্টর হিসেবে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন।

বারো বছর পরে চাকুরিরত অবস্থায় ১৮৬৯ খ্রিঃ তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইন পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘ তেইশবছর সরকারী পদে চাকুরী করার পর ১৮৯১ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

যশোরে থাকাকালে ১৮৫৯ খ্রিঃ বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নী বিয়োগ হয়। ১৮৬০ খ্রিঃ তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। সহধর্মিনী রাজলক্ষ্মী দেবী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে বলেছেন, 'আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশি রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না।'

বঙ্কিমচন্দ্র হাকিমরূপে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করায় মানুষের দুঃখ বেদনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম ও স্বদেশ হিতৈষণা ছিল প্রগাঢ়।

শাসকের জাতি ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়রাও সমান মর্যাদা লাভ করবে—তিনি এই নীতি মেনে চলতেন বলে কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতানুরূপ উন্নতি লাভ করতে পারেননি।

চাকরি জীবনেই নীলদর্পণ খ্যাত দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। প্রবল দেশপ্রেম পরস্পরকে প্রভাবিত ও তাঁদের চিন্তার পরিপুষ্টি সাধন করে।

কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত ইন্ডিয়ান ফিল্ড নামের ইংরাজি পত্রিকায় বঙ্কিমের Rajmohan's wife ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর প্রথম উপন্যাস।

১৮৬৫ খ্রিঃ দুর্গেশনন্দিনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এরপর কপালকুন্ডলা ও মৃণালিনী প্রকাশিত হয়। এই তিনটি উপন্যাসই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা দান করে।

স্বদেশ সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি বঙ্কিমের ছিল গভীর টান। ফলে পরদেশী শাসনে দেশের মানুষের নিপীড়িত অবস্থা তাঁকে অহরহ পীড়া দিত। এ বিষয়ে শিক্ষিত সমাজ না জাগলে সাধারণের চেতনা ঘটানো সম্ভব নয়। এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। স্বদেশবাসীকে আত্ম-সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খ্রিঃ বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। অচিরেই এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠী।

বঙ্কিমের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হত।

বাংলার সমাজ ও সাহিত্য জীবনে এই পত্রিকা বিপুলভাবে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিল।

বঙ্কিমের স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ উপন্যাস রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

১৮৭৩ খ্রিঃ পাবনা সিরাজগঞ্জে যে প্রজাবিদ্রোহের সূচনা হয় তার সূত্রপাত ঘটেছিল বঙ্কিমের একটি লেখা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই। তিনি পূর্ববঙ্গের কৃষক নামের একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে ভূমি সমস্যা ও কৃষক সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন।

ভারতের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত বন্দেমাতরম বঙ্কিম রচনা করেছিলেন ১৮৭৫ খ্রিঃ।

১৮৯১ খ্রিঃ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতাতেই বাস করতে থাকেন। ১৮৯৪ খ্রিঃ পরলোক গমন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মোট চোদ্দটি উপন্যাস রচনা করেন। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল কৃষ্ণচরিত, লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য, ললিতা, দীনবন্ধুমিত্রের জীবনী, ধর্মতত্ত্ব, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী এবং বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ খ্রিঃ ৭ই এপ্রিল, বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদাদেবী।

সেকালের জমিদার পরিবার হলেও ঠাকুরবাড়ি ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গীত, অভিনয়, ছবিআঁকা, শরীর চর্চা, এসবের মধ্য দিয়েই এই পরিবারের শিশুদের জীবন শুরু হতো।

তবে এই বিশাল পরিবারে পুরুষ মহিলা এবং ছোটদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল ভিন্ন ভিন্ন জগৎ। বিশেষ করে ছোটদের চলতে হত কঠোর অনুশাসনের মধ্যে। তাদের দেখাশোনার ভার থাকত পারিবারিক ভৃত্যকুলের হাতে। অবশ্য অভিভাবকদের নজরদারি থাকত সর্বত্র।

রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলাটা কেটেছে ভৃত্যকুলের হাতে। তাদের প্রহরাতেই তাঁর মনোবিকাশের শুরু। শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এদের মধ্যে থেকেই।

পরবর্তী জীবনে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা পটু ওই ভৃত্যদের নিয়ে নানা প্রবন্ধ লিখেছেন যা বাংলা রস-সাহিত্যের সম্পদ হয়ে আছে।

ভৃত্যরাজ্যে তাদের গল্পচ্ছলে ভয় দেখানো, রামায়ণ মহাভারতের পাঁচালী মুখস্থ করানো এবং অবিরাম রক্তচক্ষু দেখিয়ে দাদাগিরি সব কিছু নিয়ে তাদের বিচিত্র জীবনকে তিনি দেখেছেন কৃতজ্ঞতার আন্তরিক মনোভাব নিয়ে।

ভৃত্যদের কড়া শাসনে শিশু রবীন্দ্রনাথের ভিন্নমুখী হবার উপায় ছিল না। বরং এই শাসনের জগতে শিখেছিলেন বাধ্য হয়ে চলতে, কষ্টসহিষ্ণু হতে, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে।

বাল্যস্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "আমাদের এক চাকর ছিল, তার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গন্ডি কাটিয়া দিত।

গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গন্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধি ভৌতিক কি আধি দৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না। কিন্তু মনে বড় আশঙ্কা হইত।

গন্ডি পার হইয়া সীতার কি সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণেই পড়িয়া ছিলাম; এই জন্য গন্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্য শ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস রামায়ণই প্রধান।''

ভবিষ্যৎকালে বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে মূল্যবান আসনটি যিনি লাভ করবেন এইভাবেই লালিত হয়েছিল তাঁর প্রতিভা।

বালক রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রথমে পাঠানো হয়েছিল ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে। পরে নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করলেও স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি।

স্কুলের বাঁধাধরা বন্ধন, শিক্ষকদের ব্যবহার এবং পরিবেশ কোন কিছুকেই তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। এই জগৎ সম্বন্ধে পরিণত বয়সেও তাঁর মনে ক্ষোভ ও অভিযোগ ছিল।

প্রথাগত বিদ্যাশিক্ষা না হলেও গৃহশিক্ষকের কাছে তিনি ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, সংস্কৃত এবং ইংরাজিভাষা শেখেন।

বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, অভিনয় ও অঙ্কন বিষয়েও তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর দুচোখে ছিল অপার আগ্রহ।

পৃথিবীর সবকিছু জানার জন্য বোঝার জন্য তাঁর আকুলতা ও চেষ্টার বিরাম ছিল না। প্রকৃতির পাঠশালায় তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ ছাত্র।

এভাবেই তিনি দিনে দিনে পরিচিত হয়েছেন জগৎ ও জীবনের সঙ্গে। তাঁর এই জানাই পরবর্তীকালে গান. কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, নাটকে, উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

নিতান্ত বাল্যবয়সেই দুটি ঈশ্বর স্তব লিখে পিতা দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উৎসাহিত হয়ে অবিরাম চলতে থাকে তাঁর কাব্যচর্চা। কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম জীবনে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তাঁর পত্নী কাদম্বরী দেবীর প্রভাবও ছিল যথেষ্ট।

'হিন্দু মেলার উপহার' কবিতা রবীন্দ্রনাথের নামে প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ১২৮১ সালের মাঘ মাসে। এর কয়েক বছর পরে সতের বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথকে বিলেতে পাঠানো হয় ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য। দেড় বছর পরে পিতার আদেশে দেশে ফিরে আসেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হত ভারতী ও বালক পত্রিকা। এই দুই পত্রিকায়ই তিনি নিয়মিত লিখতেন। ভারতীর প্রথম সংখ্যায় তাঁর প্রথম ছোটগল্প ভিখারিণী এবং প্রথম উপন্যাস করুণা প্রকাশিত হয়। ভুবনমোহিনী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য প্রবন্ধ, প্রকাশিত হয়েছিল জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায়।

মাত্র আঠারো বছর বয়সের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন কবিকাহিনী, ভানুসিংহের পদাবলী, শৈশব সঙ্গীত ও রুদ্রচন্ড প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের অভিনয় জীবনে হাতেখড়ি হয় বিলেত থেকে ফিরে আসার পর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত মানময়ী নাটকে মদনের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। এক বছর পরেই স্বরচিত বাল্মীকি প্রতিভা নাটকে বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন।

১৮৮২ খ্রিঃ রবীন্দ্রনাথ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি রচনা করেন। সেই বছরেই সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের গলার মালা পরিয়ে দিয়ে কবিকে আশীর্বাদ করেন।

বাইশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে। বিয়ের পর কবি-পত্নীর নাম পরিবর্তিত হয় মৃণালিনী নামে। পরের বছরই পিতার নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি দেখাশোনার কাজ আরম্ভ করলেন।

এই সময় বৈষয়িক কাজে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করে শিলাইদহ ও সাহাজাদাপুর পরিদর্শন করতে হয়। সুন্দর প্রকৃতির মুক্ত উদার সান্নিধ্য কবির অনেক রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথ নির্জনে ঈশ্বর উপাসনার উদ্দেশ্যে বীরভূমের বোলপুরে কুড়িবিঘা জমি কিনেছিলেন। সময় এবং সুযোগমত এখানে এসে তিনি বসবাস করতেন। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০১ খ্রিঃ বর্তমানে যার পরিচয় শান্তিনিকেতন নামে। পরে এই প্রতিষ্ঠানই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৯০৫ খ্রিঃ ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার প্রতিবাদে এদেশে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। দেশবাসীকে স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর গান ও কবিতা।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রতিবাদ আন্দোলন উপলক্ষেই তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গান 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।'

১৯০৫ খ্রিঃ ১৬ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন এবং রাখী উৎসবের প্রচলন করেন।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থেকেও লেখায় ও বক্তৃতার মাধ্যমে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের কাজের প্রতিবাদ করে গেছেন। ১৯১৯ খ্রিঃ পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নির্মম হত্যাকান্ড ব্রিটিশরা ঘটিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদে সরকার প্রদত্ত নাইট উপাধি ত্যাগ করেন।

১৯১২ খ্রিঃ রবীন্দ্রনাথ বিলাত যান। সেখানে ইংরাজ শিল্পী রোদেনস্টাইন তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হন। তাঁর মাধ্যমে কবি মে সিনক্লেয়ার, এজরা পাউন্ড, ইয়েটস প্রভৃতি লেখকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ইতিমধ্যে গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ Offerings লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

লন্ডন থেকে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় গিয়ে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দেন এবং সেখানকার খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হন।

১৯১৩ খ্রিঃ রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসেন। সেই বছরই গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য সুইডেনের সাহিত্য পরিষদ রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। এর আগে অপর কোন ভারতবাসী সাহিত্যকৃতির জন্য এই পুরস্কার লাভ করেনি। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবির মর্যাদায় ভূষিত হন। বাংলার তথা ভারতের হয়েও রবীন্দ্রনাথ হলেন বিশ্বমানবের একান্ত আপনার জন।

১৯১৪ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে ডক্টরেট এবং পরের বছর সরকাব স্যার উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই বছরই দেশভ্রমণে বেরিয়ে জাপান, চীন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যান। পরিচিত হন শিল্পরসিক বেনেদেত্তো ক্রোচ, মনীষী রমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি ব্যক্তিদের সঙ্গে।

১৯২৭ খ্রিঃ রবীন্দ্রনাথ দূরপ্রাচ্য এবং ১৯২৯ খ্রিঃ কানাডায় যান। ১৯৩০ খ্রিঃ শেষবারের মত বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে ঘুরে আসেন ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, রাশিয়া এবং পারস্য।

এই বছরেই তিনি আমন্ত্রিত হয়ে অক্সফোর্ডে হিউপার্ট বক্তৃতায় মানুষের ধর্ম বা Religion of Man বক্তৃতা দেন।

প্যারিস ও বার্লিনে প্রদর্শিত হয় তাঁর শেষ বয়সের প্রিয়া নামক ছবির প্রদর্শনী। পরিচিত হন বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে। কবি সিংহলে শেষবার গেলেন ১৯৩৪ খ্রিঃ।

শান্তিনিকেতনে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার জন্য অর্থসমস্যা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করত। দেশবিদেশ থেকে সংগৃহীত অর্থ তিনি এখানকার উন্নতির জন্যই ব্যয় করতেন। এই প্রতিষ্ঠানের অর্থসংগ্রহের জন্য বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সারা দেশে নৃত্যনাট্য দেখিয়ে অর্থসংগ্রহ করেছেন। এই সময় তাঁর স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে গান্ধীজি ১৯৬৬ খ্রিঃ তাঁকে ৬০ হাজার টাকা সাহায্য করেন।

সত্তর বছর বয়সে কবিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সভায় কবি বলেন, 'একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছু নয়। আমি কবিমাত্র।' এই উপলক্ষে কবিকে The Golden Book of Tagore নামে এক দুর্লভ রচনা সম্বলিত গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়।

১৯৩৭ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে আহূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পুনরায় ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪০ খ্রিঃ শান্তিনিকেতনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবিকে ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেন। পৃথিবীর মানুষের কাছে এই তাঁর শেষ সম্মানলাভ।

১৯৪১ খ্রিঃ তাঁর শেষ জন্মদিনে পাঠ করলেন সভ্যতার সংকট প্রবন্ধ। অবশেষে ১৯৪১ খ্রিঃ ৭ই আগস্ট 'মাঘের সূর্য গেল উত্তরায়ণে।'

অজস্র উপন্যাস, কবিতা, গান, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, গীতিনাট্য, রম্যরচনা, চিঠি এবং ছবির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার একটি মাত্র পালা ছিল তা হল সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধনের পালা। তিনিই একমাত্র কবি যাঁর দুটি গান ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে অমর কথাশিল্পী নামে খ্যাত এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাসের জনপ্রিয়তা তুলনাহীন। বিগত পঞ্চাশ বছর যাবৎ তাঁর রচিত গল্প উপন্যাসের জনপ্রিয়তা ও সমাদর অম্লান রয়েছে।

তৎকালীন সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি অনাচার স্খলন কুসংস্কার, ভণ্ডামী সুদক্ষ চিত্রকরের মত তিনি তাঁর সাহিত্যে চিত্রিত করেছেন। নিপুণভাবে নিজেকে আড়ালে রেখে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ইঙ্গিত আভাসিত করেছেন।

সরল সহজ ভাষায়, অননুকরণীয় ভঙ্গিতে সমাজের বিভিন্ন চরিত্রের দুঃখবেদনা, অভাব, অভিযোগ, মনন ও চিন্তার জটিল আবর্ত তিনি অতি সার্থকভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন।

বিশেষ করে নারীজাতির স্নেহ, মমতা, সরলতা ও বাৎসল্য, তাদের অন্তর্গূঢ়, আবেগ, আর্তি, ব্যথা, বেদনা, কুটিলতা, তাদের প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের অবিচার, নির্যাতন, এক কথায় তৎকালীন সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত নারীসমাজের সমাগ্রিক রূপ তিনি গভীর মমত্ববোধ ও সহানুভূতির সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। সমাজের ক্রুটি ও দুর্বতার প্রতি তাঁর বক্তব্য ও ইঙ্গিত আজও প্রাসঙ্গিক।

শরৎচন্দ্রের জন্ম হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সাহিত্যানুরাগী, পাণ্ডিত্যের জন্যও তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু অস্থির স্বভাবের জন্য তাঁর সব গুণই অপচয়িত হয়।

উদাসী প্রকৃতির এই মানুষটি সংসারের প্রতিও ছিলেন উদাসীন, ফলে দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী। প্রধানতঃ এই কারণেই শরৎচন্দ্রকে কিশোর বয়সে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে গিয়ে থাকতে হয়েছিল।

নিজের ও পরিবারের কথা বলতে গিয়ে পরে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল— আমি অল্পবয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্নই দেখে গেলাম।

আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা— এক কথায়, সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনটাই শেষ করতে পারেননি।'

তাঁর লেখা থেকেই জানা যায় অল্প বয়সেই তিনি দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলেন। তাদের দুঃখ বেদনার সংবাদ জানতে পেরেছিলেন যা পরবর্তী জীবনে তাঁর সাহিত্যরচনার পাথেয় হয়েছিল।

কৈশোর ও যৌবন কেটেছিল তাঁর ভাগলপুরেই। তাঁর এখানকার জীবনের পরিচয় জানা যায় তাঁর বিখ্যাত শ্রীকান্ত উপন্যাস থেকে।

দুঃখ কষ্টের মধ্যে থেকেও ১৮৯৪ খ্রিঃ শরৎচন্দ্র প্রবেশিকা পাশ করেন। কলেজে ভর্তি হয়েও টাকার অভাবে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। লেখাপড়ার প্রতি গভীর আগ্রহ বশেই একসময়ে সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। সতের বছর বয়সেই গল্প লেখা আরম্ভ করেন।

ভাগলপুরে বন্ধুদের সঙ্গে নাটকে অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জনের চেষ্টায় কিছুদিন চাকরি করেন। পরে ১৯০৩ খ্রিঃ ভাগ্যান্বেষণে ব্রহ্মদেশে পাড়ি দেন।

রেঙ্গুনে তিনি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসে চাকরি নিয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

প্রবাসের জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। এখানেই বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু দুরারোগ্য প্লেগরোগে অকালেই স্ত্রীবিয়োগ হয়।

ব্রহ্মদেশে থাকবার সময়েই তিনি বন্ধুদের আগ্রহে সাহিত্যরচনায় ব্রতী হন। কলকাতার যমুনা পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় রামের সুমতি। ১৩১৯-২০ বঙ্গাব্দে এই পত্রিকায় তাঁর আরো দুটি উপন্যাস পথ-নির্দেশ ও বিন্দুর ছেলে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই লেখাগুলো পাঠক সমাজে সাড়া জাগিয়েছিল।

পরের দুই বছরে বিখ্যাত ভারতবর্ষ পত্রিকায় বিরাজ বৌ, পন্ডিতমশাই, পল্লীসমাজ পরপর প্রকাশিত হয়।

প্রথম রচনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতবর্ষে প্রকাশিত উপন্যাস তাঁকে বাংলা সাহিত্যে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করল। এরপর তিনি সাহিত্যকেই জীবিকার্জনের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেন এবং ১৯১৬ খ্রিঃ কলকাতায় ফিরে এসে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

শরৎচন্দ্র কিছুকাল কলকাতার অদূরে বাজে শিবপুর অঞ্চলে বসবাস করেন। ১৯১৯ খ্রিঃ থেকে হাওড়া জেলার পানিত্রাস গ্রামে বাড়ি করে বসবাস করতে থাকেন। শেষ জীবনে কলকাতায়ও একটি বাড়ি করেছিলেন এবং সেখানেই বাস করেন।

শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গল্পের নাম মন্দির। এই গল্পের জন্য তিনি কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেন ১৩০৯ বঙ্গাব্দে।

বড়দিদি উপন্যাস তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ছদ্মনামেও তিনি কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যমুনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল অনিলা দেবী ছদ্মনামের নারীর লেখা, নারীর মূল্য, কানকাটা, গুরু-শিষ্য-সংবাদ প্রভৃতি। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। তরুণের বিদ্রোহ তাঁর উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক রচনা।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও শরৎচন্দ্র অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। প্রকাশ্য ভাবেও বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। পরে বিতশ্রদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সরে আসেন।

স্বদেশী যুগে তাঁর পথের দাবী উপন্যাসটি দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাংলার বিপ্লববাদের সমর্থক অভিযোগ তুলে ব্রিটিশ সরকার এই উপন্যাস ১৯২৫খ্রিঃ বাজেয়াপ্ত করেছিল।

শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা তাঁর জীবিতকালেই প্রবাদ রূপ লাভ করেছিল। তাঁর গ্রন্থের প্রতি দেশের সর্বস্তরের মানুষই আগ্রহ বোধ করত। সাহিত্য তাঁকে অর্থ, যশ, সম্মান দুহাত ভরে দিয়েছিল।

অনন্যসাধারণ সাহিত্যকীর্তির জন্য বহু সম্মান তিনি লাভ করেছিলেন। ১৯২৩ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী পদক দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯৩৬ খ্রিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি-লিট উপাধি পান। ১৯৩৪ খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য হন।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে গুরুর মর্যাদা দিতেন। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্রকে জয়মাল্য দিয়েছিলেন।

১৯৩৮ খ্রিঃ অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র লোকান্তরিত হন।

কাজী নজরুল ইসলাম



বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি, গীতিকার এবং সাহিত্যিক, বিদ্রোহী কবি রূপেই প্রধানতঃ তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং পরিচিতি।

বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৯০০ খ্রিঃ ২৪ শে মে, বাংলা ১৩০৬, ১১ই জ্যৈষ্ঠ নজরুলের জন্ম। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

এই দরিদ্র পরিবারে জন্মে দুঃখ দরিদ্রের সঙ্গে সমাজের অসম ব্যবস্থার বাস্তব রূপটি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ ঘটেছিল নজরুলের বাল্যকাল থেকেই। এই সময়েই একটি বিদ্রোহী ভাব তাঁর মনের গভীরে জন্মলাভ করেছিল এবং এই মনোভাব নিয়েই তিনি আজীবন সমস্ত অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, শোষণ, পীড়ন ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সৈনিকের মত সংগ্রাম করে গেছেন।

শৈশবে গ্রামের মক্তবে সামান্য লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন নজরুল। বাংলা ভাষার সঙ্গে আরবী ও ফারসী এই সময়ই তিনি শিক্ষা করেন।

বাল্যকালেই চুরুলিয়ার পল্লীকবিদের প্রতি নজরুল অনুরক্ত হন। তিনি নিজেও মুখে মুখে কবিতা রচনা করে পল্লীবাসীদের প্রশংসা অর্জন করেন।

১৩-১৪ বছর বয়সে নজরুল উর্দু গজল গেয়ে কবিগানের আসর জমিয়ে শ্রোতাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। বাল্য বয়সেই লেটো দলের জন্য চাষার সং, শকুনি বধ পালাগান রচনা করেন।

বাল্যকালে নজরুল অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। বাঁধাধরা নিয়মে থাকা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। স্কুলের জীবন থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন রানী-গঞ্জে। এক রুটির দোকানে পাঁচটাকা বেতনে কিছুদিন কাজ করেন।

সেখান থেকে জনৈক সহৃদয় দারোগার বদান্যতায় পুনরায় তাঁর স্কুল জীবন শুরু হয়। তিনি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। দেশপ্রেমের আহ্বানে নজরুল ১৯১৪ খ্রি ৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনে সৈনিক হিসেবে যোগ দেন।

বাহিনীর সঙ্গে তাঁকে চলে যেতে হয় করাচীতে। শুরু হল নজরুলের সৈনিক জীবন, সেই সঙ্গে তাঁর কবি জীবনও।

করাচীর সেনানিবাসেই দীওয়ান-ই-হাফেজ-এর কিছু রুবাই বাংলায় অনুবাদ করেন। রিক্তের বেদন বই-এর গল্পগুলিও আরব সাগরের বিজন বেলায় বসে লেখা। গান-গল্পকবিতা সে সময়ে অজস্র ধারায় নজরুলের লেখনী থেকে বেরিয়ে আসে। তিনি সেসব লেখা পাঠিয়ে দিতেন বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র- পত্রিকায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে লেখা রচনাগুলির শেষে লেখা থাকত হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। ফলে হাবিলদাব কবি নামেই তিনি প্রথম জীবনে পরিচিত হয়েছিলেন।

তদানীন্তন সওগাত পত্রিকায় নজরুলের লেখা বাউন্ডুলের আত্মকাহিনীতে তাঁর জীবনের ছাপ অনেকটাই পাওয়া যায়।

প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত নজরুলের কবিতার নাম মুক্তি, ১৩২৬ বাংলা সনে, ইং ১৯১৯ ছাপা হয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যায়। সেই বছরই তখনকার অভিজাত পত্রিকা প্রবাসীর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় হাফেজ-এর একটি রুবাইযাৎ-এর অনুবাদ।

একই বছরে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয় ব্যথার দান ও হেনা গল্প। এই প্রেমের গল্প দুটিতে নজরুলের দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯১৯ খ্রিঃ মার্চ-এপ্রিলে ৪৯নং বাঙালী পল্টন ভেঙ্গে দেওয়া হলে নজরুল কলিকাতায় আসেন। নতুন বেগ সঞ্চারিত হয় নজরুলের কাব্যচর্চায়।

বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের কবিখ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহী কবি রূপে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেন দেশবাসীর কাছে।

মে ভুখা হুঁ শীর্ষক প্রবন্ধ ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশের পর ১৯২৩ খ্রিঃ ১৬ই জানুয়ারী রাজদ্রোহের অভিযোগে নজরুলের একবছর সশ্রম কারাদন্ড হয়।

১৯২৩ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে নজরুলের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কারাবাসকালে জেল কর্তৃপক্ষের নির্মম আচরণের প্রতিবাদে বিদ্রোহী নজরুল হুগলী জেলে অনশন শুরু করেন। এই সময়ে বিখ্যাত গান 'এই শিকলপরা ছল' সহ

ভাঙ্গার গান, সেবক, মরণবরণ গানগুলি রচনা করে গলাছেড়ে গেয়ে বন্দিদের প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে দিতেন।

নজরুলের অনশনের সংবাদে দেশের সর্বত্র ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে জনরোষ ছড়িয়ে পড়ে। শিলং থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তার করলেন, "Give up hunger strike, our literature claims you."। জেলের কর্তৃপক্ষ সেই তারবার্তা নজরুলের হাতে দেন নি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, আবদুল্লা সুরাবর্দী প্রমুখ দেশমান্য ব্যক্তিদের অনুরোধ বিফলে গেল। উনচল্লিশ দিন অনশনের পর জনমতের চাপে ও রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে ইংরাজ সরকার বন্দিদের দাবী মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। নজরুল চল্লিশ দিনের অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯২৪ খ্রিঃ ২৪শে এপ্রিল, বৈশাখ, ১৩৩১ সন, নজরুল প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সেই বছরেই প্রকাশিত হয় বিষের বাঁশী। ১৯২৫ খ্রিঃ ফরিদপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় ঘটে। কবির কণ্ঠে 'চরকার গান' শুনে গান্ধীজি মুগ্ধ হন।

নিরন্তর দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেও নজরুলের সাহিত্য সাধনা ছিল অবিরাম। একের পর এক কবিতা, গান, প্রবন্ধ রচনা করে তিনি বাংলার সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১৯২৬ খ্রিঃ কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সেই সময় কবি কৃষ্ণনগরে। লিখলেন কান্ডারী হুঁশিয়ার। কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে এই গানটি গাওয়া হয়। দেশবন্ধুর স্বরাজ পার্টির সম্মেলনে ওই সময়েই লিখে কবি গাইলেন 'ওঠরে চাষী জগৎবাসী ধর কসে লাঙল'।

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে বিদ্রোহী কবি নজরুলের আবির্ভাব। কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, নিজের উদার জীবনচর্যায়, নির্ভীকতা ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামের উজ্জ্বল প্রতীকরূপে জাতির জীবনে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১৯৪৫ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে জগত্তারিণী পদক পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৬০ খ্রিঃ ভারত সরকার পদ্মভূষণ উপাধি দেন।

বহুমূল্যবান রসোত্তীর্ণ কাব্যস্রষ্টা, অসংখ্য গানের রচয়িতা ও সুরকার নজরুল ইসলামের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে তাঁরই একটি ভাষণে। বাংলা ১৩৪৭, চৈত্রমাসে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজতজয়ন্তী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, "দুঃখ সয়েছি, আঘাতকে হাসিমুখে বরণ করেছি কিন্তু আত্মার অবমাননা করিনি। নিজের স্বাধীনতাকে কখনো বিসর্জন দিইনি। বলবীর চির উন্নত মম শির—একথা আমি আমার অনুভূতি থেকেই পেয়েছি।"

১৯২৮ খ্রিঃ নজরুল ব্রিটিশ গ্রামোফোন কোম্পানিতে কাজ পান। প্রথমে গানের ট্রেনার ও পরে তিনি কম্পোজারও হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। তাঁর নিজস্ব সংগীত-রীতি নজরুল-গীতি নামে পরিচিত।

সবাক চলচ্চিত্রের সূচনা পর্ব থেকেই নজরুল বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। ধ্রুব, বিদ্যাপতি, সাপুড়ে প্রভৃতি ছবির সঙ্গীত রচনার সঙ্গে কাহিনীও তিনি রচনা করেছিলেন।

১৯৩৯ খ্রিঃ নজরুল-জায়া প্রমীলা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যান। কয়েক বছর পরে ১৯৪২ খ্রিঃ কবি নিজেও পক্ষাঘাতে বোধশক্তি হারিয়ে নীরব নির্বাক হয়ে যান।

১৯৫৩ খ্রিঃ চিকিৎসার জন সস্ত্রীক নজরুলকে ইউরোপ পাঠানো হয়। ১৯৭২ খ্রিঃ বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়েও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য যে নীরব কবি আর স্বর ফিরে পাননি।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৫ খ্রিঃ শহীদ দিবসে নজরুলকে একুশে পদক দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৭৬ খ্রিঃ ২৯শে জুন চিরবিদ্রোহী নজরুল ঢাকাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেখানেই রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের অন্যতম রূপকার উপেন্দ্রকিশোরের জন্ম ১৮৬৩ খ্রিঃ ১২ই মে ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামের বিখ্যাত জমিদার বংশে। তাঁর পিতা কালীনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন নানাশাস্ত্রে পন্ডিত। এই কারণে মুন্সী শ্যামসুন্দর বলেও তিনি পরিচিত হয়েছিলেন।

কালীনাথের ছিল পাঁচপুত্র তিন কন্যা। তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জনকে পাঁচবছর বয়সে দত্তক নিয়েছিলেন হরিকিশোর রায়চৌধুরী নামে এক আত্মীয়। দত্তকপুত্র হিসেবে কামদারঞ্জনের নাম বদলে হল উপেন্দ্রকিশোর।

ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে শিক্ষারম্ভ। ১৮৮০ খ্রিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন।

কলকাতায় এসে পরিচিত হলেন ব্রাহ্মসমাজের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

স্বভাবতঃই উপেন্দ্রকিশোরও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এই সূত্রেই তাঁর যাতায়াত শুরু হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে।

নতুন কিছু জানার বিষয়ে বরাবরই প্রবল ঝোঁক উপেন্দ্রকিশোরের। কলকাতায় নতুন নতুন বই পড়ার সুযোগ পেয়ে তার মধ্যে ডুবে গেলেন।

এই সময়েই উপেন্দ্রকিশোর একটা বিষয় লক্ষ করলেন, দেশের ছোটদের জন্য ভাল লেখা আঁকা ও ছাপা বই নেই। এই অভাব দূর করবার উদ্দেশ্যে একটা মাসিক পত্রিকা প্রকাশের চিন্তা তাঁর মাথায় আসে।

প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেও পরে ১৮৮৪ খ্রিঃ মেট্রোপলিটন ইনস্‌টিটিউট থেকে বি.এ পাশ করেন। এই সময়ে ব্রাহ্মধর্মেও দীক্ষিত হন।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচলিত হিন্দুধর্মের রীতিনীতি ও মূর্তিপূজার বিরোধী হলেও উপেন্দ্রকিশোরের গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবার তাঁর দীক্ষার ব্যাপার মেনেই নিলেন।

এই বছরেই ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখী দেবীকে বিবাহ করেন।

ছাত্রাবস্থায় ১৮৮৩ খ্রিঃ সখা পত্রিকায় উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এবারে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখায় মনোনিবেশ করলেন।

ছোটদের বই সুন্দর করে ছাপিয়ে প্রকাশ করার পরিকল্পনা ছিল উপেন্দ্রকিশোরের। নিজে ছবি আঁকতে পারেন কাজেই সেসব বই হবে সচিত্র। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন ছোটদের লেখা আঁকা ও ছবি এনগ্রেভিং সম্পর্কে।

এরপর বিলেত থেকে ছাপার আধুনিক যন্ত্র আনাবার ব্যবস্থা করলেন।

১৮৯৫ খ্রিঃ শুরু হল নিজস্ব প্রেস। এইভাবেই সূত্রপাত হল এদেশে মুদ্রণশিল্পের নতুন অধ্যায়।

ইতিমধ্যে সংসারে এসেছে দুই ছেলে সুকুমার ও সুবিনয়। উপেন্দ্রকিশোর প্রেসের নাম দিলেন ইউ রায় অ্যান্ড সন্স। ছবি আঁকা ছবি তোলার স্টুডিও হল। আরও নানা উপকরণে সুসজ্জিত হল প্রেস।

লেখা ও ছবি আঁকার পাশাপাশি চলতে লাগল হাফটোন ছবি ছাপার বিষয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা। এসম্পর্কে তাঁর রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হল বিলেতের ম্যাগাজিন পেনরোজ অ্যানুয়েলে। প্রশংসিত হলো সেইসব রচনা।

তেলরং বা জলরং-এর হাফটোন ছবি ছাপার বিষয়টি যখন বিদেশে গবেষণার পর্যায়ে, উপেন্দ্রকিশোর এদেশে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে তাঁর প্রেসে ছাপার কাজ শুরু করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইউ রায় অ্যান্ড সন্স কোম্পানি থেকেই ভারতবর্ষে প্রসেস-শিল্পবিকাশের সূত্রপাত হল।

১৯১৫ খ্রিঃ ২০শে ডিসেম্বর উপেন্দ্রকিশোর কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ



প্রখ্যাত নাট্যকার, কবি, অভিনেতা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল কলকাতার বাগবাজারে ১৮৪৪ খ্রিঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী। পিতার নাম নীলকমল ঘোষ।

বাল্যবয়সেই পিতা মাতাকে হারিয়ে গিরিশচন্দ্র একপ্রকার অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। ফলে পড়াশোনার বেশিরভাগ সময়টাই কাটতো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় ও হুল্লোড়বাজিতে। তবে স্বভাবজাত প্রতিভা বলে মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলে নাটকে ভাল অভিনয়ও করতেন।

পড়াশোনা শুরু হয়েছিল পাইকপাড়া স্কুলে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির জন্য বেশিদূর এগোতে পারেন নি। ১৮৬২ খ্রিঃ এন্ট্রাস পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হন।

কুড়ি বছর বয়সে অ্যাটকিনসন টিলকন কোম্পানিতে বুক-কিপার-এর কাজ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এই সময় বন্ধু ব্রজবিহারী সোমের উৎসাহে দেশী ও বিদেশী সাহিত্য পাঠে আগ্রহ জন্মে এবং প্রচুর পড়াশোনা করেন।

কৈশোরে কিছুকাল হাফ-আখড়াই গানের দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে সঙ্গীত ও অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই সময় বাগবাজারে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটি থিয়েটারের দল গঠন করেন।

১৮৬৭ খ্রিঃ এই দলের প্রয়োজনায় মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক মঞ্চস্থ হয়। গিরিশচন্দ্র এই নাটকের জন্য সঙ্গীত রচনা করেন। এই ভাবেই ভাবীকালের শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকারের নাট্যজগতে আবির্ভাব ঘটে।

১৮৬৮ খ্রিঃ বাগবাজার দল দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী অভিনয় করে। সপ্তমী পূজার রাত্রে বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে স্টেজ বেঁধে অভিনয় হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র এই নাটকের নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা লাভ করেছিলেন।

এই নাট্যসংস্থার নাম পরে ন্যাশানাল থিয়েটার হয়। ১৮৭২ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে সেই সর্বপ্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনিই সর্বপ্রথম নাট্যাভিনয়কে সুচারু শিল্পরূপে এদেশে প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের অভিনয় প্রতিভা বলে অভিনয় ক্ষেত্রে একটি বিশেষ রীতির প্রবর্তন করেন। গিরিশচন্দ্র ছিলেন নট ও নাট্যকার রূপে এক দুর্লভ প্রতিভার সমন্বয়।

অভিনয় রজনীতে টিকিট বিক্রির প্রশ্নে গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করেন। কিছুকাল পরে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হলে গিরিশচন্দ্র তাতে যোগ দেন ও অবৈতনিকভাবে অভিনয় করেন।

পরবর্তীকালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানেই একশ টাকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই সময় থেকেই তিনি নিয়মিত নাট্যরচনা আরম্ভ করেন। তাঁর রচির প্রথম মৌলিক নাটক আগমনী গ্রেট ন্যাশানালের মঞ্চেই ১৮৭৭ খ্রিঃ অভিনীত হয়।

জীবনের পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে গিরিশচন্দ্র স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর প্রভৃতি রঙ্গশালায় পরিচালনার কাজ করেন। পরে ১৯০৮ খ্রিঃ মিনার্ভা থিয়েটারে অধ্যক্ষ পদে আসীন হন এবং আমৃত্যু এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র রচিত চৈতন্যলীলা নাটকের অভিনয় দেখতে ১৮৮৪ খ্রিঃ ২০ শে সেপ্টেম্বর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে আসেন এবং চৈতন্য চরিত্রের অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীকে আশীর্বাদ করে যান।

এই সময় থেকেই স্বেচ্ছাচারী গিরিশচন্দ্রের জীবনে পরিবর্তনের সূচনা হয়। ক্রমে তিনি রামকৃষ্ণদেবের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দকে বন্ধুরূপে পান। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সংস্পর্শে এসে গিরিশচন্দ্র তাঁর বেপরোয়া জীবনকে সংহত করেন; ঠাকুরের প্রতি অচলা ভক্তি তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

তাঁর জীবনে ঠাকুরের প্রভাব এক বিচিত্র অধ্যায়। তারই প্রকাশ ঘটে তাঁর পৌরাণিক ও ভক্তি রসের নাটক নাটিকায়। চৈতন্যলীলা ও বিল্বমঙ্গল গিরিশচন্দ্রের আদর্শ ভক্তিরসের নাটক রূপে চিহ্নিত। ভারতীয় পুরাণের প্রধান নৈতিক আদর্শ ভক্তি নিষ্ঠা প্রভৃতি তত্ত্বগুলিকে তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গিরিশচন্দ্র বিংশ শতকের প্রথমদিকের পৌরাণিক নাট্যকার হলেও সম-সাময়িক রাজনৈতিক ও স্বাদেশিক অনুরাগে কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটকও রচনা করেন। সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, অশোক, সৎনাম প্রভৃতি তাঁর ইতিহাসাশ্রিত নাটক।

গিরিশচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। প্রহসন, রূপক, গীতিনাট্য প্রভৃতির সংখ্যাও প্রায় একই রকম। অভিনয়, নাট্যালয় পরিচালনা, অভিনয় শিক্ষা প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও যে শতাধিক নাটক তিনি রচনা করেছেন এতেই তাঁর অসামান্য প্রতিভা প্রমাণ করে।

গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকগুলিতে অমিত্রাক্ষর ধরনের এক অভিনব ছন্দ ব্যবহার করেন। এই ছন্দ তাঁরই নামে গৈরিশছন্দ নামে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনে এবং নটনটীদের যোগ্যতানুযায়ী তাঁর অধিকাংশ নাটক রচনা করেছেন।

শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের সার্থক বাংলা অনুবাদ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস এবং মধুসূদনের মেঘনাদ বধ ও নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের নাট্যরূপ দান করেছিলেন।

মেঘনাদ বধ কাব্যে রাম ও মেঘনাদ উভয় ভূমিকাতেই অভিনয় করে গিরিশচন্দ্র বাংলার নাট্যামোদিদের চমৎকৃত করেছিলেন। অভিনয় শক্তিবলে সেকালে তিনি জীবন্ত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক দক্ষযজ্ঞ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, জনা, পাণ্ডবগৌরব, প্রফুল্ল, হারানিধি, কালাপাহাড়, আবুহোসেন প্রভৃতি।

১৯১২ খ্রিঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী গিরিশচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয় ১৮৬৩ খ্রিঃ ১৯শে জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। তাঁর পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র ছিলেন রাজবংশের দেওয়ান। গায়ক ও গীতিকার রূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

বাল্যবয়সেই পিতার যত্নে ও সাহচর্যে সংগীতের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের আগ্রহ জন্মে। পিতার কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা এবং অল্পবয়সেই সুকণ্ঠ গায়করূপে খ্যাতি লাভ করেন।

কবিপ্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। পল্লীপ্রকৃতির সান্নিধ্য এবং সঙ্গীতজ্ঞ পিতার সাহচর্যে তাঁর প্রতিভা বিকাশ লাভ করে।

পারিবারিক পরিবেশে ছিল সাহিত্য ও সঙ্গীতের আবহাওয়া। তাঁর দুই দাদা রাজেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল সাহিত্যিকরূপে পরিচিত ছিলেন। এক বৌদি মোহিনী দেবীও সাহিত্যরচনায় খ্যাতিলাভ করেছিলেন। স্বভাবতঃই এই পরিমণ্ডলের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল।

হুগলী কলেজে বি.এ ক্লাশে পড়ার সময়েই দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ আর্য্যগাথা প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রিঃ। ১৮৮৪ খ্রিঃ তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম.এ পাশ করেন। এর পর প্রবেশ করেন কর্মক্ষেত্রে। স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি করার সময়েই সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক অগ্রজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত সাপ্তাহিক পত্রিকা পতাকা। এই কাগজে তিনি প্রবাসবাসের কাহিনী লিখতেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশীয় সঙ্গীতের ভিত যথেষ্টই দৃঢ় ছিল। ফলে বিলেত বাসকালে অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতে দক্ষতা লাভ করেন। এখানে তিনি Lyrics India নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

বিলেতে তিন বছর ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। সেকালে সামাজিক গোঁড়ামি এমন ছিল যে কেউ বিলেত গেলে তাকে ম্লেচ্ছ দেশে যাবার অপরাধে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।

দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজপতিদের এই ব্যবস্থা মানতে রাজী না হওয়ায় তাঁকে যথেষ্ট সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। তাঁর এই সময়কার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পায় তাঁর একঘরে পুস্তকে।

১৮৮৬ খ্রিঃ সরকারী চাকুরি নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার কাজের দায়িত্ব বহন করতে হয়। কখনো সেটেলমেন্ট অফিসার, কখনো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কখনো আবগরি বিভাগের প্রধান পরিদর্শক, কখনো কৃষিরাজস্ব বিভাগে সহকারী প্রধানের কাজ করতে হয়েছে।

স্বভাবতঃ স্বাধীনচেতা হওয়ায় সরকারী চাকুরিতেও তাঁকে নানান ঝামেলা সামলাতে হয়েছে।

চাকরি থেকে অবসর নেবার পর ১৯০৫ খ্রিঃ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসেবী ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি পূর্ণিমা সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে তিনি ইভিনিংক্লাব নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত হন। ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে তিনি প্রকাশ্য অভিনয়েও অংশগ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অবশ্য জীবনের শেষ দিকে সাহিত্য বিষয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর মধ্যে মতানৈক্য ঘটেছিল।

১৯০৩ খ্রিঃ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের মোট বারোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রধানতঃ কবিতাই ছিল তাঁর সাহিত্যচর্চার বাহন। রচনা করেছেন প্রহসন, কাব্যনাট্য, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক কবিতা।

এরপর তিনি আত্মনিয়োগ করেন নাটক রচনায়। বিলেত বাসকালে সেখানকার প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের অভিনয় দেখার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। রঙ্গালয়ের কলাকৌশল বিষয়েও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর এই অভিজ্ঞতা বিশেষরূপে সহায়ক হয়েছিল।

জীবনের শেষ দশ বছর প্রধানত নাটক রচনাতেই ব্যাপৃত ছিলেন। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক সবরকম নাটক রচনাতেই তাঁর দক্ষতা ছিল। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে জাতীয় চেতনা ও স্বদেশীকতার প্রেরণা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বমোট ১৬টি নাটক রচনা করেন। ভারতবর্ষ নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ সম্পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশের আগেই তিনি পরলোকগমন করেন ১৯১৩ খ্রিঃ ১৭ই এপ্রিল।

হাস্যরসের সঙ্গীত রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিজস্ব একটি রীতি সৃষ্টি করেছিলেন। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রেও তিনি যশস্বী হয়েছেন। তাঁর সঙ্গীতে দেশীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে হাসির গান, চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান মেবারপতন প্রতাপসিংহ বিখ্যাত।

নবীনচন্দ্র সেন



কবি নবীনচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৪৭ খ্রিঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গোপীমোহন সেন। চট্টগ্রাম স্কুল থেকে ১৮৬৩ খ্রিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কলকাতায় আসেন। ভর্তি হন প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৮৬৫ খ্রিঃ এফ.এ এবং ১৮৬৮ খ্রিঃ জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইনস্‌টিটিউশন থেকে বি.এ পাশ করেন।

ছাত্রাবস্থায় নবীনচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহচর্যে আসেন এবং তাঁর অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্যজীবনের শুরু। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় এডুকেশন গেজেট পত্রিকায়। এই পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন।

কলেজের পড়া শেষ করে নবীনচন্দ্র শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। কর্মজীবন শুরু হয় হেয়ার স্কুলে।

কিন্তু বেশিদিন এই কাজে থাকতে হয় নি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ১৮৬৮ খ্রিঃ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন।

এই পদে কর্মরত অবস্থায় তাঁকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে থাকতে হয়েছে। কর্মজীবনের শেষ দিকে তিনি ১৮৯৩-৯৪ খ্রিঃ রানাঘাটের মহকুমা শাসক হয়ে আসেন।

সেই সময়ে তিনি নিজের উদ্যোগে তাঁর অগ্রজ আর এক মহাকবি কৃত্তিবাসের ভিটের সন্ধান করে বঙ্গবাসীকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন।

মহাকবির জন্মভিটা ফুলিয়া নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। নবীনচন্দ্র সেই ভিটে খুঁজে বার করেন। অবশ্য তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেছিল রানাঘাট, শান্তিপুর ও

ফুলিয়ার বিদ্বৎসমাজ। পরবর্তী সময়ে এই স্থানেই মহাকবির স্মৃতিফলক স্থাপিত হয়।

স্বদেশপ্রেম ও আত্মচিন্তামূলক কবিতার সংকলন অবকাশরঞ্জিনী নবীনচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রিঃ।

নবীনচন্দ্রের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রিঃ। এই গ্রন্থ বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। পলাশীর প্রান্তরে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর পরাজয়ের মাধ্যমে ইংরাজ ভারতভূমিতে রাজ্যশাসনেব অধিকার হস্তগত করেছিল এই কাহিনী কবি এমনভাবে ব্যক্ত করেছিলেন যে তা দেশবাসীকে স্বাদেশীকতায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

নবীনচন্দ্র দেশ প্রেমিক কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেন। এর ফল হল, নবীনচন্দ্রকে তাঁর উর্ধ্বতন রাজকর্মচারির বিরাগভাজন হতে হল।

ইতিমধ্যে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রবাস প্রকাশিত হলে নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতি আরও বৃদ্ধি পায়। এই তিন কাব্যগ্রন্থে তিনি মহাভারতের ঘটনার মৌলিক ব্যাখ্যা করেন। ১৯০৯ খ্রিঃ কবি কর্মস্থল থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সর্বমোট চোদ্দটি গ্রন্থ নবীনচন্দ্র রচনা করেন। তার মধ্যে ক্লিওপেট্রা, ভানুমতী, প্রবাসের পত্র ও অমিতাভ উল্লেখযোগ্য।

আমার জীবন তাঁর আত্মজীবনী। এই গ্রন্থে তৎকালীন সময়ের অনেক অজ্ঞাত কথা জানা যায়।

১৯২৮ খ্রিঃ নবীনচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ



উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ কালীপ্রসন্ন ১৮৪০ খ্রিঃ কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নন্দলাল সিংহ।

বাল্যবয়স থেকেই কালীপ্রসন্ন অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। বালকের মাথায় বৃদ্ধের মস্তিষ্ক বললে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই। অতি অল্প বয়সেই বিভিন্ন ভাষা ও বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েও প্রথাবদ্ধ পড়া সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। তবে কলেজের অসম্পূর্ণ পড়া সম্পূর্ণ করেছিলেন একজন ইংরাজ গৃহশিক্ষকের সাহায্যে।

বিদগ্ধ বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মাত্র ১৩ বছর বয়সেই বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সভা প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ ছিল স্বদেশের সর্ববিধ উন্নতি বিধান। তাই সভ্যদের আলোচনার মুখ্য বিষয়ই ছিল ভাষা সাহিত্য ও সমাজের নানাবিধ সমস্যা।

সনাতনপন্থী সমাজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার তাঁকে পীড়িত করত। দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও প্রগতিমূলক চিন্তার প্রসার ঘটাবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেন সভার মুখপত্র বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫ খ্রিঃ)। পরের বছর গড়ে তোলেন বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার।

বস্তুতঃ এসব উদ্যোগের মাধ্যমেই বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে কালীপ্রসন্নের আর্বিভাব সূচিত হয়। শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির উদ্দেশ্যে পরে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সর্বতত্ত্ব প্রবেশিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ ও পরিদর্শক প্রভৃতি পত্রিকা। প্রাণিতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, শিল্প সাহিত্য ও সমাজ ছিল এই সকল পত্রিকার প্রধান বিষয়।

দেশে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং অসহায় চাষীদের দুরবস্থা অবলম্বনে রায়বাহাদুর দীনবন্ধুমিত্র রচনা করেছিলেন নীলদর্পণ নাটক, ১৮৬০ খ্রিঃ। এই নাটক বহুভাবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

মাইকেল মধুসূদন নাটকটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন। বই আকারে প্রকাশ করেছিলেন পাদ্রী লঙ সাহেব। এর জন্য ইংরাজ সরকারের আদালতে তাঁকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়েছিল।

জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ কালীপ্রসন্ন লঙ সাহেবের জরিমানার হাজার টাকা আদালতে জমা দিয়েছিলেন।

সমাজ হিতৈষী কালীপ্রসন্ন এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারবর্গকে; মুখার্জীস ম্যাগাজিন-এর শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী, শিক্ষক রিচার্ডসন ও লঙসাহেব প্রমুখদের বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ প্রসারের তিনি ছিলেন একজন প্রধান উৎসাহী সমর্থক। তিনি বিধবা বিবাহকে জনপ্রিয় করবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য বিদ্যাসাগর দেশব্যাপী যে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন কালীপ্রসন্ন।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন প্রধানতঃ নাটক রচনার মাধ্যমে। তাঁর রচিত বাবু নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খ্রিঃ। পরবর্তী তিন বছরে প্রকাশিত হয় বিক্রমোর্বশী, সাবিত্রী সত্যবান ও মালতীমাধব। তৎকালীন বাবুসম্প্রদায়ের রুচিবিকৃতি ও সাধারণ সমাজব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলির প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ

করেছেন বিদ্রূপাত্মক রচনা হুতোম প্যাঁচার নক্সা প্রকাশ করে (১৮৬২ খ্রিঃ)। হুতোম প্যাঁচা ছিল তাঁরই ছদ্মনাম।

নানাদিক থেকেই এই গ্রন্থ স্মরণীয়। বিশেষ করে সংস্কৃত শব্দ কন্টকিত ভাষার পরিবর্তে সাহিত্যে কথ্য ভাষার প্রচলন করার লক্ষ্যে এই গ্রন্থটিই ছিল প্রথম পদক্ষেপ এবং একারণেই বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়।

মূল সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করে নিজ খরচে তা প্রকাশ করা কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই মহৎ কাজে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন বিদ্যাসাগর স্বয়ং। তাঁরই তত্ত্বাবধানে এবং হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতের সাহায্যে কালীপ্রসন্ন এই শ্রমসাধ্য দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন।

খুবই স্বল্প পরিসর জীবনে কালীপ্রসন্ন যেসব কাজ করেছিলেন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সমসাময়িক কালে তিনি ভাষা সাহিত্য ও সমাজ জীবনে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তিনি সরকার কর্তৃক অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অব দ্য পীস নিযুক্ত হয়েছিলেন। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ১৮৭০ খ্রিঃ ২৪শে জুলাই কালীপ্রসন্ন পরলোক গমন করেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়



ঔপন্যাসিক তথা সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিমান রাখালদাস বাঙ্গালীর ইতিহাসে ঐতিহাসিক মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন।

মানুষের ঐতিহাসিক প্রগতির মূক নিদর্শন ও জড়ের মুখ দিয়ে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে ঔপন্যাসের মাধ্যমে প্রকাশ করে রাখালদাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিচিত্র দিগদর্শনকে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন।

ইতিহাস আলোচনার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি যে কয়খানি উপন্যাস রচনা করেছেন তা একাধারে উপন্যাস ও নৈর্ব্যক্তিক ঐতিহাসিক চিত্র। বস্তুতঃ তাঁর হাতেই ঐতিহাসিক উপন্যাস ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মর্যাদা লাভ করেছে।

১৮৮৫ খ্রিঃ ১২ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে রাখালদাসের জন্ম। তাঁর পিতা মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরে ওকালতি করতেন।

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি ১৯০০ খ্রিঃ এন্ট্রাস পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হবার আগেই তখনকার সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিয়ে করেন। বিয়ের পর এই কলেজ থেকে ১৯০৩ খ্রিঃ এফ.এ পাশ করেন।

এই সময়ে পিতামাতার মৃত্যু এবং নানা বৈষয়িক ঝামেলার জন্য পড়াশোনা বন্ধ থাকে। এরপর ১৯০৭ খ্রিঃ ইতিহাসে অনার্স সহ বি.এ. এবং ১৯১০ খ্রিঃ এম.এ পাশ করেন।

বি.এ পরীক্ষা পাশ করার আগেই রাখালদাস প্রাচীন লেখ ও মুদ্রা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯০৬ খ্রিঃ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যা প্রাচীন পণ্ডিত ভিনসেন্ট ও স্মিথ কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

১৯১০ খ্রিঃ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানে সহকারী থেকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট হন, পরে অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন।

কৈশোর থেকেই রাখালদাস ভারতীয় ইতিহাসের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। এফ.এ পড়বার সময়েই তিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্লক সাহেবের সাহচর্যে আসেন এবং প্রাচীন লিপি পাঠে দক্ষতা লাভ করে। এই শিক্ষা তাঁর কর্মজীবনে সবিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৯২২ খ্রিঃ গোড়ার দিকে রাখালদাস কর্মসূত্রে সিন্ধুদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদারো পরিদর্শনে যান এবং এখানে খনন কার্যের মাধ্যমে মহেঞ্জোদারোর সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার রাখালদাসের জীবনের অবিনশ্বর কীর্তি।

তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার ধারক। পুরাতন লেখাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা, সুপ্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মুদ্রার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ণয়, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প নিদর্শনের মূল্য বিচার, লেখ ও মুদ্রাদির সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন যুগের প্রামাণিক ইতিহাস রচনা প্রভৃতি ছাড়াও তাঁর কীর্তির স্বাক্ষর রয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পটভূমিকায় লিখিত মনোরম উপন্যাসে।

১৯২৬ খ্রিঃ বিভাগীয় কাজে মতভেদের কারণে চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯২৮ খ্রিঃ থেকে রাখালদাস বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপকের চাকুরি গ্রহণ করেন।

কর্মক্ষেত্রের ব্যস্ততার মধ্যেও গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনায় তাঁর বিরাম ছিল না। তাঁর প্রবন্ধাদি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিহার রিসার্চ সোসাইটি পত্রিকা, Epigraphia Indica, লন্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, Indian Antiquary, Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, ভারতবর্ষ, প্রবাসী ইত্যাদি ইংরাজি ও বাংলা

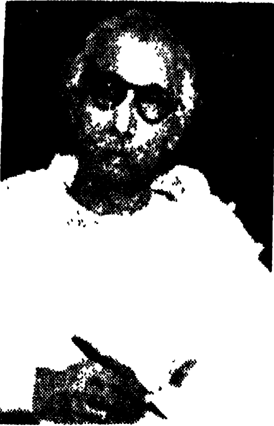
সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে যে বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন তার মূল্য অপরিসীম।

মুদ্রাতত্ত্বে সুপণ্ডিত রাখালদাস মুদ্রা বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রাচীন মুদ্রা গ্রন্থটি প্রকাশের আগে বাংলা বা ইংরাজি ভাষায় এই বিষয়ের ওপর অপর কোন গ্রন্থ ছিল না।

রাখালদাস রচিত অন্যান্য গ্রন্থ দুই খণ্ডে বাংলার ইতিহাস, পাষাণের কথা, ত্রিপুরীর হৈহয় জাতির ইতিহাস; উড়িষ্যার ইতিহাস, বাঙ্গালীর ভাস্কর্য, শশাঙ্ক, ধর্মপাল, করুণা, ব্যতিক্রম, অসীম, পক্ষান্তর, অনুক্রম, The Origin of Bangali Script. Palas of Bengal প্রভৃতি।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল রাখালদাসের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার



বাংলা শিশুসাহিত্যে রূপকথার যাদুকর আখ্যায় ভূষিত দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম ঢাকার উলাইল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পিতার নাম রমদারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

গ্রামের স্কুলে পড়া শেষ করে তিনি পিতার কর্মস্থল মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। এখানে বাসকালেই তিনি প্রদীপ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেন। পরে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে সুধা নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন।

মুর্শিদাবাদে পাঁচ বছর থাকার পর দক্ষিণারঞ্জণ ময়মনসিংহে চলে আসেন। এখানে ছিল তাঁর পিসীমার বাড়ি। তাঁর বিশাল জমিদারি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পড়ে দক্ষিণারঞ্জনের ওপরে।

জমিদারি কাজের সুযোগেই পল্লীপ্রকৃতি ও গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ ঘটে। বাংলার পল্লীগ্রামে প্রচলিত লোক-কাহিনী, ছড়া গান ইত্যাদির সহজ সরল কথা ও সুরের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে।

তিনি লক্ষ করেন মানুষের মুখে মুখে ফেরে যে সব গল্প-কথা তার আকর্ষণ এমনই যে প্রতি সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে বয়োবৃদ্ধদের ঘিরে বসে আসর, সেখানে মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলে উপভোগ করে রূপকাহিনীগুলি। এসব লোক-সাহিত্যের

কোন লিখিত রূপ নেই। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে কালের স্রোতে সেসব কাহিনীও হারিয়ে যায়।

দক্ষিণারঞ্জন বাংলার লুপ্তপ্রায় লোক-সাহিত্য সংগ্রহের কাজে উদ্বুদ্ধ হন। দীর্ঘ দশ বছর ধরে ঘুরে ঘুরে তিনি লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও গবেষণার কাজ করেন। তাঁর এই সংগ্রহ চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সেগুলো হল, রূপকথা, গীতিকাব্য, রসকথা ও ব্রতকথা। এর সবই পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলের লুপ্তপ্রায় কথা-সাহিত্য।

দীনেশচন্দ্র সেনের উপদেশে দক্ষিণারঞ্জণ এই কাহিনীগুলিকে স্থায়ী রূপদান করেন বিভিন্ন নামে। রূপকাহিনীগুলি স্থান পায় ঠাকুরমার ঝুলি গ্রন্থে। গীতিকাহিনী-গুলি নিয়ে রচিত হয় ঠাকুরদার ঝুলি, রসকথা স্থান পায় দাদামশায়ের থলে গ্রন্থে এবং প্রচলিত ব্রতকথা নিয়ে লিখিত হয় ঠানদিদির থলে। সেই প্রথম বাংলার লোক কাহিনীগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং সর্বস্তরের মানুষের কাছে বিপুলভাবে সমাদর লাভ করে।

দক্ষিণারঞ্জণ ছোটদের জন্য আরও যেসব বই লিখে বাংলার শিশুসাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চারু ও হারু, ফার্স্টবয়, লাস্টবয়, বাংলার সোনার ছেলে, সবুজ লেখা, আমার দেশ প্রভৃতি।

দক্ষিণারঞ্জন কর্মসূত্রে বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি এই সংস্থার সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন এবং মুখপত্র পথ-এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী কালে পরিষদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সমিতির সভাপতি রূপে বাংলায় বিজ্ঞানের বহু পরিভাষা রচনা করেন।

দক্ষিণারঞ্জন স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর শিশু সাহিত্যের অবদানের জন্য। বিশেষ করে ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদার থলে প্রভৃতি গ্রন্থগুলির জন্য। রূপ-কাহিনীগুলিকে তিনি এমন মনোরম সুরেলা ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে তার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। পল্লীগ্রামে প্রচলিত এমন অনেক শব্দ ও কথা তিনি হুবহু প্রয়োগ করে তাঁর লেখনীকে আরও সমৃদ্ধ ও মনোগ্রাহী করে তুলেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



রবীন্দ্র প্রতিভার আলোকে যখন বাংলা কবিতার আকাশ প্রদীপ্ত, সেই সময়ে আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে যে কজন কবি নিজেদের প্রতিভার প্রভায় সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই কারণে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার আলোচনায় অবধারিতভাবে সত্যেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়।

রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন-প্রহরে রবি-রশ্মিতে রশ্মিমান হয়ে আপন ছন্দে রবীন্দ্রবলয়ে অবস্থান করেছিলেন পাঁচজন কবি। তাঁরা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী এবং কালিদাস রায়।

রবীন্দ্র-বলয়ে অবস্থান করলেও সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত। এখানেই সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

সত্যেন্দ্রনাথ বাস্তবানুসারী চিত্রাঙ্কনে, সৌন্দর্যের বিষয়-বৈচিত্র্যে, শব্দের ঝঙ্কারে, ছন্দের লালিত্যে এবং মার্জিত রুচির ঐতিহ্যে তাঁর কাব্যের একটি স্বতন্ত্র পরিমন্ডল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করেও একারণেই সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত কবি, রবীন্দ্রোত্তর সমকালীন কবিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তম কবি।

সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৮২ খ্রিঃ ১২ই জানুয়ারি, বাংলা ১২৮৮ সন, ৩০শে মাঘ। চব্বিশ পরগনা জেলার নিমতা গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার চুপীগ্রামে।

সত্যেন্দ্রনাথের পিতার নাম রজনীমাধব দত্ত, মাতা মহামায়া দেবী। পিতামহ প্রখ্যাত লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বিদ্যাসাগরের সমকালীন।

একদিকে পিতামহ অক্ষয়কুমার অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ—সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার উভয় দিগন্তে এই দুই প্রতিভাধর মনস্বী। তবে অধিকতর কাছের মানুষ ছিলেন নিঃসন্দেহে অক্ষয়কুমারই। পরিবারের সারস্বত পরিমন্ডলে শৈশব থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন পাঠানুরাগী। পাঠ্যবহির্ভূত বই পড়াতেই ছিল তাঁর বেশি উৎসাহ।

উত্তর কলকাতার সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৯৯ খ্রিঃ সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বর্তমানে যার নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ, পূর্বে তার নাম ছিল জেনারেল এসেমব্লিজ। সত্যেন্দ্রনাথ এই কলেজ থেকে ১৯০১ খ্রিঃ এফ.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বি.এ ক্লাশে ভর্তি হন।

১৯০৩ খ্রিঃ বি.এ পরীক্ষায় বসবার আগেই সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার পর তাঁর কলেজে পড়ারও ইতি হয়।

বিদ্যায়তনিক পড়াশুনো বন্ধ হলেও অধ্যয়ন যাঁর আবাল্যের নেশা তাঁর পড়াশোনার জগৎ থাকে চিরকালই অবারিত। নানা বিষয়ের বই হয়ে উঠল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

এভাবেই দিনে দিনে সমৃদ্ধ হল সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানভান্ডার। সংগৃহীত হল তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কাব্য সাধনার বহুবর্ণ উপচার।

এই প্রসঙ্গে একস্থানে মোহিতলাল বলেছিলেন, "... তাই প্রকৃতি চিত্রশালা এবং পাণ্ডিত্যের পুঁথিশালা দুইই ছিল তাঁহার সমান আশ্রয়। এই যে জানিবার ক্ষুধা এবং জানার আনন্দ—প্রধানতঃ এই দুইয়ের তাগিদে তিনি সরস্বতীর আরাধনা করিয়াছিলেন।"

সত্যেন্দ্রনাথের পিতা রজনীনাথের ইচ্ছা ছিল তাঁর পুত্র হোমিওপ্যাথিতে বড় চিকিৎসক হবেন। কিন্তু পিতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর জীবনে পূর্ণ হয়নি। মামার উৎসাহে সত্যেন্দ্রনাথ আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা শুরু করেন।

কিন্তু সাহিত্যানুরাগ যাঁর ধমনীতে প্রবাহিত বাণিজ্যলক্ষ্মীর সাধনায় তাঁর তৃপ্তি আসবে কেন? অচিরেই স্বক্ষেত্রে ফিরে আসতে হল তাঁকে। নিজেকে পুরোপুরিভাবে সাহিত্য সাধনার কাজে নিয়োজিত করলেন।

১৯০০ খ্রিঃ যখন এফ.এ. ক্লাশের ছাত্র, সেই সময়েই সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ সবিতা প্রকাশিত হয়। সেই প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই বাঙালী কাব্যরসিকরা পেলেন নতুনেব আস্বাদ। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ জুটতেও বিলম্ব হল না। তাঁর কবিতায় ছন্দের অপূর্ব কলা-কৌশলে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ছন্দের যাদুকর আখ্যায় ভূষিত করলেন। এরপর থেকে পরপর সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে চলল।

সত্যেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল সবিতা, সন্ধিক্ষণ, হোমশিখা, তীর্থসলিল, বেণু ও বীণা, তীর্থেরেণু, ফুলের ফসল, কুহু ও কেকা, তুলির লিখন, মনিমঞ্জুষা, অভ্র-আবীর এবং হসন্তিকা।

মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল বেলা শেষের গান এবং বিদায় আরতি।

১৯০৫ খ্রিঃ লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতায় সমগ্র বাংলা দেশ জুড়ে যে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সত্যেন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যসাধনার গতি ছিল অব্যাহত। সেই

আবহাওয়া তাঁর কাব্যের বিষয়-বৈচিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত করে আর একটি ভাবসমৃদ্ধ ধারা, তা হল স্বদেশ-প্রেম।

সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেম মূলক কবিতার অধিকাংশই এই সময়ে রচিত হয়।

খুবই স্বল্প আয়ু নিয়ে এসেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর প্রতিভার পূর্ণভাবে বিকাশলাভের পূর্বেই ১৯২২ খ্রিঃ ২৫শে জুন মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ষোল। এক সময়ে উপন্যাস ও নাটক রচনাতেও তিনি হাত দিয়েছিলেন। প্রথম উপন্যাস জন্মদুঃখী প্রকাশিত হয় ১৯১২ খ্রিঃ। এইটি নরওয়ের একটি উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ।

নাটক দুটির একটি ক্ষুদ্র নাটিকা, নাম ধূপের ধোঁয়া। কয়েকটি বিদেশী নাটকের অনুবাদ নিয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় নাটকগ্রন্থ রঙ্গমল্লী। এছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের মননশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাঁর নিবন্ধগ্রন্থ চীনের ধূপ-এ।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার জনপ্রিয়তার মূলে ছিল ছন্দের চটুল আবেদন এবং প্রত্যক্ষ জগতের বাস্তব বিষয়াবলীর চিত্রসম্ভার।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং সাহিত্যিক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্ম। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র গুণেন্দ্রনাথেব কনিষ্ঠপুত্র।

ঠাকুর পরিবারের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে ইংরাজি ফারসী, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর একটা সহজাত আকর্ষণ গড়ে ওঠে।

আর্টস্কুলের শিক্ষক গিলার্ড ছিলেন তাঁর প্রথম শিক্ষক। প্যাস্টেল ড্রয়িং, জল রং প্রভৃতির প্রশিক্ষণও তাঁর কাছে। দ্বিতীয় শিক্ষক পার্মারের কাছে তিনি তৈলচিত্র এবং লাইফ স্টাডি সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

বিদেশী শিক্ষকদের কাছে শিক্ষাগ্রহণের ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে অবনীন্দ্রনাথ বিদেশী রীতিতে স্টুডিও তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কতকগুলি দেশীয় ছবির সূক্ষ্ম কারুকার্য, ঔজ্জ্বল্য এবং বর্ণ সমাবেশ তাঁর মনকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করে যে তিনি দেশীয় পদ্ধতিতেই ছবি আঁকার সিদ্ধান্ত নেন। দেশীয় আদর্শে তাঁর প্রথম কাজ কৃষ্ণলীলা চিত্রাবলী।

১৮৯৮ খ্রিঃ আর্ট কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ হ্যাভেলের চেষ্টায় তিনি ঐ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।

হ্যাভেল তাঁকে ভারতীয় শিল্প অনুশীলনে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। এই অনুশীলনের ফলশ্রুতি দেখা যায় অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত বজ্রমুকুট, ঋতু সংহার, বুদ্ধ ও সুজাতা ইত্যাদি চিত্রে।

জাপ চিত্রকর টাইকান এরপর তাঁকে জাপানী চিত্ররীতির সঙ্গে পরিচিত করান।

১৯০৭ খ্রিঃ ভগিনী নিবেদিতা, হ্যাভেল প্রভৃতির সহযোগিতায় ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি স্থাপন অবনীন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই সোসাইটির মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত শিল্প আদর্শকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করেন।

১৯১৩ খ্রিঃ প্রথমে লন্ডনে ও প্যারিসে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের এক শিল্পপ্রদর্শনী হয়। ১৯১৯ খ্রিঃ তা আয়োজিত হয় টোকিও শহরে। এই প্রদর্শনীগুলির মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকৃতি বিদেশে বিশেষভাবে পরিচিত হয় এবং বিদেশের চিত্ররসিকদের কাছেও তিনি স্থায়ী আসন লাভ করেন।

অবনীন্দ্রনাথ এরপরে আঁকেন বিখ্যাত ওমর খৈয়াম চিত্রাবলী। জাপানী ও ভারতীয় শিল্পরীতির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার যে পরিচয় এই চিত্রাবলীতে পাওয়া যায় তা শুধু অনুপম নয়, নতুন ধারার পরিচয়বাহী এক নবদিগন্ত-উন্মোচনকারী হিসেবে তা চিহ্নিত হয়ে আছে।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরীতিকে স্বদেশী বা বিদেশী কোন পরম্পরাই প্রভাবিত করতে পারেনি। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের দ্বারাই তিনি ভারতীয় শিল্পজগতের গুরু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রবিকা'ই তাঁকে দিয়ে 'শকুন্তলা' লিখিয়েছিলেন প্রথমে।

ছোটদের জন্য একটা সিরিজ বার করবার কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নাম দিয়েছিলেন বালগ্রন্থাবলী সিরিজ।

সেই সময়ে শিশুদের পড়বার মত ভাল বই ছিল না। তিনি অবনীন্দ্রনাথকে বললেন, 'তুমি গল্প লেখো'।

অবনীন্দ্রনাথ এতকাল ছবি এঁকেছেন, লেখেননি তেমন কিছু। তাও আবার ছোটদের জন্য, যা লেখা সবচেয়ে কঠিন। স্বভাবতঃই তিনি ভয় পেলেন। বললেন ওসব তাঁর আসে না।

অতি সহজ ভাষায় মুখে মুখে চমৎকার গল্প বলতে পারতেন অবনীন্দ্রনাথ। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, ''তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো'।

এরপরই অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন শকুন্তলা। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেম ও বিরহ হল শকুন্তলা গল্পের মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের ভাষার গুণে শিশুরাও তার থেকে অনাবিল আনন্দ লাভ করতে পারে। পড়তে পড়তে যেন রূপকথার রাজ্যে এসে পড়তে হয়।

'শকুন্তলা' পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। তাঁর ছাড়পত্র যেদিন থেকে পাওয়া গেল সেদিন থেকেই যেন অবনীন্দ্রনাথের মনের আগল খুলে গেল। এরপর লিখলেন ক্ষীরের পুতুল।

প্রাচীন বাংলা রূপকথা থেকে কাঠামোটি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ গল্প বলার নিজস্ব ভঙ্গিমা দিয়ে এক অসাধারণ গল্প দাঁড় করালেন। কতগুলি ছড়াকেও তিনি স্বকীয় দক্ষতায় রূপকথার অঙ্গীভূত করেছেন।

এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি একাজ করেছেন যে মনে হয় ছড়াগুলিও এই অপরূপ রূপকথারই অঙ্গ ছিল।

এরপরই তাঁর কলম থেকে জন্ম নেয় একে একে রাজকাহিনী, ভূত পতরীর দেশ, নালক, বুড়ো আংলা প্রভৃতি।

একসময় অবনীন্দ্রনাথ যাত্রাপালা লেখার নেশায় মেতে উঠেছিলেন। এই সূত্রেই তাঁর পুঁথি সাহিত্যের উৎপত্তি।

তাঁর রচিত পুঁথিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মারুতির পুঁথি, চাঁইবুড়ির পুঁথি, হনুমানের পুঁথি, জয়রামের পুঁথি, খুদ্দুর রামায়ণ প্রভৃতি।

অবনীন্দ্রনাথ শিশুদের কথা ভেবে যে কটি বই লিখেছিলেন তা বাংলা সাহিত্যের চিরকালের সম্পদ হয়ে রয়েছে।

লেখার প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীর কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। ১৯২১ খ্রিঃ স্যার আশুতোষ অবনীন্দ্রনাথকে রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন।

১৯২১ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সর্বমোট বক্তৃতা দেন উনত্রিশটি।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার জন্য দ্বারভাঙ্গা হলে ভিড় জমে যেত। শব্দের বিচিত্র বিন্যাসে, অননুকরণীয় বাচন ভঙ্গিতে শ্রোতারা আবিষ্ট হয়ে থাকতেন।

অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার কাজ ধীরে ধীরে কমে এসেছিল। নিজেই বলতেন, 'আর মন ভরে না।' ছবি আঁকার বদলে তিনি জড়ো করে নিয়ে বসলেন, কাঠের টুকরো, গাছের শিকড়, ভাঙ্গা ডাল, নারকেলের মালা, আমড়ার আঁটি এসব অতি তুচ্ছ সব উপকরণ, এসব দিয়ে নানা জিনিষ তৈরি করতেন যেমন রাজপুত্তুর, জাহাজ, পশুপক্ষি এমনি আরও কত কি।

সবই মনোলোভা, চোখভোলানো। এসব নিয়ে এমনই জমে ছিলেন যে প্রায় আট-নবছর ছবি আঁ কার কথা ভুলেই ছিলেন।

ছোট ও বড়দের জন্য অবনীন্দ্রনাথ বহু কাহিনী ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর তখন অনেক লেখাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। যা এখনো গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। তাঁর রচিত শিল্প বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, ভারত-শিল্প, শিল্পায়ন প্রভৃতি।

শেষ বয়সে তিনি শ্রুতি লেখকের সাহায্যে রচনা করেছিলেন ঘরোয়, জোড়াসাঁকোর ধারে।

১৯৫১ খ্রিঃ অবনীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

পল্লীকবি জসীমউদ্দিন



বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও গ্রামবাংলাকে প্রধান বিষয় করে কাব্য রচনার মাধ্যমে সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন জসীমউদ্দিন। বাংলার রাখালী, সাজী, মুরশেদি, ভাটিয়ালি, বাউল, মারফতী গানের ধারার উত্তরসাধক হিসেবেই তিনি চিহ্নিত হয়েছেন।

জসীমউদ্দিনের কবিতায় বাংলার যে সাধারণ মানুষের অন্তরঙ্গ চিত্র চিত্রিত হয়েছে, তারা চিরকাল দাঁড় টেনেছে, লাঙ্গল দিয়ে মাঠে চাষ করেছে, কামারশালায় হাঁপর টেনেছে, নেহাইয়ে লোহা পিটিয়েছে।

এরাই ঝড়তুফানের ঝাপটা মাথায় নিয়ে নৌকায় সাগর প্রমাণ দুরন্ত পদ্মায় বদর বদর বলে পাড়ি দিয়েছে।

এদেরই সাধারণ সুখ দুঃখ, ভালবাসা, বিরহ, মিলন, পালা, পার্বণের আনন্দ, জমি নিয়ে মাঠের ফসল নিয়ে কলহ, শোকে অবুঝের মতো কান্না—এদের মতো করে, এদেরই মুখের ভাষায় এ অনুভূতিকে জসীমউদ্দিন আন্তরিকভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়।

তাঁর কবিতার সহজ সরল ভাষা ও নিরাভরণ সৌন্দর্য সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে।

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় কবি জসীমউদ্দিনের জন্ম ১৯০৪ খ্রিঃ। তিনি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় রচনা করেন বিখ্যাত 'কবর' কবিতা। কবিতাটি

শুরু হয়েছে আশ্চর্য এক মর্মস্পর্শী আবেগ নিয়ে—

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে।
তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
অতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু, পুতুলের মত মুখ।
পুতুলের খেলা ভেঙ্গে যেতো বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা লোকগীতি ও লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও গবেষণার কাজে তরুণ জসীমউদ্দিনকে নিযুক্ত করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র জসীমউদ্দিনের কবিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

১৯২৯ খ্রিঃ 'নক্সীকাঁথার মাঠ'— জসীমউদ্দিনের কবিতা-কাহিনীর বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা কাব্য-অঙ্গনে সাড়া তোলে।

এই কাব্যগ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হলে বিদেশেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। অবনীন্দ্রনাথ এই কাব্যগ্রন্থের ভুমিকায় লিখেছিলেন, "শহরবাসীদের কাছে এই একখানি সুন্দর কাঁথার মতো করে বোনা লেখার কতটা আদর হবে জানি না— আমি এটিকে আদরের চোখে দেখেছি। কেননা এই লেখার মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লীজীবন আমার কাছে চমৎকার মাধুর্যময় ছবির মত দেখা দিয়েছে।'

এই কাব্যগ্রন্থের সুবাদে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সেই জসীমউদ্দিন দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের দীপ্তিতে উজ্জ্বল বাংলার কবিতার অঙ্গন। তারই মধ্যে নতুন ভাষা ও নতুন ভাবের জন্য জসীমউদ্দিনের কবিতা তার নিজস্ব স্থান করে নিতে সক্ষম হল।

গোড়ার দিকে তিনি নিজের নাম লিখতেন জসীমউদ্দিন মোল্লা। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর নামটি ছেঁটে শুধু জসীমউদ্দিন করবার পরামর্শ দিলে, কবি পরবর্তীকালে সেই নামই ব্যবহার করতে থাকেন।

জসীমউদ্দিন নিজে গান লিখতেন; গাইতেও পারতেন ভাল। বহু সারি, জারি, ভাটিয়ালি গান তিনি লিখেছেন, তাতে সুর দিয়েছেন। 'নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমর' কিংবা 'ও রঙিলা নায়ের মাঝি, এই ঘাটে লাগাইয়া নাও, নিগুণ কথা কইয়া যাও শুনি' প্রভৃতি ভাটিয়ালি গানের সুর স্বনামধন্য গায়ক সুরকার শচীনদেব বর্মনের কণ্ঠে একসময় সমস্ত দেশ মাতিয়ে তুলেছিল। এই মন-পাগল-করা গান-গুলি জসীমউদ্দিনের রচনা।

জসীমউদ্দিনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী, রাখালী, নক্সীকাঁথার মাঠ, সোজনবাদিয়ার ঘাট, বালুচর, মাটির কান্না, ধান ও ক্ষেত, ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায় ইত্যাদি।

এছাড়া গ্রামবাংলার প্রচলিত গল্প ও কাহিনী সংগ্রহ করে 'বাঙালীর হাসির গল্প' নামে কয়েক খন্ডে প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৭১ খ্রিঃ কবি লোকান্তরিত হন।

হেমেন্দ্রকুমার রায়



প্রধানতঃ শিশু ও কিশোর সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক হিসেবে পরিচিত হলেও বড়দের সাহিত্যেও হেমেন্দ্রকুমারের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।

জন্ম কলকাতায় ১৮৮৮ খ্রিঃ। পিতার নাম রাধিকাপ্রসাদ রায়। চোদ্দ বছর বয়স থেকেই সাহিত্য চর্চা শুরু করেন।

১৯০৩ খ্রিঃ বসুধা মাসিকপত্রে 'আমার কাহিনী' নামে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে অসংখ্য গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ও অনুবাদ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি শিশু-সাহিত্যে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেন।

বড়দের জন্যও অনেক গ্রন্থ লিখেছেন হেমেন্দ্রকুমার। তবে শিশু সাহিত্যেই তাঁর দান অতুলনীয়। বিশেষভাবে ছোটদের জন্য অ্যাডভেঞ্চার, ঐতিহাসিক ও গোয়েন্দা উপন্যাসে তাঁর অসাধারণ রচনাশৈলী প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও কবিতা, নাটক, হাসি ও ভূতের গল্প, কিশোর-উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি মিলিয়ে ছোটদের জন্য রচিত তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা আশি।

বিমল-কুমার, জয়ন্ত-মানিক, পুলিশ ইন্সপেক্টার সুন্দরবাবু— হেমেন্দ্রকুমারের সৃষ্ট চরিত্রগুলো শিশু ও কিশোর সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছে। তিনি দীর্ঘকাল ছোটদের মাসিকপত্র রংমশাল সম্পাদনা করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কিশোর-গ্রন্থ ঃ যখের ধন, আবার যখের ধন, জয়ন্তের কীর্তি, মানুষ পিশাচ, রক্তবাদল ঝরে, দেড়শো খোকার কান্ড, কিং কং, পঞ্চনদের তীরে, ভারতের দ্বিতীয় প্রভাত, ভগবানের চাবুক প্রভৃতি।

বড়দের জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হল, জলের আলপনা, বেনোজল, পদ্মকাঁটা, ঝড়ের যাত্রী, যাঁদের দেখেছি, বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার, ওমর খৈয়ামের রুবায়াৎ প্রভৃতি।

হেমেন্দ্রকুমার কেবলমাত্র বিখ্যাত সাহিত্যিক হিসাবেই পরিচিত ছিলেন না। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী ও নৃত্যবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। কৈশোর ও যৌবনে

প্রথম প্রকাশিত গল্প উপেক্ষিত, ১৯২২ খ্রিঃ প্রবাসী পত্রিকায় মাঘ সংখ্যায় ছাপা হয়। প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালী। প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে। প্রথম উপন্যাসই তাঁকে শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। এরপর সাহিত্যচর্চার দীর্ঘ একুশ বছরের পরিসরে তিনি বহু উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী এবং শিশু-সাহিত্য রচনা করেন।

বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে গ্রামজীবনের দুঃখ, দারিদ্র্য, স্বপ্ন, আশা, প্রেম, ভালবাসা তাঁর রচনায় অপরিসীম দরদের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। কেবল পল্লীপ্রকৃতিই নয়, তাঁর রচনায় অরণ্য ধরা পড়েছে তার সমস্ত রহস্যময়তা, প্রাণোচ্ছল সজীবতা ও বৈচিত্র্য নিয়ে।

এক ভাবুক কবির দৃষ্টিতে দেখা অরণ্য প্রকৃতির এক অপরিচিত লীলায়িত রূপ বিধৃত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত আরণ্যক উপন্যাসে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে ব্যক্তিজীবনের প্রভাব থাকলেও ভারতীয় অধ্যাত্মবোধ ও তার সীমাহীনতার স্পর্শ প্রায় প্রতিটি লেখাকেই সঞ্জীবিত করেছে।

দীর্ঘ একুশ বছরের সাহিত্যজীবনে গল্প, উপন্যাস, দিনলিপি, শিশুসাহিত্য মিলিয়ে প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে নিঃসন্দেহে পথের পাঁচালী ও অপরাজিতই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি।

বিভূতিভূষণের রচিত উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, ইছামতী, দেবযান, আদর্শ হিন্দুহোটেল, বিপিনের সংসার, মেঘমল্লার, মৌরীফুল, যাত্রাবদল, দৃষ্টিপ্রদীপ, প্রভৃতি।

উৎকর্ণ, স্মৃতির দেখা তাঁর ডায়েরী গ্রন্থ। কিশোরদের জন্য লিখেছেন বনে পাহাড়ে, মরণের ডংকা বাজে, হীরা মানিক জ্বলে, চাঁদের পাহাড় প্রভৃতি।

বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী ইংরাজি ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মৃত্যুর পরে ইছামতী উপন্যাসের জন্য তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

১৯৫০ খ্রিঃ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৫ই কার্তিক, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ পরলোক গমন করেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



আধুনিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জন্ম ১৩০৫ বঙ্গাব্দে (১৮৯৮ খ্রিঃ) বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে এক ছোট জমিদার পরিবারে। পিতার নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা প্রভাবতী দেবী।

লাভপুর গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ১৯১৫-১৬ খ্রিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়েই নিজ গ্রামের উমাশশী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

বিবাহের পর তারাশঙ্কর পড়াশোনার জন্য কলকাতায় এলেন। প্রথমে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবং পরে সাউথ সুবার্বন কলেজে (বর্তমান নাম আশুতোষ কলেজ) পড়াশোনা করেন।

এই সময় গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই অপরাধে তাঁকে নিজের গ্রামেই অন্তরীণ থাকতে হয়। ফলে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়।

জীবিকা অর্জনের জন্য কিছুকাল কলকাতায় কয়লার ব্যবসা করেন। পরে চাকরি নিয়ে চলে যান কানপুরে। এই সময়েই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর পদযাত্রার সূত্রপাত হয়। ১৯২৬ খ্রিঃ প্রথম প্রকাশিত হয় কবিতার বইপত্র।

কাব্যরচনা দিয়ে শুরু করলেও অল্প সময়ের মধ্যেই নাটকের জগতে তাঁর উত্তরণ ঘটল। রচনা করলেন মারাঠা-তর্পণ নাটক। প্রায় একই সময়ে কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হল রসকলি গল্প।

ইতিমধ্যে দেশজুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ তারাশঙ্কর আন্দোলনে যোগদান করেন ও কারারুদ্ধ হন ১৯৩০ খ্রিঃ। পরের বছর জেল থেকে বেরিয়ে সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেন।

সেই থেকে শুরু হয় নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য চর্চা। দেশের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যপত্র যেমন কল্লোল, কালিকলম, উপাসনা, বঙ্গশ্রী, শনিবারের চিঠি, প্রবাসী, দেশ, ভারতবর্ষ, বসুমতী, পরিচয়, প্রভৃতিতে নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। আমৃত্যু সাহিত্যসাধনায় রত থেকে তারাশঙ্কর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

তারাশঙ্করের সাহিত্যের প্রতি পরতে মিশে আছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। বীরভূমের লালমাটি আর তার মানুষকে তিনি নিপুণ দক্ষতায় উপস্থিত করেছেন বাংলা সাহিত্যে।

নিজে জমিদার বাড়ির সন্তান বলে জমিদারদের ক্ষয়িষ্ণু জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিশেষতঃ আঞ্চলিক মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হওয়ায় তাঁর রচনা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোজনা করে। এরই ফলশ্রুতি দেখা যায় গণদেবতা, মন্বন্তর, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, ডাক হরকরা, আরোগ্য নিকেতন, কবি, কীর্তিহাটের কড়চা প্রভৃতি অনবদ্য রচনাগুলিতে।

তারাশঙ্করের সাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়ে আছে বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাক হরকরা প্রভৃতি গ্রামীণ চরিত্র। এছাড়া বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, দেশবিভাগ, অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক অবস্থার শোচনীয় বিপর্যয়, অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিস্তার, যুব সমাজের ক্রোধ, অস্থিরতা, বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনা।

তারাশঙ্করের অনেক গল্প ও উপন্যাস চলচ্চিত্র ও নাটকে রূপায়িত হয়ে সাফল্য লাভ করেছে। কালিন্দী, দুই পুরুষ, আরোগ্য নিকেতন, কবি প্রভৃতি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। কালিন্দীর নাট্যরূপ তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর কবি উপন্যাসের স্বরচিত গানগুলিই তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিচয় বহন করে। এছাড়াও তিনি ছন্দোবদ্ধ পঙক্তির আদর্শবাদী ও নীতিমূলক কবিতাও কিছু রচনা করেছেন।

অর্থের প্রয়োজনে শেষ দিকে কিছুদিন দৈনিকপত্রে সাংবাদিকের কলম লিখেছেন। শেষ বয়সে কিছু চিত্রও এঁকেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ স্মৃতি পুরস্কার ও জগত্তারিণী পদক, রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ উপাধি এবং জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার লাভ তাঁর সাহিত্য জীবনের উজ্জ্বল স্বীকৃতি।

১৯৫২ খ্রিঃ তারাশঙ্কর বিধান পরিষদের সদস্য হন। ১৯৫৫ খ্রিঃ তিনি ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে চীন ভ্রমণ করেন। ১৯৫৭ খ্রিঃ তাসখন্দে এশীয় লেখক প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন ও মস্কো সফর করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

১৯৭১ খ্রিঃ পরলোক গমন করেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র



প্রখ্যাত কবি, সার্থক ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও চলচ্চিত্রকার রূপে সুখ্যাত হলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক রূপে স্বীকৃত।

তাঁর আদিনিবাস চব্বিশ পরগণা জেলার রাজপুর গ্রামে। পিতার নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি কর্মসুত্রে কাশীতে বসবাস কালে, সেখানে প্রেমেন্দ্রর জন্ম হয়। অল্প বয়সেই মাতৃহারা হন। ফলে শৈশব কাটে মির্জাপুরে মামার বাড়িতে।

১৯২০ খ্রিঃ কলকাতার সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ঢাকা ও কলকাতার কয়েকটি কলেজে ও পরে শ্রীনিকেতনে ভর্তি হন। কিন্তু বাঁধাধরা শিক্ষা ভালো লাগেনি বলে লেখাপড়ায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি।

অল্প বয়স থেকেই সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। সতের বছর বয়সে রচিত বেনামী বন্দর কবিতা উত্তরা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং কবিখ্যাতি লাভ করেন।

কর্মজীবন শুরু হয় সাহিত্যের অঙ্গনেই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সহায়তায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যোগ দেন। এরপরে সম্পাদকীয় সহযোগী হিসেবে কাজ করেন সুভাষচন্দ্রের বাংলার কথা ও ফরোয়ার্ড পত্রিকায় এবং বঙ্গশ্রী কাগজে।

কিছুকাল বিজ্ঞাপনের কপি-লেখক হিসেবে কাজ করেছেন বেঙ্গল ইমিউনিটিতে। এরপরে যুক্ত হন চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে। একটি ফিল্ম কোম্পানির পাবলিসিটি অফিসার হিসেবে কিছুকাল কাজ করেন। এই সময়েই প্রখ্যাত পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার অনুরোধে রিক্তা ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেন। এই ছবির সাফল্যলাভে উৎসাহিত হয়ে চিত্রনাট্য রচনাকে কিছুকাল পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। চলচ্চিত্রে চাকরি নিয়ে কিছুকাল বম্বেতেও ছিলেন।

কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল একদল তরুণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সাহিত্য আন্দোলন সৃষ্টি করলে, প্রেমেন্দ্র কল্লোল পত্রিকার কবি হিসেবেই সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং পরবর্তীকালে কল্লোলযুগের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব রূপে স্বীকৃত হন।

পনেরো-ষোল বছর বয়সে শ্রমজীবীদের পত্রিকা সংবর্ততে ১৯২৭ খ্রিঃ তাঁর লেখা পাঁক উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

বাংলার সায়েন্স ফিকসন রচনার সূত্রপাত তিনিই করেন। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের এই শাখাটি বর্তমানে অনেক বলিষ্ঠ লেখকের আবির্ভাবে যথেষ্ট পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্মরণীয় সৃষ্টি শ্রীঘনশ্যাম দাস ওরফে ঘনাদা চরিত্র। অন্য কোন রচনা না লিখলেও একমাত্র ঘনাদা চরিত্র সৃষ্টির জন্যই তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করতেন।

ঘনাদাকে নিয়ে তাঁর প্রথম গল্প মশা প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রিঃ।

ঘনাদার অনুরূপ আরও তিনটি চরিত্র তিনি পরবর্তীকালে সৃষ্টি করেন। এগুলো হল, বিজ্ঞান গবেষক মামাবাবু, রহস্য-সন্ধানী পরাশর বর্মা এবং ভূত-শিকারী মেজোকর্তা। ঘনাদার মত প্রবাদপ্রতিম না হলেও এই চরিত্রগুলোও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল।

পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও প্রেমেন্দ্র মিত্রর যশ ও দক্ষতা ছিল। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে নিরুক্ত, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে কবিতা পত্রিকা এবং রঙমশাল, কালিকলম, নবশক্তি প্রভৃতি সম্পাদনা করেন। কিছুকাল শিশু মাসিক পক্ষীরাজ সম্পাদনা করেন।

তাঁর অনূদিত হুইটম্যানের কবিতা, লরেন্স ও সমারসেট মম-এর গল্প প্রশংসিত হয়।

গীতিকার হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। প্রথম গান লেখেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে। 'যদি ভাল না লাগে তো দিও না মন' কানন দেবীর কণ্ঠের এই জনপ্রিয় গানটির রচয়িতা তিনিই।

কৃত্তিবাস ভদ্র ছদ্মনামেও তিনি লেখালেখি করেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র সমাধান ১৯৪৩ খ্রিঃ মুক্তি পায় ও খ্যাতি অর্জন করে।

সব মিলিয়ে চোদ্দটি ছবি তিনি পরিচালনা করেন। তার মধ্যে ময়লা কাগজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দেড় শতাধিক। ছোটদের ও বড়দের পদ্য ও গদ্য রচনা সমান দক্ষতায় লিখতে সক্ষম ছিলেন বলে সব্যসাচী লেখক রূপে আখ্যাত হতেন।

বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। সাগর থেকে ফেরা কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৫৭ খ্রিঃ আকাদেমি পুরস্কার ও ১৯৫৮ খ্রিঃ রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হন।

১৯৫৭ খ্রিঃ আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে তিনি বেলজিয়াম যান। এছাড়াও সোভিয়েত রাশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। পদ্মশ্রী ও দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত হন।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র



বাংলা শিশু-সাহিত্যের জগতে খগেন্দ্রনাথ মিত্র-র নাম করা হয় উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়ের পরেই।

বাংলা শিশু সাহিত্যের বুনিয়াদ যাঁদের হাতে গড়ে উঠেছিল খগেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সত্যিকার ছোটদের বড় লেখক।

১৮৯৬ খ্রিঃ ২ জানুয়ারী কলকাতার শ্যামপুকুর খগেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর বাল্য ও শৈশবের দিনগুলো কেটেছে কঠোর দারিদ্র্য ও অভাব অনটনের মধ্যে। পিতা শৈলেন্দ্রনাথ কাজ করতেন শিলাইদহে ঠাকুর এস্টেটে। পড়া শুরু হয়েছিল শ্যামপুকুরের এক পাঠশালায়। কিন্তু সেখানকার পড়া শেষ হতেই তাঁকে চলে যেতে হয় কুষ্টিয়ায় ঠাকুরদার কাছে।

ঠাকুরদা ছিলেন কুষ্টিয়ার নামকরা উকিল। তাঁর তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া ফের শুরু হয়। গাছপালা ঘেরা শান্ত গ্রামের পরিবেশ, সেখানকার সঙ্গীসাথী, নদী, চষা ক্ষেতে দস্যিপনা সবে মিলে এক নতুন জগতের সন্ধান এনে দিল তাঁর কাছে। তিনি মিশে গেলেন এই জগতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে।

বন্ধুদের সঙ্গে দস্যিপনা করলেও গ্রামের অভাবী মানুষগুলোর প্রতি গভীর মমতা বোধ করতেন তিনি।

কখনো কখনো তাদের সুখদুঃখের ভাগিদার হয়ে যেতেন। এইভাবেই গ্রামের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন তিনি।

এখানেই খেলাধূলা ও অভিনয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। বাঘা যতীনের সংস্পর্শে এসে পরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দেন।

কলকাতায় সিটি কলেজে পড়ার সময় গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং বি.এ পরীক্ষার ফি জমা দিয়েও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারেন নি। পরে ১৯২০ খ্রিঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত সরকারি স্বীকৃতীহীন জাতীয় বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে স্নাতক হন।

স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত খগেন্দ্রনাথ দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন ও কারাবরণ করেন।

জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কিছুকাল রেলেও চাকরি করেন। পরে পুরোপুরিভাবে সাহিত্য সেবায় নিয়োজিত হন। সাহিত্য রচনাই ছিল তাঁর জীবিকার্জনের প্রধান অবলম্বন।

প্রথম বড় রচনা আফ্রিকার জঙ্গলে প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিঃ। মৌলিক রচনার পাশাপাশি অনেক বিখ্যাত গল্প-উপন্যাসের অনুবাদও করেন তিনি। তাঁর বিখ্যাত কিশোর গ্রন্থ, ভোম্বল সর্দার, বাগদি ডাকাত, পাতালপুরীর কাহিনী, অতীতের পৃথিবী, আবিষ্কারের কাহিনী, ঝিলে জঙ্গলে প্রভৃতি।

ভোম্বল সর্দার গ্রন্থটি হিন্দি ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। পরবর্তীকালে বইটি চলচ্চিত্রায়িত হয়।

অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী, ভৌতিকগল্প রচনাতেও সমান দক্ষতা ছিল তাঁর। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সে এক পথিক, বন্দী কিশোর, সুন্দরবনের পথে, আগুনের পাহাড়, কারাকোরাম পর্বতে, লামাদের দেশ তিব্বত।

তাঁর বিশিষ্ট অনুবাদ গ্রন্থগুলি হল, এ টেল অব টু সিটিজ, আঙ্কল টমস কেবিন, গোর্কির মা ইত্যাদি।

জীবিকার তাগিদে তাঁকে দুহাতে লিখতে হয়েছিল বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে অসংখ্য বই। কিন্তু সব লেখাতেই তাঁর নিজস্বতা বজায় থেকেছে। তিনি ছিলেন ছোটদের প্রিয় লেখক।

খগেন্দ্রনাথের রচিত 'শতাব্দীর শিশু সাহিত্য ১৮১৮-১৯৬০' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

শিশুসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য ১৯৬০ খ্রিঃ জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হন। কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি সেই পুরস্কার গ্রহণ করেননি।

১৯৬০ খ্রিঃ কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

সুকুমার রায়



বাংলা শিশু সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক সুকুমার রায়ের জন্ম হয় ১৮৮৭ খ্রিঃ ৩০শে অক্টোবর কলকাতায়। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন শিশু সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী ও যন্ত্রকুশলী।

পিতার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে সাহিত্যের প্রতিভা লাভ করেছিলেন সুকুমার। অল্প বয়স থেকেই মুখে মুখে ছড়া তৈরি করতে পারতেন।

ছবি আঁকারও হাতেখড়ি হয়েছিল বাবা উপেন্দ্রকিশোরের কাছে। আঁকার সঙ্গে ফটোগ্রাফির চর্চাও শুরু করেছিলেন ছেলেবেলা থেকেই।

পড়াশুনা শুরু করেন সিটি স্কুলে। রসায়নে অনার্স সহ বি.এস.সি পাশ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে।

এরপর ফটোগ্রাফি আর মুদ্রণ শিল্পে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ নিয়ে ১৯১১ খ্রিঃ বিলেত যান।

স্কুলে পাঠরত অবস্থাতেই ছোটদের হাসির নাটক লেখা ও অভিনয়ের শুরু। বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন ননসেন্স ক্লাব। ক্লাবের মুখপত্রের নাম ছিল সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা।

বিলেত যাবার আগে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে গোড়ায় গলদ নাটকে অভিনয় করেন।

লন্ডনের পেনরোজ পত্রিকার সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের যোগাযোগ ছিল। বিলাত বাসের সময় এই পত্রিকার সম্পাদক মিঃ গম্বেল-এর সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তাঁরই চিঠি নিয়ে সুকুমার লন্ডনের L.C.C.School of Photo Engraving and Lithographyতে বিশেষ ছাত্ররূপে ভর্তি হন।

এই সময় ফটোগ্রাফিক সোসাইটি লাইব্রেরিতে নিয়মিত পড়াশোনাও করতেন। ১৯১২ খ্রিঃ ম্যাঞ্চেস্টারের স্কুল অব টেকনোলজিতে বিশেষ ছাত্ররূপে স্টুডিও ও লেবরেটরির কাজ শিখেছিলেন।

পড়াশোনার কাজের ফাঁকে সুকুমার প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এই সুযোগে লন্ডন প্রবাসী অনেক বিখ্যাত বাঙ্গালীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি নিয়ে লন্ডনে গেলে সুকুমার তাঁকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।

এই সময় East and West Society-এর আহ্বানে সুকুমার নিজের লেখা প্রবন্ধ The Spirit of Rabindranath পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের সঙ্গে কবির অনেকগুলি কবিতারও অনুবাদ ছিল। পরে প্রবন্ধটি Quest পত্রিকায় ছাপা হয়।

লন্ডনে দুবছর ছিলেন সুকুমার। সেখান থেকে নিয়মিত ভাবে গল্প, কবিতা ও আঁকা ছবি পাঠাতেন বাবার সন্দেশ পত্রিকার জন্য। এই ভাবেই তিনি সন্দেশের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

লন্ডনে থাকাকালে সুকুমার রয়েল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর আগে একমাত্র স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই সম্মান পেয়েছিলেন।

সুকুমার দেশে ফিরে এসে পিতার প্রতিষ্ঠিত ইউ রায় অ্যান্ড সন্স-এর দায়িত্ব নিলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপেন্দ্রকিশোর আগেই প্রতিষ্ঠানের ভার তুলে দিয়েছিলেন ছেলেদের হাতে।

ইতিমধ্যে সুকুমারের বিয়ে হল। রবীন্দ্রনাথ বন্ধুপুত্রের বিয়েতে শিলাইদহ থেকে এসেছিলেন কলকাতায়। ১৯৮০ খ্রিঃ উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়। সুকুমার ভাইদের সঙ্গে ব্যবসায় পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হলেন। এই সময় তাঁর উদ্যোগে গড়ে ওঠে মানডে ক্লাব। এই ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে ছিলেন কালিদাস নাগ, অতুলপ্রসাদ সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সন্দেশের প্রতিটি সংখ্যাতেই সুকুমার নানা বিষয়ে লিখতেন, ছবি আঁকতেন। শিশু-কিশোরদের উপযোগী বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

সুকুমারের গল্প ও কবিতায় থাকতো উচ্ছল কৌতুক রসের সঙ্গে সূক্ষ্ম সমাজ চেতনার সংমিশ্রণ। তিনি তাঁর লেখা ও ছবির মাধ্যমে বাংলা দেশের শিশুচিত্ত জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সন্দেশে লেখার গোড়ার দিকে সুকুমার ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। উহ্যনাম পণ্ডিত ছিল তাঁর ছদ্মনাম। পরে স্বনামেই লেখেন গল্প, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ। জীবনের শেষ পর্বে অবশ্য কিছু লেখা লিখেছিলেন উহ্যনাম পণ্ডিত নামে।

সুকুমারের রচনা কাব্যগ্রন্থ আবোল তাবোল, খাইখাই, প্রবন্ধ—অতীতের ছবি, বর্ণমালাতত্ত্ব, নাটক—অবাক জলপান, ঝালাপালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, হিংসুটে, ভাবুকসভা, চলচ্চিত্তচঞ্চরি ও শব্দকল্পদ্রুম, গল্পগ্রন্থ—হ-য-ব-র-ল, পাগলা দাশু, বহুরূপী প্রভৃতি।

তাছাড়া ইংরাজি ও বাংলায় তিনি কিছু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন।

সুকুমার ছিলেন রসিক মনের মানুষ। ফলে তার স্বভাবসুলভ রসের সঙ্গে প্রখর কল্পনা ও অপরূপ ভাষা মিলে তাঁর রচনাগুলিকে করে তুলেছিল পরম উপভোগ্য। লেখাকে অধিকতর স্বাদু করে তুলেছিল তাঁর আঁকা ছবি।

১৯২১ খ্রিঃ জন্ম হয় সুকুমারের একমাত্র সন্তান সত্যজিতের। এরপরেই তিনি আক্রান্ত হন কালাজ্বরে। দুই বছরেরও বেশি সময় সংগ্রাম করেছেন রোগের সঙ্গে। অসুস্থ অবস্থাতেও অনর্গল লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ এসে তাঁকে গান শোনাতেন, ধর্মকথা শোনাতেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন।

জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছিল। ১৯২৩ খ্রিঃ ১০ই সেপ্টেম্বর সুকুমার রায় পরলোক গমন করেন।

সত্যজিৎ রায়



সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের জন্ম ১৯২১ খ্রিঃ ২রা মে ময়মনসিংহের মসুয়ার জমিদার বংশে। তাঁর পিতা বাংলা শিশু সাহিত্যে খেয়ালরসে স্রষ্টা সুকুমার রায়, মাতা সুপ্রভাদেবী।

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মতই মসুয়ার রায়চৌধুরী পরিবারও বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ অবদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

এই বংশেরই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন শিশু সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী ও যন্ত্রকুশলী। সত্যজিৎ ছিলেন তাঁরই পৌত্র।

মাত্র আড়াই বছর বয়সে পিতৃহারা হন, মাতা সুপ্রভাদেবীর সঙ্গে সত্যজিৎ ছয় বছর বয়স থেকে মামার বাড়িতে থাকেন। মায়ের কাছেই পড়াশুনা আরম্ভ। সংসারেব প্রয়োজনে সুপ্রভাদেবীকে এক সময়ে বিদ্যাসাগর বাণীভবন বিদ্যাশ্রমে সেলাইয়ের কাজও করতে হয়েছিল।

অস্কার পুরস্কারে সম্মানিত চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ জীবনের প্রথম টকি ছবি দেখেন ১৯২৯ খ্রিঃ। ছবির নাম টার্জান দ্য এপম্যান। এর আগে নির্বাক ছায়াছবি যা দেখেছিলেন তার মধ্যে বেন হুর, কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো, থিফ অব বাগদাদ, আঙ্কল টমস কেবিন প্রভৃতির নাম পরিণত বয়সেও তাঁর মনে ছিল।

দশ বছর বয়সে বালিগঞ্জ হাইস্কুলে ফিফথ ক্লাসে অর্থাৎ এখনকার মতে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হন। এখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন ১৯৩৮ খ্রিঃ।

বাবা এবং ঠাকুরদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই শিল্প-সাহিত্যের প্রতিভা লাভ করেছিলেন সত্যজিৎ। স্কুলে থাকতে বাড়ির সংগ্রহের রেকর্ড শুনে পাশ্চাত্য

সঙ্গীতে দীক্ষিত হয়ে যান। ব্রাহ্মপরিবারের সন্তান হিসেবে এর পাশাপাশি ব্রহ্মসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের প্রতিও অনুরাগ জন্মেছিল।

চিত্রশিল্পের চর্চা বাল্যবয়স থেকেই ছিল। বি.এ পাশ করার পর শিল্প শিক্ষার জন্য ভর্তি হন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। কিন্তু আধুনিকমনা সত্যজিতের পক্ষে এখানকার পরিবেশ মনঃপুত না হওয়ায় শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই কলকাতায় চলে আসেন।

১৯৪০ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে তিনি ব্রিটিশ বিজ্ঞাপন কোম্পানি ডি'জে কিমার-সংস্থায় জুনিয়র ভিসুয়ালাইজার হিসেবে যোগ দেন। এই সময়েই তিনি সিগনেট প্রেস প্রকাশন সংস্থার বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকা শুরু করেন। ছোটদের পত্রিকা মৌচাকেও তাঁর প্রথম আঁকা ইলাস্ট্রেশন প্রকাশিত হয়।

অক্ষরলিপিতেও এই সময় তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। পরবর্তীকালে অক্ষরলিপিতে রোমান টাইপ সিরিজ তাঁর বিশেষ অবদান বলে স্বীকৃত হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের আর্ট ডিরেক্টারের পদে উন্নীত হন। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র পথের পাঁচালীর সাফল্যের পর ১৯৫৬ খ্রিঃ এই চাকরিতে ইস্তফা দেন।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত পথের পাঁচালীর প্রথম প্রদর্শনী হয় নিউইয়র্কে ১৯৫৫ খ্রিঃ এপ্রিলে। কলকাতায় মুক্তি পায় সেই বছরেই ২৬শে আগস্ট। ছবিটি সেই বছরই রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পায়।

১৯৫৬ খ্রিঃ কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট-এর প্রশংসাপত্র লাভ করে। এরপর ১৯৬৬ খ্রিঃ পর্যন্ত পথের পাঁচালী বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্রোৎসবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হয়েছে।

এরপর থেকে চলচ্চিত্রকার সত্যজিতের জয়যাত্রা শুরু হয়। তাঁর পরিচালিত প্রায় সবকটি ছবিতেই তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে যা ভারতীয় অন্য কোন ছবিতে ছিল দুর্লভ।

বস্তুতঃ সত্যজিৎ ভারতীয় চলচ্চিত্রের গোত্রান্তর ঘটিয়েছিলেন। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ছবি অপরাজিত, অপুর সংসার, জলসাঘর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অভিযান, মহানগর, চারুলতা এবং শেষ দিককার ঘরেবাইরে, গণশত্রু, শাখাপ্রশাখা, আগন্তুক প্রভৃতি।

১৯৬৬ খ্রিঃ পরিচালনা করেন প্রথম হিন্দিছবি শতরঞ্জকে খিলাড়ি। তাঁর তৈরি তথ্যচিত্র হল রবীন্দ্রনাথ, সিকিম, সুকুমার রায়, বালা, ইনার আই প্রভৃতি।

১৯৬০ খ্রিঃ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সত্যজিৎ রায় তাঁর পিতামহ ও পিতার প্রিয় সন্দেশ পত্রিকা নতুন করে প্রকাশ শুরু করেন। সম্পাদনা ও অলঙ্করণের পাশাপাশি নিজেও লেখা শুরু করেন। এভাবেই একে একে সৃষ্টি হয় ফেলুদা, তপশে, জটায়ু, প্রফেসর শঙ্কুর মত বাঙালি শিশু-কিশোরদের প্রিয় কিছু সাহিত্যচরিত্র।

লিয়রের ছড়া অবলম্বনে পাপাঙ্গুল তাঁর প্রথম রচনা। ১৯৬৯ খ্রিঃ বাদশাহী আংটি প্রকাশিত হয়। সেই থেকে ১৯৬৬ খ্রিঃ পর্যন্ত নয়না রহস্য তাঁর সর্বশেষ বই প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যের আসরেও গল্পবলার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য অল্পসময়ের মধ্যেই সত্যজিৎ প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা, সোনারকেল্লা, বাক্সরহস্য, জয়বাবা ফেলুনাথ, গোরস্থানে সাবধান, যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে, তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ, দার্জিলিং জমজমাট প্রভৃতি।

১৯৬৭ খ্রিঃ প্রফেসর শঙ্কু বছরের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য গ্রন্থরূপে আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। সাহিত্যিক হিসেবে এছাড়াও তিনি আরও সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন।

চলচ্চিত্রকার হিসেবে সত্যজিৎ দেশের ও বিদেশের বহু পুরস্কার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম সম্মান এবং ভারত সরকারের ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত হন।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রঁসোয়া মিতেরঁ কলকাতায় এসে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান লেজিঁয় দ'নর-এর স্বর্ণপদক প্রদান করেন। সিনেমা শিল্পের সর্বোচ্চ পুরস্কার অস্কার লাভ করেন ১৯৬৬ খ্রিঃ।

১৯৬৬ খ্রিঃ ২৩শে এপ্রিল সত্যজিৎ রায় কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

মুকুন্দ দাস



বাংলার চারণকবি মুকুন্দদাসের জন্ম ঢাকার বানরী গ্রামে। পিতার নাম গুরুদয়াল দে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর।

গুরুদয়াল কাজ করতেন বরিশালে এক ডেপুটির আদালতে। কর্মসূত্রে তাঁকে বরিশালে থাকতে হতো। পরে সপরিবারে এখানেই এসে বসবাস করেন। এখানেই বাল্যের স্কুলের পড়া আরম্ভ হয় মুকুন্দদাসের।

সংসারে স্বচ্ছলতার অভাব ছিল। তাই স্কুলের পড়া বেশিদূর এগোয়নি। ফলে কিশোর বয়স থেকেই পিতার মুদি দোকানে বসতে আরম্ভ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন স্বাধীনচেতা আর অত্যন্ত দুরন্ত। গানের গলা ছিল মিষ্ট। শুনে শুনেই গান তুলতে পারতেন।

বরিশালের তৎকালীন নায়েব বীরেশ্বর গুপ্ত একটি কীর্তনের দল করেছিলেন। মুকুন্দ সেই কীর্তনদলে যোগ দেন ১৯ বছর বয়সে। পরে নিজেই একটি দল গড়েন।

নানা পূজাপার্বণে কীর্তনের দল নিয়ে বরিশালের বিভিন্ন স্থানে যেতে হত। এইভাবে অনেক কীর্তনীয়া দলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তিনি পছন্দমত গান অন্য কীর্তনীয়াদের কাছ থেকেটুকে রাখতেন। পরে এইসব উপাদান তাঁর কীর্তনসঙ্গীত নামক সংকলন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

মুকুন্দ দাস ১৯০২ খ্রিঃ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নেন রামানন্দ বা হরিবোলানন্দ নামের এক সর্বত্যাগী সাধুর কাছে। দীক্ষাগ্রহণের পর তাঁর নাম হয় মুকুন্দ দাস। পরবর্তীকালে এই নামেই তিনি দেশবিখ্যাত হন।

বরিশালের মুকুটহীন সম্রাট বলে আখ্যাত মনস্বী অশ্বিনীকুমার দত্তের সংস্পর্শে এসে মুকুন্দ দাস স্বদেশ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন। তাঁরই প্রেরণায় মুকুন্দ দাস হয়ে ওঠেন বাংলার চারণকবি।

সম্প্রদায়গত কোনপ্রকার গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে ছিল না। বৈষ্ণব ও শাক্তর ভেদাভেদ যেমন তিনি মানতেন না তেমনি মন্দির মসজিদের পার্থক্যও কখনো করেন নি। তাঁর সাধন সঙ্গীত গুলিতে এই ভাবসমন্বয়ের প্রকাশ ঘটেছিল।

মুকুন্দ দাস নিজেই যাত্রাপালা ও গান রচনা করতেন। গানে সুর সংযোজনও নিজেই করতেন। মনোমোহন চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের গানও করতেন তিনি। একসময় বরিশাল হিতৈষী পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন।

মুকুন্দ দাসের দলের যাত্রাগান এমনই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে সারা বরিশাল তাঁকে গানের দল নিয়ে ঘুরতে হত। সেই সময়ে বিভিন্ন দেশবরেণ্য নেতা এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন। তাঁর মাতৃপূজা যাত্রাপালাটি যুবকদের স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ করত।

স্বদেশী আন্দোলনে বিশেষ করে বিদেশী বর্জন আন্দোলনে মুকুন্দ দাস বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গনারী রেশমীচুড়ি আর পরো না তাঁর এই গানটি এক সময়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে তীব্র উন্মাদনা জাগিয়েছিল।

অশ্বিনীকুমারের নিকট স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হবার পরে মুকুন্দ দাস গ্রামে গ্রামে দেশাত্মবোধক গান ও স্বদেশী যাত্রাভিনয় করে বেড়াতেন। ফলে তিনি বরিশালে ইংরাজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। ১৯০৮ খ্রিঃ তাঁকে একবার গ্রেপ্তার করা হয়। পরে জামিনে মুক্ত হন।

মাতৃপূজা গীত সংকলনের 'ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেতইঁদুরে করল সারা' গানটির জন্য তাঁর জরিমানা হয়। তিনি বছর কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুকুন্দ দাস অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সংগীত ও যাত্রাপালা নিয়ে। তাঁর গানের মাধ্যমে তিনি জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

এই সূত্রে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষচন্দ্রেরও সংস্পর্শে এসেছিলেন। বাংলার জনগণই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে চারণকবি আখ্যা দিয়েছিল। গান করে তিনি সারাজীবনে ৭শত মেডেল ও বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন।

মুকুন্দ দাসের উল্লেখযোগ্য রচনা সাধন সঙ্গীত, পল্লীসেবা, ব্রহ্মচারিণী, পথ, সাথী, সমাজ, কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি।

১৯৩৪ খ্রিঃ ১৮ই এপ্রিল বাংলা মায়ের চারণ সন্তান মুকুন্দ দাস পরলোক গমন করেন।

অতুলপ্রসাদ সেন



বাংলা সংগীত ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম এবং দ্বিজেন্দ্রলাল-এর সঙ্গে যার নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় তিনি অতুলপ্রসাদ সেন। বাংলা গানে তিনি একটি বিশিষ্ট সঙ্গীত রীতির প্রবর্তন করেন, তা অতুলপ্রসাদী সুর নামে সুখ্যাত।

অধুনা বাংলাদেশের ঢাকায় ১৮৭১ খ্রিঃ ২০শে অক্টোবর অতুলপ্রসাদের জন্ম। তাঁর পিতার নাম রামপ্রসাদ সেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল ফরিদপুরের মগরায়।

বাল্যবয়সে পিতৃহীন হয়ে মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের স্নেহে যত্নে প্রতিপালিত হন। ভগবদভক্ত কালীনারায়ণ ভক্তিগীতি রচনা করে সুখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন সুকণ্ঠগায়ক। তাঁর সকল গুণই দৌহিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল এবং পরে সার্থকতা লাভ করেছিল।

অতুলপ্রসাদ ১৮৯০ খ্রিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কিছুকাল কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে বিলেত যান।

১৮৯৪ খ্রিঃ বিলেত থেকে ফিরে এসে প্রথমে কিছুকাল কলকাতায় ও পরে রংপুরে আইন ব্যবসায় শুরু করেন।

যৌবনে লক্ষ্ণৌবাসী হন এবং সেখানেই আইন ব্যবসায় আরম্ভ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কালক্রমে তিনি আইন ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন ও লক্ষ্ণৌ-এর শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আউদবার অ্যাসোসিয়েশন ও আউদবার কাউন্সিলের সভাপতি হয়েছিলেন।

পেশাগত সাফল্য লাভের সুযোগে অতুলপ্রসাদ লাক্ষ্ণৌ নগরের সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন এবং নানাভাবে সমাজের উপকার সাধন করেন। তাঁর গৃহই হয়ে উঠেছিল নগরীর সারস্বত মন্ডলীর মিলনকেন্দ্র।

উপার্জনের বেশিরভাগ অর্থই তিনি ব্যয় করতেন স্থানীয় জনসাধারণের সেবার কাজে। পরবর্তী কালে নিজের বইয়ের স্বত্ব ও বাসভবনটি, সমাজসেবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দান করেন। জীবিতকালেই তিনি এরূপ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন যে নগরবাসী তাঁর গুণ ও প্রতিভার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছিল তাঁর নামে তাঁর বাসস্থানের রাস্তাটির নাম করন করে। জীবিতকালে এরূপ সম্মান লাভ বিরল ঘটনা।

সঙ্গীতই ছিল অতুলপ্রসাদের প্রাণের আরাম। নিজের রচিত গানে নিজেই সুর যোজনা করতেন। বাংলার বাউল ও কীর্তনের সুরের সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুর ও ঢঙ মিশিয়ে তিনি নিজস্ব সঙ্গীতরীতির প্রবর্তন করেছিলেন। তা-ই সুপরিচিত অতুলপ্রসাদী সঙ্গীত-রীতি।

অতুলপ্রসাদের রচিত গানগুলিকে প্রধানতঃ তিনভাবে বিভক্ত করা যায়। তা হল স্বদেশী সঙ্গীত, ভক্তিগীতি ও প্রেমের গান। তাঁর স্বদেশী সঙ্গীতগুলি স্বদেশী আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। জাতীয় চেতনা জাগরণে তাঁর 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী, বল বল বল সবে শতবীণাবেণুরবে, আ-মরি বাঙলা ভাষা', প্রভৃতি গানগুলির অবদান অপরিসীম।

সারাজীবনে প্রায় দুশত গান রচনা করেন। তাঁর গানগুলি সংগৃহীত হয় 'কয়েকটি গান' ও 'গীতিগুঞ্জ' সংকলনে। সমস্ত গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন কাকলি নামের গ্রন্থমালায়।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন সংগঠকদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ ছিলেন অন্যতম প্রধান। সম্মেলনের মুখপত্র উত্তরা-র তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক। সম্মেলনের কানপুর ও গোরখপুর অধিবেশনে তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গেও তিনি এককালে যুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৩৪ খ্রিঃ ২৬শে আগষ্ট পরলোক গমন করেন।

বাংলা সঙ্গীত জগতের অন্যতম স্মরণীয় প্রতিভা অতুলপ্রসাদের অন্যতম সুবিখ্যাত দেশাত্মবোধক গানের কিয়দংশ—

হও ধরমেতে ধীর
হও করমেতে বীর
হও উন্নত শির, নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান
হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছেন ভগবান, হবে জয়।
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান,
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়।
জগজন মানিবে বিস্ময়।

শিবনাথ শাস্ত্রী



বিশিষ্ট সাহিত্য সাধক, সমাজসেবী ও রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে স্মরণীয় শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম হয়েছিল ১৮৪৭ খ্রিঃ ৩১ শে জানুয়ারী, চব্বিশ পরগনা জেলার মজিলপুরে। তাঁর পিতার নাম হরানন্দ ভট্টাচার্য।

প্রথমে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও পরে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৭২ খ্রিঃ সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করে শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন।

সময়টা ছিল উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ। সেই যুগের তরুণ সমাজ নতুন চেতনা ও নতুন আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একদিকে স্বদেশপ্রেম ও অন্যদিকে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ভাবধারা এই দুইয়ের সমন্বয়ে সনাতনপন্থী সমাজে প্রবল পরিবর্তনের ঢেউ জাগিয়ে তুলেছিল।

এই ভাব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে ব্রাহ্মধর্ম। কলেজে অধ্যয়নকালে শিবনাথও যুক্ত হলেন ব্রাহ্মসমাজ ও সামাজিক সংস্কারমূলক কাজে।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহের পক্ষে এই সময় তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন।

জন্মেছিলেন গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে। কিন্তু সেকালের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার ও আচার সর্বস্ব তথাকথিত ধর্মের প্রতি তিনি ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

অচিরেই (১৮৬৯ খ্রিঃ) ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে উপবীত ত্যাগ করেন এবং মূর্তিপূজার সঙ্গে চিরতরে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এর ফলে তাঁকে পিতার বিরাগভাজন হতে হয়েছিল।

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে যে সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তার প্রধান লক্ষ ছিল শিক্ষা, সুলভ সাহিত্য ও কারিগরী বিদ্যার প্রচার এবং মদ্যপান নিবারণ। শিবনাথ কেশবচন্দ্রের Indian Reforms Association-এ যোগ দেন এবং মদ না গরল নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

তিনি কেশবচন্দ্রের নারীমুক্তি আন্দোলনেরও একজন প্রধান সহযোগী ছিলেন। এই আন্দোলনের ফলেই পরবর্তী সময়ে (১৮৭২ খ্রিঃ) মেয়েদের ন্যূনতম বিবাহের বয়স চোদ্দ আইনসিদ্ধ হয়েছিল।

মহিলাদের উচ্চশিক্ষার প্রশ্নে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতভেদ ঘটলে তিনি কয়েকজন তরুণকে নিয়ে একটি বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করেন। সমিতির গঠনতন্ত্র রচিত হয়েছিল জাতীয়তা মূলক ও সমাজ সংস্কারমূলক শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিকল্পনাকে সামনে রেখে।

এই গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

গুপ্ত সমিতির প্রধান কর্মসূচী ছিল জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার, সরকারী চাকরি অস্বীকার, সারা ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতি এবং সাম্য প্রতিষ্ঠা, সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। ঘোড়ায় চড়া ও বন্দুক চালনা শিক্ষাও কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই সময় শিবনাথ যুগান্তর নামে একটি সামাজিক উপন্যাস প্রকাশ করেন। এই নামানুসারেই পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯০৭ খ্রিঃ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার নামকরণ হয়েছিল।

১৮৭৪ খ্রিঃ শিবনাথ প্রথমে ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। ১৮৭৬ খ্রিঃ এই কাজ ছেড়ে হেয়ার স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষকরূপে যোগ দেন।

কিন্তু সামাজিক সংস্কার মূলক কাজ ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অচিরেই সরকারি চাকুরিতে বিরাগ জন্মে। এছাড়া গুপ্তসমিতিব কাজে যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল তার জন্যও চাকরি ত্যাগ করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। ১৮৭৮ খ্রিঃ তিনি চাকরি ত্যাগ করেন।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধের পর শিবনাথের নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এই বছরই। তার মাধ্যমে তিনি সর্বশক্তি নিয়ে সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন।

শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে একযোগে ১৮৭৯ খ্রিঃ সিটি স্কুল স্থাপন করেন। এছাড়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করবার জন্য স্টুডেন্টস সোসাইটি নামে একটি গণতান্ত্রিক ছাত্র প্রতিষ্ঠান তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয়।

কিশোরদের জন্য ভারতে প্রথম মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ থেকে। এই পত্রিকার নাম ছিল সখা। এই পত্রিকা ১৮৮৩ খ্রিঃ শিবনাথের উৎসাহ ও উদ্যোগেই প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৮৮ খ্রিঃ শিবনাথ ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে ছয়মাসের জন্য বিলেত গিয়েছিলেন। ইংরাজ চরিত্রের জাত্যাভিমান, নিয়মানুবর্তিতা ও বিবিধ সদগুণ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

এই সকল গুণাবলীর প্রতি লক্ষ রেখে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাধনাশ্রমের কর্মপ্রণালী প্রস্তুত করেছিলেন।

সমাজসংস্কারক শিবনাথের প্রধান পরিচয় কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রূপে। তাঁর বিখ্যাত তথ্যমূলক গ্রন্থ আত্মচরিত এবং রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

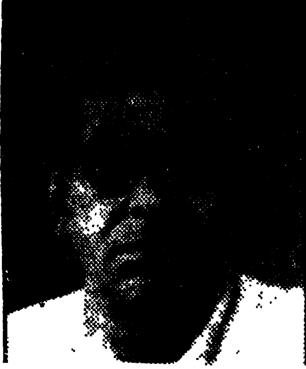
প্রবন্ধকার রূপে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ—হিমাদ্রিকুসুম, নির্বাসিতের বিলাপ, নয়নতারা, বিধবার ছেলে, ধর্মজীবন, রামমোহন রায়, History of Brahmo Samaj, Men I have seen প্রভৃতি।

শিবনাথ রচিত মেজবৌ উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ ইংলণ্ডের Indian National journal-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৯৫ খ্রিঃ প্রকাশিত মুকুল পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন।

১৯১৯ খ্রিঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর শিবনাথ শাস্ত্রী লোকান্তরিত হন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়



প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ভাষাতত্ত্ববিদ ও জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮৯০ খ্রিঃ ২৬শে নভেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

সুনীতিকুমারের জীবনেতিহাস প্রকৃতপক্ষে নতুন নতুন জ্ঞান অন্বেষণের এক ধারাবাহিক চমকপ্রদ ইতিহাস। তিনি ছিলেন যথার্থই জ্ঞানতাপস এবং তাঁর জ্ঞানানুসন্ধান আমৃত্যু অব্যাহত ছিল। ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা বিজ্ঞান ছাড়াও সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারকে ভাষাচার্য উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

শৈশবে অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল সুনীতিকুমারকে। ১৯০৭ খ্রিঃ মতিলাল শীল ফ্রী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ষষ্ঠস্থান অধিকার করেন। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন স্কটিশচার্চ কলেজের এফ. এ পরীক্ষায়। ১৯১১ খ্রিঃ ইংরাজি অনার্স সহ এম. এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

জ্ঞানানুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই কৃতিত্ব তাঁকে উত্তরোত্তর সাফল্য ও গৌরবের অধিকারী করে তোলে।

এম. এ পাস করার পর শুরু হয় কর্মজীবন। বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজি ভাষার অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। পরের বছরে যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে ১৯১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ইংরাজির অধ্যাপনা করেন স্নাতকোত্তর বিভাগে।

১৯১৮ খ্রিঃ সংস্কৃতের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুনীতিকুমার প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও জুবিলী গবেষণা পুরস্কার লাভ করেন। এই সালেই ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ইউরোপ যান।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা ও ১৯২১ খ্রিঃ ডি-লিট উপাধি লাভ করেন। বাংলা ভাষাতত্ত্ব ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। এখানেই তিনি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছে ধ্বনিতত্ত্ব, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি, ফরাসী সাহিত্য, পুরাতন আইরিশ, ইংলিশ ও গোথিক ভাষা বিষয়ে পড়াশোনা করেন।

সুনীতিকুমার এরপর ছাত্র হিসেবে যোগ দেন প্যারিসের সারবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে তিনি বিচিত্র বিষয়ে পাঠগ্রহণ ও গবেষণা করেন।

অধীত বিষয়ের বিচিত্রতাই প্রমাণ করে সুনীতিকুমারের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা। সেগুলো হল—ভারতীয় আর্যভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সগডিয়ান ও মোটানী ভাষা, গ্রীক

ও লাতিন ভাষার ইতিহাস প্রভৃতি। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত।

১৯২২ খ্রিঃ দেশে ফিরে এসে স্যার আশুতোষের আগ্রহে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের প্রথম প্রফেসর নিযুক্ত হন। এই পদ থেকে অবসর গ্রহণের পরে ১৯৫২ খ্রিঃ নিযুক্ত হন এমেরিটাস প্রফেসর।

ভাষাতাত্ত্বিক ও বহুভাষাবিদ সুনীতিকুমারের খ্যাতি ইতিমধ্যে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই খ্যাতি আরও বৃদ্ধি হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ODBL অর্থাৎ Origin and Development of the Bengali Language-এর দুই খণ্ড প্রকাশিত হবার পর। এরপর লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ। সেগুলো হল ইন্দো-আরিয়ান অ্যান্ড হিন্দী, কিরাত জনকৃতি, বেঙ্গলী ফোনেটিক রিডার প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ খ্রিঃ সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও ও শ্যাম দেশ পরিভ্রমণ করেন। সুনীতিকুমারও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে ভারতের সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁর এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিয়ে রচনা করেন দ্বীপময় ভারত।

ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন সম্মেলন ও সেমিনার উপলক্ষে কখনো বিদেশের আমন্ত্রণে কখনো ভারতের প্রতিনিধি হয়ে তিনি বহুবার ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ভাষণ দেন ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

হিন্দীভাষায় অবদানের জন্য এলাহাবাদের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন তাঁকে সাহিত্য বাচস্পতি উপাধি দান করেন।

এছাড়াও দেশ বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান লাভ করেন। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে অধ্যাপনা করেন।

সুনীতিকুমার ১৯৫০-৫১ খ্রিঃ ইউনেস্কো আয়োজিত ব্রেইল অক্ষর কমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৫২-৬৮ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে ১৯৬৩ খ্রিঃ পদ্মবিভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করেন। মানবিক তত্ত্বে গবেষণা ও কৃতিত্বের জন্য তিনি জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান লাভ করেন। ১৯৬৯ খ্রিঃ তিনি সাহিত্য একাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হন।

বাংলা সাহিত্যে সুনীতিকুমারের উল্লেখযোগ্য অবদান হল চন্ডীদাসের পদাবলীর প্রামাণ্য সংস্করণ সংকলন ও সম্পাদনা। বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণ সারস্বত মহলের সমাদর লাভ করে।

সারাজীবনে সুনীতিকুমার ৩০০টিরও বেশি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছেন।

১৯৬৬ খ্রিঃ ২৯শে মে এই বিশ্ববিশ্রুত ভাষাবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদের কর্মজীবনের অবসান ঘটে।

সুনির্মল বসু



যে কজন মুষ্টিমেয় সাহিত্য সাধক আজীবন বাংলা শিশুসাহিত্যের সেবায় ব্রতী ছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি সুনির্মল বসু অন্যতম। বাংলার শিশু-কিশোরদের মধ্যে একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ বিতরণের ব্রত নিয়ে আজীবন অশেষ ক্লেশ স্বীকার করেও কখনো পশ্চাদপদ হননি সুনির্মল। তাঁর রচিত অসংখ্য কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও জীবনী গ্রন্থ বাংলা শিশুসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে রয়েছে।

সুনির্মল বসুর আদিনিবাস ছিল ঢাকায়। পিতার নাম পশুপতি বসু। তাঁর পিতামহ গিরিশচন্দ্র বসু ছিলেন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। শিশুসাহিত্য রচনা করেও তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

সুনির্মলের মাতামহ বিপ্লবী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতাও ছিলেন সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক। এই দুই পরিবারের সাহিত্য প্রতিভা সুনির্মল লাভ করেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে।

পিতার কর্মস্থল বিহারের গিরিডিতে জন্মগ্রহণ করেন ১৯০২ খ্রিঃ ২০শে জুলাই।

সাঁওতাল পরগনার পাহাড়, নদী জঙ্গল সুনির্মলের শিশুমনকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করত। এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিত হয়ে তাঁর কবিপ্রতিভা বিকাশলাভ করেছিল।

বনজঙ্গলের বিচিত্র পাখির কূজন, ঝরনাধারার কুলুকুলু ধ্বনি কিশোর সুনির্মলের কবিতা রচনার প্রধান প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতির বুকের ছন্দময় বিচিত্র ধ্বনির মধ্যেই তাঁর বিচিত্র ছন্দ শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কবিতায় বিভিন্ন ছন্দের সার্থক প্রয়োগ তাঁকে যশস্বী করেছিল।

কিশোর বয়সে কবিতা রচনার সঙ্গে চিত্রাঙ্কনও শিক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আর্ট কলেজেও পাঠ নিয়েছিলেন।

১৯২০ খ্রিঃ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় আসেন। সেন্ট পলস কলেজে পড়ার সময়েই গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ফলে কলেজের পড়া অসমাপ্তই থেকে যায়।

শিশু-সাহিত্য রচনাকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সেযুগে কেবল সাহিত্যকে নির্ভর করে বিশেষ করে অবহেলিত শাখা শিশু-সাহিত্যের সেবা করে

বেঁচে থাকা ছিল দুঃসহ কৃচ্ছ্রতা ভোগের নামান্তর। বাংলার শিশু-কিশোরদের স্বার্থে সেই দুঃখময় জীবনই তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন।

সুনির্মল বসুর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায়। প্রথম প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থের নাম হাওয়ার দোলা। সারাজীবনে অসংখ্য সরস ছড়া, কবিতা, গল্প কাহিনী, উপন্যাস, রূপকথা, ভ্রমণকাহিনী, কৌতুকনাট্য প্রভৃতি রচনা করে শিশুসাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

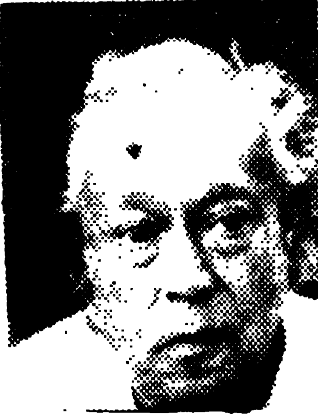
এছাড়া বহু শিশু গ্রন্থও সম্পাদনা করেছেন তিনি। তৎকালীন সময়ের একমাত্র কিশোর পাক্ষিক পত্রিকা কিশোর এশিয়ার তিনি পরিচালক ছিলেন। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে শিশুসাহিত্য রচনার জন্য ভুবনেশ্বরী পদক পান। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছানাবড়া, পাততাড়ি, মরণের ডাক, আনন্দ নাড়ু, কিপটে ঠাকুর্দা, ছন্দ শিক্ষার বই ছন্দের টুংটাং ও ছন্দের গোপন কথা, বীরশিকারী প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ ছোটদের চয়নিকা ও ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন।

জীবন খাতার কয়েক পাতা তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ।

১৯৫৭ খ্রিঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী কবি সুনির্মল বসু পরলোক গমন করেন।

শিবরাম চক্রবর্তী



শিশু সাহিত্যিক হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ হলেও অম্লমধুর টিকাটিপ্পনী এবং গুরুগম্ভীর রচনাতেও দক্ষ ছিলেন। কথার পিঠে কথা চাপিয়ে সরস পান (Pun) রচনার ধারা তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেছিলেন যা শিবরামী স্টাইল নামে পরিচিত।

সুসাহিত্যিক শিবরাম জন্মসূত্রে মালদহের চাঁচল রাজবাড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পৈতৃক নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদের জরুরবাকনা। কলকাতায় মাতুলালয়ে জন্ম ১৯০৩ খ্রিঃ ১৩ই ডিসেম্বর। পিতার নাম শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক মনোভাবের মানুষ। গৃহবন্ধন বেশিদিন সহ্য হত না বলে মাঝে মাঝেই নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পড়তেন। পিতার এই ভবঘুরে ঘরপালান স্বভাব শিবরামের মধ্যেও বর্তেছিল।

কিশোর বয়স কেটেছিল প্রথমে পাহাড়পুরে ও পরে চাঁচলে। সেই বয়সেই নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা

লাভ করেছিলেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পরে রচনা করেছিলেন বাড়ি থেকে পালিয়ে। কাহিনীটি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল।

স্কুলে থাকতেই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জেল খেটেছেন। ফলে প্রথাগত শিক্ষা বেশিদূর এগোয়নি। তবে পড়াশুনো করেছেন প্রচুর এবং বিভিন্ন বিষয়ে।

স্বদেশী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। বিজলী ও ফরোয়ার্ড পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাংবাদিকতা করেছেন। পরে যুগান্তর নামে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন কবি হিসেবে। প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম মানুষ। পরে বসুমতী, আনন্দবাজার, দেশ প্রভৃতি কাগজে নিয়মিত অম্লমধুর টিকাটিপ্পনীর ফিচার লিখে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন।

শিবরাম চকরবরতি নামে নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে লিখতেন। এরকম নজির বাংলা সাহিত্যে বিরল।

তাঁর 'পান' সমৃদ্ধ ছোটদের ও বড়দের জন্য সরস রচনা বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্মরণীয় সৃষ্টি কৌতুকচরিত্র হর্ষবর্ধন গোবর্ধন দুই ভাই ও বিনি।

হাসির ঘটনা হাসির কথা তাঁর লেখনীকে সমৃদ্ধ করেছিল। হাসির রাজা শিবরাম নামেই তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত হত।

মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের মেসবাড়ির একটি ঘরেই আজীবন কাটিয়েছেন। নিজেই বলতেন 'মুক্তারামের তক্তারামে শুক্তোরাম খেয়ে' আরামে আছেন। দিলখোলা, সদাহাস্যময় শিবরামকে কলকাতার পথেঘাটে প্রায়ই দেখা যেত শৌখিন ঝলমলে পাঞ্জাবী পরে ঘুরে বেড়াতে। ভক্তদের সঙ্গে দেখা হলেই পকেট থেকে বার করে চকোলেট খাওয়াতেন হাসিমুখে।

দীর্ঘ ৬০ বছরের জীবনে দু হাতে লিখেছেন। হাস্যরসাত্মক গল্প ও ফিচার রচনাকেই সাহিত্য রচনার প্রধান মাধ্যম করেছিলেন। ছোটদের বড়দের মিলিয়ে দেড়শতাধিক বই লিখেছেন তিনি। 'ষোড়শী' নামে শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত নাটক 'যখন তারা কথা বলবে'। রাজনীতির ওপরে রচিত মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী বিখ্যাত গ্রন্থ।

ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা শিবরামের আত্মজীবনীমূলক বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তাঁর সমসাময়িক সময়ের বহু চরিত্র ও ঘটনা অননুকরণীয় সরস ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন।

শেষ বয়সে আর্থিক অনটনে নাজেহাল হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৯৬৬ খ্রিঃ ২৮শে আগষ্ট মুক্তারামের তক্তারাম ছেড়ে লোকান্তরিত হন।

আশাপূর্ণা দেবী



বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতকীর্তি লেখকদের মধ্যে সম্ভবতঃ আশাপূর্ণা দেবীই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না। রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম হওয়ার জন্য স্কুল কলেজের বিধিবদ্ধ লেখাপড়ার সুযোগও তিনি পান নি। তিনি ছিলেন স্বসৃষ্টি এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক।

১৯০৯ খ্রিঃ ৮ই জানুয়ারী কলকাতায় জন্ম। তাঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলির বেগমপুরে। পিতার নাম হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। সম্ভবতঃ পিতার শিল্প প্রতিভাই আশাপূর্ণাকে সাহিত্যচর্চার প্রেরণা জুগিয়েছিল।

নিজের বাড়িতে পড়াশোনার যেটুকু সুযোগ পেয়েছিলেন তাতেই সহজাত সাহিত্যপ্রতিভা মুকুলিত হয়েছিল। ছোটদের লেখা দিয়েই হয়েছিল হাতেখড়ি এবং শিশু সাহিত্যের চর্চার মাধ্যমেই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেছিলেন। তেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়েছিল শিশুসাথী পত্রিকায়। তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী পনের বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুর ঘরের পরিবেশে স্বামীর ঐকান্তিক আগ্রহে ও উৎসাহে গৃহকর্মের অবসরে সাহিত্য চর্চার সুযোগ করে নেন।

গৃহবধূ এবং মা হিসেবে সংসারে তাঁর যে কর্মক্ষেত্র সাহিত্য রচনা কোনদিন সেখানে তাঁর কাজের বাঁধা হয়ে ওঠেনি। আশ্চর্য ছিল তাঁর প্রতিভা। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বিশেষ কোন পরিবেশ বা সময়ের প্রয়োজন হতো না। সংসারের কাজের অবসরেই তিনি সৃষ্টি করেছেন অনবদ্য সাহিত্য।

১৯৩৮ খ্রিঃ তাঁর বই প্রথম প্রকাশিত হয়। ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা বইটি সরস লেখনীর গুণে এবং ঘরোয়া পরিবেশের বাস্তব চিত্ররূপ অঙ্কনের জন্য ছোটদের মন জয় করেছিল।

এরপর থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অনিয়মিত রচনা প্রকাশ নিয়মিত হয়ে ওঠে। তাঁর লেখাও চলতে থাকে বিরামহীন গতিতে।

১৯৪৪ খ্রিঃ আশাপূর্ণার প্রথম উপন্যাস প্রেম ও প্রয়োজন প্রকাশিত হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীপুরুষের চাওয়া পাওয়া, মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রেম-বিরহ সেই সঙ্গে সমসাময়িক সামাজিক পটভূমি, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন—এই ছিল আশাপূর্ণার সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অন্তঃপুরে থেকেই মেয়েদের বহির্মুখী জীবন তিনি আশ্চর্য দক্ষতায় চিত্রায়িত করেছেন। আধুনিক সমাজের যথাযথ ভূমিকা নিয়েই তাঁর সাহিত্যে উপস্থিত হয়েছে। আধুনিক মেয়েদের কথা তিনি বলেছেন, তাঁদের চাহিদা ও ত্যাগের সব খবরই তিনি রাখতেন। তবু আধুনিকতার বিলাসিতা তাঁর সাহিত্যে কখনো প্রশ্রয় পায়নি। যা কিছু রুচিহীন, বিকৃত তার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে। তবে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা কখনো বিসর্জন দেননি।

গোটা নারীসমাজের আশাআকাঙ্ক্ষা দুঃখবেদনার কথা তিনি অকপটে সহজ সরল ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন।

পুরুষদের মনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতও তিনি যথাযথরূপে প্রকাশ করতে পেরেছেন। আশাপূর্ণার সাহিত্যসৃষ্টির সার্থকতা এখানেই।

অসংখ্য গল্প ও উপন্যাস সারা জীবনে তিনি লিখেছেন। কোন লেখা তাঁর অনাদৃত হয়নি। তাঁর লেখা বাঙালী মেয়েদের উজ্জীবিত করেছে।

আশাপূর্ণার সার্থক ট্রিলজি প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা। প্রথম প্রতিশ্রুতির জন্য ১৯৭১ খ্রিঃ তিনি দেশের সর্বোচ্চ জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

দীর্ঘ সত্তর বছরের জীবনে তিনি অকাতরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা দিয়েছেন। লেখার প্রার্থীদের তিনি কখনো বিমুখ করতেন না। সারাজীবনে রচনা করেছেন প্রায় দুশো উপন্যাস। ছোটগল্প সংকলন ও ছোটদের বই নিয়ে গ্রন্থ সংখ্যা সত্তরেরও বেশি।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁর ষাটটিরও বেশি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে।

সাহিত্যকৃতির জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট উপাধি পেয়েছেন।

১৯৭১ খ্রিঃ ১৩ই জুন এই অসামান্য লেখকের জীবনাবসান হয়।

সুকুমার সেন



বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরে সুকুমার সেনই ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনি বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক পদে ব্রতি হয়েছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের চর্চার পাশাপাশি গোয়েন্দা কাহিনীর জগতেও তাঁর আনাগোনা ছিল লক্ষণীয়।

১৯০০ খ্রিঃ ১৬ই জানুয়ারী সুকুমার সেন বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ।

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল থেকে ১৯১৭ খ্রিঃ ম্যাট্রিক ও বর্ধমান রাজকলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন। পরে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৯২১ খ্রিঃ প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি.এ. পাশ করেন।

১৯২৩ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষা তত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ পাশ করেন। পরের বছর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। গবেষক সুকুমার সেনের বিশেষ কৃতিত্ব হল বিভিন্ন প্রাচীন ভাষার ওপর গবেষণা করে তিনবার গ্রিফিস মেমোরিয়াল পুরস্কার ও দুবার স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক লাভ।

সুকুমার সেনের ইচ্ছা ছিল বিলেতের কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. করবেন। কিন্তু সুযোগ থাকলেও সুবিধা ছিল না। পারিবারিক অসুবিধা অন্তরায় হয়েছিল বলে তাঁর সেই সাধ পূর্ণ হয়নি।

তবে দেশে বসেই তিনি পি.এইচ.ডি. করেছিলেন। হিস্টোরিক্যাল সিনট্যাক্স অব ইন্দো-এরিয়ান বিষয়ে। তাঁর গবেষণাপত্রের পরীক্ষক ছিলেন তিনজন বিশেষজ্ঞ। তাঁদের দুজন ইংরাজ ও একজন ফরাসি।

সুকুমার সেন ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য ছাত্র। ১৯২৫ খ্রিঃ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের এম.এ. পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত হলে কর্মক্ষেত্রে তাঁর সহকারী হন।

তিনি দীর্ঘ ২৮ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. ক্লাশে ভাষাতত্ত্ব চালু হওয়ার পর তিনি অনারারি লেকচারার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

অবসর নেবার পর সুকুমার সেন ডেকান কলেজে ভিজিটিং প্রফেসর রূপে কাজ করেন দুবছর ১৯৬৬ খ্রিঃ - ৬৭ পর্যন্ত। ত্রিবান্দ্রমের ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব ড্রাভিডিয়ান লিঙ্গুইস্টিক সংস্থা তাঁকে ১৯৭১ খ্রিঃ একবছরের জন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন।

পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি দেশে ও বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তবে কখনোই দেশের বাইরে যাননি।

ভাষাবিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে,পালি প্রাকৃত অপভ্রংশ ও সংস্কৃতের চর্চার ক্ষেত্রে দেশে তো বটেই, বিদেশেও তাঁর মতামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হত। প্রাচীন পার্শি আবেস্তার ভাষা ও দক্ষিণ ইরানের সুপ্রাচীন রাজবংশের কথ্য ভাষাও সুকুমার সেনের নিজস্ব গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

প্রাচীন সাহিত্য থেকে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব উদ্ধারের ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য বিশ্বভারতী ডঃ সুকুমার সেনকে দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি লন্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটির স্বর্ণপদক লাভ করেন ১৯৭১ খ্রিঃ।

এই পদক প্রবর্তিত হয়েছিল ১৮৯৭ খ্রিঃ। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম তা লাভ করেন।

ডঃ সুকুমার সেন বাংলা হিন্দী ও ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও নগণ্য নয়। সর্বমোট গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। তাঁর আশ্চর্য সৃষ্টি কালিদাসের কাল ও চরিত্রকে অবলম্বন করে অভিনব গোয়েন্দা কাহিনী যিনি সকল কাজের কাজি, সত্যমিথ্যা কে করেছে ভাগ, কালিদাস তাঁর কালে প্রভৃতি।

তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারখণ্ডে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; এ হিস্ট্রি অব ব্রজবুলি লিটারেচার, সেকশুভদয়া, রামকথার প্রাক ইতিহাস, চৈতন্যচরিতামৃত, রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি বটতলার ছাপা ও ছবি প্রভৃতি।

১৯৭১ খ্রিঃ ৩রা মার্চ সুকুমার সেন লোকান্তরিত হন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একজায়গায় বলেছেন, 'সচেতনভাবে বাস্তববাদের আদর্শ গ্রহণ করে সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাহিত্য করিনি বটে—কিন্তু ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল।'

বাস্তবিক পক্ষে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মহারথী এই সাহিত্য সাধকের সমস্ত রচনার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে মধ্যবিত্ত কৃত্রিমতা ও ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ক্ষোভ ও অন্তর্দাহ।

বস্তুতঃ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীন সংগ্রাম, সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট সহজ সরল জীবনের বাস্তব প্রতিরূপ অঙ্কনের মধ্যেই তাঁর সাহিত্য লাভ করেছিল সার্থকতা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছিল সাঁওতাল পরগনার দুমকায় ১৯০৮ খ্রিঃ ২৯শে মে। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম নীরদাসুন্দরী। তাঁদের আদি নিবাস ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে।

সাহিত্যক্ষেত্রে মানিক পরিচিত হয়েছিলেন তাঁর ছেলেবেলার ডাক নামে। পিতৃদত্ত নাম ছিল প্রবোধকুমার।

মানিকের প্রথম গল্প অতসী মামী প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্রা পত্রিকায়। সেই সময় তিনি কলেজের ছাত্র। আত্মবিশ্বাসের অভাবে লেখক হিসেবে ডাকনামটি ব্যবহার করেছিলেন।

১৯২৮ খ্রিঃ অতসী মামী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসন নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ফলে তাঁর ডাকনামটিই স্থায়ী হয়ে যায়।

পিতা হরিহর ছিলেন সরকারী চাকুরে। নানা স্থানে তাঁকে বদলি হতে হয়েছে কর্মসূত্রে। ফলে বাংলা ও বিহার অঞ্চলে মানিকের বাল্যকাল কেটেছে। পিতার চাকরির সুবাদে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের ফলে শৈশবে মানিক নানান পরিবেশ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সময় থেকেই জীবনবোধ সম্বন্ধে তাঁর সজাগ চেতনা গড়ে উঠেছিল, যা পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যে বিস্তার লাভ করেছিল।

মেদিনীপুরে দিদির কাছে কিছুকাল থাকতে হয়েছিল মানিককে। মেদিনীপুর জিলাস্কুল থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ খ্রিঃ বাঁকুড়ার

ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে আই-এস-সি পাশ করে অঙ্কে অনার্স নিয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন।

এই সময়ই বিচিত্রা পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প অতসী মামী প্রকাশিত হয়। প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যজগতে সাড়া পড়ে।

মানিকের প্রথম উপন্যাস দিবারাত্রির কাব্য একুশ বছরের রচনা।

সাহিত্যক্ষেত্রের খ্যাতি মানিকের কলেজ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। তাঁর আর বি.এস.সি. পরীক্ষা দেওয়া হয় না। সাহিত্যকেই জীবিকার একমাত্র অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেন।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সেই সময়ে চলছে কল্লোল যুগ। মানিকও ভিড়ে গেলেন কল্লোল পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে। শুরু হলো নিরন্তর সাহিত্য সাধনা।

মানিকের প্রথম উপন্যাস জননী প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খ্রিঃ। তৎকালীন বিখ্যাত সাহিত্য সাময়িকী ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তিনটি উপন্যাস পুতুলনাচের ইতিকথা ও পদ্মানদীর মাঝি।

পূর্ববঙ্গের সাধারণ সমাজের কথা, তাদের জীবনের বিচিত্র আলেখ্য মরমী শিল্পীর মত তিনি চিত্রিত করেছেন। এ ছিল এক নতুন জীবন দর্শন, নতুন দিগন্তের উন্মোচন। ফলে অল্পসময়ের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। সাহিত্যে সূচনা হল এক নতুন যুগের।

নানা কারণে প্রচন্ড অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছিল মানিককে। খাঁটি লেখক হবার প্রেরণায় তিনি বড় চাকরির প্রলোভনও প্রত্যাখ্যান করেছেন। শেষ দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর জন্য সাহিত্যিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

সংগ্রামী-জীবনের সার্থক রূপকার মানিক মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যে এই প্রভাব অতি স্পষ্ট। বস্তুতঃ মার্কসবাদই তাঁকে মধ্যবিত্তসুলভ ভাবপ্রবণতার গণ্ডি থেকে উত্তরণের পথ নির্দেশ করেছিল। তিনি লাভ করেছিলেন প্রশস্ততর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি।

পঞ্চাশটিরও বেশি উপন্যাস, বহু গল্প ও কবিতা রচনা করেছেন মানিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা, অমৃতস্য পুত্রাঃ, সহরতলী, প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান প্রভৃতি।

মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে ১৯৫৬ খ্রিঃ ৩রা ডিসেম্বর, কঠিন রোগভোগের পর সংগ্রামী জনতার শ্রম ও স্বেদের রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

জীবনানন্দ দাশ



আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই যাঁর নামটি উচ্চারিত হয় তিনি হলেন চিত্র-রূপময় বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ।

জীবনানন্দ স্বীয় কবিমানসের আত্মকথন এভাবে করেছেন, 'আমার কাব্যপ্রেরণার উৎস নিরবধি কাল ও ধূসর প্রকৃতির চেতনার ভিতরে রয়েছে বলেই তো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সব সময়েই যে ধূসর তা নয়। মহাবিশ্ব-লোকের ইশারা থেকে উৎসারিত সময় চেতনা, Consciousness of time as a Universal, তা আমার কাব্যে একটি সঙ্গীতসাধক অপরিহার্য সত্যের মত।"

জীবনানন্দের হাতেই আধুনিক বাংলা কাব্যের বাক্‌ভঙ্গি ও রসরূপের দীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল। এক নতুন আদর্শ, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বলিষ্ঠ লোকচেতনা বোধে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধি দান করেছিল।

তাঁর কাব্য ছিল বর্ণনা বহুল, লোক থেকে লোকোত্তরের সন্ধান দিত, বর্ণময় চিত্রময়, যা প্রকৃত প্রেমকে ছাড়পত্র দিত বিশ্বমানস লোকে।

রবীন্দ্রপ্রভাবে লালিত হয়েও তিনি তাঁর কাব্য নির্মিতিতে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

১৮৯৯ খ্রিঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী বরিশালের এক ব্রাহ্মপরিবারে জীবনানন্দ দাশের জন্ম। পিতার নাম সত্যানন্দ দাশ। মাতা কুসুমকুমারী কবিতারচনা করে সেই যুগে কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।'

মায়ের সাহিত্য প্রতিভাই লাভ করেছিলেন জীবনানন্দ। তাঁর কাব্যপ্রতিভা বিকাশলাভ করেছিল মায়েরই প্রযত্নে ও উৎসাহে।

বাল্যবয়স থেকেই রূপময় প্রকৃতির প্রতি তাঁর কবিমন আকৃষ্ট হয়েছিল। ভোরের নির্মল আকাশ, শিশির ভেজা ঘাস, ধানের ক্ষেতে উদ্দাম হাওয়ার মাতন, নদীর চরের চিল-ডাকা বিষণ্ন দুপুর, জলে-ভাসা নৌকোর তন্ময় গলুই—সবকিছু, প্রকৃতির সব বর্ণ-বৈচিত্র্য জীবনানন্দের কাছে এক অজানা সুদূরের হাতছানি হয়ে ধরা দিত।

এক অকারণ বিষণ্নতায় ভরে উঠত তাঁর মন। রূপ থেকে অরূপের সন্ধানে বিচরণ শীল সেই মন স্কুলের খাতায় কবিতা রচনা করে লাভ করত মুক্তি। একাকী নিজের ভাবনায় ডুবে থাকতেই যেন তিনি ভালবাসতেন।

পরবর্তীকালে জীবনানন্দ তাঁর নিজের কবিতার উৎস-পরিচিতি দিতে গিয়ে যে কথা বলেছেন, তাতেই তাঁর শৈশব ও কৈশোরের পরিবেশ, কবিমানসের বিচরণক্ষেত্র স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

শিক্ষারম্ভ হয়েছিল স্থানীয় ব্রজমোহন স্কুলে। পরে ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ. পাস করে কলকাতায় আসেন। ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। ১৯২১ খ্রিঃ এম.এ. পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের চাকরি গ্রহণ করেন।

১৯২৮ খ্রিঃ পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার বহু বিতর্কিত কবিতা ক্যাম্পে। অশ্লীলতার অভিযোগ উত্থাপিত হয় কবির বিরুদ্ধে। সেই সূত্রে অধ্যাপনার চাকরি খোয়াতে হয়।

এরপর বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। সর্বশেষ ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৯৪৭ খ্রিঃ দেশবিভাগ হলে কলকাতায় চলে আসেন।

কলকাতায় স্বরাজ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কিছুদিন কাজ করেন। পরে ১৯৫১ খ্রিঃ থেকে খড়গপুর কলেজে অধ্যাপনা করে ১৯৫৩ খ্রিঃ হাওড়া গার্লস কলেজে যোগদান করেন। সেই বছরই কাব্যরচনার জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন। পরের বছরেই ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ২২শে অক্টোবর মারা যান।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালক। পরে একে একে প্রকাশিত হয় ধূসর পাণ্ডুলিপি, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা প্রভৃতি। তাঁর রচিত বনলতা সেন আধুনিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ।

জীবনানন্দের কাব্যের ইতিহাস চেতনা, নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা এবং অবশ্যই বিপন্ন মানবতার ব্যথা তার স্বকীয় বিশিষ্টতা নিয়ে স্থান লাভ করেছিল।

জীবনানন্দের প্রবন্ধ গ্রন্থ কবিতার কথা, জীবনানন্দ দাশের গল্প উপন্যাস মাল্যবান ও সতীর্থ তাঁর সাহিত্যধারার উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য



সংগ্রামী এক যুব-মানস রূপেই আকস্মিকভাবে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব হয়েছিল কিশোর কবি সুকান্তের। আবার অকালে তাঁর বিদায়ও ছিল এক আকস্মিক ঘটনা।

বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ, বিধ্বংসী মহাযুদ্ধের হাহাকার—এমনি এক বিপর্যস্ত পরিবেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল সুকান্তের কবি-মানস। প্রখর সমাজনিষ্ঠার সঙ্গে স্বদেশ ও ইতিহাসচেতনায় সাম্যবাদ, মানবপ্রেম ছিল তাঁর কাব্যের উপজীব্য'

স্বদেশ ও সমাজের দুঃখদুর্দশা, শোষণ, লাঞ্ছনা, তাঁর মধ্যে এক আপোসহীন সংগ্রামী মনোভাবের জন্ম দিয়েছিল। তথাকথিত কবিসুলভ আত্মকেন্দ্রিক রোম্যান্টিক কল্পনা বিলাস তাঁর কাব্যে কোথাও প্রশ্রয় পায়নি। একারণেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন জনজীবনের একান্ত আপনার সংগ্রামী কবি।

কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলে ১৯২৫ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট জন্ম হয় কবি সুকান্তের। তাঁদের পৈতৃক নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায়। তাঁর পূর্বপুরুষরা ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় এসে বেলেঘাটা অঞ্চলে বসবাস করেন। যজন-যাজন ছিল পারিবারিক বৃত্তি।

সুকান্তর পিতার নাম নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, মাতা সুনীতি দেবী। তিনি ছিলেন পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান।

বিদ্যাশিক্ষার শুরু হয়েছিল স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় কমলা বিদ্যামন্দিরে। বাল্যবয়সেই ছড়া কবিতা লিখতেন। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময়ে স্কুলের হাতেলেখা পত্রিকায় ছড়া ও গল্প লিখে কবি খ্যাতি লাভ করেন।

ছাপা অক্ষরে তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'বিবেকানন্দের জীবনী', প্রকাশিত হয়েছিল শিখা পত্রিকায়।

সুকান্তর পারিবারিক পরিবেশ তাঁর মানসিক বিকাশের অনুকূল ছিল না। দারিদ্য ছিল পরিবারের নিত্য সহচর। আবাল্য অভাব অনটনের মধ্যেই কাটাতে হয়েছে তাঁকে।

এই পারিপার্শ্বিকতায় থেকেই সুকান্তর অদম্য কবি প্রতিভা তাঁর কাব্যের উপাদান সঞ্চয় করেছে। সাধারণ দুঃখক্লিষ্ট জীবনকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার ও উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই ভাবীকালে সমাজবাদ ও সাম্যবাদের

একনিষ্ঠসৈনিক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তিনি। দুঃসময়ে, দুর্দিনেও তিনি বিশ্বাসের ভূমিচ্যুত হননি।

১৯৪১ খ্রিঃ রবীন্দ্রপ্রয়াণ উপলক্ষে সুকান্ত রেডিওতে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। গল্পদাদুর আসরে তিনি আবৃত্তিও করতেন।

স্কুলে থাকতেই সুকান্ত ১৯৪১-৪২ খ্রিঃ মার্কসবাদী চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করেছেন অক্লান্তভাবে।

১৯৪৫ খ্রিঃ সুকান্ত বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। পরের বছর থেকেই তাঁর শরীরে ক্ষয় রোগ ধরা পড়ে। মাঝেমাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকেন। অক্ষম দেহ নিয়েও অক্লান্তভাবে তিনি লিখে গেছেন।

অধুনালুপ্ত স্বাধীনতা পত্রিকার কিশোরসভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন সুকান্ত। তাঁর উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিশোর বাহিনী নামে কিশোর সংগঠনও গঠিত হয়েছিল।

১৯৪৭ খ্রিঃ ১৩ই মে রোগভোগে সংগ্রামী কিশোর কবির মৃত্যু হয়। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল একুশ বছর।

ছাড়পত্র, ঘুমনেই, পূর্বাভাস সুকান্তর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। অন্যান্য রচনা মিঠেকড়া, অভিযান, হরতাল প্রভৃতি।

হোমার



আমাদের দেশে বাল্মীকি ব্যাসদেব যেমন প্রাচীন কবি বলে স্বীকৃত তেমনি হোমারকেও বলা হয় ইউরোপের প্রাচীন ও আদি কবি। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুটি মহাকাব্য ইলিয়ড এবং ওডিসি তাঁর রচনা।

হোমার জন্মেছিলেন গ্রীসে। তাঁর জন্মস্থান বা জন্মকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। অনেকে এখনও বলে থাকেন যে হোমার নামে কোন কবি ছিলেন না। কিন্তু এই মত পন্ডিত-গবেষক মহলে গৃহীত হয়নি।

অনুমান করা হয়, হোমার খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর জন্মস্থান বিষয়ে মতভেদ দূর হয়নি। গ্রীসের বিভিন্ন শহর হোমারের জন্মস্থান বলে দাবি করে থাকে।

জন্মসাল বা জন্মস্থান বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও যতদূর জানা যায়, তাঁর মায়ের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। হোমারের মায়ের নাম ছিল মিলানোপাসা। পিতৃপরিচয় বিষয়ে কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

প্রাচীন গ্রীসের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অল্পবয়সেই হোমারকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে বাস করতে হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, ফিলিয়াস নামে কোন এক শিক্ষকের পোষ্যপুত্ররূপে তিনি লালিত পালিত হন।

গুরুগৃহে শিক্ষালাভের পর হোমার শিক্ষকতাকে জীবিকারূপে গ্রহণ করেন।

সেই সময় গ্রীসে লোকের মুখে মুখে ফিরত ট্রয়যুদ্ধের বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী। চারণগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই সব কাহিনী লোকজনকে গান গেয়ে বা আবৃত্তি করে শোনাত।

হোমার এই প্রচলিত উপাখ্যানগুলির লিখিতরূপ দেন। এই হলো মহাকাব্য ইলিয়ড রচনার গোড়ার কথা।

আমাদের দেশের রামায়ণ সম্পর্কেও এমনি মতবাদ প্রচলিত। লোকের মুখে মুখে রামচরিত্রের বিভিন্ন ঘটনা আবৃত্তি হত। বাল্মীকি সেগুলোকে লিখিত রূপ দেন।

যাইহোক, বিয়োগান্তক মহাকাব্য ইলিয়ডের মূল কাহিনী এরকমঃ

ট্রয়ের রাজা ছিলেন প্রায়াম। তাঁর পুত্র প্যারিস একবার পার্শ্ববর্তী রাজ্য স্পার্টায় যান। সেখানে তিনি রাজা মেনিলিউসের স্ত্রী সুন্দরী হেলেনকে দেখে মুগ্ধ হন ও পরে অপহরণ করে ট্রয়ে নিয়ে আসেন।

এই ঘটনার পর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে এবং হেলেনকে উদ্ধার করবার জন্য গ্রীকরা তৎপর হয়।

আর্গসের রাজা মেনিলিয়াসের ভাই অ্যাগামেমননের গ্রীকবাহিনী ট্রয় আক্রমণ করে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে ট্রোজান ও গ্রীকবাহিনীর যুদ্ধ চলে। গ্রীকরা ট্রয় অবরোধ করে রাখে।

সবশেষে গ্রীকবীর এফিলিস মহাবীর হেক্টরকে বধ করেন। কাহিনীতে দেখা যায় দেবতারাও দুপক্ষে অংশ গ্রহণ করেছেন।

ইথাকার রাজা ওডিসিউস, যিনি ইউলিসিস নামেও পরিচিত, ট্রয়যুদ্ধের পরে সদলবলে দেশে রওনা হন। তাঁর প্রত্যাবর্তন পথের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত হয় ওডিসি মহাকাব্যের কাহিনী।

দুটি মহাকাব্যেই চব্বিশটি করে সর্গ বা অধ্যায় আছে।

পন্ডিতদের মধ্যে মহাকাব্য দুটি নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে দুজন ভিন্ন ব্যক্তি কাব্য দুটি রচনা করেন।

তবে আধুনিক কালে স্বীকৃত হয়েছে যে মহাকাব্য দুটি একই ব্যক্তির রচনা। সেই ব্যক্তি হলেন মহাকবি হোমার।

জানা যায় যে হোমার মধ্যবয়সে দৃষ্টিক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে পুনরায় দৃষ্টিক্ষমতা ফিরে পান।

এই মতও প্রচলিত যে হোমার ছিলেন জন্মান্ধ। মুখে মুখে তিনি মহাকাব্য দুটি রচনা করেছিলেন। জীবনী সম্পর্কে উক্তি প্রত্যুক্তি যাই থাক না কেন মহাকাব্য দুটির

বিষয়বস্তু ও চরিত্র বর্ণনায় আনন্দানুভূতি ও সৌন্দর্যের যে প্রকাশ ঘটিয়েছেন হোমার তার জন্যই তিনি চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন।

হোমার তাঁর মহাকাব্যে গ্রীকবীরদের হাতে ট্রয় নগর ধ্বংস হওয়ার কথা লেখেন। আধুনিক কালে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের উৎখননের ফলে বিধ্বস্ত ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে । এই ধ্বংসাবশেষ মহাকাব্য কাহিনীর সত্যতা বা বাস্তবতা নির্ণয় করে।

গল্পের রাজা ঈশপ



গ্রীসদেশের বিখ্যাত গল্প-কথক ঈশপ চিরকালের গল্পের রাজা। অথচ তিনি কখনো কলম ধরে একটিও গল্প লেখেননি— অন্য সব লেখকরা যা করেন। কাজের ফাঁকে পথ চলতে চলতে ক্লান্তি দূর করবার উদ্দেশ্যে তিনি মন থেকে তৈরি করে অবলীলায় গল্প বলে যেতেন।

তাঁর নীতিমূলক গল্পগুলো বুদ্ধিদীপ্ত ঘটনায় ভরা। তিনি জীবজন্তুর মুখে মানুষের মুখের ভাষা ফুটিয়েছেন। তাদের দিয়ে মানুষের দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন।

মানুষের নীতিবোধ জাগরিত হয়, ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য অকর্তব্য মানুষ বিবেচনা করতে পারে, তার উপযুক্ত পথ ঈশপ নির্দেশ করেছেন তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তবুও আজও পৃথিবীর দেশে দেশে বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে ঈশপের এইসব মজাদার গল্পের সমাদর অম্লান। বর্তমান বিশ্বে নীতিকথামূলক গল্পের প্রধান ধারাটি ঈশপের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

দীর্ঘদিন ধরে মানুষের মুখে মুখে ঈশপের গল্পগুলো দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। এভাবে বিভিন্ন দেশের লোককথায় পড়েছে তাঁর প্রভাব। কখনো বা একাত্ম হয়ে মিশে গেছে তাঁর গল্প।

কালে কালে তাঁর নামে প্রচারিত হয়েছে এমন অনেক গল্প আদৌ যা কোনও দিন তিনি বলেননি।

অফুরন্ত গল্পের ভান্ডারী ঈশপের জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রাচীন গ্রীসে প্রথম ইউসিবিয়াসের বর্ণনায় তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঈশপ ছিলেন গ্রীসদেশের ফ্রিজিয়া নগরের অধিবাসী। খ্রিষ্টের জন্মের ৬২০ থেকে ৫৬৪ অব্দ পর্যন্ত তিনি বর্তমান ছিলেন। গ্রীসের ডেলফি রাজ্যে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৪ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঈশপ শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ ইথিওপ থেকে। এর অর্থ করলে দাঁড়ায় ঘোর কালো, কদাকার ইত্যাদি।

ঈশপের চেহারার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় তাঁর গায়ের রঙ ছিল কৃষ্ণ বর্ণ। নাকটা ছিল যারপরনাই থ্যাবড়া। পিঠে ছিল দৃশ্যমান কুঁজ।

পা-গুলোও এমন ছিল যে তিনি নাকি সটান সোজা হয়ে চলতে পারতেন না। এদিক থেকে বলা যায় ঈশপ ছিলেন সার্থকনামা।

গ্রীকদেশের স্যামস দ্বীপের রাজা জেনথাসের রাজপ্রাসাদের ক্রীতদাস রূপে ঈশপের জীবন শুরু হয়েছিল। পরে অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার গুণে দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে স্যামস দ্বীপেরই এক ধনাঢ্য বণিক ইশাদমানের অধীনে কাজ নেন।

কিছুদিন পরে ঈশপ ভাগ্যের সন্ধানে স্যামস ত্যাগ করে লিডিয়া রাজ্যের রাজা ক্রোসাসের দরবারে এসে উপস্থিত হন।

স্বভাবসুলভ বুদ্ধিমত্তা কৌতুকপ্রিয়তা এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে কিছুদিনের মধ্যেই রাজা ক্রোসাসের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। এখানে তিনি রাজবার্তা বহনের দায়িত্ব লাভ করেন।

ক্রোসাসের বিশ্বস্ত দূত হয়ে দেশ ও বিদেশের নানা প্রান্তে পরিভ্রমণের সুযোগ ঘটল তাঁর। ঈশপ যেখানেই যেতেন সঙ্গে নিয়ে যেতেন তাঁর অফুরন্ত গল্পের ভান্ডার। তাঁর গল্প ও গল্পের নীতিকথা মানুষকে মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করত।

কর্মসূত্রে একবার ডেলাফি রাজ্যে যেতে হয় তাঁকে। সেকালে ভবিষ্যদ্বক্তা পুরোহিত ও সাধুসন্তদের জন্য ডেলফির প্রসিদ্ধি ছিল। সেই সুবাদে যথেষ্ট জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির বাস ছিল সেখানে।

ঈশপ কিছুদিন এই সব ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করে হতাশ হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, শুষ্ক জ্ঞানচর্চা করে মানুষগুলো বিবেক ও নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। আকাশচুম্বী এদের লোভ আর অহংকার।

দেশের সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাস ও ভক্তি ভাঙ্গিয়ে এরা অফুরন্ত বিত্ত-সম্পদের অধিকারী হচ্ছে।

সৎচিন্তা ও জ্ঞান সাধনার এই পরিণতি ঈশপকে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ করে তুলল। তিনি জনসাধারণকে অবিলম্বে এদের সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত মানুষ তাঁর হিতকথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারল না। একদিন ক্রুদ্ধ জনতার হাতে নির্মমভাবে তিনি নিহত হন।

কিছুদিন পরেই অবশ্য ডেলাফিবাসীরা তাদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হল। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে তাঁরা নির্মাণ করল এক সুদৃশ্য পিরামিড।

ঈশপের নীতিকথার গল্পগুলো দীর্ঘদিন মানুষের মুখে মুখেই ফিরেছে। তাঁর মৃত্যুর প্রায় তিনশত বৎসর পরে ডিমিস্ট্রিয়াম ফেলিরিয়াম নামে জনৈক অ্যাথেন্সবাসী গল্পগুলো সংগ্রহ করে একত্র গ্রথিত করেন। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ব্যাব্রিয়াস কতগুলি গল্প পদ্যে রূপ দেন। খ্রিষ্টীয় নবম শতকে ল্যাটিন ভাষায় গল্পগুলো অনুবাদ করেন ফদেরাস।

এরপর প্রায় দীর্ঘ পাঁচশ বছর মানুষ এই সংকলনগুলোর কথা ভুলে ছিল। সহসা অ্যাথোস পর্বতের এক মন্দিরে একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় এবং তারপর থেকেই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বই আকারে ঈশপের গল্প পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ব্রিটেনে ঈশপের গল্প প্রথম অনুবাদ করেন ক্যাকসাস ১৪২৪ খ্রিঃ। ১৬২২ খ্রিঃ ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন লা ফঁতেন।

বাংলা ভাষায় ১৮৫৬ খ্রিঃ কথামালা নামে প্রথম প্রকাশ করেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

পঞ্চতন্ত্র-এর অনেক গল্পের সঙ্গে ঈশপের গল্পের সাদৃশ্য লক্ষ করবার মত। হিতোপদেশ ও জাতক-কাহিনীতেও এরকম কিছু গল্প আছে।

দান্তে আলিঘিয়েরি



দান্তে পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম। বাইবেল এবং শেক্সপীয়রের রচনাবলী ছাড়া পৃথিবীর অপর কোন সাহিত্য দান্তে রচিত অমর মহাকাব্য Divina Commedia-এর মত ব্যাপক প্রচার লাভ করেনি।

সম্ভবতঃ ১২৬৫ খ্রিঃ ইতালির ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সেইযুগে ইতালি ছিল রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। এক স্টেটের সঙ্গে আরেক স্টেটের দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। সকলের ওপর রাজার সঙ্গে পোপের দ্বন্দ্ব মাঝে মাঝেই ভয়ানক রূপ নিত।

সেই সময়ে ভেনিস হয়ে উঠেছিল সম্পদে ও শক্তিতে প্রবল প্রতাপশালী। ভেনিসের সম্পদের গরিমা কিংবদন্তির রূপ লাভ করেছিল। ভেনিসের একমাত্র

প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফ্লোরেন্স। এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছিল সম্পদে, শক্তিতে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে সমান রকম।

দান্তের জন্মস্থান ফ্লোরেন্স থেকেই ইউরোপের নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল। আর সেই রেনেসাঁর অন্যতম অগ্রবর্তী সেনানী ছিলেন দান্তে।

পিতা ছিলেন ফ্লোরেন্সের একজন অভিজাত আইনজীবী। পুত্রকে পরিবারের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী করে গড়ে তুলতে তাঁর যত্নের ত্রুটি ছিল না। দান্তে ক্রমেই শিক্ষায় আচারে, আচরণে পরিশীলিত হয়ে উঠতে লাগলেন।

দান্তে জন্মগতভাবে পেয়েছিলেন অন্তহীন জিজ্ঞাসা আর সীমাহীন কৌতূহল। সবকিছুর প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করতেন তিনি। জানতে চেষ্টা করতেন অন্তর্গূঢ় রহস্য।

অনন্ত রহস্যের আধার প্রকৃতির অপার ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। মনেপ্রাণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী।

পিতার সতর্ক ও সযত্ন প্রহরায় মধ্যযুগীয় অশিষ্টতার প্রভাব থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন দান্তে। গৃহেই তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়েছিল ব্রুনেতো লাতিনি নামের এক শিক্ষকের কাছে।

ব্রুনেতো ব্যক্তিগত জীবনে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের মানুষ হলেও তার মধ্যে ছিল নিটোল এক বিজ্ঞান ও সুস্থ সাংস্কৃতিক সত্তা। দান্তে তাঁর সাহচর্যে বাল্যবয়স থেকেই নবজাগরণের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। ব্রুনেতোই কিশোর দান্তের সৌন্দর্যানুরাগী কবিমনকে কল্পনাপ্রবণ ও পরিশীলিত করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন।

মাত্র নয় বছর বয়সেই দান্তে বিয়াত্রিচ নামের আটবছরের এক বালিকাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসেন। দুজনের বয়স নিয়ে নানামহলে মত পার্থক্য আছে। তবে এটা জানা যায় যে কবি এই কিশোরী প্রেমিকাকে লোকলজ্জার ভয়ে কখনোই তাঁর অন্তরের কথা জানাতে পারেননি।

এই প্রেমের কথা চিরকালই তাঁর অন্তরে গোপন ছিল। দুজনের মিলন কখনোই সম্ভব হয়নি।

মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে বিয়াত্রিচের মৃত্যু হলে কবি গভীর শোকে অভিভূত হন। এই শোকই তাঁর কবি জীবনের মূলে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা যোগায়। প্রেমিকা বিয়াত্রিচের নামকে কবি অমর করে গিয়েছেন তাঁর The Divine Comedy আর Vita Noeva তে।

ভগ্নহৃদয় কবি অবশ্য যৌবনে বিয়ে করেছিলেন জেম্মা কারসো দোনাতি নামের এক রূপসী তরুণীকে। দুই পুত্র ও দুই কন্যার জনক হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। পরবর্তিকালে কারসো দোনাতি তাঁর শত্রু হয়ে উঠেছিলেন।

চরম অসহিষ্ণুতার যুগে চিরসহিষ্ণু কবি অবশ্য কখনোই সরাসরি স্ত্রীর নিন্দা করেননি। তবে ইনফারনো গ্রন্থের একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন নিজের স্ত্রীর আদলে। সেই নারী ছিল হিংস্র মেজাজের।

নগর রাষ্ট্রের একজন প্রধান নাগরিক রূপে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন দান্তে। এবং অনিবার্য ভাবেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

ফ্লোরেন্স শহরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল দেশের দুটি সংস্থার ওপর। দান্তে তাদের একটি সংস্থার সদস্য ছিলেন। পরে নিজের কর্মদক্ষতায় সংস্থার অধ্যক্ষতা লাভ করেছিলেন।

দুটি রাজনৈতিক দলেরই প্রাধান্য ছিল ফ্লোরেন্সে। একটি হল পোপের পক্ষভুক্ত Guelfs এবং অপরটি সম্রাটের পক্ষভুক্ত গিবেল্লিনেস (Ghibellines)। এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বের ফলে ইতালি খন্ড খন্ড হয়ে পড়েছিল।

এই সময়ে অষ্টম পোপ বনিফেস একশ নাইটকে এমন কিছু নাগরিককে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাঁরা ছিলেন তার ব্যক্তিগত শত্রু। দান্তে এই নির্দেশকে অযৌক্তিক মনে করে তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর বিরুদ্ধাচরণের ফলে ফ্লোরেন্সে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় আরনো নদীর জল রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল।

এই দাঙ্গায় চরমপন্থী Black Guelf দলের জয় সূচিত হলে তারা বিরোধী White Guelf দলের নেতাদের নির্বাসনে পাঠাতে আরম্ভ করল। দান্তের বিরুদ্ধেও মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে জীবন্ত দগ্ধ করবার আদেশ দেওয়া হল।

বাধ্য হয়ে মাত্র উনিশ বছর বয়সে ১৩০২ খ্রিঃ দান্তেকে অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে দেশান্তরে চলে যেতে হয়েছিল। ১৩২০ খ্রিঃ পর্যন্ত তাঁকে দেশের বাইরে নির্বাসন জীবন কাটাতে হয়েছিল।

এই সময়ে দান্তে লেম্বার্ডি, তাস কানি ও রোগনায় হিতৈষীদের আশ্রয়ে কাটিয়েছেন। শোনা যায় তিনি প্যারিসেও এসেছিলেন।

ভেরোনায় কবি অবস্থান করেছিলেন লর্ডের পুত্র কান গাঁদ্রে দ্য লা স্কালা-এর আশ্রয়ে। সেখান থেকে তিনি চলে গিয়েছিলেন রাভেন্না।

রাভেন্নার শাসক তাঁকে দূতের দায়িত্ব দিয়ে ভেনিসে পাঠিয়েছিলেন। দৌত্য ব্যর্থ হওয়ায় তিনি রাভেন্নাতেই ফিরে গিয়েছিলেন। এখানেই কবি মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে ১৩২১ খ্রিঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এখানকার সেন্টফ্রান্সিস গীর্জায় তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়।

প্রেমিক, রাজনীতিক ও মানবতাবাদী কবি দান্তে লাতিন ভাষায় কাব্যতত্ত্ব, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ ও অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন।

নির্বাসন জীবনে থাকাকালীন সময়েই তিনি তাঁর প্রেরণাদাত্রী বিয়াত্রিচের স্মরণে রচনা করেন দিভিনা কম্মেদিয়া (Divina Commedia) গ্রন্থটি। নরক (Inferno), শোধনভূমি (Purgatoris) এবং স্বর্গ (Paradise) নামক তিনটি খন্ডে এবং শত সর্গে বিভক্ত এই কাব্যে কবি মানুষের মনকে পর্যায়ক্রমে নরক, শোধনভূমি ও স্বর্গের ভেতর দিয়ে নিয়ে গেছেন।

পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত তাঁর এই কাব্য-যাত্রায় নায়িকা হচ্ছেন বিয়াত্রিচ। বিয়াত্রিচই তাঁকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সর্বশেষে স্বর্গের দ্বারপ্রান্তে এসে তিনি ফিরে দেখেন, তাঁর পথের সাথী সেই আলোক-প্রতিমা বিয়াত্রিচ আর নেই। কবির অন্তরাত্মা আকুল হয়ে কেঁদে উঠল—বিয়াত্রিচ তুমি কোথায়?

পাশ থেকে একজন উত্তর দিল, দূরে, স্বর্গকে ছাড়িয়ে বহুদূরে নতুন এক আলোকলোকে বিয়াত্রিচ তোমারই পথ চেয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে। সে সেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাস করছে।

কবি নতজানু হয়ে প্রার্থনায় বসেন। এখানেই এই রোমান্টিক মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি।

পাশ্চাত্য জগতের ধ্রুপদী সাহিত্য ও খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যধারার মিশ্রণে কবি এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

দান্তের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই তিনি ইতালির শ্রেষ্ঠ মানবরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর রচনা ছিল আধুনিক ও প্রাচীন যুগের মধ্যে সেতুবন্ধন।

মৃত্যুর কিছুকাল আগে দান্তে রচনা করেছিলেন দ্য মনার্কিয়া, যে গ্রন্থ সমগ্র ইতালি জুড়ে তুলেছিল বিতর্কের ঝড়। এই গ্রন্থে গির্জাধ্যক্ষদের ক্ষমতা হ্রাসের স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই লেখা তাদের কোপে পড়ল। পোপকে বাধ্য হয়ে তার বিধান ঘোষণা করে বলতে হয়েছিল গির্জাই পার্থিব ও আধ্যাত্ম বিষয়ের অধিকর্তা।

পোপের নির্দেশে দ্য মনার্ক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। প্রকাশ্যে গ্রন্থটি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

গির্জার অধ্যক্ষদের রোষের এখানেই নিবৃত্তি হয়নি। তারা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন কবর খুঁড়ে দান্তের কঙ্কাল তুলে এনে পুড়িয়ে ফেলা হবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তারা তা করতে পারেননি।

রাভেন্নার জনপ্রতিনিধিরা বাধা দিয়ে কবির প্রতি চরম অপমান রোধ করেছিলেন। রাভেন্নার গির্জাধ্যক্ষরা দান্তের কঙ্কালটি গির্জার ভেতরে গোপন করে ফেলেছিলেন।

১৮৮৫ খ্রিঃ দান্তের কঙ্কালটি উদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু চোয়াল অংশ পাওয়া যায়নি। এই কঙ্কাল একটি অলঙ্কৃত কফিনে রেখে মূল সমাধিক্ষেত্রে পুঃনস্থাপিত করা হয়েছিল।

জন মিলটন



ইংরাজি ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য Paradise Lost-এর রচয়িতা এবং বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক জন মিলটনের জন্ম ১৬০৮ খ্রিঃ ৯ই ডিসেম্বর লন্ডনে।

মিলটনের পিতা ছিলেন সংগীতানুরাগী। তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় থেকে গীতে ও গানে লালিত হয়ে তাঁর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কবিতার প্রতি অনুরাগ জন্ম নেয়। স্কুলে পড়বার সময় থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন।

পিতা পুত্রের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তার উপযুক্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। স্কুলে ভর্তি হবার আগে টমাস ইয়ং নামে স্কটল্যান্ডের অধিবাসী একজন সাহিত্যরসিক ব্যক্তি তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণায় পড়াশুনার প্রতি মিলটনের গভীর অনুরাগ জন্মে। তাঁর যখন বারো বছর বয়স সেই সময়েই তিনি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনা করতেন।

১৬২০ খ্রিঃ বারো বছর বয়সে মিলটন সে সময়ের বিখ্যাত সেন্ট পলস স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলের শিক্ষাগুণে এবং পারিবারিক সংস্কৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশলাভ করতে লাগল। ইংরাজিতে ও ল্যাটিন ভাষায় তিনি কবিতা রচনা করতে লাগলেন।

১৬২৫ খ্রিঃ সেন্ট পলস স্কুলের পড়া শেষ করে মিলটন ভর্তি হন কেম্ব্রিজে ক্রাইস্ট কলেজে। এখানে তিনি সাত বছর পড়াশোনা করেন। ১৬৩২ খ্রিঃ তিনি এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন।

এই সময়ে তাঁর কাব্যগ্রন্থ At a Solemn Music এবং Nativity Hymn প্রকাশিত হয়। মিলটন খ্যাতি লাভ করেন।

কলেজের পড়া শেষ করে মিলটন চলে আসেন বাকিংহামে শহরের হোরটন নামক স্থানে। তাঁর পিতা সেই সময় সেখানেই বাস করছিলেন। তখন তিনি নিশ্চিন্তে পড়াশোনা ও কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করলেন।

মিলটনের পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁর পুত্র কলেজের পড়া শেষ করে ধর্মযাজকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু মিলটনের কবিপ্রতিভা তাঁকে সে পথে যেতে দিল না। তিনি হোরটন-এর মুক্ত উদার প্রকৃতির মধ্যে গভীর চিন্তাশীলতার পথ খুঁজে নিয়ে কাব্যচর্চায় ডুবে রইলেন।

এই সময়ে তিনি যে সব কাব্য রচনা করেন তার মধ্যে Allegar, Il Penseroso, Areades, Comus এবং Lycidas প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৬৩৮ খ্রিঃ কিছুকালের জন্য দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্স ঘুরে আসেন।

১৬৪২ খ্রিঃ মেরী পাওয়েলকে বিয়ে করেন। এই বিবাহ স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের পর মিলটন The Doctrine and Discipline of Divarce নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

পুস্তকটি নিষিদ্ধ হয়। পরে অবশ্য ১৬৪৪ খ্রিঃ মিলটনের বিখ্যাত Areopagitica গ্রন্থে পুনঃ প্রকাশিত হয়।

মিলটন এই সময় থেকেই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। তিনি ধর্ম সংস্কার, শিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। এই সব প্রবন্ধাদির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Reformation of Church Discipline in England.

দেশে শিক্ষার উন্নতি কিভাবে হতে পারে এই বিষয়ে মিলটন তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন Tracte of Education নামক পুস্তিকায়। এটি প্রকাশিত হয় ১৬৪৪ খ্রিঃ।

এরপর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর Areopagitica গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরের বছরেই প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতার সঙ্কলন গ্রন্থ।

ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড রাজশক্তিকে হারিয়ে ক্রমওয়েল পার্লামেন্টের শাসন প্রবর্তন করলেন। ক্রমওয়েলের অনুসারী লোকদের বলা হত পিউরিটান। এরা ছিলেন বিদ্বান, চরিত্রবান এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। মিলটন ছিলেন এই পিউরিটানদের দলভুক্ত।

রাজ্যের বড় বড় সমস্যার ব্যাপারে ক্রমওয়েল মিলটনের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এই সময় তিনি সরকারের ল্যাটিন সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেন।

ল্যাটিন, গ্রীক এবং হিব্রু ভাষায় মিলটনের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বিদেশীয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাজে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য মিলটনের কাব্যরচনার কাজ বিঘ্নিত হয়েছিল। মাত্র কয়েকটি সনেট ছাড়া আর কোন কবিতাই তিনি রচনা করতে পারেন নি।

১৬৫০ খ্রিঃ রাষ্ট্রীয় কাজ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি আবার স্বাধীনভাবে সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৬৫১ খ্রিঃ থেকেই মিলটনের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ১৬৫৬ খ্রিঃ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। অল্প কিছুদিন পরেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ততদিনে তিনি

সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। এই অবস্থাতেই ১৬৬২ খ্রিঃ তৃতীয়বার বিবাহ করেন।

১৬৫৮ খ্রিঃ মিলটন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Paradise Lost রচনা শুরু করেন। ১৬৬৭ খ্রিঃ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ Paradise Regained প্রকাশিত হয় ১৬৭১ খ্রিঃ। এই বছরেই তাঁর বিখ্যাত কাব্য-নাটক Samson Agonistes প্রকাশিত হয়।

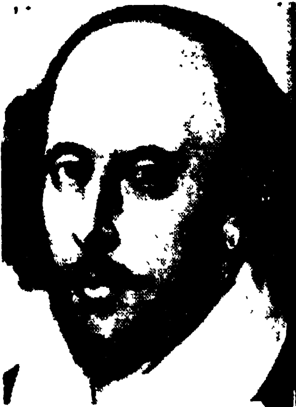
দৃষ্টিশক্তিহীন কবির লিখবার ক্ষমতা ছিল না। এই সময়ে তাঁর সহায় ছিল তিন কন্যা। পালা করে তিনটি মেয়েকে তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন, তারা লিখে নিত। এই ভাবেই জন্ম হয়েছিল জগতের অমর কাব্যগ্রন্থগুলির অন্যতম Paradise Lost। বাইবেলের আদম আর ইভের স্বর্গচ্যুতির বিবরণকে অবলম্বন করে অন্ধ কবি মিলটন এই কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন।

বাইবেলের সেই সামান্য কাহিনীর মধ্যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন মানুষের অনাবিল আত্মার আকুতিকে।

মিলটন তাঁর জীবনব্যাপী দুঃখ তাপে দগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু সবকিছুকেঅবহেলা করে তিনি স্বীয় প্রতিভা বলে বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করে গেছেন। তাঁর সৃষ্টি জগতের মানুষের কাছে আনন্দ, শক্তি ও আলোর উৎস স্বরূপ হয়ে আছে।

১৮৭৪ খ্রিঃ মিলটন চিরশান্তিধামে মহাপ্রয়াণ করেন।

উইলিয়ম শেক্সপীয়র



বিশ্বসাহিত্যের বিরল কয়েকটি প্রতিভা তাঁদের যুগোত্তীর্ণ অবদানের জন্য সময়ের সীমা অতিক্রম করে মহামানব রূপে চিহ্নিত হয়েছেন, উইলিয়ম শেক্সপীয়র তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

মনুষ্যত্ব এবং মানবিকতাকে তাঁর মত করে উজ্জীবিত ও আলোকিত করতে পেরেছেন খুব কম লেখকই।

ওয়ারউইক শায়ারে অ্যাভন নদীর তীরে স্ট্রাটফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন শেক্সপীয়র। তাঁর বাবার নাম ছিল জন শেক্সপীয় এবং মায়ের নাম ছিল মেরী আর্ডেন। সাত ভাইবোনের মধ্যে উইলিয়ম বাদে আর সকলেই মারা গিয়েছিল শৈশবে প্লেগরোগের আক্রমণে।

স্ট্রাটফোর্ডে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল মারাত্মকভাবে। সেই সময় উইলিয়মের বয়স মাত্র একবছর। ভাগ্যক্রমে তিনি প্লেগের হাত থেকে রক্ষা পান।

উইলিয়মের শৈশব ও বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এটুকু জানা যায় যে তাঁর জন্ম হয়েছিল প্রাচীন ইংরাজ জোতদার পরিবারে।

তাঁর বাবা স্ট্রাটফোর্ডের অল্ডারম্যান এবং কর্পোরেশনের বেলিফ নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সব সরকারী পদে থাকার সময়ে মঞ্চাভিনয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতার কথা জানা যায়।

বাইরে থেকে যে সব নাট্যদল শহরে আসত তিনি তাদের সরাসরি অর্থসাহায্য পেতে সাহায্য করতেন।

অনুমান করা যায় যে পিতার এই নাট্যপ্রীতি পুত্র উইলিয়মের মধ্যেই সঞ্চারিত ও বিকাশলাভ করেছিল।

অনেকে বলেন, জন শেক্সপীয়র পেশায় ছিলেন কসাই। তবে স্ট্রাটফোর্ড শহরের পরিসংখ্যান থেকে নির্ভরযোগ্য ভাবে যা জানা যায় তা হল, জন ছিলেন একজন দক্ষ দস্তানা প্রস্তুতকারক এবং নরম-চামড়ায় তৈরি দ্রব্যাদির ব্যবসায়ী।

যাইহোক, স্ট্রাটফোর্ডের পরিবেশে ছেলেবেলা থেকেই যে উইলিয়ম মঞ্চে অভিনীত নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এভাবেই কবিতা ও অভিনয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মে উঠেছিল তাঁর।

পড়াশোনার সঙ্গে বাবার ব্যবসাও দেখাশোনা করতেন উইলিয়ম। এভাবেই কাটল জীবনের আঠারোটা বছর।

শেক্সপীয়র সম্পর্কে প্রচলিত গল্প হল যে তিনি নাকি স্ট্রাটফোর্ড এলাকায় হরিণ চুরি করে বেড়াতেন। একবার হরিণ চুরির অপরাধে শাস্তি এড়াবার জন্যই নাকি লন্ডনে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

সেখানে নাট্যশালায় যারা থিয়েটার দেখতে আসতেন তাঁদের ঘোড়া রক্ষণাবেক্ষণ এবং তদারকি করাই ছিল তাঁর জীবিকা।

এসব গল্প নিছকই গল্প, এগুলোর কোন বাস্তব ভিত্তি আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন না।

আঠারো বছর বয়সেই শেক্সপীয়র বিয়ে করেছিলেন অ্যান হ্যাথাওকে। জন শেক্সপীয়রেরই একজন জোতদার বন্ধুর কন্যা ছিলেন অ্যান। বয়সেও ছিলেন উইলিয়মের চেয়ে আট বছরের বড়।

স্ট্রাটফোর্ডের নিকটবর্তী টেম্পল গ্রাফটন-এর গীর্জায় বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। এই বিয়ের জন্য দরকার হয়েছিল বিশেষ লাইসেন্স আর তা জোগাড় করা হয়েছিল উরস্টার-এর বিশপের কাছ থেকে।

বিয়ের ছমাসের মাথায়ই সংসারে নতুন অতিথির আগমন ঘটল। উইলিয়ম ও অ্যান-এর প্রথম সন্তান সুশানা-এর জন্ম হল। ১৫৮৫ খ্রিঃ সংসারে এল জমজ সন্তান। তাদের নামে রাখা হল হ্যামনেট ও জুডিথ।

সংসার বাড়ল, সংসারের খরচও বাড়ল সেই সঙ্গে। বিব্রত উইলিয়ম চলে এলেন লন্ডনে। সংসার পড়ে রইল স্ট্রাটফোর্ডের বাড়িতে।

কবিতা ও অভিনয়ের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই আকর্ষণ ছিল তাঁর। লন্ডনে এসে তিনি ঢুকে পড়লেন একটা নাটকের দলে। এখানে গোড়ার দিকে তাঁর কাজ ছিল ফাইফরমাস খাটা আর নাটক লেখা।

সেই কালে নাটক লিখিয়েদের খুব একটা মর্যাদা ছিল না। থিয়েটারের আর পাঁচজন সাধারণ কর্মীর মতই তাদের গণ্য করা হত।

পুরনো নথিপত্র থেকে জানা যায় যে উইলিয়ম গ্লোব বা অন্য কোন থিয়েটারে অভিনয় করেননি।

রিচার্ড বারবেজ, এডওয়ার্ড অ্যালিন এবং পরবর্তিকালে লর্ড চেম্বারলেনের কোম্পানির সঙ্গে কাজকর্ম করেছেন।

লন্ডনের জীবনের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই উইলিয়ম নিজের খরচে দুটি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৫৯৩ খ্রিঃ ভেনাস ও অ্যাডোনিস এবং ১৫৯৪ খ্রিঃ দ্য রেপ অব লুক্রেসি প্রকাশিত হলে কবি হিসেবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন।

উইলিয়মের লেখা নাটক মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে এবং রীতিমত সাফল্যের সঙ্গেই। কিন্তু সেগুলো বই আকারে প্রকাশের কোন আগ্রহ তাঁর ছিল না। কোন প্রকাশকও এগিয়ে আসেনি।

সেই যুগে নাটককে সাহিত্য বা শিল্পকর্ম হিসেবে গণ্য করা হত না বলেই উইলিয়মের মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় কোন নাটক তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বই আকারে দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর জীবনীও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর একশত বছর পরে।

তবে উইলিয়ম তাঁর সহজাত প্রতিভাবলে একজন সাধারণ কর্মী থেকে নিজেকে তুলে আনতে পেরেছিলেন লন্ডনের অন্যতম প্রধান নাট্যদলের মালিকানার অংশীদার হিসেবে। গ্লোব থিয়েটারেব নয়জন অংশীদারের মধ্যে উইলিয়ম ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি।

১৫৯৬ খ্রিঃ উইলিয়মের জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। তাঁর একমাত্র পুত্র হ্যামনেট মাত্র এগার বছর বয়সে আকস্মিকভাবে মারা যায়।

এই দুর্ঘটনা তাঁকে চরম আঘাত হেনেছিল। তিনি এর পর লন্ডনের বাস উঠিয়ে চলে আসেন স্ট্রাটফোর্ডে।

এখানেই ১৫৯৭ খ্রিঃ তিনি একটি মস্ত বাড়ি কিনে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন। নতুন বাড়ির নামকরণ করেন নিউ প্লেস।

সবসুদ্ধ আট ন বছর লন্ডনে ছিলেন উইলিয়ম। এই সময়ে একের পর এক নাটক লিখেছেন আর ব্যস্ত থেকেছেন সেগুলো মঞ্চস্থ করার কাজে।

স্ট্রাটফোর্ডেই উইলিয়ম তাঁর দুই মেয়ে সুশান ও জুডিথের বিয়ে দেন যথাক্রমে ১৬০৮ ও ১৬১৬ খ্রিঃ। জুডিথের বিয়ের অব্যবহিত পরেই ১৬১৬ খ্রিঃ ২৩ শে এপ্রিল তিনি লোকান্তরিত হন।

শেক্সপীয়রের জীবন ও কর্ম সাধনার অনেক কিছুই আমাদের অজানা। বহু বিষয় এখনো পণ্ডিতদের গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে। ভবিষ্যতে হয়তো নতুন তথ্য জানা যাবে।

এ পর্যন্ত তাঁকে বিষয় করে যত বই লেখা হয়েছে পৃথিবীতে অপর কোন লেখককে নিয়ে তা হয়নি।

শেক্সপীয়রের নাটকের প্রথম সঙ্কলন ফার্স্টফোলিও প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬২৩ খ্রিঃ। তিনি মোট ৩৪টি নাটক রচনা করেন। সেগুলি হল ঃ

ঐতিহাসিক নাটক ঃ চতুর্থ হেনরী, চতুর্থ হেনরী দ্বিতীয়ভাগ, পঞ্চম হেনরী, অষ্টম হেনরী।

ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক ঃ ষষ্ঠ হেনরী ১ম, ২য়, তৃতীয়-ভাগ, তৃতীয় রিচার্ড, দ্বিতীয় রিচার্ড, কিং জন।

বিয়োগান্ত নাটক ঃ টাইটাস এন্ড্রোনিকাস, রোমিও ও জুলিয়েট, জুলিয়াস সিজার, হেমলেট, ওথেলো, কিং লিয়ার, ম্যাকবেথ, এন্টনী ও ক্লিয়োপেট্রা, কোরিওল্যানাস, টাইমন অব এথেন্স।

হাস্যরসাত্মক নাটক ঃ দি কমেডি অব এরর্স, দি টেমিং অব দ্য শ্রু, দি টু জেন্টলম্যান অব ভেরোনা, লাভস লেবার লস্ট, মিড সামার নাইটস ড্রিম, দি মার্চেন্ট অব ভেনিস, মাচ এডো এবাউট নাথিং, অ্যাজ ইউ লাইক ইট, দ্যা মেরী ওয়াইভস অব উইণ্ডসর, টুয়েলফত নাইট, ট্রয়লার্স অ্যান্ড ক্রেসিডা, অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল, সিম্বেলিন, দি উইন্টার্স টেল, দি টেম্পেস্ট, দি টু নোবল কিন্সমেন।

শেক্সপীয়রের কাব্যের মধ্যে রয়েছে ঃ ১৫৪টি সনেট, ভেনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস এবং দি রেপ অব লুক্রিসি এবং একটি শোকসঙ্গীত দি ফিনিক্স অ্যান্ড দি টার্টল।

হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন



বিশ্বের শিশু ও কিশোর সাহিত্যে সব দেশের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। কেবলমাত্র রূপকথার গল্প লিখে বিশ্বজোড়া খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁব মত এমন অন্তরঙ্গ সরস ভঙ্গীতে সহজ ও সরল ভাষায় এত সুন্দর রূপকথার গল্প আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যিক লিখতে পারেননি। তাঁর গল্পগুলিতে পাওয়া যায় অসীম দরদ আর প্রাণের গভীর স্পর্শ।

অ্যান্ডারসনের রূপকথার নির্ভরযোগ্য অনুবাদ পৃথিবীতে কোন ভাষাতেই সম্ভব হয়নি। এই ক্রুটি সত্ত্বেও তিনি পৃথিবীর সকল দেশের শিশু ও কিশোর হৃদয়ে একান্ত আপনার জন হয়ে রয়েছেন। তাঁর রূপকথাগুলি বড়দের কাছেও সমান উপভোগ্য ও প্রিয়।

রূপকথার রূপকুশলী শিল্পী অ্যান্ডারসনের নিজের জীবনও ছিল একটি বিস্ময়কর রূপকথা। ১৮০৫ খ্রিঃ ২রা এপ্রিল ডেনমার্কের অন্তর্গত ফুনিন দ্বীপেব ছোট্ট শহরে ওডেন্সে হ্যান্সের জন্ম হয়। তাঁর বাবা জুতো তৈরি করে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

এই হতদরিদ্র মানুষটির একটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। আর তুচ্ছ জিনিস দিয়ে অপূর্ব সুন্দর পুতুল ও খেলনা বানাতে পারতেন।

হ্যান্স শিশু বয়সে মুগ্ধ হয়ে বাবার মুখের গল্প শুনতেন আর পুতুল বানানো দেখতেন। তাঁর বৃদ্ধ ঠাকুমাও খুব ভাল গল্প বলতে পারতেন।

দুষ্টুমি আর খেলাধুলা ভুলে তিনি ঠাকুমার কাছে বসে মজার মজার রূপকথা শুনতে ভালোবাসতেন। তাঁর জীবনে ছেলেবেলায় শোনা এই গল্পগুলির প্রভাব হয়েছিল খুবই গভীর।

সাহিত্যিক হওয়ার আগে পর্যন্ত বহুদিন তিনি কোপেনহেগেনে সম্ভ্রান্ত পরিবারে ছেলেমেয়েদের গল্প বলে দুবেলা অন্ন সংস্থান করেছেন।

হ্যান্সের চেহারা ছিল অত্যন্ত কুৎসিত। শরীর ছিল রোগা প্যাকাটির মত। কিন্তু চোখ দুটি ছিল মায়াময়। নিখিল বিশ্বের অব্যক্ত বেদনায় যেন সর্বদা করুণ ও আর্দ্র হয়ে থাকত।

ওডেন্স শহরে বোধহয় তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে গরীব। মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়।

সংসার অচল হয়ে পড়তে দেখে মা মেরী দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন। কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁকে প্রতিবেশীদের কাপড় কাচার কাজ করতে হত। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তিনি হ্যান্সকে ওডেন্সের একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন।

এসময়ে হ্যান্সের বয়স বারো-তেরো। পড়াশোনার অবসরে অন্য ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধুলা করত তখন হ্যান্স বাড়িতে বসে বাবার তৈরি কাগজের ও কাঠের পুতুলগুলিকে নায়ক-নায়িকা সাজিয়ে অভিনয় করে সময় কাটাতেন। কখনো নাটক লেখার চেষ্টা করতেন।

শহরে ভ্রাম্যমান থিয়েটার পার্টি এলে অথবা জিপসীদের দলের ঝলমলে পোশাক পরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে দেখতেন। এই সময় থেকেই তাঁর মনে ভবিষ্যৎ জীবনে অভিনেতা বা নাট্যকার হবার বাসনা দানা বাঁধতে শুরু করে।

এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে হ্যান্স কিছু টাকা সম্বল করে একদিন ঘর ছেড়ে পায়ে হেঁটে দুদিনের পথ পাড়ি দিয়ে রাজধানী কোপেনহেগেনে এসে উপস্থিত হন।

তাঁর মনে স্বপ্ন তিনি হবেন ডেনমার্কের শেক্সপীয়র। অর্থ ও যশ দেশজোড়া একসঙ্গে লাভ করবেন।

কোপেনহেগেনে সেই সময় রয়্যাল থিয়েটারের খুব নামডাক। মনে আশা নিয়ে হ্যান্স থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু হতাশ হলেন। তবু দমলেন না। তাঁকে অভিনেতা হতে হবে, নাটক লিখতে হবে।

আর একদিন দেখা করলেন রয়্যাল একাডেমির মিউজিক কনডাক্টর সিবনির সঙ্গে। সেখানেও কপালে জুটল প্রত্যাখ্যান। তাঁর কুৎসিত চেহারা আর গান সকলের হাসির উদ্রেক করল। তবে দয়াপরবশ হয়ে কেউ কেউ তাঁকে সামান্য অর্থ সাহায্য করল।

অভিনেতা হওয়ার আশা যখন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, এই সময়েই হ্যান্স কোপেনহেগেনের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের অভিনয় ও গান শোনাতে শুরু করলেন।

ছেলেমেয়েরা তাঁর গল্প, অভিনয় ও গান শুনে আনন্দ পেত। সেই সঙ্গে বয়স্করাও। পরিবর্তে এঁদের কাছ থেকে তিনি আর্থিক সাহায্য ও দুবেলা খাবার পেতেন।

এইভাবে একদিন তাঁর অভিনয়ের খ্যাতি ডেনমার্কের রাজকুমারীর কানে গিয়ে পৌছল। ডাক এল রাজপ্রাসাদ থেকে।

রাজকুমারী হ্যান্সের আবৃত্তি অভিনয় ও গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পুরস্কার দিলেন। হ্যান্সের জীবনে এই প্রথম প্রতিভার স্বীকৃতি।

এই সময়ে সুযোগ পেলেই তিনি নাটক লিখে পত্রিকায় পাঠাতেন। কিন্তু প্রত্যেকটি নাটকই অমনোনীত হয়ে ফেরত আসত। অবশেষে একদিন তাঁর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের জয় হল।

অ্যাল ফসল নামে একটি সাময়িক পত্রিকায় তাঁর একটি নাটক প্রকাশিত হল। আনন্দে আত্মহারা হ্যান্স সেদিন উপলব্ধি করলেন চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই একদিন ডেনমার্কের শেক্সপীয়র হওয়া যাবে।

জোনাস কলিন নামে একজন রাজঅমাত্য ছিলেন রয়্যাল থিয়েটারের ডিরেক্টর। অ্যাল ফসল পত্রিকা হাতে করে একদিন হ্যান্স গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

নাটকটি অবশ্য মনোনীত হল না। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার হ্যান্সের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। জোনস কলিনের সুপারিশে তাঁর লেখাপড়া শেখার জন্য সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা হল।

হ্যান্স সাইমন মাইসলিং নামে এক ভদ্রলোকের স্কুলে ভর্তি হলেন। এখানে অনেক অবহেলা লাঞ্ছনা সয়েও তিনি স্কুলের দুটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এবারে ঠিক করলেন তিনি পুরোদমে নাটক ও কবিতা লিখতে শুরু করবেন।

রয়্যাল থিয়েটারেও তাঁর নাটক অভিনীত হল। এবারে জোনাস কলিন রাজকোষ থেকে তাঁর বিদেশ ভ্রমণের জন্য একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। হ্যান্স সেই টাকায় দুবছর ধরে সারা ইউরোপ বেড়িয়ে ১৮৩৫ খ্রিঃ কোপেনহেগেনে ফিরে এলেন।

ইতালির পটভূমিকায় আত্মচরিতমূলক The Improviatoe নামক উপন্যাস লিখে তিনি রাতারাতি ডেনিস সাহিত্যের একজন দিকপাল লেখকরূপে স্বীকৃতিলাভ করলেন।

এতদিন পরে বই বিক্রির টাকা হাতে পেয়ে তিনি অর্থচিন্তার হাত থেকে নিস্কৃতি পেলেন।

হ্যান্সের দ্বিতীয় উপন্যাস যখন প্রেসে ছাপা হচ্ছে, এই সময় তাঁর কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়ল। অর্থের তাগিদেই তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য তাড়াতাড়ি কতগুলো রূপকথা লিখে ফেললেন।

বই আকারে লেখাগুলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সারা ইউরোপে সাড়া পড়ে গেল। রূপকথার গল্পগুলো হয়ে উঠল সবচেয়ে জনপ্রিয়।

আজ লোক তাঁর কবিতা, নাটক,উপন্যাসের কথা ভুলে গেছে। কিন্তু অমর হয়ে আছে রূপকথাগুলোই।

অ্যান্ডারসন জীবনে একদিকে চরমতম দুঃখ অপরদিকে প্রভূত সম্মান লাভ করেছেন। এমন ঘটনা কদাচিৎ দেখা যায়। জীবদ্দশায় তাঁর মত সম্মান ইউরোপের আর কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে জুটেছে কিনা সন্দেহ।

চার্লস ডিকেন্স, ভিক্টর হুগো, আলেকজান্ডার দ্যুমা, ইনজম্যান প্রভৃতি দেশ-বিদেশের মনীষী তাঁর বন্ধু ছিলেন।

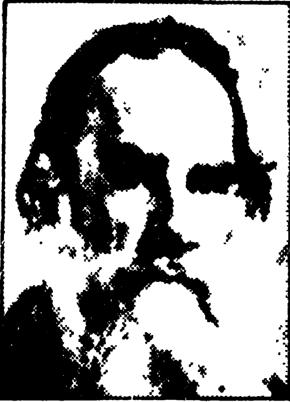
হ্যান্স ছিলেন অকৃতদার। যৌবনে এক সহপাঠীর বোনকে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন।

তাঁর লেখা রূপকথাগুলি পড়লে দেখা যায় প্রতিটি গল্পের মধ্যে অল্প-বিস্তর বেদনা মিশে আছে। এই বেদনার স্পর্শ গল্পগুলিকে আরও আবেগময়, সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

তাঁর দ্য লিটল মারমেড, স্নো কুইন, দ্য এম্পাররস নিউ ক্লোদস, দ্য পুওর লিটল ম্যাচ গার্ল, আগলি ডাকলিং প্রভৃতি গল্পের তুলনা পৃথিবীর কিশোর সাহিত্যে বিরল।

১৮৭৫ খ্রিঃ ৪ঠা আগস্ট সত্তর বছর বয়সে রূপকথার যাদুকর হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের মৃত্যু হয়।

কাউন্ট লেভ নিকোলায়েভিচ টলষ্টয়



রাশিয়ার সবচেয়ে প্রতিভাধর লেখক হলেন টলষ্টয়। কিন্তু তাঁর প্রভাব আজ দেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমাদের দেশের মহাত্মা গান্ধীও তাঁর শান্তিপূর্ণ অসহযোগের প্রেরণা পেয়েছিলেন টলষ্টয়ের কাছ থেকেই।

রাশিয়ার সবচেয়ে অভিজাত এক জমিদার পরিবারে টলষ্টয়ের জন্ম হয়েছিল ১৮২৮ খ্রিঃ ৯ই সেপ্টেম্বর।

তুলা প্রদেশের ইয়াসনারা পলিয়ানায় তাঁদের জমিদারী ছিল। সোনার চামচ মুখে নিয়েই তিনি একরকম জন্মেছিলেন, বেড়ে উঠেছিলেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর আদর প্রশ্রয়ের মধ্যে।

মাত্র নয় বছর বয়সেই টলষ্টয় তাঁর বাবা ও মাকে হারান। ফলে তাঁকে ও তাঁর ভাইবোনদের মানুষ হতে হয় পরিবারের অন্য আত্মীয়-স্বজনের কাছে।

তাতিয়ানা নামে তাঁর এক খুড়িমা ছিলেন। স্বচ্ছল এবং বড় পরিবারের মানুষ হয়েও তিনি খুবই সরল জীবন যাপন করতেন। তাঁর সরলতা ও ধর্মপ্রাণতা টলষ্টয়ের জীবনে সব চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রভাবই যৌবনের ভোগ-

সুখে মাতোয়ারা টলস্টয়কে বারবার মনের নিভৃতে নিজেকে অন্তরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিত।

জমিদার টলস্টয় আত্মজিজ্ঞাসু মানবপ্রেমিক টলস্টয় হয়ে পৃথিবীর শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন।

তথাকথিত জমিদার পরিবারের সদস্য হিসেবে যৌবনের উচ্ছলতা টলস্টয়কে ভোগসুখের মধ্যে মাতিয়ে রেখেছিল।

রাজধানী পিটার্সবার্গে নানারকম সামাজিক মেলামেশা, তাস-দাবা, মদ্যপান আর ফুর্তি নিয়েই তিনি মজে থাকতেন।

কিন্তু এই আমোদ-প্রমোদের মধ্যেও মাঝে মাঝেই যেন কেমন থমকে যেতেন তিনি। কেমন যেন মনে হতো— এসব তিনি কি করছেন, জীবনের অপচয় ছাড়া এতো আর কিছু নয়।

উচ্ছৃঙ্খল প্রমোদের জীবন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত তাঁর মন। কিন্তু আশ্চর্য যে এই ভাবনা-চিন্তা স্থায়ী হতো না।

কোন পরিকল্পনা সঙ্কল্পে রূপ নেবার আগেই ফের আনন্দ-ফুর্তির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিতেন। কিন্তু মনের ভেতরে সূক্ষ্মভাবে জেগে থাকত একটা অতৃপ্তির অসাচ্ছন্দ।

এই টানা-পোড়েনের মধ্যেই জীবন এগিয়ে চলছিল। টলস্টয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ হল ১৮৫১ সালে। সেই সময়ে পারিবারিক জমিদারি দেখাশোনার জন্য তাঁর উপস্থিতি জরুরি হয়ে পড়ল।

টলস্টয় কঠিন এক সমস্যার সম্মুখীন হলেন। পড়াশোনা শেষ হয়েছে। এখন হয় গ্রামে জমিদারিতে ফিরে যেতে হবে, নয়তো অন্য ভাইকে সেই দায়িত্ব দিয়ে সরকারী চাকরিতে যোগ দিতে হবে।

কি করবেন সেই সিদ্ধান্ত স্থির করবার আগেই এক অদ্ভুত কান্ড করে বসলেন টলস্টয়।

তাঁর এক ভাই, তার নাম নিকোলাস, সেনা বিভাগের অফিসার ছিল। তাঁর সঙ্গে তিনি চলে গেলেন ককেশাস অঞ্চলে।

সেখানে বিদ্রোহী তাতার উপজাতিদের সঙ্গে তখন জারের সেনাবাহিনীর প্রচন্ড লড়াই চলেছিল।

টলস্টয় স্বেচ্ছাসেবক হয়ে সরকারী সেনাবাহিনীর সহযোগিতার কাজে লেগে গেলেন।

প্রায় বছরখানেক সেনাবাহিনীর সঙ্গে থেকে যুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হল। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে কলম তুলে নেবার প্রেরণা জোগাল। পরের বছর তিনি 'এরেইগ' নামে একটি বই লিখলেন।

অল্প বয়সের লেখা হলেও বর্ণনার মাধুর্য পর্যবেক্ষণের গভীরতা এবং লেখকের বক্তব্যের অনাড়ম্বর তীক্ষ্ণতা বইটিতে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। বইটি বিদগ্ধ মহলে সমাদৃত হল।

উৎসাহিত হয়ে টলষ্টয় এবারে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। 'দ্য কসাকস' নামের এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হল ১৮৬৩ খ্রিঃ।

এটি আত্মজীবনী মূলক লেখা না হলেও মূলতঃ সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি ও আন্তর জিজ্ঞাসা এমন গভীর অনুভূতির সঙ্গে বিবৃত হয়েছে যে দেশের শিক্ষিত মহল বুঝতে পারল যে নতুন এক শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব হয়েছে।

বস্তুতঃ যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, টলষ্টয়ের অন্তর্জগতে এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। জীবন সম্পর্কে এক নতুন মূল্যবোধের সন্ধান পেলেন তিনি।

এতকাল যে জীবন যাপন করেছেন তা যে প্রতিভা ও জীবনের সার্থকতার কঠিনতম অন্তরায় এই উপলব্ধি তাঁকে এক অজানা অতৃপ্তিতে পীড়ন করতে লাগল।

জীবন কেন? তার সার্থকতা কোথায়? থেকে থেকে এই জিজ্ঞাসাই মনকে নাড়া দিতে লাগল।

বয়স যখন চব্বিশ হল, টলষ্টয় তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, জীবন আনন্দময়! আর এই আনন্দ রয়েছে হিংসায় নয়, রক্তপাতে নয়, রয়েছে ভালবাসায়; ভালবাসারই অপর নাম ধর্ম। এই ধর্মসাধনেই জীবনের সার্থকতা নিহিত।

স্বাভাবিক ভাবেই জীবনের লক্ষ স্থির হয়ে গেল তাঁর। কিন্তু লক্ষ পুরনের জন্য কর্মক্ষেত্রে যে প্রস্তুতির আবশ্যক তা তাঁর ছিল না। তাই লক্ষে সচেতনতা অবিচল রেখে চলল তাঁর অপেক্ষার পালা।

সৈনিকদলের কাজে ইস্তফা দিয়ে টলষ্টয় কিছুকাল পিটার্সবার্গে বসবাস করলেন। পরে ১৮৫১ খ্রিঃ ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

মানুষের জীবনবোধ ও জীবনচর্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল তাঁর এই ভ্রমণ।

১৮৫৮ খ্রিঃ তিনি রাশিয়ায় ফিরে এলেন। দেশের নিরক্ষর দরিদ্র মানুষের জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের অভিপ্রায় নিয়ে তিনি পৈতৃক জমিদারী দেখা শোনার কাজ শুরু করলেন। সেই সঙ্গে শুরু হল নিরলস সাহিত্যসাধনা।

টলষ্টয় এখন শত শত দরিদ্র প্রজার দন্ডমুন্ডের কর্তা। কিন্তু প্রজাদের অবস্থা দেখে নিজেই লজ্জিত হলেন।

একদম পাশাপাশি দুটি জীবনধারা, একটিতে চরম ভোগ, অপরটিতে চরম বঞ্চনা আর হতাশা। জীবনের এই অসম প্রবাহ চলতে পারে না।

অথচ বঞ্চিত জনের বঞ্চনা সম্পর্কে নেই উপলব্ধি। শিক্ষার অভাবেই এই চেতনাহীনতা।

টলষ্টয় নিজের চেষ্টায় স্কুল স্থাপন করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। শিক্ষা দেবার নতুন প্রণালীও তিনি উদ্ভাবন করলেন ।

আর এদিকে নিজে ত্যাগ করলেন ঐশ্বর্য আর বিলাসিতার জীবন। দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে নিজেও হয়ে গেলেন তাদেরই একজন।

ইতিপূর্বে ১৮৬২ খ্রিঃ টলষ্টয় বিয়ে করেছিলেন এক পরিচিত পরিবারের মেয়ে বেহ্‌রকে। তাঁদের বিবাহিত জীবনও সুখের হয়েছিল।

বিবাহের পরে পরেই তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন বিখ্যাত 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' উপন্যাসটি।

এই উপন্যাসেই টলষ্টয় প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। সাহিত্য সমালোচকদের মতে উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

এদিকে তাঁর জীবনচর্যায়ও ঘটে চলেছিল পরিবর্তন। দিনে দিনে তিনি কৃষকদের সঙ্গে মিশে তাদের মতই সাধারণ স্তরের জীবনযাত্রা শুরু করেছিলেন। এই সূত্রে স্ত্রীর সঙ্গেও শুরু হয়েছিল বাদানুবাদ।

কিন্তু টলষ্টয় জীবন-সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, কোন প্রতিকূলতাই তাঁকে লক্ষভ্রষ্ট করতে পারল না।

বর্তমান ভোগসর্ব্বস্ব সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছিল। নিজের উপলব্ধি সাধারণকে বোঝাবার জন্য ছোট ছোট গল্প লিখতে লাগলেন টলষ্টয়। তাঁর এই গল্পগুলো জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়।

টলষ্টয় তাঁর বিখ্যাত দ্বিতীয় উপন্যাস লেখা শুরু করলেন ১৮৭৩ খ্রিঃ। এই সময়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও একের পর এক বিপর্যয় ঘটতে লাগল। তাঁর দুটি সন্তান মারা গেল।

ছোটবেলার যে খুড়িমা ছিলেন তাঁর পরম স্নেহময়ী অভিভাবিকা—তাতিয়ানা, টলষ্টয়ের জীবনে যাঁর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি তিনিও মারা গেলেন। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে স্ত্রীও অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

এর মধ্যেই আনা কারেনিনা প্রকাশিত হল এবং অসাধারণ উপন্যাস রূপে স্বীকৃতি লাভ করল।

এই উপন্যাসে নরনারীর মানসিক সম্পর্ক ও বৈচিত্র্য নিয়ে টলষ্টয়ের যে সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশিত হল কেবল শেক্সপীয়র ছাড়া আর কেউ সেই জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেননি।

যতই বয়স বাড়তে থাকে ততই তাঁর ধারণা হতে থাকে যে সর্ব-ত্যাগের আদর্শ তিনি প্রচার করছেন সাহিত্যে, নিজের জীবনে তিনি তাকে পূর্ণমাত্রায় রূপায়িত করতে পারছেন না।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে হতেই তিনি একে একে রচনা করলেন দ্য পাওয়ার অব ডার্কনেস এবং ক্রুয়েটজার সোনাটা। পরে পরেই রচনা করলেন দ্য রেজারেকশান নামের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসটি।এই বইতে তিনি মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছেন।

টলষ্টয় নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে যেসব উপন্যাস রচনা করেছেন তার মধ্যে ওয়ার অ্যান্ড পীস, আনা কারেনিনা এবং দ্য রিজারেকশান—এই তিনটি আজ জগতের ক্লাসিকরূপে পরিগণিত।

চরম মানসিক অতৃপ্তিতে ভুগছিলেন টলষ্টয়। ঘরের বন্ধন, প্রেম-ভালবাসা সবই বাধা বলে মনে হচ্ছিল নিজের সঙ্কল্প পূরণের পথে।

কৃষকদের বেশভূষায় কৃষকদের মত জীবন যাত্রায় আরও বেশি করে একাত্ম হতে পারছেন না।

সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের দুঃখশোকের অংশীদার হতে পারছেন না। ঈশ্বরপ্রেম মানবপ্রেমের পূর্ণতায় সার্থক করে তুলতে পারছেন না এই ছিল দ্বন্দ্ব।এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গেও দীর্ঘস্থায়ী প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটল।

শেষ পর্যন্ত বিরাশি বছর বয়সে একদিন শীতের রাতে সামান্য দরিদ্র লোকের পোশাকে টলষ্টয় ঘরের আশ্রয় ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়লেন। এই পথই হল তাঁর শেষ আশ্রয়স্থল।

যেই ট্রেনে চড়েছিলেন, সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।তার এগার দিন পরে চিরতরে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন ১৯১০খ্রিঃ ৭ নভেম্বর।

বিশ্বমানবতার স্বার্থেই মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছিলেন টলষ্টয়। পত্নীর ভালবাসাহীন রূঢ় ব্যবহার তাঁর বার্ধক্যের দিনগুলোকে বিষময় করে তুলেছিল। তবুও তিনি নিজের লক্ষে ছিলেন স্থির। এই মহামনীষীর বেদনার্ত জীবনের পরিসমাপ্তি শুধু রাশিয়ার নয়, সমগ্র মানবজাতির বেদনাপূর্ণ স্মৃতি হয়ে রয়েছে।

চার্লস জন হফহ্যাম ডিকেন্স



বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্স নামেই বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

১৮১২ খ্রিঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী পোর্টসমাউথের ল্যান্ডপোর্টে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জন ডিকেন্স নৌ-বিভাগে সামান্য কেরানীর কাজ করতেন। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ যা ডিকেন্স পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে।

জন ডিকেন্স স্বভাবতঃ দয়ালু এবং হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। কিন্তু কাজে ছিলেন অলস এবং দায়িত্ব জ্ঞানহীন।

ফলে সংসারের অবস্থা এক সময়ে স্বচ্ছল থাকলেও পরে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তে হয় তাঁকে। ঋণের দায়ে কারাগারেও যেতে হয়েছিল।

চার্লসের ভাইবোনেরা ছিলেন আটজন। ডিকেন্স ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁর মা এলিজাবেথ সন্তানদের সামলে উড়নচন্ডী স্বামীকে নিয়ে অনেক কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন।

যথারীতি বাল্যবয়সেই চার্লসের স্কুলের পড়া শুরু হয়েছিল। লেখাপড়ায় আগ্রহেরও অভাব ছিল না।

প্রকৃতির পাঠশালায়ই তাঁর শিশুমন পরিপুষ্টি লাভ করে এবং কল্পনার বিকাশ ঘটে। তাঁর মেধাও ছিল অসাধারণ।

সংসারে চরম আর্থিক সঙ্কট দেখা দিলে ডিকেন্স পরিবার চলে আসেন উত্তর লন্ডনের ক্যামডেন টাউনের বেহ্যাম স্ট্রিটে। এই এলাকাটা ছিল দরিদ্র পরিবারের বস্তি। চার্লসের কাছে ছিল একেবারেই অপ্রিয়।

তবে লন্ডন শহরের বিস্তৃতি প্রাণময়তা ছিল তাঁর কাছে একটা অভূতপূর্ব আবিষ্কারের মত।

স্কুলের আনন্দময় দিনগুলোর অবসান ঘটেছিল বাবার জেলে যাবার পরে পরেই। ফলে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনোর ইতি পড়েছিল। তাঁর মা এক আত্মীয়কে ধরে চার্লসকে পাঠালেন এক কালির কারখানার চাকরিতে। প্রতিদিন ১ শিলিং মাইনেতে শ্রমিকের কাজ করতে লাগলেন তিনি।

কালির কারখানা চার্লসের কাছে ছিল আতঙ্কের মত। এই আতঙ্ক তাঁকে সারা জীবন তাড়া করে ফিরেছে।

দুটো বছর কাটল খুবই দুর্ভোগ দুর্দশার মধ্যে। লেখাপড়ার প্রতি অদম্য আগ্রহের ফলে এই দুরবস্থার মধ্যেও চার্লস সময় সুযোগ পেলেই প্রিয় বই খুলে নিয়ে বসতেন।

বারো বছর বয়সে আবার স্কুলে যাবার সুযোগ পেলেন। ইতিমধ্যে বাবা ফিরে এসেছিলেন জেল থেকে। পারিবারিক ঋণও শোধ হয়েছে। প্রধানতঃ মায়ের চেষ্টাতেই তা হয়েছিল আর চার্লসকে তার জন্য তাড়না ভোগ করতে হয়েছিল যথেষ্ট। এর জন্য মায়ের প্রতি একটা অবুঝ অভিযোগ কোনদিনই ভুলতে পারেননি চার্লস।

ছেলের মেধা এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ জন চার্লসের নজর এড়ায়নি। তিনি একরকম স্ত্রীর অমতেই ডিকেন্সকে আবার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। মেধাবী চার্লস নষ্ট হওয়া দিনগুলো মেধা ও পরিশ্রমের সাহায্যে ফিরিয়ে নিলেন।

মর্নিংটন প্লেসের ওয়েলিংটন হাউস অ্যাকাডেমিতে পড়ার সময়ে গল্প লিখতে শুরু করলেন চার্লস। ভিড়ে গেলেন স্কুলের নাটক দলের সঙ্গে।

১৮২৭ খ্রিঃ পনের বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে এক সলিসিটার ফার্মে চাকরি নিলেন অফিস বয় হিসেবে। ক্রমে উন্নীত হলেন কেরানীর পদে। বাড়িতে বাবার কাছেও এই সময় নিতে লাগলেন সর্টহ্যান্ডের পাঠ। তারই ফলে কয়েক মাস পরে পেলেন কোর্ট রিপোর্টারের পদ।

স্বপ্ন ছিল অতি সম্মানিত পার্লামেন্ট রিপোর্টারের পদ। একদিন তাই হল করায়ত্ত।

আদালতে যাবার ফলে বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে। জীবনকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পান। এই অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্য জীবনের উপকরণ জুগিয়েছিল।

পার্লামেন্ট রিপোর্টার হিসেবে চার্লসের সমালোচনা খুবই সমাদৃত হয়েছিল।

প্রথমে দ্য ট্রু সান, পরে দ্য মিরর অব পার্লামেন্ট এবং সবশেষে দ্য মর্নিং ক্রনিকল ম্যাগাজিন তাঁকে পার্লামেন্ট রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগ করে। পরে ওল্ড মান্থলি ম্যাগাজিনের লেখক গোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত হন।

এই কাজের সময় বিভিন্ন ব্যক্তি ও জায়গা সম্পর্কে নিয়মিত নোট রাখতেন চার্লস। এই সব নোটের সাহায্যেই ১৮৩৩ খ্রিঃ থেকে ওল্ড মান্থলি ম্যাগাজিনে নিয়মিত স্কেচধর্মী লেখা লিখতে আরম্ভ করলেন। ছদ্মনাম নিলেন Boz।

১৮৩৪ খ্রিঃ এরকম নটি রচনা Sketches by Boz নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

এভাবেই সাহিত্যজগতে পদার্পণ করলেন চার্লস। এবারে এল এক অভূতপূর্ব সুযোগ। প্রখ্যাত প্রকাশন সংস্থা চ্যাপম্যান অ্যান্ড হল, মাসিক কিস্তিতে তাঁর লেখা প্রকাশ করবার চুক্তি করল। স্থির হল এই লেখাগুলো হবে সচিত্র। ছবি আঁকবেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী রবার্ট সিমূর।

১৮৩৬ খ্রিঃ এক সতীর্থ জর্জ হগার্থ-এর কন্যা ক্যাথেরিন হগার্থকে বিয়ে করলেন চার্লস। কিন্তু দাম্পত্য জীবন সুখময় ছিল না তাঁর।

এ বছরেই সূচনা হল তাঁর বিখ্যাত Posthumous Papers of the Pickwick Club রচনার। বই আকারে প্রকাশিত হল ১৮৩৭ খ্রিঃ।

এই চিত্রোপন্যাস চার্লসকে ইংল্যান্ডেব সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের শিরোপা এনে দিল। এরপর থেকে একাদিক্রমে ত্রিশবছর অব্যাহত থাকল তাঁর সাহিত্য-সাধনা।

১৮৩৮ খ্রিঃ প্রকাশিত হল অলিভার টুইস্ট। এরই পরিণতরূপ হল ডেভিড কপারফিল্ড (১৮৪৯-৫০ খ্রিঃ)। মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল নিকোলাস নিকলবি (১৮৩৯ খ্রিঃ), বারনবি রাজ (১৮৪০ খ্রিঃ)। চার্লসের অন্যান্য সাহিত্যকীর্তি হল—ব্রীক হাউস (১৮৫২-৫৩ খ্রিঃ), এ টেল অব টু সিটিজ (১৮৫৯ খ্রিঃ), গ্রেট এক্সপেক্টেশনস (১৮৬১ খ্রিঃ) প্রভৃতি।

ডিকেন্স ছিলেন একজন সৎ ভ্রমণকারী। ইংলন্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের নাক উঁচু ভাব তাঁর ভাল লাগেনি। তাই ভ্রমণে বের হয়ে আমেরিকায় গেলেন। সেখানে রাজকীয় সম্মান লাভ করেন তিনি।

আমেরিকার পরে জেনোয়া, লুসন, প্যারিস, বুলোন—সর্বত্রই তিনি সমানভাবে সমাদৃত হন।

যেখানে যখন গেছেন প্রায় সব জায়গাতেই প্রকাশ্যে স্বরচিত গ্রন্থপাঠ করে শ্রোতাদের শোনাতে হয়েছে তাঁকে। ফলে অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল।

১৮৬৯ খ্রিঃ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরের বছরই মাত্র ৫৮ বছর বয়সে ১৮৭০ খ্রিঃ ৯ই জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

চার্লস ডিকেন্সের প্রিয় বই ছিল ডেভিড কপারফিল্ড। তিনি নিজেই বলেছেন 'of all books I like this the best.'

সমাজের কুশ্রীতা, কদর্যতা, নীচতার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে নির্মম কশাঘাত করেছেন।

দ্য মিস্ট্রি অব এডুইন ড্রুড হল চার্লসের সর্ব শেষ রচনা। কিন্তু সম্পূর্ণ করবার মত আয়ু পাননি। তাই যে রহস্য নিয়ে বলতে শুরু করেছিলেন তার সমাধান বা শেষ কথা আর বলে যেতে পারেননি। তার আগেই প্রিয় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হয়েছিল।

একসময় চার্লস ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর শৈশবের স্বপ্নভূমি কেন্টের গির্জা সংলগ্ন সমাধি ক্ষেত্রে তাঁকে যেন সমাহিত করা হয়।

চ্যাথাম আর রচেস্টারের মাঝে কেন্টের গ্যাডস হিল প্লেসই ছিল তাঁর শেষ আবাসস্থল। এখানেই তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁর দুই কন্যা মেমি ও কেটি। তাঁর শেষ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে সমাহিত করা হয়েছিল ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবের পোয়েটনে কর্নারে।

স্যার আর্থার কোন্যান ডায়াল



সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত চরিত্র রহস্যভেদী শার্লক হোমসের স্রষ্টা স্যার আর্থার কোন্যান ডায়ালের জন্ম এডিনবরায় ১৮৫৯ খ্রিঃ।

ডায়াল ছিলেন বহুমুখী গুণ-নৈপুণ্যের মানুষ। তিনি হতে পারতেন অনেক কিছুই। কিন্তু সাহিত্যপ্রীতি এবং শিল্পপ্রবণতা তাঁকে আকস্মিকভাবেই নিয়ে আসে সাহিত্যক্ষেত্রে।

১৮৭৬ খ্রিঃ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়বার সময় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে ডঃ জোশেফ বেল-এর। সুদক্ষ শল্যচিকিৎসক এই মানুষটিব নির্ভুল ক্ষমতা ছিল রোগ নির্ণয়ের।

কেবল তাই নয় সামান্য লক্ষণ থেকেই তিনি রোগীদের জীবন ও জীবিকার সন্ধান বলে দিতে পারতেন।

ডায়াল ছিলেন ডাঃ বেল-এর প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম। তাঁর ইচ্ছাতেই একসময় ডায়াল নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁর আউট পেশেন্ট ক্লার্ক হিসেবে।

এই সুযোগটা ডায়ালের জীবনে শার্লক-প্রস্তুতি পর্বের সূচনা করল বলা চলে। কেননা, রোগীদের ইতিহাস টোকার মধ্যে দিয়েই তাঁর মানুষের চরিত্র পর্যবেক্ষণের হাতে খড়ি হতে থাকল।

তিনি যে নোট নিতেন, তার সঙ্গে ডাঃ বেল-এর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের হুবহু মিল দেখে তিনি অভিভূত হতেন।

মানুষটির লজিক্যাল অ্যানালিসিসও ডিডাকসন পদ্ধতির প্রতি এভাবেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ডায়াল।

তাঁর কাল্পনিক অপরাধ কাহিনীর নায়ক শার্লক হোমসের মধ্যেও আমরা দেখেছি এই গুণগুলিই আরও প্রখর ও বিকশিত রূপে।

আঙুলের নখ, কোটের হাতা, বুট জুতো, প্যান্টের হাঁটু, তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের কড়া-পড়া চামড়া, মুখমণ্ডলের ভাব, শার্টের আস্তিন— এসব থেকে হোমস তার প্রাথমিক সমস্যাবলীকে আয়ত্তে আনতেন।

চিকিৎসা জগতটা এমন এক কঠিন ঠাঁই যেখানে এই জীবিকার মানুষদের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য দীর্ঘ সময় এবং ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়।

ভাগ্যের জোরে কেউ কেউ অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যেই তা পেয়ে যায়। এরা সুনাম ও আর্থিক প্রাচুর্যের দাক্ষিণ্য লাভ করে। কিন্তু বাদবাকি সকলকেই চেম্বারে বসে স্টেথো দিয়ে মাছি তাড়াতে হয়।

ডাঃ বেল-এর স্নেহভাজন হওয়া সত্ত্বেও ডায়াল জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রতা এড়াতে পারলেন না।

লেখক হবার বাসনা না থাকলেও খেয়ালবশেই ইতিমধ্যে তিনি কয়েকটি গল্প লিখে ফেলেছিলেন এই সময়ে। কিন্তু তার প্রায় সবকটিই ফেরত এসেছিল সম্পাদকের দপ্তর থেকে।

কেবল The story of Sasassa Valley গল্পটি ছাপা হয়েছিল চেম্বার্স জার্নালে।

এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্য দিয়ে পাড়ি দিচ্ছিলেন ডায়াল। সেই সময়ে আকস্মিক ভাবেই চাকরিজীবনের হাতছানি এল।

পঞ্চাশ পাউন্ডের বিনিময়ে সার্জন হিসেবে জাহাজে করে আর্কটিক যাতায়াতের দায়িত্ব পেলেন।

বলাইবাহুল্য, এই সমুদ্রযাত্রা তাঁর উত্তর জীবনে সাহিত্যরচনার রসদ হিসেবে কাজে লেগেছে।

১৮৮১ খ্রিঃ ফিরে এসে ডাক্তারী ডিগ্রি লাভ করে আবার রওনা হলেন আফ্রিকার পথে। কিন্তু তিনমাস পরেই ফিরে এলেন।

এরপর তাঁর স্থিতিহীন জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল প্লাইমাউথ থেকে পাঠানো এক সহপাঠী বন্ধু ডাঃ বাড-এর টেলিগ্রাম।

বন্ধুটি তাঁকে প্লাইমাউথে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি নিজে সেখানে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল সাফল্য লাভ করেছেন। ডায়াল এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। তিনি বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন।

ডায়ালের সহপাঠী ডঃ বাড ছিলেন টগবগে প্রাণবন্ত তরুণ। আধা প্রতিভাবান আধা হাতুড়ে এই মানুষটি ছিলেন কিছুটা খামখেয়ালি আর ঝোঁকগ্রস্তও। ফলে বন্ধুর সঙ্গে ডায়ালের পার্টনারশিপ বেশিদিন টিকল না।

তিনি রীতিমত ঝুঁকি নিয়েই সাউথ সীর ১নং বুশ ভিলায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস শুরু করলেন।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ হলে যা হয়। ডায়ালের ঝকঝকে নেমপ্লেট হঠাৎ করে রোগীদের আকৃষ্ট করল না।

কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না তিনি। অনমনীয় মনোবল নিয়ে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঁঝবার শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে।

স্টেথো দিয়ে মাছি না তাড়িয়ে এবারে কলম নিয়ে বসলেন আর্থার কোন্যান ডায়াল।

লন্ডন সিটি ম্যাগাজিনে গল্প লিখতে শুরু করলেন। দি কর্না হিল পত্রিকায় একটি গল্প প্রকাশিত হবার পর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে লাগল।

ইতিমধ্যে ডাক্তারিতেও কিছুটা রোজগার বেড়েছে। অল্প হলেও স্থায়ী রোজগারের পথ কিছুটা খুলেছে।

ভরসা করে ১৮৮১ সালের এপ্রিল মাসে বিয়ে করে ফেললেন মিস লুই হকিন্স নামের একটি তরুণীকে।

বিয়ের কিছুদিন পরে একদিন কাগজকলম নিয়ে বসে নানান আঁকিবুকি কাটতে কাটতে একটা গোয়েন্দা চরিত্রের নকসা ছকে ফেললেন ডায়াল।

নামঠিকানা সহ স্বভাবটিও ধরে রাখলেন দু-চার কথায়। বলা যায় এই মানুষটিই ভ্রূণাকারে শার্লক হোমস।

অবশ্য প্রথমে নামকরণ হয়েছিল শেরিনফোর্ড হোমস, পরে বদল করে নাম রাখলেন শার্লক।

গোয়েন্দার যে সহকারীটিকে নির্বাচন করলেন ডায়াল প্রাথমিকভাবে তার নাম ছিল অরমন্ড স্যাকার। এই নামটিও পছন্দ না হওয়ায় পরে বদলে করলেন ডাঃ জন এস ওয়াটসন।

ডায়াল ডাঃ বেল-এর ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন মরফিন আসক্ত শার্লক হোমসের কায়মূর্তিটি। অবশ্য এই চেহারার ছাঁচের মধ্যে মিশেছিল তাঁর প্রপিতামহ জন ডায়ালের অয়েলপেন্টিং-এর স্মৃতিও।

ডাঃ ওয়াটসন মানুষটি কল্পনার সৃষ্ট হলেও তার আকৃতি-প্রকৃতি এবং নামের উৎস কিন্তু ছিল দুটি বাস্তব মানুষ। দুজনেই ছিলেন ডায়ালের বন্ধু।

এদের একজন হলেন সাউথ সী-এর ডাঃ জেমস ওয়াটসন এবং অপরজন মেজর উড। এঁর চেহারাটিই প্রায় হুবহু পেয়ে গেছেন গল্পের ওয়াটসন।

মেজর উড-ও সাউথসীতে থাকতেন এবং কিছুকাল ডায়ালের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন।

এর পরেই শুরু হয় অদ্বিতীয় রহস্যভেদী গোয়েন্দা শার্লক হোমসের একের পর এক অ্যাডভেঞ্চার—রীতিমত ছকেবাঁধা গোয়েন্দা-কাহিনী।

শার্লক হোমস পাঠকদের দরবারে প্রথম আবির্ভূত হলেন A Tangled Skein উপন্যাসে ১৮৮৭ খ্রিঃ। অবশ্য পছন্দ না হওয়ায় উপন্যাসটির নাম বদলে নতুন নামকরণ করলেন A study in Skerlet।

শার্লক হোমসকে নিয়ে ডায়াল সবশুদ্ধ চারটি উপন্যাস এবং ছাপ্পান্নটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। প্রতিটি লেখার মধ্যে হোমস চরিত্রটি এমন নিপুণভাবে চিত্রিত করেছিলেন যে পাঠকরা বিশ্বাসই করতে চাইতেন না যে শার্লক হোমস কাল্পনিক মানুষ।

১৯৩০ সালে মৃত্যুর আগে ডায়াল এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে পাঠকরা মনে করতেন শার্লক হোমস এক জীবন্ত ব্যক্তি আর সেই ব্যক্তি সকল রহস্যের সমাধান করতে পারেন।

লেখকের জীবিতাবস্থাতেই হোমসের নামে পাঠকদের কাছ থেকে চিঠি আসত। একবার এক মহিলা হোমসকে বিয়ের প্রস্তাবও পাঠিয়েছিলেন। ডাকে আসা অধিকাংশ চিঠিতেই থাকে রহস্য সমাধানেব নানা অনুরোধ। থাকে মুগ্ধতাজ্ঞাপন এবং সাক্ষাৎ প্রার্থনা।

বস্তুতঃ হোমস সত্যিকারের চরিত্র না হয়েও পৃথিবীর হোমস-অনুরাগী মানুষের কাছে হয়ে উঠেছেন জীবন্ত অস্তিত্বের অধিক একটি ভাবমূর্তি।

১৮৯১ খ্রিঃ ডায়ালের The Adventures of Sherlock Holmes প্রকাশিত হবার পর অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গল্পগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত স্ট্রান্ড ম্যাগাজিনে।

ডায়ালের শার্লক হোমসের গল্পগুলো পৃথিবীর সব ভাষাতেই অনুবাদ হয়েছে। তৈরি হয়েছে দুশো ছায়াছবি ও টেলিফিল্ম। সারা পৃথিবীর পুলিশী তদন্তধারায় এনেছে পরিবর্তন। চীন মিশরে গোয়েন্দা পাঠক্রমে অবশ্যপাঠ্য এই গল্পগুলি। ডায়ালের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থায়।

প্রধানতঃ গোয়ন্দাকাহিনীর লেখক হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত হলেও ডায়াল বেশ কিছু উপন্যাস ও অনেকগুলি নাটকও লেখেন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল The Story of Waterloo, The Fires of Fate, The House of Temperley, The prison Belt ইত্যাদি।

প্রথম নাটকটিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন প্রখ্যাত নট স্যার হেনরি আরভিং।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ সেনানিবাসের স্বপক্ষে রচিত তাঁর দুখানি বই হল The great Boar War এবং The War in South Africa: Its causes and conduct.

ডায়ালের Causes and Conduct of the World War গ্রন্থটি ইংরাজি ছাড়া আরও বারোটি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

জীবনের অন্তিম পর্যায়ে ডায়াল অধ্যাত্মবাদী হয়ে পড়েন এবং এই সম্পর্কে বক্তৃতা দান ও রচনা লিখতে থাকেন।

১৯০২ খ্রিঃ তিনি স্যার উপাধি লাভ করেন। ১৯৩০ খ্রিঃ ৭ই জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

হেনরিক যোহান ইবসেন



বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বার্নার্ড শ ইবসেনের নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনটে বিপ্লব, দুটো ক্রুসেড, কয়েকটা বৈদেশিক আক্রমণ ও একটা ভূমিকম্পের যতটা প্রভাব হওয়া উচিত ইংলন্ডে ইবসেনের নাটকের প্রভাব ঠিক ততটাই।

ইবসেন ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তাঁর প্রথম নাটক কাতিলিনা রচিত হয়েছিল সমালোচিত রোমান সেনাপতির নামে ১৮৪৮ খ্রিঃ।

১৮৫০ খ্রিঃ থেকে ১৯৫৮ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় তাঁর খ্যাম্পেহাইয়েন, নুরমা, সানকথান্স, নাত্তেন, ইয়লদ্যা প সুলহাইগ ও ফ্রু ইনগের তিল ওসল্লোত নামের নাটকগুলো।

১৮৬২ খ্রিঃ থেকে ১৮৬৪ খ্রিঃ তিনি বিদ্রূপাত্মক খ্যার্লিহেভেক্স কুমেদিয়ে এবং ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বের মিশ্রণে খঙ্গসেমনেনা নাটক লেখেন। ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ খ্রিঃ যথাক্রমে লেখেন ব্রানদ ও পীয়েরয়িনত নাটক। এই দুটো নাটক লেখা হয়েছিল তাঁর বিদেশবাসের সময়।

এই সময় পর্যন্ত রচিত নাটকগুলির মধ্যে দেশের অতীত গৌরবের ইতিহাস বা সমাজসংস্কৃতি সম্পর্কে ইবসেনের চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে।

১৮৬৯ খ্রিঃ থেকে ১৮৮২ খ্রিঃ পর্যন্ত রচিত হয় ফরবুন্দ, এন ফোলকেফিত্রনদে প্রভৃতি যে নাটকগুলো। তার মধ্যে সমাজ ও সমাজের সমস্যা বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত হয়েছে।

ইবসেন ছিলেন এক অবিচল সংগ্রামী মনোভাবের মানুষ। তাঁর নাটকে এই মনোভাবের রূপায়ন ঘটেছে প্রধানতঃ নারীচরিত্রের মাধ্যমে। তাঁর এই প্রতিবাদী চরিত্র চিত্রনের জন্য ভারতবর্ষে ইবসেন সমাজ সংস্কারক হিসেবেই সমধিক পরিচিতি লাভ করেছেন।

নাট্যরচনার নবধারার প্রবর্তক এবং জাতীয়তাবাদী ইবসেনের জন্ম হয় ১৮২৮ খ্রিঃ ২০ শে মার্চ নরওয়ের স্কিয়েন শহরে।

তাঁর বাবা ক্লুদ হেনরিকসেন ছিলেন জাহাজের ব্যবসায়ী। মায়ের নাম মারিয়া কর্নেলিয়া অলতেনবার্গ।

এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মেও জীবনের প্রায় চল্লিশটি বছর ইবসেনের কেটেছে কঠোর দুঃখ দারিদ্র্য আর জীবনসংগ্রামের মধ্যে। গোড়ার দিকে তাঁর রচনারও কদর ছিল না।

বাবার অমিতব্যয়িতার ফলে ছেলেবেলা থেকেই শুরু হয়েছিল ইবসেনের দুঃখের জীবন। পড়াশোনার কথা ভুলে তাঁকে বাধ্য হয়ে স্কীয়েনের বাইরে এক খামারে কাজ নিতে হয়েছিল। পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়ার এই হয়েছিল পরিণতি।

বাল্যবয়স থেকেই খেলনা থিয়েটার নিয়ে মগ্ন থাকতে ভালবাসতেন। ফলে নাটকের প্রতি একটা স্বাভাবিক টান তাঁর মধ্যে সব অবস্থাতেই বজায় ছিল। তাই ক্লেশকর জীবনের চারপাশের মানুষজন ও তাদের ঘিরে যে জীবন তার ঘটনার নাটকীয়তা সহজেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

১৮৪৪ খ্রিঃ ষোল বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে পঞ্চাশ মাইল দূরে গ্রীনস্ট্যান্ড শহরে একটা ওষুধের দোকানে শিক্ষানবিশের কাজ নেন।

গ্রীনস্ট্যান্ডের জীবন খুবই কঠিন ছিল। তবু এখানে খানিকটা হাঁপ ছাড়তে পারলেন ইবসেন কয়েকজন সাহিত্যরসিক বন্ধুকে পেয়ে। এইসময় থেকেই (১৮৪৭ খ্রিঃ) তিনি কবিতা লিখতে শুরু করলেন। তাঁর এইসব কবিতায় থাকত নগর জীবনের প্রতি শ্লেষাত্মক আক্রমণ। আর থাকত নিজের কৈশোরের নিঃসঙ্গতা, মৃত্যুভয় ও বেদনা।

১৮৪৯ খ্রিঃ পদ্যে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক লিখলেন ক্যাটেলিনা— রোমের পটভূমিকায়। এবারে ইচ্ছা হল নাটকটি ছাপাবার। কিন্তু চেষ্টা করেও প্রকাশক পেলেন না। শেষ পর্যন্ত এক বন্ধু ওলি স্কুলারুড এগিয়ে এলেন। তাঁরই আর্থিক সাহায্যে ক্যাটেলিনা ছাপা হল এবং সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করল।

দ্বিতীয় নাটক দ্য ওয়ারিয়রস টোম্ব প্রকাশের একবছর পরে ইবসেন বারগেনের ওলি বুল থিয়েটারে একটা কাজের সুযোগ পেলেন। হলেন থিয়েটার ডিরেকটর। কিন্তু আবাল্যের লাজুক প্রকৃতি আর স্বভাবজাত ভীরুতার ফলে ডিরেকটর হিসেবে তিনি সফল হতে পারলেন না।

অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে কথা বলার সময় ঘাবড়ে যেতেন। ফলে বেশি দিন এই কাজে টিকতে পারলেন না।

১৮৫৭ খ্রিঃ ইবসেন ডাক পেলেন অসলোর ন্যাশনাল থিয়েটারে। নরওয়ের নাট্যকলার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইবসেনও ত্রিশ বছরের টগবগে যুবক। উৎসাহের সঙ্গে তিনি কাজে যোগ দিলেন।

ইবসেন ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদী। বহু শতাব্দী ধরে নরওয়ে ছিল সুইডেনের অধীন।

১৮১৫ খ্রিঃ ভিয়েনার সন্ধির পরে ডেনিস অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নরওয়ে সুইডেনের রাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী তরুণদের সংগ্রাম চলতে লাগল ধীরে ধীরে। এই সঙ্গে শুরু হয়েছিল ভাষা চর্চার উন্নতির আন্দোলন।

ইবসেন এই আন্দোলনে যুক্ত হলেন। এই সময়েই তিনি স্বাধীন নরওয়ের ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচনা করলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক কিং মেকিং।

কিছু রাজনৈতিক কবিতাও তিনি লিখেছেন এই সময়কালে।

১৮৫৮ খ্রিঃ আর্থিক অনটন সত্ত্বেও বিয়ে করলেন সুসান্না হারসনকে। অর্থের প্রয়োজন জরুরী হয়ে পড়লে বাধ্য হয়ে তাঁকে থিয়েটারের কাজ ছাড়তে হল ১৮৬২ খ্রিঃ।

কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে কিছু সরকারী সাহায্য ইবসেনের নামে বরাদ্দ হল। তবে এই সুবিধাও বেশি দিন কপালে সইল না। লাভস কমেডি নাটক প্রকাশের পর খ্রিস্টীয় যাজক সম্প্রদায়ের বিরূপতার ফলে তাঁর সরকারী বৃত্তি বাতিল হয়ে গেল।

লাভস কমেডি নাটকে ইবসেন প্রচলিত বিবাহ রীতির বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছিলেন।

দেশে আর মন টিকছিল না। এক বন্ধুর চেষ্টায় ইবসেন বিদেশ ভ্রমণের একটি বৃত্তি নিয়ে কোপেনহেগেন চলে গেলেন। সেখানে তিনি প্রুসিয়া-ডেনিস যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন।

এখান থেকে তিনি দেশ ছেড়ে চলে গেলেন জোনে। ভাগ্য বিড়ম্বিত ইবসেনের জীবনে এবারে অনুকূল পরিবর্তনের সূচনা হল।

কিছুকাল স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অবশ্য কৃচ্ছ্রতার মধ্যে কাটল। ব্রান্ড নাটকের প্রকাশের পর তাঁর জীবনে স্বচ্ছলতা ফিরে এলো। সরকারী তরফ থেকেও কবিবৃত্তি মঞ্জুর হল।

ইবসেনের বয়স যখন আটত্রিশ সেই সময় এলো তাঁর জীবনে সাফল্য।

সাফল্য নিয়ে এলো পরিবর্তন। লেখায় এলো স্বকীয়তা। সাহিত্যকর্মই হয়ে উঠল প্রধান অবলম্বন।

ক্রমে ক্রমে ইউরোপের সাহিত্য জগতে ইবসেনের সাহিত্যকৃতি নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হল।

সাহিত্যসাধনার জন্য ইবসেন ঘরসংসার সব কিছুর বন্ধনকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করার এই জীবন-সত্যই তিনি তাঁর রচনায় বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করেছেন।

১৮৬৪ খ্রিঃ থেকে দীর্ঘ দশ বছর ইবসেন জার্মানীতে ছিলেন। এখানেই তিনি ছয় বছরের পরিশ্রমের শেষে সম্পূর্ণ করেন জুলিয়ান দ্য অপেস্টেন্ট। এইভাবে নাটকের ঐতিহাসিক পর্ব শেষ করে নতুন ধারার গদ্য নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

এই নাটকগুলো তাঁকে ইউরোপীয় নাট্যকারের প্রতিষ্ঠা এনে দিল। সারা ইউরোপে ইবসেনের সবচাইতে বেশি আলোচিত নাটক হল ডলস হাউস।

১৮৭৮ খ্রিঃ রোমে ফিরে এলেন ইবসেন। সমালোচকরাও তখন তাঁর রচনার গুণগ্রাহী। সর্বত্রই সুখ্যাতি।

তেষট্টিবছর বয়সে তিনি অসলো ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। শেষ বয়সের নাটকগুলিতে সমাজবিষয়ে তাঁর বক্তব্যের মাধ্যম হয়েছিল গল্প বা প্লটের বদলে প্রতীক। তাঁর জীবনের শেষ নাটক হল হোয়েন ইউ ডেড অ্যাওকেন।

আটাত্তর বছর বয়সে ১৯০৬ খ্রিঃ সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ম্যাক্সিম গোর্কি



বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম ম্যাক্সিম গোর্কির প্রকৃত নাম ছিল আলেক্সেই ম্যাক্সিমভিচ পেশকভ।

প্রথম জীবনের বিপর্যস্ত, ক্ষুব্ধ, হতাশ যুবক তাঁর নিজের পরিবেশ ও সময়কালের প্রতি এতই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন যে পরবর্তীকালে তিনি যখন লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, ছদ্মনাম গ্রহণ করেন গোর্কি। শব্দটির বাংলা অর্থ হল তপ্ত বা ক্ষুব্ধ।

নিজের জীবনের প্রতি তীব্র ক্ষোভে ও বিতৃষ্ণায় একসময় তিনি এতটাই ভেঙ্গে পড়েছিলেন যে নিজের হাতে গুলি করে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন।

জীবনের নিম্নতম ধাপ থেকে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছিল গোর্কিকে। জীবনের শুরু থেকেই তাঁকে সইতে হয়েছিল লাঞ্ছনা, পীড়ন ও অপমান। বিচিত্র এবং ভিন্নমুখী অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়তে হয়েছে বারংবার।

কিন্তু অদম্য মনোবল আর সুদৃঢ় সংগ্রামী প্রয়াস তাঁকে একদিন বিশ্ব-সংস্কৃতির চূড়ান্ত সম্মানের স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল।

জীবনের বিতৃষ্ণ অধ্যায় ও অভিজ্ঞতাগুলিই হয়ে উঠেছিল তাঁর অমর সাহিত্যের মূল্যবান উপকরণ।

গোর্কির জন্ম হয় ১৮৬৮ খ্রিঃ ১৬ই মার্চ রাশিয়ার নিজনি নভগরদে। তাঁর বাবা জাহাজ কোম্পানীর কাজে আস্তাখানে বাস করতেন। সেখানেই গোর্কির শৈশব কাটে।

বাল্য বয়সেই তিনি পিতৃহারা হয়ে নিজনিতে দাদুর বাড়িতেচলে আসেন। তাঁর মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে নতুন সংসারে চলে যান।

কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য বেশি দিন কপালে সইল না তাঁর। দাদুর ব্যবসায় মন্দা দেখা দিল, সংসারেও নেমে এলো অভাবের ছোবল। সেই সঙ্গে গোর্কির জীবনেও দেখা দিল অনিশ্চয়তা।

মাতামহীর স্নেহ মমতা লাভ করেছিলেন গোর্কি। তাঁরই উদ্যোগে ভর্তি হয়েছিলেন একটি স্কুলে।

সেই স্কুলের পড়া এবারে বন্ধ হয়ে গেল। মাত্র আট বছর বয়সেই তাঁকে দাদুর অভাবের সংসারের চাপে রোজগারে নামতে হল।

এই সময়ে তাঁকে করতে হয়েছিল বিভিন্ন রকমের কাজ। কখনো জুতোর দোকানের সহকারী, কখনো স্টীলের বাসন মাজার কাজ, কখনো কোন চিত্রশিল্পীর গৃহভৃত্যের কাজ করে সংসারের দৈনন্দিনের অভাবের মোকাবিলা করতে হয়েছে।

এই তুচ্ছাতি তুচ্ছ কাজের মধ্যেই গোর্কি আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন। জাহাজে বাসন মাজার কাজ যখন করতেন, সেই সময় এক পাচকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সেই মানুষটির ছিল নানারকম বই পড়ার আগ্রহ। গোর্কি তার কাছে পড়ালেখা শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শিশু গোর্কির শ্রমিক জীবন ছিল খুবই ভয়াবহ। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করতে হতো উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম।

পেট ভরে দুবেলা খাবারও জুটত না। ময়লা ছেঁড়া কাপড়চোপড়ের বেশি পরার জন্য জোটাতে পারতেন না। লাঞ্ছনা, গঞ্জনার সঙ্গে মাঝে মধ্যে চড়চাপড়ও জুটতো।

রাশিয়ার শ্রমিকজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এইভাবেই লাভ হয়েছিল গোর্কির। যন্ত্রণাময় শৈশব জীবনের কথা তিনি কোনদিন ভুলতে পারেননি।

পরবর্তী জীবনে সমাজের নিম্নতম স্তরের জীবনের এই দুর্বিসহ অভিজ্ঞতাকেই তিনি তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য করেছিলেন। স্বতঃস্ফুর্তভাবেই সর্বহারাদের দুঃখবেদনা আর যন্ত্রণা-বুভুক্ষার কথা তাঁর সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছিল।

আঠারো বছর বয়সে গোর্কি নিজনি থেকে চলে এলেন কাজানে। একটা রুটি তৈরির কারখানায় কাজ নিলেন।

এখানকার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম তাঁকে এতই হতাশাগ্রস্ত আর ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল যে তিনি জীবনের যন্ত্রণা জুরোতে চেয়েছিলেন আত্মহত্যা করে।

এই আত্মহননের ইচ্ছা জেগেছিল তাঁর দুটি কারণে। একদিকে ছিল আশৈশবের সঙ্গী দারিদ্র্য। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দারিদ্র্য-মুক্তি প্রয়াসের হতাশা।

গোর্কি তাঁর দিন মজুরের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে বইপত্র পড়ার অভ্যাসটা বজায় রেখেছিলেন। এই সময় রুশবিপ্লবের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি তাঁকে অনুপ্রাণিত করে।

আন্দোলনকারীদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। তিনি বুঝতে পারেন, মানুষের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম। এই কথা তিনি মনে মনে বিশ্বাস করলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই নিজের বিশ্বাসের কথা অন্য সমব্যথীদেরও বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কাজানে শুরু হল তরুণ জনদরদী নেতা লেনিনের নেতৃত্বে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন। সেই সময় গোর্কির সঙ্গীরা তাঁকে জানালেন এই আন্দোলনকারী ছাত্রদের কঠোর হাতে দমন করা উচিত।

গোর্কি এই কথা শুনে মর্মাহত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এতদিন দুঃখ মোচনের যে বিশ্বাসের কথা তিনি সঙ্গীদের বুঝিয়ে এসেছেন তা কারো মর্মস্পর্শ করেনি। তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর আন্তরিক বিশ্বাসের কথা কারোর মধ্যেই সঞ্চারিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি একদিন স্থির করলেন গুলি করে আত্মহত্যা করবেন।

একা চলে গেলেন কাজানকা নদীর পাড়ে। বন্দুকের নল নিজের বুকে তাক করে ট্রিগার টিপে দিলেন।

প্রচন্ড শব্দে কেঁপে উঠল কাজানকা নদীর বিজন তীরভূমি। গুলিবিদ্ধ গোর্কি কাত হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

সেদিন নেহাতই ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছিলেন গোর্কি। বন্দুকের গুলি ফুসফুস ভেদ করে হৃদপিন্ডের পাশ ঘেঁষে চলে গিয়েছিল। তাতেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি।

গোর্কির সঙ্গীরাই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের উদ্বেগ আর আন্তরিকতার অভাব ছিল না তাঁর জন্য। গোর্কি সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষ আসলে মানুষই থাকে, পরিবেশই তাকে অমানুষ করে তোলে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে গোর্কি জীবনকে আরও গভীরভাবে বুঝবার দেখবার প্রেরণা বোধ করলেন। জীবনের জন্য নিরন্তর সংগ্রামের মুখোমুখি হবার লক্ষে নিজেকে তৈরি করে নিলেন।

কাজান ছেড়ে যেদিন ভবঘুরের জীবন অবলম্বন করে বেরিয়ে পড়লেন তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলেন দক্ষিণ রাশিয়ায়।

সময়টা ১৮৯১-৯২ খ্রিঃ। রাশিয়ায় দেখা দিল আকাল। লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষ গ্রামের বাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে পথে। গোর্কি নেমে পড়লেন ত্রাণের কাজে।

সেই সময় একই কাজে হাত লাগিয়েছেন লিও তলস্তয়, চেখভ সহ অন্যান্য তরুণ লেখকরা। অনুপ্রেরিত হলেন গোর্কি। শ্রমিক জীবনের পাশাপাশি হাতে তুলে নিলেন কলম, মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন হতাশা। সংকল্প নিলেন মাথা তুলে দাঁড়াবার।

ছিলেন আলেক্সেই পেশকভ, এবারে ছদ্মনাম নিলেন ম্যাক্সিম গোর্কি। ভল্গা নদীর তীরবর্তী মফস্বল শহরের কাগজে ছাপা হতে লাগল তাঁর লেখা।

অল্পদিনের মধ্যেই গোর্কির লেখা প্রতিষ্ঠিত লেখক ও প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের নজরে এলো।

১৮৯৫ খ্রিঃ প্রথম সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি জনপ্রিয় কাগজে গোর্কির 'চেলকাস' প্রকাশিত হল।

এটিই বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প যার উপজীব্য একজন বন্দুক চোরের কাহিনী। রূঢ় বাস্তব আর রোমান্টিকতার মিশ্রণে এ এক অপূর্ব সৃষ্টি।

গল্পটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গোর্কি লাভ করলেন অসাধারণ জনপ্রিয়তা। এরপর রুটির কারখানার জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে গোর্কি লিখলেন টুয়েন্টি সিকস মেন অ্যান্ড গার্ল গল্পটি।

এই গল্প তাঁকে এনে দিল সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি চিহ্নিত হলেন চেকভ এবং তলস্তয়ের সমকক্ষ রূপে।

এরপর সাহিত্য রচনাতেই পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন গোর্কি। লিখে চললেন, গল্প, উপন্যাস, নাটক।

একটু একটু করে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ১৮৯৮ খ্রিঃ প্রকাশিত হল তাঁর গল্প সংগ্রহ।

তাঁর প্রথম উপন্যাস ফোমা গার্দেয়েভ প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খ্রিঃ। একই সময়ে প্রকাশিত হয় তলস্তয়ের রেজারেকশান। কিন্তু তলস্তয়ের রচনার জনপ্রিয়তা ম্লান করতে পারেনি ফোমা গার্দেয়েভকে। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় চেকভের।

১৯০৫ খ্রিঃ রাশিয়ার বিপ্লবে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেন গোর্কি। এর কিছুদিন পরেই লন্ডনে লেনিনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। রাশিয়ায় ফিরে আসেন প্রথম মহাযুদ্ধের পরে।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র কাজের মধ্য দিয়ে গোর্কির পরিচয় ঘটেছিল নানাশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে। এদের মধ্যে ছিল চোর, জুয়াড়ী, খুনে, মাতাল, বেশ্যা ইত্যাদি।

সবশেষে সান্নিধ্যে আসেন বিপ্লবী তরুণ দলের। এইভাবে লাভ করা ব্যাপক অভিজ্ঞতাই গোর্কি ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর অজস্র গল্প-উপন্যাস-স্মৃতিচিত্র-আত্মজীবনীর পৃষ্ঠায়।

১৯০৭ খ্রিঃ তাঁর সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠকীর্তি Mother প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হল ঃ লোয়ার ডেপথস, পেটিবুর্জোয়া, ফোমাগোরদিয়েভ, ক্লিম সামঘিন ইত্যাদি।

গোর্কির মাদার উপন্যাস রাশিয়ায় ৫৪টি ভাষায় ও বিদেশে ৪৪টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর সুবিখ্যাত আত্মজীবনীর নাম চাইল্ডহুড, ইন দি ওয়ার্লড, মাই ইউনিভার্সিটিস।

প্রাক-বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর কালে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহিত্যে গোর্কি স্মরণীয় স্রষ্টা। মানবচেতনা প্রসারে তাঁর দান শুধু রাশিয়ায় সীমাবদ্ধ নয়। তা সারা পৃথিবীতে নন্দিত।

কেবল আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক রূপে নয়, মানুষ হিসেবেও তাঁর উদারতা ও হৃদয়ের প্রসারতা ছিল অপরিসীম। এইকারণে তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

জর্জ বার্নাড শ’



শেক্সপীয়রের পরেই ইংরাজি সাহিত্যে যে শ্রেষ্ঠতম নাট্যকারের নাম করা হয় তিনি হলেন জর্জ বার্নাড শ’।

আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে ১৮৫৬ খ্রিঃ ২৩শে জুলাই জন্ম হয় শ-এর। তাঁর বাবার নাম জর্জ কার শ’। মায়ের নাম এলিজাবেথ।

ছেলেবেলায় পড়াশোনায় খুব একটা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি বার্নাড শ। তবে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল খুবই প্রবল। জ্ঞান পিপাসা মেটাবার জন্য পাঠাগারকেই করে নিয়েছিলেন একমাত্র বন্ধু। দশ বছর বয়স হবার আগেই তিনি বাইবেল এবং শেক্সপীয়রের রচনা পড়া শেষ করোছলেন।

তাঁদের পরিবারের প্রায় সকলেই ছিলেন গানবাজনার ভক্ত। শ-এর মা এলিজাবেথও ছিলেন সুগায়িকা।

মায়ের গান শুনতে শুনতে শ-এর ভাবুক মন অজানা এক স্বপ্নরাজ্যে চলে যেত। বর্তমানের গন্ডীর বাইরে এমন এক কল্পরাজ্যে তাঁর মন বিচরণ করত, যেখানে মানুষ একান্তভাবেই ভগবানের কাছে আত্মসমর্পিত। সেখানে হানাহানি নেই, নেই মানুষে মানুষে বিদ্বেষ। সবকিছুতে, সর্বত্র বিরাজমান অনাবিল শান্তি।

ডাবলিনের ওয়েসলি কলেজে শ শিক্ষালাভ করেন এবং বাড়িতে বসেই সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পে কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৮২৬ খ্রিঃ শ' লন্ডনে চলে আসেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিল কিছু লেখা। কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি লেখালিখি শুরু করেছিলেন। ১৮৭৯-৮০ খ্রিঃ মধ্যে শ' পাঁচখানি উপন্যাস রচনা করেন।

কিন্তু লন্ডনের প্রায় সবকটি প্রকাশন সংস্থাই তাঁর লেখা প্রত্যাখ্যান করেছিল। দিনের পর দিন তিনি পান্ডুলিপি বগলে নিয়ে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন। প্রথম নয় বছর লন্ডন বাস কালে বই লিখে তিনি রোজগার করেন মাত্র নয় পাউন্ড।

১৮৮২ খ্রিঃ আমেরিকান অর্থনীতিবিদ হেনরি জর্জ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শ' সমাজবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এতদিন পর তিনি যেন আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেলেন।

শ' অন্যান্য সোশ্যালিস্টদের নিয়ে Favian Society গঠন করলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই একজন সুদক্ষ বক্তা এবং যুক্তিবাদী তার্কিক রূপে খ্যাতি লাভ করলেন। বড় বড় জনসভায় মোটা দক্ষিণার বিনিময়ে তিনি বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

১৮৯০ খ্রিঃ থেকে শ' G.B.S.—আদ্যক্ষরে সঙ্গীত ও নাটক সমালোচনা আরম্ভ করলেন। তাঁর ঋজু এবং প্রগতিবাদী সমালোচনায় রক্ষণশীলদের বিরাগ উৎপাদন করলেও সাধারণ পাঠকদের প্রশংসা লাভ করল।

তাঁর সমালোচনায় বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গকৌতুক এমনভাবে মিশে থাকত যে সংশ্লিষ্ট মহল সেই ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত।

Corno di Bassetto ছদ্ম নামে শ' শিল্প সমালোচনা করতেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর প্রভাবে লন্ডনের সঙ্গীত শিল্প ও নাট্যজগতের ধারা অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের হয়ে উঠেছিল।

সমালোচনার কাজ করতে করতেই শ' নিজে নাটক রচনায় হাত দিলেন। ১৮৯২ খ্রিঃ তাঁর প্রথম নাটক Widowers Houses প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই রচনা দর্শক আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়।

তিনি অগত্যা তাঁর প্রথম দিকের নাটকগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে লাগলেন। এই নাটকগুচ্ছের মধ্যে আছে The Philanderer, Mrs. Warren's Profession।

১৮৯৬ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় Plays Pleasant and Unpleasant, Arms and the Man, Candida এবং You Never can Tell।

শেষোক্ত নাটকটি প্রকাশের পরই পাঠকমহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হল। নাট্যকার রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন শ এবং নাটককেই নিজের ভাবপ্রকাশের বাহনরূপে বেছে নিলেন।

শ তাঁর প্রত্যেকটি নাটকে বিস্তৃত ভূমিকা রচনা করতেন। তাই লেখাগুলো ছিল অতিশয় উপভোগ্য।

নাট্যকার রূপে প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শ-এর জীবনে আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শার্লট পেইন টাউনসেন নামে সমাজবাদে বিশ্বাসী এক ধনী আইরিশ তরুণীকে বিয়ে করলেন।

বিয়ের কিছুদিন পরেই শ রচনা করলেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা। এক ঐতিহাসিক বিষয়কে খুবই সহজ সরল ভাবে ব্যবহার করেছেন এই নাটকে।

ফেবিয়ান পন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে শ স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই সময়ে তিনি কাউন্সিলারও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

শ-এর নাটকগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর নাটকের জন্য লন্ডনের নাট্য দলের ম্যানেজারদের মধ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। তাঁর নাটকের বাণিজ্যিক সাফল্য হয়ে উঠেছিল এমনই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইংলন্ডের ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে শ-এর বক্তব্য প্রথম দিকে বিতর্কের সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত সকলেই তাঁর মতামত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

শ' নিজে যা বিশ্বাস করতেন তা নির্ভীক বলিষ্ঠতার সঙ্গে প্রকাশ করতেন। নীতিবাগিশদের ভণ্ডামিকে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতেন। নিজস্ব নাটকের বিষয়বস্তুকে বিশ্বজনীনতার পর্যায়ে পৌঁছে দেবার বিরল ক্ষমতা ছিল শ-এর।

যৌবনে ঔপন্যাসিক হিসেবে সাহিত্যজীবন শুরু করে পরে নাট্যকার, সমালোচক, সমাজসংস্কারক হিসেবে তিনি যশস্বী হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে রচিত তাঁর Back to Methuselah (১৯২১) এবং Saint Joan (১৯২৩) বিভিন্ন দিক থেকে খাঁটি নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে গৃহীত হয়।

তাঁর অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে মেজর বারবারা, ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান, জন বুলস আদার আইল্যান্ড, দ্য ডক্টরস ডায়লামা, গেটিং মেরিড, ফ্যানিস ফার্স্ট প্লে, পিগম্যালিওন, জেনেভা উল্লেখযোগ্য।

এসব নাটক ছাড়াও শ উত্তেজনামূলক বিভিন্ন গ্রন্থও রচনা করেন—The Intelligent Womani's Guide to Socialism and Capitalism, The Adventures of a Black Girl in Search of God প্রভৃতি।

১৯২৫ খ্রিঃ সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় জর্জ বার্নাড শকে। মূলতঃ সেন্ট জোয়ান গ্রন্থের জন্যই ছিল তাঁর এই পুরস্কার। কিন্তু শ পুরস্কারের অর্থ নিতে রাজি হন না। সেই অর্থ সবটুকুই তিনি দান করেছেন।

লন্ডন ইউনিভার্সিটি তাঁকে ডক্টরেট এবং স্বয়ং রাজা তাঁকে নাইট উপাধি দিতে চান। কিন্তু এ সমস্তই তিনি সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করেন।

শ তাঁর রচনায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করেছেন, ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাত চালিয়েছেন। এর ফলে তাঁর সমসাময়িক কালে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সবচেয়ে বিতর্কিত পুরুষ। সারা জীবন ধরে তিনি যা সত্য বলে বুঝেছেন তাই প্রচার করেছেন।

চুরানব্বই বছর বয়সে ১৯৫০ খ্রিঃ ৩রা নভেম্বর বার্নাড শ' পরলোক গমন করেন।

আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে



প্রখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জন্ম ১৮১৯ খ্রিঃ ২১শে জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েস রাজ্যের ওক পার্কে।

তাঁর বাল্যকাল কেটেছে বিচিত্র পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে। বাবা ছিলেন ডাক্তার। আর শিকার পাগল মানুষ। হেমিংওয়ে শিকারে হাত পাকিয়ে ছিলেন ছেলেবেলায় বাবার কাছ থেকেই।

অন্যদিকে মা ছিলেন সংগীত রসিক। তাঁর ইচ্ছা ছিল ছেলে সংগীতজ্ঞ হবে। পিতামাতা দুজন ভিন্ন রুচির মানুষ, ফলে তাঁদের মধ্যে কারণে অকারণে অশান্তি আর খিটিমিটি লেগেই থাকত। এই পরিবেশে হেমিং-এর মন স্বভাবতঃই নিঃসঙ্গ বোধের শিকার হয়ে পড়েছিল।

পড়াশোনা শুরু হয়েছিল ওকপার্ক হাইস্কুলে। যথেষ্টই মনোযোগী ছাত্র ছিলেন হেমিং। স্কুলের পড়ার বইয়ের বাইরের জগৎ সম্পর্কে ছিল তীব্র অনুসন্ধিৎসা। ফলে নানা বিষয়ের বই নিয়ে ডুবে থাকতেন।

হেমিং-এর পড়াশোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত পৌছয়নি। তার আগেই তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ক্যানসাস সিটিস্টার পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে জীবন শুরু করেন।

হেমিং সাংবাদিক হিসেবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। টরান্টো স্টার পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে তাঁকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতে হয়েছিল।

১৯২৫ খ্রিঃ তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ ইন আওয়ার টাইমস এবং পরের বছর প্রথম উপন্যাস দ্য সান অলসো রাইজেস প্রকাশিত হবার পর হেমিং লেখক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

সাহিত্য রচনার সহজাত প্রতিভা নিয়ে জন্মালেও হেমিং বাল্যবয়স থেকেই বিচিত্র মানসিকতার শিকার হয়ে পড়েছিলেন।

বলাই বাহুল্য বাবা-মায়ের অ-মিল সংসার থেকেই এই অস্থিরতা তার মধ্যে বাসা বেঁধে ছিল।

যৌবনে নিজে যখন বিয়ে করলেন, বারবার নিজের সংসার ভাঙ্গল, গৃহসুখ বা সংসার বন্ধন বলে কিছুই প্রায় ছিল না তাঁর।

১৯২১ খ্রিঃ থেকে ১৯৪৬ খ্রিঃ পর্যন্ত চারবার বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তাঁর জীবনে। তাঁর চতুর্থ স্ত্রী মারী ছিলেন ওয়েলস ডেলি এক্সপ্রেসের ফিচারিস্ট। জীবনে চরম প্রতিষ্ঠার সময়ে এই স্ত্রীই ছিলেন তাঁর পাশে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ উপন্যাস এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস (১৯২৯ খ্রিঃ) প্রকাশের পর হেমিংওয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর রচনা জার্মান ফ্রান্স সহ আরো অনেক ভাষায় অনূদিত হতে থাকে।

অনেকের মতে হেমিংওয়ের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল স্পেনীয় যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় রচিত উপন্যাস ফর হুম দ্য বেল টোলস।

বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৪০ খ্রিঃ। তাঁর গীতিধর্মী অসামান্য উপন্যাস দ্য ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সী প্রকাশিত হয় ১৯৫২ খ্রিঃ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে মেন উইদাউট উইমেন (১৯২৭), উইনার টেক নাথিং (১৯৩৩), টু হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাভ নট (১৯৩৭), স্পেন দেশের ষাঁড়ের লড়াই বা বুল ফাইট নিয়ে রচিত ডেথ ইন দ্য আফটারনুন (১৯৩২) এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত আত্মজীবনীমূলক রচনা এ মুভেবল ফিস্ট (১৯৬৪) ও আইল্যান্ড ইন দ্য স্ট্রীম (১৯৭০)।

হেমিংওয়ে ১৯৫২/১৯৫৩ খ্রিঃ পুলিৎজার পুরস্কার এবং ১৯৫৪ খ্রিঃ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

হেমিংওয়ের বাবা আত্মহত্যা করে জীবনযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন (১৯২৮ খ্রিঃ)। তিনি নিজেও বহুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৬১ খ্রিঃ আত্মহত্যার মধ্য দিয়েই জীবনাবসান ঘটে।

পাবলো নেরুদা

চিলির জাতীয় কবি পাবলো নেরুদা লাতিন আমেরিকার কবি রূপেই প্রসিদ্ধ। দেশপ্রেম ও মানবতার আবেদনধর্মী কবিতার জন্য তিনি আজ সারাবিশ্বে পরিচিত।

আসল নাম নেফতালি রিকার্দো রেয়েজ বাসোয়াল্‌তো (Neftali Ricardo Reyes Basoalto), জন্ম চিলির পারেলের রিকাডো গ্রামে ১৯০৪ খ্রিঃ ১২ই জুলাই। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাটে দক্ষিণ চিলির সীমান্তবর্তী শহর তেমুকাতেয়।

নেরুদার পিতা যোশে কার্মেন রেয়েজ ছিলেন আরাউকো প্রদেশে নতুন নতুন রেললাইন বসাবার কাজে নিযুক্ত। সেখানকার বেশির ভাগ মানুষেরই জীবিকা ছিল পশুপালন ও কৃষি।

এই সরলপ্রাণ কৃষিজীবী মানুষদের সংস্কারমুক্ত সমাজ ও ধর্মের আবহাওয়ায় এবং বন্যপ্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে নেরুদা বড় হয়ে ওঠেন।

নেরুদার মা রোজা বাসোয়াল্টো ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা। মাত্র তিন বছর বয়সেই নেরুদা মাতৃহারা হন। মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা পুনরায় বিয়ে করে সপরিবারে চলে এসেছিলেন তেমুকোতে।

স্কুলের পড়ায় বিশেষ মনোযোগ ছিল না নেরুদার। তিনি পড়তেন বাইরের বই—জুলে ভার্ন, ভিক্টর হুগো, ওয়াল্টার স্কট, আর ম্যাক্সিম গোর্কির লেখার মধ্যে সারাক্ষণ ডুবে থাকতেন। এভাবেই শৈশব থেকে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করেছিল।

মাত্র দশ বছর বয়সেই কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। এই বয়সেই কবিতার বিষয় নির্বাচনের প্রতি ছিল তাঁর সতর্ক নজর। কবিতা লেখার সুবাদে পরিচিত মহলে কবিখ্যাতি লাভ করেন ১৩ বছর বয়সের মধ্যেই।

এই সময়েই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় চিলির তৎকালীন বিখ্যাত কবি গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রালের। গ্যাব্রিয়েলা ১৯৪৫ খ্রিঃ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। নেরুদার জীবনে তাঁর প্রেরণা গভীর রেখাপাত করেছিল।

স্কুলের পড়া শেষ করে নেরুদা ফরাসী ভাষা শেখার জন্য ভর্তি হন সানটিয়াগোর অপর একটি স্কুলে। কিন্তু তিনি নিজের সাহিত্যচর্চা নিয়ে এতই মেতে উঠেছিলেন যে পড়াশোনায় বেশি দূর অগ্রসর হতে পারলেন না।

পনের বছর বয়স থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পাবলো নেরুদা ছদ্মনামে নিয়মিত কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত কবি হওয়ারই স্বপ্ন দেখছেন তখন তিনি।

এই বয়সে তাঁর কবিতার বিষয় ছিল প্রেম ভালবাসা, বিরহ, মৃত্যু এই অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

নেরুদার প্রথম কবিতার বই টুইলাইট প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রিঃ। প্রথম বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। উৎসাহিত হয়ে তিনি পরের বছরেই প্রকাশ করলেন দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ Veinte Poemas de amar বা কুড়িটি প্রেমের কবিতা।

বয়স কুড়িতে পৌছনোর আগেই নেরুদার কবিখ্যাতি সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ততদিনে তিনি অর্জন করেছেন নিজস্ব শৈলী ও বক্তব্য। বেরিয়ে এসেছেন প্রচলিত প্রকরণ ও ঢঙ-এর গন্ডি থেকে।

কবিতার পাশাপাশি গল্প লেখাতেও হাত দিয়েছিলেন নেরুদা। তাঁর প্রথম উপন্যাস El habitante ysu caperanza বা নিবাসী ও তার আশা প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রিঃ।

পরের বছর থেকেই শুরু হল নেরুদার বিচ্ছিন্ন কূটনৈতিক জীবন। ১৯২৭ খ্রিঃ থেকে পাঁচবছরের জন্য তাঁকে দূতাবাসের চাকরিতে নিয়োগ করলেন চিলি সরকার। দেশের বুদ্ধিজীবীদের সম্মান জানাবার এটাই ওই দেশের সরকারের প্রচলিত রীতি।

নেরুদা প্রথমে গেলেন ব্রহ্মদেশ, সেখান থেকে রেঙ্গুন, তারপর কলম্বো এবং পরে জাভায় কাটালেন নিঃসঙ্গ জীবন।

কবিতা রচনাই ছিল তাঁর এই বিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গী। প্রবাসবাসকালীন রচনা Residencia eu latierra বা পৃথিবীর বাসা কবিতাগুচ্ছ।

দেশের বাইরে থাকার যন্ত্রণা ও "একাকীত্ব" স্মৃতিমেদুরতা ছিল এই কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু।

চিলি সরকারের কনসাল হয়ে ১৯৩৩ খ্রিঃ নেরুদা গেলেন স্পেনে। বার্সিলোনা ও মাদ্রিদে এলেন জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিহত কবি ফেদেরিকো গার্সিয়া কাফকা তাঁকে প্রভাবিত কবলেন।

কূটনৈতিক জীবনে এসে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হলেন রাজনীতির প্রতি। পালাবদল এলো কবিতাতেও। তাঁর লেখায় ধ্বনিত হল লরকার হত্যার বিরুদ্ধে আবেগময় প্রতিবাদ। এই কারণে তাঁকে হারাতে হল কনসালের পদ ১৯৩৭ খ্রিঃ।

১৯৪০ খ্রিঃ থেকে ৪৩ খ্রিঃ পর্যন্ত তিন বছর কনসাল রূপে মেক্সিকোতে কাটালেন। এই সময়েই নেরুদা মার্কসবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। হয়ে উঠলেন পুরোপুরি সৈনিক।

১৯৪৫ খ্রিঃ নেরুদা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং চিলির আইনসভা সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন।

রাজনীতিতে যোগ দেবার পর দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসাই তাঁকে প্রেসিডেন্ট ভিদেলার জনস্বার্থ বিরোধী কাজের সমালোচনা করতে উৎসাহ যোগাল।

এই সময় গ্রেপ্তার হবার আশঙ্কায় তাঁকে আত্মগোপন করতে হল। তাঁর সরকার বিরোধী ছড়া তখন ফিরতো লোকের মুখে মুখে।

চিলির মহাকাব্য বলে কথিত Canto General বা কান্ড সর্বময় প্রকাশিত হল ১৯৫০ খ্রিঃ।

১৯৫২ খ্রিঃ নাগাদ চিলির বামপন্থী বিরোধী আইন কিছুটা শিথিল হলে নেরুদা দেশে ফিরে এলেন। এই সময় তাঁর কবিতার ধরন-ধারণ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। তাঁর লেখা হয়ে উঠল সমাজের বৃহত্তর অংশের আদরণীয়। তিনি হলেন সাধারণের প্রিয় কবি।

১৯৫৫ খিঃ নেরুদা বিয়ে করলেন মাতিল দে উরুতীয়াকে। বিয়ের অব্যবহিত আগে এবং পরে লিখলেন অসংখ্য প্রেমের কবিতা। ১৯৫৯ খ্রিঃ প্রকাশিত হল তাঁর প্রেম বিষয়ক সনেট শতক Cien Sonetos dc amar।

বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ করে কবি তাঁর কবিতার মোড় ফিরিয়েছিলেন। বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল ভ্রমণ, রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত জীবনেব সুখ-দুঃখের হিসেব নিকেশের প্রসঙ্গ।

১৯৬৭ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় তাঁর গীতিনাট্য Fulgar 4 muirte de Joaquin Murieta বা হোয়াকিন মুরিয়েতের মহিমা ও মৃত্যু এবং মানব প্রগতি ও সৃষ্টি সম্পর্কে অতিকথনমূলক কবিতা La eshada encendida বা জাজ্জ্বল্যমান তরবারি।

ইতিমধ্যে চিলির রাজনৈতিক পটভূমিতে এলো পরিবর্তন। ১৯৭০ খ্রিঃ সালভাদর অলিন্দে চিলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। নেরুদাকে রাষ্ট্রদূত হয়ে যেতে হল প্যারিসে।

এখানে অবস্থান কালেই নেরুদা পেলেন তাঁর সাহিত্যের সর্বোচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি নোবেল পুরস্কার (১৯৭১ খ্রিঃ)। এর আগে তিনি পেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার এবং লেনিন ও স্তালিন পুরস্কার।

চিলিতে গৃহযুদ্ধের মুখে মুখে রোগাক্রান্ত নেরুদা ফিরে এলেন দেশে। তাঁর স্মৃতিকথা Confi csoque he vivido : Memorias (১৯৭১ খ্রিঃ)-এর চূড়ান্ত রূপ দিলেন।

রোগাক্রান্ত অবস্থাতেই ১৯৭১খ্রিঃ ২৩ শে সেপ্টেম্বর চিলির প্রিয় মানুষ নেরুদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

লর্ড জর্জ গর্ডন বায়রন



ইংলন্ড তথা ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কবিপ্রতিভা তাঁকে করে তুলেছিল ইউরোপ মহাদেশের একসময়ের বহু আলোচিত রোমান্টিক নায়ক। লন্ডনের অভিজাতসম্প্রদায়ের যুবকেরা ও মেয়েরা তাঁকে অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। এমনকি পোশাকে পরিচ্ছদেও।

বায়রন-অঙ্কিত চরিত্রের অনুকরণে তাঁরা বিষাদগ্রস্ত রোমান্টিক নায়কদের মত আচরণ করতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

এই অনুকরণপ্রিয়তা সারা ইউরোপে, বিশেষতঃ জার্মানীতে প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। জার্মানীতে বায়রনের স্থান শেক্সপীয়রের পরেই।

১৭৮৮ খ্রিঃ ২২ জানুয়ারি লর্ড বায়রনের জন্ম। জন্মসূত্রে তিনি দুটি অভিজাত পরিবারের সঙ্গে যুক্ত।

তাঁর বাবা জন বায়রন ছিলেন ইংরেজ। মা ক্যাথারিন গর্ডন ছিলেন অভিজাত স্কটিশ মহিলা।

বায়রনের চরিত্রে ফুটে উঠেছিল একই সঙ্গে উদ্দামতা ও বন্যতা এবং উদারতা ও স্নেহশীলতা। বাবা ও মা বিপরীত স্বভাবের এই দুজনের সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছিলেন বায়রন।

জন্মের কিছুদিন পরেই বায়রনের পিতা জন বায়রন তাঁর মাকে ছেড়ে নিরুদ্দেশ হন। স্বভাবের জন্য লোকে তাঁকে বলত ম্যাড জ্যাক। শিশুপুত্রকে নিয়ে ক্যাথারিনের জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ হয় অ্যাবার্ডিন শহরে।

মিসেস ক্যাথারিন ছিলেন উদারচেতা ও স্নেহশীলা এবং একই সঙ্গে প্রচন্ড বদমেজাজী ও বদরাগী। তাঁর পুত্রের মধ্যেও এই স্বভাবের সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

জন্ম থেকেই বায়রন ছিলেন খঞ্জ। সম্ভবতঃ শিশুপক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হওয়াতেই তাঁর একটি পা বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বায়বন সারাজীবন ধরে তাই বিষণ্ণতার বোঝা বয়ে বেড়িয়েছেন। তাঁর এই বিষণ্ণতা তাঁর সাহিত্যেও ওতপ্রোত হয়েছিল।

পাঁচবছর বয়সেই লেখাপড়া শুরু হয়েছিল বায়রনের। পড়তে শিখেই তিনি ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন।

স্কুলে পড়ার সময় মুষ্টিযুদ্ধ ও সাঁতারেও খুব দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন বায়রন। ১৮০৫ খ্রিঃ তিনি ক্রিকেটও খেলেছেন।

ডালউইচ বিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন হ্যারোতে ১৮০১ খ্রিঃ। এখান থেকে বেরিয়ে ১৮০৫ খ্রিঃ কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। এখানে পড়াকালীনই তাঁর উশৃঙ্খল জীবনযাত্রার শুরু হয়।

তবে এক মুষ্টিযোদ্ধা বন্ধুর প্রভাবে শরীরচর্চা করে সুঠাম ও সুন্দর দেহের অধিকারী হয়েছিলেন।

কলেজে পড়ার আগেই বায়রনের কাব্যচর্চা শুরু হয়েছিল। ১৮০৭ খ্রিঃ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ Hours of Idleness প্রকাশিত হয়।

বিশেষ উঁচু মানের না হলেও কাব্যগ্রন্থটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এডিনবরা রিভিউ নামের পত্রিকায় বইটির বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

এর ফলে বায়রন মনে আঘাত পেয়ে ইংরাজ সাহিত্যিকদের প্রতি ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। একবছর পরে তিনি লিখলেন English Birds and Scotch Reviewers.

এবারের বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা লাভ করল। একমাসের মধ্যেই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বেহিসেবী খরচ এবং উশৃঙ্খল স্বভাবের কারণে মায়ের সঙ্গে বায়রনের সম্পর্ক দিন দিনই খারাপ হয়ে পড়ছিল। এ সত্ত্বেও কবি তাঁর স্বভাব শুধরাবার চেষ্টা করেননি। ঋণের পর ঋণ করে খেয়াল খুশি মত আনন্দ ফুর্তি করে টাকা ওড়াতেন।

নিউস্টেটের পৈতৃক বাড়িতে বসবাস কালেই ১৮০৯ খ্রিঃ বায়রন তাঁর এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এই সময় তিনি গ্রীস, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন।

আলবানিয়া হয়ে গ্রীসে যাবার পথে বায়রন লিখতে শুরু করেন তাঁর অমর সৃষ্টি Child Harold's Pilgrimage।

আলবানিয়ার বন্য সৌন্দর্য আর আধাসভ্য অধিবাসীদের দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন বায়রন। তাঁর ভ্রমণ-অভিযানের কাহিনীই বর্ণিত হয়েছিল এই বইটিতে।

গ্রীসের এথেন্সে তিন মাস বাস করেন বায়রন। ছেলেবেলা থেকেই ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। তাই গ্রীসের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ও প্রাচীন কীর্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ তাঁকে মোহিত করেছিল।

১৮৪৪ খ্রিঃ বায়রন ইংলন্ডে ফিরে আসেন। এদিকে পাওনাদারদের অস্থিরতাও বেড়ে উঠেছিল। তিনি যখন ঋণের দায়ে ব্যতিব্যস্ত সেই সময়েই তাঁর মা মারা যান।

ডালমে নামে বায়রনের একজন সাহিত্যানুরাগী বন্ধু ছিলেন। বায়রন তাঁকে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণকালে রচিত চাইল্ড হ্যারল্ডের প্রথম দুটি সর্গ পড়তে দিয়েছিলেন।

এই সূত্রেই আকস্মিকভাবে ভাগ্য বিপর্যস্ত বায়রনের জীবনে ঘটল এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। তিনি রাতারাতি ইংলন্ডে নায়কের মর্যাদা লাভ করে বসলেন।

ডালমে বন্ধুর কাব্যটি পড়ে এমনই মুগ্ধ হলেন যে তিনি এক প্রকাশককে দিলেন সেটি প্রকাশের জন্য।

প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরে পরেই বায়রন হাউস অব লর্ডস্-এ যোগ দিয়েছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি নিউস্টেটের পৈতৃক বাড়িতে জোরদার ভোজসভারও আয়োজন করেছিলেন।

তিনি যেদিন হাউস অব লর্ডস-এ প্রথম ভাষণ দিলেন তার কয়েকদিন পরেই প্রকাশিত হল চাইল্ড হ্যারল্ড-এর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব।

হাউস অব কমন্স-এ মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে ভাষণ দিয়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি। চাইল্ড হ্যারল্ড তাঁকে রাতারাতি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছে দিল। লন্ডন শহর যেন বইটি নিয়ে উন্মাদ হয়ে উঠল।

নিজের এই অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বায়রন বলেছেনঃ একদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গলে দেখি আমি বিখ্যাত হয়ে গেছি।

লন্ডনের অভিজাত সম্প্রদায় বায়রনকে সাদরে বরণ করে নিলেন। মেয়েরা তাঁকে দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন।

ভাগ্যের অবিশ্বাস্য প্রসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে সকলের অলক্ষে এই সময়ে বিপর্যয়ের অঙ্কুরও রোপিত হল।

নিঃসঙ্গ, সদা-বিষণ্ন রহস্যময় রোম্যান্টিক তরুণ কবি অতি দ্রুত একাধিক প্রেমের ঘটনায় জড়িয়ে পড়লেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে এবং গৃহিণীরাই ছিলেন তাঁর প্রেমপাত্রী।

এই সময়েই পরপর প্রকাশিত হল তাঁর কাব্যগ্রন্থ The Giaur (১৮১৩ খ্রিঃ); The Bride of Abydas (১৮১৩ খ্রিঃ), The Carsair (১৮১৪খ্রিঃ), Lara (১৮১৪ খ্রিঃ)।

১৮১৫ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে বায়রন অ্যাসবেলা মিলব্যাককে বিয়ে করেন। এই বিয়েই বায়রনের জীবনে দুঃসময় ডেকে আনল।

বিয়ের একবছর পরে বায়রন দম্পতির একটি কন্যাসন্তান জন্মাল। মেয়েটির নাম রাখা হয়েছিল অগাষ্টাস আভ। মেয়ের জন্মের পাঁচসপ্তাহ পরেই লেডি বায়রন তাঁর স্বামীকে ছেড়ে চলে যান।

বায়রনের বিবাহ-বিচ্ছেদের সঠিক কারণ জানা যায় না। তবে এই ব্যাপার নিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

আর এই ক্ষোভ ছিল বায়রনের বিরুদ্ধে। খবরের কাগজগুলোতেও তাঁর বিরুদ্ধে লেখালেখি চলতে লাগল।

ফোঁড়ার ওপর শাকের আঁটির মত এই সময়ে বায়রনের আর্থিক দুরবস্থাও চরমে উঠেছিল। পাওনাদাররাও সমালোচকদের সঙ্গে সুর মিলাল।

রাতারাতি যেমন একদিন তিনি দেশজুড়ে বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন তেমনি রাতারাতিই তিনি হয়ে উঠলেন সমাজের সকলের ঘৃণার পাত্র। ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন।

১৮১৬ খ্রিঃ বায়রন চিরকালের জন্য দেশ ত্যাগ করলেন।

লন্ডন ছেড়ে জেনেভায় এসে বাস করতে লাগলেন বায়রন। এই সময়েই লিখলেন The Prisoner of Chillon (১৮১৬ খ্রিঃ)। বেশ কিছু ছোট কবিতার সঙ্গে চাইল্ড হ্যারল্ড-এর শেষ পর্বও সমাপ্ত করলেন।

এই সময়কালেই জেনেভায় বিখ্যাত কবি শেলির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে বায়রনের এবং অল্পসময়ের মধ্যেই দুজনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

উত্তর ইটালি ঘুরে বায়রন এসে বাস করতে লাগলেন ভেনিসে। তখনো সমানে চলছিল তাঁর অমিতব্যয়ী জীবনযাপন। তবে সৃজনশীলতা কখনো ব্যাহত হতে দেননি তিনি।

Manfred (১৮১৭ খ্রিঃ) ইত্যাদি কয়েকটি বই সহ Don Juan-এর দুটি পর্বও এই সময়ে রচনা করেন বায়রন।

১৮২১ খ্রিঃ প্রকাশিত হল Cain। বইটি ইংলন্ডে খুবই আলোড়ন তুলল। ধর্মীয় মৌলবাদীরা বইটির নিন্দায় সরব হয়ে উঠল।

বায়রনের অমর সৃষ্টি Don Juan রচনা চলাকালীন (১৮১৯ খ্রিঃ-১৮২৪ খ্রিঃ) সময়ে গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করল। বায়রন গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন এবং গ্রীসের সমর্থনে অস্ত্র ধারণ করলেন।

যুদ্ধকালেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে ১৮২৪ খ্রিঃ ১৯ শে এপ্রিল বায়রন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বায়রনের কবি-প্রতিভা সমগ্র ইউরোপের সমসাময়িক সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বর্ণময় রচনাশৈলী এবং সমসাময়িক চিন্তাধারার প্রতি ব্যঙ্গাত্মক কটাক্ষই বায়রনকে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল।

নিজের জীবদ্দশায় অন্য কোন কবির ভাগ্যেই এমন ঘটনা ঘটেনি। একটা বিষণ্ণতা বোধ বা কল্পিত দুঃখবোধ বায়রনের সারাজীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাঁর প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই তাই একটি ভুরু কোঁচকানো ভাব ফুটে উঠেছে। এখানেই কবি বায়রনের বিশিষ্টতা। উল্কার মতই ছিল তাঁর আবির্ভাব। উল্কার মতই ঘুরে বেড়িয়েছেন ইউরোপের সর্বত্র। একদিন আবার উল্কার মতই আকস্মিকভাবে অন্তর্ধান ঘটেছিল তাঁর।

অস্কার ওয়াইল্ড



সম্পূর্ণ নাম ছিল অস্কার ফিঙ্গাল ও' ফ্ল্যাহাটি উইলস ওয়াইল্ড। পরবর্তীকালে মাঝের তিনটি শব্দ বাদ রেখে নিজেই পিতৃদত্ত নামের পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন— অস্কার ওয়াইল্ড।

ইংরাজি সাহিত্যের তথা বিশ্বসাহিত্যের অবিস্মরণীয় নাম অস্কার ওয়াইল্ড। গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের প্রধান শাখাগুলোতেই তিনি রেখে গেছেন বিশিষ্ট অবদান।

১৮৫৪ খ্রিঃ ১৬ অক্টোবর আয়ার্ল্যান্ডের ডাবলিন শহরে জন্মেছিলেন। বংশগতভাবে ওয়াইল্ডরা ছিলেন ওলন্দাজ। সপ্তদশ শতকে তাঁদের এক পূর্বপুরুষ হল্যান্ড ছেড়ে আয়ার্ল্যান্ডে এসে বসবাস করেন।

অস্কারের বাবা উইলিয়ম ওয়াইল্ড ছিলেন চোখ ও কানের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। চোখের অস্ত্রোপচার করে ছানি বাদ দেবার পদ্ধতির উদ্ভাবন করে তিনি জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি এখনো পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে থাকে।

পেশাগতভাবে চোখের চিকিৎসক হলেও সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও ইউলিয়ম ওয়াইল্ডের আগ্রহ ছিল। তিনি পুরাতত্ত্ব, লোককাহিনী প্রভৃতি বিষয়ে এবং ব্যঙ্গাত্মক রচনার লেখক জোনাথন সুইফট সম্পর্কেও বই লিখেছিলেন।

সাহিত্যের প্রতিভা অস্কার উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে।

তাঁর মা জেন ফ্রান্সেসকা এলগিও ছিলেন লেখিকা। তিনি ছিলেন ইয়ং আয়ার্ল্যান্ড মুভমেন্ট-এর প্রথম সারির নেত্রী। স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন ইংরাজ বিরোধী। তিনি প্রবন্ধ ও কবিতা লিখতেন স্পেরানজা ছদ্মনামে।

এসব রচনার মাধ্যমে তিনি জাতীয়তাবাদ প্রচার করতেন এবং দেশবাসীকে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করতেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতি এবং দয়ালু। তবে বেশ খামখেয়ালি।

মায়ের সাহিত্য প্রতিভার সঙ্গে স্বভাবের এই দুর্বলতার অংশও অস্কার পেয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে অস্কার বহুবার খামখেয়ালের বশে বিস্ফোরক মন্তব্য করে বিব্রত হয়েছেন।

ওয়াইল্ড দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন অস্কার। বাল্যে পড়াশুনো শুরু হয়েছিল ইনিস্কিলেন-এর পোটোরা রয়াল স্কুলে। তবে বাঁধাধরা পড়াশোনার প্রতি তাঁর কখনোই আগ্রহ ছিল না।

পরে প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি কঠোর মতামত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমরা শেখাই কি করে সব কিছু মনে রাখতে হবে। কিন্তু কি করে বড় হতে হবে স্কুলগুলোতে আমরা তা শেখাই না।

তবে স্কুলে পড়াশোনার সময়েই চিরায়ত গ্রীক, ল্যাটিন, শিল্পসাহিত্য এবং আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়ে কল্পনা প্রসারের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এর ফলে অল্পবয়সেই তাঁর জ্ঞানের জগতে ঘটল ব্যাপ্তি।

স্কুলের পড়া শেষ করে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হলেন অস্কার। এখানকার পরিবেশ ছিল গ্রীক জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধির অনুকূল। ফলে এখানে পড়া চলাকালীনই তিনি লাভ করলেন ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ, অক্সফোর্ডের ম্যাকডেলান কলেজে পড়ার জন্য বৃত্তি এবং গ্রীকসাহিত্যে ব্যুৎপত্তির জন্য বার্কলে স্বর্ণপদক।

অস্কারের উজ্জ্বল প্রতিভা এইভাবেই তার বিকাশের পথ করে নিতে লাগল ধাপে ধাপে।

১৮৭৪ খ্রিঃ অক্সফোর্ডে ভর্তি হলেন অস্কার। এখানে তিনি মনেপ্রাণে হয়ে উঠলেন সৌন্দর্যের পূজারী। তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল কি করে নিজেকে সৌন্দর্যের যোগ্য করে তুলবেন তার চেষ্টা।

১৮৫০ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রি-র‍্যাফেনাইট ব্রাদারহুড। শিল্পকলায় চলতি প্রথার প্রতিবাদ স্বরূপই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সংস্থা।

শিল্পকলাকে জীবন ও প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রতিবাদী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ, শিল্পকলা হবে নির্মল ও কলুষমুক্ত এবং বাস্তবতার সম্পর্ক রহিত—এই ছিল এই আন্দোলনের মূলসূত্র।

অস্কার পরবর্তীকালে বলেছেন তাঁর এক প্রবন্ধে, শিল্পকলা জীবনকে নয়, জীবনই শিল্পকলাকে অনুসরণ করে।

অক্সফোর্ডে অস্কারের চিন্তাভাবনা পরিপুষ্টি লাভের সুযোগ পেয়েছিল দুই পন্ডিত শিক্ষক জন রাসকিন এবং ওয়াল্টার প্যাটারের সাহচর্যে।

অক্সফোর্ড থেকে লন্ডনে ফিরে এলেন অস্কার। এখান থেকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন কলাবিভাগের প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী। এছাড়া সঙ্গে ছিল রাভিনা কবিতার জন্য পাওয়া নিউডিগেট পুরস্কারের (১৮৭৮ খ্রিঃ) স্বীকৃতি।

কিন্তু এই সব কাগুজে সম্মানে সন্তুষ্ট ছিলেন না অস্কার। তিনি ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। গতানুগতিকতার বিরোধী। চারদিকে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হবে—সকলের মুখে মুখে আলোচনার বিষয় হয়ে থাকতে হবে এই ছিল তাঁর প্রবণতা।

সহসা বিচিত্র পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করলেন। গায়ে চড়ালেন বড় গলাওয়ালা শার্ট, সিল্কের কাপড়ের বিনুনি করা মখমলের জ্যাকেট, পরনের ট্রাউজার হাঁটু পর্যন্ত আঁটোসাঁটো, গলায় বেঢপ মাপের টাই, পায়ে উঠল কালো সিল্কের মোজা আর বকলস দেওয়া জুতো।

ল্যাভেন্ডার রঙের দস্তানা পরা হাতে নিলেন একটা বেতের লাঠি, তার গায়ে আবার মূল্যবান পাথর বসানো খোদাই করে।

সাতাশ বছরের সুদর্শন যুবক অস্কারের এই পোশাক আর মুখের চটকদার কথা—অল্পসময়ের মধ্যেই সকলের আলোচনার পাত্র হয়ে উঠলেন তিনি।

খুব ভাল কথা বলতে পারতেন অস্কার। যারা শুনত তারা মুগ্ধ না হয়ে পারত না, তাঁর মত আলাপপটু ও বাগ্মী ব্যক্তি সেই সময়ে খুব কমই ছিল।

একবার এক বন্ধুকে স্রেফ কথা বলেই আত্মহত্যার সংকল্প থেকে ফিরিয়ে এনে ছিলেন। বন্ধুর মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় শুধুমাত্র এটুকু বুঝিয়ে যে জীবন অমূল্য এবং সতত সুখের।

কথাবলার বিস্ময়কর ক্ষমতা নিয়ে তাঁর সুখ্যাতি ছিল সমাজের সর্বস্তরে। চার্চিল একবার এক প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিলেন পরলোকে গিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি সুখী হবেন যদি সেখানে তিনি অস্কার ওয়াইল্ড-এর দেখা পান।

কেবল পোশাক আর বাকপটুতার জন্যই অতি অল্পসময়ের মধ্যেই অস্কার হয়ে উঠলেন সমাজের প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

১৮৮২ খ্রিঃ বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ পেয়ে নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন অস্কার। ফিরে এসেছিলেন প্রচুর সুখ্যাতি আর হাজার হাজার পাউন্ড সঙ্গে করে। তবে আমেরিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে যা বলেছিলেন তা ছিল রীতিমত বিস্ফোরক। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বলেছিলেন, লোকের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয় আমেরিকানরা তা জানে না। এরা শিল্পকলা বোঝে না। যন্ত্র নিয়েই সারাক্ষণ মেতে থাকে।

১৮৮৪ খ্রিঃ এক আইরিশ ব্যারিষ্টারের সুন্দরী কন্যা কনস্ট্যান্সি লয়েডকে বিয়ে করলেন। তাঁদের দুটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল। নাম রাখা হয়েছিল সিরিল ও ভিভিয়ান।

প্রকৃত অর্থে অস্কারের সাহিত্যচর্চার শুরু হয় দ্য উওম্যানস ওয়ার্ল্ড সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনার সূত্রে। তার আগে আশির দশক পর্যন্ত কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র।

১৮৮৬ খ্রিঃ থেকে আরম্ভ হল গদ্য রচনা। একের পর এক গল্প প্রকাশিত হতে লাগল।

দ্য হ্যাপি প্রিন্স, দ্য সেলফিস জায়েন্ট ও দ্য রিমার্কেবল রকেট নামের বিশ্বখ্যাত রূপকথার গল্পগুলি এই সময়েই লেখা হল। তাঁর রূপকথার গল্পগুলিতে ছিল অবাধ কল্পনা আর ব্যঙ্গের নিপুণ সংমিশ্রণ।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছেই তাঁর লেখা সমাদৃত হল। কোথাও কোন লেখা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য উচ্চারিত হল না।

ইতিমধ্যে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম উপন্যাস দ্য পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে এবং প্রবন্ধ পুস্তক দ্য সেলি অব ম্যান আন্ডার সোশ্যালিজম।

উপন্যাস ও প্রবন্ধ পুস্তকের সূত্রে এবারে প্রচন্ড আলোড়ন উঠল। অভিজাত সম্প্রদায়ের মজ্জাগত মূল্যবোধের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত এবং তার বিরুদ্ধে তারুণ্যের বিপ্লবের জয়গান স্বাভাবিকভাবেই সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। কিন্তু দমলেন না অস্কার।

এরপর তিনি আসরে নামলেন নাটক নিয়ে। পর পর প্রকাশিত হল সামাজিক কমেডিগুলো—লেডি উইন্ডারমেয়ারস ফ্যান (১৮৯২ খ্রিঃ), এ উওম্যান অব নো ইম্পরট্যান্স (১৮৯৩ খ্রিঃ), এন আইডিয়াল হ্যাজব্যান্ড (১৮৯৫ খ্রিঃ) এবং দ্য ইমপরট্যান্স অব বিয়িং আর্নেস্ট (১৮৯৫ খ্রিঃ)।

সেন্ট জেমস থিয়েটারে অনেক নাটকের অভিনয় হল সাফল্যের সঙ্গে। প্রশংসা পেলেন অস্কার। বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী বলে খ্যাতিমান হলেন। এইভাবে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছলেন একজন আইরিশ নাইটের দরিদ্র সন্তান।

এরপরেই অস্কারের জীবন-নাট্যে আরম্ভ হল ট্রাজেডির পট পরিবর্তন।

সংসার জীবনের একঘেয়েমিতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন স্বভাব-চঞ্চল অস্কার। তাঁর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠল (১৮৯১ খ্রিঃ) তরুণ কবি লর্ড অ্যালফ্রেড ডগল্যাসের সঙ্গে।

১৮৯৫ খ্রিঃ নাগাদ তিনি অভিযুক্ত হলেন সমকামিতার অভিযোগে। মামলা উঠল আদালতে। ভিক্টোরিয়ান ব্রিটেনের আইন সমকামিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করল তাকে।

চর্তুদিকে সৃষ্টি হল ব্যাপক উত্তেজনা। অসাধারণ বাগ্মিতায় আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করলেন অস্কার। ইংরাজ জনগণের কপট নৈতিকতার এক চূড়ান্ত রূপ উদ্ঘাটিত হল।

বিচারে দুবছরের সশ্রম কারাদন্ড হল অস্কারের। ওয়ান্ডসওয়ার্থ ও রিডিং জেলে কঠিন শ্রমের মধ্যে কাটালেন।

অসংযত জীবনযাত্রার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী কাজেই বইরের কোন দর্শনার্থীর সাক্ষাৎকারের অনুমতি ছিল না তাঁর সঙ্গে।

মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে জেল থেকে বেরিয়েই অস্কার তাঁর জেল-যন্ত্রণার ছবি আঁকলেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা দ্য ব্যালাড অব রিডিং জেল-এ।

জেলের বাইরে নতুন রকমের জীবন-যন্ত্রণা অপেক্ষা করছিল অস্কারের জন্য। দেউলিয়া ঘোষণা করা হল তাঁকে। ঘর-গৃহস্থালীর সব জিনিস বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন।

ইংলন্ডে তাঁর পাবার মত আর কিছুই ছিল না। সন্তানদের কাছ থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন তিনি।

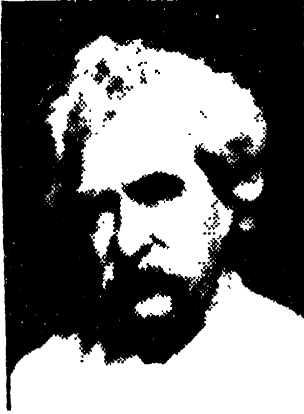
তাদের দায়িত্ব একজন আইনত বৈধ অভিভাবকের হাতে বর্তাল। লন্ডন ছেড়ে প্যারিসে আশ্রয় নিলেন।

চরম দুরবস্থা আর আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও অস্কারের সঙ্গী হয়েছিল তাঁর স্বভাবজাত বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, রসিকতা, খামখেয়ালের বিতর্কিত বক্তব্যের অভ্যাস।

শেষ পর্যন্ত মাত্র ৮৬ বছর বয়সে প্যারিসের এক হোটেলে ১৯০০ খ্রিঃ ৩০ শে নভেম্বর অস্কারের নাটকীয় ঘটনায় দীর্ণ জীবনের অবসান ঘটল।

প্যারিসের এক সেমিট্যারিতে সমাহিত করা হয় অস্কার ওয়াইল্ডকে। যিনি যন্ত্র ও বস্তুতন্ত্রের নিন্দা করেছিলেন উচ্চকণ্ঠে, মানুষের মহত্ত্বের জয়গান করেছিলেন এবং জীবনে সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে গেছেন মর্মস্পর্শী ভাষায়, তিনি ছিলেন অর্ধেক সাবালক, অর্ধেক বালক। যিনি মানুষের সুপ্তকল্পনাগুলিকে সজীব সতেজ করে জাগিয়ে তুলেছিলেন, যিনি ঘুন ধরা সমাজের প্রচলিত সবকিছুর বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, তিনি নিজে ছিলেন অতিমাত্রায় জটিল অথচ সর্বদা হাসিখুশি, রসিকতায় প্রাণময়।

মার্ক টোয়েন



মার্ক টোয়েন কথাটির অর্থ হল দুই ফ্যাদম (fathom) অর্থাৎ বারো ফুট গভীর। বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও হাস্যরসাত্মক ব্যঞ্জনায় পূর্ণ জনপ্রিয় লেখাগুলোর মধ্যে স্যামুয়েল ল্যাহর্ন ক্লিমেনস-এর ছদ্মনামকে যথাযথ ভাবে মর্যাদা দান করেছে। বিখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক মার্ক টোয়েন—এই নাম আজ সারা বিশ্বে সুবিদিত।

১৮৩৫ খ্রিঃ ৩০ শে নভেম্বর ফ্লোরিডা শহরে মার্ক টোয়েন জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র চার বছর বয়সের সময় তাঁর বাবা জন মার্সাল ক্লিমেনস পরিবার নিয়ে মিসৌরির হ্যানিবল শহরে মিসিসিপি নদীর ধারে এসে বসবাস করতে থাকেন।

টোয়েনের ভাষায় এই ছোট্ট শহরটি ছিল একটি 'ঘুমন্ত শান্ত গ্রাম'। এই শহর তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

মার্কের মা ছিলেন পরিহাসপ্রিয় মহিলা। কিন্তু অত্যন্ত অন্যমনস্ক স্বভাবের। মায়ের কাছ থেকে এই দুটি দোষ গুণই মার্ক পেয়েছিলেন।

মার্কের বাবা ছিলেন পেশায় আইনজীবী। তিনি ছেলেকে হ্যানিবলের একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে কিছুদিন পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলেন মার্ক। পরে পাঠ নিয়ে ছিলেন ক্রশ নামের একজন বৃদ্ধের কোচিং-এ।

মাত্র এগারো বছর বয়সে ১৮৪৭ খ্রিঃ মার্কের বাবার মৃত্যু হয়। স্বাভাবিকভাবেই সংসারের দায়দায়িত্বের বোঝা চাপলো তাঁর কাঁধে।

তাঁকে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ১৩ বছর বয়সেই নামতে হল কঠোর জীবন সংগ্রামে।

খবরের কাগজের হকার, মুদির দোকানের কেরানি, কামারশালার কর্মী, ওষুধের দোকানের কেরানি ও শেষে মিসিসিপি নদীর বাষ্পচালিত নৌকো চালকের পেশার মধ্যে চলতে লাগল তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ সংগ্রামময় জীবন।

১৮৬২ খ্রিঃ তিনি ভার্জিনিয়া শহরের টেরিটোরিয়াল এন্টারপ্রাইজ পত্রিকায় সাংবাদিকের কাজ নিলেন। লেখায় হাতে খড়ি আগেই হয়েছিল। এবারে পত্রিকার জন্য নিয়মিত লেখার জোগান দিতে গিয়ে ছদ্মনাম নিলেন মার্ক টোয়েন। এইসময়ে তাঁর বয়স আঠাশ।

এই কাগজে কাজ করার সময়েই মার্ক ক্রনিক্যাল নামে অন্য একটি কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে ডুয়েলের চ্যালেঞ্জের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই ডুয়েল হয়নি। কিন্তু ডুয়েল লড়তে চাওয়ার অপরাধে শহরের গভর্নর তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য মার্ক সীমান্ত পার হয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যান। সেখানে একটি কাগজে সাংবাদিকতার চাকরি নেন।

কিন্তু সহসাই আবার বেকার হয়ে পড়লেন। আর্থিক অনটন মোকাবিলার জন্য বন্ধুদের পরামর্শে এবারে কিছুদিন বিভিন্ন এলাকায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন। এতে তার ভালই রোজগার হতে লাগল।

লেকচার ট্যুরে একবার ইউরোপ থেকে ফেরার পথে জাহাজে এক সহযাত্রীর বোনের সঙ্গে আলাপ হয়। নিউইয়র্কে ফিরে ১৮৭০ খ্রিঃ অলিভিয়া ল্যাংডিন নামের এই মেয়েটিকে মার্ক বিয়ে করেন।

১৮৭২ খ্রিঃ থেকে মার্ক তাঁর পরিবার নিয়ে অ্যাব্রোড শহরে পাকাপাকিভাবে বাস করতে থাকেন।

এখানে তিনি প্রতিবেশী হিসেবে পেয়েছিলেন আঙ্কল টমস কেবিন গ্রন্থের লেখিকা হ্যারিয়েট বিচার স্টো-কে। তাঁর সাহচর্যেই প্রধানতঃ মার্ক পুরোপুরিভাবে লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রতিদিন টানা ১০ ঘন্টা লেখার মধ্যে ডুবে থাকতেন।

এভাবে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই লেখা হতে লাগল মার্কের প্রতিটি বই। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

১৯০৭ খ্রিঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় মার্ককে ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করে।

কৈশোর ও যৌবনের জীবন-সংগ্রাম এবং স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ মার্ক টোয়েনের Roughing It, The Innocent Abroad, Tramph Abroad, The Adventure of Tom Sawyer, The Adventure of Hucklebury Finn প্রভৃতি গ্রন্থে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর প্রকাশ করেছে বিবিধ সংকীর্ণতা ও কূপমন্ডুকতার বিবরণ।

মার্কের The Tragedy of Puddnhead Wilson, King Leap old's Soliloquay, The Prince and Pauper, A Connecticut Yankee in King Arthur's Court প্রভৃতি গ্রন্থ পূর্ণ হয়ে উঠেছে জাতি বিদ্বেষ ও বর্ণবিদ্বেষের নির্মমতায় এবং সাবেকী সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে নতুন মার্কিনী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিরোধিতায়।

গোড়ার দিকে লেখায় যা ছিল হাল্কা পরিহাসপ্রিয়তা, তাই পরবর্তিকালে পরিণত হয়েছিল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে।

জীবনের শেষ পর্বের লেখায় ফুটে উঠেছিল তীব্র ঈশ্বর বিরোধিতা। তিনি নিজেই নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন যাতে ঈশ্বর বিরোধিতা রূপে গণ্য হতে পারে এমন লেখাগুলো তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশ করা হয়। সেই কারণে মার্কের একমাত্র সন্তান ক্লারা ক্লিমেন্স তাঁর বাবার শেষ বয়সের রচনাগুলো ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের আগে ছাপার অনুমতি দেননি।

মার্ক টোয়েন ১৮৯৬ খ্রিঃ ১৮ই জুন ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এই দেশের সৌন্দর্য, মানুষ, জীবনযাত্রা সবকিছু তাঁকে গভীরভাবে অভিভূত করেছিল। বালকের মুগ্ধতা নিয়ে মার্ক টোয়েন সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন।

তাঁর ভারত সম্পর্কে অভিজ্ঞতার বিবরণ রয়েছে Following the Equator (১৮৯৭ খ্রিঃ) পুস্তকে। ১৯১০ খ্রিঃ পঁচাত্তর বছর বয়সে এই লেখকের জীবনাবসান হয়।

মপাসাঁ



মপাসাঁ-র সম্পূর্ণ নাম আঁরিরেনি আলবেয়র গী দ্য মপাসাঁ। সংক্ষেপে তাঁর নাম আমরা লিখি, গী দ্য মপাসাঁ।

গী দ্য মপাসাঁ-র জীবনকাহিনী বিশাল নয়, কিন্তু বৈচিত্র্যে ভরপুর। আর সে বৈচিত্র্য নৈরাশ্য, হতাশা আর বিষণ্ণতা ছাড়া কিছু নয়। তবে মানসিক দৃঢ়তাই তাঁকে জীবনপথের বাধা বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দান করেছে।

সেটা ছিল আঠার শ' পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দের পাঁচই আগস্ট, ফরাসীর অন্তর্গত নর্মাণ্ডিতে সেদিন জন্মগ্রহণ করলেন মপাসাঁ। তাঁর বাবা গুস্তাভ দ্য মপসাঁ, আর মায়ের নাম ছিল লরা। গুস্তাভ ছিলেন নর্মান। অতএব মপাসাঁ জন্মসূত্রে ছিলেন নর্মান।

মপাসাঁ-র বারো বছর বয়সকালে তাঁর বাবা-মা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

বাবা-মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদের পর বালক মপাসাঁ তাঁর মায়ের সঙ্গে থেকে যান।

ফলে তাঁর মা লরা বাবা ও মায়ের উভয় দায়িত্বই ঘাড়ে নিয়ে ছেলেকে মানুষ করে তুলতে থাকেন। মায়ের কাছেই তাঁর বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষালাভ হতে থাকে।

লরা কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের গন্ডীর মধ্যেই বালক মপাসাঁ-র পাঠাভ্যাস সীমাবদ্ধ রাখলেন না। ইংরাজ কবি ও সাহিত্যিকদের অনুবাদ গ্রন্থ, বিশেষ করে শেক্সপীয়ারের নাটকগুলির অনুবাদ পড়ে তিনি ছেলেকে শোনান। ফলে ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ বাল্য ও কৈশোর থেকে তিলে তিলে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মপাসাঁ-র পক্ষে দীর্ঘদিন ইভেট-এর বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করা সম্ভব হ'ল না। রুক্ষ ও উদ্ধত আচরণের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কার করে দেন। এখন উপায়? তাঁর মা ছেলের ভবিষ্যতের ব্যাপারে বড়ই ভাবিত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত একে-ওকে ধরাধরি করে, বহু কাঠখড় পুড়িয়ে লাউয়েন-এর বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। এখান থেকেই তিনি প্রথানুযায়ী পুঁথিগত বিদ্যা সমাপ্ত করেন।

বিদ্যানুশীলন সমাপ্ত করে কিশোর মপাসাঁ এবার নৌ-বিভাগের করণিকের কাজে যোগদান করেন। কিন্তু এখানে আসায় তাঁর সাহিত্য-সাধনায় ভাটা পড়ল। তা ছাড়া বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে কাজের মধ্যে দিনের পর দিন নিজেকে লিপ্ত রাখায় অচিরেই তাঁর মন হাঁপিয়ে উঠল। অনন্যোপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে আবার ফিরে এলেন প্যারিসের সে পরিচিত পল্লীতে। এবার তিনি পূর্ণ উদ্যমে গল্প ও উপন্যাস লেখায় নিজেকে সঁপে দিলেন। তাঁর লেখনি সৃষ্টি করতে লাগল একের পর এক বিভিন্ন স্বাদের গল্প।

আঠারোশ' আশি খ্রিষ্টাব্দে মপাসাঁ-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Des vers' প্রকাশিত হয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই জীবনের অশালীন ও কদর্য দিককে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে। অজুহাত দেখিয়ে ফরাসী সরকার তাঁর কাব্যগ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করবেন বলে হুমকী দেন। মপাসাঁ এতে এতটুকুও দমলেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেটা বাজেয়াপ্ত হয় নি।

মপাসাঁ-র সাহিত্যচর্চা নিজস্ব পথে, স্বকীয়তা অব্যাহত রেখে এগিয়ে চল্‌ল। এ সময়েই তিনি প্রখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ফ্লোবেয়র-এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। তখনকার দিনে ফরাসী কবি ও সাহিত্যিকদের কাছে তিনি ছিলেন সাহিত্য জগতের একজন দিকপাল।

কৈশোরে মায়ের সাহায্যে শেক্সপীয়র-এর সাহিত্য কর্মের সঙ্গে পরিচয়, তারপর ফ্লোবেয়র-এর লেখার সঙ্গে পরিচয় ও প্রীতি লাভ তাঁর সাহিত্য-সাধনার পাথেয় হয়ে উঠল। সংক্ষেপে বলতে গেলে সাহিত্য-সাধক ফ্লোবেয়র ছিলেন তাঁর সাধনার একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র আদর্শ।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক ফ্লোবেয়র-এর কাছে নিয়মিত যাতায়াতের মাধ্যমে তৎকালীন খ্যাতনামা ফরাসী সাহিত্যিক জোলা, দোদে এবং তুর্গেনিভ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে।

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে জোলা নিজের একটি গল্পসহ কিছু সংখ্যক তরুণ উদীয়মান লেখকদের গল্পের একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সংকলন গ্রন্থটির নাম দিলেন—'Les soire'es de me'man'- এতে মপাসাঁ-র 'Boule de Suif' নামক গল্পটি স্থান পায়।

সংকলন গ্রন্থটিতে ছাপা মপাসাঁ-র গল্পটি তাঁকে অচিরেই সাহিত্য-রসিকদের কাছে বিশিষ্ট করে তুলল।

আঠারোশ' আশি থেকে আঠারোশ' একানব্বই খ্রীষ্টাব্দ—এই দশ বছরেই মপাসাঁ বিশ্বের ছোট গল্পকে একশ' বছর এগিয়ে দিলেন। কেবলমাত্র ফরাসী দেশের গল্পকাররাই নয়, পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশের সাহিত্য সাধকরা তাঁর লেখার বিশেষ ভঙ্গী ও আঙ্গিককে অনুসরণ করে গল্প রচনায় ব্রতী হলেন।

এবার মপাসাঁ-র কয়েকটি গল্প পন্ডিতদের দ্বারা সমাদৃত হওয়ায় তাঁর গল্প বেশ কয়েকটি শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় স্থান পেল।

সাহিত্য সৃষ্টি করে কেবলমাত্র খ্যাতিলাভই নয়, তাঁর অর্থাগমও যথেষ্টই হতে লাগল। যে মপাসাঁ একদিন পেটের জ্বালা নেভাতে, অর্থোপার্জনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের বুকের রক্ত ঝরিয়েছেন আজ তিনিই লেখনীর মাধ্যমে অগাধ অর্থের মালিক হলেন। সে আমলের সাহিত্যিকদের কাছে তিনি এক প্রতীকরূপে চিহ্নিত হলেন। সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে যে এমন বিপুল অর্থোপার্জন সম্ভব এটা সে যুগের খ্যাতিমান অন্যান্য সাহিত্যিকদের ধ্যান ধারণা বহির্ভূত ছিল। তবে এ অর্থ তিনি সম্পূর্ণ নিজেব জন্য ব্যয় করেন নি বা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করেও রাখেন নি। প্রতিবেশীদের অভাব অনটন ও দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য তিনি দরাজহাতে অর্থ ব্যয় করতেন। আবার দুস্থ কবি ও সাহিত্যিকরাও তাঁর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে ধন্য হয়েছেন।

জীবনের শেষের দিকে কঠোর পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণ তাঁর শরীর বরদাস্ত করল না। শারীরিক ব্যাধির কবলে পড়লেন তিনি। দুরারোগ্য উপদংশ ব্যাধি এবার তাঁকে আক্রমণ করে বসল। তখনকার দিনে ইওরোপ মহাদেশে এ-ব্যাধির চিকিৎসা-ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয় নি। ফলে রোগজীবাণু প্রথমে তাঁর শরীরকে নিস্তেজ করে দিতে লাগল। যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির কবল থেকে অব্যাহতি পাবাব জন্য বহু প্রখ্যাত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন তিনি। না, রোগ নিরাময়ের কোন লক্ষণই

দেখা গেল না। উপরন্তু তাঁর শারীরিক ব্যাধির প্রকোপ তাঁর মনের ওপর ক্রিয়া করতে শুরু করল। শরীরের সঙ্গে মনও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। তাঁর মাথার ওপরে প্রতিনিয়ত হতাশার শকুন চক্কর মারতে লাগল। ইতিমধ্যে তাঁর অনুজ উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়ে পাগলাগারদে আশ্রয় নিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তার মৃত্যুও হয়ে গেল। মপাসাঁ আতঙ্কিত হলেন, তাঁকেও হয়ত মানসিক সুস্থতা হারিয়ে শেষ পর্যন্ত উন্মাদই হয়ে যেতে হবে। ক্রমবর্ধমান মানসিক অস্থিরতা তাঁকে আত্মহত্যার প্রেরণা জোগাল। তিনি দু'বার আত্মহননের চেষ্টাও করলেন। কিন্তু না, সম্ভব হ'ল না। তাঁর সদা সতর্ক পরিচারক দু'বারই তাঁকে রক্ষা করল। প্রাণে বাঁচানো গেলেও তাঁকে অনুজের মত উন্মাদ আশ্রমে আশ্রয় নেওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা গেল না। বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় আশ্রমের চার দেওয়ালে ঘেরা ছোট্ট খুপরির মধ্যে আশ্রয় নিতে হ'ল।

আঠারোশ' তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে, মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দেহমনে জীর্ণ অবসন্ন মপাসাঁ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন।

সাহিত্য-সাধক মপাসাঁ ছিলেন উনিশ শতকের এক বিস্ময়। মাত্র তেতাল্লিশ বছরের জীবনে তিনি বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে রীতিমত ঝড় তুলে গেছেন। গবেষকগণ বিচার করবেন, মপাসাঁ আমৃত্যু কিসের সন্ধানে হন্যে হয়ে ছুটেছেন? একমাত্র নারীদেহকেই কি তিনি মনে প্রাণে চেয়েছেন, নাকি দেহাতিরিক্ত প্রেমের পূজারী ছিলেন তিনি? যে, যা-ই বলুন না কেন, অভিজাত সমাজে নষ্টামি ও ভণ্ডামির মূলে কঠিন কঠোর আঘাত হানা, অবহেলিত নিষ্পেষিত মানুষকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। ইতিমধ্যে পৃথিবীতে বহু পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে, কবি ও সাহিত্যিকদের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন এসেছে। আজ, বিংশ শতকের শেষেও মপাসাঁ অসাধারণ জনপ্রিয় লেখক হিসাবে গণ্য হন।

মপাসাঁ সারা জীবনে সাতটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এবং প্রায় আড়াইশ'টি ছোটগল্প রচনা করেছেন। পৃথিবী বিখ্যাত সাহিত্যিক টলস্টয়, জোহান বয়ার এবং বিখ্যাত সমালোচক লুকাস তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

চরক

প্রাচীনকালে ইউরোপের অধিকাংশ দেশ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই সময় আমাদের দেশে রচিত হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ চরক-সংহিতা।

এই গ্রন্থের রচয়িতা মহাজ্ঞানী চরকই হলেন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। বিশ্বের চিকিৎসা ইতিহাসে তাঁর অবদান আজও এক মহাবিস্ময়।

চরকের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমাদের কাছে অজানা। তাঁর ব্যক্তি পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ ত্রিপিটকের একটি চীনা সংস্করণে চরক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে চরককে কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজসভার প্রধান চিকিৎসকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ সিলভাঁ লেভির মতে চীনা ত্রিপিটক গ্রন্থে উল্লেখিত চরকই চরক সংহিতার রচয়িতা।

কিন্তু এই তথ্যে অসঙ্গতি ধরা পড়েছে ভিন্ন গবেষকদের চোখে। তাঁরা দেখান যে, চরক সংহিতা গ্রন্থে চরক নিজে কোথাও উল্লেখ করেননি কণিষ্কের কথা। যিনি রাজসভার প্রধান চিকিৎসক, এবং যাঁর গবেষণার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন রাজা, গ্রন্থকার তাঁর কথা গ্রন্থে একবারও উল্লেখ করবেন না, তা যুগপ্রচলিত রীতির বিপরীত।

ভারতের সর্বপ্রাচীন সাহিত্য বেদে চরক শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। তবে সেখানে চরক বলা হয়েছে বেদের কোনও এক শাখা বা বিষয়ে অনুরক্ত ব্যক্তিকে।

আবার দেশে দেশে ঘুরে যাঁরা শিক্ষা বিস্তারের কর্ম করেন, তাঁদেরও চরক বলা হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন পাণিনি। তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থে কয়েকটি সূত্রে চরকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানেও চরক নাম উল্লিখিত হয়েছে বিশেষণ হিসেবে অর্থাৎ বেদের নানা শাখার অনুগামীদের বিশেষণ।

পাণিনির সূত্রের সঙ্গেও তাই ঐতিহাসিকগণ চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ চরকের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাননি।

কোন কোন গবেষক চরক-সংহিতাকার চরককে যোগবিজ্ঞানের প্রবর্তক পাতঞ্জলীর সমকালের বিজ্ঞানী বলে উল্লেখ করেছেন।

পতঞ্জলীর পরবর্তীকালের অনেক লেখকই তাঁকে শেষনাগের অবতার হিসেবে দেখিয়েছেন।

আবার চিকিৎসক চরককেও শেষনাগের অবতার বলে কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে অনেক পন্ডিত মন্তব্য করেছেন, পাতঞ্জলী এবং চরক অভিন্ন ব্যক্তি।

কিন্তু পাতঞ্জলীর চরক-সংহিতার ওপর রচিত ভাষ্য এই যুক্তিকে খন্ডন করে দেয়। কেন না, ভাষ্য রচয়িতার অবস্থানকাল পরে হওয়াই স্বাভাবিক ঘটনা।

পাতঞ্জলীর অবস্থান কাল হল খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫ অব্দ। সেই সময়ে চরক ভারতের চিকিৎসাক্ষেত্রে সূর্যের মত ভাস্বর এক নাম।

চরক আসলে কারো নাম, না ছদ্মনাম অথবা উপাধি—এই সব তথ্য জানার কোন উপায় নেই।

কালের গর্ভে সব তথ্যই চাপা পড়ে গেছে। ফলে চরকের জীবনকে সরিয়ে রেখে তাঁর কর্মসাধনারই আমরা সন্ধান করেছি।

চরক নামের মধ্যে আমরা পাই ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের এক অনন্য সাধারণ প্রতিভার দীর্ঘ অনুসন্ধান ও শ্রমের সমন্বয়। কেবল চিকিৎসক হিসেবেই নয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবেও তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিরল।

খ্রিস্টীয় সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভারতে যখন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পূর্ণ বিকাশের কাল সেই সময় আমরা দেখি চরক-সংহিতাই নিয়ন্ত্রণ করছে সেই গৌরব-যাত্রা।

কেবল তাই নয়. এই তিনশো বছরের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ল্যাটিন ও আরবী ভাষার অনূদিত হয়ে ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে চরক-সংহিতার প্রয়োগ ও প্রচারের ক্ষেত্র।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং ব্যবহারযোগ্যতার বহুমুখীনতা যেভাবে আয়ুর্বেদের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে এই গ্রন্থ, তা আর কোন মনীষীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। চরকেব সমস্ত তত্ত্বকেই অভ্রান্ত এবং অমোঘ বলে মেনে নিতে হয়েছে সকলকে।

ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে চরক এক কথায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানে বর্তমান। একাদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত ভারতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ওপরে নতুন বই লেখার কোন প্রচেষ্টা হয়নি।

এই সময়কালে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা রচনা করেছেন চরক-সংহিতার বিভিন্ন ভাষ্য।

চরক-সংহিতার ব্যাখ্যাকার হিসেবে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন চক্রপাণি. বিজয় রক্ষিত, শ্রীকান্ত বাচস্পতি, কান্তদত্ত, শিবদাস, ভাবমিশ্র প্রভৃতি আয়ুর্বেদাচার্যগণ। সকলেই চরককে সর্বকালের আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে স্বীকার করেছেন।

চরকের জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হল চরক-সংহিতা। তবে এই সংহিতা গ্রন্থের মূলের সূচনা যে চরকের হাতে হয়নি তা জানা যায়।

তা করেছিলেন মহাজ্ঞানী অগ্নিবেশ, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম বা অষ্টম শতকে তিনি বর্তমান ছিলেন।

অগ্নিবেশের পুঁথিটির সন্ধান পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত। এই বইটির নাম ছিল অগ্নিবেশ-তন্ত্র।

অগ্নিবেশের পরবর্তী কালের অনেক নতুন নতুন আবিষ্কার নতুন তত্ত্ব স্বাভাবিকভাবেই কালানুবর্তের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবেশের আয়ুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

অনুমান করা হয় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্বেই চরক নানা তত্ত্ব ও আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত করে নিজ প্রতিভাবলে অগ্নিবেশ-তন্ত্রকে বিপুলাকারে চরক-সংহিতায় রূপান্তরিত করেছিলেন।

আমরা যে চরক-সংহিতার সঙ্গে পরিচিত সেটি হল মূল গ্রন্থের সম্পাদিত রূপ। কাশ্মীরের প্রখ্যাত আয়ুর্বেদাচার্য ও গবেষক দুধবল চরক-সংহিতাকে সম্পাদনা ও সম্পূর্ণ করেন।

এই গ্রন্থের পাতা ওল্টালেই ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের হৃদস্পন্দন অনুভব করা যায়।

প্রাচীন ভারতে হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের মানুষরাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের চর্চা করতেন। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য এই দুটি ভাগ ছিল।

আয়ুর্বেদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটা করতেন ব্রাহ্মণ চিকিৎসকরা। তাঁরা এভাবে নানা রোগের নিরাময়ের ওষুধ তৈরি করতেন। যে সকল ব্রাহ্মণ ঘরে ঘরে গিয়ে রোগী দেখতেন এবং রোগচিকিৎসাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বলা হত বৈদ্য।

লোকচিকিৎসার মাধ্যমে যা উপার্জিত হত তাই দিয়েই এই বৈদ্য ব্রাহ্মণরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন।

তবে রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে বর্ণভেদের বিচারের বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না। যে কোন বর্ণের মানুষই বিশেষ বিশেষ গুণ ও যোগ্যতা বলে চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠ নিতে পারতেন।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শিক্ষার জন্য উপযুক্ততা বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে চরক-সংহিতায়।

যদি কারো থাকে সুগঠিত স্বাস্থ্য, মনের শক্তি, সামাজিক রীতিনীতির শিক্ষা, আত্মিক বল, বিনয়, নীতিপরায়ণতা, জ্ঞানলাভের স্পৃহা এবং ব্রহ্মচর্য তাহলে সে চিকিৎসা শিক্ষার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

ছাত্রকে যজ্ঞাগ্নির সামনে বসে গুরু ও দেবতাকে অর্ঘ্য নিবেদন করতে হবে। পরে পবিত্র অগ্নি তিনবার প্রদক্ষিণ করে শপথবাক্য পাঠ করতে হবে।

বলতে হবে (১) ছাত্রজীবনে আমি ব্রহ্মচর্য পালন করব, নিরামিষাশী হব, সর্বক্ষেত্রে সত্যবাদী হব, মনে অসুয়া স্থান দেব না কারও অনিষ্ট করব না বা অস্ত্র ধারণ করব না।

(২) আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা অবিচল রাখব। আচার্যের পুত্রসম বাধ্য থেকে সকল প্রকার আদেশ পালন করব। আচার্যের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আমার সর্বদা লক্ষ থাকবে; কখনো দুর্বিনীত হব না।

(৩) ভবিষ্যৎ জীবনে যদি চিকিৎসক হিসেবে সফল ও যশস্বী হই, সর্বজীবের মঙ্গল সাধনই হবে আমার ব্রত।

(৪) রুগীর সেবা ও সুখের জন্য সর্বদা তৎপর থাকব। চিকিৎসার মাধ্যমে সম্পদলাভের প্রবৃত্তি যেন কখনো না জাগে। কোনপ্রকার অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে কখনো জড়িত হব না।

(৫) শ্রুতি সুখকর এবং আত্মশক্তিতে পরিপূর্ণ কথা দ্বারা রুগীর মনোবল জাগ্রত করবার চেষ্টা করব। সুভাষী হব। সময়ের কাজ সময়ে করবার চেষ্টা করব। অভিজ্ঞতাকে কাজে প্রয়োগ করব।

(৬) সমাজের চোখে ঘৃণ্য ব্যক্তির চিকিৎসা করব না। যারা দুষ্ট, রহস্যময়, সম্মানের অযোগ্য, স্বামী বা গুরুজন পরিত্যক্তা নারী এদের চিকিৎসা করব না।

(৭) স্বামী বা গুরুজনের বিনানুমতিতে কোন নারীর প্রদত্ত উপহার সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করব। রুগীর বাড়ির পরিচিত কোন ব্যক্তির সঙ্গেই রুগীর বাড়িতে যাব। তার অনুমতি নিয়েই রুগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হব। চিকিৎসাকালে মন যেন ভিন্নমুখী না হয়।

(৮) রুগীর ব্যক্তিজীবন সর্বপ্রথমে সংগুপ্ত রাখব।

(৯) কথা কম বলব. নিজেকে কখনো জ্ঞানী বলে অহঙ্কার করব না।

শপথ পাঠ শেষ করার পর আচার্যের পদপ্রান্তে বসে আয়ুর্বেদের শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয় ছাত্রের।

ছাত্র তখন আচার্যের পরিবারের একজন বলে গণ্য হয়। কায়মনে সে গুরু সেবা করে আর আচার্যের চিকিৎসা লক্ষ্য করে।

এভাবেই সে শিক্ষা কবে আচার্যের কথার ভঙ্গী, স্বর, রোগ পরীক্ষা ও রোগ নির্ণয়ের প্রণালী, নিরাময়ের উপায় সন্ধান ইত্যাদি। এসকল ক্ষেত্রে প্রয়োজন মত ছাত্র আচার্যকে সাহায্য করবে।

নানা ওষুধের নাম ও কাজ এবং প্রয়োগ বিধি শিক্ষা করতে হয়। জানতে হয় শরীরের নানা অংশের শারীরবৃত্তীয় পরিচয় ও কাজ্জ। শল্যচিকিৎসার নানা যন্ত্রপাতি, তাদের প্রয়োগ পদ্ধতি বিষয়েও সম্যক ধারণা করতে হবে।

চিকিৎসা শিক্ষা অধিগত করতে প্রয়োজন হয় ছয় থেকে সাত বছরের কঠিন পরিশ্রম, অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়।

ছাত্রের শিক্ষা সম্পর্কে আচার্য যখন নিশ্চিত হন, তখনই তিনি ছাত্রকে নিয়ে গিয়ে রাজসভায় পরিচিত করিয়ে দেন। রাজসম্মতি লাভ করার পরই ছাত্র স্বাধীনভাবে লোক-চিকিৎসা শুরু করতে পারেন।

ছাত্রের ব্যবহার এবং অধীত বিদ্যায় উন্নতি সম্পর্কে যদি গুরুর মনে সংশয় থাকে তাহলে ছাত্রকে তার ছাত্রজীবন চালিয়ে যেতে হয় যতদিন পর্যন্ত না আচার্য সর্ববিষয়ে সন্তুষ্ট হন।

সেই প্রাচীনকালে সকল চিকিৎসকেরই প্রধান লক্ষ্য হল রাজসভার চিকিৎসক হওয়া। রাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের কাজ ছিল ব্যাপক। রাজার বা রাজপরিবারের কারো রোগ হলে সারিয়ে তুলতে হতো। কেবল তাই নয়, কেউ চক্রান্ত করে রাজার খাবারে গোপনে বিষ প্রয়োগ করল কিনা, কোথাও রাজাকে শারীরিক দুর্বিপাকে পড়তে হবে কিনা এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখাও রাজ চিকিৎসকের অন্যতম জরুরী কাজ।

রাজা যুদ্ধযাত্রা করলে চিকিৎসককেও সঙ্গে যেতে হত। যথাকালে প্রয়োজনীয় শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে।

এই সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে চিকিৎসক রাজার কাছ থেকে লাভ করত ভাল মাসোহারা, বিভিন্ন সুযোগসুবিধা এবং পুরস্কার।

চরক এইভাবে তাঁর সময়ের চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার নিয়ম-রীতির কথা আমাদের জানিয়েছেন।

স্বভাবতঃই আমাদের জানতে ইচ্ছা করে চরক তাঁর চিকিৎসায় কি কি বিষয় নিয়ে অনুশীলন করেছিলেন।

সংহিতা গ্রন্থে চরক বহু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যেমন মানব শরীরের গঠন, যাকে আমরা বলি অ্যানাটমি, শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, ভ্রূণসৃষ্টি ও গঠন, বায়ু পিত্ত ও কফ অর্থাৎ শরীরের ত্রিধাতুর সঙ্গে শরীরের সুস্থতা ও অসুস্থতার সম্পর্ক, ত্রিধাতুর কাম্য অবস্থা কাকে বলে, বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও রোগের শ্রেণীবিভাগ, শরীরে রোগের পূর্বাভাস, রোগ নির্ণয়, প্যাথোলজি বা রোগবিকারবিদ্যা এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি।

আর একটি অত্যন্ত কৌতূহলদ্দীপক বিষয় সম্পর্কে চরক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তা হল চিরযৌবন লাভের বৈজ্ঞানিক উপায়। এই সমস্ত বিষয় নিয়েই গড়ে উঠেছে চরকের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র।

এবারে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করে আমরা চরকের সংহিতা গ্রন্থের বিবরণের সঙ্গে পরিচিত হতে পারব।

মানব শরীরের গঠন সম্পর্কে এ যুগের চিকিৎসাশাস্ত্র আমাদের অনেক তথ্যই জানিয়েছে।

এক্ষেত্রে দুহাজার বছরেরও আগে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব দুশ বছর আগে বলা চরকের অনেক তথ্যই বিচিত্র মনে হবে।

চরক বলেছেন, দাঁত ও নখ মিলিয়ে আমাদের দেহে হাড়ের সংখ্যা ৩৬০টি। সংখ্যা ধরে আলাদা ভাবেই হাড়গুলোকে দেখিয়েছেন চরক। তাঁর হিসেবটা এ রকম, ৩২ দাঁত ও দাঁতের গর্ত, নখ ২০, হাত পায়ের আঙুলের নখ ৬০, দীর্ঘাস্থি ২০ এবং চারটি দীর্ঘাস্থির নিম্নভাগ, গোড়ালির হাড় ২, পায়ের গিঁটের হাড় ৪, মণিবন্ধের হাড় ৪ , চার হাতের সামনের হাড়, চার পায়ের হাড়, দুই হাঁটুর হাড় বা মালাইচাকি, দুই কনুইয়ের হাড়, দুই উরুর হাড়, দুই বাহুর ফাঁপা হাড়, দুই কাঁধের হাড়, দুই কণ্ঠার হাড়, দুই কটির হাড়, এক পিউবিক হাড়, পিছনের হাড় ৪৫, ২৪ অবি, বুকের হাড় ১৪, বুকের পাঁজরার হাড় ২৪, গলার হাড় ১৫, বায়ুনলি ১, তালুর গর্ত ২, চোয়ালের নিচের হাড় ১, চোয়ালের বন্ধনীর হাড় ২, নাকের হাড় ১, গালের হাড় ১, ভুরুর হাড় ১, কপালের দুপাশের হাড় ২, মাথার খুলির চাটু আকৃতির হাড় ৪, ইত্যাদি।

মানব শরীরের হাড়ের সংখ্যা ৩৬০ বলেছেন চরক, অপর পক্ষে সুশ্রুতের হিসাব হল ৩০০।

চরক পেশীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় মাংসের দলাকেই তিনি পেশী হিসেবে ধরেছেন। এখানে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি।

হৃদযন্ত্র সম্পর্কে চরক বলেছেন—এটি একটি গর্ত, সেই গর্ত থেকে দশটি নলা বেরিয়েছে, সেগুলো শরীরের নানা স্থানের সঙ্গে যুক্ত।

মস্তিষ্কের গঠন সম্পর্কে বা ফুসফুস সম্পর্কে খুব পরিষ্কার ধারণা তিনি দিতে পারেননি।

ভ্রূণ কি, কিভাবে ভ্রূণের বিকাশ লাভ হয়, এসব নিয়ে চরক তাঁর ভ্রূণবিদ্যায় আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে নারীপুরুষের মিলনের মধ্য দিয়ে পুরুষের বীর্যরস ও নারীর রক্ত মিলে ভ্রূণের বীজ সৃষ্টি হয়।

ভ্রূণের বিকাশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ভ্রূণের মধ্যে বীর্যরস ও নারীরক্তের মাত্রা যদি সমান থাকে অথবা বীর্য যদি হয় প্রজনন শক্তিবিহীন তবে সেই ভ্রূণ হিজড়ায় রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

মিলনের ফলে সৃষ্ট ভ্রূণের বীজ যদি দুই বা দুইয়ের অধিক অংশে বিভক্ত হয় তখনই গর্ভে দুই বা ততোধিক সন্তান জন্মের সম্ভাবনা থাকে।

আবার যদি নারীরস (রক্ত)-এর তুলনায় বীর্যরস অধিক জোরালো হয় তবে সন্তান হবে পুরুষ। ঠিক বিপরীত অবস্থায় সন্তান হয় নারী।

ভ্রূণ সৃষ্টি ও লিঙ্গ নির্ধারণের পর চরক ভ্রূণবিকাশের স্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, প্রথম মাসে ভ্রূণের অবস্থা থাকে একটা আঠালো পদার্থের মতো।

দ্বিতীয় মাসে এই আঠালো পদার্থ কিছুটা কঠিন হয়। এই কঠিনাকার বস্তুতে শরীরের পাঁচটি বিশেষ অংশের চিহ্ন পরিস্ফুট হয় পরবর্তী মাসে। চতুর্থ মাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো স্পষ্ট ও বর্ধিত হয় এবং চেতনা জন্মে। এই মাস থেকেই শুরু হয়ে যায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া।

পঞ্চম মাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির ও বিকাশের সঙ্গে চেতনার পরিধিও বিস্তৃত হয়।

ভ্রূণের দেহে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে ষষ্ঠ মাসে। সপ্তম মাসে প্রত্যঙ্গসমূহের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়।

এই পর্যন্ত যা বিকাশ লাভ করেছে সেই সব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় অষ্টম মাসের মধ্যে। এইভাবে ভ্রূণ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণ শিশুর রূপ লাভ করে নবম বা দশম মাসের মধ্যে।

সন্তানের শরীরের নানা অংশের উপাদান ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জনক বা জননীর প্রভাব থাকে। চরকের মতে সন্তান মায়ের কাছ থেকে পায় ত্বক, রক্ত, মাংস, নাভি, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা, নারী শিশুর ক্ষেত্রে স্তন ও শ্রোণীচক্র, পাকস্থলী, অন্ত্র এবং মজ্জা।

জনকের কাছ থেকে পায় মাথা, অস্থি, নখ, দাঁত, শিরা, বীর্য ইত্যাদি।

ভ্রূণবিকাশের তৃতীয় মাসেই যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পূর্ণতা সম্পন্ন হয় সে সম্পর্কে চরক স্থির নিশ্চয় ছিলেন।

গর্ভস্থ সন্তান ছেলে অথবা মেয়ে তা বুঝবার বিশেষ কতগুলি লক্ষণের কথা চরক উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল ঃ

(১) যদি মায়ের ডান স্তন থেকে দুধ নির্গত হয়।

(২) যদি চলতে গিয়ে মা প্রথমেই ডান পা বাড়ায়।

(৩) যদি ডান চোখকে অপেক্ষাকৃত বড় মনে হয়।

(৪) পুরুষ নামীয় জিনিষের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়।

(৫) পুরুষ নামের ফুল যদি স্বপ্নে দেখে।

(৬) মুখ যদি ক্রমশই উজ্জ্বলতর হয়।

(৭) নারীসঙ্গই যদি সবসময় কামনা করে।

(৮) কথায় কথায় পুরুষালী মেজাজ প্রকাশ পায় এবং কাজের ক্ষেত্রে পুরুষসুলভ খবরদারি দেখায় তবে গর্ভস্থ সন্তান যে পুরুষ তাতে কোন সন্দেহ নাই।

চরকের শারীরবিদ্যায় বলা হয়েছে, সমস্ত সৃষ্টির মূলেই রয়েছে পঞ্চভূতের সমন্বয়। আমরা খাদ্য হিসাবে যা কিছু গ্রহণ করি এবং যে সব উপাদানে আমাদের শরীর তৈরি এর সবকিছুই মূলতঃ পঞ্চভূতের সমাহার।

পঞ্চভূত বলতে ক্ষিতী—মাটি, অপ—জল, তেজ—আগুন, মরুৎ—আকাশ, এবং বায়ু। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র, শরীরে এইসব উপাদানের মধ্যেই পঞ্চভূত মিশে থাকে।

সম্মিলিতভাবে এই উপাদানগুলিকে বলে ধাতু। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তার দ্বারা শরীরের এই ধাতুই পুষ্টিলাভ করে। এই কারণে এই ধাতুগুলোর মধ্যে থাকে স্বাভাবিক সমতা যাকে বলে সাম্যাবস্থা। ধাতুর সাম্যাবস্থা আমাদের পরিপাক ক্রিয়া স্বাভাবিক রাখে।

চরক বলেছেন, আহারের পর খাদ্য প্রথমে রসে পরিণত হয়। এই রস থেকেই যাবতীয় ধাতু উৎপন্ন হয়।

যখন পরিপাক ক্রিয়া চলতে থাকে সেইসময় যে বিক্রিয়ার আবহ সৃষ্টি হয় তার দুটি স্তর রয়েছে।

পর্যায়ক্রমে এই স্তরগুলো হল প্রথমে মিষ্টি স্বাদের আবহ। সেই অবস্থা মিলিয়ে গেলে আসে অম্লভাবের আবহ।

মিষ্টস্বাদের ভাব থেকে সৃষ্টি হয় কফ। আম্লিক আবহ খাদ্যবস্তুর জীর্ণত্ব বৃদ্ধি করে। জীর্ণ খাদ্য থেকে অন্ত্রে ধীরে ধীরে এক ধরনের তরল পদার্থ তৈরি হয়। এই তরল পদার্থই হল পিত্ত।

জীর্ণ খাবারের শেষ অংশ অন্ত্রের ভেতরেই শক্ত আকার নেয়। এই অবস্থায় একপ্রকার তিক্তস্বাদের আবহ এখানেই উৎপন্ন হয়। এই আবহ থেকে উৎপন্ন হয় বায়ু বা বাত। কফ পিত্ত বায়ু শরীরের এই উপাদানগুলোকে এক সঙ্গে বলা হয় ত্রি-দোষ। খাদ্য পরিপাকের সঙ্গে সঙ্গে ধাতু ও এই ত্রি-দোষ পাশাপাশি শরীরে তৈরি হয়।

শরীরের ক্ষেত্রে ত্রি-দোষের গুরুত্ব চরক খুব ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শরীরে এদের প্রত্যেকের কাজই নির্দিষ্ট। আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস, হাঁটাচলার কাজের শক্তি, কথাবলা, প্রস্রাব-পায়খানার কাজ, এইসব ক্ষেত্রেই বায়ু ক্রিয়াশীল।

পিত্তের কাজ পরিপাকে সাহায্য করা। এছাড়া, দৃষ্টিশক্তিকে সতেজ রাখা এবং শরীরে তাপ যোগান দেওয়াও পিত্তের কাজ।

আমাদের মনের প্রফুল্লতা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং লাবণ্য—এই সবকিছুর পেছনেই রয়েছে পিত্তর অবদান।

কফও হেলাফেলার নয়। কফ শরীরকে মজবুত রাখে, সহ্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে, দেহের ওজন স্বাভাবিক রাখে, সর্বোপরি যৌনক্ষমতা সতেজ রাখে।

সুস্থ শরীর মানেই, শরীরে এই তিন দোষের সাম্যভাব বজায় আছে অর্থাৎ মাত্রার হিসাবে কোনও একটি বা দুটি বেশি বা কম নেই।

কফের মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি এমন শরীরের ত্বক হয় নরম, তেলচুকচুকে, আর ছিমছাম।

যেই শরীরে পিত্তের মাত্রা বেশি তাদের চামড়া হয় শুকনো, গরমে হয় আইঢাই অবস্থা, অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি এসে যায়।

পাতলা, শুকনো শরীর মানেই বায়ুর আধিক্য, এসব মানুষ আকারেও হয় অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব।

মূলকথা রোগ সংক্রমণের কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে চরক বলেছেন, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর ব্যবহারের ত্রুটিই শরীরে রোগ উৎপত্তির মূল কারণ। এর সঙ্গে আবহাওয়ার প্রতিকূলতাকেও যুক্ত করেছেন চরক।

শরীরের প্রধান শত্রুই হল অনিয়ম ও কুখাদ্য । অনিয়ম, অত্যাচারে ত্রি-দোষের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শরীরের ধাতুগুলো।

এইভাবে গোটা শরীরক্ষেত্রেই যখন একটা বিশৃঙ্খল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। তখনই রোগ শরীরে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়।

ত্রি-দোষের সাম্য নষ্ট হয়ে গিয়ে শরীরে যে রোগের সৃষ্টি হয় তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন চরক।

প্রথম হল—নিরাময়যোগ্য রোগ, দুই, নিবাময়যোগ্য তবে দীর্ঘমেয়াদী। তৃতীয় হল দুরারোগ্য।

চরক বলেছেন, দুর্ঘটনা থেকেও রোগ উৎপত্তি অসম্ভব নয়।

রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চরক সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন রোগী পর্যবেক্ষণের ওপর। অর্থাৎ রোগীকে পরীক্ষা করতে হবে খুঁটিয়ে। তারপর দেখতে হবে কোন পরিবেশে কিভাবে রোগী রয়েছে। পরিবেশই বলে দেয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগের পরিচয়।

রোগ নির্ণয়ের পরে চিকিৎসককে নিরাময়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী চিকিৎসক তাঁর লব্ধ শক্তি বলে রোগীর শরীরের ভেতরের অবস্থাটি লক্ষণ থেকেই পরিষ্কার দেখতে পাবেন। চরক বলেছেন, যিনি তা পাবেন তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক। চিকিৎসককে বিচার করতে হবে লক্ষণ, কারণ, শরীরের ধাত, রোগীর বয়স, জীবনীশক্তি, পরিবেশ এবং সময় অর্থাৎ কোন ঋতুতে রোগী রোগাক্রান্ত হয়েছে।

চিকিৎসক ওষুধের যেমন ব্যবস্থা করবেন তেমনি পথ্য বা আহার ও বিহার সম্পর্কেও ব্যবস্থা দেবেন।

চরকের ভেষজ-বিজ্ঞানে বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে দেশীয় উদ্ভিদজাত ওষুধপত্র। নানা খনিজ এবং জীবজন্তুর দেহ থেকে সংগৃহীত পদার্থ দিয়ে তৈরি ওষুধের কথাও তিনি বলেছেন।

কোন ওষুধ শরীরে কিরূপ কাজ করে তা পর্যবেক্ষণ করে যাবতীয় ওষুধকে ৫০ ভাগে ভাগ করেছেন চরক।

সমস্ত ওষুধেরই কাজ একটাই, শরীরের ধাতু এবং ত্রি-দোষের সাম্যভাব পুনরুদ্ধার করা।

ওষুধ প্রয়োগের বিভিন্ন ধরনের কথা বলেছেন চরক। কোন ওষুধ অনুপানহীন, কোন ওষুধ অনুপানসহ দেওয়া হত।

কোন ওষুধ বড়ি অবস্থায়, কোনটি আবার কেবল গুঁড়ো করে সরাসরি রোগীকে দেওয়া হত। কোন কোন ওষুধ, জল, ঘি, বা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে, কখনো ভেজে, ক্বাথ তৈরি করে, পাতিত করে গাঁজিয়ে বা নানা পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হত।

এমন ওষুধও আছে যা কেবল শুঁকতে হয় বা সুবাস নিতে হয়। মলদ্বার, মূত্রদ্বার, জননাঙ্গ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শুঁই প্রয়োগ অর্থাৎ ইঞ্জেকশন করার কথাও চরক বলেছেন।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার এমন কোন দিক নেই যা নিয়ে চরক তাঁর সংহিতা গ্রন্থে আলোচনা করেন নি। কি নেই এই গ্রন্থে?

চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের পথ, রোগ নিরাময়, সমাজে চিকিৎসকের স্থান, চিকিৎসকের সম্মান-দক্ষিণা, রোগীর সেবাযত্নের প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষায়তনের পরিচয়, চিকিৎসা, উদ্ভিদবিদ্যা, গুণাগুণ ভেদে প্রাণীজগতের শ্রেণীবিন্যাস, জীবজন্তুর মাংসের গুণাগুণ ইত্যাদি।

চিকিৎসা তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়েওঠা ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছেন চরক।

আরও রয়েছে, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারার রীতি-নিয়ম, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির আলোচনা। মহামতি চরক স্বয়ং এক প্রতিষ্ঠান—এসম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। ভারতের চিকিৎসাক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার দ্যুতি অনির্বাণ সূর্যের মত দীপ্তিমান।

আর্যভট্ট

ভারতবর্ষ থেকে প্রথম যে উপগ্রহটি মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছিল আর্যভট্ট। এই নামকরণের মাধ্যমে ভারতবাসী এক প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীর কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল।

প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার ইতিহাস চর্চা করলে জানা যায় ধর্ম দর্শনের পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার চর্চাও সমান বেগে প্রবহমান ছিল।

মহাকাশের জ্যোতিষ্কদের দিকে মহাবিস্ময়ে তাকিয়ে ভারতীয় মনীষা যেমন আত্ম-জিজ্ঞাসায় ঊর্ধমুখ হয়েছে তেমনি বিজ্ঞানের আলোকপাত ঘটিয়ে উদ্ধার করতেও সমর্থ হয়েছে।

গ্রহতারাদের গতি, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে তাদের অবস্থানের সংবাদ তাঁরা উদ্ধার করেছেন। তাঁদের সংগৃহীত তথ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান। কালক্রমে গণিতের সরল ও জটিল পথ অনুসরণ করে ক্রমোন্নতি লাভ করেছে নভঃবিজ্ঞান।

বৈদিক সাহিত্যগুলি থেকেই জানা যায় ভারতীয় মনীষা মহাকাশে গ্রহতারার অবস্থান গণনায় সেই সুপ্রাচীন যুগেই কী বিস্ময়কর প্রতিভা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর্যভট্ট। প্রাচীন শাস্ত্রগুলির যেখানেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ও গণিতের আলোচনা উত্থাপিত হয়েছে, সেখানেই আর্যভট্টের নাম উচ্চারিত হয়েছে।

বিভিন্ন ভাষ্য গ্রন্থের মধ্যেও আর্যভট্টকে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠপুরুষরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর চলা-পথের অনুসরণ করেই ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে অগ্রসর হতে হয়েছে।

আর্যভট্টের ব্যক্তিজীবন বা পরিবার সম্পর্কে প্রায় সমস্ত তথ্যই রয়েছে মহাকালের অবগুণ্ঠনে ঢাকা। তাঁর সম্পর্কে খুব কম বিষয়েই জানা সম্ভব হয়েছে।

এটুকু জানা যায় যে বর্তমান কেরালারই কোনও একস্থানে আর্যভট্টের জন্ম হয়েছিল।

তাঁর জন্মকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও খ্রিস্টীয় ৪৭৬ সালকেই মোটামুটি ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এই সম্পর্কে তিনি নিজেই একস্থানে উল্লেখ করেছেন, ষটযুগ ও তিন যুগপদ অন্তকালে তাঁর বয়স তেইশ বছর। জ্যোতিষগণনার এই হিসাব ধরেই দেখা যায় ৪৯৯ খ্রিঃ যদি বয়ঃক্রম তেইশ হয় তাহলে জন্মসময় দাঁড়ায় ৪৭৬ খ্রিঃ।

কিশোর বয়সেই সুদূর কেরালা থেকে বনজঙ্গল পাহাড় ডিঙ্গিয়ে হাঁটাপথে নালন্দায় পড়তে এসেছিলেন আর্যভট্ট। এই ঘটনাই প্রমাণ করে তাঁর জ্ঞান আহরণের আগ্রহের গভীরতা।

বর্তমান বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটনার প্রাচীন নাম ছিল কুসুমপুর। তার অদূরেই জগদ্বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপ এখনও বর্তমান।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই নানা ধর্মশাস্ত্র, দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থাও ছিল।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন খাগোলা গ্রামে অবস্থিত ছিল বিখ্যাত জ্যোতির্বিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণা ক্ষেত্র।

আর্যভট্ট নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।

প্রতিভা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম বলে তিনি যা সত্য বলে জানতেন, তা প্রকাশ করতে কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। কোন সত্যকেই ধর্মের আবরণে চাপা দেবার চেষ্টা করতেন না।

তৎকালীন ধর্মাশ্রিত সমাজের পরিবেশ-পরিমন্ডলে তরুণ আর্যভট্ট রীতিমত এক বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব লাভ করেন।

ভারতে তখন গুপ্তযুগ। সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আসীন বুদ্ধগুপ্ত। তাঁর কালেও আর্যভট্টের বৈপ্লবিক চিন্তা ভাবনার কথা পৌঁছতে দেরি হয় না। চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার বহির্ভূত ভাবনা ও প্রচারের জন্য কিন্তু বাধা হলেন না সম্রাট। বরং নতুন প্রতিভাকে সমাদরে উৎসাহিতই করলেন তিনি।

রাজকীয় ব্যবস্থাতেই আর্যভট্ট তাঁর গবেষণালব্ধ সত্য জনসমক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষণার সুযোগ লাভ করেছিলেন। সেই দিনটি ছিল ৪৯৯ খ্রিঃ ২১ শে মার্চ।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য মতবাদকে অস্বীকার করে সেদিন আর্যভট্ট তাঁর বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

বলেছিলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবীর আকৃতি গোল। গোল পৃথিবী নিজের অক্ষ-পথে আবর্তিত হয় বলেই একই নিয়মে দিন যায় রাত আসে, আবার রাত যায় দিন আসে।

চাঁদ ও সূর্যকে রাহু গ্রাস করে বলেই গ্রহণ হয়—একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। পুরাণের এসব গাল-গল্পের কোন সত্যতা নেই। সূর্যের গায়ে পৃথিবী ও চন্দ্রের ছায়া পড়ে বলেই গ্রহণের ঘটনাটা ঘটে।

আর্যভট্টই প্রথম ঘোষণা করেন, চাঁদের নিজের কোন আলো নেই, পৃথিবী থেকে চাঁদকে আলোকিত দেখায় সূর্যের আলো চাঁদে প্রতিফলিত হয় বলেই। আসলে চাঁদ হল এক চির অন্ধকারের জগৎ।

বাইবেলের উক্তি হল, পৃথিবীই সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের কেন্দ্র; তাকে ঘিরেই সবকিছু ঘুরপাক খাচ্ছে, পৃথিবী স্থির।

মধ্যযুগের ইউরোপে গ্যালিলিও ঘোষণা করেছিলেন পৃথিবী স্থির নয় আর পৃথিবী নিজেই সূর্যের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে।

সেদিন ধর্মবিরুদ্ধ কথা বলে বাইবেলের অবমাননা করায় গ্যালিলিওকে আদালতের দন্ডভোগ করতে হয়েছিল।

সেদিন কেউ বিবেচনা করেনি যে প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানের ভূল সিদ্ধান্তটিই বাইবেলে স্থানলাভ করেছিল। আর বিজ্ঞানের সেই ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলেন উত্তরকালের এক বিজ্ঞানী।

গুপ্তযুগের উদার পরিবেশে কিন্তু ধর্মবিরুদ্ধ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা ঘোষণা করেও তরুণ বিজ্ঞানী আর্যভট্টকে অবমাননার কবলে পড়তে হয়নি।

বরং সেদিন মানুষের প্রচলিতধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে সগর্বে বিজ্ঞানের এক নতুন ধারণার গোড়াপত্তন হয়েছিল।

পরবর্তীকালে আর্যভট্টের গবেষণা সম্রাট বুদ্ধগুপ্তকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে তিনি তাঁকে সেই জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময়কর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

নালন্দায় আর্যভট্টের এই নিয়োগ সনাতনপন্থীদের সমর্থন না পেলেও সারা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও ধ্যানধারণায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।

ভারতীয় জ্যোর্তিবিজ্ঞান গবেষণার বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তের কথা যেদিন ঘোষণা করেন, ৪৯৯ খ্রিঃ সেই স্মরণীয় দিনেই তরুণ বিজ্ঞানী আর্যভট্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আর্যভাটিয়া বা আর্যসিদ্ধান্ত রচনা শুরু করেন।

এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করতে আর্যভট্ট কত বছর ব্যয় করেন, সে সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তবে পন্ডিতদের ধারণা ষষ্ঠ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনি গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন।

আর্যভট্টের গ্রন্থের ধারণা ছিল প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্ধারণার চিরাচরিত ধারণার ব্যতিক্রম।

তিনি এখানে প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণনাকারদের মতামতকে গ্রহণ করেও নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারণার কথা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেন।

আর্যসিদ্ধান্ত চার পদ বা অংশে বিভক্ত। প্রথম পদের নাম দশ গীতিকা। এই অংশে শ্লোকের মাধ্যমে তিনি সংস্কৃত বর্ণমালা ধরে গণিতের বড় বড় সংখ্যা প্রকাশের এক নির্দিষ্ট পদ্ধতি দেখিয়াছেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পদের নাম গণিত-পদ। এই পদের ৩৩টি শ্লোকে রয়েছে কেবলই অঙ্ক আর অঙ্কের সূত্রের কথা।

তৃতীয় কালক্রিয়া-পদের ২৫ টি শ্লোকে রয়েছে সময়ের হিসাব।

গ্রন্থের চতুর্থ অংশ হল গোলা-পদ। গোলা অর্থ গোলক। ৫০টি শ্লোকে রয়েছে গোলক-তত্ত্ব।

নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই হল আর্যভট্টের জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্বভাবতঃই তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রচলিত প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

আর্যভট্টের যুগান্তকারী গবেষণার ফলেই পৃথিবী যে গোলক ও নিজ কক্ষে সদা আবর্তনশীল এবং সূর্যের এই কক্ষীয় আবর্তনের ফলেই দিন ও রাত হয়, এসব সত্য প্রথম জানা গিয়েছিল।

তিনিই আমাদের প্রথম সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণের জ্যোতির্বিজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে রাহুগ্রাসের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছিলেন।

আর্যভট্টের যুগান্তকারী আবিষ্কার থেকে আমরা জানতে পেরেছি, চাঁদ নিজে আলোকহীন, চাঁদের ওপরে সূর্যের আলোর প্রতিফলনকেই আমরা চাঁদের আলো বলে ভ্রম করি।

শূন্যস্থ নিরক্ষবৃত্তকে উত্তর-দক্ষিণ মুখে পরিভ্রমণকালে প্রতি বছরে সূর্য প্রতি ছ'মাস অন্তর যে দুই চরম বিন্দু অতিক্রম করে আর্যভট্ট তাদের নাম দিয়েছেন অয়নান্ত ও হরিপদী বিন্দু।

আর্যভট্টই প্রথম লক্ষ করেন এই দুই বিন্দুতে দিন রাত সমান। তারিখ হিসাবে সময়টা ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর।

অয়নান্ত ও হরিপদী এই দুই বিন্দুতে সূর্যের গতির একটি নির্দিষ্ট দোলনকাল রয়েছে---এই তথ্যও আর্যভট্টই প্রথম আবিষ্কার করেন।

এপিসাইকেল কথাটি জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটি বহুব্যবহৃত শব্দ। এই শব্দের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বড় বৃত্তের কেন্দ্রাশ্রিত পরিধিলগ্ন অপেক্ষাকৃত ছোট বৃত্তকে বোঝায়। এককথায় বড় বৃত্তের পরিধির ওপর আবর্তিত হয় যে ছোট বৃত্ত তাকেই বলে এপিসাইকেল।

গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি এপিসাইকেলের দ্বারা গ্রহের অনিশ্চিত গতিবিধিকে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন।

আর্যভট্ট এপিসাইকেল তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর এই গবেষণা ছিল টলেমির তুলনায় অনেক বেশি বিজ্ঞান-নির্ভর। আর্যভট্টই প্রথম জ্যোতিবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রহগুলির গতি ব্যাখ্যা করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে গণিতের বিশেষ করে জ্যামিতির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। স্বাভাবিকভাবেই গণিতশাস্ত্রও আর্যভট্টের অবদানে পরিপুষ্ট হয়েছে। বীজগণিতকে ভারতীয় গণিতের সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচয় করিয়ে দেন আর্যভট্টই।

গ্রহদের অবস্থান গণনার প্রয়োজনেই আর্যভট্টের হাতে জ্যামিতির বহু নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে।

অনির্ণেয় সমীকরণকে সমাধান করবার জন্য তিনি যে নতুন আংশিক পথ উদ্ভাবন করেন তাই হল বীজগণিতের $ax-by=c$।

আর্যভট্টের অন্যতম গাণিতিক আবিষ্কার হল পাই এর মান নির্ণয়। তাঁর নির্ণীত পাই-এর মান হল ৩.১৪১৬।

আধুনিক গণিতজ্ঞদের গণনার সঙ্গে আর্যভট্টের গণনার পার্থক্য নেই বললেই চলে। অথচ দেড়হাজার বছর আগেই তিনি তা আবিষ্কার করেছিলেন।

আর্যভট্টই প্রথম গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। আলোর সামনে একটা অস্বচ্ছ বস্তুকে এপাশ ওপাশ সরিয়ে ছায়ার আকৃতির পরিমাপ দেখিয়ে তিনি গ্রহণ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের এই বিজ্ঞানী গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজনে যেসব তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন এযুগের মানুষদের কাছে তা বিস্ময়ের ব্যাপার।

জ্যামিতি, পরিমিতি, বর্গমূল, ঘনমূল, প্রগতি ও সৌরগোলকের নানা তত্ত্বের আলোচনা করেছেন।

বিশ্বগণিতের ইতিহাসে আর্যভট্টের দান সাইন (sine)কস (cosine) ট্যান (tan বা tangent) এবং কট (cot বা cotangent) ইত্যাদি। এই সাইনগুলোই ত্রিকোণমিতির ভিত্তিস্বরূপ।

গণিত বিষয়ে আর্যভট্টের বিভিন্ন তত্ত্ব আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্রে সাদরে গৃহীত হয়েছে।

বীজগণিতের যে অনির্ণেয় সমীকরণগুলির ব্যাখ্যা আর্যভট্ট করেছিলেন অতি সহজভাবে, ভাবতে অবাক লাগে গ্রীক বীজগণিতের অন্যতম পুরোধাপুরুষ ডায়ো ফান্টাস চতুর্থ শতকে এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারেই ছিলেন।

অথচ গ্রীক সম্রাট জুলিয়াসের সময়কালের এই গ্রীক বিজ্ঞানী বীজগণিতের ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টি করে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ডায়াফান্টাস তাঁর কল্পনাতেই আনতে পারেননি এমনি অনেক অজানা বিষয় আর্যভট্ট বীজগণিতকে দান করেছেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে যাঁকে নিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানের এত গর্ব তাঁর কোন রচনাই দেশে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তাঁর কাজের সন্ধান আমরা পেয়েছি বিভিন্ন সময়ের নানা বিজ্ঞানীর আর্যভট্ট সম্পর্কে উদ্ধৃতি থেকে।

বিখ্যাত পর্যটক আলবেরুনী একাদশ শতকে ভারতে এসেছিলেন। আর্যভট্ট সম্পর্কে তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে আর্যভট্টের একটিও মূল রচনা তিনি খুঁজে পাননি। ব্রহ্মগুপ্তকৃত আর্যভট্টের উদ্ধৃতিগুলো নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

বিভিন্ন উদ্ধৃতিগুলি সংগ্রহ করে বিজ্ঞানী কার্ন সর্বপ্রথম আর্যভট্টের প্রথম গ্রন্থ আর্যভাটিয়া প্রকাশ করেছিলেন লেইডেন শহর থেকে ১৮৭৪ খ্রিঃ। এই গ্রন্থের মাধ্যমেই তাঁর গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কারগুলির কথা বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন এবং শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মাথা অবনত করতে বাধ্য হন।

ভারত থেকে আর্যভট্টের রচনাগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেই আরবদেশে পাচার হয়ে গিয়েছিল।

আরব জ্ঞানান্বেষীরা আর্যভট্টের অবদানের সন্ধান লাভ করে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁরাই তাঁর রচনাগুলি স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আব্বাসাইদ খালিফ, অল মনসুর এবং আল মামু প্রভৃতি জ্ঞানপিপাসু আরবীয়দের চেষ্টায় আর্যভট্ট আরবে কেবল পরিচিতই হননি, সে দেশের জনপ্রিয়তম বিজ্ঞানীদের একজন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তগুলি আরবীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে নতুন যুগের সূচনা করেছিল। আরবীয়গণ আর্যভট্টের নতুন নামকরণ করেছিলেন আরজাভর।

নাগার্জুন

ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে সিন্ধুনদের উপত্যকায়। খ্রিষ্টের জন্মের ৩০০০ বছর আগে গড়ে উঠেছিল এই সিন্ধুসভ্যতা। ধ্বংসাবশেষ থেকে যেসব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায় রসায়ন-জ্ঞান ও ধাতুবিদ্যায় সিন্ধুবাসীরা যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

বিভিন্ন মাটির পাত্র, ব্রোঞ্জের তৈজস পত্র, সোনা ও রুপোর অলঙ্কার এই সভ্যতার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের পরিচায়ক।

কিন্তু সেই সভ্যতার বিজ্ঞানিক ব্যক্তি পরিচয় বা কর্মসাধনার তথ্য আজও আমাদের অজানা।

সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তী কালই ভারতে বৈদিক যুগ নামে পরিচিত। বৈদিক মনীষীদের আয়ুর্বেদচর্চার ইতিহাস আমাদের জানা।

যতদূর জানা যায় ভারতে আয়ুর্বেদচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল খ্রিষ্টের জন্মের ৩০০ বছর আগে থেকে।

নানাপ্রকার ওষুধ প্রস্তুতির জন্য উদ্ভিদ রস ও ভস্ম ইত্যাদি সংগ্রহের সূত্রেই ভারতে আয়ুর্বেদচর্চার সূচনা হয়েছিল।

ক্রমে নানা চিকিৎসা বিজ্ঞানীর সাধনায় আয়ুর্বেদের অভাবিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।

আয়ুর্বেদের ওষুধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নানা ধাতু ও ধাতব যৌগের ব্যবহার শুরু হয়েছিল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম ভাগ থেকে। এইভাবেই উদ্ভিদ জগৎ থেকে আয়ুর্বেদের উত্তরণ ঘটেছিল রসায়ন ক্ষেত্রে।

আয়ুর্বেদে রস বলা হয়েছে পারদকে। এই পারদ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল খ্রিস্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার যুগে।

বৌদ্ধধর্মের সাধনা ছিল মূলতঃ জীবনবিমুখ। তন্ত্রের ছিল ভিন্ন পথ। জীবনবাদী তান্ত্রিকগণ জীবনোপভোগের জন্য লাভ করতে চাইতেন অনন্ত যৌবন যেহেতু যৌবনই জীবন উপভোগের শ্রেষ্ঠকাল।

স্বাভাবিকভাবে কালক্রমে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের বিজ্ঞান সাধনাই হয়ে উঠেছিল এই অনন্ত যৌবন লাভের উপায়। তাদের হাতেই রসায়ন ধাপে ধাপে অগ্রগতি লাভ করেছিল।

এই যুগেই লেখা হয়েছিল রসায়নের নানা বই। তার মধ্যে সন্ধান পাওয়া যায় নানা রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার।

বৌদ্ধতান্ত্রিকতার যুগের বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করেছিলেন নাগার্জুন। তিনিই ভারতের রসায়ন গবেষণার পথিকৃৎরূপে স্বীকৃত।

নাগার্জুনের কাল নির্ণয় নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। বিখ্যাত পর্যটক আলবেরুনী ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন ১০৩১ খ্রিঃ। তিনি ইন্ডিকা নামে যে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছিলেন এই বইতে তিনি নাগার্জুন নামে একজন বিখ্যাত রসায়নবিদের কথা জানিয়েছিলেন।

নাগার্জুন ছিলেন, গুজরাতের সোমনাথের নিকটবর্তী দৈহ্যক দুর্গের বাসিন্দা। আলবেরুনী তাঁর কাল নির্দেশ করেছেন দশম শতকের প্রথম ভাগ।

নাগার্জুনের একটি অসাধারণ বইয়েরও উল্লেখ করেছেন আলবেরুনী। বইটির নাম রসরত্নাকর।

আলবেরুনী জানিয়েছেন, রসায়নের সমস্ত বিষয়কেই এই বইতে স্থান দেওয়া হয়েছে। মহাযান বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী নাগার্জুন সুশ্রুত সংহিতার উত্তর তন্ত্র অংশটিও রচনা করেছিলেন।

ব্যক্তি নাগার্জুন সম্পর্কে জানা যায় তিনি বিদর্ভ নগরের অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী।

সেইকালে কৃষ্ণানদীর তীরে অমরাবতী নামে এক বিখ্যাত জনপদ ছিল। সেখানে ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়। নাগার্জুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটেই বাস করতেন।

নাগার্জুনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর রসরত্নাকর গ্রন্থটি। রস ঘটিত যৌগ ও তার প্রস্তুতি এই বইয়ের প্রধান উপজীব্য।

রস ছাড়া লোহা, সোনা, রুপো ইত্যাদি ধাতুর কথাও তিনি তাঁর বইতে আলোচনা করেছেন।

নাগার্জুনের রসায়নচর্চার প্রধান বিষয় ছিল রস বা পারদকে উদ্ভিদ বা জীবজন্তুর দেহাবশেষ মিশিয়ে কি করে সোনাতে রূপান্তরিত করা যায় তার অনুসন্ধান।

সোনা তৈরির অনেক পদ্ধতির কথা নাগার্জুন তাঁর রসরত্নাকর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেন এক প্রকার উজ্জ্বল নীল বর্ণের পাথরকে একটি বিশেষ রসে জারিত করলে তা এক রতি রুপোকে ১০০ গুণ বেশি ওজনের সোনায় রূপান্তরিত করতে পারে।

যে নীলবর্ণের পাথরটির কথা তিনি বলেছেন তা হল ল্যাপিস বা জুলাই জাতীয় পাথর। আর বিশেষ রসটি হল আলবিজিয়া লেব্বেক।

আরও বলেছেন, হলুদ বর্ণের গন্ধককে বুটিকা মনোস্পারমার রসের সঙ্গে মিশিয়ে বিশুদ্ধ করার পর তার সঙ্গে রুপো ঘুটের আগুনে জ্বাল দিলে বিশুদ্ধ সোনা পাওয়া যাবে।

রসায়নের নানা পদ্ধতির বিবরণও দেওয়া হয়েছে রসরত্নাকর গ্রন্থে। পাতন, ঊর্ধ্বপাতন, ভস্মীকরণ, ইত্যাদি ও বহু যন্ত্রপাতিরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

নাগার্জুনই সর্বপ্রথম কজ্জলী বা কৃষ্ণবর্ণের সালফাইডকে পুড়িয়ে ধাতব অক্সাইড তৈরি করেছেন।

'রস' বা পারদ ঘটিত নানা রস তৈরি করে তিনিই প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা ওষুধে ব্যবহার করেছেন।

অনন্ত যৌবন লাভের পথ আবিষ্কারের প্রেরণাতেই প্রথমে নাগার্জুন রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

রস ঘটিত নানা যৌগ থেকেই যে অনন্ত যৌবন লাভের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে তা তিনি শুনেছিলেন। তাই কোন সমর্থ রস-বিজ্ঞানীর কাছে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি যৌবনেই পরিব্রাজনে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

এ সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, মানুষের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দীর্ঘ বার বছর তিনি যক্ষিণীর উপাসনা করেন। সন্তুষ্ট হয়ে যক্ষিণী তাঁকে রস বন্ধন অর্থাৎ রসকে কঠিনীভবনের জ্ঞান দান করেন।

বস্তুতঃ দীর্ঘ বারো বছরের সাধনার ফলেই যে নাগার্জুন তাঁর অভিষ্ট লাভ করেছিলেন তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যক্ষিণী গল্পের প্রসঙ্গে। তাঁর আবিষ্কারের অব্যর্থতা সম্পর্কে লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই যে যক্ষিণীর অবতারণা করেছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নাগার্জুন এক জায়গায় লিখেছেন, সব রসের রাজা রসরাজ হল পারদ। এই পারদকে লেবুরস, নিশাদল, অম্ল, ক্ষার, পঞ্চ লবন, আদ্যরস ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে আটটি বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে সংকর ধাতু তৈরি করা যায়।

চিরযৌবন লাভের ওষুধি প্রস্তুতি সম্পর্কে নাগার্জুন বলেছেন, রস অর্থাৎ পারদকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত করে সম ওজনের সোনার সঙ্গে ভালভাবে

মিশিয়ে সোনা পারদের সংকর প্রস্তুত করতে হবে। এই সংকরকে মেশাতে হবে গন্ধক, সোহাগা ইত্যাদির সঙ্গে।

এবারে এই মিশ্রণকে একটা মাটির পাত্রে ঢেকে নিয়ে উচ্চতাপে উত্তপ্ত করতে হবে। এইভাবে যে ঊর্ধ্বপাতিক শোধিত অংশ পাওয়া যাবে তা পান করলে চির যৌবন লাভ অবধারিত।

নাগার্জুনের সাধনা এইভাবেই এক সময় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মুক্ত অঙ্গনে প্রবেশ করেছিল।

তাঁর তৈরি রসায়নের পথ ধরেই ভারতীয় রসায়ন বিজ্ঞানের ইমারত তৈরি হয়েছিল উত্তরকালে।

ভাস্কর

ভারতে বৈদিক যাগযজ্ঞের সূত্র ধরেই বলতে গেলে বিজ্ঞানের, বিশেষ করে, গণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল। সেযুগে সমাজে যাগযজ্ঞ ও ধর্মীয় নানা ক্রিয়াকান্ডই প্রাধান্য লাভ করেছিল। যজ্ঞের জন্য দরকার হত নানা আকার ও আয়তনের যজ্ঞবেদী। ফলে নানা ধরনের বেদীর ছক কষতে কষতেই জন্মলাভ করল জ্যামিতি।

তেমনি বৈদিক যজ্ঞের সময় ও তিথি নির্ণয় করবার প্রয়োজনে ভারতীয় মনীষীরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন গ্রহ, সূর্য ও নক্ষত্রের অবস্থান। এভাবেই সূচিত হয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি।

সহজভাবেই অনুমান করা যায় ভারতে গণিতের যাত্রা শুরু হয়েছিল যজ্ঞবেদীর সরল আকার আয়তনের পথেই। কালক্রমে সেই আকার ও আয়তনগুলি জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। বেদের সূত্রগুলিতেই তৎকালীন সময়ের জ্যামিতির বর্ণনা পাওয়া যায়।

যজুর্বেদে পাওয়া যায় মেধাতিথির দশমিক পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনার কথা। ভারতীয় গণিতজ্ঞদের হাতেই উত্তরকালে মেধাতিথির সূত্রানুসন্ধানী স্থান-মূল্য পদ্ধতিতে সংখ্যা লেখার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে।

ভারতীয় গণিতে এই স্থান-মূল্য ভিত্তিক ((Place values system) সংখ্যা রচনা যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা করেছিল। আবির্ভাব সম্ভব করে তুলেছিল আর্যভট্ট, বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্তের মত গণিতবিজ্ঞানীদের। তাঁদের অবদানে ভারতীয় বিজ্ঞানের গণিত শাখার ইতিহাসে অনিবার্যভাবে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

কালক্রমে জ্যামিতি থেকেই গণিতের ধারা বিবর্তিত হয়েছিল পাটিগণিতের দিকে। কালক্রমে ভারতীয় গণিতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল আরও একটি ধারা তা হল বীজগণিত।

আর্যভট্ট, বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্তের হাতেই রোপিত হয়েছিল বীজগণিতের বীজ।

বীজগণিতের স্পষ্ট রূপদান যিনি করেছিলেন তিনি হলেন ভাস্কর। ভারতীয় গণিতের অঙ্কুরোদগম ঘটিয়েছিল ভাস্করের গণিত গবেষণা।

উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষে ভাস্করের কাল দ্বাদশ শতকের সময়সীমার মধ্যেই বীজগণিতের যে অগ্রগতি ঘটেছিল, সমসাময়িক পৃথিবীর কোন প্রান্তেই অনুরূপ কোন বিস্ফোরণ ঘটেছে এমন যুগান্তকারী ঘটনার সন্ধান বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে অনুপস্থিত।

ভাস্করের অনুরূপ চিন্তাভাবনার পরিমন্ডলে পৌঁছতে ইউরোপীয় গণিত বিজ্ঞানকে ১৭ থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

স্বভাবতঃই বিজ্ঞানী ভাস্করের জীবন ও সাধনার কথা জানবার জন্য আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

কিন্তু ভারত এমনি এক আত্মপ্রচারবিমুখ ও নিস্পৃহ আদর্শ কর্মজীবনে অনুসরণ করে যে প্রাচীন বিজ্ঞানীদের কর্মের আশীর্বাদই কেবল দেশবাসী গ্রহণ করেছে, তাঁদের ব্যক্তিজীবনের খুঁটিনাটিসুদ্ধ সকল জ্ঞাতব্য মহাকাল সকৌতুকে অপহরণ করেছে।

উত্তরকালে বিজ্ঞানীদের জন্ম ও জীবনের পরিবর্তে তাঁদের কর্মজীবনের কীর্তির মধ্যেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অব্যাহত ছিল।

তার মধ্যে দু-একটি ব্যতিক্রমের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন বৌদ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়ন শাস্ত্রের অবিনশ্বর প্রতিভা জীবক। সমকালের বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণের কল্যাণেই তাঁর সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে।

ভাস্করের আবির্ভাব ঘটেছিল দ্বাদশ শতকে। সেই সময়ে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ভাস্কর-পরবর্তী শাস্ত্রগুলোতে তাঁর কর্ম-সাধনা ও জীবনের অনেক তথ্যই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আমরা জানতে পেরেছি, মহারাষ্ট্রের বিজ্জদাবির নগরে ১১১৪ খ্রিঃ এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ভাস্করের জন্ম।

তাঁর পিতা মহেশ্বর ছিলেন গণিত অনুরাগী মানুষ। তিনি বাল্যবয়স থেকেই পুত্রকে গণিতের শিক্ষা দেন।

সেই শিক্ষাই ভাস্করের প্রতিভাগুণে উত্তরকালে বিকশিত হয়ে ভারতের গণিত চর্চার ইতিহাসকে আলোকিত করেছিল।

ভাস্করের প্রতিভা তাঁর পুত্র লক্ষ্মীদার এবং পৌত্র গঙ্গাদেবও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। তাঁরা দুজনেই গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

কৈশোরেই গণিতের অসামান্য প্রতিভার জন্য ভাস্কর সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর গণিত বিজ্ঞানের বই সিদ্ধান্ত শিরোমণি লেখার পর সমগ্র ভারতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভাস্করের বয়স যখন ৩৬ বছর, ১১৫০ খ্রিঃ সিদ্ধান্ত শিরোমণি লিখিত হয়। পরবর্তীকালে ১১৮৩ থেকে ১১৮৪ সালের মধ্যে তিনি রচনা করেছিলেন কারণ কৌতূহল। এই বই রচনার সময় ভাস্করের বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

দ্বাদশ শতকে ভারতের মাটিতে মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ঘটেছে। সেই সময় প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মূল পান্ডুলিপিগুলি অধিকাংশই বিনষ্ট হয়েছে, কিছু পাচার হয়েছে বিদেশে।

ইতিহাসের এই সঙ্কটকালেই ভাস্কর তাঁর গবেষণার আলোতে ভারতীয় গণিত চর্চার ইতিহাসকে আলোকিত করেছিলেন।

ভাস্করের অতুলনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে। বইটি চারভাগে বিভক্ত।

প্রথমেই রয়েছে সংখ্যা নিয়ে সরল ও জটিল গবেষণা। এই ভাগের নাম পাটীগণিত। পরবর্তী ভাগের নাম বীজগণিত। তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের নাম যথাক্রমে গ্রহগণিত-অধ্যায় ও গোলাধ্যায়।

এই দুই ভাগে গ্রহ এবং গোলকের গাণিতিক আলোচনা করা হয়েছে।

ভাস্করের গ্রন্থে গণিত অধ্যায়ে আর্যভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্তের সঙ্গে দুই প্রাচীন গণিত গবেষক লাল্লা ও শ্রীধরের তত্ত্বগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

পাটীগণিত অধ্যায়ে বীজগণিতের কোন উল্লেখ ছিল না। তবে শেষ দিকে কিছু জ্যামিতি রয়েছে।

ওজন ও পরিমাপের একক দিয়ে শুরু হয়ে প্রায় কুড়ি ধরনের গাণিতিক প্রয়োগ দেখানো হয়েছে—যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, ঘনক, ঘনমূল, ভগ্নাংশ হ্রাসের পঞ্চপ্রকরণ, প্রত্যক্ষ ও বিপরীত তিন নিয়ম, পাঁচ, সাত, নয় এবং ১১ সংখ্যাসীমা এবং বিনিময় ইত্যাদি।

মিশ্রণ, প্রগতি, সমতল, ঘনক, পালুই, করাত, শস্যটিবি, ছায়াঘড়ির ছায়া, অনির্ণেয় দ্বিপদী সমীকরণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্তের ক্ষেত্রফল, গোলকের আয়তন, শঙ্কু, পিরামিড বা সূচী-ঘনক্ষেত্র প্রভৃতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ভাস্কর।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, মধ্যযুগের সেই অস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে থেকেও কী নিবিড় নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় বলে ভাস্কর ভারতীয় বিজ্ঞানের ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছিলেন।

সিদ্ধান্ত শিরোমণির দ্বিতীয় ভাগ হল বীজগণিত। আক্ষরিক অর্থেই এখানে স্থান পেয়েছে বিশ্লেষণী গণনা।

ভাস্করের বীজগণিতের ২১৩টি পংক্তি ভারতীয় গণিত আজও সগৌরবে বহন করে চলেছে।

আধুনিক বীজগণিতের প্রসার সত্ত্বেও ভাস্করের বীজগণিতের আবেদন এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

শূন্য সংক্রান্ত নানা গণনা এবং ধনাত্মক ও ঋণাত্মক নানা সংখ্যা ও পরিমাণের তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে বীজগণিত অংশে।

ভাস্কর তাঁর বীজগণিত অংশে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন অনির্ণেয় সমীকরণ ঘটিত বিশ্লেষণী গণনায়।

এই ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি পূর্ববর্তী ভারতীয় গণিত বিজ্ঞানীদের অবদানকেও সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন।

দ্বিপদী সমীকরণের অনির্ণেয় ভাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাস্কর বীজগণিতের সঙ্গে জ্যামিতিরও সাহায্য নিয়েছেন।

গণিতের পাশাপাশি জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণাতেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন ভাস্কর। তাঁর গ্রহগণিত অধ্যায়ে তিনি গ্রহতারার অবস্থানের গণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাঁর এই গবেষণার ভিত্তি ছিল সূর্য-সিদ্ধান্ত। তার অনুসরণে তিনি গ্রহদের গতিকে বায়ুর গতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে তাঁর এই কাজকে অবৈজ্ঞানিক সুলভ মনে হলেও, তিনি আশ্চর্য এক তত্ত্ব তৈরি করতে পেরেছিলেন।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এক বৃত্ত অপেক্ষাকৃত বড় একটি বৃত্তের পরিধির ওপর তার কেন্দ্র অবস্থিত এবং ওই কেন্দ্রকে আশ্রয় করে ক্ষুদ্র বৃত্তটি আবর্তিত হচ্ছে—ভাস্করের এই তত্ত্বকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিক ভাষায় নাম দেওয়া হয়েছে EPI-CYCLE।

এই তত্ত্বের সাহায্যেই তিনি নানা গ্রহের ঘূর্ণনের ব্যাখ্যা করেছেন। নানা গোলকের আকার ও আয়তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সিদ্ধান্ত শিরোমণির শেষ ভাগ গোলাধ্যায় অংশে।

ভারতীয় গণিত বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পরিধিতে ভাস্করই ছিলেন শ্রেষ্ঠ গণিত বিজ্ঞানী।

তাঁর গবেষণা অনুসরণ করে পরবর্তীকালে বহু ভাষ্য রচিত হয়েছে। দেশে দেশে ভাস্করের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এইভাবেই স্বমহিমায় ভাস্কর বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

৭১ বছর বয়সে ১১৮৫ খ্রিঃ ভাস্করের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর ৪০০ বছর পরে ভারতসম্রাট আকবর সিদ্ধান্ত শিরোমণির পাটীগণিত অধ্যায় অনুবাদ করিয়েছিলেন বিশিষ্ট পন্ডিত আবুলফজলকে দিয়ে।

আরও পরে ১৬৩৪ খ্রিঃ প্রাচ্যবিষয়ক পন্ডিত আতাউল্লা রুশটি বীজগণিত অংশের অনুবাদ করেছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়



বিখ্যাত জমিদার পরিবারের সন্তান। শিক্ষায়-দীক্ষায় কর্মকৃতিত্বে ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের অন্যতম, বিশ্রুত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সফল অধ্যাপক, অথচ চলনে বলনে, বেশভূষায়, জীবনযাপনে ছিলেন এমনই সাধারণ যে তাঁকে দেখলে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যেত না।

মনে হত কোন সওদাগরী অফিসের করণিক। এমনই অত্যাশ্চর্য মানুষ ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

দেশে বিদেশে সম্মানিত প্রখ্যাত রসায়নবিদ এই মানুষটিই ভারতে প্রথম রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দেশে রসায়নচর্চা এবং গবেষণার পথ উন্মুক্ত করেন।

অধ্যাপনার দুর্লভ আকর্ষণী শক্তিতে ছাত্রদের আকৃষ্ট করে একটি ভারতীয় রাসায়নিক বিজ্ঞানীগোষ্ঠীর সৃষ্টি উনবিংশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণের পথে গতি সঞ্চার করেছিলেন।

ঋষিপ্রতিম বিজ্ঞান সাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার রাড়ুলি গ্রামে ১৮৬১ খ্রিঃ ২রা আগস্ট। তাঁর পিতার নাম হরিশচন্দ্র রায়, মাতা ভুবনমোহিনী দেবী।

ইংরাজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলে হরিশচন্দ্র। কিন্তু তাঁর নাড়ির যোগ ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে। ফলে বাড়ির পরিবেশে ছিল দেশীয় ঐতিহ্য চেতনার সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান-গরিমার প্রভাব।

এই দুই সমান্তরাল ভাবধারার মধ্যেই তৈরি হয়েছিল ভাবীকালের প্রফুল্লচন্দ্রের মানসিক গঠন।

সাত ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যম। আদর যত্নে মানুষ হয়েও ছেলেবেলা থেকেই শরীর ছিল রুগ্ন। তবু প্রাণশক্তির অভাব ছিল না বালক প্রফুল্লচন্দ্রের।

গ্রামের পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তাঁর। রাড়ুলির বাল্যস্মৃতি পরিণত বয়সেও গভীর আবেগের সঙ্গে স্মরণ করতে দেখা যেত তাঁকে।

প্রতিষ্ঠিত জমিদার বংশ, অর্থের অনটন কোনকালেই ছিল না। তবু বিভিন্ন সময়ে নানান চাকরি করে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন হরিশচন্দ্র।

মধ্যবয়সে তিনি সপরিবারে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় এসে বসবাস করতে থাকেন। সময়টা ১৮৭০ খ্রিঃ।

বাংলা তথা ভারতের সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেটা নবজাগরণের উষাকাল। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক কাজের মধ্য দিয়ে জন্ম লাভ করছে এক নতুন জাতি।

শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন, স্ত্রী শিক্ষার বাধা দূর করে তাদের জন্যও স্কুল স্থাপন করছেন, দিগবিজয়ী পণ্ডিত হয়ে নিজেই শিশুশিক্ষার বই লিখছেন, বিধবাবিবাহ প্রচলনের উদ্দেশ্যে প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে সমান দাপটে লড়াই চালিয়ে চলেছেন। সমাজের সর্বস্তরে আরম্ভ হয়েছে প্রচণ্ড আলোড়ন।

অপর দিকে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের ফাঁদ থেকে দেশবাসীকে স্বধর্মে অবিচলিত রাখবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের পতাকা উত্তোলন করে সমাজের ভাঙ্গন রোধ করবার প্রাণপণ প্রয়াস চালাচ্ছেন।

স্বদেশী স্কুল গড়ে উঠছে নানা স্থানে, জাতীয়তা বোধের চেতনা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে দেশবাসীর মনে।

ক্রান্তিকালেব এই মহালগ্নে প্রফুল্লচন্দ্রকে ভর্তি করে দেওয়া হল কলকাতার হেয়ার স্কুলে।

কিন্তু কলকাতার নতুন জল-হাওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই রোগে পড়ে গেলেন বালক প্রফুল্লচন্দ্র। কঠিন রকম-আমাশায় মরণাপন্ন হল তাঁর অবস্থা। বাধ্য হয়ে শরীর সুস্থ করার জন্য তাঁকে ফের নিয়ে আসতে হল রাড়ুলির গ্রাম-ঘরে।

হেয়ার স্কুলের ফোর্থ ক্লাশের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ পড়া তিনি করতেন বাড়িতেই। তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল, ইংরাজি, গ্রিক, ল্যাটিন, ইতিহাস ও প্রত্নবিদ্যা।

পড়াশুনার প্রতি গভীর আগ্রহ থাকায় অতি দ্রুত এই সব বিষয়ে নিজেকে তৈরি করে নিতে পারছিলেন।

ভবিষ্যতে যিনি দেশের মানুষকে বিজ্ঞান শিক্ষার নতুন পথ দেখাবেন, ছেলেবেলায় বিজ্ঞানের প্রতিও যে তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকবে এটা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়।

ভাষা সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বিজ্ঞানও যে তাঁর বিদ্যাচর্চার অন্যতম বিষয় ছিল তা বলাই বাহুল্য।

গ্রামের জল-হাওয়ার মুক্ত পরিবেশে ক্রমে শরীবের সুস্থতা ফিরে পেলেন প্রফুল্লচন্দ্র। ১৮৭৪ খ্রিঃ পুনরায় কলকাতায় এলেন, এবারে ভর্তি হলেন অ্যালবার্ট স্কুলে।

এই স্কুলের পরিচালক ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্রের ছোট ভাই কৃষ্ণবিহারী সেন। ওখানে পাঠ্যাবস্থাতেই প্রফুল্লচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর চিন্তা ও মননে প্রগতির পরিশীলন সংঘটিত হয়।

১৮৭৯ খ্রিঃ এন্ট্রাস পাস করলেন প্রথম বিভাগে। ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানে ইংরাজির অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। তখনো অবশ্য তিনি রাষ্ট্রগুরু হয়ে ওঠেন নি। তবে তাঁর শিক্ষায় ছাত্রদের মধ্যে একদিকে যেমন ইংরাজের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ জন্মাত, তেমনি স্বাদেশিকতার আবেগে উদ্বুদ্ধ হত তারা।

এইভাবেই অন্ধকার ভারতবর্ষে জন্মলাভ করছিল নবভারতের আলোর শিশুরা। প্রফুল্লচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

তাঁর কিশোর রক্তেও প্রবাহিত হল ইংরাজি প্রেমের সঙ্গে দেশপ্রেম।

১৮৮০ খ্রিঃ এফ.এ. পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. কোর্সে ভর্তি হলেন। এখানেই তিনি রসায়নের অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার পেজলারের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

বি.এ. পরীক্ষার আগে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮০ খ্রিঃ প্রফুল্ল চন্দ্র উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র ভর্তি হলেন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। লন্ডনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে এডিনবার্গে ভর্তি হবার কারণ ছিল।

তখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের পাঠ দিতেন বিশ্রুত রসায়নবিদ ক্রাম ব্রাউন।

সমমাত্রিকতার বা আইসোমেরিজম-এর সূত্র আবিষ্কার করে তিনি বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই সূত্রেই তিনি লন্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হয়েছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮৫ খ্রিঃ বি.এসসি. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। ১৮৮৭ খ্রিঃ রসায়ন শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি উপাধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হোপ পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৮৮ খ্রিঃ দেশে ফিরে আসেন এবং ১৮৮৯ খ্রিঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

এখানে তিনি সহকর্মী হিসেবে পেলেন জগদীশচন্দ্র বসুকে। কেমব্রিজেই ইতিপূর্বে আলাপ পরিচয় হয়েছিল, এবারে কর্মসূত্রে বন্ধুত্ব তৈরি হল।

অধ্যাপনার পাশাপাশি প্রফুল্লচন্দ্র গবেষণার কাজও আরম্ভ করলেন।

সেই সময়ে প্রেসিডেন্সিতে গবেষণাগারের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। উপযুক্ত পরিসর এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির যথেষ্ট অভাব ছিল। এই অসুবিধার মধ্যেই কাজ করতে হতো প্রফুল্লচন্দ্রকে।

একেই তো চিররুগ্ন চেহারা, সময়ে অসময়ে ছোট বড় অসুস্থতা লেগেই আছে। তার ওপর অপরিসর গবেষণাকক্ষের মধ্যে ধোঁয়া গ্যাস-এর আক্রমণ। বাধ্য হয়েই তাঁকে শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের স্বার্থে নতুন একটি ল্যাবরেটরির কথা জানাতে হল।

প্রফুল্লচন্দ্রেরই উদ্যোগে এবং তৎপরতায় ১৮৯২ খ্রিঃ প্রেসিডেন্সিতে গড়ে উঠল নতুন ল্যাবরেটরী। একেবারে আধুনিক ল্যাব।

মহাউৎসাহে এবারে সহকর্মীদের নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠলেন প্রফুল্লচন্দ্র। সালফেট যৌগের আণবিক সংযুক্তি বিষয়ে শুরু হল অক্লান্ত পরিশ্রম।

১৮৯৩ খ্রিঃ থেকে জয়যাত্রা শুরু হল। এই সময়ে একদিন পরীক্ষাগারে নানারকম পরীক্ষা করছেন।

বিশেষ প্রয়োজনে পারদ পরিশ্রুত করছেন। এজন্য প্রথমে জলীয় নাইট্রিক অম্লকে ঠাণ্ডা করে নিয়েছেন। সেই ঠাণ্ডা তরলে বিন্দু বিন্দু করে পারদ ফেলতে হচ্ছে। এই সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়ল তাঁর।

লক্ষ করলেন পারদের সঙ্গে জলযুক্ত নাইট্রিক অম্লের সূক্ষ্ম একটা বিক্রিয়া ঘটছে। তার ফলে পারদের ওপরে পড়ছে অদ্ভুত একটা হলদে সর। ধীরে ধীরে সেই সর কঠিনে রূপান্তরিত হচ্ছে।

জিনিসটা পরীক্ষা করেই আনন্দে মন নেচে উঠল। জিনিসটা নাইট্রাইট—মারকিউরাস নাইট্রাইট।

এই নতুন লবন আবিষ্কার করতে পেরে স্বতঃই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন প্রফুল্লচন্দ্র। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এ সম্পর্কে একটা লেখা ছাপালেন। পরে বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা জার্নাল অব দ্য কেমিক্যাল সোসাইটিতেও নতুন লবন তৈরির কলাকৌশল ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধ পাঠালেন। প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই

বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে গেল। রাতারাতি প্রফুল্লচন্দ্র সারা বিশ্বে বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন।

এরপর ক্ষারীয় ধাতুর বিভিন্ন নাইট্রাইট লবণ তৈরির কাজ নিয়ে অগ্রসর হতে লাগল তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা। ১৯০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত এই নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বিশুদ্ধতা সহ ডবল নাইট্রাইট যেমন পারদ ও ক্যালসিয়ামের কেলাসিত ডবল নাইট্রাইট পারদ ও বেরিয়ামের কেলাসিত ডবল নাইট্রাইট, পারদ ও লিথিয়ামের ডবল নাইট্রাইট, প্রভৃতি তৈরি করলেন।

ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইট যে খুবই অস্থায়ী তা-ও তিনি নির্ণয় করেন।

একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সফল হয়েছেন, সেসব নিয়ে ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখেছেন কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালে।

নাইট্রাইট সংক্রান্ত তাঁর পর্যায়ক্রমিক সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে মাস্টার অব নাইট্রাইটস নামে পরিচিত হলেন তিনি।

প্রফুল্লচন্দ্রের বিখ্যাত গ্রন্থ হিন্দু রসায়ন চর্চার ইতিবৃত্ত প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৯০২ খ্রিঃ।

এই গ্রন্থে তিনি প্রধানতঃ প্রাচীন মধ্য ও তান্ত্রিক যুগের রসায়ন চর্চার ইতিবৃত্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন, প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদানের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বিভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে বিশ্ববিজ্ঞানের মঞ্চে ঘোষণা করেন ধাতু নিষ্কাশন, বারুদ তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দক্ষতা কিছু কম ছিল না।

প্রফুল্লচন্দ্রের দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল এই গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হল।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকাগুলোতে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরাই প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিবৃত্তের এই গ্রন্থটির বিষয়ে সপ্রশংস আলোচনা প্রকাশ করলেন। ফলে পশ্চিমের বিজ্ঞানী মহলেও যথেষ্ট সাড়া পড়ল।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৯ খ্রিঃ। এই খন্ডে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের রসায়ন চর্চা বিশেষ করে নাগার্জুনকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

সেই সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে ভৌত রসায়নের তত্ত্ব নিয়ে মধ্যযুগীয় রসায়নবিদদের গবেষণার বিষয়াদি।

হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের ভূমিকায় প্রফুল্লচন্দ্র লেখকের বক্তব্যে যা বলেছিলেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার এক অংশে তিনি বলেছেন, "হিন্দু জাতির গৌরব উদ্দীপিত অতীত ও বিশাল সুপ্ত সম্ভাবনা আরও এক গৌরবোজ্জ্বল

ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী। বইটি লিখেছি আমার দেশবাসীকে অতীতের শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পাবার চেতনায় উদ্ভাসিত করে তুলতে, যদি তাই-ই হয়—ভাববো শ্রম মাঠে মারা যায়নি.....''।

দুই খন্ড বইই প্রকাশিত হয়েছিল প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল এর পক্ষ থেকে।

পরবর্তী সময়ে দুই খন্ড জুড়ে একখন্ডে প্রকাশিত হয় পরিবর্তিত শিরোনাম 'প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের রসায়ন চর্চার ইতিবৃত্ত' নিয়ে।

১৯০৪ খ্রিঃ প্রফুল্লচন্দ্র বিলেত যাত্রা করেন। লন্ডনে কিছুদিন কাটালেন ডেভি-ফ্যারাডে-এর ল্যাবরেটরিতে। সেখানের দুই বিখ্যাত রসায়নবিদ ডেবার ও র‍্যামসের সঙ্গে এই সময়েই তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এছাড়াও অন্যান্য স্বনামধন্য রসায়নতাত্ত্বিকদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে নতুন নতুন বিষয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

বিলেত থেকে যান জার্মানিতে। সেখানে রয়েছেন বিখ্যাত রসায়নবিদ জেকোবান হেনরিকাস ভ্যান্টহয়।

রাসায়নিক গতিবিদ্যা ও অভিস্রাবণ ঘটিত চাপ-সংক্রান্ত সূত্র আবিষ্কার করে ভৌত রসায়নের ক্ষেত্রে তিনি তখন বিশ্ববিশ্রুত নাম। এছাড়া ১৯০১ খ্রিঃ রসায়নে প্রথম নোবেল পুরস্কার তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল।

হেনরিকাস ভ্যান্টহয়-এর সঙ্গে বার্লিনে সাক্ষাৎকার ঘটে প্রফুল্লচন্দ্রের। দেশে ফিরে এসে তিনি আবার নিজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপকের পদে ছিলেন. ১৯১১ খ্রিঃ বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

ইতিপূর্বেই প্রফুল্লচন্দ্রকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানক্ষেত্রে অবদানের জন্য সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

১৯১২খ্রিঃ প্রফুল্লচন্দ্র দুটি বিরল সম্মান লাভ করলেন। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারি ডি.এস-সি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করল।

ব্রিটিশ সরকার দিল সি.আই.ই ও নাইট উপাধি। এছাড়াও, পরবর্তিকালে রসায়ন বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র দেশ ও বিদেশের বহু সম্মান লাভ করেন।

লন্ডন ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক সদস্য রূপে গ্রহণ করে।

১৯৩১ খ্রিঃ মিউনিক শহরের ডয়টসে আকাদেমি ও ১৯৪৩ খ্রিঃ লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি তাঁকে সাম্মানিক সভ্যরূপে নির্বাচিত করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাণারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান অনারারি ডি.এসসি উপাধি।

১৯২৪ খ্রিঃ ভারতে ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি হন তার প্রথম সভাপতি।

বিজ্ঞান চর্চার উন্নতিকল্পে ১৯১৬ খ্রিঃ কলকাতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের কাজে পদত্যাগ করে প্রফুল্লচন্দ্র এখানে পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

বাংলা তথা ভারতীয় বিজ্ঞানের নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছিল এই কলেজেই বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অধ্যাপনায়।

গোড়া থেকেই রসায়নের দায়িত্বে ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। জগদীশচন্দ্র ছিলেন পদার্থবিদ্যার দায়িত্বে।

পরে এই ধারায় এসে যুক্ত হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, শিশির দাশ, নীলরতন সরকার প্রমুখ। আরও এসেছিলেন রামন ও কৃষ্ণনের মত প্রতিভাবান গবেষক অধ্যাপকেরা।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ-এর প্রতিষ্ঠা।

এই প্রতিষ্ঠানই ভারতের প্রথম রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষুধ প্রস্তুতের কারখানা।

কর্মবিমুখ বাঙালী জাতিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত করবার জন্য এবং দেশে বিবিধ শিল্পোন্নতিবিধানের চেষ্টায় প্রফুল্লচন্দ্র নানাভাবে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করবার চেষ্টা করেছেন। জাতিগঠনের সেই মানসিকতা নিয়েই তিনি জন্ম দিয়েছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের।

প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সঙ্গে নিজের নতুন রসায়ন ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রফুল্লচন্দ্র দেশীয় ওষুধ বাজারে ছেড়েছিলেন।

বিজ্ঞানের পাশাপাশি সাহিত্যেও গভীর অনুরাগ ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের। বাংলা ও ইংরাজিতে লেখা তাঁর বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ প্রবন্ধের মধ্যেই তিনি বিজ্ঞানের জগতে ভারতীয় অবদানের কথা সগর্বে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যসাধনার মধ্য দিয়ে তিনি পরাধীন জাতির ধমনীতে জাত্যাভিমান ও জাতীয়তাবোধের চেতনা প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ।

প্রফুল্লচন্দ্রের রচিত বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ হল, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার এবং অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার। বলাবাহুল্য বইগুলির শিরোনামের মধ্যেই লেখকের গভীর স্বজাতিপ্রীতি পরিস্ফুট।

১৯১০ খ্রিঃ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি হয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র।

নিজে ছিলেন অকৃতদার। অর্জিত অর্থ অকাতরে মানব কল্যাণের কাজে ব্যয় করেছেন।

সকলপ্রকার জাতীয় শিক্ষা ও শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে তাঁর উদার হস্ত সাহায্য ও উৎসাহ নিয়ে প্রসারিত হত।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী বীরদের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের গভীর সহানুভূতি ছিল। ১৯২১ খ্রিঃ অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গান্ধীজির খদ্দর-প্রচারের উদ্যোক্তাদের অন্যতম প্রধান ছিলেন তিনি।

দেশের বিজ্ঞানচর্চার উন্নতিকল্পে তাঁরই উৎসাহ ও অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি দুলক্ষ টাকা দান করেছিলেন।

দরিদ্র মেধাবী ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য পেত। এছাড়া দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে তাঁর ত্রাণকার্য দেশবাসীর সামনে নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ তুলে ধরেছে।

বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সকল কুসংস্কারের উর্ধ্বে। হিন্দুসমাজের জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি।

এই কুপ্রথাগুলি যে আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ তা তিনি নানাভাবে দেশবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। বারবার বলেছেন, নারীমুক্তির ও নারী স্বাধীনতার কথা।

জাতীয় দেহের সর্বনাশা ক্ষত বলে তিনি মনে করতেন জাতিভেদ প্রথাকে। তিনি বলতেন "কুকুর-বেড়াল আস্তাকুঁড় থেকে ঘরে এলে আমাদের মনে ঘেন্না হয় না তেমন, কিন্তু ছোটজাতের কেউ ঘরে এল তো হল—আমাদের গা রি রি করে। চিরদিনই যে ওদের ধর্মহীন ও ঘৃণ্য ভেবে একঘরে করে রেখেছি, সমাজে তাই ধরেছে ঘুন। এসেছে দুর্বলতা......."।

কর্মযোগী এই বিজ্ঞান সাধকের জীবন ছিল অতি সহজ সরল ও অনাড়ম্বর। নিয়মনিষ্ঠা ও সর্ববিষয়ে শৃঙ্খলা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৯৪৪ খ্রিঃ ১৬ই জুন বিজ্ঞানতাপস ও কর্মযোগী প্রফুল্লচন্দ্র চিরশান্তিময় ধামে মহাপ্রয়াণ করেন।

জগদীশচন্দ্র বসু



প্রাচীন ভারতে দর্শন ও বিজ্ঞানের সাধনার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। প্রকৃতি ও প্রাণ—এই দুই-এর নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করে যে বোধী সেদিন ভারতবর্ষ অর্জন করেছিল, পরবর্তীকালে তা বিজ্ঞজনের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল।

কিন্তু কালের ব্যবধানে এক দুঃসাহ অধঃপতনের মধ্য দিয়ে এই ভারতভূমিতেই বিজ্ঞান-সাধনা ও দর্শন-সাধনার মধ্যে ঘটেছিল অবাঞ্ছিত বিচ্ছেদ। অন্ধ কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল ভারত।

সৌভাগ্যক্রমে মহাকালের বিবর্তন ধারায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বক্ষেত্রে নবজাগরণের যে মুক্ত-ধারার প্রাদুর্ভাব ঘটে এর ফলে আত্মবিস্মৃতির দীর্ঘ সুষুপ্তি থেকে উত্থিত হয় নবীন ভারত।

সেই নব-জাগৃতির সন্ধিলগ্নে ভারতভূমিতে উদবোধনের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন যে মুষ্টিমেয় মনীষীবৃন্দ বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। তাঁর বিজ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে প্রাচ্যের দর্শন ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ধারার মধ্যে ঘটেছিল আশ্চর্য সেতুবন্ধন।

১৮৫৮ খ্রিঃ ৩০শে নভেম্বর অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা জেলার রাড়িখাল গ্রামে জন্ম হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের।

তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। স্বদেশপ্রেম ও শিল্পানুরাগ ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই দুটি গুণ লাভ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র।

মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সরলতা ও উদার প্রকৃতি। অতিবাল্য বয়সেই মায়ের মুখে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনে ভারতের সংস্কৃতির সনাতন ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

সরকারী উচ্চপদে আসীন হলেও ভগবানচন্দ্র তৎকালীন সময়ের পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী তথাকথিত শিক্ষিত ও বিত্তবানদের মত উন্মার্গগামী ছিলেন না।

জনসমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কখনোই বিচ্ছিন্ন বা শিথিল হয়ে যায়নি। শিক্ষাদানের জন্য তিনি পুত্রকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন।

এখানে গ্রামের সাধারণ মানুষের সন্তানদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে বালক জগদীশচন্দ্র তাদের ধ্যান-ধারণা ও কল্পনা-অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের জীবন-পাত্রে সঞ্চিত শৈশবের এই অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনকে পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে নিতে সহায়ক হয়েছিল।

গ্রামের সাধারণ শিল্পী-কারিগরদের কাছাকাছি থেকে জগদীশচন্দ্র কর্মকুশলতার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তাঁর জীবনে তা ব্যর্থ হয়নি।

ফরিদপুরের পাঠশালায় শিক্ষা লাভের পর জগদীশচন্দ্রকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় কলকাতার হেয়ার স্কুলে। পরে সেখান থেকে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে।

এই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন।

এই সময়ে তিনি পদার্থ বিদ্যার প্রখ্যাত অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য জগদীশচন্দ্র বিলেত যাত্রা করেন।

কেমব্রিজ থেকে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় ট্রাইপোস সহ বি.এ. এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি পাস করেন।

দেশে ফিরে এসে জগদীশচন্দ্র অধ্যাপনাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল অনুসন্ধিৎসার গভীর আকুলতা।

প্রেসিডেন্সি কলেজে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় শিক্ষকদের বেতন-বৈষম্য তাঁর আত্মমর্যাদাবোধে পীড়া সৃষ্টি করত। এই অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিবাদে তিনি তিন বছরকাল কোন বেতন গ্রহণ করেন নি।

প্রবল অর্থ সংকটের মধ্যেও তিনি তাঁর বিজ্ঞানের সাধনা অব্যাহত রাখলেন। কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করলেন না বিজাতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে।

শেষ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের আত্ম-সম্ভ্রমবোধ জয়যুক্ত হল। কলেজ কর্তৃপক্ষ শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় অধ্যাপকদেব সমহারে বেতন দেবার যৌক্তিকতা মেনে নিলেন।

ইতিমধ্যে ব্যয়বাহুল্যের কারণে তাঁর পিতা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিন বছরের বেতনের বকেয়া টাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ মিটিয়ে দিলে সেই টাকায় জগদীশচন্দ্র পিতাকে ঋণমুক্ত করলেন।

সেই সময়ে পরাধীন দেশে বিজ্ঞানী হওয়ার পথে ছিল নানাবিধ অন্তরায়। সহস্র দুঃখ-অপমানের বোঝা মাথায় নিয়েই জগদীশচন্দ্রকে বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হচ্ছিল।

সার্থকতাও একদিন এল। দীর্ঘ অক্লান্ত গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্যের আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন তিনি।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ে তাঁর আবিষ্কার বিশ্বের বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছিল।

আধুনিক ভারতের বিজ্ঞান সাধনার প্রথম পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র। তাঁর বিজ্ঞান সাধনাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার প্রথম পর্যায়ের বিস্তৃতি ১৮৯৫ খ্রিঃ থেকে ১৮৯৯ খ্রিঃ পর্যন্ত। এই পর্যায়ে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল পদার্থ বিদ্যার বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ।

জার্মানীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী হেনরিখ হার্ৎজ আলোর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে রামধনুর সাতটি রঙের রহস্যে আটকা পড়েন।

আমাদের দৃষ্টির নাগালে ধরা পড়ে যে সব রং তা হলো বেগুনি, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। কিন্তু অতিবেগুনি ও অবলোহিত দুটি রং আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

অতিবেগুনি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম এবং অবলোহিতের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বেশি—এই কারণে এই দুটি রং আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই দুই রঙকে দৃষ্টিগোচর করবার পন্থা আবিষ্কারের জন্য হার্ৎজ এবং জগদীশচন্দ্র একই ভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন।

তাঁরা দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকের ভেতর দিয়ে প্রাকৃতিক আলো পাঠিয়ে সব মুখীন আলোকে মেরুমুখী আলোতে রূপান্তরিত করেন। ফলে অদৃশ্য আলো বিদুৎচমকের মতো দৃষ্টিগোচর হয়েই আবার নিরুদ্দেশ হয়। জগদীশচন্দ্র এই আলোর নাম দেন ব্রোকেন গ্লিম্পস্ অব ইনভিজিবল লাইট।

বেতার গবেষণার কাজেও জগদীশচন্দ্র যখন ব্যস্ত ছিলেন একই সময়ে ইতালিয় বিজ্ঞানী মার্কোনিরও গবেষণার বিষয় ছিল অভিন্ন।

১৮৯৫ খ্রিঃ জগদীশচন্দ্র বিলাতে বিখ্যাত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে আলো সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল প্রদর্শন করে সমবেত বিজ্ঞানীদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করেন।

হার্ৎজের আলোর ওপরে জগদীশচন্দ্র নতুন আলোকপাত ঘটিয়ে ইংলন্ডের পদার্থবিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

বেতার আবিষ্কার করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ তার গৌরব লাভ করেছিলেন ১৮৯৬ খ্রিঃ ইতালিয় বিজ্ঞানী মার্কোনি।

উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণের সাড়া আবিষ্কার কেবল নয়, ভ্রূণবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় চমকপ্রদ সব আবিষ্কারের মাধ্যমে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানক্ষেত্রে পশ্চিমী আধিপত্য খর্ব করে ভারতীয় বিজ্ঞানীর জয়ধ্বজা উত্তোলন করেছিলেন।

বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে বেতার যোগাযোগ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার প্রথম সফল পরীক্ষা প্রদর্শন করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর নির্মিত রেডিয়েটারের মাধ্যমে তড়িৎ তরঙ্গের গতি ছিল পঁচাত্তর ফুট পর্যন্ত।

১৮৯৫ খ্রিঃ বিলেত থেকে ফিরে এসে এবারে আর পদার্থবিদ্যা নয় জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিষয় হল প্রাণিবিদ্যা।

ভারতের সনাতন ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের মনে প্রশ্ন জেগেছিল সৃষ্টির মধ্যে জড় ও চেতন এই যে দুই সমান্তরাল ধারা প্রবাহিত এর মধ্যে কি কোন যোগসূত্র নেই?

সৃষ্টির সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে চেতনার মহাসমুদ্র প্রবহমান—জড় বা অবচেতন বলে সেখানে কিছু নেই—এই হল সনাতন ভারতের মনীষার চিরন্তন ঘোষণা।

ইউরোপের জড়বাদী বিজ্ঞানীরা এই সত্য স্বীকার না করলেও জগদীশচন্দ্র এই ঘোষণার সত্যতা নিরূপণে যত্নবান হলেন। তাঁর পরীক্ষার স্থান হল ঘন জঙ্গল। অনতিকালের মধ্যেই তিনি তাঁর উদ্ভাবিত তড়িৎ তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্র বা কোহিয়ারারের সাহায্যে দেখিয়ে দিলেন ক্রমাগত ব্যবহারের পর ধাতুর ক্লান্তি বা মেটালিক ফ্যাটিগ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। সামান্য বিশ্রামের পরেই এই ধাতব ক্লান্তি মুছে যায়।

টানা দুই বছরের গভীর গবেষণার পর লন্ডনের রয়েল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্র কোহিয়ারারের মাধ্যমে জড়ের শরীরে চেতনার আভাস তুলে ধরলেন। এই গবেষণা সংক্রান্ত তাঁর গবেষণাপত্রটির নাম রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং বা জীবন ও জড়ের সাড়া। জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার বিশ্ববিজ্ঞানের অঙ্গনে আলোড়ন তুলল। ভারতীয় বিজ্ঞানী বিশ্ববিজ্ঞানীর সম্মান ও মর্যাদা লাভ করলেন।

পরবর্তীকালে নিজের তৈরি নানান যন্ত্রের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র বিশ্ববিজ্ঞান ক্ষেত্রে তুলে ধরেন উদ্ভিদের প্রাণের সাড়ার প্রমাণ। এই সত্যও তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন লন্ডনে রয়েল সোসাইটির মঞ্চে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সামনে ১৯০১ খ্রিঃ।

উদ্ভিদের নাড়ীর স্পন্দন ধরবার জন্য জগদীশচন্দ্র তৈরি করে নিয়েছিলেন একটি যন্ত্র। ঘড়ির পেন্ডুলামের মতই নির্দিষ্ট ছন্দে উদ্ভিদের স্পন্দন রেখা ফুটে উঠল সেই যন্ত্রের পর্দায়।

১৯০১ খ্রিঃ জগদীশচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক পরীক্ষাটি যে সকল বিজ্ঞানীই মেনে নিলেন তা কিন্তু নয়। অন্য অনেক বিজ্ঞানীর মত জগদীশচন্দ্রকেও বিরোধিতার ঝড়ের সম্মুখীন হতে হল।

যেসব শারীরবিদ সজীব কোষে প্রাণ-রসায়নের ক্রিয়াপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন, প্রধানতঃ তাঁরাই বিরোধিতা করলেন জগদীশচন্দ্রের। আবার এই শারীরবিদদেরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েল সোসাইটিতে। ফলে জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধ রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং সোসাইটির

সংগ্রহে প্রকাশের অনুমতি থেকে বঞ্চিত হল। কিন্তু সেদিন উদ্ভিদবিদ্যায় জগদীশচন্দ্র পদার্থবিদ্যার সাধারণ সূত্রগুলি যেভাবে প্রয়োগ করেছিলেন তার দ্বারা জীব-পদার্থবিদ্যা বা বায়োফিজিক্সের গোড়াপত্তন সকলের অজ্ঞাতে সাধিত হয়েছিল।

জড়ের মধ্যেও জীবন—ভারতীয় দর্শনের এই মূল সত্যটি জগদীশচন্দ্রে বস্তুবাদী পরীক্ষার মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এই চরম সত্যকেও সেদিন অস্বীকার করেছিলেন ঈর্ষাকাতর ও বিদ্বেষভাবাপন্ন ইউরোপীয় বিজ্ঞানীর দল। কিন্তু ভারতের জন্য নিবেদিত প্রাণ অপর এক বিদুষী বিদেশিনী সেদিন অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রকে।

এই বিদেশিনী হলেন ভারত-বিবেক বিবেকানন্দের মানস-কন্যা ভগিনী নিবেদিতা। পরবর্তীকালে এই নিবেদিতাই হয়ে উঠেছিলেন জগদীশচন্দ্রের জীবনের অন্যতম প্রেরণাদাত্রী।

ইংলন্ডে ব্রিটিশ শারীরবিদগণ যখন জগদীশচন্দ্রের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে, আইরিশ কন্যা নিবেদিতা উপযুক্ত জবাব দিয়ে তাদের স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের জীবনে বঞ্চনার ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। পদার্থবিদ্যায় বেতার যোগাযোগের ভিত্তি স্থাপন করেও তিনি গৌরবের অধিকারী হতে পারেন নি। তা আত্মসাৎ করেছিলেন ইতালিয় পদার্থবিদ গুগলিয়েলমো মার্কোনি।

বিশ্ববিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্রই প্রথম অত্যন্ত কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সূক্ষ্ম তরঙ্গ উৎপাদনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

এই সূক্ষ্ম তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে তিনি বিভিন্ন পদার্থের গঠন সনাক্ত করেন।

পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য যন্ত্রটি হল ওয়েভ গাইড বা তরঙ্গ পথ-প্রদর্শক। পরবর্তীকালে এই যন্ত্রের সাহায্যেই সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক ও পারমাণবিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়। বিশ্ববিজ্ঞানে ওয়েভগাইড জগদীশচন্দ্রের এক মূল্যবান সংযোজন।

ক্রেসকোগ্রাফ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত অপর একটি বিখ্যাত যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার মেপেছিলেন। এতেই ধরা পড়েছিল উদ্ভিদের সাড়া ও চলন।

সমকালের প্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্রের ধ্যানধারণা এতটাই অগ্রসর ছিল যে তাঁর মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি। স্বল্পবুদ্ধি সমকালীন বিজ্ঞানের সমালোচনায় বিদ্ধ হতে হয়েছিল তাঁকে। বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বকোষ গ্রন্থ দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা গ্রন্থে (১৯৪৫ খ্রিঃ) এই সত্য স্বীকার করে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে—"......

so much advance of his time that its precise evaluation was not possible.''

১৯১৫ খ্রিঃ সাতান্ন বছর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজে ত্রিশ বছর অধ্যাপনার পর জগদীশচন্দ্র এমেরিটাস প্রফেসর (অবৈতনিক প্রধান অধ্যাপক) হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। প্রায় একই সময়ে রসায়ন বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

ইতিমধ্যে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বোস রিসার্চ ইনসটিটিউট। ১৯১৭ খ্রিঃ জগদীশচন্দ্র চলে এলেন এখানে।

তিনিই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাপক ও পরিচালক। এখানেই তাঁর তত্ত্বাবধানে শুরু হল নতুন ধারার গবেষণা। তাঁর প্রতিভার দীপ্তি বিশ্ববিজ্ঞানীমহলে ছড়িয়ে পড়তেও বিলম্ব হল না।

১৯১৬ খ্রিঃ জগদীশচন্দ্রকে ব্রিটিশ সরকার নাইট উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ১৯২০ খ্রিঃ রয়েল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করে সম্মান জানাল।

তাঁর যুগোত্তীর্ণ প্রতিভাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন ভারতীয় মনীষীবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন জগদীশচন্দ্র। বাংলায় রচিত তাঁর নানা বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ রূপে স্বীকৃত।

১৯৩৭ খ্রিঃ ২৩শে নভেম্বর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের জীবনাবসান হয়।

চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন



কেবল ভারতবর্ষেই নয় গোটা পৃথিবীতেই এমন পরিবারের জুড়ি দুর্লভ, যেখানে মাত্র ৫৩ বছরের ব্যবধানে একই বিষয়ে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী দুজন বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছে।

এই দুজন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীর একজন হলেন চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন, নোবেল পান ১৯৩০ খ্রিঃ।

দ্বিতীয়জন সুব্রহ্মনিয়ম চন্দ্রশেখর, নোবেল পান ১৯৩০ খ্রিঃ।

চন্দ্রশেখর সম্পর্কে রামনের ভাইপো, বড় ভাইয়ের বড় ছেলে।

রামনের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৮ খ্রিঃ ৭ই নভেম্বর তামিলনাড়ুর তিরুচিরপল্লী শহরের তিরুবনইক্কবল গ্রামে। তাঁর পিতা চন্দ্রশেখর আইয়ার ছিলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। আট ভাইবোনের মধ্যে রামন ছিলেন মেজ।

সবার আগ্রহ ও যত্নে ছেলেবেলাতেই বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন রামন। অসাধারণ মেধা নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি।

স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষাতেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে শিক্ষকদেরও বিস্মিত করেছিলেন তিনি।

মাত্র এগারো বছর বয়সেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেছিলেন রামন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ইংরাজি ও পদার্থ বিদ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পেয়েছিলেন দুটি সোনার মেডেল।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেত যাবারই কথা হয়েছিল। কিন্তু দুর্বল শরীরে বিদেশ বাসের ধকল সইবে না বলে ডাক্তারের পরামর্শে ১৯০৪ খ্রিঃ ভর্তি হলেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যার এম.এ ক্লাসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হবার আগেই নিজের মত করে গবেষণার কাজ আরম্ভ করলেন রামন। প্রস্তুত করলেন দুটি গবেষণাপত্র।

প্রথম গবেষণার বিষয় আলোর প্রতিসম বিবর্তন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটির বিষয় তরলের পৃষ্ঠটান। গবেষণা দ্বারা তিনি তরলের পৃষ্ঠটান পরিমাপের পদ্ধতিও বার করলেন।

প্রবন্ধ দুটি যথাসময়ে প্রকাশিত হল লন্ডনের বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে।

জীবনের প্রথম থেকে আলো নিয়েই বিজ্ঞানীজীবনের যাত্রা শুরু করলেন রামন।

১৯০৭ খ্রিঃ এম.এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন।

সেই সময়ে, পরাধীন ভারতে সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতেই মেধাবী ছাত্ররা বেশি আগ্রহ বোধ করত। আনুষঙ্গিক সুখ সুবিধার সঙ্গে মাইনেও ছিল খুবই লোভনীয়।

রামনের বড়ভাই ছিলেন সিভিলিয়ান। তিনিও অগ্রজের পথই অনুসরণ করলেন।

আই.এফ.সি.এস অর্থাৎ ভারতীয় ফিনান্সিয়াল সিভিল সার্ভিসে সহকারী অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের পদে যোগ দিলেন রামন। তাঁর কর্মস্থল হল কলকাতায়।

ইতিমধ্যে বিয়েও করলেন। স্ত্রীর নাম লোকসুন্দরী।

১৯০৭ খ্রিঃ জুন মাসের সাত তারিখে কলকাতার বাসাবাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে চলে এলেন রামন। অর্থ ও প্রতিষ্ঠার নিশ্চিন্ত ভোগ সুখের জীবন তাঁর।

কিন্তু মানসিক তৃপ্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল গবেষণার নেশা। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা। এখানে কি গবেষণার উপযুক্ত একটি স্থানের অভাব হবে?

কোথায় যাবেন কার সঙ্গে দেখা করবেন এমনি ভাবনা চিন্তা নিয়ে চলাফেরার পথেই একদিন উপস্থিত হলেন ভারত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর দপ্তরে।

ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার সূতিকাগার বলে পরিচিত এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞানমনস্ক চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের অর্থ সাহায্যে ও উদ্যোগে।

বিজ্ঞান-বিমুখ ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার প্রচার ও প্রসারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই মানুষটি একরকম একক চেষ্টাতেই গড়ে তুলেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে অবশ্য বিজ্ঞান গবেষণার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরি।

সেখানে স্বমহিমায় বিরাজিত বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীযুগল পি.সি এবং জি.সি।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-সংস্থা হয়ে পড়েছিল যথেষ্টই নিষ্প্রভ।

সেই অবস্থাতেই, সব জেনে শুনেই রামন স্থির করলেন এই অবহেলিত সাধন-ক্ষেত্রই হবে তাঁর গবেষণার পীঠভূমি।

কিন্তু উচ্চপদের চাকরি বজায় রেখে বিজ্ঞানের গবেষণা চালানো কি সহজ কাজ? করতে হবে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম।

পিছপা হলেন না রামন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সময় ছকে বেঁধে নিলেন নির্মম ভাবে।

নির্মম ভাবে বলছি এই কারণে যে তখন তাঁর ঘরে সদ্য পরিণীতা পত্নী লোকসুন্দরী। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রের আহ্বানে সামান্য আত্মসুখকে নিতান্ত তুচ্ছ বলেই গণ্য করলেন তিনি।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই ছুটে আসতেন গবেষণাপীঠে। বাড়ি ফিরে যেতেন দশটা নাগাদ, সামান্য কিছু মুখে গুঁজেই ছুটতেন চাকুরিস্থলে।

বিকেল পাঁচটায় অফিস থেকে বেরিয়ে সরাসরি এসে বসতেন গবেষণার টেবিলে। মুখবুজে কাজ করে যেতেন টানা। রাত দশটার আগে কোনদিনই বাসায় ফিরতে পারতেন না।

রোববার বা অন্যান্য ছুটির দিনগুলোতে গোটা দিনই কাটাতেন গবেষেণা নিয়ে।

লোকসুন্দরী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁর কর্মব্যস্ত স্বামীর মধ্যে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে ভবিষ্যৎ এক মহাবিজ্ঞানীর সম্ভাবনা। তাই বৃহত্তর স্বার্থের মুখ চেয়ে আত্মস্বার্থ ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। কায়মনোবাক্যে প্রতিনিয়ত স্বামীকে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়ে গেছেন।

টানা দশ বছর ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান-এ একক গবেষণায় কাটিয়ে দিলেন রামন। ততদিনে তাঁর উৎসাহ আরও অনেক তরুণ বিজ্ঞানীকে টেনে নিয়ে এসেছে অ্যাসোসিয়েশনে। গবেষণার কাজে জমজমাট হয়ে উঠেছে ডাঃ মহেন্দ্রলালের স্বপ্নের বিজ্ঞান-কেন্দ্র।

এই দশ বছরে রামনের কাজের সূত্রে এখানে তৈরি হয় ২৭টি গবেষণা নিবন্ধ। বিদেশের বিজ্ঞান পত্রিকায় সেগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই ছাপা হয়েছে। এই সূত্রেই আসে ১৯১২খ্রিঃ কার্জন পুরস্কার এবং ১৯১৫খ্রিঃ উডবার্ণ মেডেল।

ভারতবর্ষ ছাপিয়ে বিদেশেও পরীক্ষা আশ্রয়ী গবেষণার অন্যতম কেন্দ্র রূপে অ্যাসোসিয়েশনের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

ইতিপূর্বে ১৯০৬ খ্রিঃ স্যার আশুতোষের উদ্যোগে কলকাতার রাজাবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সায়েন্স কলেজ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষের স্বপ্ন ছিল কলকাতাতেই গড়ে তুলবেন উচ্চতর বিজ্ঞান-শিক্ষার একটি কেন্দ্র। সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর দীর্ঘলালিত স্বপ্নই বাস্তবে রূপ পেল।

অবশ্য এই মহৎ উদ্যোগ সার্থক করার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের দুই প্রবাদপ্রতিম আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিত। তাঁদেরই অর্থ সাহায্য ও প্রদত্ত জমিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সায়েন্স কলেজ।

স্যার আশুতোষ এই নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনে নিয়ে এলেন দিকপাল অধ্যাপকদের। প্রথমে তিনটি বিষয় নিয়ে এম.এসসি ক্লাসের পড়াশুনা শুরু হল। রসায়নের পালিত

অধ্যাপকের পদে এলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ফলিত গণিতের প্রধান হলেন গণেশপ্রসাদ। পদার্থবিদ্যার ঘোষ অধ্যাপকচেয়ারে এলেন দেবেন বোস।

পদার্থবিদ্যার লেকচারার পদে পরবর্তী সময়ে যোগ দিয়েছেন তিন স্নাতকোত্তর তরুণ। এরা হলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস ও শিশির মিত্র। পরবর্তীকালে এই তিন জনই নিজেদের প্রতিভার অবদানে বিশ্ববিজ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে বিশ্বসভায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

তখনো পর্যন্ত পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকের পদটি শূন্য রয়েছে। প্রতিভা নির্বাচনের পাকা জহুরী স্যার আশুতোষ এই পদের জন্য রামনকেই নির্বাচন করলেন।

রামন তখন সিভিলিয়ানের চাকরিতে তৎকালীন সময়ের হিসাবে বিশাল অঙ্কের অর্থ এগারোশো টাকা মাইনে পাচ্ছেন। এছাড়া রয়েছে আনুষঙ্গিক নানা সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু তাঁর কাছে যখন স্যার আশুতোষের অধ্যাপনা ও গবেষণার আহ্বান এলো, মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করলেন না উচ্চমাইনের লোভনীয় সরকারী চাকুরি ছুঁড়ে ফেলতে। মাত্র ছশো টাকা মাস মাইনেতে হাসিউজ্জ্বল মুখে সায়েন্স কলেজে এসে ঢুকলেন।

এভাবেই কত স্বজাতিপ্রেমী মনীষীর বিন্দু বিন্দু আত্মত্যাগে গড়ে উঠেছে আধুনিক ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির বেদীভূমি।

রামনের চাকরি পরিবর্তনের প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বলেছিলেন, " আশুতোষ মুখার্জি যদি রামনকে ওভাবে বিজ্ঞান কলেজে টেনে না নিতেন তাহলে একজন সৎ সিভিলিয়ান হিসেবে বড়জোর অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল হতেন।"

কেবল রামনই নন, বাংলার বাঘ আশুতোষ এমনি অনেক সম্ভাবনাময় প্রতিভারই বিকাশলাভের পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে দেশের অগ্রগতিতে বেগ সঞ্চার করেছিলেন।

স্যার আশুতোষের আহ্বানে বিজ্ঞান কলেজ কাকে পায় নি? বাংলার মাটি থেকে এসেছিলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস, শিশির মিত্র, রাজচন্দ্র বসু, নীলরতন ধর, প্রশান্ত মহলানবীশ, বীরেন গুহ, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, দেবেন বোস প্রভৃতি।

বাংলার বাইরে থেকে এসেছিলেন কে.এস.কৃষ্ণান, সিভি রামন প্রমুখ।

নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তন হলেও রামন সায়েন্স কলেজে এসে পেলেন গবেষণার প্রশস্ত সুযোগ ও সঙ্গ।

গবেষণার প্রতি অনুরাগ লক্ষ করেই স্যার আশুতোষ রামনকে অধ্যাপনার তুলনামূলক কম দায়িত্বের পালিত অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করেছিলেন। সেই

সুযোগের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিলেন রামন। নিশ্ছিদ্র গবেষণার কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে।

প্রথম তিন বছর এভাবেই চলল। তারপর থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ক্লাশে তড়িৎ ও চুম্বকতত্ত্ব নিয়ে পড়ানো শুরু করলেন। একবছরের মাথায়ই বিষয় পরিবর্তন করে নিলেন ভৌত আলোকবিদ্যা। অধ্যাপক হিসেবে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রদের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে রামন তাঁর বাসা তুলে নিয়ে এসেছেন অ্যাসোসিয়েসনের কাছে। অধ্যাপনার ফাঁকে প্রায় সময়েই চলে আসেন এখানকার গবেষণার টেবিলে। কলেজের চাইতে এখানেই যেন তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

এদিকে বিশ্বজুড়ে প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ সদ্য থিতিয়েছে। ভারতে তার বিধ্বংসী প্রভাব এতটা পড়েনি এই রক্ষা। কিন্তু ১৯১৯ খ্রিঃ সারা ভারত জুড়ে তীব্রতর হল স্বাধীনতা আন্দোলন। নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী। স্বদেশীয়ানার ঢেউ কলকাতাকে করে তুলেছে উত্তাল।

এই সময়ে অ্যাসোসিয়েশনের অবৈতনিক সম্পাদক মনোনীত হলেন রামন। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও গবেষণা দুয়েরই দায়িত্ব চাপল তাঁর কাঁধে। অ্যাসোসিয়েশনের ল্যাবরেটারিগুলিতে জোরকদমে চলছে নানান গবেষণা।

১৯২১ খ্রিঃ রামন ইংলন্ড যান। ফিরে এসেই অ্যাসোসিয়েশনে আরম্ভ করেন আলোর বিক্ষেপণ নিয়ে গবেষণা। এই আলোক-গবেষণার দৌলতেই তিনি বিশ্বখ্যাতি লাভ করেন ১৯২৪ খ্রিঃ। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই রয়াল সোসাইটির ফেলো হলেন।

এক্স-রশ্মিকে পদার্থের ভেতর পাঠিয়ে তার প্রকৃতির পরিবর্তন সম্ভব করে ১৯২৪ খ্রিঃ প্রফেসর কম্পটন নোবেল পুরস্কার পেলেন।

রামনের গবেষণা চলতে লাগল আলো নিয়ে। তাঁব ধারণা আলোককেও পদার্থের ভেতর পাঠিয়ে তার প্রকৃতির পরিবর্তন আনা সম্ভব।

১৯২৮খ্রিঃ বাঙ্গালোরে বিজ্ঞানীদের এক সমাবেশে রামন তাঁর আলোর বিকীরণ বিষয়ের আবিষ্কার পেশ করলেন।

তাঁর এই আবিষ্কারই অনতিবিলম্বে সারা বিশ্বে রামন এফেক্ট নামে স্বীকৃতি লাভ করল।

পশ্চিমী জগতে কম্পটন তাঁর গবেষণার জন্য পেয়েছিলেন অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির সুবিধা। রামনের সেই সুযোগ ছিল না। কিন্তু ছিল অদম্য মনোবল। তারই জোরে অতি সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়েই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি সম্পূর্ণ করলেন রামন।

তবে তাঁকে এই কাজে অসামান্য সহযোগিতা করেছিলেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র তরুণ গবেষক কে.এস.কৃষ্ণান।

রামনের গবেষণা প্রবন্ধটি নেচার পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানীমহলে হৈ চৈ বেঁধে গিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন, রামনের এই আবিষ্কারের ফলে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত আলোর সুদূর বিস্তৃত সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

এই আলোক বিক্ষেপণ জনিত আবিষ্কার দ্বারা কোয়ান্টাম তত্ত্বের সত্য পুনঃস্বীকৃত হল।

শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরমাণুবিদ আর্নেস্ট রাদারফোর্ড নতুন আবিষ্কারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ১৯২৯খ্রিঃ রয়াল সোসাইটির সভাপতির ভাষণে বললেন, এই অসাধারণ আবিষ্কার পরীক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

নিঃসন্দেহে এর ফলে রাসায়নিক অণুর গড়ন ও কম্পনের ধরনের প্রকৃতিতে নতুন করে আলোকপাত ঘটবার সম্ভাবনা প্রবল।

আশ্চর্য দূরদৃষ্টি ছিল বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের। সেই বছরেই রামনের নতুন বিকিরণ তত্ত্বের ওপর শতাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভিড় করে আসতে লাগল স্বীকৃতি। ইতালির বিজ্ঞান আকাদেমি থেকে বছরের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ হিসেবে রামন পেলেন মাত্তেউচি স্বর্ণপদক।

ব্রিটেন থেকে এল সরকারী খেতাব নাইট হুড।

জার্মানির ফ্রাইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডি.এস.সি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করল।

এছাড়াও বহু বিজ্ঞানসভা ও বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক সদস্যপদ দিয়ে রামনকে সম্মানিত করল।

ফ্যারাডে সোসাইটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের এক সভায় নেতৃত্বের আহ্বান জানালেন রামনকে। পরের বছরেই এলো জগদ্বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার।

যৌবনের সাধনভূমি কলকাতা ত্যাগ করে ১৯৩২ খ্রিঃ রামন ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব সায়েন্সের অধিকর্তার পদে যোগ দিলেন।

১৯০২ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার সর্বময় কর্তৃত্বে এই প্রথম একজন ভারতীয় অধিকার পেল।

শব্দবিদ্যার ক্ষেত্রেও রামনের যথেষ্ট কাজ স্মরণীয় হয়ে আছে। যদিও তিনি সর্বাধিক পরিচিতি পেয়েছিলেন আলোকবিদ্যার কাজের ওপর।

ব্যাঙ্গালোরে তিনি ইনসটিটিউটে আলাদাভাবে পদার্থবিদ্যার বিভাগ গড়ে নিলেন। এখানে তাঁর একাধিক কাজ, সবই অবশ্য আলো নিয়ে, আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এখান থেকে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গবেষণা প্রবন্ধটির নাম ছিল পাখির পালকে রঙের উৎপত্তি। এরপর প্রকাশিত হয় তাঁর একটি বই, নাম কেলাসের পদার্থবিদ্যা। এতে স্থান পেয়েছে, পটাসিয়াম ক্লোরেট কেলাসের প্রতিফলিত আলোর বর্ণালিপি, সামুদ্রিক কড়ির বিবর্তিত আলোর বর্ণালিপি ও হীরের কেলাসের গঠন ইত্যাদি নিয়ে বিশ্লেষণ।

রামনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করা প্রবন্ধগুলির প্রথম তিনটি হল আলোকের আণবিক বিক্ষেপণ, তোবড়ান তার ও এক্স-রশ্মির বিক্ষেপণের যান্ত্রিক তত্ত্ব ও বাদ্যযন্ত্রের তত্ত্ব।

১৯৪৬ খ্রিঃ ব্যাঙ্গালোরে রামন ইনসটিটিউট তৈরি হলে তার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হল।

ইনসটিটিউটের কাজ থেকে অবসর নেন ১৯৪৮ খ্রিঃ। সেই সময় তাঁর বয়স ষাট। চাকরি থেকে অবসর নিলেও গবেষণার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অবিচ্ছিন্নই রইল। পাকাপাকিভাবে যুক্ত হলেন নিজের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

সম্মান ও পুরস্কারের স্রোতও অব্যাহতই ছিল। ১৯৫১খ্রিঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ফিলাডেলফিয়া ইনসটিটিউট থেকে পেলেন ফ্রাঙ্কলিন পদক।

তিন বছর পরেই ভারত সরকার ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত করল।

ভারতের জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান লাভ করলেন ১৯৪৮ খ্রিঃ।

সোভিয়েত লেনিন শান্তিপুরস্কার পেলেন ১৯৫৭ খ্রিঃ।

ভারতকে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ক্ষেত্রে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রামন। এ জন্য জীবনভোর তাঁকে অনেক বাধাবিপত্তি, অসম্মান অবহেলা ডিঙিয়ে নিজের পথ করে নিতে হয়েছে। সে এক কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস। তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে রামন তাঁর জীবনসাধনার সত্য তুলে ধরেছেন এভাবে—'বিজ্ঞানের মূল কথা হল স্বাধীন চিন্তা ও কঠোর পরিশ্রম। যন্ত্রপাতির প্রশ্ন নিতান্তই গৌণ।'

১৯৭০খ্রিঃ ২১শে নভেম্বর মহাবিজ্ঞানী রামন পরলোক গমন করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু



স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় ভারতকে জগৎসভায় প্রতিষ্ঠিত করবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যেসব মনীষী অক্লান্ত সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম অগ্রপুরুষ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রচারের কাজে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে ব্যাপৃত রেখে দেশবাসীর সামনে এক অনন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৯৪ খ্রিঃ ১লা জানুয়ারি, কলকাতায়। তাঁদের আদি নিবাস ছিল নদীয়া জেলার সুবর্ণপুরে। পিতার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু।

অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। যা পড়তেন, তন্ময় হয়ে পড়তেন, আর একবারের পড়াতেই পাঠ্যবিষয় আত্মস্থ হয়ে যেত।

প্রায় সময়েই দেখা যেত বইয়ের পড়া পাতা তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। মা এ নিয়ে বকাবকি করলে তিনি বলতেন, যেসব পাতা পড়া হয়ে গেছে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলছেন। বুঝে বুঝে কোন বিষয় একবার পড়লে সে বিষয় তাঁর দ্বিতীয়বার পড়ার দরকার হত না।

গণিতে ছিল সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ দখল। এন্ট্রান্স পরীক্ষার টেস্টে হিন্দু স্কুলের মাষ্টারমশাই উপেন্দ্রনাথ বক্সী তাঁকে একশ নম্বরের মধ্যে ১১০ নম্বর দিয়েছিলেন।

এমন বিচিত্র অবস্থা কেন ঘটিল এই সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে মাস্টারমশাই বলেছিলেন, প্রশ্নপত্রে ১১ টি অংঙ্কের মধ্যে ১০টি কষতে বলা হলেও সত্যেন্দ্রনাথ ১১টি অঙ্কই সঠিকভাবে কষেছিলেন। কেবল তাই নয়, জ্যামিতি বিভাগের অতিরিক্ত সমস্যাগুলি (একসট্রা) দেওয়া হয়েছিল, সেগুলিরও তিনি সমাধান করেছিলেন দু-তিন রকম বিকল্প পদ্ধতিতে।

পড়াশোনায় ছিলেন যেমন চৌকস তেমনি দুষ্টুমিতেও পিছিয়ে ছিলেন না সত্যেন্দ্রনাথ।

বন্ধুদের পেছনে যেমন লাগতেন, মাস্টারমশাইদেরও নাজেহাল করতেন কম না।

একবার মাস্টারমশাই ক্লাশে বলবিদ্যার বিষয় বোঝাচ্ছেন—বল × সরণ = কার্য। বিষয়টা বুঝতে পারেননি এমনি ভান করে সত্যেন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন

একটা বিশাল পাথরকে অনেকবার ঠেলে গলদঘর্ম হয়েও সরানো গেল না, এ অবস্থায় কার্য বলা হবে কিনা।

এধরনের কিশোরসুলভ দুষ্টুমি করে সত্যেন্দ্রনাথ খুবই মজা পেতেন।

কলেজেও তাঁর এই অভ্যাস যথারীতি বজায় ছিল। এসম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, ''শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের সুনাম কলেজে আমার ছিল না। তাই কোনদিন কোন কারণে, যা আমার এখন মনে নেই, ডাঃ রায়ের মনে হয়েছিল, ক্লাশের বক্তৃতা নিজে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনছি না এবং নিকটের বন্ধুদেরও চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়েছি। তাতে আদেশ জারি হলো—বক্তৃতার সময় সকলের থেকে পৃথক হয়ে বসতে হবে মঞ্চের রেলিং-এর ওপরে যেখানে গুরুদেব স্বয়ং দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন প্রত্যহ।'

যেই সময়ের কথা সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, তখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আই-এসসি ক্লাশের ছাত্র। আর ডাঃ রায় হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

বলাই বাহুল্য, নানা কূটপ্রশ্নে বিব্রত হবার আশাঙ্কাতেই রসায়নের ক্লাশে আচার্যদেব সত্যেন্দ্রনাথকে অন্য ছাত্রদের থেকে আলাদা করে বক্তৃতা মঞ্চের রেলিং-এ বসিয়ে রাখতেন।

স্কুলে কলেজে এভাবেই পড়াশুনার সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্পে মেতে থাকতেন সত্যেন্দ্রনাথ।

১৯০৯ খ্রিঃ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় হিন্দুস্কুল থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম স্থান লাভ করেছিলেন।

সেই বছর একই নম্বর পেয়ে ব্রেকেটে ফিফথ হয়েছিলেন হেয়ার স্কুলের আরও এক ছাত্র, তাঁর নাম মানিকলাল দে।

স্কুলের পাঠ শেষ করে প্রেসিডেন্সিতে আই.এসসি ক্লাশে ভর্তি হন সত্যেন্দ্রনাথ। ১৯১১ খ্রিঃ আই. এসসি পরীক্ষায় তিনি হয়েছিলেন প্রথম, আর মানিকলাল হয়েছিলেন দ্বিতীয়।

পরবর্তীকালে বন্ধু মানিকলালের কর্মক্ষেত্র আলাদা হয়ে গেলেও দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল নিবিড়। বন্ধুবৎসল সত্যেন মানিকলালের অন্তিম সময়েও শয্যাপার্শ্বে ছিলেন।

ছাত্র হিসেবে সত্যেন্দ্রানাথের কৃতিত্ব বরাবরই ছিল ঊর্ধ্বমুখী। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান পেয়েছিলেন, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তাঁর প্রথম স্থানটি ছিল বাঁধা।

আই. এসসিতে প্রথম, অনার্স নিয়ে বি. এসসিতে প্রথম, মিশ্র গণিতে এম. এসসিতে প্রথম। বি.এসসি ও এম. এসসিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলেন মেঘনাদ সাহা।

এম. এসসি পরীক্ষায় ১৯১৫ খ্রিঃ সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯২ নম্বর পেয়ে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন, এখনো পর্যন্ত সেই রেকর্ড অক্ষুণ্ন রয়েছে।

বিজ্ঞানের ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ইংরাজি ভাষাতেও ছিলেন সমান পারদর্শী। প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এসসি পরীক্ষায় টেস্টে অধ্যাপক তাঁর ইংরাজি রচনা পড়ে মুগ্ধ হয়ে খাতার ওপরে মন্তব্য লিখেছিলেন, 'এই ছাত্রটি অসাধারণ, এর নিজস্ব কিছু বলবার ক্ষমতা আছে।'

বাংলা ও ইংরাজি সাহিত্যের বহু গ্রন্থের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ যশস্বী লেখকদের রচনা ও ছাত্রাবস্থাতেই পাঠ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে শিখে নিয়েছিলেন ফরাসি ভাষা।

১৯১৭ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে স্নাতকোত্তর স্তরে পদার্থ বিদ্যায় পঠনপাঠন শুরু হবার এক বছর আগে থেকেই স্যার আশুতোষ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা ও শৈলেন ঘোষকে ডেকে পাঠিয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব নেবার জন্য তৈরি হতে বলেন এবং তাঁদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন।

পরে এই তিনজন এবং আরও কয়েকজন কৃতবিদ্য তরুণকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার পদে নিয়োগ করে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়।

বিজ্ঞান কলেজে সতেন্দ্রনাথ পদার্থবিদ্যা ও গণিত এই দুই বিষয়ের ক্লাশ নিতেন। অধ্যাপক হিসেবেও তিনি তাঁর ছাত্রদের শ্রদ্ধা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিজ্ঞানের নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বুঝতেন সত্যেন্দ্রনাথ। সেই সময় কলকাতায় বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় সব বই ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য ছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথ এবিষয়ে জার্মান ভাষার বই ও পত্র-পত্রিকা পড়বার জন্য এসময়ে জার্মান ভাষাও শিখে নিয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রস্তুত করেছিলেন মেঘনাদ সাহার সহযোগিতায়। ১৯১৮ খ্রিঃ এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞান পত্রিকা ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে।

গ্যাসের আয়তন, চাপ ও উষ্ণতার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে এবং গ্যাসীয় অণুগুলির আয়তন দ্বারা তা কিভাবে প্রভাবিত হয়, ওই প্রবন্ধে তাঁরা তা আলোচনা করেন। গ্যাসীয় অণুর আয়তনের প্রভাবকে সঠিক বিবেচনায় রেখে তাঁরা যে সম্পর্ক নির্ণয় করেন, তাই পরবর্তীকালে 'সাহা-বোস অবস্থা সমীকরণ' নামে পরিচিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের দুটি গণিত বিষয়ক প্রবন্ধ ১৯১৯ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়। ১৯২০ খ্রিঃ কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তিতে বর্ণালি বিশ্লেষণ সম্পর্কিত তাঁর একটি প্রবন্ধ ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরের বছরেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার পদে যোগদান করেন।

ঢাকা যাবার আগে সত্যেন্দ্রনাথ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে যৌথভাবে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বিষয়ে আইনস্টাইন ও হার্মান মিনকায়োস্কি রচিত কয়েকটি বিখ্যাত প্রবন্ধ মূল জার্মান ভাষা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন।

ইংরাজি ভাষায় ওই প্রবন্ধের এগুলিই প্রথম অনুবাদ। ১৯২০ খ্রিঃ প্রবন্ধগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

সাতাশ বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেই সময়ে জার্মানির প্রখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্কের গবেষণাপত্রের সংগ্রহ থার্মোডাইনলামিক্স উন্ড ওয়ার্মেস্ট্রালুং সত্যেন্দ্রনাথের হাতে পড়ে। এই গ্রন্থের মহামূল্যবান প্রবন্ধগুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করে সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন প্ল্যাঙ্কের এই তাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তি হল আইনস্টাইনের অপেক্ষবাদ।

প্ল্যাঙ্কের এই অতি জটিল গবেষণার মধ্যে ডুবে গিয়ে নতুন নতুন গাণিতিক সমীকরণের সিঁড়ি ভেঙ্গে এগিয়ে একসময় আবিষ্কার করে ফেলেন প্ল্যাঙ্কের তত্ত্বের একটি ভ্রান্তি।

এবিষয়ে তিনি চার পাতার একটি প্রবন্ধও দাঁড় করিয়ে ফেলেন। নাম দেন 'প্ল্যাঙ্কের সূত্র ও আলোক কোয়া প্রকল্প'।

সতেন্দ্রনাথ পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত একটি ভারতীয় জার্নালে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধটি পাঠিয়ে দেন। সময়টা ১৯২৪ খ্রিঃ।

যথারীতি প্রবন্ধটি ছাপার অযোগ্য ছাপ নিয়ে ফেরত আসে। সত্যেন্দ্রনাথ তাতেও না দমে গিয়ে পরপর বহু বিদেশী জার্নালে প্রবন্ধটি পাঠালেন।

কিন্তু আধুনিক পদার্থবিদ্যার তাত্ত্বিক শাখার রূপকার ও মহাবিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্কের ভুল ধরা ওই প্রবন্ধ সবজায়গাতেই অমনোনীত হল।

শেষে এক দুঃসাহসী কাজ করে বসলেন সত্যেন্দ্রনাথ—চারপাতার ক্ষীণকায় প্রবন্ধটি খোদ আইনস্টাইনের কাছেই পাঠিয়ে দিলেন।

হালকা চেহারার প্রবন্ধটির মধ্যে এক ভারতীয় অধ্যাপকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গণনার গাণিতিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন।

কেবল তাই নয়, এই প্রবন্ধের সূত্র ধরেই একটি আদর্শ কণা তত্ত্বের ধারণার আভাসও পেয়ে যান তিনি।

আইনস্টাইন সব কাজ ফেলে রেখে ইংরাজি থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রবন্ধটি পাঠিয়ে দিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল Zeitschrift fuer physik (ওসাইট শিফট ফ্যুর ফিজিক)-এ প্রকাশের জন্য। S. N. Bose নামে যথারীতি প্রবন্ধটি প্রকাশলাভ করল।

চারপাতার প্রবন্ধের মহাআবিষ্কারের সূত্রে রাতারাতি সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্ববিজ্ঞানী মহলে পরিচিতি লাভ করলেন।

কি ছিল এই প্রবন্ধে?

বায়ুমন্ডলে রয়েছে অম্লজান, উদজান, সোরাজান অঙ্গার ঘটিত সমস্ত গ্যাস। কিন্তু গ্যাসের এই অসংখ্য অণুকে পৃথক করে চেনার উপায় নেই, ব্যষ্টির এই সমন্বয় সমষ্টির মধ্যেই প্রকাশযোগ্য।

গ্যাসের এই অণুসমগ্রের গতিকে সঠিকভাবে বোঝাবার জন্য সাংখ্যায়নিক পদ্ধতিকে প্রথম ব্যবহার করেন ঊনিশ শতকের দুই পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল ও বোলৎসম্যান।

তাঁরা জানালেন অসংখ্য গ্যাস অণুর সমাবেশে প্রত্যেকটি অণুর বিক্ষিপ্ত গতির হদিস করা বৃথা। ভাবতে হবে তাদের সামগ্রিক গতির কথা।

এরপর ১৯০০ খ্রিঃ জার্মান তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বস্তুর বিকিরণে বিভিন্ন শক্তির পরিমাপ করার জন্য এক সূত্রের আবিষ্কার করেন গাণিতিক প্রক্রিয়ায়। বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে এই সূত্রই প্ল্যাঙ্ক সূত্র নামে পরিচিত।

প্ল্যাঙ্ক বললেন, বিকিরণে শক্তির পরিবর্তন হয় কোয়ান্টাম বা শক্তি কোয়ার মাধ্যমে।

আলোক কোয়ান্টা যাকে বলা হয়, প্ল্যাঙ্কেব মতে তা হল প্রকৃত পক্ষে চৌম্বক তরঙ্গের শক্তি কোয়ান্টা।

প্ল্যাঙ্কের এই ধারণাই কোয়ান্টামবাদ নামে পরিচিত। এই তত্ত্বই পদার্থবিজ্ঞানে আধুনিক ধারণার প্রতিষ্ঠা করেছে।

সতেরো আঠারো শতকে নিউটন তাঁর গতিবিদ্যায় ধারণা প্রকাশ করেছিলেন যে, শক্তির পরিবর্তন ঘটে নিরবচ্ছিন্ন ধারায়। আর প্ল্যাঙ্ক বললেন শক্তির পরিবর্তন কখনওই নিরবচ্ছিন্ন নয়।

বিজ্ঞানের জগতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল নিউটনের নিরবচ্ছিন্ন শক্তিবাদ ও প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টামবাদকে কেন্দ্র করে।

আইনস্টাইন প্ল্যাঙ্কের আলোক কোয়ান্টামকে নিজের গবেষণায় ফোটনরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিকিরণ প্রসূত আলোক কোয়ান্টাকে বস্তুকণা রূপে কল্পনা করে তার কণা চরিত্র মাত্র বজায় রাখলেন। তিনি এই কণা চরিত্র ধরেই

প্ল্যাঙ্কের সূত্রের সংস্কার করলেন এবং গড়ে তুললেন এক অসাধারণ সাংখ্যায়নিক সমস্যা।

সত্যেন্দ্রনাথ এই সমস্যার সমাধানে বসে বস্তুকণায় রচিত গ্যাসের প্রকৃতি ব্যাখ্যায় প্রচলিত সাংখ্যায়নিক পদ্ধতি ভরহীন আলোক কোয়ান্টা ভাবনাকে বর্জন করলেন।

সেখানে তিনি ধারণা করলেন ভরযুক্ত কণাকে। এইভাবেই প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ সূত্র নতুন রূপ লাভ করল।

এই বস্তুকণা ভিত্তিক ভাবনায় প্ল্যাঙ্কের সূত্রের পুনর্গঠনের অভিনবত্ব ও গুরুত্ব বিজ্ঞানের বিস্ময় প্রতিভা আইনস্টাইনকে অভিভূত করেছিল। তিনি বোসের সাংখ্যায়নিক বিধি বা বোস স্ট্যাটিসটিকস প্রয়োগ করলেন পরমাণু বস্তুকণা দ্বারা সংগঠিত সমষ্টির ওপর।

এইভাবে তাঁর হাতে রূপলাভ করল একক পরমাণুসম্পন্ন গ্যাসের কোয়ান্টাম থিওরি বা কণাবাদ।

এই সাংখ্যায়নিক প্রয়োগ পদার্থবিদ্যায় বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন বা বোস-আইস্টাইন স্ট্যাটিসটিকস নামে বিখ্যাত হয়। বর্তমানে তা কেবল বোস-সংখ্যায়ন নামেই অখ্যাত হয়ে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচডি না-করা অখ্যাত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর চার পাতার প্রবন্ধের দৌলতে অঘটন ঘটিয়ে রাতারাতি জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

১৯২৪ খ্রিঃ সংখ্যায়নের ওপরে মাদাম কুরির সঙ্গে কাজ করবেন বলে সত্যেন্দ্রনাথ এলেন প্যারিসে। মাদামের কাজ ছিল রসায়ন নির্ভর। যা হল পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান। আর সত্যেন্দ্রনাথ হলেন গাণিতিক বা তাত্ত্বিক। তবু মাদাম এই অল্পবয়সী ভারতীয় অধ্যাপকের গাণিতিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হন।

১৯২৫ খ্রিঃ সত্যেন্দ্রনাথ প্যারিস থেকে গেলেন জার্মানিতে। তাঁর জন্য এখানে আইনস্টাইন, প্ল্যাঙ্ক এবং শ্রোয়েডিঙ্গার—প্রবাদপ্রতিম এই বিজ্ঞানীরা প্রতীক্ষা করছিলেন। সকলেই তাঁর চারপাতার আশ্চর্য প্রবন্ধটির জন্য বারবার বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

বিশ্ববিজ্ঞানের অগ্রণী প্রতিভাদের কাছ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ এই পুরস্কার লাভ করলেন তাঁর ত্রিশ বছর বয়সে।

সত্যেন্দ্রনাথ ভারতে ফিরে এসে আবার তাঁর কাজে যোগ দিলেন। ততদিনে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও প্রফেসর পদে উন্নীত হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক পদে যোগ দিলেন ১৯৪৫ খ্রিঃ।

দেশে ফিরে সত্যেন্দ্রনাথ বোস সংখ্যায়ন সম্পর্কিত দ্বিতীয় একটি প্রবন্ধ আইনস্টাইনের কাছে পাঠালেন। আইনস্টাইন জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রবন্ধটি একই জার্নালে প্রকাশ করলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গবেষণাটি গাণিতিক আলোচনা ও প্রমাণ হিসেবে প্রথম প্রবন্ধের চাইতেও উন্নত মানের ছিল।

কিন্তু গবেষণার একজায়গায় আইনস্টাইন বোসের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি এমনি মন্তব্য করায় এই প্রবন্ধটি পদার্থ বিদ্যার আধুনিক গবেষণার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত স্থান লাভ করতে পারল না। কিন্তু বোস- সংখ্যায়ন যে পদার্থ বিদ্যার অশেষ সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করেছে তার প্রমাণ হয়ে গেল ১৯২৬ খ্রিঃ।

ইংলন্ড ও ইতালির দুই তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী ডিরাক ও ফের্মি বোস-সংখ্যায়নের অনুসরণে সূক্ষ্ম বস্তুপুঞ্জের ব্যাখ্যায় নতুন এক সংখ্যায়ন গড়ে তুললেন। এইভাবে গাণিতিক সত্য পরীক্ষামূলক সত্যে রূপান্তরিত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথের হতাশা দূর হল।

প্রথমে এই সংখ্যায়ন ফের্মি-ডিরাকের নামাঙ্কিত হলেও পরে ফের্মি সংখ্যায়ন নামেই পরিচিতি লাভ করে।

পদার্থ বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক শাখাটির নাম হল কণিকা পদার্থবিদ্যা বা পার্টিকেল ফিজিক্স। এই শাখার যেসব মৌলকণা বা পার্টিকেল বোস সংখ্যায়ন বিধি মেনে চলে সেসব কণাকে বলা হয় BOSON।

আর যেসব মৌলকণা ফের্মি উদ্ভাবিত সংখ্যায়ন বিধি মেনে চলে তাদের বলা হয় FERMION।

আলোককণা ফোটন, আলফাকণা ডয়টেরিয়ম এরা বোসন শ্রেণীর ইলেকট্রন, প্রোটন হল ফের্মিয়ান শ্রেণীর।

পদার্থবিজ্ঞানে আইনস্টাইনের বিস্ময়কর এক আবিষ্কার হল একক-ক্ষেত্রতত্ত্ব বা ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি।

তিনি এই তত্ত্বে নিজের অপেক্ষবাদের ভিত্তিতে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র ও তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রকে এক নিয়মের সূত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরে মৌলকণাসমূহের প্রকৃতির ব্যাখ্যাতেও এই ক্ষেত্র তত্ত্বকে প্রসারিত করেছেন।

এই জটিল ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রথম ধাপের ৬৪টি সমীকরণ পদার্থবিজ্ঞানীরা কেউই সমাধান করতে পারছিলেন না।

সত্যেন্দ্রনাথ ১৯৫২ খ্রিঃ ওই ৬৪টি সমীকরণ অনায়াসে দুভাগ করে ফেললেন। প্রথম ভাগে ৪০টি এবং দ্বিতীয় ভাগে ২৪টি সহ-সমীকরণ রেখে তিনি অতি সাধারণ পথে দুঃসাধ্য কাজটি সম্পূর্ণ করে একক ক্ষেত্রতত্ত্বের এক নতুন রূপ দিলেন। এই সমাধানের ওপরে সতেন্দ্রনাথের কয়েকটি গবেষণাপত্র বিদেশের বিখ্যাত বিজ্ঞান

জার্নালে প্রকাশিত হল। সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিজ্ঞানে আলোড়ন ওঠে। আইনস্টাইনও অত্যন্ত আনন্দিত হন।

অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী সত্যেন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বলতে লাভ করেছিলেন কেবল, লন্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্যপদ ১৯৫৮ খ্রিঃ বোস সংখ্যায়ন আবিষ্কারের দীর্ঘ ৩৪ বছর পরে।

বোস সংখ্যায়নের সূত্রধরে একাধিক বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ নোবেল পাননি বলে তাঁর অবদানের গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হল, বিশ্বের তাবৎ মৌলিক কণার অর্ধেকেরই নামকরণ হয়েছে তাঁর নাম অনুযায়ী।

নিজের দেশে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ১৯৫২ খ্রিঃ থেকে ১৯৫৮ খ্রিঃ ছ'বছর তিনি রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রিঃ থেকে ১৯৫৮ খ্রিঃ দু'বছর ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য। ১৯৫৮ খ্রিঃ হন জাতীয় অধ্যাপক। এছাড়া পেয়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডকটরেট উপাধি।

বিশ্বভারতী থেকে দেশিকোত্তম সম্মান এবং ভারত সরকারের পদ্মবিভূষণ উপাধি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

১৯৪৪ খ্রিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির পদ লাভ করেছিলেন।

মূলত গণিত ও তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী হলেও পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানেও সত্যেন্দ্রনাথের বহু মূল্যবান অবদান রয়েছে।

কেলাসের গঠন প্রণালী, পদার্থের চুম্বকত্ব, বেতার তরঙ্গের বিস্তার, প্রতিপ্রভা প্রভৃতি বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

তাপ-দ্যুতি বিষয়ক গবেষণার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ একটি বর্ণালি ফোটোমিটার উদ্ভাবন করেছিলেন। এই যন্ত্রে ক্ষণস্থায়ী বর্ণালিরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভব হত।

রসায়ন, জীববিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়েও সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। এবিষয়ে গবেষকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাঁদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগৎসভায় ভারতকে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করার ব্রত ছিল সত্যেন্দ্রনাথের।

এই ব্রত সার্থকভাবে সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর কাছে দেশপ্রেম ছিল মানবপ্রেমেরই অন্য নাম।

দেশের মানুষের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের সুগভীর ভালবাসার টানেই জীবনের শেষভাগে মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

তিনি বলতেন, 'এটা ঠিক যে, দেশ বলতে যদি দেশের লোককে বোঝায়, শুধুমাত্র শিক্ষিত বা নায়ক সম্প্রদায় না হয়, যদি মনে হয়, দেশের সাধারণ লোকই দেশ, তবে এরা শিক্ষিত হলেই তো সে দেশকে উন্নত বলা যাবে।'

সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, দেশের উন্নতির জন্যই সমাজের সর্বস্তরে বিজ্ঞানচেতনার ব্যাপক বিস্তার প্রয়োজন।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগের উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্যোগে ১৯৪৮ খ্রিঃ গঠিত হয় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে এরকম প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে এই প্রথম।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র হিসাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞান নামক মাসিক পত্রিকা ছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ, বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রদর্শনী ইত্যাদিও সংগঠিত হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের উৎসাহে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের জনসাধারণের উপযোগী ৩৫টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া জনসাধারণের উপযোগী বিজ্ঞান বিষয়ক ৪টি রচনা তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, ফরাসি, জার্মান ও ইংরাজি ভাষা থেকে।

বাল্যকাল থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনি ছিলেন সঙ্গীতের খাঁটি সমঝদার।

তিনি নিজেও ভাল এসরাজ বাজাতে পারতেন। কুড়ি-একুশ বছর বয়সেই তিনি এই বাজনা শুরু করেছিলেন।

মানুষ হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সরল স্বাভাবিক ও উদার প্রকৃতির। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি ও ভালবাসা। অন্যের প্রয়োজনকে তিনি কখনোই নিজের প্রয়োজন থেকে খাটো করে দেখতেন না।

বিশ্ববিজ্ঞান ইতিহাসের এই মহাসাধক ১৯৭১ খ্রিঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কলকাতায় লোকান্তরিত হন।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ



রাশিবিজ্ঞানের জনক, সফল অধ্যাপক গবেষক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ তাঁর অপরিসীম পাণ্ডিত্যের জন্য দেশ বিদেশের প্রশংসা লাভ করেছিলেন। তাঁর অবদান বহুমুখী।

১৮৯৩ খ্রিঃ ২৯শে জুন কলকাতায় প্রশান্তচন্দ্রের জন্ম। তাঁর পিতার নাম প্রবোধচন্দ্র মহলানবীশ।

ছাত্র হিসেবে প্রশান্তচন্দ্র বরাবরই ছিলেন কৃতী। বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। আই এসসি পাশ করার পর বিদেশে পাড়ি দেন।

কেমব্রিজে পড়াশোনা করেন। কেমব্রিজ থেকে গণিত ও পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ ট্রাইপস পেয়ে ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে যোগদান করেন। দেশে ফিরে এসে প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রথমে ছিলেন অস্থায়ীপদে পরে স্থায়ী পদ লাভ করেন।

১৯১৫ খ্রিঃ থেকে ১৯৪৮ খ্রিঃ পর্যন্ত একটানা তেত্রিশ বছর প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপনা করেন।

শেষের দিকে কয়েক বছর অধ্যক্ষের পদে ছিলেন।

রাশিবিজ্ঞানে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা ছিল প্রশান্তচন্দ্রের। এ বিষয়ে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল পাশ্চাত্যের কার্ল পিয়ার্সনের রচনা ও গবেষণা।

প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে রাশিবিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করতেন তিনি। আশপাশের অনেকেই ব্যাপারটাকে অনেকটা উপহাসের দৃষ্টিতেই দেখত। বলত তাঁর খেয়ালিপনা।

এই উপেক্ষা ও অবহেলা অবদমিত করতে পারেনি প্রশান্তচন্দ্রকে। এককালে তিনিই হয়ে উঠলেন রাশিবিজ্ঞানের পথিকৃৎ।

প্রায়োগিক গবেষণাটির পাশাপাশি তাত্ত্বিক গবেষণাতেও নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হত গবেষণা পত্রিকা 'সংখ্যা'। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা করেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনসটিটিউট।

এখানেই ভারতে প্রথম কম্পিউটার বসে প্রশান্তচন্দ্র ও হোমি জাহাঙ্গির ভাবার চেষ্টায়।

স্ট্যাটিসটিকাল ইনসটিটিউট এক নিরন্তর গবেষণার ক্ষেত্র। কৃষিক্ষেত্র থেকে

জাতীয় অর্থনীতি পর্যন্ত এখানকার গবেষণার ব্যাপ্তি। তাঁর গবেষণার আলোয় আলোকিত উপকৃত হয়েছে বিভিন্ন দিক।

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অনুরোধে প্রশান্তচন্দ্র জাতীয় আয় বৃদ্ধি, এমনকি বেকারি সমস্যার সমাধানেও নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন।

প্রশান্তচন্দ্রের ছিল নিখাদ সাহিত্য প্রীতি। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভেরও সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর।

প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপনার সময়েই ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। একাজে তাঁকে ব্রাহ্ম নেতাদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

প্রশান্তচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বীকৃতি আসুক ব্রাহ্মসমাজ থেকে। কিন্তু প্রবীণ ব্রাহ্মদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করতেন না। কবি প্রেমের গান লিখেছেন, গোরা-এর মত বিতর্কিত উপন্যাস লিখেছেন—এই অভিযোগে সমাজের কার্যনির্বাহক সমিতিতে নেওয়া হচ্ছিল না রবীন্দ্রনাথকে।

সমিতির সভায় প্রশান্তচন্দ্র ও সুকুমার রায়ের প্রস্তাব ছিল রবীন্দ্রনাথকে সাম্মানিক সদস্যপদ দেওয়া হোক।

রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচনের প্রশ্নে বৈঠকের পর বৈঠক হল, কিন্তু বারবারই প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে প্রশান্তচন্দ্র 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই', এই নামে একটি পুস্তিকা লিখে প্রকাশ করলেন।

শেষ পর্যন্ত ভাবাবেগের দ্বারা চালিত প্রাচীনপন্থী রবীন্দ্রবিরোধীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক অধিবেশনে ব্যালট-ভোটে রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন।

রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে প্রশান্তচন্দ্র আশ্রমিক সঙ্ঘের সদস্য হয়েছিলেন।

সঞ্চয়িতার আগে চয়নিকা নামে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত কবিতার একটি সংকলন প্রচলিত ছিল। সেই সংকলনের কবিতা বাছাই করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র। কবির বিদেশ ভ্রমণের সময়েও তিনি সস্ত্রীক সঙ্গী হয়েছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের স্ত্রী রানী মহলানবীশও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা।

শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী হিসেবে প্রশান্তচন্দ্রের অবদান সুবিদিত। রাশিবিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে তিনি ছিলেন অক্লান্তকর্মী। তাঁরই চেষ্টায় এদেশে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে রাশিবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের সূত্রপাত হয়।

রাশিবিজ্ঞানের ওপর প্রশান্তচন্দ্রের আবিষ্কার মহলানবীশ ডিসট্যান্স নামে পরিচিত। নৃতত্ত্ব এবং আবহাওয়াতত্ত্বেও তাঁর দান স্মরণীয়।

১৯২২ খ্রিঃ বঙ্গীয় সরকারের আহ্বানে বন্যার উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর গবেষণা ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

বিভিন্ন সময়ে প্রশান্তচন্দ্র ভারত সরকারের উপদেষ্টার কাজ করেছেন। এদেশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাঠামো তিনিই রচনা করেন।

প্রশান্তচন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনসটিটিউট প্রতিষ্ঠা। তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৭১ খ্রিঃ ২৮শে জুন প্রশান্তচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

মেঘনাদ সাহা



১৮৯৩ খ্রিঃ ৬ অক্টোবর বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার অদূরে শ্যাওড়াতলি গ্রামে মেঘনাদ সাহার জন্ম। বাবা জগন্নাথ সাহার গ্রামের বাজারে ছিল একটি মুদির দোকান। সেই দোকানের সামান্য আয়েই কায়ক্লেশে চলত পরিবারের ভরণপোষণ।

বর্ণপরিচয় শেষ হলে মেঘনাদকে গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল। বাবার সঙ্গে মুদি দোকানে বসাটাই ছিল প্রধান কাজ। সেই ফাঁকে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ করে নিতে হত।

ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন মেধাবী। তাই যে সামান্য সময়টুকু পড়াশোনার জন্য পেতেন, তাতেই তাঁর স্কুলের পাঠ তৈরি হয়ে যেত।

এভাবে দোকানের কাজ আর পড়াশোনার মধ্য দিয়েই প্রাথমিক স্কুলের পাঠ শেষ হল। এরপর ভর্তি হলেন সাত মাইল দূরের শিমুলিয়া গ্রামের মিডল স্কুলে।

প্রতিদিনের যাতায়াতের অসুবিধার জন্য স্কুলের কাছেই এক চিকিৎসকের বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল। বিনিময়ে মেঘনাদকে প্রয়োজন মত বাড়ির কাজকর্ম করে দিতে হতো।

দিনভর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বেশির ভাগ দিন রাত জেগেই পড়াশোনা করতে হতো তাঁকে। ছেলেবেলার এই দুঃখকষ্টের দিনগুলোর স্মৃতি কোনদিনই তিনি ভুলতে পারেননি।

মিডল স্কুলের পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তিলাভ করলেন মেঘনাদ। এরপরে ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন।

চূড়ান্ত আর্থিক দূরবস্থার মধ্যেই পড়াশোনা করতে হয়েছিল মেঘনাদকে। তার ভেতরেই দেশের অশান্ত রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

সেই সময় শুরু হয়েছিল দেশব্যাপী বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রবল জোয়ার। চারদিকে বিক্ষোভ মিছিল প্রতিবাদসভা।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গের গভর্নর ছিলেন ফুলার সাহেব। তিনি একদিন এলেন কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শনে।

সেই সময়ে অন্য অনেকের সঙ্গে মেঘনাদও গভর্নরকে বিক্ষোভ দেখাবার জন্য খালি পায়ে স্কুলে গিয়েছিলেন।

ফল যা হবার তাই হল। স্কুল থেকে বিতাড়িত হতে হল, স্কলারশিপ বন্ধ হল। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র হিসেবে বিনা বেতনে পড়ার যে সুযোগ পেয়েছিলেন, তা থেকেও বঞ্চিত হলেন।

অনিবার্যভাবেই যুগের আবর্তে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন মেঘনাদ। কিন্তু অভিভাবকরা তাঁর ভবিষ্যতের কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

মেঘনাদকে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সরিয়ে নেবার জন্য তাঁর দাদা জয়নাথ তাঁকে বেসরকারি কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

এই স্কুল থেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন মেঘনাদ। অঙ্ক, ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন।

১৯০৯ খ্রিঃ ঢাকা কলেজে ভর্তি হলেন এবং ১৯১১ খ্রিঃ আই.এস.সি পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান লাভ করলেন।

সেই বছরেই আই.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। অবশ্য তখনো পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি, নামেই পরিচিত হয়েছিলেন পরস্পরের কাছে।

মেঘনাদ সত্যেন্দ্রনাথকে সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন কলকাতায় ১৯১১ খ্রিঃ প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হবার পর।

সেই সময়ের প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল দেশবরেণ্য শিক্ষক ও ছাত্রদের মিলনে এক মনি-কাঞ্চন ক্ষেত্র বিশেষ।

শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন পার্সিভাল সাহেব, শ্যামদাস মুখোপাধ্যায়, ডি. এন. মল্লিক, জগদীশচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং সর্বোপরি প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

মেঘনাদ সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, জ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সরকার প্রমুখকে। তাঁর এক ক্লাশ ওপরেই ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ।

প্রেসিডেন্সি কলেজেই মেঘনাদের প্রথম আলাপ হয়েছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে। অবশ্য তখনো তিনি নেতাজি হয়ে ওঠেন নি।

পরবর্তীকালে এদেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন ১৯১৩ খ্রিঃ বি.এস.সি পরীক্ষার্থী। সকলেরই অঙ্কে অনার্স।

ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল প্রথম হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস, দ্বিতীয় মেঘনাদ সাহা এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন নিখিলরঞ্জন সেন।

তিনজনেই মিশ্রগণিত নিয়ে এম এস.সিতে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে।

১৯১৫ খ্রিঃ এম এস.সি পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ-মেঘনাদ দুজনেই হলেন প্রথম। সত্যেন্দ্রনাথ মিশ্র গণিতে, ফলিত গণিতে মেঘনাদ।

স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল যুগ সেটা। একদিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল জনচেতনা, অপরদিকে ইংরাজের দমন নিপীড়ন—দেশের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ।

সেই সময় ১৯১৩ খ্রিঃ থেকে ১৯১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন কালে মেঘনাাদ অনুশীলন সমিতির কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

তিনি যে মেসে থাকতেন ছাত্রদের মধ্যে সংগঠন গড়বার জন্য সেখানে বাঘা যতীন প্রায়ই আসা যাওয়া করতেন।

অনুশীলন সমিতি ও বাঘা যতীনের সঙ্গে সংস্রব থাকার কারণে মেঘনাদকে সরকারি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হল।

পদার্থ বিজ্ঞানের জগতে সেই সময় নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, বিশ্বময় আলোড়ন তুলছে। এম এসসি পাশ করার পর আবিষ্কারের উন্মাদনা মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথকেও পেয়ে বসল।

মেঘনাদ ঠিক করলেন, তিনি ফলিত গণিত ও পদার্থবিদ্যার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবেন। যদিও গবেষণার ভবিষ্যৎ তখনো পর্যন্ত ছিল অনিশ্চিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে তখনো বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হয়নি। প্রয়োজনীয় অর্থ ও সংগঠনের অভাবই ছিল প্রধান অন্তরায়।

এই বাধা দূর হয়েছিল আরও দুবছর পরে। স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের দানে ১৯১৭ খ্রিঃ থেকে আপার সার্কুলার রোডের নতুন বাড়িতে বিজ্ঞান কলেজের কাজ শুরু হয়েছিল।

বি.এসসি. পরীক্ষায় অসাধারণ মেধার পরিচয় দেওয়ায় স্যার আশুতোষ ১৯১৬ খ্রিঃ মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠিয়ে নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব নিতে বললেন। এই সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"…. একদিন আমাদের ডেকে পাঠালেন স্যার আশুতোষ। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে পাশে লাইব্রেরি ঘরে স্যার আশুতোষের খাস কামরায় হাজির হলাম—আমি-মেঘনাদ-শৈলেন।

অবশ্য ভয়ে ভক্তিতে সকলেই বিনীত, নম্র—একেবারে গোবেচারি ভাব। আশুতোষ শুনেছেন নব্যেরা চাচ্ছে নতুন নতুন বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হোক। জিজ্ঞাসা করলেন—তোরা কি পড়াতে পারবি?

'আজ্ঞে, যা বলবেন, তাই যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

আশুতোষ হাসলেন—তখন পদার্থ-বিজ্ঞানে নানা নতুন আবিষ্কার হয়েছে। আমরা নামমাত্র শুনেছি।

বেশিরভাগ জার্মানিতে, নতুন উন্নতি ও নতুন আবিষ্কার। প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন, বোর—তখন শুধু নাম শুনেছে বাঙালি। জানতে গেলে পড়তে হবে জার্মান কেতাব, বা অনুসন্ধান, পত্রিকায় নানা ভাষার। যুদ্ধের মধ্যে যেসব বেশিরভাগ ভারতে আসে না।

মেঘনাদের ওপরে পড়ল কোয়ান্টামবাদ নিয়ে পড়াশুনা—আমাকে পড়তে হবে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিওরি। স্বীকার করে এলাম—এক বছরের মধ্যে তৈরি হব। এদিকে বই কোথায় পাওয়া যাবে?

রিলেটিভিটির বিষয়ে ইংরাজিতে বই ছিল, সেগুলি সংগ্রহ হল, তবে বোলজম্যান কার্শ্বেফ-প্লাঙ্কের লেখা কোথায় পাওয়া যাবে? ..... মেঘনাদ ও আমি পদার্থবিদ্যা বিভাগ ও ফলিত গণিত —দু'ডিপার্টমেন্টেই লড়াই। .... প্রায় একই সময়ে রামন মনস্থির করে ফেলেন, হিসাব বিভাগের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে বিজ্ঞান কলেজে আসবেন। এসেই ডাক পড়লো সহায়কদের। এর আগে আমরাই সব ক্লাসে পড়াই, তিনি চাইলেন অনুসন্ধান কাজ জোরদার হোক। মেঘনাদ বেচারি হাতের কাজে তত পটু নয়—পালিত প্রফেসারের বিরাগ ভাজন হলেন। অন্য শিক্ষকেরা ঝুঁকলেন রামনের সঙ্গে গবেষণা করে ডক্টর উপাধির চেষ্টায়। ...আমি ও মেঘনাদ বস্তুত গণিতের হিসাবই ভাল বুঝি। মিলেমিশে কিছু কাজ করে ছাপিয়েছি। তবে মেঘনাদের জ্যোতি-বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। নক্ষত্রদের ঔজ্জ্বল্য ও সেই সম্পর্কে তাপের তারতম্য নিয়ে প্রবন্ধগুলি লিখে উচ্চ প্রশংসা পেলেন। ডক্টরেট পেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিদেশে যাওয়ার জন্য গুরুপ্রসন্ন ঘোষের বৃত্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।"

বিজ্ঞান কলেজে পড়ানো শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা আইনস্টাইন ও মিনকোয়াস্কির জার্মান ভাষায় লিখিত আপেক্ষিকতাবাদের ওপরে প্রকাশিত গবেষণাপত্রগুলি ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করে নেন।

এই বইটি পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ।

মেঘনাদের ওপর দায়িত্ব ছিল তাপ-বিজ্ঞান এবং তাপগতিবিদ্যা পড়াবার। কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিক তত্ত্ব তখন সাবেকি পদার্থবিদ্যার প্রচলিত ধারণায়

দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। ওদিকে নীলস বোর-এর হাইড্রোজেন বর্ণালী সংক্রান্ত তত্ত্বও প্রকাশিত হয়েছে।

এইসব অত্যাধুনিক তত্ত্ব সম্পর্কে তৎকালীন প্রবীণ অধ্যাপকদের অনেকেই কোন ধারণা রাখতেন না।

তাঁদের পড়াশুনা ও চিন্তাভাবনা সনাতন পদার্থবিদ্যার মধ্যেই সীমবদ্ধ ছিল।

কিছুদিনের চেষ্টাতেই তাপ বিকীরণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব মেঘনাদ রপ্ত করে ফেললেন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক মতবাদও বাদ রইল না। একই সঙ্গে চলতে লাগল গবেষণার কাজও।

গোড়ার দিকে মেঘনাদের গবেষণার বিষয় ছিল বিকিরণ ও চাপ। ১৯১৮ খ্রিঃ তিনি আলোর চাপ সম্বন্ধে তাঁর ছাত্র সুবোধ চক্রবর্তীর সঙ্গে একটি পরীক্ষামূলক গবেষণা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

পরের বছর, ১৯১৯ খ্রিঃ আমেরিকার অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে 'অন সিলেকটিভ রেডিয়েশন প্রেসার অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশন' শীর্ষক গবেষণা প্রকাশিত হল।

এই বিষয়ে ১৯২১ খ্রিঃ নাগাদ তাঁর তিনটি উল্লেখযোগ্য অবদান (১) সূর্যের বায়ুমণ্ডলে বিকিরণ ঘটিত সাম্যাবস্থা ও নির্বাচনমূলক চাপ (২) হাইড্রোজেনের গৌণ বর্ণালী এবং (৩) সৌর ক্রোমোস্ফিয়ারে আয়নন প্রকাশিত হলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মেঘনাদ বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন।

সৌর মণ্ডলে এবং নক্ষত্রের আয়ননে তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব বিশ্লেষণই ছিল এইসব গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য। এই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হল সাহা আয়নস তত্ত্ব। সেই সঙ্গে তিনি জ্যোঃতিপদার্থ বিদ্যা, নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে ভারতবর্ষে তত্ত্বীয় পদার্থ বিদ্যা গবেষণার পথিকৃৎ হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

মেঘনাদ অসাধারণ মেধা ও অধ্যবসায়ের বলে সূর্যের মধ্যে ক্যালসিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, বেরিয়াম, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি মৌলের আয়নমাত্রা অঙ্ক কষে বার করেছেন। পরে ল্যাবরেটরিতে সেগুলো নিজের হাতে মেপে তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে হিসেবের অভ্রান্ততা প্রমাণ করেছেন।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই মেঘনাদ বিশ্বের পদার্থবিদদের সারিতে নিজের স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে সক্ষম হলেন।

প্রসন্ন ঘোষের বৃত্তি নিয়ে বিদেশে গিয়ে দু বছর ছিলেন। প্রথমে লন্ডনে ইম্পিরিয়াল কলেজে অধ্যাপক আলেকজান্ডার ফাউলার এবং পরে জার্মানিতে অধ্যাপক ওয়াল্টার নার্নস্টের গবেষণাগারে গবেষণা করেন।

১৯২১ খ্রিঃ দেশে ফিরে এসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯২৭ খ্রিঃ মেঘনাদ লন্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে একটি উন্নততর গবেষণাগার স্থাপনের চেষ্টা করে মেঘনাদ নানা কারণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকপদে যোগদানের পর ১৯৩২ খ্রিঃ তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তরপ্রদেশ অ্যাকাডেমি অব সায়ান্স।

১৯৩৫ খ্রিঃ নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এবং ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন।

১৯৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি এলাহাবাদে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

১৯৩৮ খ্রিঃ ফিরে এসে মেঘনাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগের পালিত অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

এই সময় মেঘনাদ ক্রমশই নিউক্লিয় পদার্থ বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪০ খ্রিঃ তিনি তাঁর দুই ছাত্রের সহযোগিতায় ভারতীয় বিজ্ঞান সংস্থার মুখপত্রে পরমাণু কেন্দ্রের গঠন শীর্ষক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।

১৯৪৭ খ্রিঃ তাঁরই উদ্যোগে স্থাপিত হল নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যার গবেষণাগার ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। পরবর্তীকালে তাঁরই নামে নামাঙ্কিত হয় এই প্রতিষ্ঠান।

তাঁরই চেষ্টায় ভারতবর্ষে প্রথম নিউক্লিয়ার ফিজিক্সকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আগ্রা, এলাহাবাদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে পথপ্রদর্শন করে।

১৯৪১ খ্রিঃ থেকে নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ খ্রিঃ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সর্বপ্রথম ভারতের সার্বিক উন্নতির প্রয়োজনে বিজ্ঞান প্রয়োগের গুরুত্বের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনিই প্রথম নদী উপত্যকা উন্নয়নের কথা বলেন।

সায়ান্স অ্যান্ড কালচার পত্রিকায় দামোদর উপত্যকা সংস্কার, ওড়িশার উন্নয়ন ও ভারতের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে নিজস্ব মতামত ও প্রস্তাব প্রকাশ করে প্রবন্ধ লেখেন।

তাঁরই লেখা প্রবন্ধে প্রভাবিত হয়ে, ১৯৪৩ খ্রিঃ দামোদরে ভয়াবহ বন্যার পরে, বন্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্য কমিশন নিয়োগ করা হয়।

তাপীয় আয়নবাদের রচয়িতা মেঘনাদ সাহাই দামোদর নদী পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, সেই ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন।

বিজ্ঞানী মেঘনাদকে বিজ্ঞানের প্রয়োজনেই পাঁচের দশকে রাজনীতিতে যোগ দিতে হয়েছিল। ১৯৫১ খ্রিঃ বামপন্থী সমর্থনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে তিনি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সেদিন দেশের বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সমূহ ক্ষতির চিন্তায় শঙ্কিত দেশের বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। উদ্বিগ্ন দেশবাসীকে আজীবন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার আশ্বাস জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, ... "বর্তমান সময়ে প্রশাসনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আইন শৃঙ্খলার মতই গুরুত্বপূর্ণ। ধীরে ধীরে আমি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছি। কারণ আমি নিজস্ব পথে দেশের কাজে প্রয়োজনীয় হতে চেয়েছিলাম।"

সংসদে তিনি শিক্ষা যোজনা, পরমাণু শক্তি, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এবং রাজ্যগুলির পুনর্গঠন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরেছিলেন।

১৯৫৬ খ্রিঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি, দিল্লীতে প্ল্যানিং কমিশনের সভায় যোগদান করতে যাওয়ার সময় এই মহান বিজ্ঞানীর আকস্মিক জীবনপাত হয়।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য



আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল ইংরেজ আমলে। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের অগ্রগতির সংবাদ নিয়মিত ভারতে পৌঁছাতো। তাতেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছে এদেশের বিজ্ঞানীদের কর্মপ্রচেষ্টা, ক্রমোন্নতি ঘটেছে বিজ্ঞান গবেষণার।

বিজ্ঞানের অন্য অনেক বিষয়ের চর্চা হলেও বিশেষ একটি শাখা এদেশে ছিল একেবারেই অবহেলিত। তা হলো প্রকৃতিবিজ্ঞান।

বিদেশের চার্লস ডারউইন, ফ্যাবার, লরেঞ্জ বা টিনবার্গেন—বিশিষ্ট প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে এঁদের খ্যাতি বিশ্বজোড়া।

বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন প্রায় সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করে তাঁর গবেষণার বিষয় সংগ্রহ করেছেন। সেসব নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পরে তিনি ধারণা করতে পেরেছিলেন তাঁর যুগান্তকারী মতবাদের সূত্রটিকে।

বস্তুতঃ প্রকৃতির নানা নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনে সারাজীবন ব্যয় করবেন, এমন ধরনের বিজ্ঞানসাধক গোটা পৃথিবীতেই বিরল।

আমাদের দেশে একটি মাত্র মানুষই এই কাজ করেছিলেন, তিনি হলেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। কেবলমাত্র অন্তরের প্রেরণায় তিনি অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় নিয়ে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, দেশের পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ—এদের

আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে তিনি জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন।

এদেশে প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গোপালচন্দ্র ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। গোপালচন্দ্র বিদেশ ভ্রমণ করেননি, কিন্তু দেশের বনবাদাড়, মাঠ-ময়দান, ঝোপজঙ্গল, নদী-নালা-বিল বা মজা পুকুরের ধারে ধারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে পোকামাকড় কীটপতঙ্গের জীবনধারা সম্পর্কে গবেষণা করে গেছেন। পর্যবেক্ষিত সকল বিষয়ের নিখুঁত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন সরল বাংলায়।

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার জলাজঙ্গলে ঘেরা এক গ্রাম লোনসিং। সেই গ্রামে ১৮৯৫ খ্রিঃ ১লা আগস্ট এক দরিদ্র পরিবারে গোপালচন্দ্রের জন্ম।

পিতা অম্বিকাচরণের পারিবারিক পেশা ছিল যজমানি। সংস্কৃত চর্চা ছিল তাঁর নেশা।

মা শশিমুখী ছিলে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও দৃঢ় চরিত্রের মহিলা। চারটি ছেলেমেয়েকে চরম দুঃখকষ্টের মধ্যে তিনি মানুষ করেছিলেন।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই গোপালচন্দ্র পিতৃহীন হন। সংসারের অনটন সত্ত্বেও মা তাঁকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন।

গোপালচন্দ্র ছিলেন পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। ফলে সংসার চালাবার জন্য তাঁকেও শিশুবয়স থেকেই মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন কাজকর্ম করতে হত। পারিবারিক যজমানি ও পড়াশোনা একই সঙ্গে করতে হতো তাঁকে।

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। পাঠশালার পড়া শেষ করে ভর্তি হয়েছিলেন লোনসিং স্কুলে। ক্লাসে বরাবর প্রথম হয়ে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই স্কুল থেকেই ১৯১৩ খ্রিঃ ম্যাট্রিক পাশ করেন প্রথম বিভাগে। সমস্ত ফরিদপুর জেলায় এই পরীক্ষায় তিনিই পেয়েছিলেন সর্বোচ্চ নম্বর।

জনৈক বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি তাঁর পড়ার খরচ বহন করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। উচ্চতর বিদ্যালাভের আশায় গোপালচন্দ্র ভর্তি হলেন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে। থাকতেন হস্টেলে।

কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময়ই পৃথিবীব্যাপী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তোলপাড় শুরু হল। চারিদিকে অভাব অনটন প্রকট হয়ে উঠল। যিনি পড়ার খরচ চালাতেন তিন তা বন্ধ করে দিলেন।

বাধ্য হয়ে কলেজ ছেড়ে গোপালচন্দ্রকে বাড়িতে চলে আসতে হল। লোনসিং স্কুলের কৃতি ছাত্রকে স্কুলকর্তৃপক্ষ ভূগোলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করলেন। সালটা ১৯১৫, গোপালচন্দ্রের বয়স উনিশ।

এই স্কুলে পাঁচ বছর পড়িয়েছিলেন তিনি। বিয়েও করলেন এই সময়ের মধ্যেই।

স্কুলে নিয়মিত ক্লাস চালাবার ফাঁকে ফাঁকে জল-জঙ্গলে, বন-বাদাড়ে প্রায়ই তিনি ঘুরে বেড়াতেন।

কৈশোর থেকেই তাঁর একটা নেশা ছিল, ঝোপজঙ্গলে, মজা পুকুরের ধারে ঘুরে কীটপতঙ্গের গতিবিধি এবং আচার-আচরণ লক্ষ করা।

লোনসিং স্কুলে এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি করেছিলেন একজন শিক্ষক—যোগেন মাস্টার। পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিচারণে গোপালচন্দ্র লিখেছেন ঃ 'মাঝে মাঝে যোগেন মাস্টার ছেলেদের ডেকে এনে ম্যাজিকের খেলা দেখাতেন। একটা মজার জিনিস দেখাবেন বলে একদিন তিনি সবাইকে ডেকে নিয়ে এলেন। পকেট থেকে গাঢ় খয়েরি রঙের কতকগুলি বিচি বের করে টেবিলের ওপরে রাখার কয়েক মিনিট পরেই একটি বিচি প্রায় চার ইঞ্চি উঁচুতে লাফিয়ে উঠল। তারপর এদিক ওদিক থেকে প্রায় সবগুলি থেকে থেকে লাফাতে শুরু করে দিল। .... অবশেষে মাস্টারমশাই ছুরি দিয়ে একটা বিচি চিরে ফেলতেই দেখা গেল তার ভেতরে রয়েছে একটা পোকা (লার্ভা)।'

সুরেন নামে একটা ছেলে বন-জঙ্গল চষে বেড়াত। সেই চাষীর ছেলের কাছেও কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে নানা তথ্য জেনেছেন তিনি।

এভাবেই গোপালচন্দ্রের মনে পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ সম্পর্কে কৌতূহল জেগেছিল।

নতুন কোন পোকা বা গাছপালা বা লতাপাতার কোনও বৈশিষ্ট্য নজরে পড়লে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন জাগত। অবশ্য অধিকাংশ প্রশ্নেরই উত্তর সেই সময় তিনি পেতেন না।

অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী মন এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল গোপালচন্দ্রের সহজাত।

স্কুলের মাইনেতে সংসার খরচ কুলতো না। বাধ্য হয়ে সামান্য মাইনের চাকরি ছেড়ে তিনি কলকাতায় চলে এলেন বেশি মাইনের চাকরির চেষ্টায়। চাকরি পেলেন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের কাশীপুরের একটি অফিসে। কাজ ছিল টেলিফোন অপারেটরের যদিও একাজে কোন অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না।

এই সময়েই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে গোপালচন্দ্রের যোগাযোগ ঘটে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে।

এই ঐতিহাসিক যোগাযোগই গোপালচন্দ্রের জীবনে ঘটাল পালাবদল, যা তাঁকে স্মরণীয় প্রকৃতিবিজ্ঞানী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

পচা গাছপালার জৈব আলো নিয়ে গোপালচন্দ্র একটি লেখা বঙ্গবাসী পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের পৌষসংখ্যায় 'পচা গাছপালার আশ্চর্য আলো বিকিরণের ক্ষমতা' শিরোনামে পঞ্চশস্য বিভাগে ছাপা হয়েছিল। এই লেখাটি আচার্য জগদীশচন্দ্রের নজরে এসেছিল। তারই সূত্র ধরে বিজ্ঞানাচার্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে।

বিষয়টা ছিল আলেয়ার আলো। বিজ্ঞানাচার্যের ইচ্ছা ছিল বিষয়টা নিয়ে লেখকের সঙ্গে আলোচনা করে বিশদভাবে জানবেন।

'মনেপড়ে' শীর্ষক স্মৃতিকথায় এ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন গোপালচন্দ্র। তিনি লিখেছেন ঃ

"সন্ধ্যার পর একদিন স্কুল বোর্ডিংয়ে কয়েকজন বসে গল্প করছি। বর্ষাকাল, অনবরত টিপটিপ বৃষ্টি চলছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠল। তার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল মুষলধারে বৃষ্টি।

বোর্ডিং-এর কিছুদূরেই গাছপালা বর্জিত একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝখানে মাটি থেকে ৩/৪ হাত উঁচুতে এই বৃষ্টিধারার মধ্যেই হঠাৎ যেন একটা আগুনের গোলা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

কিছুক্ষণ পরেই এলোমেলোভাবে ছুটোছুটি করে কিছুদূর গিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্ধকার রাত্রিতে এই গ্রামের অনেকেই নাকি পাঁচীর মার ভিটাতে আগুন জ্বলতে দেখেছে। কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠল—পাঁচীর মার ভিটার ব্যাপারটা দেখতে হবে।

.... দিন কয়েক পরে দুজন সঙ্গী নিয়ে পাঁচীর মার ভিটার দিকে রওনা হলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—অনবরত টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। সঙ্গে ছাতা, লন্ঠন ও দেশলাই নিয়েছি।

ঝোপঝাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কর্দমাক্ত পিছল রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। এই রাস্তা ধরেই অতি কষ্টে পাঁচীর মার ভিটার উত্তর প্রান্তে এসে পড়লাম। চারদিক ঘন জঙ্গলে ঘেরা খোলা মাঠের মতো একটা বিস্তীর্ণ জায়গা। .... মাঝে মাঝে এক একটা লতাগুল্মের ঝোপ।

এরূপ একটা ঝোপের আড়াল থেকে দক্ষিণ পশ্চিম কোণের সেই জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা স্পষ্ট আলোর রেখা দেখা গেল। .... আরও অগ্রসর হওয়া উচিত কি না ভাবছি—ইতিমধ্যে আলোটা যেন হঠাৎ নিবে গেল; কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

কিছুক্ষণ ধরে ক্রমাগত এরূপ ব্যাপারই ঘটতে লাগলো। ... ভয়ে আমার গা ছমছম করছিল বটে, কিন্তু তবু কেন যেন মনে হচ্ছিল—ওটা ভৌতিক ব্যাপার নয়—অন্য কিছু একটা হবে।

সঙ্গীর অনুরোধ উপেক্ষা করে আরও খানিকটা এগিয়ে দেখা গেল প্রায় ৪-৫ হাত দূরেই বেশ বড় একটা অগ্নিকুন্ড।

আগুনের শিখা নেই। কাঠকয়লা পুড়ে যেমন গনগনে আগুন হয়, অনেকটা সেইরকম। আলোর তীব্রতা নেই। স্নিগ্ধ নীলাভ আলোতে আশপাশের ঘাস-পাতাগুলি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

পতিত একটা গাছের গুঁড়ি থেকে আলো নির্গত হচ্ছিল। ... এই অপরূপ দৃশ্য আর কখনও নজরে পড়েনি। বিস্ময়ের পরিসীমা রইলো না।

... গুঁড়িটার পাশেই, আমাদের দিকে, বেশ বড় একটা কচুগাছ জন্মেছিল। তার পাতা এমনভাবে হেলে পড়েছিল যে, একটু বাতাসেই উপরে নীচে ওঠা-নামা করে আন্দোলিত হত। দূর থেকে আলোটাকে একবার জ্বলতে আবার নিভে যেতে দেখেছিলাম—এখন তার প্রকৃত কারণ বোঝা গেল।"

আলেয়ার সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতা যখন হয় তখন গোপালচন্দ্র বিশ-বাইশ বছরের যুবক। লোনসিং গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তখনো পর্যন্ত তাঁর জানা ছিল না যে, পচা ঘাসপাতা, লতাগুল্ম ইত্যাদি জলে ভিজলে তা থেকে মিথেন গ্যাস বের হয়।

সেই গ্যাস বাতাসের সংস্পর্শে এলে জ্বলে ওঠে। এই হলো তথাকথিত ভৌতিক আলো আলেয়া।

বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস গোপালচন্দ্রকে নিয়ে গেলেন বিজ্ঞানাচার্যের কাছে। এই সাক্ষাতের পরে জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে তিনি যোগ দিলেন নবপ্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। সময়টা ১৯২১ খ্রিঃ।

বিজ্ঞান মন্দিরে নানা প্রয়োজনের কথা ভেবে জগদীশচন্দ্র গোপালচন্দ্রকে ইলেকট্রিশিয়ানের প্রশিক্ষণ দেওয়ালেন।

বিজ্ঞান বিষয়ের ছবি আঁকার জন্য অঙ্কন শিক্ষার জন্য তাঁকে বেঙ্গল আর্ট স্কুলেও পাঠানো হয়েছিল।

গোড়ার দিকে টাইপকরা, যন্ত্রের ড্রয়িং; ফটোতোলা, ব্লক তৈরি নানা ধরনের কাজ তাঁকে করতে হতো। এসব কাজের ফাঁকে তিনি গাছপালা, পোকামাকড়, কীটপতঙ্গের আচার-আচরণের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন।

১৯২৮ খ্রিঃ জার্মান প্রকৃতিবিজ্ঞানী হ্যানস মলিশ ভিজিটর প্রফেসর হয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এসেছিলেন। সেই সময় জগদীশচন্দ্রের নির্দেশে গোপালচন্দ্র তাঁর সহকারী হয়ে কাজ করেছিলেন। প্রায় ছয় মাসকাল তাঁর সঙ্গে থেকে কীটপতঙ্গের আকৃতি প্রকৃতি, খাদ্য সংগ্রহের ধারা, আত্মরক্ষার কৌশল, বংশবিস্তার, আলো-দেওয়া কীটপতঙ্গ এবং লতাপাতা সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

জগদীশচন্দ্রের উৎসাহে স্বাধীনভাবে নিজের বিষয়ে গবেষণা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন গোপালচন্দ্র।

তিনি ১৯৩১ খ্রিঃ থেকে ১৯৪১ খ্রিঃ সময়ের মধ্যে ষোলটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁর গবেষণার মধ্যে তিনি মাকড়সা, পিঁপড়ে, শুঁয়োপোকা, প্রজাপতি ইত্যাদির জীবন-রহস্যের নানা দিক বিশ্লেষণ করেছেন।

তাঁর এই প্রবন্ধগুলি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ট্রানজাকশন, বোম্বে জার্নাল অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি, সায়েন্স অ্যান্ড কালচার, কারেন্ট সায়েন্স, আমেরিকান সায়েন্টিফিক মান্থলি, ন্যাচারাল হিস্ট্রি ম্যাগাজিন ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গোপলচন্দ্র ছিলেন স্বভাব-বিজ্ঞানী। তাঁর নীরব সাধনাই এদেশে প্রকৃতি বিজ্ঞানের পথ প্রশস্ত করেছে। পোকা-মাকড় বিষয়ে তাঁর কয়েকটি আবিষ্কার ও গবেষণা ছিল আন্তর্জাতিক স্তরের।

গোপালচন্দ্রের গবেষণার ফলে জানা সম্ভব হয়েছিল. স্ত্রী ও পুরুষ মাকড়সার আচার-আচরণের পার্থক্য, স্ত্রী-মাকড়সা কর্তৃক পুরুষ মাকড়সাকে গলাধঃকরণ, ডিমের প্রতি স্নেহ-যত্ন, ডুবুরি মাকড়সা, মাছ-শিকারি মাকড়সা, টিকটিকি-শিকারি মাকড়সা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়।

শুঁয়োপোকা, বোলতা, ব্যাঙাচি, কানকোটারি পোকা প্রভৃতি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেন গোপালচন্দ্র।

মাছখেকো বা পিঁপড়ে অনুকারী মাকড়সার প্রকৃতি ও শিকার ধরার কৌশল সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন তিনি।

এক ধরনের মাকড়সার তিনি সন্ধান পেয়েছেন, যারা বিশেষ শ্রেণীর কিছু পিঁপড়ের গায়ের রং, দেহের গঠন ইত্যাদি নিখুঁত অনুকরণ করে স্বচ্ছন্দে পিঁপড়েদের দলে মিশে থাকে।

এই কৌশল তারা অবলম্বন করে পিঁপড়েদের খাদ্যে ভাগ বসাবার জন্য। তিনি এই জাতের মাকড়সার নাম দিয়েছেন অনুকারী মাকড়সা।

পিঁপড়েদের স্ত্রী পুরুষ ও কর্মীসংখ্যা নির্ধারণের বিষয় নিয়ে গোপালচন্দ্র নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন।

তাঁর গবেষণাপত্র থেকে জানা যায়, বিশেষ খাদ্যবস্তুর প্রভাবে কোনও কোনও শ্রেণীর পিঁপড়ে বাচ্চারা ডিম ফুটে বেরিয়ে কেউ শ্রমিক, কেউ পুরুষ, কেউ রানীতে পরিণত হয়।

গোপালচন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেছিলে, খাদ্য-উপাদানই এই রহস্যঘন বিষয়টির কারণ হিসেবে কাজ করে।

গাছ-উকুনের শরীর থেকে নিঃসৃত রস ও ফুলের মধু খেয়ে শ্রমিক পিঁপড়েরা বাসায় এসে সদ্য ডিম ফুটে বেরিয়েছে এমন বাচ্ছাদের সামনে উগড়ে দেয়। বাচ্চারা তাই খেয়েই বাড়তে থাকে।

গাছ-উকুনের রস ও মুকুলের মধুতে থাকা ভিটামিন বি-এর প্রভাবে পিঁপড়ের শ্রেণী বিন্যাস সংঘটিত হয়।

এই খাদ্য যারা যারা বেশি পরিমাণে পায় তারা হয় রানি। যারা কিছু কম পরিমাণ পায় তারা পরিণত হয় পুরুষে। সবচেয়ে কম যারা পায় তাদের সংখ্যাই বেশি, তারা হয় শ্রমিক।

খুব হালে এই তথ্যের প্রমাণ পাওয়া গেছে কয়েকটি গবেষণায়। বিষয়টি নিয়ে দুটি মতবাদও প্রচলিত হয়েছে। একটি জেনেটিক অপরটি ট্রাফিক মতবাদ।

অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি গোপালচন্দ্র করেছিলেন আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সেই আবিষ্কার অজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে।

একজাতের পতঙ্গ আছে, তাদের চলতি বাংলা নাম কানকোটারি। ইংরাজিতে ইয়ারউইগ।

এই পোকারা ডিম পাড়ার পর শত্রুব হাত থেকে তা রক্ষা করবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে তা গোপালচন্দ্রই প্রথম লক্ষ করেছিলেন।

ডিমপাড়ার পর কানকোটারি পিছনের পায়ে কাদা মাখিয়ে বেশ মজবুত করে নেয়। পা দুটো আয়তনেও বাড়ে। শত্রু কাছে এলেই কাদামাখা পায়ের মোক্ষম লাথি ছুঁড়ে ঘায়েল করে।

সরু কাচের নল বা পিপেট দিয়ে জল ঢেলে পায়ের কাদা ধুয়ে দেয়ার পর গোপালচন্দ্র দেখেন পোকাগুলো আবার পায়ে কাদা মাখাচ্ছে। কীটপতঙ্গের জগতে যন্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে এ এক অভিনব আবিষ্কার।

পিঁপড়ের প্রকৃতি ও যৌন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য গোপালচন্দ্র এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

হালকা লাল রঙের নালসে পিঁপড়েরা সাধারণতঃ আম জামরুল প্রভৃতি গাছে পাতা জুড়ে জুড়ে বাসা তৈরি করে।

গোপালচন্দ্র এদের দিয়ে পাতার পরিবর্তে স্বচ্ছ সেলোফেন কাগজ দিয়ে বাসা তৈরি করিয়ে ছিলেন অভিনব এক কৌশল অবলম্বন করে।

ল্যাবরেটরিতে ওই পিঁপড়েদের মধ্যে স্বচ্ছ সেলোফেন কাগজ রেখে দিলে সেই কাগজ জুড়ে জুড়ে তারা বাসা বানায়।

সেই বাসার বাইরে থেকে তিনি পিঁপড়েদের ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন।

কীটপতঙ্গের কাজকর্মের ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানীরা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি বলে ব্যাখ্যা করেন। বুদ্ধি শব্দটা তাঁরা এদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান না।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন, কখনো কখনো কীটপতঙ্গরা প্রকৃত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকে।

এ ব্যাপারেও গোপালচন্দ্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করেছেন। একবার আঠার শিশিতে একটা আরশোলা পড়ে মরেছিল। তিনি আরশোলা সমেত আঠা ফেলে দেন।

কিছু সময় পরে দেখো যায় পিঁপড়ের দল এসে জুটেছে। তারা আরশোলার চারপাশে ঘোরাফেরা করছে, কিন্তু আঠার জন্য আরশোলার কাছে পৌঁছতে পারছে না।

এভাবে কিছুক্ষণ কাটল। পিঁপড়েদের সংখ্যাও বাড়ল। আর দেখা গেল তারা ছোট ছোট কাঁকর মুখে করে এনে আঠার ওপর জড় করছে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আঠার ওপর দিয়ে একটা কাঁকরের পথ তৈরি হয়ে গেল; পিঁপড়েরাও এবারে স্বচ্ছন্দে আরশোলার কাছে পৌঁছে গেল।

খাবার সংগ্রহ ছাড়াও, আত্মরক্ষা, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি নানা ব্যাপারে পিঁপড়েদের অদ্ভুত বুদ্ধি কৌশল তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

ব্যাঙাচির রূপান্তর বিষয়েও গোপালচন্দ্রের পর্যবেক্ষণ বিশেষ গরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞানের ভাষায় যা বলে মেটামরফসিস তা হল ব্যাঙাচি থেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের রূপান্তর।

গোপালচন্দ্র ব্যাঙাচির ওপর পেনিসিলিন প্রয়োগ করে লক্ষ্য করলেন, ব্যাঙাচি থেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে সময় অনেক বেশি লাগছে।

প্রত্যেক প্রাণীরই পরিপাকনালীর ভেতরে নানা ধরনের এককোষী প্রাণী বাস করে। এদের অনেকে ক্ষতিকর হলেও অনেকেই একধরনের রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে যা প্রাণীর পুষ্টির সহায়ক।

বাইরের কোন ওষুধে এই সব উপকারী এককোষী প্রাণীর ক্ষতি হলে প্রাণীর দেহে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনীয় ভিটামিন বা রাসায়নিক পদার্থের অভাব ঘটে। ফলে দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি বাধা পায়।

পেনিসিলিন প্রয়োগের ফলে ব্যাঙাচির দেহে যে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে তার ফলেই এদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি বিলম্বিত হয়েছিল।

এছাড়া, ব্যাঙাচির থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত থায়রক্সিন ও ট্রাইআয়োডো থাইরোনিন নামে হর্মোন এদের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও রূপান্তর ঘটাবার সহায়ক ভূমিকা অবলম্বন করে।

পেনিসিলিন প্রয়োগের ফলে থাইরয়েড গ্রন্থি প্রভাবিত হয়েও ব্যাঙাচির রূপান্তর ব্যাহত হয়ে থাকতে পারে।

গোপালচন্দ্রের এরকম আরো কিছু গবেষণা প্রাণী-রসায়ন বিষয়ের গবেষণার ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় আলোকপাত করেছে।

গোপালচন্দ্রের গবেষণা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের চারদেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পথে ঘাটে, শহরের বাইরে বন-জঙ্গল খানা-ডোবা, পুকুর-বিল সবই ছিল তাঁর গবেষণাগার।

কীটপতঙ্গের ছবি তুলতে গিয়ে তাদের বিশেষ ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে অসীম ধৈর্য নিয়ে যেমন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছেন, তেমনি অনেক সময়েই অজ্ঞ গ্রামের মানুষের কাছে তাঁকে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার পেয়ে বিব্রত হতে হয়েছে।

গোপালচন্দ্র তাঁর গবেষণার বিষয় নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ প্রবাসী দেশ আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় লিখেছেন। নিজের সম্পাদিত জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

ইংরাজিতে লেখা বেশ কিছু প্রবন্ধও বোম্বাইয়ের ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির মুখপত্র, মডার্ণ রিভিউ, সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

বিদেশী কোন কাগজে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তাঁর মৌলিক কাজগুলোর খবর বিদেশে পৌঁছত।এবং বলাইবাহুল্য আন্তর্জাতিক স্তরের খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের তালিকায় গোপালচন্দ্রের নামও স্থান পেত।

তবে এটুকুই আমাদের সান্ত্বনা যে বিলম্বে হলেও নিজের দেশে গোপালচন্দ্র স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন এবং প্রকৃতিবিজ্ঞান গবেষণায় এদেশে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ রূপে স্বীকৃত হয়েছেন।

গোপালচন্দ্র ছিলেন বিজ্ঞানী-গবেষক এবং বাংলাভাষার একজন সুলেখক। তিনি জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় সহজ সরল বাংলা ভাষায় লিখে গেছেন। বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত।

সাহিত্য কর্মের জন্য গোপালচন্দ্র প্রথম স্বীকৃতি লাভ করেন ১৯৬৮ খ্রিঃ। আনন্দ পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

১৯৪৭ খ্রিঃ আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ফলক ও ১৯৭১ খ্রিঃ বাংলার কীটপতঙ্গ গ্রন্থের জন্য তাঁকে দেওয়া হয় রবীন্দ্র পুরস্কার।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রাতিষ্ঠা করেন ১৯৪৮ খ্রিঃ। পরিষদের মুখপত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার শুরু থেকেই গোপালচন্দ্র তাঁর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

দীর্ঘদিন এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি অনেককেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতে উৎসাহিত করেছেন। পরবর্তীকালে এঁদের অনেকেই সার্থক বিজ্ঞান-লেখক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এই সার্থকতা গোপালচন্দ্রের অন্যতম কৃতিত্ব।

সুবিখ্যাত ভারতকোষ সম্পাদনার কাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গোপালচন্দ্রের প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

১৯৫১ খ্রিঃ প্যারিসে সামাজিক পতঙ্গ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় শাখা পরিচালনার জন্য গোপালচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি যেতে পারেন নি।

১৯৭১ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গোপালচন্দ্রকে সাম্মানিক ডি. এসসি উপাধি প্রদান করেন। এর কয়েক মাস পরেই ৮ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

সালিম আলি



খাঁচার পাখি আর বনের পাখির সুখ দুঃখ নিয়ে মানুষের ভাবনার বিলাসিতার অন্ত নেই। কবিরা তো ঝাঁকে ঝাঁকে কাব্য কবিতা রচনা কিছু কম করেননি। কিন্তু তাই বলে পাখির মাংসে তাদের রুচি কখনো কমে যেতে দেখা যায় নি।

এখন তো সখের দরদীরা হাটে মাঠে মেলায় খাঁচাবন্দি পাখি বিক্রী হতে দেখে তাদের নির্যাতন মুক্তির বিলাসী-অভিযান দেখিয়ে মহাকর্তব্য সাধনের তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন—চোখের সামনেই এসব কান্ড দেখা যায়।

আসলে, পাখি পোষা, পাখিকে খাঁচা থেকে মুক্ত করে দেওয়া, পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে—প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কাজেই পাখি বাঁচাও অভিযান হাঁকাও—এসব কিছুর সঙ্গে পাখিকে ভালবেসে, তাদের জীবনযাত্রা, জন্মান, বেঁচে থাকা হাল চাল এসবের খবর রাখা ব্যাপারগুলোর পার্থক্য আকাশ-পাতাল।

একটা পাখির ধরন-ধারণ লক্ষ্য করা যদিও বা সম্ভব বলে ভাবা যেতে পারে, একটা গোটা দেশের অসংখ্য বিচিত্র পাখির ঠিকুজিকুষ্টির খবর রাখার কথা চিন্তাও করা যায় না।

অথচ আমাদের দেশের একটি মানুষ এমন অসম্ভব দুঃসাধ্য কাজ করেই ক্ষান্ত হননি, গোটা দেশের সমস্ত পাখির জীবনযাত্রার বিবরণ নিয়ে মহাভারত প্রমাণ বই লিখে পৃথিবীর মানুষের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন।

কেবল তাই নয়, তাঁর সংগৃহীত তথ্য জীববিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে।

সালিম আলি মনেপ্রাণে ভালবেসেছিলেন পাখিদের। কেবলমাত্র পাখির জীবন পর্যবেক্ষণ করেই যে একানব্বই বছরের গোটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ তিনি নিজেই।

মৃত্যুর আগে অবধি পাখিদের জীবনরহস্য অবাক বিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করে গেছেন সালিম আলি।

এই দেখা শুরু হয়েছিল ছেলেবেলা থেকে। তখনকার দেখার মধ্যে অবশ্য একটু বিশেষত্ব ছিল। তা হল, ভালবাসা ছিল না— যা পরে তার দেখাকে মহিমান্বিত করেছিল।

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে, সালিম আলির ছেলেবেলায়, একটা এয়ার গানের মালিক হয়েছিলেন তিনি।

অভিভাবকদের কারোর কাছ থেকে উপহার পাওয়ার সুবাদে এই মালিকানার স্বত্ব। তার ফলে অন্য দশটা বাচ্চা যা করে, তিনিও স্বাভাবিকভাবেই তাই করতেন।

টিপ পরীক্ষা করতে করতেই, সে কাজটা প্রধানতঃ হত বাড়ির আশপাশে হাতের কাছে যেসব পাখি, প্রজাপতি ইত্যাদি পাওয়া যেত তাদেরই ওপর, পাওয়া গেল একদিন অন্য স্বাদ।

মুম্বাইতে যেখানে তাঁদের বাড়ি ছিল, তার আশপাশে নানা ধরনের পাখিই পাওয়া যেত। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল, সব টিপই ফস্কাচ্ছে না। দু-একটা পাখি ঘায়েলও হচ্ছে।

একদিন একটা চড়াই হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরলেন আলি। কেউ দেখতে না পায় সেভাবে এনে সদ্য মরা পাখিটা বাড়ির রাঁধুনির হাতে তুলে দিলেন।

বুদ্ধিটা বাতলে দিয়েছিল অবশ্য সেই। সে চড়াইপাখির পালক ছাড়িয়ে গায়ে যৎসামান্য মশলা মাখিয়ে আস্ত ভেজে দিল। প্রথম দিন থেকেই এই সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পেয়ে মৌতাত ধরে গেল।

এরপর থেকে মাঝে মধ্যেই চলল আলির চড়াই ভাজা খাওয়ার পর্ব। জানতে পেত না কেউ। কেন না কাজটা করা হত অত্যন্ত গোপনে।

একদিন আচমকা বাধা পড়ল। সেদিন একটা চড়াই মেরেছে আলি। সরাসরি চলে এল রঁসুই ঘরে। কিন্তু রাঁধুনির হাতে দিতে গিয়েই হঠাৎ নজরে পড়ল পাখিটার গলার নিচের দিকের পালকে কেমন হলদে ছোপ। মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ ঝোল চলকে পড়েছে।

আলি এবারে ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, পাখিটা চড়াইর মত দেখতে হলেও ঠিক সাধারণ চড়াই নয়।

রাঁধুনিও বলতে পারল না কিছু। আলির ধন্ধ লাগল। এ পাখি আগে কখনো দেখেনি, এসব খাওয়ার চল আছে কিনা কে জানে। না জেনে খাওয়া ঠিক হবে না।

পাখিটা নিয়ে তিনি ছুটলেন মামার কাছে।

আলিরা ভাইবোনে মিলে ছিলেন আটজন। আলির যখন তিন বছর বয়স, তার মধ্যেই বাবা-মা দুজনকেই হারিয়েছেন।

তারপর থেকেই দাদা-দিদিদের সঙ্গে মানুষ হচ্ছিলেন মামা আমিরুদ্দিন তায়েবজির কাছে। মামা খুবই বিদ্বান মানুষ। তাঁর কাছেই আলির যাবতীয় শিক্ষাদীক্ষা।

মামা আর এই পরিবারের অনেকেরই ছিল শিকারে নেশা। তাঁদের কেউ যখন শিকারে বেরুতেন, মাঝে মাঝেই সঙ্গ নিতেন আলি।

একবার এমনি শিকারে বেরিয়ে চোখে পড়েছিল পুবের আকাশে ধাবমান উজ্জ্বল আলোর একটা রেখা। পরে জেনেছিলেন সেটা হ্যালির ধূমকেতু। ওই বিখ্যাত ধূমকেতুটা জীবনে দুবার দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন আলি। খুব কম মানুষের জীবনেই হ্যালির ধূমকেতু দুবার দেখার সুযোগ ঘটেছে।

চড়াই পাখিটা আমিরুদ্দিন হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। কিন্তু আসলে ওটা কি পাখি চিনতে পারলেন না।

আলির তখন কেমন রোখ চেপে গেছে। পাখিটার সঠিক পরিচয় জানতে হবে। গলায় অমন হালকা হলুদ ছোপওয়ালা পাখি আগে কখনো চোখে পড়েনি তার।

আমিরুদ্দিন ভাগ্নের আগ্রহ লক্ষ্য করে তাকে পাঠিয়ে দিলেন মুম্বাই ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিতে।

পশুপাখি উদ্ভিদের আকৃতি-প্রকৃতি পরিচয় জানায় আগ্রহী কিছু মানুষ মিলে গড়ে তুলেছিলেন এই সংস্থা। আলির মামাও ছিলেন সদস্যদের একজন। বাকি প্রায় সকলেই লালমুখো সাহেব।

এদেশে তখন সাহেবদের রাজত্ব। স্বভাবতই এদেশি মানুষদের মনে তাদের সম্পর্কে একটা ভয় ও সম্ভ্রমের ভাব।

কিশোর আলি কিন্তু এতটুকু ইতস্ততঃ করলেন না। একটা কাগজের ঠোঙার মধ্যে মরা পাখিটা ভরে নিয়ে চলে এলেন সোসাইটির অফিসে। মিলার্ড নামে এক সাহেবের সঙ্গে দেখা করে পাখিটা দেখালেন।

মিলার্ড ছোট্ট আলির সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। আলির আগ্রহ দেখে খুবই খুশি হলেন তিনি।

হাসিমুখে পাখিটার পরিচয় জানিয়ে বললেন, ওটা সাধারণ ঘরোয়া চড়াই নয়। ওটার ইংরাজি নাম ইয়েলোথ্রোটেড স্প্যারো। গলার হলদে দাগটাই এই চড়াইয়ের বিশেষত্ব।

নানা ধরনের পাখি সংরক্ষণের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘর ছিল। পাখিদের গা থেকে পালকসহ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার ভেতরে তুলো গুঁজে আসল পাখিটার আদল ফিরিয়ে আনা হত।

এই ধরনেব অসংখ্য নমুনা সেই ঘরে রাখা ছিল। আলির জানার আগ্রহ সাহেবকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি সমিতির দুজন সদস্যের সঙ্গে আলিকে পাখির যাদুঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

মস্ত ঘরের দেয়াল জুড়ে সারিসারি কাঠের খোপে সাজানো অসংখ্য রং-বেরঙের বিচিত্র সব পাখি। দেখে জীবন্ত বলে ভ্রম হয়।

রঙের এমন আশ্চর্য শোভন ব্যবহার যে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। যদিও মারা যাবার পর রঙের আসল জেল্লা কিছুটা কমে গেছে।

পাখিদের চেহারার মধ্যেও কত বৈচিত্র্য। এক এক রকম পাখির ঠোঁটের গড়নও এক এক রকম। কারও মাথায় ঝুঁটি, ঝুঁটির বাহারও কতরকম। কারও গলা ঘিরে রিঙ-এর মত রঙের দাগ।

কারও আঙুলে বড় বড় নখ, কারও চোখ কাজলটানা। কারো কারো লেজ তাদের শরীরের তিন চারগুণ লম্বা।

এইসব দেখতে দেখতে একেবারে নতুন এক জগতে পৌঁছে যান আলি। ঘোর লেগে যায় চোখে ও মনে। আকুল আগ্রহে মন ছটফট করে ওঠে, বাহারি রঙ আর রূপের আর বিচিত্র আকার আকৃতির পাখিদের জীবনের চলাফেরা কলকাকলি দেখবার জন্য।

এরপর থেকে এয়ার গানের বদলে হাতে উঠল বাইনোকুলার। আর পাখি হত্যা নয়—এবারে শুধু দেখা— চোখ ভরে দেখা আর মন ভরে উপভোগ করা। এযে কী আনন্দ আর তৃপ্তি।

পাখি দেখার প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল বর্মার জঙ্গলে। তখন আঠারো-উনিশ বছরের কিশোর। পড়াশোনা তখনো অসম্পূর্ণ। কিন্তু সংসারের প্রয়োজন বড় বালাই।

এক দাদার কাঠ আর খনিজের ব্যবসায় যোগ দেবার জন্য ছুটতে হয়েছিল বর্মায়। জঙ্গলে কাঠ কাটার তদারকি করতে হত।

সেই কাজ করতে করতেই পাখির স্বর্গে পৌঁছে গিয়েছিলেন আলি। রঙ আর রূপের চাইতে পাখিদের আচার-আচারণের প্রকৃতিই যেন বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল তাঁর কাছে।

শুরু হয়েছিল বার্মার জঙ্গল থেকে। তারপর পাখিদের টানে গোটা ভারতবর্ষ চষে বেড়িয়েছেন তিনি।

পুবে বার্মা থেকে পশ্চিমে আফগানিস্তান, উত্তরে তিব্বতের মালভূমি কৈলাস-মানসসরোবর থেকে দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা কোথায় না গেছেন তিনি।

কেবল পাখিদের জীবন দেখবার জন্য—কেমন তাদের চলাফেরা, ডেরো বাঁধা, কেমন ওদের জীবন চলন—এসব দেখার টানে পাহাড় জঙ্গল, দুর্গম দুস্তর পথ, বাঘ-হাতি, সাপখোপ কোন কিছুর তোয়াক্কা করেননি তিনি। জলে কাদায় কাটাতে হয়েছে দিনের পর দিন।

এই সময় ডাকাতের হাতেও পড়তে হয়েছে তাঁকে, জীবনও বিপন্ন হয়েছে বহুবার।

কোনও বিশেষ পাখির হদিস করবার জন্য খাড়া পাহাড়ে চড়তে হয়েছে কোথাও জীবন হাতে করে।

একবার লিপুলেখ গিরিপথে পাখির দিকে নজর রেখে পেছনে হটছেন। হঠাৎ গড়িয়ে পড়া পাথরের শব্দে পেছন ফিরে দেখেন সর্বনাশ, একেবারে খাদের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন। আর একটু হলেই অতল খাদে পড়ে প্রাণ হারাতে হত। একেবারে শেষ মুহূর্তে দৈবক্রমে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন সেদিন।

জলকাদায় জিপের চাকা অচল হয়ে কতবার যে বিব্রত হয়েছেন তার হিসেব কে করবে। তবু ছুটেছেন, পাখি দেখার আকর্ষণে।

আলির কাছে এই আকর্ষণ এমনই অমোঘ ছিল যে, যখন জীবন নব্বই-এর কোঠায় পৌঁছেছে সেই সময়েও এক দুর্লভপাখি—বহুদিন খুঁজেও যার হদিস করতে পারেননি, তার খোঁজে কুমায়ুন হিমালয়ের জঙ্গলে অভিযানে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন।

আজও পর্যন্ত সেই পাখির সন্ধান পাওয়া যায়নি—সেই দুর্লভ পাখিটি হল মাউন্টেন কোয়েল।

ভারত স্বাধীন হবার আগে এদেশে বহু ছোট ছোট রাজ্য ছিল। সাহেবরা সেসব রাজ্যে পাখির সন্ধানে যেতেন।

কিন্তু তারা কেবল পাখির প্রকারভেদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। পাখিদের জীবন, চালচলন, ধরনধারণ নিয়ে তারা বড় একটা মাথা ঘামাতেন না। আলি সে কাজটা করতেন সুচারু ভাবে।

রাজাদের অনুমতি নিয়ে দিনের পর দিন পাহাড়ে জঙ্গলে, নদীর চরে, তাঁবু খাটিয়ে বাস করেছেন।

পাখিদের স্বভাব লক্ষ্য করবার জন্য মাইলের পর মাইল পাড়ি দিতে হয়েছে স্রেফ পায়ে হেঁটে। কখনো ঘেরাটোপ আড়ালে বসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিচল ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

প্রতিমুহূর্তে সতর্ক থাকতে হয়েছে, কোন ভাবে না তাঁর অস্তিত্ব পাখিদের নজরে পড়ে যায়।

পর্যবেক্ষণের জন্য কখনো কখনো পাখি ধরতেও হয়েছে জাল পেতে। বাধ্য হয়ে গুলি করে নামাতেও হয়েছে কতবার।

সালিম আলির পাখি দেখার কাজ সাধারণ মানুষের চোখে অদ্ভুত ঠেকলেও যারা সমঝদার তাদের সহযোগিতা পেতে কখনো অসুবিধা হয়নি তাঁর।

একবার, তখন তিনি তাঁবু ফেলেছেন কোচিনের জঙ্গলে। জঙ্গল ফুঁড়ে যেতে যেতে এক ট্রেনের ড্রাইভার তাঁকে একটা মরা বাজ উপহার দিয়ে গিয়েছিল।

ট্রেনের খোলা ওয়াগনে মজুদ মুরগির ওপর ছোঁ মারতে গিয়ে পাখিটা মারা পড়েছিল। একটা জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ ছুঁড়ে মেরেছিলেন পাখিটাকে সেই ড্রাইভার ভদ্রলোক।

আলি পরে পরীক্ষা করে খুশি হয়েছিলেন, দুর্লভ এক প্রজাতির বাজ হাতে পেয়েছিলেন নিতান্ত আকস্মিকভাবে ট্রেনের ড্রাইভার ভদ্রলোকের সৌজন্যে।

এদেশে সাহেবরা পাখিদের ওপর যে কাজ করেছেন, তা ছিল এক ধরনের। তাঁরা খুঁজতেন পাখিদের মাপজোখ, শরীরের রঙবেরঙের খুঁটিনাটি হিসাব, ডিমের মাপ আর গড়ন।

এসবের বাইরে বড় একটা তাঁরা মাথা ঘামাতেন না। সুযোগ মত নমুনা হিসেবে পাখির চামড়াটা সংরক্ষণ করতেন।

আলির হাতেই শুরু হয়েছিল পাখিদের আচার-আচরণ, স্বভাবচরিত্র, জীবনযাত্রা নিয়ে খুঁটিনাটি অনুসন্ধানের কাজ। মরা পাখির চামড়া সংগ্রহ করার তুলনায় জীবন্ত, পাখিদের স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্থ চালচলন লক্ষ্য করাতেই বেশি উৎসাহ ছিল আলির।

যৌবনে বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিতে কিছুদিন দর্শকদের কাছে পাখি আর প্রকৃতি বোঝাবার কাজ করতে হয়েছিল আলিকে।

তারপর পক্ষিবিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য জার্মানি গিয়েছিলেন ১৯২৯ খ্রিঃ। একবছর পরেই দেশে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু পুরনো চাকরিতে ততদিনে নতুন লোক নিয়োগ হয়ে গিয়েছিল।

ফলে স্ত্রীকে নিয়ে আলিকে মুম্বাই শহর থেকে দুরে কিহিম অঞ্চলে কম খরচের ডেরায় চলে যেতে হয়েছিল। এখানে এসে পাখির জগতের এক নতুন দিকের আবিষ্কার করতে পারলেন।

বাবুই পাখিদের বাসা বানাবার অদ্ভুত রীতি-প্রকৃতির বিষয় আগে কোন পক্ষি-বিজ্ঞানীর নজরে আসেনি। এবিষয়ে প্রথম তথ্য সংগ্রহ করেন আলি।

মাটি থেকে দশ-বারো ফুট উঁচু একটি মাচার ওপরে ঘেরাটোপের মধ্যে দিনের পর দিন বসে থেকে আলি লক্ষ্য করতেন বাবুই পাখিদের।

তিনি লক্ষ্য করলেন, পুরুষপাখিরা অর্ধেক বাসা বানিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। একসময় একঝাঁক মেয়ে বাবুই এসে অর্ধসমাপ্ত বাসাগুলো ঘুরে ঘুরে নিজেদের পছন্দমত বাসা বেছে নেয়।

মেয়ে বাবুইদের যে যে বাসা পছন্দ হয় পুরুষ পাখিরা সেগুলোর কাজ শেষ করে আবার নতুন বাসা বানাবার কাজে হাত দেয়।

নতুন বাসায় অন্য আরো মেয়ে বাবুইকে ডেকে আনার উদ্দেশ্যেই তাদের এই পরিশ্রম করতে হয়।

কোনও কারণে প্রথম বাসাটা যদি কারও পছন্দ না হয় তাহলে গোটা কাজটাই বাতিল হয়ে যায়। খাটাখাটুনি বিফলে যায়। নতুন করে আবার বাসা বানাবার কাজে লাগতে হয়।

কাছে দূরে ঘুরে ঘুরে যেসব অদ্ভুত আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ হত, সব নিয়ম করে টুকে রাখতেন আলি একটা খাতায়।

সেই সব তথ্য সাজিয়ে প্রাসঙ্গিক ছবি আর নানান পাখির বিবরণ নিয়ে একের পর এক বই লিখেছেন।

তাঁর ভারত ও পাকিস্তানের পাখিদের হ্যান্ড বুক দশ খন্ডে সম্পূর্ণ। উপমহাদেশের বিচিত্র পাখিদের নিয়ে এমন বিস্তৃত ও ব্যাপক গবেষণা আলির আগে আর কোন পক্ষিগবেষকের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি।

আলির বিখ্যাত বই বুক অব ইন্ডিয়ান বার্ডস প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রিঃ। বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এই বইটি।

জেলবন্দি অবস্থায় এই বই পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন জহরলালও। একই সময়ে ভারতের অন্য জেলে বন্দিনী কন্যা ইন্দিরাকেও জহরলাল বইটি উপহার পাঠিয়েছিলেন।

পৃথিবীতে আমাদের পরিবেশ বাসযোগ্য রাখার জন্য যে পাখিদেরও অবদান রয়েছে তা তাঁর বিভিন্ন বইতে বারবার উল্লেখ করেছেন আলি।

লুপ্তপ্রায় পাখিদের সংরক্ষণের ব্যাপারেও তিনি ব্যবস্থা নেবার কথা বলেছেন। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সব রকম পাখির ভূমিকাই প্রকৃতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রতিটি মানুষেরই যে সচেতন থাকার প্রয়োজন আছে পক্ষিবিজ্ঞানী সেলিম আলি তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণার প্রতিস্তরেই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন, লেখায় প্রকাশ করেছেন।

নিজের কাজের জন্য দেশ-বিদেশের সম্মান লাভ করেছেন আলি। ১৯৭১ খ্রিঃ পরিবেশ বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পল গেটি অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন তিনি। পুরস্কারের পঞ্চাশ হাজার ডলারের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই তিনি দান করেছেন মুম্বাই ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিতে।

জীবনের শেষ প্রান্তে ১৯৭১ খ্রিঃ অসুস্থ অবস্থায় আলি যখন হাসপাতালে ছিলেন, তখনও তাঁর নিত্যসঙ্গী প্রিয় বাইনোকুলারটি শিয়রের কাছে থাকত। জানালার ফাঁকে উঁকি দেওয়া কোন পাখি যাতে তাঁর চোখে ফাঁকি দিতে না পারে সেজন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন সেলিম আলি, সেই একানব্বই বছর বয়সেও।

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা



ভারতে পরমাণু শক্তি গবেষণার পথিকৃৎ ও পুরোধা-পুরুষ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসেও এক স্মরণীয় নাম।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র ভাবা আকস্মিকভাবেই মোড় নিয়েছিলেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার দিকে। উত্তরকালে তাঁর নানা আবিষ্কার বিজ্ঞানের এই শাখাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

আমরা যাকে বলি মহাজাগতিক রশ্মি, বিজ্ঞানের ভাষায় তারই নাম কসমিক-রে। এই রশ্মি হল অত্যন্ত শক্তি সমৃদ্ধ ফোটন কণিকার এক মহাসমুদ্র।

বিজ্ঞানীদের ধারণা বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় পরমাণুর সঙ্গে ফোটন কণিকার সঙ্গে যে তীব্র সংঘর্ষ ঘটে তারই ফলে উৎপন্ন হয় ঋণক বা ইলেকট্রনের ধারা।

সৌরবিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর আবিষ্কার করতে সমর্থ হন যে, সূর্যও ক্বচিৎ কখনো এই রশ্মি উৎপন্ন করে থাকে। তবে মহাজাগতিক রশ্মির প্রকৃত উৎসস্থল হল বিপুল বিশাল আন্তঃনাক্ষত্রিক অঞ্চল। আর এই সম্পূর্ণ এলাকাটিই চুম্বক শক্তির অধীন।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মত হল, মহাজাগতিক রশ্মির উৎসস্থল আন্তঃনাক্ষত্রিক ক্ষেত্রের অন্তর্গত চুম্বকশক্তি সম্পন্ন গ্যাসীয় মেঘ।

এই মেঘের স্তর থেকেই রহস্যাচ্ছাদিত মহাজাগতিক রশ্মি নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় বিচ্ছুরিত হয়।

এর পরেও মতভেদ রয়েছে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, মহাকাশের নানা নক্ষত্রই হল মহাজাগতিক রশ্মির উৎস। অল্প শক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মি নির্গত হয় নক্ষত্রগুলি থেকে।

এই রশ্মি যখন চৌম্বক প্রভাবযুক্ত আন্তঃনাক্ষত্রিক এলাকায় গ্যাসীয় মেঘের সংস্পর্শে আসে তখনই হয় সংঘর্ষ।

এই বিপুল সংঘর্ষের ফলেই অল্প শক্তিযুক্ত রশ্মি পরিণত হয় শক্তিসমৃদ্ধ মহাজাগতিক রশ্মিতে।

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার যাত্রা শুরু হয়েছিল এই মহাজাগতিক রশ্মির তাত্ত্বিক গবেষণা নিয়ে।

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরেই মহাজাগতিক রশ্মির রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করে

চলেছেন। তাঁদের সেই অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল ভাবা এবং জার্মান বিজ্ঞানী ডব্লু হিটলারের মহাজাগতিক রশ্মির ওপর গাণিতিক গবেষণা।

এই কৃতিত্বের পথ ধরেই বিশ্ববিজ্ঞানী রূপে ভাবার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

ভাবা হিসেব করে দেখিয়েছিলেন, মহাজাগতিক রশ্মি যখন আন্তঃনাক্ষত্রিক চৌম্বকক্ষেত্রে এসে আলোড়িত হয় তখন সেই রশ্মি আলোকের গতিবেগ সম্পন্ন এবং শক্তিসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

এই শক্তিসমৃদ্ধ মহাজাগতিক রশ্মি বায়ুমন্ডলের বায়ুকণার সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন করে ঋণক বা ইলেকট্রন নয়—মেসন নামক এক পরমাণুকেন্দ্র নিঃসৃত অতি সূক্ষ্ম কণা।

গাণিতিক হিসেবের দ্বারাই ভাবা ইলেকট্রনের স্থলে মেসনকে আবিষ্কার করেছেন। এই মেসনকে বলা হয় গৌণকণা বা সেকেন্ডারী পারটিকল। প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন হল মুখ্য কণা। মহাজাগতিক রশ্মিকে ভাবা বলেছেন মেসন-পৃক্ত রশ্মি বা গৌণক।

তাঁর এই বিশ্লেষণকেই বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মি ধারার ক্যাসেড-তত্ত্ব। মহাজাগতিক রশ্মি-ঘটিত তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার গবেষণা ভাবার ক্যাসেড-তত্ত্ব দ্বারা দূরপ্রসারী উদ্দীপনা লাভ করেছে।

মাত্র ৪১ বছর বয়সে ভাবা ১৯৫০ খ্রিঃ লন্ডনের রয়াল সোসাইটির পদার্থবিজ্ঞানী সভায় তাঁর গাণিতিক আবিষ্কার ব্যাখ্যা করেন এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অন্যতম পুরোধারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার জন্ম ১৯০৯ খ্রিঃ ৩০শে অক্টোবর এক ব্যবসায়ী পার্সী পরিবারে। তাঁর বাবা ব্যবসায়ী হলেও বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। নানা বিষয়ের ওপর লেখা বিজ্ঞানের বই দিয়ে তিনি বাড়িতেই একটি লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। কাজের অবসরে সেখানে ডুবে থাকতেন বই নিয়ে।

স্বভাবতঃই এই পরিবেশে বাল্যবয়স থেকেই ভাবা বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

বিজ্ঞানের ওপর নানান বই যেমন ঘাঁটতেন লাইব্রেরীতে বসে তেমনি নিজের মতই সময় সময় নানা পরীক্ষা নিয়ে মেতে উঠতেন বালক ভাবা। বাবা তাঁকে নানাভাবে উৎসাহিত করতেন।

বহুমুখী প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন বিজ্ঞানী ভাবা। নিজেই রং-তুলি নিয়ে সুন্দর ছবি আঁকতে শিখেছিলেন।

কেবল কি তাই, খাতা তৈরি করেছিলেন কবিতার জন্য। পাতার পর পাতা ভরিয়েছেন কবিতা লিখে।

কবিতার সঙ্গে ছিল গানের ঝোঁক। গাইতেও পারতেন ভাল। শ্রোতা হিসেবেও সমঝদার। অল্পবয়সেই পশ্চিমী ধ্রুপদ গানের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

এসব তো বাইরের ব্যাপার। বালক বয়সে মূল বিষয় হল স্কুলের লেখাপড়া। তাতেও ছিলেন সেরা ফলটির দাবীদার।

স্কুলের পড়া শেষ করলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। এরপরই পড়লেন আতান্তরে। পছন্দের বিষয় তো অনেক। বিজ্ঞান ভালবাসেন। সেই তালিকায় পিছিয়ে নেই অঙ্কন, কাব্যচর্চা বা সঙ্গীত। কলেজে ভর্তি হবার আগে বিষয় নির্বাচন তো দরকার।

শেষ পর্যন্ত কোনদিকে না তাকিয়ে বাবা বিলেত পাঠিয়ে দিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে।

কিন্তু বেশিদিন ভাল লাগল না কলকব্জার ব্যাকরণ নিয়ে পড়াশোনা। মাঝপথেই ইস্তফা দিয়ে পদার্থবিদ্যার ক্লাশে ভর্তি হয়ে গেলেন।

১৯৩০ খ্রিঃ ২১ বছর বয়সে কেমব্রিজ থেকে পদার্থবিদ্যায় বি.এ.পাশ করলেন।

সেই সময় তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার গণিতের আসর সরগরম করে রেখেছেন ডিরাক, পাউলি, হিজেনবার্গ, শ্রোয়ডিঙ্গার ও বনের মতো দিকপাল পদার্থবিদগণ। এই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন ডিরাক।

পদার্থবিদদের গবেষণার ধারা নাড়াচাড়া করে ডিরাকের মতামতটিই অধিকতর স্বচ্ছ বলে মনে হল ভাবার কাছে।

প্রায়োগিক পদার্থবিদ্যার পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসকে ঘিরে যেসব ইলেকট্রন বা ঋণক নানা শক্তিস্তরে ঘোরাফেরা করছে, তাদের রহস্যময় বৈশিষ্ট্য ডিরাক তাঁর গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে অত্যন্ত তরল করে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

কেমব্রিজে বি.এ পড়তে পড়তেই ডিরাকের গবেষণার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন ভাবা। ফলে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার বই নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর কেটে গেছে কেমব্রিজের সমৃদ্ধ লাইব্রেরিতে।

পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হবার পর কেমব্রিজেই গবেষণায় বসে পড়লেন ভাবা। বিষয় সেই তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা।

১৯৩৪ খ্রিঃ পঁচিশ বছর বয়সেই কেমব্রিজ থেকে পদার্থবিদ্যার ডক্টরেট হলেন।

ভাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ইলেকট্রন ও অন্যান্য মুখ্য কণাদের যথাযথ ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা নিরূপণ। এই কাজই তাঁকে জগদ্বিখ্যাত করেছে।

সত্যেন বোস উদ্ভাবিত কণা বোসন ও এনরিকো ফের্মির উদ্ভাবিত গাণিতিক কণা ফের্মিয়ন কণাদেরও তিনি তাঁর গাণিতিক ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যেই তিনি তাঁর উদ্ভাবিত মেসনের ধর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন।

ভাবা দেখিয়েছেন, মেসন বা গৌণকের বিভিন্ন স্তর। তাতে যে বিদ্যুৎকে থাকতেই হবে তার কোন কারণ নেই।

তিনিই তত্ত্বীয় পদার্থবিদদের মধ্যে প্রথম ঘোষণা করেন মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে বায়ুমন্ডলের কণাগুলির বিপুল সংঘাতকে ল্যাবরেটরিতে পারটিকল অ্যাকসিলারেটর-এর সাহায্যে অনুধাবন করা সম্ভব।

ভাবার ঘোষণার অব্যবহিত পরেই তাঁর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা।

১৯৪১ খ্রিঃ মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণা ও ইলেকট্রনের অন্তর্গত দুই উপাংশের আবিষ্কারের ফলে ভাবা লন্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হলেন।

পরের বছরেই পেলেন অ্যাডমস পুরস্কার। ১৯৪৮ খ্রিঃ হপকিনস পুরস্কার। ১৯৫৪ খ্রিঃ ভারত সরকারের পদ্মভূষণ উপাধি।

পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে ভাবার অবদানের স্বীকৃতি ও পুরস্কার এসেছিল দেশ বিদেশ থেকে। বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মান জানিয়েছে।

ভাবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত প্রবন্ধগুলির অন্যতম তিনটি হল কোয়ান্টাম তত্ত্ব, মৌলিক ভৌতকণা তত্ত্ব ও মহাজাগতিক বিকিরণ।

১৯৪০খ্রিঃ ভাবা ৩১ বছর বয়সে দেশে ফিরে এলেন। এতদিনে তাঁর জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কারগুলি সম্পন্ন হয়েছে।

সেই সময় মানব ইতিহাসের ভাগ্যাকাশে দেখা দিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালমেঘ। হিংসা আর হননেচ্ছা মানুষকে নামিয়ে নিয়ে এল পাশবিক স্তরে। মানবজাতির করুণ পরিণতির কথা চিন্তা করে ভাবা গভীর বেদনা বোধ করলেন। নতুন সংকল্প ও পরিকল্পনার চিন্তা জেগে উঠতে লাগল তাঁর মধ্যে।

১৯৪১খ্রিঃ ভাবা কর্মজীবন শুরু করলেন। ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব সায়েন্স-এ তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা বিভাগে রিডার পদে যোগ দিলেন।

ভারতীয় শিল্প সাম্রাজ্যের অন্যতম রূপকার জামশেদজী টাটার সঙ্গে ভাবার ছিল পারিবারিক সম্পর্ক।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের চর্চাকে প্রাণবন্ত করার উদ্দেশ্যে মহামতি টাটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন টাটা ইনসটিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ।

ভাবা এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও মহাজাগতিক রশ্মি-সংক্রান্ত গবেষণা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে মনোনীত হলেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভাবা এবারে দেশ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

বিজ্ঞানী ভাবার হাতেই ১৯৪৫ খ্রিঃ ভারতে পরমাণু গবেষণার পথ তৈরি হয়েছিল। এই সূত্রেই ১৯৪৮ খ্রিঃ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল পরমাণু শক্তিকমিশন। ভাবা হয়েছিলেন তার প্রথম সভাপতি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ভাবার বিজ্ঞান প্রতিভার স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিঃ ভাবা ভারত সরকারের পরমাণু শক্তিবিভাগের সচীব পদে মনোনীত হলেন।

ভাবার প্রেরণাতেই ভারতে পরমাণু শক্তিউন্নয়নের বীজ রোপিত হয়। দেশের নানা প্রান্তে শুরু হয় পরমাণুশক্তি সম্পর্কিত গবেষণা। তারই ফলস্বরূপ দেশের মাটিতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় পরমাণু শক্তিচুল্লি বা অ্যাটমিক রিঅ্যাক্টর।

ভারতবর্ষের প্রথম পারমাণু শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় মুম্বাই শহরের অদূরে তারাপুরে ১৯৬৩ খ্রিঃ। দুবছর পরেই তারাপুরে গড়ে ওঠে প্রথম প্লুটোনিয়াম প্ল্যান্ট। এই সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধানেই ছিলেন ভাবা।

পরমাণু শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রে পদার্পণ করে ভারত অবিলম্বে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যে নিজের স্থান নির্দিষ্ট করে নিল। একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান বিশ্ববিজ্ঞানের সাগ্রহ স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৭১ খ্রিঃ ১৮ই মে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য দিন। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এই দিন রাজস্থানের মরু অঞ্চলে প্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ভারত ঘোষণা করে মানবকল্যাণে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই এই পরমাণু বিস্ফোরণ।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাবার অবদান বহুবিস্তৃত। ভারতে ইলেকট্রনিক গবেষণারও পথিকৃৎ তিনি। তাঁর চেষ্টাতেই ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের গবেষণাও বিশেষ স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে। ভারতে ভাবাই প্রথম শুরু করেছিলেন তেজঃসৌরবিদ্যা ও জীবাণুবিদ্যার গবেষণা। তাঁর তত্ত্বাবধানেই স্থাপিত হয়েছে উটকামন্ডের রেডিও টেলিস্কোপটি।

জগদ্বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল ভাবার অনন্যসাধারণ প্রতিভা। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন উদার মানবতাবাদী। দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম। বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার সকল প্রকার সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে তিনি দেশে ফিরে এসে স্বদেশের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনায় অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৯৬৬ খ্রিঃ এক বিমান দুর্ঘটনায় অকালে এই বিজ্ঞানসাধকের প্রাণবিয়োগ হয়।

আবদুস সালাম

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অমরত্ব লাভ করেছেন তার নাম স আপেক্ষিক তত্ত্ব বা থিওরি অব রিলেটিভিটি।

এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পর আরো দীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি বিজ্ঞান-সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন অপর একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার অনুশীলন ও গবেষণা নিয়ে।

কিন্তু উদ্দেশ্যে সিদ্ধির পথে অনেক দুর অগ্রসর হয়েও শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্যর্থই হতে হয়েছিল। তত্ত্বটি তাঁর কাছে অধরাই থেকে যায়।

যে তত্ত্বটি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার জীবনের অবশিষ্ট অংশ ব্যয় করেছিলেন মহাবিজ্ঞানী তা হল ইউনিফয়েড ফিল্ড থিওরি বা একীকৃত ক্ষেত্র তত্ত্ব।

আইনস্টাইনের পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আইনস্টাইনের পথ অনুসরণ করে বহু বিজ্ঞানী গবেষণায় লিপ্ত হয়েছেন। তাঁদের সেই কঠোর অনুশীলন ও গবেষণা শেষ পর্যন্ত ফলবতী হয়েছে ১৯৬০ খ্রিঃ।

আইনস্টাইন যে তত্ত্বকে ধরি ধরি করেও ধরতে পারেননি, সেই একীকৃত ক্ষেত্র-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পথে সুনিশ্চিত পদক্ষেপ রাখতে সমর্থ হলেন এই ভারত উপমহাদেশের এক বিজ্ঞানী আবদুস সালাম। এই কাজে তাঁব সহযোগী গবেষক ছিলেন অধ্যাপক স্টিভেন ভিলবার্গ।

এই দুই বিজ্ঞানী একক ভাবে গবেষণা করে প্রমাণ করলেন নিরপেক্ষ প্রবাহ্ বা নিউট্রাল কারেন্টের কথা। নিরপেক্ষ প্রবাহের অস্তিত্বই সুনিশ্চিত করে দিল একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পথ।

বিজ্ঞানী ভিলবার্গ ও সালাম তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে যে তত্ত্ব প্রকাশ করলেন, তা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন অপর এক বিজ্ঞানী। তাঁর নাম অধ্যাপক শেলডেন ভন গ্ল্যাশো।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই তিন প্রতিভার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে রয়াল সুইডিশ আকাদেমি তাঁদের যুগ্মভাবে ১৯৭১ খ্রিঃ পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে।

এই পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানী সালামের প্রতিভা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করল। বিশ্ববিজ্ঞানের অন্যতম সফল প্রতিভা রূপে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

বিজ্ঞানী সালামের জন্ম অবিভক্ত ভারতে ১৯২৩ খ্রিঃ। ১৯৪৭ খ্রিঃ দেশ বিভাগের পর তাঁর পরিবার পাকিস্তানের লাহোরের অধিবাসী হন।

কিন্তু তার আগে কলকাতাতেই তিনি বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা লাভ করেন। পরে পাঞ্জাবের লাহোরে প্রখ্যাত সরকারী কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা সমাপ্ত করেন সালাম।

সালামের পরবর্তী পড়াশুনার ক্ষেত্র ছিল ইংলন্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে ১৯৫৭ খ্রিঃ লন্ডনের ইমপিরিয়াল কলেজ অব সায়াব্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। তাঁর বিষয় ছিল তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞান।

এই কলেজে অধ্যাপনার ফাঁকেই সালাম ইতালিতে গড়ে তোলেন একটি গবেষণা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের নাম ইন্টারন্যাশানাল সেন্টার অব থিওরিটিক্যাল ফিজিকস।

অধ্যাপক সালাম এই বিজ্ঞান কেন্দ্রের সর্বময় অধিকর্তা। বর্তমানে এই সংস্থা বিজ্ঞানের অন্যতম গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এই কর্মক্ষেত্র ঘিরেই বর্তমানে চলেছে সালামের অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ। তিনি এখানেই নিরলস গবেষণায় মগ্ন হয়ে আছেন তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

পাশাপাশি দেশ বিদেশের বহু ছাত্র ও গবেষক তাঁর তত্ত্বাবধানে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে নিজেদের গবেষণার পথে এগিয়ে চলেছেন।

পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক সালাম ব্যক্তিগত জীবনে একজন ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ ভক্তিমান মানুষ।

তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে তথাকথিত বাধা হয়ে উঠতে পারেনি। গভীর ঈশ্বর বিশ্বাস থেকেই তিনি ব্যক্তিগত জীবনে লাভ করেছেন সরল ও অমায়িক চরিত্র।

লাহোরে সরকারী কলেজে সালামের অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন কলকাতার একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক। সালামের জীবনে এই অধ্যাপকের অবদান ছিল অপরিসীম।

বিজ্ঞান সাধনায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভের পর বিজ্ঞানী সালাম ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছিলেন কলকাতায় তাঁর শিক্ষাগুরুর পদপ্রান্তে।

বিখ্যাত অথচ বিস্মৃতপ্রায় সেই শিক্ষাগুরুকে সভক্তি প্রণাম জানিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

শিক্ষক ও ছাত্রের শাশ্বত পবিত্র সম্পর্ক সেদিন এই অবক্ষয়ের যুগে নতুন করে উজ্জ্বলতা লাভ করেছিল কৃতী বিজ্ঞানী সালামের চরিত্র মাধুর্যে।

পদার্থ বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে জানা গেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুকণা থেকে গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্ত কিছুর সৃষ্টি, রূপান্তর এবং কার্যকারণের মূলে রয়েছে চারটি বল বা শক্তির অসামান্য ও অপরিহার্য ভূমিকা।

সেগুলি হল মাধ্যাকর্ষণ বল, উইক ফোর্স বা দুর্বল বল, তড়িৎ চৌম্বক বল এবং স্ট্রংফোর্স বা প্রবল বল।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই চারটি বলই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুকে ধারণ করে আছে। এই চারটি বলের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেই বিজ্ঞানীরা ক্ষান্ত হননি। এদের মধ্যে একটি সমন্বয় সূত্র আবিষ্কারের জন্য আইনস্টাইন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের বহু বিজ্ঞানী গবেষণায় লিপ্ত হয়েছিলেন।

• কিন্তু তাঁদের আরব্ধ কাজটি অর্থাৎ উক্ত চারটি বলের সমন্বয় সূত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করলেন অধ্যাপক সালাম।

সৃষ্টিতত্ত্বে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব অসামান্য। এই শক্তি আছে বলেই চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে।

এই শক্তির প্রভাবেই পৃথিবীসহ সৌরমন্ডলের সকল গ্রহ উপগ্রহ তাদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

মাটিতে বোঁটা ছিঁড়ে গাছের ফল আকাশে উঠে না গিয়ে মাটিতে পড়ছে, সমুদ্রে সুনির্দিষ্ট নিয়মে জোয়ার-ভাঁটা হচ্ছে, মহাকাশের গ্রহনক্ষত্র, ধূমকেতু—সবই যে যার নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে কাজ করে চলেছে—এই সবকিছুর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, সমস্ত কিছুর মূলেই রয়েছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

এই মহাশক্তির অস্তিত্ব না থাকলে প্রকৃতির শৃঙ্খলার রাজ্যে কোন কিছুকেই আমরা সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীন দেখতে পেতাম না।

আপাত দৃষ্টিতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ক্ষমতার মধ্যে যতই চমৎকারিত্ব থাক না কেন, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে চারটি বলের মধ্যে সবচেয়ে কম ক্ষমতার অধিকারী হল মাধ্যাকর্ষণ বল। তাঁরা বলেছেন, পারমাণবিক কণার বল আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

যাইহোক, তড়িৎ চৌম্বক বলের প্রমাণ আমরা দেখতে পাই বেতার তরঙ্গ এবং আলোক তরঙ্গ সৃষ্টির মধ্যে।

তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্র যে পরস্পর বিছিন্ন নয়, তা প্রমাণ করে বিজ্ঞানী ম্যাকসওয়েল আমাদের দেখিয়েছেন, এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে হয়েছে অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

তড়িৎ চৌম্বক বল সৃষ্টির পেছনে রয়েছে বিদ্যুৎ এবং তড়িৎশক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। এই বলের শক্তি ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চেয়ে অনেকগুণ বেশি।

মাধ্যাকর্ষণ বা তড়িৎ চৌম্বক বলের অস্তিত্ব বাইরে থেকে বোঝা যায়। কিন্তু স্ট্রং ফোর্স বা প্রবল বল যাকে বলা হয় তাকে বাইরে থেকেবোঝার উপায় নেই। কেন না এই বল থাকে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াসের মধ্যে।

নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে প্রোটন এবং ইলেকট্রন। প্রোটন হল পজিটিভ বিদ্যুৎ আধান।

প্রতিটি প্রোটনকে ঘিরেই থাকে একটি তড়িৎ চৌম্বক বল। সব অণুর নিউক্লিয়াসেই থাকে একাধিক প্রোটন। ব্যাতিক্রম কেবল হাইড্রোজেন অণু।

যাইহোক, প্রোটনগুলি প্রতিটিই বৈদ্যুতিক গুণাগুণের বিচারে সমধর্মী। ফলে পরস্পারের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটিত কারণে নিউক্লিয়াস থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবারই কথা এবং সেক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটনেরই থাকবার কথা। কিন্তু

বাস্তবে দেখা যায়, প্রোটনকণাগুলি নিউক্লিয়াসের মধ্যে পারস্পরিকপ্রচন্ড আকর্ষণের ফলে জোটবদ্ধ অবস্থায় থাকে।

এই থেকেই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, তড়িৎ চৌম্বক বলের চেয়ে প্রোটনকণার পারস্পরিক আকর্ষণ বলের মাত্রা হাজার গুণ বেশি। এই বলই হল স্ট্রংফোর্স বা প্রবল বল।

দুর্বল বল যাকে বলা হয়, তার ভূমিকা উপরিউক্ত তিনটি বলের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন রকমের।

এই বলের প্রতিক্রিয়ায় মৌলকণার শক্তি কিছু মাত্রায় ক্ষরিত হয়ে যায় এবং ফলে স্থায়ী বা স্থিতিশীল মৌলকণায় রূপান্তরিত হয়।

আইনস্টাইন থেকে শুরু করে পরবর্তী সব মৌলকণা পদার্থ বিজ্ঞানীই চারটি বলকে গন্ডিনির্দিষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করে চলেছেন।

তাঁরা চাইছেন এমন একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, যার দ্বারা বলা যায় চারটি বলকে পৃথক বলে মনে হলেও তারা একই সত্তার বহুমুখী প্রকাশ মাত্র। এই তত্ত্বটিরই নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব।

বিজ্ঞানী সালাম তড়িৎ চৌম্বক বল এবং দুবল বলের মধ্যে একটা সমন্বয় আনতে সক্ষম হয়েছেন। এটাই তাঁর পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব। ১৯৬৩ খ্রিঃ অধ্যাপক সালাম এবং ভিলবার্গের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, তড়িৎ চৌম্বক এবং দুর্বল বলের প্রতিক্রিয়া একই বলসূত্রের দুটি ভিন্ন দিক।

অধ্যাপক সালাম এবং ভিলবার্গ নিরস্ত হননি। চারটি বলের মধ্যে সমন্বয় ঘটাবার সাধনায় তাঁরা এখনো নিরলস সাধনায় মগ্ন হয়ে আছেন।

একীকৃত ক্ষেত্র-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই দুই বিজ্ঞানীর সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ রয়াল সুইডিশ আকাদেমি ১৯৭১ খ্রিঃ দুই বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দারিদ্র্য দুঃখ ক্ষুধাপ্রপীড়িত মানুষের কাছে পাকভারত উপমহাদেশের বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আবদুস সালাম বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে এক প্রদীপ্ত আদর্শ স্বরূপ।

দৌলত সিং কোঠারি



মহাবিশ্বে সূর্যকে কেন্দ্র করে নানা কক্ষপথে নানা গ্রহ-নক্ষত্র অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। পরমাণুর গঠনটিও বলা চলে হুবহু একই রকম।

পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াসই হল সূর্য। গোটা পরমাণুর ওটিই হল মূলবস্তু। অবশিষ্ট অংশ মহাবিশ্বের শূন্যতার মতই একেবারে ফাঁকা। এই নিউক্লিয়াসটি আবার এক ধরনের ধন-বিদ্যুৎ আদানযুক্ত কণিকা অর্থাৎ প্রোটনের উপস্থিতির জন্য ধন বিদ্যুৎগ্রস্ত।

প্রোটন ছাড়াও রয়েছে একপ্রকার বিদ্যুৎহীন কণিকা পরমাণুর মধ্যে উপস্থিত, যার নাম নিউট্রন।

এই প্রোটন ও নিউট্রন অন্বিত নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে মহাকাশের গ্রহনক্ষত্রের নিজ নিজ কক্ষপথের মত শক্তিস্তর বা এনার্জি লেভেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রোটনের সমান সংখ্যার অতি-ক্ষুদ্র কণিকা ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রন হল প্রায় ভর-শূন্য ঋণবিদ্যুৎযুক্ত কণিকা।

এই পারমাণবিক সূর্য যাকে বলা হয়েছে, সেই নিউক্লিয়াসের তড়িৎ অঞ্চলটির ঋণ-বিদ্যুৎ-এর আবহের সঙ্গে প্রচণ্ড শক্তিতে এঁটে রয়েছে শক্তি স্তরীয় ইলেকট্রনেরা। প্রচণ্ড চাপে ইলেকট্রনেরা যখন নিউক্লিয়াসের প্রভাবমুক্ত হয় তখনই তারা খসে পড়ে পরমাণুর মহাশূন্যতায়।

কিন্তু পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, ধারণাতীত উষ্ণতায় পরমাণুকে বিচূর্ণ করার পরে কেবল ইলেকট্রনেরা নিউক্লিয়াসের সম্পর্কচ্যুত হয়ে পারমাণবিক মহাশূন্যতার গহ্বরে খসে পড়ে।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী দৌলত সিং কোঠারি চাপ আয়নীভবন বা Pressure Ionisation-এর তত্ত্ব আবিষ্কার করে জ্যোতির্পদার্থবিদদের দীর্ঘদিনের ভ্রান্তি দূর করে বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে সম্ভাবনাময় নতুন পথের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন।

ভারতের উত্তর প্রদেশের এক সাধারণ পরিবারে ১৯০৬ খ্রিঃ ৬ই জুলাই দৌলত সিং কোঠারির জন্ম।

সাধারণ পরিবারে জন্মালেও ছেলেবেলা থেকেই দৌলত ছিলেন অসাধারণ। স্কুলের পড়া রপ্ত করবার জন্য একবারের বেশি দ্বিতীয়বার পড়তে হত না তাঁকে। ফলে প্রচুর অবসর পেতেন।

কিন্তু সেই সময়টা সহপাঠীদের মত খেলাধুলা করে অপচয় করতেন না। স্কুলের পড়া তৈরির পরে যতটা সময় তিনি পেতেন ডুবে থাকতেন বিজ্ঞানের নানা বই পত্রের মধ্যে। স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি তাঁর ছিল বাঁধা।

পদার্থবিদ্যার প্রতিই দৌলতের ঝোঁক ছিল বেশি। তা-ই পরিণত হয়ে আধুনিক পদার্থবিদ্যার পারমাণবিক গবেষণার দিকে তাঁকে আকৃষ্ট করে।

বি.এসসি পাশ করে দৌলত ভর্তি হন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এসসি ক্লাসে। সেই সময় সেখানে পদার্থবিদ্যার ক্লাশ নিচ্ছেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা।

জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণার প্রবাদপুরুষ মেঘনাদ সাহার প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠেছিলেন দৌলত। ১৯২৭ খ্রিঃ ১৯২৮ খ্রিঃ এই দুই বছরে দৌলতকে গড়ে তোলেন মেঘনাদ সাহা। তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে ভারতীয় জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার ভাবীকালের সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতি।

ইতিমধ্যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করেছিলেন দৌলত। সেই সংবাদ জানতে পেরে শিক্ষাগুরু মেঘনাদ সাহা শিষ্যের জীবনের লক্ষ্য নির্বাচনে ভ্রান্তির জন্য মর্মাহত হন। তাঁর উপদেশে এবং নির্দেশে দৌলত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের চাকরির আর্থিক নিশ্চয়তা ও ক্ষমতার প্রলোভন ত্যাগ করে জ্যোর্তিবিদ্যার গবেষণায় স্বদেশভূমির গৌরববৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

এম. এসসি পাশ করবার পরে মেঘনাদ সাহার নির্দেশে দৌলত ইংলন্ড গমন করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় তাঁর পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা।

১৯৩৪ খ্রিঃ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে এসে দৌলত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

জগদ্বিখ্যাত পরমাণু পদার্থবিদ স্যার আর্থার এডিংটনের একটি প্রবন্ধ পড়ে দৌলত উদ্বুদ্ধ হন। তিনি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং আবিষ্কার করেন বৃহদায়তন এক সত্য। তাঁর আবিষ্কৃত সত্যটি হল, কেবলমাত্র চাপের প্রয়োগেই পরমাণুর বিভাজন সম্ভব। তবে এই চাপটি হওয়া দরকার একবর্গ ইঞ্চি পদার্থে কয়েক কোটি পাউন্ড।

এই অস্বাভাবিক চাপ পৃথিবীর মাটিতে সম্ভব নয়। তা আছে মহাবিশ্বের নাক্ষত্রিক জগতে—ডোয়ার্ফ স্টার বা বামনরূপী নক্ষত্রদের মধ্যে।

বামনরূপী নক্ষত্র হল তাদের পরমাণুর ঘনীভবনের বা শীতলতার পরিণতি। তাদের ভেতরের এই আয়তনিক অবস্থাটি গড়ে উঠেছে প্রচন্ড চাপে ও তাপে।

দৌলত আরও জানালেন, অকল্পনীয় বৃহদাকার নক্ষত্ররা ক্ষুদ্রাকার লাভ করে ভয়ঙ্কর সঙ্কোচনের ফলে। বামন নক্ষত্রগুলির সঙ্কুচিত অবস্থাটি হল ধারণাতীত শীতল অবস্থা।

বামননক্ষত্রের অভ্যন্তরীণ সঙ্কুচিত পদার্থের অবিশ্বাস্য চাপ নির্ণয় করে তাপীয় গতিবিদ্যায় বিদ্যুৎ-ধর্মগুলিকে যেভাবে দৌলত ব্যাখ্যা করেন তার ফলে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হল। দৌলত লাভ করলেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

দৌলত যখন উচ্চতর গবেষণার কাজে ব্যস্ত, সেই সময়টায় সবে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে ভারত স্বাধীন হয়েছে। নতুন ভাবে দেশ গঠনের প্রস্তুতি চলছে সকল দিকে।

১৯৪৮ খ্রিঃ দেশগঠনেরকাজে ডাক এল বিশ্রুত বিজ্ঞানী দৌলত সিং কোঠারিরও।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের চোদ্দ বছরের চাকরি ছেড়ে তিনি যোগ দিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের উপদেষ্টার পদে।

১৯৪৮ খ্রিঃ থেকে ১৯৬১ খ্রিঃ পর্যন্ত এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে কোঠারি প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পূর্ণ করেন। সেগুলো হল, প্রতিযোগিতা মূলক সমরাস্ত্রের সঠিক মান নির্ণয়, মারণাস্ত্রের ক্রমোন্নতি ও নতুন নতুন অস্ত্রের নকশা ও উদ্ভাবন পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণা।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাজে কোঠারির দূরদৃষ্টি বাস্তববুদ্ধি ও বিজ্ঞান সচেতনা ভারত সরকারের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

কোঠারি ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ও ভারতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কিত জাতীয় সংস্থার সহ-সভাপতি হয়েছেন। ১৯৬২ খ্রিঃ ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞান ছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করতে হয়েছে কোঠারিকে। এই বিষয়গুলো হল, ইলেকট্রনিক্স, পরিবেশ বিজ্ঞান, ধাতুবিদ্যা, মৃত্তিকাবিদ্যা, মরুবিস্তার রোধ, খাদ্য সুরক্ষা প্রক্রিয়া, মরু অরণ্যায়ন, বিমানচালনা-বিদ্যা ও গ্যাস টারবাইন।

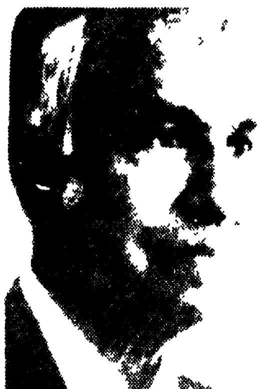
ভারতের সদ্যলব্ধ স্বাধীনতাকে ফলবান করে তুলবার সাধনায় কোঠারির অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও তার ফলাফল, পরিসংখ্যানভিত্তিক তাপীয় গতিবিদ্যা ও শুভ্র বামন নক্ষত্রদের তত্ত্ব—কোঠারির এই জ্যোতির্গবেষণা প্রবন্ধগুলি বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে। প্রথম প্রবন্ধটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কোঠারি বলেছেন, পারমাণবিক শক্তিকে অস্ত্র হিসাবে গড়ে না তুলে যদি মানবকল্যাণে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা যায় তবে বিশ্বের মহৎ উন্নতি সম্ভব।

১৯২২ খ্রিঃ ভারতের জ্যোতির্গবেষণার অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দৌলত সিং কোঠারি পরলোক গমন করেন।

সুব্রহ্মানিয়ম চন্দ্রশেখর



যে সব বিজ্ঞান-মনীষীর জীবন-সাধনার আলোয় যুগ যুগ ধরে মানব সভ্যতা আলোকিত হয়েছে, পেয়েছে অগ্রগমনের বেগ, সেই মহাবিজ্ঞানীদের একজন সুব্রহ্মানিয়ম চন্দ্রশেখর। তিনি তাঁর গণিতশাস্ত্রের হিসেব দিয়ে মহাকাশের জ্যোতির্মণ্ডলের রহস্য উন্মোচন করেছিলেন। তাঁর অচিন্তনীয় গবেষণার দানে সমৃদ্ধ হয়েছে বিশ্ববিজ্ঞানের ভাণ্ডার।

তাঁর গবেষণার ফলেই আজ আমাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়েছে নক্ষত্রের গঠন, নক্ষত্রের জীবনচক্র, নক্ষত্রের শেষ পরিণতি, ব্ল্যাকহোল প্রভৃতি তত্ত্ব সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য।

তাঁর সাধনার আলোয় আলোকিত হয়েছে বিশ্ববিজ্ঞানের অঙ্গন, গৌরবদীপ্ত হয়েছে স্বদেশ-স্বজন।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যম হয়ে চন্দ্রশেখরকে অভিনন্দিত করেছে ১৯৮৩ খ্রিঃ পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার।

অবিভক্ত ভারতের লাহোরের এক তামিল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন চন্দ্রশেখর ১৯১০ খ্রিঃ ১০ই অক্টোবর।

পরবর্তীকালে তাঁদের পরিবার লাহোর ছেড়ে চলে আসে মাদ্রাজে। এখানেই শুরু হয় চন্দ্রশেখরের শিক্ষাজীবন।

শিক্ষার আলোকে আলোকিত পারিবারিক পরিবেশে মা ও বাবার উৎসাহেই বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলেন চন্দ্রশেখর। সেই সঙ্গে তৈরি হয়েছিল তাঁর পড়ার অভ্যাস। মনের মত বই পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে ডুবে যেতেন সেই বইতে।

বিজ্ঞানীর জীবন-কথা, আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর গল্পের প্রতিই বেশি আকর্ষণ বোধ করতেন চন্দ্রশেখর। এই ভাবেই একদিন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল রসায়ন, অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যার মুক্ত অঙ্গনের প্রান্তে।

এসব বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একসময় আপনা থেকেই আগ্রহ বাড়ল অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যার বইয়ের দিকে। স্কুল লাইব্রেরিতে এই সম্পর্কে যত বই ছিল, একে একে খুঁজে খুঁজে সব পড়া হয়ে গেল তাঁর। কতক বুঝলেন, কতক বুঝলেন না, সব সমাধানেরই নাগাল পেলেন এমনও নয়—কিন্তু তাতে আকর্ষণ টলল না এতটুকু।

অঙ্ক পেলেই কোমর বেঁধে কষতে বসে যান। যত দুরূহ হয় অঙ্কের সমাধান ততই তাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। সমস্যা নিয়ে বিভোর হয়ে থাকতেই যেন তাঁর আনন্দ।

এই যে ছেলের অবস্থা তাঁর কৈশোরের চাঞ্চল্য প্রকাশ করবার সুযোগ কতটুকু? সহপাঠীরা যেই সময়ে খেলাধুলায় বা অন্য আমোদ-আহ্লাদে সঙ্গীদের নিয়ে মেতে থাকছে, সেই সময়ে ঘরের বা লাইব্রেরির নিভৃতে বসে বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের পাতার পর পাতা উল্টে তার সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করার কাজে ব্যস্ত চন্দ্রশেখর।

এই ভাবেই চন্দ্রশেখর আধুনিক পদার্থবিদ্যার যুগান্তকারী ঘটনাগুলির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করলেন। রন্টজেনের এক্স-রে, জে.জে.টমসনের ইলেকট্রন, কুরি পরিবারের তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়াম ও পোলনিয়াম, রাদার ফোর্ডের পরমাণুর কেন্দ্রকণা নিউক্লিয়াস ইত্যাদির নাগাল ধরে ফেললেন তিনি একে একে।

এই সব জগৎ-কাঁপানো আবিষ্কারের সূত্র ধরে কাজ করে চলেছেন দুই জগদ্বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ আর্নল্ড সোমার ফিল্ড এবং আর্থার কম্পটন। আধুনিক পদার্থবিদ্যায় তাঁদের নতুন নতুন ব্যাখ্যা বিজ্ঞান জগতে থেকে থেকে তুলছে আলোড়ন।

এই সব তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছেন তরুণ চন্দ্রশেখর। মাত্র আঠার বছর বয়সেই পদার্থবিদ্যার নানা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার অভ্যাস তৈরি হয়ে ওঠে তাঁর। এক সময়ে গণিতের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করে ফেললেন আধুনিক পদার্থবিদ্যার এক জটিল তত্ত্ব।

অন্ধিসন্ধি কিছুই তাঁর অজানা নয়। প্রবন্ধটি পাঠিয়ে দিলেন ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স নামের বিজ্ঞান পত্রিকায়। যথাসময়ে প্রবন্ধটি ছাপাও হল বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে চন্দ্রশেখর বি.এ. পাশ করলেন ১৯২৮ খ্রিঃ। ততদিনে গাণিতিক পদার্থবিদ্যার ওপরে একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ তৈরি হয়ে গিয়েছে তাঁর। বইকে সঙ্গী করে নিজেই পথ দেখিয়ে চলেছেন নিজেকে।

স্নাতকোত্তর পাঠ নেবার জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন চন্দ্রশেখর। এবারে আধুনিক পদার্থবিদ্যার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়ে উঠল।

এল ১৯৩০ খ্রিঃ। পদার্থ বিদ্যায় এম.এ পাশ করলেন চন্দ্রশেখর। এই সময় তাঁর বয়স ত্রিশ।

এবারে বাইরের জগতে সঞ্চরণের পালা। দুস্তর পথ সামনে, বিস্তৃত আকাশ মাথার ওপরে। সেই সময়ে এম.এ পাশ করবার পর মধ্য বিত্ত পরিবারের ছেলেরা লোভনীয় সরকারী চাকরির লোভে প্রথমেই প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় বসে যেত।

চন্দ্রশেখরের পরিবারেও সেই রেওয়াজ। নিজের বাবা উচ্চ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত। এক কাকা সি.ভি.রামন দুরন্ত বিজ্ঞান প্রতিভা থাকা সত্বেও ১৯১০ খ্রিঃ অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত আর চাকরিতে থাকেননি।

কলকাতার কালটিভেশন অব সায়েন্সে গবেষণায় মেতে গিয়েছিলেন। পরে গবেষণার স্বার্থে সরকারি চাকরি ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ নিয়েছিলেন।

সেই কাকাই ১৯৩০ খ্রিঃ রমন-বর্ণালী আবিষ্কারের সূত্রে বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

চোখের সামনেই রয়েছে এমন একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। কাজেই বিশেষ চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন হল না, ভবিষ্যতের পথ নির্দিষ্ট করে ফেললেন।

পরিবারের আর্থিক অবস্থার চাহিদা অগ্রাহ্য করেই চাকরির চিন্তাভাবনা প্রয়োজন হল না। চন্দ্রশেখর নিজের মাথা থেকে দূর করলেন। যে করেই হোক তাঁকেও বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ স্থানটি দখল করতে হবে।

নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে। এজন্য যদি আর্থিক কৃচ্ছ্রতায় চরম দুঃখকেও বরণ করতে হয় তিনি পেছপাও হবেন না।

প্রেসিডেন্সিতে পড়বার সময় সহপাঠিনীরূপে পেয়েছিলেন ললিতাকে। তার উৎসাহই প্রেরণা জোগাল চন্দ্রশেখরকে। ললিতা তাঁর বিজ্ঞানপ্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাবতী। সে-ও স্বপ্ন দেখে, বিশ্ববিজ্ঞান সভায় একদিন স্বীকৃতি লাভ করবেন চন্দ্রশেখর।

লতিতার প্রেরণাতেই রামন ছাত্র-বৃত্তির ব্যবস্থা করে নিলেন ঘোরাঘুরি করে। ১৯৩১ খ্রিঃ দেশ ছেড়ে পাড়ি জমালেন ইংলন্ডে।

এখানে এসে গবেষণা শুরু করলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই, ২৩ বছর বয়সে ডক্টরেট হলেন।

এতদিনে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যায় হাত দিয়েছেন চন্দ্রশেখর। এই সময় এই বিভাগে দোর্দন্ড প্রতাপে বিরাজ করছেন এডিংটন, ডির‍্যাঁক, বোর, বেখে, মিলনে, কম্পটন ও সোমারফিল্ডের মত পদার্থবিদ্যার স্বনামধন্য প্রতিভা।

রিজ্ঞানীরা তখন মেতে উঠেছেন মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিচয় উদঘাটনের চেষ্টায়। যে প্রশ্ন তাঁদের বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে তা হল, মহাজগতের দেদীপ্যমান সংখ্যাতীত নক্ষত্রমন্ডলী—এদের অবস্থান কি নিত্য অপরির্তনীয়? আর এদের অন্তহীন আলোর উৎসই বা কি?

সূর্য সম্পর্কে ততদিনে পদার্থবিদরা জেনে গেছেন যে আবহমান কালের অমিততেজ যে সূর্য, তার আলোর রহস্য আর কিছুই নয় সূর্যের ভেতরের এক তেজস্ক্রিয় ঘটনারই পরিণতি।

প্রতিনিয়ত সেখানে চারটি করে হাইড্রোজেন পরমাণুর সম্মিলনে গড়ে উঠছে একটি হিলিয়াম পরমাণু, আর হাইড্রোজেনের অবশিষ্ট ভর রূপান্তরিত হচ্ছে শক্তিতে। এই শক্তিই সূর্যকিরণ হয়ে পৃথিবীতে জেগে রয়েছে সমস্ত শক্তির উৎস হয়ে।

এই সূত্র ধরেই এগিয়ে চলার পথ পেয়ে যান চন্দ্রশেখর। তাঁর মনে হয় নক্ষত্রের আলোকের ব্যাখ্যাও কি সূর্যেরই অনুরূপ?

এই প্রশ্ন মাথায় নিয়ে সমকালীন বিজ্ঞানীদের গবেষণা হাতড়াতে শুরু করলেন চন্দ্রশেখর। পেয়ে গেলেন লিউক্রিটাস নামের এক পদার্থবিদের সন্ধান। তিনি এক জায়গায় স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন,We must belive that Sun, Moon and Stars emit light, from fresh and ever fresh supplies rising up.

কোন এক সদ্যোজাত শক্তির ভান্ডার থেকে আহৃত আলোই সূর্য, চন্দ্র ও তারা বিকীরণ করে চলেছে।

এ পর্যন্ত এসেই লিউক্রিটাস ও অন্যান্য পদার্থবিদগণ থমকে গেছেন। যেটাকে তাঁরা সদ্যোজাত শক্তি বলেছেন, সেই শক্তির প্রাকৃতিক ভান্ডারের রহস্য সম্পর্কে কোন আলোকপাত করতে পারেন নি। তখনো পর্যন্ত নিউক্লিয়ার এনার্জি বা পরমাণু শক্তির রহস্য জানা ছিল না বলেই পদার্থবিদগণ শক্তির প্রাকৃতিক উৎসের রহস্যের কূলকিনারা করতে পারেন নি।

গবেষণায় নেমে চন্দ্রশেখর নক্ষত্রের প্রকৃত জীবনচক্র ব্যাখ্যায় পরমাণুর আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আশ্রয় করে একে একে গণিত মডেল তৈরি করে চললেন।

তিনি দেখতে পেলেন, সৌরবিশ্বের সূর্যের মত, মহাবিশ্বের নক্ষত্ররা নিজেদের আলো সমানভাবে বিকিরণ করতে পারছে না। সেখানে আলোর ক্ষয়িষ্ণুতা বর্তমান।

এছাড়া এদের অবস্থানও যে নিত্যকালের জন্য এ ধারণারও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

তাদের অভ্যন্তরস্থ পরমাণু কেন্দ্রক নিঃসৃত শক্তি কমতে কমতে একদিন যে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেইকালে নক্ষত্রের গভীরে ঘটবে গঠনগত বিশাল এক পরিবর্তন।

সৌরপদার্থের ভেতর থেকে সেই পরিবর্তন নিয়ে আসবে এক অভাবিত রূপান্তর গোটা নক্ষত্র জুড়ে।

এভাবেই শেষ হবে নক্ষত্রের আয়ুষ্কাল। কিন্তু যেহেতু নক্ষত্র, তার শেষের সে দিনও দীর্ঘায়িত অসম্ভব রকমের।

হাতের কাছে সূর্যই হল তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে, কমবেশি পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। এই সময় সীমার বহু কোটি বছর আগে

থেকেই, পৃথিবীর বুকে আলো ছড়িয়ে চলেছে সূর্য, এখনো তেজে-বিক্রমে সে অনন্য।

আসলে মহাজাগতিক আলো ও মহাকর্ষজ টান থেকে উপজাত বলেই এই আলো ও তাপ নিয়ে নক্ষত্রেরা অমিত আয়ুষ্মান।

এই ভাবেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চলেন চন্দ্রশেখর। যত অগ্রসর হন, ততই দেখতে পান নক্ষত্রদের গঠনগত সর্বশেষ রূপান্তর একই রকমের।

প্রথমে ঘটে অভ্যন্তর ভাগের ক্রমঃসঙ্কোচন। এই টানই নক্ষত্রের ওপরের অংশে ঘটায় প্রসারণ।

বাইরের দিকের প্রসারণ ও ভেতর ভাগের সংকুচিত দশায় অতিকায় আকারে মহাবিশ্বে ধাবমান থাকে।

সেই অবস্থায় তার চারপাশে নাগালের মধ্যে যত গ্রহ উপগ্রহ থাকে সব কিছুকেই আত্মসাৎ করে।

কোনও এক সূদূর ভবিষ্যতে সূর্যেরও যখন এমনি পরিণতি আসবে তখন তার সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ বুধ সবার আগে পড়বে তার কবলে। এই ভাবেই ধীরে ধীরে একে একে আমাদের পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, ইউরেনাস, প্লুটোও কবলিত হবে সূর্যের।

অনন্তকাল ধরে যে সূর্য ছিল রক্ষক, সেদিন তার হাতেই ধ্বংস হবে নবগ্রহমন্ডলী। তারপর মহাজাগতিক এক মহাভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে সূর্যের অস্তিত্ব।

এমনি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই চন্দ্রশেখর গড়ে তুললেন সুপারনোভা তারা তত্ত্ব। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা সৌর পদার্থবিদদের আন্তর্জাতিকমহলে বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা এনে দিল তাঁর। মাত্র ২৭ বছর বয়সেই এই স্বীকৃতি লাভ করলেন চন্দ্রশেখর।

কেমব্রিজে অবস্থানকালেই চন্দ্রশেখর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ারকিস মানমন্দির থেকে সুপারনোভা সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেলেন।

আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মানমন্দিরের কর্ণধার ও বিশ্রুত বিজ্ঞানী ডক্টর অটো স্ট্রভে। স্ট্রভে এমন এক পরিবারের মানুষ সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সৌরবিজ্ঞানী মহলে যার পরিচয় সৌরবিজ্ঞানী পরিবার নামে প্রসিদ্ধ।

স্ট্রভের ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ প্রত্যেকেই ছিলেন প্রথিতযশা সৌরবিজ্ঞানী। অটো স্ট্রভে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর গবেষণায় তাঁর বাপ ঠাকুর্দার কৃতিত্বকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যপদ লাভের পর স্ট্রভে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এখানে সমবেত করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন।

অনুরূপ ভূমিকা পালন করতে আমাদের দেশেও দেখেছি একজন অমিত প্রতিভাধর শিক্ষাবিদ মনীষীকে। তিনি হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির স্বার্থে তিনি ভারতের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিভাবান বিজ্ঞানমনস্ক তরুণদের টেনে নিয়ে এসেছিলেন এখানে। তাঁর দেওয়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে বহাল হয়েই জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন রামন, কৃষ্ণান প্রমুখের মত আরও অনেক প্রতিভা।

ক্ষণজন্মা আশুতোষের দূরদৃষ্টি এমনি করেই আবিষ্কার করেছে ভবিষ্যৎ কালের কত মহাবিজ্ঞানীকে। উন্মোচন করে দিয়েছেন তাঁদের আত্মপ্রকাশের পথ।

ঠিক একই ভাবে স্ট্রুভে আবিষ্কার করেছিলেন চন্দ্রশেখরকে। পাঠিয়েছিলেন বক্তৃতার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি।

চন্দ্রশেখর এলেন ইয়ারকিস মানমন্দিরে। তাঁর সুপারনোভা সম্পর্কিত বক্তৃতা শুনে অভিভূত হলেন স্ট্রুভে। একই রীতিতে তিনিও ভাল মাইনের উচ্চপদে বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনে নিলেন চন্দ্রশেখরকে।

এর কিছুদিন পরেই মাদ্রাজে এলেন চন্দ্রশেখর। ললিতা তাঁর পথ চেয়েই বসেছিলেন। তাঁকে জীবনসঙ্গিনী করে চন্দ্রশেখর আবার ফিরে গেলেন বিদেশের কর্মক্ষেত্রে।

যথারীতি বসে গেলেন গবেষণার টেবিলে মহাকাশের নাক্ষত্রিক ক্রিয়াকর্মের হিসেব কষাতে।

নক্ষত্রের মৃত্যুদশার পর থেকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন তিনি। লক্ষ্য করলেন জ্বালানি নিঃশেষ হবার পরে নক্ষত্রের মধ্যে যে সংকোচন ক্রিয়া অর্থাৎ শীতল হওয়ার ক্রিয়া ঘটতে থাকে একটি নির্দিষ্ট অবস্থা পর্যন্ত গিয়ে তার বেগ মন্দীভূত হয়।

অবশ্য নক্ষত্রের সঙ্কোচনের ভর সূর্যের ভরের ১.৪৪ গুণ কম হলেই এই অবস্থা সম্ভব হয়ে ওঠে। নক্ষত্রের এই অবস্থাকে বলে হোয়াইট ডোয়ার্ফ স্টেজ বা শুভ্র বামন দশা।

যখন নক্ষত্রের সঙ্কুচিত ভর সূর্যের ১.৪৪ গুণের বেশি হয় তখনই ঘটে বিপর্যয়। প্রচন্ড বিস্ফোরণে আলোর অস্বাভাবিক বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে চিরকালের মত নক্ষত্র হারিয়ে যায় মহাকাশে।

বিলীনকালের প্রাক মুহূর্তে আলোর যে প্রদীপ্ত অবস্থাটি তারই নাম হল সুপারনোভা (supernova)।

সূর্যের যে ১.৪৪ গুণ ভরের সীমারেখা এই আবিষ্কারই চন্দ্রশেখরের সমূহ আবিষ্কারের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত। তাঁর নামানুসারেই চন্দ্রশেখরের সীমা বা

Chandra Sekhar's Limit নামকরণ করা হয়েছে সূর্যের ১.৪৪ গুণ ভরের সীমাকে।

১৯৩৯ খ্রিঃ চন্দ্রশেখরের গ্রন্থ An Introduction to the study of Steller Structure প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বজুড়েবিজ্ঞানমনস্ক মানুষের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সমাদর লাভ করে এই গ্রন্থ। বিশ্বের মানুষ পরিচিত হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় চন্দ্রশেখরের অবদানের সঙ্গে।

চন্দ্রশেখরের আর একটি অবিস্মরণীয় আবিষ্কার কৃষ্ণগহ্বর তত্ত্ব বা ব্ল্যাক হোলস।

নক্ষত্র বা সৌরপদার্থরা সঙ্কুচিত বা শীতল হতে হতে অতি কঠিন ও অবিশ্বাস্য ওজনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবস্থা লাভ করে। এই অবস্থান্তরের প্রকৃতি কেমন? সেই সন্ধানে বসেই গাণিতিক পথে এক অভাবনীয় তত্ত্বের সন্ধান পেয়ে যান চন্দ্রশেখর। তার নাম দিলেন ব্ল্যাক হোলস।

তিনি দেখালেন যে সাধারণ চামচে সংকুলান হয় এমন পদার্থ প্রচন্ড সঙ্কুচিত অবস্থায় কয়েক টন পর্যন্ত ওজন লাভ করতে পারে।

এই ব্ল্যাকহোলসের ওপরে লেখা চন্দ্রশেখরের বই Mathematical Theory of Black Holes প্রকাশিত হয়েছে বেশিদিন হয়নি। ১৯৮৩ খ্রিঃ । এই বছরেই পদার্থ বিদ্যায় অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে উইলিয়াম ফাউলারের সঙ্গে যুগ্ম ভাবে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

নোবেল প্রাপ্তির আগেই তাঁর অবদানের জন্য চন্দ্রশেখর বহু সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় সৌরপদার্থবিদ্যা বা Theoretical Physics বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেছেন। অ্যাস্ট্রোফিজিক্স জার্নাল হল আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছেন চন্দ্রশেখর।

১৯৫২ খ্রিঃ পেয়েছেন ব্রুস স্বর্ণপদক; বিখ্যাত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান রয়াল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি প্রদত্ত স্বর্ণপদক, ১৯৫৭ খ্রিঃ আমেরিকান আকাদেমি অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স-এর রামফোর্ড পদক।

লন্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো হয়েছেন ১৯৬২ খ্রিঃ। এছাড়া কর্মজীবনে যে পেয়েছেন উচ্চপদ ও প্রতিষ্ঠা তা বলাইবাহুল্য।

চন্দ্রশেখরের কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ইয়ারকিস মানমন্দিরে রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট হিসাবে ১৯৩৭ খ্রিঃ।

এখানে স্ট্রভে ছিলেন তাঁর গবেষণার প্রধান প্রেরণাদাতা। তাঁরই উদ্যোগে এবং স্বকীয় গবেষণা প্রতিভার যোগ্যতাবলে তিনি ক্রমে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানের পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

১৯৩৯খ্রিস্টাব্দের পর চন্দ্রশেখর নানা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনার কাজে হাত দেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল Principles of Stellar Dynamics (১৯৪২), Rediative Transfer (১৯৫০) , Hydrodynamic and Hydramagnetic stability (১৯৬২) ; Ellipsoidal figure of Comilibrium (১৯৬৯) ইত্যাদি।

নক্ষত্রের আবহাওয়া, নক্ষত্রের ভর ও নক্ষত্রের গতি সম্পর্কে চন্দ্রশেখরের গবেষণা পদার্থবিজ্ঞানে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। দেশ বিদেশের বহু গবেষক তাঁর অনুসরণে গবেষণার কাজে ব্রতী হয়েছেন। এখানেই চন্দ্রশেখরের কাজের সার্থকতা।

আকাশের নীল রং ও তরল ভরের ঘূর্ণন সম্পর্কে চন্দ্রশেখরের গবেষণাও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতিও সুবিস্তৃত।

হরগোবিন্দ খোরানা



বিশ্ববিজ্ঞানের এক মহৎ বিজ্ঞানীর নাম হরগোবিন্দ খোরানা। বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রায়পুর গ্রামে ১৯২২ খ্রিঃ ৯ই জানুয়ারী হরগোবিন্দের জন্ম।

ভারত ভাগের আগে রায়পুর গ্রামটি ছিল ভারতের মধ্যে। নিতান্ত অল্পকিছু মানুষের বসতি নিয়ে ছোট্ট একটি গ্রাম।

হরগোবিন্দের বাবা কাজ করতেন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কৃষি আয়করের হিসাব রক্ষকের পদে। সামান্য লেখাপড়া জানতেন। গোটা গ্রামে তিনিই ছিলেন একমাত্র লেখাপড়া জানা মানুষ।

লেখাপড়া বেশিদূর না থাকলেও হরগোবিন্দের বাবা ছিলেন বিদ্যোৎসাহী মানুষ। নিজের পাঁচটি ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার প্রতি তাই তাঁর যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা ছিল। গল্পচ্ছলেই তিনি নানা বিষয়ের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন।

সাহিত্য, পৃথিবীর নানা দেশের ইতিহাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের শিক্ষা হরগোবিন্দ পেয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে।

রাতে বিছানায় বসে বাবাকে ঘিরে ভাইবোনেরা শুনতেন নানা মনীষীর জীবনকথা, নানা বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর গল্প।

এই সব শুনে শুনেই খোরানা স্বপ্ন দেখতে শিখেছিলেন বড় আবিষ্কারক বিজ্ঞানী হবার।

ছেলেবেলায় হরগোবিন্দকে পড়তে যেতে হতো গ্রাম থেকে অনেক দূরে এক টোলে। স্কুলঘর বলতে কিছুই ছিল না। এক পিপুল গাছের ছায়ায় বসত সেই টোল। পড়াতেন এক পন্ডিতমশাই।

পশ্চিম পাঞ্জাবের একটি শহরের নাম মূলতান। শৈশবে এই শহরের ডি.এ.ভি স্কুলে ভর্তি হন হরগোবিন্দ। তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ এখানেই পেয়েছিল অনুকূল আবহাওয়া।

পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ বরাবরই, হাতের সামনে যে বই পান তাই মনোযোগ দিয়ে পড়েন হরগোবিন্দ। সব বিষয়েই জানার উৎসাহ প্রবল।

কিন্তু রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের প্রতিই ঝোঁক বেশি। ডি.এ.ভি স্কুলে যেই শিক্ষক মশাই বিজ্ঞান পড়াতেন তাঁর নাম রতনলাল। বিজ্ঞানের বিষয় সবই যেন তাঁর গিলে খাওয়া। ছাত্রদের এমন সুন্দর করে বোঝান যে বিষয়গুলো ছবির মত তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বিজ্ঞানের মূল ভিত যে যুক্তি ও বিচার তাও তিনি ছাত্রদেব খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর পড়াবার গুণে অতি সাধারণ মাপের ছাত্রও বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বোধ না করে পারত না।

এই রতনলাল স্যারের বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্লাশই হরগোবিন্দর বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসু মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা লাভের সঙ্কল্প এই সময়েই তাঁর মনে অঙ্কুরিত হয়।

স্কুলের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে হরগোবিন্দ চলে এলেন লাহোরে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। রসায়নে অনার্স নিয়ে শুরু হল তাঁর বিজ্ঞানের উচ্চতর পড়াশোনা।

অসাধারণ মেধা নিয়ে জন্মেছিলেন হরগোবিন্দ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আগ্রহ ও কৌতূহল । ফলে রসায়নের কঠিন কঠিন বিষয় অতি সহজেই তাঁর কাছে সহজ হয়ে উঠত।

জৈবরসায়নে হরগোবিন্দর ওই সময়েই এমন অসাধারণ দখল এসে গিয়েছিল যে বিস্মিত হতেন অধ্যাপকরা।

অনার্স নিয়ে স্নাতক হবার পর এই বিশ্ববিদ্যালয়েই রসায়ন নিয়ে স্নাতকোত্তর ক্লাশ শুরু করলেন।

এই সময় থেকেই জীবনের লক্ষ্যটি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাঁর। আবাল্যের সুপ্ত ইচ্ছা একটা পরিষ্কার রূপরেখা লাভ করেছিল।

ভবিষ্যতে একজন বড় বিজ্ঞানী হতে হবে তাঁকে। নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে চমক সৃষ্টি করতে হবে সারা বিশ্বে।

হরগোবিন্দর রসায়ন প্রীতি ও উচ্চকাঙ্ক্ষা ধরা পড়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত অধ্যাপক মোহন সিং-এর চোখে। ছাত্রের চোখে ভেসে বেড়ানো স্বপ্ন যেন তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। এই জ্ঞানময় গবেষণামনস্ক অধ্যাপক পরম স্নেহে কাছে টেনে নিলেন হরগোবিন্দকে

বিজ্ঞানের মূল চাবিকাঠি যে তার প্রয়োগক্ষেত্রে একের পর এক পরীক্ষা আর বিশ্লেষণের মুঠোবন্দি তা তিনি ভাল করে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করলেন না।

ল্যাবরেটরিতে হাতে কলমে পরীক্ষার কাজে লেগে থাকলেই যে বিজ্ঞানের সত্য আপনা থেকে এসে ধরা দেবে এই সত্যটি মন্ত্রের মত হরগোবিন্দর মনে প্রোথিত করে দিয়েছিলেন মোহন সিং।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কঠিন সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয় তার নাম পরীক্ষা। কাজেই পড়ার সঙ্গে পরীক্ষাটি রাখতে হবে পাশাপাশি। তবে বিজ্ঞানের পাঠ নেওয়া হবে সার্থক, নচেৎ না।

এম.এ. ক্লাশে পড়তে পড়তে নতুন উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন হরগোবিন্দ। কঠিন শপথ উচ্চারিত হয় মনে।

উত্তর জীবনে যখন হরগোবিন্দ ডঃ খোরানা হয়েছেন, সেই সময় বহুক্ষেত্রেই তিনি তাঁর স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের এই দুই মহৎ শিক্ষকের কথা ভক্তিনম্র কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বিবৃত করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে ১৯৪৫খ্রিঃ। সেই সময়েই এম.এসসি ডিগ্রি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুলেন খোরানা।

বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন—বিজ্ঞানের উচ্চতর পঠন-পাঠনের সুযোগ পশ্চিমের মত এদেশে কোথায়? এই সুযোগ তাঁকে নিতেই হবে। দেশাত্মবোধ আঁকড়ে দেশের মাটিতে পড়ে থাকলে স্বপ্ন কোনদিনই যে সফল হবে না, তা উত্তম রূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি।

কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে ভারত সরকারের মেধা-বৃত্তির ব্যবস্থা করে ফেললেন। বৃত্তির টাকা ভরসা করেই পাড়ি জমালেন ইংলন্ডে।

এখানে এসে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত রসায়ন অধ্যাপক ডক্টর রোজার জে.এস.বিয়ারের তত্ত্বাবধানে শুরু হল খোরানার ডক্টরেটের কাজ।

তরুণ খোরানার উৎসাহ ও পরিশ্রম লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেন অধ্যাপক বিয়ার। খুশি হলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ লক্ষ্য করে। অবিলম্বেই এক বিশ্ববিজ্ঞানীর উজ্জ্বল সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টিতে। তিনি তাঁর এই বিদেশী ছাত্রটির প্রতি আরও বেশি আকর্ষণ অনুভব করলেন।

পশ্চিমের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে খোরানার বিশেষ কোন ধারণাই ছিল না। অধ্যাপক বিয়ারের সহৃদয় সাহচর্য ও প্রেরণায় বিদেশের নতুন পরিবেশের দ্বিধা সঙ্কোচ অল্পদিনের মধ্যেই কাটিয়ে সহজ হয়ে উঠবার প্রেরণা পেলেন।

১৯৪৮খ্রিঃ জৈব রসায়নে ডক্টরেট লাভ করলেন খোরানা।

এরপর পোস্ট ডক্টরাল কাজ করলেন সুইজারল্যান্ডের জুরিখের বিখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র ইউজেনসিক টেকনিক ইস্কুলে—অধ্যাপক ভ্লাদিমির প্রেলোগের সহযোগী হিসেবে। এখানে কাজ করবার সময়েই খোরানার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

জুরিখ থেকে দেশে ফিরে এলেন ১৯৪৯খ্রিঃ। ততদিনে দেশভাগের মর্মান্তিক সেই ঘটনা সম্পূর্ণ। প্রিয় জন্মভূমি রায়পুর, কৈশোর যৌবনের লাহোর ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় সবই হয়ে গেছে বিদেশ।

বেদনায় মুষড়ে পড়লেন খোরানা। রাতারাতিই যেন আমূল পাল্টে গেল একটা গোটা দেশের ভূগোল।

স্বাধীন ভারতের কর্ণধার তখন পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু। বিধ্বস্ত, খন্ডিত ভারত তাঁর নেতৃত্বে ধীরে ধীরে হাঁটতে শিখছে। কলকারখানা, নানা শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠতে শুরু করেছে নানা দিকে।

প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ভারতের বিজ্ঞান গবেষণার ভিত্তি রচনার কাজে নিয়োজিত হয়েছেন ভাবা, রামন, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের মত খ্যাতকীর্তি বিজ্ঞানী।

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণার সুযোগ বেড়ে উঠছে ক্রমাগত।

সেই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তরুণ প্রতিভাবানদের কাজের সুযোগ ও চাহিদা বৃদ্ধি হচ্ছে। দেশ গড়ার কাজে জেগে উঠেছে উন্মাদনা।

বিদেশ থেকে বিজ্ঞানের ডক্টরেট নিয়ে ফিরেছেন খোরানা। দেশ গড়ার কাজে তাঁরও তো একটা ভূমিকা আছে।

মনের মত একটা চাকরি পেলে তাকেই তিনি তাঁর দেশ সেবার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।

কিন্তু খোরানা অনেক চেষ্টা করেও একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলেন না। তরুণ গবেষক তিনি, প্রথমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ঢুঁ মারলেন।

হতাশ হয়ে কিছুদিন ঘুরলেন নানান বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায়। যদি সামান্য একটা লেকচারারের চাকরিও জোটানো যায়। কিন্তু কোথাও কোন আশার আলো দেখতে পেলেন না।

শেষ ভরসা ছিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়। সেখান থেকেও যখন প্রত্যাখ্যান এল, ততদিনে খোরানা বুঝে গেছেন, এই পোড়ার দেশে যোগ্যতার চেয়ে ধরাধরির বাহাদুরিটাই প্রাধান্য পায়।

সদ্য স্বাধীন একটা দেশের গড়ে ওঠার পথে চেতনা ও দায়িত্বের এই অন্তঃসারশূন্যতা দেখে পীড়িত না হয়ে পারলেন না খোরানা। কিন্তু কি করবার আছে তাঁর?

নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী সকলকেই তাঁর মনে হল বাকসর্বস্ব যন্ত্রমাত্র। না আছে এদের স্বদেশ চেতনা, না আছে আন্তরিকতা ও দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ। এই দেশে তাঁর ঠাঁই হবার নয়।

দেশবাসীর কাছ থেকে এমন ব্যবহার খোরানার স্বপ্নের অতীত ছিল। অনেক ঠেকে তাঁকে জীবনের এক নির্মম অভিজ্ঞতা লাভ করতে হল।

শেষ পর্যন্ত হতাশ খোরানা দেশ ত্যাগ করে ১৯৪৯খ্রিঃ ইংলন্ড রওনা হলেন।

এখানে কাজের সুযোগের অভাব নেই। কেমব্রিজেই ফেলোশিপের ব্যবস্থা হয়ে গেল। খোরানা গবেষণা আরম্ভ করলেন ডক্টর কেনার ও অধ্যাপক আলেকজেন্ডার আর.টডের সঙ্গে।

দুটো বছর ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ খ্রিঃ দেখতে দেখতে কেটে গেল। এই সময়ে তিনি জৈবরসায়নের গবেষণার নিউক্লিওটাইড তৈরির নানা কলা-কৌশল আয়ত্ত করলেন।

এই কাজ করতে করতেই প্রাণরসায়ন বা Biochemistry ক্ষেত্রের মহাসম্ভাবনার পথের সন্ধান পেয়ে গেলেন।

প্রাণীদেহের কোষের ক্রিয়াকলাপের মূল নির্দেশক হল জিন। তার মধ্যে রয়েছে একগুচ্ছ অম্লের নির্দিষ্ট বিন্যাস। এই অম্লগুলি হল অ্যাডিনাইলিক অম্ল, গুয়ানাইলিক অম্ল. থাইমিডাইকলিক অম্ল এবং সাইটিডাইলিক অম্ল।

এই অম্লগুলিই হল নিউক্লিও টাইট। এতে আছে বিশেষ ধরনের একটি সোরাজান বা নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারক, একটি পাঁচ অঙ্গারক বা কার্বন ঘটিত চিনি এবং একটি ফসফরাস ঘটিত অম্ল। শেষোক্ত অম্লটির কাজ হল নিউক্লিওটাইডগুলিকে সংপৃক্ত রাখা।

প্রাণরসায়নের জিনঘটিত জটিলতার দিকে তখনো পর্যন্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি খোরানার। নিউক্লিওটাইড নিয়ে গবেষণা করার সময় জৈব রসায়নই ছিল তাঁর মনোযোগের কেন্দ্র।

এবারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন নিউক্লিওটাইড নিয়ে। ইতিপূর্বে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছিলেন জিনের অন্তর্গত কোষের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণেব যে নির্দেশ তা কোষের নানা অংশে পৌছবার জন্য জিন সুচারু শৃঙ্খলায় নিজের অনুরূপ জিন গড়ে তোলে।

এই জিনশৃঙ্খলের নাম রেপ্লিকেশান বা অনুকৃতি। এই অনুকৃতি তৈরির পরবর্তী পর্যায়টি হল নিউক্লিওটাইড-এর নিউক্লিক অম্ল তৈরি করা। এর নাম Transcription বা প্রতিলিপিকরণ।

এই পর্যায়ে পরবর্তী ধাপ হল ট্রানশ্লেশান। এই স্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ের নিউক্লিক অম্ল তৈরি করে প্রোটিন। প্রোটিনই হল ভাষা যা কোষের নানা স্থানে বাহিত হয় এবং কোষ তার কাজকর্ম করে।

নিউক্লিওটাইড নিয়ে কাজ করতে নেমে খোরানা প্রোটিন ও নিউক্লিক অম্লের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন।

টডের ল্যাবরেটারিতে এভাবেই খোরানার ভবিষ্যৎ জিনগবেষণার ভিত গঠিত হয়।

একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল ১৯৫২ খ্রিঃ। ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী ডক্টর গর্ডন খোরানাকে চাকরির আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিলেন।

ততদিনে খোরানা আর একা নেই। বিবাহ করেছেন। তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথ সিবলার; একজন সুইস মহিলা। গবেষণার সামান্য টাকায় সংসার চলছিল টালমাটাল অবস্থায়।

কাজেই খোরানা ভাগ্যের আশীর্বাদ মনে করেই চাকরিটি গ্রহণ করলেন। চলে এলেন ভ্যাঙ্কুবার শহরে।

সেই সময়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি উদ্যোগে সদ্য সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রিসার্চ কাউন্সিল। গবেষকদের সবরকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাই সেখানে রাখা হয়েছিল। গোটা ব্যাপারটাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল প্রভাবশালী বিজ্ঞানী ডক্টর গর্ডন শ্রামের তত্ত্বাবধানে।

বিজ্ঞানী খোরানার প্রতিভার প্রথম উদ্বোধন ঘটল এই ভ্যাঙ্কুবারের গবেষণাগারেই। খোরানা এখানে তাঁর গবেষণার সঙ্গী করে নিলেন অপর এক বিজ্ঞানী জ্যাক ক্যাম্পবেলকে।

গবেষণা আরম্ভ হল নিউক্লিক অম্ল বা জিন নিয়ে। তাঁর এই গবেষণায় প্রভূত সহায়তা করেছিলেন ডক্টর গর্ডন টেনারও।

সেই সময়ে কলম্বিয়া ছিল কানাডারই এক অংশ। খোরানা ১৯৬০ খ্রিঃ সপরিবারে চলে এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সম্পূর্ণ সময়ের জন্য উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এনজাইম রিসার্চ ইনসটিটিউটের গবেষণায় যোগ দিলেন। এবারে তিনি নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

চিন্তাভাবনা করেই তিনি তা করলেন। একজন ভারতীয় হিসেবে ভারতে ফিরে গিয়ে তাঁর করবার মত কিছুই ছিল না। জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা রূপায়ণের পূর্ণ সুযোগ তাঁর রয়েছে এখানেই।

এই কারণে ভারতীয় পরিচয়টুকুও তাঁকে ঘুচিয়ে ফেলতে হল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই।

এবারে খোরানার পরিচয় হল তিনি একজন মার্কিন জীব-গবেষক। বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি সেভাবেই চিহ্নিত হয়ে আছেন।

যাইহোক, একসময়ে মার্কিন মুলুকেই খোরানা নকল জিন তৈরি করে জিন গবেষণার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করলেন। বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভা স্বীকৃত হল।

১৯৬৮ খ্রিঃ খোরানা মার্শাল নীরেনবার্গ ও রবার্ট হোলির সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। সেই সময় খোরানার বয়স ৪৬ বছর।

এই সম্মান তিনি অর্জন করলেন স্বদেশভূমি ভারতবর্ষ ত্যাগের মাত্র আঠারো বছরের মধ্যেই। স্বদেশে চরম অবহেলিত খোরানা বিদেশের মাটিতে লাভ করলেন তাঁর ক্ষেত্রে যোগ্যতমের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস।

১৯৭০ খ্রিঃ উইসকিনসন ছেড়ে তিনি চলে এলেন ম্যাসাচুসেটস ইনসটিটিউট অব টেকনোলজিতে। এখানে জীববিজ্ঞান ও রসায়ন বিভাগের অ্যালফ্রেড সোলান চেয়ারে অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন।

এখানে ছিল অভাবিত আয়োজন। ল্যাবরেটরি সুসজ্জিত ছিল সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিতে। গবেষণার টিমও পাওয়া গেল মনের মত। চারপাশে রয়েছে প্রতিভাবান ছাত্রদের উৎসাহব্যঞ্জক উপস্থিতি আর ছিল অফুরন্ত আর্থিক অনুদান।

দিনে দিনে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ বদল যেমন ঘটছিল খোরানার জীবনে তেমনি সেই সুযোগকেও পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি।

জীবন শুরু করেছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানী রূপে, জৈব রসায়নই ছিল তাঁর প্রধান উপজীব্য।

পরিবেশের আনুকূল্যে একদিন তিনি হয়ে উঠেছেন জীববিজ্ঞানী। আর এই জীববিজ্ঞানের গবেষণাতেই লাভ করেছিলেন নোবেল পুরস্কার।

উইসকনসিন ল্যাবরেটরিতে ঈষ্ট কোষের জিনের একটি অংশকেই কেবল তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন খোরানা। ম্যাসাচুসেটস-এর ল্যাবরেটরিতে বসে এবারে তিনি ঈষ্ট কোষের সম্পূর্ণ গঠন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেন। কিন্তু চেষ্টা করে বুঝতে পারলেন সম্পূর্ণ জিন তৈরি করা মানুষের চেষ্টায় অসাধ্য। তবু গবেষণা চলতে লাগল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

এল ১৯৭১ খ্রিঃ। আবার দুনিয়াজোড়া আলোড়ন তুললেন খোরানা। প্রাকৃতিক জিনের অনুরূপ কৃত্রিম জিন তৈরি করে কৃত্রিম জীবন তৈরি সম্ভবপর করে তুললেন। তাঁর এই গবেষণা প্রজননবিদ্যায় এক সম্ভাবনাময় দিক উন্মোচিত করল।

এশ্চেরিশিয়া কোলাই হল বিশেষ এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। জীব বিজ্ঞানের প্রয়োজনে এই ব্যাকটেরিয়াকে প্রথম গবেষণার কাজে ব্যবহার করেন বিখ্যাত জার্মান জীবাণুবিদ রবার্ট কখ-এর সুযোগ্য ছাত্র এশ্চেরিশ। তাঁর নামানুসারেই জীবাণুটির নামকরণ হয়েছে এশ্চেরিশিয়া (Escherichia)।

আর কোলাই বা কোলন হল বৃহদন্ত্রের একটি বৃহৎ অংশ।

এশ্চেরিশিয়া কোলাই ব্যাকটেরিয়াটি সাধারণতঃ মানুষ ও জীবজন্তুর অন্ত্রেই পাওয়া যায়। জীবাণুটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, অজৈব মাধ্যমে যখন আন্ত্রিক ব্যাকটেরিয়াদের বংশবৃদ্ধির সুযোগ করে দেওয়া হয় তখন সাইট্রেট অম্লকে কেবল এশ্চেরিশিয়াই বিপাক ক্রিয়ায় ব্যবহার করতে পারে না— ব্যবহার করে গ্লুকোজকে।

বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে জীব গবেষকরা জিন সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এশ্চেরিশিয়া কোলাইকে ব্যবহার করে আসছেন।

এছাড়া এই জীবাণুগুলিকে ব্যবহার করে ভাইরাসঘটিত বহু আবিষ্কারও সম্ভব হয়েছে।

এশ্চেরিশিয়া কোলাইতে নানা ধরনের নকল জিন ব্যবহার করে নকল জীবনকে তৈরি করাও সম্ভব হয়েছে। এই কোলন থেকেই জীবনের সামগ্রিক চেহারার একটা নমুনা জীববিজ্ঞানীরা পেয়েছেন।

এইসব কারণে জিন গবেষণায় এশ্চেরিযাকোলনকে বিজ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। খোরানাও এই ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে জিন সংক্রান্ত গবেষণায় অসাধ্যসাধন করেত সমর্থ হয়েছেন।

তিনি ম্যাসাচুসেটসের ল্যাবরেটরিতেই রাসায়নিক উপায়ে এশ্চিরিয়ার হুবহু নকল জিন তৈরির কাজে পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছেন। এরপর করলেন এক অবিশ্বাস্য কাজ।

১৯৭৬ খ্রিঃ বাইরে তৈরি করা নকল জিন এশ্চেরিয়া কোলাই-এর আণবিক স্তরে সাফল্যের সঙ্গে গেঁথে দিলেন। পর্যবেক্ষণে রেখে দেখা গেল নকল জিনটি এশ্চেরিয়ার জীবনযাত্রায় প্রাকৃতিক জিনের মতই স্বাভাবিক ভাবে কাজ করে চলেছে।

জৈব রাসায়নিক ক্ষেত্রে খোরানার এই প্রযুক্তিগত বিস্ময়কর সাফল্য শতাব্দীর বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক অধ্যায়ের সূচনা করল। এটা নিশ্চিত হয়েই গেল যে মানুষই একদিন মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

এবারে খোরানার পথ অনুসরণ করে জীবন সৃষ্টির কাজে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন বিজ্ঞানীরা।

নকল জিন তৈরির দুঃসাধ্য কাজটি করতে গিয়ে খোরানাকে দীর্ঘ নয় বছর গভীর গবেষণায় ডুবে থাকতে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে একইভাবে মনীষা ও কঠোর শ্রম নিয়ে

ম্যাসাচুসেটস ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছেন আরও ২৪জন জীববিজ্ঞানী। গোটা টিমটির নেতৃত্ব দিয়েছেন খোরানা। দীর্ঘ নয় বছরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে জীবাণুর একটি জিন তৈরি সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু মানুষের বৃহত্তর জিন তৈরি যে এর চেয়েও হাজারগুণ কঠিন কাজ বিজ্ঞানীরা সে সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন, তা বলাই বাহুল্য। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা এই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন।

যুগান্তকারী গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবে বহু পদক পুরস্কার ও সম্মান খোরানা পেয়েছেন। এখনো পেয়ে চলেছেন। আশি ছুঁই ছুঁই বয়সে এখনো তিনি সমান সক্রিয়। ম্যাসাচুসেটসের বাড়ি আর ল্যাব এই তাঁর ঠিকানা। বিজ্ঞানের সাধনায় পূর্ণভাবে আত্মনিবেদিত এই বিজ্ঞানীর জীবন।

আর্কিমিডিস



পৃথিবীর সর্বকালের সকল দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ হিসেবে আর্কিমিডিসের নাম মানবজাতির ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তাঁর ন্যায় পন্ডিত সেকালের ইউরোপে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না।

এখনো পর্যন্ত তাঁ র সমকক্ষ গণিতবিদ পৃথিবীতে খুব অল্পই জন্মেছেন। তাঁর চিন্তাধারা ও আবিষ্কার কৌশল আধুনিক বিজ্ঞানীদের পাথেয় রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে।

আনুমানিক খ্রিঃ পূর্ব ২৮৭ অব্দে গ্রীসের সিসিলির অন্তর্গত সাইরাকিউস নগরে আর্কিমিডিসের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন সেকালের একজন সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। তাঁরই সাহচর্য ও উৎসাহে অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যামিতিবিদ্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং কালক্রমে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় প্রতিভারূপে অমরত্ব লাভ করেন।

সেকালে গ্রীস দেশেও প্রাচীন ভারতের মত গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভ করতে হত। এই ছিল প্রচলিত নিয়ম।

আর্কিমিডিসের লেখাপড়াও শুরু হয়েছিল সেভাবে আলেকজান্দ্রিয়ায়। তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন জ্যামিতির জনক ইউক্লিডের শিষ্য স্যামোসের কোনে। গুরুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও শিক্ষায় তাঁর প্রতিভা বিকাশলাভ করেছিল।

গুরুগৃহে শিক্ষা শেষ কবে আর্কিমিডিস নিজের জন্মস্থান সাইরাকিউসেই বিজ্ঞানচর্চায় সারাজীবন অতিবাহিত করেন।

সাইরাকিউসের রাজা দ্বিতীয় হিয়েরো আর্কিমিডিসকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং নিজের বন্ধু রূপে সম্মান দিতেন। হিয়েরোর অনুরোধে ও উৎসাহে পরবর্তীকালে তিনি নানা ধরনের কার্যকরী যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। চল্লিশটিরও বেশি যন্ত্র তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন।

রাজা হিয়েরোর সোনার মুকুট নিয়ে তাঁর জগদ্বিখ্যাত আপেক্ষিক গুরুত্বের সূত্র আবিষ্কারের গল্পটি বহুল প্রচলিত। এই ঘটনার সূত্রে আর্কিমিডিসের উচ্চারিত ইউরেকা (Eureka -পেয়েছি) শব্দটি প্রবাদে পরিণত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

রাজা হিয়েরো এক স্বর্ণকারকে দিয়ে একটি সোনার মুকুট তৈরি করিয়েছিলেন। মুকুটটিতে খাদ মেশানো আছে কিনা তা নির্ণয় করবার জন্য তিনি আর্কিমিডিসকে অনুরোধ করেন।

একদিন টবে স্নান করতে গিয়ে আর্কিমিডিস লক্ষ করেন খানিকটা জল টবের গা বেয়ে উপচে পড়ে গেল।

এই ব্যাপারটা থেকেই আকস্মিকভাবে রাজার প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান তাঁর মাথায় এসে গেল। আনন্দে তিনি ইউরেকা বলে চিৎকার করে উঠলেন।

পরে একটি পরীক্ষার দ্বারা তিনি রাজাকে বুঝিয়ে দেন যে মুকুটটিতে খাদ মেশানো আছে।

সামান্য এই ঘটনার সূত্র ধরেই আর্কিমিডিস আবিষ্কার করেন আপেক্ষিক গুরুত্বের ভৌতিক সূত্র যা বিজ্ঞানে আর্কিমিডিসের তত্ত্ব নামে পরিচিত।

এই তত্ত্বে তাঁর সিদ্ধান্ত হল ঃ অদ্রাব্য কোন বস্তুকে কোন স্থির তরল বা বায়বীয় পদার্থে আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে নিমজ্জিত করলে, বস্তুটি সম-আয়তন জল বা বায়ু অপসারিত করে এবং নিজে অপসারিত জল বা বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান ওজন হারায়।

আর্কিমিডিস সোনার মুকুটে খাদের পরিমাণ নির্ণয় করেছিলেন এভাবে, মুকুটের সমান ওজনের একটু সোনা তিনি একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ফেলে দেন। এর ফলে খানিকটা জল উপচে পড়ে এবং এই জলটুকু তিনি ওজন করেন। পরের বারে সোনার মুকুটটিকে তিনি জলভর্তি পাত্রে ফেলে দেন। এবারেও উপচে পড়া জলটুকু ওজন করেন।

দেখা যায় প্রথম ও দ্বিতীয়বারে উপচে পড়া জলের ওজন বিভিন্ন। এই থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন মুকুট খাঁটি সোনার তৈরি হলে দুই বারেই ঠিক একই পরিমাণ জল উপচে পড়তো।

কিন্তু খাদ মেশানো থাকায় সমান ওজনের সোনা অপেক্ষা মুকুট আয়তনে কিছুটা বড় হয়েছে এবং তার ফলে জল খানিকটা বেশি ফেলে দিয়েছে।

কী পরিমান খাদ মুকুটে মেশানো হয়েছিল দুবারের জলের ওজনের পার্থক্য থেকেই তা নির্ণয় করা হয়েছিল।

আর্কিমিডিস বিজ্ঞানের বড় বড় জটিল তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত থাকতেন। রাজা হিয়েরোর অনুরোধে তিনি জনসমাজের কল্যাণকর যেসব ছোটখাট যন্ত্র অবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে পুলি বা কপিকল এবং লিভার অন্যতম। এগুলোর সাহায্যে স্টীমারে জাহাজে নৌকায় রেলগাড়িতে ও বড় বড় কারখানায় মাল ওঠানো নামানো এবং খুব ভারি জিনিসকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ।রোবার কাজ খুবই সহজভাবে করা যায়।

শুকনো জমিতে জলসেচের জন্য আর্কিমিডিস এক ধরনের প্যাঁচালো কর্ক স্ক্রু ়দ্ভাবন করেছিলেন।

পাম্প আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত জল নিষ্কাশনের জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার ুরা হত। এই কর্কস্ক্রুর এক প্রান্ত জলে ডোবানো থাকে। আনত অবস্থায় এটি ঘুর:তে ।াকলে এর ভেতরের প্যাচানো পথে জল ঢুকে অন্য প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যায়।

গণিত বিষয়ে আর্কিমিডিসের আবিষ্কারগুলিও স্মরণীয় হয়ে আছে। বৃত্তের ।রিধি ও ব্যাসের অনুপাত নির্ণয় সমতল ক্ষেত্রের সমত্ব সম্বন্ধে তত্ত্ব নির্ণয়, ।ধিবৃত্তীয় অংশগুলির ক্ষেত্রফল নির্ণয় সমান ভূমি ও উচ্চতা বিশিষ্ট ত্রিভুজ ও ।ধিবৃত্তের অংশের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় ইত্যাদি বিজ্ঞান জগতে তাঁর বিশেষ অবদান রূপে স্বীকৃত।

একবার দেশে যুদ্ধের সময় সামান্য আতস কাচকে আর্কিমিডিস অস্ত্ররূপে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কৌশল আবিষ্কার করে সকলকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন।

রোমান সেনাপতি মার্সেলাস সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধজাহাজ নিয়ে সাইরাকিউস আক্রমণ করেছিলেন।

আর্কিমিডিস সেইসময় সরার মত ভেতরে গর্তওয়ালা বিরাট বিরাট আয়না এমনভাবে দেয়ালের গায়ে সাজিয়ে রাখলেন যে তাতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে রোমানদের জাহাজগুলিতে আগুন ধরে যায়।

এছাড়াও সমর-কৌশল সম্পর্কিত তাঁর বিভিন্ন আবিষ্কার রোমান সৈন্যদের নানাভাবে পর্যুদস্ত করে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রোমান সৈন্যদের অস্ত্রাঘাতেই আর্কিমিডিস নিহত হন। সময়টা খ্রিষ্টপূর্ব ২১২ অব্দ।

রোমান বাহিনী রাতের অন্ধকারে সাইরাকিউসের প্রাচীর টপকে শহরে ঢুকে পড়েছিল। তাদের নির্বিচার হত্যা ও ধ্বংসলীলার শিকার হন আর্কিমিডিস।

তিনি যখন বালির ওপর গণিত ও জ্যামিতি সংক্রান্ত বিষয়ে আঁকজোক করছিলেন সেই সময় রোমান সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করে।

যদিও রোমান সেনাপতি মার্সেলাস-এর আদেশ ছিল আর্কিমিডিসকে যেন হত্যা করা না হয়।

মৃত্যুর পর আর্কিমিডিসকে মার্সেলাস রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সহকারে সমাহিত করেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেও কোন প্রকার অমর্যাদাকর ব্যবহার করা হয়নি।

ফ্রান্সিস বেকন



ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞান আর দর্শনের অবস্থান ছিল প্রায় অঙ্গাঙ্গী। বলা ভাল দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যেই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবদ্ধ ছিল।

পাশাপাশি জনজীবনের স্বার্থে আর একটি আপাত বিজ্ঞান-ধারা সেই সময় প্রবাহিত ছিল। তা হল কারিগরিবিদ্যা। এর সাহায্যে কারিগরদের সহায়তায় নতুন নতুন যন্ত্রপাতিরও উদ্ভাবনের কাজ চলছিল।

এই কারিগররা বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা নতুন কোন আবিষ্কারে উৎসাহিত হতেন। যেন-তেন প্রকারে তারা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করতেন।

ফলে বিজ্ঞানের সঙ্গে কারিগরদের কারিগরী বিদ্যার দূরত্ব ছিল অনেক। অথচ অনিবার্যভাবেই একটি আর-একটির পরিপূরক।

এই সত্যটি অনুধাবন করে পণ্ডিতরা বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় ব্রতী হন।

মুষ্টিমেয় চিন্তাবিদের ঐকান্তিক প্রযত্নে ধীরে ধীরে কারিগররা যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে উৎসাহিত হলেন।

এই ভাবেই বিজ্ঞান দার্শনিকতার গন্ডি ছাড়িয়ে নিজস্ব পথে অগ্রসর হবার সুযোগ লাভ করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসে বিপ্লব।

ফ্রান্সিক বেকন হলেন সেই মুষ্টিমেয় চিন্তাবিদ্‌দের অন্যতম যাঁরা বিজ্ঞান-ইতিহাসের এই বিপ্লবকে বহন করে এনেছিলেন।

ফ্রান্সিস বেকনের জন্ম ইংলন্ডে ১৫৬০ খ্রিঃ। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে বারো বছর বয়সে তিনি কেম্‌ব্রিজে পড়াশুনা করতে যান।

কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ করে মাত্র দুবছর পরে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে দর্শন শাস্ত্রে বেকন কেম্‌ব্রিজ থেকে চলে যান ফ্রান্সে।

সেখানে বছর দুই থাকার পর তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তিনি লন্ডনে ফিরে এসে আইন অধ্যয়ন করেন এবং পাশ করে অল্পদিনের মধ্যেই আইন ব্যবসায়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন।

এই সময় ইংলন্ডের রাজা প্রথম জেমস-এর বিচার বিভাগে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ আসে এবং তিনি এই কাজে যোগদান করেন। অনন্য সাধারণ প্রতিভার বলে অল্পকালের মধ্যেই তিনি আইন বিভাগের প্রধানরূপে মনোনীত হন।

রানী এলিজাবেথের স্নেহধন্য বেকন সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দেন।

অনেকে মনে করেন মনীষী অ্যারিস্টটলের পর বেকনের মত আর কেউ এত বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি।

ইংরাজি সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ অর্থাৎ এলিজাবেথীয় যুগে বেকন অন্যতম রত্নস্বরূপ স্বীকৃত।

বেকন ছিলেন মূলতঃ দার্শনিক। তবে বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। আইন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা করতেন।

পরে কেবলমাত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধেই ভাবনাচিন্তা আরম্ভ করেন।

প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের সময় থেকে তাঁর সমসাময়িক কাল পর্যন্ত প্রচলিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী তিনি সংগ্রহ করে পড়াশোনা করেন। তার ফলেই বিজ্ঞানের নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত তিনি লাভ করেন।

বেকনের অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান সহ নানা বিষয়ে মৌলিক সৃষ্টির ব্যাপারে সাফল্য লাভে সাহায্য করেছে।

মনটেইনের (Montaigne) আদর্শে বেকনই সর্বপ্রথম ইংরাজিতে খাঁটি প্রবন্ধ রচনার স্রষ্টা রূপে স্বীকৃত।

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর ভাল-মন্দ, ব্যাপ্তি-সংকোচ, মহত্ত্ব-ঋজুতার বৈচিত্র্য বেকনের দিগন্ত-প্রসারী সৃষ্টির মধ্যে সংহত হয়েছে।

একসময় বেকন কারিগরীবিদ্যা এবং প্রচলিত যন্ত্রপাতির দিকে আকর্ষণ বোধ করেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই উপলব্ধি করেন বিজ্ঞান এবং কারিগরীবিদ্যাই মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস রচনায় প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করবে।

তাঁর এই সময়ের চিন্তাভাবনা একটি পুস্তকের আকারে দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব লার্নিং নামে প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যাকে জনপ্রিয় করার কোন প্রয়াস ইতিপূর্বে কোন পণ্ডিত-চিন্তাবিদ গ্রহণ করেন নি। উক্ত বইটির মাধ্যমে বেকনই সেই প্রয়াসের সূচনা করেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বেকনের দ্বিতীয় পুস্তক গ্রেট ইনস্টরেশন অব লার্নিং। বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত পুস্তকটি প্রকাশিত হয় ১৬২০ খ্রিঃ।

প্রথম খণ্ডে বেকন প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁর প্রাসঙ্গিক মতামতও ব্যক্ত করেন।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্বার্থে প্রাচীন মতবাদের ভিত্তিতে নতুন নতুন তত্ত্ব ও পদ্ধতির উদ্ভাবনের গুরুত্বের কথা তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন। এই বিষয়ে এগিয়ে আসার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি আহ্বান জানান।

গ্রেট ইনস্টরেশন অব লার্নিং-এর দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি প্রচলিত যন্ত্র বিদ্যার উল্লেখ করেন এবং ব্যাখ্যা করে দেখান কোন কোন যন্ত্রে কোন কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রযুক্ত হয়েছে।

কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তিসহ তীব্র সমালোচনার জন্য এই খণ্ডটি ইংরাজি সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে।

পুস্তকখানির তৃতীয় খণ্ডে তিনি প্রাচীন বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।

কারিগরী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁর যুক্তিপূর্ণ তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা স্থান পেয়েছে চতুর্থ খন্ডে।

এই গ্রন্থের আরো কয়েকটি খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা বেকনের ছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা তিনি বাস্তবায়িত করবার সময় পাননি।

বিজ্ঞান বিষয়ের পাশাপাশি ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যেও বেকনের স্বকীয়তার চিহ্ন পরিস্ফুট।

বেকনের অধিকাংশ রচনাই লাতিন ভাষায় লেখা। ইংরাজি জানা পাঠকদের কাছে তাঁর অন্যান্য যেসব বই সমাদৃত হয়েছে, সেগুলি হল, Essays, The New Atlantis।

বেকনের যুগান্তকারী চিন্তাধারা পণ্ডিত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং অচিরেই বিজ্ঞানরাজ্যে প্রথম বিপ্লবের সূচনা হয়।

নতুন ভাবে আরম্ভ হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা। আবির্ভূত হন গ্যালিলিও, দেকার্ত-এর মত নতুন যুগের বিজ্ঞান সাধকগণ।

ফ্রান্সিস বেকনের নির্দেশিত পথেই তাঁরা বিজ্ঞানের গতিধারায় গতি সঞ্চার করেন।

বহুমুখী প্রতিভাধর এই মনীষী ১৬২৬ খ্রিঃ পরলোক গমন করেন।

এসক্লেপিয়াড অ্যারিস্টটল



প্রাচীন গ্রীসের বিশ্বখ্যাত দার্শনিক, বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের গ্রীক নাম আরিস্তোতেলেস। জন্মেছিলেন ঈজিয়ান সাগরের উত্তর-পশ্চিম তীরে চেলিসিডিসের অর্ন্তগত স্টেগিরা নামের ছোট্ট এক শহরে।

সময়টা খ্রিস্টের জন্মের ৩৮৫ বছর আগে। তাঁর বাবা নিকোমাখুস ছিলেন ম্যাসিডনিয়ার রাজা অ্যামিনটাসের চিকিৎসক ও বন্ধু। অ্যামিনটাস ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডারের ঠাকুর্দা।

পরিবারের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিমন্ডলে স্বভাবতঃই শিশুবয়স থেকেই তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি প্রবল আগ্রহ জন্মায়।

প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন অ্যারিস্টটল। ফলে অতি অল্পবয়সেই অঙ্ক, বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন।

কিশোর বয়সে তিনি মাঝেমাঝেই গিয়ে বসতেন ঈজিয়ান সাগরের ধারে। অশান্ত ঢেউয়ের ভাঙ্গা-গড়া, সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে আকাশের সুদূর প্রান্তে হারিয়ে যেত তাঁর ভাবালু দৃষ্টি।

বইতে পড়েছেন নানা দেশের কথা, সভ্যতার ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস, মনীষীদের রোমাঞ্চকর জীবন-কাহিনী ও আবিষ্কারের কথা।

তাঁর মনও এই সময়ে অজানা জগতের রহস্য সন্ধানের স্বপ্ন দেখে, কল্পনায় নানা ছবি আঁকে।

সেই সময় রাজধানী এথেন্স ছিল সমগ্র গ্রীসের জ্ঞানচর্চার পীঠভূমি। বিশ্ববিখ্যাত সব পণ্ডিত সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় রত।

অ্যারিস্টটলের স্বপ্ন তিনিও এথেন্স যাবেন। সমুদ্রবিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিদ্যার চর্চায় তাঁর গভীর আগ্রহ—সেখানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের পদপ্রান্তে বসে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করবেন।

বাবার মৃত্যুর পর সতের বছর বয়সে ৩৬৭ খ্রিঃ পূর্বাব্দে এথেন্সে আসেন।

প্লেটোর লাইসিয়ামের তখন খুব নামডাক। প্রাচীন গ্রীসে মনীষীরা বড় হলঘরে বসে দেশ-বিদেশের ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। অনেকটা আমাদের দেশের প্রাচীন তপোবন বা গুরুগৃহের ধারাতেই এথেন্সেও শিক্ষাগুরুরা শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করতেন।

এই শিক্ষাশ্রমগুলোই লাইসিয়াম নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে লাইসিয়ামেরই নাম হয়েছে আকাডেমী।

মহাজ্ঞানী প্লেটোর লাইসিয়ামটিই পরিচিত ছিল এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয় নামে। জ্ঞান এবং অধ্যাপনার জন্য তাঁর খ্যাতি দেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশেও পৌঁছেছিল।

প্লেটো ছিলেন মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের সেরা ছাত্র। নানা বিষয়েই ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য।

অ্যারিস্টটল প্লেটোর লাইসিয়ামে নাম লেখালেন। এখানে তিনি স্বকীয় রুচিতে ও আচরণে সংশ্লিষ্ট সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। হয়ে উঠেছিলেন প্লেটোর প্রিয় ছাত্র।

দীর্ঘ কুড়ি বছরে সাহিত্য দর্শন, রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে অঙ্ক জ্যোতির্বিজ্ঞান. উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও সমুদ্রবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা বিষয়েও শিক্ষা নিয়েছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন প্লেটোর প্রিয়ছাত্র।

প্লেটো তাঁর টাইমেয়াস গ্রন্থে প্রিয়শিষ্য অ্যারিস্টটলের অসাধারণ জ্ঞানের কথা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই দুই গুরুশিষ্যের চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্যও ছিল যথেষ্ট স্পষ্ট। প্লেটোর প্রিয় বিষয় ছিল অঙ্ক। ছিলেন কল্পনাবিলাসী। অঙ্ক নিয়ে চিন্তায় বিভোর থাকতেই ভালবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পৃথিবী গতিহীন এবং স্থির এক গ্রহ।

অন্যদিকে অ্যারিস্টটল ছিলেন বস্তুবাদে বিশ্বাসী। লৌকিক জগতের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। সজীব পদার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চিন্তা করতেই তিনি বেশি ভালবাসতেন।

জীব জগতের অনেক কিছুরই শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন অ্যারিস্টটল। সেই যুগে এই বিষয়ে মাথা ঘামাতে অপর কোন বিজ্ঞানীই উৎসাহবোধ করতেন না।

পৃথিবী অ্যারিষ্টটলের দৃষ্টিতে ছিল গতিময়।

মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সেই অ্যারিস্টটলের বিজ্ঞান ও দর্শনের খ্যাতি সমস্ত গ্রীসে ছড়িয়ে পড়েছিল।

৩৪২ খ্রিঃ পূঃ প্লেটোর মৃত্যু হয়। তাঁর পরে আকাদেমির চালক অধ্যাপক হতে চেয়েছিলেন অ্যারিস্টটল। কিন্তু এথেন্সের অধিবাসীরা তাঁকে বিদেশী বলেই মনে করত। তাই দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চালক অধ্যাপকের পদটি তাঁর লাভ করা হল না।

এথেন্সে আর থাকতে মন চাইল না। অ্যারিস্টটল তখন এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত আতরনিউস নামক শহরে চলে আসেন।

এখানে তাঁর এক সহপাঠী হেরমিআ বাস করতেন। বন্ধুর বাড়িতেই এসে উঠলেন তিনি।

এখানে তিন বছর ছিলেন তিনি। হেরমিআর বোন পুথিয়াকে (Pythia) বিয়ে করে অনেক উপহার লাভ করেন।

ম্যাসিডনের রাজপরিবারের সঙ্গে পিতার সূত্রেই পরিচয় ঘটেছিল অ্যারিস্টটলের। রাজকুমার ফিলিপের সঙ্গে জানাশোনাও ছিল তাঁর। তিনি তখন রাজা হয়েছেন। অ্যারিস্টটলের গুণগ্রাহী ও ভক্তদের মধ্যে রাজাও ছিলেন অন্যতম।

আতরনিউসে থাকার সময়েই অ্যারিস্টটল রাজা ফিলিপের একটি চিঠি পেলেন। রাজা তাঁকে বালকপুত্র ফিলিপের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে অনুরোধপত্র পাঠিয়েছেন।

অ্যারিস্টটল সানন্দে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং ম্যাসিডনে ফিরে এলেন।

রাজকুমার আলেকজান্ডারের যখন চোদ্দ বছর বয়স, সেই সময় অ্যারিস্টটল তাঁকে ছাত্র হিসেবে পান। প্রথম দর্শনেই দুজন দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

সাতবছর সময়ের মধ্যেই অ্যারিস্টটল রাজকুমার আলেকজান্ডারকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন।

ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনে অসাধারণ জ্ঞানার্জন করেছিলেন আলেকজাণ্ডার। গুরুর কাছ থেকে তিনি আরও লাভ করেছিলেন বিশ্বকে জানবার তীব্র পিপাসা।

বিজ্ঞান মনস্কতা, অসামান্য তেজ ও সাহস।

এই আন্তর সম্পদের প্রেরণাতেই একদিন তিনি ঘরছেড়ে বিশ্বজয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

একের পর এক দেশ তিনি জয় করেছেন, সেসব দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। অ্যারিস্টটলের শিক্ষা এভাবেই সার্থকতা লাভ করেছিল শিষ্য আলেকজাণ্ডারের মধ্যে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ মারা গেলেন। সিংহাসনে বসলেন আলেকজাণ্ডার। সেই সময় তাঁর বয়স একুশ।

অ্যারিস্টটল চলে এলেন এথেন্সে। এখানে নিজেই একটি লাইসিয়াম খুললেন। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে চললো তাঁর গবেষণার কাজ। তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের নাম দিলেন পেরিপ্যাটেটিক স্কুল।

মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত রাজা ফিলিপ অ্যারিস্টটলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আলেকজাণ্ডার রাজা হয়ে পিতার সেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।

অ্যারিস্টটল একবার স্থির করলেন প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করবেন।

উপাদান সংগ্রহের জন্য একহাজার সহকারী গবেষক নিযুক্ত করা হল। তারা পৃথিবীর নানাস্থানে প্রেরিত হয়েছিলেন। একাজে তিনি অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন রাজকোষ থেকে।

সংগ্রাহকরা ঈজিয়ান সাগরের উত্তর-পূর্ব উপকূলের জল ও স্থলভাগ থেকে, লেমবস দ্বীপ থেকে সংগ্রহ করে আনতো নানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর নমুনা। সেসব পাঠিয়ে দেওয়া হত এথেন্সে অ্যারিস্টটলের গবেষণাগারে।

অ্যারিস্টটল এসব নমুনা একে একে শ্রেণী ধরে সাজিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। এইভাবেই দিনে দিনে জীববিদ্যা ও সমুদ্রবিদ্যার ভূমিপ্রস্তুত হয়ে চলল।

সব মিলিয়ে প্রায় ৫০০ জীবজন্তুর প্রজাতির গঠন ও প্রজনন কৌশল ধরে তিনি শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন।

বিভিন্ন প্রাণীর নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবচ্ছেদ করে সেসবের পরিচয় ও কার্য-কারিতার ব্যাখ্যাও করেছেন তিনি।

প্রাণী ও উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ে অ্যারিস্টটলের সিদ্ধান্তই ১৮ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছেন।

জীবোৎপাদন ও জীবজন্তুর ওপর নানা বৈজ্ঞানিক বিবরণ নিয়ে তিনি প্রকাশ করেছিলেন হিস্টোরিয়া অ্যানিমিলিয়া বইটি।

বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী লিনিয়াস ও কুভিয়ারের আবির্ভাবের পরে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের নতুন শ্রেণীবিন্যাস সাধিত হয়েছিল। ফলে অ্যারিস্টটলের এই দুই বিভাগে অধিকাংশ কাজ বাতিল বলে গণ্য হয়েছিল।

যুক্তিবাদী অ্যারিস্টটল সকল কার্যেরই কারণ অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করতেন যুক্তি দিয়ে।

তাঁর এই কার্যকারণ তত্ত্ব নিয়ে রচিত হয়েছিল ন্যায়শাস্ত্রের বই আরগান। এই গ্রন্থের ভিত্তিতে প্রধানতঃ নীতিশাস্ত্রকার রূপেই তিনি বিখ্যাত ও প্রচারিত হয়েছেন বেশি।

বিভিন্ন বিষয়ের ওপব গবেষণা করে তিনি ১০০০ মত তথ্যনিষ্ঠ বই রচনা করেছেন। তাঁর বেশিরভাগ বইই অবশ্য মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। যেসব বই রক্ষা পেয়েছে তার অধিকাংশই দর্শন ও নীতিবিদ্যা সংক্রান্ত।

জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যায় তাঁর যেসব তত্ত্ব রয়েছে তার ভিত্তি দার্শনিক ভাবনার ওপরেই গড়ে উঠেছিল।

তাঁর একটি সিদ্ধান্ত যেমন ভারী ও হালকা এই দুই বস্তু ওপর থেকে নিচে ফেলে দিলে দুটিই একসময়ে নিচে পড়বে।

বহু শতক পরে ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও পিসা শহরে পরীক্ষা দ্বারা এই তত্ত্ব ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছিলেন।

তিনি দেখিয়েছিলেন, বায়ুপূর্ণ স্থানে বায়ুঘাতের জন্য এরকম হতে পারে। কিন্তু বায়ুহীন স্থানে ভারী ও হাল্কা বস্তু একসঙ্গে নিচে ফেললে দুটিই একসময়ে নিচে পড়বে।

অ্যারিস্টটলের মত ছিল, স্থির বস্তুকে ধাক্কা দিয়ে বা বেগ সঞ্চার করে চির গতিময়তা দান করা যায়।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে নিউটন অ্যারিস্টটলের এই সিদ্ধান্তটিকে সংশোধন করে প্রকৃত সত্যের ভিত্তিতে আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর প্রথম গতিসূত্র।

তিনি প্রমাণ করে দেখান, যে কোন গতিশীল বস্তুরই গতিপথ হয় সরল রেখা ধরে।

অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন পৃথিবী গঠিত হয়েছে ক্ষিতি, অপঃ, তেজ ও মরুৎ এই চারটি মৌলিক বস্তুদ্বারা।

কিন্তু পরবর্তীকালে জানা গেছে পদার্থ সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের সিদ্ধান্তটি ভুল। ক্ষিতি, অপঃ, তেজ, মরুৎ অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন ও বায়ু এগুলো কোনটাই মৌলিক পদার্থ নয়।

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণ রেখেছেন অ্যারিস্টটল। কিন্তু পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ভুল থাকার জন্য তাঁর সিদ্ধান্তও সঠিক হতে পারেনি। তিনি জানিয়েছিলেন পৃথিবীই হল সৌরজগতের কেন্দ্র। একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে গ্রহ ও নক্ষত্রেরা অবিরাম ঘুরছে।

চাঁদের আলোকেও তার নিজস্ব আলো বলেই বর্ণনা করেছেন তিনি। বহু শতাব্দী পরে অ্যারিস্টটলের এই সব সিদ্ধান্ত শুধরে দিয়েছেন গ্যালিলিও কেপলার প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ।

তাঁরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে।

দ্বিতীয়তঃ চাঁদের নিজস্ব আলো বলতে কিছু নেই। সূর্যের আলোতেই তার আলোকিত রূপ প্রকাশিত হয় জ্যোছনা হয়ে। চাঁদের ভেতর দিয়ে আসে বলেই জ্যোছনা তাপমুক্ত।

প্লেটোর দার্শনিক চিন্তার সূত্র ধরে তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল যা লিখে রেখে গেছেন, বৈচিত্র্যে ও বিস্তারে তা বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচায়ক। রাষ্ট্রনীতি, নাটক, কাব্য, বস্তুবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, তর্কবিদ্যা. জ্যোতির্বিদ্যা, সৌন্দর্যতত্ত্ব, প্রকৃতিবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, অলংকার শাস্ত্র, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বহু বিষয়েই অ্যারিস্টটলের জিজ্ঞাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল।

ঈশ্বর, রাষ্ট্র ও মানুষ—এই তিনটি বিষয়ে অ্যারিস্টটল নতুন কথা বলেছেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, ঈশ্বরকে প্রসন্ন করার অভিপ্রায়ে প্রার্থনা ব্যাপারটা মানুষের মূর্খতাই প্রমাণ করে।

মানুষের সুখ-দুঃখ ঈশ্বরকে স্পর্শ করে না। তবে মানুষের সব চিন্তার প্রেরয়িতা ঈশ্বর।

ঈশ্বরের চালক নেই, মানুষের আবেগ আছে, হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে থাকতে পারে না।

জগদব্যাপারের নিয়ম অনুসারে মানুষের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়।

মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসে, ঈশ্বরের ভালবাসা বলে হৃদয়াবেগ থাকতে পারে না।

ঈশ্বরই মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করে একথা ঠিক নয়, ঈশ্বর স্বপ্নচারী।

বিশ্ব-প্রপঞ্চের মূল শক্তি বা Primal Energy বলতে আধুনিক বিজ্ঞানীরা যা বোঝেন অ্যারিস্টটলের ঈশ্বরও সেই শক্তি-সত্তা।

রাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন, স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র, দলতন্ত্র (oligarchy), গণতন্ত্র—কোন তন্ত্রই দুষ্টের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে না। এসবের মধ্যে স্বৈরতন্ত্র নিকৃষ্ট।

অ্যারিস্টটল সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন সংবিধানসম্মত শাসনপদ্ধতি বা Constitutional Government। তাঁর মতে শ্রেণীতন্ত্র বা Dictatorship of a class স্বৈরতন্ত্রেরই সমকক্ষ।

সাম্যবাদ বা Communism তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না। বলতেন, সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থায় হিংসার আগুন দেশকে ধ্বংস করবে।

দেশের উন্নতি যদি কাম্য হয় তাহলে নিশ্চয় ব্যক্তিগত মালিকানার প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন অ্যারিস্টটল।

তিনি বুঝেছিলেন, প্রবীণদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। বৃদ্ধ এবং প্রাজ্ঞরা নির্দেশ দেবে, নবীনেরা তাঁদের আজ্ঞা পালন করবে।

অ্যারিস্টটল বলতেন, শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান লক্ষ হবে শিক্ষার উৎকর্ষসাধন।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অ্যারিস্টটল খাঁটি মানুষ তাকেই বলেছেন যার নিজে সুখী হবার এবং অপরকে সুখী করবার যোগ্যতা আছে।

তিনি বলতেন, দয়া প্রদর্শন মানুষের কর্তব্য, তবে দয়া করা মানে অনুগ্রহ করা নয়। আশু ফল প্রদান না করলেও সৎকর্মের একটা নিজস্ব মূল্য থাকে।

পরনিন্দা, বিদ্বেষ, অপরের ক্ষতিসাধন—এসব প্রবণতা খাঁটি মানুষের থাকতেই পারে না।

গ্রিস দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বকে চিন্তার মুক্তির সাধনায় প্রেরণা দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে তিনজনের অবদান বিশ্ব মানস অবনত মস্তকে বহন করে চলেছে। এঁরা হলেন সক্রেটিস, প্লেটো আর অ্যারিস্টটল।

প্লেটো তাঁর গুরুর তত্ত্বাবলীর বিচারবিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করেছেন বলেই সক্রেটিসকে আজও আমরা জানতে পারছি।

প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটলও তেমনই গুরুর তত্ত্ববাদের সূত্র ধরেই অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন।

মহাজ্ঞানী মহাজন অ্যারিস্টটল খ্রিঃ পূর্ব ৩২২ অব্দে Eubaca-এর অন্তর্গত থালফিস নামক নগরীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর প্রধান বইগুলির ইংরাজি নাম Dialogues, On Monarchy, Alexander, The Custom of Barbarians, Natural History, Organon or The Instrument of Correct Thinking, On the Soul, Rhetoric, Logic, Eudemian Ethics, Physics, Metaphysics, Politics, Poetics,158 Constitutions (including The Constitution of Athens) প্রভৃতি।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি



পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নতুন যুগের সূচনা হয় লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছিলেন তার অন্যতম পথপ্রদর্শক।

লিওনার্দোর জন্ম হয় ইতালীর ভিঞ্চি গ্রামের অ্যানপিয়ানো নামক স্থানে ১৪৫২ খ্রিঃ ১৪ই এপ্রিল।

পরবর্তীকালে যিনি বহু বিচিত্র গুণের আধারস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন, নিয়তির বিধানে জন্মের পর থেকেই তাঁকে নাটকীয় ঘটনার স্রোতে পড়তে হয়।

লিওনার্দোর মায়ের পরিবার ছিল অতি সাধারণ। চাষবাসই ছিল তাদের জীবিকা। মা ক্যাটারিনা ছিলেন গ্রামের সরাইখানার সাধারণ পরিচারিকা।

কিন্তু লিওনার্দোর বাবা পীয়িরো দ্য ভিঞ্চি ছিলেন সম্ভ্রান্ত আইনজীবী পরিবারের সন্তান। স্বভাবতঃই তাঁর পছন্দ মত স্ত্রী তিনি ঘরে তুলতে পারলেন না। ক্যাটারিনার সঙ্গে পীয়িরোর সম্পর্ক তারা অস্বীকার করলেন এবং অন্য এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন।

লিওনার্দোর সবে মাত্র জন্ম হয়েছে সেই সময়। নবজাতকের মুখের দিকে তাকিয়ে পিয়িরোর মায়া হল। তিনি তাকে নিজের প্রাসাদে তুলে আনলেন। সেই থেকেই মায়ের সঙ্গে চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল লিওনার্দোর।

লিওনার্দোই ছিলেন ভিঞ্চি পরিবারের একমাত্র সন্তান। তাই শৈশবে তাঁর খেলার সঙ্গী কেউ ছিল না। নিজেই নিজের দুরন্তপনা নিয়ে মগ্ন থাকতেন।

প্রকৃতি যেন মূর্তিমন্ত শিল্প করেই গড়েছিলেন বালক লিওনার্দোকে। যেমনি গায়ের রঙ, তেমনি একমাথা ঝাঁকড়া চুল, তেমনি চোখমুখের গড়ন। একবার তাকালে সহজে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

রূপের সঙ্গে অসামান্য বুদ্ধিও পেয়েছিলেন লিওনার্দো। কাজেই সহজেই সকলের প্রিয় হয়ে উঠলেন।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই লিওনার্দোর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। গণিতের নানা কঠিন সমস্যা তিনি অতি সহজেই সমাধান করে ফেলেন।

এই সময়েই লিওনার্দোর গানবাজনার প্রতিও বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয়। আর সুযোগ পেলেই দেখা যায় আপন মনে ছবি আঁকছেন।

তাঁর শিল্পপ্রতিভা লক্ষ্য করে লিওনার্দোর বাবা ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন ভেরোসিওর স্টুডিওতে।

এখানেই শিল্পকার্যে লিওনার্দোর শিক্ষানবিশী শুরু হল। তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর।

শিল্পী হিসেবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে লিওনার্দোর খ্যাতি দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় ভেরোসিওর অনেক অসমাপ্ত কাজও শেষ করার ভার পড়ে তাঁর ওপর।

১৪৭২ খ্রিঃ জুন মাসেই স্বাধীন শিল্পী হিসেবে লিওনার্দোর নাম ওঠে ইতালীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ফ্লোরেনটাইন গীল্ড নামক পুস্তকে।

লিওনার্দোর এই সময়কার অধিকাংশ ছবিই আজ হারিয়ে গেছে। অ্যাডোরেশন অব দ্য কিংস শীর্ষক অসমাপ্ত ছবিটিই কেবল পাওয়া যায়।

কেবল চিত্রকলায় নয় স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যেও লিওনার্দো ক্রমে দক্ষতা অর্জন করতে থাকেন।

১৪৭৭ খ্রিঃ থেকে ১৪৮২ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছর লিওনার্দো ইতালীর বিখ্যাত লোরেঞ্জোর পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনভাবে ছবি আঁকতে থাকেন।

অসংখ্য ছবি এঁকেছেন লিওনার্দো। কোথাও হয়ত শিশুর হাঁটুর চামড়ার খাঁজগুলো ধরা পড়েছে, কোথাও বা যুদ্ধরত সৈনিকের মুমূর্ষু চেহারা, আবার কোথাও খেটে-খাওয়া মানুষের ঘর্মাক্ত রূপ। কোথাও আবার প্রার্থনারতা যুবতীর নতজানু দেহভঙ্গী। ভিখিরির গলার কাঁপাকাঁপা পেশিবন্ধন নিখুঁত হয়ে ধরা পড়েছে লিওনার্দোর তুলির আঁচড়ে।

এইসব ছবির উপকরণ সংগ্রহের জন্য অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছে শিল্পীকে। ঘন্টার পর ঘন্টা হাসপাতালে বসে কাটিয়েছেন মুমূর্ষু বৃদ্ধের শেষ অবস্থা দেখার জন্য।

ফাঁসিকাঠে ঝোলার আগে কয়েদীর মানসিক প্রতিক্রিয়া কেমন হয় তাও তিনি তন্ময় হয়ে লক্ষ্য করেছেন।

লিওনার্দো নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি পছন্দ করি অদ্ভুত ধরনের কাজ করতে।' এই অদ্ভুত কাজের নেশাই তাঁকে চিত্রকর, সমরযন্ত্রের কারিগর, বীণাবাদক, শল্যচিকিৎসক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি পেশায় দক্ষ করে তুলেছিল।

এই বহুমুখী দক্ষতার জন্যই তাঁর সময়ে তিনি 'একের মধ্যে দশ মানুষ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

নতুন কিছু জানার প্রবল আগ্রহ ছেলেবেলা থেকেই ছিল লিওনার্দোর। এর ফলেই প্রকৃতির বুকের বিভিন্ন রহস্য ও সমাধান ধরা পড়েছিল তাঁর কাছে। এইভাবেই তিনি চিত্রশিল্পী থেকে হয়ে উঠলেন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ অবদান তাঁকে সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানীদের মধ্যে স্থান করে দিয়েছে।

লিওনার্দো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহিত হয়েছিলেন মূলত ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই। চিত্রশিল্পীর অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি অনুভব করেছিলেন যে, সার্থকচিত্রশিল্পী হতে গেলে বিজ্ঞানের কয়েকটি বিভাগের বিস্তারিত জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

সেই লক্ষ পূর্ণ করতে গিয়ে তিনি আলোকবিদ্যা, চর্ম্মের গঠনবৈচিত্র্য, শারীরস্থান প্রভৃতি বিষয়ে আকৃষ্ট হন।

লিওনার্দো তাঁর চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ এলোমেলোভাবে টীকার আকারে লিখে রাখতেন। তাঁর যে নোট বইটি পাওয়া গেছে তাতে পৃষ্ঠা সংখ্যা সাত হাজার।

তাতে পাওয়া গেছে, শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যার বিভিন্ন গবেষণা, যুদ্ধাস্ত্র, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, উড়ন্ত যান, ব্যঙ্গ চিত্র, ধাঁধাঁ, অঙ্ক, সঙ্কেত চিত্র প্রভৃতি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের মাথায় প্রথম আসে উড়োজাহাজ বা হেলিকপ্টারের কথা। অথচ চারশ বছর আগেই পঞ্চাশ শতাব্দীতে লিওনার্দো ডানাওয়ালা উড়ন্ত যান ও ডানাহীন যানের নানা ধরনের নকশা তৈরি করেন।

আশ্চর্যের বিষয় হল, উড়ন্ত যানের অ্যাবজরভার ধরনের যন্ত্রের কথা পর্যন্ত তাঁর নকশায় বলা হয়েছে।

উড়ন্ত যানের নকশা তৈরি করবার জন্য বাতাসের স্রোতে উড়ন্ত পাখির ডানার বিস্তারের পদ্ধতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করতে হয়েছে তাঁকে। দড়ি তৈরির উন্নত যন্ত্র, ফাইল তৈরির যন্ত্র, শান দেওয়ার যন্ত্র, বায়ুচালিত কল, সুর রচনার জন্য বিভিন্ন ধরনের নতুন যন্ত্র ও সূঁচও তিনি বানিয়েছিলেন। বল বিয়ারিং ব্যবহার করা একটি জলঘড়িও তাঁর ছিল।

ত্রিশবছর বয়স পর্যন্ত লিওনার্দো ফ্লোরেন্সে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৪৮২ খ্রিঃ তিনি ফ্লোরেন্স ছেড়ে মিলানে আসেন।

সেই সময়ে মিলানের শাসনকর্তা ছিলেন কাউন্ট লু দোভিকো। একবার তিনি বাদ্যযন্ত্রশিল্পীদের এক সভার আয়োজন করেন। দেশ-দেশান্তরের শিল্পীরা জড়ো হলেন সেই সভায়।

লিওনার্দোও উপস্থিত হলেন নিজের হাতে তৈরি রুপোর একটা যন্ত্র নিয়ে, যন্ত্রের আকৃতি অনেকটা ঘোড়ার মাথার মত।

শিল্পীদের সভায় দাঁড়িয়ে লিওনার্দো সেই যন্ত্র বাজিয়ে সকলকে স্তম্ভিত করেছিলেন। মুগ্ধ কাউন্ট লিওনার্দোকে ডেকে চাকরি দিলেন। মিলানের প্রধান চিত্রশিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হলেন তিনি।

নিজের পেশাদার কাজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিওনার্দো কাউন্টকে লেখা পত্রে বিভিন্ন সামরিক ও নৌবিদ্যা সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও নির্মাণে তাঁর পারদর্শিতাব কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন।

এটা করেছিলেন ইচ্ছে করেই, কেননা তিনি জানতেন একজন শাসকের কাছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চাইতে যুদ্ধে জেতার অস্ত্রের আকর্ষণই বেশি হওয়া স্বাভাবিক।

লিওনার্দোর উল্লিখিত সামরিক যন্ত্রপাতির মধ্যে সাঁজোয়া গাড়ি, আগুনে বোমা, স্থানান্তরযোগ্য সেতু, উঁচু প্রাচীরে আরোহণের উপযোগী দড়ির মই, বিশালাকার গুলতি, গোলা চালবার উপযুক্ত আড় ধনুক প্রভৃতি ছিল।

সেই সময়ে ইতালীর বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। ফলে তাঁকে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কাজেই এখানে বেশি সময় ব্যয় করতে হত। এই সময়েই লিওনার্দো ডাইভিং সুট ও সাবমেরিনের পরিকল্পনা করেন।

কিন্তু সাবমেরিনের নির্মাণকৌশল তিনি প্রকাশ করেননি। তাঁর ভয় ছিল, তাঁর এই যন্ত্র মানুষ ভবিষ্যতে সমুদ্রের তলদেশ থেকে মানবজাতির ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করতে পারে।

মিলানে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভা দেখা দেয় ১৪৮৫ খ্রিঃ। এই সময়েই লিওনার্দো অঙ্কন করেন তাঁর বিখ্যাত চিত্র দি লাস্ট সাপার। কাউন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রটি সান্তামেরিয়ার ভোজনকক্ষে স্থান লাভ করে।

লিওনার্দোর নোটবুকটি আবিষ্কার না হলে সাবমেরিনের মত তাঁর অনেক আবিষ্কারের কথাই বিশ্ববাসীর অজানা থেকে যেত। নীলামে উঠেছিল নোটবুকটি এবং উচ্চমূল্য নির্ধারিত হয়েছিল সেটির।

কেবল বিষয়বস্তুর জন্যই নয় নোট বুকটির অন্যতম আকর্ষণ ছিল তার হস্তলিপি। সবই ছিল উল্টোভাবে লেখা— আয়নার সামনে ধরে পড়তে হয়। নোটবুকের পাঠোদ্ধার হলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলেছিলেন আরো আগে এসব কথা জানা গেলে আজকের বিজ্ঞানীদের বহু শতাব্দীর পরিশ্রম বেঁচে যেত।

নোটবুক থেকেই জানা গেছে ভবিষ্যৎ মহাযুদ্ধে যেসব মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হবে, তার অধিকাংশই লিওনার্দোর আয়ত্তে ছিল।

স্পেন-আমেরিকার যুদ্ধে যে গাটলিং গান ব্যবহৃত হয়েছে, তার পথপ্রদর্শক ছিল লিওনার্দোর আবিষ্কৃত মেশিনগান।

তাঁর পরিকল্পিত বন্দুকটি ত্রিভুজাকৃতির অবলম্বনের ওপরে দাঁড় করানো যেত। অনেকগুলো নল ছিল বন্দুকের। প্রথম নল থেকে যখন গুলি ছোঁড়া হবে, তখন দ্বিতীয় নলে গুলি ভর্তি হবে।

আবার দ্বিতীয় নলে যখন গুলি ছোঁড়া হবে তখন প্রথম নল ঠান্ডা হবে। এমনি আধুনিক ব্যবস্থা ছিল সেই বন্দুকের।

লিওনার্দোর অন্যতম আবিষ্কার ছিল দুই কাঠামো বিশিষ্ট জাহাজ। ওপরের অংশ শত্রপক্ষের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও জাহাজটি জলে ভাসতে পারত অভ্যন্তরীণ কাঠামোর জোরে।

বিজ্ঞানীদের যেসব আবিষ্কার আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব করেছে, লিওনার্দোই ছিলেন তার পথপ্রদর্শক।

এই কারণে বিজ্ঞানের জগতে লিওনার্দো প্রথম আধুনিক বা The first Modern বলে স্বীকৃত।

লিওনার্দোর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর হিসেব দেওয়া এককথায় অসম্ভব। কয়েকটি বিশেষ অবিষ্কার যা আমাদের জানা উচিত তা হল— বাতাসের বেগ পরিমাপক যন্ত্র অ্যানিমোমিটার, আধুনিক কালের স্বয়ংচালিত গাড়ির অডোমিটার তাঁরই আবিষ্কার।

লিওনার্দোর পরিকল্পিত ঘড়িতেই সর্বপ্রথম ঘন্টা ও মিনিটের সময়সূচক হিসেবে দুটি কাঁটা ব্যবহৃত হয়।

ভার উত্তোলনের সুবিধার জন্য অটোমোবাইল জ্যাকের মত একটিযন্ত্রও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। স্বয়ংচালিত দূরযানের বেগ নির্দেশক যন্ত্র স্পিডোমিটার তাঁরই আবিষ্কার।

এছাড়াও স্ক্রু-কাটিংমেসিন, ধাতু-ছেদন যন্ত্র, চাষের উপযোগী বুলডজার. সিমেন্ট মিশ্রণের যন্ত্র, নদী থেকে কাদা তোলার যন্ত্র—এ সব কিছুই লিওনার্দো আবিষ্কার করেছিলেন।

লিওনার্দোই প্রথম ব্যবহার করেন মেগনেটিক নিডল বা চুম্বক-শলাকা। তিনি প্রমাণ করে দেখান যে আমাদের পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। ডিফারেনশিয়াল গিয়ার-এর তিনিই উদ্ভাবক, ইঞ্জিন চালনার যে চালনচক্র বা প্রপেলার তা-ও তাঁর আবিষ্কার।

গাণিতিক হিসাবের বিষয়বস্তুকে রেখাচিত্রে বা গ্রাফস-এর সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা তিনিই প্রথম করেন।

এককথায় বলা চলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই লিওনার্দোর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। নিউটনের বহু পূর্বেই লিওনার্দো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা উল্লেখ করে গেছেন।

গ্যালিলিওর অনেক আগে লিওনার্দোই প্রথম সৌরজগৎ সম্বন্ধে স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে আসেন।

তিনি তাঁর নোটবইতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, পৃথিবী ডিম্বাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র নয়, অন্যান্য অনেক গ্রহের মধ্যে একটি। যেসব নক্ষত্র আমরা খালি চোখে আকাশে দেখতে পাই সেগুলো কোটি কোটি মাইল দূরে। আমাদের সূর্য এই লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে একটি।

সূর্যরশ্মির যে সাতটা রং আছে, যার বিচ্ছুরণ আমরা দেখতে পাই আকাশের রামধনুতে, এই বর্ণালীর বিষয়টিও লিওনার্দো নিউটনের আগেই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

ছবি আঁকার প্রয়োজনেই মানবদেহের প্রত্যেক স্থানের অস্থি ও পেশী খুঁটিয়ে দেখার জন্য বহু শব ব্যবচ্ছেদ করেন লিওনার্দো। এই বিষয়ে তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এঁকে রেখে গেছেন তিনি। নরকঙ্কাল ও নরদেহের মাংসপেশীর সঠিক বর্ণনা তিনিই প্রথম দেন।

লিওনার্দোর মানবদেহ সংক্রান্ত অসংখ্য চিত্র ও স্কেচের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশই ছিল হৃদপিন্ডের ওপর। হৃদপিন্ডের গঠন, কার্য ও ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করেন।

তিনিই প্রথম দেখান যে, ফুস ফুস থেকে বায়ুনলের যে শাখাপ্রশাখা রয়েছে, তার সঙ্গে হৃদপিন্ডের কোন যোগ নেই।

হৃদপিন্ডের ব্যবচ্ছেদ, অঙ্কন ও ছাঁচ নির্মাণের দ্বারা বহু পরীক্ষার পর লিওনার্দো মহাধমনীর মূলে অবস্থিত কপাটিকা বা ভালব আবিষ্কার করেন। এই কপাটিকাগুলি কেবল একদিকেই রক্ত সংবহনের কাজ করে। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে হৃদপিন্ডের চারটি নিলয় বা Ventricle থাকে।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত স্থপতিবিদ্যাতেও লিওনার্দোর বিচরণ ছিল অত্যন্ত সাবলীল। আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যায় তাঁর অবদান নগণ্য নয়। তিনি রাস্তা, গির্জা, সোপান শ্রেণী, আস্তাবল, কেন্দ্রীয়ভাবে তাপের ব্যবস্থা এবং ছোট ছোট শহরের নানা ধরনের নকশা তৈরি করেন।

দীর্ঘদিন ধরে বহু বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন, বহু কিছু উদ্ভাবন করেছেন লিওনার্দো। পড়ন্ত যৌবনে এসে তিনি কেমন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর শিল্পদৃষ্টিও হয়ে এল স্তিমিত।

কাজকর্ম ছেড়ে কিছুকাল ঘুরে বেড়ালেন মানটুয়া, ভেনিস, রোম, পার্মা প্রভৃতি স্থানে। শেষে জন্মভূমি ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন। শেষ জীবন কাটে তাঁর রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের অতিথি রূপে।

তাঁর উদভ্রান্ত অবস্থার সময়ে আঁকা অবিস্মরণীয় ছবি মোনালিসা চিত্র। চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছিল ফ্লোরেন্সের গিয়োকেন্সের স্ত্রী লিসা জেরারডিনির ওপরে।

লিসা ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। কিন্তু তাঁর সাজপোশাকে কোন জাঁকজমক থাকত না। ঘোর কালো রঙের পোশাক শরীরে রাখতেন তিনি। সম্ভ্রান্ত ঘরের অন্যান্য মেয়েদের মত হাতে কোন ঘড়িও ব্যবহার করতেন না।

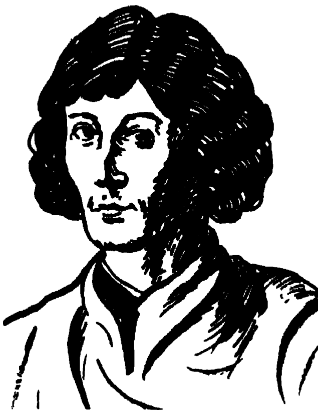
তাঁর কাল পোশাক গ্রহণের পেছনের কারণটি ছিল বড়ই করুণ। একমাত্র শিশুপুত্রের মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন তিনি। জীবনে বেঁচে থাকার সার্থকতাই যেন তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

লিওনার্দোর ওপর যখন লিসার ছবি আঁকার ভার পড়ে, তখন তার বয়স মাত্র একুশ। ছবিটি সম্পূর্ণ করতে শিল্পীর সময় লেগেছিল ছয় বছর। একই পোশাকের পটভূমিতে লিসার শোকাতুরা মূর্তিটি ধরে রেখেছেন লিওনার্দো।

কিন্তু তাঁর ঠোঁটে জুড়ে দিয়েছেন এক রহস্যময় বিচিত্র ক্রূর হাসি। এ যেন হাসি নয়, জীবনের প্রতি অনুচ্চারিত বিদ্রূপ আর অবজ্ঞা। মোনালিসা চিত্রের এই রহস্যময় হাসি চিত্রজগতের ইতিহাসে অনন্য।

সর্বকালের বিস্ময়মানব লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ১৫১৯ খ্রিঃ ২রা মে দক্ষিণ ফ্রান্সে অত্যন্ত সাধারণ এক মানুষের মত লোকান্তর যাত্রা করেন।

নিকোলাস কোপার্নিকাস



প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক-বিজ্ঞানী টলেমির একটি ধারণা থেকেই গঠিত হয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূলভূমি। মানবসভ্যতার উষালগ্নে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, পৃথিবী হল সৌরজগতের কেন্দ্রভূমি। তার চারপাশে সদা আবর্তনশীল সূর্য চন্দ্র গ্রহ ও অসংখ্য নক্ষত্রের জগৎ।

সেই যুগে মহাজ্ঞানী টলেমির এই ধারণাটিই মহাসত্যরূপে গৃহীত হয়েছিল।

তবুও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল সেই যুগেরই আর এক গ্রীক মনীষা পিথাগোরাসের কণ্ঠে।

তিনি বলেছিলেন, টলেমির ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য—পৃথিবী নয়। পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

এইভাবেই বিতর্কের শুরু। কিন্তু টলেমির ধারণা অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। পরবর্তীকালে গ্রীক চিন্তাবিদ অ্যারিস্টটল পিথাগোরাসের তত্ত্বকে উড়িয়ে দিলেন মিথ্যা বলে।

তিনি টলেমির তত্ত্বকেই সমর্থন করে বলেছিলেন, পৃথিবী স্থির, সূর্যসহ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র তার চারদিকে পরিক্রমা করে চলেছে এই তত্ত্বই সত্য।

পিথাগোরাসের প্রতিবাদী কণ্ঠ কিন্তু স্থির হয়ে যায়নি। যে সত্যের ভিত্তিতে তিনি টলেমির তত্ত্বকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেই সত্যকে নতুন করে তুলে ধরেছিলেন নিকোলাস কোপার্নিকাস।

এই মহাবিজ্ঞানীর তত্ত্বের ভিত্তিতেই উত্তরকালে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল।

পোলান্ডের ভিস্টলা নদীর তীরবর্তী টোরুন (Tarun) নামে বন্দর শহরে ১৪৭৩ খ্রিঃ কোপার্নিকাসের জন্ম। মাত্র দশ বছর বয়সেই পিতৃহারা হন তিনি।

তাঁর মামা ছিলেন পোল্যান্ডের একজন বিশিষ্ট বিশপ। পিতার মৃত্যুর পর কোপার্নিকাস মামার কাছেই মানুষ হতে থাকেন।

বাবা ছিলেন বাণিজ্যের মানুষ। তাঁর কাছে বাল্য বয়স থেকে দেশ-বিদেশেব সাগর ও বন্দরের রোমাঞ্চকর গল্প শুনে কল্পনার এক স্বপ্নরাজ্য গড়ে উঠেছিল কোপার্নিকাসের মনে।

মামা ছিলেন বাস্তববাদী, সবকিছুকে যাচাই বাছাই করে প্রকৃত সত্যের সন্ধান করবার প্রবণতা ছিল তাঁর স্বভাবজাত।

মামার সান্নিধ্যে কোপার্নিকাসের মধ্যেও এই গুণ সঞ্চারিত হল। মামার শিক্ষা ও সাহচর্যে বেড়ে উঠতে লাগলেন তিনি।

১৪৯২ খ্রিঃ উনিশ বছর বয়সে কোপার্নিকাস ভর্তি হন পোল্যান্ডের বিখ্যাত ক্রাকো বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে অধ্যয়ন করার সময়েই অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক ব্রুদেস্কির সান্নিধ্যে এসে কোপার্নিকাসের জীবনে এলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলেন তিনি।

১৪৯২ খ্রিঃ বিখ্যাত হয়ে আছে আরও একটি কারণে। সেই বছরই ইতালীয় নাবিক কলম্বাস নতুন এক মহাদেশ আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও কোপার্নিকাসকে কিন্তু পড়তে হল চিকিৎসাশাস্ত্র।

মানবহিতৈষী মামার ইচ্ছা ডাক্তার হয়ে কোপার্নিকাস আর্ত মানবের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করুন।

বিশপ মামার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেননি কোপার্নিকাস। কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করে আর্ত মানবতার সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

কিছুকাল পরে মামার অনুমতি নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য কোপার্নিকাস ইতালিতে গেলেন। ভর্তিহলেন বোলগানা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান হল তাঁর বিষয়।

সেই সময় পর্যন্ত জ্যোর্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রীক মনীষীদেরই প্রাধান্য। আবার অঙ্কের ক্ষেত্রে তার প্রাচীন ধারাটি ধারণ করে আছেন আরব পন্ডিতগণ।

দুই বিষয়ের মূল ধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য কোপার্নিকাস প্রথমে গ্রীক ও আরবী ভাষা শিক্ষা করতে লাগলেন।

ছবি আঁকা ও কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল কৈশোর থেকেই। ভাষা শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে তারও চর্চা চলতে লাগল।

বোলগানা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ চলাকালীনই রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বান পেলেন। সেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকের পদে যোগ দিলেন। সঙ্গে থাকল বিস্তৃত গবেষণার সুযোগ।

টলেমীর জ্যোতির্তত্ত্ব ও বিভিন্ন দার্শনিক মনীষীর মতামত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়েই সহসা একদিন এক জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হল। গভীর চিন্তা আশ্রয় করল কোপার্নিকাসকে।

তিনি লক্ষ্য করলেন টলেমির জ্যোর্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধেও মতামত রেখেছেন অনেক মনীষী। তাঁরা বলেছেন, পৃথিবী নয়, সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্র। অথচ টলেমির স্পষ্ট উক্তি, পৃথিবী স্থির, সৌরজগতের সমস্ত কিছুই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে নিজস্ব কক্ষপথ ধরে বৃত্তাকারে ঘুরছে।

কোপার্নিকাসের মনে প্রশ্ন জাগে, পৃথিবী যদি স্থির হবে, তাহলে পৃথিবীর বুকে ঋতু বৈচিত্র্য ঘটে কি করে ? দূর আকাশের তারাদেরই বা বছর বছর স্থান বদল ঘটে কেন ?

এই প্রশ্নটি মাথায় চেপে বসল। তিনি বুঝতে পারলেন, তত্ত্বটি সম্পূর্ণ করবার সুযোগ হয়নি কোন মনীষীর।

এতকাল এই অসম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে তাঁদেরও রাখা হয়েছে প্রকৃত সত্য থেকে দূরে।

নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিলেন কোপার্নিকাস। শেষ পর্যন্ত রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন বাড়িতে।

ততদিনে মামা বৃদ্ধ হয়েছেন। কোপার্নিকাস তাঁর সেবাযত্নের সঙ্গে পুনরায় দরিদ্রের সেবার নিয়োজিত করলেন নিজেকে।

কিন্তু যে জিজ্ঞাসার তাড়নায় অধ্যাপনার কাজ পরিত্যাগ করে এসেছিলেন তা কিন্তু অন্তরে সদা জাগরুক ছিল। সৌরজগতের যথার্থ রূপটি জানার আগ্রহে দিনের পর দিন চলল তাঁর আকাশ পর্যবেক্ষণ।

দিনের বেলা চার্চের কাজ আর দরিদ্রের সেবার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই রাতে তিনি ছাদে গিয়ে ওঠেন মহাকাশের নক্ষত্রদের গতিবিধি বুঝবার জন্য।

অসীম বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায় এভাবে।

কখনো প্রাচীন পান্ডুলিপি খুঁজে সৌরসংসারের পরিচয় ঝালিয়ে নেন। গাণিতিক হিসাবনিকাশে ডুবে যান।

এইভাবে একসময় গড়ে ওঠে কোপার্নিকাসের গ্রহ আবর্তনের তত্ত্ব। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই চার গ্রহের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতেও সমর্থ হন।

এরপর চলে নিজস্ব ছকে সত্যতা নির্ণয়ের পালা। কিছুকালের মধ্যেই বুঝতে পারলেন গ্রহ-তারাদের গতিধারা নিয়ে তাঁর গাণিতিক ছক নির্ভুল।

উল্লসিত হয়ে ওঠেন কোপার্নিকাস। গ্রহ-তারাদের নিত্যকালের পথ-পরিক্রমার সঠিক নিয়মটি এতদিনে ধরতে পেরেছেন তিনি।

১৫০৯ খ্রিঃ থেকে ১৫১১ খ্রিঃ মধ্যে কোপার্নিকাস তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের আবিষ্কার সম্পূর্ণ করলেন। তাঁর তত্ত্বের সারকথা হল, সৌর-মন্ডলের সকলেই এমনকি পৃথিবীও স্থির নয়—সকলেই চলমান নিজস্ব কক্ষপথে। সূর্যকে ঘিরেই চলে তাদের পরিক্রমণ।

সূর্যই সৌরমন্ডলের কেন্দ্র। প্রথমে বুধ তারপর একে একে শুক্র, পৃথিবী ও চাঁদ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, সেই সঙ্গে অসংখ্য নানাজাতের নক্ষত্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

পৃথিবী তার নিজস্ব কক্ষপথে লাটিমের মত আবর্তিত হতে হতে তার সূর্য প্রদক্ষিণের কাজ সম্পূর্ণ করে। নিজস্ব কক্ষে এভাবে পাক খায় বলেই পৃথিবীতে চলে দিন আর রাতের অবিরাম যাতায়াত।

সমগ্র কাজটিই চলে প্রকৃতি নির্দিষ্ট একটি গাণিতিক রীতিতে। গণিতের হিসাব থেকেই বলে দেওয়া সম্ভব কখন কোন গ্রহ কক্ষপথের কোন স্থানাঙ্কে অবস্থান করছে।

গ্রহণের সময় নির্দেশ করাও সম্ভব পরিপাটি গণিত থেকে।

ষোল শতকের প্রথম দশকে দেশজুড়ে চলেছে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের ঢেউ। চিন্তাশীল মানুষদের নেতৃত্বে ক্রমশ ধসে পড়ছে পুরনো ভাবনা-চিন্তা।

পারিপার্শ্বিকের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও কোপার্নিকাস তাঁর নবাবিষ্কৃত তত্ত্বের কথা ঘোষণা করবার সাহস পেলেন না। সমাজে চার্চের অনুশাসন তখন সুদৃঢ়। প্রকৃতির সহজ সত্যের কথাও ধর্মাশ্রয়ী প্রাচীনপন্থীর দল মেনে নিতে চাইবে না কিছুতেই।

সুবিধাভোগী প্রাচীনের দল প্রকৃতির সত্যকেই ঘোষণা করবে বাইবেল-বিরোধী প্রচারণা বলে। চার্চের রাজত্বে ধর্মদ্রোহীর দন্ডবিধান অনিবার্য।

বাধ্য হয়ে স্বাধীন চিন্তার আলোকপ্রাপ্ত রেনেসাঁর নেতৃবৃন্দের শরণাপন্ন হতে হয় তাঁকে। বক্তৃতা আলোচনা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কোথাও নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করবার সাহস পেলেন না কোপার্নিকাস।

রেনেসাঁর কর্মকর্তারাও তাঁকে অভয় দেবার সাহস দেখাতে পারলেন না।

প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের পিতা প্রগতিমনা মার্টিন লুথার-এর কানেও একসময় কোপার্নিকাসের অভিনব তত্ত্বের কথা পৌঁছল। কিন্তু হলে হবে কি, প্রতিবাদী ধর্মের ভিত্তিও যে সেই বাইবেল। আর কোপার্নিকাসের কথা যে বাইবেলের ঘোষণার বিপরীত।

মার্টিন লুথার সমর্থন তো করলেনই না উল্টে মন্তব্য করলেন, "He is a fool who wants to turn the whole art of astronomy upside down"।

কোপার্নিকাস হতাশ হলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পৃথিবী কেন্দ্রিক তত্ত্ব যা বাইবেল স্বীকৃত, তা যে মিথ্যা, মহাবিশ্বের সব কিছুরই গতি যে সূর্যকেন্দ্রিক এবং তাই-ই প্রাকৃতিক সত্য—একথা মেনে নেবার মত প্রস্তুত মানসিকতার মানুষ যে একটিও নেই দেশে।

কিন্তু সত্যের পূজারী যে সে তো নির্ভীক— সত্যপ্রকাশে কুণ্ঠা যে মিথ্যার কাছে হেরে যাবার সামিল।

অনেক চিন্তাভাবনার পর কোপার্নিকাস মনস্থির করে নিলেন। জীবন অস্তাচলের পথে, আর সময় বেশি পাওয়া যাবে না। পৃথিবী থেকে চলে যাবার আগেই এই মহাসত্যের ঘোষণা প্রচার করতে হবে।

দ্য রিভলিউশান অব হেভেনলি স্ফিয়ার বা দ্য রেভলিউশনিবাস অরবিয়াস সিলেসটিয়াম এই নাম দিয়ে নিজের তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিবরণ বিবৃত করে একটি বই রচনা করলেন কোপার্নিকাস।

এই বৈপ্লবিক বইটি তিনি উৎসর্গ করলেন মহামান্য পোপ তৃতীয় পলের নামে। কোপার্নিকাস জানতেন তাঁর বই চার্চের রোষদৃষ্টিতে পড়বে। কিন্তু পোপের নাম যুক্ত থাকলে হয়তো যাজকরা এই বই-এর ওপর হামলা করতে ইতস্ততঃ করবে। এই আশাতেই বইটির সঙ্গে পোপের নাম যুক্ত করে দিয়েছিলেন।

এক তরুণ জার্মান পন্ডিতের প্রবল আগ্রহে কোপার্নিকাস তাঁর বইয়ের পান্ডুলিপি তাঁকে দেন। ১৫৪৩ খ্রিঃ কোপার্নিকাস যখন শয্যায় তখন তাঁর বহু বছরের পরিশ্রম বই আকারে প্রকাশিত হয়।

জীবিতকালে কোপার্নিকাস তাঁর নিজস্ব মতবাদের স্বীকৃতি না পেলেও ১৫৮২ খ্রিঃ পোপ গ্রেগরি ক্যালেন্ডার সংশোধন করেন সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই।

সৌরজগৎ যে সৌরকেন্দ্রিক এই মতবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন কোপার্নিকাসের ১৮০০ বছর আগেকার সামোসের গ্রীক জ্যোতির্বিদ অ্যারিসটারকাস। কোপার্নিকাস সেই মতবাদকে নির্ভুল গাণিতিক যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৫৪৩ খ্রিঃ পোলান্ডে এই কর্মময় প্রাণবন্ত জ্ঞানপিপাসু বিজ্ঞানী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কোপার্নিকাসকে কেবল আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের রূপকার বললে তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

তিনি ছিলেন একাধারে ভাষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ, পুরোহিত, অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিজ্ঞ।

১৪৯১খ্রিঃ থেকে ১৪৯৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ কালে তিনি যে কেবল গণিত ও জ্যেতির্বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন তাই নয়, এখানে নানা যন্ত্রপাতির ব্যবহার গ্রহনক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণ করার কলাকৌশল আয়ত্ত করেন।

১৫০৩ খ্রিঃ ফেরারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্মযাজক সম্পর্কিত আইনের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি পান।

১৫০৬ খ্রিঃ পাদুয়া থেকে ফিরে এসে যখন চার্চের কাজে পিতৃব্যের সহযোগী হন সেই সময় সপ্তম শতাব্দীর বাইজেনটাইন কবি Theophylactus Simacotta-এর ৮৫টি কবিতা গ্রীক থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। ১৫০৯ খ্রিঃ ক্রাকাও থেকে তা পুস্তাকাকারে প্রকাশ করেন।

১৫২২ খ্রিঃ কোপার্নিকাস একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার উপায় ব্যক্ত করেন।

কোপার্নিকাস জানতেন good money এবং bad money দুটোই যদি একই সঙ্গে বাজারে চালু থাকে তাহলে জনসাধারণ ভাল টাকা রেখে মন্দ টাকা চালাবে, এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি হবে—এই ধারণা অর্থনীতিতে গ্রেসামের সূত্র নামে খ্যাত।

কোপার্নিকাস সুপারিশ করেন, মুদ্রা প্রবর্তনের ক্ষমতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত। যাজক থাকাকালীন তাঁকে অনেক রাজনৈতিক সঙ্ঘাতও সামাল দিতে হয়েছে।

১৫৪২ খ্রিঃ পর্যন্ত কোপার্নিকাসের জীবন বহুবিধ কর্মকান্ডের মধ্যে কাটে। এই দীর্ঘসময়ে তিনি তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ না করে তাকে নানাভাবে উন্নততর করার চেষ্টা করেছেন।

তবে ১৫১২ খ্রিঃ পিতৃব্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কোপার্নিকাস একটি পান্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন তার নাম Commintariolus অথবা Small Commentary। এই পান্ডুলিপিতে তিনি তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের কথা লিখে রেখেছিলেন।

আন্দ্রেঁ ভেসালিয়াস



ষোড়শ শতাব্দীর প্যারিস। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমি বিভাগের খুব নামযশ তখন। দারুণ এক গুণী অধ্যাপক জেকোবাস সিলভিয়াস সশরীরে বর্তমান এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ফলে দেশ বিদেশের ছাত্রদের ভিড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগে।

তরুণ আন্দ্রেঁ ভেসালিয়াসও এসেছেন এই অধ্যাপকের নামডাক শুনে। কিন্তু কয়েকদিন ক্লাশ করবার পরেই তাঁর আক্কেল গুড়ুম। মন হতাশায় ভরে গেল। বস্তাপচা পুরনো সব তত্ত্ব নিয়ে কেবল ঘাঁটাঘাঁটি করছেন অধ্যাপক। নতুন কোন ভাবনার কথা জানাবার গরজও নেই, ভাবনাও যে আছে, তা পড়াবার ধরন ধারণ দেখে মনে হয় না।

বিরক্ত হতাশ ভেসালিয়াস তবু ধৈর্য ধরে অধ্যাপকের ভ্যানরভ্যানর শুনে চলেন। কি করবেন অতঃপর সেই চিন্তা অনবরত মাথায় পাক খেতে থাকে।

শবব্যবচ্ছেদের ক্লাশে যেদিন ঢুকলেন, সেদিন ধৈর্য রক্ষা করাই কষ্টকর হল তাঁর পক্ষে।

টেবিলের ওপর শায়িত একটা মৃতদেহ। পচা গন্ধে ভুরভুর করছে ঘর। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে অধ্যাপক সিলভিয়াস যা বলতে শুরু করলেন, সেসব কথা একহাজার বছরের পুরনো। সেই কবে গ্যালেন তাঁর ধারণার কথা যেমন যেমন বলে গেছেন, তিনিও তাই নির্বিকারভাবে আবৃত্তি করে চলেছেন। স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত যেন।

হাতে লম্বা ছোরা নিয়ে কশাইমার্কা চেহারার এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের পাশে। সিলভিয়াসের হুকুম মত এটা ওটা সেটা খটাখট কেটে চিমটের ডগায় তুলে এগিয়ে দিচ্ছে। সেই অংশের দিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সিলভিয়াস এমন ভাব করছেন যেন মানব শরীরের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁর নখদর্পণে।

ছাত্ররাও অধ্যাপকের করিৎকর্ম দেখে মুগ্ধ। কিন্তু একমাত্র মুগ্ধ হতে পারেন না একজন, তিনি ভেসালিয়াস। কেবল তিনিই বুঝতে পারছেন, অধ্যাপকের মুখ থেকে যা বেরিয়ে আসছে তা নিতান্তই ভূষিমাল।

সারা ইউরোপ জুড়ে প্রফেসর সিলভিয়াসের অ্যানাটমির নামডাক। আর ভেসালিয়াস হলেন এক পুঁচকে ছাত্র। তাঁর কি অধ্যাপকের কথার কোন প্রতিবাদ করা সাজে। না তা ধোপে টিকবে। বিশেষ করে অধ্যাপক নিজে যেখানে আত্মসন্তুষ্টিতে টগবগ করছেন।

ডেকে বিপদ আনতে আর কে চায়। তাই সিলভিয়াসকেও সব জেনে বুঝে মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হয়।

দিনের পর দিন কাটে—শেখার ঘরে টুঁ টুঁ। সময়ের এমন অপচয় কাঁহাতক সহ্য হয়? ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল একদিন।

শবব্যবচ্ছেদের ঘরে সেদিনও অধ্যাপকের সঙ্গে ছাত্ররা জড়ো হয়েছে শবের টেবিল ঘিরে।

সিলভিয়াস কি আদেশ করলেন, সেই কশাইমার্কা চেহারার ভদ্রলোক, শবের শরীর হাতড়ে চলেছেন, কিন্তু খুঁজে আর পাচ্ছেন না কিছুতে।

অধ্যাপক নাকে রুমাল চেপে ছোঁয়াছুঁয়ির সীমার বাইরে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত হাঁক পাড়ছেন, ভাল করে খুঁজলেই শবের শরীরে অংশটা খুঁজে পাওয়া যাবে।

কশাই ভদ্রলোকের বেগতিক অবস্থা দেখে ভেসালিয়াস আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। একবার সভয়ে অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন।

কশাই ভদ্রলোককে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই ক্লাশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে নিলেন।

নির্বিকারভাবে, মৃতদেহের নানা অংশ তুলে ধরে মনোগ্রাহী ভাষণে বুঝিয়ে দিতে থাকেন ছাত্রদের।

অপ্রস্তুত অধ্যাপক দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন আগের মতই। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল যথেষ্ট ক্ষুব্ধ তিনি এই বিদেশি ছাত্রের স্পর্ধা দেখে। কিন্তু ভেসালিয়াসের বক্তৃতা আর শবাংশ প্রদর্শনের কায়দায় ছাত্ররা এমনই মগ্ন হয়ে গেছে যে তাঁর দিকে খেয়াল দেবার কথাও তাদের মন থেকে মুছে গেছে। নিঃশব্দে অপমান হজম করে সবার অলক্ষ্যে ক্লাশ থেকে সরে পড়েন তিনি।

মাত্র আধঘন্টার ক্লাশ নিয়েছেন ভেসালিয়াস, তার মধ্যেই তিনি সব ছাত্রের মন জয় করে নিলেন। ক্লাশ শেষ হলে সকলে তাঁকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়ে যে যার নিজের জায়গায় চলে গেল।

এদিকে সিলভিয়াস যথেষ্ট অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হলেও তখনই ভেসালিয়াসকে কিছু বললেন না। বুদ্ধিমান তিনি। প্যারিসে অধ্যাপনার সঙ্গে ভাল দর্শনির জমজমাট কোচিং ক্লাশ খুলেছেন তিনি।

পাছে তাঁর এই জমিয়ে বসা আসরের সুনাম বিঘ্নিত হয়ে তাঁর আর্থিক ক্ষতির কারণ ঘটায় সেই আশঙ্কায় সাময়িকভাবে চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধির কাজ বলে বিবেচনা করেছেন।

কিন্তু মনে মনে প্রস্তুত হয়ে রইলেন সুযোগের, সেই সময়েই অপমানের সমুচিত জবাব দেবেন।

এই দিনের ঘটনা থেকে ছাত্ররা এটা বুঝে গিয়েছিল যে ভেসালিয়াসের কাছ থেকে তাদের জানার বিষয় যথেষ্ট রয়েছে।

তারা অধ্যাপককে অনুরোধ জানান প্রতিদিন অন্ততঃ একটি অ্যানাটমির ক্লাশ ভেসালিয়াসকে ছেড়ে দেবার জন্য।

বাধ্য হয়েই ছাত্রদের দাবি মেনে নিতে হল সিলভিয়াসকে। ভেসালিয়াস এই আকস্মিক যোগাযোগেই ছাত্রদের মধ্যে হিরো বনে গেলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না যে ছাত্র হিসেবে তাঁর এই ঔদ্ধত্য সিলভিয়াসকে তাঁর শত্রু করে তুলেছে।

সেদিন বুঝতে না পারলেও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন উত্তরকালে। প্রিয় বিষয় অ্যানাটমি থেকে তাঁকে সেদিন মাথা নত করে দূরে সরে আসতে হয়েছিল। বড় বেদনাময় সেই ঘটনা।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগে ছাত্র হিসেবে পড়তে এসেছিলেন ভেসালিয়াস। কিন্তু শবব্যবচ্ছেদ ঘরে নিয়মিত ছাত্রদের ক্লাশ নেবার অঘটনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হল তাঁকে অদ্ভুতভাবে। সেই সময়ে বয়স তাঁর মাত্র আঠার। সময় ও বয়স অনুপাতে জ্ঞানের সমৃদ্ধিই তাঁর জীবনে এমন একটি অঘটন সম্ভব করেছিল।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস। এই শহরেরই এক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক পরিবারে জন্ম হয়েছিল ভেসালিয়াসের।

বংশানুক্রমে চিকিৎসাবিদ্যা এই পরিবারের পেশা। রক্তে সেই প্রবণতা নিয়েই জন্মেছিলেন ভেসালিয়াস।

তাঁর মা-ও ছিলেন বিদুষী। ষোড়শশতকের পরিবেশে রীতিমত এক ব্যতিক্রম। রান্নার কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়াশোনা করবেন বলে, রান্নার ঘরের পাশের ঘরেই নানা বিষয়ের বই জড়ো করে রীতিমত একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন তিনি। চিকিৎসক পরিবারের বউ হিসেবে স্বাভাবিক কারণেই চিকিৎসাবিদ্যার বই পড়তেই বেশি ভালবাসতেন তিনি।

মায়ের এই পাঠাভ্যাস অতি অল্প বয়সেই দাগ কেটেছিল ভেসালিয়াসের মনে। স্বভাবতঃই এই পরিবেশে ভবিষ্যতে বড়চিকিৎসকহবার স্বপ্ন রূপ লাভ করেছিল তাঁর মনে।

মায়ের উৎসাহে নানা রোগের কারণ নিয়ে মাথা ঘামাবার অভ্যাস ছোটবেলাতেই গড়ে উঠেছিল ভেসালিয়াসের। শরীরের কোন অংশে কি রকম বৈকল্য দেখা দিলে কোন রোগের সম্ভাবনা প্রকট হয়ে ওঠার কারণ ঘটে তা জানার আগ্রহের সীমা ছিল না তাঁর।

ব্যাঙ, ছুঁচো, টিকটিকি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার অভ্যাসও সেই ছেলেবেলাতেই শুরু। রান্নাঘরের টেবিলেই ছুরি দিয়ে কাটাকুটি, ঘেঁটে ঘেঁটে নানা প্রাণীর শরীর দেখা, পরিচিত হওয়া বিভিন্ন অংশের সঙ্গে—এসব ব্যাপারে মায়ের উৎসাহ বরাবর তাঁর সহায় হয়েছে।

শরীরের কোন অংশের কি কাজ, কোথায় কোন প্রত্যঙ্গ কি ভাবে থাকে—মায়ের মুখে শুনতে শুনতে বড় হয়ে উঠেছেন ভেসালিয়াস।

খোলা মন, খোলা চোখ আর খোলাখুলি পরীক্ষা সেই সঙ্গে যখন বই পড়া বিদ্যার যোগ হয়, বিজ্ঞানের জ্ঞান হয় পাকাপোক্ত। এই সবকটি গুণই ছিল ভেসালিয়াসের মধ্যে—বইপড়া বিদ্যারও কমতি ছিল না কিছু। ফলে গোটা শরীরের রহস্য সবই জানা হয়ে গিয়েছিল তাঁর।

এই কারণেই মাত্র আঠারো বছর বয়সেই অ্যানাটমির জ্ঞান দেখিয়ে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন।

ঘরের লেখাপড়ার পাট শেষ হলে ব্রাসেলস শহরের একটা নামি স্কুলে ভর্তি' করিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভেসালিয়াসকে।

স্কুলের পড়া শেষ করে ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতর পাঠ নেবার জন্য ভর্তি হন লাউডেন শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বছর দুই-তিনের মধ্যেই ভেসালিয়াস রপ্ত করলেন গ্রীক, আরবি, হিব্রু ও ল্যাটিন। বিজ্ঞানের বিষয়ে পঠন-পাঠন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল খুবই অবহেলিত, তার ওপরে অ্যানাটমি শিক্ষার ওপরে রয়েছে চার্চের শাসন। মড়া কেটে পড়া-শোনার ঘোর বিরোধী ধর্মপিতারা।

বাধ্য হয়েই ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পাড়ি জমাতে হয় ভেসালিয়াসকে।

ফ্রান্সে ধর্মের আঁট অত নেই।

বিজ্ঞানের যুক্তিতে মানসিকতা এখানে খোলা হাওয়ায় লালিত হবার সুযোগ পায়।

এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিভাগের শবব্যবচ্ছেদের ঘরে মড়া কেটে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন ধর্মীয় বিধিনিষেধ নেই।

তার ওপরে বিভাগীয় অধ্যাপক সিলভিয়াসের খুবই নামডাক তখন। সারা ইউরোপ জুড়েই তাঁর সুখ্যাতি।

ভদ্রলোকের জ্ঞানের ঝুলিতে নিজস্ব চিন্তা ভাবনা বিশেষ কিছু না থাকলেও গ্যালেন ছিল পুরা দখলে। দিনের পর দিন ক্লাশে তাই কচপে নির্বিকারে ছাত্রদের বাহবা কুড়োতেন।

গ্যালেনের অন্ধ ভক্ত সিলভিয়াস তাঁর ওই সীমিত বিদ্যার জোরেই জাঁকিয়ে বসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ক্লাশের বাইরে মোটা দক্ষিণার বিনিময়ে নিজস্ব কোচিং-এ পাঠ দেওয়ার রেওয়াজও চালু করে ফেললেন।

ছাত্ররা ভাল ভাবেই জেনে গিয়েছিল যে তাঁর কোচিং নিলে ডাক্তারী পাশের পথে আর বাধা থাকবে না।

তাই সিলভিয়াসের কোচিংয়ে ছাত্রদের ভিড় জমতেও দেরি হতো না। বেশ মোটা দাগের উপরি একটা আয় প্রতিমাসে পকেটে আসতো তাঁর।

ছাত্ররা কিন্তু উপকৃত হত না কিছুই। ডাক্তারি শাস্ত্রে, বিশেষ করে অ্যানাটমিতে তাদের জ্ঞান ১৫০০ বছরের আগেকার গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনের গন্ডির মধ্যেই ঘুরপাক খেত।

তাদের মনের মধ্যে অধ্যাপকের শিক্ষার গুণে বদ্ধমূল হয়ে যেত, শরীরের অস্থিসন্ধি বিষয়ে গ্যালেনই সর্বশেষ কথা, তাঁর বইতে যা নেই শরীরের কোথাও তা থাকতে পারে না।

এই একমুখীন পরিবেশে ভেসালিয়াস আবির্ভূত হয়েছিলেন জীবন্ত প্রতিবাদের মত। গ্যালেনের বই পড়ে তিনি ভালভাবেই তার গলদগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

তিনি জানতেন শরীরের এমন অনেক অংশেব কথাই গ্যালেন বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যার অস্তিত্ব আদৌ মানব শরীরে নেই, অথবা তাঁর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে।

সিলভিয়াসের বিরাগ উৎপাদন করলেও ভেসালিয়াস সসম্মানেই চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক হলেন। স্নাতকোত্তর ক্লাশেও নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন।

এমনি দিনে আবার ঘটল দুর্ঘটনা। সেদিনও সিলভিয়াস অ্যানাটমির ক্লাশ নিচ্ছেন। ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর বক্তৃতা শুনছে। এই সময় হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ভেসালিয়াস।

অধ্যাপকের বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, নিজের হাতে মড়া কেটে পরীক্ষা করে তিনি দেখেছেন পনেরোশ বছর আগের গ্যালেনের অ্যানাটমিতে বিস্তর গলদ রয়েছে। সেই গলদ গুলোকেই নির্ভুল ভেবে তিনি বর্ণনা করে চলেছেন।

সবিনয়ে ভেসালিয়াস বললেন, আপনি অনুমতি করলে আমি নিজেই তা সকলের সামনে প্রমাণ করে দেখাতে পারি।

সিলভিয়াস জানতেন না যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির ঘরের মড়া নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না ভেসালিয়াস। রাতের অন্ধকারে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় প্রতিরাতেই তিনি হাজির হতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী ইনোসেন্ট কবরখানায়।

সবার অলক্ষ্যে কবরের মড়া কেটে পরীক্ষা করেছেন আবার সকাল হবার আগেই মৃতদেহ কবরে যথাস্থানে রেখে ছাত্রাবাসে ফিরে এসেছেন।

ছাত্রের হাতে কলমে জানার ব্যাপারটা জানতেন না বলেই সিলভিয়াস সেদিন একঘর ছাত্রের সামনে ভেসালিয়াসকে নানা শ্লেষাত্মক বিশেষণে বিদ্ধ করে বুঝিয়ে দিলেন যে গ্যালেনকে অমান্য করে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার অযোগ্যতাকেই তুলে ধরছেন।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সিলভিয়াস ও ভেসালিয়াসের বিরোধ প্রকাশ্যে এসে পড়ল। সিলভিয়াস নিজের প্রভাব প্রয়োগ করে নানাভাবেই ভেসালিয়াসকে জব্দ করার কৌশল করলেন। চিকিৎসা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকরাও বিরূপ হয়ে উঠলেন।

ক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে স্নাতকোত্তর পড়া অসমাপ্ত রেখেই ভেসালিয়াসকে হতাশা ও মর্মপীড়া নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হল।

সেই সময় তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর। সময়টা ১৫৩৬ খ্রিঃ।

অ্যানাটমির ক্লাশে গ্যালেনের গলদ ধরিয়ে দিতে গিয়েই নিজের জীবনে এই বিভ্রাট ঘটালেন তিনি।

এবারে আর কোথাও নাম লেখালেন না। লাউভেন শহরে নিজের ঘরে বসেই কুকুর, বেড়াল, শুওরের শরীর খুলে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ডুবে গেলেন।

তিনি লক্ষ্য করলেন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের শরীরের মিল অনেক। তাই তাদের শরীর ঘেঁটেই মানব শরীরের ভূগোল উদ্ধার করেন তিনি। সেই বিবরণ লিখে রাখেন খাতায়।

লাউভেন শহরে ধর্মীয় গোঁড়াপন্থীদের প্রাধান্য। তাদের চোখে মানুষের শরীরের ভেতরের কথা জানতে চাওয়া অন্যায় কাজ।

তাই মড়াকাটা এখানে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবেই গণ্য হয়। এদিকে এখানেই আস্তানা নিয়েছেন তিনি।

কিন্তু জানতে চায় বুঝতে চায় যে তার সামনে বাধা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসা অচিরেই সেই বাধাকে ধূলিসাৎ করে।

ভেসালিয়াসও উপায় বার করে ফেললেন। অপরাধীকে যেখানে ফাঁসি দেওয়া হয়, রাতের অন্ধকারে সেখানে আনাগোনা শুরু হয় তাঁর।

মৃতের শরীরের টুকরো টাকরা অংশ যা সংগ্রহ করতে পারেন তাই নিয়ে এসেই পরীক্ষায় বসেন।

এই কাজ করতে গিয়ে নিশাচর হিংস্র প্রাণীর কবলে পড়ে অনেকবারই জীবন সংশয় হয়েছে তাঁর। কিন্তু সেসব বিপদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেননি তিনি।

প্রহরীদের হাতে ধরা পড়লেও প্রাণদন্ড নিশ্চিত। তাই বলে গবেষণা তো বন্ধ হতে পারে না।

একবার খবর পেয়ে সদ্য কবর দেওয়া এক অপরাধীর মৃতদেহ রাতের অন্ধকারে ঘাড়ে করে নিয়ে আসেন বাড়িতে।

অক্ষত একটা দেহ। মনের সুখে সেই মড়া কেটেই অ্যানাটমির নানা দিকদর্শনের হদিশ পেয়ে যান।

একের পর এক আবিষ্কারের বিবরণে ভরে ওঠে তাঁর খাতার পাতা, ছোট বড় হাড় থেকে পেশী-তন্তু, এমন কি , কিভাবে হাড়ের ওপর টিউমার গজায়, এই সব বিষয়েই পরিষ্কার ধারণা গড়ে ওঠে তাঁর।

সবে যখন ২৪ বছর বয়স, নিজের ঘরেই অ্যানাটমির ছাত্রদের জন্য খুলে বসলেন ক্লাশ।

গ্যালেনের চিন্তা ছাড়িয়েও নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার কথা তিনি ছাত্রদের শেখাতে শুরু করেন। দেখতে দেখতে জমে ও ওঠে তাঁর অধ্যাপনা।

আবিষ্কার আর পর্যবেক্ষণের সমস্ত বিবরণ জড়ো করে কিছুদিনের মধ্যেই বার করলেন অ্যানাটমির একটা বই।

ততদিনে অবশ্য লাউভেন শহর থেকে ধর্মীয় শাসনের বিধিনিষেধ সরে গেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে মুক্ত আলো। মড়াকাটার সরকারী বিধিনিষেধ উঠে গেছে।

এখন প্রকাশ্য দিবালোকেই বেওয়ারিশ মড়া ধাঙড়েরা ভেসালিয়াসের ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়। কাজেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা লিখে প্রকাশ করতে কোন বাধাই ছিল না।

বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আলোড়ন পড়ে গেল চারদিকে। মানব শরীরের নতুন নতুন আবিষ্কারের বিষয় চমৎকৃত করল সকলকে।

এই বইয়ের সুবাদেই ডাক এলো লাউভেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। চিকিৎসা বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাঁকে অ্যানাটমির ক্লাশ নেবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির ঘরে শুরু হল ভেসালিয়াসের জীবনের নতুন অধ্যায়।

নতুন বিষয়ের উপস্থাপনা ও অধ্যাপনার গুণে রীতিমত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ভেসালিয়াসের ক্লাশগুলি। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছোট্ট লাউভেন শহরের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে অবশ্য পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে নিয়েছেন তিনি।

সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই অ্যানাটমি ও শল্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপনার চাকরিতে কর্মজীবন শুরু হয়ে গেছে তাঁর।

ভেসালিয়াসের অ্যানাটমির ক্লাশকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে বলা হয়েছে "First Anatomy Class in Medical History"।

ভেসালিয়াস নিজের ক্লাশে সরাসরি ছুরিকাঁচি নিয়ে মড়া কেটে শরীরের নানা অংশ তুলে ধরে তার কার্যকারিতা ছাত্রদের বোঝান।

তাদের উৎসাহিত করেন হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণের জন্য। এতকাল শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর সঙ্গে পরিচিতির জন্য নানা ড্রইং ব্যবহার করা হত। তিনি সেসব সরিয়ে দিলেন।

অধ্যাপনা আর গবেষণার কাজ করতে করতেই আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজও সম্পূর্ণ করেন ভেসেলিয়াস।

ছয় শতকের যুক্তিবাদী আরবীয় চিকিৎসক রাজেশ। তাঁর একটা বিখ্যাত বই অনুবাদের কাজ শুরু করলেন।

রাজেশ তাঁর বইতে বিশ্লেষণমুখী বর্ণনার মধ্য দিয়ে নিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন শরীরে কোন অংশে কোন রোগ দেখা দিলে কিভাবে তার চিকিৎসা করতে হবে সেই উপায়।

রাজেশের রোগ নিরাময়ের নির্দেশ অনুবাদের মাধ্যমে নাগালে পেয়ে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন ইউরোপের কৃতবিদ্য চিকিৎসক মহল।

ক্লাশ নেবার জন্য নতুন নতুন মড়ার প্রয়োজন হত। সেই সময় মড়াকে তাজা রাখার কোন উপায় আবিষ্কৃত হয়নি।

ফলে মৃতদেহে পচন ধরে কদিনের মধ্যেই কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ত। তার মধ্যেই নির্বিকারে ক্লাশ নিতেন ভেসেলিয়াস।

প্রতিমাসে একাদিক্রমে তিন সপ্তাহ তিনি ক্লাশ নিতেন। প্রতিটি ক্লাশ চলত আটঘন্টা করে। তাঁর শিক্ষাদানের প্রণালী এমনই প্রশংসিত হয়েছিল যে অনেক ডাক্তার ও গবেষক পর্যন্ত ছাত্রদের ভিড়ে মিশে তাঁর কথা শুনতেন। ভেসালিয়াস সবই জানতেন, কিন্তু তার জন্য তাঁর কোন অহমিকা ছিল না।

ভেসালিয়াসের ক্লাশে তিনি গ্যালেনের ভু লগুলি একের পর এক তুলে ধরতেন। নিজে জুড়ে দিতেন সংশোধনী।

এই ভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে গিয়ে ভেসালিয়াস উপলব্ধি করলেন, সাধারণ ছাত্রদের জন্য অ্যানাটমির একটা ভাল বই দরকার যার মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পথে একটা সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসৃত হবে।

তিনি সঙ্কল্প করলেন, সেই বই নিজেই লিখবেন। আর সেই বইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিস্তারিত বিবরণের সঙ্গে পৃথক ও স্পষ্ট ছবিও রাখতে হবে।

কিন্তু এই দুরূহ কাজ করবে কে? অ্যানাটমির অংশ বুঝে নিখুঁত ছবি আঁকা তো সহজ কাজ নয়। এমন একটা বিদঘুটে কাজে হাত দিতে কোন চিত্রকরই রাজি হতে চাইবেন না।

এই ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত যে বিজ্ঞান ভাবাপন্ন শিল্পী সাগ্রহে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন জন ভন কালকার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই শিল্পী তাঁর কাজের জন্য অমরত্ব লাভ করেছেন।

টানা ৩ বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর শেষ পর্যন্ত সার্থক ভাবে রূপায়িত হল ভেসালিয়াসের পরিকল্পনা। তাঁর চিত্রায়িত বই The Structure of the Human Body পূর্ণতা লাভ করল।

বইয়ের ভূমিকায় ভেসালিয়াস নিজের কঠোর শ্রমের প্রসঙ্গে শিল্পীর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এখানেই শেষ করেননি ভেসেলিয়াস। বইটির ছাপার কাজ যাতে নিখুঁত হয় সেজন্য তিনি বইয়ের পাণ্ডুলিপি ও ছবির কাঠের ছাঁচ জাহাজে করে পাঠিয়ে দিলেন সুইজারল্যাণ্ডে।

সুইজারল্যাণ্ডের বাসেল শহরে উন্নত ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে অনবদ্য বইটি আত্মপ্রকাশ করল ১৫৪২ খ্রিঃ। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৮ বছর।

সর্বাংশে নিখুঁত বইটি হাতে পেয়ে জীবনের মহৎ স্বপ্ন সফল হওয়ার আনন্দে মন ভরে উঠল ভেসালিয়াসের।

ডাক্তার ও ছাত্ররা এবারে যথার্থই উপকৃত হবেন এই বই থেকে এর চেয়ে বড় তৃপ্তি আর কি হতে পারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আড়ালে সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে ছিল সর্বনাশা যে বিপর্যয়, সেই সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না সিলভিয়াসের। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই তা উদয় হয়ে সব আনন্দ সমূহ তৃপ্তি ছারখার করে দিল।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রভাবশালী ডাকসাইটে অধ্যাপক সিলভিয়াসের তখন পরিণত বয়স। কিন্তু তার বুকে অনির্বাণ ছিল পুরনো দিনের বিদ্বেষ আর অপমানের সর্বনাশা আগুন। সেই আগুনেই দগ্ধ হলেন ভেসালিয়াস। তিনি নখদন্ত ব্যাদান করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হিংস্রভাবে ভেসালিয়াসের গ্রন্থের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, ''My former student is a unprinicipled upstart and a mad man whose pestilential teachings are poisoning Europe.''

সিলভিয়াস তাঁর লেখায় ও কথায় স্পষ্টই ব্যক্ত করলেন দীর্ঘদিনের মনের জ্বালা। তাঁর বিষোদ্গারের ফল ফলতেও দেরি হল না।

ভেসালিয়াস লক্ষ করলেন, পাদুয়ার সহ-অধ্যাপকেরা কেবল নয়, ছাত্ররাও তাঁকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। তাঁর বইটিকেও তারা বিপজ্জনক মনে করে সরিয়ে রেখেছে। দেখতে দেখতে এক মাসের মধ্যেই ভেসালিয়াস সারা পাদুয়া শহরে একঘরে হয়ে গেলেন।

তীব্র ঘৃণায়, দুঃখে ভেসালিয়াস চিরদিনের মত পাদুয়া ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর মধ্যে বিজ্ঞানের যে মহৎ সম্ভাবনা গড়ে উঠেছিল, এভাবেই তার ছেদ পড়ল। ভেসালিয়াস জীবনধারণের জন্য ভিন্ন পথের সন্ধান করতে লাগলেন। তীব্র অর্থকষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটতে লাগল।

ভাগ্যের প্রসন্নতা ফিরে এলো দুবছর পরে ১৫৪৪ খ্রিঃ। স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস ভেসালিয়াসকে রাজপরিবারের চিকিৎসক নিযুক্ত করলেন।

চিকিৎসক হিসেবে সুনামের সঙ্গে এই পদে কেটে গেল কুড়ি বছর। তৎকালীন স্পেনের বিজ্ঞানের আলোবাতাসহীন পরিবেশে জীবন্মৃত অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন বিজ্ঞানী ভেসালিয়াস। নিজে কর্মক্ষেত্র থেকে সরে থাকলেও বিদ্রোহী বিজ্ঞানের প্রতিভা ইতিমধ্যে জাগিয়ে তুলেছে অনেক কয়জন প্রতিভাবান ছাত্রকে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ফেলোপিয়াস।

পাদুয়া ছেড়ে আসার পরে ফেলোপিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানাটমির অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভেসালিয়াসের সার্থক উত্তরসূরী হয়ে ওঠার প্রতিভা ও চেষ্টা

ছিল তাঁর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৫৬২ খ্রিঃ তাঁর আকস্মিক অকাল মৃত্যু সেই সম্ভাবনারও ইতি টেনে দিল।

ইতালির বিজ্ঞান ক্ষেত্রে এই দুই প্রতিভার অস্তগমনের পর পুনরায় অ্যানাটমিতে গ্যালেনের প্রতিপত্তি নির্বাধ হয়ে গেল।

দীর্ঘদিন পরে অবশ্য পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুনরায় ডাক পেয়েছিলেন ভেসালিয়াস। ফেলোপিয়াসের মৃত্যুর পর অ্যানাটমির অধ্যাপকের পদটি শূন্য অবস্থাতেই ছিল।

পঞ্চাশ বছর বয়স তখন ভেসালিয়াসের। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি পাবার পর তিনি পুরনো ক্ষত ভুলে স্পেন ছেড়ে ইতালি রওনা হলেন। কিন্তু তাঁর জাহাজ ভূমধ্যসাগরের বুকে ঝড়ের মুখে পড়ে বিধ্বস্ত হল। জাহাজের একটা ভাসমান কাঠ ধরে কোনক্রমে তিনি গ্রীসের কাছাকাছি জাঁতে নামক একটা দ্বীপে এসে উঠলেন। কিন্তু তাঁর জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। এখানে দুদিন মাত্র বেঁচে ছিলেন। ১৫৬৪ খ্রিঃ মৃত্যুর কোলে চিরশান্তি লাভ করলেন অভিমানী বিজ্ঞানী ভেসালিয়াস।

১৬ শতকে অ্যানাটমি বিদ্যায় ভেসালিয়াস যে ঝড় তুলেছিলেন তা অবশ্য বৃথা যায় নি। মহাকাল তাঁর অবদানকে অস্বীকার করতে পারেনি। পরবর্তীকালে ভেসালিয়াস আধুনিক অ্যানাটমির জনক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

টাইকো ব্রাহে



শেক্সপীয়রের অমর চরিত্র হ্যামলেটের দৌলতে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে ডেনমার্কের ছোট্ট শহর এলসিনোর। এই শহরেই জন্মেছিলেন আজীবন অনুসন্ধানী এক বিস্ময়-প্রতিভা, টাইকো ব্রহে তাঁর নাম।

পৃথিবীর মাটিতে থেকেই তিনি তাঁর সন্ধিৎসু দৃষ্টি সতত সঞ্চরমান রাখতেন মহাকাশের নিঃসীম নক্ষত্রলোকে। অজানা নক্ষত্রের সন্ধানে হাতড়ে ফিরেছেন নীহারিকাপুঞ্জ।

নিমেষহীন দৃষ্টিতে তিনি ধরবার চেষ্টা করেছেন জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রতিটি ছটা—নিরীক্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন সৌরগঠন।

খালি চোখেই এই কাজ সারাজীবন করতে হয়েছে ব্রাহেকে। কেননা দূরবীন ছিল তখনো পর্যন্ত মানুষের কল্পনার বাইরে।

১৫৪৬ খ্রিঃ ডেনমার্কের এক জমিদার বংশে জন্ম হয় ব্রাহের। তাঁর আসল নাম ছিল টাইজি।

বাল্যে নিঃসন্তান এক কাকার কাছে মানুষ হয়েছিলেন তিনি। দশের মধ্যে কি করে একজন হয়ে ওঠা যায়, পথের বাধাকে তুচ্ছ করে কি করে নিজের গতিপথকে অব্যাহত রাখতে হয় সেই শিক্ষা কাকার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন তিনি।

মাথা তুলে দাঁড়াবার শিক্ষা নিতে গিয়েই বুঝি অনন্ত আকাশের মহাবিস্ময় তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

মহাকাশের সৌন্দর্যে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন ব্রাহে যে আত্মহারা হয়ে কবিতা লিখেছেন, গান রচনা করেছেন। মাত্র বার বছর বয়সেই তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

স্কুলের পাঠ শেষ করে দর্শন ও সাহিত্যের পাঠ নেবার জন্য ব্রাহে ভর্তি হলেন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এই সময়ে একটি আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্রাহের জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল। চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

সময়টা ১৫৪০ খ্রিঃ আগস্ট মাস। ডেনমার্কের কয়েকজন জ্যোতিষী ঘোষণা করলেন একটি গ্রহণের কথা। দিন এবং সময়ও তাঁরা নির্দিষ্ট করে দিলেন।

গোড়ার দিকে ব্যাপারটাকে কেউ বিশেষ আমল দেয় নি। কিন্তু কারোরই বিস্ময়ের অবধি রইল না যখন দেখা গেল সত্যি সত্যিই নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্ধারিত সময়ে গ্রহণ হল।

টাইকো এই ঘটনায় খুবই অভিভূত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন গ্রহ-নক্ষত্রের গতির হিসাব কষে জোতিষীরা যখন গ্রহণের সময় নির্ণয় করতে পারছেন তখন সেই হিসাব ধরে মহাকাশের অনেক অজানা রহস্যেরই সন্ধান করা সম্ভব।

টাইকো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। সব কাজ ফেলে রেখে তিনি টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই নিয়ে বসলেন।

প্রথমে অনুবাদের কাজটা করলেন। তারপর মেতে উঠলেন জ্যোতিষশাস্ত্র ও জোতির্বিজ্ঞান নিয়ে।

ক্রমে তাঁর হাতেই ষোড়শ শতকের জ্যোতির্বিজ্ঞান লাভ করল নতুন রূপ নতুন গতিপথ।

ডেনমার্কের লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় সেই সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। দেশের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেখানে পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত।

টাইকোর ইচ্ছা সেখানেই ভর্তি হন। বাবাকে মনের কথা খুলে জানালেন। তারপর একদিন নাম লেখালেন লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্লাশে।

ক্লাশের পড়ার সঙ্গে আরম্ভ হল টাইকোর আকাশ পর্যবেক্ষণের অভ্যাস। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে করেই হোক ওই অনন্ত বিস্তারের অজানা রহস্যকে জানতে হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজের স্থানটি নির্দিষ্ট করে নেবেন তিনি।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে লাগল। ক্রমেই একটি ব্যাপার দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠল তাঁর কাছে।

টাইকো বুঝতে পারলেন, প্রচলিত জ্যোতির্বিজ্ঞানে সবটাই বিজ্ঞান নয়—তার বেশির ভাগ অংশটাই জুড়ে আছে মানুষের কল্পনা—ভেলকি আর কুসংস্কার। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে গ্রহের পৌরাণিক গল্প-কাহিনী।

সৃষ্টির সেই কোন আদি যুগ থেকে মানুষের ভাবনা-চিন্তা একই গতিধারার অনুসরণ করে চলেছে।

অন্তহীন মহাকাশে বিচরণ করছে দেবতারা—আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দ্যুতি তাদের বস্ত্রালঙ্কারের বিচ্ছুরণ ছাড়া কিছু নয়।

মানুষের এই আদিম চিন্তার জগতে কিছু বিপ্লবী চিন্তাবিদ নিজেদের প্রতিভা ও ধ্যান-ধারণা বলে শুনিয়েছেন নতুন কথা। তাঁদের কাছ থেকেই জানা সম্ভব হয়েছে, আকাশের জ্যোতিষ্কের কথা।

পৃথক পৃথক সময়ে জন্মে মহাজ্ঞানী হিপারকাস আর ক্লডিয়াস টলেমি পৃথিবীর মানুষকে মহাকাশের দেড় হাজারেরও বেশি নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

খ্রিষ্ট জন্মের দুশো বছর পরের অন্ধকার যুগে বসেই টলেমি নিজের মত জ্যোতিষ্কলোকের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে অবস্থান করছে স্থির পৃথিবী। একে ঘিরেই আবর্তন করছে সূর্য চন্দ্র মিলিয়ে সৌরক্ষেত্রের সকল গ্রহ নক্ষত্র।

মানুষের অ-জ্ঞান টলেমির এই তত্ত্বকেই মেনে নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে দেড় হাজার বছরেরও বেশি সময়। তাই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মানুষ নতুন কিছু আর ভাবতে পারেনি।

অবশেষে কোপারনিকাসের বৈপ্লবিক আবির্ভাব সব কিছুকে তছনছ করে দিল। তিনি টলেমির তত্ত্বকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে পৃথিবীকে নতুন কথা শোনালেন।

কোপারনিকাস ঘোষণা করলেন, টলেমিকে নিয়ে মেতে থাকবার অর্থ অন্ধকারকে সঙ্গী করা। কেননা টলেমির পর্যবেক্ষণ ভ্রান্ত।

আমাদের পৃথিবী বিশাল সৌরজগতের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সদস্য মাত্র। তার আকার গোল।

কোপারনিকাসকেই বেছে নিলেন টাইকো। সৌর-সংসারের রহস্যভেদ করবার জন্য কোপারনিকাসের পরীক্ষাগুলোর অনুসরণ করে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু বারবার বাধা পেতে লাগলেন। চিন্তার মৌলিকত্বে স্পষ্ট ফারাক আবিষ্কার করতেও বিলম্ব হল না।

কোপারনিকাস ছিলেন ঈশ্বরতত্ত্বে অবিশ্বাসী। ফলে তাঁর চিন্তার গতি হয়েছে অবাধ।

গবেষণা কখনো ঈশ্বরচিন্তায় আছন্ন বা সঙ্কীর্ণ হয়নি। তাঁর চিন্তার সূত্র অনুসরণ করতে গিয়ে ধর্মের অনুশাসন টাইকোকে বাধার সম্মুখীন করতে লাগল। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে ঈশ্বরবিশ্বাসী।

চিন্তা-ভাবনা করে মধ্যপন্থা উদ্ভাবন করলেন শেষ পর্যন্ত যার দ্বারা যুক্তিবাদের বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস উভয়ই বজায় থাকবে। তিনি সৌরসংসারের চেহারার যে রূপ দিলেন, তা হল এই রকম—পৃথিবীকে কেন্দ্রে রেখে দিনে একবার করে ঘুরপাক খাচ্ছে যাবতীয় গ্রহতারা। সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে সকলে, সূর্য সকলকে নিয়ে ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে।

এই মডেল সামনে রেখেই খালি চোখেই তাঁর পর্যবেক্ষণ ও হিসেবনিকেশের কাজ করে চললেন। এইভাবেই তিনি সৌর সংসারের নক্ষত্রমণ্ডলীর বৃত্তাকার পথের হিসাব করলেন।

টাইকোর সেই হিসাব এমনই নিখুঁত হল যে আধুনিক যুগের হিসাবের সঙ্গে তার ফারাক ধরা পড়েছে মাত্র এক সেকেণ্ডের।

১৫৭২ খ্রিঃ একরাতে ছাদে বসে আকাশের বুকে খুঁজে পেলেন এক উজ্জ্বল তারা। আনন্দে উদ্বেল হয়ে তিনি এই তারার নাম দিলেন নোভা।

কিছুদিনের মধ্যেই আকাশের নক্ষত্রদের চরিত্র সমীক্ষার সঙ্গে নোভা আবিষ্কারের বর্ণনা দিয়ে একটি বই লিখে ফেললেন।

তিনি স্পষ্ট করেই জানালেন যে প্রত্যেক নক্ষত্রেই রয়েছে তিনটি পর্ব—আরম্ভ চূড়ান্ত এবং শেষ।

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন নক্ষত্ররা স্থির এবং যে কোন নক্ষত্রের অবস্থাই অপরিবর্তিত।

কিন্তু প্রত্যেক নক্ষত্রকেই নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার শেষ পর্যায়ে পৌঁছাতে হয়।

আরম্ভ চূড়ান্ত অবস্থা এবং শেষ—এই তিনটি পর্বকে ছোট বড় কোন নক্ষত্রই এড়াতে পারে না।

মহাকাশে নতুন নতুন তারার জন্মের কথা তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, এরা মূলতঃ স্থির ও অপরিবর্তিত। টাইকোর ঘোষণা অ্যারিস্টটলের প্রাচীন ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিল।

সুপার নোভা সম্বন্ধে রচিত টাইকোর বইটি ডেনমার্কে সাড়া জাগাল। তাঁর গবেষণাকার্যে মুগ্ধ হলেন ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিক। জ্যোতির্লোকের গবেষণায় বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে ডেনমার্কও স্থান লাভ করবে এই মহৎ উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হলেন দ্বিতীয় ফ্রেডরিক।

অবিলম্বেই তিনি টাইকোর গবেষণার জন্য কোপেনহেগেনের অদূরে হার্ডিন দ্বীপে একটি মানমন্দির তৈরি করিয়ে দিলেন।

গবেষণা কাজের জন্য নগদ কুড়ি হাজার পাউন্ড আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হল টাইকোকে।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রাজাকে বিজ্ঞানের সেবায় এগিয়ে আসতে দেখে এবং গবেষণার অচিন্তনীয় সুযোগ লাভ করে টাইকো নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেন।

মানমন্দিরের নাম দেওয়া হল উরানিয়েন বার্গ অর্থাৎ সৌরপ্রাসাদ। রাজকীয়ভাবেই নির্মিত হল প্রাসাদটি।

আকাশ পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য চারদিকই রাখা হল খোলা। দেয়াল জুড়ে নানান চিত্রাঙ্কন, সেই সঙ্গে শোভা বর্ধনের জন্য রয়েছে ভাস্কর্য।

ভেতরে সাজানো গোছানো অনেক ঘর। টাইকোর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে সবচেয়ে ভাল ঘরটি।

তার লাগোয়াই বিরাট হলঘর। অতিথিদের সঙ্গে দেখা করবার উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে ঘরটি।

ল্যাবরেটরি, প্রেস ও লাইব্রেরী রয়েছে প্রাসাদের অন্যধারে। নানাদেশ থেকে আনা যন্ত্রপাতিতে গবেষণা-ঘর সজ্জিত। গোটা প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হল লোকজন।

বিজ্ঞানগবেষণার ক্ষেত্রে এমন রাজানুকূল্যের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ।

এই সুসজ্জিত ও সুগঠিত মানমন্দিরে বসে গবেষণা আরম্ভ করলেন টাইকো।

দীর্ঘ কুড়ি বছর এই মানমন্দিরে বসে গবেষণা করেছিলেন তিনি। সর্বমোট সাতাত্তরটি নতুন তারা স্থান পেয়েছিল টাইকোর জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার রেকর্ডে।

গবেষণার সুবিধার জন্য আগে নিজেই অনেক যন্ত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন টাইকো। পর্যবেক্ষণের জন্য মানমন্দিরের যে যন্ত্রটি তিনি পরে ব্যবহার করতেন তার ব্যাস পাঁচ ফুট।

নতুন কোন নক্ষত্র চোখে পড়লেই যে কোণ থেকে সেটি দেখতেন, সেখানে চিহ্ন দিয়ে রাখতেন।

কোণ পরিমাপক একটি যন্ত্র নিজেই বানিয়ে নিয়েছিলেন। যন্ত্রটা ছিল খুবই ভারি। অনেক লোকের সাহায্য না পেলে সেটি নাড়াচাড়া করা যেত না। তবু তাই নিয়েই গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতেন তিনি। বছরের পর বছর ধরে তাঁর গবেষণাপত্রের সংখ্যা বেড়েছে।

টাইকোর গবেষণার এক চূড়ান্ত পর্যায়ে অকস্মাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটল। রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের মৃত্যু হল।

নতুন রাজা টাইকোকে জানিয়ে দিলেন মানমন্দিরের খাতে রাজকোষ থেকে আর অর্থব্যয় করা হবে না।

কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তিগত দান নেবার ব্যবস্থা করে তিনি যেন গবেষণার খরচ চালান।

টাইকো পড়ে গেলেন অকূল পাথারে। গবেষণা এমন পর্যায়ে যে তা বন্ধ করা যায় না। উপায়ান্তর না দেখে তিনি প্রাগে সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফের কাছে চিঠি পাঠালেন।

গুণগ্রাহী সম্রাটের সহৃদয় সাড়া পাওয়া গেল। তাঁর আহ্বানে টাইকো কোপেনহেগেনের মানমন্দির ছেড়ে ১৫৯৯ খ্রিঃ প্রাগে চলে এলেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের মহৎ স্বার্থেই কোপেনহোগেন ত্যাগ করতে হয়েছিল। এখানে এসে তিনি মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর এইসব তথ্য পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্যাকে প্রভাবিত করেছিল।

এছাড়া তিনি কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ এবং টলেমীয় ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ মিশিয়ে যে নতুন এক মতবাদ সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম দেন টাইকোনিকা।

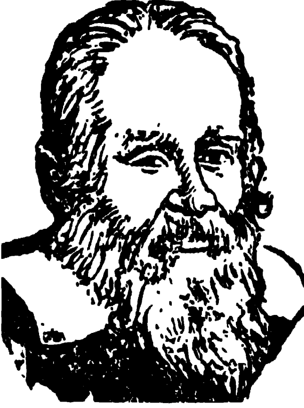
অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পরিণামে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন টাইকো। অজীর্ণরোগ তাঁর আয়ুকে ক্রমশই জীর্ণ করে ফেলছিল। অথচ অনেক কাজই তখনো তিনি করে উঠতে পারেন নি।

জীবনের অন্তিম লগ্নে টাইকো প্রিয় শিষ্য কেপলারকে অনুরোধ করে যান তাঁর অবর্তমানে তিনি যেন আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করেন।

কেপলার কথা দিয়েছিলেন এবং গুরুর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করে নিজেও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অন্যতম টাইকো ব্রাহে ১৬০১ খ্রিঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঞ্চান্ন বছর।

গ্যালিলিও গ্যালিলি



বিজ্ঞানীদের ভাবনা চিন্তার শুরু হয় 'কেন' দিয়ে। কেন—সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা। অজ্ঞানাকে জানার তীব্র কৌতূহল।

এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই অন্ধকার সরে যায় দৃষ্টিসীমার ওপর থেকে, উদ্ভাসিত হয় সত্যের আলো। আড়ালটা থাকে কেন—আর এই আড়ালকে সরানোই সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীর কাজ।

মানব সভ্যতার অগ্রগতি, যা কিছু আজকের দিনের আবিষ্কার উদ্ভাবন আমরা পাচ্ছি, যা নিয়ে সভ্যতার গৌরবে গৌরবান্বিত হচ্ছি—সব কিছুরই সূচনা-তিলকের চিহ্ন হল 'কেন' নামক প্রশ্নবোধক চিহ্নটি।

ইউরোপে মধ্যযুগের অন্ধকারে নতুন যুগের আলোকসম্পাত ঘটিয়েছিলেন গ্যালিলিও গ্যালিলি। তাঁর হাতে ছিল 'কেন'-এর মশাল। সেই মশাল উদ্ভাসিত ছিল তাঁর প্রতিভার আলোকে।

পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে যে প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার ব্যাপক প্রচলন সমাজ মেনে নিয়ে চলছিল, গ্যালিলিও সেখানে ইতি টানলেন, যথার্থ সত্যের প্রতিষ্ঠা করলেন নির্ভীক সৈনিকের মত। প্রমাণ করলেন প্রচলিত ধ্যানধারণার ভিত্তি ছিল ভ্রান্তি।

খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসীদের মতে সত্য হয়ে ছিল যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, পৃথিবী হল স্থির এক গ্রহ।

গ্যালিলিও তাদের চিরাচরিত ধারণায় আঘাত হেনে প্রথম জানালেন, পৃথিবীই সচল, সূর্য স্থির, পৃথিবী তার চারপাশে ঘোরে—প্রমাণও করলেন।

মহাজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের বহু যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক চিন্তাকেও তিনি দাঁড় করালেন কেন-এর কাঠগড়ায়।

এই হলেন মানুষের চিন্তার জগতের অন্যতম আধুনিক পুরুষ বিজ্ঞানী-বিপ্লবী গ্যালিলিও।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জনক গ্যালিলিওর জন্ম হয়েছিল ইতালির পিসা শহরে ১৫৬৪ খ্রিঃ। তাঁর পিতা ছিলেন শিল্পী—সুখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। ফলে তাঁর মনেও জন্মে ললিতকলা ও কাব্যে অনুরাগ।

শিল্পের আবেগময় পরিবেশে থেকেও গ্যালিলিওর মনে সেই বাল্যবয়সেই সত্যসন্ধানের অনুসন্ধিৎসা অঙ্কুরিত হয়েছিল। চারপাশের সবকিছুকে তিনি দেখতেন

অসীম কৌতূহল নিয়ে। অজানাকে জানার অদম্য আগ্রহ নিয়ে দেখার মধ্যে কোন খুঁত রাখতে চাইতেন না।

কৈশোরেই তিনি নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মডেল তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সতের বছর বয়সে গ্যালিলিও ভর্তি হয়েছিলেন পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ধর্মবিশ্বাসী পরিবারে জন্ম, তাই তাঁকেও নিয়মিত ভাবে যেতে হত গীর্জায়। যোগ দিতে হত সমবেত প্রার্থনায়।

সেই সময় তাঁর উনিশ বছর বয়স। একদিন বেদীর কাছে শিকল দিয়ে ঝোলানো তেলের প্রদীপের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন।

লক্ষ করলেন একটা সাধারণ ব্যাপার—শিকলের দোলার সঙ্গে বাতিটা দুলছে এদিক থেকে ওদিকে।

কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল হতেই তিনি সচমকে দেখলেন, প্রদীপের প্রতিটি দোলনের বিস্তার প্রতিবারে আগের চেয়ে কমে যাচ্ছে— অথচ সময় লাগছে একই।

প্রশ্নের কাঁটা গেঁথে গেল অনুসন্ধিৎসু গ্যালিলিওর চিন্তার জগতে। কেন এমন হচ্ছে? সময় একই অথচ দোলনের বিস্তার কমে যাচ্ছে কেন?

এই জিজ্ঞাসার জবাব সন্ধান করেই পরবর্তীকালে গ্যালিলিও আবিষ্কার করলেন ঘড়ির পেন্ডুলামের সূত্র।

এই সূত্র ব্যবহার করেই আজ প্রায় পাঁচশ বছর পরেও সময়ের গতি নির্ধারণ করা হয়। নিয়ন্ত্রিত হয় ঘড়ির সময়।

বাল্যে শিক্ষার সুযোগ কম ছিল। এক জেসুইট মঠে তিনি গ্রীক ও লাতিন ভাষা শিক্ষা করেন। অসাধারণ মেধা ও প্রতিভাধর পুত্রকে তাঁর পিতা বিজ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করার সুযোগ দেন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য।

পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালেই গ্যালিলিওর চিন্তাশক্তি, মনশীলতা, যুক্তিনির্ভর মানসিকতা ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল।

তাঁর নির্ভীক মতামত ও অকাট্য যুক্তির কাছে পরাজিত হতেন তাঁর প্রতিপক্ষ। শিক্ষকরা পর্যন্ত তাঁর স্পষ্টবাদিতা পছন্দ করতেন না।

গ্যালিলিও প্রাচীন মনীষীদের চিন্তাধারারও সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

বিশ্ববিশ্রুত মহাপ্রাজ্ঞ অ্যারিস্টটল সিদ্ধান্ত করেছিলেন; কোন উঁচু জায়গা থেকে একই সময়ে কোন ভারি বস্তু ও একটি হাল্কা বস্তু ফেললে ভারি বস্তু হাল্কা বস্তুর আগে নিচে পড়বে।

গ্যালিলিও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করলেন এই সিদ্ধান্ত ভুল.—ওপর থেকে নিচে ফেলা ভারি বস্তু ও হাল্কা বস্তু একই সঙ্গে নিচে পড়বে।

এই নিয়ে তাঁকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অসন্তুষ্টি দেখা দিয়েছিল। তিনি পিসার বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তাঁর গণিতশাস্ত্রে বিশেষ অনুরাগ জন্মে। তিনি ইউক্লিড আর্কিমিডিস প্রভৃতি মনীষার গবেষণা গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন।

এই সময় তিনি নিশ্চিত রূপে অনুধাবন করেন, সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে পরীক্ষালব্ধ তথ্য গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতি নির্ভর করে।

এই সিদ্ধান্তই তাঁকে পরবর্তীকালে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের পথিকৃতের গৌরব দান করেছিল।

চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন বেশিদূর এগোল না। আর্থিক কারণে মাঝপথেই বন্ধ করতে হল।

কিন্তু তাঁর নিজস্ব গবেষণা বন্ধ হল না। কিছুদিনের মধ্যেই আর্কিমিডিসের অনুসরণে তিনি এমন একটি নিক্তি তৈরি করেন যার দ্বারা মিশ্রিত ধাতুসমূহের মধ্যে কোন একটির উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

গণিতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন গ্যালিলিও। তাঁর সেই খ্যাতি আরও বৃদ্ধি করেছিল তাঁর অসাধারণ আবিষ্কার সমূহ।

কিন্তু নির্ভীক ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য তিনি পশ্চিম ইউরোপে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপকের পদ লাভ করতে পারেননি। তবুও কিছু বন্ধুর সহায়তায় শেষ পর্যন্ত পিসায় অধ্যাপকের পদ লাভ করেছিলেন।

দীর্ঘ ১৮ বছর পাদুয়ায় ছিলেন গ্যালিলিও। এই সময়ে তাঁর বিজ্ঞান সাধনা অনেক নজির সৃষ্টি করে।

তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল (১) বলবিদ্যার গবেষণার পূর্ণতায় আরও অগ্রগতি (২) ভার্চুয়াল ওয়ার্ক নামে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও নানাবিধ সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশের স্কেটর আবিষ্কার (৩) নিজস্ব কারখানায় সর্বপ্রথম দিকনির্ণয় যন্ত্র নির্মাণ (৪) তরল পদার্থের ধর্ম ও পাম্পের কার্যপ্রণালী নির্ধারণ (৫) সমর-স্থাপত্য ও দুর্গ প্রভৃতির নির্মাণ কৌশল।

প্রাঞ্জল ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর গ্যালিলিও যেসব বক্তৃতা দিতেন, সারা ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মহলে তা আগ্রহের সঞ্চার করত। বিজ্ঞান বিষয়ের বক্তা হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বগুলির অভ্রান্ততা গ্যালিলিও গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু গীর্জার যাজকদের ভয়ে তখনই তিনি তা প্রকাশ করতে সাহসী হননি।

১৫৯৭ খ্রিঃ যোহান কেপলার গ্রহের গতি সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ গ্যালিলিওকে উপহার দেন। সেই সঙ্গে অনুরোধ জানান, কোপারনিকাসের বিশ্বতত্ত্ব প্রকাশ করবার জন্য।

১৬০৪ খ্রিঃ মহাকাশে সুপারনোভার আবির্ভাব হলে গ্যালিলিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট হন। এই সময়েই তিনি বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে বাইবেলের ভুল প্রচারের কথা প্রকাশ করেন।

গ্যালিলিও নিজস্ব চেষ্টায় একটি অতি শক্তিশালী দূরবীন আবিষ্কার করেছিলেন। এই দূরবীনের সাহায্যে তিনি মহাকাশের অনন্ত রহস্যের যবনিকা তোলেন। তিনিই প্রথম দেখেন চাঁদে উঁচু পাহাড় ও গভীর খাদ, আর প্রস্তরময় মরুভূমি।

মহাকাশের ছায়াপথ যে অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ ছাড়া কিছু নয়, একথা তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন।

বৃহস্পতির চারটি গ্রহ ও শুক্রের কলা তিনিই আবিষ্কার করেন প্রথম।

নিজস্ব দূরবীনের সাহায্যে একসময় আবিষ্কার করেন সৌরকলঙ্ক।

গ্যালিলিও তাঁর রচিত The Messengers of Stars গ্রন্থে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রয়োগ দেখান। এছাড়া অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বস্তুর অন্তর্নিহিত অনেক রহস্য উদঘাটন করেন।

বস্তুর গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে দুই হাজার বছর আগেকার অ্যারিস্টটলের মতবাদের অনেকগুলিই যে ভ্রান্ত গ্যালিলিও তা প্রমাণ করেন।

বস্তুর গতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণার পর তিনি বস্তুর ত্বরণ ও জাড্য নির্ণয় করেন। বস্তুর ভরকেন্দ্র গবেষণাকালে আবিষ্কার করেন সাইক্লয়েড।

গ্যালিলিও নিউটনের জন্মের পঞ্চাশ বছর আগেই গতিসূত্র ও আধুনিক বলবিদ্যার সূচনা করেন।

মাত্র ২৬ বছর বয়সেই এইসব অসাধারণ গবেষণা শেষ করে গ্যালিলিও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সমস্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদই সে যুগের বিজ্ঞানীদের নিকট সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অপরদিকে প্রাচীনপন্থীরা বিশেষ করে যাজক সম্প্রদায় তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হন। কেননা তাঁর বিজ্ঞানসাধনা হয়ে উঠেছিল রক্ষণশীল চার্চের উদ্ধত ধ্যানধারণা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ।

মহাকাশ সংক্রান্ত গ্যালিলিওর আবিষ্কারে গীর্জার যাজকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বিধর্মী ও ভগবৎবিদ্বেষী বলে ঘোষণা করে।

১৬১৯ খ্রিঃ পাদুয়া থেকে ফ্লোরেন্সের পিসায় আসার পরে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জেসুইটরা তাঁকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন।

রোমের মিনার্ভা চার্চে ইনকুইজিশনের সামনে তিনি অধার্মিক হিসেবে ধিকৃত হন। তাঁকে বলা হয়, এতদিন তিনি যেসব ধর্মবিরোধী ও শয়তানী চিন্তা পোষণ করেছেন, তা এখন থেকে ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করে কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ না করলে তাঁকে অনন্ত কারাবাসে বন্দী থাকতে হবে।

১৬১৬ খ্রিঃ কোপারনিকাসের পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, সূর্যের অবস্থান স্থির ইত্যাদি তথ্য-সত্য জেনেও তা অসত্য বলে তাঁকে স্বীকার করতে হয় মুক্তির স্বার্থে।

১৬২৩ খ্রিঃ গ্যালিলিওর বন্ধু কার্ডিনাল বারবেরিয়ান পোপের পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ধূমকেতুর ওপরে লেখা তাঁর The Asseyes নামক গ্রন্থটি পোপকে উপহার দেন।

জীবনের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের গবেষণাকে ছয় বছরের পরিশ্রমে রূপ দেন ডায়ালগ কনসার্নিং টু দ্য প্রিন্সিপ্যাল সিসটেমস অব দ্য ওয়ার্লড গ্রন্থে।

এই পুস্তক প্রকাশের পর ক্রুদ্ধ যাজকরা গ্যালিলিওকে গৃহে অন্তরীণ করেন। তখন তাঁর বয়স সত্তর।

সেই বন্দী অবস্থাতেও তিনি লিখলেন ডায়ালগ কনসার্নিং দ্য টু নিউ সায়েন্সেস। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় হল্যান্ড থেকে।

কিছুদিন পরেই তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। চার্চের শাস্তিও তুলে নেওয়া হয়—গৃহবন্দিত্বের দন্ড থেকে মুক্তি লাভ করেন।

গৃহবন্দিত্ব না থাকায় দেশ বিদেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। অন্ধ অবস্থাতেই কাটালেন আরও চার বছর। তারপর ১৬৪২ খ্রিঃ ৭৮ বছর বয়েস চির নিদ্রার কোলে শান্তি লাভ করলেন।

যোহান কেপলার



মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানের নানা প্রতিভা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে প্রচলিত অন্ধ সংস্কার ও ধ্যানধারণাকে পাল্টে দিয়ে সভ্যতাকে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে আমাদেব বর্তমান সভ্যতা সংস্কৃতির যা কিছু তা এই বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ মানুষদেরই অবদান।

তাঁদের অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় গড়ে উঠেছে সভ্যতার বনিয়াদ, বিজ্ঞান হয়েছে সুগঠিত।

বিশ্বের বিজ্ঞান-নির্মাণের অন্যতম বিশিষ্ট স্থপতি হলেন যোহান কেপলার। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদান বিশ্ববন্দিত।

বিজ্ঞান-অবিজ্ঞানের আশ্চর্য এক সহাবস্থান লক্ষ করা যায় তাঁর জীবনে। দূরবীন নিয়ে মহাকাশের রহস্য সন্ধান করেছেন, কঠিন কঠিন অঙ্ক কষে দুরূহ সমস্যার সমাধান করেছেন। আবার এই যুক্তিবাদী মানুষই ভুতুড়ে ব্যাপারস্যাপার নিয়েও ছুটোছুটি করেছেন, মানুষের ভাগ্য বিচারের জন্য জ্যোতিষের ছক কেটে হিসেব নিকেশ করেছেন।

জন্ম হয়েছিল ১৫৭১ খ্রিঃ জার্মানীর দক্ষিণ-পশ্চিমের শহর উইল-এ। যে পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন বংশানুক্রমে তাদের পেশা ছিল ডাইনিবিদ্যা। পরিবেশ ছিল কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে স্যাঁতসেতে।

কেপলারের পিতা পিতামহ ছিলেন কুখ্যাত ডাইন। মানুষের অজ্ঞতা অন্ধবিশ্বাসই ছিল তাঁদের জীবিকার মূলধন।

তুকতাক আর জড়িবুটির ভাঁওতায় কত অসংখ্য লোকের যে তাঁরা সর্বনাশ করেছিলেন তার কোন হিসেব ছিল না। অভিশাপের পাহাড়ে বসে তাঁরা নির্বিচারে নিজেদের পৈশাচিক ক্রিয়াকর্ম করে গেছেন।

মহাবিজ্ঞানী কেপলার এই নারকীয় পরিবেশে যাদুবিদ্যার বিষাক্ত রক্ত শরীরে নিয়েই জন্মেছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে তিনি তাঁর পরিবারের মধ্যে ছিলেন মস্ত ব্যতিক্রম। নারকীয় পারিবারিক আবহাওয়ার প্রভাব থেকে বেরিয়ে যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিজ্ঞানের উদার আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মত তিনি আলোর গানে জগৎ মুখরিত করেছেন।

প্রকৃতির রাজ্যে এ যে এক অত্যদ্ভুত ব্যতিক্রম তাতে সন্দেহ নেই।

দুঃখ-দুর্দশা আর রোগভোগের স্থায়ী আবাসস্থল ছিল কেপলারের পরিবার। সেখানে তিনিও ছেলেবেলায় অসংখ্য রোগে ভুগেছেন। ফলে শরীর ছিল রুগ্ন ও দুর্বল।

মাত্র চার বছর বয়সেই গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে প্রায় মরণাপন্ন হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে তাঁকে দিয়ে অনেক বড় কাজ করানো হবে বলেই ভাগ্য তাঁকে সে যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

এই অস্বাভাবিক রোগমুক্তির পর থেকেই অদ্ভুত পরিবর্তন এল কেপলারের জীবনে। যেন তাঁর নবজন্ম হল।

পরিবারের অভিভাবকদের ধাতে যার রেশ ছিল না বিন্দুমাত্র, লেখাপড়া ও বিদ্যা লাভের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা দিল তাঁর মধ্যে।

সেই সময়ে শিশুশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে আরটেমবারগের ডিউক বিভিন্ন স্থানে স্কুল খুলেছিলেন। এইসব স্কুলে প্রধানত শেখানো হত ধর্মচর্চা। সেই সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চার পাঠও থাকত কিছু।

কেপলার বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজেই একদিন ডিউকের এক স্কুলে গিয়ে নাম লেখালেন।

ডাইনী-বাড়ির অন্ধকার গহ্বর থেকে সেই প্রথম মহাবিশ্বের মুক্ত আলোকে একজনের পদার্পণ ঘটল।

ডিউকের এই স্কুলেই কেপলারের নতুন মনে নতুন স্বপ্ন সাধের জন্ম হয়েছিল। প্রকৃতির রহস্যকে তিনি দেখতে শিখেছিলেন অনুসন্ধিৎসা নিয়ে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কুড়ি বছর বয়সে কেপলার টুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

এখানেই এক অধ্যাপক তাঁকে কোপারনিকাসের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন।

সেই সময়ে কোপারনিকাসের মতবাদ ছিল আইনত নিষিদ্ধ। টলেমির ভ্রান্ত মতবাদই ছিল সরকার-স্বীকৃত।

'মহাকাশে সূর্যকে কেন্দ্র করেই সবকিছু ঘোরে, এমন কি পৃথিবীও' কোপারনিকাসের এই কথার সমর্থন বাইবেলে নেই কাজেই তা ধর্মবিরুদ্ধ, তাই নিষিদ্ধ।

টলেমিস্বীকৃত বাইবেলের ধারণা হল, পৃথিবী স্থির, সূর্য সহ সব কিছুই তার চারদিকে ঘোরে।

কেপলারের মনে গোপন বাসনা ছিল ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি যাজকবৃত্তি গ্রহণ করবেন। তাই কোপারনিকাসের মতবাদ জেনেও তা নিয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামাতে চাননি।

কিন্তু পরবর্তীকালে এক অজানা কারণে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। স্থির করেন পাদ্রী নয়, ভবিষ্যতে তিনি হবেন শিক্ষক।

অনুমান করা হয়, সেই অধ্যাপকের প্রভাবেই তাঁর চিন্তাজগতে নিঃশব্দে এই পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

টুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে সৌভাগ্যবশতঃ শিক্ষকতার চাকরিই জুটে গেল তাঁর।

অস্ট্রিয়ার স্ট্রাইরিয়া প্রদেশের রাজধানী গ্রাৎজ শহরের একটি কলেজে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হলেন তিনি।

এই কলেজে পড়াবার সময়েই পঁচিশ বছর বয়সে প্রথম বই লিখলেন কেপলার। প্রকাশিত হল The History of the Universe।

এই গ্রন্থে তিনি লেখেন, ঈশ্বরের সৃষ্ট এই বিশ্বসৃষ্টির মূল রহস্য তিনি অধিগত করে ফেলেছেন।

সেই সময় পর্যন্ত বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল, পৃথিবী, বুধ ও শুক্র— মাত্র এই ছটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছিল। কেপলার তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যৌবনোচিত উচ্ছ্বাস এবং উদ্দীপনার সঙ্গে ঘোষণা করলেন, ত্রিমাত্রিক মহাকাশে মাত্র পাঁচটা সঠিক

ঘনবস্তুই গঠন করা যায় এবং ঐ পাঁচটা ঘনবস্তুই ঠিক ঠিক ভাবে খাপে খাপে বসানো যায়।

দারুণ আবেগ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে কেপলার তাঁর নবাবিষ্কৃত তত্ত্বটির কথা যাঁদের জানালেন তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন দুই জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও এবং টাইকো ব্রাহে।

তরুণ বিজ্ঞানীর গবেষণাকার্যের ধরন দেখে এই দুই বিজ্ঞানী খুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

বইয়ের বক্তৃতা এবং কেপলারের চিন্তার প্রবণতার মধ্যে ধর্মবিরোধী মনোভাবের আঁচ পেয়ে পাদ্রীসমাজে উষ্মা ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিপদের গন্ধ পেয়ে কেপলার আগেভাগে শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। সৌভাগ্যবশতঃ সেইসময় ব্রাহে তাঁকে সহকারী হিসেবে মনোনীত করলেন।

ব্রাহে এবং কেপলার দুজনেরই জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ ছিল। তাঁদের বিশ্বাস ছিল সুদূর আকাশের গ্রহ নক্ষত্ররাই মানুষের প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করে।

বাস্তবিকপক্ষে, কেপলার ছিলেন প্রকৃতি ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের উপাসক। এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন, 'মহাজাগতিক সুসমঞ্জস দৃশ্যগুলি দেখে আমি চরম পুলক অনুভব করি প্রতি মুহূর্তেই'।

ব্রাহের সঙ্গে যোগযোগের প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত, ঈশ্বরই এই কাজ করেছেন এবং ঈশ্বরের নির্দেশেই তাঁরা পরিচালিত হচ্ছেন।

বাস্তবিক পক্ষে, কেপলারের সঙ্গে ব্রাহের জীবন যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছিল তাতে মনে হতো ঈশ্বরের একটি বিশেষ ইচ্ছা পূরণের জন্যই তাঁরা দুজনে পৃথিবীতে এসেছেন।

কেপলারের সবচেয়ে দুঃখের দিনগুলোতে পরম সহায়রূপে পাশে পাশে থেকেছেন ব্রাহে। তাঁকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন।

১৬০১ খ্রিঃ ব্রাহের মৃত্যু হলে কেপলার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সঙ্গী ও পথপ্রদর্শককে হারান।

কিন্তু এর পরেই কেপলারের ভাগ্য খুলে যায়। তিনি সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফের রাজসভায় শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

গণিতবিদ হিসেবে রাজসভায় কেপলারের কাজ ছিল দুটি। একদিকে তিনি সম্রাট ও তাঁর সভাসদদের কোষ্ঠী ঠিকুজি তৈরি করতেন। অন্যদিকে অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুরূহতম প্রশ্নগুলির সমাধান করতেন।

রাজসভায় দিনে দিনে তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৬০৫ খ্রিঃ কেপলার তাঁর নতুন গ্রন্থ New Astronomy প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটিকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম বই হিসেবে অভিহিত করা যায়।

এই গ্রন্থেই তিনি প্রথম উল্লেখ করেন প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। কেপলার এই গ্রন্থে যে দুটি যুগান্তকারী সূত্রের কথা বলেছেন সেগুলো হল ঃ

প্রথম সূত্র ঃ প্রত্যেক গ্রহই ডিম্বাকৃতি পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ডিমের মত কক্ষপথে সূর্যের অবস্থান কোথায়? না তার নাভিতে। ইংরাজিতে বলে ফোকাস।

এই সূত্রে কেপলার কক্ষপথে আবর্তনশীল গ্রহের অনিয়মিত গতিবেগকে দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ সূর্যের কেন্দ্র থেকে যদি কোনও গ্রহের কেন্দ্র একটা কাল্পনিক রেখা, যাকে বলে ইমাজিনারি লাইন টানা যায় তবে তা সবসময়েই সমান ক্ষেত্রফলকে সূচিত করবে।

এর দ্বারা কেপলার বোঝাতে চেয়েছেন যে গ্রহগুলো সূর্যের যত কাছে আসবে ততই তাদের গতিবেগ বাড়বে।

এই দুটি সূত্র ছাড়াও পরবর্তীকালে আরও একটি সূত্র কেপলার যোগ করেছেন। সেটি হল, যে কোন গ্রহ তার কক্ষপথে সূর্যকে একপাক ঘুরে আসার জন্য সময়ের যে দৈর্ঘ্য তৈরি করে তার নাম পর্যায়।

যে কোন দুইটি গ্রহের পর্যায়ের বর্গ সূর্য থেকে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের ঘনফলের সমানুপাতিক।

১৬১৯ খ্রিঃ কেপলার World Harmony নামে আর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান-সংক্রান্ত তৃতীয় সূত্রটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

এই তিনটি সূত্রকে সৌরবিজ্ঞানের মাইলস্টোন বলা হয়ে থাকে।

বস্তুতঃ তিনি তাঁর এই সূত্রের মাধ্যমে সৌরবিজ্ঞানকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে এনেছেন।

বস্তুমুখী পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সৌরবিজ্ঞানের যে যোগ আছে তা তিনি সর্বপ্রথম দেখিয়ে দেন।

সৌর-সংসারকে ঘিরে যে গল্পগুজব আর কল্পপুরাণের জন্ম হয়েছিল, কেপলার এককথায় সেগুলোকে নস্যাৎ করে দিলেন।

কেপলারের সূত্রগুলিই পৃথিবীর মানুষকে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভে সাহায্য করে।

সূত্রগুলো কেপলারের মাথায় এসেছিল কিন্তু তিনি এগুলোর কোন গাণিতিক সূত্র দিতে পারেননি।

তবু এসব অত্যদ্ভুত কাজকর্মের জন্য আজও তিনি বিজ্ঞান-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীরূপে পরিচিত হয়ে আসছেন।

কেপলার তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন ইংলন্ডের রাজা প্রথম জেমসের নামে। জেমস এই কারণে কেপলারকে ইংলন্ডে আমন্ত্রণ জানান।

কিন্তু কেপলার জার্মানী ছেড়ে ইংলন্ডে যেতে অস্বীকার করেন। যদিও জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধে নেমে তার খুবই নাজেহাল অবস্থা।

গ্যালিলিও এবং কেপলারের মধ্যে পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ কখনও হয়নি। কিন্তু উ ভয়ের মধ্যে একটা চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

গ্যালিলিও অবশ্য কোপারনিকাসের তত্ত্বসংক্রান্ত তাঁর গ্রন্থটিতে কেপলারের সূত্রগুলির কোন উল্লেখই করেননি।

হয়তো তিনি মনে করেছিলেন কেপলারের সূত্রগুলি অবাস্তব এবং কল্পনাবিলাসের ফল।

কেপলার কোষ্ঠী-ঠিকুজিতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু গ্যালিলিওর সেই বিশ্বাস ছিল না। হয়তো সেই কারণেই গ্যালিলিও এমন একটা ধারণা করেছিলেন।

১৬১০ খ্রিস্টাব্দেই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এরপর পরস্পরের মধ্যে আর কখনো যোগাযোগ ঘটেনি।

তবে গ্যালিলিও যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন তখন তিনি কয়েকজন বিজ্ঞানীর কাছে যন্ত্রটি পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেপলারও ছিলেন।

গ্যালিলিওর পাঠানো সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েই কেপলার বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগুলিকে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করেন।

স্বচক্ষে দেখার আগে পর্যন্ত তিনি বিশ্বাসই করতেন না বৃহস্পতির কোন উপগ্রহ থাকতে পারে।

উপগ্রহগুলির একটি প্রতিশব্দ এর পরই কেপলার বের করেন। তাঁর ব্যবহৃত 'স্যাটেলাইট' আজও পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

এরপরে কেপলার শুরু করেন দূরবীক্ষণ নিয়ে ভাবনা চিন্তা। আলোকতরঙ্গগুলিকে লেন্স কিভাবে প্রতিসরিত করে এবং টেলিস্কোপ ও মানুষের চক্ষু কিভাবে কাজ করে, আমাদের কোন জিনিস দেখতে সাহায্য করে তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন।

গ্যালিলিও তাঁর টেলিস্কোপটি তৈরি করেছিলেন একটি উত্তল ও একটি অবতল লেন্সের সাহায্যে।

কেপলার দুটি উত্তল লেন্স ব্যবহার করে আরও উন্নত ধরনের টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন।

আলোকবিজ্ঞান তথা দূরবীক্ষণ সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা সে যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

প্যারাবোলা শ্রেণীর আয়না সমান্তরাল আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করে। একথাও তিনিই প্রথম গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেন। তাঁর এই আবিষ্কারকে ভিত্তি

করেই প্রায় একশো বছর পরে বিজ্ঞানী নিউটন প্রতিফলন দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবনে সক্ষম হন।

এভাবে কেপলার শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানের নয়, আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন।

অবশ্য আলোক প্রতিসরণের কোন সূত্র তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। পরবর্তীকালে সেই কাজটি করেছিলেন তরুণ বিজ্ঞানী ইয়েল।

১৬১২ খ্রিঃ সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফ মারা যান। নতুন সম্রাট হন ম্যাথিয়াস। নতুন সম্রাট তাঁর রাজসভাতেও কেপলারকে রাখলেন কিন্তু যথোপযুক্তভাবে সময়মত বৃত্তি দিতে পারেননি।

১৬২০ খ্রিঃ কেপলারের মাতার মৃত্যু হয় । এই মৃত্যু ছিল খুবই দুঃখজনক। ডাইনিবৃত্তির অভিযোগে ভদ্রমহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অবশ্য কেপলারের জন্য তাঁকে কোনরূপ শাস্তি ভোগ করতে হয়নি। তবে যথেষ্ট যাতনা ভোগ করে তাঁকে মরতে হয়েছিল।

ইতিমধ্যে কেপলার প্রায় তিন বছর গভীরভাবে ব্রাহের পর্যবেক্ষণ এবং তাঁর নিজস্ব উপবৃত্ত তত্ত্বকে মিলিয়ে একটি সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন এবং অবশেষে গ্রহগুলির পরিভ্রমণ সম্বন্ধীয় নতুন একটি সারণী প্রকাশ করতে সমর্থ হন।

এইসব গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি নেপিয়ার কর্তৃক সদ্য আবিষ্কৃত লগারিদম সারণী(Logarithmic table) ব্যবহার করেন।

বস্তুতপক্ষে, আবিষ্কারের পর লগারিদম সারণীকে সেই প্রথম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা হল।

আশ্চর্য যে, ঠিক সেই সময়টাতেই কেপলারের সংসারে প্রচন্ড অসুবিধা চলে ছিল। স্ত্রী ও তেরোটি সন্তানের এক বিরাট সংসার নিয়ে প্রচন্ড আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে।

জার্মানীর রাজনৈতিক এবং আর্থিক অবস্থাও তখন প্রচন্ড সংকটের মধ্য দিয়ে চলছিল। যুদ্ধ এবং ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে দেশের আবহাওয়াও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু অক্লান্তকর্মা বরেণ্য এই বিজ্ঞানী সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ১৬২৭ খ্রিঃ সারণীটি প্রকাশ করেন।

সারণীটি পরম শ্রদ্ধাস্পদ টাইকো ব্রাহের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হয়েছিল। এককালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার কথা স্মরণে রেখে তিনি এই সারণীর নাম দেন Rudalphine Table।

নিরলস বিজ্ঞান তাপস কেপলারের বিজ্ঞান সাধনা এর পরেও অব্যাহত ছিল। সূর্যের দিকে শুক্র এবং বুধের গতিপথ নিয়েও তিনি গবেষণা করেন।

এই গবেষণা তৎকালীন সময়ে অবশ্য বিশেষ স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বিজ্ঞানী গ্যামেন্দি লক্ষ্য করেন, কেপলারের গণনা এবং মতামত দুই-ই নির্ভুল ছিল।

চাঁদের আকর্ষণে যে নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে এই কথাও কেপলারই প্রথম জানিয়েছিলেন।

১৬৩০ খ্রিঃ বরেণ্য বিজ্ঞানী কেপলারের কর্মময় জীবনের. অবসান ঘটে। রোজেনবার্গে তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়।

উইলিয়াম হারভে



শারীরবিদ্যার বিষয়-আশয় নিয়ে মানুষের গবেষণা-আলোচনার সূত্রপাত সুদূর প্রাচীনকাল থেকে। বহু মনীষীর আত্মত্যাগ, জীবনব্যাপী নিরলস শ্রম এই বিদ্যার অনেক রহস্যেরই উন্মোচন ঘটিয়েছে। নতুন নতুন আবিষ্কারে শারীরবিদ্যা পুষ্টি ও প্রসার লাভ করেছে।

তবুও ষোড়শ শতক পর্যন্ত মানুষের হৃদযন্ত্র ও রক্তবাহী নালিকার প্রকৃত কাজ কি, এ সম্পর্কে কোন বিজ্ঞানীই সঠিক আলোকপাত করতে পারেন নি।

জীবদেহের হৃদযন্ত্রের শারীরবৃত্তীয় কার্যকারিতা সম্পূর্ণ অজানাই থেকে গিয়েছিল।

সেই সময় পর্যন্ত হৃদযন্ত্র সম্পর্কে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের যে ধারণা ছিল, তা হল, রক্ত হৃদযন্ত্র থেকে বেরিয়ে রক্তনলের মাধ্যমে এক তরঙ্গায়িত ধারায় শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

রক্তের শেষবিন্দুটি পর্যন্ত শরীরের কাজে নিয়োজিত না হওয়া পর্যন্ত এই তরঙ্গায়িত ধারায় রক্ত নির্গমন কাজ চলতে থাকে। যে রক্ত হৃদপিন্ড থেকে নির্গত হয় তা আর সেখানে কখনো ফিরে আসে না।

উইলিয়াম হারভে পুরনো এই ধ্যানধারণাকে পাল্টে দিয়ে হৃদযন্ত্র সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করে চিকিৎসা জগতে নিয়ে আসেন বিপ্লব।

উইলিয়াম হারভের জন্ম ইংলন্ডে ১৫৭৮ খ্রিঃ। তাঁর বাবা ছিলেন লন্ডনের বিখ্যাত ব্যবসায়ী।

ছোটবেলা থেকেই হারভের স্বপ্ন ছিল বড় চিকিৎসক হবার। অন্তর্নিহিত প্রতিভাই তাঁর মনে এই প্রবণতার জন্ম দিয়েছিল। মাত্র উনিশ বছর বয়সে কেমব্রিজ

থেকে স্নাতক হবার পর তিনি স্থির করেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাঠ নেবার জন্য ইতালি যাবেন।

রানী এলিজাবেথের সেই রাজত্বকালে সারা ইউরোপ জুড়ে খ্যাতি ছিল ইতালির পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের।

সেখানে শারীর বিদ্যার সেরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ফাব্রিয়াসের মত প্রথিতযশা বিজ্ঞানী। জীবিতকালেই তিনি অ্যানাটমির প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছেন।

প্রাচীনপন্থীদের রক্তচক্ষুশাসনে ইউরোপের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই অ্যানাটমি শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

একমাত্র ব্যতিক্রম পাদুয়া। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার অবাধ স্বাধীনতা। চার্চের রক্তচক্ষুর শাসন সেখানে নেই।

হারভে এসে ভর্তি হলেন পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি প্রাচীন গ্যালেন থেকে শুরু করে পুরনো নবীন সকল চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা ও মতামত গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। হৃদযন্ত্র ও রক্তবাহী নালী বিষয়ে গভীর আগ্রহ বোধ করেন তিনি।

হৃদযন্ত্রের প্রকৃত রহস্য জানবার জন্য নিজের হাতেই শবব্যবচ্ছেদ করে চলেন দিনের পর দিন।

একদিন ফাব্রিয়াসের ক্লাসে মৃতদেহের বুক চিরে পরীক্ষা করতে গিয়ে চোখে পড়ে এক ধরনের মোটা শিরার সঙ্গে আলতো ভাবে লেগে আছে এক ভালভের শ্রেণী। এই ভালভগুলির বিষয়ে ফাব্রিয়াসও আলোকপাত করতে পারেন নি।

হারভের তাই জেদ চেপে যায়। তিনি বুঝতে পারেন শরীরের কোন জরুরী প্রয়োজনেই এই বিশেষ ভালভশ্রেণীর অবস্থান। সেই প্রয়োজন এবং তার ক্রিয়াপদ্ধতিই তাঁকে জানতে হবে।

১৬০২ খ্রিঃ হারভে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরলেন।

তখানো তাঁর মাথায় চেপে আছে হৃদযন্ত্রের স্বরূপ ও শিরা ধমনীতে রক্তের কাজের রহস্য।

যথাসময়ে লন্ডনে ফিরে আসেন তিনি। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ভর্তি হলেন কেমব্রিজে।

সেই সঙ্গে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবেন বলে একটা ক্লিনিকও খুললেন। এই প্র্যাকটিস নিয়ে কেটে গেল তেরটি বছর।

ডাক্তারদের এম. আর. সি. পি করবার প্রতিষ্ঠান হল লন্ডনের রয়াল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস।

হারভে এই কলেজে অধ্যাপক মনোনীত হলেন। এখানে যোগ দেবার পর তিনি গবেষণার প্রশস্ত সুযোগ লাভ করলেন।

ইতিমধ্যে প্র্যাকটিসের সঙ্গে গবেষণার কাজ চালিয়ে হৃদযন্ত্র ও রক্তপ্রবাহের নানা বিষয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতিও অর্জন করেছেন। ফলে হারভে হয়ে উঠলেন এই কলেজের প্রধান আকর্ষণ। তাঁর ক্লাশে দেশ বিদেশের ছাত্রদের ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল।

হারভের আবিষ্কার হৃদযন্ত্রের রহস্যকে পরিষ্কার করলেও তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারকে মেনে নিতে পারছিলেন না অধিকাংশ ডাক্তার। তাঁরা চিকিৎসার সাবেকী ধারণাই আঁকড়ে ছিলেন।

সবচেয়ে বড় কারণ হল হারভে তাঁর আবিষ্কারের সপক্ষে যুক্তিসঙ্গত কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন নি।

সব দেখেশুনেও দমলেন না হারভে। প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টায় একের পর এক পশুর হৃদযন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন।

দীর্ঘ গবেষণার পর হারভে সাফল্য লাভ করেন। তিনি দেখতে পান হৃদযন্ত্রে প্রথমে ঘটে সংকোচন। সেই সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গেই রক্ত ঢুকে পড়ে রক্তনালিকা গুলিতে।

আর ভালভগুলো এমনভাবে সংস্থাপিত ও ক্রিয়াশীল যে তারা রক্তকে সর্বদা এক মুখে অর্থাৎ ভেতর থেকে বাইরে, নয়তো বাইরে থেকে ভেতরে যেতে সাহায্য করে।

হারভে আরও লক্ষ্য করেন রক্ত হৃদযন্ত্রের ডান দিকের ভেনট্রিকল বা নিলয় থেকে সরাসরি ফুসফুসে চলে যায়। তার পথ হল ফুসফুসমুখী ধমনী যার নাম পালমনারি আরটারি।

ফুসফুস থেকে রক্তস্রোত হৃদযন্ত্রের ডান দিকের আরিকল বা অলিন্দ দিয়ে ফের হৃদযন্ত্রের দিকে প্রবাহিত হয়।

তার গতির মাধ্যম হল ফুসফুস অভিমুখী শিরা বা পালমনারি ভেইন। এইভাবে রক্ত বাম অলিন্দ থেকে ছুটে যায় বাম নিলয়ে। সেখান থেকে পাম্প হয়ে সোজা হাজির হয় মহাধমনীতে।

সেখান থেকে শরীরের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকা ধমনীর ভেতর দিয়ে শরীরের বিভিন্ন দিকে চলে যায়।

এরপর বিশেষ শিরার ভেতর দিয়ে সেই রক্ত ডান অলিন্দ পথে ডান নিলয়ে ফিরে যায়। এইভাবেই সম্পূর্ণ হয় শরীরের রক্তচক্র।

হারভে শেষ সিদ্ধান্ত করেন এইভাবে, হৃদযন্ত্রের স্পন্দনই নিয়ন্ত্রণ করে রক্তের এই বৃত্তাকার অবিরাম প্রবাহকে। রক্ত একবার নয়, বারবারই হৃদযন্ত্রে ফিরে আসে।

হারভে এ বিষয়ে যে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটি প্রস্তুত করতে থাকেন, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার প্রমাণ সংগ্রহ করতে কেটে গেল দীর্ঘ দশটি বছর।

গবেষণা সম্পূর্ণ করে Anatomical exercise on the motion of the heart and blood নামে বই প্রকাশ করলেন ১৬২৮ খ্রিঃ।

এবারে তাঁরা কেউ অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না হারভের সিদ্ধান্তকে। বাধ্য হয়েই বিরুদ্ধবাদীদের পুরনো পথ থেকে সরে আসতে হল। এভাবেই যুক্তি ও সত্যের কাছে যুগে যুগে হার মেনেছে অসত্যের অচলায়তন।

দেখতে দেখতে বছর তিনের মধ্যেই হৃদযন্ত্র ও রক্তপ্রবাহের ওপর হারভের গবেষণা সারা ইউরোপের চিকিৎসাব্যবস্থায় স্থান করে নিল।

এই সময়েই ইংলন্ডের সম্রাট প্রথম চার্লস হারভেকে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত করলেন।

১৬৩৯ খ্রিঃ ইংলন্ড জুড়ে দেখা দিল গণঅভ্যুত্থান। দেখতে দেখতে তা গৃহযুদ্ধের আকার লাভ করে সারা ইংলন্ডে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম চার্লস সিংহাসনচ্যুত হলেন ১৬৪২ খ্রিঃ।

দেশ ছেড়ে পালাতে হল তাঁকে। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হারভেকেও দেশত্যাগী হতে হল।

হারভের ঘরবাড়ি ধ্বংস হল বিদ্রোহীদের রোষে। তাঁর গবেষণার অমূল্য কাগজপত্র পুড়িয়ে বহ্ন্যুৎসব করা হল।

তাঁর ঐতিহাসিক যন্ত্রপাতি, যা দিয়ে তিনি হৃদযন্ত্রের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্ভব করে তুলেছিলেন, সেসব ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করা হল।

বিদেশে এই মর্মান্তিক সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শোকে দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন হারভে।

প্রথম জীবনে কীট-পতঙ্গের প্রজননের ওপরে প্রচুর গবেষণা করেছিলেন হারভে। সেই সব আর কোন দিনই বিশ্ববিজ্ঞানের অঙ্গনে হাজির হতে পেল না। বিজ্ঞানের এক নতুন সম্ভাবনার পথ চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল বিপ্লবীদের রোষানলে।

কিন্তু অসীম মনোবল ছিল হারভের। ধীরে ধীরে ধাতস্থ করলেন নিজেকে। নতুন প্রেরণার আগুন জ্বালিয়ে তুললেন নিজের মধ্যে। নির্বাসনের জীবনেই নতুন গবেষণার কাজে হাত দেন। এবারে তাঁর কাজের বিষয় হল, প্রজনন ও ভ্রূণগঠন সম্পর্কে।

পাদুয়াতে থাকার সময়েই এই বিষয়ে কাজ করবার সংকল্প নিয়েছিলেন। এতদিনে সর্বনাশা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সেই সুযোগ পাওয়া গেল। পরীক্ষার জন্য যে হরিণ দরকার হত, অভয়ারণ্য থেকেই তা পাওয়া গেল। তাঁর অনুরোধে নির্বাসিত রাজাই সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

নির্বাসনের দিনগুলোর একঘেয়ে জীবন হারভে কাটালেন ভ্রূণঘটিত গবেষণায় ডুবে থেকে।

নানা অসুবিধার জন্য যদিও তিনি গবেষণা সম্পূর্ণ করতে পারেননি, তবু তাঁর প্রারব্ধ কাজই উত্তরকালের জীবতত্ত্ববিদদের প্রেরণার ইন্ধন জুগিয়েছিল। যৌন কোষ ও ভ্রূণের গঠন নিয়ে জীববিদ্যায় নতুন গবেষণার পথ সুগম করেছিল।

জীবনের অধিকাংশ সময়ই হারভে ব্যয় করেছিলেন পশুদের প্রজনন সম্পর্কে গবেষণায়। এই বিষয় নিয়েই তাঁর তৃতীয় বইটি প্রকাশিত হয় ১৬৫১ খ্রিঃ।

সারা ইউরোপেই এই বই অভাবিত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। প্রাচীনকাল থেকে বিজ্ঞানের যত বিষয়ের ওপর গবেষণা হয়েছে, এর মধ্যে হারভের গবেষণা—প্রজনন বিষয়টি ছিল অভিনব। ইতিপূর্বে এই বিষয় নিয়ে কাজ করবার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারেন নি। এই কারণেই হারভেকে বলা হয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন পথের পথিকৃৎ।

কি করে বিজ্ঞানের আলোয় বিজ্ঞানীকে পথ দেখে অগ্রসর হতে হয় সেই সম্পর্কে উত্তরকালের বিজ্ঞানীদের জন্য হারভে রেখে গেছেন তাঁর মূল্যবান পরামর্শ—..... "Without frequent observation and reterated experiment the mind goes astray after phantoms and appearances."

১৬৫৭ খ্রিঃ হারভে মৃত্যুমুখে পতিত হল।

রেনে দেকার্ত



ইউরোপের রেনেসাঁকে অবলম্বন করে খ্রিস্টীয় পনের ও ষোল শতকে যেসব তীক্ষ্ণধী মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল রেনে দেকার্ত ছিলেন এঁদের অন্যতম। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধকার থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে সত্যের আলোয় জ্ঞানের পথ আলোকিত করতে হবে। সব সত্যই প্রকৃতির রাজ্যে রয়েছে সঙ্গুপ্ত। রহস্যের আবরণে আবৃত। রহস্যের আবরণ সরিয়েই সেই সত্যকে উদ্ধার করতে হবে। আর সত্য উদ্ধারের বা আবিষ্কারের একমাত্র পথ নিরন্তর গবেষণা।

দেকার্ত বিশ্বাস করতেন, একদিন নিজ প্রতিভা ও অনুসন্ধান বলে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে সমর্থ হবে। সাধারণ রোগশোকের কারণ থেকে মহাকাশের

ধূমকেতুর প্রকৃতি পর্যন্ত যেখানে যে সত্য রয়েছে তার সবই একদিন সন্ধানী মানুষের করায়ত্ত হবে।

ভবিষ্যতের সেই সম্ভাবনার স্বপ্ন নিয়েই প্রকৃতির গোপন সত্যকে আবিষ্কারের জন্য তিনি এমন এক পদ্ধতির কথা ভাবতেন যার প্রধান উপকরণ হবে অঙ্কশাস্ত্র।

জ্ঞানতীর্থের নবীন অভিযাত্রী রেনে দেকার্তের জন্ম হয় ১৫৯৬ খ্রিঃ ৩১ শে মার্চ। জন্মের পরে হাসপাতাল থেকে ঘরে আসার আগেই শিশু দেকার্ত মাতৃহারা হয়েছিলন।

মায়ের স্নেহ ও সতর্কতা নিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে দেকার্তকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁর বাবা। বাবার হাত ধরেই বড় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন দুর্বল ও রুগ্ন।

ঘরে মা ছিল না, তাই অন্তহীন বিষণ্নতা ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখত।

শিশুর চঞ্চলতা স্বতঃস্ফূর্ত বালউচ্ছ্বাস তাঁর মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। গভীর একাকীত্বের মধ্যে নিজেই নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকতেন।

মাঠে ঘাটে বনের ছায়ায় তাঁকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে, কখনো নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখা যেত।

চারপাশের প্রকৃতির নানা দৃশ্যের বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে মুগ্ধ বিস্ময়ে আত্মহারা হবার মত উপকরণের অভাব ছিল না। সব তিনি দেখতেন, শুনতেন, উপভোগ করতেন।

তার মধ্যেই প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় সত্যের হাতছানি উপলব্ধি করতেন দেকার্ত। তিনি বুঝতে পারতেন এই বিপুল বিস্ময়ের উৎসের সন্ধান রয়েছে প্রকৃতিরই গর্ভে নিহীত।

কি করলে তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে নিরন্তর এই জিজ্ঞাসায় আলোড়িত হত তাঁর শিশুমন।

শরীর বরাবরই নানা ভোগে কষ্ট দেয়। নিবিষ্ট হয়ে অন্যদশটা ছেলের মত পড়াশোনা করবেন তার উপায় কি? বাবাও পড়াশোনার চাপ বাড়িয়ে রুগ্ন ছেলের কষ্ট বাড়াতে চাইতেন না। তাই আট বছর বয়সের আগে লা ফ্লেচের জেসুইট স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পাননি।

স্কুলের রেক্টর মা-হারা রুগ্ন বিষণ্ন প্রকৃতির ছেলেটিকে সর্বদাই চোখে চোখে রাখতেন।

মাঝে মাঝে কাছে ডেকে আদর করে বসিয়ে মনীষীদের গল্প শোনান। কখনো অতীতের ইতিহাস ঘেঁটে মানুষের সভ্যতার রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনান।

এসব শুনতে শুনতে এক অজানা জগতের স্বপ্নে দুলে উঠত বালক দেকার্তের মন। আনন্দে ভুলে যেতেন শরীরের দুর্বলতার কথা।

অল্পদিনের মধ্যে ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ রেক্টর বুঝতে পারেন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে জন্মেছে এই বিষণ্ণ দর্শন বালক।

তিনি যত্নের সঙ্গেই সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন দেকার্তের। সেই সঙ্গে ছাত্রের ভাঙ্গা স্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্যও সচেষ্ট হন। তাঁর চেষ্টায় ও যত্নে হস্টেলের জীবনগুলো ভিন্ন স্বাদের হয়ে উঠল দেকার্তের কাছে।

অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে সহপাঠীদের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে দেকার্ত। যুক্তিবিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা, আধিদৈবী বিদ্যা এসবের পাঠেও তিনি পিছিয়ে থাকেন না।

ধীরে ধীরে একসময় জ্যামিতি ও বীজগণিতের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। গণিতের এসব শাখায় প্রমাণের নিশ্চয়তার আভাস দেকার্তকে আকর্ষণ করে সব চাইতে বেশি। তিনি বুঝতে পারেন এতদিনে নিজের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

জেসুইট স্কুলের পড়া শেষ করে দেকার্ত ভর্তি হন পয়টায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকে আইনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন পরীক্ষায়।

পাশ করে বেরিয়েই প্যারিস রওনা হলেন। এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে নানা বইপত্র ঘেঁটে একরকম অগোছালো ভাবেই দুটো বছর কাটিয়ে দিলেন।

ভেতরে কিসের একটা অস্থিরতার আলোড়ন নিজেও বুঝতে পারছিলেন না। সেজন্যই নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করতে পারলেন না দুই বছর।

তবে যখনই বইপত্র নিয়ে বসতেন, মনোযোগ থাকত অঙ্কের জটিল তত্ত্বের সমাধানের দিকে।

বলতে গেলে দেকার্তের এই নির্বাসিত জীবনের একমাত্র সঙ্গীই ছিল অঙ্কের বিষয়-আশয়।

একদিন এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে। বন্ধুটি নাসুর যুবরাজ মরিসের সেনাদলের স্বেচ্ছাসেবক একজন। তার উৎসাহে দেকার্তও ঢুকে গেলেন ভলেন্টিয়ার্স টিমে। কিছুদিনের মধ্যেই টিমের সঙ্গে চলে আসতে হল হল্যান্ডের ব্রেদা শহরে।

ছোট্ট শহরটা পছন্দ হয়ে গিয়েছিল দেকার্তের। একদিন হাতে বিশেষ কাজকর্ম ছিল না, একমনেই একটা রাস্তা ধরে হাঁটছিলেন।

একটা বাজারের কাছে এসে লক্ষ্য করেন, খুঁটির সঙ্গে লটকান রয়েছে একটা বিজ্ঞাপন। একদঙ্গল লোক খুঁটিঘিরে জড়ো হয়ে বিজ্ঞাপনটা দেখছে আর হুল্লোড় করছে।

দেকার্ত কৌতূহলী হয়ে কাছে এসে একজনকে ভিড় জমাবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জানতে পারলেন, বিজ্ঞাপনটি হল একটি জটিল অঙ্কের ধাঁধা।

অঙ্ক শুনেই আগ্রহ বাড়ল। এবারে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে রেনে অঙ্কটি পড়লেন। এরপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুখে মুখে ধাঁধার সমাধান করে দেন।

সৌম্যদর্শন একজন বৃদ্ধ খুঁটির কাছেই বসেছিলেন। তিনিই টানিয়েছিলেন বিজ্ঞাপনটি।

দেকার্তের জবাব শুনে তিনি চমৎকৃত হন। দেকার্তের পরিচয় জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

রেনে জানান, তিনি দিন কতক আগে মরিসের সৈন্যদের সঙ্গে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ব্রেদায় এসেছেন।

পরিচয় পেয়ে বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হল না। কেন না, এমন কঠিন অঙ্কের ধাঁধাটি যে ব্যক্তি মুখেমুখেই সমাধান করে দিতে পারেন, একজন সামান্য স্বেচ্ছাসেবকই যে তার প্রকৃত পরিচয় নয় তা তিনি ভালই বুঝতে পারলেন।

বৃদ্ধ নিজেও সাধারণ মানুষ ছিলেন না। হল্যান্ডের বিখ্যাত এই অঙ্কবিজ্ঞানী ও গবেষক মানুষটির পরিচয় সকলেই জানতেন। জ্ঞানীগুণী মহলে তাঁর যথেষ্ট নামডাক। নাম আইজাক বেকম্যাল।

পেশায় চিকিৎসক হলেও অঙ্কের নেশাতেই সারাক্ষণ মেতে থাকতেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। দেকার্তও অঙ্ক পাগল মানুষ। কাজেই কথায় কথায় আলাপ-পরিচয় জমে উঠতে সময় লাগল না। বয়সের ব্যবধান দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোন বাধাই হল না।

মেলামেশা আলোচনার মধ্যে অঙ্কই যোগসূত্র। দেকার্তের জীবনে অচিরেই জ্যামিতির চর্চা নতুন মোড় নেয়।

জ্যামিতির নানা সূত্রের আবিষ্কারের প্রধান দাবিদার প্রাচীন গ্রীক পন্ডিতগণ। কিন্তু তাঁদের পথ দেকার্তের কাছে নিতান্তই গতানুগতিক বলে মনে হত। তিনি চাইতেন সহজ সরল যুক্তির পথে জ্যামিতিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে তুলতে। তাহলে অনেক মানুষই জ্যামিতি চর্চায় উৎসাহ পাবে।

তিনি নিজেই জ্যামিতির একটি ভাগ নতুন করে সাজিয়েছিলেন। তা হল রেখার ব্যবহার ও গ্রাফ বা লেখ-এর দ্বিমাত্রিক নকশা।

দেকার্ত রেখকের এককগুলোকে অনুভূমিক রেখা ও উল্লম্ব রেখ-তে নির্দিষ্ট করে বসান। এর ফলে রেখার ওপর যে কোন এক বিন্দুকে দুই রেখার ওপর নির্দিষ্ট করা দুই সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে।

ইউক্লিডের জ্যামিতির মূল নিয়মগুলোকে বজায় রেখে জ্যামিতি ও বীজগণিতকে এইভাবে একসূত্রে গেঁথে দেকার্ত তৈরি করেছেন স্থানাঙ্ক বা বিশ্লেষণী জ্যামিতি (Co-ordinate Geometry)।

অসুস্থতা কোন না কোনভাবে জড়িয়েই থাকত দেকার্তের শরীরে। তবু শরীর মনের কষ্ট স্বীকার করেও যুদ্ধবিভাগের কাজে থেকে গেলেন কিছুদিন। তারপর সেখান থেকে এলেন জার্মানি।

সেই সময় জার্মানিতে বাভারিয়ার ডিউকের সেনাদলে স্বেচ্ছাসেবী নেওয়া হচ্ছিল। দেকার্তও ভিড়ে গেলেন সেই দলে।

বছর দেড়েক জার্মানির সৈন্য বিভাগে কাটিয়ে এবারে নিরুদ্দেশ ভ্রমণে বেরলেন মধ্য ইউরোপে।

নানাস্থানে ঘুরছেন বন্ধনহীন ভাবে কিন্তু জ্যামিতি আছে সঙ্গে। সেই সূত্রে সব জায়গাতেই জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে চিন্তার বিনিময় ঘটেছে। ফলে পরিচিতি ছড়িয়েছে সবত্রই।

পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে ফের প্যারিসে যখন ফিরে এলেন তখন সেখানকার শিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে দেকার্তের নাম। জ্যামিতির যুক্তি নিয়ে নতুন নতুন চিন্তাভাবনার সুবাদেই তাঁর এই পরিচিতি।

প্যারিসে যে বাড়িতে উঠলেন, অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে গড়ে উঠল যুক্তিবাদী মানুষদের মিলনকেন্দ্র।

আলোচনার প্রসঙ্গ থাকে বিজ্ঞানের নানা বিষয়। তবে অবধারিতভাবেই অধিকাংশ সময়ে প্রাধান্য পায় গণিত, বিশেষতঃ জ্যামিতি।

জনমুখে প্রচার শুনে পন্ডিত থেকে পড়ুয়া অনেকেরই যাতায়াত বাড়ে দেকার্তের বাড়িতে। গণিতের সঙ্গে দর্শনের আলোচনায় সমান দক্ষতা দেখান দেকার্ত।

প্যারিসের পাটও চুকল একদিন। তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে এলেন হল্যান্ডে। ১৬২৯ খ্রিঃ থেকে এখানেই পাকাপাকিভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন।

জেসুইট স্কুলের ফাদার মেরিস মারমেন প্যারিস আর হল্যান্ডের মধ্যে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। তাঁর মাধ্যমেই প্যারিস আর হল্যান্ডের মধ্যে খবরাখবর আদানপ্রদানের কাজটাও চলত।

হল্যান্ডে অঙ্ক আর দর্শনের গবেষণা নিয়ে থাকলেও আলোকবিজ্ঞান; পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অ্যানাটমি ও ভেষজবিদ্যার চর্চাও করেছেন গভীরভাবে। তাঁর সব ভাবনা চিন্তা পরীক্ষানিরীক্ষার বিবরণ একসঙ্গে সাজিয়ে পান্ডুলিপির আকারে দাঁড় করালেন। নাম দিলেন লে মনডে। বই আকারে ছাপাবেন এরকমই মনোগত ইচ্ছা। সময়টা ১৬৩৪ খ্রিঃ।

যথারীতি এই খবরটা একসময় ফাদার মারমেনের মারফত প্যারিসের বিদ্বৎমহলে ছড়িয়ে পড়ল। আয়োজনও চলতে লাগল। খবর হল, বড়দিনের আগেই বহু বিষয়ের নতুন ভাবনাচিন্তা নিয়ে দেকার্তের বই আত্মপ্রকাশ করবে।

হল্যান্ডে আশায় আশায় দিন গুণছেন দেকার্তও। এরই মধ্যে খবর পাওয়া গেল বাইবেলকে অবমাননার দায়ে ক্যাথলিক আদালত গ্যালিলিওকে দন্ডিত করেছেন।

সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ঘোরে এই বাইবেল-বিরোধী ঘোষণা করেছিলেন কোপার্নিকাস। গ্যালিলিও কোপার্নিকাসকে সমর্থন জানিয়ে ধর্মদ্রোহিতার মহাপাপের কাজ করেছিলেন।

খবরটা পেয়েই সতর্ক হয়ে গেলেন দেকার্ত। হাত গুটিয়ে নিলেন। প্যারিসে অনুরাগী মহলেও খবর পৌঁছে গেল, ব্যক্তিগত কারণে লে মনডে-এর ছাপার কাজ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু অদ্ভুত এক ব্যতিক্রমী ঘটনা এই সময়ে চমকে দিল দেকার্তকে। চার্চের দুই ফাদার কার্ডিনাল দে বেরুন ও কার্ডিনাল রিষেল দেকার্তকে লে মনডে বইটি ছাপিয়ে বার করার জন্য উৎসাহ দিয়ে ক্রমাগত চিঠি পাঠাতে লাগলেন।

গ্যালিলিওর খবর পাবার পর থেকে অনিশ্চয়তার দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন দেকার্ত। দুই ফাদারের চিঠির আন্তরিক তাগিদে তাঁর মনের দ্বিধার ভাবটা কেটে গেল।

দ্রুত অবশিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করে প্যারিস থেকে লা মনডে প্রকাশের ব্যবস্থা করে ফেললেন।

১৬৩৭ খ্রিঃ ৮ জুন বইটি আত্মপ্রকাশ করল। যা হবার কথা ছিল ১৬৩৪ খ্রিঃ তা হলো তিন বছর পরে।

সত্য প্রকাশের কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলেছিলেন দেকার্ত। দীর্ঘ তিন বছর পরে হলেও স্বপ্ন সফল হওয়াতে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন।

স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ওপরেই ভিত ছিল লে মনডে বইয়ের। একই বই প্রকাশিত হল ভিন্ন নামে— ডিসকোর্স অব মেথড।

প্রকাশের আগে থেকেই কানাঘুষার মাধ্যমে দেকার্তের বই নিয়ে চার্চের ফাদারদের মধ্যে কৌতূহল দানা বেঁধে ছিল। সেই সঙ্গে ছিল অহেতুক সংশয়। দেকার্ত বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর বই সম্পর্কে ধর্মপিতাদের মন থেকে সংশয় দূর করতে না পারলে তাঁর ভাগ্যেও গ্যালিলিওর পরিণতি ঘটা বিচিত্র নয়। সেইকারণে বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চার্চের কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে দেখা করে বোঝালেন যে বাইবেলের কথাই পরম সত্য। তার বিরুদ্ধতা করে কোন নতুন কথা বলা বা নতুন কোন সত্য আবিষ্কারের কথা তাঁর বইতে নেই।

পুরনো কথাকেই সামান্য ঘষামাজা করে নতুন ভাষায় বলবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

দেকার্তের খোলামেলা কথা শুনে চার্চের কর্মকর্তারা আশ্বস্ত হলেন। তাঁরা আর বই খুলে পড়ে দেখবার দরকার মনে করলেন না।

বাইবেলের কথার সঙ্গে আদৌ কোন অমিল দেকার্তের বইতে যে থাকতে পারে এমন সন্দেহও তাঁদের মন থেকে দূর হল। ফলে বইটি ধর্মপিতাদের রোষদৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সমর্থ হল।

তথাকথিত চার্চের আধিকারিকদের বুদ্ধিবিবেচনা কেমন হত সেকালে, দেকার্তের এই ঘটনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। দেকার্তের বইতে নতুন বিস্ফোরক পদার্থ

কি বা কতটা ছিল তার হদিস তারা না পেলেও দেশের অনেকেই তা অবিলম্বে জেনে গেলেন।

সেই কানাঘুষো ধর্মপিতাদের প্রভাবিত করবার আগে পর্যন্ত কিছুদিন দেকার্তের নিশ্চিন্তেই কাটল।

শেষ্ পর্যন্ত কি ঘটবে তা দেকার্ত ভালই জানতেন। তিনি চেয়েছিলেন গোলমাল পাকিয়ে ওঠার আগে বইটা দেশের কিছু মানুষের হাতে পৌছে যাক।

যা অবধারিত ছিল তাই ঘটল একসময়ে। হল্যান্ডের প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের ধর্মকর্তারা সখেদে মন্তব্য প্রকাশ করলেন, দেকার্তের বইটি পুরোপুরি ধর্মবিরোধী। দেকার্ত হলেন প্রথম শ্রেণীর নাস্তিক। তার বই অবিলম্বে বাজার থেকে তুলে না নিলে সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ উচ্ছন্নে যাবে।

দেকার্তের সৌভাগ্য বলতে হবে, ধর্মপিতাদের নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হবার আগেই হল্যান্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব অরেঞ্জ দেকার্তকে অকুণ্ঠ প্রশংসা জানালেন। অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে যাজকসম্প্রদায় বাধ্য হয়ে ঢোঁক গিলে ফেললেন, আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

নেহাৎ দৈবযোগেই দেকার্তের মাথা বেঁচে গেল। আর তার ফল হল, দেকার্তের নাম দাবানলের মত রাতারাতি সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে বইয়ের প্রচারও বেড়ে গেল বিপুলভাবে।

হল্যান্ডের যুবরাজের সমর্থনের পরে অন্যান্য দেশের রাজারাও দেকার্তকে নতুন চিন্তানায়কের সম্মান দিয়ে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন।

ইংলন্ডের রাজা প্রথম চার্লস, ফ্রান্সের সম্রাট ত্রয়োদশ লুই বিজ্ঞানের নতুন নায়ককে নিজেদের দেশে সাদর আমন্ত্রণ জানান।

দেকার্ত পরে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। দুই দেশেই তিনি বিপুল ভাবে সংবর্ধিত হয়েছিলেন।

১৬৪৬ খ্রিঃ হঠাৎ শোনা গেল, বোহেমিয়ার সুন্দরী যুবরানী নিজেকে দেকার্তের ভাবশিষ্য বলে প্রচার করেছেন। ঘটনাটা যে দেকার্তের অনুরাগীদের যারপরনাই উৎসাহিত করল তা বলাই বাহুল্য।

মোট কথা তাঁর বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করার সব সম্ভাবনার দরজাই এভাবে দিনে দিনে রুদ্ধ হয়ে গেল।

বাইরে যখন নতুন প্রকাশিত বই নিয়ে এত কান্ড চলছে তখন দেকার্তের নিজের সময় কাটছে নানা বিষয়ের জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যায়। সেই সঙ্গে আর একটা কাজ করেন তিনি। প্রতিদিনই নির্দিষ্ট একটা সময়ে চিঠির তাড়া নিয়ে বসেন জবাব লিখতে।

বিচিত্র সব অনুরোধ জানিয়ে দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই অসংখ্য চিঠি

এসে জমে। দেকার্ত ধৈর্য ধরে সব চিঠিই পড়েন। যত্ন করে যথাযোগ্য জবাব লিখে পাঠিয়ে দেন।

একদিন একটা চিঠি খুলেই চমকে যান। সুইডেনের মহারানী, ক্রিশ্চিয়ানার চিঠি। রানী তাঁকে তাঁর দেশে যাবার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। চিঠিটার খুব একটা গুরুত্ব দেননি তিনি প্রথমে।

কিন্তু একই অনুরোধ জানিয়ে দিনের পর দিন রানীর চিঠি আসতে থাকায় দেকার্ত রানীর উদারতায় মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। ১৬৪৯ খ্রিঃ দেকার্ত সুইডেন রওনা হলেন। তাঁর বয়স তখন তেপ্পান্নর কোঠায়।

পাথর আর ভালুকের দেশ বলে সুইডেনের খ্যাতি। সেই দেশ দেকার্তকে রাজার সম্মানে সম্মানিত করল। কয়েকদিন রাজঅতিথি হয়ে কাটালেন। এর মধ্যে একদিন ক্রিশ্চিয়ানা এসে সাক্ষাৎ করলেন। আকুতি জানালেন, তিনি দেকার্তের কাছে দর্শন ও অঙ্ক শিখবেন।

আরও জানালেন, যেহেতু নানা কাজে সময় কম তাই ভোর পাঁচটা থেকেই তিনি রোজ পাঠ নিতে আসবেন।

দেকার্তের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। প্রথমতঃ তিনি এমন ব্যাপারের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যই অত ভোরে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু রানীকে বোঝাবার চেষ্টা করে কোন ফল হল না। দেকার্তকে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হতেই হল।

নির্ধারিত দিনে রাজপ্রাসাদে ক্লাশ নিতে এসে দেকার্তের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। তিনি দেখলেন যে ঘরে তাঁকে পড়াতে হবে সেটি অসম্ভব রকমের ঠান্ডা। বুঝতে পারলেন দিন কয়েকের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়তে হবে তাঁকে। মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও সৌজন্যের খাতিরে মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। রানী ক্রিশ্চিয়ানার অঙ্ক ও দর্শনের শিক্ষা শুরু হল।

কিন্তু তিন মাসও কাটল না। প্রবল নিউমোনিয়ায় শয্যাশায়ী হলেন দেকার্ত। সুইডেন রাজপ্রাসাদের সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে শেষ প্রর্যন্ত প্রবল জ্বর আর কাশিতে মারা গেলেন দেকার্ত। সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এই দুঃসংবাদ।

সুইডেনেই সমাহিত হয়েছিলেন দেকার্ত। কিন্তু মৃত্যুর সতের বছর পরে তাঁর মরদেহের কফিন প্যারিসে নিয়ে আসা হয় এবং নির্জন এক সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে পুনঃসমাহিত করা হয়।

অঙ্ক সহ বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখাতেই দেকার্তের কিছু না কিছু পরীক্ষা রয়েছে। অনেক সম্ভাবনার কেবল সূত্রটুকু তিনি দেখিয়েছেন, বিস্তৃত ব্যাখ্যায় নামেননি ইচ্ছে করেই।

গ্যালিলিওর পরিণাম পদে পদে তাঁর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিশ্লেষণী জ্যামিতির সঙ্গে বীজগণিত মিশিয়ে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির উদ্ভাবন।

তাঁর জ্যামিতি ভাবনাই পরবর্তীকালে লিবনিজ ও নিউটনকে ক্যালকুলাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

দেকার্তের উদ্ভাবিত সমীকরণের পথেই গ্রাফ ও শংকুর প্রস্থচ্ছেদের শ্রেণীচরিত্র নির্ণয় করতে গণিতবিজ্ঞানীদের পথ দেখিয়েছেন।

গাণিতিক পদার্থবিদ্যার অন্তর্গঠনে দেকার্তের অবদান অনস্বীকার্য।

ইয়োহানিস গুটেনবার্গ



মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মুদ্রণযন্ত্রের সম্পর্ক অতি গভীর এবং ওতপ্রোত। লিখতে শেখার পর থেকে মানুষ লেখার সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করত গাছের বাকল, পশুর চামড়া, শিলা ও মাটির ফলক।

মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ধরা থাকত এইসব উপকরণে। সমাজের বৃহত্তর মানুষের মধ্যে চিন্তাশীল মানুষদের ভাবনা-চিন্তা বড় একটা পৌঁছবার সুযোগ পেত না।

সেই কারণে শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ব্যাপ্তি ছিল গণ্ডীবদ্ধ। দেশের ও সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষদের চিন্তার ফসল ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের সুযোগ এসেছিল অনেক পরে।

এই যুগান্তকারী কাজটি করেছিলেন জার্মানীর এক প্রসিদ্ধ শিল্পী কারিগর গুটেনবার্গ। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করে তিনি বিজ্ঞানের জগতে তথা মানব সভ্যতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

গুটেনবার্গের পিতা ছিলেন একজন মণিকার। পিতার সঙ্গেই তাঁর মণিকারের জীবন শুরু হয়েছিল, লেখাপড়ার বিশেষ একটা সুযোগ পাননি।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ শিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান হলেন। একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র।

ফলে দেশের বিত্তবান ব্যক্তিরা গুটেনবার্গকে দিয়েই তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজ করাতে ভালবাসতেন। এই সূত্রে তাঁর দোকানে সকলকেই যাওয়া আসা করতে হত।

শিল্পী গুটেনবার্গের বেদম নেশা ছিল তাস খেলার। সবসময় খেলার জুড়ি পাওয়া যেত না বলে, প্রায়ই তিনি স্ত্রী এনাকে সঙ্গে করে খেলায় বসে যেতেন।

সেকালে কিন্তু এখনকার মত এমন ছিমছাম সুন্দর তাস পাওয়া যেত না। শিল্পীরা মোটা কাগজ কেটে তার ওপর ছবি এঁকে তাস তৈরি করতেন। বাজারে সেই সব তাসেরই প্রচলন ছিল।

একদিন গুটেনবার্গের মাথায় চিন্তা ঢুকল, তাসকে তো আরও সুন্দর করা যায়। এরপর থেকেই কি করে সুন্দর ছবি এঁকে এই সখের জিনিসটাকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হল।

একদিন তাসের ছবি আঁকতে বসে কিছুক্ষণ কাজ করার পরে খেয়াল হল, তাই তো, সময় অনেক ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এত কষ্ট না করে সহজ কোন উপায়ে কাজটা করতে পারলে অনেক সুবিধে।

অনেক চিন্তার পর কাঠের টুকরো খোদাই করে ছবি আঁকলেন। এরপর তার গায়ে কালি মাখিয়ে কাগজের ওপর ছাপ দিলেন।

কাগজের ছবি দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। বাজারের সেরা তাস হাতে এসে গেল। এক বাণ্ডিল এমন ছবিওলা তাস পেলে কেউ আর অন্য তাসে হাত ছোঁয়াবে না।

সবকটি তাসের জন্য আলাদা আলাদা কাঠের ব্লক তৈরি করে ফেললেন গুটেনবার্গ। তারপর নতুন জাতের তাসের বাণ্ডিল বন্ধুদের কাছে উপহার পাঠিয়ে দিলেন।

শিল্পী পরিবারে জন্ম। জন্মগত ভাবে লাভ করেছেন শিল্পের প্রতিভা। অতৃপ্তিই শিল্পীজীবনের উপজীব্য। তাই কেবল তাস নিয়েই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না গুটেনবার্গ।

কাঠের ব্লকের সন্ধান যখন পাওয়া গেল, তখন আরও ভাল কাজে তাকে কি করে লাগানো যায় সেই চিন্তা করতে করতে কিছু মহাপুরুষের ছবির ব্লক তৈরি করে ফেললেন।

তারপর আরও একটা কাজ করলেন। ছবির নিচে ধারাল অস্ত্র দিয়ে মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী খোদাই করে দিলেন। সেই লেখা-যুক্ত ছবি কাগজে ছাপিয়ে এক অভিনব জিনিস দাঁড়িয়ে গেল।

এবারে বেশ কয়েকজন মনীষীর বড় আকারের ছবি নিজের দোকানে ঝুলিয়ে দিলেন।

সেই যুগে এমন একটা ব্যাপার পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ভাবনা পৌঁছাতে পারেনি তখনো। ফলে ছবিগুলো দেখে সকলেই গুটেনবার্গের কৃতিত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

অবস্থাপন্ন অনেক লোক ভাল দাম দিয়ে ছবি কিনে নিয়ে যেতে লাগল। চাহিদাও বাড়তে লাগল দিন দিন।

ব্লক তৈরিই আছে। কাজেই সাদা কাগজে ছাপ তুলে ছবি সরবরাহ করতে তাঁর বেশি সময় লাগত না।

ব্লক তৈরি করবার যে পরিশ্রমটুকু তা আগেই মিটে যেত। ভাল এবং সঠিক ছবির জন্য গোড়া থেকেই দুটো ব্লক তৈরি করতে হত।

গুটেনবার্গ প্রথমে একটা কাঠের ফলকে ছবি এবং লেখা এঁকে নিতেন। তারপর প্রয়োজনীয় অংশ রেখে বাকি কাঠ কেটে বাদ দিয়ে দিতেন। তৈরি হত সোজা ব্লক। এর ছাপ হত উল্টো।

কাঠের ফলকে সেই উল্টো ছাপ ফেলে কেটে নিলেই সোজা ব্লক তৈরি হয়ে যেতো। দ্বিতীয় বারের আসল ব্লকটাই সংরক্ষণ করতে হত।

গুটেনবার্গের নতুন উদ্ভাবিত ছবির ব্যবসা দেখতে দেখতে বেশ জমে উঠল। শিল্পী হিসেবে খ্যাতিও বৃদ্ধি পেল অনেক।

একদিন দোকানে এলেন এক পাদ্রীসাহেব। ছবি দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা ছবি কিনে নিয়ে গেলেন।

গুটেনবার্গের ছবি দেখে দেখে পাদ্রী সাহেবের মাথায় নতুন চিন্তা এসে গেল। তিনি ঠিক করলেন মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী একটু বিস্তৃতভাবে লিখে ছবি সহ ছাপিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করবেন। এতে দেশের মানুষ উপকৃত হবে। সমাজের চিন্তা উন্নত হবে।

পাদ্রী সাহেব কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনী লিখে নিয়ে এরপর একদিন হাজির হলেন গুটেনবার্গের দোকানে।

বললেন, এগুলো তাঁকে ছাপিয়ে দিতে হবে। ছবি না পাওয়া গেলেও হবে। খরচ যা লাগবে তা তিনি বহন করবেন।

গুটেনবার্গ দায়িত্ব নিলেন, তবে খুবই চিন্তায় পড়ে গেলেন কাজটা নিয়ে। চিন্তাভাবনা করে তিনি প্রথমে অক্ষরের উল্টো প্রতিলিপি আঁকা রপ্ত করে নিলেন।

এরপরে কাজটা আর কঠিন থাকল না। কাঠের ফলকের ওপর একটার পর একটা অক্ষর খোদাই করে পর পর চৌষট্টিখানা ব্লক তৈরি করে ফেললেন। এজন্য তাঁকে কয়েক সপ্তাহ ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হল।

পাদরী সাহেব যেদিন এলেন তিনি হাতে পেয়ে গেলেন চৌষট্টি পৃষ্ঠার মহাপুরুষদের একখানা জীবনীগ্রন্থ। এটিই পৃথিবীর প্রথম ছাপা বই।

ইতিহাসবিদদের অভিমত হল, চীনদেশেই ৮৬৮ খ্রিঃ প্রথম অক্ষর ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু মুদ্রণ যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কর্তার বিষয়ে নিশ্চিতভাবে ইতিহাস কিছু বলতে পারে না।

তবে যিনিই সেই পদ্ধতি উদ্ভাবন করে থাকুন ততদিনে তা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালের গুটেনবার্গের কাজের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল না।

এই কারণে প্রথম মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কর্তার সম্মান গুটেনবার্গকেই দেওয়া হয়ে থাকে।

নিজের কাজের সাফল্যই গুটেনবার্গের উৎসাহ বৃদ্ধি করল। তিনি এবারে স্থির করলেন, একটা বাইবেল ছাপবেন।

স্ত্রীকে মনের কথা জানালেন। কাজের জন্য কয়েকজন সহযোগীও জোগাড় হয়ে গেল।

কিন্তু কাজ শুরু করার মুখেই দুর্ভাগ্যক্রমে বাধা পড়ল।

গোটাকয়েক পৃষ্ঠার ব্লক তৈরি হয়েছিল। একদিন সেগুলো পরীক্ষা করবার সময় হাত ফস্কে পড়ে গেল। পাতলা কাঠের ফলক সঙ্গে সঙ্গে ফেটে চিড় ধরে অকেজো হয়ে গেল।

একটা নতুন কাজে এভাবে গোড়াতেই বাধা পড়াতে খুবই দুঃখ পেলেন গুটেনবার্গ। কিন্তু হতাশ হলেন না। আবার কিছুদিন ধৈর্য ধরে পরিশ্রম করতে হবে এই যা।

এই দুর্ঘটনার থেকে একটা অভিজ্ঞতাও লাভ হল গুটেনবার্গের। ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলেও যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়—তেমন একটা উপায় বার করার জন্য চিন্তা মাথায় ঢুকল তাঁর।

কিছুদিনের মধ্যেই পথ বার করে ফেললেন। এবারে তিনি আর কাঠের ওপরে অক্ষর খোদাই করলেন না। একটা একটা করে ছোট আকারের কাঠের অক্ষর তৈরি করলেন।

প্রয়োজনীয় অক্ষর তৈরি হয়ে গেলে সেগুলোকে কাঠের ফলকে লেখার মত করে সাজিয়ে ফেললেন।

তারপর গোটা জিনিসটাকে শক্ত সুতো দিয়ে বেড় দিয়ে বেঁধে ফেললেন যাতে অক্ষরগুলো নড়েচড়ে না যায়।

এবারে সমস্ত অক্ষরের গায়ে কালি লাগিয়ে কাগজে ছাপ তুলে নিলেন।

পদ্ধতিটা গুটেনবার্গের কাছে খুবই নিরাপদ আর সুবিধাজনক বলে মনে হল। তিনি পরের কাজগুলো এভাবেই করবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কাঠ কেটে যে অক্ষর তৈরি করা হয়েছিল গুটেনবার্গ সেগুলোর নাম দিলেন টাইপ বা বিচল অক্ষর।

এই পদ্ধতিতে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি লক্ষ্য করলেন, বারবার একই টাইপ নিয়ে কাজ করার ফলে সেগুলো খানিকটা ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। ফলে লেখার ছাপ অস্পষ্ট হচ্ছে।

এই অসুবিধা দূর করবার জন্য পরে গুটেনবার্গ কাঠের টাইপ বর্জন করলেন। তৈরি করে নিলেন দীর্ঘস্থায়ী ধাতুর টাইপ। এই টাইপে ছাপিয়ে ১৪৫৬ খ্রিঃ তিনি প্রথম বাইবেল ছেপে প্রকাশ করেন।

এই কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন ফাস্ট ও শোত্রক নামের দুজন শিল্পী কারিগর।

গুটেনবার্গ স্ট্রাসবুর্গে প্রথম ছাপার কাজ শুরু করেছিলেন। পরে ১৪৪০ খ্রিঃ মেনজে তাঁর প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নেন। তখন থেকেই তাঁর বিখ্যাত Mazarine Bible মুদ্রিত হয়েছিল।

গুটেনবার্গের বাইবেলটি বিশালাকারে লার্টিনে ছাপা হয়, মোট পাতার সংখ্যা ১২৮২। পুরো বই কালো কালিতে ছাপা, কেবল পরিচ্ছদগুলোর হেডিং আর প্রথম প্যারার এবং অনেক পাতার প্যারার আদ্যক্ষর লালে ছাপা। প্রত্যেক পাতার পাঠ্যাংশ দুকলমে ৪২ লাইনে ছাপা। এই জন্য গুটেনবার্গের বাইবেল 42 line Bible বলেও বিখ্যাত। ছাপা হয়েছিল ২০০ কপি।

আবিষ্কারক বা উদ্ভাবকদের কাজের ফলটিই কেবল মহাকাল তার সময়ের ফলকে খোদাই করে রাখে। তাঁদের জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও ত্যাগের স্বেদ ও অশ্রুর দীর্ঘ ইতিহাস কালস্রোতে হারিয়ে যায়।

শিল্পী গুটেনবার্গ তাঁর শিল্পের উন্নতির চিন্তা আর কাজকেই জীবনে প্রাধান্য দিয়েছিলেন জীবনভোর। তাই মুদ্রণশিল্পের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করে তাঁকে কঠোর দারিদ্র্যকে বরণ করে নিতে হয়েছিল।

অথচ ব্যবসায়বুদ্ধি প্রয়োগ করলে নিজস্ব পদ্ধতিতে বাইবেল ও অন্যান্য পুস্তক ছেপে সেই যুগেই প্রচুর অর্থ ও বিত্তের অধিকারী হতে পারতেন।

তা না করে নিজের যা কিছু সম্বল ছিল তা-ও অকাতরে ব্যয় করেছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে।

চরম দরিদ্র অবস্থার মধ্যেই শেষ বয়সে তাঁর সকল কাজের নির্ভরযোগ্য সহযোগী এবং একমাত্র উৎসাহদাত্রী স্ত্রী ওনাকে হারিয়েছিলেন। এই বিয়োগব্যথা তাঁর সমস্ত কর্মক্ষমতাকে বিকল করে দিয়েছিল।

শেষ দিকে একরকম অনাহারেই দিন কাটাতে হয়েছিল তাঁকে। মেঞ্জের পাদরী সাহেবের অনুগ্রহে সেই সময় তাঁর জন্য সামান্য ভাতার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই ভাতার অর্থেই অবশিষ্ট জীবনটা কাটিয়েছিলেন কায়ক্লেশে।

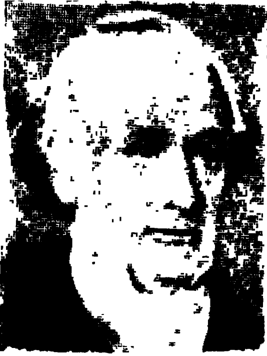
গুটেনবার্গের পর জার্মানি থেকেই মুদ্রণ শিল্প রোম, ভেনিস ও অবাশিষ্ট ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইংলন্ডে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন ক্যাকস্টন ১৪৭৬ খ্রিঃ। পরবর্তী বছরেই ওয়েস্টমিনিস্টার থেকে তিনি মুদ্রিত করেন The Dictes and Sayings of the Philosophers।

পনের বছরের মধ্যে তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থ মুদ্রিত করেছিলেন।

পরবর্তীকালে মুদ্রণযন্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। সমস্ত উন্নতিব মূলেই ছিল গুটেনবার্গের সেই কাঠের টাইপ।

ইভানজেলিসতা টরিসেলি



বিজ্ঞানের জগতে গ্যালিলিও-এর আবির্ভাব এক মহাবৈপ্লবিক ঘটনা। চার্চ অনুশাসিত ও সনাতনপন্থী ধ্যানধারণার কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পের মত তাঁর মতবাদ সমাজের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

কেবল বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়েই নিমগ্ন ছিলেন না গ্যালিলিও। অধ্যাপনার ক্ষেত্রেও তিনি নিজের বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করে সত্যকে স্বীকার করবার অদম্য মনোবল ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন।

উত্তরকালে তাঁর হাতে গড়া ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদান রেখে কীর্তিমান হয়েছেন। ইভানজেলিসতা টরিসেলি তাঁদের মধ্যে একজন।

উত্তর ইতালিব কায়েঞ্জা শহরে ১৬০৮ খ্রিঃ ১৫ই অক্টোবর টরিসেলির জন্ম। অল্পবয়েসেই শিক্ষালাভের জন্য একটি জেসুইট স্কুলে ভর্তি হন তিনি। খ্রিষ্টান যাজকদের বিশেষ সদস্যরা সেই সময়ে জেসুইট নামে পরিচিত হতেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মশিক্ষার স্কুলগুলিকেই বলা হত জেসুইট স্কুল। কায়েঞ্জা শহরে তখন যত্রতত্র জেসুইটদের স্কুল।

অসাধারণ মেধা নিয়ে জন্মেছিলেন টরিসেলি। যা একবার শুনতেন তা সহজে ভুলতেন না। যা পড়তেন তা মনে গেঁথে যেতো।

স্কুলে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ বাল্যবয়সেই প্রকাশ পেয়েছিল।

স্কুলের পড়া শেষ করে রোমে এলেন উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য। ভর্তি হলেন বিখ্যাত কলেজিও দ্য সাপিয়েঞ্জা মহাবিদ্যালয়ে।

এখানেই ছাত্রাবস্থায় টরিসেলির হাতে পড়ল একদিন গ্যালিলিওর মহাকর্ষ তত্ত্বের বই।

মহাবিজ্ঞানীর বলবিদ্যা সম্পর্কিত নতুন নতুন চিন্তাধারার পরিচয় লাভ করে চমৎকৃত হলেন। নতুন করে পদার্থবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হল টরিসেলির মন।

কলেজের ক্লাশ মাথায় উঠল এরপর। রোমের লাইব্রেরিগুলিতে হানা দিতে লাগলেন গ্যালিলিওর বই-এর সন্ধানে।

পৃথিবীর সূর্যকেন্দ্রিক আবর্তন প্রকাশের পর শাস্ত্রবিরোধী প্রচারের অভিযোগে চার্চ গ্যালিলিওকে দণ্ডিত করেছিল। নিষিদ্ধ হয়েছিল তাঁর বই।

কিন্তু রাজধানী শহর রোমে গ্রন্থাগার ও সংরক্ষণশালার অভাব ছিল না। সেইসব লাইব্রেরী ঘুরে ঘুরে পেয়েও গেলেন গুটিকতক বই। গোগ্রাসে পড়ে গেলেন। কিন্তু অতৃপ্তি যেন আরও বেড়ে গেল।

বুঝতে পারলেন নতুন চিন্তার সূত্র-সন্ধান করতে হলে উপস্থিত হতে হবে এই জ্ঞানসমুদ্রের উপান্তে।

গ্যালিলিও যেন এক অদৃশ্য আকর্ষণে টানতে লাগলেন টরিসেলিকে।

১৬৪১ খ্রিঃ তিনি চলে এলেন ফ্লোরেন্স শহরে। সেই সময়ে তাঁর বয়স তেত্রিশ বছর। গ্যালিলিওর কাছে এলেন।

কিন্তু বিজ্ঞানের ভূমিতে ভূমিকম্প জাগানো সেই বিদ্রোহী আগ্নেয়গিরি ততদিনে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এতটাই যে টরিসেলি বেদনাক্রান্ত না হয়ে পারলেন না।

আট বছর আগেই আদালত গ্যালিলিওর দণ্ডবিধান করেছে। নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়েছে তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক গবেষণা। তিনি হয়েছেন গৃহবন্দী।

টরিসেলি যখন গ্যালিলিওর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।

উদ্যম হারালেন না টরিসেলি। সিদ্ধান্ত নিলেন যতদিন সম্ভব এই জ্ঞান-মহীরুহের পদপ্রান্তেই তিনি থাকবেন।

গ্যালিলিওর ব্যক্তিগত সচিবের কাজ নিলেন টরিসেলি। এই সূত্রেই কিছুদিন পরে গ্যালিলিওর ব্যক্তিগত অনেক গোপন কাগজপত্র দেখার সুযোগ পেলেন।

সেইসব কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা অসমাপ্ত গবেষণার চিত্র খুঁজে পেলেন। একটা চাপদণ্ডের ছবি।

চোঙের ভেতরে একটা চাপদণ্ড বা পিস্টন টেনে গ্যালিলিও কৃত্রিমভাবে শূন্যতা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি।

মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলেন টরিসেলি। এই অসম্পূর্ণ পরীক্ষাটিকে নতুন করে তো দেখা যেতে পারে।

কিন্তু এ বিষয়ে গভীর কিছু যে আলোচনা করবেন গ্যালিলিওর সঙ্গে তাঁর শরীর সেই অবস্থায় আর নেই।

দিনদিনই জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। হলোও তাই। একমাসের মধ্যেই ১৬৪২ খ্রিঃ গ্যালিলিওর মৃত্যু হল।

ফ্লোরেন্সে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। তবু কিছুদিন থেকে গেলেন টরিসেলি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপক হিসেবে মাস কয়েক কাজ করলেন।

এই সময়ে তাসকানিয়ার ডিউক ফার্দিনান্দের অঙ্কের গৃহশিক্ষকের কাজটাও জুটে গেল।

গ্যালিলিওর মৃত্যুর পর প্রায় এক বছর সময় ইতিমধ্যে পার হয়েছে। এই সময়টা কিন্তু নিশ্চেষ্ট বসে থাকেন নি টরিসেলি।

নিজের সমস্ত কাজের মধ্যেও নলের শূন্যতা সৃষ্টির সেই অসমাপ্ত পরীক্ষাটির কাজে একদিনও অবহেলায় নষ্ট করেন নি।

বারবারই ব্যর্থ হচ্ছেন। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত প্রাকৃতিক কারণে যে প্রতিবারেই সাফল্য নাগালে এসেও আসছে না তা বুঝতে পারছেন না।

অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পর অজানা প্রাকৃতিক বাধাটিকে জয় করতে সমর্থ হলেন শেষ পর্যন্ত।

টরিসেলি দুটো ৩ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা কাচের নল বানিয়ে আনলেন, তাদের প্রত্যেকটি একমুখ বন্ধ করা, একমুখ খোলা।

খোলা মুখ দিয়ে নল দুটিতে পারদ ভর্তি করলেন। তারপর আঙুল চেপে নল দুটি উল্টে নিয়ে দুটো পারদভর্তি বাটিতে আলাদাভাবে খাড়া করে রাখলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। দেখা যায় বাটির পারদের তল থেকে নলের ৩০ ইঞ্চি ওপর পর্যন্ত পারদস্তম্ভ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুই নলের পারদেই একই উচ্চতা।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে এবারে তিনি কাচের নলকে সামান্য কাত করে ধরেন। অমনি বাটির কিছু পারদ নলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। আর পারদ স্তম্ভের উচ্চতারও পরিবর্তন ঘটে।

টরিসেলি বুঝতে পারলেন, কাচের নলকে যতক্ষণ খাড়া রাখা যাচ্ছে ততক্ষণই নলের পারদের উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি বজায় থাকছে।

এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, নলের পারদের ৩০ ইঞ্চি উচ্চতার ওপরে যে শূন্য অংশ তা বায়ুশূন্য স্থান। নলের ভেতরে বাইরের কোন জিনিস ঢুকবার সুযোগ না পাওয়ার ফলেই ওই শূন্য স্থানটি তৈরি হয়েছে। বায়ুর চাপই নলের পারদকে এই উচ্চতায় ধরে রেখেছে।

তিনি এরপর আরও কিছু পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, বায়ুর চাপ নির্দিষ্ট বলেই পারদতলের উচ্চতাও সর্বদাই একই থাকে অর্থাৎ ৩০ ইঞ্চি থাকে। চাপের পরিবর্তন হলেই পারদতলের উচ্চতারও পরিবর্তন ঘটে। স্থূল কথা, এই উচ্চতা দেখেই বায়ুচাপের মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব।

এই সিদ্ধান্তে আসার পর টরিসেলি তাঁর পরীক্ষার বিবরণ দিয়ে বায়ুচাপ নির্ণয় সম্পর্কে বিখ্যাত প্রবন্ধটি রচনা করেন। সময়টা ১৬৪৪ খ্রিঃ। টরিসেলি সেই প্রবন্ধে অনেক চমকপ্রদ ও নতুন কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা বায়ুর মহাসমুদ্রে ডুবে আছি। এই সমুদ্রের গভীরতা ৫০০ মাইলেরও বেশি।

আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল, এই গভীর বায়ু সমুদ্রের একেবারে তলদেশে রয়েছি আমরা। এই বায়ুর ওজন জলের ঘনত্বের ৮০০ ভাগের একভাগ মাত্র।

টরিসেলির সিদ্ধান্ত এই যে, কাচের নলের ৩০ ইঞ্চি পারদতলই বিশাল বায়ু সমুদ্রের সূচক। এইভাবে টরিসেলিই প্রথম এই স্থির উচ্চতার পারদতলকে বায়ু চাপের ফল বলে ঘোষণা করেন।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, নলের পারদতল যে ওজনের বায়ু পারদের বাটির ওপর চাপ দেয় তার সঙ্গে সমানুপাতিক অর্থাৎ চাপ বাড়লে পারদের উচ্চতা বাড়ে, চাপ কমলে উচ্চতা কমে যায়।

টরিসেলি জানান, পারদ ছাড়াও বিভিন্ন আপেক্ষিক ঘনত্বের তরল দিয়েও বায়ুর চাপ মাপা যায়। জল নিয়েও সম্ভব। তবে জলের ক্ষেত্রে জলতল অনেক দীর্ঘ হয়ে দাঁড়াবে ১৩.৬ গুণ বেশি। এই কারণে এই পরীক্ষার জন্য দরকার হবে ৪৬ ফুটের চেয়েও দীর্ঘ নল।

এই পরীক্ষার জন্য গৃহীত তরলের ঘনত্ব যদি কম হয় তবে ওই তরলতল অনেক বেশি উচ্চতায় দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে দীর্ঘ কাচ নলের দরকার হবে।

আর তরল যদি বেশি ঘন হয় তবে তরলতল আগের চেয়ে কম উচ্চতায় দাঁড়াবে। তখন দরকার হবে অপেক্ষাকৃত কম লম্বা নল।

টরিসেলির এই বায়ুচাপের পরীক্ষা তাঁকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। তাঁর নামেই বায়ুর চাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম হয়ে ওঠে টরিসেলির নল।

পারদের বায়ুমান যন্ত্র বা ব্যারোমিটার আবিষ্কার করার পর গ্যালিলিওর দুরবীনের সংস্কার সাধন টরিসেলির অন্যতম বিশিষ্ট অবদান।

তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার ফলেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লাভ করেছিলেন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীন।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, টরিসেলিই যে প্রথম অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নকশা তৈরি করেছিলেন তা আমরা অনেকেই জানি না। তিনিই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন, অতি সূক্ষ্ম জিনিস খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়, তা দেখার জন্য দরকার কোন বিশেষ যন্ত্র।

বিভিন্ন তরল কণিকার গতি নিয়েও টরিসেলি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। তাঁর গণিততত্ত্ব প্রক্ষিপ্ত বস্তুর গতিপথের প্রকৃতি নির্ণয়ের পথ সহজ করেছে।

টরিসেলি বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে যেসব তথ্য দান করেছেন, উত্তরকালে তার ভিত্তিতেই বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এসেছে অবিশ্বাস্য দ্রুততা।

বিজ্ঞানী জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য লাভের সময়ে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে এই সম্ভাবনাময় বিজ্ঞান সাধকের জীবনাবসান হয় ১৬৪৭ খ্রিঃ ২৫শে অক্টোবর।

ব্লেইজ পাস্কাল

ব্লেইজ পাস্কালকে বলা হয় আধুনিক দর্শন-জিজ্ঞাসার প্রথম পুরুষ। অথচ বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৬২৩ খ্রিঃ ফ্রান্সের এক সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম। মাত্র তিন বছর বয়সেই মাতৃহারা হন তিনি। বাবা এতিয়েঁর স্নেহ যত্ন ও শিক্ষায় বড় হয়ে উঠতে থাকেন।

এতিয়েঁর নিজেই তাঁর সন্তানদের পড়াতেন। ছোট ছোট উদাহরণ দিয়ে গল্পের ভঙ্গিতে তিনি তাঁর সন্তানদের শিক্ষা দিতেন। কখনোই পড়ালেখার জন্য কাউকে চাপ দিতেন না।

কোন কারণে যাতে পড়াশোনার ওপরে তাদের বিরক্তি বা অনিচ্ছার ভাব না জাগে সে বিষয়ে সর্বদাই সতর্ক থাকতেন।

পিতার বিজ্ঞানের আগ্রহ পূর্ণমাত্রায় সঞ্চারিত হয়েছিল পাস্কালের মধ্যে সেই ছেলেবেলা থেকেই।

এতিয়েঁর বলতেন, অঙ্কই হল পড়াশোনার সেরা। যেমন বলতেন তেমনি নানাভাবে অঙ্কের প্রতি সন্তানদের আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টাও করতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ছিল অদ্ভুত। শিশু পাস্কালেরও যে তাঁরই মত অঙ্কের প্রতি আগ্রহ জন্মেছে তা বুঝতে পারা সত্ত্বেও তিনি পুত্রকে কখনো শক্ত শক্ত অঙ্ক কষতে দিতেন না।

তাঁর আগ্রহ বজায় রাখার জন্য তিনি মাতৃভাষা ফরাসি শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে গ্রীক ল্যাটিন ভাষা শেখানোর দিকে জোর দিতেন। ধাপে ধাপে ভূগোল ইতিহাসের দিকে এগোতেন।

আর পাস্কালের দাদা দিদিদের যখন জ্যামিতি বা অঙ্ক বোঝাতে বসতেন তখন পাস্কালকে সামনে বসিয়ে রাখতেন।

এতিয়েঁর পক্ষপাত ছিল জ্যামিতির দিকে। তাঁর অভিমত ছিল, জ্যামিতিই হল অঙ্কশাস্ত্রের প্রবেশপথ। তাই ছেলেমেয়েদের অঙ্ক শেখাতে বসে জ্যামিতি দিয়েই শুরু করতেন।

আর একটা ব্যাপার, ছোটদের বুদ্ধি একটু সড়গড় না হলে যে অঙ্কের গোলক-ধাঁধায় তাদের ঢোকাতে নেই তা এতিয়েঁ ভালই জানতেন। সেকারণে পাছে

পাস্কালের অঙ্কের প্রতি আগ্রহ চটে যায় সেই ভয়ে ষোল বছরের আগে গণিত বীজগণিত বা জ্যামিতির কোন বই তাঁর হাতে দেননি তিনি।

তবে তাঁকে ধরাছোঁয়ার কাছেই রাখতেন। কিন্তু এত করেও শেষ পর্যন্ত এতিয়েঁ পাস্কালের ক্ষেত্রে তাঁর বাঁধাধরা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে বাধ্য হন।

শুনে শুনে নিজের চেষ্টাতেই পাস্কাল মাত্র বারো বছর বয়সেই ইউক্লিডের জ্যামিতির অনেক সমাধান রপ্ত করে ফেলেন। কেবল তাই নয় নিজেই চিন্তা ভাবনা করে ইউক্লিডের সরল রেখার নতুন নামকরণ করলেন bar এবং বৃত্তের নাম দিলেন গোল বস্তু বা round।

অবসর সময়ে জ্যামিতির উপপাদ্যর জট ছাড়ানর চর্চা হয়ে উঠেছিল পাস্কালের খেলাধুলার মত। তাই নিয়েই মেতে থাকতেন।

ছেলের অসাধারণত্ব দেখে বিস্মিত না হয়ে পারতেন না এতিয়েঁ। অথচ পাস্কালের স্কুলের পড়াশোনার ফলাফল নিয়ে যথেষ্টই খেদ ছিল তাঁর। স্কুলের পরীক্ষায় কখনোই সন্তোষজনক ফল দেখাতে পারতেন না পাস্কাল। ফলে স্কুলে শিক্ষকদের বক্রোক্তি শুনতে হতো মাথা নত করে।

প্রতিবারেই মন তৈরি করে নিতেন পরবর্তী পরীক্ষায় ভাল ফলের জন্য। কিন্তু অদ্ভুতভাবে প্রতিবারেই পরীক্ষার ফল দেখে হতাশ হতে হত।

অথচ ওইটুকু ছেলেই ঘরে বাবাকে জ্যামিতি নিয়ে চিন্তার অতীত কাজ দেখিয়ে বিস্মিত করে দিতেন।

এতিয়েঁ কিন্তু হতাশ হতেন না। ষোল বছর বয়সের জন্য অপেক্ষা না করে ছেলেকে অঙ্কের ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছিলেন। ফল যা হল তা যেমন অদ্ভুত তেমনি অবিশ্বাস্য।

পাস্কাল যখন ষোল বছরে পড়লেন তখন নিজেই জ্যামিতির ওপর নিজের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা একত্র জড় করে একটা ছোটখাট বই-ই ছাপিয়ে ফেললেন। নাম দিলেন ESSAYS ON CONICS। যার অর্থ করলে দাঁড়ায় শঙ্কু গণিতের ওপর প্রবন্ধ।

এই বইতে কিশোর পাস্কাল জ্যামিতিকে অদ্ভুত পথে অঙ্ক দিয়ে বোঝালেন। বইটি যে রীতিমত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল তা নিশ্চয় বলে বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না।

এর আগে দেশুয়ে বলে একজন গণিতবিদ জ্যামিতিকে অঙ্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। স্বভাবতঃই অঙ্ক বিজ্ঞানীরা কিশোর পাস্কালের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।

সতের শতকের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী রেনে দেকার্তে এবিষয়ে ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি পাস্কালের কাজকে ধন্যবাদ না জানিয়ে বরং দেশুয়ের কাজের ওপর পাকামো বলেই অভিহিত করলেন।

আসলে রেনে দেকার্ত পাস্কালের বইটির প্রতিপাদ্য বোঝার চেষ্টা আদৌ করেন নি, ছেলেমানুষের ছেলেমানুষি ভেবেই বইটি সরিয়ে রেখে ছিলেন। তা না হলে তিনি দেখতে পেতেন দেগুয়ের ওপরে কারসাজি করেননি পাস্কাল, বরং দেগুয়ের জ্যামিতি যেখানে ঠোক্কর খেয়ে থেমে গিয়েছিল, পাস্কাল সেখান থেকেই তাকে উদ্ধার করে সমাধানে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

আধুনিক কালে গণকযন্ত্র বা ক্যালকুলেটর নামটি সকলেরই পরিচিত। এই গণকযন্ত্রের প্রথম হদিশ কিন্তু দিয়েছিলেন পাস্কাল ১৬৪০ খ্রিঃ। গণকযন্ত্রের একটি একক হল পাস্কাল।

বই প্রকাশের পরের বছরেই মজার ঘটনাটি ঘটেছিল। পাস্কালের তখন মাত্র সতের বছর বয়স।

সেই সময় রাজস্ব বিভাগ থেকে ট্যাক্স কালেক্টরের দায়িত্ব দিয়ে এতিয়েঁকেরুয়েন রাজ্যে যাবার হুকুম এল। পাস্কালও গেলেন বাবার সঙ্গে।

গোটা ব্যাপারটাই হিসাব নিকাশের। কাজে নেমে কালঘাম ছুটে যেতে লাগল এতিয়েঁর । হিসাব নিয়ে বসে কোন কোন দিন রাত ভোর হয়ে যেত।

পাস্কাল বাবার খাটুনি দেখে খুবই পীড়া বোধ করতে থাকেন। মনে মনে ঠিক করেন, বাবার কাজের চাপ কমাবার একটা উপায় যে করেই হোক বার করতে হবে।

যেমনি চিন্তা অমনি কাজেও নেমে পড়লেন। দীর্ঘ পাঁচ বছরের একটানা চেষ্টা ও পরিশ্রমে ক্যালকুলেটর তৈরি হয়ে গেল।

বারবার পরীক্ষা করে নিজের যন্ত্র সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন পাস্কাল। গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেন, শক্ত শক্ত যোগ বিয়োগ যেগুলোর ফল মেলাতে কুড়ি পঁচিশ মিনিটেরও বেশি সময় দরকার হয়, সেগুলো অনায়াসেই দুমিনিটের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে। এবারে বাবাকে জানালেন, যন্ত্রের কার্যকারিতাও দেখালেন।

এতিয়েঁ আনন্দে তৃপ্তিতে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর রাতভর পারিশ্রমের তিন চতুর্থাংশই কমে গেল পুত্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রের দৌলতে।

পাস্কালও বাবাকে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত দেখতে পেয়ে খুশি হলেন।

এরপরে মাথায় এল, ব্যবসায়িকভাবে যন্ত্রটাকে বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা করলে তো মন্দ হয় না।

কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন। সকলের ব্যবহারযোগ্য একটা ক্যালকুলেটর তৈরি করে ফেললেন ১৬৫২ খ্রিঃ মধ্যেই।

বেনে দেকার্তের অকাল মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন সুইডেনের রানী ক্রিস্টিনা। তিনি অঙ্ক ও দর্শনের পাঠ নেবার জেদ ধরে দেকার্তকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

রানীর অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হয়েই সম্মত হতে হয়েছিল চিররুগ্ন দেকার্তকে। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় রানী যে ঘরে বসে দেকার্তের কাছে দর্শন ও অঙ্কের পাঠ নিতেন, সেই ঘরটি ছিল অসম্ভব ঠান্ডা।

সেই ঠান্ডা ঘরে দিনের পর দিন বসে মাস তিনেকের মধ্যেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন দেকার্ত।

পাস্কাল তাঁর নতুন গণকযন্ত্রটি সেই বিজ্ঞানরসিক রানী ক্রিস্টিনাকেই উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন। পাস্কালের বয়স তখন উনিশ।

রেনেসাঁর শুভাগমনের পদধ্বনিতে সারা ইউরোপের সেই সতের শতকে ঘুম ভাঙ্গতে শুরু করেছে। যুক্তিবাদী বিজ্ঞান চর্চার একটা শুদ্ধআবহাওয়া ক্রমশই গড়ে উঠছে। ধর্ম আর অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকার কুঠুরিতে জীবনের জয়গান ধ্বনিত হতে শুরু করেছে।

সেই শুভ মুহূর্তেই গ্যালিলিও শুনিয়েছিলেন রোমাঞ্চকর নতুন কথা—পৃথিবী নয়, সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্র।

চার্চের বিচারে বাইবেল বিরোধী প্রচারণার জন্য গ্যালিলিওকে দন্ডিত হতে হলেও, সেদিন গ্যালিলিওর কাছ থেকে মানবসভ্যতা লাভ করেছিল এক নতুন পথের দিশা।

গোটা ইউরোপ জুড়েই সেদিন শুরু হয়েছিল মুক্তিপাগল মানুষের অভিযান। বিদ্যানুরাগীদের উৎসাহে প্যারিসে গড়ে তোলা হয়েছিল বিজ্ঞান আকাদেমি লিব্রে। বিশ্ববিখ্যাত এই আকাদেমিরই বর্তমান নাম হল আকাদেমি দেচ সায়েনসেস।

পাস্কালের বাবা এতিয়েঁও ছিলেন এই আকাদেমির উৎসাহী সদস্য। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আশ্চর্যভাবে উপস্থিত ছিলেন চার্চের একজন যাজকও। তাঁর নাম ফাদার সারসেনে।

এই ধর্মযাজক যে তথাকথিত ধর্মপিতাদের থেকে চিন্তায় ও কাজে স্বতন্ত্র ছিলেন তা তাঁর বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য তালিকায় উপস্থিতি থেকেই বোঝা যায়। অঙ্ক ও দর্শনের ওপরে ছিল তাঁর অগাধ পান্ডিত্য। রোমান ক্যাথলিকদের ওপরে ছিল তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব।

তাই তাঁর সচিব পদ আকাদেমির বিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে রক্ষাকবচের মত হয়েছিল।

বাবার মুখে বিজ্ঞানজগতের নতুন নতুন বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা পাস্কাল সহজেই জেনে যেতেন।

এভাবে অল্পবয়সেই গ্যালিলিও টরিসেলি ও অন্যান্য বিজ্ঞানসাধকদের কর্মকৃতিত্বের অনেক খবরাখবর তিনি জানতে পেরেছিলেন। উনিশ বছর বয়সেই

টরিসেলির ব্যারোমিটার আবিষ্কারের গল্প বাবার মুখে শুনে মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তিনি।

সেই ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানী মারা গেলেন ১৬৪৭ খ্রিঃ। তাঁর পাঁচবছর আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন টরিসেলির গুরু গ্যালিলিও।

গ্যালিলিওর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণতা দিয়েছিলেন টরিসেলি। কিন্তু এই দুই বিজ্ঞানীর কাজের ফলে বিজ্ঞানের সামনে দেখা দিয়েছিল অনেক প্রশ্ন।

নলের শূন্য আবহ সম্পর্কেও গ্যালিলিও বা টরিসেলি কোন নতুন তত্ত্ব সাজাতে পারেননি।

যাই হোক টরিসেলির অকাল প্রয়াণের আগেই ইতালির ফ্লোরেন্স থেকে টরিসেলির শূন্যতা নিরীক্ষণের মূল্যবান কাগজপত্র একদিন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বিজ্ঞান আকাদেমিতে পৌঁছে গিয়েছিল। এই সংবাদ জানতেন কেবল আকাদেমির সচিব ফাদার সারসেনে। পাস্কাল তো নয়ই, আকাদেমির সদস্য তাঁর বাবা এতিয়ঁরও বিষয়টা অজ্ঞাত ছিল।

গণকযন্ত্র উদ্ভাবনের দশ বছর পূর্ণ হবার আগেই ১৬৬৪ খ্রিঃ অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল পাস্কালের জীবনে।

ফ্রান্সের দুর্গ তৈরি ও বন্দর বিকাশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পিয়েরে পেতিত একদিন হঠাৎ উপস্থিত হলেন পাস্কালের বাড়িতে। তাঁর কাছেই এতিয়েঁর সেদিন প্রথম শুনতে পান যে টরিসেলির শূন্যতা নিরীক্ষণের পদ্ধতি আকাদেমির বিজ্ঞানীরা নতুন করে পরীক্ষা শুরু করেছেন।

জলের মত টাকা খরচ হচ্ছে এই কাজে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা কেউই বুঝতে পারছেন না টরিসেলি আসলে কি করবার চেষ্টা করেছেন, আর তাঁর উদ্দেশ্যটাই বা কি ছিল।

কথায় কথায় পিয়েরে পেতিত এতিয়ঁরকে জানালেন, টরিসেলির পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না একটা কাচের নলের অভাবে। অনেকবার নল বানাবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবারেই অজ্ঞাত কারণে নল মাঝপথে ভেঙ্গে যাচ্ছে।

পেতিত সরকারি উঁচু মহলের লোক। বিজ্ঞানী অনুরাগী কেবল নয়, বিজ্ঞানের নতুন কোন গবেষণার সংবাদ পেলেই তিনি সবার আগে সাগ্রহে ছুটে যান। বিজ্ঞান আকাদেমিরও হর্তাকর্তাদের একজন তিনি।

রুয়েন শহরের কাচ শিল্প বিখ্যাত। আকাদেমির কাজের জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন একমুখ-বন্ধ চার ফুটের ভাল কাচের নল তৈরি করিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে।

অর্ডার মাফিক কাজটা হাতে পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে এসেছিলেন পাস্কালদের বাড়িতে দেখাসাক্ষাৎ করতে।

পাস্কালরা বাপবেটা দুজনেই বিজ্ঞানের মানুষ। স্বভাবতঃই আকাদেমির সমস্যার কথা শুনে কিছুটা চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন।

ব্লেইজ কিন্তু উৎসাহে টগবগ করে উঠলেন। নিজেই বসে গেলেন নল নিয়ে পরীক্ষায়।

কিছুদিনের মধ্যেই যে সমাধানে পৌঁছলেন সে সম্বন্ধে বললেন, "The force holding up the quick silver comes without, and the quick silvers enters and rises in a column just high enough to make equilibrium with the weight of the external air which force it up."

অর্থাৎ বাইরে থেকে আসা বলই পারদতলকে ওপরে তুলে ধরে। পারদ যতটা ওঠে নলের ভেতরের পারদও ততটাই ওঠে এবং বাইরের যে বায়ুচাপ পারদকে ধরে রাখে তার ওজনের সঙ্গে সাম্যতার অবস্থায় আসে।

ধারণাটা পেয়ে যাবার পরেই পরীক্ষাটাকে নতুনভাবে সাজাবার কাজে লেগে গেলেন পাস্কাল।

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আকারে প্রত্যেকটি আলাদা এমন কয়েকটি কাঁচনল নিলেন তিনি প্রথমে। নলগুলোর মধ্যে দুটোর উচ্চতা ৩ ফুট ১০ ইঞ্চি।

প্রত্যেকটি নলেই একের পর এক নানান তরল ঢেলে দেখতে পান জল যে নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠে স্থির হয়ে যায় তা সর্বদাই ৩৪ ফুট। লাল মদের স্থির উচ্চতা ৩৪.৬ ফুট। তেলের নির্দিষ্ট উচ্চতা ৪০ ফুট।

পাস্কাল লক্ষ্য করেলেন নলের প্রস্থ বা শূন্য আবহের আয়তন কোন সমস্যার মধ্যেই পড়ে না। তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে টরিসেলির নলের মাথায় যে শুন্য স্থান রয়েছে তা প্রকৃতই শূন্য। এই শূন্যতাকে আপাত শূন্য বলার কোন কারণই থাকতে পারে না।

নিজের গবেষণার বিবরণ নিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই পাস্কাল লিখে ফেললেন দীর্ঘ একটা প্রবন্ধ। পুস্তিকা আকারে ছাপিয়ে প্রকাশও করলেন।

টানা কয়েকদিনের কঠোর প্ররিশ্রমের ধকল শরীর সইতে পাবল না। অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলেন পাস্কাল।

এতিয়েঁর সুচিকিৎসার জন্য ছেলেকে নিয়ে এলেন প্যারিসে। সেই সময় তাঁর বয়স চব্বিশ।

একদিন আকস্মিকভাবে রেনে দেকার্ত এলেন অসুস্থ পাস্কালকে দেখতে। তাঁর মত বিশ্রুত বিজ্ঞানীকে এরকম অভাবিতভাবে কাছে পেয়ে অভিভূত হয়ে গেলেন পাস্কাল। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে, কৃতজ্ঞাতায় তাঁর মাথা নত হয়ে গেল।

দেকার্ত জানালেন, পাস্কালের গবেষণার কথা তিনি আগেই শুনেছেন। সুযোগ পেয়ে এখন এসেছেন দেখা করতে।

দুই বিজ্ঞানী মুখোমুখি হলেন। একজন সম্ভাবনাময় তরুণ। অপরজন প্রবীণ, সাফল্যে উজ্জ্বল।

সেদিন দুজনের আলোচনায় বারবারই ঘুরেফিরে এল টরিসেলির শূন্য আবহের তত্ত্ব।

রেনে দেকার্ত এই সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করলেন না। তাঁর মুখে শোনা যায় অ্যারিস্টটলের প্রতিধ্বনি, শূন্যতা বিশ্বপ্রকৃতিতে অসম্ভব, তা একটা তত্ত্ব হতেই পারে না।

সেদিনের সেই সাক্ষাৎকার পাস্কালের জীবনে প্রেরণার স্থায়ী ছাপ রাখে।

সুস্থ হয়ে পাস্কাল বাড়ি ফিরে আসেন। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে সতর্ক করে দেন, গবেষণার ধকল কমাতে হবে।

কিন্তু টরিসেলির নল মাথায় গেঁথেই ছিল। বাড়ি ফিরেই শুরু করলেন নতুন করে ভাবনা-চিন্তা।

হঠাৎ খেয়াল হয়, নল নিয়ে ওপর নিচ করে দেখা যেতে পারে। খেয়াল হতেই প্যারিসের সবচেয়ে উঁচু বাড়ির ওপর তলায় উঠে আসেন নল নিয়ে।

লক্ষ্য করেন, ওপরে পারদতল তার ৩০ ইঞ্চি সাধারণ উচ্চতা থেকে খানিকটা নেমে গেছে। কিন্তু নিচে নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই নলের পারদতলও ৩০ ইঞ্চি উঠে আসে।

পারদতলের উচ্চতার হেরফেরের কারণ বুঝবার জন্য আরও একটু ভালভাবে পরীক্ষা করবার দরকার হল।

পাস্কাল তাঁর এক ভগ্নিপতি পেরিয়ারের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর দুজনে মিলে একদিন চলে আসেন ফ্রান্সের ক্লারমন্ট শহরে।

শহরের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে পুইদে দোম পাহাড়। টরিসেলির নল সঙ্গে নিয়ে দুজনেই উঠে যান শিখরে।

পাস্কাল লক্ষ্য করলেন, যতই ওপরে উঠছেন, নলের পারদতলও তরতর করে ততই নেমে যাচ্ছে। মেপে দেখেন দোমের শিখরে পারদতলের উচ্চতা ২৭ ইঞ্চি। স্বাভাবিক উচ্চতা থেকে ৩ ইঞ্চি নেমে গেছে।

আর এর ফলে শূন্য আবহের দৈর্ঘ্য বাড়ল ৩ ইঞ্চি। স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ছিল ১৮ ইঞ্চি, তার সঙ্গে যোগ হল ৩ ইঞ্চি। ফলে মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াল ১৮ +৩ = ২১ ইঞ্চি।

পাহাড় থেকে নেমে আসতেই দেখা গেল পারদতল ৩০ ইঞ্চি আগের উচ্চতায় ফিরে গেল।

এরপর নানা তরল নিয়ে দিনের পর দিন গবেষণা চালিয়ে একটি চমৎকার সূত্র আবিষ্কার করেন পাস্কাল। সেই সূত্রই হল বিখ্যাত Pascal's Principle।

এই নীতির মূল কথা হল, বদ্ধ কোন পাত্রের ভেতরে কোন তরল পদার্থকে আটকে যদি ওই তরলের যে কোনও স্থানে চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেই চাপ

তরলের সব অংশেই সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং পাত্রের ওপর অংশের সঙ্গে সমকোণে কাজ করে যাবে।

এই নীতির ভিত্তিতেই তৈরি হয় হাইড্রলিক প্রেস, হাইড্রলিক জ্যাক ইত্যাদি। জলবাহী এসব পেষাক ও তোলকের সাহায্যে সামান্য চাপকে ১০০, ২০০, ৩০০ গুণ ছাড়িয়েও যত খুশি বাড়ানো সম্ভব। হাইড্রলিক জ্যাকের নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্টভাবে কুড়ি বা ত্রিশ বল চাপালে তার দ্বারা ৩০০০ পাউন্ডের গাড়িকেও অনায়াসে ওপরে তোলা সম্ভব হয়।

কাজ করছিলেন টরিসেলির নলের শূন্যতার ওপরে, পাস্কাল তা থেকে উদ্ভাবন করে ফেললেন হাইড্রলিক মেসিনের সুলুকসন্ধান।

বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মগুলো যে একই সুতোয় বাঁধা, একটি টানলে আরেকটিতেও টান পড়ে, এক সত্য থেকে বিজ্ঞানীদের হাতে আর এক সত্য আবিষ্কৃত হয়, এ থেকেই তার প্রমাণ হয়।

পাস্কালের জীবন বিজ্ঞানের পথ ধরেই অগ্রসর হয়ে চলেছিল। এমনি সময়ে ১৬৪৬ খ্রিঃ আকস্মিক এক ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর গোটা জীবনেই অদ্ভুত এক পরিবর্তনের সূচনা হল।

ঈশ্বর বিশ্বাসী তিনি কোন কালেই ছিলেন না। সতের শতকের ধর্মবিশ্বাস আর সংস্কারের যুগে বসেও তিনি স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে থাকতেন বাইবেল ও গির্জা। ক্বচিৎ কখনো যদি বাবার তাড়নায় গীর্জায় যেতে বাধ্য হতেন তাহলে প্রার্থনার সময়ে অন্য চিন্তায় মন চলে যেত।

সেই নাস্তিক পাস্কাল হঠাৎ ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

ঘটনাটা বলা যেতে পারে। পাস্কালের পিতা এতিয়েঁর দীর্ঘ দিনের অভ্যাস সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর খানিকক্ষণ রাস্তায় বেড়ানো। তারপর বাড়ি ফিরে এসে প্রাত্যহিক কাজ নিয়ে বসেন।

এই নিয়মেই এক শীতের সকালে এতিয়েঁর প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। কিন্তু যেই সময়ে ফিরে আসার কথা, সেই সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল তবু তিনি ফেরেন না।

বাড়িতে পাস্কাল ও তাঁর ভাইবোনেরা খুবই চিন্তায় পড়ে গেলেন। সকলে মিলে খুঁজতে বেরোন বাবাকে।

এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজির পর এক বরফের স্তূপ থেকে এতিয়েঁকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হল। দেখা গেল বরফে পা পিছলে পড়ে পায়ের মালাইচাকি ভেঙ্গে গেছে।

গুরুতর আহত অবস্থায় এতিয়েঁরকে রুয়েনের হাসপাতালে ভর্তি করা হল।

চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানালেন, তাঁদের পক্ষে মালাইচাকি সারানো সম্ভব নয়। এতিয়েঁরকে প্যারিসে নিয়ে গিয়েই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাস্কাল ভাইবোনেরা খুবই বিপন্ন হয়ে পড়লেন। রুগীর যা অবস্থা তাতে অতদূরে নিয়ে যাবার ধকল সইবে না। যে কোন মুহূর্তে পথেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে, যখন সকলেই উদভ্রান্ত অবস্থায় সময় গুণছেন, এমন সময় পাস্কালদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন দেচাম ভ্রাতৃদ্বয়। মানব সেবা ও মানব কল্যাণে ব্রতী এই দুই ভাই সারা ফ্রান্সেই সুপরিচিত।

দুঃখতাপে দগ্ধ মানুষকে নিশ্চিন্ততার ছায়াদানই এই দুই মানব হিতৈষী সহোদরের জীবনের ব্রত।

পাস্কাল ভাইদের নিশ্চিন্ত করে দেচাম ভাইরাই এতিয়েঁর সেবার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন।

তাঁদের চিকিৎসা সেবা ও যত্নে অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যুপথযাত্রী এতিয়েঁর একসময় উঠে বসেন। পাস্কালদের বাড়িতে আবার আনন্দ ফিরে আসে।

সামান্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অবকাশটুকু না দিয়ে কর্তব্য সম্পূর্ণ করেই দেচাম ভাইরাও বিদায় নেন।

দেচামদেরমানবসেবারনিষ্ঠা ও মহানুভবতা বিজ্ঞানী পাস্কালের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই সেবা—এও ধর্মের একটা দিক।

এই দিকটির প্রতি এতকাল তাঁর কোন নজরই পড়েনি। ধর্মভাবনা এক নতুন রূপ নিয়ে তাঁকে মুগ্ধ করে।

বিজ্ঞানের গবেষণা এবারে শিকেয় উঠল। গোটা পরিবার বাইবেল পাঠ, নিয়মিত প্রার্থনা ইত্যাদিতে মগ্ন হয়ে গেল।

বিজ্ঞানী পাস্কালের মন জুড়ে চিন্তার আলোড়ন। তাঁর মনে হতে লাগল, বিজ্ঞান নিয়ে মেতে থেকে এতদিন মূল্যবান সময় অপচয়ই শুধু করেছেন।

এইভাবে কিছুদিন কাটল। সাময়িক আবেগ প্রশমিত হতেই যুক্তিবাদী মন আবার বিজ্ঞানের চিন্তাভাবনায় ফিরে গেল। বাইবেলের স্থান নিল বিজ্ঞানের নানা বই।

১৬৪৮ খ্রিঃ থেকে ১৬৫৪ খ্রিঃ এই সময়ে পাস্কাল বিজ্ঞানকে দান করলেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

এরপরই পর পর দুটি ঘটনায় আবার পাস্কালের জীবনে ঝড় নেমে এল। এতিয়েঁর মারা গেলেন। পাস্কালের এক দিদি জ্যাকুইলিন সন্যাসিনীর ব্রত নিয়ে মঠে চলে গেলেন।

পাস্কাল হয়ে পড়লেন একেবারেই একা। নিজের গবেষণার উৎসাহ প্রেরণার যাবতীয় উৎস ছিলেন দুজন, বাবা এতিয়েঁর এবং দিদি জ্যাকুইলিন।

দুঃখ হতাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন পাস্কাল। সান্ত্বনা খুঁজবার জন্য মন আবার গীর্জার শরণাপন্ন হল। জীবনের সার্থকতার সন্ধান করতে দর্শনের বই নিয়ে বসলেন পাস্কাল।

একদিন খুব ভোরে বারান্দায় এসে বসেছেন। ভোরের আকাশে কুয়াশার আস্তরণ। বসে ভাবছিলেন মানবজীবনের কথা—অর্থ কি এভাবে, এই বেঁচে থাকার? সার্থকতা কোথায় লুকিয়ে আছে জীবনের?

ভাবতে ভাবতে এক অনাস্বাদিত আনন্দানুভূতিতে মন ভরে উঠল। জীবনের সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ কোথায় ভেসে গেল।

সেই প্রভাতেই নতুন পাস্কালের জন্ম সম্পূর্ণ হল। ঈশ্বর চিন্তাতেই মন থিতু হল।

পরিচিত লোকজনরা এরপর থেকে পাস্কালকে দেখলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, বাবাকে হারিয়ে দিদিকে সন্ন্যাসিনী হতে দেখে পাস্কাল মানুষটা একেবারেই বদলে গেছে। বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর মুখে আর কোন কথাই শোনা যায় না।

আসলে দর্শন আর বিজ্ঞানে মেশামেশি হয়ে নতুন ভাবনায় জারিত হচ্ছিলেন পাস্কাল।

জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে জ্যামিতির দর্শন ভাবনা নিয়ে বই লিখলেন। নাম দিলেন এসপ্রিত দে জিওমেত্রি।

বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সারা ইউরোপ জুড়ে আলোড়ন উঠল।

এর পরেই আরো এক কান্ড করে বসলেন পাস্কাল। দেখা গেল প্যারিসের জুয়ার আড্ডায় নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন তিনি।

আর কিছুই নয় গণিতের সম্ভাবনা-তত্ত্বকে উদ্ধার করবার জন্যই জুয়ার আড্ডায় আনাগোনা।

কিছুদিন পরেই প্রকাশ পেল পাস্কালের ম্যাথামেটিক্যাল থিওরি অব প্রবাবিলিটি। আধুনিক বিজ্ঞানের বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদানই পাস্কালের এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই সম্ভব করে তুলেছেন প্রখ্যাত গণিতবিদগণ।

পাস্কালের বিচিত্র জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল মাত্র ৩৯ বছর বয়সে। এই সামান্য সময় সীমার মধ্যেই তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। ভাবীকালের বিজ্ঞানীদের জন্য পথ তৈরি করে দিয়ে গেছেন।

আজ ক্যালকুলেটর জীবনের নিত্যসহচর, অল্টিমিটার ধরে উড়োজাহাজ পৃথিবীর নানা প্রান্তে পাড়ি জমাচ্ছে, শিল্পক্ষেত্রে হাইড্রোলিক প্রেসের ভূমিকা অনিবার্য, প্রতিদিনের জীবনের দায় মেটায় তোলক, স্ট্যাটিসটিকস বা পরিসংখ্যান, গণিতের জটিল গণনাঙ্ক বা ক্যালকুলাস— বিশ শতকের এই সব কিছুই পাস্কালের গবেষণার অবদান।

পাস্কালের দর্শন-জিজ্ঞাসার তত্ত্ব বিশ্লেষণের আলোকে নির্মিত জীবন-সত্যের ভাবনা তাঁকে মহাদার্শনিকের অভিধাযুক্ত করেছে। তাঁর যুক্তিবাদী বিশ্লেষক মন দর্শনকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

এলটন ভন লিউয়েন হুক



হল্যান্ডের ডেলফট শহরের অতি সাধারণ এক পরিবারে লিউয়েন হুক-এর জন্ম। সময়টা ১৬৩২ খ্রিঃ।

লেখাপড়ার সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না এই পরিবারের লোকজনের। কায়িকশ্রম আর ছোটখাট ব্যবসাই সম্বল। কাজেই দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী।

অতি অল্প বয়সেই আমস্টারডামের এক মালগুদামে কাজ নিতে হয়েছিল লিউয়েন হুককে।

গুদামের মালপত্র দেখাশোনার কঠিন কাজে খুব বেশিদিন থাকতে পারেননি অবশ্য। ফিরে এলেন বাড়িতে।

সামান্য যা সঞ্চয় হয়েছিল তা দিয়ে বাড়িতেই একটা দোকান খোলেন। ব্যবসাটা ছিল অদ্ভুত ধরনের। সুতীকাপড়ের গুণাগুণ পরীক্ষা। পরীক্ষার কাজ হত একটা লেন্স দিয়ে।

লেন্স নিয়ে নাড়াচাড়ার কাজ তখন থেকেই শুরু। নিজের চেষ্টাতেই এভাবে একদিন মেজে ঘষে মসৃণ করে লেন্সের ক্ষমতা বাড়াবার কৌশল জেনে গেলেন।

এভাবেই একদিন মাথায় ঢুকল সূতীকাপড় ছাড়া আর কি কাজে লাগানো যায় লেন্সকে।

লেখাপড়া খুব সামান্যই শিখতে পেরেছিলেন নিজের চেষ্টায়। অসাধারণ বুদ্ধিবলই ছিল তাঁর প্রধান সহায়।

কাজ করার সময়ে একটা লেন্স কোনভাবে ভেঙ্গে গেলে তখুনি আর একটা নতুন লেন্স কেনার জন্য ব্যস্ত হতেন না লিউয়েন হুক। নিজেই চেষ্টা করে ভাঙ্গা লেন্সকে কাজের উপযোগী করে নিতেন।

এইভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে আপনা থেকেই লেন্সের মূল সূত্রগুলি তাঁর জানা হয়ে গেল। একসময় ধাতব ফ্রেমও বানিয়ে নিলেন লেন্সের জন্য।

নিজের চেষ্টা ও চিন্তার সংযোগে সেই ১৭ শতকের মধ্যভাগেই লিউয়েন হুক এমন সব শক্তিশালী লেন্স গড়েছিলেন যে তেমনটি আর কোথাও ছিল না।

নিজের তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে কেবল সূতীকাপড় পরীক্ষা নয়। শুরু করলেন অন্যধরনের পরীক্ষা—নিতান্ত কৌতূহলের বশেই।

শুকনো খাবারদাবার পরীক্ষা করতে গিয়ে এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়ে যান লিউয়েন হুক। বিস্মিত হন নিজের যন্ত্রটির কার্যকারিতা দেখে।

ডেলফট শহরের স্বনামধন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন রেগনার দে গ্রাফ। লিউয়েন হুক তাঁর কাছে এসে তাঁর পর্যবেক্ষণের সব কথা জানাতেন।

ভদ্রলোক নিজেও গবেষণার নানান কাজে অভ্যস্ত। তাই লিউয়েন হুককে উৎসাহিত করেন।

অশিক্ষিত জেনেও তার সঙ্গে মহা উৎসাহে নিজের গবেষণার বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

গ্রাফ বুঝতে পারেন অসাধারণ প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে এই তরুণের মধ্যে। সেই প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি থাকে না।

লিউয়েন হুকের অণুবীক্ষণের লেন্সের তলায় একদিন ধরা পড়ে খালি চোখে অদৃশ্য ক্ষুদে জানোয়ারের পাল।

গ্রাফ সেই দিনই লিউয়েন হুককে পরামর্শ দেন, কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বিষয়টা হাতে কলমে দেখিয়ে, তাদের সাক্ষরসহ সমস্ত বিবরণ লিখে রয়াল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

পরামর্শটা গ্রহণ করলেন লিউয়েন হুক। হল্যান্ডের ১১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে তাঁর আবিষ্কারের প্রমাণ দেখাবার জন্য নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন।

এই এগারজনের মধ্যে ছিলেন দুজন পাদ্রী, একজন হিসাবরক্ষক, আর সকলেই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছিলেন, একটা প্লেটে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুকে কিলবিল করতে দেখে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রটিই এই অসাধ্যকর্ম সাধন করেছিল।

লিউয়েন হুকই মানবসভ্যতার প্রথম ব্যক্তি যিনি অতিক্ষুদ্র প্রাণী জীবাণুদের প্রথম দেখেছিলেন। আর এই দেখার পরিণতিতেই জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন এক শাখা জীবাণুবিজ্ঞানের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল।

সেই এগারোজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দিয়ে, জীবাণুদের দেখার ব্যাপারটা তাঁরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এই মর্মে লিউয়েন হুক একটি অঙ্গীকারপত্র সই করিয়ে নিলেন।

এই অঙ্গীকারপত্রটির সঙ্গে নিজের বক্তব্য লিখে লিউয়েন হুক রয়াল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিলেন ১৬৭৪ খ্রিঃ।

হল্যান্ডের এক অজ্ঞাতকুলশীল অশিক্ষিত মানুষ নিজের হাতে অণুবীক্ষণ তৈরি করে যা নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং অন্যদের দেখিয়েছিলেন, তা বলাবাহুল্য রয়াল সোসাইটির বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীদের যারপরনাই বিস্মিত করেছিল। আর এভাবেই লিউয়েন হুক বিশ্ববিজ্ঞানীদের সভায় নিজের আসনটি নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন।

পচা ডোবার জল, পিপের বদ্ধ জল, রাস্তার ড্রেনের জল, কোন কিছুই পর্যবেক্ষণ করতে বাদ দেননি লিউয়েন হুক।

সর্বত্রই তাঁর চোখে পড়েছে ক্ষুদে প্রাণীদের অস্তিত্ব। তিনি তাদের নাম দিয়েছিলেন Little Beastries ।

পরে বিজ্ঞানীরা নাম পাল্টে রেখেছিলেন Microbes।

এই ক্ষুদে প্রাণীদের লেজ, শিং মাথা সবই আলাদাভাবে দেখে তিনি নানা ভাগে ভাগ করেন। লিখে রাখেন নোট বুকে। তাঁর মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, খালি চোখে দেখা যায় না এই সব খুদে জানোয়ার কোথা থেকে আসে? তাঁর ধারণা হয় বৃষ্টির জলই হয়তো এই ক্ষুদ্র প্রাণের উৎস।

ব্যাপারটা পরীক্ষা করবার জন্য বাগানে একটা ১৮ইঞ্চি উঁচু টব বসালেন। দুদিন পরেই এল প্রচন্ড বৃষ্টি। কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল টব। এবারে একটা চিনামাটির ঢাকনা দিয়ে টবের মুখ ঢেকে দেন।

টবের কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জল নিয়ে অণুবীক্ষণের তলায় নিয়ে পরীক্ষা করলেন। খুদে জানোয়ারদের দেখা পাওয়া গেল না।

দুদিন পরে সেই জল নিয়ে আবার পরীক্ষা করলেন। এবারে দেখা গেল দিব্যি জলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে খুদে জানোয়ারেরা। তবে সংখ্যায় খুবই কম।

এইভাবে কয়েকদিন অন্তর অন্তর পরীক্ষা করে দেখলেন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমেই সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে জানোয়ারগুলো।

লিউয়েন হক এদের নাম দেন অ্যানিমলিকিউলস। এদের আকার আকৃতিতেও যে পার্থক্য রয়েছে তা-ও তিনি লক্ষ করেন।

এরপর নানা আকৃতি ও রঙের জীবাণুর সন্ধান আরম্ভ করলেন জায়গায় জায়গায়। এমন কি দাঁতের ময়লা পরীক্ষা করেও এই জীবাণুদের দেখা পেয়েছেন তিনি।

যাই দেখেন, যা তাঁর মনে প্রশ্ন তোলে, সবই নিজের ভাষায় লম্বা লম্বা চিঠিতে লিখে পাঠাতে লাগলেন রয়াল সোসাইটিতে।

রয়াল সোসাইটিতে তাঁর পাঠানো এই ধরনের পত্রের সংখ্যাছিল ৩৭৫। এছাড়া ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমিতেও ২৭টি পত্র পাঠিয়েছিলেন লিউয়েন হক।

বিজ্ঞানের শিক্ষা তো দূরের কথা, সাধারণ শিক্ষাও যিনি লাভ করেননি, তাঁর এই সব পত্র সোসাইটির বিজ্ঞানীরা কিন্তু অবহেলা করতে পারেননি।

১৬৮০ খ্রিঃ জীবাণু আবিষ্কারের কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ লিউয়েন হক রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বিজ্ঞান মহলে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম।

কোন সুসজ্জিত গবেষণাগার নয়, সাধারণ একটি ঘরে, তার চেয়েও সাধারণ পরিবেশে থেকে নিজের অণুবীক্ষণটিকে সঙ্গী করে লিউয়েন হক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করেছিলেন। এই কারণেই তাঁকে জীবাণুবিদ্যার জনক আখ্যা দেওয়া হয়।

লিউয়েন হক দীর্ঘদিন জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ করে অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন।

ঈষ্ট, প্রটোজেয়া ও স্পারমাটোজোয়া—এমনি নানা জাতের জীবাণুর অস্তিত্বের সন্ধান তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল।

বিজ্ঞানের প্রথাগত শিক্ষাটুকু কেবল তাঁর ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানীর চোখ ও মন দুইই তিনি লাভ করেছিলেন। এর বলেই তিনি তাঁর গবেষণার কাজ করে যেতেন।

পিঁপড়ে, কয়েক জাতের পতঙ্গ, শামুক, বানমাছ, ঝিনুক প্রভৃতির ওপরেও আণুবীক্ষণিক পরীক্ষার বিবরণ রেখে গেছেন লিউয়েন হুক।

পিঁপড়ের জীবনে জন্ম বৃদ্ধি ও মৃত্যু এই তিন পর্যায়ের ধারাবাহিকতা নিয়ে পরীক্ষার পর তিনি জানিয়েছেন, আমরা যাকে পিঁপড়ের ডিম বলে ভাবি আসলে তা হল পিঁপড়ের পিউপা অর্থাৎ ডিম ও পূর্ণাঙ্গ পিঁপড়ের মাঝামাঝি স্তরের অবস্থা। এই পিউপা অবস্থা থেকেই পিঁপড়ে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা লাভের প্রেরণা লাভ করে।

ডানাহীন একজাতের পতঙ্গ হল ফ্লী (Flee)। এদের শারীরিক গঠন ও জীবনচক্র নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রেখে গেছেন তিনি।

সেইকালে মানুষের ধারণা ছিল ধুলোবালি থেকেই প্রাণের উৎপত্তি হয়। লিউয়েন হুক সেই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব অবর্তমান সেখান থেকে প্রাণের উদ্ভব একেবারেই অসম্ভব। জীবনই জীবন সৃষ্টির একমাত্র কারণ হতে পারে। কাদাবালির মধ্যে আমরা যে সব প্রাণী দেখি যেমন বাণমাছ, শামুক, ঝিনুক, ইত্যাদি, এদের জীবনের পেছনেও রয়েছে কোন অজ্ঞাত প্রাণকণার ইতিহাস।

এইভাবে একের পর এক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে আর তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রয়াল সোসাইটিতে।

বিশ্ববিজ্ঞানের সেই পীঠস্থান থেকে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ ও গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল জীববিজ্ঞানী লিউয়েন হুক-এর নাম। সেই সঙ্গে বিখ্যাত হয়ে গেল হল্যান্ডের সেই ক্ষুদে শহর ডেলফট।

শহরের মানুষের কাছে যিনি ছিলেন নিতান্তই মূর্খ এক চাষাড়ে মানুষ, তাঁর কল্যাণেই অখ্যাত অজ্ঞাত শহরটি দেশ-বিদেশের গুণীজ্ঞানী মানুষদের কাছে বিজ্ঞানের এক তীর্থভূমিতে পরিণত হল। ১৮৬৯ খ্রিঃ রাশিয়ার জার পিটার দ্য গ্রেট স্বয়ং এই শহরে উপস্থিত হয়ে জীববিজ্ঞানের এই পুরোধা পুরুষকে সম্মান জানিয়েছেন।

লিউয়েন হুক তাঁর নিজের তৈরি অণুবীক্ষণের লেন্সের তলায় সামান্য তরলের ফোঁটা রেখে সম্রাটকে দেখিয়েছেন জীবাণুদের বিচিত্র জগৎ।

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত গবেষণার ধকল সয়ে সয়ে শরীর ক্রমশই জীর্ণ হয়ে আসছিল। নিজের আবিষ্কৃত জগতের মধ্যে ডুবে থাকার আনন্দে আর সব কিছু ভুলে ছিলেন। তবে শেষ কর্তব্যটুকু কিন্তু জীবনের অন্তিম পর্বে উপস্থিত হয়েও ভোলেন নি।

মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে রয়াল সোসাইটিকে ধন্যবাদ সূচক চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন, তাঁর মত অতি নগণ্য একজন মানুষকে যেভাবে সম্মান জানিয়ে শীর্ষখ্যাতির অধিকারী করেছেন, তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

সোসাইটির হাতে চিঠি পৌঁছবার দিন কয়েক পরে ১৭২৩ খ্রিঃ ২৬শে আগস্ট নব্বই বছর বয়সে এই নীরব বিজ্ঞানসাধক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্যার আইজ্যাক নিউটন



বিজ্ঞানের আশ্চর্য প্রতিভা নিউটন মাত্র সাত মাস বয়সেই মায়ের গর্ভ থেকে জন্মে নিশ্চিত মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন আশ্চর্যভাবে। নিজের প্রতিভায় জগৎকে আশ্চর্য করবার, চমকিত করবার পালা শুরু হয় তাঁর তখন থেকেই।

এরপর দীর্ঘ জীবনে একের পর এক আশ্চর্যের মালা গেঁথে বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসকে স্বকীয় কৃতিত্বের মালিকায় ভূষিত করেছেন।

জন্মের তিনমাস আগেই বাবা মারা গিয়েছিলেন। দুবছর বয়স হতে না হতেই মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে বসলেন।

নিউটনের নতুন বাবা ছিলেন পাদ্রী। তিনি রোগা পটকা নিউটনের দায়িত্ব নিতে রাজি হননি। ফলে উলসথরপের খামার বাড়িতে ঠাকুমার কাছেই মানুষ হতে থাকেন তিনি।

বাবাকে হারিয়েছেন, মা নেই, নেই কোন ভাইবোন। এই অবস্থায় একাকীত্বের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির কাছাকাছি আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। চারপাশের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস তৈরি হয়েছিল তখন থেকেই।

আর এই অভ্যাসের ফলেই তো পরিণত বয়সে একদিন গাছ থেকে আপেল পড়ার সামান্য ঘটনা থেকে মাধ্যাকর্ষণের সূত্র আবিষ্কার করে গোটা পৃথিবীকে চমকে দিয়েছিলেন।

বয়স বারো বছর পূর্ণ হতেই ঠাকুমা নিউটনকে পাঠিয়ে দিলেন গ্রানথাম শহরে তাঁর পরিচিত ক্লার্ক নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে।

ক্লার্ক-এর স্ত্রী ছিলেন নিউটনের মায়ের বান্ধবী। সেই সূত্রে এখানেই প্রথম তিনি মাতৃস্নেহের স্বাদ পান।

ক্লার্ক ভদ্রলোক ওষুধের ব্যবসা করতেন। নিজেই বাড়িতে তৈরি করতেন সেসব। বিজ্ঞানের বিশেষ করে রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যায় যথেষ্ট পড়াশোনা ছিল তাঁর। পারিবারিক অবস্থাও স্বচ্ছল।

এখানে চার বছর ছিলেন নিউটন। এখানেই বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনের ভিত তৈরি হয়েছিল বলা যায়।

বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে হঠাৎ একদিন রত্নভান্ডার আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন নিউটন। চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, সৌরজগতের বিষয়ে প্রচুর বই জড়ো করা ছিল সেই ঘরে।

নিউটন সেই সব বইতে ডুবে গেলেন। সব কি আর বুঝতে পারেন, তবু পড়ার নেশায় পড়ে যান।

এইভাবে ক্লার্কের ওষুধ তৈরির ল্যাবরেটরির সন্ধানও পেয়ে যান একদিন। কৌতূহল নিয়ে কাচের যন্ত্রপাতি, রসায়নিক বোঝাই শিশি-বোতল সব নাড়াচাড়া করে দেখেন।

এই বাড়ির নিরিবিলি চিলেকোঠায় বসেই সর্বপ্রথম সৃষ্টির নেশায় মেতে উঠেছিলেন বালক নিউটন।

বাতাসি কলযন্ত্রের গাড়ি, জলঘড়ির নানা মডেল বানিয়েছেন তিনি। কখনো নানা রসায়নিকের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখেছেন।

ক্লার্কভবনে নিউটনের সঙ্গী ছিল ক্লার্কের একমাত্র মেয়ে স্টোরি। বন্ধুত্বের সহজ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তাদের মধ্যে।

নিউটনের যখন ষোল বছর বয়স, তখন উলসথরপ থেকে মায়ের চিঠি পেয়ে জানতে পারেন তাঁর নতুন বাবা মারা গেছেন। জমিদারির ব্যাপার নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন তিনি।

ক্লার্ক পরিবারের চার বছরের জীবনে ছেদ পড়ে এরপর। নিউটন উলসফরপে মায়ের কাছে চলে আসেন।

কিন্তু জমিদারির লাভক্ষতি আর চাষ-আবাদের হিসেবের মধ্যে অল্পদিনেই হাঁপিয়ে ওঠেন নিউটন। মাকে জানালেন কলেজে পড়বেন। লেখাপড়ায় ছেলের আগ্রহ দেখে মা খুশি হন। ছেলেকে পাঠিয়ে দেন কেমব্রিজে। নিউটন ভর্তি হন ট্রিনিটি কলেজে।

এই কলেজে আইজ্যাক ব্যারো নামে অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন খাঁটি জহুরী। নিউটনের সুপ্ত প্রতিভার পরিচয় তাঁর কাছে গোপন রইল না।

ব্যারো নিজে ছিলেন এক প্রতিভা। বিজ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থ বিদ্যায় তাঁর ছিল অসামান্য দখল।

নিজস্ব কিছু গবেষণাও ছিল তাঁর। ব্যারোর সুপারিশে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিউটনকে অঙ্কে ছাত্রবৃত্তি পড়ার সুযোগ দিলেন।

এই সময় থেকেই অধ্যাপক ব্যারোর প্রেরণায় নিউটনের বিজ্ঞান প্রতিভার উন্মেষ ঘটতে থাকে। নিউটনকে তিনি জ্যামিতি ও আলোকবিজ্ঞানের রহস্যালোকের সন্ধান দেন।

অল্পসময়ের মধ্যেই গণিতের মূলনীতিগুলো নিউটন চমৎকার রপ্ত করে ফেললেন।

তবে বিশুদ্ধ গণিতের চেয়ে ব্যবহারিক গণিতই তাঁর পছন্দ ছিল বেশি। এই গণিতের মধ্যেই ছিল প্রকৃতি জগৎ ও সৌরবৈচিত্র্যের রহস্যালোকের চাবিকাঠি।

ব্যারোর তত্ত্বাবধানে থেকে নিজের বিচারবুদ্ধি ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ নিয়ে মেতে রইলেন নিউটন।

নিউটন বৃত্তি পান ১৬৬৪ খ্রিঃ। সেই বছরই গোড়ার দিকে ইংলন্ড জুড়ে মহামারীর আকারে দেখা দিল প্লেগ। কাতারে কাতারে লোক মরল। দিশাহারা লোক জন দলে দলে যে যেদিকে পারল শহর ছেড়ে পালাতে লাগল। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। মড়ক-পীড়িত লন্ডন ছেড়ে উলসথরপের খামার বাড়িতে চলে এলেন নিউটন।

এখানে এসে মায়ের সঙ্গে জমিদারি দেখাশোনার কাজে হাত লাগালেন। তবে পাশাপাশি বিজ্ঞানের গবেষণাও চালিয়ে চললেন।

উলসথরপে দেড় বছর ছিলেন নিউটন। এই সময়ের মধ্যে এক এক করে তিনটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাজ সম্পূর্ণ করলেন।

তাঁব প্রথম আবিষ্কার দ্বিপদতত্ত্ব অর্থাৎ দুই অংশযুক্ত রাশি ও দ্বিতীয় আবিষ্কার প্রভেদক গণনা গণিতের মৌলসূত্র।

এই দুটির বৈজ্ঞানিক নাম যথাক্রমে বাইনোমিরাল থিয়োরেম ও ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস।

প্রভেদক গণনা গণিতের সাহায্যে অনবরত পরিবর্তনীয় রাশির পরিবর্তনের হার বার করা যায়। এই রাশিগুলির নাম হল প্রবাহপুঞ্জ বা Fluxions।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রবাহপুঞ্জের বিকল্প প্রবাহেরও সন্ধান পেয়ে গেলেন নিউটন। এইভাবেই পাওয়া গেল গণনা গণিতের এক শাখা অখন্ড গণনা গণিত বা ইনটিগ্রাল ক্যালকুলাস।

এই সঙ্গেই আরও একটি কাজ করলেন নিউটন। শংকুর কোন এক অংশ নিয়ে যে বক্ররেখা বা কারভ রচিত হয় সেই পরা বলয়ের ক্ষেত্রফল ও ঘনবস্তুর আয়তনের পরিমাপের উপায়ও বার করে ফেললেন।

এইভাবে জমিদারির কাজ আর নিজের গবেষণা নিয়ে দেখতে দেখতে দেড়টি বছর কেটে গেল। নিউটন আবার কেমব্রিজে ফিরে এলেন।

এখানে এসে তাঁর তিনটি গবেষণা প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গণিত বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে গেল। প্রভেদক গণনা গণিতের উদ্ভাবক হিসাবে বিজ্ঞানী মহল তাঁকে স্বীকৃতি জানাল।

কোপারনিকাশের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব থেকে নিউটন জেনেছিলেন, গ্রহমন্ডলী অধিবৃত্ত পথে নিজ নিজ কক্ষে ঘুরপাক খায়। গ্যালিলিওর গতিসূত্র ও চলমান বস্তুর যান্ত্রিকতা সম্পর্কেও তাঁর ধারণা পরিষ্কার ছিল। এই ধারণার ভিত্তিতেই তাঁর দ্বিতীয় আবিষ্কার রূপ পেয়েছিল।

সেইকালে বিজ্ঞানীরা জানতেন না গ্রহরা নিজ নিজ কক্ষপথে কার প্রভাবে নিয়মিতভাবে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

নিউটন তাঁর অঙ্কের সাহায্যে বুঝতে পারলেন যে সূত্রের সাহায্যে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু ও তাদের গতির নিয়ন্ত্রণ ঘটে সেই একই সূত্রের প্রভাবে সৌরজগতের গ্রহতারকাদের কক্ষনির্ভর আবর্তনও নিয়ন্ত্রিত হয়। যে সূত্র বা বলের টানে গাছের আপেল আকাশে না উঠে মাটিতে এসে পড়ে, সেই একই বল সৌরমন্ডলের গ্রহতারাদেরও পরিচালিত করে।

নিউটন এই বলেরই নাম দিলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। যে সূত্রের সাহায্যে তিনি এই বলকে প্রকাশ করলেন তারই নাম হল মাধ্যাকর্ষণ সূত্র বা Law of gravitation।

এরপর নিউটন দেখলেন যেই অভিকর্ষ বলকে কেন্দ্র করে সৌরবস্তুদের নড়াচড়া সেই কেন্দ্র থেকে সৌর বস্তুর দূরত্বের বর্গের বিষয়ানুপাতিক। অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে সৌর বস্তুর দূরত্ব যদি বাড়ে অভিকর্ষ কমে আসে, আবার যদি দূরত্ব কমে অভিকর্ষ বলের পরিমাণও বেড়ে যায়।

নিউটন তাঁর আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ সূত্র ও অভিকর্ষ বলের কথা বাইরে প্রকাশ করবার আগেই বুঝতে পারলেন, এই মহাসত্য ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পদার্থবিজ্ঞান ও সৌরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব উপস্থিত হবে, নিয়ে আসবে নতুন যুগ।

আবিষ্কৃত সত্যকে দৃঢ় মূল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার দরকার। তাই নিয়েই মেতে উঠলেন তিনি।

১৬৬৫-৬৬ খ্রিঃ মধ্যে নিউটন আবিষ্কার করলেন আলোর প্রতিসরণ সূত্র বা Law of Refraction of Light।

তিনি দেখালেন, এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে ঢুকবার সময় আলো যে বাঁক নেয়, তার পরিমাণ নির্ভর করে মাধ্যমের ঘনত্বের ওপর।

ইতিপূর্বে তেফলা কাচ মাধ্যম বা প্রিজম আর লেনস—এই দুই বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কাচের সাহায্যে দৃষ্টি বিবর্ধক চশমা তৈরি সম্ভব হয়েছে, সম্ভব হয়েছে দূরবীন তৈরি।

লিউয়েন হুক তৈরি করেছিলেন জীবজগতের সূক্ষ্মতম অধিবাসীদের দেখবার উপযোগী অণুবীক্ষণযন্ত্র।

নিউটন প্রিজন ও লেনস নিয়ে নাড়াচাড়া করে দূরবীনের একটি মারাত্মক ত্রুটি আবিষ্কার করে ফেললেন।

দূরবীনের লেনসে সৌরজগতের যে ছবি ভেসে উঠত, তাতে থাকত নানা বর্ণের রেখার বর্ণবৃত্ত। এর ফলে গ্রহনক্ষত্রের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের কাজ বড় রকমের বাধার সম্মুখীন হত।

এই বর্ণঘটিত বিভ্রাটকে বলা হয় CHROMATIC ABERRATION বা বর্ণঘটিত স্থানচ্যুতি।

আলোক বিজ্ঞানীরা দূরবীনের এই ত্রুটি সম্পর্কে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু তাঁরা মনে করতেন দূরবীনের এই ত্রুটি প্রকৃতিগত অর্থাৎ ন্যাচারাল ফ্লো—এই ত্রুটিমুক্ত দূরবীন তৈরি অসম্ভব।

নিউটন এই বর্ণবিভ্রাট মুক্ত দূরবীন তৈরি করলেন। এর সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রদের প্রকৃত দূরত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে বর্ণঘটিত স্থান চ্যুতির বিঘ্ন থাকল অতি সামান্য মাত্রায়।

পরে ১৭৬০ খ্রিঃ তাঁর অনুসরণেই সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত দূরবীন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন আলোকবিজ্ঞানী জন ডোনাল্ড।

আলো ও বর্ণঘটিত নানা তত্ত্ব ও তথ্য যখন প্রকাশ করেন তখন নিউটনের বয়স ত্রিশের কোঠা ছুঁই ছুঁই।

তাঁর এই গবেষণা প্রবন্ধ ইউরোপের বিজ্ঞানীমহলে প্রবল বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। লন্ডনের বিখ্যাত রয়াল সোসাইটি তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি জানালেন তাকে সংস্থার সদস্য পদে নির্বাচিত করে।

এই সম্মান প্রাপ্তির পর নিউটন কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ নিজের বর্ণঘটিত ত্রুটিমুক্ত দূরবীনটি রয়াল সোসাইটিতে উপহার পাঠিয়ে দেন।

১৬৬৭ খ্রিঃ নিউটনকে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে অঙ্কের অধ্যাপকপদে নিয়োগ করা হয়। দীর্ঘ ২০ বছর তিনি এই মহাবিদ্যালয়ের কাজে ছিলেন। এই সময়ে অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যা নিয়ে একের পর এক গবেষণা করেছেন তিনি। রসায়ন নিয়েও কিছুকাল কাজ করেছেন।

ক্ষারীয় বা ক্ষারধর্মী ধাতুকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সোনায় পরিণত করা যায় কিনা তা নিয়েও পরীক্ষা করেছেন।

নিরন্তর গবেষণার মধ্যে থেকে বয়স তিরিশ হতে না হতেই সমস্ত চুল ধবধবে সাদা হয়ে গেল তাঁর।

যে কোন বিষয়ে একনিষ্ঠ মনঃসংযোগের বিরল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। যে কোন বিষয় একবার মাথায় ঢুকলে তার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না।

তাঁর সবচেয়ে মহৎ গুণ যেটি ছিল তা হল অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ এড়িয়ে মূল লক্ষে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা। তাঁর প্রতিটি গবেষণার কাজ এগিয়েছে নির্দিষ্ট নিয়মের পথ ধরে।

প্রথমে বিষয় নির্বাচন, পরে মূলনীতি নির্ধারণ। সবশেষে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলা।

১৬৮৪ খ্রিঃ এক তরুণ সৌরবিজ্ঞানী কেমব্রিজে এসে নিউটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই বিজ্ঞানীর নাম এডমুন্ড হ্যালি। তাঁর নামেই পরে একটি বিশেষ ধূমকেতুর নাম হ্যালির ধূমকেতু রাখা হয়েছিল।

প্রকৃতির মহাশক্তি অভিকর্ষের ওপর গবেষণা করার আগ্রহ প্রকাশ করে হ্যালি নিউটনের সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন।

নিউটন এতদিন তাঁর যে গবেষণার কথা চেপে রেখেছিলেন, তা প্রথম প্রকাশ করলেন হ্যালির কাছে।

জানালেন, বারো বছর আগেই তিনি এ সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা করেছেন। বিভিন্ন তত্ত্ব আবিষ্কারও করেছেন।

হ্যালির প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ-ও জানালেন যে বিশেষ কারণেই তিনি তাঁর আবিষ্কৃত মূল্যবান তত্ত্ব দীর্ঘকাল গোপন করে রেখেছেন।

কারণটিও গোপন করলেন না নিউটন। তাঁর আলোক বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা প্রকাশিত হবার পর তাঁকে বহু মিথ্যা সমালোচনার শিকার হতে হয়েছিল। বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও এই দলে ছিলেন।

তাঁদের নীচতা দেখে তাঁর মন এমনই ভেঙ্গে পড়েছিল যে জীবনে আর কোন গবেষণার কথাই প্রকাশ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত করেন।

তরুণ বিজ্ঞানী হ্যালির আগ্রহ ও তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত নিউটন তাঁর গবেষণা প্রকাশ করবেন বলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন।

টানা দুই বছর পরিশ্রম করে তিনি তাঁর যে গবেষণা প্রবন্ধটি তৈরি করেন তা বিশ্ববিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ। বইটির নাম রাখা হয় ফিলোসফিয়া নেচারালিস প্রিনসিপিয়া ম্যাথেমেটিকা যা ইংরাজি করলে দাঁড়ায় Mathematical Principle of Natural Philosophy।

তরুণ হ্যালি এই সময় নানাভাবে নিউটনকে সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আগ্রহেই বইটি তৈরি হয়েছিল, প্রকাশও করলেন নিজের পয়সায়।

নিউটনের এই বই-এর ভিত্তি উচ্চশ্রেণীর জ্যামিতি হলেও এর মধ্যে যেমন রয়েছে গভীর দর্শন তেমনি জটিল গণিত ও অসাধারণ সব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। বইটির সংক্ষিপ্ত নাম প্রিন্সিপিয়া। ইংরাজি প্রিনসিপল শব্দের ল্যাটিন উচ্চারণ হল প্রিন্সিপিয়া।

পরপর তিনটি বইয়ের সংকলন হল প্রিন্সিপিয়া। প্রথম বইটির আলোচ্য বিষয় গতিসূত্র। এতে রয়েছে পরপর তিনটি সূত্র।

প্রথম সূত্র হল : Every body continues in its state or rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by external force to change that state of inertia।

দ্বিতীয় সূত্র হল : Rate of change of momentum is proportional to the force acting, and the change takes place in the direction in which the force acts।

তৃতীয় সূত্র :. To every action there is an equal and opposite reaction।

প্রিন্সিপিয়ার দ্বিতীয় বইতে নিউটন আলোচনা করেছেন প্রতিরোধী বস্তুর মাধ্যমের ভেতরে যে কোন বস্তুর গতি নিয়ে।

প্রতিরোধী বস্তু হিসেবে তিনি তরল ও বায়বীয় এই দুই পদার্থকেই গ্রহণ করেছেন।

নিউটনের মতে যে কোন গ্যাসই অসংখ্য স্থিতিস্থাপক পরমাণুর মিশ্রণ। গ্যাসের ওপর চাপই তার আয়তন নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রিন্সিপিয়ার তৃতীয় খন্ডে রয়েছে সৌরজগৎ ও প্রকৃতির অভিকর্ষ বলের কথা। তিনি পরিষ্কার ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কিভাবে পৃথিবীর বুকে পতনশীল বস্তুর ওপর অভিকর্ষ বল কাজ করে এবং এই একই বলের প্রভাবে মহাকাশের গ্রহতারা তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে থেকে নির্দিষ্ট নিয়মে কাজ করে।

এই অভিকর্ষ বলের টানেই যে সমুদ্রে জোয়ার ভাটা খেলা করে সেই কথাও তিনি বলেছেন।

নিউটনের বক্তব্যের অর্থ হল, সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর পেছনেই রয়েছে নির্দিষ্ট যুক্তি ও অবিসংবাদি কারণ।

প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের পর এবারে নিউটন পেলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা, সাধুবাদ আর অপ্রতিহত খ্যাতি।

খ্যাতির সঙ্গে এল প্রাপ্তি। ১৮৮৯ খ্রিঃ ইংলন্ডের পার্লামেন্ট নিউটনকে সদস্যপদে বরণ করল। কেমব্রিজের বিজ্ঞান বিভাগ পরিচালনার সর্বময় দায়িত্বও তিনি পেলেন।

১৭০১ খ্রিঃ পেলেন দেশের সমস্ত টাঁকশালের অধ্যক্ষপদ। অবশ্য এই পদ পাবার পর তিনি পার্লামেন্ট থেকে অবসর নেন। ১৭০৩ খ্রিঃ তিনি রয়াল সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত হলেন। আমৃত্যু, ১৭২৭ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

১৭০৫ খ্রিঃ মহারানী অ্যান নিউটনকে নাইট উপাধিতে সম্মানিত করলেন। তাঁর নামের আগে যুক্ত হল স্যার। এই বিরল সম্মান বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই প্রথম লাভ করেন।

পদ বা পদক যাই জুটুক না কেন নিজ প্রতিভাগুণেই নিউটন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন বলে স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁর আবিষ্কারের সূত্র ধরেই আধুনিক বিজ্ঞানধারণা সুদূরপ্রসারী ফল ফলিয়ে চলেছে।

কার্ল ভন লিনিয়াস



সম্পূর্ণ নাম কারোলাস লিনিয়াস। সুইডেনের সামাল্যান্ড শহরে ১৭০৭ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন স্থানীয় গির্জার সামান্য একজন পাদ্রী। যৎসামান্য রোজগারে কায়ক্লেশে সংসার চলে।

ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল লিনিয়াসের। তাঁর বাবাও চাইতেন ছেলে বিদ্বান হয়ে চাকরিবাকরি করে সংসারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

কিন্তু লিনিয়াস একঘণ্টা বই নিয়ে বসেন তো পাঁচঘণ্টা ঝোপজঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। বই-এর চেয়ে প্রকৃতির সঙ্গেই তাঁর বেশি মাখামাখি।

একা একা মাঠঘাট, বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ান, ফুল আর গাছপালা দেখে দেখে সময় কাটান।

মাটির ওপরে দুটি জীবনের স্রোত প্রাশাপাশি। একটি প্রাণীজগৎ অপরটি উদ্ভিদ জগৎ। উদ্ভিদদের নিয়ে লিনিয়াসের কৌতূহলের অন্ত নেই।

কেমন করে উদ্ভিদেরা বেড়ে ওঠে, শীতের স্পর্শে পাতা ঝরিয়ে নেড়া হয়ে যায়, আবার বসন্ত এলেই নেড়াগাছে নতুন পাতা ও ফুলের সমারোহ জাগে, শিশু লিনিয়াস একান্তমনে এসব দেখে বেড়ান আর ভাবনায় ডুবে থাকেন।

ছেলের অবস্থা দেখে পাদ্রী বাবা চিন্তায় অস্থির হন। অমন করে গাছ দেখে বেড়ালে কি আর পড়ালেখা হবে? ছেলেকে তিনি বোঝান, উদ্ভিদের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন কিছু নেই যা তাকে জীবনের উন্নতির পথে সাহায্য করতে পারবে। ওসব নেশা ছেড়ে তিনি যেন বিজ্ঞানের বই পড়াশুনো করে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করেন।

লিনিয়াস বাবার কথা অমান্য করেন কি করে? এদিকে নিজের আবাল্য লালিত উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণের নেশাও ছড়েতে পারেন না। দুদিকই রক্ষা করলেন তিনি।

স্কুল কলেজে ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের নানা বিষয়েরও নিয়মিত পাঠ নেন, আবার সময় সুযোগ মত উদ্ভিদের জীবন দেখার কাজও চলে।

কলেজ থেকে বেরিয়ে সিদ্ধান্ত নেন, উচ্চতর পড়াশুনা উদ্ভিদ নিয়েই করবেন তিনি। সেই উদ্দেশ্যেই ১৭৩২ খ্রিঃ সুইডেনের উত্তরাঞ্চলের ল্যাপল্যান্ডে চলে এলেন।

উদ্ভিদ চর্চায় সেই সময় ল্যাপল্যান্ডের খুব নামডাক। এখানেই উদ্ভিদবিদ্যায় পড়াশুনা শুরু করেন লিনিয়াস।

একটা ঘোড়া সংগ্রহ করেছেন। উদ্ভিদ নিয়ে নানা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য সঙ্গে রয়েছে দূরবীন, পরিমাপদন্ড, ছুরি, ডাইরি, দোয়াত কলম, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, উদ্ভিদরস টানার কাগজ।

এইসব নিয়ে প্রতিদিনই তিনি শহর ছাড়িয়ে চলে যান দূরের অরণ্যে। সঙ্গে বাড়তি থাকে শিকারের উপযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র।

উত্তর মেরুর বন্য উদ্ভিদ ও পশুপাখির জীবন দেখার কাজ এই ভাবেই শুরু হয়। এখানকার বন-জঙ্গল, নদী-নালায় বিচিত্র উদ্ভিদ জীবন নতুন রূপ নিয়ে ধরা দেয় লিনিয়াসের জীবনে।

কেবল খুঁটিয়ে দেখার মধ্যেই শেষ হয় না তাঁর কাজ। শতশত অজানা গাছপালা লতাপাতার নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন।

সুইডেনের বনজঙ্গলের হাজার হাজার মাইল ঘোরাঘুরি করে বুঝতে পারেন, প্রকৃতির এই অফুরন্ত সম্পদ হেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবনের প্রয়োজনেই এই সম্পদ রক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে।

লিনিয়াস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সুইডিশ সরকারকে বন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে চিঠি দেন।

সেইযুগে উদ্ভিদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল অদ্ভুত। ঈশ্বর হঠাৎই একদিন উদ্ভিদ জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর থেকে একই রকম রয়েছে উদ্ভিদজগৎ, থাকবেও অনন্তকাল সেভাবেই। বলাই বাহুল্য, লিনিয়াসের চিঠি স্বাভাবিকভাবেই সেদিন কোন গুরুত্ব পায়নি।

উদ্ভিদ জগতের সম্পূর্ণ এক নতুন রূপ ও রসের অঞ্জন চোখে মাখিয়ে একসময় বাড়ি ফিরে আসেন লিনিয়াস। গাছপালার অনেক রহস্যই তখন তাঁর ভাঁড়ারে।

এই সময়েই স্যামল্যান্ডের এক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে লিনিয়াসের।

মেয়েটির নাম সারালিসা মরিয়াস। রূপসী ও বিদুষী মেয়েটির বাবা শহরের প্রখ্যাত ডাক্তার। তিনি লিনিয়াসকে একদিন পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে হলে তাকে এভাবে গাছপালা ঘেঁটে বনেবাদাড়ে ঘোরা বন্ধ করে ডাক্তারী পাশ করতে হবে।

তবে যেহেতু মেয়েরও বিশেষ আগ্রহ, তিনি লিনিয়াসের ডাক্তারী পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত মেয়েকে অন্যত্র পাত্রস্থ করার চেষ্টা করবেন না।

বাধ্য হয়েই এবারে লিনিয়াসকে হল্যান্ডে রওনা হতে হল ডাক্তারী পড়বার জন্য। ডাক্তারী পড়ার উদ্দেশ্যে গেলেও উদ্ভিদবিদ্যার ওপর লেখা নানা বই ও তাঁর নিজস্ব গবেষণার কাগজপত্র সঙ্গে নিতে ভুললেন না।

হল্যান্ডে তিন বছর ছিলেন লিনিয়াস। ডাক্তারী পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি হল্যান্ডের বনজঙ্গল নদী-নালায় ঘুরে ঘুরে উদ্ভিদ জীবনের গভীর ও গোপন সত্যকে আবিষ্কারের চেষ্টায় নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন।

ডাক্তারী পাশ করবার আগেই লিনিয়াস উদ্ভিদ জীবনের প্রজনন সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণের বিবরণ নিয়ে একটা বই প্রকাশ করলেন।

এই বইতে তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, প্রত্যেক ছোটবড় উদ্ভিদের জীবনেই মিলন ও প্রজননের একটা নেপথ্য রয়েছে। এই জগতেও রয়েছে জন্ম ও মৃত্যুর ধারাবাহিকতা—সজীব জগতেরই অনুরূপ। স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে মিলনের ধারা নানা উদ্ভিদে নানা ধরনের।

মানুষ ও পশুদের মতই উদ্ভিদের শরীরেও রয়েছে গর্ভধারণের প্রয়োজনীয় আয়োজন ও প্রক্রিয়া।

উদ্ভিদের নিষেকের কাজে সহায়তা করে মৌমাছি প্রজাপতির দল। তারা ফুলের পুংকেশর থেকে পরাগ বা পুংরেণু সংগ্রহ করে নিয়ে যায় স্ত্রী ফুলের ডিম্বাশয়ে। পরাগ ডিম্বকোষে মেশে এবং এভাবেই নিষেক বা মিলনের কাজ সম্পন্ন করে।

উদ্ভিদ জীবনদর্শনের এই অদ্ভুত কথা সেই যুগে ছিল একেবারেই নতুন ভাবনা। ফুলের পবিত্রতা নিয়েই মানুষ এতদিন মুগ্ধ ছিল। এমন নিষ্কলঙ্ক পবিত্র আধারেও যে পশুর জন্মের ইতিহাস থাকতে পারে এমন চিন্তা মানুষের কল্পনার ধবাছোঁয়ার মধ্যেও ছিল না।

এই অভাবনীয় ব্যাপার স্যাপার নিয়ে বই প্রকাশিত হতেই আলোড়ন পড়ে গেল চারদিকে। সমাজপতিরা একবাক্যে রায় দিলেন, লিনিয়াস দুরাচার, নীতিহীন।

কিন্তু সাধারণ মানুষের এ ব্যাপারে জেগে উঠল তীব্র কৌতূহল। তারা লিনিয়াসের কাছে এসে জুটতে লাগল উদ্ভিদ বিষয়ে নতুন কথা শুনবার জন্য।

তিনিও নানা পরীক্ষা করে লোকজনকে উদ্ভিদের জন্মলীলা দেখিয়ে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে লাগলেন মানুষ, জীবজন্তু, পাখি ও মৌমাছির মত ফুলেরও প্রজনন হয়।

সমাজপতিদের চোখরাঙানি নিষ্ফলই হল। চোখে দেখে সকলেরই বিশ্বাস হল লিনিয়াসের কথার সত্যতা।

পুরুষরেণু ছড়িয়ে মৌমাছি প্রজাপতির দল উদ্ভিদের শরীরে সম্ভব করে তোলে ফলের, ফল থেকে নতুন উদ্ভিদের।

যেমন করে মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেয় শিশু, তেমনি নির্দিষ্ট একটা সময়ের পরে ফুলের গর্ভ থেকেও বেরিয়ে আসে ভবিষ্যতের উদ্ভিদ শিশু ফল ও বীজের আকারে।

উদ্ভিদের প্রজনন রহস্যের প্রথম ব্যাখ্যা দিয়েই সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন লিনিয়াস। কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছিলেন তিনি। তা হল উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ।

ইতিপূর্বে প্রাচীন উদ্ভিদবিদদের যে কাজটি প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে বিজ্ঞানের চাইতে ধারণাই কাজ করেছিল বেশি।

তাঁর পূর্বসুরিরা উদ্ভিদ জগতের সমূহ গাছপালা লতাপাতাকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন বিচিত্র উপায়ে। সেগুলো হলো, (১) কাঁটাযুক্ত বা কাঁটাহীন, (২) শাঁসযুক্ত বা শাঁসহীন, (৩) নামের অক্ষরের অনুক্রম, (৪) প্রয়োজীয় ও অপ্রয়োজনীয়, (৫) মানুষের শরীরে কোন ফুলের কি প্রতিক্রিয়া।

লিনিয়াস সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পন্থায় উদ্ভিদকুলের শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন। এই সম্পর্কে ১৭৫৩ খ্রিঃ তাঁর যে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম Species Plantarum বা উদ্ভিদ প্রজাতি।

দু'খণ্ডের এই বইটি উদ্ভিদবিদ্যায় নতুন যুগের সূচনা করল। গোড়ার দিকে নাক সিঁটকোলেও শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা লিনিয়াসের মতামত মেনে নিলেন। পরিণতির পথে অগ্রসর হবার গতি লাভ করল উদ্ভিদবিদ্যা।

যাইহোক, এত কাণ্ডের মধ্যেও যথাসময়ে হল্যান্ডের মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে লিনিয়াস সোজা চলে এলেন সামাল্যাণ্ডের হবু শ্বশুর বাড়িতে। শর্ত অনুযায়ী সারাকে বিয়ে করে সংসার পাতলেন শহরের এক নিরিবিলি জায়াগায়।

বাধ্য হয়েই ডাক্তারি পাশ করেছিলেন, কিন্তু লিনিয়াসের প্রাণের সম্পর্ক ছিল উদ্ভিদজগতের সঙ্গেই। তবু জীবিকার্জনের প্রয়োজনে যখন রুগীর চিকিৎসা করতে বসলেন, সেখানেও তাঁর জন্মগত প্রতিভা তাঁকে অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় চিকিৎসক করে তুলল।

দেখতে দেখতে শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। দূরদূরান্তর থেকে রুগীর দল হাজির হতে লাগল চেম্বারে। ফলে নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠল।

লিনিয়াসের চিকিৎসক খ্যাতি একসময় সুইডেনের রানীর কানে গিয়ে পৌছল। তিনি তাঁকে তাঁর চিকিৎসক দলের সদস্য করে নিলেন।

সমস্ত ব্যস্ততা ছিল লিনিয়াসের জীবনের বহিরঙ্গ। ভেতরে ভেতরে উদ্ভিদ সংক্রান্ত গবেষণার বিরাম ছিল না। নিত্য নতুন গবেষণার সংবাদ প্রকাশিত হয় আর আলোড়ন সৃষ্টি হয় পৃথিবী জুড়ে।

এবারে রুগীদের ভিড়ের সঙ্গে যুক্ত হল আরও একটি ভিড়। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকেই আগ্রহীরা উদ্ভিদবিদ্যার নতুন পাঠ গ্রহণের জন্য এসে জুটতে লাগল।

নানা দেশের ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গে চলতে লাগল তাঁর আলোচনা ও পরামর্শ। একই সঙ্গে নানা দেশের ফল ও ফুলের গাছের সংগ্রহ সমৃদ্ধ হতে থাকে বাড়ির উদ্যানে।

লিনিয়াস তাঁর বইতে ফুল ও ফলকে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নামে চিহ্নিত করবার পদ্ধতি দেখিয়েছিলেন।

দুই শব্দে থাকত একটি নাম। নামের প্রথম অংশ হল উদ্ভিদের জাতি বা জেনাসের ল্যাটিন নাম, দ্বিতীয় অংশটি হল উদ্ভিদেব বিশেষণ।

লিনিয়াসকৃত উদ্ভিদের এই শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করেই পরিবর্তীকালে ডারউইন তাঁর. বিবর্তনবাদে পশুপাখির শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন। উপশ্রেণীতেও যে পশুপাখিদের বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে তা লিনিয়াসের পদ্ধতি অনুসরণ করেই।

বিশ্বজোড়া খ্যাতির সঙ্গে লিনিয়াস পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পেয়েছিলেন অভিনন্দন ও পুরস্কার।

১৭৬১ খ্রিঃ তাঁর নতুন নাম হয় কার্ল ভন লিনি। তিনি হয়ে উঠলেন দেশের প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যতম।

উদ্ভিদবিদ্যার জয়যাত্রাকে সূচীত করে বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন লিনিয়াস। ১৭৭৮ খ্রিঃ এই বিজ্ঞান-তাপসের দেহাবসান হয়।

ল্যাজারো স্পালাঞ্জানি

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে জীববিজ্ঞানীদের জীববিজ্ঞানী (Biologists' Biologist) বলে পরিচিত ল্যাজারো স্পালাঞ্জানির আবির্ভাব হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের এমন এক সময়ে যখন সমাজে ছিল কুসংস্কারও তথাকথিত ধর্ম বিশ্বাসীদের দাপট।

যা প্রচলিত সংস্কারে মেলে না, যা শাস্ত্র বহির্ভূত, সেই অন্ধকার যুগে তাকে সত্য বলে প্রমাণ করা ছিল দুঃসাধ্য। গোটা পৃথিবীর আবহাওয়াই ছিল এই রকম।

অথচ সেই যুগে অদম্য প্রাণশক্তি ও অধ্যবসায় বলে দুঃসাধ্য সাধন করেছিলে স্পালাঞ্জানি।

তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা জীববিজ্ঞানের অসংখ্য জটিল জিজ্ঞাসার বৈজ্ঞানিক মীমাংসা দানে সক্ষম হয়েছিল। জীববিজ্ঞান পেয়েছিল আধুনিকতার আলোর সন্ধান।

বিজ্ঞান-সাধক স্পালাঞ্জানি পেয়েছিলেন এক বিচিত্র জীবন। সেই জীবনে বিজ্ঞানের সংস্পর্শ নিরবচ্ছিন্ন ছিল না।

একাধিকবার পেশা পরিবর্তন করেছেন, নেশা পাল্টেছেন। কখনো হয়েছেন পাদ্রী, কখনো আইনজীবী।

তবে সর্বক্ষেত্রেই সত্যসন্ধানের আকুলতা তাঁর মধ্যে সদাজাগ্রত ছিল। যুক্তি আর জিজ্ঞাসা হয়েছিল তার বাহন।

স্পালাঞ্জানির জন্ম ইতালির মোদেনা প্রদেশের ছোট শহর স্কান দিয়ানোয় ১৭২৯ খ্রিঃ। তাঁর পিতা ছিলেন আইনজীবী। তাই ছেলেকেও আইনজীবী হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্নই তিনি দেখতেন।

শৈশবে স্পালাঞ্জানি শিক্ষালাভ করলেন স্থানীয় রেজিও মহাবিদ্যালয়ে। তখনকার দিনে এসব শিক্ষালয়ে প্রাচীন গ্রিস ও রোমের সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চাই ছিল প্রধান। অসাধারণ মেধাবলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এই সকল বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হয়ে উঠলেন।

পাশ করবার পর সেই মহাবিদ্যালয়েই গ্রিক ভাষা ও দর্শনের শিক্ষকতার কাজ পেয়ে গেলেন।

দর্শনের শিক্ষা স্পালাঞ্জানিকে আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। জীবনের রহস্য ভেদ করার আকুলতা ক্রমেই তাঁর মধ্যে তীব্র হয়ে উঠতে লাগল।

সৃষ্টি-রহস্যের উৎস-মূলের সন্ধান লাভের জন্য তিনি পিতার অনুমতি নিয়ে সেমিনারিতে নাম লেখালেন।

সেমিনারি হল ধর্মশিক্ষার কেন্দ্র। এখানে ভর্তি হবার পর থেকেই তাঁর জন্মগত প্রতিভার উন্মেষ ঘটতে থাকে।

গীর্জার অনুশাসনের মধ্যে থেকে বাইবেল ও শাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। লাভ করলেন যাজকের পদ—অ্যাবে উপাধি।

কিন্তু তৃপ্ত হতে পারলেন না। অন্তরে যে জিজ্ঞাসা অহরহ জাগছে তার কোন সদুত্তর ধর্মগ্রন্থের মধ্যে তিনি পেলেন না।

গভীর অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে গেলেন রিজিও মহাবিদ্যালয়ের চাকরিতে।

গ্রিক ভাষা পড়াতে পড়াতেও চলল সত্যের সন্ধান—অন্যতর জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার পালা।

এমনি সময়ে অতি সাধারণ একটি ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল আকস্মিকভাবে।

কদিনের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন মাসির এক মেয়ে লরা বাসি-এর বাড়িতে। লরা সেসময়ে অধ্যাপনা করতেন বোলগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর বিষয় অঙ্ক ও পদার্থ বিজ্ঞান।

মস্ত সংসার লরার। এগারোটি ছেলেমেয়ের জন্মদাত্রী তিনি। সংসারের সব ঝামেলা জঞ্ঝাট মিটিয়েও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও বিজ্ঞানের চর্চা বজায় রেখে চলেছেন।

মাসতুতো দিদির অদম্য প্রাণশক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ মুগ্ধ করল স্পালাঞ্জানিকে। তিনি বুঝতে পারলেন, বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে নিশ্চয় এমন দুর্লভ তৃপ্তির স্পর্শ রয়েছে যা লরাকে সমস্ত কর্মক্লান্তির মধ্যেও সজীব ও সক্রিয় করে রেখেছে।

স্পালাঞ্জানি মনস্থির করে ফেললেন, তিনি বিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করবেন। সত্যকে জানার, অজানার রহস্য উন্মোচনের একমাত্র চাবিকাঠি রয়েছে বিজ্ঞানের কোষকক্ষে।

স্পালাঞ্জানির বয়স তখন একত্রিশ। ইতিপূর্বে তিনি কৌতূহল চারিতার্থ করবার জন্য প্রকৃতির নানা বিষয় নিয়ে নিজের মত করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিস্তর করেছেন। তিনি স্থির করলেন প্রকৃতিবিজ্ঞানই হবে তাঁর জীবনে সত্য সন্ধানের মাধ্যম।

বাড়ি ফিরে এসে চাকরি বদল করলেন। মোদেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপনা আরম্ভ করলেন। সেই সঙ্গে চলল গবেষণা।

অধ্যাপক হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করলেন অল্প সময়ের মধ্যেই। সেই সঙ্গে তাঁর নতুন নতুন গবেষণার সংবাদ যুক্ত হয়ে সমগ্র ইতালিতেই খ্যাতিমান বিজ্ঞানী করে তুলল তাঁকে।

প্রকৃতি বিজ্ঞানের পাঠ নেবার জন্য দেশের নানা প্রান্ত থেকে ছাত্ররা এসে মোদেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করতে লাগল।

স্পালাঞ্জানির সুখ্যাতি একদিন ইতালির রানী মারিয়া থেরেসার কানে পৌঁছল। রানী ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালেন তাঁর কাছে। পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার আহ্বান জানালেন।

স্পালাঞ্জনি সেই আহ্বান সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি জানতেন রানীর বিশেষ উৎসাহে পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের বিশেষ সুবন্দোবস্ত হয়েছে। তৈরি হয়েছে, বিজ্ঞান-যাদুঘর, বিশাল লাইব্রেরি।

গবেষণাকাজের ব্যাপক সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করে ১৭৬৮ খ্রিঃ স্পালাঞ্জানি পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের নতুন বিভাগে যোগদান করলেন।

অধ্যাপনা ও গবেষণা পাশাপাশি চলতে লাগল। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল বহুবিধ।

জীবনের উৎস, প্রজনন, পুনরুৎপাদন, সংজ্ঞাবাহী ইন্দ্রিয়, পরিপাক, রক্ত পরিবহন, শ্বসন—কি ছিল না তাঁর অনুসন্ধানের তালিকায়?

একথা সর্ববাদিসম্মত যে স্পালাঞ্জানির গবেষণার ভিত্তিতেই জন্ম নিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের জীবপ্রযুক্তি (Bioengineering) নামের শাখাটি।

স্পালাঞ্জানির গবেষণার প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল Reproduction বা পুনরুৎপাদন যা আধুনিক জীব প্রযুক্তিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমরা সচবাচর দেখতে পাই টিকটিকির লেজ খসে যায়। আবার যথাস্থানে কিছুদিন পরেই নতুন লেজ গজিয়ে উঠেছে।

প্রকৃতির রাজ্যের এই রহস্যময় কান্ডটি স্পালাঞ্জানির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনিও লক্ষ্য করলেন, জল গোধিকা বা water lizard আকস্মিক একটি ঘটনায় পা হারিয়ে প্রকৃতির রহস্যময় নিয়মে কিছুদিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক পা ফিরে পেয়েছে।

এই ঘটনা যে সব প্রাণীদেহে ঘটে না তা তাঁর অজানা নয়। মানুষ, কুকুর বা বেড়ালের ক্ষেত্রে যে ব্যাপার ঘটে না কেবল মাত্র জলগোধিকার ক্ষেত্রে কেন ঘটছে—এই জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার চেষ্টায় ব্রতী হন।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি বুঝতে পারেন জলগোধিকার শরীরে কোষকলা বা টিসুরাই এই অসম্ভব কান্ডটি সংঘটিত করে। এর মধ্যে এমন স্বাভাবিক রিপেয়ারিং ব্যবস্থা রয়েছে যা অন্য প্রাণীদের নেই।

এই সারাইব্যবস্থার রহস্যটিকেই জানতে হবে। গবেষণায় নিমগ্ন হলেন স্পালাঞ্জানি। সময়টা ১৭৮৬ খ্রিঃ। পরীক্ষা আরম্ভ করলেন একটা স্যালামান্ডার বা গিরগিটি নিয়ে।

প্রাণীটির একটি পা ও লেজ কেটে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই কর্তিতস্থানে নতুন পা ও লেজ দেখা দিল।

তিন মাসের মধ্যে পাঁচবার একই কাজ করলেন তিনি আর পাঁচবারই গিরগিটির শরীর নতুন করে পা ও লেজ তৈরি করে ফেলল।

স্পালাঞ্জানি অনুধাবন করলেন, ভ্রূণাবস্থায় যে অবস্থায় গিরগিটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গড়ে ওঠে সেই অবস্থাটি তার শরীরে বজায় থাকে বলেই জীবনের যে কোন বয়সে সে নতুন করে হাত পা লেজ গড়ে নিতে পারে।

তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, ভ্রূণাবস্থায় একটি পর্যায়ে অঙ্গগঠনের কাজ তো সব প্রাণীরই ঘটে থাকে। তাহলে অন্য প্রাণীর দেহে ভ্রূণাবস্থার অঙ্গগঠন পর্যায়টি কেন নষ্ট হয়ে যায়?

ব্যাঙ নিয়ে পরীক্ষা করলেন। লক্ষ করলেন, ব্যাঙাচির লেজ কাটা গেলেও নতুন লেজ গজিয়ে উঠছে।

কিন্তু ব্যাঙের জীবনচক্রে অঙ্গগঠনের প্রবণতা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় বলে ব্যাঙের পা কাটা গেলে আর নতুন পা গজায় না।

এই ব্যাপারটির পেছনে জলের কোন ভূমিকা আছে কিনা অর্থাৎ পরিবেশগত প্রভাব বর্তমান কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য স্পালাঞ্জানি গিরগিটির পা ও লেজ কেটে জলের বাইরে রেখে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

জলের বাইরেও এমনই ফল দেখা গেল। কিছুদিনের মধ্যেই গিরগিটি তার দেহের কাটা অংশে পা ও লেজ তৈরি করে ফেলল। তিনি নিশ্চিত হলেন যে

ব্যাঙাচির জীবনের শরীরের কোষবিন্যাস ব্যাঙজীবনের পরিণত দশায় পাল্টে যায়। কিন্তু গিরগিটির শরীরে বজায় থাকে।

বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও স্পালাঞ্জানির পক্ষে এ বিষয়ে আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়াসম্ভবহল না।

পরবর্তিকালে আধুনিক জীব-প্রযুক্তিবিদরাও গবেষণাগারে জীবদেহে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করবার জন্য বহুতর গবেষণা করেছেন। এর ফলে সার্থকতা এটুকুই এসেছে যে সজীব কোষের জৈব রাসায়নিক ও শারীর বৃত্তীয় বিষয়ে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে।

আয়ার্ল্যান্ডের এক পাদ্রী জে.টি.নীডহ্যাম ১৭৪৮ খ্রিঃ একটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে জীবণুরা স্বয়ংসৃষ্ট। একটা কাচের বয়ামে একটুকরো মাংস রেখে মুখ ছিপি দিয়ে আটকে রাখলে দু সপ্তাহের মধ্যেই বয়ামের ভেতরে জীবাণুরা আপনা থেকেই জন্মলাভ করে।

ছিপি দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেও বয়ামের ভেতরে জীবাণুর জন্ম রোধ করা যায় না।

তারপর থেকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নীডহ্যাম-এর মতই প্রচলিত ছিল। সকলেই মেনে নিয়েছিলেন যে জীবজগতে জীবাণুদের স্বয়ংসৃষ্টি অবাস্তব নয়।

স্পালাঞ্জানি এই সূত্র ধরে তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণা আরম্ভ করলেন। তিনি মাংসের টুকরোকে ভাল করে ফুটিয়ে বয়ামে ভরে ছিপি আটকালেন।

এক দুই তিন করে পরপর পাঁচ সপ্তাহ কেটে গেল। দেখা গেল সিদ্ধ মাংস পূর্বে যেমন জীবাণুমুক্ত ছিল তেমনিই জীবাণুশূন্য বা স্টেরাইল রয়ে গেছে।

এরপর তিনি সর্বসমক্ষে সেদ্ধ করা জীবাণুমুক্ত মাংস দুদিন পরে বোতলের ভেতর থেকে বার করে এনে দেখালেন দুদিনের মধ্যেই মাংসের মধ্যে জীবাণুর আবির্ভাব ঘটছে।

এইভাবে তিনি নীডহ্যামের জীবোৎপাদনের স্বতঃস্ফুর্ত তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণ করে দিলেন।

এ বিষয়ে পরবর্তিকালে পাস্তুর সঠিক সিদ্ধান্তটি জানিয়ে বলেছিলেন, জীবাণুরা স্বয়ংসৃষ্ট নয়। বাতাসে দূষিত সজীব কণা বর্তমান, তাদের দ্বারাই জীবাণু জন্ম সম্ভব হয়।

স্পালাঞ্জানি যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সেই সত্য জীববিজ্ঞানে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন পাস্তুর একশো বছর পরে। এনজাইম বা জৈব অনুঘটকের বার্তা তিনিই প্রথম শুনিয়েছিলেন।

এনজাইম বা প্রোটিন জাতীয় উৎসেচক যে প্রাণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জৈব অনুঘটকের কাজ করে এই তত্ত্ব স্পালাঞ্জানির যুগের বিজ্ঞানীদের কারোই জানা ছিল না।

কিন্তু উৎসেচকের সন্ধান না জেনেও স্পালাঞ্জানি নতুন ভাবনার ইশারা দিয়েছিলেন।

শরীরের খাদ্য পরিপাক ব্যাপারটাকে নিছক যান্ত্রিক ঘটনা বলে মানতেন না স্পালাঞ্জানি। তাঁর বক্তব্য ছিল, হজম ব্যাপারটা পুরোপুরি রাসায়নিক, যান্ত্রিক নয়।

তাঁর এই ঘোষণার সূত্র ধরেই পঞ্চাশ বছর পরে পাচক রসে পেপসিন অবস্থান আবিষ্কৃত হয়।

পেপসিনই হল প্রথম আবিষ্কৃত এনজাইম। হজমের ক্ষেত্রে এই এনজাইমটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাকস্থলীর রস বা গ্যাসট্রিক জুস থেকে পেপসিনকে আবিষ্কার করেছিলেন জীববিজ্ঞানী থিওডোর শ্যোহান ১৮৩৬ খ্রিঃ। তাঁর অনেক আগেই পাচক রসের ওপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন স্পালাঞ্জানি।

আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন লালার এনজাইম টায়ালিন। এই টায়ালিন মুখের খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে খাদ্যের মূল উপাদান স্টার্চ বা শ্বেতসার যৌগটিকে বিশ্লিষ্ট করে মালটোজ শর্করা উৎপাদন করে। যা পরিপাক ক্রিয়ার প্রধান সহায়ক।

বহুপূর্বে স্পালাঞ্জানি লক্ষ করেছিলেন রুটির টুকরো ক্রমাগত চিবোতে থাকলে ক্রমেই মিষ্টত্ব বাড়ে।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রুটিচূর্ণ লালারসে মিশে এমন এক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় যার ফলে চিনি জাতীয় মিষ্ট জিনিস তৈরি হয়।

গ্যাসট্রিক রসের ওপরেও গবেষণা করেছিলেন স্পালাঞ্জানি। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি ধারণা করেছিলেন গ্যাসট্রিক রস শরীরের তাপের সহায়তায় খাদ্যবস্তুকে গালিয়ে দেয়। এতটা এগিয়েও তিনি গ্যাসট্রিক রসের অম্লটির সন্ধান করতে পারেন নি।

স্পালাঞ্জানির পদ্ধতি অনুসরণ করেই ১৮০৩ খ্রিঃ মার্কিন শারীরবিদ ইয়ং গ্যাসট্রিক রসের রহস্য ভেদ করেছিলেন।

জীবজন্তুর প্রজননের ওপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যার বিবরণ নিয়ে ১৭৮৫ খ্রিঃ স্পালাঞ্জানি একটি বই প্রকাশ করেন। বইটির নাম Experiments up on the Generation of Animals and Plants।

ইতিপূর্বে উইলিয়ম হারভে নামে এক বিজ্ঞানী জীবজন্তুর প্রজননের ওপর প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম্বকোষকে শুক্ররসের বাষ্পে ভিজিয়ে নিলে নিষেকের কাজটি দ্রুততর হয়।

স্পালাঞ্জানি তাঁর পরীক্ষা দ্বারা হারভে-এর ব্যাখ্যাটি যে ভ্রান্ত তা প্রমাণ করেছিলেন। তিনি স্পষ্টই তাঁর বইতে এ সম্পর্কে বলেছেন শুক্ররসের বাষ্প কখনোই ডিম্বকোষকে নিষিক্ত করতে পারে না।

কেননা শুক্র রসের সঙ্গে ডিম্বকোষের মিলনের ফলে ডিম্বকোষ ভেঙ্গে যায় ও ভ্রূণবিকাশের কাজ শুরু হয়।

কাছাকাছি পৌঁছেও দুর্ভাগ্যবশতঃ স্পালাঞ্জানি ধরতে পারেননি যে শুক্ররসে থাকে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র লেজওয়ালা কীট বা শুক্রাণু স্পারমেটোজোয়া। এই শুক্রকীটই নিষেকে অংশ গ্রহণ করে ভ্রূণে রূপান্তরিত হয়।

শুক্ররস ব্লটিংপেপারে ছেঁকে তার পরিশ্রুত অংশটি দিয়ে যে নিষেকের কাজ হয় না তা-ও তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। কিন্তু কেন তা হয় না তা তিনি ধরতে ব্যর্থ হয়ে ছিলেন।

১৮৫৪ খ্রিঃ স্পালাঞ্জানি র গবেষণার সূত্র ধরে জীববিজ্ঞানী জর্জ নিউপোর্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শুক্ররসে লেজওয়ালা শুক্রকীট আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এরাই ডিম্বকোষে ঢুকে নিষেকের কাজ সম্পন্ন করে।

প্রকৃতিতে যা কিছু রহস্যময় ঠেকেছে তা নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় মেতে উঠেছেন স্পালাঞ্জানি।

কখনো রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হয়েছেন, কখনো ব্যর্থ হয়েছেন। যেসব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন, সেসব ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রগতির পদ্ধতি যে সঠিক ছিল তা পরবর্তীকালে বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

বাদুড় কি করে রাতের অন্ধকারে নির্বিঘ্নে উড়ে যেতে সক্ষম হয় তার কারণ অনুসন্ধানেও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন।

শেষপর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্তে আসেন বাদুড়ের কানের মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যার ফলে বাদুড় অন্ধকারে কোথাও অতটুকু বাধা না পেয়ে নিশ্চিন্তে উড়তে পারে।

তিনি একবার কয়েকটা বাদুড়কে একটা অন্ধকার হল ঘরে উড়িয়ে দেন।

আগে থেকেই সেই ঘরে নানাজায়গায় কিছু ব্যারিকেড করে রেখেছিলেন। দেখাগেল, অন্ধকার ঘরে বাদুড়গুলো কোন ব্যারিকেডে বাধা না পেয়ে দিব্যি উড়ে বেড়াচ্ছে।

এরপর তিনি বাদুড়গুলোর প্রত্যেকের কান কাপড়ের টুকরো দিয়ে বেঁধে দিয়ে আবার উড়িয়ে দিলেন।

এবারে দেখা গেল, বাদুড়গুলো উড়তে গিয়ে বিভিন্ন ব্যারিকেডে বাধা পেয়ে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে।

স্পালাঞ্জানি আসল রহস্যটির কাছাকাছি পৌঁছেও থেমে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর গবেষণার সম্পূর্ণতা দিয়েছিলেন একজন ইংরাজ শারীরতত্ত্ববিদ ১৯২০ খ্রিঃ। তিনি আবিষ্কার করেন, বাদুড়েরা অন্ধকারে উড়বার সময় এক উচ্চ

কম্পাঙ্কের শব্দ উৎপন্ন করে। সেই শব্দ মানুষ বা অন্যকোন প্রাণী উৎপন্ন করতে পারে না।

অবিরাম ধারায় উৎপন্ন ওই উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ সামনে কোন বাধা থাকলে তার গায়ে বাধা পেয়ে শব্দের প্রতিফলন ঘটায়।

সেই প্রতিফলিত শব্দ শুনে বাদুড় বাধার অস্তিত্ব টের পেয়ে যায় এবং নিরাপদ ওড়াউড়ির পথ বেছে নিতে পারে।

বাদুড় যে উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ উৎপাদন করে তার নাম আলট্রাসোনিক সাউন্ড। এই কম্পাঙ্ক আমাদের শ্রুতিগোচর শব্দ সীমার অনেক হাজার গুণ বেশি হওয়ায় আমরা শুনতে পাই না।

স্পালাঞ্জানি তাঁর বিজ্ঞানের গবেষণার ভাণ্ডারে যে রসদ সঞ্চিত করেছিলেন, উত্তরকালে তার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর প্রতিটি বিষয়ের গবেষণার মধ্যেই নিহিত ছিল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ। পরবর্তীকালে তারই পুষ্টরূপ বিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধতর।

মাত্র কয়েক বছরের বিজ্ঞান সাধনার ফলে তিনি এই বিস্ময়কর কাজ করেছিলেন। এই কারণেই জীববিজ্ঞানের প্রধান পুরোধা পুরুষরূপে তিনি স্বীকৃত।

১৭৯৯ খ্রিঃ এই বিজ্ঞান সাধকের জীবনাবসান হয়।

হেনরি ক্যাভেন্ডিস



একা নিরিবিলি থাকতেই ভালবাসতেন। হাঁটু সমান ঝোলা কোট পরতে পছন্দ করতেন। সাধারণত জনকোলাহলের বাইরে নির্জন রাস্তা ধরে চলতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন।

কেন না মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই তিনি কেমন কুঁকড়ে যেতেন। তাঁর হাঁটাচলা কথাবলা সবই অদ্ভুত ভাবে পাল্টে যেত।

লন্ডনের নির্জন রাস্তায় একসময় এই অদ্ভুত স্বভাব ও বেশভূষার মানুষটিকে প্রায়ই চলাফেরা করতে দেখা যেত।

এই আশ্চর্য প্রতিভাধর মানুষটিকে সেদিন যে অনেকেই পাগল বা বিকৃতমস্তিষ্ক বলে মনে করতো তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

ইংলন্ডের অন্যতম ধনবান ব্যক্তি হেনরি ক্যাভেন্ডিসকে তাঁর সময়ে যে যাই বলুক না কেন নিজের অসাধারণ অবদানের জন্য রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন।

ইংলন্ডের বিখ্যাত ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডের সবচেয়ে বেশি শেয়ারের মালিক হয়েও অদ্ভুত ছিল ক্যাভেণ্ডিসের জীবনযাত্রার ধরন।

দিন যাপন করতেন অতি সাধারণভাবে। গোটা সপ্তাহে তাঁর নিজের জন্য খরচ হত মাত্র কয়েক পাউন্ড—যা অনেক হতদরিদ্র ব্যক্তির চাইতেও কম। অথচ তিনি ছিলেন অগাধ অর্থের মালিক।

কিন্তু আশ্চর্য মনীষা নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বিজ্ঞানী হিসেবে দেশে বিদেশে যখন তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে,স্বাভাবিক ভাবেই অনেক বিজ্ঞানপিপাসু মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, বহু জায়গা থেকে বক্তৃতার আমন্ত্রণ আসত।

ক্যাভেণ্ডিস প্রতিটি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতেন, দর্শনার্থীদের সঙ্গেও ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করতেন না। আসলে তিনি লোকসমাগম একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না।

নারীর মুখ তাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে অসহ্য। দৈবাৎ কোন মহিলার মুখোমুখি হয়ে পড়লে আর্তনাদ করে উঠে তিনি পালাতে থাকতেন। তাঁর শরীর কম্পিত হতে থাকত—তিনি অসুস্থ বোধ করতেন। সারাজীবন তাঁকে এই কারণে অকৃতদার থাকতে হয়েছিল।

একজন মানুষের এমন আচরণকে মানসিক বিকৃতি ছাড়া আর কি বলা যায়? তাঁর সমসাময়িক কালের বিজ্ঞানীরা ও তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করেননি—তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন।

তাঁর নাম দিয়েছিলেন তাঁরা booby Cavendish বা হাবা ক্যাভেণ্ডিস। তাঁর জীবনীকারও তাঁকে সরাসরি পাগল বলেই উল্লেখ করেছেন।

ক্যাভেণ্ডিসের মত বিকৃত মানসিকতার প্রতিভাধর বিজ্ঞানের ইতিহাসে বড় বেশি দেখা যায় না। অথচ বহুবিধ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।

তাঁর দর্শনের জ্ঞান ছিল অসাধারণ, বিজ্ঞানী হিসেবেও কালের তুলনায় ছিলেন অগ্রবর্তী।

ক্যাভেণ্ডিসের জন্ম হয় ১৭৩১ খ্রিঃ ইংলণ্ডের নাইম শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে।

পিতা লর্ড চার্লস ক্যাভেণ্ডিস ছিলেন ইংলন্ডের এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। মা লেডি অ্যানিও ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে।

তাঁর এক পূর্বপুরুষ জন ক্যাভেণ্ডিস ছিলেন ইংলন্ডের রাজা ৩য় এডওয়ার্ডের প্রধান বিচারপতি।

আর এক পূর্বপুরুষ টমাস ক্যাভেণ্ডিস সাগরপথে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন।

সেই সময় এই ঘটনা সমগ্র ইউরোপেই আলোড়ন তুলেছিল। ক্যাভেণ্ডিসের পিতামহ হেনরি ক্যাভেণ্ডিস ছিলেন ডাকসাইটে ডিউক।

পিতা এবং মাতা দুই তরফের অভিজাত রক্ত শিরায় নিয়েই জন্মেছিলেন ক্যাভেণ্ডিস। পারিবারিক পরিবেশও ছিল পরিশীলিত।

মাত্র দুই বছর বয়সেই মাতৃহারা হন। এর ফলেই দিনে দিনে তিনি সমাজ সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আত্মমগ্নতার আড়ালে সরে গিয়েছিলেন। লোকসঙ্গ একদম সহ্য করতে পারতেন না।

অথচ অসাধারণ মেধা ছিল তাঁর। স্কুলের পরীক্ষায় বরাবর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

অভিজাত স্কুলের পড়া শেষ করে ভর্তি হয়েছিলেন কেমব্রিজে। সেখানে কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্র ও শিক্ষক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলেন।

ধর্মের ক্লাসে তিনি যোগ দিতেন না। অনেক শাসানিতেও কাজ হয়নি। শেষপর্যন্ত ধর্মের পরীক্ষা বয়কট করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হলেন।

ইংলন্ডের ধর্মব্যাপারের গোঁড়ামির কথা বিবেচনা করে ক্যাভেণ্ডিসের বাবা তাঁকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিলেন।

উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থান প্যারিসে ধর্ম নিয়ে অতটা কড়াকড়ি ছিল না। ক্যাভেণ্ডিস সেখানে বিজ্ঞানের আধুনিক পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলেন।

বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের পর ক্যাভেণ্ডিসের যুক্তিবাদী মন আরও পরিপক্ক হল। তিনি পুরোপুরি ধর্ম বিরোধী হয়ে উঠলেন।

ক্যাভেণ্ডিস তাঁর এই বিজ্ঞানমনস্কতা লাভ করেছিলেন পিতার কাছ থেকে। বাবা চার্লস ক্যাভেণ্ডিস ছিলেন সখের বিজ্ঞানী। এবিষয়ে তিনি নিয়মিত পড়াশুনা করতেন।

রয়াল সোসাইটিতে যাতায়াতের সূত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর সঙ্গেও ওঠাবসা ছিল তাঁর। সোসাইটির বিভিন্ন বক্তৃতা ও প্রদর্শনীতেও উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করতেন।

প্রাসাদে নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটা ছোটখাট ল্যাবরেটরিও তৈরি করে নিয়েছিলেন।

ছেলেবেলায় ক্যাভেণ্ডিস কাছাকাছি থেকে বাবার কাজকর্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখতেন। বিজ্ঞান বিষয়ের নানান গল্পও শুনতেন। বাবার ল্যাবরেটারি তাঁর নাগালের মধ্যেই ছিল সবসময়।

প্যারিস থেকে ফিরে এসে বাবার ল্যাবরেটরিতেই নিজের মত করে গবেষণা আরম্ভ করলেন ক্যাভেণ্ডিস।

সেইযুগে রসায়ন বিজ্ঞানে ফ্লোজিস্টন তত্ত্ব নিয়ে খুব আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, সমস্ত দহনশীল বস্তুতেই ফ্লেজিস্টন নামক পদার্থ বর্তমান থাকে—তার সাহয্যেই দহনকার্য সম্পন্ন হয়।

দাহ্যবস্তুতে ফ্লোজিস্টন থাকা পর্যন্তই দহনকার্য চলে, ফ্লেজিস্টন নিঃশেষ হয়ে গেলে দহনও বন্ধ হয়ে যাবে।

যদি কোন বস্তুতে ফ্লোজিস্টননা থাকে তাহলে সেই বস্তুর দহন সম্ভব হবে না। বিষয়টি ধারণা এবং প্রচার করলেও বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা দ্বারা কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি।

ফলে বস্তুর দহন ক্রিয়ার ওপরে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর নানা অভিমত ক্রমশই বিষয়টাকে জটিল করে তুলছিল।

ক্যাভেণ্ডিস স্থির করলেন, এবিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করবেন। প্রথমে তিনি দাহ্য বস্তুর শরীর থেকে ফ্লোজিস্টনকে আলাদা করবার জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করলেন।

একদিন সালফিউরিক অ্যাসিডকে দস্তার সঙ্গে মিশিয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন দুটি পদার্থ মিশতেই কিরকম একটা গ্যাস বেরতে আরম্ভ করল।

এরপর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকেও একইভাবে দস্তার সঙ্গে মেশালেন। প্রতিক্রিয়াও হল একই—ভুরভুর করে গ্যাস বেরিয়ে এল।

পরে পরীক্ষা করে ক্যাভেণ্ডিস দেখলেন দুটি পরীক্ষাতে যে গ্যাস উৎপন্ন হল তা একই। সেই গ্যাসকে নিয়ে বসলেন পরীক্ষায়।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করলেন। সেই গ্যাসকে আগুনের কাছাকাছি নিয়ে এলেই নীল শিখা বিস্তার করে জ্বলে উঠছে। তিনি লক্ষ করলেন গ্যাসটি বাতাসের চেয়ে হাল্কা।

এর পরে তিনি হাইড্রোক্লোরিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে লোহা ও টিন-এর বিক্রিয়া ঘটিয়েও দেখলেন একই গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে।

এইভাবে দিনের পর দিন পরীক্ষা করার পর ক্যাভেণ্ডিস সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে এই উদ্বায়ী গ্যাসই ফ্লোজিস্টন।

ক্যাভেণ্ডিস এরপর তাঁর ফ্লোজিস্টন গ্যাস আবিষ্কারের বর্ণনা দিয়ে প্রবন্ধ লিখে রয়াল সোসাইটিতে পাঠালেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন বিজ্ঞান সবে চোখ মেলতে শুরু করেছে, সেই সময়ে বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনকার মত এত স্পষ্ট ছিল না। তাই ক্যাভেণ্ডিসের আবিষ্কার করা ফ্লোজিস্টন গ্যাসটি যে আসলে হাইড্রোজেন গ্যাস তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি।

অনেক পরে এই ফ্লোজিস্টন গ্যাসকে হাইড্রোজেন গ্যাস বলে চিহ্নিত করেছিলেন ফরাসী রসায়ন বিজ্ঞানী আতেঁ ল্যাভয়সিয়ার। নামটিও তাঁরই দেওয়া।

ক্যাভেণ্ডিসের আবিষ্কৃত ফ্লোজিস্টন গ্যাস নিয়ে তৎকালীন সময়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ মানুষও খুবই উৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। এক উৎসাহী একটা কাগজের খোলায় এই গ্যাস পুরে মুখ বন্ধ করে ছেড়ে দিয়েছিল। চোখের পলকে সেই গ্যাসভর্তি খোলাটা সকলকে চমকে দিয়ে দূর আকাশে মিলিয়ে গেল।

ফ্লোজিস্টনকে নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড হতে লাগল চারদিকে। একজন কিছুটা গ্যাস মুখে নিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতির ওপরে ছাড়তেই দাউদাউ করে শূন্যে আগুন জ্বলে উঠল। দেখা গেল একটা আগুনের স্রোত যেন লোকটির মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে।

ক্যাভেণ্ডিসের উপস্থিতিতেই একবার একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটল। দর্শকঠাসা একটা হলঘরে একজন যাদুকর ফ্লোজিস্টন গ্যাসের নানা কারিকুরি দেখাচ্ছিলেন। একসময় তিনি একটা গ্যাসজারে ফ্লোজিস্টন গ্যাস ঢোকালেন। তারপর যেই একটু বাতাস গ্যাসজারে ঢোকান হল অমনি আকাশফাটান বিস্ফোরণের শব্দ উঠে দর্শকদের আতঙ্কিত করে তুলল।

এই বিস্ফোরণের সময় ক্যাভেণ্ডিস লক্ষ্য করেছিলেন, গ্যাসজারের গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমে আছে। এই জল বিন্দুই তাঁকে ভাবিত করে তুলল।

এই জল এল কোথা থেকে—এই প্রশ্ন মাথায় নিয়েই তিনি আবার গবেষণায় বসলেন।

তিনি একটা কাচের গোলাকে ম্যাজিশিয়ানের মত প্রথমে ফ্লোজিস্টন পরে ফ্লোজিস্টন-হীন বাতাস ঢোকালেন।

যথারীতি প্রচন্ড শব্দ হল এবং গোলকের ভেতরের দেয়ালে জলকণাও পাওয়া গেল।

ক্যাভেণ্ডিস জিবে ঠেকিয়ে বুঝতে পারলেন, স্বাদহীন বিশুদ্ধ জল ছাড়া আর কিছু নয়। ওজনের পরীক্ষা নিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। তরলটি জল ছাড়া কিছু নয়। তিনি তাঁর নোটে লিখলেন, ওই ফ্লোজিস্টন (দাহ্য বাতাস) আর বাতাসে যে গ্যাসটির এক পঞ্চমাংশ বর্তমান, দুয়ের সংযোগেই জলকণার সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই জলকণা যে বিশুদ্ধ জল তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ফ্লোজিস্টন যে একটি মৌল এবং এই মৌলই অন্যান্য মৌলের উৎস স্বরূপ এই সিদ্ধান্তের কথাও ক্যাভেণ্ডিস পরে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন।

ফ্লোজিস্টন তথা হাইড্রোজেন গ্যাসের আবিষ্কার রসায়ন বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী ঘটনা।

বিশ্ব বিজ্ঞানের ইতিহাসকে এই একটি আবিষ্কারের দ্বারাই ক্যাভেণ্ডিস নানাভাবে সমৃদ্ধি দান করেছিলেন।

এর পরেও বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন ক্যাভেণ্ডিস। তাঁর অবদানগুলিও স্মরণীয়। তার মধ্যে রয়েছে, নাইট্রোজেন গ্যাস আবিষ্কার, পৃথিবীর নির্ভুল ঘনত্ব নির্ণয়।

এছাড়াও স্থির তড়িৎ বিজ্ঞান, তাপ ও তড়িৎ নিয়ে তাঁর গবেষণা সম্ভাবনাময় দিগনির্দেশ করেছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ জুড়ে খ্যাতিও লাভ করেছেন ক্যাভেণ্ডিস। কিন্তু তিনি সবসময়েই নিজেকে একান্তে জনসমাজের বাইরেই রেখেছেন।

কেবলমাত্র বিজ্ঞানকে সঙ্গী করে বলা যায় একরকম নির্বাসিতের জীবনই যাপন করেছেন তিনি।

পিতার মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তির অধিকার লাভ করেছিলেন তিনি। কিন্তু ঐশ্বর্য তাঁর জীবনযাত্রাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর জীবন ছিল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত।

তিনি আমৃত্যু তিনটি বিষয়কে সভয়ে এড়িয়ে চলতেন। সেগুলো হল—অর্থ, সাফল্য আর লোকসঙ্গ।

অথচ তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী দেশের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি। অর্থ-বিত্ত লাভ করেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে।

বিজ্ঞান-চর্চার সূত্রে যশ এসেছিল অযাচিত ভাবে। আর তারই সূত্রে বিপুলভাবে জনসম্বর্ধনার সুযোগও।

এই সবকিছুর মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন একজন নিস্পৃহ নিবাসক্ত দার্শনিক।

নিজের গবেষণা ঘরটিই ছিল তাঁর পৃথিবী। স্বেচ্ছায় এই নির্বাসিতের জীবন বেছে নিয়েছিলেন তিনি।

আর এভাবেই একদিন ১৮১০ খ্রিঃ নিঃশব্দে মৃত্যুর শীতল কোলে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

মৃত্যুর পর ক্যাভেণ্ডিসের বিপুল অর্থের সঞ্চয় দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল ব্রিটেনের সুবিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবরেটরি।

এখনো পর্যন্ত এই পীঠস্থান বহু তরুণ বিজ্ঞানীর নিবিড় বিজ্ঞান-সাধনার স্থল হয়ে রয়েছে।

এডওয়ার্ড জেনার



একসময় গুটি বসন্ত ছিল গোটা পৃথিবীর আতঙ্ক। প্রতি বছরই পৃথিবীর নানা প্রান্তে হাজার হাজার মানুষ এই রোগের আক্রমণে প্রাণ হারাত।

কোন প্রতিষেধক ছিল না বলে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের নীরব দর্শক হয়ে মানুষের এই নিদারুণ বিদায়যাত্রা দেখা ছাড়া উপায় ছিল না।

ভারতের মত দেশেও আজ এই মহামারী রোগ নিশ্চিহ্ন। এই রোগের সন্ধান- কারীকেহাজার টাকা পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করেও আজ একজনও দাবিদারকে পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর মাটি থেকেই গুটি বসন্তকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ গুটিবসন্তের প্রকোপে ছারখার হয়েছে।

১৬১৪ খ্রিঃ গুটি বসন্তের বীভৎস আক্রমণে ইউরোপের জনসংখ্যার এক দশমাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

১৬৬৬ খ্রিঃ থেকে ১৬৭৫ খ্রিঃ মধ্যে টানা ন বছর ধরে ইংল্যান্ডে এই দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে লোক দেশ ছেড়ে পালাবার অবস্থায় চলে এসেছিল।

ডাক্তার চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন বটে, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও গুটি বসন্তের আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করবার কোন উপায় করতে পারেননি।

ইতিহাস থেকে জানা যায় ৯০০ খ্রিঃ পারস্যের চিকিৎসকরা কেবল বুঝতে পেরেছিলেন যে হাম ও গুটি বসন্ত সম্পূর্ণ আলাদা দুটি রোগ। কিন্তু তার কোন প্রতিষেধকের কথা তাঁরা বলে যেতে পারেন নি।

১৭১৭ খ্রিঃ চিনদেশে সর্বপ্রথম গুটি বসন্তের প্রতিষেধক হিসেবে টিকাদান রীতি প্রচলিত হয়েছিল। পরে এই পদ্ধতি ইংলন্ডে প্রচারিত হয়েছিল।

এখন টিকা বলতে আমরা যা বুঝি সেকালে তেমন উন্নত ব্যবস্থা যে ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

আক্রান্ত রুগীর চামড়া কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঁচড়ে সেখানে গুটি বসন্তের গুটিরসে ভেজা সুতো তাগার মত করে বেঁধে দেওয়া হত।

এই ব্যবস্থায় ভাল ফল পাওয়া যেত ক্বচিৎ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগাক্রান্ত রোগীর রোগভোগে মৃত্যু ঘটত। শেষ পর্যন্ত ওই চৈনিক টিকা বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

সেই যুগে অনেক প্রতিভাবান চিকিৎসকই গুটিবসন্তের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে যিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন তাঁর নাম এডওয়ার্ড জেনার। তাঁর আবিষ্কৃত প্রতিষেধক মানবজাতিকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে।

মানব ইতিহাসের পরম ত্রাণকর্তা রূপে তিনি মানবজাতির চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রয়েছেন।

জেনারের জন্ম ১৭৪৯ খ্রিঃ ১৭ই মে ইংলন্ডের বার্কলে শহরে। তাঁর বাবা ছিলেন গ্লসেস টারশায়ার শহরের সামান্য এক পাদ্রী।

শৈশবে শহরের স্কুলেই লেখাপড়া শিখেছিলেন জেনার। তারপর এক অস্ত্রচিকিৎসকের কাছে শিক্ষানবীশের কাজে ঢোকেন।

কিছুদিন কাজ করবার পরই ডাক্তারী শাস্ত্রের প্রতি জেনারের আগ্রহ লক্ষ্য করে বিস্মিত হন সেই চিকিৎসক। তিনি যে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। জেনারের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে বিস্তারিত জানিয়ে জেনারকে পাঠালেন ইংলন্ডের প্রখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ও জীবাণুতাত্ত্বিক ডাক্তার জন হান্টারের কাছে।

তখন জেনারের বয়স একুশ। সময়টা ১৭৭০ খ্রিঃ।

অসাধারণ চিকিৎসক ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে হান্টার সুপরিচিত ছিলেন। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের ওপরেই তাঁর ছিল অগাধ পান্ডিত্য। জেনারকে চিনতে তাঁর ভুল হল না।

নতুন প্রতিভাকে সাদরে স্বাগত জানালেন। নিজের কাজের সঙ্গে সানন্দে যুক্ত করে নিলেন জেনারকে।

ডাঃ হান্টারের সঙ্গে থাকতে থাকতেই ডাক্তারী পড়া শুরু করেন। ভূ-বিজ্ঞান, অরনিয়োলজি বা পক্ষিবিজ্ঞান, ঈলের জীবনচক্র, শজারুর শারীরবৃত্ত ও তাপমাত্রা ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষালাভ করেন।

জেনারের লেখাপড়া, থাকা-খাওয়ার যাবতীয় খরচ ডাঃ হান্টারই বহন করতেন। হাত খরচের জন্য জেনারকে একটা পার্টটাইম কাজও জুটিয়ে দিয়েছিলেন ডাঃ হান্টার।

স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস বলে একজন অভিজাত শৌখিন ব্যক্তি সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের একটা সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি একটা বিশাল সংগ্রহ যোগাড় করেছিলেন ১৭৭৬ খ্রিঃ ক্যাপ্টেন কুকের সমুদ্র যাত্রা থেকে।

জেনার এই সংগ্রহশালাতেই কাজ পেয়েছিলেন। তাঁর কাজ ছিল সমস্ত নমুনা বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা।

কাজটা এমনই কৌতুহলদ্দীপক ছিল আর জেমস মনেপ্রাণে মজে গিয়েছিলেন যে তিনি একসময় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন সব ছেড়েছুড়ে ক্যাপ্টেন কুকের দ্বিতীয় সমুদ্র যাত্রার সঙ্গী হয়ে বেরিয়ে পড়বেন।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর এই চিন্তা কোন অজ্ঞাত কারণে আর কার্যকরী করা হয়ে ওঠেনি। ধৈর্য ধরে ডাক্তারী শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন।

মানবজাতির পরম সৌভাগ্য যে জেনার ডাক্তারি ছেড়ে অন্যদিকে যাননি। তাহলে গুটি বসন্তের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য আমাদের আরও কত যুগ অপেক্ষা করতে হত কে জানে?

এতদিনে গোটা পৃথিবীর আরো কত অসংখ্য প্রাণ অকালে ঝরে যেত, তা ভাবলেও আতঙ্কিত হতে হয়।

ডাক্তারী পড়া শেষ করে জেনার একসময়ে ফিরে এলেন নিজের বার্কলে শহরে। একটা ডিসপেনসারি খুলে রোগীদেখার কাজও আরম্ভ করলেন।

সেই সময়ে গো-বসন্তের প্রকোপও কিছু কম ছিল না। এইজন্য গোয়ালাদের খুবই দুর্ভোগ ভুগতে হত। ডাক্তারিতে নেমে এই গো-বসন্ত নিরাময়ের ডাক পেলেন জেনার।

গরুর চিকিৎসা করতে গিয়ে একটা অদ্ভুত বিষয় নজরে পড়ল জেনারের। গো-বসন্ত গাভীর বাঁট থেকে গোয়ালার হাতে ছড়িয়ে পড়ত। ফলে অনেক গোয়ালা ও গোয়ালিনীর শরীরেও বসন্তের ব্রন কয়েকদিন বাদেই দেখা দিত। আশ্চর্যের বিষয় এ নিয়ে বিশেষ ভুগতে হত না তাদের। কিছুদিন পরে একসময়ে সেই ব্রন মিলিয়েও যেত।

সেযুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানীর এই ব্যাপারটা সকলেই জানতেন। কিন্তু এ নিয়ে তাঁদের মনে কখনো কোন প্রশ্ন দেখা দেয়নি। জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেনের ডাক্তাররাও কখনো এর মধ্যে নতুন কিছু দেখতে পাননি। জেনার কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়েই গভীর ভাবনায় পড়ে গেলেন।

জেনার এবার অনুসন্ধানে নামলেন। গোয়ালাদের পাড়ায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে চমকপ্রদ এক তথ্য আবিষ্কার করলেন।

এক গোয়ালিনী জানালেন গাভীর বাঁট ঘেঁটে যাদের শরীরের অন্যস্থানে গোবসন্তের ফুসকুরি দেখা দিয়েছে, তারা গুটিবসন্তের রুগীদের শুশ্রূষা করেও গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়নি।

এমন ঘটনার কারণ খুঁজতে গিয়ে ১৭৭৫ খ্রিঃ জেনার গো ও গুটি বসন্তের যোগসূত্র আবিষ্কার করে ফেলেন।

বুঝতে পারেন গো-বসন্ত ঘাঁটা গোয়ালাদের শরীরে গুটিবসন্তের প্রতিরোধশক্তি গড়ে ওঠে যে কোন কারণেই হোক।

চলল এরপরে গবেষণা। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল।

গবেষণার এক পর্যায়ে জেনার বুঝতে পারেন, গো-বসন্তের ফুসকুড়ি শরীরে উঠলেই যে গুটিবসন্তের প্রতিরোধশক্তি গড়ে উঠবে তেমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ গো-বসন্ত দু ধরনের।

এক ধরনের গো-বসন্ত মানব শরীরে গুটি বসন্তকে প্রতিরোধ করতে পারে। অন্য ধরনের গো-বসন্তের সেই ক্ষমতা থাকে না।

আবার প্রথম ধরনের গো-বসন্তের জীবাণু শরীরে যখন তখন কাজ করে না। গরুর বসন্ত হবার পর একটা নির্দিষ্ট সময়ে গোবীজে গুটি বসন্তের প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হয়।

এইভাবে বিন্দু বিন্দু করে এগিয়ে দীর্ঘ একুশ বছর কেটে গেল গবেষণার মধ্যে। শেষ পর্যন্ত জেনার সফল হলেন। এবার তৈরি হলেন কোন মানবশরীরে তাঁর সাধনার সার্থকতার প্রমাণ দেখার জন্য।

১৭৯৬ খ্রিঃ ১লা জুলাই দিনটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সারা নেলসেস নামের এক গোয়ালিনী মানবকল্যাণের হিত কামনায় নিজের আটবছরের ছেলে জেমস ফিপসকে ওইদিন জেনারের কাছে নিয়ে এলেন। ছেলের ওপরেই পরীক্ষা চালাবার অনুমতি দিলেন। জেনার ব্যর্থ হলে গুটিবসন্তের আক্রমণে ছেলেটি মারা যাবে একথা জেনেও।

অভিভূত জেনার গো-বসন্তের প্রথম ধরনের গুটি থেকে নির্দিষ্ট সময়ে পুঁজরস সংগ্রহ করে ফিপসের শরীরে টিকা দিলেন।

টিকা দেবার সাতচল্লিশ দিনের মাথায় পুনরায় ফিপসের শরীরে গুটিবসন্তের মারাত্মক পুঁজ ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

নেলসেস ও জেনার আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তায় প্রহর গুণতে লাগলেন। কিন্তু দেখা গেল ফিপস নিরাপদেই রইল। তার শরীরে গুটিবসন্তের আক্রমণ ঘটল না।

বেশ কিছুদিন নিজের তত্ত্বাবধানে ফিপসকে রেখে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হলেন জেনার।

এরপর পরপর ২৩ জন গুটি বসন্তের রোগীকে জেনার তাঁর আবিষ্কৃত টিকা প্রয়োগ করে সারিয়ে তুললেন।

১৭৯৮ খ্রিঃ জেনার পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাঁর গুটিবসন্তের টিকা আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন।

চারটি ছবি সহ একটি বই প্রকাশ করলেন, নাম দিলেন Inquiry into the causes and effects of variance vaccinae।

এই বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে মানব ইতিহাসের পাতায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

গোড়ার দিকে গো-বীজের কার্যকারিতা নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহের ভাব থাকলেও যখন দেখা গেল কাতারে কাতারে গুটি বসন্তের রুগী নিরাময় হয়ে যাচ্ছে, তখন সকল ভয় দূর হল। চতুর্দিকে জেনারের জয়জয়কার ঘোষিত হল।

প্রথমে ইংলন্ডে তারপরে সমগ্র ইউরোপ ও সারা বিশ্বে জেনারের গো-বীজ টিকাদান পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে গেল।

আবিষ্কারের প্রথম দেড় বছরে কেবল ইংলণ্ডেই বারো হাজার মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছিল। একবছরের মধ্যে গুটিবসন্তে মৃতের সংখ্যা ২০১৮ থেকে ৬২২ সংখ্যায় নেমে এল।

সাধারণ এক পাদ্রির ছেলে নিজের শ্রম, নিষ্ঠা, সাধনা ও মানবহিতৈষণার গুণে বরণীয় মানবপ্রেমিক রূপে বিশ্ববন্দিত হলেন।

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দেই ইংলন্ডে প্রতিষ্ঠিত হল রয়াল জেনারিয়ান সোসাইটি। গোটা বিশ্ব থেকে গুটিবসন্তের অভিশাপ দূর করার ব্রত নিয়েই গঠিত হল এই সংস্থা। তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় আজ পৃথিবী থেকে গুটিবসন্তের ভয় চিরতরে দূর হয়েছে।

১৮২৩ খ্রিঃ ৭৫ বছর বয়সে জেনারের মহাজীবনের অবসান ঘটে।

গ্যাব্রিয়েল ডানিয়েল ফারেনহাইট

জ্বরজারির দৌলতে থার্মোমিটারের সঙ্গে আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় রয়েছে। আমাদের দেহের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য যে কাচের নলটি ব্যবহার করে থাকি সেটিই থার্মোমিটার।

বলে বোঝাবার দরকার নেই যে এই থার্মোমিটারের গায়ে কিছু দাগ কাটা থাকে। যে স্কেল অনুসারে এই দাগগুলো দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানী ফারেনহাইট হলেন সেই স্কেলের উদ্ভাবক।

যে তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হয়ে যায় তাকে বলে হিমাঙ্ক। আর যে তাপমাত্রায় জল উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পে পরিণত হয় তা হল স্ফুটনাঙ্ক। এখন হিমাঙ্ককে ৩২ ডিগ্রি এবং স্ফুটনাঙ্ককে ২১২ ডিগ্রি ধরে দুয়ের মাঝখানের দূরত্বকে মোট ১৮০ সমানভাগে ভাগ করে তাপমাত্রার একটি স্কেল উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করেছিলেন ফারেনহাইট।

ডাক্তারী থার্মোমিটারে এই স্কেল অনুসারেই দাগ কাটা হয়। উদ্ভাবকের নামেই স্কেলটির নামকরণ করা হয়েছে ফারেনহাইট স্কেল।

সম্পূর্ণ নাম গ্যাব্রিয়েল ডানিয়েল ফারেনহাইট। তিনি ১৬৮৬ খ্রিঃ ১৪ই মে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। ছেলেকেও ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গেই ব্যবসায় নিয়ে আসবেন, নিশ্চয় এমন ইচ্ছা তাঁর ছিল। তিনি ছেলেকে ধীরে ধীরে ব্যবসায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু হতাশ হয়েছিলেন ছেলের ব্যবহারে।

ফারেনহাইটের ব্যবসায়ের প্রতি আদৌ কোন আকর্ষণ ছিল না। তিনি লেখাপড়া করতেই ভালবাসতেন। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ।

কি করে কি হয়, কেন হয় এসব অনুসন্ধিৎসু প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন বিষয় তাঁর মাথায় ঘুরে বেড়াত।

ছেলের প্রবণতা বুঝতে পেরে পিতা কোন রকম বিরুদ্ধাচরণ করলেন না। তিনি পুত্রের বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দিলেন।

স্কুল ও কলেজের পড়া বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন করলেন ফারেনহাইট। নিযুক্ত হলেন গবেষণা কার্যে।

এই সময় উন্নততর গবেষণার জন্য তিনি প্রথমে ইংলন্ড ও পরে হল্যান্ড যান। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত হন।

সেই সময় দেহের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য যে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হত তাতে পারদ ব্যবহার করবার রীতি তখনো পর্যন্ত প্রচলিত হয়নি।

থার্মোমিটারে সেই সময় তরল হিসেবে ব্যবহার করা হত অ্যালকোহল। তাতে নানাধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। ফারেনহাইট স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারলেন থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে কিছু কাজ করবার মত সুযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন দেশ ঘুরে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে শুরু করলেন গবেষণা। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি থার্মোমিটারে অ্যালকোহলের পরিবর্তে পারদ ব্যবহারের সুবিধা অনেক বেশি বুঝতে পারলেন।

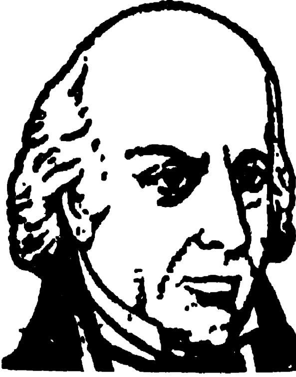
১৭১৪ খ্রিঃ তিনি থার্মোমিটারে পারদের ব্যবহার প্রবর্তন করলেন। সেই রীতি এখনও অপরিবর্তিতই রয়েছে।

ফারেনহাইটের অপর গুরুত্ব পূর্ণ কাজ হল হাইগ্রোমিটার নামক যন্ত্রের উন্নতিসাধন। এছাড়া তাঁর আরও কিছু অবদান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রয়েছে।

সারাজীবনই তিনি বিজ্ঞানের নানাবিধ গবেষণার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর কাজের কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ লন্ডনের রয়াল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচন করেছিলেন।

১৭৩৬ খ্রিঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর ফারেনহাইট হল্যান্ডে দেহত্যাগ করেন।

হ্যানিম্যান



সম্পূর্ণ নাম স্যামুয়েল ক্রিস্টিয়ান ফ্রেডরিক হ্যানিম্যান। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির জনক রূপেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতি আজও দেশে দেশে প্রচলিত।

জার্মানির অন্তর্গত সাক্সলি প্রদেশে ১৭৫৫ খ্রিঃ ১০ই এপ্রিল এক হতদরিদ্র পরিবারে ডাঃ হ্যানিম্যান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে অশেষ দারিদ্র্যের মধ্যে।

বাবা খ্রিস্টান গটফ্রেড হ্যানিম্যান ছিলেন এক গরীব শিল্পী। নুন আনতে পান্তা ফুরায় সংসারের এমনই অবস্থা। ডাঃ হ্যানিম্যান ছিলেন পিতার তৃতীয় সন্তান। সুখ বা স্বচ্ছলতা তাঁর কাছে ছিল স্বপ্নের মতো।

বেশির ভাগ দিনই হ্যানিম্যান পরিবারের সকলকে খিদে মেটাতে হতো মাত্র একটা রুটি সম্বল করে।

অর্থের অভাবে ভাল স্কুলে পর্যন্ত ভর্তি হতে পারেননি তিনি। স্কুলে যাবার একমাত্র পোশাকটি ময়লা হলেও সাবান কেনার সামর্থ্য হত না। আলু দিয়ে পরিষ্কার করে নিতেন নিজের পোশাক।

কিন্তু কঠোর দারিদ্র্য তাঁর প্রতিভাকে ঢেকে রাখতে পারেনি। একাগ্রতা, নিষ্ঠা আর ঐকান্তিক ইচ্ছার বলে তিনি প্রখর রৌদ্রের মত উদ্ভাসিত হয়েছেন। জীবিতকালেই স্যামুয়েল হ্যানিম্যান একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন।

কোনক্রমে লিপজিগ বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করেছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যয়নের ইচ্ছা নিয়ে চলে এলেন ভিয়েনা।

বাবার পাঠানো সামান্য অর্থই ছিল ভরসা। কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। ফলে বাধ্য হয়েই একসময় পড়াশুনো বন্ধ করে চাকরির সন্ধানে নেমে পড়লেন।

দিনের পর দিন উদভ্রান্তের মত ঘুরলেন পথে পথে। দৈবক্রমেই এইসময় একদিন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল ট্রানসিলভানিয়ার গভর্নরের সঙ্গে।

আলাপ করে গভর্নর ভদ্রলোক হ্যানিম্যানের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। তাঁকে পরিবারের গৃহচিকিৎসক রূপে নিয়োগ করলেন।

ভাগ্যের চাকা এত দিনে ঘুরতে শুরু করল উল্টো মুখে। ট্রানসিলভানিয়ার সেই গভর্নরের বাড়িতে ছিল একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। বহু মূল্যবান পুস্তক সেই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল।

গভর্নর নিজেও ছিলেন শিক্ষানুরাগী। হ্যানিম্যানের আগ্রহ লক্ষ করে তিনি তাঁকে গ্রন্থাগারে পড়াশুনো করবার অনুমতি দিলেন। কেবল তাই নয় গ্রন্থাগারটি রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত দায়িত্বই তাকে অর্পণ করলেন।

বাল্যকাল থেকেই পড়াশুনোর আগ্রহ ছিল প্রবল, কিন্তু কখনো সুযোগ পাননি তেমন। হ্যানিম্যান এবার মনের আনন্দে বই-এর জগতে ডুব দিলেন।

মেধা ছিল অসাধারণ। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের চিন্তাশীল লেখকদের লেখা পড়বার আগ্রহে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হ্যানিম্যান পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি ভাষা শিখে ফেললেন।

তারপর চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ের ওপরে লেখা যত বই পেলেন পড়তে শুরু করলেন। কিছুকাল পরেই মেতে উঠলেন আনুষঙ্গিক আর একটি বিষয় নিয়ে, তা হল চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা।

এবারে পথ খুঁজে পেয়ে গেলেন হ্যানিম্যান। স্থির করলেন তিনি নতুন ধরনের একটি চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করবেন। একদিন সুযোগ বুঝে মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন গভর্নর সাহেবকে। বিদ্যানুরাগী সাহেবটি তাতে খুশি হলেন এবং হ্যানিম্যানকে উৎসাহিত করলেন। নিজের উদ্যোগে তাঁর প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থাদিও করে দিলেন।

চিকিৎসা ব্যবসায় এবং গবেষণা, এবারে দুটি কাজ একই সঙ্গে করে চললেন হ্যানিম্যান। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর গবেষণার সাফল্যের কথা ছড়িয়ে পড়ল দেশে বিদেশে।

তাঁর গবেষণাবলীকে স্বাগত জানাল বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৭৭৯ খ্রিঃ এরলানগেল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এম.ডি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করল।

১৮৮২ খ্রিঃ বিয়ে করলেন হ্যানিম্যান। সেই বছরই ট্রানসিলভানিয়া ছেড়ে উন্নততর গবেষণার জন্য চলে এলেন ড্রেসডেন শহরে।

এখানে এসে পুরোপুরিভাবে গবেষণাতেই আত্মনিয়োগ করলেন।

গোড়ার দিকে হ্যানিম্যানের গবেষণার বিষয় ছিল কতগুলি ভেষজ এবং আর্সেনিক বা সেঁকোবিষ। তাঁর গবেষণার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করলেন। বিষয়ের অভিনবত্ব এবং গবেষণার ফলাফল দেশবিদেশের বিজ্ঞানীদের মুগ্ধ করল। ফলে হ্যানিম্যানের খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পেল।

দীর্ঘ গবেষণায় লিপ্ত রয়েছেন তিনি। ঘরসংসারের কথা ভুলে গিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান আর সংগ্রহ করেন নানা জাতের ভেষজ। চলে সেগুলো নিয়ে প্রয়োগ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

আহারনিদ্রার কথাও ভুলে গেলেন। অর্থের অভাবে সংসারে অনটন দেখা দিল। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। প্রয়োজনীয় ভেষজের সন্ধানে তাঁকে দেশ ছেড়ে

বিদেশেও ছুটতে হতো। যে কোন ভেষজই প্রয়োগের আগে নিজে খেয়ে গুণাগুণ পরীক্ষা করে নিতেন। এভাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে বহুবার সঙ্কটাপন্নও হতে হয়েছে।

একদিন পরীক্ষা করতে গিয়ে সিঙ্কোনা গাছের ছাল খেলেন।

সেই সময় চিকিৎসকরা সিঙ্কোনার ছাল ম্যালেরিয়া রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। সুস্থদেহে সেই ছাল খাওয়ার ফলে ম্যালেরিয়ার মত কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল তাঁর।

বিস্মিত হলেন হ্যানিম্যান। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝবার জন্য কয়েকজন বন্ধুর ওপরেও প্রয়োগ করলেন সিঙ্কোনার ছাল। দেখা গেল একই উপসর্গ নিয়ে তাঁরাও জ্বরে পড়লেন।

হ্যানিম্যান এবারে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে কোন রোগের প্রতিষেধক ভেষজকে সুস্থ দেহে প্রয়োগ করলে সেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

১৮১১ খ্রিঃ পর্যন্ত একাদিক্রমে তিনি তাঁর নতুন বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে গেছেন। অসংখ্য সুস্থ শরীরে জানা অজানা ভেষজ প্রয়োগ করেছেন আর তার ফলাফল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভেষজের প্রতিক্রিয়া ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করতেন হ্যানিম্যান। তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার বিবরণ একসময় প্রকাশ করলেন গ্রন্থাকারে। নাম দিলেন ল অব সিমিলারস।

এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য ছিল, যে কোন শক্তিশালী ওযুধ মানব শরীরে রোগের সৃষ্টি করে। ওষুধ যত শক্তিশালী হবে রোগ লক্ষণও শরীরে তত বেশি হবে।

দ্বিতীয়তঃ যে ওষুধ সুস্থদেহে রোগ উৎপন্ন করে ঠিক সেই ওষুধটির দ্বারাই সেই রোগ নিরাময় হয়।

রোগ নিরাময়ের জন্য অধিক মাত্রায় কোন ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। অতি সূক্ষ্মমাত্রায় ওষুধ ব্যবহার করে রোগ নির্ণয় যেমন সম্ভব, অল্প মাত্রায় ওষুধ ব্যবহার করিয়ে রোগীকে সম্পূর্ণরূপে সারিয়ে তোলাও তেমনি সম্ভব।

হ্যানিম্যান তাঁর উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতির নাম দিলেন হোমিওপ্যাথিক। এই চিকিৎসার নিয়মাবলীকে তিনটি ভাগে তিনি ভাগ করেছেন। তা হল—

(১) মানুষের শরীরে রোগলক্ষণ সৃষ্টিকারী সমমানের সূক্ষ্মমাত্রার ওষুধই রোগীকে নিরাময় করতে পারে (২) ওষুধকে যত সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করা যাবে ততই তার শক্তি বেড়ে গিয়ে রোগ নিরাময়ে অধিকতর সহায়ক হবে। (৩) আক্রমণকারী রোগগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হল—

(ক) নতুন রোগ বা অ্যাকিউট ডিজিজেস (খ) মহামারী বা এপিডেমিক ও (গ পুরাতন রোগ বা ক্রনিক ডিজিস।

এই নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির ওষুধ তৈরির মূল-উপাদান হচ্ছে প্রকৃতি। প্রকৃতিজাত খনিজ দ্রব্য। উদ্ভিদরাজ্য, জীবজগৎ এবং রোগ-জীবাণু থেকে ওষুধ-শক্তি তৈরি করা হয়ে থাকে।

হ্যানিম্যানের রোগ আরোগ্যের নিয়মাবলী বা ল অব কিওরস হল (১) রোগ আরোগ্যের লক্ষণ ভেতর থেকে বাইরে প্রকাশ পাবে (২) রোগলক্ষণ ওপর থেকে নিচে আসবে (৩) আরোগ্যের গতিপথ সবসময়ই আক্রমণের গতিপথের বিপরীত হবে।

হ্যানিম্যান নিজের উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতিকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করবার উদ্দেশ্যে ছোট ছোট পুস্তিকা প্রণয়ন করলেন। নিজের ছাত্রদেরও নিয়োগ করলেন প্রচারকার্যে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ে দুইটি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। সেগুলি হল অর্গানন অব মেডিসিন(১৮১০) ও মেটিরিয়ামেডিকা (১৮১১)। এই দুটি গ্রন্থেরই প্রণেতা হ্যানিম্যান। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থটি ল অব সিমিলারস এবং আরও কয়েকটি পুস্তিকার সম্মিলিত সঙ্কলন।

হ্যানিম্যান নিজে যে চিকিৎসা পদ্ধতির M.D ছিলেন তার নাম হলো অ্যালোপ্যাথি। এই নামটি তাঁরই দেওয়া। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক হয়েও তিনি হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন।

তিনিই প্রথম বলেন দেহের মনের জীবনীশক্তির (ইমিউনিটি) বিশৃঙ্খলাই ব্যাধি। সামান্য স্থানীয় ব্যাধি বলে যা ভাবা হয় তা আসলে দেহমনের অভ্যন্তরীণ বৈকল্যরই বহিঃপ্রকাশ। অতএব চিকিৎসা যদি করতেই হয় তবে তা যেন রোগের মূল ধরে করা হয়।

নিজের উদ্ভাবিত নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিকে প্রচলিত করতে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন হ্যানিম্যান। বিশেষতঃ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ তাঁর পদ্ধতিকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরাই হয়ে উঠলেন প্রবল প্রতিপক্ষ।

হ্যানিম্যান কিন্তু দমলেন না। অভিজ্ঞতার আলোয় ধৈর্যের সঙ্গে সব প্রতিকূলতার মোকাবিলা করেছেন। দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে তাঁর পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতে যথেষ্ট শ্রম তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে।

জনসাধারণকে উৎসাহিত করবার জন্য তিনি তরুণ শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং উপদেশ দান করে নানা স্থানে পাঠাতে লাগলেন। নিজেও আরম্ভ করলেন ব্যাপকভাবে চিকিৎসা।

তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। কিছু প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকও এই পদ্ধতির ফলাফল পরীক্ষা করে উৎসাহিত হলেন এবং নিজেরাই আরম্ভ করলেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

হ্যানিম্যানের জীবদ্দশাতেই পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ সাদরে গ্রহণ করল তাঁর প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতিকে। নানা দেশে গড়ে উঠেছিল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকেন্দ্র।

সেসব কেন্দ্র হ্যানিম্যান স্বয়ং পরিদর্শন করেছেন, দান করেছেন প্রয়োজনীয় উপদেশ নির্দেশ। বৃদ্ধবয়সেও একাজের জন্য বিভিন্ন দেশের আমন্ত্রণে তাঁকে ছোটাছুটি করতে হয়েছে।

কথায় আছে, প্রদীপের নিচেই থাকে অন্ধকার। হ্যানিম্যানের পদ্ধতি পৃথিবীর নানা প্রান্তে জনপ্রিয় হলেও তাঁর স্বদেশে তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

নানান প্রতিকূলতার বাধা অতিক্রম করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জনপ্রিয়তা আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ক্রমবর্ধমান।

জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর ১৮৪৩ খ্রিঃ ২রা জুলাই ৮৮ বছর বয়সে মহামতি হ্যানিম্যান ফ্রান্সে মৃত্যুবরণ করেন।

মাইকেল ফ্যারাডে



পৃথিবীব সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে মাইকেল ফ্যারাডে অন্যতম। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে মানবকল্যাণে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য।

ফ্যারাডের অক্লান্ত সাধনাকে ভিত্তি করে আবিষ্কৃত হয়েছিল ডায়নামো যা বিশ্বের শিল্পক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিল বিপ্লব। মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে যা হয়ে উঠেছিল এক নতুন দিগ্‌দর্শক স্বরূপ।

১৭৯১ খ্রিঃ ২২শে সেপ্টেম্বর ইংলন্ডের নেউইংটনে এক দরিদ্র কর্মকার পরিবারে জন্ম হয়েছিল এই অসাধারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর।

দারিদ্র্য উন্নতিকামী জীবনের সব সুযোগসুবিধা গ্রাস করে নেয়। আর্থিক অনটনের জন্য ফ্যারাডে বাল্যকালে স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। যেটুকু লেখাপড়া তা হয়েছিল বাড়িতে বাবা মায়ের কাছে।

প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে অর্থোপার্জনের জন্য চাকরি নিতে হয়েছিল এক বই-এর দোকানে। এখানে তাঁকে বই বিক্রি এবং বই বাঁধাই দুটি কাজই করতে হত।

পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ হলেও মনের তৃপ্তি নিয়েই তিনি করতেন। কেন না পছন্দমত বিষয়ের বই পড়ার সুযোগ ছিল এখানে।

যখনই সময় পেতেন, কখনো কখনো সারারাত জেগে তিনি বই পড়ে অতৃপ্ত মনের ক্ষুধা মেটাতে লাগলেন।

ফ্যারাডে বেশি আনন্দ পেতেন বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ের বইগুলি পড়ে। তিনি বুঝতে পারতেন এদিকেই তাঁর সহজাত আকর্ষণ। বিজ্ঞানের যে বই হাতে পেতেন তাই নিয়েই ডুবে যেতেন।

কিন্তু লেখাপড়া তো বেশি ছিল না। বিজ্ঞানের বেশিরভাগ তথ্যই তাই দুর্বোধ্য ঠেকত। বারবার পড়ে বুঝবার চেষ্টা করতেন। কোন বিষয় পরিষ্কার হয়ে যেত, কোন কোন বিষয় নিয়ে খুবই সমস্যায় পড়ে যেতেন।

তাঁর জানার আগ্রহ এমনই তীব্র ছিল যে এই দুর্বোধ্যতা মোচনেরও একটা পথ বার করে নিয়েছিলেন তিনি।

দোকানে বই কেনার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই সমাগম হত। তিনি তাঁদের অনুরোধ জানাতেন দুরূহ বিষয় বুঝিয়ে দেবার জন্য।

বালকের উৎসাহ এবং আগ্রহ লক্ষ্য করে সকলেই খুশি হতেন। সাধ্যমত অনেকেই চেষ্টা করতেন তাঁর অনুরোধ রক্ষার। এভাবেই চলতে লাগল দিনের পর দিন।

সেই সময়ে লন্ডনের রয়াল সোসাইটিতে প্রায়ই দেশবিদেশের বিজ্ঞানীরা বক্তৃতা করতে আসতেন।

প্রচুর জনসমাগম হত সেই বক্তৃতা শোনার জন্য। ফ্যারাডে সময় সুযোগ পেলেই এসে জুটতেন ভিড়ের মধ্যে।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি প্রায়ই রয়াল সোসাইটিতে বক্তৃতা করতেন। ফ্যারাডে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতেন তাঁর কথা। এই বিজ্ঞানীর বক্তৃতার দিনটিতে যে করে হোক তিনি উপস্থিত হতেন।

বক্তৃতা শুনতেন মনোযোগ দিয়েই, কিন্তু সব অংশই যে তিনি বুঝতে পারতেন তা নয়। তবে দুর্বোধ্য অংশগুলো বোঝার উদ্দেশ্যে তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না। বক্তৃতাগুলি কাগজে টুকে নিয়ে আসতেন হুবহু। ঘরে এসে রাতের পর রাত জেগে চিন্তা করে, কখনো ছোট ছোট পরীক্ষা করে বিষয়টা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করতেন।

সবসময়েই যে সফল হতেন তা নয়। কিন্তু নিরুৎসাহ হতেন না ফ্যারাডে। বরং তাঁর আগ্রহ দ্বিগুণ বেড়ে যেত।

অজানাকে জানার অত্যধিক আগ্রহবশেই একদিন প্রচন্ড দুঃসাহসী হয়ে উঠলেন ফ্যারাডে। কতগুলি পরীক্ষার ফল তাঁকে বুঝিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে ডেভিকে সরাসরি চিঠি লিখে বসলেন।

চিঠি পেয়ে ডেভি অবাক হলেও চিঠির লেখককে সাধারণ একজন দপ্তরী ভেবে অবজ্ঞা করলেন না। নিজের কাজে তাঁর ব্যস্ততার বিরাম নেই। তবু ফ্যারাডেকে ডেকে পাঠালেন।

ডেভি আর ফ্যারাডের সাক্ষাৎকার বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একজন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অপরজন এক বই-এর দোকানের অতি সাধারণ স্বল্প শিক্ষিত কর্মচারী। বিজ্ঞানের প্রতি অন্তরের আকর্ষণ এই দুই ব্যক্তিত্বকে সম্পর্কযুক্ত করল।

ডেভির ডাক পেয়ে মুহূর্ত বিলম্ব করলেন না ফ্যারাডে। পুনরায় তাঁর সমস্যার কথা খুলে জানালেন ডেভিকে।

তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেন ডেভি। জ্ঞানের গভীরতার সন্ধান পেয়ে চমৎকৃত না হয়ে পারলেন না।

ফ্যারাডের কৌতূহল চরিতার্থ করবার সুযোগ নিজেই করে দিলেন ডেভি। হ্যামফ্রে তাকে গ্রহণ করলেন তাঁর সহকারী রূপে। কেবল তাই নয় তাঁর প্রতিভা বিকাশের সবরকম ব্যবস্থা করে দিলেন।

কোন বিষয়ে ডেভি যখন গবেষণা করতেন, তিনি ফ্যারাডেকে পাশে রাখতেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে শিক্ষা দিতেন। বিদেশে যখন বক্তৃতা দিতে যেতেন ফ্যারাডেকে সঙ্গী করতেন।

ডেভির সাহচর্য ও ঐকান্তিক চেষ্টায় বিজ্ঞানী ফ্যারাডের জন্ম হল। রসায়ন বিজ্ঞান নিয়ে ডেভির সঙ্গে একসময় গবেষণা আরম্ভ করলেন।

পরে ১৮১৬ খ্রিঃ থেকে ডেভির উৎসাহে ফ্যারাডে স্বাধীনভাবে গবেষণা আরম্ভ করলেন।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী উরস্টেড ১৮২০ খ্রিঃ চুম্বক ও তড়িৎ প্রবাহ নিয়ে গবেষণা করলেন। তাঁর গবেষণার ব্যাখ্যা শুনে ফ্যারাডে তাড়িৎ-চুম্বক বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

১৮২৯ খ্রিঃ থেকে তিনি এবিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন। ১৮৩১ খ্রিঃ পর্যন্ত তিন বছর গবেষণা করার পর তিনি আবিষ্কার করলেন তড়িৎ চৌম্বক আবেশের নিয়মগুলি।

তিনি প্রমাণ করলেন একটি চুম্বক বা তড়িদ্বাহী বর্তনীর সাহায্যে অন্য একটি বর্তনীতে ক্ষণস্থায়ী তড়িৎচালক বল সৃষ্টি করা সম্ভব।

ফ্যারাডের এই আবিষ্কার তড়িৎ বিজ্ঞানে এক সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার সুত্রপাত ঘটাল। পরবর্তীকালে জেনারেটর, ট্রানসফরমার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় তড়িৎ-যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছে ফ্যারাডের সূত্র অনুসারেই।

এই আবিষ্কারই ফ্যারাডেকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান এনে দিল।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সংস্থা লন্ডনের রয়াল সোসাইটি ফ্যারাডেকে প্রথম সম্মান জানাল।

স্কুল কলেজের শিক্ষাবিহীন এক ব্যক্তি ফ্যারাডে, তিনি বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞান সংস্থার লেকচারার নিযুক্ত হলেন। এ এক অসাধারণ, অস্বাভাবিক বিরল ঘটনা সন্দেহ নেই।

ফ্যারাডের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল তরলের তড়িৎ বিশ্লেষণের নিয়মাবলী। তড়িৎ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলিও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের একটি নতুন দিকের প্রতি আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ফ্যারাডে।

তাঁর দ্বিতীয় আবিষ্কারের ফলে তড়িৎ রসায়নবিদ্যা নামক রসায়নের অপর একটি শাখা নিয়ে গবেষণার পথ উন্মুক্ত হল।

ফ্যারাডের আবিষ্কারের সংখ্যা বহুবিধ। তার মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রে অলোকের পরিবর্তন, ক্লোরিন গ্যাসকে তরলে রূপান্তরকরণ এবং বেনজিন নামক কার্বন ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগিক পদার্থ প্রভৃতি তিনটি আবিষ্কার ফ্যারাডে এফেক্ট নামে পরিচিত।

এই তিনটি আবিষ্কারের প্রত্যেকটির মধ্যেই নিহিত ছিল নতুন নতুন সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি।

চৌম্বকক্ষেত্রে আলোকের পরিবর্তন বিষয়ে পরীক্ষার ফলাফল ভিত্তি করেই ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন।

অতি সাধারণ অবস্থা থেকে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা বলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন ফ্যারাডে। তিনি ছিলেন সরল, উদার, নিরহঙ্কারী ও ধর্মভাবাপন্ন মানুষ।

অর্থ এবং সম্মানের বিষয়ে কোনদিনই লালায়িত ছিলেন না। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অতি সাধারণ অনাড়ম্বর।

তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ এতই প্রখর ছিল যে বৃদ্ধ বয়সে চরম অর্থসঙ্কটের সময়েও পেনসন গ্রহণ করতে সম্মত হননি।

অথচ তাঁরই আবিষ্কারের সুবাদে ইংলন্ড সেই সময় উপার্জন করছিল কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। শোনা যায়, সরকার প্রদত্ত নাইট উপাধিও তিনি সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

সর্বকালের সর্বযুগের বিজ্ঞানীদের আদর্শস্থল মাইকেল ফ্যারাডের কর্মময় জীবন। অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা একজন মানুষকে কোথায় পৌঁছে দিতে পারে তার উদাহরণ তিনিই।

স্কুলে কলেজে শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির বালাই নেই, কেবল ছিল জানার আগ্রহ আর নিষ্ঠা।

ঘরে বসে বই পড়ে আর ডেভির বক্তৃতা শুনেই তিনি জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন, বরণীয় হয়েছেন বিশ্বের বিজ্ঞান-সভায়।

১৮৬৭ খ্রিঃ ২৫শে আগষ্ট এই স্বয়ংসৃষ্ট মহান বিজ্ঞানীর জীবনাবসান হয়।

স্যার উইলিয়ম ক্রুকস

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ স্যার উইলিয়ম ক্রুকসের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তড়িৎমোক্ষণ নলের পরীক্ষা।

বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের জ্ঞাত ছিল গ্যাস কিংবা বায়ুকে নিম্নচাপে রেখে তার ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করলে গ্যাস অথবা বায়ুকে তড়িৎপরিবাহী করা যায়। কিন্তু পরীক্ষাক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল বায়ুর চাপ যত কমিয়ে আনা যায় ততই বায়ুর পরিবাহিতাও বৃদ্ধি পায়।

এই পরীক্ষাটি করা হত ৩০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও ৪ সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত চোঙাকৃতি একটি শক্ত কাঁচের নলে।

নলের দুপ্রান্তে দুটি ধাতব তড়িৎ-দ্বার সিল করে বন্ধ করে দেওয়া হত। নলের ভেতরে যে বায়ু থাকত তা বাইরে থেকে টেনে নেবার মত কেবল একটি ছিদ্র নলটিতে রাখা হত। এছাড়া বায়ু চলাচলের মত অপর কোন ছিদ্র থাকত না।

নলের দু প্রান্তের তড়িৎ-দ্বার দুটোর মাধ্যমে তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে এবং নলের ভেতরকার বায়ু সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশিত করে বিজ্ঞানীরা অদ্ভুত ফলাফল লক্ষ করতে লাগলেন। এই বিস্ময়কর ঘটনাগুলো ছিল এরকম ঃ

তড়িৎ-দ্বার যুক্ত নলদুটির আবেশকুন্ডলীর সঙ্গে গৌণকুন্ডলী যুক্ত করে উচ্চ তড়িৎবিভব প্রয়োগ করা হয়। যে তড়িৎ-দ্বারকে ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে যুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় ক্যাথোড।

ধনাত্মক মেরুর সঙ্গে যে তড়িৎ-দ্বারকে যুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় অ্যানোড। নলের ভেতরে তড়িৎমোক্ষণ শুরু করা হয় দশ হাজার থেকে পনের হাজার ভোল্ট বিভবপ্রভেদ প্রয়োগ করে।

এই অবস্থায় পাম্পের সাহায্যে নলের ভেতরের বায়ুকে পারদ চাপের ৮ মিলিমিটার পর্যন্ত নিয়ে এলে দেখা যায় বেগনী এবং নীল রঙের লম্বা স্ফুলিঙ্গ এক তড়িৎ-দ্বার থেকে অন্য তড়িৎ-দ্বারের দিকে ছুটছে।

নলের ভেতরের বায়ুর চাপ পাঁচ মিলিমিটার পারদ চাপের সমান করা হলে দুই তড়িৎ-দ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে একপ্রকার আলোক স্তম্ভ অধিকার করে নেয়, তার রঙ হয় গোলাপী।

বায়ুর চাপকে আরও কমিয়ে যখন দুই মিলিমিটার পারদ চাপের সমান করা হয় তখন দেখা যায় ধনাত্মক স্তম্ভগুলির মাঝখানে একটা অন্ধকার অঞ্চল ধরা পড়ে। এই অন্ধকার অঞ্চলটি আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে। সেকারণে তাঁর নামেই এর নামকরণ করা হয়েছিল ফ্যারাডের কৃষ্ণাঞ্চল বলে।

এর পরেও নলের মধ্যস্থিত বায়ুর চাপকে কমিয়ে বাড়িয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল কিন্তু ফলাফলে ইতরবিশেষ ঘটতে দেখা যায়নি।

কিন্তু এই পরীক্ষার ভিন্ন একটি ফলাফল লাভ করা সম্ভব হয়েছিল বিজ্ঞানী ক্রুকস-এর পক্ষে। তিনি নিজের তৈরি একটি যন্ত্রের সাহায্যে নলের মধ্যস্থিত বায়ুকে ০.১ মিলিমিটার পারদ চাপের সমান চাপে এনে আর একটি কৃষ্ণাঞ্চলের অবস্থান আবিষ্কার করেন।

নলের মধ্যস্থিত ০.১ বায়ুচাপে ধনাত্মক স্তম্ভগুলো ভেঙ্গে গিয়ে ছোট ছোট আলোর চাকতি সৃষ্টি হয়। অপর দিকে ঋণাত্মকরশ্মির বিচ্ছুরণ ক্যাথোডপাত থেকে সরে যায়। ফলে সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় একটি কৃষ্ণাঞ্চল। এই অঞ্চলটির নামকরণ পরবর্তীকালে করা হয় 'ক্রুকসের অন্ধকার অঞ্চল' আবিষ্কারকের নামে।

বিজ্ঞানীরা পরে ক্রুকসের পদ্ধতি প্রয়োগ করে নলের বায়ুর চাপকে ০.০১ মিলিমিটার পারদের সমান চাপে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সেই অবস্থায় ক্রুকসের অন্ধকার অঞ্চল গোটা নল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর ক্যাথোডের বিপরীত দিকে নলের কাচের দেয়াল আলোকিত হয়ে উঠেছিল হাল্কা সবুজ আলোতে।

এই আলোর কারণও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছিল যা প্রচন্ড বেগে কাচের দেয়ালের দিকে নির্গত হয়ে হাল্কা সবুজ আলোর দীপ্তি প্রকাশ করেছিল। বিজ্ঞানীরা এই আলোর নামকরণ করেছেন ক্যাথোড রশ্মি।

এই পরীক্ষার মাধ্যমেই ক্রুকস প্রমাণ করেছিলেন ক্যাথোড রশ্মি শক্তিযুক্ত এবং তার ভরবেগ বা মোমেন্টাম বর্তমান। এই রশ্মি পাতলা ধাতব পাতকে উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। এই থেকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন ক্যাথোড রশ্মি অণুর স্রোত ছাড়া কিছু নয়।

পরবর্তীকালে অবশ্য ক্রুকসের এই সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রুকস যে পরীক্ষাগুলো করেছিলেন বিজ্ঞানীদের কাছে সেগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ।

পরবর্তীকালে ক্রুকস আবিষ্কার করেছিলেন রেডিওমিটার নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র যা আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

ক্রুকস তড়িদ্বারযুক্ত নলের মধ্যস্থিত বায়ুকে নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য আবিষ্কার করেছিলেন একটি বায়ুনিষ্কাশন পাম্প।

ঐ পাম্পের সাহায্যে তিনি কোন বদ্ধ নলের মধ্যস্থ বায়ুর চাপকে কমিয়ে বায়ু চাপের দশ হাজার ভাগের এক ভাগে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর ফলে তড়িৎ মোক্ষণ নলের পরীক্ষার সমস্ত বাধা অপসারিত হয়েছিল।

যুগসন্ধিক্ষণের বিজ্ঞানী ক্রুকসের জন্ম হয়েছিল লন্ডনে ১৮৩২ খ্রিঃ ১৭জুন। অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁর জন্মগত। বিদ্যালয়ের শিক্ষার পর রসায়ন বিজ্ঞানের পাঠ নিয়েছিলেন রয়েল কলেজে।

কিছুকাল প্রসিদ্ধ গবেষক-অধ্যাপক হফ্‌ম্যানের অধীনে গবেষণা করেন। পরে রয়েল কলেজেই অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

রয়েল কলেজে পড়াশোনার সময় ক্রুকস অজৈব রসায়নের ওপরে গবেষণা করেন। থলিয়াম নামক একটি মৌলিক পদার্থ তাঁরই আবিষ্কার।

সোনা ও রূপাকে তাদের আকরিক থেকে পৃথক করার কোন সহজসাধ্য পদ্ধতি তাঁর সময়ে ছিল না। ফলে বিষয়টি ছিল যথেষ্ট ব্যয় ও শ্রমসাধ্য।

ক্রুকস এই সমস্যা দূর করেছিলেন একটি সহজ পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। এই পদ্ধতির নাম সোডিয়াম অ্যামালগাম প্রসেস। ১৯১৯খ্রিঃ ৪ঠা এপ্রিল ক্রুকস লন্ডনে প্রাণত্যাগ করেন।

স্যার আলফ্রেড বার্নাড নোবেল



সুইডিস রসায়ন বিজ্ঞানী ও ডিনামাইট আবিষ্কর্তা আলফ্রেড নোবেল আজ বিশ্ববন্দিত তাঁর প্রবর্তিত নোবেল পুরস্কারের জন্য।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, লেখক এবং শান্তির স্থপতিগণ নোবেল প্রবর্তিত এই পুরষ্কারটি দ্বারাই চিহ্নিত ও পরিচিত হন।

ডিনামাইট আবিষ্কারের সুবাদে একসময় নোবেলকে লর্ড ডিনামাইট বলে ডাকা হত। তাঁর জন্ম হয়েছিল সুইডেনের স্টকহল্‌মে ১৮৩৩ খ্রিঃ ২১শে অক্টোবর।

তাঁর পিতা ইমানুয়েল নোবেল ছিলেন আর্কিটেক্ট ও গবেষক। তাঁর ছিল টর্পেডো ও মাইন নির্মাণের ব্যবসা। তাঁর মা ক্যারোলিনা ছিলেন বিদুষী বুদ্ধিমতী মহিলা। আলফ্রেড ছিলেন মায়ের অনুরাগী।

ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ইমানুয়েল ১৮৩৭ খ্রিঃ তাঁর পরিবারকে সুইডেনে রেখে ফিনল্যান্ডে চলে আসেন।

সেখান থেকে পরে রাশিয়ার লেনিনগ্রাদে এসে গোলাবারুদের বিস্ফোরক তৈরির ব্যবসা শুরু করেন। ন বছর বয়সে আলফ্রেড পরিবারের সঙ্গে লেনিনগ্রাদে বসবাস শুরু করেন।

ইমানুয়েল ছেলেকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য স্কুলে না পাঠিয়ে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। পিতার আগ্রহে ও গৃহশিক্ষকের চেষ্টায় আলফ্রেড অল্পবয়সেই রসায়ন বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

আলফ্রেড কোনদিন স্কুল কিংবা কলেজে পড়াশোনা করেন নি। তাঁর যাবতীয় শিক্ষা লাভ হয়েছিল গৃহে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। সেই কারণে অল্পবয়স থেকেই তাঁর জীবন ছিল নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা এবং সুশৃঙ্খল।

তিনি কখনো ধূমপান করতেন না। মদও খেতেন না। ফ্রেঞ্চ, জার্মান, রাশিয়ান ও ইংরাজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

পড়াশোনার প্রতি ছিল তাঁর গভীর আকর্ষণ। ব্রিটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার, ভলতেয়ার ও শেকসপীয়রের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। সমাজবিজ্ঞানেও তাঁর আগ্রহ ছিল।

তিনি বেশ কয়েকটি নাটক, গল্প ও উপন্যাস লিখেছিলেন। পরে অবশ্য রসায়নের গবেষণাতেই পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন।

আলফ্রেডের পিতার কোম্পানির নাম ছিল Foundries and Machine Shops of Nobel and Sons। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের পরে তিনি পিতার কোম্পানিতে যোগ দেন।

জানা যায়, ১৯৫৩ খ্রিঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তাঁদের কোম্পানি থেকে যুদ্ধের বহু মালমশলা সরবরাহ করা হয়েছিল।

একসময় কোম্পানির আর্থিক অবস্থা পড়ে এলে আলফ্রেড ও তাঁর পিতা ইমানুয়েল সুইডেনে ফিরে আসেন। এখানে আলফ্রেড শুরু করেন নানা গবেষণা।

সেইসময় খনি ও সৈন্যবিভাগে একপ্রকার কালো বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করা হত। এই পদার্থের নাম ছিল নাইট্রো-গ্লিসারিন।

উদ্বায়ী এই পদার্থটি বিপজ্জনক বিস্ফোরক। একে নিরাপদে ব্যবহার করবার কোন উপায় এখনো পর্যন্ত জানা ছিল না।

আলফ্রেড গবেষণা শুরু করলেন। অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি নাইট্রো-গ্লিসারিনের সঙ্গে একটি চক জাতীয় পদার্থ Kieselgur মিশিয়ে আবিষ্কার করলেন সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে বিস্ফোরণ ঘটাবার কৌশল।

তিনি এই পেটেন্টটির নাম দিলেন ডিনামাইট। এর পর থেকেই ডিনামাইটের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তিনি নানা ধরনের ডিনামাইট বাজারে ছাড়তে লাগলেন। ফলে হুহু করে ব্যবসা বেড়ে চলল। আসতে লাগল টাকা।

ব্যবসা দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে উঠল। ১৮৯৬খ্রিঃ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর এ জাতীয় ৯৩টি কারখানায় ৬৬ হাজার ৫০০ টন বিস্ফোরক পদার্থ উৎপাদিত হত।

ডিনামাইটের ব্যবসা থেকে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন আলফ্রেড নোবেল।

মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত মানের। তাঁর কারখানার শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

আলফ্রেড নোবেল বিশ্বাস করতেন যে শান্তি ও সংহতিই এই বিশ্বের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র চাবিকাঠি।

তিনি জানতেন আর্ন্তজাতিক ভাব বিনিময় ও ভ্রাতৃত্ববোধই আনতে পারে আন্তর্জাতিক সংহতি, প্রতিষ্ঠিত হতে পারে স্থিতিশীলতা।

বিশ্বে শান্তি স্থাপনের এবং সৃজনশীল কর্মোদ্যোগকে উৎসাহিত করবার উৎসাহে তিনি একটি পুরস্কার প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ১৮৯৫ খ্রিঃ প্যারীতে বসবাসকালে তিনি একটি উইল রচনা করেন।

সেই উইল অনুসারে প্রতিবছর পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যায় সবচেয়ে মূল্যবান আবিষ্কারের জন্য এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের জন্য, মানবকল্যাণ ও বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার দাতার নাম অনুসারেই পুরস্কারের নামকরণ করা হয়।

১৮৯০ খ্রিঃ গঠিত হয় নোবেল ফাউন্ডেশান। এই ফাউন্ডেশান স্বাধীন ও বেসরকারীভাবে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ও অর্থ সংরক্ষণের বিষয়টি দেখেন। মৃত্যুর একবছর আগে ১৮৯৫ খ্রিঃ ২৭শে নভেম্বর আলফ্রেড উইলটি করেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন কিভাবে তাঁর বিপুল সম্পত্তি ব্যবহার করা হবে। তিনি লিখেছেন ঃ

'একটি তহবিল গঠন করে যথাযোগ্য নিরাপত্তার মধ্যে আমার অর্থ সংরক্ষিত হবে। আমার অর্জিত অর্থ থেকে যে পরিমাণ সুদ পাওয়া যাবে তা থেকে প্রতিবছর কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া হবে।

পুরস্কার নির্দিষ্ট থাকবে মানবজাতির উন্নয়নে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য।

সুদের টাকা পাঁচ ভাগ করে একভাগ পদার্থবিদ্যায় আবিষ্কার, একভাগ রসায়নবিদ্যায় আবিষ্কার আর একভাগ শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে নতুন অবদান, একভাগ সাহিত্যক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য ও একভাগ আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপন ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য প্রধান ভূমিকা পালনকারীকে প্রদান করা হবে।

রয়াল সুইডিশ আকাদেমি অব সায়েনসেস পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার পুরস্কারটি দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের পুরস্কারটি স্টকহোমের কারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের বিবেচনাধীন থাকবে।

সাহিত্যের পুরস্কারটির দায়িত্বে থাকবে সুইডিশ আকাদেমি। আর নরওয়ে সংসদ (Starting) মনোনয়ন করবেন শান্তি পুরস্কারের প্রার্থী।

এই পুরস্কার কখনই কোন প্রার্থী কোন দেশের এই প্রশ্নের ওপর নির্ভর করবে না।'

আলফ্রেড নোবেল তাঁর উইলে আরও উল্লেখ করেন, এই পুরস্কার কখনই যুক্তভাবে তিনজনের বেশি কাউকে দেওয়া যাবে না।

এই উইল অনুসারে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তবে তার আগে অক্টোবর মাসেই আকাদেমি পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করে থাকেন।

১৯৩৯ খ্রিঃ থেকে আলফ্রেড নোবেলের স্মৃতিরক্ষাকল্পে অর্থবিজ্ঞানেও এই পুরস্কার সংযোজন করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রতিটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ কোটি ২৬ লক্ষ ডলার। এমন মোটা অঙ্কের পুরস্কার পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই।

১৯০১ খ্রিঃ থেকে এই পুরস্কার প্রদান আরম্ভ হয়। নোবেলের জীবদ্দশায় নোবেল পুরস্কার কাউকে প্রদান করা হয়নি।

১৮৯৬ খ্রিঃ ১০ই ডিসেম্বর অ্যানজাইলা পেক্টোরিস ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু হয়।

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল



তড়িৎবিজ্ঞানে বিশেষ করে তড়িৎ ও তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর আবিষ্কৃত সূত্রটি তড়িৎবিজ্ঞানে ম্যাক্সওয়েলের কর্কস্ক্রু-সূত্র নামে প্রসিদ্ধ। তড়িৎপ্রবাহের ফলে চুম্বক-শলাকার দিক নির্ণয় করা হয় এই সূত্রের সাহায্যে।

ম্যাক্সওয়েল পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে যে দিকে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করা হয় চুম্বক শলাকার উত্তর মেরু সেইদিকে বিক্ষিপ্ত হয়।

তড়িৎচুম্বক তরঙ্গতত্ত্ব বিষয়ে ম্যাক্সওয়েলের আবিষ্কারটিকে যুগান্তকারী বলা হয়। তরঙ্গ-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম সঠিক ধারণা তিনিই দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম

বলেছিলেন, বিদ্যুৎক্ষেত্রে অথবা চুম্বক ক্ষেত্রে সামান্যতম বিশৃঙ্খলা ঘটলেই আলোর গতির সমান একটি তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ বেরিয়ে আসে। এই তড়িৎচুম্বকের তরঙ্গের ধর্ম সাধারণ আলোর ধর্মের অনুরূপ। আলোকের মত এই তরঙ্গেরও হয় প্রতিফলন, প্রতিসরণ, পোলারাইজেশন প্রভৃতি।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের মূলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যার তা হল বেতার তরঙ্গ। আর এই বেতার তরঙ্গ ল্যাবরেটারিতে উৎপাদন করেছিলেন বিজ্ঞানী হেনরিক হার্ৎস।

ম্যাক্সওয়েলের মতবাদের পরীক্ষা করতে গিয়েই তিনি বেতার তরঙ্গের সন্ধান পেয়েছিলেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ধারক বলা হয় তিনটি নিয়মকে। তার প্রথমটি হল নিউটনের গতিবিজ্ঞান। দ্বিতীয়টি ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎচুম্বক তরঙ্গতত্ত্ব এবং তৃতীয় নিয়মটি হল অপগতি বিদ্যা।

এই নিয়মগুলোর মাধ্যমেই প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

বলা বাহুল্য বহু মূল্যবান আবিষ্কারেরও প্রসূতি এই তিনটি নিয়ম। এ থেকেই ম্যাক্সওয়েলের অবদানের মূল্যায়ন করা সম্ভব।

ম্যাক্সওয়েলের জন্ম হয়েছিল ১৮৩১ খ্রিঃ ১৩ই নভেম্বর এডিনবরায়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আইনজীবী। কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের অনুরাগী। তাই স্বভাবতঃই পুত্রের বিজ্ঞান শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। নিজেও অবসর সময়ে বসতেন ছেলেকে পড়াতে।

ম্যাক্সওয়েল ছিলেন পিতার একমাত্র পুত্র। তাই যথেষ্ট আদরে যত্নেই মানুষ হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়েছিল এডিনবরা আকাদেমিতে।

বাল্যকাল থেকেই একটা অদ্ভুত আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল ম্যাক্সওয়েলের মধ্যে। কারো সঙ্গে তিনি ভালভাবে কথা বলতে পারতেন না। অকারণ লজ্জা সঙ্কোচে কেমন আড়ষ্ট হয়ে যেতেন।

স্বভাবের এই দুর্বলতা তাঁর পিতাকে খুবই বিব্রত করে তুলেছিল। সেকারণেই তিনি পুত্রের এই লজ্জা কাটাবার জন্য একটু আগে আগেই ম্যাক্সওয়েলকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ভাল স্কুলে গিয়েও এই লজ্জাভাব দূর হল না তাঁর। পিতা এবারে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

অনেক চিন্তাভাবনার পর তিনি ঠিক করলেন পুত্রকে সর্বদা নিজের সঙ্গে রেখে তার সলজ্জভাব কাটাবার চেষ্টা করবেন। তিনি পুত্রকে সঙ্গে করেই আদালতে যেতে লাগলেন।

বেড়াতে যাবার সময়, সভাসমিতিতে যোগদানের সময়, বন্ধুদের বাড়িতে যাবার সময়, পুত্রকেও সঙ্গে রাখতে লাগলেন।

এভাবে বেশ কিছুদিন কাটল। বারো-তেরো বছর বয়সে ম্যাক্সওয়েলের লাজুক স্বভাবের কিছুটা পরিবর্তন হল।

এইভাবেই স্কুলের পাঠ শেষ হল। কলেজে ভর্তি হলেন ম্যাক্সওয়েল। বিজ্ঞানানুরাগী পিতা তাঁর জন্য একটি সুন্দর গবেষণাগার তৈরি করিয়ে দিলেন। পিতার উৎসাহে উৎসাহিত হলেন ম্যাক্সওয়েল।

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পড়াশোনা ও গবেষণায় মেতে উঠলেন। ধীরে ধীরে এবারে প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে লাগল।

সহজাত উদ্ভাবনী ক্ষমতাবলে নিজেই কয়েকটি ছোটখাট যন্ত্র নির্মাণ করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল।

ম্যাক্সওয়েলের পিতা এই যন্ত্রগুলো একদিন তৎকালীন খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ফোরবীজকে দেখতে দিলেন। ফোরবীজ ষোলবছরের কিশোরের উদ্ভাবনী প্রতিভা দেখে বিস্মিত হলেন, প্রশংসা করলেন উচ্ছ্বসিতভাবে।

পরে সেগুলো পাঠিয়ে দিলেন লন্ডনের রয়েল সোসাইটিতে। সোসাইটি ম্যাক্সওয়েলের প্রশংসা করে সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিলেন।

সতেরো বছর বয়সে ম্যাক্সওয়েল ভর্তি হলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষায়তনের গবেষণাগারে তিনি কিছুদিন চুম্বক ও তড়িৎ সম্বন্ধে গবেষণা করলেন।

পরে উন্নততর গবেষণার জন্য যোগদান করেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানেই তিনি ১৮৫১ খ্রিঃ আবিষ্কার করেন কর্ক স্ক্রু সূত্রটি।

ম্যাক্সওয়েলের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করলেও জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতবিজ্ঞানেও তাঁর সমান দক্ষতা ছিল।

১৮৬০ খ্রিঃ কিংস কলেজের আমন্ত্রণে তিনি এখানকার পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রধান অধ্যপকের পদ গ্রহণ করেন।

এই কলেজে অধ্যাপনাকালেই ১৮৬৪ খ্রিঃ ম্যাক্সওয়েল আবিষ্কার করেন তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গতত্ত্ব।

গণিতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকার কারণেই তাঁর পক্ষে চৌম্বক তরঙ্গতত্ত্বের ধারণা করা সম্ভব হয়েছিল।

পরবর্তীকালে আলোক তরঙ্গের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি সহজ গণিতের পরিবর্তে উচ্চ গণিতের ফেক্টর ও ক্যালকুলাস—এই দুই শাখা প্রয়োগ করেছিলেন।

সফল বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর ডাক আসে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কিংস কলেজের কাজ ছেড়ে দিয়ে ম্যাক্সওয়েল যোগদান করে কেমব্রিজে।

কিছুকাল জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েও গবেষণা করেছিলেন তিনি। শনিগ্রহের বলয় সম্পর্কে তাঁর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ একসময়ে বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল।

এই প্রবন্ধের জন্য তিনি এডামস পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

ম্যাক্সওয়েল একাধিক মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম ট্রিটিজ অন ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বিখ্যাত গবেষণাগার ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটারি প্রতিষ্ঠা। তাঁর উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানেই এই গবেষণাগার গড়ে উঠেছিল।

দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলে অল্প বয়সেই ম্যাক্সওয়েল রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৮৭৯ খ্রিঃ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উইলিয়ম টমসন কেলভিন



পদার্থ বিজ্ঞানে বেশ কিছু মূল্যবান আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে কেলভিনের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তিনি লর্ড কেলভিন, টমসন কেলভিন, এই দুই নামেই পরিচিত ছিলেন।

স্কটল্যান্ডের বেলফাস্টে ১৮২৪ খ্রিঃ ২৬শে জুন জন্মগ্রহণ করেন কেলভিন। তাঁর পিতা জেমস টমসন ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। পিতার উৎসাহ ও প্রেরণাতেই গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি কেলভিন আকৃষ্ট হন।

কেলভিন ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। পরে গণিতের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ভর্তি হন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কেমব্রিজের অধ্যয়ন শেষ করে তিনি ফ্রান্সে যান। সেখানকার বিভিন্ন গবেষণাগারেও কিছুকাল গবেষণা করেন।

১৮৪৬ খ্রিঃ দেশে ফিরে এসে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। আমৃত্যু তিনি এখানেই কর্মনিযুক্ত ছিলেন।

তাপগতি বিদ্যায় কেলভিনের মূল্যবান আবিষ্কার হল উষ্ণতা পরিমাপের অ্যাবসলিউট স্কেল। এই স্কেল আবিষ্কারকের নামে কেলভিন স্কেল নামেও পরিচিত।

কেলভিনই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাপগতিবিদ্যার সাহায্যে এমন একটি স্কেল কল্পনা করা সম্ভব যা কোনও পদার্থেরই বিশেষ কোনও ধর্মের ওপর নির্ভর করবে না।

এই কল্পনা থেকেই তাঁর অ্যাবসলিউট স্কেলের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছিল।

গ্যাস তরলীকরণের সূত্রও আবিষ্কার করেছিলেন কেলভিন। পদার্থবিদ্যায় এটি তাঁর দ্বিতীয় অবদান।

তিনি অপর এক বিজ্ঞানী জেমস প্রেসকট জুল-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে এই সূত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই কারণে তো জুল-টমসন এফেক্ট বা জুল-কেলভিন এফেক্ট নামে পরিচিত।

অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, বায়ু প্রভৃতি স্থায়ী গ্যাস রূপেই চিহ্নিত ছিল। কেলভিন ও জুল-এর আবিষ্কৃত পদ্ধতির সাহায্যেই এই গ্যাসগুলিকে তরলে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে।

অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি গ্যালভানোমিটার আবিষ্কার করে কেলভিন সেইকালে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছিলেন। সেই কাজটি হল আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে টেলিগ্রাফের তার স্থাপন।

এই উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। এই সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন কেলভিন।

বিভিন্ন অসুবিধার কারণে কাজটি বারবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। কেলভিনের আবিষ্কৃত গ্যালভানোমিটার সেই অসুবিধাগুলো দূর করে কাজটিকে সফল করে তুলেছিলেন।

নৌ-চালনা সংক্রান্ত বেশকিছু ফলপ্রদ যন্ত্রপাতিও আবিষ্কার করেছিলেন কেলভিন। টাইডাল অ্যানালাইজার এবং টাইডাল প্রেডিকটর এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করবার ফ্যাদমিটার যন্ত্রটি কেলভিনেরই আবিষ্কার।

বিজ্ঞান সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ কেলভিন দেশে বিদেশে সম্মান লাভ করেছেন। তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন ১৮৬৬ খ্রিঃ। ব্যারন কেলভিন অব লা'র্গজ উপাধিতে ভূষিত হন ১৮৯২ খ্রিঃ।

লন্ডন রয়েল সোসাইটির ফেলো এবং পরে ১৮৯০ খ্রিঃ সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯০২ খ্রিঃ তিনি লাভ করেন অর্ডার অব মেরিট উপাধি।

কেলভিনের মূল্যবান গ্রন্থগুলি হল ৬ খন্ডে ম্যাথম্যাটিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল পেপারস,' ৩ খন্ডে পপুলার লেকচারস অ্যান্ড অ্যাড্রেসেজ এবং মলিকিউলার ট্যাকটিক্স অব এ ক্রিস্ট্যাল।

১৯০৭ খ্রিঃ ১৭ ডিসেম্বর স্কটল্যান্ডে মৃত্যু হয় বরণীয় বিজ্ঞানী কেলভিনের।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন



১৭০৬ খ্রিঃ জানুয়ারী মাসে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকার বোস্টন শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের আদি বাস ছিল ইংলন্ডে। তাঁর পিতা ছিলেন প্রোটেস্টান্ট মতাবলম্বী।

ধর্মীয় মতভেদের জন্য সম্রাট দ্বিতীয় চার্লসের শাসনকালে তাঁকে ইংলন্ড ছেড়ে আমেরিকায় এসে বসবাস করতে হয়েছিল।

বেঞ্জামিন ছিলেন তাঁর পিতার পঞ্চদশতম সন্তান। সংসারের আর্থিক অনটনের ফলে বেঞ্জামিন বেশিদিন স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি।

বাবার ছিল সাবানের কারখানা। বছর দুয়েক স্কুলে যাতায়াতের পরই তাঁকে বাবার সঙ্গে কারখানার কাজে যোগ দিতে হয়েছিল।

শৈশবে বেঞ্জামিন স্বপ্ন দেখতেন স্বাধীন ভাবে উন্মুক্ত সমুদ্রের বুকে পাড়ি দেবেন। বাড়ির কাছেই সমুদ্র। সেখানে নৌকা নিয়ে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করবার সময়েই তাঁর এই স্বপ্ন উঁকি দিয়েছিল মনে।

কিন্তু সেই স্বপ্ন মনের কোণে চেপেই রাখতে হল তাঁকে— বাবার হুকুমে কারখানায় এসে সাবান তৈরির কাজে হাত লাগাতে হল। তবে কাজের ফাঁকে যখনই সুযোগ পেতেন নৌকা নিয়ে নেমে পড়তেন সমুদ্রে।

ছেলেবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি ছিল গভীর আগ্রহ। হাতের কাছে কোন বই পেলেই সেটা তড়িঘড়ি পড়ে ফেলতেন।

কিছুদিন পরে বাবা ঠিক করলেন তাঁকে ছাপাখানার কাজে দেবেন। বেঞ্জামিনের পড়াশোনার আগ্রহ লক্ষ করেই হয়তো তাঁর বাবা এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কেননা ছাপাখানার কাজে অন্ততঃ কিছুটা লেখাপড়ার যোগাযোগ ও সুযোগ রয়েছে যা রুটির কারখানায় ছিল না।

বোস্টনে বেঞ্জামিনের দাদা জেমস-এর একটা ছাপাখানা ছিল। বারো বছর বয়সে সেখানেই তাঁকে শিক্ষানবীশ হিসেবে পাঠানো হল।

এখানে এসে বাস্তবিকই বই পড়ার সুযোগ নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলেন তিনি। সেই সঙ্গে অনেক পত্রপত্রিকা।

কিছুদিন পরেই জেমস নিউ ইংল্যান্ড কুর‍্যান্ট নামে একটি খবরের কাগজ প্রকাশ শুরু করলেন। অভাবিতভাবে বেঞ্জামিন এই কাগজে লেখার সুযোগও পেয়ে গেলেন।

সেই সময়ের জীবনযাত্রা নিয়ে তিনি এই কাগজে যেসব লেখা লিখেছেন তাতে তাঁর সূক্ষ্মরসবোধ, অন্তর্দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে ট্রায়ো নামের এক লেখকের বই পড়ে বেঞ্জামিন কোন প্রাণীর মাংস খাবেন না বলে একরকম সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলেন।

ফলে কোন বাড়িতে বা হোটেলে খাওয়ায় তাঁর খুবই আপত্তি ছিল। তাই নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করে নেবেন বলে তিনি দাদা জেমসের কাছ থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে খাওয়া খরচ চেয়ে নিতেন।

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কোনরকম কিছু একটা হলেই তাঁর চলে যেত। ফলে টুকটাক ফল, রুটি, কেক এসব দিয়েই তাঁর খাওয়ার কাজ চুকে যেত। সপ্তাহের শেষে দেখা যেত বেশ কিছু পয়সা বেঁচে গেছে।

তিনি সেই পয়সা দিয়ে পছন্দমত বই কিনতে লাগলেন। আর প্রেসের কাজের অবসরে সেই বই নিয়ে বসতেন।

পরে তিনি বলেছেন, ওসব হাল্কা খাবার খেয়ে তাঁর ক্ষতি কিছু তো হয়ইনি বরং মস্তিষ্কের ক্ষমতা, চিন্তার শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। যা পড়তেন সহজেই মনে রাখতে পারতেন।

অবশ্য নিরামিষ আহারের পর্বটা ছিল তাঁর নিতান্তই আবেগ নির্ভর। আহারের জন্য প্রাণীহত্যার বিষয়টাই ছিল বাধাস্বরূপ।

নইলে ট্রায়োর বই পড়বার আগে স্বচ্ছন্দেই তিনি মাছ, মাংস গলাধঃকরণ করেছেন। বিশেষ করে কড মাছ ভাজা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

যাইহোক, বছরখানেক পরেই আবার নিজের মনেই যুক্তি খাড়া করলেন। প্রাণীরা তো উদরপূর্তির জন্যই অপর প্রাণী হত্যা করছে দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থাটা প্রাকৃতিক। কাজেই বেঁচে যখন থাকতে হবে, খাদ্য হিসেবে নির্বাচিত প্রাণীহত্যায় আর দোষ কোথায়? তিনি যথারীতি আবার মাছ ও মাংসের স্বাদ নিতে লাগলেন।

বেঞ্জামিনের এই 'দিব্যজ্ঞান'-এর উদয় হয়েছিল একবার সহকর্মীদের সঙ্গে ব্লক আইল্যান্ড নামে একটা দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে।

সেখানে সহকর্মীরা কড মাছ ধরে যখন রান্নার জন্য কাটাকুটি করছিল সেই সময় তাদের অনেকেরই পাকস্থলীতে ছোট ছোট মাছ পাওয়া গিয়েছিল। বেঞ্জামিন তা লক্ষ করেছিলেন।

এই ঘটনা থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর স্বভাবে কিছুটা ভাবালুতা এবং খেয়ালিপনাও ছিল অল্প বয়স থেকেই।

সতের বছর বয়স পর্যন্ত প্রেসের কাজে টিকে ছিলেন বেঞ্জামিন। দাদা জেমসের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় কাজ ছেড়ে তিনি প্রথমে পাড়ি দিলেন নিউইয়র্ক। পরে সেখান থেকে গেলেন ফিলাডেলফিয়ায়।

একরকম নিঃসম্বল অবস্থাতেই লন্ডনে এসে পৌঁছেছিলেন বেঞ্জামিন। কিছু ঘোরাঘুরি করে একটা প্রেসে কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলেন। ১৭২০ খ্রিঃ থেকে দুবছর সেই কাজ করলেন।

১৭২৬ খ্রিঃ ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে এসে নিজেই প্রেসের ব্যবসায় শুরু করলেন একজন অংশীদারের সঙ্গে।

দক্ষতা ও পরিশ্রমের ফলে ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেল। কিছুকাল পরে সম্পূর্ণ ব্যবসার মালিক হয়ে উঠলেন। ১৭২৯ খ্রিঃ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ পেলেন যা তাঁকে অচিরেই বিখ্যাত হয়ে উঠবার সুযোগ এনে দিল।

পেনসিলভানিয়া গেজেট প্রকাশনার দায়িত্ব পেলেন বেঞ্জামিন। এর বছর কয়েক পরে লিখতে শুরু করলেন পুওর রিচার্ডস অ্যালম্যানক। এই লেখার বলার ভঙ্গী ও সরস উক্তি তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় করে তুলল। এই বই বিক্রির টাকাই তাঁকে বলা যায় ধনী করে দিল।

ভবিষ্যতে বেঞ্জামিন যে বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং দক্ষ রাজনীতিক হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছিলেন, অ্যালম্যানকই তার সূচনা করেছিল। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা যেন পথ খুঁজে পেল এতদিনে।

এই সময়ে বৃহত্তর লক্ষে পারিপার্শ্বিক উন্নতির জন্য তিনি পরিচিত ও বন্ধুদের নিয়ে দ্য জুটা নামে একটি ক্লাব গড়ে তুললেন। মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানই ছিল তাঁর মূল লক্ষ।

এই ক্লাবের মধ্য দিয়ে সীমিত ভাবে সেই উদ্যোগ আরম্ভ হল। তিনি নিজে ক্লাবে সভ্যদের সভায় বহুরকম সংস্কারমূলক প্রবন্ধ পাঠ করতেন। নানান উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন। পরবর্তীকালে এগুলোই আমেরিকার নানাবিধ সংস্কারের ভিত্তিস্বরূপ হয়ে উঠেছিল।

বেঞ্জামিনের উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি ও সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁরই প্রচেষ্টায় দেশে গড়ে উঠেছিল ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার।

পরবর্তীকালে তাঁর হাতেই জন্ম নিয়েছিল আমেরিকার প্রথম ফায়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানি।

বাল্যবয়স থেকেই ছিলেন অনুসন্ধিৎসু, চারপাশের সবকিছু নিয়েই তাঁর ছিল অসীম কৌতূহল। সেই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। এভাবেই লালিত হয়ে চলেছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা।

১৭৪০ খ্রিঃ বেঞ্জামিন জ্ঞানীগুণীদের নিয়ে গড়ে তুললেন ফিলজফিক্যাল সোসাইটি।

সেই সময় ইংলন্ডের সঙ্গে লড়াই বেঁধেছিল স্পেন আর ফ্রান্সের। বেঞ্জামিন তাঁর প্রিয় শহরটিকে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য গড়ে তুললেন এক স্বেচ্ছাসেবী সুরক্ষাবাহিনী।

ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনও হয়েছিল তাঁর হাতে। পরবর্তীকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হয় পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

দুবছর পরে বন্ধু ডাঃ বন্ড-এর সহযোগিতায় গড়ে তুললেন আমেরিকার প্রথম হাসপাতাল। এই সব গঠনমূলক কাজে তাঁর গভীর সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

যে কোন উদ্যোগ শুরুর যথেষ্ট আগে থেকেই তিনি সেই সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং খবরের কাগজে লিখে প্রচারের কাজ আরম্ভ করতেন।

এছাড়াও এসব কাজে প্রচারের নানা পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করতেন। ফলে শুরুর আগেই প্রকৃত কাজ অনেকটাই এগিয়ে থাকত।

সংস্কারমূলক কাজে কেবল সমাজই নয়, শহরের রাস্তাঘাট ইত্যাদিও তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকত।

সবকাজেরই উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের উন্নতি ও উপকার। বস্তুতঃ তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় নতুন এক আমেরিকার জন্ম হতে লাগল। পরবর্তীকালে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সেই আমেরিকার মুকুটহীন সম্রাট।

টুকটাক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ১৭৪২ খ্রিঃ বেঞ্জামিন এক নতুন ধরনের চুল্লী আবিষ্কার করেন। এসব ক্ষেত্রে আবিষ্কারের পেটেন্ট নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা শুরু হয়—এটাই চিরাচরিত রীতি।

বেঞ্জামিন কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত চুল্লীর পেটেন্ট নেবার কোনরকম চেষ্টা করলেন না। তিনি বললেন, আবিষ্কারের সব রকম সুবিধা ও ফলভোগ করবে জনসাধারণ, তাদের উপকারের লক্ষেই বিজ্ঞানীরা গবেষণায় রত হবেন—তার জন্য পেটেন্টের বাধা রাখা অনুচিত।

একসময় বেঞ্জামিন বিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। অচিরেই তিনি আবিষ্কার করলেন বিদ্যুতের পজিটিভ ও নেগেটিভ তত্ত্ব।

বজ্রপাতের সঙ্গে বিদ্যুতের যে সম্পর্ক রয়েছে সেই সত্যই তিনিই আবিষ্কার করেন ১৭৫২ খ্রিঃ। এর ফল স্বরূপ তিনি আবিষ্কার করলেন বাজ নিরোধক কনডাক্টর।

এইভাবে নানা কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর নাম দেশের সীমা ছেড়ে বিদেশেও পৌঁছে যেতে লাগল। বিশেষ করে তাঁর আবিষ্কার ও গবেষণা বিপুল উৎসাহে সর্বত্র গৃহীত হতে লাগল।

ব্যবসায়ের সাফল্য তাঁকে দিয়েছিল বিত্ত ও সম্পত্তি। বহুমুখী প্রতিভা ও হিতৈষণা বুদ্ধি থেকে পেলেন খ্যাতি।

এর মধ্যে থেকেও তাঁর জীবন ছিল সহজ সরল অনাড়ম্বর। ভোগবিলাসের প্রতিও ছিলেন উদাসীন ও নিস্পৃহ।

বিয়ে করেছিলেন ১৭৩০ খ্রিঃ। সেই সূত্রেই তাঁর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিবারে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বাড়তি কিছু সুযোগ সুবিধার, সেগুলোকে কটাক্ষ করে তিনি বলতেন 'বিলাসিতা'।

জনহিতকর কাজের মাধ্যমে বেঞ্জামিন পেনসিলভানিয়ার আইনসভার সদস্য পদ লাভ করেছিলেন। ১৭৫০ খ্রিঃ থেকে ১৭৬৪ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি এই আইনসভার সদস্য ছিলেন।

তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্য সহকর্মীর অভাবে ও অন্যান্য কারণে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সফলতা পাননি।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যরা বেঞ্জামিনের চিন্তাধারাকে ঠিকমত বুঝতে পারতেন না বলে কাজেও লাগাতে পারেননি।

১৭৫৪ এবং ১৭৬৪ খ্রিঃ বেঞ্জামিন দুবার ইংলন্ড ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ইংলন্ডে অবস্থানকালে বহু বিতর্কিত স্ট্যাম্প আইন-এর বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। মূলতঃ তাঁরই চেষ্টায় এই বহুনিন্দিত আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল ১৭৬৬ খ্রিঃ।

তিনি নিঃসন্দেহে রাজভক্ত প্রজা ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ উপনিবেশগুলির প্রতি কোনরূপ অবহেলা বা অবিচার হলে তিনি তার বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

ইংলন্ড তাঁর প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারত না। ফলে তাঁকে একবার প্রিভি কাউন্সিলের কাছে অপমানিত হতে হয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি উপনিবেশগুলির স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করেননি।

আমেরিকাব উপনিবেশগুলি যখন স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করল বেঞ্জামিন ছিলেন সেই লড়াইয়ের অন্যতম যোদ্ধা। সেই সময় তিনি তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা পূর্ণভাবে স্বদেশের কাজে প্রয়োগ করেছিলেন।

বেঞ্জামিন তাঁর বাস্তবমুখী চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন সর্বত্র। তিনি লন্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৭৫৩ খ্রিঃ পেয়েছিলেন কার্পাল পুরস্কার। এছাড়াও সেন্ট অ্যানড্রুজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছিলেন সম্মানিক উপাধি।

জীবনের শেষ দিকে বেঞ্জামিন আমেরিকার সুপ্রীম একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলে ১৭৮৭ খ্রিঃ সংবিধান রচনায়ও তিনি সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি দেশের আইনসভায় দাসত্ব প্রথার বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মূল্যায়ন করা এক কঠিন কাজ। বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, মানবহিতৈষী—তাঁর সব পরিচয়ই সার্থক।

১৭৯০ খ্রিঃ অক্লান্তকর্মী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনাবসান হয়।

আরমাউয়ের হ্যানসেন

কুষ্ঠ এক ভয়াবহ ব্যাধি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই রোগ সন্ত্রাসিত করছে সমাজকে। ব্যাধিটির কারণ ও প্রতিষেধকের অনুসন্ধানেও মানুষের চেষ্টার বিরাম ছিল না।

পৃথিবীর প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রগুলিতে কুষ্ঠরোগের বর্ণনা রয়েছে। কোথাও কোথাও প্রতিকারের উপায়ও বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু তবু কুষ্ঠর ভয়াবহতা কিছুমাত্র হ্রাস পেতে দেখা যায়নি।

দীর্ঘকাল থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র এই রোগে আক্রান্ত হয়ে অসংখ্য মানুষ তীব্র যন্ত্রণা ভোগের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে।

এই ভয়াবহ রোগকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনে নানান সংস্কার জন্ম নিয়েছে। লোকে মনে করত কুষ্ঠ সংক্রামক ব্যাধি এবং নিরাময়ের অতীত।

তাই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকেসমাজ থেকে নির্বাসিত হতে হত। তাদের লোকে ঘৃণায় ও ভয়ে স্পর্শ পর্যন্ত করত না।

মনুষ্যবসতির বাইরে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দুর্দশা ভোগ করে রোগগ্রস্ত মানুষদের পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হত।

কুষ্ঠরোগের সঠিক কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা ও রোগের নিরাময়ের উপায় জানার জন্য আধুনিক যুগেও মানবদরদী বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকগণ নিরলস সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। মানুষের চেষ্টাই ফলবতী হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

১৮৭৪ খ্রিঃ চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ও গবেষক জি. আরমাউয়ের হ্যানসেন কুষ্ঠরোগের জীবাণু আবিষ্কারে সমর্থ হন।

তাঁর গবেষণার ফলেই বর্তমানে সমাজ থেকে কুষ্ঠরোগের ভীতি ও ত্রাস দূরীভূত হয়েছে বলা যায়। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ায় কুষ্ঠ আজ নিরাময় সম্ভব হয়ে উঠেছে।

সেই সঙ্গে অতীতের অনেক ধারণাই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। জানা গেছে এই রোগ সব ক্ষেত্রেই সংক্রামক নয়, বা বংশানুক্রমিকও নয়।

মানবহিতৈষণার ক্ষেত্রে যেসব মনীষীর অবদান মানবসভ্যতা ভোগ করছে, হ্যানসেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

হ্যানসেনের জন্ম ১৮৪১ খ্রিঃ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানী। চিকিৎসক হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

কুষ্ঠরোগীদের দুর্দশার কথা অজানা ছিল না হ্যানসেনের। কিন্তু এই রোগের নিরাময়ের কোন ফলপ্রসু পথ জানা ছিল না। একসময় তিনি চিকিৎসাবৃত্তি থেকে সরে এসে গবেষণায় লিপ্ত হলেন।

দীর্ঘ ও কঠোর গবেষণার পর হ্যানসেন সফল হলেন। জানতে পারলেন এই রোগের জীবাণুর পরিচয়।

১৮৭৪ খ্রিঃ সেই প্রথম মানুষ জানতে পারল মিকোবাক্তেরিয়ম লেপরী নামের এক প্রকার জীবাণু ভয়াবহ কুষ্ঠরোগের কারণ।

তিনি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে জানান কুষ্ঠ রোগের জীবাণুর সঙ্গে যক্ষা রোগের জীবাণুর সাদৃশ্য রয়েছে। আর এই রোগ কোন অবস্থাতেই বংশানুক্রমিক নয়।

কুষ্ঠ দু ধরনের—এর একটি সংক্রামক ও অপরটি অসংক্রামক। সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতস্থান থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তার মধ্যে থাকে রোগজীবাণু। কোনভাবে এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে রোগ সংক্রমণ ঘটে থাকে।

অল্পকালের মধ্যেই কুষ্ঠ রোগজীবাণু সম্বন্ধে হ্যানসেনের দেওয়া তথ্য অন্য বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিলেন।

হ্যানসেন রোগজীবাণুর পরিচয় আমাদের জানিয়েছিলেন কিন্তু কোন প্রতিষেধক আবিষ্কার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে বহু বিজ্ঞানী গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। আবিষ্কৃত হয় কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধক। এই ওষুধের নাম সালফোন।

এই আবিষ্কারের ফলেই সমাজ থেকে কুষ্ঠরোগের ভীতি ও ভয়াবহতা দূর হয়েছে। তবুও দুঃখের বিষয় যে সমাজ থেকে কুসংস্কারের বীজ এখনো নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

বিভিন্ন দেশে সরকারী বেসরকারী স্তরে বিভিন্ন ভাবে প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে এই উদ্দেশ্যে, সেই চেষ্টা এখনো অব্যাহত , তবুও মানুষের মন থেকে কুষ্ঠ রোগীর প্রতি ঘৃণার ভাব দূর হয়নি।

হ্যানসেনের সোচ্চার ঘোষণার পরও সমাজের অকারণ ঘৃণা ও অবহেলার শিকার হচ্ছে হতভাগ্য কুষ্ঠরোগীরা।

হ্যানসেন জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কাটিয়েছেন কুষ্ঠরোগের গবেষণায়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি অন্য কিছু বিষয় নিয়েও গবেষণা করেছিলেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদের ওপরে তাঁর গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কুষ্ঠরোগের জীবাণু আবিষ্কার।

১৯১২ খ্রিঃ হ্যানসেনের জীবনাবসান হয়।

জন ডালটন



প্রবাদ আছে যে প্রতিভা কখনো চাপা থাকে না, কোন না কোনভাবে তার স্ফূরণ ঘটেই থাকে। পৃথিবীর প্রাতঃস্মরণীয় বহু মনীষীর জীবনেই এই পবাদবাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

জীবনের অতি সাধারণ অবস্থা থেকে এমনকি প্রতিকূল পরিবেশের গন্ডী থেকে বহু বিশ্ববরেণ্য প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে।

পরমাণুবাদের প্রবর্তক জন ডালটনও এমনি এক দুর্জয় প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন ইংলন্ডের ইগলসফিল্ড নামের এক অখ্যাত গ্রামে। সময়টা ১৭৬৬ খ্রিঃ। তিনি ছিলেন তঁাতী পরিবারের ছেলে। বংশানুক্রমিক ভাবেই এই পরিবারের বৃত্তি ছিল তাঁতবোনা।

গ্রামের যে পাড়ায় তাঁর জন্ম সেটা তাঁতীদেরই পাড়া। তাঁতবুনে জীবন নির্বাহ করাই এই পাড়ার মানুষদের একমাত্র কাজ। পুরুষানুক্রমেই এরা মূর্খ, লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য।

সকলেরই হত দরিদ্র অবস্থা। লেখাপড়া শেখার ব্যাপারটা তাদের কাছে সময় অপচয় ছাড়া কিছু নয়।

এমনি এক পরিবেশে জন্মে তাঁকেও অন্য দশটি পরিবারের ছেলেদের মতো কাপড় বুনতে তাঁতে বসে যাবার কথা। বসেওছেন তিনি, বাবাকে সাহায্য করবার জন্য।

কিন্তু তার সঙ্গে অন্য একটি কাজও তিনি করতেন যা অন্য কোন পরিবারের কেউ কখনো করেনি।

লেখাপড়ার প্রতি সহজাত আগ্রহ নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। সেই আগ্রহে নিতান্ত শৈশবেই এক স্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য মেধা ছিল তাঁর। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সহপাঠীদের তুলনায় অনেক বেশি শিখে যেতেন। কথিত আছে, বিদ্যালয়ে পড়বার সময়েই তিনি নিজের চেষ্টায় গ্রীক ও লাতিনের মত দুরূহ ভাষাকে আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন।

ছেলেবেলায় বিজ্ঞান ও অঙ্কের প্রতিই তিনি সবচেয়ে বেশি আগ্রহ বোধ করতেন।

বয়স যখন বছর বারো, সেই সময় এক অদ্ভুত কান্ড করে বসলেন ডালটন। তাঁতী পাড়ার খেলার সঙ্গীদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য নিজেই একটা স্কুল আরম্ভ করে দিলেন।

বাবার কাজে সাহায্য করতে হয়। তারই ফাঁকে সময় করে বন্ধুদের নিয়ে স্কুল করতে বসেন।

গোড়ার দিকে অভিভাবকের অনেকের আপত্তি থাকলেও পরে তারাও ব্যাপারটাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সকলের মধ্যেই জেগে উঠেছিল শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ।

জটিল সব অঙ্কের সমাধান করতে ডালটনের খুব আনন্দ। সেসব নিয়ে তিনি বসতেন অনেক রাতে, যখন গোটা পাড়া গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

কেবল অঙ্ক বা ভাষা চর্চার বইই নয়। নানান কলকব্জা নাড়াচাড়ার নেশাও তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

নিজেই বানিয়ে নিয়েছিলেন নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, সেসব নিয়ে নিজের মনেই একটার পর একটা পরীক্ষার বিভিন্ন অবস্থার এবং সিদ্ধান্তের বিবরণ একটা খাতায় টুকে রাখতেন।

বিখ্যাত শিল্পনগরী ম্যাঞ্চেস্টার। এখানেই কলেজের পড়া শেষ করে বিজ্ঞানের এম.এস.সি ডিগ্রি লাভ করেন, পরে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়েই যোগদান করেন অধ্যাপক রূপে। সেই সময়ে বয়স মাত্র পঁচিশ বছর।

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরম্ভ করলেন গবেষণার কাজ। সেই সময় তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ।

ডালটনের মৌলিক গবেষণাগুলি প্রথম ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮০০ খ্রিঃ প্রথম গবেষণাপত্রে ডালটন প্রকাশ করেছিলেন গ্যাস-প্রসারণ সূত্র এবং গ্যাসের অংশচাপ সূত্র।

ডালটনের আংশিক চাপের সূত্রই সর্বপ্রথম পরিবর্তিত তাপমাত্রায় ও চাপে নানা গ্যাসের ভৌতধর্মের একটা গোড়া পত্তন করে।

দেশ বিদেশের বহু বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে এই সূত্রগুলি স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং ডালটনও স্বীকৃত হয়েছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানী হিসেবে।

গ্যাস আয়তনের সূত্র আবিষ্কারের পর পদার্থের গঠন সম্পর্কে ডালটনের নতুন গবেষণা শুরু হল। গবেষণায় উদ্ভাসিত হল নতুন এক দিগন্ত। তাঁর নাম হল পরমাণুবাদ।

ডালটনের মতবাদ অনুসারে প্রতিটি মৌলিক পদার্থ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত।

এই কণাগুলি অবিভাজ্য এবং প্রত্যেকেই পরস্পরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ব্যাবধানে অবস্থান করে।

এই কণা ভাঙ্গা যায় না, কিংবা গড়াও যায় না, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের কণাগুলি ওজনে ও ধর্মে এক।

তবে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মধ্যকার কণার ওজন ও ধর্ম স্বতন্ত্র। এই কণাগুলো সরল ও সুনির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হতে পারে।

ডালটন এবারে পুঁথি পত্র ঘাঁটতে বসলেন। মৌলিক পদার্থের কণাগুলোর একটা নামকরণ করা দরকার।

গ্রীক ভাষা ভালভাবেই জানতেন। গ্রীক বিজ্ঞানীদের বই ঘেঁটে বার করলেন প্রাচীন গণিত বিজ্ঞানী ডেমোক্রিটাসের মতামত।

তিনি পদার্থের অতিক্ষুদ্র কণাগুলোকে সম্বোধন করেছেন অ্যাটমস নামে। এই গ্রীক শব্দটির অর্থ অবিভাজ্য। ডালটন এই শব্দটিকে গ্রহণ করলেন স' অক্ষরটিকে বাদ দিয়ে—যা দাঁড়াল তা হল অ্যাটম।

বিজ্ঞানের প্রাচীন পুঁথির তলা থেকে সেই প্রথম অ্যাটম শব্দ আধুনিক বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করল।

প্রসঙ্গতঃ বলে নেওয়া ভাল যে, পদার্থের অ্যাটম বা পরমাণুর কথা প্রাচীন ভারতেও জ্ঞাত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক মহর্ষি কণাদ কণাবাদ বা পরমাণুবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, প্রত্যেকটি পদার্থ অতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত।

গ্রীক গণিতজ্ঞ দার্শনিক পদার্থের বিষয়ে এই একই মত পোষণ করতেন।

তবে এঁদের এই মতবাদের কথা বিজ্ঞান জগৎ মেনে নিতে পারেনি। কারণ এঁরা দুজনই মূলতঃ দার্শনিক।

যদিও দর্শনই বিজ্ঞানের উৎসভূমি, তবু যেহেতু তাঁরা উভয়েই জড়বস্তুর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেননি, বিজ্ঞান ছিল গৌণ পর্যায়ে তাই যুক্তির জগৎ বিজ্ঞান তাদের মতামতকে কল্পনা বলেই সরিয়ে রেখেছিল। ফলে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রভূমিতে ডালটনই পরমাণুবাদের প্রকৃত প্রবর্তকের শিরোপা লাভ করেন।

নিজের পরমাণুতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডালটন প্রত্যেক পরমাণুর জন্য বিশেষ বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

কেবল তাই নয় বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর ওজন সম্বন্ধেও একটি সারণী প্রস্তুত করেছিলেন।

নানান মৌলের পারমাণবিক ওজন নিয়ে যে সারণী ডালটন প্রস্তুত করেছিলেন তা সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল না।

সেই ত্রুটি সংশোধন করে পরবর্তীকালে একটি পূর্ণাবয়ব সারণী প্রস্তুত করেছিলেন সুইডেনের বিখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী বার্জিলিয়াস।

বার্জিলিয়াসের কাজের চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন অপর এক বিজ্ঞানী, তিনি হলেন মেন্ডেলিফ।

তিনি ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুর ওজন নির্দিষ্ট নিয়মে পরপর সাজিয়ে তৈরি করেন পর্যায় সারণী বা পিরিওডিক টেবল।

মেন্ডেলিফ-এর পরে এক রসায়ন-বিজ্ঞানী মসেলি পারমাণবিক ওজনের পরিবর্তে পারমাণবিক সংখ্যা বসিয়ে অত্যাধুনিক পর্যায় সারণী তৈরি করেছেন।

মৌলের পরিচয় নির্ধারণের জন্য মসেলি নির্দিষ্ট পারমাণবিক সংখ্যাকেই এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে ভাল সূচক বলে মেনে নেওয়া হয়।

ডালটনের পারমাণবিক তত্ত্বের মূল্য অপরিসীম। তাঁর গবেষণার ভিত্তিতেই নানা রাসায়নিক যৌগের অন্তর্গত মৌলকণা বা পরমাণুর ওজন পৃথক ভাবে মাপার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় পরবর্তীকালে পরমাণুচর্চায় বৈপ্লবিক অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রেই ডালটন তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনিই প্রথম পরীক্ষা করে দেখান সব গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থকেই উচ্চচাপ ও নিম্ন তাপমাত্রায় তরলে রূপান্তরিত করা যায়।

এছাড়া সুমেরুজ্যোতি বা অরোরা বোরেলিসে তড়িৎ প্রকৃতিও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন।

জীবদ্দশাতেই ডালটন বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক হিসেবে দেশে বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি পরিচিত হয়েছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম হিসেবে।

জীবনে বহু সম্মান ও পুরস্কার তিনি লাভ করেছিলেন। ১৮২৬ খ্রিঃ লন্ডনের বিখ্যাত রয়েল সোসাইটি প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সুবর্ণপদক দান করেছিল। তিনি ফ্রান্সের বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

১৮৪৪ খ্রিঃ এই নিরভিমানী, অজাতশত্রু বিজ্ঞানতাপস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কার্ল ফ্রেডরিক গাউস

বিশুদ্ধ গণিত ও ফলিত গণিতে যুগান্তকারী অবদানের বিচারে কার্ল ফ্রেডরিক গাউসকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বললে অত্যুক্তি হবে না।

কেবল গণিত শাস্ত্রেই নয়, পদার্থ বিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও গাউসের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

জার্মানীর ব্রাউনসভাইগ শহরে এক হতদরিদ্র পরিবারে ১৭১৭ খ্রিঃ ৩০ শে এপ্রিল গাউসের জন্ম। তাঁর পিতা গেরহের্ড ডিড্রিক ছিলেন পেশায় রাজমিস্ত্রী। তাঁর

মায়ের নাম ডোরোথা বেনৎস। লেখাপড়ার প্রতি মায়ের প্রবল আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে।

পুত্রকে স্কুলে লেখাপড়া শেখাবার আর্থিক সামর্থ্য ডিড্রিক-এর ছিল না। কিন্তু মায়ের আগ্রহে ও চেষ্টায় গাউস স্কুলে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ডোরাথা কায়ক্লেশে অর্থের সংস্থান করে পুত্রের বিদ্যালয়ের খরচ জোগাতেন। তবে তাঁর এক সহোদরের সাহায্য ও সহানুভূতি না থাকলে হয়তো সন্তানের জন্য এই কর্তব্যটুকুও তিনি করে উঠতে পারতেন না।

গাউসের প্রতিভা ছিল সহজাত। এছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত অধ্যবসায়ী। তাঁর সবচাইতে বেশি আগ্রহ ছিল অঙ্কে।

কথিত আছে, তিনি যখন মাত্র তিন বছরের শিশু, পরিষ্কার করে সবকথাও বলতে পারেন না, সেই সময় একদিন পিতার হিসাবের ভুল শুধরে দিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

বিদ্যালয়ে তাঁর গণিতের অসামান্য প্রতিভা শিক্ষকদেরও চমৎকৃত করত। সাত বছর যখন তাঁর বয়স, সেই সময় একদিন একটি মস্ত বড় সমান্তর শ্রেণীর যোগফল মুখে মুখে বলে দিয়ে শিক্ষকদের বিস্মিত করে দিয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য, হতদরিদ্র পরিবারের এই শিশুটি তার প্রতিভা বলে বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক সকলের কাছেই আদরণীয় হয়ে উঠেছিল।

প্রবাদ আছে, প্রতিভা নিজেই তার পথ করে নেয়। বস্তুতঃ হয়েছিলও তাই। পোশাক পরিচ্ছদ যেমনই হোক, ক্লাসের দু-একটির বেশি বই কেনার ক্ষমতা হত না গাউসের।

পড়াশোনা চালাবার এটাই হয়ে উঠেছিল প্রধান বাধা। কিন্তু সেই বাধাও একদিন দূর হল। স্কুলের শিক্ষকরাই তাঁর বইপত্র কিনে দেবার ব্যবস্থা করতেন।

বালকের প্রতিভায় মুগ্ধ গণিতের শিক্ষক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ের বাইরেও তাঁকে অনেক গণিতের পুস্তক কিনে উপহার দিয়ে উৎসাহিত করতেন।

বালক গাউস কাউকে হতাশ করেননি। শিক্ষকদের ভালবাসা ও স্নেহের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। অল্পদিনেই গণিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন তিনি।

বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থাতেই সংখ্যাতত্ত্বের কিছু মৌলিক সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিলেন তিনি।

বালকের অস্বাভাবিক কৃতিত্ব জার্মানীর সমস্ত বিজ্ঞানীকে চমৎকৃত করেছিল। তাঁদের সব হিসেবেই গোলমাল ঘটিয়ে দিয়েছিলেন গাউস।

তাঁরা কোনভাবেই হিসেব মেলাতে পারেননি একটি বারো তেরো বছরের বালকের পক্ষে কি করে সংখ্যাতত্ত্বের দুরূহ সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

হাঁটতে চলতে সকল অবস্থাতেই গণিতই হয়ে উঠেছিল গাউসের একমাত্র চিন্তার বিষয়। ধ্যানজ্ঞান স্বপ্ন সবেরই কেন্দ্রে গণিত। বিদ্যালয়ে পাঠকালেই গণিত নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠেছিলেন তিনি।

গোড়ার দিকে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল জ্যামিতি। ইউক্লিডের জ্যামিতি ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ।

১৭৯৩ খ্রিঃ গাউস বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করলেন। গণিত শাস্ত্রের উন্নততর শিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি হলেন গোত্তিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই ১৭৯৬ খ্রিঃ মাত্র আঠারো বছর বয়সে গাউস আবিষ্কার করলেন সপ্তদশ বাহুবিশিষ্ট সুষম বহুভুজের অঙ্কন পদ্ধতি।

বিশ্ববিদ্যালয়েও একের পর এক চমক সৃষ্টি করলেন গাউস। পরের বছরেই তিনি বিশ্বের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

এমন কতকগুলি জ্যামিতিক সমস্যা ছিল যা প্রায় দুহাজার বছর ধরে বিখ্যাত গণিতবিদদের ব্যস্ত রেখেছিল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছিল না।

গাউস বিজ্ঞানীদের সেই সমস্যার সমাধান করে দিয়ে ছাত্রাবস্থাতেই লাভ করলেন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞের সম্মান।

জ্যামিতিতে গাউসের মৌলিক আবিষ্কারগুলি বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার প্রিন্সিপাল অব লিষ্ট স্কোয়ার্স, প্রকাশিত হয় ১৭৯৭ খ্রিঃ।

পরবর্তীকালে তাঁর এই আবিষ্কারের ভিত্তিতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল গণিত ও পরিসংখ্যানের মৌলিক সূত্র গাউসিয়ান ল অব নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন।

গোত্তিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হল। গণিতে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ পেলেন হেলমস্টেড বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এখান থেকেই তিনি ১৭৯৯ খ্রিঃ গণিতে মৌলিক গবেষণার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করলেন।

এই সময় আকস্মিক ভাবেই গাউসকে গবেষণার কাজ বন্ধ রাখতে হল। আর্থিক অনটনই এই অনর্থ ঘটাল। শুরু করলেন চাকরির চেষ্টা।

একদিন ঘোরাঘুরি করছেন, এমন সময় দৈবক্রমে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল ব্রাউনস ভাইগের ডিউক কার্ল ভিলহেলম-এর সঙ্গে।

ডিউক তাঁর নামের সঙ্গে আগেই পরিচিত ছিলেন। সাক্ষাৎ আলাপের সুযোগ পেয়ে তিনি গাউসের সমস্যার কথা জানতে পারলেন। গুণগ্রাহী ডিউক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর গবেষণার ব্যয়ভার গ্রহণ করলেন।

ভাগ্যের আনুকূল্যে এবং ডিউকের সাহায্যে গাউস পুনরায় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন।

দুর্ভাগ্য যে বেশিদিন ডিউকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সুযোগ তিনি পেলেন না। আকস্মিকভাবে দেশে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটল। ডিউক যুদ্ধে নিহত হলেন।

মাত্র কিছুদিন আগেই পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে গাউস বিয়ে করেছিলেন। বৃদ্ধ পিতামাতা এবং সদ্য পরিণীতা পত্নীকে নিয়ে চরম দুর্যোগের মুখে পড়তে হল তাঁকে। বাধ্য হয়েই পুনরায় চাকরির সন্ধানে বের হলেন।

অর্থোপার্জনের জন্য চাকরির প্রয়োজন ছিল ঠিকই, কিন্তু গবেষণাকেও স্থগিত রাখা যায় না।

একই সঙ্গে দুটো কাজ করবার সুবিধা পাওয়া যাবে, এমন একটি চাকরির জন্যই তিনি বেশি উৎসুক ছিলেন।

ফলে বহু শিক্ষায়তন থেকে অধ্যাপকরূপে যোগদানের আহ্বান এলেও তিনি এর কোনটিই গ্রহণ করতে পারছিলেন না।

এইভাবে কেটে গেল কিছুদিন। অবশেষে দুর্ভাগ্যের মেঘ কাটল। গোত্তিঙ্গেন মানমন্দির থেকে আহ্বান এল। গাউস নিযুক্ত হলেন মানমন্দিরের অধিকর্তার পদে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য কেটেও যেন কাটতে চাইছিল না। এই পদের জন্য খুব সামান্য বেতনই পাওয়া যেত।

সংসারের খরচ তা দিয়ে কায়ক্লেশে কুলিয়ে যাচ্ছিল। গবেষণা চালাবার মত বিশেষ কিছু হাতে থাকত না। তবু দমলেন না গাউস। সংসারের ব্যয় সংকোচ করে গবেষণা অব্যাহত রাখলেন।

ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর যে দীর্ঘ যুদ্ধ চলছিল এতদিনে তার নিষ্পত্তি হয়। দিগ্বিজয়ী বীর নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় হয়। নেপোলিয়ন যুদ্ধের ব্যয় বাবদ জার্মানীর ওপর কর ধার্য করলেন। জার্মানীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওপরেও করের দায়ভাগ চাপল অনিবার্য ভাবে। গাউস-এর ওপরও ধার্য হল দুহাজার ফ্রাঙ্ক।

সংসারই চলছিল টেনেটুনে। সঞ্চয়ের ঘর শূন্য। এই অবস্থায় যুদ্ধোত্তর করের বোঝা গাউসকে অকূল সমুদ্রে ফেলে দিল। করের বোঝা কাঁধে নিয়ে অর্থের সন্ধানে দিশাহারার মত ঘুরতে লাগলেন তিনি।

তৎকালীন সময়ে ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ছিলেন লাপলাস। গাউস-এর আর্থিক অনটনের কথা তাঁর কানে পৌঁচেছিল। তিনি গাউসকে বিব্রত করলেন না। তাঁকে না জানিয়েই গাউসের হয়ে নির্ধারিত করের অর্থ ফ্রান্সের রাজকোষে জমা দিয়ে দিলেন।

পরে গাউস লাপলাসের বদান্যতার কথা জানতে পেরে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। লাপলাসের ঋণ পরিশোধও করেছিলেন তিনি।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে গাউস পুনরায় তাঁর গবেষণার কাজ শুরু করলেন।

গণিতবিদ্যা ছাড়াও তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, তড়িৎচুম্বকতত্ত্ব ও ভূ-চুম্বকতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং প্রতিক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সিসিলির প্রসিদ্ধ জ্যোর্তিবিজ্ঞানী পিয়াজী সেই সময় গ্রহাণুপুঞ্জের সিরিস নামক গ্রহাণু আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই গ্রহাণুর আকার এবং ভর সম্বন্ধে সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। গাউস নিজের গবেষণা দ্বারা এই অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করেছিলেন।

গোড়া থেকেই গাউস ছিলেন প্রচারবিমুখ এবং বিজ্ঞানের নীরব সাধক। ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন উদার ও সরলপ্রকৃতির। গুণীকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে তিনি কখনো কার্পণ্য করতেন না। এমন কি শত্রুর প্রশংসাতেও তিনি কখনো কুণ্ঠিত হতেন না।

নেপোলিয়নের কাছে জার্মানীর পরাজয় ঘটেছিল। দুঃসহ করের বোঝা তিনি চাপিয়েছিলেন জার্মানীর কাঁধে। এর ফলে চরম দুর্যোগ নেমে এসেছিল গাউসের জীবনে।

নেপোলিয়নের পতনের পর শত্রুর প্রশংসা শুনে তাঁর স্বদেশবাসী বিরূপ হবে জেনেও গাউস একজন যথার্থ মহাবীরের পতনে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

ফল যা হবার তাই হয়েছিল। তাঁকে দেশবাসীর বিরাগ ভাজন হতে হয়েছিল। তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল নেপোলিয়নের সম্পর্কে সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ লিখতে।

গাউস ছিলেন বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী। তিনি মনে করতেন সমস্ত মানুষই পৃথিবী নামক এক গ্রহের অধিবাসী। কেউ জার্মান, কেউ ফরাসী, কেউ ইংরাজ—এরকম দেশের বিভাগ ও পরিচয় তিনি পছন্দ করতেন না। এই সম্পর্কে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন।

গাউস তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করতেন না। তাঁর মাথায় যখনই যেই প্রশ্ন জেগেছে, নিরন্তর গবেষণার মাধ্যেমে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। গবেষণার ফলাফল তিনি লিখে রাখতেন।

তাঁর দীর্ঘ গবেষণালব্ধ তথ্যগুলির বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে। মৃত্যুর ৪৩ বছর পরেও অনেক গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

বিদেশ ভ্রমণ, বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো এসবেও বিশেষ অনীহা ছিল তাঁর। ফলে অনেকেরই বিরাগভাজন হতে হয়েছে তাঁকে। ব্যক্তিগত শোক, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা সবই নীরবে সহ্য করেছেন।

শেষ বয়সে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে চাইতেন না, মানমন্দিরেই পড়ে থাকতেন নিজের কাজ নিয়ে।

১৮৫৫ খ্রিঃ ২৩ শে ফেব্রুয়ারী এই নীরব বিজ্ঞান সাধকের দেহান্তর ঘটে।

অ্যামদিও অ্যাভোগাদ্রো



পরমাণুর প্রবর্তক হিসেবে জন ডালটনের নামের সঙ্গে আর একজন বিজ্ঞানীর নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, তাঁর নাম অ্যামদিও অ্যাভোগাদ্রো।

ডালটনের তত্ত্বের মধ্যে অনেক ত্রুটি ধরা পড়েছিল পরবর্তীকালে। অ্যাভোগাদ্রোর তত্ত্ব সেই হিসেবে ত্রুটিহীন বলে স্বীকৃতিলাভ করেছে।

তাঁর মতবাদকে ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত বহু তথ্য ব্যাখ্যা করা সহজ হয়েছিল।

ইতালিব এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৭৭৬ খ্রিঃ অ্যাভোগাদ্রোর জন্ম হয়েছিল। ফলে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানেই তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়েছিল। তাঁর ছাত্রজীবন ছিল অত্যন্ত গৌরবময়।

আশ্চর্যের বিষয় হল, ভবিষ্যতে তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছিলেন, ছাত্রাবস্থায় তাঁর শিক্ষার বিষয় কিন্তু বিজ্ঞান ছিল না।

আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন অ্যাভোগাদ্রো। বিজ্ঞানে প্রথাগত কোন শিক্ষা বা ডিগ্রি তাঁর ছিল না। তবে বিজ্ঞানের প্রতি ছিল নীরব আকর্ষণ। ফলে কর্মজীবনে প্রবেশ করে তিনি বিজ্ঞানচর্চার দিকে ঝুঁকলেন। বিষয়টা ছিল তাঁর অবসর বিনোদনের মাধ্যম।

শিক্ষালাভের পর যথারীতি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। কিন্তু ক্রমেই বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে লাগল।

পরে অবস্থা এমন হল যে অবসরকালের চর্চার বিষয়টিই তাঁর ভাবনা-চিন্তা অধিকার করে বসল।

শেষ পর্যন্ত আইন ব্যবসায় বন্ধ করে পুরোপুরিভাবে বিজ্ঞান সাধনায় মনোনিবেশ করলেন। আইনব্যবসায়ী পরিণত হল বিজ্ঞানীতে।

রসায়ন বিজ্ঞানই ছিল অ্যাভোগাদ্রোর চর্চার বিষয়। ডালটনের পরমাণুবাদের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তারই প্রেরণায় গবেষণা আরম্ভ করলেন পদার্থের গঠন সম্পর্কে।

এই সময়েই তিনি লক্ষ করলেন, ডালটনের পরমাণুবাদের তত্ত্ব প্রয়োগ করে সর্বক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি তার যথার্থতা বিচারের জন্য নিজেই একটি প্রকল্প রচনা করলেন। তাঁর এই প্রকল্প বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অ্যাভোগাদ্রো প্রকল্প নামে খ্যাতিলাভ করেছিল।

তাঁর এই প্রকল্পের সিদ্ধান্ত হল, যে কোন পদার্থকেই ক্রমাগত ভাঙ্গতে থাকলে এমন এক অবস্থা আসবে যা হল পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকা অবস্থা। এই কণিকায় পদার্থের নিজস্ব গুণ বা অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু এই কণিকাটিকে আরও ভাঙ্গা হলে শেষ পর্যন্ত তা পদার্থের গুণ হারাবে।

অ্যাভোগাদ্রো পদার্থের ধর্ম ও গুণ সমন্বিত কণিকা অবস্থার নাম রাখলেন অণু আর পদার্থের গুণ ও ধর্ম হারানো চরমতম অবস্থার কণিকার নাম রাখলেন পরমাণু।

এবিষয়ে তিনি আরও একটি সিদ্ধান্ত করলেন যে একই উষ্ণতা ও চাপে মৌলিক কিংবা যৌগিক যে কোন সম আয়তন গ্যাসের মধ্যে অণু থাকে সমান সংখ্যায়।

অ্যাভোগাদ্রোর পূর্বেও একজন বিজ্ঞানী পদার্থকে বিভাজিত করে প্রায় একইরকম সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তাঁর নাম বার্জিলিয়াস।

অবশ্য তাঁর সিদ্ধান্তে একটি ভুল থাকার জন্য সেটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। তিনি অণুকে পরমাণু কল্পনা করেছিলেন।

তখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা পরমাণুকে কেন্দ্র করেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই অ্যাভোগাদ্রোর সিদ্ধান্ত ও প্রবর্তিত মতবাদ বিজ্ঞানীদেব পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হল না। তাঁদের মতে ডালটন বা বার্জিলিয়াস প্রবর্তিত মতবাদ নির্ভুল।

প্রতিভাধর বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তের প্রতি অন্ধ ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন বিজ্ঞানী অ্যাভোগাদ্রোর নতুন মতবাদকে পরীক্ষা করে দেখারও উৎসাহ বোধ করলেন না।

ফলে অ্যাভোগাদ্রোর গবেষণা উপেক্ষিতই রইল। সময় এককালে তাঁকে বিস্মৃতির আড়ালে সরিয়ে নিল।

স্ট্রানিসলাও ক্যানিজারো ছিলেন অ্যাভোগাদ্রোর ছাত্র। তিনি আবার এককালে গুরুর মতবাদটিকে তুলে ধরলেন। তখনো পর্যন্ত ডালটনের পরমাণুবাদই অপরিবর্তিত। যদিও বিজ্ঞানীদের অনেকের মধ্যেই তখন প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে। তারা এবারে বাধ্য হয়ে অ্যাভোগাদ্রোর প্রকল্পের সত্যতা যাচাই করতে উৎসাহী হলেন।

এবারে পরমাণু জগতের অনেক রহস্যই ধরা দিতে লাগল বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। অ্যাভোগাদ্রোর যথার্থতা বিষয়ে তাঁদের আর সংশয় রইল না।

মৃত্যুর পরে স্বীকৃতি পেলেন অ্যাভোগাদ্রো। তাঁর প্রকল্পটি যুগান্তকারী আখ্যা লাভ করল।

যথারীতি এই প্রকল্প প্রয়োগ করে ডালটনের পরমাণুবাদ সংশোধিত হল বিজ্ঞানীদের দ্বারা। প্রমাণিত হল, যে কোন গ্যাসীয় অণু দুই পরমাণু বিশিষ্ট। এই সূত্রকে কাজে লাগিয়ে পদার্থের আণবিক ওজন নির্ণয় করা সম্ভব হল। অ্যাভোগাদ্রোর মতবাদ সূত্ররূপে বিজ্ঞান জগতে গৃহীত হল।

অ্যাভোগাদ্রো বিজ্ঞানের প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁর পেশাও ছিল ভিন্ন। তবু আন্তরিক আকর্ষণের বশে বিজ্ঞানের চর্চাতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি বিজ্ঞানীদের কাছে উপেক্ষিতই ছিলেন। প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর নীরব সাধনা ব্যর্থ হয়নি। মৃত্যুর পর রসায়ন বিজ্ঞান তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

১৮৫৬ খ্রিঃ অ্যাভোগাদ্রোর জীবনাবসন হয়।

হামফ্রে ডেভি



বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি আবিষ্কারের কৃতিত্বের অধিকারী টমাস আলভা এডিসন। তাঁর পরে আবিষ্কারক হিসেবে যে রসায়ন বিজ্ঞানীর নাম করা হয়, তিনি হলেন স্যার হামফ্রে ডেভি। তাঁর অবদান রসায়ন বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে গতি সঞ্চার করেছিল।

হামফ্রে ডেভি জন্মেছিলেন ইংলন্ডে ১৭৭৮ খ্রিঃ ১৭ই ডিসেম্বর।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসক বৃত্তি গ্রহণ করেন।

স্কুলজীবনেই ডেভি এটা সেটা নিয়ে পরীক্ষা করতে বসতেন। বিজ্ঞান নিয়ে এভাবেই হয়েছিল তাঁর হাতেখড়ি।

তীব্র অনুসন্ধিৎসা আর কৌতূহল ছিল ডেভিব সহজাত। চারপাশের যা কিছু তাঁর মনে প্রশ্ন জাগাত, তাই নিয়েই চিন্তাভাবনা করা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই অভ্যাসের বশেই চিকিৎসা বৃত্তি গ্রহণ করার পর তিনি নিজস্ব প্রয়োজনে একটি ছোট গবেষণাগার তৈরি করে নিলেন। অবসর সময়ে সেখানে নানা বিষয়ের গবেষণায় মেতে থাকতেন।

গোড়ার দিকে তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞান ভিত্তিক। নানা রাসায়নিক পদার্থের ওষুধ হিসেবে গুণাগুণ পরীক্ষাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

এইভাবে দিনের পর দিন পরীক্ষা করতে করতেই ১৭৯৯ খ্রিঃ আকস্মিকভাবে তিনি একটা নতুন বিষয়ের সন্ধান পেয়ে গেলেন। তিনি লক্ষ করলেন নাইট্রাস অক্সাইডে রয়েছে চেতনানাশক গুণ।

মাত্র আঠারো বছর বয়সে এই আবিষ্কার তাঁকে বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত করে তুলল।

সাফল্যের প্রেরণায় এরপর তিনি গবেষণায় মেতে উঠলেন। রোগী দেখা একরকম বন্ধই হয়ে গেল।

তাঁর সময় কাটতে লাগল গবেষণাগারে। দিনে দিনে রসায়ন বিজ্ঞান তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল।

ডেভির উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারগুলির মধ্যে প্রধান বলা যায় বিদ্যুতের সাহায্যে রাসায়নিক পদার্থের বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

এই পদ্ধতির সাহায্যে তিনি ১৮০৭ খ্রিঃ সোডিয়াম ও পটাসিয়াম নামক দুটি ক্ষার ধাতু আবিষ্কার করেন।

এই সময়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্বন্ধেও ডেভি অনেক তথ্য প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে এই তথ্যগুলি বহু বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়বস্তু হয়েছিল।

ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থগুলি হ্যালোজেন গ্রুপের অন্তর্গত।

ডেভি একসময় দীর্ঘ গবেষণায় রত হলেন ক্লোরিন নিয়ে। বহু মূল্যবান তথ্য তাঁর কাছ থেকে লাভ করল রসায়ন বিজ্ঞান।

এই সময়ে বিজ্ঞানীদের একটি বড় ভুলও তিনি সংশোধন করে দেন।

অ্যাসিড মাত্রই অক্সিজেনের একটি যৌগিক, সেই সময়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ছিল প্রচলিত ধারণা। তাঁরা জানতেন যে কোন অ্যাসিডকে বিশ্লেষণ করলেই অক্সিজেন পাওয়া যাবে।

ডেভি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে বিশ্লেষণ করে প্রথম দেখালেন সব অ্যাসিডেই অক্সিজেন থাকে না। তবে হাইড্রোজেনের অবস্থান বাধ্যতামূলক। বিজ্ঞানীদের দেওয়া অক্সিজেন নামটাই যে ভুল তা তাঁর পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হল। কারণ অক্সিজেন অ্যাসিড উৎপাদক মাত্র।

হ্যালোজেন পরিবারের বিখ্যাত মৌলিক পদার্থ ক্লোরিন নিয়ে ডেভির গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্লোরিন নিয়ে গবেষণা করেও তিনি বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন।

ডেভির জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি লিথিয়াম নামের ক্ষার ধাতুর আবিষ্কার। এছাড়াও তিনি আবিষ্কার করেন বেরিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম নামক ধাতু দুটি। মৃত্তিকা ধাতু স্টনসিয়ামের সঙ্গে তাঁর নামও যুক্ত।

খনিতে ব্যবহৃত সেফটিল্যাম্প বা নিরাপত্তা বাতি ডেভির এক মহান আবিষ্কার। খনিশ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি এই বাতি আবিষ্কার করেছিলেন ১৮১৬ খ্রিঃ।

তাঁরই নামানুসারে বাতিটির নামকরণ হয়েছে ডেভির নিরাপত্তা বাতি।

আজকাল খনির কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। শ্রমিকরা সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক বাতিই ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু ডেভি প্রবর্তিত নিরাপত্তা বাতির প্রয়োজন এখনও ফুরায়নি।

হয়তো ভবিষ্যতে আরো বহুকাল খনি শ্রমিকরা ডেভির নিরাপত্তা বাতির সুবিধা ভোগ করবে।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ডেভির সবচেয়ে বড় অবদান সম্ভবতঃ বিজ্ঞানী ফ্যারাডেকে আবিষ্কার।

স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষাবর্জিত অতি সাধারণ এক বই বাঁধাইয়ের দপ্তরীকে তিনি নিজের হাতে গড়েপিটে উত্তরকালে এক অসাধারণ বিজ্ঞানীতে পরিণত করেছিলেন।

বিজ্ঞান বিষয়ে ফ্যারাডের প্রতিভা উপলব্ধি করতে ডেভির ভুল হয়নি। তাঁর চেষ্টাতেই জগৎ লাভ করেছিল এক মহান বিজ্ঞানীকে। ফ্যারাডের আবিষ্কারই বিজ্ঞান জগতে বিদ্যুৎ যুগের সূচনা ঘটিয়েছিল।

ডেভি ছিলেন সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের মানুষ। বিজ্ঞান সাধনা তাঁকে দিয়েছিল যশ, অর্থ, সম্মান। কোন কিছুতেই তিনি আচ্ছন্ন হননি।

বিজ্ঞানের গবেষণা যখন তাঁর জীবনে প্রাধান্য লাভ করল তখনও তিনি সময় ও সুযোগ মত জনসেবা করেছেন চিকিৎসকরূপে। এই কাজ করেছেন তিনি আমৃত্যু।

ডেভি তাঁর জীবদ্দশাতেই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান লাভ করেছিলেন। দেশ বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মান জানিয়েছিল।

ডেভি যখন বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস নিয়ে গবেষণা করছিলেন, সেই সময় একদিন অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন। তারপর থেকেই তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পডতে থাকে। অনেকের ধারণা ক্লোরিন গ্যাসের গবেষণাই তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল।

মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে ১৮২৯ খ্রিঃ ২৯শে মে ডেভির মৃত্যু হয়।

কাউন্ট রামফোর্ড

তাপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাপ গতিবিদ্যার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন রামফোর্ড। তাপবিজ্ঞানে আজকের দিনের অগ্রগতির মূলে রয়েছে এই বিজ্ঞানীর নিরলস সাধনা।

আমেরিকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৭৫৩ খ্রিঃ রামফোর্ডের জন্ম হয়েছিল। বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে উপনিবেশিক গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন বলে জানা যায়।

এই যুদ্ধে ব্রিটেনের পরাজয় ঘটে। বাধ্য হয়ে তখন রামফোর্ডকে দেশত্যাগ করে লন্ডনে পালিয়ে যেতে হয়।

লন্ডনে রামফোর্ড কর্মজীবন শুরু করেন ইঞ্জিনিয়ার রূপে। প্রিন্স অব ব্যাভেরিয়ার অধীনে কাজ করতে হয় তাঁকে।

পরে এই কাজ ছেড়ে তিনি মিউনিখ শহরের অস্ত্রশালায় কামান তৈরির কাজে নিযুক্ত হন। এখানে কাজ করবার সময়েই ১৭৯৮ খ্রিঃ অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ তাপগতিবিদ্যার তথ্য আবিষ্কার করেন।

এই তথ্য আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, তাপ অতি সূক্ষ্ম পদার্থকণা। এই কণাগুলো বস্তু থেকে বস্তুতে সঞ্চালিত হয়ে তাপের উৎপত্তি ঘটায়।

প্রচলিত এই ধারণা রামফোর্ডের অজানা ছিল না। একদিন কামান তৈরির জন্য তিনি একখানা ধাতব পাত ছিদ্র করছেন, সেই সময় লক্ষ করলেন পাতটি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

কারণ বুঝতে না পেরে তিনি বিস্মিত হলেন। এরপর তিনি পাতখানাকে জলে ডুবিয়ে রেখে ছিদ্র করতে আরম্ভ করলেন।

বিস্ময়ের তখনো যথেষ্ট বাকি ছিল। পাতখানা এত উত্তপ্ত হয়ে উঠল যে জল ক্রমেই গরম হতে লাগল। শেষে একসময় ফুটতে আরম্ভ করল।

ব্যাপারটা রামফোর্ডের মনে রেখাপাত করল। তিনি ঘটনাটার কার্যকারণ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

তাপ অতি সূক্ষ্ম এক পদার্থকণা এবং এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে সঞ্চালিত হয়। রামফোর্ড চিন্তা করলেন, যদি তাই হয় তাহলে ঠান্ডা ধাতব পদার্থের সংস্পর্শে এসে জল স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছল কি করে? ঠান্ডা ধাতব পদার্থে তাপ কিভাবে সঞ্চালিত হওয়া সম্ভব?

অনেক চিন্তার পর রামফোর্ড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, কোন বস্তুর উত্তপ্ত হওয়ার পেছনে অন্য কোন কারণ নিহিত। অন্য বস্তু থেকে তাপসঞ্চালনই একমাত্র কারণ নয়, ঘর্ষণের ফলেই তাপ উৎপন্ন হয়।

রামফোর্ড তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা লন্ডনের বিখ্যাত কয়েকটি বিজ্ঞানের পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করলেন।

মহান বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি তখন ইংলন্ডে স্বমহিমায় বর্তমান। রামফোর্ডের প্রবন্ধটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

তাপের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর মনেও সন্দেহ উপস্থিত হল। তিনি বসে গেলেন রামফোর্ডের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে।

এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি বিশেষ ধরনের পরীক্ষা চালালেন। এক সময় বরফে বরফে ঘর্ষণের ফলাফলও লক্ষ করলেন। প্রবল ঘর্ষণের ফলে বরফ গলে জল হয়ে গেল।

প্রচলিত ধারণা ছিল যে বরফের মধ্যে তাপের সূক্ষ্ম কণা অনুপস্থিত, সেকারণেই পদার্থটি বরফ। কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা গেল বরফ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা সত্য নয়।

তাপহীন বস্তু থেকে তাপ সঞ্চালন হওয়া তো সম্ভব নয়। অথচ বরফ তাপ ব্যাতিরেকে গলবার কোন কারণ নেই।

ডেভি রামফোর্ডের যুক্তিকে সমর্থন করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন।

এইভাবেই অতি সাধারণ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রামফোর্ড তাপবিজ্ঞানের জগতে নতুন যুগের সূচনা করলেন।

এরপর রামফোর্ড মিউনিখ অস্ত্রশালার চাকরি ছেড়ে ১৭৯৯ খ্রিঃ লন্ডনে চলে এলেন। জীবনের অবশিষ্ট সময় তিনি বিজ্ঞানের উন্নতির চেষ্টায় বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত হন।

লন্ডনের বিখ্যাত রয়েল ইনসটিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

১৮১৪ খ্রিঃ কাউন্ড রামফোর্ডের মৃত্যু হয়।

জোসেফ নিয়েপসে

ফরাসী বিজ্ঞানী জোসেফ নিয়েপসের গবেষণার বিষয় ছিল ফটোগ্রাফি। আধুনিক ফটোগ্রাফির সূত্রপাত বলতে গেলে তিনিই ঘটান।

নিয়েপসের পরেও ফটোগ্রাফি নিয়ে অনেকানেক গবেষণা হয়েছে এবং বহু উল্লেখযোগ্য তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু চিত্রকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার পদ্ধতি তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন।

আজকে আমরা যেসব ক্যামেরা দেখি তার ক্রিয়াকৌশল ইত্যাদি তখনকার দিনে কিন্তু এরকম ছিল না।

সেই সময় ক্যামেরা বলতে ছিল একটি ছোট কাঠের বাক্স। এই বাক্সের গায়ে থাকত একটি ছিদ্র।

ছিদ্রের সোজাসুজি বাক্সের ভেতরের দেয়ালের গায়ে ঝোলানো থাকত একখানা ঘষা কাঁচের পর্দা।

বাক্সের গায়ের ছিদ্রপথে আলো পর্দার ওপর পড়ত এবং দৃশ্যবস্তুর একটা উল্টো প্রতিবিম্ব দেখে শিল্পী কাগজে ছবি আঁকতেন।

বহু পূর্বকাল থেকে এই পদ্ধতিতেই ছবির কাজ করা হয়ে আসছিল। কে যে কবে এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন তা জানা যায় না। যাই হোক কোন একটি বিষয়ের হুবহু ছবি পেতে হলে বাক্স নামক ক্যামেরা এবং চিত্রশিল্পীর যৌথ উদ্যোগেই তা সম্ভব হত।

গবেষক বিজ্ঞানীর অভাব তো প্রাচীনকালেও ছিল না। তাঁদের অনেকেই উন্নততর ক্যামেরা উদ্ভাবনের চেষ্টায় গবেষণাও করছিলেন।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও চিত্রকর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এই পচলিত পদ্ধতির কিছুটা উন্নতিসাধন করেছিলেন।

তিনি ছবিকে অধিকতর স্পষ্ট করে তুলবার জন্য বাক্সের ছিদ্রের গায়ে একখানা লেন্স জুড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি এতেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। যন্ত্রের মাধ্যমে ছবি আপনা থেকে সৃষ্টি হবে এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক।

ক্যামেরার পটে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীকে বা কোন মানুষের প্রতিকৃতিকে স্থায়িত্ব দানের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলতে লাগল।

এবিষয়ে সম্ভবতঃ নিয়েপসেই প্রথম উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি বুঝতে পেবেছিলেন কোন রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যেই ছবিকে পর্দার গায়ে স্থায়িত্ব দানের চেষ্টা সফল হতে পারে।

সেই সময় সিলভার ক্লোরাইড নামের একটি রূপার যৌগিক পদার্থের পরিচয় বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছিলেন।

সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণকে সূর্যের আলোতে ধরলে তা কালো হয়ে যায়। অনেক ভাবনা চিন্তার পর নিয়েপসে এই বিশেষ দ্রবণটিকেই কাজে লাগাবেন বলে স্থির করলেন।

তিনি প্রথমে একটা কাগজ সিলভার ক্লোরাইড দিয়ে ভিজিয়ে নিলেন। তারপর ক্যামেরার বাক্সের ভেতরে ঘষা কাচের পর্দার ওপর ঝুলিয়ে দিলেন।

এরপর এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে ছিদ্রের মুখ ইচ্ছেমত খোলা ও বন্ধ করা চলে।

এরপর ছিদ্রপথে দৃশ্যবস্তু থেকে আলো যখন সিলভার ক্লোরাইডে সিক্ত কাগজের ওপরে পড়ল তখন গঠিত হল একটি সুন্দর ছবি। স্থায়ী ছবি। তার জন্য অন্য কোন চিত্রশিল্পীর সাহায্যের দরকার হল না।

সবই হল, কিন্তু কাগজের গায়ে ছবিটা হল উল্টো।

নিয়েপসে স্থায়ী ছবির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ছবিটি উল্টো হবার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেননি। আর এই উল্টো ছবি থেকে প্রকৃত নিখুঁত ছবি পাওয়ার কোন চেষ্টাও তিনি করেননি।

সম্ভবতঃ ছবির জন্য এই ধরনের ঝক্কিঝামেলা নিয়েপসের পছন্দ ছিল না। এই সম্পর্কে তিনি আর মাথা না ঘামিয়ে নতুন কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায় কিনা সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন।

এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করলেন।

দীর্ঘ গবেষণার পর সফল হলেন নিয়েপসে। নতুন একটি কৌশল আবিষ্কার করলেন।

এবারে তাঁর সরঞ্জাম হল একটি তামার পাত। সিলভার ক্লোরাইডের পরিবর্তে তাতে মাখিয়ে নিলেন বিটুমেন।

এই পাতটি ক্যামেরার মধ্যে রেখে তাতে ছিদ্রপথে সূর্যের আলো ফেলে অদ্ভুত ফল পাওয়া গেল।

দেখা গেল, যেখানে রোদ পড়ে সেখানে বিটুমেন শক্ত হয়ে এঁটে যায়। রোদ যেখানে পড়ে না বিটুমেন সেখানে আগের মত নরমই থাকে।

এইভাবে তামার পাতটিকে কয়েকঘন্টা রাখার পর ল্যাভেন্ডার তেল দিয়ে ধুয়ে ফেলা হল বিটুমেন।

দেখা গেল, যেখানে যেখানে বিটুমেন শক্ত হয়ে গিয়েছিল সেখানে তামার পাতের কোন ক্ষতি হয়নি।

কিন্তু যেখানে রোদ পড়েনি এবং বিটুমেন নরম ছিল সেখানে তামার পাত ক্ষয়ে গেছে। এর ফলে পাতের গায়ে সৃষ্টি হয়েছে সুন্দর একটি ছবির ছাঁচ।

এবারে নিয়েপসে তামার পাতের গায়ে কালি মাখিয়ে কাগজে ছাপ দিলেন। দৃশ্যবস্তুর অবিকল একটি প্রতিচ্ছবি পাওয়া গেল। ছবি দেখে খুশি হলেন নিয়েপসে।

কিন্তু এখানেই থেমে থাকলেন না তিনি। স্থায়ী ছবিটিকে কি করে আরও সুন্দরভাবে পাওয়া যেতে পারে সেই চেষ্টা করতে লাগলেন।

দ্যাগোরে নামে এক শিল্পীর সঙ্গে আলাপ ছিল নিয়েপসের। তিনিও এসে জুটলেন তাঁর সঙ্গে। দুজনে মিলে মেতে উঠলেন ক্যামেরা নিয়ে।

ইতিমধ্যে আকস্মিকভাবে নিয়েপসের মৃত্যু হল। দ্যাগোরে একা হয়ে পড়লেন। কিন্তু দমলেন না। নিয়েপসের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করবার চেষ্টায় পরিশ্রম করে চললেন।

কিছুদিন গবেষণার পর নিয়েপসের পদ্ধতিকে সার্থকভাবে কাজে লাগাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন তিনি।

আধুনিক ক্যামেরার আবিষ্কার তখনো অবশ্য অনেক দূরে। বিজ্ঞানী আরগো নিয়েপসের মৃত্যুর ছ'বছর পরে এই কাজটি করেছিলেন। তবে তাঁর কৃতিত্বেও নিয়েপসের দানই সর্বাধিক।

ফ্রান্সের এক অভিজাত পরিবারে ১৭৬৫ খ্রিঃ ৭ই মার্চ নিয়েপসের জন্ম হয়। প্রাচুর্যের মধ্যেই বড় হয়েছিলেন নিয়েপসে। কিন্তু ভোগবিলাসের প্রতি কোন আসক্তি ছিল না তাঁর।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন চিন্তাশীল। লেখাপড়ায়ও বরাবর ছিলেন কৃতি ছাত্র। বিজ্ঞানের প্রতিই ছিল ঝোঁক।

স্কুলের পড়া শেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

ফরাসীবিপ্লবে সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে থাকে, চোখদুটিও খারাপ হয়। বাধ্য হয়ে সৈন্য বিভাগের চাকরি ছেড়ে বাড়িতে ফিরে আসতে হয় তাঁকে।

সুচিকিৎসার সাহায্যে হৃতস্বাস্থ্য ফিরে না এলেও অনেকটাই সুস্থতা ফিরে পেলেন। তবে চাকরি করার ক্ষমতা আর রইল না।

বিজ্ঞানের গবেষণা আগেই আরম্ভ করেছিলেন, এবারে তা নিয়েই মগ্ন হলেন। ক্যামেরা নিয়েই একরকম গোটা জীবন অতিবাহিত করেছেন তিনি।

১৮৩৩ খ্রিঃ নিয়েপসের মৃত্যু হয়।

চার্লস হোপ

শীতপ্রধান দেশে দেখা যায় সাগর, নদী, হ্রদ, খাল, বিলের জল জমে বরফ হয়ে যায়। কিন্তু দেখা যায় সেই বরফের তলায় থাকে উষ্ণ জল। সেখানে জলচর প্রাণীরা স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারে। এমনটা হয় কি করে?

এই অদ্ভুত ব্যাপারটি বিজ্ঞানের যে সূত্রের কারণে সম্ভব হয় তা আবিষ্কার করেছিলেন ইংরাজ পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানী চার্লস হোপ। বিজ্ঞানের এই সত্য আবিষ্কারের গৌরবই তাঁকে অমরত্ব দান করেছে।

হোপ আবিষ্কার করেছিলেন ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব সর্বাধিক। এই সত্যটি আবিষ্কার করার পর তিনি তা বোঝাবার জন্য যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা এ রকম ঃ

শীতপ্রধান দেশে প্রবল ঠান্ডার সময়ে নদী কিংবা সাগরের জল ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে শীতল হয়।

শীতল জল অপেক্ষাকৃত ভারী বলে সেই জল জলাশয়ের তলায় চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিচের উষ্ণ জল ওপরে উঠে আসে।

ওপরের জলও একসময় শীতলতা লাভ করে নিচে চলে যায় এবং তল দেশের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জল ওপরে চলে আসে।

এইভাবে একটা পরিচলন স্রোত চলতে চলতে জলাশয়ের তলদেশের জল ৫° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় চলে আসে।

অন্যান্য তাপমাত্রার জলের তুলনায় ৪° সেন্টিগ্রেড জল অপেক্ষাকৃত ভারী। ফলে সেই জল ওপরে উঠতে পারে না এবং তার তাপও বজায় থাকে।

সেই অবস্থায় ওপরের জল স্থিতাবস্থা লাভ করে ক্রমে শীতল হতে থাকে এবং ০° সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে জমে বরফ হয়ে যায়।

জলাশয়ের তলদেশের জল ০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নেমে আসতে পারে না। ফলে তা আর বরফ হয় না, জলই থেকে যায়।

চার্লস হোপ এই সত্যটি আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

১৭৬৬ খ্রিঃ এডিনবরা শহরে জন্মগ্রহণ করেন চার্লস হোপ।

তাঁর ছাত্রজীবন ছিল গৌরবময়। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই বিজ্ঞানের কয়েকটি মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করে প্রশংসা লাভ করেছিলেন।

১৭৮৭ খ্রিঃ তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে হোপ রসায়ন বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন। এই সময় তিনি স্টনসিয়াম নামে একটি নতুন ধাতু আবিষ্কার করেন।

অজ্ঞাতপূর্ব স্টনসিয়াম সম্বন্ধে দীর্ঘ গবেষণার পর হোপ এই ধাতু বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিতে সক্ষম হন।

এই আবিষ্কার তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসায়ন বিজ্ঞানীর সম্মান দান করে।

গবেষণাকার্যের সুবিধার জন্য ১৭৯৫ খ্রিঃ হোপ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এখানে তিনি হলেন রসায়নের সহকারী অধ্যাপক।

চারবছর পরেই ১৭৯৯ খ্রিঃ রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

এডিনবরায় অবস্থান কালেই তিনি জলের ব্যাতিক্রান্ত প্রসারণ তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন।

১৮৪৩ খ্রিঃ হোপ কর্মক্ষেত্রে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। একবছর পরেই ১৮৪৪ খ্রিঃ সাতাত্তর বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

জর্জ সাইমন ওহম

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি মাত্র সূত্র আবিষ্কার করেই ভবিষ্যৎকালের বিজ্ঞানীদের বহুতর গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন এক এক জন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের ইতিহাস তাঁদের যথোপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

এমনি এক মহান বিজ্ঞানী জর্জ সাইমন ওহম। তাঁর আবিষ্কৃত তড়িৎ বিজ্ঞানের সূত্রটি ওহমের সূত্র নামে পরিচিত।

জর্জ ওহম জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮৭ খ্রিঃ জার্মানীতে এক দরিদ্র পরিবারে। অভাব অনটনের সংসারে থেকে প্রচন্ড পরিশ্রম স্বীকার করে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল।

তবে অভাবের চাপে মাঝে মাঝেই পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হত। অর্থোপার্জনের জন্য ছোটখাট কাজ করতে হত। কিছু সঞ্চয় হলে আবার পড়াশোনা আরম্ভ করতেন।

বিদ্যার্জনের প্রতি গভীর আগ্রহ থাকার ফলেই তিনি পড়াশোনার জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেননি।

শেষ পর্যন্ত অভাবের বাধাকে তিনি সগৌরবে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বি.এ পাশ করে কলেজের পড়া সাঙ্গ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ছিল তাঁর। একসময়ে এমন ইচ্ছাও পোষণ করতেন, তিনি বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করবেন।

অর্থকৃচ্ছ্রতার উপর্যুপরি বাধার মধ্যে থেকেও তিনি মনের সঙ্গোপন ইচ্ছা পরিত্যাগ করেননি।

অসাধারণ মেধা ছিল তাঁর। সেই সঙ্গে ছিল অধ্যবসায়। এরই সংযোগে তাঁর প্রতিভা বিকাশ লাভের সুযোগ পেয়েছিল।

বি.এ পাশ করার পর ওহম জেসুইট হাইস্কুলে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। এই কাজে থাকার সময়েই তিনি বিজ্ঞানের গবেষণার সুযোগ পান।

সেই সময়ে বিজ্ঞানীরা তড়িৎ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠেছিলেন। ওহমও এই বিষয়ে আকর্ষণ বোধ করলেন। তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে গবেষণা আরম্ভ করলেন এবং কিছুকাল পরেই আবিষ্কার করলেন তড়িৎ বিজ্ঞানের একটি মহান সূত্র।

১৮২৬ খ্রিঃ তাঁর এই আবিষ্কারের কথা বিশ্ববাসী জানতে পারল। বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি জানালেন।

ওহম-এর বিখ্যাত সূত্রটি হল, তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোন পরিবাহীর প্রবাহমাত্রা ওই পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদের সমানুপাতিক হয়।

ওহম-এর এই সূত্রটি প্রবাহী তড়িৎ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় সূত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ নুরেমবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় জর্জ ওহমকে ১৮৩৩ খ্রিঃ পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।

এখানে কিছুকাল কাজ করার পরেই তিনি মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পান। পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন।

বহু সম্ভাবনাময় মহান আবিষ্কারের জন্য ওহম বহু বিজ্ঞান সংস্থার কাছ থেকে সম্মান লাভ করেন। ১৮৪১ খ্রিঃ লন্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করে।

তড়িৎ বিজ্ঞানের একটি একক-ও ওহম-এর নামে প্রচলিত হয়েছে।

১৮৫৪ খ্রিঃ এই বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়।

স্যামুয়েল মোর্স

জীবন শুরু করেছিলেন চিত্রকর হিসেবে। বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভও করেছিলেন। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ লন্ডনের শিল্পরসিক মহল সম্মান জানিয়েছিল স্বর্ণপদক দান করে।

এই শিল্পীর ভবিষ্যৎ যে সম্ভবনাময় তাতে আর সন্দেহ কি?

যে কোন প্রতিভাই চায় স্বীকৃতি। সেই স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন স্যামুয়েল মোর্স। কিন্তু আশ্চর্য এই যে চিত্রশিল্পের স্বক্ষেত্র থেকে জীবনের কর্মধারা অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই মোড় ফেরালেন। রঙ, তুলি, ইজেল সরিয়ে রেখে নেমে পড়লেন বিজ্ঞানের গবেষণায়।

তারের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে কি করে সঙ্কেত বা বার্তা পাঠানো যায় এই বিষয়টিই হল তাঁর গবেষণার বিষয়।

মোর্স-এর গবেষণার ফলেই জগৎ লাভ করেছে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা। স্যামুয়েল মোর্স এই অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে অমরত্ব লাভ করেছেন।

ম্যাসাচুসেটসের চার্লস টাউন নামক স্থানে ১৭৯১ খ্রিঃ ২৭ শে এপ্রিল মোর্স-এর জন্ম।

ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি সহজাত আকর্ষণ ছিল তাঁর। বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষারও খোঁজখবর রাখতেন উৎসাহের সঙ্গে।

বস্তুতঃ বিজ্ঞান ও ললিতকলা—এই দুই ভাবনাই সমান্তরাল ভাবে তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল।

বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থাতেই চিত্রশিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

পড়াশোনা ও ছবি আঁকার অবসরে নিজের সংগ্রহের নানান সরঞ্জাম নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। এইভাবেই এই দুই বিদ্যার সহাবস্থান তাঁর মধ্যে অব্যাহত ছিল।

১৮১০ খ্রিঃ ইয়েল কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর মোর্স চিত্রকরের বৃত্তিই বেছে নেন।

এই সময়ে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন যাদুঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রখ্যাত শিল্পীদের চিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। দীর্ঘ চার বছর তিনি এই কাজে ব্যয় করেন।

দেশে ফেরার পথে দৈবক্রমে জাহাজে আলাপ হল এক চিকিৎসকের সঙ্গে। এই চিকিৎসক একজন নীরব বিজ্ঞানীও ছিলেন। চিকিৎসা অপেক্ষা বিজ্ঞানের গবেষণাতেই তিনি বেশি উৎসাহ বোধ করতেন। বিশেষ করে তড়িৎ ও চুম্বক সম্বন্ধে তিনি বেশি আগ্রহ বোধ করতেন।

ফলে এই উৎসাহী চিকিৎসক সবসময়েই নিজের সঙ্গে চুম্বক ও কিছু যন্ত্রপাতি রাখতেন।

দুজনের জীবনের ধারা একই—দুই বৃত্তির মানুষ দুজনে। কিন্তু আগ্রহ ও উৎসাহের কেন্দ্র একই, বিজ্ঞান। কাজেই পরিচয় থেকে অন্তরঙ্গ আলাপ জমতে সময় লাগল না।

চিকিৎসক ভদ্রলোক জাহাজেই সোৎসাহে মোর্সকে কতগুলি পরীক্ষা করে দেখালেন। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ ও তারের মাধ্যমে সঙ্কেত প্রেরণের বিষয়েও আলোচনা হয়।

সেই আলোচনার সূত্রেই কিছু দিনের মধ্যে মোর্সের জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল।

সেই সময়ে তড়িৎ ও চুম্বক নিয়ে গবেষণায় রত হয়েছিলেন পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বিজ্ঞানী। ভাগ্যের অদৃশ্য সঙ্কেতে চিত্রশিল্পী রূপেই তাঁর পরিচয় এবং খ্যাতি।

ছবি আঁকার কাজে সত্যি সত্যি ইস্তফা দিয়ে মোর্স গবেষণা আরম্ভ করলেন তারের মাধ্যমে সঙ্কেত প্রেরণের পন্থা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে।

গবেষণার কাজে তিনি এমনই নিবিষ্ট হলেন যে অচিরেই পড়তে হল কঠোর অভাব অনটন ও দারিদ্র্যের মধ্যে।

অর্থোপার্জনের পথ তো বন্ধ—ছবি আঁকা ছেড়ে বিজ্ঞানের গবেষণায় মনোনিবেশ করেছেন।

নিজের রাহা খরচ, গবেষণার ব্যয়, সর্বসাকুল্যে যথেষ্ট অর্থেরই প্রয়োজন। মোর্স দমলেন না।

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি কেনা সম্ভব হত না বলে তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করে নিজের হাতেই সেসব বানিয়ে নিতে লাগলেন।

এইভাবেই কায়ক্লেশে কেটে গেল চারটি বছর। অবশেষে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরাজেয় মনোবলের দ্বারা সাফল্য অর্জন করলেন। তাঁর আবিষ্কারের পরীক্ষার কথা বিশ্ববাসী জানতে পেল এইভাবে—নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদশীর্ষ থেকে ৬০০ গজ দূরে তারের মাধ্যমে সঙ্কেত প্রেরণ করতে সমর্থ হয়েছেন স্যামুয়েল মোর্স।

প্রাথমিক সাফল্য মোর্সকে উৎসাহিত করে তুলল। তিনি এখানেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না।

মাত্র ৬০০ গজ নয়, দূরে আরও দূরে—দূর থেকে দূরান্তরে সার্থকভাবে সঙ্কেত প্রেরণ করতে না পারা পর্যন্ত তাঁর মনে শান্তি ও তৃপ্তি আসে কি করে।

কিছুদিনের মধ্যেই মোর্স আবিষ্কার করলেন 'রিলে' পদ্ধতি। সমস্যার সমাধান হল, সঙ্কেত প্রেরণের অসুবিধা দূর হল। আনন্দিত হলেন মোর্স।

এবারে নিজের আবিষ্কার বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও প্রদর্শন করতে চাইলেন মোর্স। আবেদন জানালেন সরকারকে।

কিছু অর্থের প্রয়োজন তাঁর, তাহলেই তিনি ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত তারের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে সঙ্কেত সাহায্যে খবর আদানপ্রদান করতে পারেন।

নবীন বিজ্ঞানীর প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন সরকার। উৎসাহের সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। অভাবিত সাহায্য লাভ করলেন মোর্স।

এবারে ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত তার টেনে টেলিগ্রাফের লাইন বসান হল। মোর্স সাফল্যের সঙ্গে খবরের সঙ্কেত প্রেরণ করলেন। দূর হল নিকট।

ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে সেই প্রথম পৃথিবীতে টেলিগ্রাফ প্রবর্তিত হল। অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করলেন বিজ্ঞানী মোর্স, একদিন যাঁর জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল একজন সার্থক চিত্রশিল্পী হিসেবে।

টেলিগ্রাফ নিঃসন্দেহে মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে এক মাইল স্টোন।

১৮৭২ খ্রিঃ ২রা এপ্রিল এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনাবসান হয়।

হেরমান গুনথের গ্রাসমান

প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও ভাষাতাত্ত্বিক পন্ডিত গুনথের গ্রাসমান ভারতবাসীর কাছে একটি বিশেষ প্রিয় নাম। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য ভারতবাসীর মনে তিনি চিরশ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন।

বহুমুখী প্রতিভাধর গ্রাসমান ১৮০৯ খ্রিঃ ১৫ই এপ্রিল বালটিক সাগরের উপকূলে স্টেটিন নামের এক ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতা ছিলেন গণিতবিদ। অধ্যাপক হিসেবেও খ্যাতিলাভ করেছিলেন তিনি।

বাল্যবয়স থেকেই পিতার কাছে গণিতের শিক্ষা লাভ করেছিলেন গ্রাসমান। আগ্রহ জন্মেছিল গণিতশাস্ত্রের প্রতি।

পিতার শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানে অতি অল্পবয়সেই উচ্চতর গণিতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তিনি।

বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হলে গ্রাসমান ভর্তি হলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকে গণিতের তিনবছরের পাঠক্রম কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বছর।

গণিতের শিক্ষা শেষ হলে বাড়িতে বসেই তিনি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করলেন। মাত্র চার বছরের চেষ্টাতেই গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন।

এরপর প্রবেশ করলেন কর্মজীবনে। একটি বিদ্যালয়ে গ্রীক লাতিন ও গণিতের শিক্ষকের কাজ নিলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই তিনি কর্মস্থল পরিবর্তন করলেন। বার্লিনের ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল স্কুলে যোগ দিলেন।

কিন্তু এখানেও বেশিদিন কাজ করলেন না। বার্লিনের বিখ্যাত ওটো স্কুলে গণিতের অধ্যাপকের পদ নিয়ে পূর্বতন কর্মস্থল ছেড়ে এলেন। তাঁব জীবনের বেশিরভাগ সময় এখানেই ব্যয়িত হয়েছে।

গ্রাসমান ছিলেন প্রচারবিমুখ নীরব বিজ্ঞান-সাধক। উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট গণিতজ্ঞদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন।

গণিত বিষয়ে তাঁর যাবতীয় গবেষণা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করেননি। মৃত্যুর পর গবেষণামূলক সমস্ত প্রবন্ধসংকলিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণাগুলি পন্ডিতমহলে সমাদৃত হয়।

বিন্দু, রেখা ও তলের বিশ্লেষণে ক্যালকুলাস প্রয়োগের সূত্রপাত গ্রাসমানই করেছিলেন।

বীজগণিতের ওপরেও তাঁর অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই তাঁকে আধুনিক বীজগণিতের প্রবর্তকরূপে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন।

গ্রাসমানের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এই যে তাঁর সমূহ গবেষণাকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে বিখ্যাত ভেক্টর বিশ্লেষণ।

ভাষাতত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন গ্রাসমান। ১৮৬৫ খ্রিঃ তিনি ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সূত্র উদ্ভাবন করেছিলেন।

এই সূত্রানুসারে অন্যান্য প্রাচীন ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষারও উৎপত্তির বিজ্ঞানসম্মত কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন।

ভাষাতত্ত্বে গ্রাসমানের সূত্রটি গ্রাসমান'স ল নামে বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে।

যে কজন বিদেশী মনীষী ভারত সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ভারতীয় ভাষা ও ভারততত্ত্ব চর্চা করেছিলেন, গ্রাসমান তাঁদের অন্যতম।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য বিশেষ করে বেদ বেদান্ত বিষয়ে গ্রাসমানের আগ্রহ ছিল সুগভীর, এবিষয়ে তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করেন।

ঋগ্‌বেদের অনুবাদ প্রকাশ করে গ্রাসমান ভারতবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাঁর জীবনের স্মরণীয় কীর্তি ঋগ্‌বেদের অভিধান রচনা। 'ভেরটের বুখৎসুম ঋগ্‌বেদ' নামাঙ্কিত গ্রন্থটি পন্ডিতমহলে সুপরিচিত। একটি বস্তুকেন্দ্রিক, অপরটি সংস্কৃতি কেন্দ্রিক—-এই দুই বিপরীতমুখী বিজ্ঞানের আশ্চর্য সহাবস্থান গ্রাসমান ব্যক্তি-প্রতিভার স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য।

যে কজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্বের চেষ্টা ও আগ্রহে জার্মানীতে ভারততত্ত্ব চর্চা প্রসার লাভ করেছিল, গ্রাসমান নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট।

১৮৭৭ খ্রিঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ ও ভাষাতাত্ত্বিক পন্ডিত গুনথের গ্রাসমান পরলোকগমন করেন।

চার্লস ডারউইন



জীবনের রহস্য এবং সৃষ্টির মূল নিয়মকে বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অর্ন্তভুক্ত করেছিলেন চার্লস ডারউইন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন উদ্ভিদ ও প্রাণীর দৈহিক পরিবর্তন পরিবেশের সঙ্গে তাদের প্রতিক্রিয়ার ফল।

তিনিই প্রথম অসংখ্য উদাহরণের মাধ্যমে প্রাণীজগতের অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন।

জীববিজ্ঞানের বিখ্যাত অভিব্যক্তিবাদ তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন। সেই কারণে জীববিজ্ঞানে তিনি গুরুস্থানীয় বলে বিবেচিত হন।

মানবোৎপত্তির ব্যাখ্যাতা, প্রকৃতিবিদ, দার্শনিক চার্লস ডারউইনের জন্ম ১৮০৯ খ্রিঃ। তাঁর পিতামহ ইরাসমাস ডারউইন ছিলেন সুখ্যাত নিসর্গবিদ, কবি ও দার্শনিক এবং পিতা ও বড় ভাই দুজনেই ছিলেন চিকিৎসক।

বাল্যকাল থেকেই চার্লস ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির ও প্রকৃতি প্রেমিক, রূপময় প্রকৃতির চিত্রময় অভিব্যক্তির মধ্যে তন্ময় হয়ে যেতেন। বিশেষ করে চারপাশের উদ্ভিদ ও জীবদের নিয়েই তিনি বেশি ভাবনা চিন্তা করতেন।

তরুণ বয়সেই তাঁর মনে এমন প্রশ্ন উদিত হয়েছিল—প্রকৃতির কোলে লালিত জীবকুল কোথা থেকে এসেছে?

আবার এরা যায়ই বা কোথায়? মৃত্যুর পর কি এদের কোনরূপ অস্তিত্বই পৃথিবীতে থাকে না?

স্পষ্টতঃই পিতামহর প্রবল প্রভাব পড়েছিল বালক চার্লস-এর ওপর। সেই বয়সেই তিনি বিশ্বজগৎ ঘুরে দেখার কথা ভাবতেন।

প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য ও রহস্য নিয়ে ডুবে থাকলেও লেখাপড়ায় বরাবরই ভাল ছিলেন তিনি।

প্রথমে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়েছিল ডাঃ বাটলারের বিদ্যালয়ে। এখানকার পড়া শেষ হলে ডাক্তারি পড়ার জন্য তাঁকে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করান হয়।

কিন্তু ডাক্তারি পড়া চার্লস-এর ভাল লাগল না। একথা পিতাকে জানালে তিনি ছেলেকে ধর্মযাজক করবেন বলে ঠিক করলেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কেমব্রিজে।

আঠারো বছর বয়সে চার্লস ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। এখানে পড়ার সময় হামবোল্ড-এর লেখা Personal Narrative বইটি পড়ে তিনি নিসর্গবিদ্যার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন।

উদ্ভিদবিদ্যার বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন ডঃ হন্‌সলো। এখানে চার্লস তাঁর গভীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর জীবনে দিক পরিবর্তনের সূচনা হয়।

ক্রাইস্ট কলেজ থেকে স্নাতক উপাধি লাভের পর চার্লস কিছুদিন ভূ-বিদ্যা পাঠ করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্যটনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

এই সময়ে আকস্মিকভাবেই একটা সুযোগও এসে গেল। এই সময়ে H.M.Beagle নামে একটি ভ্রাম্যমাণ জাহাজের জন্য একজন নিসর্গবিদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের গাছপালা ও জীবজন্তু দর্শনের জন্য চার্লস খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি অধ্যাপক হন্‌সলো-এর চিঠি নিয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিররে-এর সঙ্গে দেখা করলেন।

জাহাজের উক্ত গবেষক পদটি ছিল অবৈতনিক। চার্লস কোন আপত্তি করলেন না এবং কর্মনিযুক্ত হলেন।

বিগল্ জাহাজ ১৮৩১ খ্রিঃ ২৭ ডিসেম্বর ইংলন্ড থেকে আমেরিকার দিকে যাত্রা করে।

দীর্ঘ পাঁচবছর ধরে জাহাজটি দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল অঞ্চল, আগ্নেয়গিরি সঞ্চিত গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ, তাইহিতি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, তাসমানিয়া, মালদিভ দ্বীপপুঞ্জ, সেন্ট হেলেনা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেছিল।

এই দীর্ঘ সময়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে পুরোদস্তুর প্রাণিতত্ত্ববিদ হয়ে চার্লস দেশে ফিরলেন।

এবারে তিনি আরম্ভ করলেন গবেষণা আর নিজস্ব ধ্যানধারণার কথা পুস্তিকাকারে প্রচার করতে লাগলেন।

এই সকল পুস্তিকা তেমন সাড়া জাগাতে না পারলেও ভূ-তত্ত্ববিদ চার্লস লায়ারের সঙ্গে চার্লস-এর পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে। এতে তিনি যথেষ্ট লাভবান হন।

ত্রিশ বছর বয়সে চার্লস এমমা ওয়েজউডকে বিয়ে করেন। এই দম্পতি ক্রমে পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান লাভ করেন।

দীর্ঘ ষোল বছর ধরে পঠন-পাঠন ও গবেষণার মাধ্যমে চার্লস বিবর্তনবাদকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেন।

এই সময় তিনি প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ ও তথ্যানুসন্ধানী অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের কাছ থেকে একটি চিঠি পান।

সেই চিঠিতে জানা যায় পরস্পরের অতি পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও উভয়েই একই বিষয়ে গবেষণা করে একই সিদ্ধান্ত পৌঁচেছেন।

এই আশ্চর্য সমাপতনে চার্লস বিস্মিত হন এবং নিজের গবেষণার কথা ওয়ালেসকে জানালেন।

উত্তরে ওয়ালেস আশ্চর্য ঔদার্যের সঙ্গে জানালেন, ''I withdraw from the field leaving it open to you.''

১৮৫৮ খ্রিঃ ১ জুলাই লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটিতে ডারউইন তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এটিই এক বছর পরে The origin of species by means of Natural Selection or the Preservation of the Favoured Races in the Struggle for Life -এই দীর্ঘ নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

এই বইটিই দ্য অরিজিন অব স্পিসিস সংক্ষিপ্ত নামে বিখ্যাত।

প্রকাশের পর মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে বইটির এক হাজার আড়াই শো কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

রক্ষণশীল খ্রিস্টান ও বিজ্ঞানী উভয় মহলেই আলোড়ন সৃষ্টি করল বইটির বক্তব্য।

উদ্ভিজ্জ ও জীবের অপরিণত অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে তাদের পরিবর্তনশীলতা, মাটির ওপরে তাদের বংশ বিস্তার প্রভৃতি বিবেচনা করে চার্লস সিদ্ধান্ত করেন যে জীবের সৃষ্টি কোন স্বয়ংসৃষ্ট ব্যাপার নয়। এর উদ্ভবের পেছনে একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

পনেরোটি অধ্যায়ে এই গ্রন্থে গার্হস্থ্য পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবের অবস্থা বিচার, বাঁচবার জন্য তাদের নিরন্তর প্রয়াস, তার প্রাণধারণে প্রকৃতির

নির্বাচন অথবা যোগ্য জীবেরই বাঁচার অধিকার, সংজ্ঞা (instinct), সংকরতা প্রভৃতি বিষয়ে পরিচ্ছন্ন আলোচনা ও এ বিষয়ে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ডারউইনের এই গ্রন্থের আলোচনা পদ্ধতি ছিল কাব্যময় ও সরস, ফলে বিষয় বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হলেও সকলশ্রেণীর পাঠককেই সমানভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর বহু ভাষায় বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

দ্য অরিজিন অব স্পিসিস, যেমন টি. এইচ. হাক্সলির মত বৈজ্ঞানিকের সমর্থন পায় তেমনি বিগল জাহাজের ক্যাপটেন ফিজরয়ের মতো রক্ষণশীল খ্রিস্টানদের বিরোধিতাও পায়।

সকল প্রকার বিতর্কের অবসানের জন্য ডারউইন ১৮৬৮ খ্রিঃ ও ১৮৭১ খ্রিঃ দুখানি বই Variation of Animals and Plants ও Decent of Man পর পর প্রকাশ করেন।

দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর গবেষণা চালিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তিনি যে মতবাদ প্রচার করেন, তাই ডারউইনের মতবাদ বা (Darwin's Theory) প্রাকৃতিক নির্বাচন নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

ডারউইনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস স্বাধীনভাবে গবেষণা করে অভিব্যক্তির মূল ঘটনাকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতিতে ব্যাখ্যা করে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের দরুন প্রজাতির উৎপত্তি এই মত প্রকাশ করায় ডারউইনের মতবাদ ডারউইন-ওয়ালেস মতবাদ নামেও পরিচিত।

ডারউইনের মতবাদের মূলকথা Survival of the fittest অর্থাৎ জীবজগতে অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলেছে এবং যারা উপযুক্ত তারাই টিকে আছে।

ডারউইনের মতবাদের মূল নীতি হল ঃ

(১) বহুল পরিমাণে বংশবৃদ্ধি।

(২) জীবনসংগ্রাম-এর মধ্যে আছে অন্তঃপ্রকৃতি সংগ্রাম, ভিন্ন ভিন্ন বা আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম ও পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম।

(৩) প্রকরণ ও বংশগতি এবং ,

(৪) প্রাকৃতিক নির্বাচন।

প্রাকৃতিক নির্বাচন বলতে বোঝায় যে কোন প্রাণী যে সংখ্যায় বাঁচতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণী জন্ম নেয়। যেহেতু ক্রমাগত জীবন সংগ্রাম চলছে, এ থেকে ধারণা করা যায় যে, কোন প্রকরণ যদি কোন প্রাণীর এবং পরিবেশের তুলনায় সুবিধার হয় তাহলে প্রজাতির ঐ প্রাণী বেঁচে থাকবার সুযোগ বেশি পায়। এভাবেই প্রাকৃতিক নির্বাচন সাধিত হয়।

প্রাণীর বংশগতির মূল ধারণা থেকেই এ বিশ্বাস আসে যে নির্বাচিত প্রকরণ বংশগতি লাভ করে থাকে।

ডারউইনের যুগান্তকারী প্রাকৃতিক নির্বাচন-তত্ত্ব বিশ্বের বিজ্ঞানীদের দ্বারা অভিব্যক্তির প্রমাণরূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯০০ খ্রিঃ ক্রিশের পরিব্যক্তিতত্ত্ব প্রকাশিত হবার পর এবং গোল্ডস্মিথ, মূলার, মার্সাল ফিশার প্রভৃতি প্রজননবিদদের নতুন নতুন তত্ত্ব প্রকাশিত হবার ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচনই জীবের অভিব্যক্তির মূল কারণ, এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে।

বর্তমান বিজ্ঞানীরা পরিব্যক্তিবাদের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে ডারউইনের মতবাদের দুর্বল অংশগুলিকে সংশোধন করে এক নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন।

এই সংশোধিত তত্ত্ব নয়া-ডারউইনবাদ (New Darwinism) নামে পরিচিত। এই মতবাদের মূল কথা হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন ও মিউটেশনের মিলিত প্রচেষ্টায় অভিব্যক্তি ঘটে থাকে।

অভিব্যক্তিবাদ প্রকাশের পর ডারউইন আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য Fertilization of Orchids (১৮৬২) ও Formation of Vegetable Mould through the Action of Worm (১৮৮১খ্রিঃ) প্রভৃতি।

আজীবন গবেষণাকাজে লিপ্ত ছিলেন ডারউইন। জীবের প্রতি ভালবাসা ছিল তাঁর চরিত্রের মহান বৈশিষ্ট্য।

১৮৮২ খ্রিঃ ১৯ এপ্রিল এই মহান বিজ্ঞান-সাধকের জীবনাবসান হয়।

১৮৩৫ খ্রিঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর চার্লস ডারউইন এইচ এম. এস বিগ্‌ল জাহাজে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে গ্যালাপোগাস দ্বীপুঞ্জে যান। এখানকার বহু বিচিত্র প্রাণীজীবন সম্পর্কে তিনি বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। প্রাণের ক্রমবিবর্তনধারা নিরূপনে এই সব তথ্যই ছিল তাঁর বিখ্যাত মতবাদের অন্যতম ভিত্তিভূমি। নিচে আগ্নেয়শিলাজাত দ্বীপপুঞ্জের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

গ্যালাপোগাস দক্ষিণ আমেরিকার অর্ন্তগত ইকোয়েডরের শাসনাধীন দ্বীপপুঞ্জ। ইকোয়েডরের থেকে দূরত্ব ১,০০০ কি.মি এবং ৬০০ মাইল পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত।

পনেরটি বড় এবং অসংখ্য ছোটছোট দ্বীপ মিলিয়ে মোট আয়তন ৭,৯৬৪ বর্গ কি.মি।

প্রথমে স্পেনীয়রা এই দ্বীপগুলির নামকরণ করে। দ্বিতীয়বারে এদের নামকরণ করে সপ্তদশ শতকে ইংরাজ জলদস্যুরা। তাই অধিকাংশ দ্বীপেরই দুটি করে নাম। কয়েকটি প্রধানদ্বীপের স্প্যানিশ নাম ও ইংরাজি নাম এরকম—

ইংরাজি নাম	স্প্যানিশ নাম
এবিংডেন	পিন্টা
বিনজ্বলে	মার্চেনা
টাওয়ার	জেনোভেসা
জেমস	সালভাদর

ইংরাজি নাম	স্প্যানিশ নাম
ইন্ডিফ্যাটিগেবল	সান্তাক্রুজ
চ্যাথাম	ক্রিস্তোব্যাল
চার্লস	সান্তামারিয়া
এলবেমার্লে	ইসাবেলা
নারবরো	ফার্নান্দিনা

গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের মাত্র পাঁচটি দ্বীপে লোকবসতি রয়েছে। অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কৃষি ও মৎস্যশিকার। এখানকার আদিম প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৫০০ পাউন্ড ওজনের অতিকায় কচ্ছপ। এগুলোর স্প্যানিশ নাম গ্যালাপ্যাগো। এই থেকেই দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ।

প্রাচীনকালে সমুদ্রের চোরাস্রোতে পড়ে জাহাজ ইত্যাদি এই অঞ্চলে এমনভাবে ঘুরপাক খেতো যে নাবিকদের চোখের সামনে থেকে দ্বীপ মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যেত।

সেইকারণে স্প্যানিশদের দেওয়া আর একটি নাম হল লা আইলাস এনক্যালনটাডাস। ইংরাজি নাম দ্য এনচেন্টেড আইস্‌ল।

এখানকার জলবায়ু বিচিত্র। ভূ-বিষুবরেখা দ্বীপপুঞ্জের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে, সেইকারণে এখানে সূর্যকিরণ অতীব প্রখর।

অথচ দক্ষিণ মেরু থেকে প্রবাহিত অতি শীতল হমবোল্ট সমুদ্রস্রোতের দরুণ নিরক্ষীয় সমুদ্র থেকে এখানকার সমুদ্র ৯৫° থেকে ২০° বেশি ঠান্ডা।

ডিসেম্বর থেকে মার্চ অবধি ঝড়-বৃষ্টি, তারপর আগ্নেয়গিরিজাত পর্বতসঙ্কুল দ্বীপমালা মরুভূমি-সদৃশ।

ফলে নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে কুমেরু অঞ্চল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এলাকা বহুবিচিত্র প্রাণীর লীলাভূমি।

পানামার বিশপ টমাস ডি বারলাঙ্গা, ১৫৩৫ খ্রিঃ এই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন।

কনটিকি অভিযান-খ্যাত থর হায়ারডাল ১৯৫৩ খ্রিঃ এখানে এসে যে সব প্রমাণ পান তার থেকে তিনি ধারণা করেন ১৫৩৫ খ্রি আগেই এখানে মানুষের পদার্পণ ঘটেছে।

প্রাগৈতিহাসিক কালের সরীসৃপের মধ্যে এখানে এখনো পর্যন্ত বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছে জলচর ও স্থলচর গোসাপ বা গিরগিটি শ্রেণীর ইগুয়ানা। পৃথিবীর আর কোথাও এই প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। নারবরো (ফার্নান্দিনা) দ্বীপের জলচর ইগুয়ানা লম্বায় তিন ফুট, ওজন ২০ পাউন্ড।

এখানকার এক একটি দ্বীপে এক এক প্রজাতির ফিঞ্চ পাখি রয়েছে। জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম করতে করতে ১৩ প্রজাতির ফিঞ্চ পাখির আকার বিশেষতঃ ঠোঁটের গঠন বিভিন্ন প্রকারের হয়ে গেছে।

অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বৃহদাকার কচ্ছপ, ফারসীল, সিন্ধুঘোটক, লাল কাঁকড়া ও ড্রোমিকাস প্রজাতির সাপ উল্লেখযোগ্য।

পাখি রয়েছে বহুপ্রকার, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ববি, পায়রা, বাজপাখি, পেঙ্গুইন, পেলিক্যান, পরমোর‍্যান্ট, ফ্লেমিংগো, মকিংবার্ড, ফ্রিগেট, নীল হেরন, ফ্লাইক্যাচার ও ফ্লিগেটবার্ড।

প্রকৃতি যেন তার আদিম রূপের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এখানে স্বকীয় প্রযত্নে সংরক্ষণ করে চলেছে।

হেনরি ভিক্টর রেনোঁ

একমাত্র অধ্যবসায়ের বলে নিতান্ত সাধারণ অবস্থা থেকে মানুষ যে কি করে সম্মানের উচ্চশিখরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হেনরি ভিক্টর রেনোঁ-এর জীবন।

বর্তমানে তাপ বিজ্ঞানের দ্রুত সম্প্রসারণের মূলে আছে রেনোঁ-এর অবদান। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেই তিনি যথেষ্ট অবদান রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ফ্রান্সের এক দরিদ্র পরিবারে ১৮১০ খ্রিঃ ৯ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন রেনোঁ। পরিবারের আর্থিক অবস্থা এমনই শোচনীয় ছিল যে স্কুলে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও পড়াশোনা সম্পূর্ণ করবার সুযোগ পাননি তিনি।

শৈশব উত্তীর্ণ হবার আগেই স্কুলের পড়া বন্ধ করে তাঁকে চাকরির সন্ধানে বেরাতে হয়েছিল।

লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল রেনোঁ-এর। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল রসায়ন ও ওষুধ। ইচ্ছাও ছিল কায়ক্লেশে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের। কিন্তু প্রকট অর্থচিন্তা তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষাকে গ্রাস করেছিল। তাঁকে একটি ওষুধের দোকানের কেরানীর চাকরি নিতে হয়েছিল।

ভাগ্যের বিড়ম্বনা সত্ত্বেও মনোবল ও আগ্রহ দমিত হয়নি। চাকরি পাবার পর রেনোঁ বিদ্যাভ্যাসের সময় নিজেই বার করে নিলেন।

দিনের বেলায়-দোকানের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। রাত্রে বসতেন বই নিয়ে। রাত জেগে নিজের প্রিয় বিষয়ের বই পড়াশোনা করতেন।

অতি অল্প বয়স থেকেই প্রচণ্ড অধ্যবসায় সম্বল করে প্রতিকূল ভাগ্য ও পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন দরিদ্রের সন্তান রেনোঁ। চাকরি করে সংসারে কিছু সাহায্য করতে হত।

তারপরও নিজস্ব খরচ খরচা কাটছাঁট করে অর্থ সঞ্চয়ের অভ্যাস তৈরি করে নিয়েছিলেন।

কিছুকাল পরে যৎসামান্য অর্থ যা সঞ্চিত হল, তাই সম্বল করে তিনি চলে এলেন প্যারিসে। ভর্তি হলেন একোল পলিটেকনিক স্কুলে।

এখানে পড়াশোনা বজায় রাখতে অশেষ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল রেনোঁকে। প্রবল অর্থ সংকটের মধ্যেও মনোবল হারান নি।

দ্বিগুণ উৎসাহে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করেছেন, একই সঙ্গে পড়াশোনাও চালিয়ে গেছেন। এমন অনেকদিন কেটেছে, যেদিন কোন খাদ্য ছাড়াই তাকে কাটাতে হয়েছে।

কঠিন পরিশ্রম কখনো ব্যর্থ হয় না। অর্থসমস্যা রেনোঁর অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করলেও রুদ্ধ করতে পারল না।

জীবন-সংগ্রাম তাঁর জীবনকে আরও মহত্তর করে তুলেছিল। অধ্যবসায় জয়যুক্ত হয়েছিল।

একদিন একোল পলিটেকনিকের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন তিনি। ১৮৩৬ খ্রিঃ বিদ্যায়তনে লাভ করলেন অধ্যাপকের পদ।

প্রতিভা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল রেনোঁর আবাল্যের সহায়। এবারে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুরু করলেন গবেষণা।

গোড়ার দিকে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল রসায়ন। এ সম্পর্কে তাঁর কিছু প্রবন্ধ কয়েকটি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হল।

প্রবন্ধগুলির মৌলিকতা বিজ্ঞানী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। খ্যাতি লাভ করলেন রেনোঁ।

একোল পলিটেকনিক স্কুল কর্তৃপক্ষের আহ্বানে পূর্বতন কর্মস্থল পরিত্যাগ করে রেনোঁ ১৮৪০ খ্রিঃ এখানে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন। এখানেই তাপ বিজ্ঞানের ওপর তাঁর গবেষণার সূত্রপাত হয়।

দীর্ঘ গবেষণার পর পদার্থবিদ্যার তাপবিজ্ঞান শাখায় বহু যন্ত্র ও তথ্য আবিষ্কার করে তিনি বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার এক ধরনের ক্যালরি মিটার।

পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় করবার জন্য বর্তমান সময়েও ল্যাবরেটরিতে রেনোঁর ক্যালরি মিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

যে সকল হাইড্রোমিটার বায়ুর শিশিরাঙ্ক ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় তাদের একটির আবিষ্কর্তা রেনোঁ। হাইগ্রোমিতির ক্ষেত্রে তাঁর মিটারের গুরুত্বই সর্বাধিক।

এছাড়াও যন্ত্রের সাহায্যে যে পদ্ধতিতে জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব, গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ প্রভৃতি নির্ণয় করা হয়, তার অনেকগুলি পদ্ধতিই রেনোঁ আবিষ্কার করেছিলেন।

তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ সম্বন্ধেও রেনোঁর গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে তাপবিজ্ঞান রেনোঁর বহু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর আবিষ্কারের ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে বহু বিজ্ঞানী তাপ বিজ্ঞানকে সম্প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার সঙ্গে শব্দ বিজ্ঞান নিয়েও দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন রেনোঁ। তাঁর গবেষণা শব্দের গতিবেগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

নিরলস বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে বিজ্ঞানী হিসেবে দেশে বিদেশে সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন রেনোঁ। তাঁর সফল জীবন ছিল কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের আশীর্বাদ স্বরূপ।

এই মহান বিজ্ঞানী ১৮৭৮ খ্রিঃ লোকান্তরিত হন।

গালোয়া এভারিস্ত

জীবদ্দশায় রাজনীতিক ও বিপ্লবী হিসেবে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। মৃত্যুর পরে তাঁরই বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচয় লাভ করে বিস্মিত হয়েছিল দেশবাসী। গণিত বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন গালোয়া এভারিস্ত।

প্রথাবদ্ধ শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল না অথচ বিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্ববন্দিত হয়েছেন বিজ্ঞান জগতে এমন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব কখনো কখনো ঘটেছে। সেই মুষ্টিমেয় প্রতিভাধরদের মধ্যে গালোয়া অন্যতম।

স্কুলে কলেজে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি। তার ওপর স্বল্প দৈর্ঘ্যের জীবনও ছিল তাঁর ঘাতপ্রতিঘাতময়। তৎসত্ত্বেও গণিতশাস্ত্রের চর্চা ও গবেষণা থেকে সরে আসেন নি তিনি।

তাঁর নীরব সাধনা উচ্চতর গণিতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

ফ্রান্সে জন্মেছিলেন গালোয়া, ১৮১১ খ্রিঃ। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বিপ্লবী পরিচয়ই তাঁকে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিল।

একোল নর্মাল স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয়বার স্কুলে শিক্ষালাভের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি আর কোনদিন ভর্তি হবার চেষ্টা করেন নি।

গণিত ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। রাজনীতির জীবনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে যখনই সময় সুযোগ মিলত গণিতের পঠন-পাঠন ও চর্চায় মেতে উঠতেন। খুঁজে খুঁজে প্রয়োজনীয় বইপত্রও নিজেই সংগ্রহ করে আনতেন।

স্কুলে পড়ার অভিলাষ পরিত্যাগ করলেও গণিতের চর্চা ত্যাগ করলেন না। ত্যাগ করেননি রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং বিপ্লবের পথ। রাজনীতি বাল্যবয়স থেকেই তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল নেশার মত।

শাসক শক্তির বিরুদ্ধে যে বিপ্লব আন্দোলনের শরিক তার চাকরির চেষ্টা দেশে সফল হওয়া দুরূহ।

গালোয়াও দু-একবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বিরত হন। তবে দৈবক্রমেই জীবিকা অর্জনের একটা পথ হয়ে গিয়েছিল।

এক ধনী ব্যক্তি গালোয়ার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই সামান্য রোজগারই ছিল তাঁর জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন।

কিন্তু গালোয়ার ভাগ্যে এটুকুও সইল না। রাজনীতির আবর্তে পড়ে এই কাজটুকুও হারাতে হল।

ফ্রান্সের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ গ্রহণের ফলে শেষ পর্যন্ত ১৮৩০ খ্রিঃ গালোয় কারারুদ্ধ হলেন।

কারাগারে থাকতে হল কিছুকাল। দণ্ডভোগ শেষ হলে মুক্তিলাভ করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিগুণ উৎসাহে বিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

গালোয়ার বিপর্যস্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘনিয়ে এসেছিল নিঃশব্দে। মাত্র একুশ বছর বয়সে ১৮৩২ খ্রিঃ তিনি এক মহিলার প্রেমে পড়েন।

এই প্রেমের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুদিনের মধ্যেই এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হল তাঁকে এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরাজিত ও নিহত হলেন।

সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতাকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মত সাহস ও বীরত্ব ছিল গালোয়ার। তিনি ছিলেন বীর বিপ্লবী। জীবদ্দশায় বিপ্লবীরূপেই পরিচিত ছিলেন তিনি।

বিপ্লবের দুর্যোগময় পথে সংগ্রামী সৈনিকের ভূমিকায় থেকেই গালোয়া নীরবে গণিতের সাধনা করেছিলেন। মাত্র একুশ বছর বয়সের মধ্যেই নানান তথ্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর সহযোদ্ধাদের এবিষয়ে কাউকেই কিছু জানাতেন না। গবেষণার খুঁটিনাটি সহ সব কিছু লিখে রাখতেন একটি ডায়েরিতে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আগে তিনি এক বন্ধুকে প্রথম পত্র দিয়ে তাঁর গবেষণার কথা জানান। সেই প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তিনি মারা গেলে বন্ধুটি তাঁর গবেষণাগুলি প্রকাশের চেষ্টা করেন।

গোড়ার দিকে একাজে যথেষ্ট বাধা পেতে হয়েছিল গালোয়ার বন্ধুটিকে। শেষ পর্যন্ত গালোয়ার মৃত্যুর প্রায় চোদ্দ বছর পরে গবেষণা প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে অনেক প্রবন্ধ হারিয়েও গেছে। সেগুলো কোনদিনই আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

১৮৪৬ খ্রিঃ থেকে একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে গালোয়ার প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

এই বিপ্লবী বিজ্ঞানীর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেন ফ্রান্সের জনসাধারণ। বিজ্ঞানীরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হলেন।

তাঁরা স্বীকার করলেন গালোয়ার আবিষ্কৃত তথ্যগুলি গণিতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গণিত শাস্ত্রের যে আবিষ্কারটি গালোয়াকে অমরত্ব দান করেছে তা হলো সমীকরণের বীজতত্ত্ব। তাঁর এই অবদানকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে সসীম ক্ষেত্রকে গালোয়া ফিল্ড এবং সমীকরণের বীজের রূপকে গালোয়া সংযোগ নামকরণ করে।

মহাকাল প্রতিভাকে অবহেলা করে না। তাই মৃত্যুর চোদ্দ বছর পরেও যথাযোগ্য সম্মান পেয়েছিলেন গালোয়া। কিন্তু অকালেই অপচয় হয়েছিল এই প্রতিভার। ফলে নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বিজ্ঞানের অঙ্গন।

হেলম্যান ভন হেলমোহৎস

বিজ্ঞানের নীরব সাধক হেলমোহৎস জন্মগ্রহণ করেন জার্মানীর পোটসডমে ১৮২২ খ্রিঃ ৩১শে আগস্ট।

তাঁর পিতা ছিলেন সাধারণ একজন স্কুল শিক্ষক। পুত্রকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দেবার মত আর্থিক সঙ্গতি ছিল না তাঁর। তবু পুত্রকে শিক্ষিত করে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তাঁর।

স্কুলে পড়াশোনার সময়েই বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন হেলমোহৎস। সহজাত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। সব বিষয়ে জানবার কৌতূহল ছিল প্রবল। তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন শিক্ষকরা।

ছেলেবেলায় তিনি নিজের চেষ্টাতেই ঘরে বসে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির অনুকরণে নতুন নতুন খেলনা বানিয়ে নিতে পারতেন। তাঁর কারিগরি দক্ষতা দেখে শিক্ষকরা মুগ্ধ হতেন।

একবার একটি খেলনা দূরবীন বানিয়ে হেলমোহৎস তাঁর স্কুলের শিক্ষকদের চমকে দিয়েছিলেন। তাঁরা উচ্ছ্বসিত ভাবে তাঁর কাজের প্রশংসা করেছিলেন।

আর একবার বাবার জন্য একটি চশমা বানিয়েদিয়েছিলেনতিনি। আশ্চর্য যে, চশমার কাচগুলো তিনি নিজেই তৈরি করেছিলেন। এভাবে ছেলেবেলাতেই তাঁর

অসাধারণ বিজ্ঞান প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। শিক্ষকরা বিশ্বাস করতেন বড় হয়ে তিনি নিশ্চয় দেশবরেণ্য বিজ্ঞানী হবেন।

বলাবাহুল্য, তাঁদের সেই আশা ব্যর্থ হতে দেননি হেলমোহৎস।

বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হলে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে অধ্যয়ন করেন। উত্তীর্ণ হলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। চিকিৎসকের চাকরি গ্রহণ করেন প্রুশিয়ার সৈন্য বিভাগে। এই সময়ে চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়াও তিনি বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেন।

গবেষণা শুরু করেন চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়েই। অল্পকালের মধ্যেই ১৮৪২ খ্রিঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবদেহের নার্ভ সেল আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কার বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত হলে উৎসাহিত হয়ে বেলিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অ্যানাটমির অধ্যাপক করে নিয়ে আসেন।

তারপর ১৮৫১ খ্রিঃ হেলমোহৎস পশুদের চক্ষুনিঃসৃত আলোকরশ্মি নিয়ে অনুসন্ধানে রত হন। কাজের প্রয়োজনে একটি যন্ত্রও নিজেই আবিষ্কার করেন।

মানুষের শ্রবণশক্তি নিয়ে হেলমোহৎসের গবেষণার ফলেই প্রথম আবিষ্কৃত হয় মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরীণ গঠন ও কার্যপ্রণালী।

এরপর অনুনাদকের সাহায্যে শব্দের গুণাগুণ বিশ্লেষণের বিষয় নিয়ে হেলমোহৎস গবেষণা করে কতকগুলো বিভাগে বিভক্ত করতে সমর্থ হন। তাঁর এই গবেষণার ফলাফলকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে হারমোনিয়ম ও পিয়ানো বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও শব্দবিজ্ঞানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন হেলমোহৎস।

তাঁর এইসব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য বেলিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনার দায়িত্ব দেন।

১৮৭১ খ্রিঃ পরে তিনি তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই ক্ষেত্রে তিনি মেক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ তত্ত্ব বিষয়ে খুবই আগ্রহান্বিত হন।

বিদ্যুৎ পদার্থ কণা অথবা তরঙ্গ এ বিষয়ে তখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। দীর্ঘ গবেষণার পর ১৮৮১ খ্রিঃ এই সম্পর্কে একটি মূল্যবান তত্ত্বের প্রচার করেন হেলমোহৎস। তিনি ঘোষণা করেন, যে কোন মূল পদার্থই অ্যাটম বা পরমাণু দিয়ে গঠিত। ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক বিদ্যুৎ যাই হোক না কেন তাকেও অতি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা সম্ভব হতে পারে। এই অবস্থায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে বিদ্যুতের অ্যাটম।

জে. রবার্ট ওপেনহাইমার

১৯৪৫ খ্রিঃ ১৬ জুলাই তারিখটি আধুনিক বিজ্ঞান তথা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এই দিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় নিউমেক্সিকোর এক মরুভূমিতে পৃথিবীর প্রথম আণবিক বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল।

আমেরিকার উদ্যোগে সংঘটিত সেই আণবিক প্রকল্পের নেতা ছিলেন জে. রবার্ট ওপেনহাইমার।

শত শত বিজ্ঞানী, সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা, কারিগর ও প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে এই আণবিক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছিল।

এই প্রকল্পের সর্বোচ্চ সর্বময় কর্তা হওয়ায় ওপেনহাইমারকে সহজেই আণবিক বোমার জনক নামে অভিহিত করা যায়।

বিশ্ববিশ্রুত এই বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছিল ১৯০৪ খ্রিঃ ২২শে এপ্রিল নিউইয়র্কে।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র সাতবছর বয়সের মধ্যেই তিনি নানা ভূ-তাত্ত্বিক শিলার নমুনা সংগ্রহ করেন।

ওই বয়সেই তিনি নিজের অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু পর্যবেক্ষণের কৌশল আয়ত্ত করেন।

এছাড়া অঙ্কন বিদ্যা এবং যন্ত্রসঙ্গীতেও রীতিমত কুশলতার পরিচয় দেন।

বিখ্যাত এথিকাল কালচার স্কুলে ওপেনহাইমারের শিক্ষারম্ভ হয়েছিল।

মাত্র বার বছর বয়সেই রসায়নবিদ্যার প্রতি তাঁর অপরিসীম আগ্রহ দেখা দিলে তাঁর পিতা তাঁকে একটি ল্যাবরেটরি তৈরি করে দেন। সেই সঙ্গে বিশেষভাবে রসায়ন শিক্ষা দেবার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থেকে গভীর অধ্যবসায় নিয়ে তিনি মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে এক বছরের নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করে সকলকে বিস্মিত করে দেন।

এথিকাল কালচার স্কুল থেকে স্নাতক হবার পর ওপেনহাইমার পিতার সঙ্গে গ্রীস, রোম ও ইউরোপের অন্যান্য সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশগুলি পরিভ্রমণ করেন।

এই সময়েই তিনি ফরাসী, স্প্যানিশ, ইতালীয়, লাতিন এবং গ্রীক ভাষা আয়ত্ত করেন।

উনিশ বছর বয়সে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন এবং চার বছরের পাঠক্রম তিন বছরে শেষ করে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে স্নাতক হন।

১৯২৬ খ্রিঃ ওপেনহাইমার ইংলন্ডে যান। কেমব্রিজের ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে বিশ্রুত বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের সঙ্গে তিনি কাজ শুরু করেন।

এখানেই বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্সবর্নের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

বর্ন ওপেনহাইমারকে গটিনজেন নিয়ে যান এবং দুজনে মিলে গবেষণা আরম্ভ করেন।

মিলিতভাবে তাঁরা কোয়ান্টাম তত্ত্বের (Quantum Theory) ওপরে যে গবেষণা পত্রটি তৈরি করেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

তারপর সুইজারল্যান্ড এবং হল্যান্ডে পড়াশুনা শেষ করে ১৯২৮ খ্রিঃ চব্বিশ বছর বয়সে তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ততদিনে পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে ওপেনহাইমারের নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুইজারল্যাণ্ডে পড়াশুনা করবার সময়েই অণুকে ভেঙ্গে মানবকল্যাণে কিছু করা যায় কিনা এই সম্বন্ধে তাঁর মাথায় উঁকি দিতে শুরু করেছিল।

এই ভাবনা মাথায় নিয়েই তিনি এবারে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

পদার্থবিদ্যায় নতুন কোন আলোকপাত করা যায় কিনা—এবিষয়ে তিনি এই সময়েই গভীর ভাবে চিন্তা ও গবেষণার প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করেন।

ইতিমধ্যে ১৯৪১ খ্রিঃ ৭ই ডিসেম্বর জাপান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়।

ওই দিন আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা চলাকালীন সময়ে জাপান এক আকস্মিক বিমান আক্রমণে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্যতম প্রধান মার্কিন নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার বিধ্বস্ত করে আমেরিকাকে সরাসরি যুদ্ধে নামতে বাধ্য করে।

১৯৪২ খ্রিঃ সম্পূর্ণ প্রথমার্ধ পর্যন্ত জার্মান-ইতালী-জাপান পক্ষ শক্তি সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখল।

ইতিপূর্বেই আইনস্টাইন এবং অন্যান্য কয়েকজন মার্কিন বিজ্ঞানী মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে জার্মানি এবং ইতালীর বৈজ্ঞানিকরা অপরিমিত ধ্বংসসাধনের ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন ধরনের বোমা আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন।

এই সতর্কবাণীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪২ খ্রিঃ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আণবিক বোমা প্রকল্প (Atomic Bomb Project) প্রণয়ন করলেন।

বিশ্রুত বিজ্ঞানীরা এই প্রকল্পের সর্বময় কর্তা হিসাবে ওপেনহাইমারের নাম সুপারিশ করেন। সেই অনুযায়ী রুজভেল্ট তাঁকেই প্রকল্পটির অধিকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেন।

আমেরিকান আণবিক বোমা প্রকল্প-এর সদর দপ্তর স্থাপিত হল নিউ মেক্সিকোর লস অ্যালামসে।

দেশ বিদেশের বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা এখানে সমবেত হলেন ওপেনহাইমারের সহযোগী হিসেবে কাজ করবার জন্য।

জার্মানির লিসে মাইৎনার ও অটো ফ্রিচস, ডেনমার্কের নিয়েলস বোর, ইতালীর এনরিকো ফারমি, হাঙ্গেরির টেলার প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিকরা আণবিক বোমা নির্মাণ প্রকল্পে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রকৃত নেতার মতই অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে ওপেনহাইমার প্রকল্পটি পরিচালনা করেন।

দিনে-রাতে তিনি চার ঘণ্টার বেশি ঘুমোতেন না। ফলে তাঁর দৈহিক ওজন মারাত্মকভাবে কমে গিয়ে ১৩০ পাউন্ডেরও কম হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা অটুট ছিল।

এই প্রকল্পের যাবতীয় গবেষণার কাজ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে সম্পন্ন হয়।

টেনেসির ওক রিজ-এ ৭৫,০০০ শ্রমিকের চেষ্টায় প্রায় সাড়ে ছয় পাউন্ড মূল্যবান ইউরেনিয়াম-২৩৫ তৈরি করা সম্ভব হয়।

এরপর প্লুটোনিয়ামের ফিসন-ক্ষমতা (Fission power) আবিষ্কৃত হলে ওয়াশিংটনের হ্যাজফোর্ডে আর একটি প্ল্যান্ট তৈরি করে সেখানে আরও ৭৫ হাজার লোককে নিযুক্ত করা হল।

এভাবে দীর্ঘ তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯৪৫-এর জুলাইতে বোমাটি তৈরি হল।

বোমা তৈরির পর তার প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ভয়াবহতা এবং ভীষণতা দেখার পরে ওপেনহাইমার স্বয়ং পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের কাছে আণবিক বোমার প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার আবেদন পেশ করেন।

ওপেনহাইমারের এই আবেদন দেশের নিরাপত্তা রক্ষার কারণে নাকচ হয়েছিল। কিন্তু আণবিক বোমার আবিষ্কর্তা তারপর বারবার শান্তি ও মানব-কল্যাণের কাজে আণবিক শক্তিকে কাজে লাগানোর কথা বলেন।

১৯৬৩ খ্রিঃ প্রেসিডেন্ট কেনেডির অনুমোদনে ওপেনহাইমারকে আণবিক শক্তি কমিশনের ৫০ হাজার ডলার মূল্যের এনরিকো ফারমি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৯৪৭ খ্রিঃ থেকে ওপেনহাইমার প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি-এর মুখ্য অধিকর্তা হিসেবে আসীন ছিলেন।

১৯৬৭ খ্রিঃ বিশ্ববিশ্রুত এই আমেরিকান বিজ্ঞানীর জীবনাবসান হয়।

যোসিয়া উইলার্ড গিবস

বিশ্রুত পদার্থ বিজ্ঞানী উইলার্ড গিবস-এর জন্ম হয় ১৮৩৯ খ্রিঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হেভেন নামক স্থানে।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৫৮ খ্রিঃ তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরে পদার্থ বিদ্যার উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য প্যারিসে যান।

সেখানে কিছুকাল অধ্যয়ন ও গবেষণা করে বার্লিনে গিয়ে হাইডেনবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন। এই সময়ে তাঁর কিছু মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হলে বিজ্ঞানীদের প্রশংসা লাভ করেন এবং বিজ্ঞানী হিসেবে গিবস স্বীকৃতি লাভ করেন।

তাঁর গবেষণায় অনুপ্রণিত হয়ে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। গিবস সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং দেশে ফিরে এসে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

এই কর্মক্ষেত্র থেকেই পরবর্তীকালে গিবসের গবেষণাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

গিবস ছিলেন খুবই খুঁতখুঁতে স্বভাবের বিজ্ঞানী। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর গবেষণার বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত বার বার পরীক্ষা করতে পছন্দ করতেন। বিজ্ঞানী গিবসের চরিত্রের এটাই ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তাঁর গবেষণা মূলক প্রবন্ধের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। বারবার পরীক্ষা করে ভালভাবে যাচাইয়ের পর তিনি তা প্রকাশ করতেন।

কোন বিষয়ে গবেষণায় সাফল্যলাভের পরেও তা প্রকাশের জন্য তিনি ব্যস্ত হতেন না। খুঁটিনাটি বিষয়ের যাচাইয়ের জন্য বছরের পর বছর ধরে গবেষণা করে যেতেন।

এই কারণে তাঁর প্রত্যেকটি প্রবন্ধই হত নিখুঁত এবং অতি উচ্চমানের। ফলে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি প্রবন্ধ বিজ্ঞানী মহলে সমাদৃত হত।

গিবস আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁর অসম পদার্থ সমূহের স্থিতাবস্থা বা অন দি ইকুইলিব্রিয়াম অব হেটেরজিনিয়স সাবটেন্সেস নামের একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য।

তাঁর এই প্রবন্ধটি ছিল খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ। পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করে বহু বিজ্ঞানী নিজেদের গবেষণার কাজ করেছেন।

ফেজরুল নামক রাসায়নিক সাম্যের বিখ্যাত সূত্রটি গিবসের উক্ত প্রবন্ধের ভিত্তিতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

গিবসের বিখ্যাত 'অসম পদার্থসমূহের স্থিতাবস্থা' প্রবন্ধটির গুরুত্ব বিচার করে সেটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন প্রসিদ্ধ রাসায়ন বিজ্ঞানী অস্টওয়াল্ট।

অস্টওয়াল্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন অনুঘটক দ্বারা অ্যামোনিয়াকে জারিত করে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করে।

গিবসের উক্ত প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে রসায়ন বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছিল।

রসায়ন বিজ্ঞানী অস্টওয়াল্ট গিবসকে রাসায়নিক শক্তিতত্ত্বের জনক আখ্যায় ভূষিত করেন।

বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী লা শতলিয়ে গিবসের গবেষণা পত্রটি ফরাসী ভাষাতেও অনুবাদ করেছিলেন।

তিনিও এই প্রবন্ধের ওপর কিছুকাল গবেষণা করেছিলেন এবং গিবসের প্রবন্ধটিকে রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে সানন্দে ঘোষণা করেছিলেন।

আলোকের তড়িৎ চৌম্বক তত্ত্ব সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন গিবস। এই বিষয়েও তিনি মহামূল্যবান অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর গবেষণা করেছিলেন বহু বিজ্ঞানী। উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল একাধিক মূল্যবান তথ্য। এই তথ্যগুলি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছিল নতুন পথের সন্ধান।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে গিবস তাপগতিবিদ্যা বা থার্মোডাইনামিকস-এর সূত্রকে প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন।

তাঁর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য গিবসেব পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন এবং কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেছেন।

কর্মসূত্রে আজীবন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গিবস। নিজের সাধনা নিয়ে মগ্ন থাকতেই তিনি পছন্দ করতেন।

বিদেশ গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া বা একের পর এক বিষয় নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ—এসব বিষয়ে খুব উৎসাহ বোধ করতেন না তিনি। নিজেও খুব অল্পসংখ্যক গবেষণাপত্রই প্রকাশ করেছিলেন।

বিজ্ঞান-প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ বহু সম্মান লাভ করেছিলেন গিবস। লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি ১৮৭৯ খ্রিঃ তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেছিল।

১৯০১ খ্রিঃ লাভ করেছিলেন কোপলে পুরস্কার।

১৯০৩ খ্রিঃ এই নীরব বিজ্ঞান সাধকের জীবনাবসান হয়।

উইলহেলম কনরাড রন্টগেন



উপযোগিতার সূত্রেই এক্স-রে বা এক্স-রশ্মি বর্তমান কালে সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে বিপুল পরিচিতি লাভ করেছে।

এই অজানা অচেনা অদৃশ্য রশ্মিটির পরিচিতি উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয়ে আবিষ্কারক প্রুশিয়ার উরসবার্গ বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ বিজ্ঞানী রন্টগেন রশ্মিটির নামকরণ ইংরাজি এক্স অক্ষর দিয়ে সূচিত করেছিলেন।

পদার্থ বিজ্ঞানী রন্টগেনের আবিষ্কৃত X-ray বর্ণালীর সাহায্যে অজ্ঞাত মৌলের সন্ধান ও অস্তিত্ব উদঘাটন সম্ভব হয়। হাফনিয়ন নামে মৌলটির আবিষ্কার এই রশ্মির সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে।

হীরকের প্রসারণ ও তার গুণাগুণ নির্ণয়ে, যন্ত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে এই রশ্মির প্রয়োগ হয়ে থাকে।

হাড়ের দোষ ত্রুটি নির্ণয়, ফুসফুস ও কিডনি প্রভৃতির রোগ নির্ণয় এর দ্বারা সম্ভব হচ্ছে।

ক্যান্সার, টিউমার, পেটের আলসার, রেডিও থেরাপিতে সারানো সম্ভব হচ্ছে।

জমানো খাবারের ওপর রশ্মি ফেলে খাবারকে জীবাণুমুক্ত রাখা হয়। কৃষিবিজ্ঞানে এই রশ্মির সাহায্যে মিউটেশন (Mutation) ঘটিয়ে উচ্চ ফলনশীল ফসলের বীজ তৈরি করা হয়।

ডিটেকটিভ বিভাগ সন্দেহজনক দ্রব্যের রেডিওগ্রাফ তুলে চোরাই চালান ধরতে সক্ষম হয়। ঝিনুকের মধ্যে মুক্তোর সন্ধান করা হয়।

বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে এক্স-রশ্মির সহায়তায়।

সাধারণ অনেক রশ্মি থেকে এই রশ্মির প্রকৃতি আলাদা। মানুষের চামড়ার ভেতর দিয়ে সাধারণ আলোক যেতে পারে না। অথচ এই রশ্মি অবাধে গমন করতে পারে। তবে হাড়ের ভেতর দিয়ে চলাচল করতে পারে না। ফলে মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের ছবি তুলবার জন্য চিকিৎসাক্ষেত্রে এই রশ্মি বিপুল সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে।

অথচ আশ্চর্য যে, এক্স-রশ্মি আবিষ্কৃত হয়েছিল আকস্মিকভাবে।

১৮৯৫ খ্রিঃ, অন্যান্য বিজ্ঞানীর মত রন্টগেনও ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে গবেষণা করছিলেন সেই সময়।

একদিন একটা কাচের বাল্বকে যথাসম্ভব বায়ুমুক্ত করে তার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ মোক্ষণ পাঠাতে গিয়ে রন্টগেন এই বিপুল শক্তিসম্পন্ন অদৃশ্য শক্তির সন্ধান পান।

তিনি লক্ষ করেন যে বায়ু নিষ্কাশিত কাচের নলের দুদিকে প্রবিষ্ট দুটো ইলেকট্রোডের সাহায্যে উচ্চ ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্তি পাঠাবার সময় নলের মধ্যে বিদ্যুৎ মোক্ষণ তো ঘটেই, তাছাড়া ওই অদৃশ্য আলোকপাতে অন্য জিনিসও ভাস্বর হয় ওঠে।

অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়াম প্ল্যাটিনো সায়ানাইডের ওপর পড়ে হলুদ-সবুজ রঙের প্রতিপ্রভা নির্গত হয়।

সরলরেখায় প্রবাহিত এই রশ্মি প্রবাহ বৈদ্যুতিক অথবা চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

যার ঘনত্ব বেশি তার ভেতর দিয়ে রশ্মি সেরকম যেতে পারে না; কম ঘনত্বের জিনিসই ভেদ করে যায়।

তামা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়মের পাতকে এই রশ্মি ভেদ করে যেতে না পারলেও শরীরের মাংস ভেদ করে গিয়ে হাড়ের কাঠামোকে স্পষ্ট করে তোলে।

এই রশ্মির দ্বারা নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং নিজের হাতের হাড়ের কাঠামোকে স্পষ্ট করে দেখতে পেয়ে রন্টগেন এই অদৃশ্য রশ্মির আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন এবং নাম দেন এক্স-রে।

আলোক রশ্মির মত এক্স-রশ্মিও অদৃশ্য আলোক রশ্মির থেকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে অনেক কম 10^{-6} সে.মি.— 10^{-9} সে.মি.।

তিনি প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে বলেন, এক্স-রে এক প্রকার তড়িৎ চৌম্বক বিকীরণ। এটি রেডিও-তরঙ্গ, উত্তাপজনিত বিকীরণ অবলেহিত, দৃশ্যমান আলোক, অতি বেগুনি ও গামা রশ্মির সমগোত্রীয়, এই বিকীরণ তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়।

১৮৯৬ খ্রিঃ ১লা জানুয়ারী রন্টগেন একটি দশ পাতার পুস্তিকার সঙ্গে প্রকাশ করেন এক্স-রে-এর সাহায্যে তোলা কিছু ফোটো।

বিজ্ঞানী মহলে সঙ্গে সঙ্গেই আলোড়ন সৃষ্টি হল। বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে বিজ্ঞানীরাও প্রয়াসী হলেন।

রন্টগেনের পুস্তিকা প্রকাশের মাত্র কুড়িদিন পরেই এক্স-রে-এর প্রথম প্রয়োগ হয় এক ভদ্রলোকের ওপর। তাঁর নাম এডিম্যাকার্থি। তাঁর হাতের একটা হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। চিকিৎসকরা এক্স-রশ্মির সাহায্যে ফোটো গ্রহণ করে তাঁর ভাঙ্গা হাড় ঠিক করে দিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই রন্টগেন বিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করলেন।

১৮৪৬ খ্রিঃ ২৭শে মার্চ প্রুশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন রন্টগেন। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর ১৮৭০ খ্রিঃ গবেষণা করতে যান উরসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অল্পদিনের মধ্যেই গবেষক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

অল্প বয়স থেকেই দুটি বিষয়ের প্রতি রন্টগেনের কৌতূহল ছিল প্রবল। সেগুলি হল, কাচনল তৈরি ও ফোটোগ্রাফী। গবেষণার এক পর্যায়ে হার্ৎস, টমসন, লেনার্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মত তিনিও নিম্নচাপে বায়ুর মধ্যে তড়িৎ মোক্ষণের নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। সেই সময়েই আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করেন এক্স-রে।

এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ১৮৯৬ খ্রিঃ রন্টগেনকে রামফোর্ড পুরস্কারে সম্মানিত করা হল।

১৯০১ খ্রিঃ নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন হলে বিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের জন্য রন্টগেন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

এক্স-রে আবিষ্কারের পর রন্টগেন তড়িৎবিজ্ঞান নিয়েও গবেষণা করেছিলেন। গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

শেষ বয়সে রন্টগেন উরসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন।

১৯২৩ খ্রিঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী কনরাড রন্টগেন পরলোক গমন করেন।

টমাস আলভা এডিসন



টমাস আলভা এডিসন-এর মত এত বেশি সংখ্যক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজ পর্যন্ত আর কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁকে বলা হয় বিজ্ঞানের যাদুকর।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এই বিজ্ঞানীর বিচিত্র আবিষ্কার সম্ভারের মত নিজের জীবনও ছিল বিচিত্র। তিনি স্কুল কলেজে প্রথাগত শিক্ষা লাভ করেন নি। তাঁর শিক্ষাদীক্ষার জন্য কোন গৃহশিক্ষকও নিযুক্ত হননি। নিজের চেষ্টাতেই নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন তিনি।

অসাধারণ প্রতিভা, অনুসন্ধিৎসা আর অধ্যবসায় বলে তিনি নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর অবদান ধারণ করে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছে মানবসভ্যতা।

প্রতিভা যে নিষ্ফল হয় না এই সত্য বহুভাবে বহু মনীষীর জীবনেই প্রমাণ হতে দেখা গেছে।

একেবারে সাধারণ অবস্থা থেকে, সম্পূর্ণভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকে অনেকেই নিজেদের দুর্মর প্রতিভাবলে বিশ্বমানবের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কীর্তি রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এডিসন ছিলেন এমনি এক দুর্লভ প্রতিভার মানুষ।

স্কুল কলেজে শিক্ষা দীক্ষাহীন একজন মানুষ, যাঁর জীবন আরম্ভ হয়েছে এক সাধারণ ফেরিওয়ালা রূপে, তিনিই একদিন আপন কর্মকুশলতায় শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী রূপে প্রভূত অর্থ ও যশের অধিকারী হয়েছিলেন।

এডিসনের জন্ম হয়েছিল ওহিও প্রদেশের মেনলো নামক স্থানে, ১৮৪৭ খ্রিঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী। পিতার আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল একরকম। মা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।

বাড়িতে লেখাপড়ার একটা পরিবেশ ছিল ধারণা করা চলে। যথাসময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোও হয়েছিল তাঁকে। তবু, বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন এডিসন।

এক্ষেত্রে তাঁর সহজাত প্রতিভাই যে দায়ি ছিল তা বলা চলে। কেননা প্রবল কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। যা দেখেন তার সম্পর্কেই নানান প্রশ্ন জেগে ওঠে তাঁর মাধ্যে।

সেই প্রশ্ন সমাধান করবার জন্য বালককে স্বাভাবিক ভাবেই অভিভাবকের শরণাপন্ন হতে হত। কিন্তু উত্তর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবারশুরু হত একের পর এক প্রশ্ন।

এডিসন ছিলেন পিতামাতার সপ্তম ও কনিষ্ঠ সন্তান। বাড়িতে নিজের লোকেরা তাঁর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার প্রবাহ সামাল দিলেও স্কুলের শিক্ষকরা হার মেনে গিয়েছিলেন। তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতেন বালক এডিসনকে নিয়ে।

কিন্তু কে বিরক্ত হল, কে হল বিব্রত, এসব দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ থাকত না তাঁর। সব বিষয়ই তিনি জানতে চাইতেন, বুঝতে চাইতেন।

প্রশ্নবাণে নাজেহাল হয়ে শিক্ষকরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে নানাভাবে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করলেন।

হতাশ ও বিতশ্রদ্ধ বালক এডিসনকে বাধ্য হয়েই একসময় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হল।

পুত্রের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন পিতা। তিনি যথাসাধ্য এডিসনের কৌতূহল নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতেন এবং তাঁর অনুসন্ধিৎসাকে উৎসাহিত করতেন।

নিজেই তিনি সাধ্যমত এডিসনকে শিক্ষা দিতেন। পিতা ও মাতার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাই ভাবীকালের বিশ্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ গঠন করে দিয়েছিল।

বার বছর বয়সে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই এডিসনকে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় নামতে হল।

শৈশব থেকেই ছেলেদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সেই দেশে এটাই ছিল প্রচলিত রীতি। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে বা মেয়েরা স্বাধীনভাবে রোজগারেরও চেষ্টা করবে।

এডিসন খবর কাগজ ফেরি করতে নামলেন। ট্রেনে ট্রেনে কাগজ নিয়ে হাঁকেন। সেই সঙ্গে সংগ্রহ করেন নানা রকম খবর।

নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতার গুণেই তিনি সেই বয়স থেকেই বিচিত্র সব কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন।

মাত্র পনের বছর বয়সেই রেলগাড়ির একটি কামরায় তিনি সাজসরঞ্জাম জুটিয়ে প্রেস তৈরি করে ফেললেন। এরপর সংগৃহীত খবর ছাপিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করলেন।

সেই সংবাদপত্র আবার নিজেই ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন। এর ফলে যা উপার্জন হত তাতেই তাঁর নিজের খরচ কোনরকমে কুলিয়ে যেত।

এইভাবেই চলছিল দিন। একদিন ঘটল এমন একটা ঘটনা যা এডিসনকে তাঁর নিজের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে সাহায্য করল।

সেদিন অন্যান্য দিনের মত তিনি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন, বগলে খবরের কাগজের বাণ্ডিল. গাড়ি এসে দাঁড়ালে কামরায় কামরায় উঠে বিক্রি করবেন, এই উদ্দেশ্য।

এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন, সেখানকার ষ্টেশনমাষ্টারের ছোট ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে রেললাইনের ওপরে। আর ভীষণ শব্দে মাটি কাঁপিয়ে লাইন ধরে ছুটে আসছে রেলগাড়ি।

বাচ্ছা ছেলেটি এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে। লাইন থেকে লাফিয়ে সরে যাবার কথাও সে ভুলে গেছে।

এডিসন দেখলেন কিছুক্ষণেই মধ্যে চোখের সামনে ঘটে যাবে মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা। তিনি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে লাফিয়ে নামলেন লাইনের ওপরে। ছুটে গিয়ে একটানে সরিয়ে নিয়ে এলেন ছেলেটিকে। বিপুল গর্জন তুলে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল যন্ত্রদানব।

এডিসনের প্রত্যুৎপন্নমতির জন্যই রক্ষা পেয়ে গেল ষ্টেশনমাষ্টারের ছেলেটি। কৃতজ্ঞ ষ্টেশনমাষ্টার এডিসনকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে।

সেইদিন থেকেই তিনি তাঁকে নিজের কাছে রেখে টেলিগ্রাফের কাজ শেখাতে আরম্ভ করলেন।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কাজটা রপ্ত করে ফেললেন এডিসন। ষ্টেশনমাষ্টার তাঁকে টেলিগ্রাম অপারেটরের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন।

কাজটা পছন্দসই হয়েছিল এডিসনের। বেশির ভাগ সময়টাই অফিসে বসে কাজ করতে হত। যেসব টেলিগ্রাম অফিসে আসত, সেগুলো তাঁকে ধরতে হত। ক্বচিৎ কখনো বাইরে যেতে হত।

তিনি নিজের মনে কাজ করেন আর স্বভাববশতঃ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো দেখেন। এভাবে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ভালরকম ধারণা গড়ে উঠল তাঁর।

অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে উদ্ভাবনী শক্তি তাঁর ছিল সহজাত। এবারে সেই শক্তি নিয়ে নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে মেতে উঠলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এমন একটা যন্ত্র বানিয়ে ফেললেন যে তাতে সঙ্কেত ধরা পড়তে লাগল। ফলে নিজের কাজেরই সুবিধা হল অনেক।

যখন তিনি কাছে থাকতেন না তখন আপনা থেকেই কাগজে টেলিগ্রাম রেকর্ড হয়ে যেত।

কিন্তু এই সুবিধাই একদিন বিপদ ডেকে আনল। ব্যাপারটা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে গেল। ফলে কাজে গাফিলতির অপরাধে চাকরিটি খোয়াতে হল।

এডিসন এবারে চলে এলেন নিউইয়র্কে। এক বন্ধুর আস্তানায় আশ্রয় নিলেন। এখানে কেবল রাত্রিটা কাটাতেন, আর গোটা দিন টো-টো করে ঘুরতেন চাকরির সন্ধানে।

বন্ধুটি কাজ করত এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে। একদিন তার অফিসের একটি যন্ত্র বিকল হয়ে গেল। যন্ত্র সারাই করার জন্য শহরের বড় বড় মিস্ত্রীদের ডাকা হল। বিশেষজ্ঞরাও ব্যর্থ হলেন।

যন্ত্রটি ছিল এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেটি সারাই না হওয়ায় অফিসের প্রধান কাজই গেল বন্ধ হয়ে। প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ল।

বন্ধুর কাছ থেকে খবরটা পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন এডিসন। একদিন গিয়ে দেখলেন মেসিনটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

বিশেষজ্ঞরা হার মেনেছেন। এডিসন বিশেষজ্ঞ নন। তবু তাঁর মনে হল, এ মেসিন তাঁর দ্বারা সারাই করা সম্ভব।

প্রথমে ইতস্ততঃ ভাব থাকলেও বন্ধুকে সাহস করে জানালেন কথাটা। বন্ধুটি তাঁকে নিয়ে হাজির করল ম্যানেজারের কাছে।

সেই সময় এডিসনের বয়স মাত্র ষোল। এইটুকুনি ছেলের মুখ থেকে যখন ম্যানেজার শুনলেন যে সে যন্ত্রটা সারাই করতে পারবে, কথাটা তাঁর অবিশ্বাস্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

হলও তাই। তবু মানুষ ভেসে যাবার মুহূর্তে খড়কুটোকে বিরাট অবলম্বন বলে মনে করে, তেমনি ম্যানেজারের মনেও যতই অবিশ্বাস আর বিস্ময় থাক না কেন, মুখে তিনি তা প্রকাশ করলেন না।

দেখা যাক না কি হয়। এমনি একটা মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি এডিসনকে সঙ্গে করে যন্ত্রের কাছে নিয়ে গেলেন।

এডিসন খুব বেশি সময় নিলেন না। গলদটা কোথায় তা নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতা বলে বুঝে গিয়েছিলেন। খানিকটা নাড়াচাড়া করতেই সচল হয়ে গেল যন্ত্র।

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় ম্যানেজার এডিসনের প্রশংসা করলেন।

এতেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি। নির্দ্বিধায় এডিসনকে চাকরিতে বহাল করে নিলেন। মাইনে স্থির হল মাসে তিনশো ডলার।

দৈব যোগাযোগেই বলতে গেলে এডিসনের এভাবে অর্থের ভাবনা দূর হয়ে গেল। মাইনের টাকাতে নিজেই পছন্দমত একটা আস্তানা ভাড়া করলেন। রাহা খরচ বাব দ যা ব্যয় হত তার পরেও কিছু অর্থ থেকে যেতো হাতে। এডিসন তা দিয়ে তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার নানা সাজসরঞ্জাম কিনতে লাগলেন। চিন্তাভাবনা করে যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজও শুরু করলেন।

যেই প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করতেন, সেই অফিসের কাজের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এডিসন বিশেষ ধরনের একটি মেসিন তৈরি করে ফেললেন কয়েক মাসের চেষ্টাতেই।

মেসিনটির কার্যকারিতা দেখে উক্ত প্রতিষ্ঠান নগদ চল্লিশ হাজার ডলার দিয়ে কিনে নিল। সেই সঙ্গে যন্ত্রনির্মাতা হিসেবে এডিসন পরিচিত হয়ে উঠলেন।

একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি। প্রচুর অর্থ। এবারে এডিসন মনের মত একটি গবেষণাগার তৈরি করে নিলেন মেসিন বিক্রীর অর্থে।

গবেষণাগার তৈরি হবার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বহু জায়গা থেকে অর্ডার আসতে লাগল। চাহিদা মত যন্ত্রও তৈরি করে দিতে লাগলেন তিনি।

অর্থাগমের এই সুযোগ অল্প দিনের মধ্যেই এডিসনকে ধনবান করে তুলল। তিনি মহা উৎসাহে ১৮৭৬ খ্রিঃ নিউ জার্সির মেনলো পার্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করলেন। মেতে উঠলেন আবিষ্কারের নেশায়।

পরবর্তীকালে যা কিছু তিনি আবিষ্কার করেছেন, তার সবই মেনলো পার্কের এই গবেষণাগার থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

টেলিগ্রাফ নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল গবেষণা। তারপর টেলিফোন। দুটি যন্ত্রেরই উন্নতি সাধন করেছেন তিনি।

পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর গবেষণা আরম্ভ হল বিচিত্র এক ব্যাপার নিয়ে। কি করে মানুষের কণ্ঠস্বর ধরে রাখা যায় সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন।

এডিসনের চিন্তা ও গবেষণার ফলেই ১৮৭৭ খ্রিঃ ১৮ই জুলাই একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হল।

তিনি মোম মাখান কাগজে নিজের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করে যন্ত্রের সাহায্যে সেই কণ্ঠস্বর পুনরায় শুনতে পেলেন।

ক্রমে এই যন্ত্রটিরই উন্নতি সাধন করে পরে এডিসন আবিষ্কার করলেন ফোনোগ্রাফ।

এরপর তিনি আবিষ্কার করলেন বৈদ্যুতিক বাতি। ততদিনে ডায়নামো আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তার সাহায্যে সহজেই বিদ্যুতের আলো জ্বালিয়ে ঘর আলোকিত করা যেত।

কিন্তু ঘরে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থাটি এডিসনের পছন্দ হল না। তিনি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বায়ুশূন্য কাচের বাল্বের মধ্যে কার্বন ফিলামেন্ট রেখে তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যে বাতি জ্বালাতে সমর্থ হলেন।

বেশ কয়েকদিন ধরে টানা বাতি জ্বালিয়ে রাখলেন তিনি। দেখা গেল বাল্বের ভেতরের ফিলামেন্ট একই ভাবে রয়ে গেল, পুড়ে গেল না।

ইচ্ছামত এবং প্রয়োজন মত বাল্বের আলো জ্বালানো এবং নিবানোর আর কোন বাধা রইল না।

এডিসনের এই অভিনব সাফল্যের পর তাঁর খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পেল।

মেনলো পার্কের ঘরে বসে তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা নিয়ে মেতে থাকেন। আর এতদিন যা মানুষ ভাবতে পারেনি করতে পারেনি তেমনি সব কাণ্ড ঘটিয়ে মানুষকে ক্রমাগত চমকে দিচ্ছেন।

অদ্ভুতকর্মা এডিসন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে নতুন নাম পেলেন 'মেনলো পার্কের যাদুকর'।

এডিসন যেই সময়ে বৈদুতিক বাল্ব আবিষ্কার করেছিলেন, প্রায় একই সময়ে আর একজন ইংরাজ বিজ্ঞানী একই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎবাতি আবিষ্কার করলেন। বিজ্ঞানীর নাম যোসেফ স্বোয়ান। ১৮৮০ খ্রিঃ একটি প্রদর্শনীতে এই আবিষ্কার প্রমাণিত হল।

একই বিষয়ের দুইজন আবিষ্কারক। ফলে আমেরিকা এবং ইংলন্ড দুই দেশের মধ্যে প্রথম আবিষ্কারের গৌরবের দাবি নিয়ে আরম্ভ হয়ে গেল বাদ প্রতিবাদ।

কেউ কারোর দাবি ছাড়তে রাজি নয়। এই নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মামলাও আরম্ভ হল। শেষ পর্যন্ত বিবাদের মীমাংসা করতে এগিয়ে এলেন এডিসন নিজেই।

তিনি বাতিটির নামকরণ করলেন এডিস্বোয়ান ল্যাম্প। উভয় আবিষ্কারকের নামই জড়িত হয়ে রইল বাতির নামের সঙ্গে। এই ব্যবস্থায় কারোরই আর প্রতিবাদের কোন প্রশ্ন থাকল না।

মানুষের কণ্ঠস্বর ধরে রাখার যন্ত্র ফোনোগ্রাফ নিয়ে গবেষণা করবার সময়েই চিত্রের চলমান অবস্থার চিন্তা এডিসনের মাথায় এসেছিল। এবারে সেই চিন্তা কাজে রূপ দেবার প্রয়াস পেলেন।

এডিসনের ধারণা হয়েছিল, ফোনোগ্রাফের গায়ে পরপর কতগুলি ছবি বসিয়ে হাতে ঘুরিয়ে দ্রুত ছবিগুলিকে বার করলে সচল ছবি পাওয়া যেতে পারে। ব্যাপারটা হাতে কলমে করবার জন্য কতগুলো ফোটো তুললেন। সেই ফোটোগুলো সিলিণ্ডারের গায়ে এঁটে বসিয়ে দিলেন।

তারপর হাতল ঘুরিয়ে ছবিগুলোকে যখন একে একে বার করে আনলেন, একটি শক্তিশালী লেন্সের ভেতর দিয়ে ছবিগুলোকে দেখে তাঁর মনে হল, তাঁর চিন্তা সঠিক পথেই রয়েছে।

এবারে গবেষণায় মেতে উঠলেন। সামান্য চওড়া এবং পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ সেলুলয়েডের ফিল্ম অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে আনলেন। সেই ফিল্ম নিজের তৈরি মুভি ক্যামেরায় লোড করে ছবি তুললেন। এইসব ছবি দেখানোর জন্য একটি যন্ত্রও তৈরি করলেন। এবারে লেন্সের সাহায্যে ফিলমের ছবিকে পর্দায় প্রদর্শনেব ব্যবস্থা হল।

সুন্দর ছবি প্রতিফলিত হলো পর্দার গায়ে। নিজের কৃতিত্বে এডিসন স্বয়ং বিস্মিত হলেন। তিনি এই যন্ত্রটির নামকরণ করলেন কিনেটোস্কোপ।

এরপর আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এডিসনের এই আবিষ্কার থেকেই জন্ম নিল আজকের চলচ্চিত্র।

অবশ্য এডিসনের অবলম্বিত ব্যবস্থার বহু অদল বদল ঘটেছে বর্তমানে। তবুও কতগুলো বিষয়ে এখনো পর্যন্ত এডিসনের ব্যবস্থাকেই অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

এডিসনের প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। যে বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন, তাতেই লাভ করেছেন সাফল্য। তাঁর আবিষ্কার এমন বহুবিচিত্র আর বহুল যে তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া শক্ত। জানা যায়, সারা জীবনে তিনি একহাজারেরও বেশি আবিষ্কারের পেটেন্ট নিয়েছিলেন।

বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসের বিস্ময়প্রতিভা মহান বিজ্ঞানী এডিসন ১৯৩৩ খ্রিঃ ১৮ই অক্টোবর ওয়েস্ট অরেঞ্জে চুরাশি বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

লুই পাস্তুর



বিগত শতকের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তার অন্ধকার মানুষের জীবনকে ঘিরে রেখেছিল। সেই যুগে উপযুক্ত ওষুধ ও চিকিৎসার অভাবে মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হত, তার জীবন ও জীবিকার পশু-সম্পদ হঠাৎ মারণ-মড়কে নির্মূল হয়ে যেত।

বিংশ শতাব্দীর উষালগ্ন থেকে বিভিন্ন মনীষীর আবির্ভাবের পর তাঁদের জীবন ও কর্মের আলোকে অন্ধকার যুগের অনিশ্চয়তার বিভীষিকা ধীরে ধীরে দূর হয়েছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোর বিচ্ছুরণ মানুষের জীবনকে আলোকময় করেছে। মানবসভ্যতা লাভ করেছে আলোকময় নতুন পথের দিশা।

সেই অন্ধকার যুগে যাঁরা মানব সমাজকে আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন, সেই ক্ষণজন্মা মহামানবদের মধ্যে বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর অন্যতম।

দীর্ঘ প্রায় অর্ধশতক ধরে তিনি মানব সমাজকে দিয়েছেন নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপহার।

তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অ্যানথ্রাক্স রোগের ওষুধ, জৈবিক অম্লের সৃষ্টি, জীবাণুর সন্ধান, রেশমগুটির অকাল মৃত্যু রোধ ও জলাতঙ্ক রোগের নিরাময়ের উপায়।

১৮২২ খ্রিঃ ২৭শে ডিসেম্বর পূর্ব ফ্রান্সের দেল শহরে এক চর্মব্যবসায়ীর পরিবারে জন্মেছিলেন পাস্তুর।

কালক্রমে নিজ অধ্যবসায় ও সাধনার গুণে সেই দরিদ্র বালকই পরবর্তীকালে বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী ও মানবপ্রেমিক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সেই সময় গবাদি পশুর মধ্যে অ্যানথ্রাক্স নামে একপ্রকার মারাত্মক রোগ দেখা যেত। হাজার হাজার পশু প্রতি বছর এই দুরারোগ্য রোগের শিকার হত।

রোগের কোন প্রতিকার মানুষের জানা ছিল না বলে অসহায় ভাবে ভাগ্যের ওপরেই তাদের নির্ভর করে থাকতে হত।

মানুষের এই দুরবস্থা মোচনের জন্য অনেক মরমী বিজ্ঞানীই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। রোগের কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের চেষ্টায় তাঁরা গবেষণায় ব্রতী হয়েছিলেন।

রবার্ট কোখ্ ছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত জীবাণুতত্ত্ববিদ। অ্যানথ্রাক্স রোগের বিষয়ে তিনিও যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

একবার একটি রোগাক্রান্ত পশুর রক্ত পরীক্ষা করতে বসে পাস্তুর বুঝতে পারলেন, এক ধরনের মারাত্মক জীবাণুর প্রভাবই অ্যানথ্রাক্স রোগের কারণ।

জীবাণু আবিষ্কার করার পরে কোন সুস্থ পশুদেহে ওই রোগের জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে নিজের ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন কোনভাবে বাইরে থেকে অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু সুস্থদেহে প্রবেশ করলেই ওই রোগে আক্রান্ত হতে হয়।

কোখ্-এর চেষ্টায় রোগজীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছিল। তিনি কোন প্রতিষেধক আবিষ্কার করে যেতে পারেননি।

পাস্তুর জানালেন, পরিমিত পরিমাণে অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণুকে সুস্থ পশুর দেহে প্রবেশ করালে পশুটি রোগাক্রান্ত তো হবেই না, উপরন্তু দেহে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মাবার ফলে ভবিষ্যতে তার এই রোগে আক্রান্ত হবার ভয় থাকবে না।

পশুরোগ বিশেষজ্ঞরা এই অদ্ভুত গবেষণাকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হল।

বিজ্ঞানী পাস্তুর তাঁর আবিষ্কারের ফলাফল সর্বসমক্ষে প্রমাণ করবার জন্য নিঃশঙ্ক চিত্তে এগিয়ে এলেন। পরীক্ষা চালাবার জন্য তিনি পঞ্চাশটি সুস্থ ভেড়াকে নির্বাচন করলেন।

প্রথম পর্যায়ে পঁচিশটি ভেড়ার দেহে মৃদু পরিমাণে অ্যানথ্রাক্স রোগ জীবাণু নিয়ে টিকা দেওয়া হল। এই ভেড়াদের এবারে আলাদা করে রাখা হল।

কিছুদিন পরে পঞ্চাশটি ভেড়ার শরীরেই তীব্র পরিমাণে অ্যানথ্রাক্স রোগজীবাণু প্রয়োগ করা হল।

এবারেও কিছুদিন অপেক্ষা করলেন বিজ্ঞানী। একদিন দেখা গেল অদ্ভুত কাণ্ড। যে পঁচিশটি ভেড়াকে প্রথমে টিকা দেওয়া হয়নি তাদের সবকটিই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

কিন্তু যেই পঁচিশটি ভেড়াকে প্রথমে টিকা দেওয়া হয়েছিল তাদের কেউই অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়নি।

এবারে কেবল স্বীকার করে নেওয়া নয়, বিজ্ঞানীর জয়কারে সকলে গলা মেলালেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন পরিমিত পরিমাণ রোগজীবাণু সুস্থদেহকে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা দান করে।

এই ঘটনার পর থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র টিকাদানের পদ্ধতি চালু হল। মানুষ এবং গবাদি পশু—উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি প্রচলিত হল।

এইভাবেই বিজ্ঞানের ইতিহাসে মহান লুই পাস্তুর নিজের স্থানটি নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন।

সমগ্র জীবন তিনি ব্যয় করেছিলেন জীবাণু নিয়ে গবেষণা করে। বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। জীবাণু সম্বন্ধে তাঁর মত এত বেশি আবিষ্কার আর কোন বিজ্ঞানী করতে পারেন নি। তিনি ছিলেন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ জীবাণুতত্ত্ববিদ।

ছেলেবেলা থেকেই দরদী ও পরদুঃখকাতর হবার শিক্ষা ও প্রেরণা পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।

উপযুক্ত শিক্ষালাভের জন্য পিতার কাছ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন তিনি। ফলে ছাত্র হিসেবে স্কুল কলেজ সর্ব ক্ষেত্রেই কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে ছিলেন।

১৮৪৭ খ্রিঃ রসায়ন বিজ্ঞানে মৌলিক গবষেণার জন্য তিনি ডক্টর উপাধি লাভ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ নিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেন। একই সঙ্গে চলল তাঁর গবেষণার কাজ।

রসায়নবিজ্ঞানী পাস্তুরের প্রথমদিকে গবেষণার বিষয় ছিল রেশমিক অ্যাসিড। তাঁর এই গবেষণার ফলাফল ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর গবেষণাকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে লিভোটার্টারিক অ্যাসিড নামে একটি জৈব অ্যাসিড আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

রসায়ন নিয়ে জীবন শুরু করলেও মানুষের প্রয়োজনে জীবাণুতত্ত্ব, পশু চিকিৎসা, কীটপতঙ্গ ও শারীরবিজ্ঞানের বিষয়েও তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে।

ফ্রান্সের রেশম চাষীরা একবার খুবই বিপদের মধ্যে পড়ে গেল। রেশম গুটির অকালমৃত্যুর ফলে রপ্তানি শিল্পের বাজারে সঙ্কট দেখা দিল। বিপর্যস্ত চাষীদের সঙ্গে দেশের সরকারও চিন্তিত হয়ে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত পাস্তুরকেই দেওয়া হল গুটি পোকার মড়কের কারণ ও তার প্রতিষেধকের উপায় আবিষ্কারের দায়িত্ব।

রসায়ন বিজ্ঞানী হিসেবেই পাস্তুরের পরিচিতি। জীবাণু নিয়ে তিনি এর আগে কখনো গবেষণা করেন নি।

তৎসত্ত্বেও, জনগণের সমালোচনা অগ্রাহ্য করে সরকার পাস্তুরের গবেষণার ওপরেই নির্ভর করল।

পাস্তুর বিপন্ন স্বদেশবাসীর কল্যাণের কথা বিবেচনা করে দায়িত্ব মাথা পেতে নিলেন। প্রবল উৎসাহ নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন গুটিপোকার মড়কের কারণ এবং তার প্রতিকারের উপায়।

দেশবাসী অকুণ্ঠ প্রশংসা জানাল পাস্তুরের প্রতিভাকে। সেই সঙ্গে তাদের কৃতজ্ঞতা। সরকার যে যোগ্য লোককেই দায়িত্ব দিয়েছিল সে বিষয়ে আর কারোরই দ্বিমত রইল না।

এরপরে পাস্তুর যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এর ফলেই বিখ্যাত পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারই উপকার ভোগ করছে আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের মানুষ।

আঙুর বিট ইত্যাদির প্রচুর ফলন হয় ফ্রান্সে। ফলে সে-দেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ জুড়ে আছে মদ রপ্তানি ব্যবসায়। সেই ব্যবসায়ে যতটা অর্থাগম সম্ভব তার চেয়েও কম হতো। কারণ মদ বেশি দিন রাখা সম্ভব হত না। গেঁজে গিয়ে নষ্ট হয়ে যেত।

একবার এক সুরা ব্যবসায়ী পাস্তুরকে অনুরোধ করলেন এই সমস্যার একটা প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য।

যথারীতি আবার গবেষণায় বসতে হল পাস্তুরকে। মদের প্রধান উপাদান হল অ্যালকোহল বা সুরাসার। এই অ্যালকোহল তৈরি করা হয় আঙুর, বিট, বিভিন্ন ফল, বার্লি, চাল, ঝোলাগুড় প্রভৃতিকে পচিয়ে।

গবেষণাব পরে পাস্তুর বুঝতে পারলেন, একপ্রকার অদৃশ্য জীবাণুর প্রভাবেই ফল, সবজি বা অন্যান্য বস্তু অল্পসময়ের মধ্যেই গেঁজিয়ে ওঠে। তিনি এ-ও বুঝতে পারলেন, দুধ যে টকে দই হয়ে যায়, রুটি বা মাখনের ওপর ছাতা পড়ে—এসবের মূলেও রয়েছে অদৃশ্য জীবাণুর রহস্য। অদৃশ্য জীবাণুদের সম্বন্ধে গবেষণা করে বহু মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করলেন পাস্তুর। কিছু ক্ষেত্রে জীবাণু নাশের উপায় উদ্ভাবন করলেন তিনি।

এই পর্যায়েই তিনি আবিষ্কার করেন পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতি। দুধ সংরক্ষণের জন্য এই পদ্ধতিটি এখনো বহু দেশে প্রচলিত রয়েছে।

পাস্তুর আবিষ্কৃত পদ্ধতির মূল বিষয়বস্তু হল, উত্তাপের দ্বারা জীবাণুকে ধ্বংস করে দুধ বা কোন খাদ্যকে বায়ুশূন্য করে যদি সংরক্ষণ করা যায় তাহলে সেই খাদ্যে জীবাণুর সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হয়। জীবাণুর সংক্রমণ না ঘটা পর্যন্ত তা পচে গেঁজে উঠবার সম্ভাবনা থাকবে না।

ইতিপূর্বে পাউসেট নামে এক বিজ্ঞানী প্রচার করেছিলেন যে জীবাণুরা আপনা থেকেই জন্মায়। পাস্তুর পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে পাউসেটের সিদ্ধান্ত ভুল।

জীবাণুরা স্বয়ং সৃষ্ট নয়। এরা অদৃশ্যভাবে বাতাসে বিচরণ করে বলে কোন বস্তুতে এদের ক্রিয়াশীলতাকে স্বয়ংসৃষ্ট বলে বোধ হয়।

পাস্তুরাইজেশন আবিষ্কারের পরবর্তী পর্যায়েই পাস্তুর অ্যানথ্রাক্স রোগ সংক্রান্ত গবেষণা করেছিলেন। গবাদিপশুর রোগ নিরোধক টিকা তাঁরই দান। গৃহপালিত

পাখী, মুরগী প্রভৃতির জন্য যে কলেরা রোগের টিকার ব্যবস্থা রয়েছে, তা-ও পাস্তুরের অবদান।

জনকল্যাণে পাস্তুরের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান জলাতঙ্ক রোগের সিরাম (র‍্যাবিজ ভাইরাস) আবিষ্কার। পাগলা কুকুর, বাঁদর, শেয়াল প্রভৃতি কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যেত।

এই রোগের কারণ আবিষ্কারের জন্য দীর্ঘদিন গবেষণায় ডুবে থাকতে হল তাঁকে।

ইতিমধ্যে ১৮৬৫ খ্রিঃ তাঁর পিতার মৃত্যু হল। কয়েক মাস পরেই তাঁর ছোট মেয়ে অসুখে ভুগে মারা যায়। পরের বছরে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাল আর এক মেয়ে।

এসব দুর্ঘটনার কয়েক বছর আগেই ১৮৫৯ খ্রিঃ তাঁর বড় মেয়েও টাইফয়েডের শিকার হয়েছিল।

স্বজন বিয়োগ ব্যথা নিয়েই গবেষণার কাজ করে চলেছিলেন পাস্তুর। তিনি একসময় বুঝতে পারলেন মারাত্মক জলাতঙ্ক একধরনের ভাইরাস ঘটিত রোগ। কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে প্রভৃতি প্রাণীর লালায় এই ভাইরাস থাকে বলেই এরা কামড়ালে সুস্থ প্রাণীদেহে ভাইরাসের অনুপ্রবেশ ঘটে।

সেই ভাইরাস শরীরের নার্ভ তন্ত্রকে আক্রমণ করে। ফলে রোগীর ক্ষতস্থান ফুলে ওঠে। প্রবল জ্বর দেখা দেয়।

অকারণে ভয় পায়, ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। গলার পেশীর সংকোচন ঘটার ফলে রোগী জলপান করতে পারে না—জল দেখলেই ভীত হয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে শরীর আড়ষ্ট হয়ে কর্মশক্তি হারায়। কুকুর বা শেয়াল কামড়ানোর দশ থেকে সত্তর দিনের মধ্যেই শরীরে জলাতঙ্কের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ আত্মপ্রকাশের পাঁচ থেকে সাতদিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটে।

দীর্ঘ গবেষণার পর পাস্তুর জলাতঙ্কের ভাইরাস বা সিরাম আবিষ্কার করতে সমর্থ হন।

তিনি এই সিরাম প্রথম প্রয়োগ করেন যেই বালকের দেহে তার নাম জোসেফ লিস্টার।

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ছেলেটিকে একটা পাগলা কুকুর কামড়েছিল। পাস্তুর তার দেহে সিরাম প্রয়োগ করেছিলেন নিজ হাতে। ছেলেটির জলাতঙ্ক হয়নি।

সেই দিন থেকেই অ্যানথ্রাক্স রোগের মত ভয়াবহ জলাতঙ্ক রোগের ভীতিও মানুষের মন থেকে দূর হয়।

পাস্তুরের আবিষ্কারের ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞান। অথচ তিনি ছিলেন একজন রসায়ন বিজ্ঞানী। কখনো চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নি। তাঁর আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।

পাস্তুর আজ নেই কিন্তু পৃথিবীর দেশে দেশে তাঁর শ্রম ও সাধনার প্রতীক রূপে গড়ে উঠেছে পাস্তুর ইনসটিটিউট।

প্যারিস শহরের উপকণ্ঠে স্থাপিত হয়েছে পাস্তুরের মর্মর মূর্তি, তাঁর সঙ্গে রয়েছে একটি মেষপালক ও একটি কুকুর।

অ্যানথ্রাক্স ও জলাতঙ্ক রোগ নিরাময়তার জন্য ওভাবেই শ্রদ্ধার্পণ করেছে তাঁর কৃতজ্ঞ দেশবাসী সমস্ত পৃথিবীর জনগণের হয়ে।

পাস্তুর ছিলেন কেবল বিজ্ঞানী নয়, শ্রেষ্ঠ মানব হিতৈষী। মনুষ্যতর প্রাণীরাও তাঁর কল্যাণ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় নি।

শেষ বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দেহের এক পাশ অবশ হয়ে গিয়েছিল পাস্তুরের। তার মধ্যেও তিনি তাঁর গবেষণা অব্যাহত রেখেছিলেন।

১৮৯৫ খ্রিঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর প্যারিসে এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনাবসান হয়।

একবার ফ্রান্সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচনের জন্য জনসাধারণের ভোট গ্রহণ করা হয়। সেই নির্বাচনে পাস্তুরই পেয়েছিলেন সর্বাধিক ভোট।

মানব হিতৈষী বিজ্ঞানী পাস্তুর ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক। তিনি বলতেন,

"প্রজাতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আমি যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত আছি .... বিপদের মধ্যে জীবনই প্রকৃত জীবন .... যখন পৃথিবীর কোনও দেশে জ্ঞানের আলো আসে ফ্রান্স তাকে অভিনন্দিত করে, আর যখন বিদেশে কোনও প্রতিভাবান ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে ফ্রান্স তাঁর জন্য শোকে কাঁদে।"

জেমস ওয়াট



বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তা হিসাবে যিনি পৃথিবীর শিল্পবিপ্লবের আবাহন জানিয়েছিলেন বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে তিনি হলেন জেমস ওয়াট।

১৭৩৬ খ্রিঃ ১৯শে জানুয়ারী শিল্পনগরী গ্লাসগোর অন্তর্গত গ্রীনকের এক ছোট্ট গ্রামের এক স্কটিশ পরিবারে জেমসের জন্ম।

জেমসের পিতার আর্থিক অবস্থা কোনকালেই স্বচ্ছল ছিল না। কিন্তু মনের দারিদ্র্য এই পরিবারে কখনো প্রশ্রয় পায়নি।

সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে থেকেই উচ্চতর চিন্তায় অভ্যস্ত ছিলেন পরিবারের প্রতিটি মানুষ।

ছেলেবেলা থেকেই জেমসের শরীর ছিল অত্যন্ত দুর্বল। স্কুলে যাবার ও পড়াশোনার ধকল সামলাবার মত শারীরিক ক্ষমতা ছিল না বলে ছোটবেলায় মায়ের কাছেই লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল।

পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ের বই তাঁর খুবই প্রিয় ছিল।

মায়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর জেমস একটু বেশি বয়সেই স্কুলে গেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মাস্টারমশাইরা জেমসের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেন।

স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষাতেই জেমসের স্থান থাকতো সবার ওপরে। কেবল তাই নয়। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও জ্যামিতি এই তিন বিষয়ে তাঁর চেয়ে বেশি নম্বর কোন ছাত্রের ভাগ্যে জুটত না।

স্কুলের পড়া শেষ হবার আগেই হঠাৎ জেমসের মা মারা গেলেন। ফলে পড়াশোনারও ইতি টানতে হল। সংসারের প্রয়োজনে বেরতে হলো চাকরির খোঁজে।

স্কুলের ওইটুকু বিদ্যের জোরে চাকরি জোটানো তো আর সহজ কথা নয়। ফলে বাধ্য হয়েই শিক্ষানবিশের কাজে ঢুকতে হয় জেমসকে গ্লাসগোর এক চশমার দোকানে।

এই দোকানের মালিক ছিল এক বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ। ব্যবসাটাও তেমনি বিচিত্র।

প্রধান কাজ ছিল চশমার পাওয়ার ঠিক করা। কিন্তু তার সঙ্গে করতেন বাড়ি বাড়ি আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ।

নানা যন্ত্রপাতি বানাবার হাতটিও ছিল ভাল। আশ্চর্য এই যে, অবলীলায় বেহালাও সারাই করে দিতেন।

এত সব কর্ম করার নিট ফল ছিল এই যে, ভদ্রলোক সবসময়েই সবজান্তার মেজাজ নিয়ে থাকতেন।

এহেন মানুষটিও কিন্তু জেমসের সাফ মাথার কাজ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেন না। যা একবার দেখেন সেই কাজই আয়ত্তে এসে যায় জেমসের।

খুব অল্প সময়ই লাগল শিক্ষানবিশের শিক্ষা সমাপ্ত করতে। ভদ্রলোকের কাছে জেমসের শেখার আর অবশিষ্ট রইল না কিছু।

ততদিনে জেমস নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও মনস্থির করে নিয়েছেন। ঠিক করলেন যন্ত্রের কাজে আর একটু হাত পাকলে বিজ্ঞানের কিছু বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন। তাহলে বড় বড় যন্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে আর কোন বাধা থাকবে না।

যন্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করবার শ্রেষ্ঠ জায়গা হল লন্ডন। জেমস সরাসরি এবারে লন্ডনে পাড়ি জমালেন।

লন্ডনে দিনকয়েক ঘোরাঘুরি করে এক মেকানিকের কাছে কাজ শিখতে আরম্ভ করলেন।

সেইকালে লন্ডনে মেকানিকদের বড় নিয়মকানুনের আঁট ছিল। সাত বছর শিক্ষানবিশী না করলে কাউকে মেকানিক হিসেবে কাজ করবার লাইসেন্স দেওয়া হত না।

কিন্তু কাজ শিখতে জেমসের সাতবছর শিক্ষানবিশী করবার দরকার হবে কেন? যন্ত্রবিদ্যার সব কিছু আয়ত্ত করতে তার পক্ষে একবছরই যথেষ্ট সময়। এই সময়ের মধ্যেই যন্ত্রবিদ্যার মূল বিষয় সবই রপ্ত হয়ে গেল তাঁর।

একবছরের মাথায় যখন জেমস তাঁর এই কাজ থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তিনি রীতিমত একজন দক্ষ যন্ত্রনির্মাতা।

জানতেন এই শহরের যন্ত্রবিদসঙ্ঘের কড়া নিয়মকানুনের কথা। তবুও লাইসেন্সের তোয়াক্কা না রেখে বেরিয়ে পড়লেন। এবারে হয় স্বাধীন ব্যবসা নয়তো ভাল একটা চাকরি।

দিনকতকের মধ্যেই মনস্থির করে ফেললেন জেমস। ঠিক করলেন পরের তাঁবেদারি আর নয়। ব্যবসাই করবেন। যে করে হোক একটা গেরাজ খুলতে হবে। সব রকম যন্ত্র সারাইয়ের কাজ হবে সেখানে।

কিন্তু সেখানেও সেই নিয়মের বাধা আড়াল হয়ে দেখা দিল। গ্লাসগোর যন্ত্রসঙ্ঘের সভ্য না হলে যন্ত্র সংক্রান্ত কোন দোকানই খোলা চলবে না— তা না হলে দোকান খোলা সরাসরি বেআইনী কাজ বলে গণ্য হবে।

অগত্যা জেমস নিজের যোগ্যতার হিসেব ও ইচ্ছার কথা জানিয়ে গ্লাসগোর যন্ত্রসঙ্ঘের অফিসে আবেদনপত্র জমা দিলেন।

কিন্তু যেহেতু জেমস সাতবছর শিক্ষানবিশী করেননি, সেই কারণে তাঁর আবেদন নাকচ হয়ে গেল।

জেমস অনেক আশাভরসা নিয়ে বুক বেঁধেছিলেন। এবারে মাথায় হাত পড়ল। কি করবেন ভেবে ঠিক করতে পারছেন না।

এমনি সংকট সময়ে কয়েকজন পারিবারিক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আচমকা। তাদের কাছেই পাওয়া গেল পথের হদিস।

বন্ধুরা একবাক্যে সকলে পরামর্শ দিলেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রভবনের একটা ঘরে স্বচ্ছন্দে নিজের কাজ নিয়ে বসে যাওয়া যায়।

তার জন্য ব্যবস্থা যা করবার তারাই করে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যন্ত্রসঙ্ঘের নিয়মকানুন অচল।

জেমস সানন্দে বন্ধুদের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করলেন। নিজের যন্ত্রপাতি নিয়ে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রভবনের একটা ঘরে একরকম বলা যায় কারখানা খুলে বসলেন।

কাজের তো অভাব ছিল না। দিনকয়েক এটা সেটা নিয়ে কিছু কাজ করে দিতেই গোটা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জেমসের হাতের কাজের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

যন্ত্রবিভাগের কিছু বিকল যন্ত্রপাতি কয়েকদিনের চেষ্টাতেই জেমস সারিয়ে তুললেন। দেখা গেল, সারাই করা যন্ত্রগুলো আগের তুলনায় অনেক ভাল কাজ দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে একটা কাজ রাতারাতি জেমসকে বিখ্যাত করে তুলল। শব্দ বিজ্ঞানের গবেষণার জরুরী সঙ্গীত যন্ত্রগুলো জেমসের হাতে সারাই হয়ে যথারীতি কাজ দিতে শুরু করল।

চোখকান খোলা রেখেই সব কাজ করতেন জেমস। তিনি জানতেন, শেখার শেষ নেই। সারা জীবনই শেখার সময়। তাই তিনি যা কিছু মেরামতের কাজ করতেন, নানান জাতের যন্ত্রে নানা ধরনের মেকানিজম খুঁটিয়ে দেখে রপ্ত করে নিতে লাগলেন।

জেমস ওয়াট ছিলেন বলতে গেলে হাতুড়ে। দেখতে দেখতে জেমস হয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক মিস্ত্রী।

উত্তরকালে যিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগপুরুষ হিসেবে বন্দিত হবেন, এভাবেই দিনে দিনে তাঁর ভিত তৈরি হয়ে চলল।

জেমসের উৎসাহ ছিল অফুরন্ত। কাজের ফাঁকে যে অবসরটুকু পেতেন তা তিনি শুয়ে বসে নষ্ট করতেন না। সেই সময়ে ডুবে থাকতেন নানা ধরনের বিজ্ঞানের বইতে।

কিন্তু তাতে অতৃপ্তি বেড়েই চলেছিল। নানা দেশের বিজ্ঞানের বিষয়ে পড়তে হলে যে ভাষা শিক্ষার দরকার তা তো তাঁর ছিল না।

অধ্যবসায় বলে সেই বাধাও দূর করলেন জেমস। নিজের চেষ্টাতেই নানা ভাষা শিক্ষার বই কিনে পড়তে শুরু করলেন। নানা বিদেশী ভাষা এই সময়েই শেখা হয়ে যায় জেমসের।

প্রধান বাধা দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি প্রসারিত হল, সাহসও বাড়ল। দিনের শেষ লগ্নে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যখন ছাত্রছাত্রীদের ভিড় থাকে না, সেই সময়ে লাইব্রেরীও থাকে প্রায় ফাঁকা। জেমস প্রাথমিক সঙ্কোচ দূর করে লাইব্রেরীর এককোণ আশ্রয় করতে লাগলেন।

এভাবে একের পর এক বিজ্ঞানের বই পড়া চলল তাঁর। অবশ্য যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বইই যে তাঁর পড়ার প্রধান বিষয় ছিল তা বলাই বাহুল্য।

কিছুকাল এভাবে কাটার পর রসদ যথেষ্টই সংগৃহীত হল। এরপরে বসে গেলেন ছোট বড় নানা যন্ত্রের পরিকল্পনা নিয়ে— অবশ্যই যা নিজের সীমিত সাধ্যের আয়ত্তাধীন।

বাদ্যযন্ত্রের কাজে হাত দেবার আগে স্বর ও সুর সঙ্গতির মূল সূত্রগুলো ভাল করে রপ্ত করে নিয়েছিলেন।

শব্দবিজ্ঞানের ওপর কাজ করবার জন্য কষ্টসাধ্য সুরজ্ঞান থেকেও পিছিয়ে থাকেননি জেমস।

এই সময়ে জেমসের বিদ্যা ও জ্ঞান যে কোন বিজ্ঞানের অধ্যাপক কিংবা সঙ্গীতের অধ্যাপকের চেয়ে বেশি ছাড়া কম কিছু ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্ররা এই অশিক্ষিত মিস্ত্রীর হাতের যাদু দেখে মুগ্ধ। অধ্যাপকরাও আসেন ।

অধ্যাপকদের মধ্যে যোসেফ ব্ল্যাক জেমসের মুগ্ধ গুণগ্রাহী। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন।

গবেষণা ও অধ্যাপনায় গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই নাম ডাক ব্ল্যাকের। তিনি তাঁর বক্তৃতার ও গবেষণার জরুরী যন্ত্রপাতি তৈরি করার দায়িত্ব জেমসকে দেন।

ব্ল্যাকের গবেষণার মূল বিষয় ছিল তাপ পদার্থবিদ্যা। এই গবেষণার দরকারী জিনিসপত্র বানাতে বানাতে বাষ্পীয় শক্তিঘটিত কারিগরি বিষয় সম্পর্কে জেমসের পরিষ্কার ধারণা গড়ে উঠল।

ইতিমধ্যে একটা বিশেষ ধরনের ইঞ্জিন মেরামতির জন্য জেমসের কাছে এল। একটা নিউকমেন মেসিন। সেই যুগে এই মেসিন ব্রিটেনে কয়লাখনিতে জল নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহার কার হত।

জেমস ইঞ্জিনের যন্ত্রকৌশল দেখে বুঝতে পারছেন, ইঞ্জিনটা চলে বায়ুর চাপকে কাজে লাগিয়ে।

দেখে শুনে তাঁর মনে হল বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই মেসিনের কার্যকারীতা আরও অনেক বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেললেন জেমস।

কাজ বেশি দেবে, আবার ঝামেলাও কম হবে এমন একটা ইঞ্জিন তিনি নিজেই তৈরি করবেন স্থির করলেন।

জেমস জানতেন ২১২ ডিগ্রী ফারেনহাইট বা ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এক পাউন্ড বাষ্প সহজেই ৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইটের বা ০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পাঁচ পাউন্ড জলকে ২১২ ডিগ্রি ফারেনহাইটে নিয়ে আসা যায়। বাষ্পীয় এই লীনতাপকে কাজে লাগাবার চিন্তায় ডুবে গেলেন জেমস।

১৭৬৫ খ্রিঃ নাগাদ জেমস বাষ্পীয় ইঞ্জিনের বায়ুকল বা এয়ারপাম্প আবিষ্কার করে ফেললেন।

ইঞ্জিনের চোঙের ভেতরের বাষ্প কাজ শেষ করে যখন ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় জলবিন্দুতে পরিণত হয় তাকে পৃথক করবার জন্য ঘনীভবন কক্ষ ও এয়ার পাম্পের প্রায়োজন হয়।

এরপর তৈরি করলেন দুটি ছিদ্রযুক্ত বায়ুনিরন্ধ্র আবরণ। ছিদ্রপথের একটিতে চাপদণ্ডের ওঠানামা ও অন্যটিতে বাষ্প চলাচলের বন্দোবস্ত রাখা হল। এই আবরণটি তিনি এঁটে দেন বাষ্পীয় ইঞ্জিনের তলার দিকে।

দেখা গেল এই নতুন ব্যবস্থায় চাপদন্ড বাম্পের ধাক্কায় চোঙের ভেতরে অনায়াসে চলাফেরা করতে পারছে।

এইভাবে একে একে নানা যন্ত্রাংশ ও তার কলাকৌশল উদ্ভাবন করতে করতে বাষ্পীয় ইঞ্জিন নির্মাণের পথ প্রশস্ত করতে লাগলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই একটি মডেল ইঞ্জিন তৈরি করে ফেললেন। কিন্তু দেখা গেল, পরীক্ষাকালে ইঞ্জিনের নানা ফাঁকফোকর দিয়ে বাষ্প বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা করে ইঞ্জিনের চাপদন্ডটিতে ত্রুটি ধরা পড়ল।

মডেল ইঞ্জিন তৈরির ব্যাপারটা ছিল খুবই খরচ সাপেক্ষ। সামলাতে গিয়ে বাজারে জেমসের অনেক দেনা হয়ে গেল। তাছাড়া আরও কয়েকটি নতুন মেসিনের কলাকৌশল নিয়েও তিনি এইসময় পরীক্ষার কাজ চালাচ্ছিলেন। তাতেও খরচ হচ্ছিল যথেষ্ট অর্থ।

এসব নিয়ে যখন দিশাহারা অবস্থায় সেই দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন অধ্যাপক যোসেফ ব্ল্যাক।

অধ্যাপকের অনুরোধে ব্রিটেনের এক বিখ্যাত লৌহ কোম্পানি ক্যারন আয়রন ওয়ারকস-এর কর্তা ডক্টর জন রোবাক জেমসকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাবতীয় খরচ বহন করতে সম্মত হলেন। তবে একটাই শর্ত থাকবে, লভ্যাংশের দুই তৃতীয়াংশ ক্যারন কোম্পানির প্রাপ্য হবে। যথারীতি এবিষয়ে চুক্তিপত্র সইসাবুদ হতেও বিলম্ব হল না।

১৭৬৯ খ্রিঃ জেমস তাঁর বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পেটেন্ট পেয়ে গেলেন।

এই যুগান্তকারী ঘটনার মাধ্যমেই বলা চলে প্রথমে ব্রিটেনে ও পরে বিশ্বের অন্যান্য সমৃদ্ধ দেশে শিল্পবিপ্লবের ঘন্টাধ্বনি হল।

জেমসের মডেল ইঞ্জিনটি তত্ত্বগতভাবে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেবল গঠনগত কিছু ত্রুটি থাকার জন্য সেটি আশানুরূপ কাজ দেখাতে পারেনি। কাজেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ইঞ্জিন তৈরির আর কোন বাধা ছিল না।

এইসময় জেমসের সঙ্গে যোগাযোগ হল বার্মিংহামের বিশ্ববিখ্যাত লৌহ কারখানার মালিক ম্যাথু বুলটনের সঙ্গে।

তারা জেমসের পূর্বতন চুক্তিকর্তা জন রোবাকের সঙ্গে ব্যবস্থায় এলেন যে ইঞ্জিন তৈরির জন্য সবচেয়ে ভাল লোহার কলকব্জা তৈরি করে দেবেন। এই চুক্তি হল ১৭৭৪ খ্রিঃ গোড়ার দিকে।

জেমসের উৎসাহের অন্ত ছিল না। কয়েক মাসের চেষ্টাতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি হয়ে গেল। সারা ব্রিটেনে এই নিয়ে উৎসাহ ও উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল।

এরপর একের পর এক ইঞ্জিন তৈরি হয়ে চলল। নতুন পেটেন্ট নিয়ে আরও নতুন ইঞ্জিনও তৈরি হতে লাগল।

যতদিন যেতে লাগল জেমসের হাতে ইঞ্জিনেরও ক্রমোন্নতি ঘটতে লাগল। এমন ইঞ্জিন গড়া হল তাতে গতিবেগকে অপরিবর্তিত রাখার এবং গতিকে সীমিত করার যন্ত্রও যুক্ত হল। প্রচুর বাষ্পকে উৎপন্ন করে ইঞ্জিনে এই স্বয়ংক্রিয় সীমিতকরণের ব্যবস্থা করা হল।

এতদিন ব্রিটেনে নিউকমেন ইঞ্জিনেরই প্রাধান্য ছিল। ১৭৮৩ খ্রিঃ থেকে জেমসের ইঞ্জিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাজার থেকে নিউকমেন হটে যেতে বাধ্য হল।

বাষ্পীয় ইঞ্জিন নির্মাণের সূত্রে জেমস অচিরেই প্রভূত অর্থ ও খ্যাতির অধিকারী হলেন। এই সূত্রে বিশ্ববিখ্যাত লৌহ কারখানার মালিক ম্যাথু বুলটনের সঙ্গেও বন্ধুত্ব নিবিড় হল।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী বুলটন ছিলেন প্রকৃত অর্থেই মানবদরদী। বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরির নতুন ফ্যাকটরিতেও তাঁর সেই সহৃদয়তার প্রমাণ রাখলেন।

তাঁর ব্যবস্থাপনায় ফ্যাকটরিতে প্রকৃত অনাথ ও দুঃস্থরাই শিক্ষানবীশের অগ্রাধিকার পেত। বুলটন খুঁজে খুঁজে এদের সংগ্রহ করতেন। পরম মমতায় তাদের থাকা খাওয়া ও শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতেন।

ওখানেই শেষ নয়। কারখানায় কাজ শেখার পরে দুঃস্থ কর্মীদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগও বুলটনই করে দিতেন।

অপরদিকে, উৎপাদিত ইঞ্জিনের গুণগত মান বজায় রাখার ব্যাপারে জেমসের শ্রম ও ভাবনাচিন্তার অন্ত ছিল না। তাঁর ভদ্রোচিত ব্যবহার ও যন্ত্রের মান প্রতিটি ক্রেতাকেই সন্তুষ্ট করত।

জ্বালানীর অপচয় রোধ হত বলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জেমসের বাষ্পীয় ইঞ্জিন ইংলন্ডের কয়লাখনিগুলিতে একচেটিয়া হয়ে গেল।

এই ইঞ্জিনকে দেখা গেল ব্যবসায়ীরা তাদের কারখানায় আরও নানা কাজে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। ফলে দেখতে দেখতে শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রবিপ্লব উপস্থিত হল।

১৮০০ খ্রিঃ নাগাদ জেমসের ইঞ্জিনের পেটেন্টের মেয়াদ শেষ হল। চুক্তিমত ইঞ্জিন বিক্রির এক তৃতীয়াংশ জেমসের প্রাপ্য হয়েছিল। তাতে প্রচুর অর্থের মালিক হলেন তিনি।

এই অর্থ দিয়ে স্বাধীনভাবে গবেষণা আরম্ভ করলেন জেমস। একে একে আবিষ্কার করলেন প্রতিলিপিমুদ্রণযন্ত্র, জমিপরিমাপের বিশেষ যন্ত্র, অঙ্কন যন্ত্র ও গ্রহনক্ষত্রাদির দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্র।

যন্ত্রবিদ্যা ছাড়াও রসায়ন বিদ্যাতেও যথেষ্ট দান রয়েছে জেমসের। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন জল কোন মৌল নয়। যৌগিক পদার্থ। এতে আছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস।

শেষ বয়সে জেমস মানব সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ব্রিটেনের বস্তি অঞ্চলগুলোতে তিনি নিয়মিত ঘুরে বেড়াতেন। নিরন্নকে যোগাতেন অন্ন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় আর রুগীকে নিরাময়ের ওষুধ।

১৮১৯ খ্রিঃ অদম্য কর্মপ্রেরণার আদর্শপুরুষ বিজ্ঞানী জেমস ওয়াট ৮৪ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

জর্জেস ক্যুভিয়ের

পৃথিবীর ইতিহাসের ইতিহাসটি হল প্রাণীবিদ্যার ইতিহাস। এই ইতিহাসের প্রাণপুরুষ ছিলেন জর্জেস ক্যুভিয়ের।

ফ্রান্সের এক অখ্যাত গ্রামে ১৭৬৯ খ্রিঃ ক্যুভিয়েরের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন সুইডেন সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মচারী। কাজ নিয়েই তাঁকে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হত। কাজেই মায়ের স্নেহ আর শিক্ষা নিয়েই বড় হয়ে উঠতে হয়েছিল শিশু ক্যুভিয়েরকে।

ছেলের শিক্ষার প্রতি সতর্ক নজর ছিল মায়ের। চারপাশের জগৎকে গভীর ভাবে দেখার চোখটি তিনিই তৈরি করে দিয়েছিলেন। এইভাবেই বিচিত্র প্রাণীজগতের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন ক্যুভিয়ের। একটু বয়স বাড়তেই প্রাণীবিদ্যার নেশায় ডুবে গিয়েছিলেন তিনি।

মায়ের কাছ থেকে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতের সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস ও বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন ক্যুভিয়ের। মায়ের প্রেরণাতেই পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে প্রাণীবিদ্যার ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিপতিত হয়েছিল তাঁর।

বুফনের প্রাণীজগতের ইতিহাস মোট ৩৬ খন্ডের এক বিশাল গ্রন্থ। মায়ের কথাতেই এই বই পড়তে শুরু করেন ক্যুভিয়ের।

এক একটি খন্ড শেষ করেন আর তাঁর মনে হতে থাকে বিশাল সৃষ্টি রহস্যের এক একটি দরজা তাঁর সামনে খুলে যেতে থাকে।

এই বইতে তিনি ক্রমে এতই মজে গেলেন যে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলার কথা পর্যন্ত ভুলে গেলেন। যেখানেই যান বা থাকেন সারাক্ষণই হাতে থাকে বুফনের কোন না কোন খন্ড।

স্কুলের পড়াশোনাতেও মোটেই পশ্চাদপদ ছিলেন না কুভিয়ের। ভাল ফল দেখিয়ে সরকারী বৃত্তি পেলেন। বৃত্তি নিয়ে চার বছর পড়াশুনা করলেন স্টুটগার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করার পর বেশিদিন বেকারও থাকতে হল না।

নর্মান্ডির এক অভিজাত পরিবারে ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াবার কাজ পেয়ে গেলেন।

এই কাজ তাঁর প্রতিভার বিকাশের অনুকূলে যে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। কেননা নর্মান্ডির বিস্তীর্ণ সাগরবেলায় বিবিধ জীবজন্তুর জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছিলেন।

প্রাণীবিদ্যা বা জুলজির বই পড়ে আগে থেকেই তাঁর একটি অদ্ভুত অভ্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যেখানেই কোন প্রাচীন দেহাবশেষের নমুনা চোখে পড়ত, তাই সযত্নে সংগ্রহ করে ঘরে নিয়ে আসতেন। তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে খুঁটিয়ে দেখতেন।

সেই সূত্রে বর্তমান ছেড়ে তাঁর মন চলে যেতো ধুসর অতীতে. সেই সময়ে সভ্যতা তো দূরের কথা, আদিম অরণ্যসঙ্কুল পৃথিবীতে মানুষের বসবাসযোগ্য পরিবেশও ভালভাবে গড়ে ওঠেনি।

চাকরি নিয়ে নর্মান্ডিতে এসে কুভিয়েরের মনে হল তিনি যেন স্বভূমিতেই এসে পৌচেছেন।

যথার্থই তাঁর জীবনে নর্মান্ডির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গভীর। যে বাড়িতে তিনি পড়াতেন সেখানে ছিল পরিবারের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।

অন্যান্য বিষয়ের হাজার হাজার বইয়ের সঙ্গে বিজ্ঞানের নানা শাখার বইও ছিল প্রচুর এখানে।

ক্যুভিয়ের খুঁজে খুঁজে প্রখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী লিনেয়াসের সিসটেমো নেচার বইটি বার করলেন।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের রহস্যময় জগতের বহু অনাবিষ্কৃত বিষয়ের সন্ধান তিনি এই বই থেকে পান।

আর একটি বইও এই সময়ে ক্যুভিয়েরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই বইয়ের লেখক ছিলেন বিখ্যাত কৃষি বিশেষজ্ঞ ও বিশ্বকোষ সংকলক অ্যাবে তেসিয়ার।

আশ্চর্য যোগাযোগ বলতে হবে, এই তেসিয়ার সেই সময় বাস করছিলেন ক্যুভিয়েরের নিয়োগকর্তার বাড়ির সন্নিকটেই।

তিনি সন্ত্রাসবাদীদের চোখের আড়াল হবার জন্য জন্মভূমি ছেড়ে নর্মাণ্ডিতে আত্মগোপন করে ছিলেন।

সন্ধান পেয়ে ক্যুভিয়ের গিয়ে আলাপ করলেন প্রিয় লেখকের সঙ্গে। দিনকতকের মধ্যেই নানা বিষয়ের গভীর আলোচনা বিশেষ করে প্রাণীবিজ্ঞানের আলোচনার সূত্রে তেসিয়ার ক্যুভিয়েরের বিশেষ আগ্রহের বিষয়টির সন্ধান জেনে যান। তিনি ক্যুভিয়েরের মধ্যে ভবিষ্যতের এক সম্ভাবনাময় প্রাণীবিজ্ঞানীকে দেখতে পান। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তেসিয়ারের চেষ্টায় ১৭৯৫ খ্রিঃ ক্যুভিয়ের প্যারিসের বিখ্যাত প্রাকৃতিক ইতিহাসের সংরক্ষণশালায় অ্যানাটমি বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের চাকরি পেয়ে যান।

এবারে ক্যুভিয়েরের জীবন তার স্বাভাবিক গতিপথ পেয়ে সাবলীল ধারায় এগিয়ে চলল।

অধ্যাপনার জগতে এসে অল্পদিনের মধ্যেই সুখ্যাত হয়ে উঠলেন ক্যুভিয়ের। জীবাশ্ম-বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর বক্তৃতাগুলি ছাত্রমহলে সবিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করল। প্রাচীন পৃথিবীর লুপ্ত প্রাণীরাও যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় হতে পারে তা ক্যুভিয়েরের মাধ্যমেই প্রথমে ছাত্ররা ও পরে সমগ্র ফ্রান্স জানতে পারল।

এই সময়ে খনি খনন করবার সময়ে কোন জীবাশ্ম উদ্ধার হলে তা সনাক্তকরণের জন্য সরাসরি ক্যুভিয়ের-এর কাছেই নিয়ে আসা হত। প্রাণীবিদ্যার বিশারদ হিসেবে তিনি এতটাই খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

জীবাশ্মবিজ্ঞানের ওপর ক্যুভিয়েরের প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ ফ্রান্সের বিজ্ঞান আকাদেমিতে জমা পড়ল ১৭৯৬ খ্রিঃ।

প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল অতীত পৃথিবীর প্রাণীবা বর্তমান প্রকৃতি জগতের পরিচিত পশুপাখিদের চেয়ে কতটা পৃথক।

আঠার শতকের শেষ পাদে ক্যুভিয়েরের এই প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক মূল্য যে সাধারণ ছিল না তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বর্তমান জীবাশ্ম-বিজ্ঞানের আলোকমন্ডলে থেকে সেদিনের বিজ্ঞানের এই নতুন শাখার অভ্যুদয়ের কালের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়তো সম্ভব নয়।

সেই কালের মানুষের বিশ্বাস ছিল অতীত পৃথিবীর অবলুপ্ত মানুষ ও জীবজন্তুদের চেহারা, চালচলন, ধরনধারণ সবই সমকালের প্রাণীদেরই অনুরূপ ছিল।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রকৃতি-জগতের বৈশিষ্ট্য ও প্রাণীদের শারীরিক গঠনগত রূপের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব এ সম্পর্কে সেকালের মানুষের কোন ধারণাই ছিল না।

ক্যুভিয়েরই সমকালের সকল ধারণায় পরিবর্তনের ঝড় আনলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেয় ঃ We have difficulty in recognising the former inhabitants of the earth।

তিনি কেবল পুরা পৃথিবীর অধিবাসীদের হদিশ-হদ্দ জানা কষ্টসাধ্য বললেন তাই নয়, তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণও দাখিল করলেন।

ফ্রান্সের মঁত মারেতের জিপসাম খাদে খোঁড়াখুঁড়ির সময়ে শ্রমিকদের শাবল গাঁইতির আঘাতে বেরিয়ে এসেছিল অজ্ঞাত কোন জন্তুজানোয়ারের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ।

সেগুলো সনাক্ত করবার জন্য জমা পড়েছিল ক্যুভিয়েরের কাছে। তিনি জীবাশ্মের বিচ্ছিন্ন অংশগুলো জুড়ে লুপ্ত প্রাণীটির একটি পূর্ণাবয়ব আদল তৈরি করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

এ যে এক সুকঠিন কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ প্রাণীবিশ্বের সবচেয়ে কঠিন ধাঁধা হল অশ্মীভূত প্রাণীর নানা দেহাবশেষ জুড়ে একটা পূর্ণাবয়ব গড়ে তোলা। সেই সুকঠিন কাজেই হতে দিলেন ক্যুভিয়ের।

অতিকায় এক প্রাণীর অসংখ্য বিচ্ছিন্ন হাড়গোড় সামনে নিয়ে বসে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে একে একে অবস্থান অনুযায়ী মিলিয়ে সরু তার দিয়ে আটকে নতুনভাবে প্রাণীদেহ গড়ে তোলার কাজে মেতে উঠলেন তিনি।

অসাধারণ অ্যানাটমি জ্ঞানের সঙ্গে প্রাণীবিদ্যার প্রতি অমানুষিক আগ্রহ সম্বল করে শেষ পর্যন্ত অতি অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে তুলেছিলেন ক্যুভিয়ের।

তাঁর দীর্ঘদিনের ধৈর্য শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে দুটি তৃণভোজী লুপ্ত প্রাণীর বিচিত্র শরীর সম্পূর্ণ গড়ে উঠেছিল।

প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে যেসব প্রাণী পৃথিবীর মাটি থেকে হারিয়ে গেছে, এমন দুটি প্রাণীর কঙ্কাল-শরীর প্রদর্শনের জন্য প্যারিসের প্রাকৃতিক ইতিহাসের সংগ্রহশালায় রেখে দেওয়া হল।

গোটা শহর আলোড়িত হল এই সংবাদে। বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সর্বশ্রেণীর মানুষ ভেঙ্গে পড়ল হারিয়ে যাওয়া পুরা-প্রাণীর কঙ্কাল-খাঁচা দেখে কৌতূহল মেটাবার জন্য।

তৃণভোজী এক নং প্রাণীটির নাম দিলেন ক্যুভিয়ের এনোপ্লথেরিয়াম। যার অর্থ অস্ত্রশস্ত্রহীন বন্য জানোয়ার।

তৃণভোজী দুই নং-এর নাম রাখা হল প্যালিওথেরিয়াম। এর অর্থ হল প্রাচীন-কালের বন্যপ্রাণী।

এখানেই শেষ হল না ক্যুভিয়েরের দুঃসাধ্য অভিযান। নিজের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করে একটার পর একটা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীকে অবলুপ্ত জগতের অন্ধকার গহ্বর থেকে তুলে আনতে লাগলেন।

তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল না। জীবাশ্মবিজ্ঞানী হিসেবে গোটা ইউরোপ জুড়ে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল।

বিশাল এক রত্নভান্ডারের দরজা যেন হঠাৎ অর্গলমুক্ত হয়ে গেল। ফ্রান্সের যেখানে যত জীবাশ্ম উদ্ধার হতে লাগল গাড়ি বোঝাই হয়ে হাজির হতে লাগল ক্যুভিয়েরের স্টুডিওর সামনে। এর মধ্যে পাওয়া গেল, প্রাচীন পাখি, তিমি ও অতিকায় সব হাতিদের জীবাশ্ম।

ক্যুভিয়ের সংগ্রহকারীদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেককেই পুরস্কৃত করতে লাগলেন।

স্তূপীকৃত হাড়গোড়ের পাহাড় থেকে একদিন আশ্চর্যভাবে ক্যুভিয়ের তুলে আনলেন সৃষ্টি রহস্যের মশলা মাখানো অত্যদ্ভুত এক প্রাণীর জীবাশ্ম। সেটি হল পাখিদের আদিতম পূর্বপুরুষ সরীসৃপ-পাখি টেরোডাকটিল।

ক্যুভিয়েরের নিরলস চেষ্টা ও আগ্রহে ধীরে ধীরে অতীত পৃথিবীর প্রাণীজগতের পরিচয় উঠে এল আধুনিক মানুষের জ্ঞানচর্চার অঙ্গনে।

বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে ক্যুভিয়ার-চর্চিত জীবাশ্ম বিজ্ঞান অন্যতম শাখারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের জীবাশ্ম নিয়ে কাজ করতে করতে আর এক দুঃসাহসিক কাজের চিন্তা মাথায় এল ক্যুভিয়েরের। তিনি প্রাণীজগতের নতুন শ্রেণীবিভাগের কাজে হাত দিলেন।

লিনোয়াসের সিসটেমা নেচারি বইটি বহু পূর্বেই ভালভাবে পড়েছিলেন ক্যুভিয়ের। এই বইতে লিনোয়াস বহিরাকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জীবজগতের বাসিন্দাদের শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন।

ক্যুভিয়ের সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের পর প্রাণীজগতের শ্রেণীবিভাগ করলেন তাদের আদিম গঠনভঙ্গি ভিত্তি করে।

এই সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা ও কাজের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ১৭৯৮ খ্রিঃ একটি বই প্রকাশ করলেন। বইটির নাম দিলেন টেবলিউ এলিমেন্টেয়ার দে লভ হিস্ট্রি নেচারেল দেস অ্যানিমাকস।

ক্যুভিয়ের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যকে নিরূপণ করবার জন্য শারীরবৃত্তীয় ও শব ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান অর্থাৎ ফিজিওলজি ও অ্যানাটমিকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁর এই কাজ মানবেতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনারূপে স্বীকৃত হয়েছে।

ক্যুভিয়েরের তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তুকে মোট চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল (১) মেরুদণ্ডী (২) কোমলাঙ্গী (৩) আলোবিকীর্ণকারী ও (৪) গ্রন্থিবদ্ধী।

কোমলাঙ্গীর উদাহরণ হিসেবে নাম করা যায় শামুক ও শুক্তি। আলোকবিকীর্ণকারী প্রাণী হিসাবে নাম করা যায় প্রবাল ও একজাতীয় সামুদ্রিক সাদা গাছ সী-অ্যানেমন।

গ্রন্থীবদ্ধী প্রাণীর উদাহরণ হল নানা কীটপতঙ্গ ও কাঁকড়া।

তাঁর বইটিতে ক্যুভিয়ের কেবল প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগই করেননি। তিনি শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের বিভিন্ন অঙ্গের নির্দিষ্ট কাজকর্ম সম্পর্কেও স্পষ্ট মতামত জানিয়েছেন।

তিনি জানিয়েছেন, এই চার শ্রেণীর প্রত্যেক প্রাণীই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে চলে। কেউ কারো ওপরে নির্ভরশীল নয়।

কেবল তাই নয়, এই সব শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে পারস্পরিক বিবর্তনগত কোন সম্পর্কও নেই।

উত্তরকালে যারা জীবাশ্ম বিজ্ঞানের চর্চা করবেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে ক্যুভিয়ের পরামর্শ রেখেছেন যে প্রকৃতির নানা সময়কালের প্রাণী ও উদ্ভিদকুলকে পরীক্ষা করবার সময়ে যেন পৃথক ও স্বাধীন সত্তা হিসবেই গণ্য করা হয়।

এই পথে অগ্রসর হলে প্রাচীন পৃথিবীর প্রাণীদের আবিষ্কার করাব কাজ সহজসাধ্য হবে।

জীবাশ্ম নিয়েই বিজ্ঞান জগতে যাত্রা শুরু করেছিলেন ক্যুভিয়ের। এই সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের কোন সমালোচনা শোনা গেল না। কিন্তু প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে ক্যুভিয়েরের বৈজ্ঞানিক মতবাদ সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞানীই একমত হতে পারলেন না।

এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা যিনি নিলেন তিনি হলেন তাঁরই বন্ধু ও সহকর্মী এতিয়েন সেইন্ট হিলের।

প্যারিসের যেই সংগ্রহশালায় ক্যুভিয়ের অধ্যাপনা করতেন এতিয়েন ছিলেন সেই সংস্থারই বিখ্যাত অধ্যাপক। জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীমহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। ক্যুভিয়েরেরও অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন তিনি।

এতিয়েন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, পৃথিবীর জীবনক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদই এক সাধারণ ও নির্দিষ্ট পথ ধরে উপস্থিত হয়েছে।

এই অবস্থায় এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য এক শ্রেণীর বিবর্তনগত সম্পর্ক যে রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তিনি ল্যামার্ক-এর ধারণার কথাও উল্লেখ করেন।

এই বিরূপ মতামতকে কেন্দ্র করে দুই সহকর্মীর মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কে চিড় ধরলেও ক্যুভিয়ের তাঁর নিজের বিশ্বাসে অবিচল রইলেন। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা

করলেন, একটা অক্টোপাশ ও একটা ঘোড়ার মধ্যে বিবর্তনগত নির্দিষ্ট কোন সম্পর্ক রয়েছে এই মত আমি স্বীকার করতে পারি না। তেমনি এ-ও মানি না , জীবজন্তুর আস্তাবল থেকেই মানুষের উৎপত্তি হয়েছে।

সেই সময়ে ক্যুভিয়ের মতামতই ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও পঞ্চাশ বছর পরে ডারউইন তাঁর বিখ্যাত বিবর্তনবাদের সাহায্যে এই ধারণাটির যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

ক্রমশঃ সমগ্র ইউরোপ ও পরে বিশ্বের বিজ্ঞানমহলে ক্যুভিয়েরের অবদান স্বীকৃতি লাভ করল। একের পর এক সম্মান তাঁকে পুরস্কৃত করতে লাগল।

এক সময়ে প্যারিসের রাজকীয় বিখ্যাত উদ্যান জার্ডিন দেস প্ল্যান্টেস ক্যুভিয়েরের তত্ত্বাবধানেই বর্ধিত হয়েছিল। এবার সেখানে অধ্যাপনার আহ্বান এল। ক্যুভিয়ের সংগ্রহশালার চাকরি ছেড়ে জার্ডিনে চলে এলেন।

নতুন কাজে যোগ দেবার কিছুদিন পরেই ক্যুভিয়ের ফ্রান্সের বিখ্যাত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ইনস্ট্যাট দে ফ্রান্সের আজীবন সচিব নির্বাচিত হন।

সম্রাট নেপোলিয়ন ১৮০৮ খ্রিঃ ক্যুভিয়েরকে রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পরিষদের সদস্যপদে মনোনয়ন দেন।

আল্পস পর্বত ও রাইন নদীর পরপাড়ে ফ্রান্সের অধীন জেলাগুলিতে উচ্চশিক্ষা বিকাশের সুযোগ ও সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার সর্বময় দায়িত্বও ক্যুভিয়েরকে দেওয়া হল।

১৮১৮ খ্রিঃ ফ্রান্সের বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য হন ক্যুভিয়ের। এর পরেই ফরাসি সরকারের অভ্যন্তরীণ সমিতির প্রধানের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি আমৃত্যু, ১৮৩২ খ্রিঃ পর্যন্ত আসীন ছিলেন।

ক্যুভিয়েরের সম্মান ও গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকার লাভ তখনো বাকি ছিল। ১৮৩১ খ্রিঃ ফ্রান্সের সম্রাট লুই ফিলিপ তাঁকে লর্ড সভার সদস্য করেন। একই সঙ্গে দেওয়া হয় রাজ্যসভার সভাপতির পদটি।

১৮২৮ খ্রিঃ দীর্ঘ ২৫ বছরের সমূহ গবেষণার বিবরণ নিয়ে ক্যুভিয়ের একটি বই প্রকাশ করেন। বইটির নাম নেচারাল হিস্ট্রি অব ফিশ।

পাঁচ হাজারেরও বেশি বিভিন্ন ধরনের মাছের ওপরে গবেষণা করে তাদের জন্ম ইতিহাসের নানা চমকপ্রদ ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন ক্যুভিয়ের। সেই বিবরণও এই বইতে সংযুক্ত হয়েছিল।

পরের পর জীবাশ্মবিজ্ঞান, জীবাশ্ম-অস্থি ও তুলনামূলক শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যার ওপর তাঁর বিভিন্ন বই প্রকাশিত হয়। এই বইগুলি ক্যুভিয়েরের জীবনে বিপুল খ্যাতি বহন করে এনেছিল।

ক্যুভিয়ের তাঁর তুলনামূলক শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যার গবেষণার দ্বারা বিখ্যাত বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করেও বিজ্ঞানীমহলে অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তিনি দেখিয়েছেন, মাছ থেকেই উভচর এবং উভচর থেকে সরীসৃপের জীবন অবস্থান্তর লাভ করেছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, সুদীর্ঘকাল একটানা গবেষণা করে জীবজগৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্তমূলক কোন স্থির মতামত প্রকাশ করতে পারেননি ক্যুভিয়ের।

যেই সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে ল্যামার্ক, ওয়ালাক এবং ডারউইনের কাজে, এঁদের কাউকেই এত দীর্ঘ সময় গবেষণার জন্য ব্যয় করতে হয়নি।

তবুও বলতে হবে, সত্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল ক্যুভিয়েরের গবেষণার উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে তিনি নিজের সঙ্গেও আপোশ করতেন না। কোন জীবাশ্ম দেখে যদি মনে করতেন এ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভুল, তাহলে তা পরিবর্তন করতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করতেন না। সত্যসন্ধানের এই মহৎ বৈশিষ্ট্যই তাঁর চরিত্রকে মহতো মহীয়ান করে তুলেছিল।

১৮৩২ খ্রিঃ ক্যুভিয়ের কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

রবার্ট কখ্



রবার্ট কখ্-এর জন্ম ১৮৪৩ খ্রিঃ জার্মানির ক্লাউস্তলে।

অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর ওপরে গবেষণা ও যক্ষার জীবাণুর পরিচয় নির্ণয় করে বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

কখ্ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন চিকিৎসক। কিন্তু মানবজাতির সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর শত্রু রোগজীবাণুর গবেষণার তাড়নায় পেশা হয়ে গিয়েছিল নিতান্তই গৌণ ব্যাপার।

জীবাণু আবিষ্কার ও জীবাণুনাশক গবেষণাকেই তিনি মানবকল্যাণের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

এর জন্য তাঁকে সংসারে সহ্য করতে হত স্ত্রীর নির্যাতন, উপহাস আর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ। তাঁর গবেষণার কাজকে স্ত্রী কখনোই সুনজরে দেখতেন না।

অর্থোপার্জনের খোলা পথ থাকতেও তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজের গবেষণা নিয়ে মেতে থাকলে সংসারের আর্থিক অনটন কে রোধ করবে? তাই নিয়েই ছিল স্ত্রীর অভিযোগ।

গবেষণার স্বার্থে কখ্ সবই নীরবে সহ্য করতেন। কোন রকমে সংসারের হালটা ধরে থাকতেন কেবল।

এই স্ত্রীই জীবনের কোন এক দুর্বল মুহূর্তে জন্মদিনে স্বামীকে একটা মাইক্রোস্কোপ কিনে উপহার দিয়েছিলেন। সেই যন্ত্র পেয়ে কখ্ হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন।

সম্পূর্ণ এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছিল কখ্কে এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি। সে হল জীবাণুর জগৎ ও জীবন।

যেখানে যা পান তাই এনে তিনি যন্ত্রের লেনসের নিচে ধরেন। পদার্থের আণুবীক্ষণিক চেহারা দেখেন মুগ্ধ হয়ে।

সেই সময়ে জার্মানির গ্রামে দুরন্ত পশুরোগ অ্যানথ্রাক্স রোগের ভয়ঙ্কর দাপট। এই রোগের মড়কে গৃহপালিত পশুর পাল নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

কি খেয়াল হতে একদিন অ্যানথ্রাক্স রোগে মৃত একটি ভেড়ার কিছু কাল রক্ত সংগ্রহ করে কখ্ নিয়ে এলেন নিজের ক্লিনিকে। পরীক্ষা করতে বসে গেলেন মাইক্রোস্কোপ নিয়ে।

লেন্সে চোখ রাখতেই দেখতে পেলেন, অসংখ্য রডের আকৃতির সজীব পদার্থ রক্তের মধ্যে কিলবিল করছে।

সুস্থ ভেড়ার রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করেন, না সেখানে কোন সজীব পদার্থের অস্তিত্ব চোখে পড়ে না।

এরপর আরও জীবজন্তুর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে একসময় তিনি নিশ্চিত হন এই সজীব রডেরাই হল অ্যানথ্রাক্স রোগের বাহক।

রোগের কারণ হিসাবে রডকে নির্দেশ করতে পারলেও তিনি তাদের জীবনকে প্রমাণ করবার মত কোন পরীক্ষা করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু জীবাণুদের কালচারের অভিনব পদ্ধতি তিনি রেখে যেতে পেরেছিলেন।

কখ্ জীবাণু জন্মের জৈবমাধ্যম জল নিতেন ষাঁড়ের অশ্রু থেকে। তাতে মিশিয়ে দিতেন অ্যানথ্রাক্সে মৃত জীবজন্তুর প্লীহার রস।

নির্দিষ্টভাবে তৈরি এই তরলকে জীবাণুমুক্ত কাচের স্লাইডে নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক রেখে দিতেন। তারপরই দেখতে পেতেন অসংখ্য রড দল বেঁধে সেই তরল থেকে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

এইভাবে প্রতিবারের কালচারেই তিনি দেখতে পেলেন, যে রড জন্মাচ্ছে তাদের প্রত্যেকেরই অ্যানথ্রাক্স রোগ তৈরির ক্ষমতা সমান।

এইভাবে কখ্ সমাধানে আসেন যে কোন কোন বিশেষ রোগের পেছনে থাকে একই ধরনের জীবাণু। কখ সানন্দে ঘোষণা করলেন ''One specific microbe causes one specific disease.''

উনিশ শতকের শেষ লগ্নের চিকিৎসা বিজ্ঞানে কখের এই ঘোষণা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। কখের এই আবিষ্কারের সাহায্য নিয়েই পাস্তুর অ্যানথ্রাক্স রোগের ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক টিকা তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ফলে বেঁচে গিয়েছিল কোটি কোটি গৃহপালিত পশু, সেই সঙ্গে ফ্রান্সের ভেঙ্গে পড়া কৃষি অর্থনীতি।

যে টিকাদান পদ্ধতি আজ সারা পৃথিবীতে প্রচলিত তার প্রথম পথিকৃৎ হলেন রবার্ট কখ্।

কখ তাঁর পরবর্তী গবেষণার কাজ শুরু করেন যে বিষয় নিয়ে তা হল, ব্যাসিলাস জীবাণু বা রডদের পশুর শরীরে অনুপ্রবেশ ঘটে কি ভাবে।

দিনের পর দিন কেটে যেতে থাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন ইতিহাসের সন্ধানে।

অনেকদিন আগের তৈরি অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর একটা smear রাখা ছিল ক্লিনিকে। অনেকদিন তাতে হাত পড়েনি। সেটাকেই কি মনে হতে একদিন টেনে আনলেন অনুবীক্ষণের তলায়।

দেখলেন, রডদের পরিচিত চেহারা একেবারে বদলে গেছে। প্রত্যেকটি ব্যাসিলাস বা রডের গায়েই যেন বসানো রয়েছে মুক্তোরমালা।

সেদিন সকালেই সংগ্রহ করা ষাঁড়ের চোখের জল রাখা ছিল পরীক্ষানলে। তা থেকে সামান্য জল ছড়িয়ে দেন স্লাইডের স্মীয়ারে।

এরপর চলে কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষা। অণুবীক্ষণের লেনসে চোখ রেখে কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একসময় দেখতে পান, সেই মুক্তোর মালার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে পুরনো চেহারার রডেরা। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় তাঁর কাছে—জীবাণুর সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় দশাতেই তাদের গায়ে গজিয়ে ওঠে অসংখ্য রেণুর মুক্তোমালা।

অনুকূল অবস্থার সম্মুখীন হলেই রেণুময় অবস্থা ঘুচে গিয়ে সক্ষম সজীব জীবাণুরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নানা মারাত্মক রোগ সৃষ্টিতে তখন এদের শক্তির অভাব হয় না।

কখের এই নতুন আবিষ্কারের সংবাদ প্রচারিত হবার কিছুদিন পরেই পাস্তুর ঘোষণা করলেন, অ্যানথ্রাক্স রোগে মৃত যে-সব পশু মাঠে ঘাটে ফেলে দেওয়া হয়, তাদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসে কৃমির দল। এই কৃমিদের শরীরেই রেণুর মুক্তোমালা হয়ে জড়িয়ে থাকে অ্যানথ্রাক্স জীবাণু। জীবাণুবাহী এইসব কৃমি যখন নীরোগ পশুর দেহে প্রবেশ করে, তারা রোগাক্রান্ত হয়।

এইভাবে কখ-এর নিজস্ব ক্লিনিকের নিভৃতিতে আবিষ্কৃত তত্ত্ব পাস্তুরের পরীক্ষায় নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়ে গেল।

পাস্তুরের আগে কখ্ই প্রথম চাষীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, অ্যানথ্রাক্সে মৃত পশুদের যেন নরম মাটির অনেক গভীরে পুঁতে দেওয়া হয় অথবা পুড়িয়ে ফেলা হয়। তাহলে আর রোগ ছড়াবার ভয় থাকে না।

অনতিবিলম্বেই কখ্ তাঁর গবেষণার ফল লাভও করলেন। ডাক এল ব্রেসলু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

সেখানে তাঁর নানা আবিষ্কারের একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। এরপরেই বিস্ময়কর আবিষ্কারক হিসেবে কখের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এবারে ডাক এলো রাজধানী বার্লিনের ইম্পিরিয়াল হেল্‌থ অফিস থেকে। তাঁর জন্যই সেখানে তৈরি করা হয়েছে এক্‌সট্রা অর্ডিনারি অ্যাসোসিয়েটের পদ। আর তাঁর গবেষণার জন্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে আধুনিক নানা যন্ত্রপাতিতে চমৎকার এক ল্যাবরেটরি, মায় দুজন সহকারী।

বৃহত্তর গবেষণার স্বার্থে কখের প্রতি এ সবই ছিল সরকারি উপহার।

কখ যখন বার্লিনে তাঁর কর্মজীবন শুরু করলেন সেই সময় গোটা শহরেই ক্ষয়রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

কখ্ এই সুকঠিন রোগটির মোকাবিলায় নেমে পড়লেন।

তিনি লক্ষ করলেন, ক্ষয়রোগের মূলেও রয়েছে ব্যাসিলাস বা রডশ্রেণীর জীবাণু। তবে খানিকটা ভিন্ন গঠনের।

এই জীবাণুদের নিয়ে একে একে ২৭০টি স্লীয়ার তৈরি করলেন কখ্। তারপর তার সঙ্গে মেশান দু-এক ফোঁটা করে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক রঞ্জক। প্রতিটি স্লীয়ারই বিশেষ বিশেষ রঙে এভাবে রঞ্জিত করে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু অণুবীক্ষণ উৎসাহ ব্যঞ্জক কোন বার্তা দিতে পারল না।

সবশেষে আর একটি নতুন স্লীয়ারে মিথিলিন ব্লু নামক রাসায়নিক রঞ্জকে রঞ্জিত করে অণুবীক্ষণের তলায় ধরতেই দেখতে পান স্লাইডের জমিতে কিলবিল করছে সজীব জীবাণুরা।

কখ নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত করলেন ক্ষয়রোগের জন্যও ওই রড বা ব্যাসিলাসের দলই দায়ী।

এরপর জীবাণু নাশক রাসায়নিক আবিষ্কারেও সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি।

কিন্তু তিনিই প্রথম যক্ষ্মার ব্যাসিলাসের পরিচয় নির্ণয় করার কাজে সাফল্য লাভ করেছিলেন।

তাঁর এই সূত্র অনুসরণ করেই উত্তরকালের বিজ্ঞানীরা জীবাণু ধ্বংসের রাসায়নিক আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই দিক থেকেও চিকিৎসা বিজ্ঞান কখের কাছে ঋণী।

যক্ষ্মারোগেব জীবাণু মানব শরীরে কিভাবে রোগের উৎপত্তি ঘটায় তা নিয়েও গবেষণা করে সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছিলেন কখ।

তিনি জানিয়েছেন এই জীবাণুরা বায়ুজীবী এবং এরা মানবশরীরে প্রবেশ করে নিঃশ্বাসের সাহায্যে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারাই এই বিষয়টি তিনি প্রমাণ করেছিলেন।

প্রতিটি রোগের জন্যই ভিন্ন ধরনের জীবাণু দায়ী। কখের পূর্বঘোষিত জীববৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি তাঁর যক্ষ্মারোগ জীবাণু নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

জীবাণুতাত্ত্বিক হিসেবে দেশ থেকে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল রবার্ট কখের নাম। মিশরে এশিয়াটিক কলেরার প্রাদুর্ভাব হলে ১৮৮৩ খ্রিঃ তাঁকে মিশরে যেতে হয়েছিল।

তিনি পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন 'কমা'-এর মত চেহারার বিশেষ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া থেকেই কলেরার উৎপত্তি। দূষিত জলই হল এদের বাসস্থান। জলকে দূষণমুক্ত করলেই কলেরার সম্ভাবনা দূর হবে।

কখের পরামর্শে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল মিশর।

এরপর ১৮৯৭ খ্রিঃ কখ্ এসেছিলেন ভারতবর্ষে। বোম্বাই সেই সময় দুরন্ত প্লেগরোগে ধুঁকছে। সেখানেও তাঁর পরামর্শে রোগের প্রকোপ প্রশমিত হয়।

স্লিপিং সিকনেস নামক মারাত্মক ঘুম-রোগের কবল থেকে কখ্ রক্ষা করেছিলেন পূর্ব আফ্রিকার অসহায় মানুষদের।

দুর্গত মানুষের সেবার কাজে এইভাবে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন কখ। রোগাক্রান্ত বহু মানুষও আসত তাঁর কাছে নিরাময়ের আশায়। তিনি সাধ্যমত তাদের শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলবার চেষ্ট করেছেন। বহু সময় তিনি এই কাজের সম্পূর্ণ ব্যয় নিজেই বহন করেছেন নির্দ্বিধায়।

কখ্ ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ নীরব বিজ্ঞান সাধক। অর্থ যশের চাইতে মানব সেবাই ছিল তাঁর কাছে অধিকতর কাম্য। এই কাজে তাঁর স্বার্থত্যাগের তুলনা বিরল।

বিশ্ববিজ্ঞানে অবদানের জন্য রবার্ট কখ্ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন জীবনের অন্তিম লগ্নে ১৯০৫ খ্রিঃ। বলা ভাল, বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল তাঁকে শেষ বয়সে এই সম্মানটুকু না জানিয়ে পারেন নি।

জীবনবিজ্ঞানের অগ্রপথিক রবার্ট কখ্ ৬৭ বছর বয়সে ১৯১৩ খ্রিঃ লোকান্তরিত হন।

স্যর উইলিয়াম র‍্যামসে



স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে ১৮৫২ খ্রিঃ ২রা অক্টোবর বিজ্ঞানী র‍্যামসের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার। স্বাভাবিক ভাবেই বাল্য বয়স থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি গভীর আগ্রহ তৈরি হবার কথা তাঁর। কিন্তু তিনি থাকতেন বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

তাই বলে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এসব বিষয়েও যে তাঁর ভীতি ছিল তা নয়। বিজ্ঞান ছাড়া আর সব বিষয়েই তিনি ছিলেন রীতিমত চৌকস।

তার ওপরে তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল ধর্মবিশ্বাস। গীর্জায় যাতায়াত করতে, পাদ্রীদের মুখে যিশুর গুণগান শুনতেই যেন বেশি পছন্দ করতেন।

অভিভাবকরা সকলেই ধরে নিয়েছিলেন, স্কুলের শিক্ষাটুকু শেষ করেই হয়তো র‍্যামসে যাজক হয়ে যাবেন।

বাড়ির ধর্মীয় পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে এভাবেই এগিয়ে চলেছিল বালক র‍্যামসের জীবন।

এর মধ্যে হঠাৎই ঘটল এক বিস্ময়কর কান্ড। র‍্যামসে বিরূপ হয়ে উঠলেন ধর্মের প্রতি। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঘোষণা করলেন, স্কুলে তিনি বিজ্ঞান পড়বেন। ধর্মের পথে নয়, বিজ্ঞানী হয়ে মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবেন।

অনেকে র‍্যামসের জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ধারণা করেছেন, হয়তো ইতিমধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ের কোন বই র‍্যামসে পড়ে থাকতে পারেন।

যথারীতি স্কুলে পড়াশোনা শুরু করলেন র‍্যামসে। শিক্ষকেরা তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করে বিস্মিত হন।

স্কুলের পাঠ শেষ হতে হতেই বিজ্ঞানের হালফিল বিষয়ের খবরাখবর ভালভাবে জানা হয়ে গেল র‍্যামসের।

শেষ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে সকলের ওপরে নাম্বার পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন তিনি।

এরপর আর আটকায় কে। নিজের পথ নিজেই ঠিক করে নিয়েছেন। সোজা চলে এলেন জার্মানি।

হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে তখন স্বমহিমায় বিরাজ করছেন খ্যাতকীর্তি বিজ্ঞানী বুনসেন।

র‍্যামসে বিশ্লেষণী রসায়নের উচ্চতর শিক্ষা নিতে লাগলেন বুনসেনের কাছেই।

বুনসেনের গবেষণার আওতায় থেকে নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগলেন র‍্যামসে।

অল্পসময়ের মধ্যেই বুনসেনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন তিনি। ফলে বিশ্লেষণী রসায়নে সুখ্যাত হয়ে উঠলেন।

পরীক্ষার ফলাফলের কৃতিত্ব ও বিজ্ঞান প্রতিভার সুবাদে ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনার কাজও জুটে গেল অবিলম্বে।

কিছুকাল এখানে কাজ করার পর উচ্চতর গবেষণার স্বার্থে র‍্যামসে যোগ দিলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে।

প্রথম যে কাজের জন্য র‍্যামসে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা হল অ্যালকালয়েড জাতীয় জৈব রসায়ন বিষয়ে তাঁর গবেষণা। এই রাসায়নিক শরীরের জৈব রাসায়নিক কাজে কি ধরনের কাজ করে তা নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি দেখান ওই সব জৈব রাসায়নিকের সঙ্গে অসম চক্রাকৃতি জৈব রাসায়নিক পিরিডিনের গঠনগত সম্পর্ক রয়েছে।

অসম চক্রাকৃতি জৈব রাসায়নিকটি হল সোরাজান ঘটিত। বেঞ্জিনের গঠনের সঙ্গে পিরিডিনের গঠনের যথেষ্টই মিল রয়েছে।

সেই সময়ে রসায়নের নতুন গবেষণা নিয়ে মেতে ছিলেন ব্রিটিশ রসায়নবিদ লর্ড র‍্যালি। তিনি ওইকালে বাতাস থেকে সোরাজান পৃথক করে দেখতে পেলেন ওই সোরাজানের ঘনত্ব সাধারণ সোরাজানের ঘনত্ব থেকে যথেষ্টই বেশি। এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়েই আর অগ্রসর হতে পারছিলেন না। পরীক্ষার পর পরীক্ষা করেও বারবার একই ফলাফলের সম্মুখীন হচ্ছিলেন।

লর্ডর‍্যালি ব্রিটেনের সকল রসায়নবিদের কাছেই দুই সোরাজানের ঘনত্বের এই ব্যবধানের কারণ নির্ণয়ের আহ্বান জানালেন। কিন্তু কেউই তাঁকে সাহায্য করতে পারলেন না।

র‍্যামসে সেই সময়ে ব্যস্ত ছিলেন পিরিডিন ও বেঞ্জিনের গঠন গত ভাবনা নিয়ে। লর্ড র‍্যালির সমস্যার কথা কানে পৌঁছতে তিনি সোরাজান সমস্যা মাথায় তুলে নিলেন।

র‍্যামসের বিশ্লেষণী রসায়নের শিক্ষা হয়েছিল বিজ্ঞানী বুনসেনের কাছে। সেই শিক্ষা এবারে তিনি প্রয়োগ করলেন নতুন সমস্যার সমাধানের কাজে।

যথারীতি সমাধান পেয়েও গেলেন। তিনি জানালেন লর্ড র‍্যালি যে দুই সোরাজানের কথা বলেছেন সেই দুটি এক নয়। রাসায়নিকভাবে প্রস্তুত সোরাজান একেবারেই নির্জলা খাঁটি।

কিন্তু বাতাস থেকে যে সোরাজানকে পৃথক করা হয়েছে তার সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে ভারী কোন রাসায়নিক মৌল, যার অস্তিত্ব আজও পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

লর্ড র‍্যালি সানন্দে মেনে নিলেন র‍্যামসের সিদ্ধান্ত। তিনি এটাই যে সঠিক সিদ্ধান্ত তা কবুল করে র‍্যামসেকে নিজের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে নিলেন।

দুজনে মিলে উঠে পড়ে লেগে গেলেন বাতাসে মিশে থাকা ভারী রাসায়নিকের মৌলের সন্ধানে।

অচিরেই তাঁরা একটি নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন। এর সাহায্যে সোরাজান ও অম্লজানকে পৃথক করার পর সার্থকভাবে বের করে আনলেন ভারী রাসায়নিক মৌল।

দেখা গেল এই মৌল রাসায়নিকভাবে অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়, তাঁরা তার নামকরণ করলেন আর্গন।

বাতাসে এই আর্গন গ্যাসের পরিমাণ খুবই সামান্য—একশোভাগ বাতাসে মাত্র এক ভাগ।

এরপর র‍্যামসে এককভাবে গবেষণা আরম্ভ করলেন। এক বছরের মধ্যেই ক্লেভাইট খনিজ থেকে দ্বিতীয় একটি ভারী ও নিষ্ক্রিয় গ্যাস পৃথক করতে সমর্থ হলেন।

এই ভারী মৌলটির নাম দেওয়া হল হিলিয়াম। দেখা গেল হিলিয়াম আর্গন থেকে অনেক বেশি হাল্কা।

সূর্যের ল্যাটিন নাম হল হিলিয়াম। সূর্যের ভেতরের আবহাওয়ায় রয়েছে এই ধরনের ভারী গ্যাসের প্রাচুর্য—সেই কারণেই তার নাম রাখা হল হিলিয়াম।

তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়াম থেকে যে বিকিরণ নিঃসৃত হয়, তা থেকেও হিলিয়াম পেলেন র‍্যামসে।

র‍্যামসের উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এরপর বিভিন্ন বিজ্ঞানী একে একে আবিষ্কার করেন নিয়ন, ক্রিপটন, জেনন ও রেডন নামের ভারী অথচ নিষ্ক্রিয় গ্যাস মৌল।

মেন্ডেলিফ যে পর্যায় সারণী প্রস্তুত করেছিলেন সেখানে এভাবে সংযোজিত হল এক নতুন গ্রুপ যার নাম শূন্য গ্রুপ।

এই গ্রুপে পারমাণবিক ওজনের ক্রম অনুসারে নিষ্ক্রিয় গ্যাস মৌলগুলো সাজানো হল এই ভাবে—হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন, জেনন এবং রেডন।

তাঁর পরবর্তী বিজ্ঞানীদের জন্য নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনা কাগজে কলমে রেখে দিয়েছিলেন দক্ষ ভবিষ্যদ্বক্তার মত।

নিজে যে নিষ্ক্রিয় মৌলগুলো আবিষ্কার করেছিলেন তিনি তা অন্তর্ভুক্ত করে নতুন করে পর্যায় সারণী গড়েছিলেন পরে।

সেখানে অনুদ্দিষ্ট মৌলগুলোর জন্য ঘর ফাঁকা রেখেছিলেন।

ভাবীকালের রসায়ন বিজ্ঞানীদের এই সংক্রান্ত আবিষ্কারের জন্য এই ভাবেই পথ নির্দেশ করে রেখেছিলেন তিনি।

পরবর্তীকালে যখন অত্যন্ত উচ্চচাপ ও নিম্ন তাপমাত্রায় বাতাসকে তরল করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়, তখন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ট্রাভাস নিয়ন, জেনন ও ক্রিপটন তরল বাতাস থেকে পৃথক করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

র‍্যামসে হিলিয়ামকে যেভাবে পৃথক করেছিলেন, একই পদ্ধতিতে তিনি রেডিয়ামের বিকিরণ থেকে রেডনকে পৃথক করেছিলেন।

পূর্বের আবিষ্কৃত মৌলগুলোর সঙ্গে নামের মিল রেখে প্রথমে তার নাম রাখেন নাইটন। পরে যেহেতু রেডিয়াম থেকে পাওয়া সেই জন্য নাম পরিবর্তন করে রাখেন রেডন।

র‍্যামসে একের পর এক নিষ্ক্রিয় গ্যাস মৌল আবিষ্কার করে রসায়ন বিজ্ঞানের এক নতুন ভবিষ্যৎ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

যুগান্তকারী গবেষণার সূত্রে লন্ডনের প্রখ্যাত রয়াল সোসাইটি র‍্যামসেকে ফেলো নির্বাচিত করেন ১৮৮৮ খ্রিঃ। তিনি নাইট উপাধি পান ১৯০২ খ্রিঃ।

র‍্যামসেকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় ১৯০৪ খ্রিঃ। এছাড়াও পৃথিবীর বহুদেশ থেকে তিনি পেয়েছেন স্বর্ণপদক, সম্মান ও নগদ অর্থ। পেয়েছেন বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি।

শান্তিপ্রিয় মানবতাবাদী বিজ্ঞানী র‍্যামসের দুর্ভাগ্য যে তাঁকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মারণযজ্ঞের ভয়াবহতা গভীর বেদনার সঙ্গে দেখতে হয়েছিল। যেই মানব কল্যাণের ব্রতকে জীবনের সকল সাধনার ধ্রুববিন্দু করেছিলেন, তাঁর সেই ব্রতসাধনের তৃপ্তি যেন নিরর্থক হয়ে গিয়েছিল র‍্যামসের কাছে। এরপর ২৩ দিন বেঁচে ছিলেন, গভীর মর্মযাতনা তাঁকে প্রপীড়িত করেছিল।

যুদ্ধের অমানবিক দৃশ্য দেখতে দেখতেই ১৯১৬ খ্রিঃ ২৩ শে জুলাই ইংলন্ডের সুরি শহরে প্রাণত্যাগ করেছিলেন বিজ্ঞানী র‍্যামসে।

স্যার জোসেফ জন টমসন

১৮৫৬ খ্রিঃ ১৮ই ডিসেম্বর ইংলন্ডের ম্যানচেস্টার শহরের নিকটবর্তী চেথাম হিল গ্রামে জন্ম হয়েছিল বিজ্ঞানী স্যার টমসনের।

ছোটবেলা থেকেই এক দুরন্ত পাঠাভ্যাস গড়ে উঠেছিল টমসনের। হাতের নাগালে যে বই পেতেন তাই নিয়েই বুঁদ হয়ে যেতেন। সে বই হোক গল্প কি উপন্যাস অথবা গণিত বা রসায়নের বিজ্ঞানের, টমসনের মনোযোগ আকর্ষণে কোন ত্রুটি ঘটত না।

এই অভ্যাসটি তৈরি করে দিয়েছিলেন তাঁর বাবা ও মা। ছেলেকে তাঁরা তাঁদের মনের মত করেই গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন।

স্কুলে বরাবরই ক্লাশ পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি ছিল টমসনের দখলে। স্কুলের শেষ পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ম্যানচেষ্টারের বিখ্যাত ওয়েন্স কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাশে ভর্তি হন টমসন।

কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে আকস্মিকভাবে এমন ভাগ্যবিপর্যয় নেমে এলো তাঁর জীবনে যে সব স্বপ্নসাধ লন্ডভন্ড হয়ে গেল।

কলেজে ভর্তি হবার দুবছরের মধ্যেই মারা গেলেন সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবা।

পড়া ইস্তফা দিয়ে সংসারেব প্রয়োজনে তাঁকে নেমে পড়তে হলো অর্থোপার্জনের চেষ্টায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া এভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় টমসনের বিধবা মা খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন। পরিবারের হিতৈষী বন্ধুদের পরামর্শে তিনি ছেলের পড়াশোনা চালানোর জন্য বৃত্তির আবেদন জানিয়ে শহরের মেয়রকে চিঠি লিখলেন।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন আগেই ইংরাজ বিজ্ঞানী ডালটনের স্মৃতি রক্ষার্থে ম্যানচেষ্টারের বাসিন্দারা একটি তহবিল গঠন করেছিলেন। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য সেই তহবিল থেকে সাহায্য করা হত।

পরীক্ষার ফলাফলই ছিল টমসনের মেধার পরিচয়। কাজেই তাঁর মায়ের আবেদন গৃহীত হতে বিলম্ব হল না।

টমসন ডালটন স্মৃতিরক্ষা কমিটির বৃত্তির টাকা নিয়ে আবার ওয়েন্সের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়া শুরু করলেন।

কৃতিত্বের সঙ্গেই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলেন টমসন ১৮৭৬ খ্রিঃ। পাশ করলেন বটে মনে কিন্তু তৃপ্তি পেলেন না।

তাঁর বরাবরের ইচ্ছা ছিল গণিত ও পদার্থ বিদ্যায় উচ্চশিক্ষা নেবেন। কিন্তু বাবা মায়ের তাগিদেই মনের ইচ্ছাকে দমন করে ভর্তি হতে হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে।

টমসন কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে গণিত ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে এবারে পড়া শুরু করলেন। মেধার সুবাদে এখানেও বৃত্তি পেয়ে গেলেন।

কেমব্রিজের ম্যাথেমেটিক্যাল ট্রাইপস হল বিখ্যাত একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। ১৮৮০ খ্রিঃ টমসন এই পরীক্ষায় দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করলেন।

এই প্রতিযোগিতায় তিনি পদার্থ বিদ্যার এক জটিল সমস্যার সমাধান করেছিলেন নিজস্ব গাণিতিক মেধা প্রয়োগ করে।

এই সময়েই টমসন উপলব্ধি করেন, তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় সমীকরণগুলির গাণিতিক প্রমাণ সম্পূর্ণ মূল্যহীন। এজন্য দরকার পরীক্ষামূলক প্রমাণ।

যাইহোক, মাত্র ২৫ বছর বয়সেই পরমাণুর ওপরে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি করে ফেললেন।

পরমাণু সম্পর্কে জন ডালটন থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত যে ধারণা চলে আসছে তার মধ্যে অনেক ফাঁকফোঁকর রয়েছে।

ডালটন বলেছিলেন বিশ্বের সমস্ত বস্তুই হল অতিক্ষুদ্র, অদৃশ্য ও অবিভাজ্য কণিকার সমাহার। তিনি এই কণিকার নাম দিয়েছিলেন অ্যাটম। তাঁর মতে অ্যাটমের ধ্বংস নেই সৃষ্টিও নেই, এরা শাশ্বত।

কোনও এক রাসায়নিক মৌলে একই ধরনের অ্যাটম বর্তমান। নানা রাসায়নিক মৌলে থাকে নানা ধরনের অ্যাটম। এই কারণেই বিভিন্ন মৌলের রাসায়নিক চরিত্রও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অ্যাটমের ধরন বদলের সঙ্গে সঙ্গে মৌলের রাসায়নিক গড়নেরও রদবদল ঘটে।

ডালটনের পরমাণুবাদের নানান ত্রুটি সনাক্ত করতে পেরেছিলেন সমকালীন বিখ্যাত রসায়নবিদ বার্জিলিয়াস। তাঁর পরে আরও সংশোধন করে গে-লুকাস ও অ্যাভাগাড্রো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরমাণুতত্ত্বকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন।

টমসন তাঁর গবেষণাপত্রে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তা হল, অ্যাটম অবিভাজ্য নয়, একে ভাগ করা সম্ভব। অ্যাটমকে টুকরো টুকরো করে বিশেষ বিশেষ বিদ্যুৎকণা সংগ্রহ করা সম্ভব।

এই প্রবন্ধের জন্য টমসন অ্যাডামস পুরস্কার লাভ করলেন।

এই ঘটনার তিনবছর পরেই ১৮৮৪ খ্রিঃ ঘটল এক অভাবিত ঘটনা। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরির পরিচালক ছিলেন লর্ড র‍্যালি। এই সময়ে তিনি অকস্মাৎ পদত্যাগ করলেন।

তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্য প্রার্থী হিসেবে টমসনের নাম সুপারিশ করলেন।

সেই সময়ে টমসনের বয়স মাত্র ২৮ বছর। জগদ্বিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের পদের জন্য এই বয়স নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু প্রতিষ্ঠানে অনেক ডাকসাইটে বর্ষীয়ান বিজ্ঞানী থাকা সত্ত্বেও লর্ড র‍্যালি টমসনের নামই সুপারিশ করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কিন্তু টমসনের সঙ্গে কথা বলে লর্ড র‍্যালির মতেই মত দিলেন। টমসন যথারীতি কর্মনিযুক্ত হলেন।

সেই ১৮৮৪ খ্রিঃ টমসন বসেছিলেন লর্ড র‍্যালির চেয়ারে—স্বমহিমায় আসীন ছিলেন টানা পঁয়ত্রিশ বছর।

এই সময়ে কেবল আবিষ্কার ও সংগঠনের কাজেই যে টমসন ব্যস্ত ছিলেন তাই নয়, তিনি তৈরি করে তুলেছিলেন একদল ভুবনজয়ী ছাত্রছাত্রী। পদার্থবিজ্ঞানে এঁদের প্রত্যেকেই উত্তরকালে রেখেছিলেন স্মরণীয় অবদান।

টমসনের এই ছাত্রদলের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ছিলেন আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। আর এঁদের আটজন মৌলিক গবেষণার জন্য পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন।

কৃতিছাত্রদের কল্যাণে টমসন বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে তাঁর জীবিতকালেই কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন।

এই সময়েই তরুণ বিজ্ঞানী টমসনের সঙ্গে বিয়ে হয় প্রতিভাময়ী বিজ্ঞান-সাধিকা রোজ পাগেটের।

স্মরণীয় যে এই বিজ্ঞানী দম্পতির একমাত্র সন্তান জর্জ পাগেট টমসন ১৯৩৭ খ্রিঃ পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করে পিতামাতার গৌরব আরও উজ্জ্বল করেছিলেন।

ক্যাথোড রশ্মির প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে উনিশ শতকের শেষ দশকে পদার্থ বিজ্ঞানীরা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটি ইংরাজ শিবির দ্বিতীয়টি জার্মান শিবির।

ইংরাজবিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম ক্রুকস বলেছিলেন, ক্যাথোড রশ্মি প্রকৃতপক্ষে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-সম্পৃক্ত অতি সূক্ষ্ম কণিকা মাত্র। তার প্রমাণ হল ক্যাথোড রশ্মির গতিপথে চুম্বক ধরলেই রশ্মির মধ্যে কম্পন জেগে ওঠে।

জার্মান শিবিরের বিজ্ঞানীরা অবশ্য তা মানতে রাজি হলেন না। তাঁরা বললেন ক্যাথোড রশ্মি হল এক ধরনের ইথার-তরঙ্গ। পদার্থ বিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্ৎজ ১৮৮৭ খ্রিঃ যে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ অর্থাৎ রেডিও-ওয়েভ নির্ণয় করেছিলেন অনেকটা সেই রকম।

জার্মান পদার্থবিদদের এই সিদ্ধান্ত অবশ্য অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও মাক্সপ্লাঙ্ক স্বীকার করেন নি।

কিছুদিন পরেই বিজ্ঞানী হার্ৎজ প্রমাণ করে দিলেন যে ক্যাথোড রশ্মি কোন কণিকা নয়। তা অনায়াসে পাতলা সোনার পাতকে ভেদ করে চলে যায়। কেবল তাই নয়, তড়িৎক্ষেত্রেও এই রশ্মির কোন চাঞ্চল্য ধরা পড়ল না—স্বচ্ছন্দে তড়িৎক্ষেত্র পার হয়ে যায়।

খবরটা কেমব্রিজে পৌছলে টমসন বুঝতে পারলেন হার্ৎজের পরীক্ষায় কোথাও বড় রকমের গলদ রয়েছে। নইলে যে রশ্মি চুম্বকক্ষেত্রে এমন চঞ্চল তা তড়িৎক্ষেত্রে অমন পঙ্গু হবে কেন? তিনি হার্ৎজের পরীক্ষাটি নতুন করে করতে বসলেন

অবিলম্বেই তিনি বুঝতে পারলেন ক্যাথোড রশ্মি হল ঋণ-বিদ্যুৎবাহী কণাপুঞ্জ। সেই কারণেই বিদ্যুৎক্ষেত্রে ক্যাথোড রশ্মির বিক্ষেপণ ঘটে।

এরপর টমসন নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করেন ক্যাথোড রশ্মির গতিবেগ। তা হল—প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ষাট হাজার মাইল। আলোর গতিবেগ হল প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

দীর্ঘ দশ বছর বিদ্যুৎ মোক্ষণনল ও নানা চরিত্রের গ্যাস নিয়ে গবেষণার পর টমসন তিনটে সূত্র বার করেন, সেগুলো হল—

(১) পরমাণুর গায়ে আঘাতের ফলে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বিদ্যুৎকণার স্রোত।

(২) এই বিদ্যুৎবাহী কণাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে ভর এবং প্রত্যেক কণার মধ্যেই থাকে সমপরিমাণের বিদ্যুৎ। সকল পরমাণুতেই এই ধরনের কণা বিদ্যমান।

(৩) এই বিদ্যুৎবাহী কণাদের প্রত্যেকের ভর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র।

টমসনের এই সূত্র তিনটির দ্বারাই বিজ্ঞানের নতুন যুগের গোড়াপত্তন হল। সূচনা হল ইলেকট্রনের যুগের।

এরপর দীর্ঘ আটবছরের গবেষণার ফলে টমসন নানান চমকপ্রদ আবিষ্কারের দ্বারা পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রীতিমত পালা বদল ঘটিয়ে দিলেন। এসব আবিষ্কারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল—থিওরি অব দ্য কনসটিটিউশান অব ম্যাটার অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও পদার্থের গঠনগত তত্ত্ব।

আশ্চর্যের বিষয় যে টমসনের তত্ত্বের ওপর কাজ করে পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই গড়ে উঠল মহাশক্তিধর একদল পদার্থবিজ্ঞানী আর তাঁরা প্রকাশ করলেন একশোরও বেশি মৌলিক গবেষণাপত্র।

ইলেকট্রন তথা ক্যাথোড কণা আবিষ্কারের স্বীকৃতি এলো অনতিবিলম্বেই। ১৯০৬ খ্রিঃ টমসন পেলেন নোবেল পুরস্কার। ১৯০৮ খ্রিঃ পেলেন নাইটহুড।

ইলেকট্রন আবিষ্কারের পর টমসন আত্মনিয়োগ করেন পরমাণু শক্তির উন্নতি প্রচেষ্টায়। তাঁর অবদানকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয় মাস-স্পেকট্রোগ্রাফ বা ভর বর্ণালী যার সাহায্যে আধুনিককালে একই মৌলের বিভিন্ন সমস্থানিককে অনায়াসে পৃথক করা সম্ভব হচ্ছে।

১৯৪০ খ্রিঃ বিশ্ববিজ্ঞানের স্মরণীয় মনীষী জে. জে. টমসন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয় লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে।

রোনাল্ড রস



ম্যাল শব্দের অর্থ খারাপ বা কু, আর আরিয়া মানে বাতাস। দুই শব্দ মিলিয়ে হয় ম্যালেরিয়া। বাংলায় যা হল খারাপ বাতাস বা কু-বাতাস।

প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসকরা মনে করতেন শরীরে দুষিত বাতাস বা কু-বাতাস ঢুকলেই এই রোগ হয়।

ইংরাজরা এই রোগকে বলত মার্শ ফিভার। ইংরাজি মার্শ শব্দের অর্থ জলাভূমি। তার মানে জলাভূমি থেকে যে রোগের উৎপত্তি তাই হল মার্শ ফিভার।

উৎপত্তি যেখানেই হোক কি করে এই রোগ শরীরে প্রবেশ করে, বংশ বিস্তার করে, সেই সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে কোন সমাধানে পৌঁছতে পারেন নি।

আজ থেকে ১৬০০ বছর আগে এক জার্মান কৃষিবিজ্ঞানী পালাদিয়াস সাফ প্রথম বলেছিলেন মশার কামড়েই ম্যালেরিয়া রোগের সংক্রমণ ঘটে থাকে। তিনি আরও বলেছিলেন, বদ্ধ জলেই মশা ডিম পাড়ে, সেই জল পেটে গেলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অবধারিত।

পালাদিয়াস সতর্ক করে বলেছিলেন, নালা-নর্দমা কেটে জলের বদ্ধদশা না ঘোচাতে পারলে ম্যালেরিয়াও দূর করা যাবে না।

একজন গ্রীক বিজ্ঞানী, তাঁর নাম, হেরোডোটাস, ১০০০ বছর আগেই মিশরের লোকেদের দেখেছিলেন মশারি খাটিয়ে ঘুমোতে। মশার আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার জন্যই তারা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে ম্যালেরিয়া রোগকে ফাঁকি দিত।

যত যাই হোক, বহু দীর্ঘ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, চিকিৎসকরা ম্যালেরিয়ার কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারেন নি। বাস্তব অবাস্তব নানা চিকিৎসা দ্বারাও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হয় নি।

শেষ পর্যন্ত ম্যালেরিয়াকে যিনি সার্থকভাবে প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন, তাঁর নাম রোনাল্ড রস। বিজ্ঞানসম্মত উপায়েই তিনি তা করেছিলেন।

বিজ্ঞানী রস প্রমাণ করেছিলেন, মশাই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। কিভাবে মশারা এই রোগজীবাণু ছড়িয়ে দিয়ে রোগের বিস্তার ঘটায়, তিনিই প্রথম আমাদের জানান।

কেবল তাই নয়, যে বিশেষ ধরনের মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণুর বাহক, সেই সম্পর্কেও তিনিই প্রথম আলোকপাত করেন।

বিজ্ঞানী রস ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের অস্ত্র আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে পোকামাকড় বাহিত হলুদ জ্বর, ঘুমজ্বর টাইফয়েড ও প্লেগ ইত্যাদি মারাত্মক রোগকে জয় করার উপায়ও আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিজ্ঞানী রসের অবদান মানব সভ্যতার এক বিশেষ অধ্যায়।

অথচ রস কোনদিনই ভাবেননি যে তিনি বিজ্ঞানী হবেন, নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে বিশ্ববিজ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবেন।

চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য রচনা এই গন্ডীর মধ্যেই ছিল তাঁর আন্তরিক আনাগোনা। প্রকৃত ইচ্ছা ছিল শিল্পী হবার।

অথচ ভাগ্যের এমনই বিচিত্র ব্যবস্থা যে বাবার নির্দেশে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ডাক্তারি পড়া শুরু করেছিলেন। পাশ করে বেরিয়ে চিকিৎসাকেই করেছিলেন জীবিকার্জনের মাধ্যম।

রস ডাক্তার না হলে, মানুষের ইতিহাসে ম্যালেরিয়ার আধিপত্য আরও কতকাল চলত কে তা বলতে পারে।

ব্রিটিশ ভারতে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম স্বাধীনতার জাগরণ ঘটিয়েছিল ১৮৫৭ খ্রিঃ সিপাহী যুদ্ধ।

এই যুদ্ধের সরকারি ঘোষণার মাত্র তিনদিন আগে তেরোই মে নগাধিরাজ হিমালয়ের কোলে আলমোড়ায় এক সম্ভ্রান্ত স্কট পরিবারে রসের জন্ম।

রসের বাবা স্যার ক্যাম্পবেল ক্লে গ্রান্ট রস ছিলেন সেনা বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার।

দশ ভাইবোনের মধ্যে রসই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। বিদুষী মায়ের স্নেহ যত্ন ও শিক্ষায় সাত বছর বয়স পর্যন্ত ভারতেই কেটেছে তাঁর। তারপর শিক্ষালাভের জন্য তাঁকে ইংলন্ডে পাঠানো হয়।

রস তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই বাবার মত ছবি আঁকতে, গল্পকবিতা লেখায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিজ্ঞানে যে অরুচি ছিল তা নয়। তার মধ্যে প্রাণিবিদ্যার বই বেশি ভাল লাগত।

পড়াশুনার চেয়ে নিজের মনে ছবি আঁকার দিকেই ছিল বেশি ঝোঁক। স্বপ্ন দেখতেন শিল্পী হবার।

এদিকে এক অঙ্ক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিলেন চোদ্দ বছর বয়সেই।

ষোল বছর বয়সে অক্সফোর্ডে ভর্তি হন, পরে পড়াশুনা করেন কেমব্রিজে।

বাবার জেদে শিল্পী হবার সাধ অপূর্ণই রইল শেষ পর্যন্ত। ভর্তি হতে হল লন্ডনের বার্থোলোমিউ হাসপাতালের মেডিক্যাল স্কুলে। ছয় বছর পরে ডাক্তার হয়ে বেরলেন।

এই সময় ভারত থেকে বাবা চিঠি লিখে জানালেন, রস যাতে অবিলম্বে ভারতীয় সেনা বিভাগে যোগ দেন।

রস বাবার প্রস্তাব মাথায় না রেখে এক বেসরকারি জাহাজে সার্জেনের চাকরি নিয়ে আতলান্তিকে ভেসে পড়লেন।

ডাক্তার হিসেবে এই সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা রসের জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। চিকিৎসার সূত্রে তিনি জানতে পেরেছিলেন জাহাজীরা কোন রোগের সঙ্গে কিভাবে যুদ্ধ করে।

জাহাজে বসেই জাহাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে রস একটি উপন্যাস লিখলেন। তাঁর এই উপন্যাসের নাম Emigrants।

১৮৮১ খ্রিঃ ইংলন্ডে ফিরে এসে রস ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে যোগ দিলেন। সেই বছরই মাদ্রাজে এলেন স্টেশন হাসপাতালের সার্জেন হয়ে। কাজের মধ্যে হল সারা দিনে দু'ঘণ্টা রুগী দেখা।

অখন্ড অবসর কাটে বই পড়ে, কবিতা লিখে আর গান গেয়ে।

ভারত রসের জন্মভূমি। সেই কারণে অন্তরের একটা টান স্বাভাবিকভাবেই ছিল। সেই আকর্ষণেই ভারতীয় জনজীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

রোগশোকে ভোগা মানুষগুলোর প্রতি সহানুভূতি তাঁর এই সময়ের অনেক কবিতায় ভাষা পেয়েছে।

কিছুদিনের মধ্যেই রস সপ্তদশ পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে সমুদ্রকূলবর্তী ভিজিয়ানা গ্রামে চলে আসেন। এই সময় থেকেই ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ সম্পর্কে তাঁর মধ্যে কৌতূহল জাগ্রত হয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘেঁটে পরজীবী জীবাণুদের বিষয়ে নানা মহামারী রোগের সম্পর্কে পড়াশুনা করতে থাকেন।

১৮৮৪ খ্রিঃ কাজের সূত্রে মাদ্রাজ ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে আসেন রস। পাহাড়ের ওপরে এক সামরিক দুর্গে থাকার ব্যবস্থা। এখানেই মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল তাঁকে।

এতদিন যে ভাবনা মনে ছিল, ভাসা ভাসা অনেকটাই কৌতূহল আর বিলাসিতার পর্যায়ে, এবারে তাই রূপান্তরিত হল প্রতিশোধস্পৃহায়। সংকল্প করেন মশাদের রোগজীবাণু ছড়াবার পথ যে করেই হোক বন্ধ করতে হবে।

ব্যাঙ্গালোর থেকে পরের বছর, ১৮৮৫ খ্রিঃ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যেতে হল আন্দামান।

এখানে তাল-নারকেল ঘেরা সবুজ বনানী আর সাগরবেলার সৌন্দর্য তাঁর কবিমনে দোলা তুলল। এখানে বসেই রচিত হয় তাঁর কবিতার বই In exile।

আন্দামানের শান্ত পরিবেশই একদিন রসকে তাঁর নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। কর্মক্ষেত্রের অনিশ্চয়তার সূত্রেই এই আত্মজিজ্ঞাসা রসকে সজাগ সচেতন করে তুলল।

দীর্ঘদিন থেকেই সামরিক বিভাগে অস্থায়ী চিকিৎসকের পদে রয়েছেন। মাইনেও অতি সামান্য। এইভাবেই কি বাকি জীবনটাও কেটে যাবে? জীবনের সার্থকতা তাহলে কি হল?

জীবনের দীর্ঘ ব্যাপ্তিতে মানবজাতির জন্য কি তাঁর কিছুই করবার নেই? একজন চিকিৎসক হিসেবে নানা ভয়ঙ্কর রোগে ভোগা মানুষগুলোর জন্য কিছুই কি তিনি করতে পারেন না?

এই আত্মজিজ্ঞাসাই অদ্ভুত এক অস্থিরতা তৈরি করল রসের অন্তর্জগতে।

ওপর মহলে চিঠি লেখালেখি করে ছুটির ব্যবস্থা করলেন, ১৮৮৮ খ্রিঃ ফিরে এলেন ইংলণ্ডে।

গভীরভাবে পড়াশুনা শুরু করলেন জীবাণুবিদ্যা নিয়ে। বিজ্ঞানী কখ্ ও পাস্তুরের নানা প্রবন্ধের ওপরে বারবার করে চোখ বোলাতে লাগলেন।

ছুটি ফুরোবার আগেই ১৮৮৯ খ্রিঃ রস বিয়ে করলেন রোজা ব্লসামকে। জীবাণু নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর কিছু যন্ত্রপাতির সঙ্গে জীবনে সঙ্গী একজন বাড়ল।

বিয়ের কিছুদিন পরেই ভারতে ফিরে এলেন। এই সময় তাঁকে বদলি করা হল ব্রহ্মদেশে। একবছর সস্ত্রীক সেখানে থাকতে হল। ১৮৯৩ খ্রিঃ ফিরে এলেন ব্যাঙ্গালোরে।

টানা নয় বছর অস্থায়ীপদে কাজ করার পর সেই বছরই তাঁকে স্থায়ী করা হল। আর্থিক দিকের ভাবনা সুরাহা হতেই ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণার কাজ আরও গভীরভাবে করবার সুযোগ পেলেন।

গবেষণার কাজে মাঝে মাঝেই হতাশা জেগে উঠত। সেই সময়ে সাধ্বী পত্নী রোজা সান্ত্বনা আর আশ্বাস নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতেন। রসের জীবনসাধনার সাফল্যে তাঁর পত্নীর উৎসাহ ও প্রেরণার অবদান অসামান্য।

তাঁদের পারিবারিক জীবনও ছিল মধুর। দুই কন্যা ও এক পুত্রের ছোট্ট সংসারটিতে শান্তি ও আনন্দের ঘাটতি পড়েনি কোনদিন।

গবেষণার নানা ফলাফল নিয়ে প্রবন্ধ লিখে প্রকাশের জন্য নানা জার্নালে পাঠাতেন রস।

কিন্তু সব লেখাই যথারীতি ফেরত আসত। এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া রসের মানসিকতাকে দুর্বল করে তুললেও প্রেরণাময়ী স্ত্রী রোজার বল ভরসা তাঁকে আবার চাঙ্গা করে তুলত।

পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে রস সপরিবারে ইংলন্ড গেলেন ১৮৯২ খ্রিঃ। সেই সময় নানা রোগের প্রতিষেধক হিসেবে জনসাধারণকে টিকা দেওয়ার কাজ হচ্ছিল। রসও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন।

এই সময়েই তাঁর পরিচয় হয় চিকিৎসক প্যাট্রিক ম্যানসনের সঙ্গে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানা রোগ সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা।

ম্যালেরিয়া বিষয়ে রসের আগ্রহের সন্ধান পেয়ে ম্যানসন তাঁকে পরামর্শ দিলেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বসেই এই রোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার জন্য।

কিভাবে এগোতে হবে সেই সম্পর্কেও এক পরিষ্কার ধারণা রস পেয়ে যান ম্যানসনের কাছ থেকে। আর তা হল, সবার আগে মশার জীবনচক্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া।

ম্যালেরিয়া রোগের ভাবনা সেই সময় একটা ঘোরের মত চেপে বসেছিল রসের মাথায়। কেবলই হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন, কিন্তু আলোর রেখা কোন দিকেই দেখতে পাচ্ছিলেন না।

পরম হিতৈষী ডাঃ ম্যানসনের কাছ থেকে পথের সন্ধান পেয়ে নতুন ভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন তিনি।

দুঃসময় কেটে আসতে আরম্ভ করেছিল রসের জীবনের।এই সময়েই আকস্মিক একটি ঘটনা তাঁকে আশায় আনন্দে উদ্দীপিত করে তুলল।

ইংলন্ডের নেটলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ম্যালেরিয়া নিয়ে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। রস তাঁর জন্মভূমি ভারতের অভিজ্ঞতার আলোকে লিখলেন একটা প্রবন্ধ, যথারীতি জমাও দিলেন।তথাকথিত কু-বাতাসের ফলেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ঘটে এই প্রচলিত প্রাচীন ধারণা যে ভ্রান্ত প্রবন্ধে এ বিষয়ে স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করলেন তিনি।

ইতিপূর্বে অনেক প্রবন্ধই পাঠিয়েছিলেন নানা জায়গায়। কিন্তু অনুকূল সাড়া পাননি। এবারে কিন্তু ফলাফল হল অন্যরকম।

চুলচেরা বিচারে রসের প্রবন্ধই সবার সেরা বলে বিবেচিত হল। রস লাভ করলেন পার্কেস স্বর্ণপদক ও নগদ পঁচাত্তর গিনির পুরস্কার।

এই ঘটনায় রসের আত্মবিশ্বাস নতুন প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠল।

গবেষণার প্রয়োজনে ইতিমধ্যে রস নিজেই বানিয়ে নিয়েছেন উচ্চক্ষমতার একটা ছোট্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র। সাহিত্যচর্চা মাথায় উঠেছে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণাতেই তাঁর কেটে যেতে লাগল দিন।

১৮৯৫ খ্রিঃ ভারতে ফিরে এলেন রস।ইংল্যান্ড ছেড়ে এলেও ম্যানসনের সঙ্গে কিন্তু তাঁর যোগাযোগ রয়েই গেল।

নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় নিয়মিত লিখে জানাতে লাগলেন ম্যানসনকে। প্রতিভার পৃষ্ঠপোষক ম্যানসনও রসকে পাঠাতে লাগলেন তাঁর উপদেশ নির্দেশ। এভাবেই এগিয়ে চলল রসের গবেষণার কাজ।

সেকেন্দ্রাবাদের সামরিক হাসপাতাল এবারের কর্মস্থল। এখানে এক রুগীর রক্ত পরীক্ষা করে এক ধরনের জীবাণুর সন্ধান পেলেন রস।রুগীটি ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত।

রুগীর মশারির ভেতরে মশা ঢুকিয়ে দিয়ে রক্ত খাওয়া পুষ্ট মশাদের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেই জীবাণুর সন্ধান পেয়ে যান।

এরপর থেকেই বিভিন্ন মশার জীবনধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করেন।

ক্ষুদে প্রাণীগুলোর জীবনচক্রের প্রতিটি ধাপ গভীরভাবে লক্ষ করে, নানা পরীক্ষার পর রস নিঃসন্দেহ হন, ম্যালেরিয়ার মূলে রয়েছে মশার কামড়।

মশার লার্ভাযুক্ত জল পান করলে কিংবা জলাভূমির কু-বাতাস থেকে যে ম্যালেরিয়া হয় না তা হাতে কলমে প্রমাণ করলেন রস। তিনি জেনে গেছেন, ম্যালেরিয়ার জীবাণুরা পরজীবী। তিন প্রজাতির মশা তাদের বহন করে বেড়ায়। এই মশাদের জীবনচক্রের বত্রিশটি পর্যায়।

রস দেখলেন যখন মশা হুল ফোটায় তখন মানুষের শরীরে তার লালারস ঢোকে ও রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। সূচের আকারের ম্যালেরিয়ার পরজীবীরা থাকে মশার লালারসে। সেখান থেকে রক্তে মিশে সরাসরি লোহিত কণিকার মধ্যে ঢুকে বংশ বিস্তার করে।

এই সময়েই পরজীবীরা অর্ধচন্দ্রাকারে পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই অবস্থায় যদি কোন মশা মানুষের রক্ত শোষণ করে সেই রক্তের পরজীবীরা মশার পাকস্থলীতে বাসা নেয়।

এইখানে অর্ধচক্রাকৃতি পুং ও স্ত্রী পরজীবীরা মিলিত হয়ে যথারীতি বংশ বিস্তার করে। এইসব পরজীবী তখন মশার পাকস্থলী থেকে লালাগ্রন্থিতে ঢুকে যায়। এই মশার কামড় থেকেই মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়।

এইভাবে একই ইতিহাসের পুনরাবর্তন চলতে থাকে আর বিস্তার লাভ করে ম্যালেরিয়া রোগ।

গবেষণার এক পর্যায়ে রস লক্ষ করেন, মশার জীবনচক্রের যে বত্রিশটি পর্যায় তার কোনও একটি পর্যায় বিপর্যস্ত হলেই ম্যালেরিয়াবাহী পরজীবীরা আর পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। ফলে ম্যালেরিয়ার বিস্তারও ব্যাহত হয়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রস ছিলেন একেবারেই এক অনভিজ্ঞ মানুষ। অণুবীক্ষণযন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। নিজের খোলা চোখ আর তীব্র আগ্রহই ছিল তাঁর সহায়।

সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্ত্রীর সক্রিয় প্রেরণা ও হিতৈষী প্যাট্রিক ম্যানসনের চিঠিতে পাওয়া উপদেশ-নির্দেশ।

এই সম্বল নিয়েই বহুবিধ প্রজাতির মশা ঘেঁটে ম্যালেরিয়ার পরজীবীদের বৃত্তান্ত জানতে পেরেছেন তিনি।

এই পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি এখনো তাঁর অজানা। কোন প্রজাতির মশা ম্যালেরিয়ার প্রকৃত বাহক এখনও তা জানার বাকি। দিনের পর দিন গভীর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পর রস সফল হলেন।

জানতে পারলেন অ্যানোফিলিস প্রজাতির মশাই ম্যালেরিয়া রোগের প্রকৃত বাহক।

ইতিমধ্যে রস একটি খবর পেয়ে উল্লসিত হলেন। ম্যানসন ইংলন্ডের অধীন উপনিবেশ সমূহের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টা নির্বাচিত হয়েছেন। এই খবরে রসের খুশি হবার কারণ হল, গবেষণা যেই পর্যায়ে এসেছে, এবারে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সময় ও খরচপত্রের অর্থের প্রয়োজন তীব্র হয়ে উঠেছিল, ম্যানসনের সহযোগিতায় হয়তো সেসবের একটা সুরাহা হবে।

চাকরি বজায় রেখে গবেষণার কাজ চালাতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। টান ধরছিল প্রয়োজনীয় সময়ে।

দ্বিতীয়তঃ মাইনের সামান্য টাকা থেকে সংসারের খরচ বাঁচিয়ে গবেষণার প্রয়োজনে খুব সামান্যই ব্যয় করতে পারছিলেন। ফলে কাজ বিঘ্নিত হচ্ছিল দফায় দফায়।

ম্যানসন যথেষ্ট চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভারত সরকারের সামরিক বিভাগ ম্যালেরিয়ার গবেষণার জন্য রসকে বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা করে দিতে সম্মত হল না।

তবে আশ্বাস একটা পাওয়া গেল। কলকাতায় ট্রপিক্যাল মেডিসিনের গবেষণাগারে বিভিন্ন গ্রীষ্মবাহিত রোগের বিষয়ে গবেষণার অনুমতি পাওয়া গেল।

রস এবারে কলকাতায় এসে গবেষণা আরম্ভ করলেন। এখান থেকেই তিনি ইংলন্ডে ম্যানসনের কাছে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রবন্ধাকারে লিখে পাঠাতে লাগলেন।

১৮৯৮খ্রিঃ জুন মাসে ম্যানসন সেই প্রবন্ধ ইংলন্ডের ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে বিশিষ্ট চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীর সমাবেশে পাঠ করলেন।

সেদিনের সেই গুণীজন সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী লর্ড লিস্টার। তিনি প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক গভীরতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

সম্ভবতঃ ম্যানসনের ইঙ্গিত পেয়ে ১৮৯৯ খ্রিঃ রস সামরিক বিভাগের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ইংলন্ডে ফিরে গেলেন।

সেই সময়ে লিভারপুলে সবে চালু হয়েছে মেডিক্যাল স্কুল। সেখানেই রস অধ্যাপনার চাকরি পেয়ে গেলেন। শুরু হল তাঁর নতুন জীবন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানী লর্ড লিস্টার সেই সময়ে রয়াল সোসাইটির সভাপতি। তিনি ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত রসের গবেষণাকে বিশ্ববিজ্ঞানের এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হিসাবে মতামত ব্যক্ত করলেন। ১৯০১ খ্রিঃ রস রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হলেন।

এর পরই রসের আবিষ্কারের সংবাদ সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে ছড়িয়ে পড়ল।

মানবেতিহাসে বিশেষ অবদানের জন্য সুইডিশ নোবেল কমিটি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের চিকিৎসাশাস্ত্রের নোবেল দিয়ে রসকে সম্মানিত করেন।

এরপর দেশের ও বিদেশের অসংখ্য পুরস্কারও লাভ করেছেন রস। ১৯১১ খ্রিঃ স্যার উপাধি পান।

পঞ্চান্ন বছর বয়সে ১৯১২ খ্রিঃ লিভারপুলের মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯২৬ খ্রিঃ ইংলন্ডে রস-অনুরাগীরা গড়ে তুললেন রস ইনসটিটিউট। তিনি হন এই প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা। পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়া চিরতরে দূর করার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় এই প্রতিষ্ঠান।

১৯৩২ খ্রিঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিজ্ঞানী রসের দেহান্তর ঘটে।

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং



যেসব রোগ জীবাণুঘটিত, তার মোক্ষম ওষধি হল পেনিসিলিন। এটি এমন এক রাসায়নিক যে মানুষ বা পশু কারো শরীরেই এর কোন অশুভ প্রতিক্রিয়া ঘটে না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক মহৎ আবিষ্কার পেনিসিলিন। এটি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই ধরনের আরও জীবাণুনাশক আবিষ্কারের জন্য উদ্ভিদ ও ছত্রাক নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এমন কিছু জীবাণুর অস্তিত্বও ক্রমে আবিষ্কৃত হল যা জৈবরসায়নিক পেনিসিলিনের প্রয়োগেও বিনষ্ট হয় না।

এই ভাবেই জীবাণুনাশক রাসায়নিকের একটি শ্রেণীবিভাগ তৈরি হল, যার নাম দেওয়া হয় অ্যান্টিবায়োটিক।

এই শ্রেণীর জীবনদায়ী ওষধিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্টেপ্টোমাইসিন, টেরামাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন, ক্লোরামপেনিকল, পিউরোমাইসিন ইত্যাদি।

অ্যান্টিবায়োটিক গ্রুপের ওষুধ যে মানবজীবনকে ভয়ানক সব রোগের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে, একথা আজ সুবিদিত।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে পেনিসিলিন আবিষ্কার এক যুগান্তকরী ঘটনা। এটি আবিষ্কার করেছিলেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং।

একজাতীয় ছত্রাকের নাম হল পেনিসিলিয়াম। এই ছত্রাকের রস থেকে যে জীবাণুনাশক রাসায়নিকটি আবিষ্কার করেছিলেন ফ্লেমিং তার নাম দিয়েছিলেন পেনিসিলিন।

গ্রেট ব্রিটেনের স্কটল্যান্ডের আয়ারশায়ারে দারভেল নামক গ্রামে ১৮৮১খ্রিঃ ৬ই আগষ্ট আলেকজান্ডার ফ্লেমিং-এর জন্ম। বাবা আর্ল অব লাউডাউন, মায়ের নাম গ্রেস মর্টন।

পুরুষানুক্রমে ফ্লেমিংরা ছিলেন চাষী। লেখাপড়ার চল এই পরিবারে ছিল না বললেই চলে। ফ্লেমিং-এর ছেলেবেলাটাও তাই ছিল লেখাপড়াবর্জিত।

মাত্র সাতবছর বয়সেই পিতৃহারা হন ফ্লেমিং। ফলে মস্ত বড় সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর মায়ের ওপরে। দক্ষ হাতে তিনি সব সামলে স্নেহ যত্নে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে থাকেন।

মায়ের তত্ত্বাবধানে থেকে সবরকম দুঃখকষ্টকে জয় করার মত মনোবল ছেলেবেলা থেকেই লাভ করেছিলেন ফ্লেমিং।

প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে সহজভাবে অগ্রসর হবার শিক্ষাও তিনি লাভ করেছিলেন মায়ের কাছ থেকে।

উত্তরকালে যিনি জগদ্বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী হয়েছিলেন, পাঁচ বছর বয়সে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়েছিল নিতান্তই এক সাধারণ গ্রাম্য স্কুলে।

তীক্ষ্ণ ধীশক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন ফ্লেমিং। আর ছিল অসাধারণ মেধা। ফলে সহজেই তিনি স্কুলের শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের উৎসাহ ও প্রশংসা তাঁকে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহান্বিত করে তোলে।

পড়াশোনার ফাঁকে ফ্লেমিং-এর অভ্যাস ছিল বনে-জঙ্গলে ঘুরে নানা পশুপাখি ও জীবজন্তু মনোযোগ দিয়ে দেখা। কখনো কখনো ফুল আর প্রজাপতির খেলা দেখে তন্ময় হয়ে যেতেন।

এই ভাবেই প্রতিটি সজীব পদার্থ খুঁটিয়ে দেখার চোখ তৈরি হয়ে গিয়েছিল তাঁর ছেলেবেলাতেই। উত্তরকালের এই খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাসের ফলেই ছত্রাকের নিঃসৃত পদার্থ থেকে পেনিসিলিন আবিষ্কার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

দশবছর বয়সে ফ্লেমিং ভর্তি হলেন দারভেলের হাইস্কুলে। কিন্তু এই স্কুল বাড়ি থেকে খুব দূরে হওয়ায় কিছুদিন পরেই মা তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন কিলমারনক আকাদেমিতে। এটি ছিল খুবই নামকরা স্কুল। ফ্লেমিং বাড়ি থেকে স্কুলের ছাত্রাবাসে এসে ওঠেন।

মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে কিলমারনক আকাদেমির নামডাক ছিল খুব। রবার্ট বার্নস ও রবার্ট সুইস স্টিভেনসন—এই দুজন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন।

এমন এক স্কুলে ভর্তি হয়ে ফ্লেমিংও যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন তা বলাই বাহুল্য।

ফ্লেমিং-এর দাদা টমাস ফ্লেমিং স্থানীয় স্কুল থেকে পাশ করে গ্লাসগোতে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরোলেন চোখের ডাক্তার হয়ে।

মেরিলিবোনে চেম্বার খুলে বসার কিছুদিনের মধ্যে নিজের প্রতিভা ও কর্মকুশলতার গুণে তাঁর পসার জমে ওঠে।

তখন তিনি অন্যান্য ভাইদের দারভেল থেকে লন্ডনে নিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ভাইরাও চশমা সম্পর্কে নানা জ্ঞান লাভ করেন। সকলে মিলে তখন গড়ে তুললেন চশমার কাচ তৈরির মস্ত ব্যবসা।

ফ্লেমিং যখন লন্ডনে দাদার কাছে এলেন তখন তাঁর বয়স চোদ্দ। সময়টা ১৮৯৫ খ্রিঃ।

সেই বছরই জার্মান বিজ্ঞানী রন্টগেন এক্স-রে আবিষ্কার করে পদার্থ বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুগান্তর ঘটিয়েছেন।

লন্ডনে এসে ফ্লেমিং ভর্তি হলেন রিজেন্ট স্ট্রিটের পলিটেকনিক স্কুলে। এখানে শিক্ষা অত্যন্ত মামুলি ধরনের হলেও বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের সঙ্গে ফ্লেমিং-এর পরিচয় ঘটল।

পাশ করে বেরুলেন দু বছর পরে। সঙ্গে সঙ্গে চাকরিও পেয়ে গেলেন লন্ডনের এক জাহাজ কোম্পানিতে।

কিন্তু বেশিদিন এখানে কাজ করা হল না। দাদা টমাস তখন শহরের নামী চক্ষুবিশারদ।

ভাইকে তিনি চাকরি থেকে ছাড়িয়ে এনে ভর্তি করিয়ে দিলেন সেন্ট মেরি মেডিক্যাল কলেজে। সেই সময় ফ্লেমিং-এর বয়স কুড়ি।

এই কলেজে পড়ার সময়ে ফ্লেমিং গভীরভাবে একজন অধ্যাপকের দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি হলে প্যাথোলজির প্রধান অধ্যাপক ডঃ আলমোর্থ রাইট।

যুক্তিবাদী এই অধ্যাপকের চিন্তাভাবনায় ছিল আধুনিকতার আলো। সেই যুগের আবহাওয়ায় তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

অধ্যাপক রাইট টাইফয়েড জ্বরের প্রতিষেধক হিসেবে টিকা দেবার চল করেছিলেন। তাঁর প্রতিভা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবপ্রেম ফ্লেমিংকে সহজেই আকৃষ্ট করেছিল।

এই প্রিয় অধ্যাপকের প্রভাবেই ধীরে ধীরে ফ্লেমিং-এর প্রতিভা বিকশিত হতে লাগল, তিনি বিজ্ঞানীতে রূপান্তরিত হতে লাগলেন।

১৯০৮ খ্রিঃ ফ্লেমিং সেন্টমেরি থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করলেন। কৃতিত্বের জন্য পেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক।

সেই সময়ে জীবাণুবিদ্যায় শারীরের রোগ প্রতিরোধের কারণ নিয়ে দুটি মত প্রচলিত ছিল। একটিকে বলা হত প্যারিস ধারা, যার নেতৃত্বে ছিলে ফরাসী বিজ্ঞানী ডাক্তার মেটনিকভ। তাঁর মতে শরীরের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে শ্বেতকণিকাদের প্রভাবই সর্বাধিক।

শরীরে কোন জীবাণু প্রবেশ করলে, শ্বেতকণিকারা তাদের ঘিরে ধরে ধ্বংস করে। এ কারণে শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, শ্বেতকণিকাদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

শ্বেতকণিকার সংখ্যা কম হলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। ফলে সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই শরীর সর্দি-কাশিতে কাবু হয়ে যায়। জীবাণুর সামান্য আক্রমণও তখন শরীর ঠেকাতে পারে না।

দ্বিতীয় মতটিকে বলা হয় বার্লিন ধারা। এই ধারার নেতৃত্ব দিচ্ছেন রবার্ট কখ। তিনি শ্বেত কণিকার চাইতে শরীরের রক্তরসকেই রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

ডাঃ রাইট মেটনিকভের মতামতের সমর্থক হলেও, তাঁর বক্তব্য, শ্বেতকণিকার কাজ অনেক বেশি জটিল। জীবাণু বা অ্যান্টিজেনকে যে শ্বেতকণিকারা ধ্বংস করে তার মূলে রয়েছে রক্তরসের বিশেষ প্রভাব। শরীরের এই স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত ক্ষমতাকে বলেছেন opsonin। এই ক্ষমতার বলেই শরীরে কোনও একটি রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। অপসোনিন বেশি হলে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশি হয়।

ডাক্তারি পাশ করবার পর ফ্লেমিং ডাঃ রাইটের ল্যাবরেটারিতেই গবেষণা শুরু করলেন। তাঁর বিষয় হল, স্বাভাবিক ভাবেই রক্তের শ্বেতকণিকা। রোগজীবাণুকে লড়াই করে তারা কিভাবে কাবু করে, অণুবীক্ষণের লেন্সে চোখ রেখে তিনি তন্ময় হয়ে দেখতে থাকেন।

অচিরেই তিনি বুঝতে পারলেন, শ্বেতকণিকা বাহিনীই শরীরের নিরপত্তা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে। রক্তরসের সেখানে কোন ভূমিকাই নেই।

এবিষয়ে অধ্যাপক রাইটের মতামতই যে যথার্থ এ সম্পর্কে তাঁর আর কোন সন্দেহই থাকে না।

রাইটের পথ অনুসরণ করে ১৯১৪ খ্রিঃ ফ্লেমিং একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে ফেললেন। এর টিকা শরীরে নিলে অল্প সময়ের মধ্যেই মুখের ব্রন সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়।

এই সময়েই পৃথিবীব্যাপী শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী হানাহানি।

রণাঙ্গনের সামরিক শিবিরগুলিতে দলে দলে আহত সৈনিকরা গ্যাস-গ্যাংগ্রীনে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাতে লাগল।

সেবা শিবিরে যোগ দিয়ে ফ্লেমিং প্রাণপণে মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

সেই সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানী লিস্টারের আবিষ্কৃত কার্বলিক অ্যান্টিসেপটিকই ছিল এই জীবাণুবাহিত রোগটির একমাত্র ওষুধ। কিন্তু দেখা গেল, এই ওষুধও এঁটে উঠতে পারছে না।

আহত সৈনিকরা মারা পড়ছে বেঘোরে। সে মৃত্যু এমন মর্মান্তিক যে দেখে সহ্য করা যায় না।

ফ্লেমিং-এর ভাবনা শুরু হল, যে করেই হোক জীবাণুবাহিত রোগটিকে জব্দ করার উপায় বার করতে হবে।

গ্যাংগ্রিন রোগীর পায়খানা পরীক্ষা করে জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল। ফ্লেমিং বুঝতে পারলেন, এই পথেই রোগসংক্রমণ ঘটে থাকে। তিনি শিবিরের সকলকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন।

পরীক্ষায় বসে আরও একটি অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করলেন ফ্লেমিং।

লিস্টার গ্যাংগ্রিনের জীবাণুনাশক হিসেবে কার্বলিক অম্ল ব্যবহার করেছিলেন। অস্ত্রচিকিৎসায়ও তা ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

ফ্লেমিং লক্ষ করলেন, একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় কার্বলিক অ্যাসিডকে গ্যাংগ্রিন জীবাণুর কালচারে মেশালে, তা বিপরীত কাজ করে। আশ্চর্য দ্রুততায় জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটে।

বিস্মিত ফ্লেমিং আরও কয়েকটি জীবাণুর ক্ষেত্রেও একই প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেন। কার্বলিক অম্লের ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক হয়ে গেলেন ফ্লেমিং। সহযোগী চিকিৎসকদেরও এ বিষয়ে সাবধান করতে ভুললেন না।

একটি জীবাণুনাশক ওষুধের এমন বিপরীত প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে স্বভাবতঃই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন ফ্লেমিং।

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, শ্বেতকণিকারাই এই অস্বাভাবিকতার জন্য দায়ী।

রক্তে কার্বলিক অম্লের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে শ্বেতকণিকার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

শ্বেতকণিকার সংখ্যা কমে যাবার ফলে রোগ জীবাণুরা শরীরে প্রবল হয়ে ওঠে, নিরাপদে তারা বংশ বিস্তার করতে পারে।

এর পরে কার্বলিক অম্ল প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাত্রা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন থাকার ব্যাপারে ফ্লেমিং সাবধানবাণী ঘোষণা করলেন।

এইভাবে অধ্যাপক রাইটের নীতি অনুসরণ করে ফ্লেমিং নতুন নতুন সত্যের সম্মুখীন হতে লাগলেন।

সেই সময়ে অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে শরীরের প্রাণ-রাসায়নিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা গড়ে ওঠেনি। সেই অবস্থায় জীবাণুনাশক নানা রাসায়নিক সম্পর্কে ফ্লেমিং-এর সতর্কবার্তা চিকিৎসকদের খুব মনঃপুত হল না। অনেকেই তা অগ্রাহ্য করলেন।

দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল। এল ১৯১৮ খ্রিঃ। মহাযুদ্ধের আগুন নিভে গেল। ইতিমধ্যে যুদ্ধচলাকালীন সময়েই ১৯১৫ খ্রিঃ ফ্লেমিং বিয়ে করেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম সারা মরিসন ম্যাকেলরয়।

অধ্যাপক রাইটের জীবাণুবিদ্যা বিভাগে সহকারীর পদে চাকরি নিয়ে ঢুকেছিলেন ফ্লেমিং। ১৯২৮ খ্রিঃ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাণুবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপকের পদে উন্নীত হলেন।

এই সময়ে ফ্লেমিং স্টাফাইলোকক্কাস নামে এক ধরনের জীবাণু নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন।

একদিন টেবিল থেকে উঠবার সময় কালচারের একটা প্লেট ঢাকা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। পরে এসে দেখেন, জীবাণুর কালচারের ওপর ভাগে কেমন নীলাভ ছাতা পড়ে গেছে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন, নীল ছাতার ধার বরাবর কোন জীবাণু নেই।

কৌতুহলী হয়ে অণুবীক্ষণের তলায় নিয়ে এসে বিস্ময় একেবারে চরমে উঠল। দেখেন একটা জীবাণুও জীবিত নেই।

কারণটা ঠিক বুঝতে না পারলেও কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠল। নীলাভ ছাতাটার খানিকটা করে অংশ নানা জীবাণুর কালচারে প্রয়োগ করে দেখতে লাগলেন। প্রতিক্ষেত্রেই একই ফলাফল ঘটল, জীবাণুরা গুষ্ঠীসুদ্ধ প্রাণ হারাল।

এবারে ওই নীলভা ছাতা নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। কয়েক মাস পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফ্লেমিং দেখতে পেলেন, যে নীলাভ ছাতা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে তার সঙ্গে সাধারণ পেনিসিলিয়াম ছত্রাকের যথেষ্ট মিল।

নষ্ট পনীরের ছত্রাকই হল সাধারণ পেনিসিলিয়াম ছত্রাক। জেলি বা জ্যামের ওপরে যে ছাতা পড়ে তাও সেই একই ধরনের ছত্রাক।

ফ্লেমিং লক্ষ করলেন, এই ছত্রাক থেকে যে বিশেষ ধরনের তরল নিঃসৃত হয় তাই নানা ভয়ঙ্কর রোগের জীবাণুদের ধ্বংস করছে।

জীবাণুনাশক এই তরলটি পেনিসিলিয়াম ছত্রাক থেকে পাওয়া গেছে। ফ্লেমিং তাই এটির নাম রাখলেন পেনিসিলিন।

ফ্লেমিং-এর জীবনের এই আকস্মিক আবিষ্কারটি মানবসভ্যতার কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করে দিল।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা হাতে পেয়ে গেলেন প্রাণ-রাসায়নিক জীবাণুনাশক বা বায়োলজিক্যাল অ্যান্টিসেপটিক।

ছত্রাকের গা থেকে নিঃসৃত তরলকে বিশুদ্ধ করে তৈরি হল অ্যান্টিবায়োটিক শ্রেণীর ওষুধ। এই ওষুধ গ্রহণ করলে মানব শরীরের প্রহরী শ্বেত কণিকাদের কোন ক্ষতি হয় না, উপরন্তু রোগের জীবাণু ধ্বংস করে ফেলে। এই বিশেষ ক্ষমতা কার্বলিক অম্ল বা অন্যান্য জীবাণুনাশকের মধ্যে অনুপস্থিত।

যাইহোক, ছত্রাকের বিশেষত্বটি আবিষ্কারের পর ফ্লেমিং বসলেন পেনিসিলিনকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু ক্রমাগত কয়েক বছর চেষ্টার পরও সফল হতে না পেরে বিরক্ত হয়ে জীবাণুবিদ্যার অন্য গবেষণায় মনোযোগ দিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে বাজারে দেখা দিল সালফা ড্রাগস। গন্ধকঘটিত এই ওষুধগুলোর ক্ষমতা অপরিসীম।

এরা সরাসরি রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে না। এদের প্রভাবে রোগজীবাণু নিস্তেজ হয়ে পড়ে ও বংশবৃদ্ধি রোধ হয়। ফলে এই দুর্বল রোগজীবাণুকে শ্বেতকণিকারা সহজেই কাবু করে ফেলতে পারে।

ফ্লেমিং তাঁর গবেষণা অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিঃ দুই ইংরাজ রসায়ন বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড ফ্লোরি এবং ই.বি. চেইন পেনিসিলনকে পৃথক করে ফ্লেমিং-এর গবেষণা সম্পূর্ণ করলেন। ফলে অনতিবিলম্বেই ওষুধ হিসেবে পেনিসিলিন বাজারে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালেই ১৯৪১ খ্রিঃ থেকে চিকিৎসায় পেনিসিলিনের ব্যবহার শুরু হল।

বিজ্ঞানীরা পেনিসিলিনের নাম দিলেন 'বিশ শতকের বিস্ময়'। আসলে তার কাজও ছিল সত্যিই বিস্ময়কর।

অ্যান্টিবায়োটিকস-এর মতো পেনিসিলিনও জীবাণুদের বংশবিস্তার রোধ করে। কিন্তু তার কাজ সম্পন্ন হয় অধিকতর দ্রুততায়। তাছাড়া বিভিন্ন জীবাণুঘটিত রোগের চিকিৎসায় পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিকস-এর তুলনায় অনেক বেশি কার্যকরী।

পেনিসিলিন আবিষ্কার করে ফ্লেমিং বিশ্বখ্যাতি লাভ করলেন। সেই সঙ্গে এল পদ ও পুরস্কার।

১৯৪৩ খ্রিঃ লন্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হলেন। পরের বছর পেলেন ইংলন্ডের নাইটহুড।

১৯৪৫ খ্রিঃ হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও ই.বি. চেইনের সঙ্গে ফ্লেমিং পেলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার।

পৃথিবীর নানা দেশের আমন্ত্রণ পেয়ে ফ্লেমিং ঘুরে ঘুরে অ্যান্টিবায়োটিক সংক্রান্ত ভাষণ দিয়ে বেড়ালেন কিছুকাল।

১৯৪৯ খ্রিঃ ফ্লেমিং-এর সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী সারা মরিসনের মৃত্যু হল। তাঁদের একমাত্র পুত্রও অবশ্য ততদিনে ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছে।

কিছুকাল পরে ফ্লেমিং পুনর্বার বিয়ে করলেন জীবাণুতাত্ত্বিক ডক্টর আমেলিয়া কোৎসুরিসকে। সেটা ১৯৫৩ খ্রিঃ। সেই সময় তাঁর বয়স বাহাত্তর।

এক বছর পরেই এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ফ্লেমিংকে দিল ক্যামেরুন পুরস্কার।

হার্ভাড, ভেরোনা প্রভৃতি সহ বহু বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানজনক ডক্টরেট দিয়ে সম্মান জানিয়েছে।

১৯৫৫ খ্রিঃ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মানবসভ্যতার মহান পরিত্রাতা আলেকজান্ডার ফ্লেমিং-এর জীবনাবসান ঘটে।

মেরি কুরি



বিশ্ববিজ্ঞানের মহানায়িকা মেরি কুরি, মাদাম কুরি নামেই সমধিক পরিচিতা। রেডিয়াম ও পোলনিয়াম এই দুই তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কার করে তিনি পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার মহাসম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

মাদাম কুরির সম্পূর্ণ নাম মার্জা ক্লোডোস্কা। তিনি পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে ১৮৬৭ খ্রিঃ ৭ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে মার্জা সর্বকনিষ্ঠ। বাবা স্থানীয় একটি স্কুলের পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক। মাও সুশিক্ষিতা, ব্যক্তিত্বময়ী।

সংসারের খরচ সংকুলানের জন্য তিনি মেয়েদের পড়াবার জন্য একটা স্কুল খুলেছিলেন।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই লিখতে পড়তে শিখে গিয়েছিলেন মার্জা। তাঁর পড়ার আগ্রহও ছিল প্রবল।

অ্যাডভেঞ্চারের গল্প থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, নানা আবিষ্কারের গল্প, যখন যা হাতের নাগালে পেতেন সব গো-গ্রাসে গিলতেন।

পনের বছর বয়সের মধ্যেই তিনি রুশ ও জার্মান দুই ভাষাই ভালভাবে শিখে নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে বাবাই ছিলেন উৎসাহদাতা। মাত্র এগারো বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মা মারা গেলেন। সেই সময় এই মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক বলতে কিছুই ছিল না।

মার্জার দিদি ব্রনিয়া এবং দাদা জোজিও হাইস্কুলে সেরা ফল করে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। মার্জাও একই স্কুল থেকে সবচেয়ে ভাল ফল করে স্নাতক হলেন, পেলেন স্বর্ণপদক।

ছেলেমেয়েদের স্কুলের ফলাফলের জন্যই স্ক্লোডোস্কার পরিবার অঞ্চলে বিশেষ সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল।

ষোল বছর বয়সে স্কুল থেকে বেরিয়ে মার্জা স্থির করলেন প্যারিস যাবেন ডাক্তারি পড়বার জন্য।

কিন্তু বাবার আর্থিক সামার্থ্য ছিল সীমিত। বড়দি ব্রনিয়ারও সাধ প্যারিসে গিয়ে ডাক্তারি পড়বেন। প্যারিসে রেখে দুই মেয়েকে ডাক্তারি পড়াবার মত সঙ্গতি বাবার ছিল না।

বাবার মুখে এই নিদারুণ কথা শুনে মার্জার মন ব্যথিত হলেও হতাশ হলেন না। তিনিই বাবাকে আশ্বস্ত করে জানালেন যে দিদিই আগে প্যারিসে পড়তে যাবে। তাঁর পড়ার খরচ জোগাবার জন্য তিনি এখানে কিছু একটা কাজ জুটিয়ে নেবেন। দিদি পাশ করে দেশে ফিরে এলে তিনি সেখানে যাবেন। তখন তাঁর পড়ার খরচ চালানো দিদির পক্ষে অসম্ভব হবে না।

এই ব্যবস্থা মতই দিদি ব্রনিয়া প্যারিস চলে গেলেন। আর তাঁর পড়ার খরচ চালাবার জন্য মার্জা ওয়ারশতেই এক ধনী পরিবারে গভর্নেসের চাকরি নিলেন। সেখানে বাড়ির কর্ত্রী ছিলেন খুবই বদমেজাজী। ফলে মার্জা বছরখানেকের বেশি টিকে থাকতে পারলেন না।

কিন্তু কাজ ছাড়া থাকবার তো উপায় ছিল না। দিদিকে প্যারিসে নিয়মিত খরচের টাকা পাঠাতে হয়।

চেষ্টা চরিত্র করে এবারে এক রুচিসম্পন্ন ভদ্র পরিবারে কাজ পেলেন—সেই গভর্নেসেরই। এখানে পরিবারের আবহাওয়ার সঙ্গে সহজেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন।

কিন্তু সুখ তো বেশিদিন কপালে সয় না। মার্জারও তাই হল। ঘটনাক্রমে পরিবারের এক সুদর্শন যুবকের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে বাঁধা পড়েন। কিন্তু বিয়ে সম্ভব হল না।

অভিজাত পরিবারের ছেলের সঙ্গে সামান্য বেতনভূক পরিচারিকার বিবাহ যে অকল্পনীয় ব্যাপার।

যুবকটি তাঁর অভিভাবকদের কথা জানিয়ে মার্জার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ওতেই শেষ হয় না। পরিবারের কর্তারা কাজ থেকে ছাঁটাই করলেন মার্জাকে।

চরম হতাশা ও অপমান নিয়ে আবার নতুন করে কাজের সন্ধানে নামতে হল মার্জাকে।

এমনি জীবন-সংগ্রামের কঠিন পথে চলতে চলতে মার্জা অল্প বয়সেই যথেষ্ট পরিণত হয়ে উঠলেন। প্রতিকূলতার মধ্যে মর্যাদার সঙ্গে লড়াই করবার প্রেরণা তিনি এভাবেই লাভ করেছিলেন।

পাঁচ বছর প্যারিসে পড়াশোনা করে দিদি ব্রনিয়া ডাক্তার হলেন। কিন্তু তিনি আর দেশে ফিরলেন না। সেখানেই এক যুবককে বিয়ে করে সংসার পাতলেন।

গোটা পরিকল্পনাটাই পাল্টে গেল। মার্জার আর ডাক্তারী পড়তে প্যারিস যাওয়া হল না। খরচ যোগাবে কে?

উনিশ শতকের শেষ দিকে পোল্যান্ড ছিল রাশিয়ার জারতন্ত্রের শাসনাধীন। মার্জার তরুণী বয়সকালে পোল্যান্ডে রুশ-বিরোধী স্বাদেশিকতার আবহাওয়া জোরদার হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতার আন্দোলনে মার্জার শিক্ষক পিতা ছিলেন অন্যতম পুরোধা পুরুষ। মার্জাও বাবার সঙ্গে আন্দোলনে ভিড়ে গেলেন।

পোল্যান্ডের নানাস্থানে গোপনে স্বদেশী স্কুল গড়ে উঠেছিল। তেমনি একটি স্কুলে মার্জা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে লাগলেন। তিনি ছাত্রদের পড়াতেন অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন। এইভাবে দুবছর কাটল।

১৮৯১ খ্রিঃ প্যারিস থেকে দিদি ব্রনিয়া হঠাৎ চিঠি পাঠালেন পত্রপাঠ সেখানে চলে যাবার জন্য। মার্জার ডাক্তারী পড়ার খরচ তিনিই জোগাবেন।

এতদিন পরে আশার আলো আবার মার্জাকে আশ্বান্বিত করে তুলল। কোনরকমে পথ খরচ সংগ্রহ করে তিনি প্যারিসে রওনা হয়ে পড়লেন। প্যারিসে পৌঁছে মার্জা কিন্তু দিদির সঙ্গে দেখা করলেন না।

সুখী সংসারের গৃহিণী ব্রনিয়া। তার ওপরে ততদিনে একটি সন্তানও হয়েছে তার। সংসারে খরচ তো বেড়েছে।

এর ওপর বোঝা হয়ে উপস্থিত হলে দিদি তো কোন সময়ে স্বামীর বিরাগভাজন হয়ে উঠতে পারেন।

এমনি সাত-পাঁচ ভেবে মার্জা দিদির বাড়িতে আর গেলেন না। প্যারিসের আলোক-বাতাসহীন বস্তি অঞ্চল লাতিন কোয়ার্টারে নামমাত্র ভাড়ায় মাথা গোঁজার মত একচিলতে একটা ঘর ভাড়া করলেন।

নরকতুল্য সেই নোংরা, চোর জোচ্চোর-ভবঘুরে ভরা পরিবেশে নতুন জীবন শুরু হলো মার্জার।

যেই স্বপ্ন নিয়ে প্যারিসে এসেছিলেন, তা বাতিল করে ভর্তি হলেন প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে, পদার্থবিদ্যার ক্লাশে।

এখানে নিজের নামও পাল্টে ফেললেন। মার্জার নতুন নাম হল মেরি ক্লোডোস্কো।

চরম দারিদ্র্য, অনাহারে ও অসুস্থ পরিবেশের মধ্যে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া চালিয়ে যেতে লাগলেন মার্জা। দিদি এই কৃচ্ছ্রসাধনের বিন্দুবিসর্গ-ও জানতে পেলেন না। বছর দুই এভাবেই কাটল।

কিন্তু দীর্ঘদিন অনাহারে আধপেটা খেয়ে শরীর একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল, জীবনীশক্তিও শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁচেছিল।

একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ করতে করতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সহপাঠীদের শুশ্রূষায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে শুনলেন, ডাক্তার জানিয়েছেন, পুষ্টির অভাবে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে।

বন্ধুরাই ডায়েরী হাটকে দিদি ব্রনিয়ার ঠিকানা জোগাড় করল। ব্রনিয়া খবর পেয়ে ছুটে এসে কঙ্কালসার বোনকে বাড়িতে নিয়ে তুললেন। দিদির আন্তরিক সেবাযত্নে সে যাত্রা প্রাণরক্ষা হল মার্জার।

সুস্থতা ফিরে পেতেই আবার ফিরে এলন নিজের লাতিন কোয়ার্টারের নরকে। ব্রনিয়ার অনেক কাকুতি মিনতিতেও নিজের কঠিন জীবনসাধনার পরিবর্তন ঘটালেন না।

১৮৯৩ খ্রিঃ মার্জা সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করে স্নাতক হলেন। পরের বছর গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করলেন।

এতদিন পরে একটু হাঁপ ছাড়বার অবকাশ পেলেন মার্জা। এই সময়েই একদিন তাঁর এক বন্ধু কোভলস্কির বাড়িতে আলাপ হল পদার্থবিদ্যার এক তরুণ গবেষকের সঙ্গে। তাঁর নাম পিয়েরি কুরি।

এই ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই বিদ্যুতের সূক্ষ্ম পরিমাপক যন্ত্র ও পিজো বিদ্যুৎ আবিষ্কার করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

পরবর্তীকালে আদর্শবাদী গবেষণাপাগল এই তরুণ গবেষকই মার্জাকে জীবনসঙ্গিনী করে নেন। মার্জা হলেন মাদাম কুরি। সময়টা ১৮৯৫ খ্রিঃ।

বিশ্ববিজ্ঞানের পরম বিস্ময়কর দম্পতির জীবনের যাত্রারম্ভ হয় এভাবেই।

পিয়েরি প্যারিসের এক মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন পড়ান। তবে গবেষণার সূত্রে পদার্থবিদ হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছেন। আর্থিক অবস্থা খুব সুবিধের নয়।

মাসমাইনের সামান্য টাকাতেই দুজনে মিলে কোনরকমে সংসার সামলাতে লাগলেন। এরই মধ্যে তাঁদের স্বপ্ন দেখারও বিরাম নেই।

বিয়ের দু বছর পরেই ১৮৯৭ খ্রিঃ কুরি দম্পতির প্রথম কন্যাসন্তান আইরিনের জন্ম হল।

কুরি দম্পতির এই প্রথম কন্যাটি পরবর্তীকালে পরমাণু বিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিলেন।

১৯২৬ খ্রিঃ আইরিনের বিয়ে হয়েছিল রেডিরিক জোলিয়েট নামের এক পদার্থ বিজ্ঞানীর সঙ্গে।

স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে গবেষণা করে ১৯৩৫ খ্রিঃ নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

আইরিনের জন্মের কয়েক বছর পরেই দ্বিতীয় কন্যা ইভার জন্ম হয়। সংসারের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে খরচ। কিন্তু সম্বল তো সেই মিউনিসিপ্যাল স্কুলের মাসমাইনের টাকা।

সংসারের সব অভাব-অভিযোগ ভুলে রইলেন কুরি দম্পতি নিজেদের গবেষণার মধ্যে ডুবে থেকে।

১৮৯৬ খ্রিঃ হেনরি বেকেরেল নামে এক ফরাসি বিজ্ঞানী ইউরেনিয়াম ঘটিত খনিজ থেকে এক রশ্মি আবিষ্কার করেন। তার নাম গামা রশ্মি। এই আবিষ্কারের পর থেকেই বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে থাকেন যে ইউরেনিয়াম বা তার কোনও যৌগের অবশ্যই আলো শোষণের ক্ষমতা রয়েছে। সেই আলোই নিশ্চয় রশ্মির আকারে বিচ্ছুরিত হয়।

বিজ্ঞানীরা অনুমানই যা করেছিলেন, ভাবনার স্বপক্ষে কোন বাস্তব প্রমাণ খাড়া করতে পারছিলেন না।

পিয়েরি মার্জাকে পরামর্শ দিলেন এই সম্যসাটিকে নিয়েই তাঁর ডক্টরেটের থিসিস তৈরি করতে।

গবেষণার কাজে নানা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দরকার। কিন্তু সেসব কিনবার টাকা কোথায়? মার্জা হতাশ না হয়ে স্বামীর তৈরি যন্ত্রপাতি, বিকিরণ পরিমাপের যন্ত্র—এসব নিয়েই গবেষণার জন্য তৈরি হলেন।

পিয়েরি যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, সেখানে একটি পরিত্যক্ত ঘর ছিল। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সেখানেই ল্যাবরেটরি গুছিয়ে নেওয়া হল। তারপর দুজনে মিলে আরম্ভ করলেন গবেষণা।

মার্জা দেখলেন, ইউরেনিয়াম ঘটিত যৌগই কেবল নয়, ইউরেনিয়াম ধাতু থেকেও রহস্যময় বিকিরণ বেপরোয়াভাবে বেরিয়ে আসছে। এই বিকিরণের গোপন উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মার্জা লক্ষ করলেন পরমাণুর মধ্যেই রয়েছে এই গোপন উৎস।

বিকিরণের বৈশিষ্ট্যটি ইউরেনিয়াম ধাতুরই একটা পারমাণবিক অবস্থা। বিকিরণের এই বৈশিষ্ট্যই হল রেডিও অ্যাকটিভিটি।

ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা রয়েছে এমন কোন মৌল আরও আছে কিনা, সেই অনুসন্ধান কাজে এবারে মার্জা আত্মনিয়োগ করেন।

দীর্ঘ অনুসন্ধানের কাজে নানা খনিজ খুঁজতে খুঁজতে মার্জা খুঁজে পান পিচ ব্লেড। এর মধ্যেই পাওয়া গেল ভয়ঙ্কর সেই বিকিরণ। ইউরেনিয়ামেরই অনুরূপ সেই বিকিরণ এই খনিজের সারা অবয়ব জুড়ে।

আরও একটা ব্যাপার হল, খনিজ পিচ ব্লেড থেকে যে বিকিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তার তেজ ইউরেনিয়ামের চেয়ে বহুগুণ বেশি।

ধীরে ধীরে মার্জা খনিজ পিচ ব্লেড থেকে বিশুদ্ধ অবস্থা অর্থাৎ বিশেষ তাপমাত্রায় কতগুলো পদার্থ যোগ করে নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক ধরনের মৌলকে আলাদা করে নিলেন।

স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘ চার বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশেষে প্রকৃতির এক অজানা রহস্যের উন্মোচন ঘটানো সম্ভব হয়। মার্জা দুটি সম্পূর্ণ নতুন মৌল আবিষ্কার করে পৃথক করে নেন।

এই মৌল দুটোর একটির নাম দিলেন পোলনিয়াম।—মাতৃভূমি পোল্যান্ডের নামে এই মৌলটিকে উৎসর্গ করে এই নাম দিলেন।

দ্বিতীয় মৌলটির নাম দেন রেডিয়াম। ইউরেনিয়াম নামের এক অংশ ছেঁটে রেডিয়েশন বা বিকিরণ শব্দের রেডি বসিয়ে নামকরণ করা হল।

নতুন আবিষ্কৃত রেডিয়াম মৌলটির তীব্রতা ইউরেনিয়ামের তুলনায় পনের লক্ষ গুণ বেশি। পিয়েরির তৈরি বিকিরণের পরিমাণ পরিমাপের যন্ত্রই তা বলে দিল।

এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন উঠল।

কুরি দম্পতির এই মহৎ গবেষণার স্বীকৃত হিসেবে হেনরি বেকেরেলের সঙ্গে যুক্তভাবে তাঁদের দেওয়া হল ১৯০৩ খ্রিঃ পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার।

অসুস্থতার জন্য তাঁদের কারোর পক্ষেই সুইডেনের রাজধানী স্টকহলমে গিয়ে পুরস্কার নেওয়া সম্ভব হয়নি। আশ্চর্য যে এই বিজ্ঞানী দম্পতির জন্য ফরাসি সরকারের কোন তাপ উত্তাপ দেখা গেল না। না দেওয়া হল তাঁদের কোন আর্থিক সাহায্য না করে দেওয়া হল একটি ভাল ল্যাবরেটরি। কোন সম্মান প্রদর্শন তো দূরের কথা।

গবেষণার সুবাদে কেবল ১৯০৪ খ্রিঃ মাদাম কুরি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করলেন।

রেডিয়াম ও পোলনিয়াম আবিষ্কার ও এই দুটি ধাতব মৌলের নিষ্কাশন পদ্ধতি উদ্ভাবনের পর বিশ্ববিজ্ঞানে নতুন একটি শাখার উদ্ভব হল। তার নাম রেডিয়েশন সায়েন্স বা তেজস্ক্রিয় বিজ্ঞান।

মার্জা রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন বটে, এর তেজস্ক্রিয়তার স্বরূপ তিনি নির্ণয় করে উঠতে পারেন নি।

তাঁর অসম্পূর্ণ কাজটি করেছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড ১৯০২ খ্রিঃ। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান যে এই তেজস্ক্রিয়তা হল আসলে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙ্গন দশা।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রচণ্ড চাপে অবস্থিত মৌল কণিকা প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যাগত তারতম্যের ফলেই ঘটল ভাঙ্গন দশা।

নিউক্লিয়াসের এই বিশেষ অবস্থার কথা রাদারফোর্ডই সর্বপ্রথম বিশ্ববিজ্ঞানকে অবহিত করেন।

১৯০৬ খ্রিঃ ১৯শে এপ্রিল, প্যারিসের এক রাস্তায় আকস্মিক দুর্ঘটনায় পিয়েরি কুরির আকস্মিক মৃত্যু হয়।

এই বিপর্যয়ের কিছুদিন পরেই মাদাম কুরি সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে মনোনীত হলেন।

মাদাম কুরিই হলেন ফ্রান্সের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে প্রথম মহিলা যিনি অধ্যাপনার আসনে ব্রতী হন।

১৯১১ খ্রিঃ দ্বিতীয়বার নোবেল পেলেন মাদাম কুরি। এবারে পদার্থ বিদ্যায় নয়—রসায়নে।

রেডিয়ামকে বিশুদ্ধ মৌলরূপে পৃথক করা ও তার পারমাণবিক ওজন নির্ণয় করার কৃতিত্বের জন্যই তিনি এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

এই সুবাদে ফরাসি সরকার মাদাম কুরিকে একটি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি উপহার দিয়ে তাঁদের পূর্বেকার ভুলের সংশোধন করলেন। এই ল্যাবরেটরির নাম রাখা হয় কুরি ইনসটিটিউট অব রেডিয়াম। মাদাম কুরিই হলেন এই প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা।

১৯১৪ খ্রিঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তান্ডব নেমে এলো পৃথিবীর বুকে। মানবতাবাদী মাদাম কুরি আর ল্যাবরেটরির ঘরে আবদ্ধ থাকতে পারলেন না। গবেষণা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে আহতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর আবিষ্কৃত রেডিয়ামকে আহতদের চিকিৎসায় ব্যবহার করে তাদের সুস্থ করে তুলতে লাগলেন।

চার বছর পৃথিবীময় মৃত্যুর তান্ডব ঘটিয়ে অবশেষে ১৯১৮ খ্রিঃ মহাযুদ্ধের অবসান ঘটল। মাদাম কুরিও আবার ফিরে গেলেন তাঁর ল্যাবরেটরিতে।

দীর্ঘকাল তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিয়ে গবেষণা করার ফলে মাদাম কুরির রক্তের কোষগুলি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ফলে ১৯৩৪ খ্রিঃ তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন।

সমস্ত চিকিৎসা ও চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সেই বছরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিশ্ববিজ্ঞানের এক অত্যাশ্চর্য প্রতিভা।

গুগলিয়েলমো মার্কোনি



পদার্থবিজ্ঞানের সেরা পাঁচটি আবিষ্কারের মধ্যে একটি হল বিশেষ এক ধরনের তড়িৎ প্রক্রিয়া যার নাম বেতার টেলিবার্তা। দূরবর্তী স্থানে দ্রুত গতিতে খবরাখবর পাঠানোর এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন ইতালির পদার্থবিজ্ঞানী গুগলিয়েলমো মার্কোনি।

বেতার টেলিযোগাযোগের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল গাণিতিক ও পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার ফলে। এর সঙ্গে যুক্ত একা মার্কোনি নয় বহু বিজ্ঞানীর সাধনা।

ইংরাজ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে প্রথম ধারণা করেছিলেন আলো ও তড়িতের মধ্যে রয়েছে রহস্যময় সংযোগ।

এরপর তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ ও আলোর সম্পর্কটিকে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় তুলে ধরেন।

পরবর্তী পর্যায়ে বিজ্ঞানী হার্ৎজ তাঁর বিখ্যাত পরীক্ষার মাধ্যমে আলো ও তড়িতের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেন।

হার্ৎজের পরীক্ষার আগেই বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন তড়িৎ ধারক বা ক্যাপাসিটরকে তড়িদাবিষ্ট করা হলে তা থেকে দোলনের নিয়মে তড়িৎ প্রবাহ তৈরি হয়। এই প্রবাহের বিস্তার আলোর অনুরূপ তরঙ্গায়িত।

আধুনিক তড়িৎবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেছিলেন হার্ৎজ। সেই সঙ্গে বেতার টেলিবার্তার উদ্ভাবনের পথও সুগম হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ল্যাবরেটরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেন না উদ্ভুত তড়িৎতরঙ্গের বিস্তার ছিল মাত্র কয়েক মিটার।

এই নামমাত্র বিস্তারকে পৃথিবীময় সম্প্রসারিত করার পথ দেখিয়েছিলেন মার্কোনি। তিনি তাঁর পূর্বসূরী বিজ্ঞানীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্ভব করে তুলেছিলেন।

বিদ্যুৎ ও আলোর তরঙ্গের সাহায্যে সঙ্কেত পাঠাবার প্রথম কাজটি মার্কোনি শুরু করেছিলেন ১৮৯৫ খ্রিঃ। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর।

তারপর ধীরে ধীরে এই কাজকে উন্নতস্তরে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। মাত্র কয়েক মিটার দূরত্বকে সম্প্রসারিত করে ১৮৯৭ খ্রিঃ তিনি কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে সংকেত পাঠাতে পেরেছিলেন।

মার্কোনির সেই পথ অনুসরণ করেই উত্তরকালে হাজার হাজার মাইল দূরে সংকেত পাঠাবার কাজটি বিজ্ঞানীরা সম্ভব করে তুলেছেন।

ইতালির বোলগনা শহরে ১৮৭৪খ্রিঃ ২৫শে এপ্রিল এক সম্পন্ন জোতদার পরিবারে মার্কোনির জন্ম। তাঁর বাবার নাম গিসেপে মার্কোনি, মা অ্যানি।

জোতদার পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব ছিল না। ফলে ভাল টিউটর রেখে বাড়িতেই মার্কোনির শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল।

ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন মার্কোনি। বিজ্ঞানের বিষয়গুলির মধ্যে বিশেষ করে পদার্থবিদ্যায় ছিল তাঁর অলৌকিক আকর্ষণ। সেই সঙ্গে ছিল গণিত।

বাল্য বয়সেই ভৌততত্ত্ব ও তড়িৎ প্রসঙ্গে তাঁর উৎসাহ এমন ছিল যে হাতের কাজ দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতেন।

স্কুল-কলেজের প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই মার্কোনি ম্যাক্সওয়েল, হার্ৎজ, রিখি, লজ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় অধিগত করেন।

ছেলের উৎসাহ দেখে বাবা গিসেপে তাঁদের পঁতেচিও শহরের জমিদারির মধ্যেই একটি ছোট ল্যাবরেটরি তৈরি করে দেন। সেই সময়ে মার্কোনির বয়স একুশ বছর।

এই নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে বসেই তিনি তড়িৎ সংক্রান্ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন।

গোড়া থেকেই তিনি যে কাজে হাত দেন তা হল বেতার-র্বাতা দূরে পাঠাবার গবেষণা। ১৮৯৫ খ্রিঃ মার্কোনি দেড়মাইল দূরত্ব পর্যন্ত বেতার সংকেত পাঠাতে সক্ষম হন।

পরের বছর, ১৮৯৬ খ্রিঃ মার্কোনি তাঁর গবেষণার যন্ত্রপাতি ইতালি থেকে ইংলন্ডে নিয়ে এলেন।

ডাক বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম প্রিসের উপস্থিতিতে লন্ডনের সলস্‌বেরিতে তাঁর বেতার টেলি-যোগাযোগের পরীক্ষাটি দেখান।

এই সময়ে তিনি বেতার সংকেত দু মাইল দূরত্ব পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতেই লাগল। পরের বছরেই, ১৮৯৭ খ্রিঃ দূরত্ব দুমাইল থেকে চার মাইলে বৃদ্ধি পেল। এরপর দুমাসের মধ্যেই চারমাইল পৌঁছল ন'মাইলে।

১৮৯৬ খ্রিঃ মার্কোনি উইলিয়াম প্রিসের সহযোগিতায় বেতার টেলিগ্রাফির পেটেন্ট পেয়ে গিয়েছিলেন।

১৮৯৭ খ্রিঃ উভয়ের উদ্যোগে গড়ে উঠল দ্য অয়ারলেস-টেলিগ্রাফ অ্যান্ড সিগন্যাল কোম্পানি লিমিটেড।

এইভাবেই বেতার টেলিবার্তা পৃথিবীতে এক নতুন যুগের সূচনা করল।

ইতালি সরকারের ব্যবস্থাপনায় —১৮৯৭ খ্রিঃ স্পেজিয়া শহরে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল।

সেখানে মার্কোনি বারো মাইল পর্যন্ত দূরত্বে টেলি-যোগাযোগ সম্প্রসারিত করতে সমর্থ হন।

১৮৯৯ খ্রিঃ মধ্যেই ইংলিশ চ্যানেলের দূরত্বে ফ্রান্স ও ইংলন্ডের মধ্যে টেলি-যোগাযোগ গড়ে উঠল। তারপর থেকেই বিভিন্ন শহরে বেতার স্টেশন গড়ে উঠতে লাগল।

১৯০০ খ্রিঃ মার্কোনির কোম্পানির নাম বদল করে রাখা হল মার্কোনি বেতার টেলি-যোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেড।

পরীক্ষার ক্রমোন্নতি থেকেই বোঝা যায় মার্কোনি তাঁর গবেষণা নিরন্তর চালিয়ে চলেছিলেন। ১৯০১ খ্রিঃ তিনি এক নতুন কথা ঘোষণা করলেন ডিসেম্বর মাসে। তিনি এক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখালেন যে বেতার তরঙ্গ পৃথিবীর বক্রতা দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

আটলান্টিক মহাসাগরের দুই পাড়ে দুই শহর পলধু ও সেন্ট জনস। এই দুই শহরের পরস্পরের দূরত্ব দু হাজার একশো মাইল।

এই দূরত্ব অতিক্রম করে দুই শহরের মধ্যে টেলিযোগাযোগ ঘটিয়ে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটালেন।

এই ভাবেই সাধারণ সঙ্কেত থেকে টেলি-বার্তার ব্যবহার সংবাদে সম্প্রসারিত হল। ক্রমে এই যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাঁধা পড়ল সমগ্র বিশ্ব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে, ১৯১৪ খ্রিঃ মার্কোনি ইতালির সেনাবাহিনীতে ল্যাফটেন্যান্টের চাকরি নিলেন।

ক্রমে মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল গোটা ইউরোপ। ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ইতালিকেও জড়িয়ে পড়তে হল।

এই অবস্থায় মার্কোনির টেলি-যোগাযোগ যুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠল। ফলে কর্মদক্ষতার গুণে মার্কোনি প্রথমে ক্যাপ্টেন ও ১৯১৬ খ্রিঃ জলবাহিনীর কম্যান্ডার পদে উন্নীত হলেন।

১৯১৭ খ্রিঃ ইতালি সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে জরুরী মিশন পাঠালেন তার অন্যতম সদস্য হলেন মার্কোনি।

১৯১৮ খ্রিঃ গোটা ইউরোপ শ্মশানভূমিতে পরিণত করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থামল। ১৯১৯ খ্রিঃ প্যারিসে বসল শান্তি সম্মেলন। এই সম্মেলনে পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত হয়ে ইতালি থেকে যোগ দিলেন বিজ্ঞানী মার্কোনি।

মহাযুদ্ধে দেশের সেবার স্বীকৃতি হিসাবে সেই বছরেই মার্কোনিকে দেওয়া হল ইতালির সামরিক পদক।

দেশে ফিরে এসে মার্কোনি আবার তাঁর গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন শর্ট ওয়েভ বা হ্রস্ব-তরঙ্গ নিয়ে।

সম্পূর্ণ, স্পষ্ট ও ত্রুটিহীনভাবে টেলিবার্তা পাঠানো নিশ্চিত করার জন্যই এই নতুন গবেষণা।

১৯২৩ খ্রিঃ মার্কোনি উদ্ভাবন করলেন নতুন বিম পদ্ধতি (Beam System)। এই নতুন পদ্ধতিতে ১৯২৬ খ্রিঃ মধ্যেই মার্কোনি তাঁর গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করলেন।

১৯৩১ খ্রিঃ অত্যন্ত সুক্ষ্মতরঙ্গ তৈরি করে টেলিযোগাযোগের দূরত্বকে দূরান্তরের সীমায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হলেন।

পরের বছরেই ১৯৩২ খ্রিঃ পৃথিবীর প্রথম মাইক্রোওয়েভ রেডিও টেলিফোন ব্যবস্থা গড়ে উঠল।

টেলিফোনের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রথম কথাবার্তা হল ভ্যাটিকান শহর ও পোপের গ্রীষ্মাবাস ক্যাসেল গ্যানড্‌ফলো-এর মধ্যে।

সমুদ্রের অনিশ্চিত জাহাজী যাত্রায় নতুন জীবন সঞ্চারিত হল নৌ-বিজ্ঞানে টেলিযোগাযোগের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ১৯৩৪ খ্রিঃ। পরের বছরেই রেডার তত্ত্বের ব্যবহারিক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হল ইতালিতে।

জীবনব্যাপী অক্লান্ত গবেষণার মাধ্যমে মার্কোনি পদার্থবিজ্ঞানের ভূমিতে এক অনন্ত সম্ভাবনার বীজ রোপন করেছিলেন। তার বহুমুখীন ফল ভোগ করছে আজকের পৃথিবী।

বিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের জন্য দেশবিদেশের অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অসংখ্য সম্মান, পদক ও পুরস্কার লাভ করেছেন মার্কোনি।

১৯৩৭ খ্রিঃ ২০শে জুলাই রোমে এই মহাবিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়।

আলবার্ট আইনস্টাইন



ইংরাজিতে একটা কথা আছে, সকাল দেখেই বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে। কথাটা যে পুরোপুরি ঠিক নয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলেন বিশ্বের বিস্ময়কর বিজ্ঞান প্রতিভা আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবন।

ভবিষ্যৎকালে যিনি বিশ্ববিজ্ঞানকে নেতৃত্ব দেবেন, হয়ে উঠবেন মানব ইতিহাসের এক সুমহান পথপ্রদর্শক, তাঁর জীবনের শুরুটা ছিল অতি সাধারণেরও সাধারণ। সেদিন তাঁর মধ্যে এমন কোন লক্ষণ ছিল না যা দেখে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার সামান্য পরিচয়ও পাওয়া যেতে পারে।

দক্ষিণ জার্মানির বাভারিয়া রাজ্যের উল্‌ম্‌ শহরে ১৮৯৭ খ্রিঃ ১৪ই মার্চ এক ইহুদী ব্যবসায়ী পরিবারে আইনস্টাইনের জন্ম। তাঁর বাবার নাম হেরম্যান, মায়ের নাম পলিন। তিনি ছিলেন বাবামায়ের প্রথম সন্তান।

আইনস্টাইনের জন্মের পরে পরেই তাঁর বাবা ব্যবসায়ের প্রয়োজনে জার্মানির মিউনিখ শহরে এসে বাস করতে থাকেন। যেই বয়সে ছোটরা সঙ্গীদের সঙ্গে হুল্লোড় বাঁধায়, খেলাধুলোয় মেতে থাকতে ভালবাসে—ঘাস-পাতা-লতা-ফুল টুঁড়ে প্রজাপতির পেছন নেয়, সেই বাল্য বয়স থেকেই আইনস্টাইন ছিলেন আশ্চর্য রকমের ব্যতিক্রম। এমন লাজুক আর মুখচোরা ছিলেন যে কারো সঙ্গে মিশতে পারতেন না। খেলাধুলো তো দূরের কথা। তাঁকে নিয়ে মা-বাবার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। কাজেই লেখাপড়ার জন্য ভালো স্কুলেই ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। দুবছরের ছোটবোন মাজাও যেত সেই সঙ্গে।

পড়াশোনায় মোটেই ভাল ফল দেখাতে পারেননি আইনস্টাইন। সব পরীক্ষাতেই অল্পের জন্য কোন রকমে উৎরে যেতেন। কি অঙ্ক বা বিজ্ঞান অথবা ভাষা-সাহিত্য, কোন বিষয়ের প্রতি কোন রকম আগ্রহ ছিল না তাঁর। পড়তে হবে তাই যেন বাধ্য হয়ে পড়তেন।

তবে একটা ব্যাপারে ছিল তাঁর খুব আগ্রহ। হাতের নাগালে কোন যন্ত্র পেলে তার খুঁটিনাটি দেখার জন্য কৌতূহলের অন্ত থাকত না। মাথা খাটিয়ে খুঁটিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে বসে ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন।

আইনস্টাইনের এক কাকা ছিলেন। তাঁর নাম জ্যাক। বাড়ির মধ্যে একমাত্র এই কাকার সঙ্গেই যত ভাব ছিল তাঁর। নানা বিষয় জানার জন্য কাকার কাছেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতেন তিনি।

ছ'বছর বয়সে বাবা একটা কম্পাস কিনে দিয়েছিলেন। সেটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতেই আইনস্টাইন কাকার কাছ থেকে শেখেন চৌম্বক ধর্ম ও মাধ্যাকর্ষণ বলের কথা।

দশ বছর বয়সে কাকা জ্যাকের কাছে প্রেরণা পেয়েছিলেন অঙ্ক শেখার। বীজগণিত পাটিগণিতের দরজায় এভাবেই পদার্পণ ঘটেছিল আইনস্টাইনের।

অঙ্কের বিষয়ে যে বইটি আইনস্টাইনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল, তা হল ডক্টর স্পিকারের একটা জ্যামিতির বই।

ডাক্তারি পড়া এক ছাত্র আসত তাঁদের বাড়িতে। তাঁর নাম ম্যাক্স টলমি। তাঁর কাছ থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও অঙ্কের নানা বই চেয়ে নিয়ে পড়তেন কিশোর আইনস্টাইন।

এইভাবে একসময় দেখা গেল বিজ্ঞান ও গণিতকে দিব্যি ভালবেসে ফেলেছেন তিনি। আধুনিক জার্মান সাহিত্যেও ততদিনে মনোযোগ এসে গিয়েছিল।

এই সময়েই ধরে আর একটা নেশা, তা হল বেহালা। বালক আইনস্টাইনকে প্রায়ই দেখা যেত নিভৃতে বেহালা নিয়ে বসে সুরের মায়াজাল বিস্তার করে চলেছেন।

মিউনিখের স্কুল থেকেই টেনেটুনে মাধ্যমিক পাশ করলেন। তারপর চলে এলেন সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে পলিটেকনিক আকাদেমিতে ভর্তি হবেন বলে।

জুরিখের পলিটেকনিক ইউরোপের এক সেরা প্রতিষ্ঠান। সেখানে ভর্তির পরীক্ষাতেই আইনস্টাইন পাশ করতে পারলেন না।

অঙ্কে মোটামুটি ভাল ফল করলেও সবচেয়ে খারাপ নম্বর পেলেন প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায়।

অকৃতকার্য হয়ে সুইজারল্যান্ডের অ্যারাউ শহরে এসে একটা স্কুলে প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে ছমাস পড়াশোনা করে নিজেকে তৈরি করলেন। তারপর আবার উপস্থিত হলেন পলিটেকনিকে। দ্বিতীয়বারে আর ব্যর্থ হতে হল না—ভর্তির চেষ্টায় সফল হলেন।

এই প্রতিষ্ঠানের খোলামেলা আবহাওয়াতে পড়াশোনায় দ্রুত উন্নতি ঘটল আইনস্টাইনের। এখানেই তিনি অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা এই দুই বিষয়ে পরিণত হবার সুযোগ পেলেন।

১৯০০ খ্রিঃ পলিটেকনিক থেকে স্নাতক হলেন আইনস্টাইন। এবারে নামতে হল একটা চাকরির সন্ধানে।

জাতে ইহুদী হওয়ায় অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ব্যর্থতার সঙ্গে যা পেলেন তা হল অযাচিত উপদেশ আর অপমান। ইতিমধ্যে বাবার ব্যবসার অবস্থাও এসেছে পড়তির দিকে।

তার ওপরে আইনস্টাইন বিয়েও করেছেন। স্ত্রী হাঙ্গেরির মেয়ে, নাম মিলেভা মারিৎস। কালক্রমে দুই শিশুর আগমন ঘটেছে সংসারে। কাজেই একটা চাকরি না হলেই যে নয়।

চেষ্টার ফল ফলল একদিন। ১৯০২ খ্রিঃ এক বন্ধুর সুপারিশে সুইস পেটেন্ট আপিসে কেরানির একটা চাকরি জুটে গেল।

সামান্য হলেও চাকরিটা যথেষ্টই আশ্বস্ত করল আইনস্টাইনকে। প্রথমতঃ আর্থিক দুশ্চিন্তার লাঘব, দ্বিতীয়তঃ নতুন কিছু করার যথেষ্ট অবসর।

ততদিনে পদার্থবিদ্যার জটিল সব তত্ত্ব আইনস্টাইনের মাথায় গিসগিস করছে। সুযোগ পেলেই পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলেন উচ্চতর গণিতের হিসাবে।

শান্তশিষ্ট চেহারার এক কেরানীকে দেখে বাইরের কারোরই বুঝবার উপায় নেই তাঁর মাথায় কি ঘুরছে।

অফিসের যেটুকু কাজ, তার জন্য খুব বেশি সময় লাগত না। বাকি সময়টা ডুবে যেতেন অঙ্ক সংক্রান্ত নিজের কাজ নিয়ে।

অফিসের ওপরওয়ালা কেউ আসছেন শুনলেই গণিতের কাগজপত্র ড্রয়ারে ঢুকিয়ে পেটেন্ট সংক্রান্ত কাগজপত্র সামনে খুলে নিয়ে কাজে ডুবে আছেন এমন ভাব করতেন।

পেটেন্ট অফিসে বসে এভাবেই আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন।

বিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটির এই নেপথ্যকাহিনী সত্যিই বিস্ময়কর।

১৯০৫ খ্রিঃ আইনস্টাইনের গাণিতিক গবেষণার ফল আপেক্ষিকতার সূত্রটি প্রথম প্রকাশিত হল। এই সময় তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর।

এই বছরেই জুরিখের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট হলেন।

ইতিপূর্বে দুই মার্কিন পদার্থবিদ মাইকেলসন ও মলি যুগ্মভাবে চেষ্টা করেছিলেন, সূর্যের চারদিকে পৃথিবী যে অভিমুখে ঘুরে বেড়ায় সেই অভিমুখে আলোকে পাঠিয়ে তার বেগ কতটা বাড়ে তা পরিমাপ করবার।

তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন পৃথিবীর আবর্তনের অনুকূলে ও প্রতিকূলে আলোর বেগ কতটা বাড়ে ও কতটা কমে। কিন্তু এই বেগ বৃদ্ধি ও হ্রাসের বিষয়টা আবিষ্কার করতে পারেন নি।

এই দুই বিজ্ঞানীর অসমাপ্ত কাজকেই সম্পূর্ণ করেছিলেন আইনস্টাইন কোন যন্ত্রপাতি নয় স্রেফ গণিতের সাহায্যে।

পদার্থবিজ্ঞানী নিউটন ১৭-১৮ শতকে ঘোষণা করেছিলেন, কাল বা সময় সর্বদাই ধ্রুবক ও অপরিবর্তনীয়। নিউটনের এই ঘোষণা বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আইনস্টাইন প্রথম পূর্বসূরীর এই রায়কে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, কাল বা সময় অবশ্যই পরিবর্তনীয়। কখনোই ধ্রুবক নয়।

বিজ্ঞানীরা এতদিন বিশ্বের সমস্ত বস্তুর অবস্থানকেই সাধারণ তিনটি মাত্রা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা দ্বারা ব্যাখ্যা করতেন।

আইনস্টাইন এর সঙ্গে যোগ করলেন চতুর্থ একটি মাত্রা, তা হল কাল। এই কাল আবার গতি বা বেগের ওপর নির্ভরশীল। কাল বা সময় এই দুটির কারো অবস্থানের ওপর নির্ভর করেই বাড়বে বা কমবে। যেমন, বৃহস্পতির এক বছর, পৃথিবীর এক বছরের চেয়ে দীর্ঘ, কেননা বৃহস্পতি পৃথিবীর চাইতে অনেক বেশি সময় নিয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করে আইনস্টাইন অন্য ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর ব্যাখ্যাটি এই রকম—দূর থেকে যদি দেখা যায়, দুটি ট্রেন দুদিক থেকে প্রচন্ড বেগে পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসছে, তাহলে বোঝা যাবে, ট্রেনের বেগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দুটি ট্রেনের স্বাভাবিক আকারও হ্রস্ব থেক হ্রস্বতর হয়ে যাচ্ছে।

এবারে সময়কে যদি স্কেল হিসাবে আলোর গতির কাছাকাছি দাঁড় করানো যায় তবে দেখা যাবে বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সময়ের নির্দিষ্টতা কমে আসছে। আলোর গতিবেগে হাজির হওয়া মাত্র সময়ও একেবারে শূন্য হয়ে যাবে।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ওজন। এটি বেগের ওপর নির্ভরশীল। পদার্থের বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ওজনও বাড়তে থাকে।

তবে আলোকের বেগে না পৌঁছনো পর্যন্ত পদার্থের ওজন ততটা মারাত্মক রকমের বাড়ে না।

মোটকথা আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ গড়ে তুলেছিলেন অত্যন্ত জটিল এক গাণিতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে, যা কিনা সম্পূর্ণভাবেই বিশুদ্ধ গণিত। এই গণিতের সাহায্যে তিনি যেই ফলাফলে পৌঁচেছিলেন, আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীরা সর্বাধুনিক যন্ত্রে যাচাই করে একই ফলাফল লাভ করেছেন। আইনস্টাইনের গণনা ছিল এমনই নির্ভুল।

১৯০৫ খ্রিঃ আইনস্টাইন তাঁর প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধেই তিনি আপেক্ষিকতার বীজ বপন করেন। প্রবন্ধের নামকরণ করেছিলেন On a Heuristic Point of View Concerning the Generation and Transformation of Light.

এই প্রবন্ধের সুবাদেই আইনস্টাইন বিজ্ঞানী মহলে পরিচিতি লাভ করেন। এই সূত্রেই ১৯০৯ খ্রিঃ তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

একদিকে প্রাণখুলে বেহালা বাদন, অন্য দিকে বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিমগ্নতা এই দুটি কাজেরই প্রশস্ত সুযোগ এসে গেল চাকরির দৌলতে আর্থিক নিশ্চয়তা আসার পরে।

প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের দশ বছর পরে ১৯১৫ খ্রিঃ আইনস্টাইন প্রকাশ করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি আপেক্ষিকতারই নানা দিক নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং পুরনো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বদলে নতুন তত্ত্ব উপস্থিত করেন।

অভিকর্ষজ আকর্ষণ বলের কথা বলতে গিয়ে নিউটন বলেছিলেন, বিশ্বের যে কোনও দুটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

আইনস্টাইন সেই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে জানালেন, অভিকর্ষজ আকর্ষণকে চরম বল বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।

কেননা, প্রত্যেক পদার্থেরই নিজস্ব ভরের অনুপাতে কার্যকরী বল থাকে; ফলে অন্য পদার্থকে নিজের দিকে টানার একটা প্রবণতা থাকে।

পদার্থের এই আকর্ষণী বলই সৌর বিশ্বের বক্রতা ও নানা সৌরবস্তুর কক্ষপথের পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে।

আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত হল, দুটি অতি নিকটবর্তী বিন্দুর দূরত্ব বক্ররেখ, কখনোই সরলরৈখিক নয়।

দ্বিতীয় গবেষণা প্রবন্ধে এই সব আলোচনার সঙ্গে আইনস্টাইন ভর ও শক্তি সম্পর্কিত আলোচনাও করেছিলেন।

তিনি জানিয়েছিলেন, পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শক্তি ও পদার্থের রূপান্তরের সম্পর্কটিকে তিনি একটি সমীকরণে দাঁড় করিয়েছিলেন। সেটি এই রকম $E=mc^2$। E হল শক্তি বা energy, M হল ভর বা massC হল ধ্রুবক বা constant আলোর বেগ।

আইনস্টাইন প্রতি সেকেন্ডে আলোর গতিবেগ নির্ণয় করেন ২৯৯, ৭৭৬ কিলোমিটার বা ১৮৬,৩০০ মাইল। এটি ধ্রুবক বা অপরিবর্তনীয়।

এই সমীকরণের সূত্র ধরেই পরমাণু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন ইউরেনিয়াম পরমাণু থেক উদ্ভূত শক্তিকে মুক্ত ও নিয়ন্ত্রণের পন্থা।

এই পথ ধরেই হয় পরমাণু শক্তির আবিষ্কার, পরে মহাঘাতক পরমাণু বোমার উদ্ভব।

জুরিখে গবেষণা ও অধ্যাপনা পাশাপাশি চলতে লাগল। দুই বছর পর ১৯১২ খ্রিঃ আইনস্টাইন প্রুশিয়ার বিজ্ঞান আকাদেমিতে চলে এলেন। এখানে নিজের গবেষণা ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গবেষণার তত্ত্বাবধানের কাজের সঙ্গে তিনি কুড়ি বছর যুক্ত ছিলেন।

১৯১৪ খ্রিঃ ইউরোপ জুড়ে শুরু হল প্রথম মহাযুদ্ধ। হিটলার ঘোষণা করেছিল, জার্মানরা আর্যরক্তের মানুষ, ইহুদীদের রক্ত দূষিত। তারই প্ররোচনায় দেশ জুড়ে আরম্ভ হল ইহুদী নিধন যজ্ঞ।

আইনস্টাইনের শরীরে খাঁটি ইহুদীর রক্ত। তার ওপর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার কথা ঘোষণা করে এই সময়ে বললেন, These war is a vicious and savage crime. I would rather be hacked to pieces than take part in such an abominable business.''

জার্মানিতে ইহুদীদের মর্মান্তিক পরিণতি লক্ষ করে আইনস্টাইন শুরু করলেন মানবিক আন্দোলন। তিনি উপলব্ধি করলেন, আত্মরক্ষার প্রশ্নেই ইহুদীদের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন।

১৯৩৩ খ্রিঃ নরপশু হিটলারের প্ররোচনায় তথাকথিত জার্মানদের মধ্যে এমনই ইহুদী বিদ্বেষ তৈরি হয়েছিল যে নাৎসি সরকার আইনস্টাইনের বিখ্যাত আপেক্ষিকতা-বাদকে কলঙ্কময় তত্ত্ব হিসাবে ঘোষণা করলেন। ইহুদীদের যাবতীয় কাজকেই নিষিদ্ধ বলে প্রচার করা হল।

জার্মানি হয়ে উঠল ইহুদী-বধ্যভূমি। নির্বিচারে ইহুদীদের নিধন চলতে লাগল। ইহুদী বিজ্ঞানী ও মনীষীদের নামও খতম তালিকায় উঠতে লাগল।

আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন জার্মানিতে থাকার অর্থ যেচে মৃত্যু ডেকে আনা। তিনি ডাকযোগে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন।

আমেরিকাতেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত করে নিউ জার্সির প্রিন্সটন শহরের ইনসটিটিউট ফর অ্যাডভ্যান্স স্টাডিজ-এ প্রধান গবেষকের চাকরি নিলেন ১৯৩৩ খ্রিঃ শেষ দিকে।

কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল জার্মানিতে আইস্টাইনের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

হিটলার তাতেই শান্ত হয় নি। আইনস্টাইনের মাথার জন্য কয়েক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করা হল।

১৯৪০ খ্রিঃ আইনস্টাইন মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি জার্মানিতে নির্যাতিত জার্মানদের জন্য গঠন করলেন কল্যাণ তহবিল। তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'আইনস্টাইন ফান্ড ফর প্যালেস্টাইন'।

১৯৩৬ খ্রিঃ জার্মানি রাইনল্যান্ড দখল করল। তারপর ১৯৩৮ খ্রিঃ দখল করল অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া।

চেকোশ্লোভাকিয়াতে ছিল ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ খনি। জার্মান অধিকার কায়েম হতেই সেখানকার ইউরেনিয়াম বাইরে আসা বন্ধ হয়ে গেল। তা ব্যবহৃত হতে লাগল জার্মান পরমাণুবিজ্ঞানীদের গবেষণায়।

হিটলারের স্বপ্ন সমস্ত পৃথিবীর অধিকার। তা করায়ত্ত করবার জন্য দরকার এমন এক শক্তি যা হবে অপ্রতিহত। সেই লক্ষ পূরণের উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে জার্মান বিজ্ঞানীরা।

১৯৩৯ খ্রিঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক-মুহূর্তে দুই আমেরিকান পরমাণু বিজ্ঞানী ফের্মি ও জিলার্ড পরমাণুবোমা তৈরির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন।

এ বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁরা প্রিন্সটনে এসে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

আইনস্টাইন মানবতাবাদী ও শান্তিকামী মানুষ। যুদ্ধবিরোধী মতবাদে বিশ্বাসী। তবু জার্মানির আগ্রাসন ও রণোন্মত্ততার পরিপ্রেক্ষিতে এবং মানবিকতার প্রশ্নে আমেরিকার পরমাণু বোমা তৈরির স্বপক্ষে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারলেন না।

ফের্মি ও জিলার্ডের অনুরোধে আইনস্টাইন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে পত্র লিখতে বাধ্য হলেন।

এই চিঠিতে তিনি জার্মানির চেকোশ্লোভাকিয়া দখল ও ইউরেনিয়ামের চালান বন্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শক্তিসম্পন্ন বোমা তৈরির আশু প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

১৯৩৯ খ্রিঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে অশুভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হল।

এই ঘটনার দু সপ্তাহ পরেই প্রেসিডেন্ড রুজভেল্টের হাতে পৌঁছল আইনস্টাইনের চিঠি। চিঠির গুরুত্ব অনুধাবন করে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তিনি এবং পরমাণু বোমা তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে বিজ্ঞানীদের এই বৈঠকে আইনস্টাইন ছিলেন অনুপস্থিত।

বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তের পরিণতি দেখা গেল ১৯৪৫ খ্রিঃ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি লগ্নে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের ধ্বংসকান্ডের মধ্যে।

মহাযুদ্ধের পরিণতি—লক্ষ লক্ষ মানুষের হত্যালীলা, দেশের পর দেশ মহাশ্মশানে রূপান্তরিত হল।

মানব সমাজের অস্তিত্বের সংকটের চিন্তা আইনস্টাইনকে নতুন মানুষে রূপান্তরিত করল। তিনি পরমাণুশক্তিকে মানবকল্যাণের কাজে ব্যবহার করার আহ্বান জানালেন।

যুদ্ধ নয়, মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসাই যে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বসমস্যার সমাধানের উপায়, একথা তিনি বিশ্ববাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

মানবতার এই মহামন্ত্র পৃথিবীর দেশে দেশে বহন করে নিয়ে গেলেন মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন।

জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমা শহর দুটির ভয়াবহ অবস্থার কথা জানতে পেরে আইনস্টাইন এতটাই ভেঙ্গে পড়েছিলেন যে, তীব্র মনোবেদনায় নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'আবার যদি নতুন করে জীবন শুরু করা সম্ভব হত, তাহলে বিজ্ঞানের সাধনা না করে ছুতোর মিস্ত্রীই হতাম'।

গোটা জীবনে আইনস্টাইন তিনশোরও বেশি প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন। এর অধিকাংশই ছিল আপেক্ষিকতার ব্যাখ্যা ও শক্তি সম্পর্কিত।

আলোক তড়িৎ ও আলোকের ফোটন তত্ত্ব বিষয়েও আইনস্টাইনের অবদান রয়েছে। আধুনিক ইলেকট্রনিক্সের উৎস তাঁরই উদ্ভাবিত আলোকতড়িৎ নিঃসরণতত্ত্ব।

এই তত্ত্বের জন্য ১৯২১ খ্রিঃ তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম রূপকার আইনস্টাইন গোটা পৃথিবীতে বিজ্ঞানের প্রবাদপুরুষ রূপে খ্যাত।

বিশ্ববিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য পৃথিবীর অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান উভয় বিষয়েই দেওয়া হয়েছে অজস্র সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি।

লন্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো সিপ ছাড়াও তিনি পেয়েছিলেন কপলে পদক ও ফ্রাঙ্কলিন পদক।

আইনস্টাইন রচিত উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল, Special theory of Relativity, Theory of Relativity, Investigation on theory of Brownian Movement প্রভৃতি।

বিজ্ঞান বর্হিভূত বিষয় নিয়ে রচিত, Why war? My philosophy, ও Audit of later years প্রভৃতি।

বিজ্ঞানী হয়ে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে ধর্ম সম্পর্কিত বইও আইনস্টাইন রচনা করেছেন। মানবতাবাদই ছিল তাঁর ধর্মচিন্তার মূল সুর।

১৯৫৫ খ্রিঃ ১৮ই এপ্রিল মহাবিজ্ঞানী ও মানবমন্ত্রের অন্যতম প্রচারক আইনস্টাইন প্রিন্সটন হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হেরম্যান জোসেফ মুলার

আধুনিক জীববিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধাপুরুষ হেরম্যান জোসেফ মুলার ১৮৯০ খ্রিঃ ২১শে ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ধাতুশিল্পের একজন ডিজাইনার। বাবা মা দুজনেই ছিলেন বিজ্ঞানে উৎসাহী। তাঁদের চেষ্টা ও যত্নে হেরম্যান বাল্যকাল থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলেন।

স্কুলে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের প্রতি হেরম্যানের আগ্রহ তাঁর শিক্ষকদেরও বিস্মিত করত। বন্ধুদের নিয়ে সেই সময়েই তিনি গড়ে তুলেছিলেন বিজ্ঞান ক্লাব। সেখানে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা করা হত। মজার ব্যাপার এই যে, জীবনবিজ্ঞান যে বিজ্ঞানের একটা বিশেষ শাখা, একথা একদম মানতে চাইতেন না হেরম্যান। নিতান্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই এই বিষয়টাকে দেখতেন তিনি।

ক্লাবেও ঠাঁই দেননি জীবনবিজ্ঞানকে। তিনি বলতেন, জীবনবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা আর হাতে ধরে জীবনটাকে নষ্ট করা একই কথা।

স্কুলে বরাবরই ভাল ফল করতেন। চূড়ান্ত পরীক্ষাতে বৃত্তি নিয়ে পাশ করলেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিখ্যাত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হলেন তখন তাঁর বয়স সতেরো।

আগাগোড়া ছিলেন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ভক্ত। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আকস্মিকভাবেই তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হলো জীবনবিজ্ঞানের প্রতি।

অধ্যাপক এডমন্ড উইলসন পড়াতেন জীববিজ্ঞান। তিনি ছিলেন গবেষকও। ফলে জীববিজ্ঞানের রহস্যময় দিকগুলি তিনি ক্লাশে এমনভাবে তুলে ধরতেন যে তাঁর ক্লাশে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় উপচে পড়ত।

হেরম্যান উইলসনের ক্লাশে প্রথম পরিচিত হলেন জেনেটিক্স বা প্রজনন বিদ্যা নামক জীববিজ্ঞানের রহস্যময় বিভাগটির সঙ্গে। ফলে তাঁর আবাল্য লালিত জীবন-দর্শনেরই আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল।

কিছুদিনর মধ্যেই হেরম্যান সিদ্ধান্ত নিলেন জীববিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর বিভাগ জেনেটিক্স নিয়েই গবেষণা করবেন।

অধ্যাপক উইলসন মূলতঃ ছিলেন সাইটোলজিস্ট। কোষতত্ত্বের গবেষণা করে তিনি এক মহৎ সত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জেনেটিক্সের উদ্ভাবক যোহান মেন্ডেলের তাত্ত্বিক উপাদানের কাজের সঙ্গে জনন কোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের কাজের সাদৃশ্য রয়েছে। এবিষয়ে গবেষণা করবার জন্য ছাত্রছাত্রীদেরও তিনি উৎসাহিত করতেন।

হেরম্যান স্থির করলেন তিনি মেন্ডেলের বংশগতির এককের পরিচয় লাভ করবেন উইলসনের ধারণাকে অনুসরণ করে।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গড়ে তুললেন জীববিজ্ঞান ক্লাব। যেসব ছাত্রছাত্রী জীববিজ্ঞানে উৎসাহী এবং বংশগতি সম্পর্কে আগ্রহী বিশেষ করে তাদের নিয়েই গড়ে উঠল এই জীববিজ্ঞান ক্লাব।

১৯১০ খ্রিঃ কুড়ি বছর বয়সে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হেরম্যান স্নাতক হয়ে বেরলেন।

সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগে আর একজন প্রথিতযশা অধ্যাপক গবেষক ছিলেন। তাঁর নাম টমাস হান্ট মর্গান। ড্রসোফিল নামে একপ্রকার লালচক্ষু ফলারে মাছি নিয়ে তিনি গবেষণা করতেন।

এই মাছিদের বৈশিষ্ট্য হল, এরা সাধারণতঃ ফলের ওপরেই জীবনযাপন করে। বংশবিস্তারও করে খুব তাড়াতাড়ি।

অধ্যাপক মর্গান এই মাছিদের নিয়ে যে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন তা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে বিস্ময় উৎপাদন করেছিল।

লিঙ্গবাহিত বংশগতি সম্পর্কে মর্গানের পরীক্ষা ও ফলাফল জেনেটিক্স শাখায় সম্ভাবনাময় অবদান হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

লালচক্ষু ড্রসোফিলদের মধ্যে শুভ্রচক্ষু স্ত্রী ড্রসোফিলাদের আবিষ্কার করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন জীবনের গুণ বা বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেও সম্ভব।

অধ্যাপক মর্গান মেতে ছিলেন ড্রসোফিলা মাছিদের নিয়ে গবেষণায়। তখনো কেউ বুঝতে পারেনি যে জীববিজ্ঞানের এই সাধকের নীরব সাধনায় রয়েছে এক মহাবিপ্লবের সম্ভাবনার ইঙ্গিত। যার সূত্র ধরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

অধ্যাপক মর্গান যখন নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে একের পর এক গবেষণাপত্র প্রকাশ করে চলেছেন সেই সময় মুলার এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। ফলে নতুন গতি লাভ করল মর্গানের গবেষণা।

মর্গানের গবেষণার সঙ্গে মুলার ছাড়াও তাঁর আরও দুই ছাত্র ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা হলেন স্টারটেভান্ট এবং ব্রিজেস।

এঁদের সহযোগিতায় মর্গানের জিন সম্পর্কিত গবেষণা ক্রমেই উচ্চতর মাত্রা লাভ করতে লাগল।

উনত্রিশ বছর বয়সে ১৯১৯ খ্রিঃ মুলারের বংশগতি সংক্রান্ত প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হল।

তিনি তাঁর গবেষণায় দেখালেন যে, জিন বা বৈশিষ্ট্যের বাহক যে উপাদানের জন্য ড্রসোফিল মক্ষিকার পাখার গঠনের বক্রতা তার অস্তিত্ব রয়েছে ড্রসোফিলের চতুর্থ ক্রোমোসমের মধ্যে।

এইভাবেই মুলার আরম্ভ করলেন জিনের নানা রহস্য উন্মোচনের কাজ।

কিছুদিনের মধ্যেই চারজনে মিলে জেনেটিক্সের ওপরে একটি বই রচনা করলেন। বইয়ের নাম দেওয়া হল The Mechanism of Mendelian Heredity. বইটি প্রকাশিত হল ১৯১৫ খ্রিঃ। বইতে যেসব বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হল, সেগুলো হল ঃ

১. সবকটি জিনই অভিন্ন সম্পর্ক কারক বিন্যাসে একই রেখায় বিন্যস্ত।

২. সমস্ত জিনের অবস্থানই ক্রোমোসমে এবং সম্পর্ককারক বিন্যাস-এর দ্বারাই গঠিত হয়।

৩. যে কোন সজীব পদার্থের একটি ক্রোমোসমে রয়েছে নানা সম্পর্ককারক বিন্যাস।

যেই সম্ভাবনার স্পষ্ট আভাস নিয়ে বইটি আত্মপ্রকাশ করল তা সমাদৃত হবার মত পরিবেশ তখনো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কেননা, জেনেটিক্সের সবেমাত্র যাত্রাশুরুর কাল তখন।

জীবনবিজ্ঞানের এই শাখার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তখনো সম্যক ধারণা গড়ে ওঠেনি।

বই প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই ১৯১৫ খ্রিঃ মুলার যোগ দিলেন বিখ্যাত রাইস ইনস্টিটিউটের জীববিজ্ঞান বিভাগে। এখানে এসেও শুরু করলেন ড্রসোফিলের জিন-সংক্রান্ত গবেষণা।

একবছর পরেই ড্রসোফিল জেনেটিক্সের ওপরে দ্বিতীয় গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন মুলার।

এই গবেষণায় তিনি দেখালেন, প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় পরিবর্তিত জিন নিয়ে ড্রসোফিল পিতামাতা যখন নতুন সন্তানসন্ততির জন্ম দেয় তখন বংশগতির সাধারণ সূত্রের বাইরে এমন এক বংশধারা গড়ে ওঠে যার সম্পর্কে গাণিতিক বিচারে কোন আগাম মতামত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এই গবেষণা মুলারকে ডক্টরেট ডিগ্রি এনে দিল।

মিউটেশন বা জিনের প্রাকৃতিক গুণগত পরিবর্তনের প্রথম হদিশ পেয়েছিলেন হল্যান্ডের এক অখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তাঁর নাম হুগো ডি ভ্রিস। তিনি থাকতেন আমস্টারডাম শহরের অদূরে হিলভারসান নামক এক জায়গায়। গবেষণার প্রয়োজনে সেখানে তিনি সন্ধ্যামণি ফুলের বাগান করেছিলেন।

একদিন সকলে তাঁর নজরে পড়ে কয়েকটি সন্ধ্যামণির গায়ে ঘটেছে আকস্মিক পরিবর্তন।

এই পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য তিনি গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে ১৯০১ খ্রিঃ আবিষ্কার করেন মিউটেশান তত্ত্ব। The Mutation theory এই নামে ১৯০১ খ্রিঃ তিনি একটি বইও প্রকাশ করেন।

বইতে তিনি তুলে ধরেছেন পরিবেশগত পরিবর্তন ও বংশগতির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সম্পর্কের আভাস। এইভাবেই ডি ভ্রিসের হাতে হয়েছিল মিউটেশন তত্ত্বের গোড়াপত্তন।

অবশ্য ইতিপূর্বে, উনিশ শতকের আশির দশকে এই সম্পর্কে একটা অনুমানের সূত্র ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ জীববিজ্ঞানী ল্যামার্ক।

তিনি এনোথেরা লামার্কিয়ানা গাছটি, সেই সময়ে এই গাছটি ছিল অজ্ঞাতনামা, আমেরিকা থেকে ফ্রান্সে এনে তার মধ্যে বৃদ্ধিগত আকস্মিক একটা পরিবর্তন লক্ষ করেছিলেন।

আমেরিকাতে গাছটির ছিল স্বাভাবিক বৃদ্ধি। ফ্রান্সের মাটির সংস্পর্শে এসে সেই গাছ অস্বাভাবিক বৃদ্ধিলাভ করেছিল।

মিউটেশনের বিষয়ে পূর্বাপর সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে মুলার এই বিষয়ের ওপরেই গভীর গবেষণা আরম্ভ করলেন।

অসংখ্য জিজ্ঞাসা তখন পাক খাচ্ছে তাঁর মাথায়। জিনের মধ্যে এই আকস্মিক অথচ স্থায়ী পরিবর্তন কেন ঘটে, কেন তা জিন মাধ্যমে পরম্পরাক্রমে বংশধারায় প্রসারিত হয়?

পরিবেশগত পরিবর্তনে জিনের পরিবর্তনই বা ঘটে কিভাবে? মিউটেশনের প্রকৃতিই বা কি?

পরিবেশগত পরিবর্তন কেন জীবনের বৈশিষ্ট্যে ব্যাপক কোন পরিবর্তন ঘটায় না?

কেনই বা জিনের সামান্য পরিবর্তন জনন কোষের মধ্য দিয়ে বংশানুক্রমে পরিবাহিত হয়?

সমস্ত জিজ্ঞাসারই উত্তর পেয়ে গেলেন এক সময়ে মুলার তাঁর দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে। আর এই সাফল্যই মুলারকে করে তোলে জীববিজ্ঞানের অগ্রপথিক।

মুলারের মতে, একক একটি জিনের ওপরে কাজ করে তার প্রাকৃতিক পরিবর্তন পরিমাপ করা হল ভয়ানক কঠিন একটি কাজ।

এই শক্ত কাজটিরই সমাধান করেছিলেন মুলার ১৯২৭ খ্রিঃ। তিনি বিশ্ববিজ্ঞানকে দেখালেন, এক্স-রশ্মির বিকিরণের প্রভাবেই জিনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে।

মুলার তাঁর এই বিশ্ববিখ্যাত পরীক্ষাটি করেছিলেন ড্রসোফিল-এর এক বিশেষ প্রজাতির ওপরে। এটির নাম ড্রসোফিলা লোনোগস্টার। এই বিশেষ প্রজাতির মাছির ওপরে এক্স-রশ্মি ব্যবহার করে তিনি দেখলেন জিনের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটেছে।

এইভাবেই মুলার বিশ্বে প্রথম বাইরে থেকে জিনের ওপরে শক্তি প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন এনে তার পরিমাণগত পরিমাপকে সম্ভব করলেন।

মুলারের গবেষণার সহযোগী ছিলেন আর এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আল্টেনবার্গ। তাঁরা যুগ্মভাবে গবেষণা করে পরের বছরেই, ১৯২৮ খ্রিঃ দেখালেন, এক্স-রশ্মির বিকিরণসঞ্জাত শক্তির প্রভাবে ক্রোমোসমের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে।

তিনি আরও দেখালেন, এক্স-রশ্মির প্রয়োগে কোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসমগুলির স্থান পরিবর্তন বেড়ে যায়।

তবে এক্স-রশ্মির বিকিরণ কোষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। এর ফলে ক্রোমোসমের একটি অংশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

মুলার ও আল্টেনবার্গের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ড্রসোফিলা মক্ষিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে এক্স-রশ্মির বিকিবণেব ফল অন্যান্য সজীব পদার্থের কোষে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে সেই সম্পর্কে তখন কিছুই জানা সম্ভব হয়নি।

১৯২২ খ্রিঃ মুলার সেই সময় পর্যন্ত জিন নিয়ে যত কাজ হয়েছে তার একটি ধারাবিবরণী তৈরী করেছিলেন।

১৯২৭ খ্রিঃ তিনি সেই বিবরণীর সঙ্গে নিজের পরীক্ষার ক্রম অনুযায়ী বিবরণ নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির নাম দেন The Artificial Trans mutation of the Gene।

মুলারের এই প্রবন্ধ বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলের প্রশংসা অর্জন করে। পরবর্তীকালে এই কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

মুলার তাঁর বিশ্ববিখ্যাত প্রবন্ধটিতে জানিয়েছেন

(১) প্রাকৃতিক প্রভাবে জিনের বৈশিষ্ট্যের একটা আকস্মিক পরিবর্তন সাধিত হয়। অনুরূপ ভাবে বিকিরণের প্রভাবেও জিনের বৈশিষ্ট্যের স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন ঘটে থাকে।

(২) বিকিরণের মাত্রার ওপরে পরিবর্তনের হার নির্ভরশীল। বিকিরণের মাত্রা অস্বাভাবিক রকমের বাড়ানো হলে, পরিবর্তনের হারও সেইভাবে বেড়ে যাবে। প্রাকৃতিক প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন থেকে এই হার বহুগুণ বেশি।

(৩) বিকিরণের স্পর্শহীন ড্রসোফিলের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক পরিবর্তনের হার প্রতি দশ হাজারে আট।

অপর দিকে মোটামুটি মাত্রা অর্থাৎ আড়াই হাজার রন্টগেন রশ্মি প্রয়োগে ড্রসোফিলায় জিনের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন আট শতাংশ।

বিকিরণের মাত্রা যদি আরও বাড়ানো হয় পরিবর্তনের হারও তেমনি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯২৮ খ্রিঃ আর একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন মুলার। সেখানে তিনি দেখালেন এক্স-রশ্মির বদলে গামা রশ্মির বিকিরণ ঘটিয়েও জিনের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটানো যায়।

একই সময়ে এফ.বি. হানসন এবং এফ. এম. হেস নামক দুজন বিজ্ঞানী স্বতন্ত্রভাবে একই বিষয়ে গবেষণা করছিলেন।

তাঁদের গবেষণা থেকে জানা গেল, জন্তুদের অন্ডকোষে গামা রশ্মি ছাড়াও নিউট্রন বা অন্য কোনও শক্তিশালী বিকিরণের দ্বারাও জিনের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে থাকে।

মুলার সহ অন্যান্য খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে জানা যায়—

(১) উচ্চশক্তিসম্পন্ন বিকিরণের প্রভাবে যে কোনও জীবজন্তু ও উদ্ভিদের জিনের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটতে পারে।

(২) শতকরা ৯৯টি বিকিরণই কোষের পক্ষে ক্ষতিকর।

(৩) সজীব পদার্থের পরিবর্তিত জিন তার স্বাভাবিকতা হারায়।

(৪) পরিবর্তিত জিনের বৈশিষ্ট্য যে সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বহু ক্ষেত্রেই বংশগতিতে কোন এক সময়ে পরিবর্তন বিশেষ গুণ হিসেবে প্রকাশ পায়।

(৫) পরিবর্তিত জিনের সংখ্যা বিকিরণের মাত্রার হারের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই কারণেই জিন প্রভাবকারী বিকিরণের ফল ক্রমবর্ধমান হতে বাধ্য।

(৬) বিকিরণের কোন মাত্রা জিনের ওপরে কোন প্রভাব ফেলবে না অর্থাৎ জিনের পরিবর্তনকারী বিকিরণের সর্বনিম্নমাত্রা সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সম্ভব হয় না।

মুলারের গবেষণার সূত্র ধরে এভাবেই জিন গবেষণায় মিউটেশন একটি প্রধান সূত্র হয়ে ওঠে।

মুলারের গবেষণা প্রবন্ধের গুরুত্ব তার সমকালে নিরূপন সম্ভব না হলেও দীর্ঘ উনিশ বছর পরে বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল তা অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন।

১৯৪৬ খ্রিঃ মুলারের মিউটেশান গবেষণাকে স্বীকৃতি জানিয়ে অর্থাৎ এক্স-রশ্মির বিকিরণে জিনের বৈশিষ্ট্যের আকস্মিক পরিবর্তন আবিষ্কারের জন্য নোবেল কমিটি তাঁকে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করলেন। মুলারের বয়স তখন ছাপ্পান্ন।

বিজ্ঞানী হিসেবে মুলার যেমন ছিলেন বড় মাপের প্রতিভা তেমনি মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন হৃদয়বান ও উদার প্রকৃতির।

তিনি বারবার উচ্চারণ করেছেন, জিন গবেষণা যেন বিশ্বমানবের কল্যাণেই নিবেদিত হয়।

যখন মুলার নোবেল পান, সেই সময়ে তিনি ছিলেন ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। আমৃত্যু তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন।

জীববিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রপথিক মুলার ১৯৬৭ খ্রিঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জন এন্ডারস

জীববিজ্ঞানের ভাষায় ক্ষুধার্ত জীবাণু ভাইরাসের নাম ব্যাকটেরিওফাজ। ল্যাটিন শব্দ ফাজাইন থেকে এসেছে ফাজ কথাটা যার অর্থ কুরে খাওয়া।

মারাত্মক জীবাণু ব্যাকটেরিয়াকেও অনায়াসে খেয়ে নেয় বলে ভাইরাসকে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

প্রাণীদেহের কোষের মাংস যে এই ভাইরাসের অতি প্রিয়খাদ্য হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই মারাত্মক জীবাণুটিকে প্রথম তামাক পাতার মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন ইভানোস্কি নামে এক জীববিজ্ঞানী ১৮৯২ খ্রিঃ।

তামাক পাতায় পাওয়া গিয়েছিল বলে ইভানোস্কি এই জীবাণুর নাম দিয়েছিলেন টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস। ইংরাজিতে সংক্ষেপে বলা হয় টি.এম.ভি।

ভাইরাস কথাটা এসেছে ল্যাটিন থেকে। এর অর্থ তরল বিষ।

প্রাণিদেহে প্রথম ভাইরাসের সন্ধান পেয়েছিলেন লোয়েফলার নামে এক বিজ্ঞানী ১৮৯৮ খ্রিঃ। ১৯০০ খ্রিঃ পিত্তঘটিত পীতজ্বরের ওপর গবেষণা করতে

গিয়ে ওয়াল্টার রিড নামে এক বিজ্ঞানী লক্ষ করেন এক ধরনের ভাইরাসই এই রোগের কারণ।

এইভাবে ভাইরাস জীববিজ্ঞানে এক নতুন যুগের সূচনা করল। ভাইরাসকে কব্জা করবার জন্য বিজ্ঞানীরা গবেষণায় মেতে উঠলেন।

ক্রমে আবিষ্কৃত হল ভ্যাক্সিন, অ্যান্টিবায়োটিক, সালফাড্রাগ যা ভাইরাসকে ধ্বংস করে ভাইরাসঘটিত রোগের কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে।

এইসব প্রতিষেধক আবিষ্কার করবার জন্য পৃথিবীর অসংখ্য জীববিজ্ঞানী দীর্ঘ অনলস গবেষণায় জীবন ব্যয় করেছেন।

মানবকল্যাণের লক্ষে যে সব বিজ্ঞানসাধক জীবনদায়ী ওষুধ আবিষ্কার করেছেন তাদের মধ্যে বিশিষ্ট নামটি হল জন ফ্রাঙ্কলিন এন্ডারস।

এই বিশ্ববরেণ্য জীববিজ্ঞানী দীর্ঘ ত্রিশ বছর ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করে বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন।

১৮৯৭ খ্রিঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল শহরে এক ধনী পরিবারে বিজ্ঞানী এন্ডারসের জন্ম।

স্বাভাবিকভাবেই ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়া শেখার প্রশস্ত সুযোগ লাভ করেন এন্ডারস। কিন্তু তাঁর যত আগ্রহ ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ে। বই পেলেই গোগ্রাসে গিলতে বসেন।

যত অনীহা তাঁর বিজ্ঞানের বিষয়ে। কি জীবনবিজ্ঞান, কি রসায়ন বা পদার্থবিদ্যা-- এসবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষেন না তিনি। অঙ্কের কথা শুনলেই শিউরে উঠে চোখ বোজেন, এমনি অবস্থা।

এন্ডারস স্বপ্ন দেখেন ভবিষ্যৎ জীবনে হবেন এক মস্ত লেখক। লিখবেন গল্প, উপন্যাস, নাটক।

জীবনের কি রহস্যময় গতিবিধি, এই মানুষই একদিন আকস্মিক ভাবে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে বিজ্ঞান-সাধনার মাধ্যমে বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের বিশেষ স্থানটি নির্দিষ্ট করে নেন।

এন্ডারস ১৯১৯ খ্রিঃ ইয়েল শহরের কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে বেরুলেন। সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভর্তি হলেন হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এখানে ইংরাজি সাহিত্যের ক্লাশ করতে করতেই ঘটল একদিন অঘটন।

কি একটা কাজে একদিন জীবাণুবিদ্যার ক্লাশে ঢুকে একটা অদ্ভুত বিষয়ের বই হাতে পেলেন।

বইটা হল হ্যান্স জিন্সার রচিত উকুনের জীবনবৃত্তান্ত। বিশেষ করে বিষয়ের আকর্ষণেই বইটা পরে কিনে নিলেন তিনি। বই পড়ে তো হতভম্ব এন্ডারস। একটা তুচ্ছ কীটের এমন রোমাঞ্চকর জীবনেতিহাস যে সম্ভব তা ছিল তাঁর কল্পনারও অগোচর।

কী আশ্চর্য ভাবে জন্মের পর থেকে জীবনচক্রের ধাপে ধাপে প্রাণীটার চেহারা, বুদ্ধি ও বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর ঘটে, অদ্ভুত জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে বংশ বিস্তার ও অবশেষে আসে মৃত্যু।

বিশ্বপ্রকৃতির এক অজানা রহস্য উন্মোচিত হয় এন্ডারসের চোখের সামনে। তাঁর বিস্ময়ের অবধি থাকে না সামান্য এক জীবন নিয়ে অসামান্য বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ধৈর্য ও কুশলতার কথা ভেবে।

ওই উকুনই এন্ডারসের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলে।

উকুনের জীবনবৃত্তান্ত বইটির লেখক হ্যান্স হার্ভাডের জীবাণুবিদ্যা বিভাগেরই স্বনামখ্যাত অধ্যাপক-গবেষক। এন্ডারস বইটি শেষ করে পরদিনই গিয়ে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে।

তিনি ততক্ষণে মনস্থির করে নিয়েছেন, সাহিত্য নয়, জীবাণুবিদ্যার গবেষণাতেই জীবন উৎসর্গ করবেন।

অধ্যাপক হ্যান্স এন্ডারসের সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পারলেন বিজ্ঞানের উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়েই জন্মেছেন তিনি। নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাঁর ল্যাবরেটরিতে এন্ডারসের ডক্টরেট করবার সুযোগ করে দিলেন। এন্ডারস তাঁর জীববিজ্ঞানের গবেষণা আরম্ভ করলেন হ্যান্সের অধীনে।

এন্ডারস তাঁর গবেষণার বিষয় নির্বাচন কলেন অ্যালার্জি।

আমাদের শরীরের প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থার নাম হল ইমিউনলজি। এই কাজটি করে শ্বেতকণিকা।

বাইরের কোন জীবাণু শরীরে ঢুকলে শ্বেতকণিকারা জীবাণুর মোকাবিলার জন্য রক্তে একধরনের প্রোটিন তৈরি করে। এর নাম হল এন্টিবডি। আর বাইরের জীবাণুকে বলে অ্যান্টিজেন।

আমাদের শরীরের জটিল প্রাণ-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলেই একধরনের অ্যান্টিজেনে বা বহিরাগত রেণুর অনুপ্রবেশের দরুন কোষের মধ্যে অতিরিক্ত সাড়া জেগে ওঠে।

ফলে শরীরে তৈরি হয় হিস্টামিন নামে একটি জৈব রাসায়নিক। এই রাসায়নিকটি এমন যে এটি তৈরি হওয়া মাত্র শরীরে কতগুলি প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে, যেমন চুলকানি, চোখ ফোলা, নাকে সুড়সুড়ি ইত্যাদি। এই অবস্থারই নাম অ্যালার্জি।

যেসব জিনিস থেকে শরীরে অ্যালার্জি দেখা দেয় এর মধ্যে আছে, জন্তু-জানোয়ারের গায়ের লোম, ধুলাবালি, বোলতা বা মৌমাছির হুল, ডিমের সাদা অংশ, দুধ, কার্বন কাগজ ইত্যাদি।

অ্যালার্জি বহু প্রকার। এন্ডারস, হ্যান্সের ল্যাবরেটরিতে নানা প্রকার অ্যালার্জি নিয়ে পরীক্ষা চালাতে লাগলেন।

এন্ডারসের ডক্টরেট ডিগ্রি এল অ্যালার্জির ওপর উচ্চমানের গবেষণার জন্য।

ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ বা ফুসফুসের প্রদাহকেই বলা হয় নিউমোনিয়া। অ্যালার্জির পর এন্ডারস গবেষণা আরম্ভ করলেন নিউমোনিয়া নিয়ে।

অচিরেই এন্ডারস আবিষ্কার করলেন একধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমন থেকেই নিউমোনিয়ার উৎপত্তি।

এন্ডারস নিউমোনিয়া রোগের জীবাণুনাশক অনুসন্ধানের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন।

পাশাপাশি চলতে থাকে যক্ষ্মারোগ সংক্রান্ত গবেষণা। এই রোগটিও ব্যাকটেরিয়া জাতীয় জীবাণুঘটিত।

ইতিমধ্যে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করায় নানা প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পথ সুগম হল।

একে একে আবিষ্কৃত হল, স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, ক্লোরামপেনিপল প্রভৃতি জীবনদায়ী ওষুধ। ফলে ব্যাকটেরিয়াঘটিত যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া জাতীয় রোগের প্রকোপ কমে গেল।

এন্ডারস পরীক্ষা করে দেখালেন, এমন কিছু ভাইরাস রয়েছে যারা কোন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধেই জব্দ হয় না। এন্ডারস পরীক্ষা শুরু করলেন এই কারণ নির্ণয়ের লক্ষে।

বিভিন্ন ভাইরাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এন্ডারস এদের স্বরূপ উদঘাটন করলেন। দেখা গেল সব ভাইরাসই এককোষী। এদের আকৃতি এতই ক্ষুদ্রাকার যে খালিচোখে তো দূরের কথা, অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখেও বোঝার উপায় থাকে না এরা জীবিত না মৃত।

অতি ক্ষুদ্র অবয়ব নিয়ে অতি সহজেই এরা শরীরে ঢুকে পড়ে। এদের আক্রমণের স্থান হল কোষ। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে এরা কোষকে ধ্বংস করে নিজেদের বংশবিস্তার করে।

কোষ থেকে ক্রমে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে। এই ভাবেই রোগাক্রান্ত শরীরে একসময় নেমে আসে মৃত্যু।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক বছর আগে ১৯৩৮ খ্রিঃ ইলেকট্রো মাইক্রোস্কোপ তৈরি হল। ফলে জীবাণু গবেষণায় যুগান্তর এল।

এই শক্তিশালী অণুবীক্ষণের সাহায্যেই আবিষ্কৃত হল প্রথম ভাইরাস টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস।

দেখা গেল এই ভয়াবহ জীবাণুর গড় আকারের পরিমাপ এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ক্রমে ভাইরাসের শরীরতন্ত্র সম্পর্কেও বহু তথ্য জানা সম্ভব হল।

বিভিন্ন ভাইরাসের শরীরে উপাদানও বিভিন্ন।

বিজ্ঞানীরা জানালেন ভাইরাস এক ধরনের নিউক্লিও প্রোটিনের অণুযুক্ত সংক্রামক কণা। এদের নিজস্ব বিপাকক্রিয়া বলতে কিছু নেই। কোষে অনুপ্রবেশের পর এই সংক্রামক কণারা কোষীয় বিপাক ক্রিয়াকে অবলম্বন করে নিজেদের বংশবৃদ্ধি ঘটায়। এই ভাবেই এরা কোষকে ধ্বংস করে দেয়।

বহু ধরনের ভাইরাসের প্রত্যেকেই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। এরা যে কেবল মানুষের কোষকেই ধ্বংস করে তাই নয়, উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, মৎস্য, সরীসৃপ, পাখি এমনকি জীবাণু ব্যাকটেরিয়া পর্যন্ত এদের শিকারের আওতাভুক্ত।

এন্ডারস গভীরভাবে গবেষণা করে বহুবিধ ভাইরাসের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন। তাঁর এবং অন্যান্য গবেষকদের গবেষণার ফলে এ পর্যন্ত চার হাজার রকমের ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার হল, এই বিরাট সংখ্যক ভাইরাসের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা চরিত্র এবং প্রত্যেকেই ক্ষতিকারক। এরা কেউই জীবজগতের কোন প্রকার উপকারে আসে না।

এন্ডারস এদের অনেকের মধ্যেই মানবকোষের প্রতি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করলেন। মানবকোষে অনুপ্রবেশের পর এরা নিজেদের লালা থেকে একধরনের এনজাইম ছড়িয়ে দিতে থাকে। এই এনজাইম অতি দ্রুত কোষের আবরণকে গালিয়ে ফেলে।

কোন কোন ভাইরাসের আছে ছোট ছোট লেজ। তার ভেতরটা আবার নলাকৃতি। তারা এই তীক্ষ্ণাগ্র লেজটিকে মানবকোষের গায়ে কাঁটার মত বিঁধিয়ে দেয়। তারপর নলাকৃতি লেজের ভেতর দিয়ে ভাইরাসের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের বাহক জিনটি কোষের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

এই জিন কোষের বিপাক ক্রিয়াকে অবলম্বন করে কোষের ভেতরেই অসংখ্য ভাইরাস তৈরি করে।

অল্প সময়ের মধ্যেই এদের দাপটে কোষ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং শরীরে রোগ লক্ষণ দেখা দেয়।

এন্ডারস বিভিন্ন ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করলেও বিশেষভাবে কাজ করেছেন ভাইরাস বাহিত হামরোগ নিয়ে।

হাম এমনই এক রোগ যা ছমাস বয়সের পর থেকে যে কোন বয়সের মানুষেরই হতে পারে।

তবে অল্প বয়সেই এই রোগ বেশি হতে দেখা যায়। একবার হাম হলে দ্বিতীয়বার হবার সম্ভাবনা কম থাকে।

একসময়ে হাম থেকে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটত। হাম ছড়িয়ে পড়ত মহামারীর মত।

এন্ডারস দেখলেন, হামের ভাইরাস শরীরকে এমন দুর্বল করে দেয় যে সহজেই নিউমোনিয়া কিংবা মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেক সময় মানুষের শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

থাইলার নামে এক বিজ্ঞানী বহুদিন আগেই পীতজ্বরের ভাইরাসের কালচার তৈরি করে এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছিলেন।

এন্ডারসও একই ধারা অনুসরণ করে হামের ভ্যাকসিন তৈরি করতে সমর্থ হলেন।

এন্ডারসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পোলিও ভাইরাসের কালচার তৈরি করা। তাঁর কাজের সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে জনাস সল্ক পোলিও রোগের সার্থক ভ্যাকসিন তৈরি করেছিলেন।

সল্ক মুক্ত কণ্ঠে এন্ডারসের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "Dr, John Enders pitched a very long forword pass, and I happend to be in the right spot to receive it."

সারাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এন্ডারস ১৯৫৪ খ্রিঃ চিকিৎসা শাস্ত্র ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন।

পুরস্কার প্রাপ্তির পরেই এন্ডারস আবার হাম নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন।

ইতিপূর্বে তিনি হামের যে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছিলেন তার দ্বারা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান সম্ভব হয়নি।

এবারে, ১৯৫৪ খ্রিঃ তিনি একটি এগারো বছরের বালকের রক্ত ও গলা থেকে শ্লেষা নিয়ে পরীক্ষা করে তার মধ্যে হামের ভাইরাস পেয়ে যান। তা থেকে তৈরি করেন সেই ভাইরাসের টিস্যু কালচার। তা থেকেই দুবছরের চেষ্টায় তৈরি করলেন হামের ভ্যাকসিন।

পরীক্ষা করে দেখা গেল এই ভ্যাকসিনে শতকরা ৯৬ ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ নিরাময় ঘটে।

এন্ডারসের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলে ষাটটিরও বেশি রোগের ভাইরাসের কালচার তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। অনাগত ভবিষ্যতে তাঁর অনুসরণেই হয়তো দুরারোগ্য ক্যানসারের ভাইরাস বধের অস্ত্রও পাওয়া যাবে।

আর্থার হোলি কম্পটন

বিজ্ঞান ও ঈশ্বর এই দুই বিষয়ের তথাকথিত দ্বন্দ্ব সুবিদিত। অথচ বিশ্বখ্যাত এক বিজ্ঞানীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে এক বিস্ময়কর উক্তি।

'Science is the glimps of God's purpose in native. The very existence of the amazing world of the atom and radiation points to a purposefull creation, to the idea that there is a God and an inteligent purpose back of everything.'

অণু থেকে পরমাণু, প্রকৃতি-আশ্রয়ী সমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে এক মহাশক্তির সৃষ্টিমুখী উদ্দেশ্য। এই বুদ্ধিদীপ্ত উদ্দেশ্যের মধ্যেই পরম শক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বয়ং প্রকাশ।

ঈশ্বর বিশ্বাসী এই মহাবিজ্ঞানী হলেন আর্থার হোলি কম্পটন। পরমাণু বিস্ফোরণের ইতিহাসে যাঁকে নিয়ে গোটা বিশ্বে গড়ে উঠেছিল বিতর্কের আবহ।

১৮৯৫ খ্রিঃ কনরাড রন্টগেন এক্স-রে নামক এক অজানা রশ্মি আবিষ্কার করে বিশ্ববিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার পথ উন্মোচন করে দিয়েছিলেন।

কম্পটন এই এক্স-রে নিয়ে গবেষণা করে পদার্থবিদ্যার গবষেণায় নতুন গতি সঞ্চার করেছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের উস্টার শহরে ১৮৯২ খ্রিঃ ১০ই সেপ্টেম্বর এক ধর্মপরায়ণ পরিবারে কম্পটন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ইলিয়াস এবং মা ওটেলিয়া উভয়েই ছিলেন মানবপ্রেম ও অহিংসায় বিশ্বাসী।

চার ভাইবোনের মধ্যে আর্থার ছিলেন তৃতীয়।

ছেলেবেলায় বিদুষী মায়ের কাছে গল্প শুনে শুনেই বিশ্বমানবের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বুদ্ধ, জরাথুস্ট্র, কনফুসিয়াস, যিশু প্রমুখের জীবন কাহিনী ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন আর্থার কম্পটন।

একই সঙ্গে মানুষের আদি সভ্যতার পীঠভূমি মিশর, ব্যাবিলন, গ্রিস দেশের কথা, হিপোক্রিটাস, আর্কিমিডিস, নিউটন, গ্যালিলিও প্রভৃতির মত বিজ্ঞানীদের সম্পর্কেও অনেক কথা জানা হয়ে গিয়েছিল তাঁর।

মায়ের প্রেরণাতেই সব ইতিহাসের ইতিহাস প্রাণিবিদ্যার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলেন কম্পটন। প্রাণিবিদ্যা থেকেই এক সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চিন্তাভাবনা বাসা বাঁধল মাথায়।

মায়ের মুখে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস শোনার পরেই কিশোর বয়সে তিনি পড়ে ফেলেছিলেন টলেমি, পিথাগোরাস, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস ও কেপলারের আবিষ্কারের নানা বই।

বয়স যখন কুড়িতে পড়েছে, সেই সময় তিনি নিজেই এমন এক উড়োজাহাজ বানান যা আকাশে বেশ কিছুক্ষণ উড়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল।

কম্পটনের বাবা ইলিয়াস ছিলেন উস্টার কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। এই কলেজ থেকেই স্নাতক হন তিনি।

এই কলেজে পড়ার সময়েই কম্পটন নিজের হাতে একটি জাইরোস্কোপ বানিয়ে বাজারে তার পেটেন্ট নেন। জাইরোস্কোপ যন্ত্রটি উড়োজাহাজের গতিনিয়ন্ত্রণের কাজের সহায়ক।

কম্পটনের দাদা কার্ল প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় পি.এইচ.ডি করে উচ্চতর গবেষণায় যশস্বী হয়েছেন। তিনি ছোটভাইয়ের জাইরোস্কোপ দেখে তাঁকে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত ও পদার্থবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা নেবার উপদেশ দিলেন।

দাদার পরামর্শে প্রিন্সটনে ভর্তি হয়ে চব্বিশ বছর বয়সে ডক্টরেট হয়ে বেরোলেন কম্পটন।

পদার্থবিদ্যার ডিগ্রি নেওয়া হলেও কম্পটনের মনে ছিল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকেই ঝোঁক।

এর মধ্যেই, ১৯১৬ খ্রিঃ মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে ইনস্ট্রাকটরের চাকরি পেয়ে গেলেন। কিন্তু একবছর যেতে না যেতেই ওয়েস্টিং হাউস ইলেকট্রিক অ্যান্ড ম্যানুফাকচারিং কোম্পানিতে গবেষক যন্ত্রবিদ হিসেবে যোগ দিলেন।

কিন্তু এই কাজেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায় দেশাত্মবোধের আহ্বানে যোগ দিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংকেত-বাহিনীতে। উড়োজাহাজের নানা অংশের উন্নতি কি করে করা যায়—এখানে এই ছিল কম্পটনের কাজ।

১৯১৮ খ্রিঃ যুদ্ধ থেমে গেলে কম্পটন সামরিক বাহিনীর কাজ ছেড়ে চলে এলেন ইংলন্ডে। কাজ নিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিখ্যাত ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরিতে।

দু বছর টানা এখানে কাজ করলেন। ১৯২০ খ্রিঃ দেশে ফিরে এলেন। এবারে অধ্যাপনার কাজ নিলেন সেন্ট লুই শহরের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে। প্রধান অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের গুরুদায়িত্ব নেন।

তিন বছরের মধ্যেই আবার এল কর্মস্থল পরিবর্তনের আহ্বান।

সেই সময়, ১৯২৩ খ্রিঃ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে কাজ করছেন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও নোবেলজয়ী অ্যালবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন। পদার্থ বিদ্যার কিছু ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য তিনিই ডেকে পাঠালেন কম্পটনকে। তিনিও হাজির হলেন যথারীতি। বসে গেলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার চেয়ারম্যান পদে।

গবেষণার কাজ। কাজেই মনের মত হয়েছিল। এই কাজেই বাইশ বছর থেকে যোগ্যতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

এখানেই কম্পটন পরমাণু পদার্থবিদ্যার গবেষণার কাজ আরম্ভ করেন।

১৮৯৫ খ্রিঃ রন্টজেন এক্স-রে নামক অজানা এক রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন। তখনো পর্যন্ত এক্স-রে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কাজ হয় নি।

কম্পটন এই এক্স-রে নিয়েই কাজ করতে বসলেন। তাঁর গভীর গবেষণার ফলেই আবিষ্কৃত হল এক্স-রে সম্পর্কে একটি জগদ্বিখ্যাত তত্ত্ব। যার নাম হল কম্পটন এফেক্ট।

কম্পটন তাঁর আবিষ্কারে দেখালেন, এক্স-রে ও ইলেকট্রনিকের সংঘর্ষের ফলে এক্স-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়ে ও কিছু পরিমাণ শক্তি এক্স-রে থেকে সরাসরি মিশে যায় ইলেকট্রনে।

অখ্যাত কম্পটন এই একটি গবেষণার মাধ্যমেই পরমাণু পদার্থবিদ্যায় কৃতিত্ব দেখিয়ে বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজের স্থানটি নির্দিষ্ট করে নিলেন।

কম্পটনের এই আবিষ্কারের ফলে ম্যাক্স প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইনের কোয়ান্টাম তত্ত্বের সত্যতা নির্ভুল প্রমাণ হয়ে গেল।

আইনস্টাইনের আলোকতড়িৎ সম্পর্কিত তত্ত্বগুলিও দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আরও প্রমাণ হল আলোকের মত এক্স-রশ্মিও তরঙ্গ ও কণা দুই ভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে।

কম্পটন এফেক্ট-এর স্বীকৃতি এলো ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দেই। পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিনি। তবে একা নয়, যুগ্মভাবে।

সি.টি. উইলসন নামে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছিলেন পরমাণু পদার্থবিদ্যা গবেষণার এক অসাধারণ যন্ত্র 'মেঘ-কক্ষ'।

এই যন্ত্রের সাহায্যে কম্পটনের এক্স-রে ও ইলেকট্রনের সংঘর্ষের পরীক্ষাটি করা সম্ভব হয়েছিল।

নোবেল কমিটি তাই সেই বছরের পদার্থ বিদ্যার পুরস্কারের জন্য দুই জনকেই বেছে নিয়েছিলেন।

নোবেল পাবার পর কম্পটন বসলেন মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণায়। দীর্ঘ আট বছর এই গবেষণায় ডুবে রইলেন তিনি।

মহাজাগতিক রশ্মির প্রকৃতি ও উৎস নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে সারা পৃথিবীর মহাজাগতিক রশ্মির নির্ভুল হিসেব সংগ্রহের প্রয়োজন হল। তিনি এই কাজের জন্য বিশাল এক গবেষক টিম গঠন করে তাঁদের পাঠালেন বিভিন্ন দিকে।

উত্তর মেরুর তুষার ক্ষেত্র থেকে শুরু করে এশিয়া, ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকার দুরারোহ পর্বতশৃঙ্গ সর্বত্র তাঁর দল মহাজাগতিক রশ্মির তথ্য সংগ্রহ করে বেড়াল।

এইভাবে জানা গেল, পরমশক্তি সমৃদ্ধ পারমাণবিক কণারা কল্পনাতীত দূরাঞ্চলের মহাজাগতিক রশ্মির আবহ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নিঃসরিত হয়ে চলেছে। এই পারমাণবিক কণারা ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত আধান। অর্থাৎ প্রোটন ও পজিট্রন।

কম্পটন তাঁর পরীক্ষা দ্বারা নতুন এক ধরনের মহাজাগতিক রশ্মির সন্ধান পেলেন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওপরের স্তরের বায়ুর মধ্যে। তিনি দেখলেন এই নতুন মহাজাগতিক রশ্মির কণার প্রকৃতি সাধারণ মহাজাগতিক রশ্মির চেয়ে পৃথক। এই কণা সাধারণ বায়ুস্তরে প্রবেশ করতে পারে না। তার আনাগোনা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের সীমা পর্যন্ত।

বারবার পরীক্ষা করে কম্পটন বুঝতে পারেন এই কণাগুলি সম্পূর্ণভাবেই বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ বা প্রশম। ধনাত্মক বা ঋণাত্মক কোন বিদ্যুৎই এই সব কণায় অনুপস্থিত।

দীর্ঘ আট বছরের গবেষণার কাজে ছেদ পড়ল ১৯৩৮ খ্রিঃ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী আগুন তখন ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবী জুড়ে। কম্পটনকে হাতে নিতে হল অন্য এক গবেষণার কাজ।

ইতিমধ্যে পরমাণু বিজ্ঞানীরা শক্তির এক অফুরন্ত উৎসের সন্ধান পেয়ে গিয়েছেন। তা হল ইউরেনিয়াম নামক ভারী এক প্রাকৃতিক মৌল।

এই ইউরেনিয়াম মৌলের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রথম সন্ধান পেয়েছিলেন হেনরি বেকেরেল নামে এক অখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী। তারপর থেকে এই বিকিরণ সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন নামক এক পারমাণবিক তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণার দ্বারা আলোড়িত করলে এক অদ্ভুত ধরনের বিক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। তাঁরা এই বিক্রিয়ার নাম দিয়েছেন চেইন-রিঅ্যাকশন। এই বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বিকিরণ থেকে প্রচন্ড তাপের সঞ্চার হয়।

বাধ্য হয়েই মহাযুদ্ধকালে ইউরেনিয়াম ঘটিত গবেষণায় কম্পটনকে যুক্ত হতে হল।

ইতিমধ্যে আর এক বিজ্ঞানী অর্নেস্ট লরেন্স সাইক্লোট্রন নামে ইউরেনিয়াম বিদারণের যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এই যন্ত্রও যুক্ত হল কম্পটনের পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ-সন্ধানের গবেষণায়।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মার্কিন সরকারের পরিকল্পনার পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল কম্পটনের হাতে। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে এই পরিকল্পনা রূপায়িত হয়ে চলল ১৯৪১ খ্রিঃ মাঝামাঝি সময় থেকে।

প্রয়োজনটা ছিল সামরিক দপ্তরের। তাই কাজ চলছিল নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে।

সমকালীন যুগের ধুরন্ধর মার্কিন পরমাণু বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির কম্পটন কমিটি। কমিটির নাম রাখা হয়েছিল এস-১ কমিটি।

পরে কমিটি যখন পুরোপুরি সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে এল, তার নাম বদলে রাখা হল ম্যানহাটান পরিকল্পনা। সময়টা তখন ১৯৪২ খ্রিঃ।

কম্পটনের কর্তৃত্বাধীন এই কমিটির প্রধান কাজ ছিল ইউরেনিয়াম-২৩৫ ও কৃত্রিম কণা প্লুটোনিয়াম-২৩৯—এই দুই মৌল সংগ্রহ করা।

বিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন কেবলমাত্র এই দুই মৌলের নিউক্লিয়াস বিদারণ করেই সর্বাধিক মাত্রার শক্তি আহরণ সম্ভব। তাই কম্পটনের তত্ত্বাবধানে এই দুই মৌল সংগ্রহের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলতে লাগল।

পরমাণু বিস্ফোরণের কাজে কম্পটনের অধীন এই কমিটির কাজ ছিল সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কম্পটন জাতীয় গুরুদায়িত্ব সঠিক প্রতি পালনের সাফল্য লাভ করলেন ১৯৪২ খ্রিঃ ২রা ডিসেম্বর। তিনি এক গোপন বার্তার মাধ্যমে সাফল্যের সংবাদটি জানালেন এস-১ কমিটির সমকালীন প্রধান জেমস কোন্যান্টকে।

এরপর ১৯৪২ খ্রিঃ থেকে ১৯৪৫ খ্রিঃ মধ্যে বিভিন্ন ধাপে এগিয়ে চলল পরমাণু বোমা সম্পূর্ণ করার কাজ।

বিশ্ববিজ্ঞান ইতিহাসের পাতায় এক নতুন ঐতিহাসিক অধ্যায় সূচিত হল ১৯৪৫ খ্রিঃ ১২ই জুলাই।

এই দিন নিউ মেক্সিকোর মরু অঞ্চলে মার্কিন উদ্যোগে প্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হল। এই পরীক্ষার নাম হলে ট্রিনিটি টেস্ট।

বিস্ফোরণের পরেই দেশজুড়ে দেখা দিল গণরোষ। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ গবেষণারত বিজ্ঞানীরা পড়লেন তীব্র সমালোচনার মুখে। কমিটির চেয়ারম্যান আর্থার কম্পটনই প্রধানতঃ হলেন গণসমালোচনার মূল লক্ষ্য। সেই প্রথম তিনি এক নারকীয় ঘোষণা রাখলেন।

বললেন, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োগ কত জরুরী হয়ে পড়েছে।

বস্তুত জার্মানিতে পরমাণু বোমা তৈরির কাজ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে এমন সংবাদ মার্কিন নাগরিক বিজ্ঞানীদের মুখে শুনতে পেয়েই মার্কিন সরকার গোটা

বিশ্বজুড়ে মহা অঘটন ঘটার আশঙ্কায় তড়িঘড়ি পারমাণবিক বোমা তৈরি ও পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাবার উদ্যোগ নিয়েছিল।

১৯৪৫ খ্রিঃ ৬ই আগস্ট সকালে প্রথম পারমাণবিক বোমাটি বিস্ফোরিত হল জাপানের সমৃদ্ধ শহর হিরোসিমায়।

দ্বিতীয় বোমাটি পড়ল দুদিন পরে ১৯৪৫ খ্রিঃ ৯ই আগস্ট জাপানের অপর বর্ধিষ্ণু শহর নাগাসাকিতে।

দুটি শহরই ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সংখ্যাহীন জাপানির মৃতদেহের স্তূপে বিশ্বমানবতার এক কলঙ্কময় ইতিহাস রচিত হল। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বীভৎস অমানুষিক কার্যের দ্বিতীয় নজির নেই।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর এই পাশবিক আচরণকে ধিক্কার জানাল সমগ্র বিশ্বের মানুষ।

১৯৪৫ খ্রিঃ ১০ই আগস্ট নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করল জাপান। সেই সঙ্গে অবসান ঘটল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের।

এই পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের জন্য কম্পটন সুখ্যাতি ও কুখ্যাতি দুই পেলেন। বিজ্ঞানীদের কাছে পেলেন খ্যাতি, বিশ্বের মানবতাবাদীরা তাঁকে জানাল ধিক্কার।

নৃশংসতাকে রোধ করতে পারে উচ্চতর নৃশংসতার ঘটনা এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়েই কম্পটন তাঁর জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। তাই নিন্দা প্রশংসা দুই অবস্থাতেই তিনি রইলেন নির্বিকার।

যুদ্ধ শেষ হলে কম্পটন আবার ফিরে এলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে।

১৯৪৫ খ্রিঃ কম্পটন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদের দায়িত্ব পেলেন। অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম রূপকার কম্পটন সত্তর বছর বয়সে ১৯৬২ খ্রিঃ মৃত্যুবরণ করেন।

উইলবার রাইট
অরভিল রাইট



যে সকল প্রতিভাবান অনুসন্ধিৎসু মানুষের চিন্তা ও কর্ম মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে, উইলবার রাইট ও অরভিল রাইট—এই দুই সহোদর তাদের মধ্যে অন্যতম। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় নামেই তাঁরা সারা বিশ্বে পরিচিত।

আজকের পৃথিবীতে দূর হয়েছে নিকট—পৃথিবী আজ আমাদের হাতের মুঠোয় বলতে গেলে। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে মানুষের আবিষ্কৃত বিমানপোত।

আর তা আবিষ্কার করেছিলেন উইলবার ও অরভিল দুই ভাই। নিজেদের তৈরি যন্ত্রযানে চেপে তাঁরাই প্রথম আকাশে উড়ে মানুষের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন।

আমেরিকার ইন্ডিয়ানা প্রদেশে ১৮৬৭ খ্রিঃ উইলবারের জন্ম। অরভিলের জন্ম ১৮৭১ খ্রিঃ।

পিঠোপিঠি দুই ভাই ছেলেবেলা থেকেই ছোট যন্ত্রপাতি নিয়ে মেতে থাকতেন। কখনো নিজেরাই কিছু একটা বানাতেন। অসীম ধৈর্য নিয়ে নাওয়া খাওয়া ভুলে লেগে থাকতেন নিজেদের সেইসব কাজে।

পড়াশুনা শেষ করে দুই ভাই মিলে নিজেদের পছন্দমত একটা কারখানা তৈরি করলেন। প্রথমে ছাপার যন্ত্র ও পরে বাইসাইকেল নিয়ে কি করে এগুলোর আরো উন্নতি করা যায় তার চেষ্টা করলেন।

সেই সময় অটো লিলিয়েনথাল নামে একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার উড়ন্তযান নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কয়েক বছরের চেষ্টায় তিনি অনেকটা সফলও হলেন। কিন্তু হঠাৎ ভদ্রলোকের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর গবেষণার কাজ সেখানেই বন্ধ হয়ে যায়। রাইট ভাইয়েরা তখন লিলিয়েনথালের অসমাপ্ত কাজের বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন।

লিলিয়েনথালের উড়ন্ত যানের নক্সা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার ত্রুটি খুঁজে বার কবলেন তাঁরা। তারপর আরম্ভ করলেন এই নিয়ে গবেষণার কাজ।

উড়ন্ত যান নিয়ে ইতিপূর্বে যত কাজ হয়েছিল প্রথমেই তাঁরা সেই সব বিবরণ সংগ্রহ করলেন। সেসব পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন কেবলমাত্র বাতাসের গতিবেগের ওপর নির্ভর করে উড়ন্ত যান বেশিদূর চালানো সম্ভব নয়। এজন্য

দরকার শক্তিচালিত ইঞ্জিনের। গতি সঞ্চার করতে না পারলে এই যানের কোন ব্যবহারিক মূল্য থাকবে না।

তারপর দুই ভাই মিলে চিন্তা শুরু করলেন ইঞ্জিনের বিষয় নিয়ে। বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। কিন্তু কিছুতেই সফল হতে পারলেন না।

বারবার ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন দুজনেই। তখন বুঝতে পারলেন এবিষয়ে তাঁদের জ্ঞান যথেষ্ট সীমিত। সাফল্যের জন্য দরকার বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান।

আকাশযান সম্পর্কে ইতিমধ্যে যা কিছু বিজ্ঞানীরা লিখেছেন, তাঁদের ব্যর্থতা, সাফল্য ও চিন্তাভাবনার ইতিবৃত্ত নিয়ে দুই ভাই অধ্যয়ন করলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে।

এইভাবেই তাঁরা ধীরে ধীরে বাতাসের গতিবেগ, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তার চাপ, ভারসাম্য নির্ণয়ের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করলেন।

ইতিপূর্বে কি পদ্ধতিতে উড়ন্তযান নির্মাণ করা হয়েছে সেই কৌশলও তাঁরা রপ্ত করে নিলেন।

সুদূর অতীতে নীল আকাশে পাখিদের ওড়া দেখে একদিন মানুষের মনেও সাধ জেগেছিল আকাশে উড়বার। কিন্তু পাখিরা আকাশে ওড়ে ডানার সাহায্যে, মানুষের তো ডানা নেই। সেই অভাব তো মানুষের পক্ষে পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তবু, অনেক দুঃসাহসী মানুষ কৃত্রিম ডানা পিঠে বেঁধে আকাশে উড়বার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে ওড়া হল না। বাড়ল দুর্ঘটনা।

তারপর সেই চেষ্টা বন্ধ করে মানুষ বানাল বেলুন। কিন্তু বেলুনে চেপে শূন্যে ভাসা সম্ভব হলেও মানুষের আশা পূরণ হল না।

তারপর বানানো হল খেলনার আকৃতির গ্লাইডার। এই যন্ত্রগুলো নানান কৌশলে আকাশে ওড়ানো সম্ভব হল বটে, কিন্তু তাতে চেপে মানুষের আকাশে ওড়ার সাধ পূর্ণ হল না।

মানুষের আকাশে ওড়ার ইতিহাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে রাইট ভাইয়েরা এখানে এসে থামলেন। তাঁরা স্থির করলেন, এমন যন্ত্র বানাতে হবে যা চেপে মানুষ ইচ্ছামত আকাশে উড়ে বেড়াতে পারবে।

নিজেদের কারখানায় আবার শুরু হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। দীর্ঘ এক বছরের চেষ্টায় একটা বড় আকারের গ্লাইডার বা উড়ন্ত যান তৈরি হল। গ্লাইডারের বিশেষত্ব হল এটি বাতাসে ভারসাম্য রেখে সহজেই উড়ে যেতে পারবে।

এই সাফল্যই নতুন প্রেরণার সঞ্চার করল দুই ভাইয়ের মধ্যে। এরপরই তাঁরা তৈরি করলেন দুই পাখা বিশিষ্ট একটি ছোটখাট বিমান। ভারসাম্য রক্ষার জন্য এলিভেটর নামের একটি ছোট যন্ত্র এই বিমানের সামনে ও পেছনে জুড়ে দেওয়া হল। এই যন্ত্রটি বিমানের গতি নিয়ন্ত্রণ করতেও পাইলটকে সাহায্য করবে।

সাফল্যের আনন্দ নিয়ে একদিন বিমান নির্মাণের কাজ শেষ হল। তারপর শহর থেকে দূরে খোলা এক মাঠে নিয়ে গিয়ে বিমানটিকে শূন্যে উড়িয়ে দেওয়া হল।

এই কাজও ছিল পরীক্ষার পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় বুঝতে পারলেন, তাঁদের কলাকৌশলের কিছু পরিবর্তন দরকার।

আবার শুরু হল চিন্তাভাবনা ও সেই মত কাজ। বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেল, পেট্রল চালিত হাল্কা ইঞ্জিনই বিমানটির পক্ষে উপযোগী।

সেই সময়ে বাজারে যেসব ইঞ্জিন পাওয়া যেত, সেগুলো বিমানের পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত। কাজেই বাধ্য হয়ে নিজেরাই বসে গেলেন বিমানের উপযুক্ত ইঞ্জিন তৈরি করতে।

কয়েক মাসের নিরলস চেষ্টায় তৈরি হল তিন পাউন্ড ওজনের এক অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিন।

তারপর উইলবার ও অরভিল যেদিন কেরোলিনা প্রদেশের কিটি হক শহরের এক মাঠে তাঁদের উদ্ভাবিত পরীক্ষামূলক বিমানটি নিয়ে উপস্থিত হলেন, সেই দিনটি ছিল ১৯৩০ খ্রিঃ ১৭ই ডিসেম্বর।

আগেই শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল মানুষ বিমানে চেপে পাখির মত আকাশে উড়ে বেড়াবে। কথাটা কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। তবু কৌতূহলী কয়েকজন মানুষ হাজির হল মাঠে।

তখনো এরোপ্লেন নামটি উদ্ভাবিত হয়নি। রাইট ভাইরা তাদের উড়ন্ত যানের নাম দিয়েছিলেন রাইট ফ্লাইয়ার।

ইঞ্জিন যুক্ত করে দুই ভাই মিলে বিমানটিকে উড়বার জন্য প্রস্তুত করে নিলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল বিমানে দুজনের তো চড়বার ব্যবস্থা নেই। একজনকেই উড়তে হবে।

দুজনে মিলেই বিমানটি নির্মাণ করলেও প্রথম আকাশে ওড়ার দুর্লভ সম্মান নিতে হবে একজনকেই।

কে প্রথম বিমান চালাবে শেষ পর্যন্ত টস করে তা ঠিক করা হল। টসে জিতে অরভিল বিমানে গিয়ে উঠলেন। উইলবার রইলেন নিচে। তাঁদের আবিষ্কারের সাফল্য দেখবার জন্য সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাত্র জনা পাঁচেক মানুষ। সেদিন কি তাঁরা ভাবতে পারছিলেন কী যুগান্তকারী ঘটনা তাঁরা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছেন?

বিমানে চেপে নিজের জায়গায় বসে অরভিল প্রপেলার চালু করলেন। দুপাশ থেকে দুটি দড়ি নিচে বাঁধা ছিল। উইলবার এবারে সেগুলো খুলে দিলেন। তারপর প্রাণপণ শক্তিতে বিমানটিকে ঠেলতে আরম্ভ করলেন।

কিছুদূর গিয়েই শূন্যে লাফিয়ে উঠে আকাশে উড়ে চলল মানুষের হাতে তৈরি আকাশযান। কিছুদূর মসৃণ ভাবে এগিয়ে গিয়ে পাক খেয়ে ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল।

সেদিন রাইট ভাইয়ের তৈরি বিমান প্রথম দফায় বারো সেকেন্ড আকাশে ভেসে ছিল।

মানুষের ইতিহাসে আকাশ জয়ের নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল ওই বারো সেকেন্ড সময় নিয়ে। এ ছিল গতির যুগের শুভ সূচনা।

অরভিল নিরাপদে অবতরণ করলে আকাশে উড়লেন উইলবার। তিনি সবশুদ্ধ আকাশে ভেসে থাকলেন উনষাট সেকেন্ড, অতিক্রম করলেন ৮২০ ফুট দূরত্ব।

বাতাসের বেগ বাড়ছিল বলে সেদিন আর আকাশে ওড়া সম্ভব হয়নি।

ঐতিহাসিক ঘটনাটি এমন ভাবে ঘটল যে পৃথিবীর মানুষ তার কোন সংবাদই জানতে পারল না। কেবল কিট হক্ শহরে রটে গেল, দুজন মানুষ যাদু মন্ত্র বলে পাখির মত আকাশে উড়েছে।

সাফল্যের আনন্দের উত্তেজনা কাটিয়ে উঠতে দিন কতক লাগল। তারপর দুভাই মিলে কিছুদিনের চেষ্টাতেই আগের চাইতে অনেক বড় আর শক্তিশালী বিমান তৈরি করে ফেললেন।

এবারে তাঁরা স্থির করলেন, তাঁদের সাফল্যের কথা সমস্ত মানুষকে জানাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা আমেরিকার পত্রিকাগুলোকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের আকাশে ওড়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার জন্য।

মানুষ পাখির মত আকাশে উড়বে অধিকাংশ পত্রিকার লোকই তা বিশ্বাস করতে পারল না। তবুও কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য পত্রিকার সাংবাদিকরা নির্দিষ্ট দিনে এসে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই ছিল ঝোড়ো বাতাস। এছাড়া নতুন ইঞ্জিনটাও ঠিকভাবে কাজ করছিল না। দুর্ভাগ্যের ফেরে রাইট ভাইদের তাঁদের পরিকল্পনা বাতিল করতে হল।

রাইট ভাইদের সমস্ত প্রচারই মিথ্যা এই ধারণা নিয়ে সাংবাদিকদের সকলেই ফিরে গেলেন।

বিপর্যয়টা ছিল আকস্মিক। তাই প্রথমে অপ্রস্তুত হলেও কাটিয়ে উঠতেও সময় লাগল না। রাইট ভাইরা নতুন উদ্যমে আবার কাজে নেমে পড়লেন।

ইঞ্জিনের গোলমাল সারাই করে নিজেরাই এবারে আকাশে ওড়া অভ্যাস করতে লাগলেন। প্রচারের কথা মাথায়ও আনলেন না তাঁরা। সকলের অগোচরেই দুভাই মিলে ধীরে ধীরে আকাশে ওড়ার সময় বাড়াতে লাগলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই একমাইলের বেশি দূরত্ব বিমান নিয়ে অতিক্রম করে গেলেন তাঁরা।

বিমান নিয়ে আকাশে ওড়ার গবেষণার কাজটি রীতিমত ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই কাজ করতে গিয়ে দুই ভাই এতদিনে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। ফলে বাধ্য হয়েই উড়াউড়ির কাজ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখতে হল।

অর্থোপার্জন দরকার। দুভাই মিলে ব্যবসায়ের কাজে নেমে পড়লেন।

সময় খুব বেশি লাগল না বাজারের ধার দেনা পরিশোধ করতে। কিছু অর্থ সঞ্চয়ও হল। দুভাই মিলে আবার ফিরে এলেন নিজেদের আগের কাজে।

সেই সময় ইউরোপের কয়েকজন বিজ্ঞানী উড়ন্ত যান নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাই রাইট ভাইদের মনে আশঙ্কা ছিল, আবার কেউ না তাঁদের আগে তৈরি বিমান নিয়ে আকাশে উড়ে পৃথিবীকে চমকে দেয়। তাহলে তাঁদের সব উদ্যোগই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বঞ্চিত হবেন আকাশযান তৈরির কৃতিত্বের গৌরবে।

অবশ্য তেমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটল না। রাইট ভাইরা তাঁদের আকাশে উড়া প্রত্যক্ষ করবার জন্য এবারে সাংবাদিকদের সঙ্গে বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানালেন।

নির্দিষ্ট দিনে সকলেই উপস্থিত হয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, নিজেদের তৈরি বিমানে রাইট ভাইরা একে একে পাখির মতই স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন।

যা ছিল এতদিন অবিশ্বাস্য অসম্ভব, এতদিনে তা সফল হল। মাটির মানুষের বিজয় অভিযান সম্প্রসারিত হল আকাশে। এই বিস্ময়কর সংবাদ বাতাসের মতই আমেরিকা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ইউরোপে। চর্তুদিকে পড়ে গেল জয়জয়কার। আসতে লাগল শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন।

এবাবে রাইট ভাইরা পরিকল্পনা নিলেন আরো উন্নত ধরনের বিমান তৈরির। দেখা দিল অর্থের সমস্যা। সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দিল সিন্ডিকেট। আমেরিকান সরকারের সঙ্গে তাদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

শর্ত অনুসারে অরভিল আমেরিকায় থেকে উন্নত ধরনের বিমান তৈরির কাজে মনোনিবেশ করলেন।

উইলবার গেলেন ফ্রান্সে। সেখানে বিমানে চেপে আকাশে ওড়ার কলাকৌশল দেখিয়ে চমৎকৃত করলেন সকলকে।

ফ্রান্সেই প্রথম উইলবার একজন সহযাত্রী নিয়ে আকাশে একঘন্টা বিমান চালালেন। মানুষের আকাশ জয়ের ইতিহাসে সে-ও এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

ফ্রান্সের এক বিখ্যাত কোম্পানি উইলবারের কাছ থেকে তাঁদের আবিষ্কৃত বিমানের পেটেন্ট কিনে নিলেন বিরাট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে। এতদিনে বিমানের সুবাদে রাইট ভাইদের অর্থের সমস্যাও দূর হল।

অরভিল ছিলেন আমেরিকায়। একদিন একজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে বিমানে আকাশে ঘুরে বেড়াবার সময় দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনায় পড়লেন তিনি।

প্রপেলার ভেঙ্গে বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ল। সঙ্গী অফিসারটি দুর্ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন। অরভিল আহত হলেও প্রাণে বেঁচে গেলেন। কিছুদিনের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ উপলব্ধি করতে পেরেছে আকাশযানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনের ব্যাপকতা। সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল এরোপ্লেন কেনার জন্য। তা নিয়ে শুরু হয়ে গেল দেশে দেশে পরিকল্পনা রচনা।

রাইট ভাইদের দীর্ঘ শ্রম অধ্যবসায় ও অনুশীলনের সাফল্যের মধ্য দিযে পৃথিবীতে এল গতির যুগ।

এই গতি ত্বরান্বিত করল সভ্যতার অগ্রগতিকে। বস্তুতঃ সামগ্রিকভাবে এই অগ্রগতি সম্ভব করে তুললেন রাইট ভাইরা দুজন।

অল্পসময়ের মধ্যেই দেশে তৈরি হল বিমান তৈরির কারখানা। নতুন নতুন বিমান তৈরি হতে লাগল পূর্ণোদ্যমে। দেশের উৎসাহী তরুণদের বিমান চালনার প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন অরভিল আর উইলবার।

১৯১২খ্রিঃ উইলবার মারা গেলেন। অরভিল বেঁচে ছিলেন আরও কয়েক বছর। বিমানের উন্নতি ও উৎপাদনের কাজেই তিনি আমৃত্যু নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড



আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জনক ও এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের জন্ম ১৮৫৬ খ্রিঃ ৬ই মে অস্ট্রিয়ার মোরাভিয়া প্রদেশের ফ্রেইসবার্গ শহরে এক ইহুদী পরিবারে।

সিগমুন্ডের পিতা জ্যাকব ফ্রয়েড ছিলেন একজন পশমের ব্যবসায়ী। মা অ্যামিলিয়া ছিলেন বিদুষী।

জ্যাকবের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন অ্যামিলিয়া। সৎ ছেলেরা ছিল অ্যামিলিয়ার চাইতে বয়সে বড়। সিগমুন্ড ছিলেন তাঁর মায়ের সাতটি সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। অ্যামিলিয়া তাঁর সন্তানদের মধ্যে সিগমুন্ডকেই সব চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তাঁর ধারণা ছিল সিগমুন্ড জন্মেছেন কোন মহৎ কাজের জন্য।

পরিণত বয়সে বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী সিগমুন্ড মায়ের স্নেহ ভালবাসার কথা স্মরণ করতে গিয়ে অভিভূত হয়ে পড়তেন। তিনি বলেছেন, যে সন্তান মায়ের

স্নেহ-যত্ন বেশি লাভ করে, আপনা থেকেই তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয় যা তাকে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে সাহায্য করে।

জ্যাকব তাঁতে পশমের কাপড় বুনতেন। জীবিকার প্রয়োজনেই ভিয়েনাতে এসে পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু করেন। অস্ট্রিয়ার সবচেয়ে বড় শহর ভিয়েনা। এখানেই কেটেছে সিগমুন্ডের সারা জীবন।

আট বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে বাবার কাছেই পড়াশুনা করেন সিগমুন্ড। পড়াশুনার প্রতি ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ।

স্কুলের পড়া শুরু হয়েছিল ভিয়েনার স্পার্ল স্কুলে। প্রথম বছরের পরীক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত প্রথম স্থানটি ছিল তাঁর বাঁধা। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান সব বিষয়েই ছিল তাঁর আগ্রহ। যখন যে বই হাতের নাগালে পেতেন তাই গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। জার্মান সাহিত্য ও দর্শন তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করত।

চোদ্দ বছর বয়সেই সিগমুন্ড দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনাবলী থেকে বেশ কিছু অংশ জার্মান থেকে অনুবাদ করেছিলেন। কিশোর বয়সেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন ভবিষ্যতে বড় দার্শনিক বা মহান সাহিত্যিক হবেন।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না। পিতাকে অর্থ সাহায্য করবার প্রয়োজনে একসময় তিনি সিদ্ধান্ত নেন ডাক্তারি পড়বার। অবশ্য অন্য একটি আকর্ষণও ছিল ডাক্তারি পড়ার।

চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাধ্যমেই নতুন কিছু কাজ করবার সুযোগ রয়েছে। মৌলিক গবেষণার দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক।

তাঁর ইচ্ছায় সতেরো বছর বয়সেই জ্যাকব সিগমুন্ডকে ভিয়েনা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

স্থানীয় খ্রিস্টান ধর্মাভিলম্বীদের মধ্যে সেই সময় ইহুদী বিদ্বেষ ক্রমশই ছড়াতে শুরু করেছে। ফলে ক্লাশে সহপাঠীদের ব্যবহারে খুবই আঘাত পেতেন সিগমুন্ড। ক্লাসের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ইহুদী।

অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য ও অপমান সত্ত্বেও নিজের ধর্মের প্রতি কখনও বিশ্বাস হারাননি সিগমুন্ড।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্লাশে পড়াশুনা করতে করতেই সিগমুন্ডের মাথায় আসে মানুষের দেহের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশুনা করবেন। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আলাদা কোন বিভাগ সেই সময় ছিল না ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ভিয়েনার সর্বশ্রেষ্ঠ শরীরতত্ত্ববিদ রবার্ট মেয়র ছাত্র ব্রুকে ছিলেন মেডিকেল কলেজের শরীরতত্ত্বের অধ্যাপক। সিগমুন্ড অল্পদিনেই হয়ে উঠলেন তাঁর প্রিয়

ছাত্র। শরীরতত্ত্ব বিষয়ে এমনই আগ্রহ জন্মাল সিগমুন্ডের যে ব্রুকের গবেষণাগারেই বেশির ভাগ সময় কাটতে লাগল তাঁর। ফলে কলেজের পাঁচ বছরের পাঠ্যসূচী শেষ করতে তাঁর লাগল আট বছর।

এই সময়ের মধ্যে আরও একটি কাজ করেন সিগমুন্ড। স্নায়ুতন্ত্রের ওপরে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করে নিজের মৌলিক চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৮৮১ খ্রিঃ সিগমুন্ড এম. ডি. উপাধি নিয়ে কলেজ থেকে বেরলেন। সেই সময় তাঁর বয়স পঁচিশ।

অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনের কথা ভেবেই ডাক্তারি পড়তে এসেছিলেন সিগমুন্ড। তাই পাশ করে বেরিয়েই ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালে ইনটার্নি হিসেবে যোগ দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই হলেন জুনিয়ার ডাক্তার।

হাসপাতালে বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ থিওডর মেনারেত-এর অধীনে থেকে সিগমুন্ড মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর গবেষণা আরম্ভ করলেন।

ইতিপূর্বে অধ্যাপক ব্রুসের সহকারী হিসেবে স্নায়ুতন্ত্রের ওপরে তিনি কাজ করেছিলেন। মাছের স্নায়ুতন্ত্রের ওপরে তাঁর কাজ ব্রুসের প্রশংসা লাভ করেছিল। কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিভা, মেধা ও নিষ্ঠা বলে তিনি মেনারেত-এরও প্রশংসা অর্জন করলেন।

ভিয়েনা হাসপাতালে কাজ করবার সময়েই সিগমুন্ড বিয়ে করলেন মার্থা বার্নেসকে। বিয়ের পর স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করলেন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে।

ইতিপূর্বে ভিয়েনা শহরে স্নায়বিক রোগের কোন চিকিৎসাকেন্দ্র ছিল না। সিগমুন্ডই তা প্রথম চালু করলেন। দেখতে দেখতে পসারও জমে উঠল। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

সিগমুন্ডের এই প্রতিষ্ঠা ভিয়েনার চিকিৎসক-সমাজের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠল। তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হতেও বিলম্ব হল না।

রুগীরা যাতে তাঁর কাছে না আসে তার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করা হতে লাগল।

ডঃ শার্কের কাছ থেকে সিগমুন্ড সম্মোহন বিদ্যা শিখে এসেছিলেন। রুগীদের রোগ বিশ্লেষণের জন্য তা প্রয়োগ করা হতো। অনেকেই দেখা গেল বিষয়টাকে মেনে নিতে পারছিলেন না।

সিগমুন্ডের প্রাক্তন শিক্ষক থিওডর মেনারেতও তাঁকে তিরস্কার করে চিঠি লিখলেন।

কর্মজীবনের শুরুতেই সিগমুন্ডকে এভাবে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হল যা ছিল অপ্রত্যাশিত। কিন্তু তিনি এতে বিচলিত হলেন না। তিনি আরো মনোযোগ

সহকারে রুগীর চিকিৎসা করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে তাঁর গবেষণার কাজও চালিয়ে যেতে লাগলেন।

সিগমুন্ডের গবেষণার বিষয় ছিল হিস্টিরিয়া রোগের উৎস, প্রকৃতি ও তার নিরাময়ের পন্থা। তাঁর এই গবেষণা চলল দীর্ঘ দশ বছর ধরে।

ব্রুয়ের নামে এক চিকিৎসক ইতিপূর্বে বেশ কিছু মানসিক রুগীকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। একসময় তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এলেন সিগমুন্ডের সহযোগিতায়। দুজনে যুগ্মভাবে গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন।

দুজনের সম্মিলিত গবেষণার ফলাফল নিয়ে ১৮৯৫ খ্রিঃ প্রকাশিত হল Studies in Hysteria নামে একটি বই।

মনস্তত্ত্বের চিকিৎসার জগতে এই বই এক নতুন জগতের সন্ধান এনে দিল। এতেই প্রথম প্রকাশিত হল মানুষের অবচেতন মনের অস্তিত্বের কথা। যা স্নায়ুসংক্রান্ত যাবতীয় রোগের মূল কারণ।

সিগমুন্ড মনোরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারণার উদ্ভাবন করলেন। তার নাম তিনি দিলেন Psychoanalysis বা মনঃসমীক্ষণ।

সিগমুন্ড তাঁর বইতে বললেন, মানুষের মনের স্তর দুইটি, একটি চেতন অপরটি অবচেতন।

শৈশব থেকেই মানুষের অহংবোধ বা ইগো কোন কারণে অবদমিত হলে তার যৌনকামনা অনেকাংশে মনের চেতন স্তর থেকে অবচেতন স্তরে সংগুপ্ত হয়। এর ফলেই দেখা দেয় মানসিক বিকার।

শিশুর মধ্যে যে যৌনবোধ থাকে তা-ই অবদমিত হয়ে পরবর্তীকালে মনোরোগের সৃষ্টি করে।

মোটকথা সিগমুন্ড মানুষের মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার যৌনবোধকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি বললেন, 'আমরা ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখি, প্রায় সময়ই ঘুমভেঙ্গে তা আর মনে থাকে না। কিন্তু এই স্বপ্নই হল মানুষের মনের চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন। মনের অবদমিত ইচ্ছা বা কামনা-বাসনার প্রভাব থেকেই স্নায়ু অসুস্থ হয়ে রোগ দেখা দেয়।

রুগী সজ্ঞান বা অজ্ঞান অবস্থায় (হিপ্নোটাইসড) মনের সমস্ত কথা চিকিৎসকের কাছে প্রকাশ করেন। এই সময় তার মনের অবচেতন স্তরের কামনা-বাসনার কথাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাকে বিশ্লেষণ করেই চিকিৎসক রুগীর চিকিৎসা করেন এবং নিরাময় করে তোলেন।'

সম্পূর্ণ নতুন কথা বলেই সিগমুন্ডের অভিমতের সঙ্গে কোন চিকিৎসকই একমত হতে পারলেন না। তাঁর বক্তব্যকে বিকৃত চিন্তাভাবনা বলে কঠোরভাবে সমালোচনা করতে লাগলেন।

কিন্তু আবিষ্কৃত সত্য সম্পর্কে সিগমুন্ডের ছিল গভীর বিশ্বাস। তাই অতটুকু বিচলিত হলেন না।

নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি একের পর এক বই লিখে চললেন। এগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতা, গভীর জ্ঞান ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা।

১৯০০ খ্রিঃ থেকে ১৯৩২ খ্রিঃ পর্যন্ত সব মিলিয়ে এগারোটি বই সিগমুন্ড লিখেছিলেন।

ভিয়েনার চিকিৎসক সমাজ বিরূপ সমালোচনা করলেও কয়েকজন তরুণ চিকিৎসাবিজ্ঞানীকে সিগমুন্ডের মতবাদ আকৃষ্ট করল। এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরা হলেন, হ্যাস্ক, সেটকন, অ্যাডনার গ্রাফ, ইয়ং প্রমুখ।

সিগমুন্ডের ফ্রয়েডিয় মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব উত্তরকালে এই বিজ্ঞানীদের দ্বারাই বিকশিত ও বিস্তৃত হয়েছে।

বিশ্বে মানুষের চিন্তা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যে কয়েকটি বই তার মধ্যে অন্যতম হল ফ্রয়েডের Interpretation of Dream।

এটি প্রকাশিত হয় ১৯০০ খ্রিঃ। মানুষের স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েড তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ও বিচার বিশ্লেষণ এই বইতে প্রকাশ করেছেন।

ইতিপূর্বে স্বপ্ন বিষয়ে চিকিৎসকদের কোন প্রকাব ধারণাই ছিল না। তাঁরা এটাকে অবাস্তব কোন কল্পনা বলেই মনে করতেন।

ফ্রয়েড এই প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করে স্বপ্নের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন। মনোরোগের ক্ষেত্রে স্বপ্নের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি সুচিন্তিত পথ নির্দেশ করলেন।

ফ্রয়েডের মতবাদ স্বাভাবিকভাবেই দেশে বিদেশে বিতর্কের সূচনা করল। বিশিষ্ট পন্ডিতরা এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা আরম্ভ করলেন। এই সুবাদে তাঁর খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর নানা দেশে। ইতিমধ্যে ফ্রয়েড আরও কয়েকটি বই প্রকাশ করলেন। সেগুলো হল The Psychology of everyday life and its relation to the unconscious (১৯০৪ খ্রিঃ), The three contribution to the theory of sexuality (১৯০৫ খ্রিঃ)।

মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য ফ্রয়েড ১৯০৯খ্রিঃ আমেরিকার ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেলেন। শিষ্য ইয়ংকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আমেরিকা গেলেন। তাঁর বক্তৃতা গুণীজন সমাবেশে সমাদৃত হল, মতবাদ অভিনন্দিত হল বিপুলভাবে।

ফ্রয়েডের মতবাদের গভীরতা মুক্ত মনে প্রথম উপলব্ধি করতে পারল আমেরিকা। ধর্মীয় ও মানসিক গোঁড়ামি বাধা হয়ে উঠল না।

ফ্রয়েড মানুষের যৌনবোধের ওপরেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অবদমিত যৌন কামনাই যে অধিকাংশ মনোরোগের কারণ, মনোরোগের ক্ষেত্রে যৌনতার এই গুরুত্ব মনোবিজ্ঞানীরা প্রথমে স্বীকার করতে না চাইলেও ধীরে ধীরে তাঁরা তা উপলব্ধি করতে পারলেন এবং ফ্রয়েডের মতবাদ বিভিন্ন দেশের পন্ডিতরা মেনে নিলেন। এবিষয়ে গবেষকরাও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

মতবাদের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই এল পুরস্কার। ১৯৩০ খ্রিঃ ফ্রয়েড পেলেন ল্যোনে পুরস্কার। ১৯৩২ খ্রিঃ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে রোগ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করল।

লন্ডনের রয়াল সোসাইটি ১৯৩৬ খ্রিঃ তাঁকে সদস্য নির্বাচিত করে স্বীকৃতি ও সম্মান জানাল।

ব্যক্তিগত জীবনে ফ্রয়েড ছিলেন উদার ও নিরহংকার প্রকৃতির মানুষ। শিশু, বৃদ্ধ, পন্ডিত, মূর্খ সকলের সঙ্গেই তিনি সহজ ভাবে মিশতে পারতেন।

এমন কি মতবাদ সংক্রান্ত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও অনেকের সঙ্গেই তাঁর ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

১৯১৩ খ্রিঃ জার্মানিতে হিটলার ইহুদী নির্যাতন আরম্ভ করলে ফ্রয়েড বন্ধুদের পরামর্শ সত্ত্বেও অস্ট্রিয়া ত্যাগ করতে রাজি হননি। নাৎসীবাহিনী তাঁর বই পুড়িয়ে, সম্পত্তি লুঠ করেছে। ল্যাবরেটরি ভেঙ্গে নির্যাতনের চূড়ান্ত করেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি হয়েছেন গৃহবন্দী।

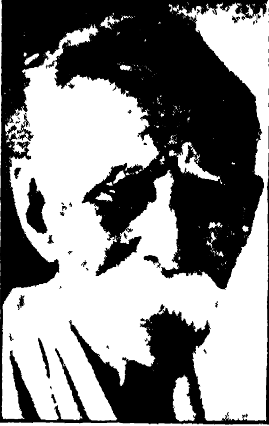
নাৎসী নেতাদের কাছে তাঁর বন্ধুবান্ধবরা আবেদন জানালে নাৎসী সরকার কুড়ি হাজার পাউন্ড মুক্তিপণ দাবি করে।

গ্রীসের রাজকুমারী এই অর্থ প্রদান করে তাঁর গুণগ্রাহিতার ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। ফ্রয়েডকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইংলন্ডে। এইসময় তাঁর বয়স বিরাশি।

১৯৩৯ খ্রিঃ ২৯ শে সেপ্টেম্বর লন্ডনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিজ্ঞান-তাপস সিগমুন্ড ফ্রয়েড।

তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই শুরু হয়েছিল ভয়ঙ্করী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

দাদাঠাকুর



দাদাঠাকুর ছিলেন এমন এক বিরল চরিত্রের মানুষ। তাঁর প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্মানবোধ ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা আদর্শরূপে স্বীকৃত।

দাদাঠাকুরের আসল নাম ছিল শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। বাংলা ১২৮৮ সালের ১৩ই বৈশাখ মুর্শিদাবাদ জেলার অখ্যাত অবজ্ঞাত দরফপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। শৈশবেই তিনি পিতা-মাতাকে হারান। কিন্তু তাঁর পিতৃব্য রসিকলাল তাঁকে কোনদিনই তাঁদের অভাব বুঝতে দেন নি।

একদিকে তাঁর স্নেহ-ভালবাসা, অন্যদিকে তাঁর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শাসনের মধ্য দিয়ে বালক শরৎচন্দ্র বেড়ে উঠতে লাগলেন।

সাতবছর বয়সে পিতৃব্য রসিকলাল বালক শরৎচন্দ্রকে জঙ্গীপুর হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন। আর্থিক অসঙ্গতির জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁকে অর্ধেক বেতনে পড়ার সুযোগ করে দেন।

ছাত্রজীবনেই বালক শরৎ চন্দ্রের মধ্যে কবিত্ব-প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে দেখা যায়। ছাত্রাবস্থাতেই তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করে তিনি সহপাঠী ও শিক্ষক মশাইদের বিস্ময়ের কারণ হন।

একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়ে এক পঙ্গুলোকের দেখা পান। লোকটা কাঠের পায়ের সাহায্যে কোনরকমে পথ পাড়ি দিচ্ছে। শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের পা দুটো ছিল নগ্ন।

পঙ্গু লোকটাকে দেখে শরৎচন্দ্রের মনে অনুশোচনা ও ব্যথার উদ্রেক হ'ল। সে মুহূর্তেই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, জীবনে কোনদিন জুতো পায়ে দেবেন না। পরিণত বয়সে তিনি লাট সাহেবের দরবারে, জমিদার ও সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তি প্রভৃতি সবার কাছেই নগ্নপায়ে যাতায়াত করতেন। এ কাজে তিনি কোনদিনই এতটুকু কুণ্ঠিত বা সঙ্কোচ বোধ করতেন না।

শরৎচন্দ্র আমৃত্যু একই সাদামাঠা পোশাক—হাঁটুর ওপরে ধুতি, ফতুয়া বা একটি মাত্র উত্তরীয় ছিল তাঁর সম্বল। লাট সাহেব থেকে আরম্ভ করে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সকলের সঙ্গে এ পোশাকে নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করেছেন। অন্যান্য অধিকাংশ বাঙালীর মত অনুকরণপ্রিয়তা দোষ তাঁর আদৌ ছিল না। বাইরে ও

ভেতরে তিনি ছিলেন যথার্থই একজন খাঁটি বাঙালী। কিন্তু সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খাঁটি ইওরোপিয়ানদের মতই সচেতন।

গ্রামের বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে শরৎচন্দ্র ভর্তি হলেন বর্ধমান রাজ কলেজে। সেখানকার পাঠ শেষ করে ফিরে এলেন জঙ্গীপুরের বাড়িতে। এবার দু'পয়সা রোজগারের চিন্তা করা দরকার। কলকাতার এক ছাপাখানার সরঞ্জাম বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে ছোট্ট একটা ছাপার মেশিন ক্রয় করলেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে, ১৯০২ সালে তিনি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করলেন। নাম দিলেন পণ্ডিত প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ।

পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র তাঁর ছাপাখানার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন—'আমার ছাপাখানার আমিই প্রোপ্রাইটর, আমি কম্পোজিটর, আমি প্রুফ রিডার আর আমি ইঙ্ক-ম্যান। কেবল প্রেস-ম্যান আমি নই। সেটি ম্যান নয়—উওম্যান অর্থাৎ আমার অর্ধাঙ্গিনী। ছাপাখানার কাজে ব্রাহ্মণী আমাকে সাহায্য করেন, স্বামী-স্ত্রীতে আমরা ছাপাখানা চালাই।' শরৎচন্দ্রের ছাপাখানায় নিমন্ত্রণপত্র, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, উপহারপত্র এবং হ্যান্ডবিল জাতীয় যাবতীয় কাজ ছাপা হতে লাগল। প্রেস চালাবার ফাঁকে তিনি সাধ্যমত পরোপকারও করতেন। তার এক কর্মচারী ছিল বোবা-কালা।

শরৎচন্দ্র কারো কাছেই কোনদিন মুখ ফুটে কিছু চাইতেন না। মানুষ তো নয়ই, এমন কি দেবতার কাছেও কিছু চাওয়া ছিল তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। দেবতাদের যা দেবার তাতো জন্মকালে একবারেই দিয়ে দিয়েছেন হাত, পা, চোখ, কান ও মুখ প্রভৃতি। মানুষ যদি সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজন মেটাতে না পারে তার জন্য দায়ী দেবতারা নয়, মানুষ নিজে। জ্ঞান হবার পর থেকে তিনি কোনদিন সরস্বতীর অঞ্জলি দেন নি। তবে কি তিনি নাস্তিক ছিলেন? অবশ্যই না। পূজান্তে অঞ্জলি দেবার সময় 'দেহী' বলতে হবে বলেই তিনি এ কাজ থেকে দূরে সরে থাকতেন।

বিপ্লবী নালিনীকান্ত সরকার দীর্ঘদিন শরৎচন্দ্রের আশ্রয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। তাঁকে প্রেসের কাজে সাহায্য করতেন। তিনি বলেছেন, 'একবার দাদাঠাকুরের একটি ছেলের ভীষণ অসুখ করে। বাঁচার সম্ভাবনা কম। তাঁর সহধর্মিনী দুর্গাপ্রতিমা দর্শন করে এসে দাদাঠাকুরকে বললেন—ছেলের অসুখের জন্য মায়ের কাছে মানত করে এলাম। মাকে বললাম, মা আমার ছেলেকে ভাল করে দাও, আসছে বছর তোমার ভোগ দেব।' শুনে দাদাঠাকুর ব্রাহ্মণীকে বললেন—'যিনি নিজের ছেলের শুঁড় ভাল করতে পারেন না, তিনি তোমার ছেলের কি করবেন?'

শরৎচন্দ্র এবার 'জঙ্গীপুর সংবাদ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন যাতে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী ছাপা হ'ত

পত্রিকাটির সম্পাদক তিনিই ছিলেন, আর তিনিই ছিলেন কম্পোজিটর ও প্রেসম্যান যা একেবারেই কল্পনাতীত।

পত্রিকাটি ছাপাবার জন্য একটি নতুন ছাপার মেশিন কিনতে গিয়ে এক ইংরেজ দোকানীর মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর বিচিত্র পোশাক দেখে সাহেব তো হেসেই খুন। তার ওপর কাঁধে একটি টিনের চোঙ ঝুলিয়ে রাখতে দেখে আরও বেশী করে তাঁর হাসির উদ্রেক হ'ল। চোঙটির প্রসঙ্গে সাহেব প্রশ্ন করলে তিনি ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিতে গিয়ে সেটার মুখ খুলে তার ভেতর থেকে ধূমপানের সরঞ্জামাদি বের করতে করতে বল্‌লেন—'এতে আমার জাতীয় স্মোকিং অ্যাপারেটাস রয়েছে।' এবার তার ভেতর থেকে একটি হুকো, কল্কে, চকমকি পাথর, টিকে ও কিছু তামাক বের করলেন। তারপর কল্কে সাজিয়ে চেয়ারের ওপর পা তুলে বিচিত্র ভঙ্গিতে বসে মৌজ করে ধূমপান করতে লাগলেন। সাহেব ভদ্রলোক তো সবিস্ময়ে তাঁর কান্ড দেখতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্র কর্তব্য সম্বন্ধে খুবই সজাগ ছিলেন। নইলে গলা সমান জল ভেঙ্গে স্কুলের প্রশ্নপত্র পৌঁছে দিতে কখনই উৎসাহী হতেন না।

শরৎচন্দ্র ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরাজী শিক্ষার মুশকিল আসান করতে গিয়ে চমৎকার এক পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। ফার্স্টপারসন্, সেকন্ড পারসন্ ও থার্ড পারসনের মধ্যে বাক্যে কোন্‌টি আগে বা পরে বসবে সে বিষয়ে একটি চমৎকার ছড়া লিখলেন—"আমি, তুমি এবং তিনি যদি একই ক্রিয়ার কর্তা হন

বিপদকালে মনে রেখো হও।"—অর্থাৎ প্রথমে সেকন্ড পারসন্, পরে থার্ড পারসন্ ও সব শেষে ফার্স্ট পারসন্ বসবে।

পাংচুয়েশন্ সম্বন্ধে তিনি লিখলেন—

মন, শুনরে পাংচুয়েশান/ আই অ্যাম্ ভেরী বোল্ড/ টু পাংচুয়েট হাউসহোল্ড,/ সহজ উপায় বের করেছি যখন/ কমা বসাইবে মাউন্ট এ সাইড-এ,. কমা বসাইবে স্মিট্-এ ওয়াইড-এ. গ্রীমেতে কোলন ড্যাসের সহিতে, সী-এ ফুলস্টপ জানে সর্বজন। .... ইত্যাদি।

অঙ্ক শেখার চমৎকার যে ছড়াটি তখনকার দিনে ছাত্রদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতো তা হচ্ছে—"কোটি লক্ষ হাজার শত/ লিখে রাখো মনের মত।/ ফি ঘরেতে জোড়া জোড়া/ শতের ঘরে এক।/ ডাইনে দুটো শূন্য দিয়ে/ মজা করে দেখ।"

শরৎচন্দ্রের তাৎক্ষণিক কবিতা রচনার ক্ষমতা দিল অসাধারণ। একবার গুরুসদয় দত্ত-র সঙ্গে এক উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁর চিরাচরিত পোশাক পরে গেলেন। সভায় স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর সভাপতিত্ব করছেন। বহু রাজা জমিদারও সভায় উপস্থিত। কেতাদুরস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পাশে এমন এক বিচিত্র পোশাক পরা গেঁয়ো প্রৌঢ়কে দেখে উপস্থিত সবাই তো রীতিমত নাক সিঁটকাতে লাগলেন। তিনি

নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ভাষণের শুরুতে তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করে শোনালেন—

'আই অ্যাম কামিং ফ্রম্ মুর্শিদাবাদ/ বাট নট ফ্রম বারহাম্ পোর,/ হ্যাড আই কাম ফ্রম দ্যাট ভেরী প্লেস/ অল মাইট হ্যাভ শাট্ আপ দ্য ডোর,/ দে মাইট হ্যাড্ থট্ দ্যাট্ হ্যাভ কাম/ ফ্রম দ্য ফেমাস্ অ্যাসাইলাম্,/ আই অ্যাবোড ইন সাচ এ প্লেস/ হুইচ ইজ নাউ ইন্ ফুল ডিসট্রেস্। ..... দ্য ম্যাজিস্ট্রেট হ্যাজ ইন্ভেন্টেড মি/ টু এন্টারটেন্ ইওর এক্সেলেন্সি।/

শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন যথার্থ সমাজসংস্কারক। সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা 'পণপ্রথা'-র বিরুদ্ধে তিনি আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন। তিনি বহু কবিতা লিখে, ছাপিয়ে এ-কুপ্রথার বিরুদ্ধে কঠিন কুঠারাঘাত করেছেন। বিদূষক পত্রিকার এক জায়গায় পণপ্রথার কুফল সম্বন্ধে লিখেছেন—শাশুড়ির উক্তি—"কী কুক্ষণে লক্ষ্মীছাড়া/ ঢুকলি এসে আমার ঘর/ স্কন্ধে চেপে আসার পরে/ সোনার ছেলে করলি পর।"

বধূর উক্তি—"নিজের মন্দ নিজেই করেছ/ ঝগড়ার কোন নাহিকো ফল/ কি আর হইবে বল মিছামিছি/ গোড়া কেটে দিয়ে আগায় জল/ জন্ম হইতে কলেজ ঘরটা/ হিসাব করিয়া চার হাজার,/ বাবার নিকটে নিয়েছ গুনিয়া/ পুত্রে দাবী কেন আবার?

পণপ্রথার কুফল সম্বন্ধে তিনি আর এক কবিতায় লিখেছেন—"তুমি প্রভু, আমি দাসী/ আমি স্ত্রী, তুমি স্বামী,/ কারণ, তোমার বাবা মহাজন,/ আর আমার বাবা আসামী,/ ... অন্ন নাই মোর বাপের ঘরে,/ তবু এলাম কত গয়না পরে,/ ... পেয়েছিলে উচ্চশিক্ষা/ শ্বশুরকে করাতে ভিক্ষা,/ এই হৃদয়ে গর্ব করো/ বল—এম.এ., বি.এ. পাশ আমি।"

কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে 'গল্পদাদুর আসর'-এ শরৎচন্দ্র লিখিত গল্প ও হাস্যরস-সিক্ত ঘটনা পরিবেশন করতেন। তাঁর একদিনের অনুষ্ঠানের কথা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে শিশুদের আনন্দ দিতে গিয়ে তিনি বললেন—"প্রঃ- সংসারটা কার বশ?/ উঃ সংসার টাকার বশ।/ প্রঃ রাম-রাবণের যুদ্ধের কারণ জান কি?/ উঃ- রাম-রাবণের যুদ্ধের কারণ জানকী।/ কে সব দেবতাদের মধ্যে পালনকর্তা?/ কেশব দেবতাদের মধ্যে পালনকর্তা।/ প্রঃ- মাসী কি দিয়েছে?/ মা সিকি দিয়েছে।/ প্রঃ- এই শিল্পকর্ম কারকৃত?/ এ শিল্প কর্ম-কারকৃত।/ প্রঃ- অরুচি হলে নিম কি রুচিকর?/ উঃ- অরুচি হলে নিমকি রুচিকর।/ .... প্রঃ বড় দিনে ভেট কি দিলে?/ উঃ বড়দিনে ভেটকি দিলে।"

শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন যথার্থ পরোপকারব্রতী। অপরের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার নেশা তাঁর অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। দরিদ্রকে ঘৃণা করা, অবজ্ঞার

চোখে দেখা সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের ধর্ম। তিনি কখনই এমন অসঙ্গত অশোভন আচরণ বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাইতো কার্ত্তিক নামধারী এক তেলেভাজার দোকানিকে স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কমিশনারের অপমান করার প্রতিবাদে তিনি কার্ত্তিককেই ওই কমিশনারের বিপক্ষে ভোটে দাঁড় করালেন। শরৎচন্দ্র-র বুদ্ধি কৌশল, অক্লান্ত পরিশ্রম, মানসিক দৃঢ়তাই শেষ পর্যন্ত কার্ত্তিক'কে ভোটে জিতিয়ে দিল। সে সময় তিনি 'ভোটরঙ্গ' নামে একটি গান রচনা করলেন। সুর দিলেন, বিপ্লবী নলিনীকান্ত। পাড়ার ছেলে-বুড়ো দলবেঁধে সে গান গেয়ে কার্ত্তিক-এর হয়ে ভোটের প্রচার করল। গানটির কিয়দংশ উল্লেখ করা হল—"ভোট দিয়ে যা—/ আয় ভোটার আয়!/ মাছ কুটলে মুড়ো দিব,/ গাই বিয়োলে দুধ দিব,/ দুধ খেতে বাটি দিব/ সুদ দিলে টাকা দিব/ ফি দিলে উকিল হব,/ চাল দিলে ভাত দিব/ মিটিংয়ে যাব না, অবসর পাব না/ কোন কাজে লাগব না,/"

কলিকাতার রাস্তাগুলির অদ্ভুত অদ্ভুত নামকরণকে বিষয়বস্তু করে তিনি রচনা করলেন, 'কলকাতার ভুল' নামে এক মনোজ্ঞ কবিতা। তিনি লিখলেন—

"সরি হায়রে/ কলকাতা কেবল ভুলে ভরা/ সেথায় বুদ্ধিমানে চুরি করে/ বোকায় পড়ে ধরা।।/ আজকাল কলকাতাতে/ সব কথাতে/ দেখছি ভারি ভুল/ ...ভাবলাম, কলুটোলায় ফুল আছে/ দেখি, কলুর বলদ বদ্যি সেথায়/ করে তেল আমদানি!/ ....নাইকো হাতী নইকো বাগান/ হাতীবাগান বলে/ বাদুড়বাগানেতে দেখি/ বাদুড় নাহি ঝোলে/ .... একটা সাঁকো নাইকো সেথায়/ জোড়াসাঁকো নাম,/ সেথা দিনে রাতে রবির উদয়/ দেখে আসিলাম"।

এরই কিছুদিন পর শরৎচন্দ্র 'কলকাতার মেদ' নামে আর একটি ছড়া-কবিতা তাঁর বোতলপুরাণে লিখলেন। নাম দিলেন 'আত্মঘাতী দেবশর্মা'। ছড়া-কবিতাটির কয়েকটি ছত্র উল্লেখ করা হ'ল—"মনের দুঃখে কলকাতা কেঁদে বলে ভাই!/ আমার মধ্যে ভুল পেলে, ভুল/ আর কি কোথাও নাই?/ কলকাতার ভুল লিখলেন যিনি/ আমি বলি তাকে,/ রাগ কোরো না দাদাঠাকুর/ পার্সোনাল অ্যাটাক!/ আকাশেতে শরৎচন্দ্র/ দেখছি তো সবে—/ মলিন বেশে খালি পায়ে নেমে এলে কবে?/...চাল ফুরালে 'দানাপুরে'/ যোগাড় কর দানা?/ খানা জংশানেতে আসি/ পাকাও বুঝি খানা?/ ডাল ফুরোলে 'ডোমজুড়েতে'/ কিনে নিয়ে ঝুড়ি/ 'বুট' পরে আর 'মটর' চড়ে/ চল কি 'মসুরী'।"

শরৎচন্দ্র নিজের জন্য জীবনে কোনদিন কারো কাছ থেকেই কিছু হাত পেতে গ্রহণ করেন নি। একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন তখন এক রকম জোর করেই তাঁকে একটি হগিং লাইসেন্স করে দিয়েছিলেন। যে কয়জন বিরল ব্যক্তিত্বের জীবিতকালেই তাঁদের জীবনকথা নিয়ে চলচ্চিত্র রচিত হয়েছে, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত তাঁদের মধ্যে একজন। ১৩৭৫ সালের ১২ই বৈশাখ এই মহাত্মা যাবতীয় দুঃখ দারিদ্র্যের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর



ব্রাহ্মসমাজের নেতা, বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক, চিন্তাবিদ। 'আচারে আচরণে এবং পোশাকে আহারে তিনি 'ছিলেন নিজের যুগের একজন পরিপূর্ণ স্বাদেশিক মানুষ।

জোড়াসাঁকোর প্রখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮১৭ খ্রিঃ দেবেন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন স্বনামধন্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবন কাটে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ও হিন্দু কলেজে।

অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে পাঠকালে ১৮৩১ খ্রিঃ থেকে কয়েক বছর পিতার ব্যবসায় দেখাশোনার কর্তৃত্ব পেয়ে বিলাসী হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৩৫ খ্রিঃ পিতামহীর মৃত্যুর পর আকস্মিকভাবে তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। মনে ধর্মজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে। ঈশ্বর লাভের উপায় জানবার উদ্দেশ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম ও দার্শনিক গ্রন্থাদি পাঠ করতে থাকেন এবং ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য সর্বতত্ত্বসভা স্থাপন করেন। সভার দ্বিতীয় অধিবেশনেই নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় তত্ত্ববোধিনী সভা।

১৮৪০ খ্রিঃ এই সভার অংশ হিসাবে স্থাপিত হয় তত্ত্ববোধিনী-পাঠশালা। বিনা বেতনে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়া এই পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল।

পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন কৈশোরেই। অচিরেই রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বিদ্যাবাগীশের নিকট ২০ জন বন্ধুসহ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হন। এভাবেই দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার জীবন আরম্ভ হয়।

১৮৪৬ খ্রিঃ বিলাতে পিতার মৃত্যু হলে তিনি অপৌত্তলিক মতে পিতৃশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করেন।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর দুটি প্রতিষ্ঠান কার টেগোর কোম্পানি ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক উঠে যায়। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে পিতার প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য সুদ সমেত ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা District Charitable Society কে দান করেন।

১৮৬০ খ্রিঃ দেবেন্দ্রনাথ আচার্য হিসাবে ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসেন। কেশবচন্দ্র তাঁর কাছেই দীক্ষিত হন।

হিন্দুমতে পূজাপার্বণাদি বন্ধ করে তিনি প্রবর্তন করেন মাঘোৎসব—১৬ই মাঘ, নববর্ষ—১লা বৈশাখ, দীক্ষাদিবস—৭ই পৌষ ইত্যাদি নতুন কতগুলি উৎসব।

তাঁর অর্থানুকূল্যে কেশবচন্দ্রের পরিচালনায় ও মনোমোহন ঘোষের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে সুখ্যাত Indian Miror পত্রিকা।

সমাজ সংস্কারমূলক বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধ উপস্থিত হলে কেশবচন্দ্র তাঁকে ত্যাগ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে নতুন সমাজ গঠন করেন ১৮৬৬ খ্রিঃ। দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত সমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়।

ব্রাহ্মধর্মের মূল লক্ষ ছিল, খ্রিস্টানধর্মের প্রভাব থেকে দেশীয় যুবকদের রক্ষা করা। এই কাজের জন্য তৎকালীন হিন্দুসমাজের সমাজপতি রাধাকান্তদেব দেবেন্দ্রনাথকে জাতীয়ধর্মের পরিরক্ষক উপাধি দেন। ১৮৬৭ খ্রিঃ তিনি ব্রাহ্মগণ কর্তৃক মহর্ষি উপাধিতে ভূষিত হন।

১৮৭৬ খ্রিঃ বীরভূমের ভুবনডাঙায় একটি বিশাল ভূমিখন্ড কিনে সেটিকে আশ্রমে রূপান্তরিত করে নাম দেন শান্তিনিকেতন।

এইস্থানই আজ বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ভূমি এবং রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত স্থান।

সমাজসংস্কারমূলক সকল কাজের সঙ্গেই দেবেন্দ্রনাথের আত্মিক যোগ ছিল। তিনি ছিলেন হিন্দু চ্যারিটেবল ইনসটিটিউশনের অন্যতম স্থাপয়িতা।

বিধবাবিবাহ প্রশ্নে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের উৎসাহী সমর্থক। তিনি বাল্য ও বহুবিবাহের বিরোধী ছিলেন। কিছুদিন রাজনীতিতেও অংশ নেন।

বৃটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটির তিনি প্রথম সম্পাদক হন। নারীশিক্ষায় অগ্রণী সংস্থা বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে প্রকাশ করেন কঠোপনিষদের বাংলা অনুবাদ। পরে বেদচর্চার জন্যও সবিশেষ সচেষ্ট হন।

সাহিত্যপ্রিয় দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রীতির নানা প্রমাণ বর্তমান। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি ১৮৪৮ খ্রিঃ থেকে ঋকবেদের অনুবাদে ব্রতী হন এবং এই কাজে চব্বিশ বছর নিযুক্ত থাকেন।

ব্রাহ্ম ধর্ম, Vedentic Doctrines Vindicated,জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি, পরলোক ও মুক্তি, ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী, জীবনচরিত তাঁর সাহিত্য প্রতিভার উদাহরণ।

বাংলায় সাহিত্য সংস্কৃতিতে নব ভাবনা ও আবেগের মিলন মেলা তাঁরই আশীর্বাদপূত হয়ে স্থাপিত হয় হিন্দুমেলা বা চৈত্রমেলা।

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ভ্রমণকারী আধ্যাত্মিক। বিষয়কর্মের বন্ধন ছাড়িয়ে প্রায়ই হিমালয়ের নির্জনতায় চলে যেতেন। সিংহল সহ তিনি চীন ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করেন।

১৯০৫ খ্রিঃ ১৯শে জানুয়ারী দেবেন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হন।

নস্ত্রাদামুস



বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতদ্রষ্টা রূপে বর্ণিত বিশিষ্ট চিন্তাবিদ নস্ত্রাদামুস ১৫০৩ খ্রিঃ ২৩ শে ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্রভাসের সেন্ট মেরি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তিনি লাতিন, হিব্রু, গ্রীস প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যৌবনারম্ভের আগেই। জ্যোর্তিবিদ্যা এবং চিকিৎসা বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতাও ছিল বিস্ময়কর। তিনি প্লেগ নিরাময়ের ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন বলে জানা যায়।

অল্প বয়স থেকেই বিচিত্রভাবে আগামী দিনের বর্ণনা করতে পারতেন নস্ত্রাদামুস। পরবর্তিকালে এই রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণীর সূত্রেই তিনি হয়ে ওঠেন কিংবদন্তি পুরুষ।

তাঁর চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যৎ-বাণীগুলো আরম্ভ হয় ১৫৫৭ খ্রিঃ থেকে যখন তাঁর বয়স ৪৪ বছর। আগামী কয়েক শতকের বিশেষ বিশেষ ঘটনার কথা তিনি আগাম লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী চার লাইনের কবিতায় রচিত। লে পেফেটিস ডে মিশেল ডে নস্ত্রাদামুস (Prophecy of Nostradamus) গ্রন্থের দশটি খন্ডে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বিধৃত।

১০৪ পংক্তিতে ২৬টি কবিতা দিয়ে এক একটি খন্ড রচিত। জীবিতকালের মধ্যেই এই গ্রন্থের নয়টি খন্ড তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন।

দশম খন্ড সম্পূর্ণ করার আগেই পরলোক গমন করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে ১৫৬৮ খ্রিঃ ফ্রান্সের লিয়ঁ শহরে।

ফরাসী প্রাচীন সাহিত্যের বিদুষী পন্ডিত এরিকা চিথ্যামকৃত ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে নস্ত্রাদামুস-এর নাম। সেই সঙ্গে শুরু হয় লৌকিক-অলৌকিকের প্রশ্নে বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে বিতর্কের ঝড়।

রহস্যময় পুরুস নস্ত্রাদামুস-এর ভবিষ্যৎ দর্শনের পদ্ধতি ছিল বিচিত্র ও বিস্ময়কর। গভীর রাত্রিতে তিনি নিজের ঘরে টেবিলের ওপরে ছোট একটা

পেতলের টুলের ওপরে রাখতেন একপাত্র জল।

টেবিলে বসে দু'পায়ের পাতা এবং আলখাল্লার হাতাদুটি জলে ভিজিয়ে নিতেন। পরে পাত্রের জলের দিকে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট ভাবে তাকিয়ে থাকতেন। ধীরে ধীরে তাঁর চোখের সামনে জলে ভেসে উঠত ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর প্রতিচ্ছবি।

নস্ত্রাদামুসের যে সব ভবিষ্যৎবাণী বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পৃথিবীব্যাপী বিস্ময় উৎপাদন করেছে সেগুলি হল — ১৬৬৮ খ্রিঃ লন্ডনের প্লেগ ও অগ্নিকান্ড।

নস্ত্রাদামুসের সফল ভবিষ্যদ্বাণীগুলির তালিকা এরকম—নেপোলিয়নের উত্থান ও পতন এবং হেলেনা দ্বীপে তাঁর নির্বাসন, লুই পাস্তুরের রোগজীবাণু আবিষ্কার এবং জলাতঙ্ক রোগের নিরাময় কথা, ফরাসী বিপ্লবে সম্রাট লুই-এর নির্যাতন, হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ, অষ্টম এডওয়ার্ড-এর সিংহাসন ত্যাগ, মুসোলিনী এবং হিটলারের অভ্যুত্থান, ইংলন্ডের গৃহযুদ্ধ, ট্রাফালগার এবং ওয়াটার্লুর যুদ্ধ, কলঙ্কময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কেনেডি হত্যা, ইতালির ফ্লু, জার্মানির বিভাজন ও পুনর্মিলন, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম প্রভৃতি।

তাঁর রহস্যময় চতুষ্পদীতে নস্ত্রাদামুস হিটলার সম্পর্কে বলেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপের একদেশে এমন একজন মানুষ ক্ষমতায় আসবে যার জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে অর্ধেক পৃথিবী।

তার দেশে গুণীজনদের পিঞ্জরে আবদ্ধ করা হবে। সেনাবাহিনী ন্যায়-নীতি বর্জন করে বন্যার স্রোতের মত নদী পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে অন্য দেশে।

এই বর্ণনা থেকেই চোখের ওপর ভেসে ওঠে নাৎসি জার্মানির চ্যান্সেলর বিশ্বত্রাস অ্যাডলফ হিটলারের ছবি।

তার আগ্রাসী ক্ষমতার দম্ভে রক্তস্নাত হয়েছিল পৃথিবী। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, সিগমুন্ড ফ্রয়েড এবং ওটো হান প্রমুখ গুণীজনের নির্যাতন ও বন্দীত্বের বিষয় মানুষের ইতিহাসের কলঙ্ক রচনা করেছে।

আগামী দিনের জন্য নস্ত্রাদামুস-এর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এই রকম— ১৯৬৬ খ্রিঃ থেকে ১৯৭১ খ্রিঃ জুলাই মাসের মধ্যে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা।

দুই মিত্র দেশ হয়ে উঠবে পরস্পরের শত্রু। বহু নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাবে। যারা বেঁচে থাকবে তাদের জীবন হবে দুর্বিসহ।

আমেরিকায় ঘটবে ভয়াবহ ভূমিকম্প, খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যে পোপের আধিপত্য শেষ হবে। পৃথিবীতে জেগে উঠবে তিন মহাশক্তিধর রাষ্ট্র।

পাশ্চাতের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে প্রাচ্যদেশ। ভারতও গণ্য হবে মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে।

রাজা রামমোহন রায়



আধুনিক ভারতের জনক-রূপে অভিহিত রামমোহন রায় সম্ভবতঃ ১৭৭২ খ্রিঃ বর্তমান হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাদশাহ্ ফররুখশিয়রের আমলে বাংলার সুবেদারের অধীনে আমিনের কাজ করতেন। সেই সূত্রেই তাঁদের পরিবারে রায় উপাধির ব্যবহার প্রচলিত হয়।

রামমোহনের পিতার নাম রামকান্ত রায় এবং মাতার নাম তারিণীদেবী।

সেকালের প্রথা মত রামমোহন পাটনায় মৌলভীর নিকট আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। সংস্কৃত শিক্ষা করেন কাশীতে।

এরপরে নিজ গ্রামের কাছে সুপন্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কাছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং বেদান্তশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। এই সময়েই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক চিন্তার বীজ রোপিত হয়।

পনের বছর বয়সে আকস্মিকভাবে গৃহত্যাগ করে রামমোহন পর্যটনে বেড়িয়ে পড়েন। ১৭৯০ খ্রিঃ পুনরায় ঘরে ফিরে আসেন।

১৭৯১ খ্রিঃ রামকান্ত পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ঘরে ফিরে এসে রামমোহন তাঁর অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে পৈতৃক জমিদারী দেখাশোনা করতে থাকেন।

বৈষয়িক কাজে রামমোহন বিভিন্ন সময়ে কলকাতা, বর্ধমান ও লাঙ্গুলপাড়ায় অবস্থান করতেন। সেই সময় তাঁকে ইংরাজ সিভিলিয়ানদের সাহচর্যে আসতে হয়। অসাধারণ মেধাবী রামমোহন এই সুযোগে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করেন।

১৮০৩ খ্রিঃ রামমোহন মুর্শিদাবাদের কালেক্টর উডফোর্ডের কাছে কাজ নেন এবং যশোরে যান। অবশ্য এই চাকরি মাস দুই-এর বেশি করা সম্ভব হয়নি।

ইতিমধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক সিভিলিয়ান কর্মচারী জন ডিগবির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

রামমোহন ডিগবির অধীনে দেওয়ান বা খাসকর্মচারীরূপে ১৮০৫ খ্রিঃ থেকে ১৮১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত কাজ করেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল রংপুর। এই সময়ে রামমোহন বিষয়কর্মে যথেষ্ট উন্নতি করেন।

ইংরাজের অধীনে চাকরি হলেও রামমোহন সর্বদা আত্মমর্যাদা বজায় রেখে চলতেন। একসময় চাকুরি ক্ষেত্রে এই প্রশ্নেই স্যার ফ্রেডরিক হ্যামিলটনের সঙ্গে তাঁর বিবাদ উপস্থিত হয়।

১৮০৯ খ্রিঃ ১২ই এপ্রিল রামমোহন তাঁর বিরুদ্ধে লর্ড মিন্টোর কাছে অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ পত্রটিকেই রামমোহনের প্রথম ইংরাজি রচনা বলে জানা যায়।

১৮১৫ খ্রিঃ রামমোহন স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন।

কলকাতায় বসবাসকালেই রামমোহন বিবিধ সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে জড়িত হয়ে পড়েন।

প্রথমজীবনে মুর্শিদাবাদে বাসকালে (১৮০৩-১৮০৪ খ্রিঃ) তাঁর একেশ্বরবাদমূলক রচনা ফারসী ও আরবী ভাষায় তুহ্‌ফাৎ-উল-সুবাহহিদ্দীন প্রকাশিত হয়। এবারে তিনি একেশ্বরবাদের সমর্থনে বেদান্তসূত্র এবং বিবিধ উপনিষদ বাংলাভাষায় অনুবাদের কাজ শুরু করেন। এভাবেই বাংলাদেশে প্রথম উপনিষদ চর্চার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

কলকাতাবাসের চারবছরের মধ্যেই রামমোহন একে একে রচনা করেন বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, কেনোপনিষদ, ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ, মাণ্ডুক্যোপনিষদ এবং মুণ্ডকোপনিষদ।

এই সময়েই তাঁকে ধর্ম বিষয়ে নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয়। কিন্তু একেশ্বরবাদ বিরোধী গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্গে বাদানুবাদের সূত্রেই রামমোহনের চিন্তা ও লেখনীর স্পর্শে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পথ সুগম হয়ে ওঠে।

রামমোহন একেশ্বর উপাসনার পথ দেখাবার উদ্দেশ্যে ১৮১৫ খ্রিঃ আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভাই ১৮২৮ খ্রিঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত হয়।

আত্মীয়সভায় শাস্ত্র আলোচনা, বেদপাঠ, ব্রাহ্মসংগীত ইত্যাদি হত। রামমোহন নিজেও সুগায়ক ছিলেন।

কলকাতার গুণীজ্ঞানী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় সভা ক্রমশ বড় হতে লাগল। সেই সঙ্গে রামমোহন সমাজের অন্ধকুসংস্কার দূর করবার জন্য যে সকল যুক্তি ও শাস্ত্রের কথা বলতেন তা-ও প্রচার লাভ করল।

সমাজে নারীজাতির দুঃখ ও দুর্দশা লক্ষ করে রামমোহন বেদনা বোধ করতেন। তাই দীর্ঘদিনের একটি প্রচলিত কুপ্রথা সহমরণ রোধ করবার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন।

সারাদেশে আলোড়ন উঠল। শেষ পর্যন্ত লর্ড বেন্টিঙ্কের সহযোগিতায় ভারতবর্ষে সহমরণ নিষিদ্ধ হল।

এই বিষয়ে রামমোহনের প্রথম বই সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ প্রকাশিত হয় ১৮১৮খ্রিঃ। ১৮২০ খ্রিঃ লিখলেন দ্বিতীয় বই প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ এবং সহমরণ বিষয়।

১৮২০ খ্রিঃ তিনি খ্রিস্টের উপদেশ নামে ইংরাজিতে একটি বই লেখেন। এই বইতে রামমোহন খ্রিস্টীয় ত্রিত্ত্ববাদ অস্বীকার করেন। ফলে মিশনারীদের সঙ্গেও তাঁর সংঘর্ষ ও বাদপ্রতিবাদ অনিবার্য হয়ে উঠল।

১৮২৩ খ্রিঃ তিনি প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা করে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার প্রস্তাব দিয়ে লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লেখেন।

সনাতন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কেবল কাব্য আর ব্যাকরণ নিয়ে পড়ে থাকলে দেশ অন্ধকারেই পড়ে থাকবে। আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে ভারতবাসীকে যে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে তা মনেপ্রাণে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন রামমোহন।

ইংরাজিতে লেখাপড়া চালু করবার জন্য ১৮২২ খিঃ অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি।

মাতৃভাষা শিক্ষা প্রসারের জন্য ইতিপূর্বে তিনি বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ গৌড়ীয় ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন। সেই বই স্কুলবুক সোসাইটি প্রকাশ করেছিল ১৮০৩ খ্রিঃ।

বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের নিগড় মুক্ত করে এই গ্রন্থেই তিনি তার একটি নিজস্ব রূপ দান করেছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যে তদ্ভব শব্দের ব্যবহার এবং অসমাপিকা ক্রিয়া ও জটিল বাক্যাংশের ব্যবহার বন্ধ করেন।

বাপ, মাসী, মেসো, গাই, কাপড়চোপড়, ভাই, পাগল, পাগলী ইত্যাকার যেসব শব্দ আমরা মুখের ভাষায় ব্যবহার করি, এসব রামমোহনই প্রথম ব্যবহার করেন।

রামমোহনের চেষ্টায় সতীদাহ বা সহমরণ নামক কুপ্রথা যেমন সমাজে আইনত নিষিদ্ধ হয়েছিল, তেমনি তিনি বহুবিবাহ সম্পর্কেও সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সম্পর্কে লিখেছেন, 'রাজা রামমোহন রায় বলেন যে গভর্নমেন্ট এইরূপ ব্যবস্থা করিলে অত্যন্ত উপকার হয় যে, কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোন রাজকর্মচারীর নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহার স্ত্রীর শাস্ত্র নির্দিষ্ট কোন দোষ আছে। প্রমাণ করিতে সক্ষম না হইলে, সে পুনর্বার বিবাহ করিতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না।'

রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সূত্রে রামমোহন ছিলেন ভারতে আন্তর্জাতিক মনন ও আদর্শের প্রবক্তা। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতের বাইরের নানা ঘটনার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষের ওপর নিপীড়নের

বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন। জানা যায় যে, দক্ষিণ আমেরিকা স্পেনের অধিকারমুক্ত হলে সেই আনন্দে তিনি বাড়িতে জোরদার ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। ১৮২২ খ্রিঃ তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা মিরাত-উল-আখবার-এ আয়ারল্যান্ডের ওপর ইংরাজ সরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

১৮৩০ খ্রিঃ ১৯শে নভেম্বর দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে তাঁর জন্য পার্লামেন্টে কিছু বিষয়ে তদ্বির করবার জন্য বিলেতে পাঠান।

সেই সময়ে এইকাজের জন্য ভারতবর্ষে রামমোহনই ছিলেন একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।

বিলেতে রামমোহন ইউনিটেরিয়ান সমিতির সম্বর্ধনা লাভ করেন।

১৮৩৩ খ্রিঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর এই ক্ষণজন্মা মনীষী ব্রিস্টলে দেহত্যাগ করেন।

বারট্র্যান্ড রাসেল



বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ দার্শনিক ও মানবকল্যাণব্রতী মনীষী বারট্র্যান্ডরাসেলের নাম শিক্ষাবিদ, রাজনীতিজ্ঞ এবং বিশ্বশান্তির দূত হিসেবেও বিখ্যাত। সমসাময়িক সময়ে তাঁকে বলা হত ব্রিটেনের সব চাইতে জ্ঞানী ব্যক্তি। নিজেকে তিনি বস্তুবাদী ও মুক্ত চিন্তাবিদ বলে পরিচয় দিতেন।

বারট্র্যান্ডের জন্ম হয়েছিল ১৮৭২ খ্রিঃ ১৮মে তারিখে ইংলন্ডের ট্রেলক নামক স্থানে। তাঁর পিতা ছিলেন ভাইকাউন্ট অ্যাম্বারলি এবং মা লেডি কেন্ট অ্যাম্বারলি।

শিশু বয়সেই বাবামাকে হারিয়েছিলেন বলে বারট্র্যান্ড মানুষ হয়েছিলেন পিতামহ ও পিতামহীর স্নেহ ও কঠোর শাসনের মধ্যে। ফলে অতি অল্পবয়স থেকেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন নিঃসঙ্গ ও লাজুক স্বভাবের।

লেখাপড়া আরম্ভ হয়েছিল বাড়িতেই। যে মানুষ পরবর্তী জীবনে অঙ্কবিদ বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, প্রিন্সিপিয়া ম্যাথিমেটিকা নামে অঙ্কশাস্ত্রের বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, বাল্যকালে তাঁর কাছে গণিত ও অ্যালজেব্রা ছিল বিভীষিকার মত।

অবশ্য এগারো বছর বয়স নাগাদ এই ভীতি দূর হয়েছিল এবং তাঁর প্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছিল গণিত, ইতিহাস, সাহিত্য বিশেষ করে কবিতা।

তাঁর দিন ও রাতের বেশিরভাগ সময়টাই কাটত পিতামহ লর্ড জন রাসেলের সুবিশাল পাঠাগারে। তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়েছিল এখানেই।

অতিরিক্ত পাঠাভ্যাসের জন্য ষোল বছর বয়সেই চোখের নানা উপসর্গ দেখা দেয়। ফলে লেখাপড়া একরকম বন্ধ হয়ে গেল।

এই সময়েই তিনি কবিতা মুখস্থ করার অভ্যাস তৈরি করলেন। জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখা তাঁকে বেশি প্রভাবিত করেছিল। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে অভিজ্ঞতাই সমস্ত জ্ঞানের উৎস।

ট্রিনিটি কলেজে পড়া শেষ করে বারট্র্যান্ড কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৯৪খ্রিঃ কেমব্রিজ থেকে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কেমব্রিজে ভর্তি হবার আগেই তিনি ল্যাটিন, গ্রিক, জার্মান, ফরাসি ও ইতালিয়ান ভাষা বেশ ভালভাবেই শিখে নিয়েছিলেন। কেমব্রিজে তিনি বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন ম্যাকগার্ট, মুর প্রভৃতিকে। পরবর্তিকালে এই দুজনই দার্শনিক হিসেবে পরিচিত হন।

বারট্র্যান্ড শৈশবে সান্নিধ্য পেয়েছিলেন রানি ভিক্টোরিয়া, কবি টেনিসন এবং ব্রাউনিং-এর। উত্তরজীবনেও এসেছিলেন লেনিন সহ অনেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে।

দার্শনিক বন্ধু মুর এবং ম্যাকটেগার্ট-এর আলোচনা বারট্র্যান্ডকে দর্শন বিদ্যায় আগ্রহী করে তোলে। ১৮৯৪ খ্রিঃ স্নাতক হবার পর তিনি দর্শনতত্ত্ব নিয়ে পুনরায় পড়া শুরু করেন। তিনি কিছুকাল জার্মানীতে রাজনীতিও অধ্যয়ন করেছিলেন। পরবর্তিকালে দর্শন রাজনীতি এবং শিক্ষা-বিষয়ে জনসাধারণের উপযোগী বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

জনসংযোগ জনজীবনে বারট্র্যান্ডের আগ্রহ ছিল। ১৮৯৪ খ্রিঃ প্যারিসের ব্রিটিশ দূতাবাসে চাকরি নিলেন। সেই বছরই ডিসেম্বরে বিয়ে করেন স্বনির্বাচিত পাত্রী আলিসা পিয়ারসাল স্মিথকে।

বিয়ের পর হনিমুনে গেলেন জার্মানিতে। সেখানে জার্মান সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে মেতে গেলেন।

১৮৯৬ খ্রিঃ দেশে ফিরে লিখলেন জার্মান গণতন্ত্র নিয়ে একটি মূল্যবান বই General Social Democracy ।

বহুমুখী চিন্তা ভাবনার প্রতিভা নিয়ে জন্মালেও ৩৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ব্যাপৃত ছিলেন মূলতঃ অঙ্কের মূলসূত্রগুলো নিয়ে। তারই ফল হল Principia Mathematica নামের বিখ্যাত গ্রন্থ।

রাসেল নিজেই বলেছেন এই গ্রন্থ রচনার কাজে তাঁকে সাত বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

১৯০৭ খ্রিঃ বারট্র্যান্ড ন্যাশনাল ইউনিয়ান অব উইমেনস সাফ্রেজ সোসাইটির হয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ৭ হাজার ভোটে হেরে গিয়েছিলেন।

১৯১০ খ্রিঃ লিবারেল পার্টির প্রার্থী হয়ে পরে আবার হাউস অব কমনস-এর নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রের ভোটাররা যখন জানতে পারল যে তিনি নাস্তিক এবং গীর্জায় যান না, তখন কেউই তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না।

বারট্র্যান্ড পরবর্তী জীবনে হয়ে উঠেছিলেন গোঁড়া সোস্যালিস্ট। অবশ্য নিজের রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতবাদের জন্য পরে তাঁকে সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছিল।

ব্যক্তি জীবনে বিবাহ সম্পর্কেও বারট্র্যান্ডের নিজস্ব মতবাদ ছিল। তিনি মুক্ত ভালবাসা-তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

নিজেও বিয়ে করেছিলেন চারবার। ১৮৯৪ খ্রিঃআলিসাকে, ১৯২১ খ্রিঃ জেরা ব্লাককে, ১৯৩৬ খ্রিঃ পাট্রিশিয়া স্পেন্সকে এবং ৮০ বছর বয়সে ১৯৪২ খ্রিঃ এডিথ ফিঞ্চকে।

প্রথমা স্ত্রী আলিসার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল ১৯১১ খ্রিঃ। এর ফলে তাঁকে নিজের সমাজে অপ্রিয় হতে হয়েছিল।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঁধলে তিনি যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করেন। ফলে তাঁকে কেমব্রিজের চাকরি খোয়াতে হয়। জেলেও যেতে হয়।

নিজের সমাজে মেলামেশার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেলে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠল চার্লস ট্রেভেলিয়ন, হারবারট স্যামুয়েল, বার্নাড শ প্রভৃতির সঙ্গে। এইকালে তিনি যাদের সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে এসেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রচলিত ধ্যানধারণা ও রীতিনীতির বিরোধী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বারট্র্যান্ডের চিন্তার ক্ষেত্রে ও জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তিনি সবকিছু ছেড়ে যুদ্ধবিরোধী প্রচার ও আন্দোলন শুরু করলেন।

সৈন্যদলে বাধ্যতামূলক যোগদানের বিরুদ্ধে অচিরেই গঠিত হল কমিটি অব দ্য নো-কনসক্রিপসন ফেলোশিপ। বারট্র্যান্ড হয়ে উঠলেন এই সংস্থার প্রেরণার প্রধান উৎস।

লেবার রিডার নামের পত্রিকায় লিখতে শুরু করলেন যুদ্ধবিরোধী লেখা। ফলে খোয়াতে হল চাকরি, হল জেল-জরিমানা, তাঁর লাইব্রেরিটিও সরকার বাজেয়াপ্ত করল।

বারট্র্যান্ড এতে এতটুকু দমলেন না। শান্তির স্বার্থে যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন।

কারাগারে থাকার সময়েই তিনি রচনা করলেন Introduction to Mathematical Philosophy এবং Analysis of Matter-এর খসড়া।

দ্বিতীয় বিবাহের পরে বারট্র্যান্ড শিক্ষা প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে উঠলেন এবং ১৯২৭ খ্রিঃ তিনি স্ত্রী জেরার সঙ্গে গড়ে তুললেন একটি প্রগতিশীল বিদ্যায়তন। স্কুলের নাম হল বেকন হিল স্কুল।

শিশুদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি ব্যবহার যেন প্রতিবন্ধক না হয় তাই ছিল এই বিদ্যায়তনের লক্ষ্য।

ছাত্রদের ব্যবহারে যাতে বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয় এবং তারা অবদমিত মনোভাবের শিকার হয়ে না পড়ে সে বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন।

মূলতঃ অর্থের অভাবে এবং পরে ডোরার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে এই স্কুল উঠে যায়।

তৃতীয় বিয়ের পর লেখাই হয়ে উঠেছিল বারট্র্যান্ডের জীবিকা। এই সময়ই তিনি জগতের বিশিষ্ট চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম বলে স্বীকৃতি লাভ করেন।

বিজ্ঞান ও দর্শন যে একই ধারায় কাজ করে চলে তাঁর লেখায় তিনি তা বারবার প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার একবছর আগে বারট্র্যান্ড স্ত্রী ও তিনটি সন্তান নিয়ে আমেরিকায় চলে যান। সেখানে তিনি ছবছর বাস করেন।

আমেরিকা বাসের শেষ দিকে স্ত্রী ও তিনটে সন্তান নিয়ে তাঁকে খুবই আর্থিক অনটনে পড়তে হয়েছিল।

নিরলস কর্মী বারট্র্যান্ড সত্তর বছর বয়সেও জীবনের এই অনিশ্চিত সময়েই রচনা করেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ A History of Western Philosophy। দর্শন শাস্ত্রের ওপরে এমন অসাধারণ গ্রন্থ এর আগে পর্যন্ত রচিত হয়নি।

১৯৪৪ খ্রিঃ কেমব্রিজের সাদর আহ্বানে তিনি আবার পূর্বতন কর্মস্থলে ফিরে আসেন। এবারে আর অনাদর নয়, স্বদেশে পেলেন তিনি বীরের সম্বর্ধনা। দিনে দিনে ইংলন্ডে তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠাও বেড়ে চলল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচাইতে ঐতিহ্যময় উপাধি অর্ডার অব মেরিট-এ ভূষিত হলেন ১৪৪৯ খ্রিঃ। ১৯৫০ খ্রিঃ বারট্র্যান্ড নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

নোবেল কমিটি তাঁর জীবনব্যাপী কীর্তির সম্পর্কে লিখল ঃ ইন রিকগনিশন অব হিজ ভ্যরিড এন্ড সিগনিফিকেন্ট রাইটিংস, ইন হুইচ হি চ্যাম্পিয়নস হিউম্যানিটেরিয়ান আইডিআলস এন্ড ফ্রিডম অব থট।

আশ্চর্য প্রতিভাধর বারট্র্যান্ড আশি বছর বয়সে লিখতে শুরু করলেন গল্প। এ সম্পর্কে তিনি নিজে মন্তব্য করেছেন ঃ 'দর্শনশাস্ত্রের জন্য আমার জীবনের আশিটি বছর আমি উৎসর্গ করেছি। পরবর্তী আশি বছর আমি কল্পসাহিত্যের এক নতুন শাখায় আত্মনিয়োগ করতে চাই।'

বারট্র্যান্ডের প্রথম গল্প সংকলন স্যাটার্ন ইন দ্য সাবার্বস প্রকাশের পর সাহিত্যের এই বিভাগে আর অগ্রসর হবার সুযোগ পেলেন না। হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কারের

ফলে মানবজাতি এক চরম সঙ্কটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে পৃথিবীর সকল শান্তিকামী মানুষের হয়ে বারট্র্যান্ড ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে।

১৯৫৮ খ্রিঃ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ অভিযান শুরু হল, বারট্র্যান্ড হলেন তার প্রথম সভাপতি। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও তিনি বিশ্বশান্তির প্রশ্নে অক্লান্তভাবে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। ১৯৭০ খ্রিঃ ২ ফেব্রুয়ারী বারট্র্যান্ডের মৃত্যু হয়।

রোমাঁ রোলাঁ



উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এবং প্রগতিবাদী লেখকদের মধ্যে রোমাঁ রোলাঁ ছিলেন প্রথম সারির অন্যতম।

ফ্রান্সের ক্ল্যামসিতে ১৮৬৬ খ্রিঃ ২৯ জানুয়ারী এক অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন রোমাঁ রোলাঁ। পড়াশোনা করেন প্রথমে প্যারিসে ও পরে রোমে।

সঙ্গীতের সঙ্গে সাহিত্য ও নাট্যশাস্ত্রের প্রতিও ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। তবে শিক্ষার সর্বস্তরেই ছিল তাঁর গতি।

রোলাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন ধর্মযাজক। তিনি সেদিকে গেলেন না। যৌবনে সঙ্গীত বিষয়ে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি হয়ে রোমে ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে কর্মজীবন শুরু করলেন। পঁচিশ বছর বয়সে দেশে ফিরে এসে একাডেমি অব ফ্রান্স-এ শিল্প ইতিহাসের অধ্যাপকের চাকরি নিলেন।

অধ্যাপক হিসেবে তিনি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম ইউরোপীয় সাহিত্যিক যিনি সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিসমাপ্তি তাঁকে খুবই বেদনার্ত করে তুলেছিল। যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিগত বিভেদ থেকে উৎপন্ন বিশ্বমানবতার আর্ত ক্রন্দন তাঁকে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের অনুকূলে আন্দোলন আরম্ভ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৯১৪ খ্রিঃ সুইজারল্যান্ডে বাসকালে তিনি বিখ্যাত শান্তিবাদী ইস্তাহার An-dssus de la melee প্রকাশ করেন। এই ইস্তাহারে তিনি প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের

মনীষী, লেখক, শিল্পী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর গ্রহণ করে প্রচার করেন। তাঁর প্রচেষ্টা বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

রোলাঁর উদ্যোগ ইংলন্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বিপুল জনসমর্থন লাভ করেছিল। কিন্তু জার্মানীতে হিটলারের উত্থানের ফলে ইউরোপের শান্তিবাদীদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগেই রোলাঁ আর একটি মহাযুদ্ধের সম্ভাবনার আভাস অনুমান করতে পেরেছিলেন।

শান্তির বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সাহিত্য এবং রাজনীতি এই দুই মাধ্যম আশ্রয় করেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর শাণিত বচনাগুলি স্থান পায় I will not Rest গ্রন্থে।

রোলাঁ ছিলেন মনেপ্রাণে বিপ্লবী এবং ব্যক্তিত্ববাদী মানবিকতার পক্ষপাতী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মহামিলনের সেতুবন্ধের তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রণী পুরুষ।

গুণী ব্যক্তিদের প্রতি সতত শ্রদ্ধাবান রোলাঁ, মাইকেল এঞ্জেলো, টলস্টয়, বিটোফেন, মহাত্মা গান্ধী, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ প্রভৃতি জগদ্বরেণ্য পুরুষদের জীবনী রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও ছিল তাঁর অকৃত্রিম সৌহার্দ্য। তাঁর রচনার মাধ্যমেই ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছিল ভারতাত্মার সনাতন শান্তির বাণী।

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদের প্রতি ছিল রোলাঁর অপরিসীম আগ্রহ। ইউরোপের বুদ্ধিজীবী, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনে সহযোগিতা করতে। বারবার ধিক্কার ঘোষণা করেছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

পৃথিবীর যেখানেই কোন অবিচার অত্যাচার ঘটেছে, রোলাঁ অকুণ্ঠিত কণ্ঠে ধিক্কার জ্ঞাপন করেছেন। প্রচারিত হয়েছে তাঁর অহিংস বিদ্রোহের বাণী। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রোলাঁ ছিলেন পাশ্চাত্যে ভারতের আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রদূত।

রোলাঁর রচিত মহাউপন্যাস জাঁ-ক্রিস্তভ (Jean Christophe) ১৯০৪ খ্রিঃ থেকে ১৯১২ খ্রিঃ মধ্যে রচিত হয়। এই বিশ্বখ্যাত গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯১৫ খ্রিঃ নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন।

তাঁর সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য ছিল এ রকমঃ অব এ ট্রিবিউট টু দ্য লফটি আইডিয়ালিজম অব হিজ লিটারেচার প্রোডাকশন অ্যান্ড টু দ্য সিমপ্যাথি অ্যান্ডলাভ অব ট্রুথ, হুইচ হি হ্যাজ ডেসক্রাইবড ডিফারেন্ট টাইপস অব হিউম্যান বিইংস।

পুরস্কারের টাকা রোলাঁ রেড ক্রশ ও ফ্রেঞ্চ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনকে দান করেন।

তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত রচনা হল ডন, মর্নিং দ্য মার্কেট প্লেস, দ্য হাউস, লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডসিপ এবং দ্য টাইম উইল কাম প্রভৃতি।

গণনাট্য (Peoples' Theatre) সৃষ্টি বিষয়ে রোলাঁ ছিলেন বিশেষ উৎসাহী। এই উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেছিলেন কুড়িটি নাটক।

১৯৪৪ খ্রিঃ ৩১ শে ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।



ফা-হিয়েন

সুপ্রসিদ্ধ চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং পর্যটক ফা-হিয়েন আনুমানিক খ্রিস্ট্রীয় ৪র্থ শতকে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন চীনের শান-সি জনপদের ফিং-ইয়াং-এর অন্তর্গত উ-ইয়াং-এর অধিবাসী।

খুব অল্পবয়সেই তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদান করেন। পরবর্তী জীবনে আচারনিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুরূপে খ্যাতিলাভ করেন।

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। চীন দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই কারণে ভারত ভূমি দর্শনের প্রবল আগ্রহ বোধ করতেন। এই দেশকে তৎকালে বৌদ্ধরা মহাতীর্থ রূপেই গণ্য করতেন।

বৌদ্ধ ধর্মানুরাগীদের মধ্যে ফা-হিয়েন ছিলেন অন্যতম প্রধান! তিনি একসময় সঙ্কল্প নিলেন যে ভাবেই হোক দুর্গম ও দুস্তর পথ অতিক্রম করে ভারত ভূমিতে তীর্থ করতে আসবেন।

এই পুণ্যকাজে সঙ্গী জুটতে বিলম্ব হল না। ফা-হিয়েন ৩১৯ খ্রিঃ চারজন চীনা ভিক্ষু হুই কিং, তাও কিং, হুই ইয়ং ও লুই ওয়েইকে সঙ্গে নিয়ে মধ্য এশিয়ার পথে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই পথে ভারতগামী আরেকটি চীনা ভিক্ষুদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল তাঁদের। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা প্রথমে তুন-হুয়াং থেকে বর্তমান কারাসর এসে পৌছলেন। এখান থেকে দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল মরুপথ অতিক্রম করে খোটানে এসে পৌছান।

সেই সময় খোটান মধ্য এশিয়ার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধসংস্কৃতি কেন্দ্র রূপে বিখ্যাত ছিল। এখানে কিছুদিন অবস্থান করলেন তাঁরা।

পরে খোটান থেকে ফা-হিয়েন ও তাঁর সঙ্গীরা পামীর অঞ্চল পার হয়ে গিলগিটের পথে কাশ্মীরে এসে পৌছান।

দুর্গম পথের অপরিসীম কষ্টে সঙ্গীরা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রোগব্যাধির আক্রমণে তাঁদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌছান সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই আশঙ্কা দেখা দিল।

ফা-হিয়েন কিন্তু দমলেন না। অদম্য উৎসাহ নিয়ে তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন। পথের সমস্ত ক্লেশ দুঃখ কষ্ট মেনে নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরে উত্তর ভারতের উড্ডিয়ান, সুবাস্ত, পুরুষপুর. তক্ষশিলা, মথুরা, কনৌজ. শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, বারাণসী প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধশাস্ত্রকেন্দ্রগুলি ঘুরে বেড়ালেন।

ফা-হিয়েন দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন। প্রথমতঃ বৌদ্ধতীর্থ পরিদর্শন এবং দ্বিতীয় হল, বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থের পুঁথি সংগ্রহ ও প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা। তাই পরিভ্রমণকালে তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে বহুবিধ বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন।

তীর্থস্থানগুলিতে তাঁকে বিভিন্ন বৌদ্ধবিহারে থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি একাগ্র নিষ্ঠা নিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও পুঁথি নকল করার উদ্দেশ্যে তিনি মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের বিভিন্ন বিহারে তিন বৎসর অবস্থান করেন।

সংস্কৃত ভাষা জানা থাকায় সহজেই তিনি ভারতবাসীদের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন। তাঁর ভাববিনিময়ের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা।

ফা-হিয়েন বৌদ্ধসঙ্ঘের অনুশাসনের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাবান। বৌদ্ধদর্শনের বিনয় ভাগের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। তাই তিনি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের অন্যান্য পান্ডুলিপির সঙ্গে মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের ও মহীশাসক সম্প্রদায়েব বিনয়পিটক দুটির পান্ডুলিপিও সাগ্রহে সঙ্গে নিয়ে যান। মহাসাঙ্ঘিক বিনয় পরে তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

পাটালিপুত্র থেকে বেরিয়ে ফা-হিয়েন প্রথমে চম্পা অর্থাৎ বর্তমান বিহারের ভাগলপুর অঞ্চল এবং সেখান থেকে তখনকার বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র তাম্রলিপ্তি অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের তমলুকে আসেন।

তৎকালীন তাম্রলিপ্তিতে বাইশটি সঙ্ঘারাম ছিল। এর সবকটিতেই তিনি অবস্থান করেন। দুবছর ধরে বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ, পুঁথি নকল ও বুদ্ধমূর্তির চিত্র ও নকসা অঙ্কনের কাজে নিয়োজিত থাকেন।

তাম্রলিপ্তি থেকে ফা-হিয়েন সমুদ্র পথে সিংহলে যান। একরকালে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য নিজ কন্যা, মতান্তরে ভগ্নি সঙ্ঘমিত্রা ও পুত্র মহেন্দ্রকে সিংহলে প্রেরণ করেছিলেন।

সিংহলও ছিল অন্যতম বৌদ্ধভূমি। ফা-হিয়েন সিংহলে দুই বছর অবস্থান করেন এবং প্রচুর বৌদ্ধপুঁথি সংগ্রহ করেন।

এখান থেকে বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে তিনি প্রথমে যান যবদ্বীপ। সেখান থেকে যাত্রা করে ৪১৪ খ্রিঃ চীনদেশে ফিরে যান।

ভারতীয় ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র সেই সময় চীনে অবস্থান করছেন। ফা-হিয়েন তাঁর সহায়তায় জীবনের অবশিষ্ট সময় ভারত থেকে নিয়ে আসা শাস্ত্রগ্রন্থের পুঁথিগুলির চীনা ভাষায় অনুবাদের কাজে ব্যস্ত থাকেন। তিনি ছয়টি বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁর মৌলিক গ্রন্থটি ভারত পর্যটনের অভিজ্ঞতার বিবরণ। গ্রন্থটির নাম ফো কুয়োকি (Fo Kuoki)। ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ এই গ্রন্থটিতে ভারত সম্পর্কিত বহু মূল্যবান তথ্যও লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ফা-হিয়েন ছিলেন প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানী। ফলে অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কৌতূহল না থাকাই স্বাভাবিক। এই কারণেই তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা বা এ বিষয়ের ওপর কোন প্রসঙ্গের আলোচনা বিশেষ পাওয়া যায় না।

ফা-হিয়েন যেই সময়ে ভারতে আসেন, তখন উত্তর ভারত শাসন করছিলেন গুপ্তবংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। ফা-হিয়েন তাঁর রাজ্যে ৪০৫-৪১০ খ্রিঃ পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন।

তাঁর গ্রন্থে সাধারণভাবে এই রাজ্যের শাসনপ্রণালী ও প্রজাসাধারণের সুখসমৃদ্ধি ও জীবনযাপন প্রণালীর উল্লেখ থাকলেও তিনি ভ্রান্তি বশতঃ সম্রাটের নামের উল্লেখ করেন নি।

এই মৌলিক রচনাটির বাইরে ফা-হিয়েন যে দুটি বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ করেন, সেগুলি চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যকে সুদৃঢ় করার কাজে সহায়তা করেছে। পরবর্তীকালে যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতবর্ষ পর্যটনে এসেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রেরণা জুগিয়েছিল ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

ফা-হিয়েন ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৌদ্ধমন্দির থেকে বুদ্ধমূর্তির মাপ, চিত্র ও নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এই সংগ্রহ চীনাশিল্পে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে সহায়ক হয়েছে।

ফা-হিয়েন বিরাশি বছর বয়সে (মতান্তরে অষ্টাশি) দক্ষিণ চীনের অর্ন্তগত কিং-চিউ নামক স্থানে সু-য়ু-সিন-সে নামক সংঘারামে প্রাণত্যাগ করেন।

চার্লি চ্যাপলিন



কঠোর জীবন-সংগ্রাম আর ক্লান্তিহীন অধ্যবসায়ের বলে দীনহীন ধূলার জীবন থেকে নিজেকে পরিণত করেছিলেন পৃথিবীর অন্যতম মহত্তম ব্যক্তিতে একজন মাত্র মানুষ যাঁর হৃদয় ছিল মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা, সহমর্মিতা আর বিশ্বাসে ভরপুর, সুদীর্ঘ জীবনে যিনি বিশ্বমানবতাবোধের আদর্শকে প্রচারের মাধ্যম করেছিলেন চলচ্চিত্রকে, যিনি অন্যায়কে কোন দিন প্রশ্রয় দেননি, ভালবাসা ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করেননি—তাঁর নাম চার্লস চ্যাপলিন। চার্লি চ্যাপলিন নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

লন্ডনের ইস্ট লেনের এক দরিদ্র শিল্পী পরিবারে ১৮৮৯ খ্রিঃ ১৬ই এপ্রিল জন্ম হয়েছিল চার্লির। তাঁর বাবা অভিনয় করতেন থিয়েটারে, মা ছিলেন গায়িকা।

বাবা যা রোজগার করতেন মদের পেছনেই তা ফুঁকে দিতেন। ফলে অভাবের সংসারে বাসা বেঁধেছিল নিত্য অশান্তি।

চার্লির যখন এক বছর বয়স, আর তাঁর দাদা সিডনির চারবছর সেই সময় মা বাবা দুজনের বিচ্ছেদ হয়ে গেল। দুঃখিনী মা দুই ছেলেকে নিয়ে উঠে এলেন আলো বাতাসহীন এক বস্তির অন্ধকার ঘরে।

থিয়েটারে গান করে মা যা রোজগার করতেন তিনটি মানুষের কায়ক্লেশে চলে যেত।

একটু বড় হয়ে মাকে সাহায্য করবার জন্য সিডনি বাচ্চাদের মধ্যে মজার মজার খেলা দেখিয়ে রোজগারের চেষ্টা করতেন। চার্লির ভারি ভাল লাগত দাদার খেলাগুলো। তিনি ভাবতেন বড় হয়ে দাদার মত খেলা দেখাবেন।

চার্লির যখন পাঁচ বছর বয়স, সেই সময় সংসারের দুঃখের অন্ধকার আরও ঘনীভূত হল। একদিন গান গাইতে গাইতে মায়েরকণ্ঠস্বর কেমন বিকৃত হয়ে গেল। সে গলা আর কোন দিন স্বাভাবিক হল না—চিরদিনের জন্য তাঁর গান গাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

চরম দুঃখের গ্রাসে পড়লেন তিনটি অসহায় প্রাণী। এই সময়ের দিনগুলো যেন কাটতেই চাইত না। মনে হতো এই অর্ধাহার অনাহারের গ্লানিময় জীবন বুঝি এমনিই শেষ হয়ে যাবে।

দাদা সিডনি ইতিপূর্বে জাহাজে চাকরি নিয়ে দূরে কোন দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। অসুস্থ মাকে নিয়ে একা কোন রকমে দিন গুজরান করতে লাগলেন চার্লি। এই সময়

যখন যে কাজ পেয়েছেন ক্ষুধার রুটি জোগাড় করবার জন্য তাই করতে হয়েছে তাঁকে।

কখনো খবরের কাগজ ফিরি করেছেন, জুতো পালিশ করেছেন, মোট বইতেও দ্বিধা করেন নি। সুঁড়িখানার সামনে মাতালদের গান শুনিয়ে, নাচ দেখিয়ে টুপি পেতে ভিক্ষেও করেছেন।

এমনি করে চরম দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে বারো বছরে পা দিলেন চার্লি। ততদিনে মা আরও নির্জীব হয়েছেন। তাঁর বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখ, কোটরে বসা চোখ আর অনাহারে ক্লিষ্ট শরীর সহ্য করতে পারতেন না তিনি। বুকের ভেতরটা অসহ্য ব্যথায় মুচড়ে উঠত।

আকুল হয়ে ভাবতেন, কবে তিনি দু'হাত ভরে মায়ের জন্য খাবার নিয়ে আসতে পারবেন—মায়ের মলিন শীর্ণ মুখে আবার হাসি দেখতে পাবেন।

একদিন জাহাজ থেকে ফিরে এলেন সিডনি। কিন্তু সংসারে সাহায্য করবার মত সম্বল কিছুই নিয়ে আসতে পারেননি। এদিকে দুঃখের জ্বালা সইতে না পেরে মায়ের মাথায় দেখা দিয়েছে গোলমাল। দুভাই মিলে অগত্যা মাকে পাঠালেন পাগলা গারদে।

আর নিরুপায় অবস্থায় তাঁদের উঠতে হল গিয়ে বাবার আশ্রয়ে। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন থাকা সম্ভব হল না। সৎমায়ের যাতনা ছিল অসহনীয়।

কিছুদিনের মধ্যে মা ভালো হয়ে উঠলেন। আবার তিনজনে ফিরে এলেন আগের বস্তির ঘরে।

ভাগ্য এবারে বুঝি কিছুটা প্রসন্ন হল। সিডনির একটা চাকরি জুটল। যৎসামান্য মাইনে। কিন্তু সেই সামান্যই দরিদ্রের সংসারে অসামান্য।

দাদার রোজগারে যদি কিছু যোগ করা যায় এই আশায় চার্লিও কাজের সন্ধানে পথে নামলেন।

নাটক দলের আখড়া বেডফোর্ড স্ট্রিটের কাছেই ছিল বস্তিটা। প্রতিদিন সেই পথে যাতায়াতের সময় নাটক দলের অফিসগুলো চোখে পড়তো চার্লির।

অভিনয় তাঁর রক্তে। ছোটবেলায় বাবার অভিনয়ও দেখেছেন দু-একবার। তখন থেকেই স্বপ্ন বাবার মত অভিনেতা হবার। তাই কাজের সন্ধানে নেমে নাটকের দলের কথাই আগে মনে পড়ল তাঁর। যদি কোন নাটক দলে সামান্য একটা কাজ পাওয়া যায়।

কিন্তু একের পর এক অফিস ঘরগুলোর দরজা পার হয়ে যান। ভেতরে ঢোকার সাহস করে উঠতে পারেন না।

একদিন মনে বল সঞ্চয় করলেন। তারপর কপাল ঠুকে ঢুকে পড়লেন এক নাটক দলের অফিস ঘরে। কিন্তু কাজের কথা পাড়তেই কেরানী ভদ্রলোক দরজা দেখিয়ে দিলেন।

সেদিনের মত নিরাশ হয়ে ফিরলেও হাল ছাড়লেন না চার্লি। দু'চারদিন পর পরই গিয়ে হাজির হন সেই অফিসে।

ততদিনে ভয় সঙ্কোচ কেটে গেছে। কাজ একটা তাঁর চাই যে করে হোক, কে বিরক্ত হল তা দেখলে তো চলবে না।

ভাগ্যক্রমে একদিন পড়ে গেলেন মালিকের চোখে। সপ্রতিভ চার্লিকে দেখে তাঁর ভাল লেগে গেল। কাজও জুটে গেল।

সেই সময় শার্লক হোমস নামে একটা নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে সেই দলের। তাতে বিলি বলে একটা ছোট ছেলের ভূমিকায় যে ছেলেটি অভিনয় করতো, সে চলে যাবে বলে তার জায়গায় নেওয়া হল চার্লিকে।

মাইনে ঠিক হল সপ্তাহে ২ পাউন্ড ১০ শিলিং। টাকাটা প্রত্যাশার চাইতেও অনেক বেশি। খুশি হয়ে চার্লি ভাবলেন, এবার বুঝি সংসারের অভাব ঘুচল।

ভবিষ্যতে যাঁর অনবদ্য অভিনয় গোটা বিশ্বকে মাতিয়ে তুলবে, অভিভূত করবে, সেই অবিস্মরণীয় শিল্পীর অভিনয় জীবন এভাবেই শুরু হল।

এই সময় দলের সঙ্গে নাটক দেখাবার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে হয়েছে চার্লিকে। সেই ভ্রাম্যমাণ জীবন ভাল লাগতো তাঁর।

যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যে দাদাকেও নাটুকে দলে ভিড়িয়ে নিলেন চার্লি। নিজে জায়গা করে নিলেন আরো বড় দলে। তিনি তখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন—ইংলন্ডের সব সেরা অভিনেতা হবেন।

চার্লির অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ফ্রেডকারনো নামে এক থিয়েটার মালিক। তাঁর দলের নাম কারোনার। সেখানে ফুটবল ম্যাচ নাটকে হাসির অভিনয় করবার জন্য চার্লিকে তাঁর দলে নিয়ে এলেন। সেই সময় চার্লির সতেরো বছর বয়স।

প্রথম রাতে অভিনয় করেই হল মাতিয়ে দিলেন চার্লি। দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়লেন। কৌতুক অভিনেতা হিসেবে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন চার্লি।

সুনামের সঙ্গে টানা দুই বছর এই দলে অভিনয় করলেন তিনি। এখানেই তাঁর পরিচয় হল অভিনেত্রী হেটি কেটীর সঙ্গে।

প্রথম আলাপেই দুজন দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সেই প্রথম প্রেম চার্লির জীবনে। কিছুদিন মেলামেশার পর চার্লি বিয়ে করতে চাইলেন কেটীকে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালেন কেটীর মা।

দুজনের মিলন আর সম্ভব হল না। জীবনের প্রথম প্রেমই এভাবে ব্যর্থ হল। অনেক দিন এই ব্যর্থতার বেদনা চার্লিকে পীড়া দিয়েছিল। জীবনে কেটীর সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হয়নি তাঁর। কিন্তু তাঁর স্মৃতি বয়ে বেড়িয়েছেন সারা জীবন।

চার্লির জীবনের প্রথম বিদেশযাত্রা ১৯০৯ খ্রিঃ। নাটকের দলের সঙ্গে প্যারিসে গেলেন। এখানকার মানুষের খোলামেলা উজ্জ্বল জীবন মুগ্ধ করল তাঁকে।

পাশাপাশি নিজের জীবন, জীবনযাত্রাকে খুবই অকিঞ্চিতকর মনে হল তাঁর। যেন তিনি অদৃশ্য কোন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। কিছুতেই বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছেন না। অথচ ক্রমাগত হাতছানি তাঁকে টানছে যেন অনুভব করছেন।

ইংলন্ডে ফিরে এসে আবার সেই ভ্রাম্যমাণ জীবনের একঘেয়েমির সঙ্গে যুক্ত হলেন। কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠছিলেন ক্রমশই ভেতরে ভেতরে। ভাঁড়ামো, রঙ্গ-তামাশা এসব যেন হঠাৎ কেমন কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। অথচ এটাই তাঁর নাটকের জীবনে বাঁধাধরা গন্ডি।

এই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবেই চার্লির জীবনে পরিবর্তনের সুযোগ এসে গেল। আমেরিকায় দলের একটা নতুন শাখা খোলার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে একজন কৌতুকাভিনেতার প্রয়োজন পড়েছিল।

কারোনার দলের মালিক ফ্রেডকারনো আমেরিকা যাবার প্রস্তাব দিতেই একরকম লুফে নিলেন চার্লি। নতুন কিছু করার জন্য ভেতরে ভেতরে তিনি প্রবল অস্থিরতা বোধ করছিলেন। ইংলন্ডে তা করবার সুযোগ ছিল না। কেননা এখানকার দর্শকরা তাঁর রঙ্গ-কৌতুকেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। নতুন কিছু ওরা সহজে মেনে নিতে চাইবে না।

চার্লি ইংলন্ড ছেড়ে আমেরিকায় চলে এলেন ১৯১০ খ্রিঃ। প্রথম অভিনয় করলেন ৩রা অক্টোবর নিউইয়র্কের কলোনিয়াল থিয়েটারে। নাটকের নাম আউ-হাউস।

নিউইয়র্কের দর্শকদের মন জয় করে নিলেন প্রথম অভিনয়ের রাতেই। পত্র-পত্রিকাতেও তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হল। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন চার্লি।

এরপর যেখানেই দলের সঙ্গে গেছেন সেখানেই তাঁর কৌতুকাভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ, আপ্লুত করেছে।

চার্লির জীবনে এভাবেই ধীরে ধীরে সৌভাগ্যের সূত্রপাত হতে লাগল।

একদিন নাটক দেখতে এসেছিলেন এক সিনেমা কোম্পানির কর্মকর্তা অ্যাডাম কেসেল। চার্লির অভিনয় দেখে তিনি এমনই মুগ্ধ হলেন যে নাটক শেষ হলে নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। সাগ্রহে প্রস্তাব দিলেন সিনেমায় অভিনয় করবার।

ততদিনে শিল্পী চার্লির স্বকীয় চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছে। তিনি কি করতে চান, কিভাবে তা করবেন—এসব বিষয়ে পরিষ্কার একটা ছক নিজের মনে তৈরি করে নিয়েছেন।

সেই সময় সিনেমা সবে হাঁটতে শিখেছে। নির্বাক যুগ। অভিনেতাদের মুখে সংলাপ থাকে না। পরিবেশ পরিস্থিতি বোঝাবার জন্য অভিনয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাজনা বাজানো হয়।

আমেরিকায় আসার পর এরকম দু-একটা সিনেমা দেখেছিলেন চার্লি। কিন্তু তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি। অভিনয়কে মনে হয়েছে নিতান্তই কৃত্রিম। আর বাজনা তো একেবারেই সামঞ্জস্যহীন।

এই ধারার সঙ্গে নিজেকে জড়াবার মত মানসিক সাড়া পেলেন না চার্লি। যদিও সপ্তাহে ষোল ডলার মাইনেটা ছিল রীতিমত লোভনীয়। তবুও তিনি সিনেমার অভিনয়ের প্রথম সুযোগ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন।

কেসেল ছিলেন পাকা জহুরী। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা তাঁর। চার্লির সহজাত প্রতিভা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও চার্লিকে রাজি করতে ব্যর্থ হলেন।

আমেরিকায় থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে সেবারের মত চার্লিকে ইংলন্ডে ফিরে আসতে হল। ফের এলেন দুবছর পরে।

এবারে মনস্থির করেই এসেছিলেন। প্রথমেই দেখা করলেন কেসেলের সঙ্গে। জানালেন থিয়েটারের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেই তাঁর কোম্পানিতে যোগ দেবেন।

কিছুদিন পরেই নাটকের সঙ্গে এতদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন চার্লি, যোগ দিলেন সিনেমায়। মাইনে স্থির হল সপ্তাহে পঁচিশ ডলার। নাটক দিয়ে যে অভিনয় জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল এভাবেই তার ছায়াছবির পর্দায় পদার্পণ ঘটল।

তখনো হলিউড সাধারণ পর্যায়ে। সাদামাটা কিছু যন্ত্রপাতি ও ছবির সেট ছাড়া সেখানে আর কিছু ছিল না।

কেসেলের সঙ্গে হলিউডে এসে চার্লির মন দমে গেল। এখানকার কাজের পরিবেশ, মানুষজন দেখে কাজের উৎসাহ ঝিমিয়ে গেল তাঁর। তবু প্রথম একটা ছবিতে অভিনয় করলেন। নিতান্তই যেন দায়সারা ভাবে।

থিয়েটারের সেই প্রণোচ্ছল টগবগে চার্লি যেন কেমন নিস্তেজ, প্রাণহীনভাবে হাতমুখ নেড়ে গেলেন কেবল। অভিনয়ের স্বতঃস্ফূর্ততার স্পর্শ তার মধ্যে ছিল না।

কর্মকর্তারা হতবাক হয়ে গেলেন চার্লির অবস্থা দেখে। কোম্পানির মালিক ম্যাক সেনেট তো রীতিমত নিরাশ হলেন এবং তা প্রকাশ করতেও ইতস্ততঃ করলেন না।

চার্লি সরাসরি তাঁর অভিযোগগুলি প্রকাশ করলেন। অভিনয়ে তাঁর কোন স্বাধীনতা ছিল না। এছাড়া সাজপোশাকও করতে হয়েছিল নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

এরপর চার্লি প্রস্তাব করলেন, তাঁর মতকরে অভিনয় করতে দিতে হবে। আর সাজপোশাকও নিজেই ঠিক করবেন।

শিল্পীর স্বাধীনতা মেনে নিলেন ম্যাক সেনেট। জানালেন, দ্বিতীয় ছবিতে তাঁকে অভিনয় করতে হবে এক সাংবাদিকের ভূমিকায়। সম্পূর্ণ হাসির রোল।

এবারে চার্লি নিজেই পড়লেন মুশকিলে। পোশাকের ব্যাপারটা নিয়ে আগে বিশেষ কিছু ভেবে রাখেননি তিনি। অথচ তাঁর ইচ্ছা এমন কিছু একটা করা, যা আগে

কেউ কখনো করেনি। আবার তা হবে এমন, যা দেখেই দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়তে বাধ্য হবে।

চিন্তায় ডুবে গেলেন চার্লি—পোশাকটা কেমন হওয়া দরকার কেবল তাই নিয়ে। পোশাকটাই হবে অভিনীত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

চার্লি যে ঘরে থাকতেন, তার পাশের ঘরেই থাকতেন দশাসই চেহারার এক অভিনেতা। তাকে লক্ষ করে হঠাৎই একদিন তাঁর মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলে গেল।

চার্লির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ দৈহিক মাপের সেই অভিনেতার ঢোলাঢালা ট্রাউজারটা পরে নিলেন। কিন্তু গায়ে চাপালেন নিজেরই ছোট হয়ে যাওয়া একটা জ্যাকেট।

মাথায় পরলেন বাউলার টুপি। লম্বা টাই ঝোলালেন গলায়। প্রতিবেশী অভিনেতার বিরাট আকারের জুতো দিয়ে পা ঢাকলেন, তবে উল্টোভাবে। এরপর হাতে নিলেন ছোট্ট ছড়ি, ঠোঁটের ওপরে সাঁটলেন খাটো গোঁফ।

সাজটা উদ্ভট-বিদকুটে রকমের হলেও চার্লির বেশ মনের মতই হল। তবে সেদিন তিনি নিশ্চয় কল্পনাও করতে পারেননি যে এই বিচিত্র উদ্ভট সাজেই একদিন জগৎজোড়া খ্যাতির অধিকারী হবেন।

পোশাক অনুমোদন করার পর চার্লি পাকাপাকিভাবে ঠিক করে নিলেন, এই বিচিত্র পোশাকের সঙ্গে তাঁর অভিনয়টাও হবে অদ্ভুত রকমের।

শিল্পী হিসেবে তাঁর যা বক্তব্য তা তিনি প্রকাশ করবেন এই পোশাক ও অভিনয়ের মোড়কেই।

এরপর পোশাক ও অভিনয় ভঙ্গিতে এক নতুন চার্লির আবির্ভাব ঘটল পর্দায়। যাত্রা শুরু হল চার্লি চ্যাপলিনের। এর পরে কেবল অর্থ, খ্যাতি, যশ, সম্মান—এরই ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল শিল্পী চার্লির জীবন।

স্বাধীনভাবে ছবি তৈরি করার উদ্দেশ্যে চার্লি কিছুদিন পরে দুই ধনী ব্যবসায়ীর সহযোগিতায় গঠন করলেন ইউনাইটেড আর্টিস্টস ফিল্মস। ১৯১৭ খ্রিঃ চার্লির সোলডার আর্মস ছবি চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা লাভ করল। ছবির সুবাদে অর্থাগম হতে থাকে স্রোতের মত।

১৯১৮ খ্রিঃ তিনি বিয়ে করলেন সুন্দরী তরুণী মিলড্রেড হ্যারিসকে। কিন্তু এই বিয়ে শান্তির হল না। অল্পদিন পরেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

এরই মধ্যে একে একে মুক্তি পেতে লাগল চার্লির দুনিয়া কাঁপানো সব ছবি। দি কিড, দি পিলগ্রিম, এ উওম্যান অব প্যারিস, দি গোল্ডরাশ, দি সার্কাস, দি সিটি লাইট ইত্যাদি।

শেষোক্ত ছবিতে চার্লির প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটল। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই ছবি তাঁর এক অনন্যসাধারণ অবদান।

চার্লি আগাগোড়া সেই ঢলঢলে ট্রাউজার, পায়ে বেঢপ মাপের জুতো, গায়ে আঁটোসাটো জামা, মাথায় বাউলার টুপি ইত্যাদি নিয়ে সব ছবিতে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছেন।

হলিউডে নিজস্ব বাড়ি তৈরি হলে চার্লি সেখানে তাঁর চিরদুঃখিনী মাকে নিয়ে এসেছিলেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি এখানেই মাতৃভক্ত পুত্রের সেবাযত্নে সুখে অতিবাহিত করেছেন।

১৯৩১ খ্রিঃ হলিউডে নির্বাক ছবির যুগ শেষ হলে নরদানব হিটলারকে নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে নির্মিত হল চার্লির দি গ্রেট ডিকটেটর ছবি। এই ছবিতে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর কৌতুকের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন হিটলারের চরিত্র। এই ছবি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চার্লির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, তিনি কমিউনিজম প্রচার করছেন।

চার্লির ছবির বিশেষত্ব হল, মানুষের জীবনের ছোট ছোট দুঃখ, সুখ, ব্যথা-বেদনা, অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, প্রগাঢ় ভালবাসা, অন্যায়ের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও মানবিক চেতনা তাঁর প্রতিটি ছবির মূল প্রতিপাদ্য।

মঁসিয়ে ভার্দু, লাইম লাইট, এ কিং অব নিউইয়র্ক চার্লির অসামান্য ছবিগুলোর অন্যতম।

১৯১৪ খ্রিঃ থেকে ১৯৩৯ খ্রিঃ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সব ছবি। তিনি হয়ে উঠেছিলেন চলচ্চিত্র জগতের একচ্ছত্র অধিপতি। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তাঁকে আপনজন বলে মেনে নিয়েছে। দেশে দেশে তিনি লাভ করেছেন রাজকীয় সম্বর্ধনা।

চার্লির চতুর্থ স্ত্রীর নাম উনা। ইনি ছিলেন আমেরিকান নাট্যকার ইউজিন ও-নীলের কন্যা। চুয়ান্ন বছর বয়সে আঠারো বছরের উনাকে বিয়ে করেছিলেন চার্লি এবং তাঁদের বিবাহিত জীবন ছিল সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন চার্লি। তাঁর জীবন ছিল অনন্য নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও মানব প্রেমের প্রতিভূস্বরূপ। আত্মজীবনীতে তাঁর জীবনবোধ ও আদর্শ অকপটভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি।

১৯৭১ খ্রিঃ ২৫শে ডিসেম্বর সুইজারল্যান্ডের বাসভবনে বিশ্বমানবতার পূজারী ও রুপোলী পর্দার অনন্য নায়ক চার্লি চ্যাপলিনের জীবনাবসান হয়।

হেলেন কেলার



মানব সভ্যতার ইতিহাসের অন্যতম মহীয়সী নারী, মানুষের চেষ্টা ও উদ্যমের পবিত্র প্রতিমূর্তি হেলেন কেলার। নিজের বিচিত্র জীবনের কাহিনী লিখতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন "আমার জীবন নিরন্তর সংগ্রামের জীবন"। বস্তুতঃ হেলেন কেলারের জীবন এক অপরাজেয় সংগ্রামী মানুষের জীবন-কাহিনী। সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে একজন মানুষ কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় ভাগ্যকে জয় করতে পারে, নিজের জীবন দিয়ে তিনি তা প্রমাণ করেছেন।

১৮৮০ খ্রিঃ ২৭শে জুন উত্তর আমেরিকার টুসকুমরিয়া নামক এক ছোট্ট শহরে জন্ম। তাঁর পিতার নাম আর্থার কেলার, মায়ের নাম ক্যাথারিন।

জন্মের সময় হেলেন ছিলেন অন্য পাঁচটি শিশুর মতই সবল সুস্থ স্বাভাবিক। তাঁর ফুটফুটে চেহারা দেখে আর মুখের আধো আধো বুলি শুনে বাবামায়ের মন ভরে উঠত।

যখন বয়স মাত্র একবছর সাত মাস সেই সময় একদিন তিনি হঠাৎ করে মায়ের কোল থেকে মাটিতে পড়ে যান। এই আকস্মিক দুর্ঘটনাই ছোট্ট হেলেনের জীবনে নিয়ে আসে দুর্ভাগ্যের অভিশাপ। কিছুদিন জ্বর ভোগের পরেই তিনি চিরতরে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল তাঁর মুখের ভাষাও।

বাইরের পৃথিবীর কোন শব্দ তিনি শুনতে পেতেন না। কোন আলো তাঁর চোখে ছায়া ফেলত না। দিন রাতের কোন পার্থক্য তাঁর কাছে ছিল না।

নিজের থেকে কোন কিছুই করতে পারতেন না তিনি। সারাক্ষণ তাই মাকে কাছে কাছে থাকতে হত।

একমাত্র সন্তানের এই অবস্থা বাবামায়ের বুক ভেঙ্গে দিল। তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টায় নিবিড় সান্নিধ্যে সন্তানের দুঃখ-বঞ্চনাকে ভাগ করে নিলেন।

একটা জড় পদার্থের মত সারাক্ষণ বসে থেকে থেকে কয়েকটা বছর কেটে গেল। বয়স একটু বাড়তে নিজের জীবনের যন্ত্রণা-বঞ্চনা উপলব্ধি করতে পারলেন হেলেন।

অবরুদ্ধ আবেগে অসহায়ভাবে চিৎকার করতেন তিনি, জেদে আক্রোশে হাতের নাগালে যা পেতেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেন। স্নেহ দিয়ে সান্নিধ্য দিয়ে মা তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করতেন।

হেলেনের বাবামা ধরেই নিয়েছিলেন, তাঁদের মেয়ের জীবনে আশার আলো চিরদিনের মত নিবে গেছে। চির অন্ধকারের মধ্যেই কাটবে হেলেনের বাকি জীবনটা।

তবু এই বোবা অন্ধ মেয়েকে কি করে লেখাপড়া শেখানো যায় তা নিয়ে তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন।

ভাগ্যেরই যোগাযোগ বলতে হবে, একদিন আকস্মিকভাবে ওয়াশিংটনের বিখ্যাত ডাক্তার আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের সঙ্গে আর্থার কেলারের পরিচয় হল। বেল তাঁকে সন্ধান দিলেন বোস্টনের পার্কিনস ইনসটিটিউশনের। অন্ধদের শিক্ষা দেবার পদ্ধতি এখানে শিক্ষা দেওয়া হত।

প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হো তখন মারা গিয়েছিলেন। নতুন ডিরেক্টর হয়ে যিনি এসেছিলেন তাঁর নাম মাইকেল অ্যাগানেসে।

কেলার দম্পতি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের মেয়ের কথা খুলে জানালে মাইকেল অ্যাগানেস একজন শিক্ষয়িত্রীর ওপর হেলেনের শিক্ষার ভার দেবার পরামর্শ দিলেন। কেলার দম্পতি সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হলেন।

তাঁদের আশা যদি হেলেন কোনভাবে জীবনে আলোর সন্ধান পেতে পারে তাহলে নতুন জীবন লাভ করবে।

১৮৮৭ খ্রিঃ ৩রা মার্চ। এই দিন একুশ বছরের এক তরুণী মিস অ্যানি সুলিভ্যান ম্যানসফিল্ড কেলার পরিবারে এসে হেলেনের শিক্ষার দায়িত্ব নিলেন। বস্তুতঃ তিনিই হেলেনের অন্ধকার জীবনে নিয়ে এলেন প্রথম আলো।

এই শিক্ষিকার জীবন হেলেনের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা ও যত্নের ফলেই হেলেনের পক্ষে জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করা সম্ভব হয়েছিল।

অ্যানি মানুষ হয়েছিলেন সরকারী অনাথ আশ্রমে। দরিদ্র আইরিশ পরিবারের সন্তান, আট বছর বয়সেই মাতৃহারা হন। কিছুদিন পরে পিতাও নিরুদ্দেশ হয়ে যান। অসহায় দুটি ভাইবোন স্থান পেয়েছিলেন সরকারী অনাথ আশ্রমে। ছেলেবেলা থেকে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিল বলে অ্যানিকে থাকতে হয়েছিল ম্যাসাচুসেট প্রতিবন্ধীদের হোমে। পরে সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় পার্কিনস ইনসটিটিউটে। সময়টা ১৮৮০ খ্রিঃ।

এখানে কয়েকজন ডাক্তারের আন্তরিক চেষ্টায় এবং দুবার অপারেশনের পরে অ্যানি স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। এরপর তিনি অন্ধদের শিক্ষা দেবার কাজেই নিজেকে উৎসর্গ করেন।

অ্যানির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটার কথা বলতে গিযে হেলেন তাঁর আত্মজীবনী The story of my life গ্রন্থে লিখেছেন যে সেইদিনটা প্রকৃতপক্ষে ছিল তাঁর আত্মার জন্ম দিন। তাঁর শিক্ষার গুণেই তিনি নতুন জীবন পেয়েছেন।

গোড়ার দিকে কয়েক সপ্তাহ হেলেন কিছুতেই অ্যানিকে সহ্য করতে পারতেন না। অ্যানি কাছে এলেই, হাত পা ছুঁড়ে কান্না জুড়তেন।

অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অ্যানি সব সহ্য করেছেন। মায়ের মত স্নেহ মমতা দিয়ে ধীরে ধীরে তিনি হেলেনকে নিজের বশে এনেছেন। তারপর শুরু করেছেন তাঁর শিক্ষার কাজ।

হেলেনকে শিক্ষা দেবার কাজটিও ছিল রীতিমত এক কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষা। হৃদয়ভরা মমতা ছিল বলেই অ্যানির ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রম সার্থকতামন্ডিত হয়েছিল।

জলের প্রকৃতি অনুভব করাবার জন্য হেলেনের হাতের ওপর একটু একটু করে জল ঢেলে দেওয়া হত। তারপর জল-ভেজা আঙুল দিয়ে তাকে বারবার করে মাটির ওপর লেখানো হত জল শব্দটি। এভাবে বারবার লিখিয়ে শব্দটির সঙ্গেও তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হতো।

এভাবে আশপাশের প্রতিটি বস্তুর সাথে হেলেনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হত। বস্তুর আকার আয়তন স্পর্শ অনুভূতি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হত। তারপর অ্যানি নিজের আঙুল দিয়ে বস্তুর নাম হেলেনের হাতের পাতার ওপরে লিখতেন। কখনো বা হেলেনকে দিয়ে সেই নাম বারবার করে লেখাতেন।

অ্যানির চেষ্টায় ও যত্নে হেলেনের সুপ্ত প্রতিভা ধীরে ধীরে জেগে উঠতে লাগল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সব কিছু শিখে নিতে লাগলেন। এইভাবেই একদিন হেলেন ব্রেল পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে ইংরাজি, লাতিন, গ্রীক, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করলেন।

একই সঙ্গে তিনি আঙ্গুলের স্পর্শের মাধ্যমে নিজের মনের ভাবও প্রকাশ করতে শিখলেন।

ইতিপূর্বে নরওয়ের একটি মূক শিশুকে বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে কথা বলতে শেখানো হয়েছিল। অ্যানি সেই পদ্ধতির সাহায্যে দীর্ঘ এগারো মাস চেষ্টার পর হেলেনের মুখে প্রথম কথা ফোটাতে সক্ষম হলেন।

পরবর্তীকালে হেলেন নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতেন, তবে কথাগুলো উচ্চারিত হত জড়ানো ভাবে। এই ত্রুটি অবশ্য পরে বিশেষ চিকিৎসায় অনেকটাই কমে গিয়েছিল।

নিজের চেষ্টাতেই হেলেন কুড়ি বছর বয়সের মধ্যেই ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য জ্ঞান অর্জন করলেন। তাঁকে তখন র‍্যাডক্লিফ কলেজে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল।

ক্লাশে অধ্যাপকদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন হেলেন। পরে হাতের তালুতে তা লিখে নিতেন।

এমন ক্লান্তিকর কাজটি করতে কখনো ধৈর্যচ্যুত হননি তিনি। তাঁর এই অমানুষিক পরিশ্রম ব্যর্থ হয়নি।

চার বছর পরে যখন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ পেল, দেখা গেল, হেলেন কলেজে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বি.এ পাশ করেছেন।

কলেজ জীবনে হেলেন সহপাঠীদের সঙ্গে প্রাণখুলে মেলামেশা করতেন। কাউকে স্পর্শ করেই তার মানসিক প্রকৃতি অনুভব করার দুর্লভ ক্ষমতা তিনি লাভ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে দেখা গেছে কেবলমাত্র স্পর্শদ্বারাই তিনি নির্ভুলভাবে কোন মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারতেন।

কলেজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হেলেন যোগদান করতেন। এই সময়েই তাঁর সাহিত্য চর্চার শুরু। Optimism নামে আত্মজীবনীমূলক একটি ছোটগল্প তিনি কলেজে পড়বার সময়েই লিখেছিলেন।

বি. এ. পাশ করবার পর তিনি লেখেন তাঁর আত্মজীবনী The story of my life। জীবনের তেইশ বছরের যে কাহিনী তিনি বিবৃত করেছেন, তা যেমনি মর্মন্তুদ তেমনি রোমাঞ্চকর।

কিভাবে অ্যানি দিনে দিনে তাঁর শ্রদ্ধা ভালবাসা নির্ভরতা অর্জন করেছেন, কিভাবে তিনি তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছেন, তাঁকে হাত ধরে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার এক মর্মস্পর্শী জ্বলন্ত বিবরণ রয়েছে এই বইয়ের প্রতিটি পাতা জুড়ে।

একটি অন্ধ মূক বধির মেয়ে অমানুষিক ধৈর্য ও পরিশ্রমের বলে নিজেকে মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এই সুকঠোর অবিশ্বাস্য জীবন সংগ্রামের কাহিনী যখন দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সকলে।

হেলেনের নাম দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশের মানুষের কাছেও পরিচিত হয়ে গেল।

নিজের জীবনের অপূর্ণতা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন হেলেন। অপরের জীবনকে অপূর্ণতার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি তীব্র ব্যাকুলতা বোধ করতেন।

অন্তর দিয়ে নানা সমস্যা বুঝবার চেষ্টা করতেন। পরে এই সব সমস্যা নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু করলেন।

তাঁর এই সব লেখায় থাকত, মানুষের জীবনের বিভিন্ন সমস্যার কথা, শিশুদের নিরাপদ জীবন লাভের কথা, খনিশ্রমিকদের বঞ্চিত দুঃখময় জীবনের কথা ও সমাজতন্ত্রের কথা।

স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা, আন্তরিক আকুতি থেকেই মুক্ত মনে এসব কথা লিখতেন হেলেন। তিনি কোন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, কোন গোঁড়ামি বা অন্ধ বিশ্বাসও তাঁর ছিল না।

সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী র‍্যাডিকাল পার্টির এক কর্মকর্তা মিঃ ম্যাকি। অ্যানি তাঁকে বিয়ে করলেন।

এই বিয়েকে কেন্দ্র করে একশ্রেণীর লোকের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল অ্যানিকে। বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থক বলে তাঁর নামে অভিযোগ তোলা হয়েছিল।

হেলেন বা অ্যানি অবশ্য এতে বিচলিত হননি। অবজ্ঞার সঙ্গেই দুজনে এসব উপেক্ষা করেছিলেন।

সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন হেলেন। অ্যানি সংসার জীবনে চলে গেলে তিনি জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার কাজ বেছে নিলেন।

অ্যানির সংসার জীবন সুখের হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। অ্যানি আবার যুক্ত হলেন হেলেনের জীবনের সঙ্গে। তাঁদের এই বন্ধন আমৃত্যু অবিচ্ছিন্ন ছিল।

এবার থেকে হেলেন আর অ্যানির জীবন কাটতে লাগল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে। কখনো নিজেরাই নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে মঞ্চে বক্তৃতার আয়োজন করতেন। দলে দলে লোক তাঁদের সভায় ভিড় করত।

হেলেন সম্পর্কে মানুষের মনে ছিল কৌতূহলের সঙ্গে শ্রদ্ধাবোধ। তাঁকে দেখার জন্য তাঁর জীবনের কথা, উপলব্ধি অনুভবের কথা শুনবার জন্য সকলেই যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করত।

হেলেন নিজের জীবনের আলোকে সকলকে শোনাতেন আশার কথা, বিশ্বাসের কথা, কিভাবে মনোবল বাড়ানো যায় এসব কথা।

হেলেনের কথা জড়ানো ছিল বলে অনেক কথাই সহজে বোঝা যেত না। অ্যানি তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলে দিতেন।

এইভাবে বক্তৃতা করে যে অর্থ উপার্জন হত, তা দিয়ে দুজনকে যথেষ্ট অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেই দিন কাটাতে হত। তবু তাঁরা কখনো মনোবল হারাননি, তাঁদের উদ্যম আহত হয় নি।

অ্যানির দৃষ্টিশক্তি বরাবরই ছিল দুর্বল। ক্রমেই চোখের অবস্থা খারাপ হতে আরম্ভ করেছিল। কিছুদিনের মধ্যে একরকম অন্ধই হয়ে গেলেন। হেলেন ও অ্যানির একাত্ম জীবন যে ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছিল তার সামনে উপস্থিত হল এক বাধার প্রাচীর।

এই দুঃসময়ে তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন এক সহৃদয় তরুণী, তাঁর নাম পলি টমসন। হেলেনের সংগ্রামী জীবন, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর বক্তৃতা পলিকে মুগ্ধ করেছিল।

পরবর্তীকালে হেলেনের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

সামান্য বক্তৃতার আয় থেকে যখন দুজনের ব্যয়ভার ক্রমশঃ দুর্বহ হয়ে উঠছিল সেই সময় ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতই কিছু সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তাঁদের চেষ্টায় ও দানে হেলেন ও অ্যানির জীবনের অভাব দূর হল। তবে সমস্ত অবস্থার মধ্যেই হেলেন তাঁর আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন। নিজের ব্যয়ভার নিজেই যথাসাধ্য বহন করবার চেষ্টা করেছেন।

হেলেন তাঁর জীবনে দেশ বিদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে সকলেই মুগ্ধ অভিভূত হয়েছেন।

টেলিফোনের আবিষ্কারক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল ছিলেন বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোকাল ফিজিওলজির অধ্যাপক। তিনি নিজের মেয়ের মত হেলেনকে ভালবাসতেন। নানাভাবে তাঁকে সাহায্যও করতেন।

একবার তিনি হেলেন আর অ্যানিকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে বেরোন। দেশের বাইরে সেই প্রথম পা রাখেন হেলেন।

নতুন দেশে নতুন পরিবেশে দৃষ্টি দিয়ে তিনি কিছু প্রত্যক্ষ করতে না পারলেও অনুভব দিয়ে সেই অচেনা জগৎকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতেন। একবার যে পথে যেতেন সে-পথ কখনো ভুলতেন না।

পথে কোথায় হাসপাতাল, কোথায় গীর্জা কিংবা নদী, বাগান বা কারখানা—এসবের অস্তিত্ব তিনি নির্ভুলভাবে বুঝতে পারতেন।

অ্যানির আন্তরিক চেষ্টায় হেলেনের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল এক আশ্চর্য শক্তি। কোন মানুষের কণ্ঠনালীর ওঠা পড়া অনুভব করেই তিনি তার প্রতিটি কথা বুঝতে পারতেন।

একবার মাত্র যাকে স্পর্শ করতেন, দীর্ঘকাল পরেও তাকে চিনতে তাঁর ভুল হত না। হেলেন শিশুদের মধ্যেই সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন।

বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন হেলেন। এই অসামান্য প্রতিভাময়ী নারী সর্বত্রই শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়েছেন। রাষ্ট্রনায়ক থেকে সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখে তাঁর কথা শুনে সকলেই হয়েছেন বিস্ময়বিমুগ্ধ।

তাঁর গুণমুগ্ধ অনুরাগীদের মধ্যে ছিলেন বার্নার্ড শ, মার্ক টোয়েন, উড্রু উইলসন, জওহরলাল নেহরু, স্যার হেনরি আরভিং প্রমুখ এবং বিশ্বের আরও অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে হেলেনের অনুরাগীদের জড়িয়ে একদল কুৎসাবাদী লোক তাঁর নামে অপবাদ রটনা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। দীর্ঘাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী হেলেনের আকর্ষণী শক্তিই তাঁর নিন্দা রচনাকারীদের ইন্ধন জুগিয়ে ছিল। অনেকে এ-ও প্রচার

করেছিল যে হেলেন যশ ও খ্যাতির লোভে অন্ধ সেজে থাকেন, নিজের কথা যা বলেন সবই বানানো মিথ্যা।

যাইহোক, হেলেন ছিলেন সমস্ত কুৎসা ও অপপ্রচারের উর্ধ্বে। গভীর আত্মবিশ্বাস ও মানসিক দৃঢ়তা নিয়েই তিনি সর্বপ্রকার প্রতিকূলতাকে জয় করেছেন।

হলিউডের এক পরিচালকের অনুরোধে হেলেন একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ছবির নাম রাখা হয়েছিল Deliverence। এই ছবিতে হেলেনের প্রকৃত জীবনকে বাদ দিয়ে তাঁকে অন্য ভূমিকায় তুলে ধরা হয়েছিল। তাঁকে স্থান দেওয়া হয়েছিল জোয়ান অব আর্কের সমপর্যায়ে—শান্তির লক্ষে আত্মোৎসর্গকারী এক অসাধারণ নারীরূপে উপস্থাপিত হয়েছিলেন তিনি। এই চলচ্চিত্র অবশ্য দর্শকমনে আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পারেনি।

আমেরিকান ফাউন্ডেশন ফর ব্লাইন্ড প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল। ১৯২২ খ্রিঃ তিনি মারা যান। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে হেলেন এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। অন্ধদের কল্যাণে কাজ করার এক বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র পেলেন তিনি।

দেশের অন্ধ ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য বহু সংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠা হল তাঁর উদ্যোগে। অন্ধদের মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি তার জন্যও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে সব মানুষ নিজেদের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল তাদের কল্যাণের জন্যও তিনি নিরলসভাবে চেষ্টা করে গেছেন।

কেবল আমেরিকাই নয়, পৃথিবীর বহু দেশের অন্ধ-কল্যাণ সংস্থার সঙ্গেই হেলেন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। নিজের জীবনই হয়ে উঠেছিল তাঁর সমস্ত কর্মপ্রেরণার উৎস।

দেশে দেশে ঘুরে সভাসমিতিতে বক্তৃতা করে হেলেন অন্ধদের কল্যাণকর্মের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। সেই অর্থে তিনি গড়ে তুলেছিলেন পঞ্চাশটিরও বেশি প্রতিষ্ঠান।

তাঁর চেষ্টাতেই হাজার হাজার অন্ধ আশাহত মানুষ, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

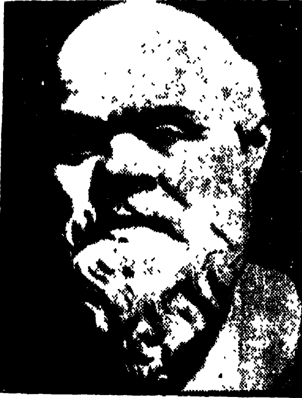
কেলারের শিক্ষয়িত্রী ও জীবনের সর্বক্ষণের ও সর্বকাজের সঙ্গী ও সহযোগী অ্যান মারা যান ১৯৩৬ খ্রিঃ। অ্যানের শিক্ষায় ও সহযোগিতাতেই হেলেন লাভ করেছিলেন জীবনের আলো। সেই আলো তিনি উৎসর্গ করেছিলেন পৃথিবীর সব মানুষের কল্যাণে।

অ্যানের পরে হেলেন তাঁর সুবিশাল কর্মযজ্ঞে সঙ্গী পেলেন পলি টমসনকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলে তিনি দেশে দেশে ঘুরে প্রচার করেছেন শান্তির বাণী।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও পরিচয় হয় হেলেনের। কবিকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে হেলেন শান্তিনিকেতনে এসে গভীর আনন্দ লাভ করেছিলেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক স্নাতক উপাধিতে ভূষিত করেন। দেশ বিদেশের বহু সম্মান লাভ করেছেন তিনি। খ্যাতি, সম্মান, অর্থ—এই সবকিছুর মধ্যেই নিজের আদর্শ অটুট রেখে কর্তব্য করে গেছেন হেলেন।

প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর মানুষের কল্যাণে কাজ করে কর্মরত অবস্থাতেই ১৯৬৮ খ্রিঃ ১লা জুলাই হেলেনের কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

সক্রেটিস



আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের কথা। গ্রীসের সিংহাসনে তখন সম্রাট পেরিক্লিস। তাঁর রাজত্বকালেই প্রাচীন গ্রীস উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছিল।

বহু বিখ্যাত নাট্যকার, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক এইযুগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে জগৎবরেণ্য দার্শনিক সক্রেটিস অন্যতম।

অনেক সুপ্রাচীন বিষয়ের মত পণ্ডিত-দার্শনিক সক্রেটিসের জন্মের সন-তারিখ ইত্যাদি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯ অব্দে, কারো মতে ৪৭০ অব্দে এথেন্স নগরীর উপকণ্ঠে সক্রেটিসের জন্ম। সক্রেটিসের বাবা ছিলেন সাধারণ এক ভাস্কর। ছেলেবেলা সক্রেটিস বাবার সঙ্গে থেকে মূর্তি গড়ার কাজ শিখেছিলেন।

ভাস্কর্য বিদ্যায় সেই সময় গ্রীসের খ্যাতি দেশের বাইরেও। অতীতের গ্রীক ভাস্কর্যের অতুলনীয় নিদর্শন আজো কিছু কিছু অক্ষত অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।

বালক সক্রেটিস বাবার পাশে থেকে মূর্তিগড়া দেখেন, কখনো তাঁকে সাহায্য করেন। নিজেও কিছু যে চেষ্টা না করেন তা নয়। কিন্তু মূর্তি খোদাইয়ের কাজে যেন ঠিক তৃপ্তি পেত না তাঁর মন।

কাজ করতে করতে প্রায়ই উদাস হয়ে পড়েন তিনি। চারপাশের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তাঁর মাথায় ভিড় জমাত।

শেষ পর্যন্ত জীবন ধারণের জন্য জাগতিক ব্যবস্থা ভাস্কর্যবিদ্যাকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হল তাঁর। জীবনের সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে একদিন তিনি গৃহত্যাগ করলেন।

প্রাচীন গ্রীসে সফিস্ট নামে একটি সম্প্রদায় ছিল। এই সফিস্টদের পেশা ছিল দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো। সেই কারণে সমাজে সফিস্টরা যথেষ্ট সম্মান পেতেন।

তাদের অর্থ উপার্জনও হত যথেষ্ট। গ্রীকরা গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতাকে একটি মহৎ গুণ বলে মনে করত এবং গুণীর সম্মান দেখাতে বা মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে তারা কার্পণ্য করত না। কাজেই সফিস্টদের আয় রোজগার যথেষ্টই ভাল ছিল বলা চলে।

বক্তৃতা দেওয়া মহৎ গুণ তাতে সন্দেহ নেই, এই গুণ চেষ্টা ও চর্চার দ্বারা অর্জন করতে হত। যুক্তি দিয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে গুছিয়ে কথা বলা রীতিমত অভ্যাসের ব্যাপার।

অন্যান্য শিল্পকর্ম যেমন চর্চা ও অনুশীলনের দ্বারা সম্ভব হয়, তেমনি কোন বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তব্যকেও শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারা যায় নিরন্তর অনুশীলনের মাধ্যমে।

সমাজের সফিস্টরা তাই নিজেরা যেমন বক্তৃতা দিতেন, তেমনি অন্য লোককেও শেখাতেন। রাস্তার মোড়ে, মাঠে-ময়দানে বা হাটে-বাজারে দাঁড়িয়ে যখন এঁরা নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন, সেই সময় তরুণ অনেক শিক্ষার্থীও থাকত তাঁদের সঙ্গে। হাতে কলমে তালিম গ্রহণই ছিল এই শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে।

সক্রেটিস এসে এই সফিস্ট দলে যোগ দিলেন। তাদের দলের সঙ্গে কিছুদিন নানাস্থানে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই সফিস্টদের সম্বন্ধে তাঁর মন বিরূপ হয়ে উঠল।

সক্রেটিস দেখলেন যে সফিস্টরা শুধু যন্ত্রের মত কথাই বলে, সেই সব কথার মধ্যে সারবস্তু কতটা আছে, কি পরিমাণ সত্য ও যুক্তি আছে তা নিয়ে মোটেই ভাবনা-চিন্তা করে না।

পুরনো গতানুগতিক ভাবধারাই সকলে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুলে ধরে। স্বাধীন চিন্তা বলতে কারোরই কিছু নেই।

সকলেরই একমাত্র লক্ষ অর্থ উপার্জন—এজন্য গুছিয়ে কথা বলার দিকেই সকলের মনোযোগ নিয়োজিত। বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত সক্রেটিস সফিস্টদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন।

তাঁর মনে নানা প্রশ্ন। তার ব্যাপ্তি পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু থেকে সৃষ্টিকর্তা ভগবান পর্যন্ত। ভগবান কে? মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি? প্রকৃত রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত?

দয়া, ধর্ম, ভক্তি এসব কথার মর্ম কি? মানুষের জীবনে এসবের প্রয়োজনীয়তা কি? এসব হাজারো প্রশ্ন নিরন্তর তাঁর মনে উদিত হতে থাকে। নিজেকেই নিজে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন, কে দেবে এসব প্রশ্নের উত্তর?

সমাজে যারা জ্ঞানীগুণী বলে পরিচিত, তাঁদের কাছে এসব প্রশ্নের সমাধান চেয়েও হতাশ হন তিনি। তাঁরা সেই পুরনো ধ্যানধারণার কথাই আওড়ান। তাঁদের সব কথার যুক্তি তিনি খুঁজে পান না।

নিজের চিন্তায় ডুবে থেকে সক্রেটিস উদভ্রান্তের মত পথে পথে ঘুরে বেড়ান। পায়ে জুতো নেই, পোশাক-আসাকের বালাই নেই। পথ চলেন আর পথের মানুষদের ধরে ধরে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর কথা শুনে কেউ হাসে, কেউ টিটকারি দেয়, কেউ পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সকলেই ভাবে সক্রেটিস পাগল হয়ে গেছে।

তা পাগল ভাববার অন্য কারণও ছিল। জাতি হিসেবে গ্রীকরা সকলেই সুগঠিত সুন্দর দেহের অধিকারী। স্বভাবতই তারা সুন্দরের পূজারী। অসুন্দর কিছু দেখলে সহজেই তাদেব মন বিরূপ হয়ে পড়ে।

সক্রেটিস নিজে ছিলেন কদাকার—মাথাজোড়া টাক, গোলমুখ, চ্যাপ্টা নাক, থলথলে শরীর। তার ওপরে অপরিচ্ছন্ন আলুথালু বেশবাসে তাকে পাগল বলে মনে হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিল না। সমস্ত অবয়বের মধ্যে কেবল চোখদুটি ছিল আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল।

কিন্তু সেই বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দিকে সাধারণ মানুষের তাকাবার ফুরসৎ কোথায়? তাদের কেবল নজরে পড়ত, লোকটা দিনরাত উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে আর যাকে খুশি যা-তা প্রশ্ন করছে। কখনো ভগবানের কথা, কখনো বা প্রশ্ন, বল তো বাবা মাকে কেন শ্রদ্ধা করা উচিত? দয়া-ভক্তি-ভালবাসা এসব কথার অর্থ বোঝ?

তারা দেখতে পেত লোকটা এভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদিকে তার বাড়িতে বৌ ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে দিন কাটাচ্ছে। তাদের ভরণপোষণের চিন্তা নেই, টাকাপয়সা রোজগারের ধান্দা নেই, নিজে কি খাবে তার ভাবনাও নেই।

গোড়ার দিকে সক্রেটিসকে নিয়ে সকলেই হাসি-তামাসা করত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, তারা বুঝতে পারল, এ পাগল সাধারণ পাগল নয়। তার প্রশ্নগুলো এলোমেলো বটে. শুনলে হাসি পায়, কিন্তু জবাব দিতে গেলে বোকা বনে যেতে হয়।

আরও পরে সক্রেটিসের মুখ থেকে নানা প্রশ্নের জবাব শুনে লোকেরা বুঝতে পারল, তারা এতদিন কেবল বাঁধা বুলি মুখস্থ করেছে, সফিস্টরা যা বলেছে, তাই একবাক্যে মেনে নিয়েছে। কিন্তু খুঁটিয়ে বিচার করলে সক্রেটিসেব কথাগুলোই বেশি যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ হচ্ছে। তারা যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে যা বিচার করেনি, সক্রেটিস তাই করেছে।

ধীরে ধীরে সকলের মনের ঘোর কাটল, সকলের বিস্ময় জাগল, বিস্ময় থেকে শ্রদ্ধা।

তারা বুঝতে পারল, নিতান্ত পাগল হলে লোকটা এমন মনের জোর, একনিষ্ঠা ধৈর্য ও অধ্যবসায় বজায় রাখতে পারত না।

সক্রেটিসের অপরিসীম ধৈর্যের বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত। তার মধ্যে একটি হল, হঠাৎ একবার রটে গেল, সক্রেটিস ভোরবেলা থেকে একজায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে

কি ভেবে চলেছেন। দলে দলে লোক জড়ো হতে লাগল তাঁকে দেখবার জন্য। সকলেই দেখল, সক্রেটিসের কোনদিকেই খেয়াল নেই, নিজের ভাবনায় ডুবে আছেন।

সকাল গিয়ে দুপুর হল, দুপুর থেকে সন্ধ্যা। দিন শেষ হতে চলল, সক্রেটিস তখনো এক জায়গায় অটল অনড় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কৌতূহলী হয়ে অনেকেই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সক্রেটিসের কান্ড।

ক্রমে রাত গভীর হল। সক্রেটিস তখনো দাঁড়িয়ে ভাবছেন। তাঁর সেই ভাবনার অবসান হল পরদিন সকালে—যখন আকাশে সূর্যোদয় হল।

এই ঘটনার মধ্য দিয়েই এই বিশ্ববরেণ্য দার্শনিকের অপরিসীম ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা ও জ্ঞান পিপাসার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সক্রেটিস সেদিন নিশ্চয়ই কোন অমীমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসায় ডুবে ছিলেন চিন্তার জগতে।

ইতিমধ্যে নাগরিকদের অনেকেই সক্রেটিসের যুক্তিপূর্ণ কথা ও আলোচনা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে দেশের তরুণ সম্প্রদায়। দিনে দিনে তরুণদের মধ্যে সক্রেটিসের চিন্তার প্রভাব বেড়ে চলতে লাগল। অনেকে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁদের মধ্যে প্লেটো ও জেনোফোনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী যুগে প্লেটো একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও জেনোফোন ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

অন্যান্য দার্শনিকদের মত সক্রেটিস নিজের মতামত কোন গ্রন্থে লিখে যান নি। তিনি কখনো কিছু লিখতেন না। সবসময় একদল শিষ্য নিয়ে কথা বলতে বলতে ঘুরে বেড়াতেন কিংবা কোথাও বসে মুখে মুখে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। প্লেটো ও জোনোফোন সক্রেটিসের জীবনী ও মতবাদ লিখে রেখে গেছেন। তাঁদের লেখা থেকেই সক্রেটিস সম্পর্কে যা কিছু জানা সম্ভব হয়েছে।

সক্রেটিসের মূল কথা ছিল Know thyself অর্থাৎ নিজেকে জানো। সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বলেই সক্রেটিস সম্মানীত। কিন্তু নিজের সম্পর্কে সক্রেটিস বলতেন, One thing only I know, and that is that I know nothing. তিনি বলতেন, আমি এটুকুই কেবল জানি যে আমি কিছুই জানি না।

এই বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক এই কথার দ্বারা বলতে চেয়েছেন, মানুষের জানার কোন সীমা নেই, জ্ঞান অসীম ও অনন্ত।

সক্রেটিসের মতে জ্ঞানই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। মানুষকে বিচার করতে হবে সে কি রকম জ্ঞানী তাই দিয়ে। আর জ্ঞান হল আহরণের বা অর্জনের জিনিস তা আপনা থেকে মনের মধ্যে উৎপন্ন হয় না।

তাই কেউ বৃদ্ধ হয়েছে বলেই তাকে জ্ঞানী বলা যায় না, যদি না সে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করে।

এই কারণেই মা-বাবা যদি অশিক্ষিত হন, তবে তাঁরা শুধু গুরুজন বলেই সন্তানদের ভক্তিশ্রদ্ধা পেতে পারেন না।

রাষ্ট্রের বিষয়েও নানা কথা বলে গেছেন সক্রেটিস। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রের যিনি কর্ণধার, দেখতে হবে তিনি সত্যিকার কর্ণধার হবার উপযুক্ত কিনা। নইলে রাজার ছেলে বলেই রাজা হবেন, কিম্বা সবাই ভোট দিয়েছে বলে বা গায়ের বলে দেশটা দখল করতে পেরেছে বলেই একজন দেশের হর্তাকর্তা হবেন—সকলে তাকে মান্য করে চলবে, হতে পারে না। বিচার করে দেখতে হবে, দেশ শাসন করবার উপযুক্ত বিবেক বুদ্ধি তার আছে কিনা।

সক্রেটিস বলতেন, অনেক লোক বলল বলে কিংবা তুমি দেখছ শুনছ বলে হুট করে কোন কিছুকে সত্যি বলে মেনে নিও না। যা শুনছ, দেখছ তাকে আগে বিচার বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখ, তারপর গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করলে গ্রহণ করবে, নইলে বাতিল করবে।

ভাবাবেগের বশীভূত হয়ে কখনো কিছু করবে না। ভগবান থেকে শুরু করে পৃথিবীর সমস্ত কিছুই এইভাবে যাচাই বাছাই করে নিতে হবে। অন্ধ ভক্তি বিশ্বাসকে পশ্রয় দিলে আখেরে ঠকতে হতে পারে।

মানুষের সকল সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই সক্রেটিসের ছিল সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা। এই সর্বব্যাপী জিজ্ঞাসাই চিন্তা জগতে সক্রেটিসের সবচেয়ে বড় অবদান।

জ্ঞান ও সত্যের প্রভুত্ব ছাড়া আর কোন কিছুর প্রভুত্ব তিনি স্বীকার করতেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতেন কিন্তু তা করতেন নিজের যুক্তি বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে।

লোকে বলে ঈশ্বর আছেন, কাজেই তা বিশ্বাস করতে হবে, চোখবুজে মেনে নিতে হবে, সক্রেটিস সব বিষয়েই এরকম চিন্তার বিরোধী ছিলেন।

সক্রেটিস ছিলেন যুক্তিবাদী দার্শনিক। কিন্তু তাই বলে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নিজের কর্তব্যের প্রতি কখনো উদাসীন ছিলেন না। সেই কর্তব্য পালনেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল না।

দেশের স্বার্থে একাধিক যুদ্ধে তিনি সৈনিকরূপে যোগদান করেন এবং রীতিমত বীরত্বের পরিচয় দেন।

বেশ কিছুকাল তিনি এথেন্সের রাজসভার সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের অনুগত প্রজা। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের বোধ ছিল তাঁর সদাজাগ্রত। ইতিমধ্যে গ্রীসে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ হয় এবং অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

সরকারী নীতির প্রতিবাদ করা শাস্তি জনক অপরাধ হয়ে দেখা দিল। নির্বিচারে প্রতিবাদী মানুষদের জেলে পাঠানো হতে লাগল। অনেকেরই প্রাণদন্ড হল।

সক্রেটিস তখন জীবনের শেষপ্রান্তে। তিনি সমাজে মান্যগণ্য বিশিষ্ট এক নাগরিক। এই সময় একদিন তাঁর ও অপর চারজন নাগরিকের ওপর সরকারী আদেশ এল যে অপর এক নাগরিককে গ্রেপ্তার করে সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে।

যেই নাগরিককে গ্রেপ্তার করার হুকুম হয়ছিল, সক্রেটিস ভালভাবেই জানতেন যে তিনি সরকারী নীতির সমর্থক না হলেও মানুষ হিসেবে অত্যন্ত সৎ এবং নির্দোষ। অতএব তাঁকে গ্রেপ্তার করবার প্রশ্নই আসে না।

সক্রেটিস সরকারী আদেশ মানতে সরাসরি অস্বীকার করলেন। এই ঘটনায় সক্রেটিস সরকারের রোষে পড়লেন। যদিও তাঁর প্রভাবের কথা বিবেচনা করে প্রকাশ্যে তাঁকে কিছু বলা হল না।

দেশজুড়েই তখন তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সক্রেটিসের মতবাদের প্রবল প্রভাব। তারাই তাঁর প্রধান ভক্ত ও অনুগত। দেশের প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তারা বিশ্বাস হারিয়েছে।

অতি উৎসাহী কেউ কেউ হয়ে পড়েছে উশৃঙ্খল। ফলে সমাজ জীবনে দেখা দিয়েছে বিপর্যয়—গ্রহণ ও বর্জন নিয়ে আলোড়ন।

দেশের তরুণদের অবস্থা দেখে রক্ষণশীল প্রবীণ সম্প্রদায় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। দেশের ভবিষ্যৎ স্বরূপ যে যুবশক্তি, তাদের মধ্যেই যদি চিন্তার ক্ষেত্রে এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তাহলে যে প্রচলিত রীতিনীতি ধসে পড়বে। বুদ্ধি-বিবেকের দোহাই দিয়ে যে-কেউ যা-খুশি করে বেড়াবে? দেশে সমাজ ব্যবস্থা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না?

উদ্বিগ্ন প্রবীণ সম্প্রদায় সরকারের দ্বারস্থ হলেন। সক্রেটিসের ওপর সরকারের মনোভাব আগে থেকেই বিরূপ ছিল। এবারে সুযোগ এসে গেল তাকে উপযুক্ত জবাব দেবার।

একরকম সঙ্গে সঙ্গেই সক্রেটিসকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করা হল।

পাঁচশ একজন বিচারক নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হল। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করা হল দুটি—প্রথমতঃ তিনি নাস্তিক, দেশের সকলে যে ঈশ্বরের পুজো করে, তিনি তাঁকে মানেন না। দ্বিতীয় অভিযোগ হল, দেশের যুব সমাজকে তিনি বিপথে চালিত করছেন।

দেশের বিচার তাঁর বিরুদ্ধে গেলেও সক্রেটিস সত্যচ্যুত হতে চাননি। প্রহসন বিচার ব্যবস্থার সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি কি বলেছিলেন, সক্রেটিস শিষ্য প্লেটো তা লিখে রেখে গেছেন।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অকুতোভয়ে নিজের মতবাদকেই সক্রেটিস ঘোষণা করে যান। যা সত্যি বলে জানেন এবং মানেন, তাই তিনি প্রচার করেছেন—এ যদি অপরাধ হয় তবে তিনি অপরাধী।

অধিকাংশ বিচারকই একমত হয়ে সক্রেটিসকে দোষী বলে সাব্যস্ত করেন। সক্রেটিস দণ্ড হিসেবে এক মিনা (তিন পাউন্ড) মাত্র দিতে স্বীকৃত হলে বিচারকগণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বিষপানে হত্যার নির্দেশ দেন। আর সেই বিষ হেমলক, নিজের হাতে তাঁকে পান করতে হবে।

সক্রেটিস দণ্ডাদেশ শুনে কোনরকম প্রতিবাদ করেন নি। অথচ তিনি জানতেন দণ্ডাদেশ মকুব করার জন্য আপীল করার পথ খোলা রয়েছে।

সত্তর বছরের বৃদ্ধ দার্শনিক সক্রেটিসকে পাঠানো হল কারাগারে। মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু অতুটুকু মনোবিকার দেখা গেল না তাঁর মধ্যে।

কারাগারে বসেও তিনি আগের মতই শিষ্যদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে তর্কবিতর্ক আলাপ-আলোচনা করেছেন।

শিষ্যরা তাঁর পলায়নের পরিকল্পনা ছকে কারারক্ষীদের সঙ্গে রফা করলেন। কিন্তু সক্রেটিস রাজি হলেন না।

বললেন, প্রাণের চেয়ে আদর্শ বড়। আদর্শের জন্য তিনি প্রাণ দেবেন, চোরের মত পালিয়ে গিয়ে আদর্শকে হেয় করবেন না।

তারপর একদিন শান্তমুখে সকলকে ক্ষমা করে তিনি হেমলক বিষের পাত্র নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে মুখে তুলে ধরলেন।

সক্রেটিসের মৃত্যু ছিল যেমন করুণ তেমনই মহিমাময়।

নিজের আদর্শের জন্য হাসিমুখে সক্রেটিস প্রাণ দিয়েছিলেন। মানুষের চিন্তাজগতে প্রথম আলোড়ন তুলে অন্ধকুসংস্কারেব ওপবে ব্যক্তি মানুষের বিচারবুদ্ধিকে বড় করে তুলে আঘাত হেনেছিলেন তিনি। চিন্তাজগতে বিবর্তনের হোতা পৃথিবীর প্রথম শহীদ দার্শনিক সক্রেটিস।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান



জ্ঞানবান-রূপবান-বৈরাগ্যবান বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রদীপ্ত পরিব্রাজক অতীশ দীপঙ্কর এই বাঙলারই সন্তান। আজ থেকে হাজার বছর আগে ৯৮২ খ্রিঃ মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর পূর্বতন বঙ্গদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য এমনই ছিল যে তাঁর উপস্থিতিতে পরিপার্শ্ব প্রদীপের দীপ্তির ন্যায় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। জ্ঞানেও তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কারণেই অতীশ নামের সঙ্গে বিশেষ গুণবাচক শব্দগুলি ব্যবহৃত হত।

প্রাচীন বিক্রমণিপুর রাজ্যের রাজপুত্র অতীশের জন্ম আনুমানিক ৯৮০ খ্রিঃ। পণ্ডিতদের মতে ঢাকা বিক্রমপুরই হল বিক্রমণিপুর। বজ্রযোগিনী গ্রাম তাঁর জন্মস্থান।

তাঁর লৌকিক নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পর তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর। ক্রমে তিনি ভিক্ষুদীক্ষা লাভ করেন ও বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন।

দীপঙ্করের পিতার নাম ছিল রাজা কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম রানী প্রভাবতী। কল্যাণশ্রীর তিনপুত্র—পদ্মগর্ভ, চন্দ্রগর্ভ এবং শ্রীগর্ভ। মধ্যম পুত্র চন্দ্রগর্ভই পরবর্তী কালের মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর।

জন্মের পরেই অতীশ সম্পর্কে জ্যোতিষীরা নানা ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে রাজা এবং রানী মধ্যম পুত্রের ব্যাপারে অতিশয় যত্নশীল হয়েছিলেন।

শৈশবে অতীশকে লেখাপড়া শেখার জন্য আচার্য জেতারি এবং অবধূতের কাছে পাঠানো হয়। অসাধারণ মেধাবলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অধীত বিদ্যা আয়ত্ত করেন। এমন কি তন্ত্র বিদ্যাতেও যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন।

প্রথম জীবনে একবার তর্কবিদ্যায় একজন বিখ্যাত বৌদ্ধপন্ডিতকে তিনি পরাস্ত করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে পরবর্তীকালে তিনি নিজেই বৌদ্ধধর্মের অঙ্গনে শ্রেষ্ঠপুরুষ হিসেবে পূজিত হয়েছেন।

মাত্র উনিশ বছর বয়সে অতীশ বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন কৃষ্ণাগিরি মঠে পণ্ডিত রাহুল গুপ্তের কাছে।

এরপর ওদন্তপুরীর আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

দীক্ষাগ্রহণের বারো বছর পরে তিনি ভিক্ষুব্রতী হন এবং আচার্য ধর্মরক্ষিতের কাছে বোধিসত্ত্বব্রতে দীক্ষিত হন। এরপর আরো বারো বছর শাস্ত্রপাঠের জন্য অতিবাহিত করেন সুবর্ণদ্বীপে আচার্য চন্দ্রকীর্তির কাছে।

সেখান থেকে তাম্রদ্বীপ বা সিংহলের পথে ফিরে আসেন মগধে। মগধের নৃপতি তখন মহীপাল। তিনি তাঁকে আমন্ত্রণ জানান বিক্রমশীলা মহাবিহারের মহাচার্য পদ গ্রহণের জন্য।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্বমহিমায় বিদ্যমান সেই সময়েই বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান কোথায় ছিল তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান।

কারোর মতে রাজগৃহের ছয়মাইল উত্তরে আধুনিক বড়গাঁওয়ের অন্তর্গত শিলাও গ্রামে বিক্রমশীলার অবস্থান ছিল। অনেকে বলেন ভাগলপুর জেলার পাথরঘাটা নামক স্থানে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিক্রমশীলাও ছয়টি কলেজে বিভক্ত ছিল এবং এখানে চার সম্প্রদায়ের প্রায় দুহাজার ভিক্ষু অধ্যয়ন করতেন।

ভারতবর্ষে ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে অষ্টম শতাব্দীতে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা করেছিলন তৎকালীন গৌড় মগধ-বঙ্গের অধীশ্বর ধর্মপাল দেব।

তাই ধর্মপাল দেবের সময় থেকেই পাল রাজবংশের খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। এই বংশই নালন্দা বিহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিক্রমশীলা বিদ্যালয় পরিচালনা করত।

ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান বৌদ্ধ পন্ডিত বিক্রমশীলা বিহারের অধিনায়ক নিযুক্ত হতেন। দীর্ঘ চারশ বছর এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারত ও ভারতের বাইরে জ্ঞান বিতরণ করেছে।

বুদ্ধদেবের সিদ্ধপীঠস্থান বুদ্ধগয়ায় মহাবোধি মঠে দীপঙ্কর দীর্ঘদিন বাস করেন। পরবর্তীকালে ১০৪২ খ্রিঃ তিনি বিশ্বখ্যাত বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

সেই সময়ে তিব্বতের অধিপাতি রাজা লাহ্-লামা যে শেষ-ওড নিজের দেশে বৌদ্ধধর্মের গ্লানি ও মালিন্য, কুসংস্কারের আবিলতা দেখে খুবই পীড়িত হচ্ছিলেন। তিনি বিশেষ দূত পাঠিয়ে দীপঙ্করকে তিব্বতে যাবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই ঘটনাচক্রে প্রতিবেশী এক রাজকারাগারে তিব্বত রাজ লাহ্-লামা যে শেষ ওড প্রাণত্যাগ করেন।

মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর দেশের অবস্থা জানিয়ে দীপঙ্করের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে রেখে যান।

লাহ-লামা-এর মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো ধর্মনারায়ণ চ্যাংচুর তিব্বতের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর রাজত্বকালে তিব্বতে আচার্য বিনয়ধর মৃত রাজার শেষ পত্রটি

সঙ্গে করে বিক্রমশীলা মহাবিহারে উপস্থিত হন। কিছুকাল সেখানে থাকার পর, দীপঙ্করের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে তিনি মৃতরাজার পত্রটি তাঁর হাতে দেন এবং সেই সঙ্গে নিজের মনোবাসনা জানান।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়িত অবস্থার কথা জানতে পেরে দীপঙ্কর তিব্বতে যেতে সম্মত হলেন। সেই সময় আচার্য রত্নাকর ছিলেন বিক্রমশীল বিহারের অধিনায়ক।

স্থানীয় ভিক্ষুসঙ্ঘে নানা প্রকার নৈতিক ও মানসিক শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। ভিক্ষুদের নৈতিক শৈথিল্য দূর করবার ক্ষমতা দীপঙ্কর ছাড়া আর কারও ছিল না। তাঁর প্রভাব তখন মগধজনপদের বিভিন্ন বিহার ও সঙ্ঘে বিস্তৃত। এইসব কারণে আচার্য রত্নাকর দীপঙ্করকে কিছুদিন পরে তিব্বত যাত্রার পরামর্শ দিলেন।

কিন্তু তিনি যখন শুনলেন যে ইতিমধ্যেই দীপঙ্কর বিনয়ধরকে তিব্বতে যাবার সম্মতি জানিয়েছেন তখন তাঁকে অনুমতি দিতে হল। তবে শর্ত রাখলেন যে, তিন বছরের মধ্যে দীপঙ্কর আবার বিক্রমশীল মহাবিহারে ফিরে আসবেন।

এরপরই তিব্বতি আচার্য বিনয় ধরকে সঙ্গে নিয়ে দীপঙ্কর নেপাল ও হিমালয়ের দুর্গম পথে তিব্বত যাত্রা করলেন। দীপঙ্করের বয়স তখন ষাট বছর। দুর্গম পথে কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো পাহাড়ী ঘোড়ার পিঠে চেপে, তিনি অতিক্রম করে চললেন উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, আবার কখনো তাঁকে চলতে হয়েছে তুষার স্তূপের ওপর দিয়ে।

পথে দুবার তাঁরা দস্যুদলের হাতে আক্রান্ত হন। তাঁদের অন্যতম সঙ্গী তিব্বতি পন্ডিত গ্যা-ট্সন দস্যুদের হাতে প্রাণ হারান।

এইভাবে দীর্ঘদিনে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে একমসয় নেপালরাজ অনন্তকীর্তির সঙ্গে দীপঙ্করের সাক্ষাৎ হয়।

রাজপুত্র পদ্মপ্রভ এই সময় দীপঙ্করের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরুর পথসঙ্গী হয়ে তিব্বতে রওনা হলেন।

একসময় শ্বেত শুভ্র ভয়ঙ্কর তুষারাবৃত দুর্গম পাহাড়ি পথের অবসান হল। দীপঙ্কর তিব্বতে এসে পৌঁছলেন।

তিব্বতে দীপঙ্কর বিপুলভাবে সংবর্ধিত হলেন। এই জ্ঞানতাপসকে ঘিরে সেখানে রচিত হল এক পবিত্র উৎসবের পরিবেশ। কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হল ওঁ মণিপদ্মে হুম মন্ত্র। সহস্রকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল রাজা চ্যাংচুর এবং ধর্মগুরু দীপঙ্করের নামে। তিব্বতি ধর্মগুরু লামা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অবনত মস্তকে সসম্ভ্রমে তাঁকে দর্শন করলেন।

দীর্ঘ দুর্গম পথ পার হতে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছে দীপঙ্করকে। পথশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত তিনি। তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হল তিব্বতের গু-জে প্রদেশে।

বৃদ্ধ বয়সে তিব্বতে এসেছিলেন দীপঙ্কর এবং তিব্বতই ছিল তাঁর জীবনের শেষ কর্মস্থল। এখানে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এখানে অনেক লোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তিব্বতে প্রচলিত মহাযান মতেরই প্রচার করেন।

বৌদ্ধধর্মের অনেক গ্রন্থ দীপঙ্কর তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত ও অনুদিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই শতাধিক। তিনি সহজ সরল সুললিত ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মের সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ ও প্রচার করে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করেন।

মহাজ্ঞানী দীপঙ্কর প্রায় তের বছর তিব্বতে বাস করে তিয়াত্তর বছর বয়সে আনুমানিক ১০৫৪ খ্রিঃ মহাপ্রয়াণ করেন।

গৌতম বুদ্ধ



বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ বা জ্ঞানপ্রাপ্ত নামে অভিহিত হন।

বর্তমান উত্তর প্রদেশে অথবা নেপালে কপিলাবস্তু নামক রাজ্যের রাজবংশের নরপতি শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থের জন্ম হয় সম্ভবতঃ খ্রিঃ পূঃ ৫৬৩ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে।

শিশু অবস্থায় মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হলে বিমাতা মহাপ্রজ্ঞাবতী গৌতমী তাঁকে লালনপালন করেন। সেই কারণে তাঁর অপর নাম হয় গৌতম।

শাক্যবংশীয় বলে শাক্যমুনি নামেও তিনি হতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম যশোধরা বা গোপা।

বুদ্ধদেব যে ধর্মমত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন তা অতি প্রাচীন ধর্মমত বলে পণ্ডিতদের অনুমান। বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মতে বুদ্ধদেব হলেন শেষ সপ্তম বুদ্ধ। তাঁর পূর্বে আরও ৫৫জন বুদ্ধ পর্যায়ক্রমে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ললিতবিস্তর গ্রন্থের মতে পূর্বতন বুদ্ধগণ হলেন—পদ্মোত্তর, ধর্মকেতু, দীপঙ্কর, গুণকেতু, মহাকর, ঋষিদেব, শ্রীতেজা, সত্যকেতু, বজ্রসংহত, সর্বাভিভূ, হেমবর্ণ, অত্যুচ্চগামী, প্রবাতসার, পুষ্পকেতু, বররূপ, সুলোচন, ঋষিগুপ্ত, জিনবক্ত, উন্নত, পুষিপত, উর্ণীতেজা, পুষ্কর, সুরশ্মি, মঙ্গল, সুদর্শন, সিংহতেজা, স্থিতবুদ্ধিদত্ত, বসন্তগন্ধি, সত্যধর্ম-বিপুলকীর্তি, তিষ্য, পুষ্য, লোসুন্দর, বিস্তর্ণভেদ, রত্নকীর্তি, উগ্রতেজ, ব্রহ্মতেজা, সঘোষ, সুপুষ্য, সুমনোজ্ঞ ঘোষ, সুচেষ্টরূপ, প্রহসিতনেত্র, গুণরাশি, মেঘস্বর,

সুন্দরবর্ণ, আয়ুস্তেজা, সুনীলগজগামী, লোকাভিলাষিত, জিতশত্রু, সম্পূজিত, বিপশ্চিৎ, শিখি, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছদ, কনকমুনি, কশ্যপ প্রমুখ।

বিপশ্চিৎবুদ্ধ, বুদ্ধবিশ্বভূ, বুদ্ধক্রকুচ্ছদ, বুদ্ধকনকমুনি, বুদ্ধ কাশ্যপ এবং শেষ বুদ্ধ শাক্যমুনি বা গৌতম বুদ্ধ।

ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখে কিশোর বয়সে রাজকুমার গৌতম কাতরতা বোধ করতেন। রাজসুখ ও ভোগের মধ্যে থেকেও মানবজীবনের প্রকৃত সুখ ও পরিণতি চিন্তায় সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন।

তাঁর উদাসীন ভাব লক্ষ করে শুদ্ধোধন গোপা বা যশোধরার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেন। সংসারবন্দি গৌতমের মনে এর পরেও স্বস্তি ছিল না। অবশেষে মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে পুত্র রাহুলের জন্মের পরেই তিনি গৃহত্যাগ করেন। বিভিন্ন স্থানে বহু সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে পথে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরাড় কালাম এবং রুদ্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুর নির্দেশে গৌতম কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। কিন্তু পরে তিনি অনুভব করেন যে এই কৃচ্ছ্রতা সাধন অকারণ। অতঃপর তিনি কৃচ্ছ্রতা পরিত্যাগ করে উরুবিল্ব নামকস্থানে এক অশ্বত্থবৃক্ষতলে আসন গ্রহণ করেন। শপথ নেন, বোধিলাভ না করা পর্যন্ত আর আসন ত্যাগ করবেন না।

গৌতম তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। বোধিলাভের পর তিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত হলেন।

বুদ্ধদেব অতঃপর ঋষিপত্তন বা বর্তমান সারনাথ গিয়ে পাঁচজন পূর্বপরিচিত সন্ন্যাসীর নিকট মধ্যমপন্থারূপ নবধর্মের স্বরূপ উদঘাটন করেন। এই পাঁচজন হলেন—কৌন্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, বপ্র, ভদ্দিয় এবং মহানাম। তাঁরা বুদ্ধদেবের নিকট থেকে চারটি আর্যসত্য এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশ গ্রহণ করেন। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, এই পঞ্চ স্কন্ধের জ্ঞানও তাঁরা অর্জন করেন। এঁরাই বুদ্ধদেবের প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য বা বৌদ্ধভিক্ষু। এরপর শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ বুদ্ধদেবের প্রথম গৃহী-শিষ্যরূপে গৃহীত হলেন।

বোধিলাভের পর বুদ্ধদেব প্রথম পাঁচজন শিষ্যকে বলেছিলেন, আমার উপদেশ শোন। মানুষেরা মোহবশতঃ বিপথে পদার্পণ করে—একদিকে বিষয়লালসা ও ভোগাসক্তি এবং অন্যদিকে অকারণ কঠোর তপস্যায় শরীর শোষণ। আমি মধ্যপথ আবিষ্কার করেছি। সেই পথে অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিক সৎপথে চললে ক্লেশের অবসান হবে এবং শক্তি ও মুক্তি লভ্য হবে।

বুদ্ধদেবের এই উপদেশ দানই ধর্মচক্র প্রবর্তন নামে বৌদ্ধসমাজে পরিচিত। বুদ্ধদেবের উপদেশ সমূহে চারটি গভীর তত্ত্ব নিহিত। একে বলা হয় চতুরার্য সত্য। প্রথম—এই সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ। দ্বিতীয়—বিষয়তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ,

তৃতীয়—বিষয়তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন করাতেই দুঃখের নিবৃত্তি। চতুর্থতঃ—দুঃখ-নিরোধগামী মার্গ।

নিম্নোক্ত আটটি উপায় অবলম্বন করলেই দুঃখের নিরোধ সম্ভবপর। এই আটটি পথকেই বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সঙ্কল্প ঠিক রাখা, সত্যবাক্য বলা, সৎআচরণ, সাধু জীবীকা অবলম্বন, আত্মসংযম, ধারণা ঠিক রাখা এবং জীবনের সুগভীর তত্ত্বসকলের ধ্যান।

মহাপরিনির্বানকালে বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়েছিলেন—যার জন্ম হয়েছে তার ক্ষয় ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তোমরা যত্নপূর্বক সত্য ধর্ম পালন করে আপন মুক্তি সাধন করবে।

বোধিলাভের পর বুদ্ধদেব সারাজীবন দেশময় পরিভ্রমণ করে তাঁর উপলব্ধ জ্ঞান বিতরণ করতে থাকেন।

শুধু বর্ষাকালে চারমাস কাল এক জায়গায় থাকতেন। তিনি বহু আর্তকে ধর্মোপদেশ দান করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দান করেন। একবার কপিলাবস্তু গিয়ে মাতা গৌতমী, পিতা ও পত্নীকে দর্শন করেন এবং পুত্র রাহুল, নাপিত উপালি ও সেবক আনন্দকে দীক্ষিত করেন।

নৃপতি বিম্বিসার বুদ্ধদেবকে বেনুবন দান করেন। সারিপত্ত এবং মৌদগল্যায়ন রাজগৃহে বৌদ্ধসংঘে যোগদান করেন। নৃপতি বিম্বিসার-পত্নী ক্ষেমা, রাজা প্রসেনজিৎ-পত্নী মল্লিকা, রাজা উদয়ন-পত্নী সামাবতী—এরা সকলেই বুদ্ধের কৃপালাভ করেছিলেন।

বুদ্ধদেবের জীবৎকালেই তাঁর প্রধান অনুগতদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার শ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডদ, পন্ডিতশ্রেষ্ঠ সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়ন প্রভৃতি পরলোক গমন করেন। বুদ্ধদেব নিজে বার্ধক্যভারে অবনত হওয়ায় তাঁর পক্ষে সঙ্ঘের শৃঙ্খলা বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে।

এই সময় পদব্রজে বৈশালী থেকে কুশীনগর যাবার পথে মল্লদেশের শালবনে খ্রিঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে, আশি বছর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

কুশীনগরের মল্লগণ তাঁর দেহ দাহ করে দেহাবশেষ আদি সংগ্রহ করেন এবং এগুলি স্মারকচিহ্ন রূপে গ্রহণ করে দশটি স্তূপ নির্মাণ করেন।

বুদ্ধদেবের সময়কাল নিয়ে কিছুটা মতান্তর আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে খ্রিঃ পূর্ব ৬২৩ অব্দ ও খ্রিঃ পূর্ব ৫৪৪ অব্দ যথাক্রমে বুদ্ধদেবের জন্ম ও মহাপরিনির্বাণের কাল।

অশোকের রাজ্যাভিষেকের ২১৮ বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ—মোটামুটি এই প্রামাণিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই পন্ডিতগণ বুদ্ধদেবের জীবৎকাল নির্ণয় করেছেন।

ধর্ম বিষয়ে বুদ্ধদেব যে সকল উপদেশ দান করেছেন, সেগুলি প্রচলিত ধর্মমত সমূহের অনুরূপ নয়। তিনি ধর্মাচরণ বলতে সৎভাবে জীবন যাপনের কথাই বলে গেছেন। অহিংসা, মৈত্রী ও করুণা—এদিকে লক্ষ রেখে জীবনযাত্রায় অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্মের মূলকথা।

পরলোক, আত্মা বা ঈশ্বর বিষয়ে বুদ্ধদেব নীরবতা পালন করেছেন। তবে তিনি জন্মান্তরবাদ স্বীকার করতেন। তাঁর অভিমত বিষয়-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হলেই মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারে—তাদের আর জন্মান্তরের দুঃখ ভোগ করতে হয় না।

বুদ্ধদেব কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। তিনি মাতৃভাষায় উপদেশ দান করেছেন এবং মাতৃভাষাতেই শাস্ত্র গ্রন্থাদি রচনা ও ধর্মোপদেশ দানের বিধান দিয়ে গেছেন।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর প্রধান শিষ্যগণ রাজগৃহে এক সম্মেলনে সমবেত হন। একে বলা হয় প্রথম বৌদ্ধসংগীতি।

শতবৎসর পর আর একটি সংগীতি হয়েছিল। এই সংগীতি পরবর্তী বৌদ্ধধর্মের রূপরেখা অঙ্কন করেন।

যে চারটি সত্যের ওপর বুদ্ধদেবের সামগ্রিক চিন্তা ও মত প্রতিষ্ঠিত তাকে বলা হয় চতুরার্য সত্য। এগুলি হল দুঃখ সমুদয়, দুঃখনিরোধ, দুঃখ নিরোধগামী মার্গ এবং দুঃখের কারণ জন্মগ্রহণ এই কারণ নিরোধের উপায় নির্বাণ।

এই নির্বাণ লাভই বৌদ্ধদের পরম কামনার বস্তু। নির্বাণ লাভের জন্য বুদ্ধদেব যে পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন, তাকে বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই আটটি অঙ্গ হল, (১) সম্যক দৃষ্টি—চতুরার্যসত্য এবং সতীত্য সমুৎপাদ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান। (২) সম্যক সঙ্কল্প—নিষ্কাম মৈত্রী ও করুণার সঙ্কল্প (৩) সম্যক বাক্য—সত্য, প্রিয় মিষ্ট ও অর্থযুক্ত বাক্য কথন (৪) সম্যক কর্ম—জীবে দয়া, বদান্যতা এবং সচ্চরিত্র থাকার কর্ম। (৫) সম্যক জীবিকা—সৎ জীবিকার সাহায্যে জীবনযাত্রার নির্বাহ। (৬) সম্যক উদ্যম—সুচিন্তার উৎপাদন, উৎপন্ন সৎচিন্তার স্থিতি ও বিস্তার প্রচেষ্টা। (৭) সম্যক স্থিতি—কায়, বেদনা, চিন্তা ও মানবিক ভাবনাদির প্রকৃত স্থিতি। (৮) সম্যক সমাধি—কাম ও অকুশল চিন্তা থেকে বিরত থেকে চিত্তের একাগ্রতা সাধন।

বুদ্ধদেবের মহাপ্রয়াণের পর বৌদ্ধপ্রধানগণ রাজগৃহে সমবেত হয়ে বুদ্ধবচনসমূহ সঙ্কলন করেন। এইভাবে ত্রিপিটক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সূত্রপাত হল। এই ত্রিপিটক তিনভাগে বিভক্ত। (১) বিনয় পিটক (২) সুত্তপিটক বা সূত্রপিটক ও (৩) অভিধম্ম পিটক বা অভিধর্ম পিটক।

বৌদ্ধধর্ম ভারতের সমস্ত প্রান্তে এবং ভারতের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। অনেক ভারতীয় বৌদ্ধপন্ডিত—অতীশ দীপঙ্কর, কুমারজীব প্রভৃতি তিব্বত চীন প্রভৃতি অঞ্চলে শুধু বৌদ্ধধর্মেরই বিস্তার সাধন করেননি, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বার্তা সেই সেই দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আবার ফা-হিয়েন, হিউ-এন-সাং, ইচিং প্রভৃতি বিদেশী ধর্মানুরাগীরাও ভারতে

এসে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির বহু উপাদান আহরণ করে নিয়ে গেছেন।

বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ অস্থিগুলি আটভাগে বন্টন করে মগধরাজ অজাতশত্রু, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, লিচ্ছবিগণ, বুলিন্দগণ, কোলিয়গণ, মল্লগণ, শাক্যগণ ও জনৈক ব্রাহ্মণ এক এক ভাগ গ্রহণ করে এক একটি স্তূপ নির্মাণ করেন।

সম্রাট অশোক এই সকল স্তূপ থেকে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ উদ্ধার করে দেশজুড়ে ৮৪,০০০ স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। বৌদ্ধ স্থাপত্য শিল্পের প্রধান নিদর্শন এই স্তূপ বা চৈত্য, শ্রমণদের আবাসভূমি বিহার এবং অনুশাসন সম্বলিত ছিল স্তম্ভগুলি। ভারত থেকে প্রাপ্ত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ চিত্রে বৌদ্ধস্তূপের প্রচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়।

অমরাবতীতে প্রাপ্ত প্রস্তরফলকে চিত্রিত একটি দ্বিতল চৈত্যের নিদর্শনও পাওয়া গেছে। যে আদর্শে স্তূপ বা চৈত্য নির্মিত হত সেই আদর্শেই চৈত্য গৃহও নির্মিত হত। গয়া জেলায় পাহাড়ে উৎকীর্ণ গুহাশ্রেণী থেকে চৈত্যগৃহের নিদর্শন পাওয়া যায়। সাঁচি, ভারহুত, তক্ষশিলা প্রভৃতিস্থানে যে সকল স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন সকল বর্তমান। এই সকল স্তূপে যে সকল চিত্র উৎকীর্ণ কিম্বা অঙ্কিত হয়েছে, তাতে বুদ্ধ জীবনের এবং সমসাময়িক কালের অনেক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। স্তূপের চারপাশের বেষ্টনীকে বেদিকা, মাঝখানের পাথরগুলিকে সূচ এবং স্তূপের পাশে বেদিকার মধ্যে শোভাযাত্রা যাবার যে পথ ছিল তাকে মেধ বা মেধী বলা হয়। স্তূপটি জলবুদ্বুদের আকারে মাটি তেকে অর্ধগোলাকার ভাবে ওপরে ওঠে।

সম্রাট অশোক ভারতবর্ষের নানাস্থানে অসংখ্য স্তম্ভ নির্মাণ করে তাতে নানা অনুশাসন খোদাই করে রেখেছিলেন। এই স্তম্ভগুলিতে সিংহমূর্তি, অশ্বমূর্তি, ধর্মচক্র প্রভৃতি খোদাই করা থাকত। এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—দিল্লী তোপরা স্তম্ভ, মীরাট স্তম্ভ, এলাহাবাদ স্তম্ভ, লৌরিয়া অরায়াজ স্তম্ভ, নন্দনগড় স্তম্ভ, রামপুরাওয়া স্তম্ভ, সাঁচী স্তম্ভ, নাতালি স্তম্ভ, রসিস্তি স্তম্ভ ও সারনাথ স্তম্ভ। সারনাথ স্তম্ভে যে ত্রিসিংহ মূর্তি ও চক্র খোদিত আছে, এটিকেই স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রীয় প্রতীক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ভজন পূজনের জন্য চৈত্য এবং বৌদ্ধ শ্রমণদের বসবাসের জন্য অসংখ্য বিহার নির্মিত হয়েছিল বহু পাহাড় কেটে তার গুহার মধ্যে বহু বিহার নির্মিত হয়েছিল।

বিভিন্ন গুহায় বিহার, মূর্তি ও চিত্র সহযোগে বৌদ্ধগণ যে শিল্পরুচির পরিচয় দিয়েছেন তার অনুরূপ নিদর্শন পৃথিবীতে দুর্লভ। এরূপ কতগুলি গুহা যোগীমায়া, সীতাবেঙ্গরা, কালে, কেনারি, অজন্তা, ভাজা, ধুমনার, শতপন্নি, হস্তিগুম্ফা, ব্যাঘ্রমুখী, প্রভৃতি। ভারতের বাইরেও বৌদ্ধ স্থাপত্যাদি শিল্পের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের কয়েক শতাব্দী পরে প্রথম বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়। এরূপ কোন কোন মূর্তি পৃথিবীর বৃহত্তম মূর্তির মর্যাদা লাভ করেছে।

ভগিনী নিবেদিতা



পাশ্চাত্যের মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল নামক এক বিদুষী তরুণীকেই নিবেদিতা নাম দিয়ে ভারতবাসী আপনার করে নিয়ে ভগ্নী সম্বোধন করেছেন। নিবেদিতা অনাগত ভবিষ্যতেও আপামর ভারতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসার আসনে ভগ্নীরূপেই বিরাজিতা থাকবেন।

কর্মই মানুষের প্রকৃষ্ট পরিচয়। কাজের মাধ্যমেই জীবন-সত্য হয় পরিস্ফুট। জীবন হয়ে ওঠে ইতিহাস। যে মানুষের কর্ম ও জীবন প্রবাহের প্রভাব বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কর্মজগৎ ও জীবনকে পরিচালিত করে তিনিই মহান ব্যক্তিত্ব, মহাকালের খাতায় তাঁর জীবনই ঐতিহাসিক মহিমা লাভ করে।

ভারতের মাটিতে পাশ্চাত্যের মার্গারেট নিবেদিতা নামে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব লাভ করেছেন। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী মার্গারেট ভারতপথিক বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে নিজের জীবনের মুক্তির পথ খুঁজে পেয়ে ভারতকেই নিজের দেশ, ভারতবাসীকেই আপন দেশবাসী রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অসামান্য জীবনের দ্যুতি ভারত ভূমির ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডাঙ্গাসন নামক ছোট্ট শহরে ১৮৬৭ খ্রিঃ ২৮শে অক্টোবর মার্গারেটের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম স্যামুয়েল এবং মায়ের নাম মেরী হ্যামিলটন।

মার্গারেট যখন বালিকা, সেই সময়ে মা-বাবা জীবিকার সন্ধানে চলে আসেন লন্ডনে। ঠাকুমার কাছেই মানুষ হতে থাকেন তিনি।

তৎকালে আয়ারল্যান্ড ছিল ইংলন্ডের শাসনাধীন। ইংলন্ডের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হবার জন্য আয়ারল্যান্ডে ঘটেছে গণজাগরণ; ফলে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া খুবই উত্তপ্ত। এই আবহাওয়ার মধ্যে বেড়ে ওঠার সুযোগে মার্গারেটের মন প্রস্ফুটিত হয়েছিল বিপ্লবের স্বপ্নে। সেই স্বপ্ন লালিত হয়েছে ঠাকুমার আদর্শ ও প্রেরণায়। জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর ভাবনার উন্মেষ হয়েছিল বাড়ির বৈপ্লবিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে।

মার্গারেটের বয়স যখন মাত্র তেরো, তিনি তখন হ্যালিফ্যাকস বিদ্যায়তনের ছাত্রী। এই সময় একদিন সাহিত্যের শিক্ষিকা কলিনকে একটি প্রশ্ন করে চমকে দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, জীবনের শেষ কোথায়? মৃত্যুই কি জীবনের পরিসমাপ্তি?

অতটুকুন মেয়ের মুখে গভীর জীবনবোধের এমন প্রশ্ন মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু প্রতিভা তো এমনি বিশেষ পথ ধরেই এগোয়—গতানুগতিকতার পথ তো তার নয়।

ওই একটা প্রশ্নের মধ্য থেকেই সেদিন তার প্রতিভার পরিচয় লাভ করেন দূরদর্শিনী শিক্ষিকা। তাঁর চিন্তাশক্তি দেখে তিনি বিস্মিত না হয়ে পারেন নি।

কিন্তু মার্গারেটের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন নি তিনি। নিজেই হয়তো বিমূঢ় হয়েছিলেন নিজের চিন্তার দৈন্য দেখে।

সেই শিক্ষিকাকে আর একদিন মার্গারেট জানালেন, ঈশ্বর যে আছেন তা বিশ্বাস করতে ভাল লাগে, আমি তাঁকে জানতে চাই, বুঝতে চাই। কি করে ঈশ্বরকে জানা যায়?

সাহিত্যের শিক্ষিকা কলিনস সেদিন আপ্লুত হয়েছিলেন প্রশ্ন শুনে। তিনি বললেন, তাঁর সম্পর্কে জান, তাঁকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা কর। তার মাধ্যমেই তোমার বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে।

ঈশ্বর তো স্বচ্ছ স্বয়ংপ্রকাশ, অজানার অন্ধকার দূর হলেই তাঁর প্রকাশ প্রত্যক্ষ হয়। তোমার মধ্যে তাঁর লীলা মূর্ত হয়ে উঠুক।

সেদিনের শিক্ষিকার আন্তরিক অভিপ্রায় উত্তরকালে মার্গারেটের জীবনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরের অহৈতুকী প্রসাদ লাভে তিনি ধন্য হয়েছিলেন।

এমনি গভীর জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই মার্গারেটের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটতে লাগল। আয়ারল্যান্ডের বিপ্লব চেতনাও একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে ক্রিয়া করে চলল। দেশের আহ্বানে তিনি অবিচল থাকেন কি করে? তীব্র ভাবে অনুভব করলেন তাঁরও কিছু করবার আছে, দেশকে কিছু দেবার দায়িত্ব তাঁরও রয়েছে। ইংরাজের অন্যায় শাসন ও শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করতে না পারলে, আইরিশ জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

এই সব চিন্তার মধ্য দিয়েই বিপ্লবী মার্গারেটের সত্তা জেগে উঠল। তিনি আইরিশ হোমরুল আন্দোলনে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লেন।

ক্রমেই মার্গারেট উপলব্ধি করলেন জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হলে, দেশে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষাই তৈরি করে জাতির মেরুদন্ড।

১৮৮৪ খ্রিঃ স্কুলের শেষ পরীক্ষা সমাপ্ত করে মার্গারেট শিক্ষকতার জীবনই বেছে নিলেন। চাকরি নিয়ে চলে এলেন কেসউইকে।

কর্মজীবনে প্রবেশ করলেও অন্তরের আধ্যাত্মিক অনুভব তাঁর মধ্যে নিরন্তর আত্মজিজ্ঞাসার আলোড়ন তুলেই চলল। শান্তির সন্ধানে অন্তর থেকে থেকে আকুল হয়ে উঠতে লাগল।

ফল হল অস্থিরতা। শিক্ষকতার কাজও মন দিয়ে করতে পারলেন না। ১৮৮৬ খ্রিঃ খনি শহর রেক্সাহামে এসে শিক্ষকতার কাজ নিলেন শহরের সেন্ট মার্কস চার্চে। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত করলেন সমাজ সেবার কাজে।

এখানকার মানুষের জীবিকা শ্রম নির্ভর। শ্রমিক শ্রেণীর নিত্যসঙ্গী দারিদ্র্য। অভাব অনটনের মধ্যে মানুষগুলো যেন নিষ্পেশিত হচ্ছে। মার্গারেট নিজের উদ্যোগেই এই দুঃখী মানুষদের মধ্যে নিজের কাজ আরম্ভ করলেন।

ব্রত মানবসেবার হলেও চার্চের নিয়মে তার আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন আছে। মার্গারেট নিজের প্রাণের তাগিদেই কাজ করছিলেন। ফলে বাধা এলো চার্চের পক্ষ থেকে।

আশ্চর্য হলেও এই ঘটনার মধ্য দিয়েই এক চরম অভিজ্ঞতা লাভ করলেন মার্গারেট। বুঝতে পারলেন চার্চের জনসেবার ব্রত হল অন্তরের সম্পর্ক বর্জিত নেহাতই পোশাকি। ধর্মকে বাদ দিয়ে এরা দল নিয়েই মত্ত।

চার্চের সংশ্রব ভাল লাগল না মার্গারেটের। তিনি স্থির করলেন প্রতিষ্ঠানিকতার বাইরে থেকে তাঁকে কাজ করতে হবে। তাঁর লক্ষ যশ প্রশংসা নয়। দেশ সেবাই তাঁর উদ্দেশ্য।

জনতার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন মার্গারেট; বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

দুর্গতের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষুধার্তকে অন্ন জোগাবার ব্যবস্থা করলেন। সেই সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা।

দেশবাসীর দুঃখমোচনের আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখতে লাগলেন প্রবন্ধ। অল্পসময়ের মধ্যেই সাড়া জেগে উঠল। দেশবাসীর চেতনার তন্ত্রীতে নতুন সুরের মূর্চ্ছনা অনুরণিত হতে লাগল।

এই সময়েই মার্গারেটের সঙ্গে পরিচয় হল ওয়েলসবাসী এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের। নাম গেলোয়াক। তাঁর সাহচর্যে নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন মার্গারেট। বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প নিলেন তিনি— সেই কাজে সঙ্গী করবেন গেলোয়াককে।

এই তরুণ যুবককে ঘিরেও স্বপ্ন রচনার বিরাম নেই তাঁর অন্তরে। এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে উঠল মার্গারেটের অন্তর।

কিন্তু বাদ সাধলেন বিধাতা। আকস্মিকভাবে মৃত্যু হল গেলোয়াকের। সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল।

বেদনা সম্বরণ করে নীরবে চোখের জল মুছলেন মার্গারেট। শূন্য হৃদয়ে স্মৃতিটুকু সম্বল করে নতুন ভাবে জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

তারই মধ্যে ১৮৯৫ খ্রিঃ অ্যাংলিকান চার্চের Free thinker -এর দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

আত্মপ্রকাশের পথ ক্রমাগত খুঁজে চলেছিল মার্গারেটের প্রতিভা। কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে বারবার প্রতিহত হচ্ছিল তাঁর উদ্যোগ। সমাজের গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণতা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। কিন্তু এখানেও দেখলেন মুক্তচিন্তার পরিবেশ প্রতিবন্ধকহীন নয়। অসহিষ্ণুতা আর গোঁড়ামি পদে পদে।

সেবাধর্মের এমন অন্তঃসারশূন্যতা দেখে পীড়িত হলেন তিনি। আত্মপ্রচারের হীন স্বার্থ সেবাকে মর্মহীন ভন্ডামিতে পরিণত করেছে, এ কি করে মেনে নেন মার্গারেট।

হৃদয়ের হাহাকার ও আর্তি নিয়ে পথ হাতড়ে চলেন তিনি। কোথায় পাবেন তিনি মুক্ত উদার বাধাবন্ধহীন পথ— যে পথ তাঁকে পৌঁছে দেবে পরম সত্যের দুয়ারে।

ইতিপূর্বে ১৮৯৩ খ্রিঃ শিকাগোতে বিশ্বধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা ইউরোপ আলোড়িত হয়ে উঠেছে ভারতীয় হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জয়কারে। সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে কেবল তাঁরই সংবাদ।

স্বামী বিবেকানন্দ ইংলন্ডে এসেছেন, মার্গারেট এই সংবাদ পেলেন তাঁর বন্ধু কুক-এর কাছে। তিনি জানতে পারলেন, মার্গসনের বাড়িতে একজন হিন্দুসন্ন্যাসী আসছেন। সেই উপলক্ষে তাঁর কিছু বন্ধুদের সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মার্গারেট ইচ্ছে করলে সেখানে যেতে পারেন।

অন্তর জুড়ে আছে অতৃপ্তি আর মন জুড়ে অন্বেষণ। কোথাও স্থির হতে পারছিলেন না মার্গারেট। সানন্দে তিনি সম্মত হলেন।

১৮৯৫ খ্রিঃ নভেম্বরের এক রোববারের সন্ধ্যায় মার্গসনের বৈঠকখানায় তেজোদৃপ্ত ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম দর্শন করলেন মার্গারেট।

শহরের কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তির সমাগম হয়েছে বিবেকানন্দের বাণী শুনবার জন্য। মার্গারেট তৃষিত চাতকের মত মুখোমুখি গিয়ে বসলেন বিবেকানন্দের। অলৌকিক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত স্বামীজির মুখমন্ডল। সেই দ্যুতিতে আলোকিত হয়ে উঠল পরিবেশ। মুগ্ধ বিস্ময়ে স্বামীজির কথা শুনতে লাগলেন মার্গারেট।

স্বামীজি বললেন, পূর্ব ও পশ্চিমের আদর্শ বিনিময়ের জন্যই তাঁর পাশ্চাত্যে আসা। প্রাচ্যের বাণী সর্বকালের সর্বদেশের মর্মবাণী আর তা হল, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—সবকিছুতেই সেই অনন্ত সত্যের প্রকাশ।

অদ্বৈত সত্তাই দ্বৈত হয়ে সব হয়েছেন। সেই পরম সত্তাকে জানার জন্য চাই ত্যাগ। সেই ত্যাগের মাধ্যমেই মানুষ সর্বমুক্ত অবস্থায় সত্য থেকে সত্যে উত্তীর্ণ হতে পারে।

কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীতে জন্মানো ভাল, কিন্তু বেরিয়ে আসতে হবে সেই গন্ডির বাইরে। হতে হবে দ্বিধাহীন, যেখানে দ্বিধা সেখানেই দ্বৈত, দ্বিধাহীন তাই অদ্বৈত।

সব আমির মধ্যেই আমার আমিকে উপলব্ধি করতে হবে। বন্ধনই মায়া। বন্ধন ছাড়িয়ে এলেই আলোর জগৎ—আলোকে উত্তরণই আনন্দ। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—এই তিনই হল সনাতন সাধনা। এভাবেই মানুষ পরম সত্যকে চিরকাল নিবিড় ভাবে জেনে এসেছে।

সেদিনই মুগ্ধ বিমোহিত মার্গারেটের প্রতিভা আত্মমুক্তির সন্ধান পেল স্বামীজির কথায়। আকৃষ্ট হলেন ভারতীয় সনাতন ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি।

গ্রহণ করলেন স্বামীজির শিষ্যত্ব।

মানব জীবনের মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ নিবেদিতা আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার সংকল্প নিয়ে চলে এলেন ভারতবর্ষে। স্বামীজি তাঁর নতুন নামকরণ করলেন নিবেদিতা।

দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও পরাধীনতায় জর্জরিত ভারতবর্ষের মুক্তির উপায় স্বামীজি দেখেছিলেন নারী জাতির জাগরণের মধ্যে। জাতির জাগতিক মুক্তির জন্যই নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের কথা প্রচার করেছিলেন তিনি। প্রয়োজন মহীয়সী নারী। নিবেদিতার মধ্যে সেই মহীয়সী নারীকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বামীজি।

১৮৯৮ খ্রিঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারীতে ভারতে এসে পৌঁছলেন নিবেদিতা।

ইতিমধ্যে স্বামীজি সেবা ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প নিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। স্বামীজির সান্নিধ্যে এসে নিবেদিতা লাভ করলেন তাঁর আদর্শের কর্মক্ষেত্র।

বিদেশিনী নিবেদিতাকে সেবার অধিকার দিতে হলে আগে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা দরকার দেশের মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আসনে। জাতবিচারের নিরর্থকতা বুঝিয়ে দিতে হবে সকলকে। তাই মার্গারেটকে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য স্বামীজি ১৮৯৮ খ্রিঃ ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে এক সভা আহ্বান করলেন। স্বামীজি নিজেই সভাপতিত্ব করলেন এই সভায়।

করতালি মুখরিত সভায় অভিনন্দিত হলেন নিবেদিতা। অভিভূত হলেন তিনি। বললেন, পৃথিবীর মহত্তম আধ্যাত্মিক সম্পদ রয়েছে ভারতবর্ষের সঞ্চয়ে। যুগ যুগ ধরে ভারতবাসী এই সম্পদকে ধারণ ও বহন করে আসছে। সেই মহান সম্পদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি ভারতবর্ষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সঙ্কল্প নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছেন। সকলের সহানুভূতি ও সহায়তা তিনি কামনা করেন।

সেদিন স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে মুহুর্মুহু করতালির মধ্য দিয়ে নিবেদিতাকে বরণ করে নিলেন ভারতবাসী। মার্গারেট হলেন ভারতের প্রতি নিবেদিত প্রাণ সিস্টার নিবেদিতা। স্বামীজিই এই নামকরণ করলেন তাঁর।

এরপর ভারতবর্ষকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে চেনার পালা। আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যমন্ডিত সনাতন ভারতবর্ষ। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পরাধীন ভারতবর্ষ।

সশিষ্য স্বামীজি নিবেদিতাকে নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করলেন। নিবেদিতা মনে প্রাণে উপলব্ধি করলেন বহু বছরের আত্মবিস্মৃতি ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে শিক্ষার সোনার কাঠি স্পর্শে। তবেই জেগে উঠবে.জাতীয় চেতনা— স্বাজাত্যবোধ। ঘুচবে পরাধীনতার আগল।

নিবেদিতা নামলেন কর্মক্ষেত্রে। বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে প্রতিষ্ঠা করলেন বালিকা বিদ্যালয়। নারীশিক্ষায় অনাগ্রহী সমাজ থেকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে একটি একটি করে সংগ্রহ করতে লাগলেন ছাত্রী।

কর্মক্ষেত্রের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার জন্য নিবেদিতার প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিলেন স্বামীজি। ১৮৯৮ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাস থেকে সপ্তাহে একদিন বেলুড় মঠ থেকে বাগবাজারে তাঁকে আসতে হত। ইতিহাস, উদ্ভিদবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, শরীরতত্ত্ব ও সূচীশিল্পের শিক্ষা নিতে হত নিবেদিতাকে।

ধীরে ধীরে নিবেদিতার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করলেন স্বামীজি। মঠ বা মিশনের নির্দিষ্ট কর্মসূচীর বাইরে ব্রাহ্মসমাজের সভাতেও যোগ দিতে লাগলেন তিনি। সপ্তাহে একদিন সমাজে মহিলাদের সভায় বক্তৃতা দিতেন নিবেদিতা। এই সভায় অন্যান্য বিদুষী প্রতিভাবান মহিলাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেনের কন্যা, ঠাকুর পরিবারের ইন্দিরাদেবী, সরলাদেবী, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের বোন লাবণ্যপ্রভা প্রমুখ।

নিজের দেশে ইংরাজের শাসন শোষণ ও অত্যাচারের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল নিবেদিতার। ইংরাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত করবার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল।

ভাবতবর্ষে ইংরাজের বিদ্বেষমূলক শাসনব্যবস্থায় থেকে একই সুরে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগল নিবেদিতার মন। তিনি স্থির করলেন, এখানেও ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন কাজে। তখনো ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জাগরণ সেভাবে প্রকাশ পায়নি বলে প্রতীক্ষায় থাকতে হল তাঁকে।

ইতিমধ্যে ১৮৯৯ খ্রিঃ কলকাতায় দেখা দিল মারাত্মক প্লেগ রোগের মহামারী। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাতে লাগল। পথেঘাটে মৃতদেহ পড়ে থাকলেও রোগ সংক্রমণের ভয়ে কেউ এগিয়ে আসে না সৎকারের কাজে। উপযুক্ত চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও পথ্যের অভাবে উজাড় হয়ে যেতে লাগল দরিদ্র বস্তি।

মঠের সন্ন্যাসীদের পুরোভাগে থেকে নিবেদিতা আর্তের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। পিছিয়ে থাকল না দেশবাসী—স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এলো তাঁর সাহায্যে।

নিবেদিতার করুণামাখা হাতের স্পর্শে দূর হল একদিন প্লেগের আতঙ্ক। নিবেদিতার আসন প্রতিষ্ঠিত হল ভারতবাসীর অন্তরের অন্তস্থলে।

অসংবৃতা করালী, রুধিরপিপাসায় লেলিহান জিহ্বা যে কালীমূর্তি—এই মূর্তির সাধনার মধ্যেই যে রয়েছ বৈপ্লবিক চেতনা, ক্রমে তা অনুভব করলেন নিবেদিতা। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একে একে রচনা করলেন, Kali the Mother, The story of Kali, The Vision of Siva, The Voice of Mother প্রভৃতি গ্রন্থ।

১৯০০ খ্রিঃ নিবেদিতা আমেরিকায় পরিভ্রমণে এলেন। ভোগবাদী পাশ্চাত্যে ভারতের ত্যাগের আদর্শ প্রচার করলেন তিনি। প্রকৃত শান্তির পথ যে নিষ্কাম কর্মের পথ একথা ঘোষণা করলেন।

ভারতে ফিরে এসে ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে নিজেকে উপস্থাপন করলেন নিবেদিতা। তাঁর প্রতিভার গুণে সমাজের অগ্রগণ্য প্রতিভাধরদের মধ্যে নিজের স্থানটি নির্দিষ্ট করে নিলেন তিনি।

আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠল রবীন্দ্রনাথ, কেশব সেন, গিরিশ ঘোষ, জগদীশচন্দ্র প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে। ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হল বিপ্লবী মহানায়ক অরবিন্দর সঙ্গে। যুক্ত হয়ে পড়লেন বহুবিচিত্র কর্মপ্রবাহের সঙ্গে।

এদিকে অবিশ্রান্ত কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিবেকানন্দ। ১৯০২ খ্রিঃ ৪ঠা জুলাই মহাসমাধি লাভ করলেন তিনি।

একটা দুরন্ত ঝড়ে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে যেন চলে গেলেন মহাত্যাগী বীর সন্ন্যাসী।

নিবেদিতার মন্ত্রগুরু, আদর্শ পুরুষ স্বামীজি। তাঁকে হারিয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন তিনি। সমস্ত কাজের নির্দেশ উপদেশ এতদিন আসত যাঁর কাছ থেকে, তিনি অনুপস্থিত, এবারে তাঁর কর্তব্য ও কর্মপন্থা নির্দেশ করবেন কে? উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রশ্নে ধীরে ধীরে মঠের সঙ্গেও সম্পর্ক শিথিল হয়ে এল। নিবেদিতার কর্মক্ষেত্র কেন্দ্রীভূত হল ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে। এবারে তাঁর সাধনা হল স্বামীজির স্বপ্নের ভারতকে পুনর্গঠন করা।

অরবিন্দ তখন বরোদায় কর্মরত। নিবেদিতার Kali the Mother পড়ে তিনি ভারত বিপ্লবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেন। তাঁর প্রেরণায় বাংলার মাটিতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল গুপ্তসমিতি।

মুক্তিকামী যুবকদের সংগঠিত করে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে দেশব্যাপী গড়ে তুললেন বিপ্লবী আন্দোলন। প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে নিবেদিতা জড়িয়ে রইলেন এই আন্দোলনের সঙ্গে।

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি বিপ্লবীদের শোনালেন মাভৈঃ মন্ত্র। অরবিন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল বন্দেমাতরম পত্রিকা। নিবেদিতা জোগালেন

শক্তি ও প্রেরণা। ঘোষণা করলেন ইংবাজদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে সক্রিয় প্রতিরোধ। জেগে উঠল বিপ্লবী বাংলা, ঘুম ভাঙ্গল ভারতবর্ষের।

নিবেদিতার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মূলেই নিহিত ছিল গুরুর আদর্শকে বাস্তবায়িত করার সঙ্কল্প। তাই তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন।

দীর্ঘ চার বছরের পরিশ্রমে নিবেদিতা সম্পূর্ণ করলেন তাঁর স্মৃতিকথা। প্রকাশিত হল সেই অসামান্য গ্রন্থ The Master as I saw him।

ইতিমধ্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে স্বাধীনতাকামী ভারত। ইংরাজ শাসনকে উচ্ছেদের লক্ষে অকাতরে প্রাণবলি দিতে লাগলেন বিপ্লবী তরুণের দল। কেঁপে উঠল ব্রিটিশের সিংহাসন। ইংরাজের দমন-পীড়ন যত বাড়তে লাগল, পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল বিপ্লবীদের আক্রমণ ও আত্মদানের পালা।

১৯০২ খ্রিঃ থেকে ১৯১১ খ্রিঃ ভারতের ইতিহাসের এক রক্তলিপ্ত অধ্যায়। এই দীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়ল নিবেদিতার। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯১১ খ্রিঃ জগদীশচন্দ্র বসুর পরিবারের সঙ্গে নিবেদিতা এলেন দার্জিলিঙে। কিছুদিন ভালই কাটল। কিন্তু একদিন অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে ১৯১১ খ্রিঃ ১৩ই অক্টোবর সকাল ৭টায় সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করলেন নিবেদিতা।

ভারতের সেবায় নিবেদিত প্রাণ মার্গারেটের নাম বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন লোকমাতা বলে। জগদীশচন্দ্র নাম দিয়েছিলেন শিখাময়ী। কিন্তু ভারতবাসীর প্রাণে বিবেকানন্দের নিবেদিতা—সিস্টার নিবেদিতা হয়েই বিরাজ করবেন চিরকাল।

ভীমরাও রামজী আম্বেদকর



মধ্যপ্রদেশের ছোট্ট শহর মোউ। এখানেই ১৮৯১ খ্রিঃ ১৪ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে নবজাগরণের অন্যতম সৈনিক ভীমরাও রামজী আম্বেদকর।

ভীমের পিতা রামজী শকপাল ছিলেন মোউ সেনানিবাস স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মাতার নাম ভীমাবাই। তিনি ছিলেন সরল ও ধর্মপরায়ন।

রামজী ছিলেন তথাকথিত অস্পৃশ্য মাহার জাতির লোক। নিজের চেষ্টায় তিনি ভাল লেখাপড়া শিখে সেই সময়ের নর্মাল স্কুল থেকে শিক্ষকতার ডিপ্লোমা পেয়েছিলেন। সেই সূত্রেই তিনি সেনাবাহিনীর শিক্ষা বিভাগে সুবেদার মেজর পদে চাকরি পেয়েছিলেন।

ভীমের যখন দুই বছর বয়স তখন তাঁর পিতা চাকরি থেকে অবসর নেন। মাসিক ৫০ টাকা পেনসন নিয়ে তিনি সপরিবারে তাঁর আদি বাসভূমি কোঙ্কনের ডাপোলীতে চলে যান। এখানেই ভীম প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হন।

ভারতের কুসংস্করাচ্ছন্ন সমাজে সেই সময় অস্পৃশ্য মাহার জাতির একটি ছেলের পড়াশোনা করা যে কি যন্ত্রণা ও দুঃখের ছিল তা আজ কল্পনা করেও শিহরিত হতে হয়।

বইখাতা নিয়ে ভীমকে ক্লাশের এককোণে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। ক্লাশে অন্যান্যদের সঙ্গে বসার অধিকার ছিল না। তৃষ্ণা পেলে নিজের হাতে জল নিয়ে খাওয়া যেত না। উঁচুজাতের অন্য কোন ছেলে ওপর থেকে জল ঢেলে দিত, তাঁকে ওপরের দিকে হাঁ করে জল খেতে হত। স্লেট খাতা শিক্ষক স্পর্শ করতেন না। তিনি দূর থেকে স্লেট ও খাতার লেখা দেখতেন। এই দুঃসহ অপমানের মধ্যেই ভীম নিষ্ঠা নিয়ে নিজের পড়াশুনা করতে থাকেন।

ভীমের ছয় বছর বয়সে মা মারা যান। তখন বাবা ও ভাইবোনদের সঙ্গে তাঁকেও সংসারের কাজ করতে হত।

রামজী তাঁর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি খুবই মনোযোগী ছিলেন। তিনি তাদের বাড়িতে নিয়মিত পড়াতেন। মারাঠী ও ইংরাজিতে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি ছেলেদের ইংরাজি পড়তে ও ইংরাজীতে অনুবাদ করতে শেখাতেন। এছাড়া প্রত্যহ রামায়ণ মহাভারত, মহাত্মা কবীর ও সাধুসন্তদের রচনা আবৃত্তি করে শোনাতেন।

সামাজিক অবিচার ও নানা অসুবিধার মধ্যে থেকে ভীমের অন্তরে সহনশীলতা, অধ্যবসায় ও মানসিক দৃঢ়তার সূত্রপাত হয়।

স্কুলে ভীমের একজন শিক্ষকের পদবী ছিল আম্বেদকর। তিনি তাঁকে খুব ভালবাসতেন এবং নানাভাবে সাহায্য করতেন।

তখনকার সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী আমবাবাদ গ্রামের অধিবাসী হিসেবে ভীমের পরিবারের পদবী ছিল আম্বাবাদেকর। শিক্ষক মশায় স্কুলের খাতায় ভীমের পদবী বদল করে নিজের পদবী আম্বেদকর লিখে দেন। উত্তরকালে এই পদবীতেই তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

রামজী একটি নতুন চাকরি পেয়ে সপরিবারে বম্বে চলে এসেছিলেন। এখানেই ভীম তাঁর দাদার সঙ্গে এলফিলস্টোন হাইস্কুলে ভর্তি হন।

ছোট জাতের ছেলে বলে স্কুলে দেবভাষা সংস্কৃত পড়ার অধিকার ছিল না ভীমের। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে স্কুলে ফার্সিভাষা পড়তে হয়েছিল। পরে তিনি নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত শিখেছিলেন।

১৯০৭ খ্রিঃ এলফিলস্টোন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন আম্বেদকর। মাহার সমাজে এই ঘটনা আলোড়ন তুলল। বম্বে শহরে সভা ডেকে আম্বেদকরকে অভিনন্দন জানানো হয়।

সমাজের তখনকার নিয়ম অনুযায়ী ১৭ বছর বয়সেই আম্বেদকরের বিয়ে হয়। তাঁর স্ত্রী রমাবাই-এর বয়স তখন নয় বছর। তিনি ছিলেন সৎ ও শান্ত স্বভাবের মেয়ে। আম্বেদকরের উন্নতিতে এই নীরব নারীর দান ছিল অতুলনীয়।

এলফিনস্টোন কলেজে আই.এ পড়বার সময় বম্বের উইলসন স্কুলের শিক্ষক মারাঠী লেখক ও সমাজসেবী কৃষ্ণাজী অর্জুন কেলুসকর-এর সঙ্গে কিশোর আম্বেদকরের পরিচয় হয়। আম্বেদকরের ভবিষ্যৎ উন্নতিতে এই ভদ্রলোকের অবদান অপরিসীম।

১৯১২ খ্রিঃ এলফিনস্টোন কলেজ থেকে বি.এ. পাস করার পর আম্বেদকর কিছুকাল বরোদা মহারাজের সেনা বিভাগে লেফট্‌ন্যান্ট পদে চাকরি করেন। এরপর বরোদা মহারাজের ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তিনি ১৯১৩ খ্রিঃ উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক যাত্রা করেন।

এখানে পৌঁছে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁর পাঠ্যবিষয় ছিল নৃতত্ত্ব, দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

১৯১৫ খ্রিঃ আম্বেদকর এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। পরের বছর ভারতের জাতীয় আয়-ব্যয়ের ওপর থিসিস লিখে জমা দেন। পরবর্তীকালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এই কাজের জন্য ডক্টরেট উপাধি দেয়।

পশ্চিমের মুক্ত সমাজের সংস্পর্শে এসে আম্বেদকর বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রেরণা লাভ করেন।

উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৬ খ্রিঃ লন্ডনে আসেন। এখানে গ্রেস ইন-এ ব্যারিস্টারী এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ অর্থনীতি নিয়ে এক সঙ্গে পড়া আরম্ভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতিমধ্যে বৃত্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় মাত্র ন'মাস ক্লাস করার পর তাঁকে ভারতে ফিরে আসতে হয়।

বরোদা মহারাজের বৃত্তির সর্ত ছিল, আম্বেদকরকে দশবছর মহারাজের অধীনে চাকরি করতে হবে। দেশে ফিরে এসে আম্বেদকর মহারাজের সামরিক সচিবের পদে নিযুক্ত হলেন।

কিন্তু জাতপাতের বাছবিচারে কলুষিত চাকুরিস্থলের পরিবেশে বেশিদিন তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব হল না। বাধ্য হয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ১৯১৭ খ্রিঃ তিনি বম্বে চলে আসেন।

ইতিপূর্বে পিতা রামজী গত হয়েছিলেন। কাঁধের ওপরে নিজের সংসার। এই সময়ে বাড়িতে ছাত্র পড়িয়ে, শেয়ার বিক্রেতাদের পরামর্শ দিয়ে ও সংবাদপত্র ও পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে আম্বেদকরকে অর্থোপার্জন করতে হয়।

এই সময়ে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে আর এক দরদী দেশের রাজার সাহায্য লাভ করেন।

১৯২০ খ্রিঃ নাগপুরে এক সভায় দেশের দলিত জাতির উন্নতির উদ্দেশ্যে জোরালো বক্তৃতা করেন। তাঁর কথায় চিন্তার পরিচয় পেয়ে কোলাপুরের মহারাজা সাহু বুঝতে পারেন এই তরুণই দেশের দলিতদের মুক্তি আনবে। তাঁর সাহায্যে ১৯২০ খ্রিঃ আম্বেদকর লন্ডনে এসে আইন ও অর্থনীতির আরব্ধ পড়াশুনা ও গবেষণা সম্পূর্ণ করেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় অর্থের বন্টন ব্যবস্থা বিষয়ে থিসিস লিখে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এসসি ডিগ্রি লাভ করেন ১৯২৩ খ্রিঃ। লন্ডন ছাড়ার পূর্বে ব্যারিস্টারীও পাস করেন।

এবারে বম্বেতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। কিন্তু অস্পৃশ্যতার অভিশাপ তখনো তাঁকে তাড়া করে ফিরছে। নিচু মাহার জাতির উকিলকে সকলেই এড়িয়ে চলে। কিন্তু আম্বেদকর সহজে দমবার পাত্র নন। আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন।

আম্বেদকর বুঝতে পারছিলেন, দেশের সব জাতির মধ্যে ঐক্যের অভাবে দেশের উন্নতি বিঘ্নিত হচ্ছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, সমতা ও মৈত্রী, এই তিন আদর্শকে সমাজে রূপায়িত করতে না পারলে ভারত ও ভারতবাসীর উন্নতি সম্ভব নয়।

আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করার বিষয়েও আম্বেদকর ব্যাপকভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেন।

১৯২৪ খ্রিঃ তিনি তাঁর সহকর্মী ও অন্য সম্প্রদায়ের সমাজদরদী কতিপয় ব্যক্তিকে নিয়ে বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির লক্ষ হল দলিতদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার; তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অভাব অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গোচরে এনে প্রতিকারের চেষ্টা করা।

১৯২৫ খ্রিঃ রত্নাগিরি জেলার মালওয়াঁতে অস্পৃশ্যদের প্রথম সম্মেলনে আম্বেদকর সভাপতিত্ব করেন। এরপর তাঁর কাজের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের উদ্দেশ্যে গোয়া যান।

১৯২৬ খ্রিঃ জেজুরীতে এক সভায় আম্বেদকর প্রস্তাব আনেন—অস্পৃশ্যদের জন্য উঁচু জাতির লোকালয় থেকে দূরে আলাদা বাসভূমি তৈরি করা হোক।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রের তিনজন অ-ব্রাহ্মণ নেতা একটি পুস্তিকায় ব্রাহ্মণরাই দেশের সর্বনাশ করছে এই মর্মে বক্তব্য ছাপিয়ে বিলি করে। পুনের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় উক্ত তিন নেতার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের অভিযোগে আদালতে মামলা করে। এই মামলায় আম্বেদকর অ-ব্রাহ্মণদের পক্ষের উকিল হিসেবে এমন যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ সওয়াল করেন যে ব্রাহ্মণরা মামলায় হেরে যান। এই মামলার পর তিনি রাতারাতি আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই মামলার সামাজিক মূল্যও ছিল অপরিসীম।

আম্বেদকর সমাজের তথাকথিত সংস্কারের চিন্তাতেই আবদ্ধ থাকেননি। প্রচলিত কাঠামো ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ে তোলার কথাই তিনি ভাবতেন। সে হবে এমন এক সমাজ যেখানে মানুষে মানুষে ভেদ থাকবে না, যেখানে সকলেই হবে সমান ও স্বাধীন।

নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় নিচু জাতির ব্যথা বেদনা ও বঞ্চনার কথা তিনি জানতে পেরেছিলেন। সেই কারণেই নতুন সমাজ গড়ার চিন্তা তাঁর মনে জাগরিত হয়েছিল। দলিতদের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেছেন, "তোমাদের প্রাপ্য অধিকার আবেদন নিবেদন করে লাভ করতে পারবে না। নিজের চেষ্টায় ও শক্তিতে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। ভীরু মেষকেই বলি দেওয়া হয়। সিংহকে নয়। তোমাদের সিংহের শক্তি অর্জন করতে হবে।"

মাহাতে কোলাবা জেলায় সরকারী পুকুর আইন অনুসারে সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু উঁচু জাতের হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের পুকুরের জল স্পর্শ করতে দিত না।

১৯২৭ খ্রিঃ এই জেলায় অস্পৃশ্যদের সম্মেলন ডাকা হয়। সভাপতিত্ব করেন আম্বেদকর। সম্মেলন চলাকালীন আম্বেদকরের নেতৃত্বে ২৫০০ অস্পৃশ্য প্রতিনিধি শহরের রাস্তায় শোভাযাত্রা করে সরকারী পুকুরে গিয়ে জলপান করেন।

এই ঘটনায় শহরের উঁচু জাতের হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের ওপর চড়াও হয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে।

মাহার যুবকরাও প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরি হল। তাঁরা তাঁদের নেতা আম্বেদকরের অনুমতি চাইলে তিনি তাঁদের শান্ত করে রক্তপাতের প্রতিহিংসা থেকে বিরত করেন।

১৯২৭ খ্রিঃ ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর মাহারদের অস্পৃশ্য শ্রেণীর দ্বিতীয় সম্মেলন ডাকা হয়। এই সম্মেলনে বিশাল এক জনসমাবেশে মনুর নামে প্রচলিত ঘৃণিত সামাজিক বিধি-বিধানের সমালোচনা করে বলা হয়, প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মানুষদের যে বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকার দেওয়া হয়েছে তা নীচ ও স্বার্থবুদ্ধি প্রসূত।

এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে অসম জাতি বিভাগের দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে সমগ্র জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

ধর্মের নামে অত্যাচার, অবিচার ও ভেদনীতিকে স্থায়ী করার প্রতিবাদে মনু সংহিতা প্রকাশ্য সম্মেলনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এই সভায় আম্বেদকরের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অস্পৃশ্যরা বংশগত পেশা হিসেবে জীবজন্তুর মৃতদেহ অপসারণ করবে না। প্রয়োজনমত উঁচু জাতির লোকদেরও এই কাজ করতে হবে।

আনুষ্ঠানিক সম্মেলন শেষ হলে আম্বেদকর ৩০০০ অস্পৃশ্য শ্রেণীর নারীসমাবেশে বক্তৃতা করেন। দলিত শ্রেণীদের নারীদের সমাজ সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে ভারতে সেটিই ছিল সর্বপ্রথম সভা। সভার শেষে দলিতদের পূর্ণ সামাজিক স্বাধীনতা অর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়

মাহারদের এই সম্মেলনে অনুগামীরা আম্বেদকরকে বাবাসাহেব উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯২৮ খ্রিঃ আম্বেদকর বম্বের সরকারী আইন কলেজে আংশিক সময়ের জন্য অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। পরিবার প্রতিপালনের জন্য বাধ্য হয়েই তাঁকে এই কাজ নিতে হয়েছিল।

নাগরিক অধিকারের লড়াইয়ে পাশাপাশি আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশহিতৈষী সংস্কারক ও চিন্তাবিদদের শুভবুদ্ধির প্রতিও আবেদন জানান।

১৯২৭ খ্রিঃ জুন মাসে বম্বের ঠাকুরদ্বারের নতুন মন্দির উদ্বোধন হলে আম্বেদকর তাঁর কতিপয় অনুগামীকে নিয়ে সেখানে যান। মন্দিরের প্রধানের সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ করে যাওয়া সত্ত্বেও আম্বেদকরকে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসতে হয়।

১৯২৭ খ্রিঃ নভেম্বর মাসে এই মন্দিরে সর্বশ্রেণীর হিন্দু জনগণের প্রবেশের সমর্থনকারীদের এক সভা ডাকা হয়। এই সভায় সভাপতির ভাষণে আম্বেদকর বলেন, "হিন্দুমন্দিরে হিন্দু দেবতার পূজা করার অধিকার সব হিন্দুরই থাকা উচিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গদের গাড়িতে এক কামরায় চড়তে না দেওয়ার নীতিকে হিন্দুরা কঠোরভাবে নিন্দা করেছে।

এই অবস্থায় স্বজাতীয় কোন হিন্দুকে তাদের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করতে না দেওয়ার চেষ্টা তাদের দুমুখো নীতিরই প্রমাণ করে।.... এটা সত্য যে অস্পৃশ্যদের প্রবেশে মন্দির কলুষিত হয় না। দেবতার পবিত্রতাও নষ্ট হয় না। সেই জন্য আমরা আলাদা মন্দির গড়তে উৎসাহী নই। আমরা অন্য হিন্দুদের সঙ্গে একই মন্দিরে পূজা করতে আগ্রহী। ... আইন অনুসারে অস্পৃশ্যদের মন্দির-প্রবেশে বাধা দেওয়া যায় না। হিন্দু মন্দির সব হিন্দুদের। তাদের অস্পৃশ্য বা স্পৃশ্য যাই ভাবা হোক না কেন। ... হিন্দুত্বের বিকাশে ও গরিমা বৃদ্ধিতে বাল্মীকি, চোখামেলা, রোহিদাস প্রভৃতি অস্পৃশ্য বংশজাত সন্তানদেরও প্রভূত অবদান রয়েছে। এই অবদান ব্রাহ্মণ বংশীয় বশিষ্ঠ, ক্ষত্রিয় বংশীয় শ্রীকৃষ্ণ, বৈশ্য বংশীয় হর্ষের ও শূদ্র তুকারামের অবদানের সঙ্গে তুলনীয়।

মাহার বীর সিড়নাক মাহারের মত অনেক অস্পৃশ্য সন্তান হিন্দুত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

হিন্দুত্ব বিস্তার লাভ করেছে, গৌরব লাভ করেছে তথাকথিত স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য সব হিন্দুর ত্যাগ ও চেষ্টার মধ্য দিয়ে। এই কারণেই সকল হিন্দুমন্দিরে হিন্দুমাত্রেরই প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা দরকার।"

আম্বেদকরের পরিচালনায় নাসিকে কালারাম মন্দির প্রবেশের আন্দোলন ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

১৯৩০ খ্রীঃ ১২ই মার্চ গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলনে ডাণ্ডী অভিযান শুরু করেন। এর দশ দিন আগেই নাসিকের বিখ্যাত কালারাম মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের জন্য আম্বেদকরের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৫,০০০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছাসেবিকার দীর্ঘ এক মাইলব্যাপী শোভাযাত্রা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হয়।

মন্দিরের বন্ধ দরজার সামনে দীর্ঘ একমাস অবস্থান চলে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাসিক শহরে উঁচু জাত ও নীচু জাতের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ বাঁধে।

এই ঘটনার পরেও ১৯৩০ খ্রিঃ নাগপুরের সভায় সভাপতির ভাষণে আম্বেদকর জানান, বর্ণ হিন্দুদের সমস্ত রকম অপমান ও অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি নিজের হিন্দু পরিচয় ত্যাগ করতে চান না।

১৯৩২ খ্রিঃ ইংরাজ সরকার দলিত হিন্দু সমাজের মধ্যে পৃথক ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের সাময়িক সুবিধা দেয়। কিন্তু গান্ধীজির বিরুদ্ধাচরণের ফলে দলিতদের

পৃথক ভোটের অধিকার বাতিল হয়। পরিবর্তে হিন্দু সমাজের মধ্যে আইন সভাতে দলিতদের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

১৯৩২ খ্রিঃ আম্বেদকরের আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস সরকার শাসিত বম্বে ও মাদ্রাজ প্রদেশে 'মন্দির প্রবেশ' আইন পাশ করা হয়।

১৯৩৪ খ্রিঃ রঙ্গ আইয়ার কেন্দ্রীয় আইন-সভায় মন্দির প্রবেশ শীর্ষক একটি আইনের প্রস্তাব পেশ করেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আগে দলিতদের কোন প্রকার লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না। তাদের এই সুযোগ আসে ১৮১৫ খ্রিঃ। এই সময়ে ইংরাজ সরকার সাধারণের শিক্ষার জন্য স্কুল খোলার ব্যবস্থা করে।

দলিতদের শিক্ষার জন্য আম্বেদকর অন্যভাবেও কাজ করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রিঃ তিনি দুটি ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। ওই বছরেই বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা তুলে দিয়ে দলিতশ্রেণী শিক্ষা সমিতি নামে নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

এই সমিতির আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯২৮ খ্রিঃ বম্বে সরকার দলিত শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য পাঁচটি ছাত্রাবাস স্থাপনের টাকা মঞ্জুর করে দায়িত্ব এই সমিতির ওপর ন্যস্ত করেন।

দলিতদের শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ তৈরি করা আম্বেদকরের জীবনের অন্যতম ব্রত হয়ে উঠেছিল। রাজনীতি ও সমাজ সেবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় ১৯৩৮ খ্রিঃ তিনি বম্বের সরকারী ল'কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নেন।

নীচ অস্পৃশ্য দলিতদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিশ্রমিকের কাজ ও কারখানার মজুরের কাজ। এই জন্য আম্বেদকর কৃষি ও কারখানা শ্রমিকদের সুবিধা ও কল্যাণের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হন।

বম্বের আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি ভূমিদাসপ্রথা তুলে দেবার জন্য পরিষদে একটি বিলের প্রস্তাব দেন ১৯৩৫ খ্রিঃ ভারত শাসন আইনে।

জাতীয় কংগ্রেস সরকার বম্বে প্রদেশে ক্ষমতায় আসে ১৯৩৭ খ্রিঃ। পরের বছর আম্বেদকর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ভূমিবন্টন ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য জোরালো আবেদন জানান। আম্বেদকরের এই আবেদন সফল হয়েছিল কুড়ি বছর পরে। বম্বের আইন সভা ভূমি বন্দোবস্তের আমূল সংস্কার করেছিল।

কলকারখানার শ্রমিক মজুরদের জন্যও আম্বেদকর বহুবিধ কাজ করেছেন। ১৯৩৬ খ্রিঃ তিনি মেহনতি জনতার প্রতিনিধি হিসেবে স্বাধীন শ্রমিকদল গঠন করেন। এই দলের পক্ষে কারখানা শ্রমিক, কৃষি মজুর ও অল্প আয়ের মধ্যবিত্তদের কল্যাণের জন্য সুচিন্তিত কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

১৯৪২ খ্রিঃ আম্বেদকর নাগপুরে সারা ভারত দলিত শ্রেণী সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। এই সময়েই তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদে শ্রমসদস্য হিসেবে নিয়োগপত্রটি

পান। ওই বছরেই আগস্ট মাসে তিনি দিল্লিতে শাসন পরিষদে সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করেন।

এই পদে থাকাকালীন তিনি শ্রমিকদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ইতিপূর্বে শ্রমিকদের জন্য এত ব্যাপক কার্যকরী ব্যবস্থার কথা আর কোন ভারতীয় নেতা ভাবেন নি।

তাঁর প্রবর্তিত অনেক ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত শ্রমিক কল্যাণের ক্ষেত্রে আদর্শ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

আম্বেদকরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই ভারতীয় শ্রমিক সমিতি সংশোধনী বিল পাস হয় ১৯৪৬ খ্রিঃ। এর ফলে ভারতবর্ষে প্রথম শিল্প শ্রমিকদের সমিতি স্বীকৃতি লাভ করে।

শ্রমজীবী নারীদের কল্যাণার্থে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস করেন ১৯৪৩ খ্রিঃ। এর ফলে গর্ভবতী মহিলা কর্মীদের জন্য ১৬ সপ্তাহ ছুটির ব্যবস্থা হয়। গর্ভবতী অবস্থায় দশ সপ্তাহ ও সন্তান প্রসবের পর ছয় সপ্তাহ।

এই ভাবে আম্বেদকর দেশের শ্রমব্যবস্থাকে সামন্তযুগের প্রভাবমুক্ত করে আধুনি যুগের উপযোগী করে তোলার পথ উন্মুক্ত করেন।

সমাজতত্ত্ব বিষয়ে আম্বেদকরের গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজ ও দেশের উন্নতির জন্যই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীগুলির উন্নতিসাধন জরুরী।

১৯৩০ খ্রিঃ লন্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বসে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। এই বৈঠকে আম্বেদকরের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের দুরবস্থা, ইংরাজ শাসনের অপদার্থতা ও ব্যর্থতার চিত্র তিনি নির্ভীকভাবে তুলে ধরেছিলেন। এই গোলটেবিল বৈঠকের বিবরণ শুনে গান্ধীজি মন্তব্য করেছিলেন, আম্বেদকরের দেশপ্রেম অতুলনীয়।

দেশে স্বাধীনতার জন্য আম্বেদকর জোরালো বক্তব্য রাখেন। সেই সঙ্গে স্বাধীন ভারতে বঞ্চিত দলিতদের নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্যও সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেন।

আম্বেদকর দলিতদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হলেও সারা ভারতের উন্নতির কথা তিনি কখনো বিস্মৃত হননি।

১৯৩২ খ্রিঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবিত ভারতশাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আইনসভার আসন বন্টন ঘোষণা করেন। মুসলমান, শিখ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, খ্রিস্টানদের জন্য আসনে আলাদাভাবে নিজেদের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারও এদের সকলকে দেওয়া হয়।

সাময়িকভাবে হলেও দলিতদের আসন ও আলাদা ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। এ ছাড়াও দলিতরা যাতে হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা হয়ে না যায় তার জন্য দলিতদের আলাদা ভোটের জন্য নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়।

এই ব্যবস্থার ফলে দলিতদের কিছু রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল।

টানা কয়েক বছরের অমানুষিক পরিশ্রমে আম্বেদকরের স্বাস্থ্য ক্রমশই ভেঙ্গে পড়ছিল। কিছুদিনের জন্য তাঁকে বিশ্রাম ও ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে হল।

১৯৩৪ খ্রিঃ মাঝামাঝি সময়ে তিনি আবার আইন ব্যবসা শুরু করেন। পাশাপাশি আইন কলেজেও অধ্যাপনার কাজ নেন।

দীর্ঘ দশ বছর ধরে আম্বেদকর হিন্দু সমাজের দলিতদের উন্নতির জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন।

দলিতদের নাগরিক অধিকারের জন্য, মন্দিরে প্রবেশের অধিকারের জন্য, তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য নিরলস চেষ্টা করেছেন।

সমাজের এই সব কাজের চাপে সংসারের কাজে বিশেষ মন দিতে পারতেন না। সমস্ত দায়িত্বই বহন করতেন সুযোগ্য পত্নী রমা বাই।

১৯৩৫ খ্রিঃ রমা বাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর জন্য উপযুক্ত চিকিৎসারও ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু কোন ফল হল না। সেই বছরই ২৭শে মে রমা বাই পরলোক গমন করেন।

স্ত্রী বিয়োগের পর ১৯৩৫ খ্রিঃ ১লা জুন বম্বে সরকার আম্বেদকরকে বম্বে সরকারী কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন।

এই দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দলিতদের স্বার্থে অসমাপ্ত কাজের জন্য পরিশ্রম করে যেতে হয়।

১৯৩৫ খ্রিঃ ভারতের প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়। শাসন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক নির্বাচনের সুযোগ আসে। এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য আম্বেদকর ১৯৩৬ খ্রিঃ স্বাধীন শ্রমিক দল গঠন করেন।

এই দলের কর্মসূচী ছিল ভূমিহীন কৃষক, গরীব বাড়ি-ভাড়াটে, সাধারণ চাষী ও মজুরদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা।

১৯৩৫ খ্রিঃ নতুন ভারত শাসন আইনের জন্য আম্বেদকর ভারতবর্ষের দলিত অস্পৃশ্য জাতিগুলির একটি তালিকা বা তপসিল তৈরি করেন।

ব্রিটিশ সরকার এই তালিকাভুক্ত দলিত জাতিগুলিকে তপসিলভুক্ত জাতি নামে অভিহিত করে। এই জাতিগুলির জন্য সংরক্ষণের সুবিধাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ খ্রিঃ গোড়ার দিকে। আম্বেদকরের স্বাধীন শ্রমিক দল ১৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ১৫টি আসনে জয়লাভ করে।

আম্বেদকরের স্বাধীন শ্রমিক দল ছিল একটি প্রাদেশিক দল। সারা ভারতের দলিত উন্নয়নের কাজের লক্ষ নিয়ে তিনি ১৯৪২ খ্রিঃ নাগপুরে সারা ভারত তপসিলী জাতি ফেডারেশন গঠন করেন।

পররর্তীকালে এই সর্বভারতীয় দলের পক্ষ থেকেই আম্বেদকরের রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালিত হত।

১৯৪২ খ্রিঃ আম্বেদকর বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। এই সময় থেকে ১৯৪৬ খ্রিঃ পর্যন্ত চারবছর তিনি শাসন পরিষদে শ্রমবিভাগের দায়িত্ব বহন করেন।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। ব্রিটেনে শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করে। এই দলের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন ভারতকে অবিলম্বেই স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

এই সময়ে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মাউন্টব্যাটেন বড়লাট নিযুক্ত হয়ে এসে ভারতকে দ্বিখন্ডিত করার ব্যবস্থা করেন।

অবিলম্বেই দুটি গণপরিষদ ও দুটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ব্যবস্থা হয়। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের স্বাধীনতা আইন অনুমোদন করে। ফলে ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ই আগষ্ট ভারত উপমহাদেশে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র জন্মলাভ করে—ভারত ও পাকিস্তান।

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতরাষ্ট্র সুসংগঠিত করবার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ দেশীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় নতুন জাতীয় প্রশাসন গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে আম্বেদকর ভারত সরকারের আইন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

গান্ধীর পরামর্শে নেহরু আম্বেদকরকে নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। এই সময় আম্বেদকর শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি জাতীয় স্বার্থে এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন।

খসড়া সংবিধান রচনার জন্য সাত সদস্যের যে কমিটি গঠিত হয় আম্বেদকর হলেন তার সভাপতি। তিনি প্রায় একক চেষ্টাতেই ১৪১ দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন।

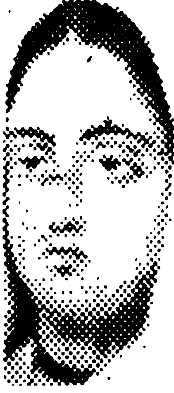
দীর্ঘ বিচার, বিতর্ক ও বিবেচনার পর ১৯৪৯ খ্রিঃ ২৬শে নভেম্বর ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ ও ৮টি তালিকাযুক্ত স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়।

সংবিধান রচনার কঠোর পরিশ্রমের ফলে ১৯৪৭ খ্রিঃ থেকেই আম্বেদকর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। এই সময় হাসপাতালে কুমারী ডাঃ সারদা কবীরের সঙ্গে তাঁর জানাশুনা হয়।

পরে ১৯৪৮ খ্রিঃ ১৫ই এপ্রিল আম্বেদকর এই মহারাষ্ট্রীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ-কন্য ডাঃ কবীরকে বিবাহ করেন।

দ্বিতীয়বারের গুরুতর শারীরিক অসুস্থার পর থেকেই আম্বেদকরের বহুবিচিত্র কর্মময় জীবনের গতি সংকুচিত হয়ে আসতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৬ খ্রিঃ ৬ই ডিসেম্বর দিল্লীর বাসভবনে এই মহাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

রানী রাসমণি



দানে, দয়ায় ব্যাক্তিত্বে, সাহসে, বুদ্ধিমত্তায় ও ভক্তিসাধনায় অনন্যা মহীয়সী নারী রানী রাসমণি। তীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধি, জনহিতকর কর্ম এবং ধর্মচর্চার প্রতি আকর্ষণে তিনি ইতিহাসের এক বিরল চরিত্র।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে স্বামী সারদানন্দ রানী রাসমণি সম্পর্কে বলেছেন, 'তাঁহার ঈশ্বর বিশ্বাস, তেজস্বিতা, দরিদ্রদের প্রতি নিরন্তর সহানুভূতি, অজস্র দান, অকাতর অর্থব্যয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে সকলের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। বাস্তবিক নিজ গুণে ও কর্মে এই রমণী তখন আপন রানী নাম সার্থক করিতে এবং ব্রাহ্মণেতর নির্বিশেষে সকল জাতির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্বপ্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন।''

রানী রাসমণি, বস্তুত সর্ব অর্থেই ছিলেন রানী।

১৭৯৩খ্রিঃ হালিশহরের নিকটবর্তী এক গ্রামের কৃষিজীবী মাহিষ্য পরিবারে রাসমণি জন্ম গ্রহণ করেন। নিতান্ত এক দরিদ্র পরিবারে জন্মলাভ করেও তিনি একদিন যথার্থই রানী হয়ে উঠেছিলেন।

সেই যুগে এই দেশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার বা শিখবার সুযোগ তেমন ছিল না। ঘরেই সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা হয়েছিল রাসমনির। এর বেশি আর এগুনো সেই সময়ে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে গণ্য হত না।

সামান্য লেখাপড়া হলেও রাসমণির রূপ ছিল অসাধারণ। সেই সূত্রেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল কলকাতার বিরাট ধনী পরিবারে।

জানবাজারের প্রীতিরাম দাস ছিলেন ব্যবসায়ী। ফোর্ট উইলিয়ামে খাবার-দাবার সরবরাহ করে তিনি প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছিলেন। একটি বাঁশের আড়তের মালিকানাও তাঁর ছিল। ফলে সমৃদ্ধি ছিল ক্রমবর্ধমান।

প্রীতিরাম দাসের বড় ছেলে রাজচন্দ্রের সঙ্গে রাসমণির বিয়ে হয়েছিল ১৮০৪ খ্রিঃ, বাংলা সন ১২১১, ৪ই বৈশাখ।

রাজচন্দ্র ছিলেন এক রাজকীয় পুরুষ। তাঁর ঐশ্বর্য ও দানধ্যান ছিল বিস্ময়কর। এরকম এক ধনী পরিবারে সুদুর পল্লী অঞ্চলের এক দরিদ্র কন্যার বধূ হয়ে আসার ব্যাপারটা রীতিমত অবিশ্বাস্য। অথচ সেই ঘটনাই ঘটেছিল।

বিয়ের পর রাজচন্দ্রের আর্থিক সমৃদ্ধি আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে রাসমণি পরিবারে লক্ষ্মী রূপেই আদৃতা হয়েছিলেন।

কিন্তু এত সব সত্ত্বেও রানী রাসমণির জীবন ছিল নিরন্তর সংগ্রামের জীবন। সারাজীবন ধরে তাঁকে নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে।

তাঁর এই সংগ্রামের মূলে কখনও ছিল আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রতিজ্ঞা, কখনও লোকহিতৈষণার প্রেরণা। এই সংগ্রামের মধ্যেই কঠোরে কোমলে রাসমণি ছিলেন অনন্যা।

মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে রাসমণি বিধবা হয়েছিলেন। তাঁর কোন ছেলে ছিল না। একপাশে বিশাল সম্পত্তি, আর অন্য দিকে চার কন্যা—পদ্মমণি, কুমারী, করুণা ও জগদম্বা। এই সুকঠিন অবস্থায় পড়েও ব্যক্তিত্বময়ী রাসমণি যোগ্যতার সঙ্গেই তাঁর কর্তব্য সাধন করেছেন।

তৃতীয়া কন্যা করুণার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল মথুরনাথ বিশ্বাসের। করুণার অকাল মৃত্যুর পর রাসমণি মথুরবাবুর সঙ্গেই চতুর্থ কন্যা জগদম্বার বিয়ে দেন এবং জামাতাকে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব দেন।

এই কাজের মধ্যে রাসমণি অসামান্য বিচক্ষণতা ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেন। মথুরবাবুকে কাছে রেখে দেওয়ায় সুরক্ষিত হয়েছিল বিষয়-সম্পত্তি এবং বৈষয়িক জীবন থেকে ধর্মীয় জীবনের দিকে যাওয়া রানীর পক্ষে সহজ হয়েছিল।

রাসমণির দানধ্যান ও পুণ্যকর্মের তুলনা পাওয়া বিরল। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর কন্যার করণীয় পারলৌকিক করতে গঙ্গায় গিয়ে তিনি দেখেন ঘাট ভাঙ্গা, কর্দমাক্ত। তার মধ্যেই মানুষকে গঙ্গার ঘাটে প্রয়োজনীয় কৃত্য ও স্নানাদি করতে হয়।

রাসমণির অনুরোধে রাজচন্দ্র প্রচুর অর্থব্যয় করে গঙ্গার ঘাট ও ঘাটে যাবার রাস্তা তৈরি করে দেন। সেই ঘাটেরই নাম হয় বাবুঘাট, যা আজও বর্তমান।

বাবুঘাট ছত্রিশ থাম ও চাঁদনীযুক্ত। তার গায়ে খোদিত আছে—"ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের অনুমতিক্রমে এবং বাবু রাজচন্দ্র দাসের অর্থব্যয়ে ১৮৩০ খ্রিঃ এই ঘাট নির্মিত এবং ইহার নাম বাবু রাজচন্দ্র ঘাট"।

রাজচন্দ্রের নির্মিত রাস্তাটির নামকরণ হয়েছিল বাবুরোড।

দানধ্যানের ব্যাপারে রাজচন্দ্র ছিলেন মুক্তহৃদয় ও উদারহস্ত। স্বামীর মতো রাসমণিও সারাজীবন অজস্র দানধ্যান করেছেন।

রাজচন্দ্রের শ্রাদ্ধকার্যের সময় তিনি ছয় হাজার রুপোর মুদ্রা ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতেন বিভিন্ন পুজো ও ব্রত উপলক্ষে।

রাসমণি বাংলা ১২৪৫ সনে সওয়া লক্ষ টাকা ব্যয় করে রুপোর রথ তৈরি করে পথে বের করেছিলেন। সেই শোভাযাত্রার সামনে পেছনে ছিল শত শত গায়ক ও বাদক।

একই জাঁকজমকে তিনি পর পর কয়েক বছর রথোৎসব পালন করেছিলেন।

তিনি প্রতিবছর যে দুর্গাপুজো করতেন তাতে খরচ হত ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা।

একই রকম ধুমধামের সঙ্গে তিনি জন্মাষ্টমী, বাসন্তী পুজো, লক্ষীপুজো, সরস্বতী পুজো প্রভৃতি সম্পন্ন করতেন।

সেইকালে তীর্থাদিতে যেতে হত পায়ে হেঁটে ও নৌকা যোগে। পুরী যাবার রাস্তা ভাল ছিল না বলে রাসমণি সেই রাস্তা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, তিনি জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার জন্য তিনটি হীরক-খচিত মুকুট তৈরি করিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়েছিলেন। এই জন্য তাঁর খরচ হয়েছিল ৬০ হাজার টাকা।

রাসমণি তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে দানধ্যান, ঘাট ও মন্দির তৈরি প্রভৃতি কাজে চার বছরে ব্যয় করেছিলেন প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।

কালীঘাটে বাগানবাড়ি, পুকুর ও আদি গঙ্গার পাকা ঘাট তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন রাসমনি। তাছাড়া তিনি আধমাইল দীর্ঘ টোনার খাল খনন করিয়ে মধুমতী নদীর সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে কৃষকদের চাষের কাজের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। কৃষকরা তাঁকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা জানাত।

রানী তাঁর প্রজাদের কাছে ছিলেন মায়ের মত। শিশু যেমন তার মায়ের কাছে নির্ভয়ে আবদার ও দাবি জানায়, তেমনি প্রজারাও রাসমণির কাছে তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে জানাতে পারত।

রাসমণির প্রজাদের মধ্যে অনেকেরই জীবিকা ছিল গঙ্গায় মাছ ধরা। এই দরিদ্র জেলেদের ওপরে হঠাৎ ইংরাজ সরকার মৎস্যকর চাপিয়ে দেওয়ায় তারা খুবই বিভ্রাটে পড়ে গেলেন। সরকারী কর না দিয়ে গঙ্গায় মাছ ধরা চলবে না—জেলেদের সংসার অচল হবার মত অবস্থা।

ইংরাজ সরকারের কাছে অনেক আবেদন নিবেদন জানিয়েও কোনই প্রতিকার হল না। শেষ উপায় এক রানীমা—রানী রাসমণি। সকলে এসে কেঁদে পড়ল তাঁর কাছে।

রাসমণি সব শুনে প্রজাদের আশ্বস্ত করলেন। তারপর নায়েব মশাইকে পাঠিয়ে ঘুসুড়ী থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত গঙ্গা দশ হাজার টাকায় লিজ নিয়ে নিলেন।

এরপর যা করলেন তা এক অকল্পনীয় কাজ। দড়ি, বাঁশ শিকল দিয়ে গঙ্গা ঘিরে ফেললেন। ফলে গঙ্গায় নৌকা ও জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে গেল।

বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সরকারকে নতি স্বীকার করতে হল। জেলেদের ওপর থেকে কর তুলে নেওয়া হল। রাসমণিও নদীর ওপর থেকে বন্ধন তুলে নিলেন।

রানীর জীবনে এমনি জনহিতৈষণা ও তেজস্বিতার ঘটনা অনেকবারই ঘটেছে। তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কৌশলের কাছে প্রতিবারেই প্রতিপক্ষকে হার মানতে হয়েছে।

আর একবার, রাসমণির দুর্গাপুজোর সময় হাজার হাজার মানুষ স্নানের জন্য নবপত্রিকা গঙ্গায় নিয়ে চলেছেন বাবুরোড দিয়ে। এমনি সময় ঘটল বিপত্তি।

সরকার এক নিষেধাজ্ঞা জারি করল, বাবু রোড দিয়ে পুজোর শোভাযাত্রা নেওয়া চলবে না।

রাসমণি যথারীতি প্রতিবাদ করলেন, বাবুরোড তাঁর, সুতরাং তাঁর পুজোর শোভাযাত্রা সেখান দিয়ে যাবার কোন বাধা নেই।

এই নিয়ে আদালতে মামলা পর্যন্ত গড়াল। সেই মামলায় রাসমণির পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হল।

জরিমানার টাকা রাসমণি জমা দিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জানবাজার থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত দুই পাশে গরানকাঠের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিলেন।

কর্তৃপক্ষের আর কিছু করার রইল না। লোকজনের চলাচল, যানবাহন ইত্যাদির যাতায়াতের পথের বাধা সরাবার জন্য নতি স্বীকার করতে হল। রাসমণির জয় হল।

লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল—

অষ্ট ঘোড়ার গাড়ি দৌড়ায় রানী রাসমণি।
রাস্তা বন্ধ করতে পারলে না ইংরাজ কোম্পানি।।

একবার, সিপাহী যুদ্ধের কিছু পরের ঘটনা এটা, একদিন একদল গোরা সৈন্য হঠাৎ হৈ হৈ করে জানবাজারের বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

রাসমণির কর্মচারীদের সঙ্গে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল, তাইতে গোরাগুলো তাদের উন্মত্তের মত তাড়া করে এলো।

এরকম অত্যাচার গোরারা নিরীহ দেশবাসীর ওপর প্রায়ই করে। কিন্তু কখনো বাধা পেত না বলে দিনে দিনে তাদের সাহসও বেড়ে গিয়েছিল।

এদিন বাড়িতে মথুরবাবু ছিলেন না, বৈষয়িক কাজে অন্যত্র ছিলেন। রাসমণির লোকেরা যথাসাধ্য বাধা দেবার চেষ্টা করে যেতে লাগল।

রাসমণি সব শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ভৈরবী মূর্তিতে খাঁড়া হাতে করে বেরিয়ে এলেন। তাঁর সেই মূর্তি দেখে গোরা সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে থমকে গেল। এক পা-ও তারা সামনে এগোবার সাহস পেল না। তারা দল বেঁধে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। পরে এই সৈন্যদের শাস্তি হয়েছিল।

রাসমণির তেজস্বিতা ও সাহসিকতা এমনি করে বারবার দেখা গেছে। প্রজা বৎসল রাসমণি তাঁর প্রজাদের ওপর ইংরাজের অবিচার কখনো সহ্য করতেন না। কেবল প্রজাদের ক্ষেত্রেই নয়, জনহিতৈষণার প্রেরণায় তিনি সাহসিকতার সঙ্গে বীরাঙ্গনা মূর্তিতে বিপদ-আপদ রুখে দাঁড়াতেন।

করুণায় মাখা হৃদয়ের স্নিগ্ধ মমতাই তাঁকে করে তুলত ভীমাভৈরবী।

রাসমণি যথার্থই ছিলেন লোকমাতা, পালিকা, অপর দিকে সন্তান রক্ষার তাগিদে তিনিই হয়ে উঠতেন ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিনী। একদিকে বরাভয় প্রদায়িনী অপরদিকে ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিনী—এই দুই সত্তাই তাঁর মধ্যে সমানভাবে কাজ করেছে বারবার।

রাসমণির জীবনের শ্রেষ্ঠকীর্তি দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির নির্মাণ। সেখানেই নিজেকে প্রকটিত করেছিলেন যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ।

পরম ভক্তিমতী রানী রাসমণি সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, "অশেষ গুণশালিনী রানী রাসমণির শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদপদ্মে চিরকাল বিশেষ ভক্তি ছিল। জমিদারি সেরেস্তার কাগজপত্রে নামাঙ্কিত করিবার জন্য যে শীলমোহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষোদিত ছিল—'কালীপদ-অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী'। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তেজস্বিনী রানীর দেবী ভক্তি ঐরূপে সকল বিষয়ে প্রকাশ পাইত।"

রাসমণি একবার ঠিক করলেন কাশীক্ষেত্রে বিশ্বনাথ দর্শনে যাবেন। সময়টা ১৮৪৭ খ্রিঃ। রানী রাসমণি তীর্থে যাবেন। কাজেই আয়োজন হল রাজকীয়। লোকজন, দাসদাসী নিয়ে বেশ বড়সড় এক দল আর বিপুল আয়োজন হল।

শ'খানেক বজরা তৈরী হল। সমস্ত লোকজনের জন্য ছমাসের উপযুক্ত খাদ্য-সামগ্রী নেওয়া হল সঙ্গে। আত্মীয়-স্বজন, এমন কি চেনা-জানা অনেক মানুষও রাসমণির তীর্থযাত্রার সঙ্গী হল।

যাত্রার সব আয়োজন সম্পূর্ণ। এখন দুর্গা বলে গঙ্গায় ভেসে পড়লেই হয়।

কিন্তু যাত্রা শুরুর আগের রাতে রাসমণি স্বপ্ন দেখলেন, স্বয়ং মাকালী দর্শন দিয়ে বলছেন. কাশীতে যাবার দরকার নেই, গঙ্গার ধারে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পুজোর ব্যবস্থা করলেই হবে।

রানীর এই তীর্থযাত্রা বন্ধ হওয়া সম্পর্কে অন্য একটা কাহিনীও প্রচলিত আছে।

রানী তাঁর দলবল বোঝাই করে বজরা ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের কাছে এসে খারাপ আবহাওয়ার জন্য আটকে পড়লেন। সেই সময়েই ওই স্বপ্ন দেখেন।

যাইহোক, মোটকথা রাসমণির আর কাশী যাওয়া হয়নি। তিনি গঙ্গার তীরে কোথায় মন্দির তৈরি করবেন সেই বিষয়য়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মন্দিরের উপযুক্ত জমি কেনার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

রাসমণির জন্মস্থান হালিশহর। প্রথমে তিনি স্থির করলেন, তার কাছাকাছিই মন্দিরের জন্য জমি কিনবেন।

কিন্তু রাসমণি তো শূদ্রের মেয়ে, শূদ্রের গৃহিণী। তখনকার দিনের জাতপাতের গোঁড়ামীর যুগে একজন শূদ্রের পক্ষে দেবকার্যে এগিয়ে আসার পথে হাজারো বাধা। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা রাসমণির ইচ্ছার কথা জানতে পেরে প্রবল বিরোধিতা করলেন।

আজীবন সংগ্রামী রানী আবার এক সংগ্রামের মুখোমুখি হলেন। এ হল তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া সমাজপতিদের বিরুদ্ধে সামাজিক সংগ্রাম। রানী তাঁর সঙ্কল্প বদল করতে বাধ্য হলেন। হালিশহরে আর মন্দির নির্মাণ সম্ভব হল না।

রাসমণি জানতেন সেই কথাটা, গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল। এবারে তাই এই পুণ্যভূমির দিকেই মনোযোগ দিলেন রাসমণি। মথুরবাবু ওই দিকেই জমি খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

সেই সময়ে বালি-উত্তরপাড়া অঞ্চলের ক্ষুদ্র জমিদাররা কেউ অন্যের জমির ওপর দিয়ে গঙ্গায় যেতেন না। কাজেই কেউই জমি বিক্রি করতে চাইলেন না।

কিন্তু রাসমণি নিরস্ত হলেন না। দীর্ঘদিন ধরে খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত কেনা হল গঙ্গার পূর্বকূলের দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলের জমি।

জমির মালিক ছিলেন হেস্টিং সাহেব। তাঁর কাছ থেকেই ১৮৪৭ খ্রিঃ ৬ই সেপ্টেম্বর ষাট বিঘে জমি কেনা হল পঞ্চাশ হাজার টাকায়।

এই জমিটা ছিল খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। তার একদিকে ছিল জমির মালিক সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি জেমস হেস্টিং-এর কুঠি। অন্য প্রান্তে ছিল মুসলমানদের কবরস্থল ও গাজি সাহেবের দরগা।

এই দুই প্রান্তের মাঝখানে হল হিন্দু মন্দির। জমির এমন অবস্থানের মধ্যেই যেন ছিল ভবিষ্যতের এক অলৌকিক ইঙ্গিত।

পরবর্তীকালে এখানেই রাসমণির মন্দিরের পুরোহিত যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী—যত মত তত পথ।

সর্বধর্মের মধ্যে যিনি এই ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন, তাঁর সেই সত্য উপলব্ধির ভূমি ছিল রাসমণির মন্দির প্রাঙ্গণ।

রানীর ঐকান্তিক আগ্রহে ও চেষ্টায় একদিন গড়ে উঠল ভবতারিণীর মন্দির, রাধাকান্তের মন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির, অতিথিশালা, কর্মীগৃহ, মন্দির সংলগ্ন দুটো ঘাট, কুঠিবাড়ি, চাঁদনী ইত্যাদি।

মন্দির সম্পূর্ণ হতে লেগেছিল দীর্ঘ দশ বছর। খরচ? মন্দির উদ্বোধনের খরচ নিয়ে মোট ব্যয় হয়েছিল তখনকার দিনের নয় লক্ষ টাকা।

বাংলা ১২৫৪ থেকে ১২৬৩ সন পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর মন্দির নির্মাণের সময় সুদীর্ঘ দশ বছর রাসমণি ছিলেন ব্রতচারী, শয়ন করেছেন মাটিতে, আহার তো ছিল হবিষ্যান্ন মাত্র।

জমি কেনা, মন্দির নির্মাণ ও মন্দিরের খরচপত্র চালানোর জন্য দিনাজপুরে জমি কেনা হয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। তার জন্য খরচ হয়েছিল দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা। এই সম্পত্তি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের জন্যই দানপত্র করে দিয়েছিলেন তিনি।

মন্দিরে কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলেন পঞ্চাশজন। তাঁদের বেতন বাবদ বছরে খরচ হত তিন হাজার টাকা।

সেই সময়ে রাসমণির বয়স হয়েছিল বাষট্টি বছর। বয়সের কথা ভেবেই তিনি মন্দিরে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং বিধিমতে নিত্যপূজা-উপসনার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন।

মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হবার আগেই বাংলা ১২৬২ সনে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিনে তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। ইংরাজি মতে সময়টা ছিল ১৮৫৫ খ্রিঃ ৩১শে মে।

মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবারে কোন সৎ নিষ্ঠাবান শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দিতে হবে মন্দিরে দেবসেবার দায়িত্ব। কিন্তু ব্রাহ্মণদের কেউই রানীর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন না।

রানী ছিলেন মাহিষ্য পরিবারের মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল মাড়-পরিবারে। সেইকালে মাহিষ্যদের শূদ্র বলেই গণ্য করা হত। সেইজন্য রানীর গোঁড়া ব্রাহ্মণরা মন্দিরে পৌরোহিত্য বা দান গ্রহণ করার ব্যাপারে রাজি হলেন না।

রাসমণি এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর মাথায় যেন এবারে আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন, নিষ্ঠা, আকুলতা, অর্থব্যয়, শ্রম কোন কিছুরই ত্রুটি ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণরা পুজো করতে না এলে যে কেউ ঢুকবে না মন্দিরে, তবে কি সব আয়োজনই পন্ড হবে?

কিন্তু রাসমণি তো প্রতিকূলতার কাছে কোন দিন মাথা নত করেন নি। তিনি বিভিন্ন দিকে লোক পাঠিয়ে পন্ডিতদের পরামর্শ নিতে লাগলেন।

রানীর সব চেষ্টাই যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার মুখে, সেই সময় একজন শাস্ত্রবিৎ, সদাচারনিষ্ঠ, ভক্ত ব্রাহ্মণ রামকুমার চট্টোপাধ্যায় রানীর কাতরতায় বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি সম্মত হলেন রানীর মন্দিরে পুজো করতে।

সেই সময় রামকুমার কলকাতার ঝামাপুকুরে সংস্কৃত টোলে অধ্যাপনা করতেন। টোল বাড়িতে তাঁর সঙ্গে থাকতেন ছোটভাই রামকৃষ্ণ। তখন তিনি রামকৃষ্ণ নন, গদাধর। বয়স উনিশ।

উপনয়নের সময় তাঁদের কামারপুকুর গ্রামে গুরুজনদের নিষেধবাক্য উপেক্ষা করে শূদ্রা রমনী ধনী কামারনীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করে তাঁকে মা বলে ডেকেছিলেন গদাধর। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও শূদ্রানীকে তিনি করেছিলেন ভিক্ষামাতা।

এবারে রানী রাসমণির আর্তি শোনার পর তিনি দাদাকেও তাঁর মত আচরণ করতেই প্রেরণা দিলেন।

রাসমণির পত্র নিয়ে এসেছিলেন মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণ পূজকের অভাবে ভক্তের মাতৃপূজা হবে না, দেবীর আদিষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হয়ে যাবে— এসব কথা ভেবে রামকুমার ও গদাধর দুজনেই ব্যথিত হলেন। তাঁদের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়

কোনদিন শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নি, শূদ্রযাজী হননি। এই ঐতিহ্যের ধারক হয়েও বংশের রীতিকে ভঙ্গ করতে বাধ্য হলেন রামকুমার—ভক্তিমতী রাসমণির অসহয়তার কথা ভেবে।

তিনি রানীকে বিধান দিয়েছিলেন রানী যদি ওই মন্দির ও মন্দির পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট সব সম্পত্তি কোনও ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাহলে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

রাসমণি প্রতিষ্ঠার আগেই মন্দির উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাঁর গুরুদেবের নামে। কাজেই মন্দিরে পূজার দায়িত্ব নিতে আর ইতস্ততঃ করেন নি রামকুমার। পরবর্তীকালে একই দায়িত্ব নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ যখন তাঁর দাদার সঙ্গে দক্ষিনেশ্বরে থাকতে আসেন, সেই সময়েও তাঁর মধ্যে পারিবারিক নিষ্ঠা বেশ সক্রিয় ছিল। প্রচলিত রীতিনীতিকে অতিক্রম করবার মতো মানসিক প্রস্তুতি তখনো তাঁর গড়ে ওঠেনি। দাদার সঙ্গে থেকেছেন কিন্তু মন্দিরের অন্নভোগ বা প্রসাদ গ্রহণ করতেন না। মন্দিরের ভাঁড়ার থেকে নেওয়া চাল ডাল ইত্যাদি তিনি গঙ্গাতীরে স্বহস্তে রান্না করে খেতেন।

ক্রমে রাসমণির মধুর ব্যবহারে ও সহৃদয়তাগুণে রামকৃষ্ণের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। ক্রমে তিনি সহজ হয়েছেন। পরে রাসমণির অনুরোধে তিনি পূজারীর পদও নিয়েছেন। তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয়েই উত্তরকালে গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণে উন্নীত হয়েছেন।

রামকৃষ্ণ প্রচলিত পূজার পদ্ধতির ধার ধারতেন না। ভাবের আবেশে তিনি নিজস্ব প্রক্রিয়ায় পুজো করতেন, কালীর সঙ্গে অলৌকিক লীলায় মেতে থাকতেন।

মন্দিরের অন্যান্য পুরোহিতরা রামকৃষ্ণের ব্যবহারে রুষ্ট হয়ে রানীর কাছে গিয়ে নালিশ জানিয়েছিলেন এই বলে যে রামকৃষ্ণ দেবীর অবমাননা করে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করছেন।

অভিযোগ শুনে রাসমণি নিজে অনুসন্ধানে এসে দেখলেন, রামকৃষ্ণের দেবীপূজা মন্ত্রহীন, প্রচলিত পদ্ধতির একেবারে বাইরে। কিন্তু সেই পূজায় রয়েছে ভক্তপ্রাণের আকুতি আর আত্মনিবেদন।

রাসমণি তাঁর ভক্তি ও বিচক্ষণতা দিয়ে সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন, রামকৃষ্ণের পূজাতেই পাষাণী দেবী একদিন চিন্ময়ী হবেন। তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই।

রাসমণি তাঁর লোকজনদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন. গদাধরের কাজে কেউ যেন কোন বাধা না দেয়। তিনি তাঁর মতো করেই মায়ের পূজা করবেন।

রাসমণির বাস্তববোধ ও লোকচরিত্র জ্ঞানের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। রামকৃষ্ণের স্বরূপ তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতেই প্রথম ধরা পড়েছিল। ফলে মানসিক দিক থেকে ক্রমেই

দুজনে দুজনের নিকটে এসেছেন। রামকৃষ্ণের নিকটে এলে, তাঁর অপার্থিব গান শুনলে তিনি মনে শান্তি লাভ করতেন।

একবার দক্ষিণেশ্বরে এসে গান শুনতে শুনতে রাসমণি বিষয় চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তার জন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ পরে বলেছেন, 'একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়িতে এসেছে। কালীঘরে এল। পূজার সময় আসত আর দু-একটা গান গাইতে বলত। গান গাচ্ছি, দেখি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। অমনি দুই চড়। তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতজোড় করে রইল।'

গদাধর রাসমণির বেতনভুক কর্মচারী। অথচ তাঁর হাতের চড় খেয়ে রাসমণি সেদিন ক্ষুন্ন হননি, নিজের অন্যমনস্কতার অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন বারংবার। তিনি গদাধরের প্রকৃত সত্তার পরিচয় জেনেছিলেন বলেই তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধার আসনটিতে স্থান দিতেন। গদাধরকে তিনি সম্বোধন করতেন বাবা বলে।

রাসমণির কাছ থেকে এই ভক্তিভাব পেয়েছিলেন মথুরবাবুও। তার ফলেই দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠেছিল মানবসভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান। পুণ্য তীর্থক্ষেত্রজ্ঞানে দেশ বিদেশের মানুষের সমাগম হয়েছে সেখানে। সেই ধারা আজও বহমান।

রাসমণির কর্মধারা ছিল বহুবিস্তৃত। তিনি ইংরাজের সঙ্গে মর্যাদার লড়াই লড়েছেন, গরিব প্রজাদের ও জনসাধরণকে রক্ষার জন্য সতত সজাগ ও সচেষ্ট থেকেছেন, জলকর ও নীলকরের অত্যাচার বন্ধ করতে অকুতোভয়ে অগ্রসর হয়েছেন—নিজেই তরবারি হাতে গোরা সৈন্যদের রুখেছেন। জনকল্যাণের জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করে নির্মাণ করেছেন পথঘাট, বাজার, সেচের খাল—তাঁর কীর্তির তালিকা অসামান্য।

জমিদারি পরিচালনা ও অন্যান্য বৈষয়িক কাজকর্ম দেখাশোনার দায়িত্ব মথুরমোহনের ওপর দিলেও রাসমণি নিজেই সবকিছু দেখাশোনা করতেন।

করুণাময়ী রাসমণি আপন চরিত্র মাধুর্যেই লোকসমাজে রানী ও লোকমাতা রূপে পরিচিত হয়েছিলেন।

প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী, তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা রাসমণি তাঁর সময়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিলেন অনন্যা।

রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'রাসমণি শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্টনায়িকার একজন'। কালী, চামুন্ডা, ব্রহ্মাণী, ঐন্দ্রী, বারাহী, নারসিংহী, শিবদূতী, বৈষ্ণবী এই অষ্টমাতৃকা অসুরবধকালে আদ্যাশক্তি মহামায়ার শরীর থেকেই উদ্ভূতা হয়েছিলেন। এই অষ্টমাতৃকাই শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্টনায়িকা। এঁরাই হলেন জগতে জগন্মাতার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়িকা শক্তি। এঁদের উদ্ভব দেবীর দেহ থেকে, কার্যশেষে তাঁরা আবার দেবীর অঙ্গেই বিলীন হয়ে যান।

রাসমণির এই চরিত্ররহস্যটি শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানদৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছিল। জগন্মাতার শক্তির অংশ রূপেই রাসমণিকে জ্ঞান করতেন তিনি।

বিপুল কর্তব্য সম্পূর্ণ করে, ১৮৬১খ্রিঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারি রানী রাসমণি ফিরে গেছেন জগন্মাতার কোলে।

ধ্যানচাঁদ



পরপর পাঁচটি অলিম্পিকে বিশ্বজয়ীর জয়মাল্য লাভ করে আর্ন্তজাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারত ক্রীড়া ইতিহাসে নবতম গৌরবের অধিকারী হয়েছিল। ভারতের এই প্রতিভাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে যিনি সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন, তিনিই হলেন হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদ।

ভারতীয় হকি দলের অন্যতম জ্যোতিষ্ক ধ্যানচাঁদ বিশ্ববাসীর মনে প্রথম আলোড়ন তোলেন নিউজিল্যান্ডে ১৯২৬ খ্রিঃ। এরপর একে একে আমস্টার্ডাম, লস এঞ্জেলস, বার্লিন ও ইংলন্ডের অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে সেই আলোড়নের ঢেউ এসে আঘাত করে।

ধ্যানচাঁদের হকি খেলা ছিল ছন্দোময়। তাঁর খেলার সৌন্দর্য দেখে ইংলন্ডের জনসাধারণ তাঁকে যাদুকর নামে অভিহিত করেন। কেউ আবার বলেছেন 'হিউম্যান ঈল' অর্থাৎ মানুষরূপী বানমাছ।

ইংলন্ড, আমেরিকা, জার্মানী, বেলজিয়াম এবং হাঙ্গেরীর জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বের ক্রীড়ামোদী মানুষ স্বপ্নাবিষ্টের মত ধ্যানচাঁদের হকি খেলার সৌন্দর্য উপভোগ করতেন।

১৯৩৬ খ্রিঃ বার্লিন অলিম্পিকে উপস্থিত ছিলেন ফুরার হিটলার। ধ্যানচাঁদের হকি খেলার মাধুর্য সুষমায় মুগ্ধ হয়ে সেদিন নাৎসী জনসাধারণ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তারপর বিশ্ববাসী ধ্যানচাঁদকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান জানিয়ে হকির প্রাঙ্গণে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

১৯০৫ খ্রিঃ ২৯শে আগস্ট উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত এলাহাবাদে এক রাজপুত ব্রাহ্মণ পরিবারে ধ্যানচাঁদের জন্ম। তাঁর পরিবার রাজপুতনা ত্যাগ করে প্রথমে এলাহাবাদে ও পরে ঝাঁসিতে বসবাস করেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যম।

ধ্যানচাঁদের পিতা ও বড় ভাই ছিলেন সৈনিক। ছোট ভাই রূপ সিং ছিলেন ভারতীয় হকি দলের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ধ্যানচাঁদ আর রূপ সিং হলেন ভারতীয় হকির অনন্য ভ্রাতৃযুগল।

ছেলেবেলা থেকেই ধ্যানচাঁদ জানতেন, পরিবারের ধারা অনুযায়ী তাঁকেও সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হবে। তাই লেখা পড়ার বিষয়ে তিনি নিজে এবং পরিবারের লোকেরাও বিশেষ মনোযোগ দিতেন না।

ষোল বছর বয়স হতেই ১৯২১ খ্রিঃ ধ্যানচাঁদ দিল্লীতে প্রথম ব্রাহ্মণ রেজিমেন্টে সাধারণ সেপাই হিসেবে যোগদান করেন।

সৈন্যবিভাগে প্রথম যে ব্রাহ্মণ রেজিমেন্ট গঠিত হয়েছিল, তার সুবেদার মেজর ছিলেন বালে তেওয়ারী। ইনি ছিলেন একজন দক্ষ হকি খেলোয়াড় এবং খেলার উগ্র সমর্থক। মুখচোরা স্বভাবের নিরীহ প্রকৃতির ধ্যানচাঁদকে তিনি খুব স্নেহ করতেন।

এই বালে তেওয়ারীর কাছেই ধ্যানচাঁদের হকি খেলার প্রথম হাতেখড়ি হয়। বস্তুতঃ তিনিই বিশ্ব হকির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ তারকা ধ্যানচাঁদের হকিগুরু।

সেই সময় সৈন্যদলের মধ্যে হকি খেলার খুব প্রচলন ছিল। জনাকয়েক এক সঙ্গে হলেই আরম্ভ হতো খেলা। এর জন্য সকাল বিকাল বা সন্ধ্যা-সময়ের কোন বাছবিচার ছিল না।

ধ্যানচাঁদ সুযোগ পেলেই খেলায় মেতে উঠতেন। স্টিকের মাথায় বল নিয়ে এঁকে বেঁকে দৌড়ে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই যেন তিনি অভূতপূর্ব আনন্দ পেতেন। এইভাবেই ধীরে ধীরে সৈন্যদলের মধ্যে ধ্যানচাঁদের খেলার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

সৈনিকদের আন্তঃবিভাগীয় খেলায় তিনি নিজের দলের জন্য বিজয়ীর জয়মাল্য ছিনিয়ে এনে সৈন্যবিভাগের সকল দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

ধ্যানচাঁদ সৈন্যবিভাগের মধ্যেই খেলেছেন ১৯২২ খ্রিঃ থেকে ১৯২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত।

একসময় একটি ফৌজি দল নিউজিল্যান্ড সফর করবে বলে স্থির হয়। এই সফরের অন্যতম খেলোয়াড় হিসাবে ধ্যানচাঁদকে নির্বাচিত করা হবে কিনা সে বিষয়ে তখনো কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

ধ্যানচাঁদের মনে অত্যুগ্র আগ্রহ। কিন্তু কারোর অনুগ্রহ নেবার মানসিকতা ছিল না তাঁর। শৈশব থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছেন তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি একমনে কঠোর অনুশীলনের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন।

ইতিমধ্যে একদিন কমান্ডিং অফিসার তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ধ্যানচাঁদ জানতে পারলেন নিউজিল্যান্ড সফরে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। সেদিন আনন্দ সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর।

কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে উচ্ছ্বাস সংবরণ করে অফিসারকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে এসে ছুটে যান তাঁর ব্যারাকে।

সহকর্মীদের ঘরে ঘরে ছুটে গিয়ে সকলকে আনন্দের সংবাদ দিতে থাকেন। বন্ধুরাও আনন্দে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। আশায় আনন্দে বুক ভরে ওঠে ধ্যানচাঁদের।

নিউজিল্যান্ড থেকে ভারতের হকি দলের জয়যাত্রা শুরু হয়। ভারতীয় হকির অবিস্মরণীয় প্রতিভাকে চিনে নিতে বিদেশে ক্রীড়ামোদীদের দেরি হয় না। ধ্যানচাঁদই হয়ে ওঠেন সকলের আলোচনার বিষয়।

নিউজিল্যান্ডবাসীদের বিস্ময়ের চমকে চমকিত করে ফিরে আসেন দেশে। ভারতেও দিকে দিকে ধ্যানচাঁদের বিস্ময়কর প্রতিভার কথা ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয় না।

এই সময়ে সামরিক জীবনেও ঘটল তাঁর পদোন্নতি। সেপাই থেকে হলেন ল্যান্স-নায়ক।

ভারতীয় হকিদল প্রথম বিশ্ব অলিম্পিকে যোগদান করে ১৯২৮খ্রিঃ।

স্থির হয় আন্তঃপ্রাদেশিক খেলার মাধ্যমে ভারতীয় খেলোয়াড়দের নির্বাচিত করা হবে। এই আন্তঃপ্রাদেশিক খেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়।

উত্তর প্রদেশ দলের আক্রমণ ভাগে ধ্যানচাঁদের খেলা দেখে দর্শকরা ধ্যানচাঁদের প্রশংসায় কলকাতার ময়দানের আকাশ-বাতাস মুখর করে ফেললেন।

নির্বাচক মন্ডলী দ্বিধাহীন ভাবে ভারতীয় দলের আক্রমণভাগের গুরুদায়িত্ব ধ্যানচাঁদের ওপর ন্যস্ত করলেন।

১৯২৮খ্রিঃ ১০ই মার্চ কাইজার-ই-হিন্দ জাহাজে চেপে ভারতীয় খেলোয়াড় দল যথাসময়ে বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করলেন।

সেদিন এই দলকে সম্বর্ধনা জানাতে কোন ভারতীয় জাহাজঘাটে উপস্থিত ছিল না। কিন্তু জাহাজের মধ্যে ভারতীয় জওয়ানদের বুকে দুর্দমনীয় সঙ্কল্প ধ্বনিত হচ্ছিল— আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতকে পরিচিত করবার প্রেরণা।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের আগে লন্ডনে ভারতীয় দল এগারোটি খেলায় জয়ী হয়। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই সংবাদ গোপন করে লন্ডনের সব কটি দৈনিক সংবাদপত্র।

সম্ভবতঃ ধ্যানচাঁদের বিস্ময়কর প্রতিভা তাঁদের বিচলিত করে তুলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দুর্দমনীয় প্রতিভাকে তাঁদেরই অভিনন্দন জানাতে হয়েছিল হকির যাদুকর ও হিউম্যান ঈল আখ্যায় ভূষিত করে।

অলিম্পিকের খেলায় পরাজিত হল অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, ফাইন্যাল পড়ল হল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

কিন্তু খেলার আগে দেখা দিল আকস্মিক বিপর্যয়। ভারতীয় দলের দিকপাল খেলোয়াড় ফিরোজ খান, সৌকত আলী ও খের সিং অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অধিনায়ক ছিলেন জয়পাল সিং। তিনিও অনুপস্থিত। প্রবল জ্বরে ধ্যানচাঁদও শয্যাশায়ী।

ম্যানেজার মিঃ রসার চোখে অন্ধকার দেখেন। তিনি উন্মাদের মত ছুটে আসেন ধ্যানচাঁদের কাছে। তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'ভারতের এই চরম পরীক্ষার দিনে তুমি শয্যাশায়ী থাকবে, ধ্যানচাঁদ। তুমি তো সৈনিক, ওঠো— ভারতের জন্য নির্দিষ্ট বিজয়ীর জয়মাল্য তোমাকেই এনে দিতে হবে।' মুহূর্তে যেন সমস্ত জড়তা ঝরে পড়ে ধ্যানচাঁদের শরীর থেকে। অসুস্থ সৈনিক অভুক্ত অবস্থাতেই হাতিয়ার নিয়ে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

সেদিন যেন আসুরিক শক্তি সামর্থ্য লাভ করেছেন ধ্যানচাঁদ। তাঁর দুর্বার আক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হয় হল্যান্ডের রক্ষণভাগ। হল্যান্ডের গোলরক্ষক একবার নয়— বারবার তিনবার পরাজিত হল।

সময়টা ১৯২৮খ্রিঃ ২৬শে মার্চ। ভারত লাভ করল বিশ্বহকির দুর্লভ বিজয় মুকুট। সহ-খেলোয়াড়দের সঙ্গে ধ্যানচাঁদ অলিম্পিকের স্বর্ণপদক লাভ করলেন ২৯শে আগষ্ট।

অলিম্পিক বিজয়ী দল ভারতে ফিরে আসার পর ধ্যানচাঁদের নাম ছড়িয়ে পড়ল ঘরে ঘরে। অভিনন্দনে অভিষিক্ত হলেন তিনি।

চারবছর পরে ১৯৩২ খ্রিঃ লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের জন্য যে দল নির্বাচিত হল তাতে ধ্যানচাঁদ অন্তর্ভুক্ত হলেন কোন ট্রায়াল খেলায় অংশ গ্রহণ না করেই।

অলিম্পিক ফাইন্যালে ভারত খেলল আমেরিকার বিরুদ্ধে। পরপর ২৪ গোল করে ভারতীয় খেলোয়াড়রা নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করল।

অলিম্পিক বিজয়ের পর ভারতীয় দল হল্যান্ড, জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরী সফর করে। ভারতীয় হকির উন্নত কৌশল দেখে সকল দেশের জনসাধারণই বিস্ময়মুগ্ধ হয়। ধ্যানচাঁদের অনুপম খেলার ছন্দোময় সুষমার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হন সকলে।

সফর শেষ করে অপরাজিত গৌরব নিয়েই ভারতীয় হকি দল দেশে ফিরে আসে। ধ্যানচাঁদ সর্বমোট ১৩৩টি গোল করে সব চেয়ে বেশি গোলদাতার সম্মান লাভ করেছিলেন।

সেই সময় ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন সিস্টার হ্যেমান। ধ্যানচাঁদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি তাঁর জন্য রেলবিভাগে একটি ভাল চাকুরির ব্যবস্থা করেন।

এই সংবাদে ধ্যানচাঁদ পড়লেন অস্বস্তিতে। সৈন্যবিভাগ ত্যাগ করবেন কিনা এ বিষয় নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। এই সময়ে সৈন্যবিভাগের কর্তাদের

আশ্বাস পেয়ে ধ্যানচাঁদ সৈন্য বিভাগেই থেকে যান। তাঁর পদোন্নতি হয় ল্যান্স-নায়কের পদ থেকে নায়কের পদে।

১৯৩১খ্রিঃ ধ্যানচাঁদ লাভ করলেন নবাবী খিলাত। এই সালের ডিসেম্বর মাসে কারোয়াইতে ঝাঁসী হিরোজ দলে অধিনায়ক হিসেবে খেলে মানভাদার দলকে পরাজিত করেন। কারোয়াই-এর নবাব পুরস্কার বিতরণের সময় ধ্যানচাঁদকে 'খিলাত' দান করেন।

দুবছর পরেই, ১৯৩৩ খ্রিঃ ঝাঁসী হিরোজ দলের হয়ে খেললেন শক্তিশালী ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে। যথারীতি জয়লাভ করে দলের জন্য নিয়ে এলেন বাইটন কাপ।

এই খেলাটি এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ধ্যানচাঁদ তাঁর জীবনের সব থেকে স্মরণীয় খেলা হিসাবে এটিকে উল্লেখ করেন।

সেদিন কাস্টমস দলের হয়ে খেলেছিলেন দিকপাল হকি খেলোয়াড়গণ—সৈকত আলী, আসাদ আলী, ডিফোল্টস, সিম্যান, মেগসিন প্রভৃতি। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত এই দলকে পরাজিত করে সেদিন ধ্যানচাঁদ যে আনন্দ লাভ করেছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অন্য কোন খেলায়, এমনকি অলিম্পিকের বিভিন্ন খেলাতেও তেমন আনন্দ লাভের সুযোগ হয়নি।

ওয়েস্টার্ন এশিয়াটিক গেমসে ১৯৩৪ খ্রিঃ ধ্যানচাঁদ ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন। ১৯৩৫খ্রিঃ ভারতীয় হকিদল নিউজিল্যান্ড সফরে গেল। অধিনায়ক হলেন ধ্যানচাঁদ। অপরাজিত দল নিয়ে সগৌরবে দেশে ফিরে এলেন তিনি। এই সফরে সর্বাপেক্ষা বেশি গোল করার সম্মানও ছিল তাঁরই। গোল করেছিলেন ২০১টি।

এরপর এল ১৯৩৬খ্রিঃ অলিম্পিক। ভারতীয় হকি দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পড়ল ধ্যানচাঁদের ওপরে। এবারেও বিজয়ীর সম্মান লাভ করে পর পর তিনবার হকি খেলায় ভারতীয় দলকে বিশ্বক্রীড়াঙ্গনের সভায় শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করলেন ধ্যানচাঁদ।

এবারের সফরেও তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি ৫৯টি গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

১৯৩৬খ্রিঃ থেকে তিন বছর, ১৯৩৯খ্রিঃ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর মধ্যেই ধ্যাঁনচাঁদ তার হকি খেলা সীমাবদ্ধ রাখেন।

১৯৩৮খ্রিঃ তিনি ভাইসরয়েস কমিশন লাভ করে জমাদার পদে উন্নত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল স্তিমিত হয়ে এলে ধ্যানচাঁদ সৈন্যবিভাগের হকি দল নিয়ে মণিপুর, বর্মা, দূরপ্রাচ্য এবং সিংহল সফর করেন।

পূর্ব আফ্রিকা এশিয়ান স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণ আসে ১৯৪৭ খ্রিঃ। ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে ভারতীয় দলকে পূর্ব আফ্রিকা সফরে পাঠানো হয়। এই দল ২৮টি খেলাতে অংশ গ্রহণ করে সবকটিতেই বিজয়ী হয়।

ধ্যানচাঁদের অস্তায়মান প্রতিভার শেষ রশ্মিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয় নিউজিল্যাণ্ডের মাঠে। এই সফরে তিনি ৬১টি গোল করে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত জীবনের শেষ স্বাক্ষর রেখে যান।

প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে ধ্যানচাঁদ অবসর নেন ১৯৪৮খ্রিঃ। ১৯৪৯খ্রিঃ মে মাসে কলকাতায় লন্ডন অলিম্পিক বিজয়ী দলের সঙ্গে অবশিষ্ট দলের প্রদর্শনী খেলা হয়। এই খেলায় অবশিষ্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে ধ্যানচাঁদ অংশগ্রহণ করেন। এটিই তাঁর জীবনের সর্বশেষ প্রদর্শনী খেলা এবং এরপরই তিনি প্রথম শ্রেণীর হকি খেলা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

খেলার বিরতির সময় হকি অ্যাসোসিয়েশন ভারতীয় হকি ইতিহাসে ধ্যানচাঁদের অকৃপণ অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেন।

কলকাতার মাঠে শেষ প্রদর্শনী খেলা থেকেই বলা যায় ধ্যানচাঁদ একরকম তাঁর প্রিয় খেলা ত্যাগ করেন।

উত্তরকালের খেলোয়াড়দের জন্য ধ্যানচাঁদ যে আহ্বান রেখে গেছেন তা হল— "Keep the flag of India flying"।

ধ্যানচাঁদ ১৯৪৬খ্রিঃ সামরিক জীবনে কিংস কমিশন লাভ করে লেফটেন্যান্ট হন। ১৯৪৮খ্রিঃ ক্যাপ্টেন ও পরে মেজর পদে উন্নীত হন।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত তাঁর এই অনন্য প্রতিভাধর খেলোয়াড়কে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে খেলার জগতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

১৯৫৬খ্রিঃ ভারত সরকার ভারতীয় হকির অবিস্মরণীয় প্রতিভা ধ্যানচাঁদকে পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করেন।

জিম থর্প



১৯১২ খ্রিঃ। সুইডেনের রাজধানী স্টক হলমে পঞ্চম অলিম্পিকের আসর বসেছে। রাজা গুস্তভ নিজেও খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহী। শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখবার জন্য তাই প্রতিদিনই হাজির হন অলিম্পিক আসরে।

ডেকাথলন ও পেন্টাথলন প্রতিযোগিতা শেষ হলে রাজা গুস্তভ নিজের নির্দিষ্ট আসন ছেড়ে অ্যাথলেটদের বেশ পরিবর্তনের ঘরের দিকে অগ্রসর হন।

রাজার দেহরক্ষী ও সৈনিকেরা তটস্থ হয়ে রাজাকে অনুসরণ করতে থাকে, এভাবে রাজাকে দেখে পরিচালকমন্ডলীও কম বিস্মিত হন না।

কিছুক্ষণ আগেই ডেকাথলন ও পেন্টাথলন প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। প্রতিযোগীরা ফিরে এসে কেউ বিশ্রামরত, কেউ বেশপরিবর্তন করছেন। এমনি সময় রাজা গুস্তভ অকস্মাৎ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। অসময়ে এই স্থানে রাজাব অবির্ভাব ছিল অকল্পনীয়। হতবাক হয়ে যান সকলে।

রাজা গুস্তভের কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য নেই। তিনি উৎসুকভাবে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে কাকে যেন খুঁজতে থাকেন।

ঘরের এককোণে বসে ছিল এক যুবক। সুঠাম ঋজুদেহের অধিকারী সে। উজ্জ্বল তামার মত গায়ের রঙ। তখন ঘামে সিক্ত। তার ওপরে নজর পড়তেই রাজা গুস্তভ দ্রুত পায়ে এগিয়ে যান।

সুইডেনের রাজা মুহূর্তে যেন ভুলে যান তাঁর মর্যাদার, আভিজাত্যের কথা। দুই হাত বাড়িয়ে সাগ্রহে জড়িয়ে ধরেন বিস্মিত হতবাক যুবককে। রাজা আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকেন, হে বন্ধু, তুমি আমাদের সম্মানীয় অতিথি—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অ্যাথলেট তুমি। অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে যদি একবার করমর্দন কর তাহলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করব।

আনন্দে উদ্বেল যুবক দুহাতে রাজার হাত জড়িয়ে ধরে করমর্দন করেন। পরিতৃপ্ত প্রফুল্লতায় সুইডেনের রাজা গুস্তভ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

প্রতিভার অপরিমিত শক্তি যখন কোন বিশেষ মানুষকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করে তখন সেই মানুষ অবলীলায় ইতিহাস সৃষ্টি করে; সে হয়ে ওঠে অনন্য, চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। খেলাধুলার ইতিহাসে এমনি একজন প্রতিভাবান মানুষ

নিজের কর্মকৃতিত্ব ও অপরিমিত শক্তির পরিচয় রেখে চিরস্মরণীয় চিরবরণীয় হয়ে আছেন।

এই প্রতিভাধর মানুষটির দুর্লভ জীবনেতিহাস মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়, একজন মানুষের পক্ষে খেলাধুলার নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা কষ্টসাধ্য নয়। প্রেরণার চির-দ্যুতি স্বরূপ এই মানুষটি হলেন জিম থর্প।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার শ্রেষ্ঠ আসর অলিম্পিক। এই আসরের কঠিনতম প্রতিযোগিতা দুটির নাম হল ডেকাথলন ও পেন্টাথলন।

১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়, ১১০ মিটার হার্ডলস, হাইজাম্প. সটপট, বর্শা ছোঁড়া, পোলভল্ট, ব্রডজাম্প এবং ডিসকাস ছোঁড়া এই ১০টি প্রতিযোগিতা নিয়ে হল ডেকাথলন।

আর পেন্টাথলন হল, ব্রডজাম্প, বর্শা ছোঁড়া, ডিসকাস ছোঁড়া. ২০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়—এই পাঁচটি প্রতিযোগিতা।

সর্বমোট এই পনেরটি প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করে যিনি সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট অর্জন করেন তিনিই বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত হন। বলাই বাহুল্য অ্যাথলেটিকসের সকল বিভাগে যিনি চরম উৎকর্ষতা লাভ করতে পারেন কেবল তাঁর পক্ষেই ডেকাথলন ও পেন্টাথলনে জয় লাভ করা সম্ভব।

অলিম্পিকের ইতিহাসে জিম থর্প ছাড়া আজ পর্যন্ত অন্য কোন অ্যাথলিটই ডেকাথলন ও পেন্টাথলন এই উভয় বিভাগেই বিজয়ীর গৌরব লাভ করতে সমর্থ হননি। তিনি এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেন ১৯১২ খ্রিঃ।

কিন্তু নিয়তির এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে এই অবিশ্বাস্য প্রতিভাধর ও অনন্যসাধারণ ইতিহাসের স্রষ্টার নাম আজ অলিম্পিকের ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না। পরবর্তীকালে বিজয়ীর সম্মান থেকে অবহেলিত রেড ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত এই মানুষটি বঞ্চিত হন।

তাঁর অপরাধ? অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের আগে থর্প পেশাদারী বেসবল খেলায় যোগদান করেছিলেন—অলিম্পিকের রীতিভঙ্গের এই অপরাধের জন্যই বিজয়ীর তালিকা থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলা হয়। তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয় বিজয়ীর স্বর্ণপদক।

অলিম্পিকের ইতিহাসে বিজয়ীর তালিকায় জিম থর্পের নাম না থাকলেও বিশ্ব ক্রীড়ারসিকদের মনে তিনি তাঁর কীর্তির সঙ্গে অমলিন হয়ে আছেন। যুগ যুগ ধরে মানুষ তাঁকে স্মরণ করছে, আগামীদিনেও স্মরণ করতে বাধ্য হবে। জিম থর্পই অ্যাথলেটিকসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলেট কেবল এটুকুই তাঁর সবটুকু পরিচয় নয়।

বেসবল ও রাগবী খেলায় তিনি আমেরিকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেছেন। বন্দুক ছোঁড়া, স্কেটিং, টেনিস, হকি এবং ল্যাক্রোসি খেলাতেও তিনি প্রতি বছর অসংখ্য পুরস্কার লাভ করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

১৮৮৮ খ্রিঃ ২৮ শে মে প্রাগের নিকটবর্তী একস্থানে জন্মগ্রহণ করেন জিম। তাঁর পিতার নাম ছিল হিরাম থর্প, মায়ের নাম চার্লেটি ভিউ থর্প। নিজের জন্মস্থানটি বর্তমানে একলাহোমার অন্তর্গত।

মাত্র তিন বছর বয়স থেকেই জিম ঘোড়ার পিঠে চাপতে পারতেন। সাঁতার কাটতেও শিখেছিলেন শৈশবেই। যখন দশ বছরের বালক সেই সময়ে তিনি একটা হরিণ শিকার করেছিলেন।

নিজের প্রথম শিক্ষা শুরু হয়েছিল ম্যাক-ফক্স রিসার্ভেশন স্কুলে। স্কুলের পাঠ শেষ করে পরবর্তী পাঠ্যজীবন আরম্ভ করেন হাস্কেল ইনস্টিটিউটে। ছাত্রজীবন শেষ হয় পেনসিলভেনিয়ার কারলিসিল ইন্ডিয়ান স্কুলে।

এই স্কুলে খেলাধুলার শিক্ষক ছিলেন গ্লেন.এল.ওয়ার্নার। তাঁর চোখেই প্রথম জিমের অ্যাথলেটিকস প্রতিভা ধরা পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯০৭ খ্রিঃ।

সেদিন স্কুলের ছেলেরা হাইজাম্পের অনুশীলন করছিল। একটা জায়গায় এসে সকলেই আটকে যাচ্ছিল। কিছুতেই আর সেই বাধাটি অতিক্রম করতে পারছিল না।

জিম দূরে বসে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে জামাজুতো পরা অবস্থাতেই দৌড়ে এসে অনায়াসে সেই বাধাটি পার হয়ে গেলেন।

জিমের এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে ছেলেরা স্তম্ভিত হল। ক্রীড়াশিক্ষক ওয়ার্নার সেদিনই বুঝতে পারলেন উপযুক্ত শিক্ষা পেলে এই বালকই একদিন অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

ওয়ার্নার মনোযোগ দিলেন জিমের প্রতি। ক্রমেই তাঁর প্রতিভা বিকাশ লাভ করতে লাগল।

জিম তাঁর অবিস্মরণীয় প্রতিভার প্রথম পরিচয় দিলেন একবছরের মাথাতেই।

পার্শ্ববর্তী আর একটি স্কুল দলের সঙ্গে অ্যাথলেটিক প্রতিযোগতিায় থর্প একাকী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্কুলদলকে বিজয়ীর সম্মান এনে দিয়েছিলেন।

বিভিন্নমুখী প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন জিম থর্প। যখন যে বিষয়ে হাত দিয়েছেন তাতেই নিজের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯০৯খ্রিঃ ছাত্র অবস্থাতেই তিনি উইস্টন সালেন, ফয়েটেভিল ও রকিমাউন্ট প্রভৃতি শক্তিশালী পেশাদারী বেসবল দলের হয়ে খেলে পুরস্কার লাভ করেছেন।

দুবছর পরেই আবার রাগবী খেলায় আমেরিকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেছেন অবলীলায়।

জিম থর্পের অফুরন্ত প্রাণশক্তি বলে বন্দুক ছোঁড়া, স্কেটিং, টেনিস, হকি, সাঁতার ও ল্যাক্রেসী খেলাতেও তিনি নিজের কালে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৯১২ খ্রিঃ স্টকহলমের পঞ্চম অলিম্পিকে বিশ্বের জনগণ প্রথম স্তম্ভিত বিস্ময়ে জিম থর্পের অসাধারণ প্রতিভা প্রত্যক্ষ করে। সেই আসরেই তিনি সকল প্রকার খেলাধুলার একচ্ছত্র সম্রাট রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। ডেকাথলন ও পেন্টাথলনে অবিস্মরণীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে বিজয়ীর যে গৌরব বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে সেদিন তিনি লাভ করেছিলেন, অলিম্পিকের ইতিহাসে দ্বিতীয় কোন মানুষের পক্ষে তা অর্জন করা আজও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

সেদিন অযাচিত উপহার ও পারিতোষিকের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন তিনি। সুইডেনের রাজা গুস্তভ তাঁকে বেশ পরিবর্তনের ঘরে উপস্থিত হয়ে অভিনন্দিত করেছিলেন।

কেবল তাই নয়, বহুমূল্যবান মণিমানিক্যখচিত একটি সুদৃশ্য বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলিট বলে সম্বোধন করেছিলেন।

থর্পের এই সাফল্যে আনন্দ লাভ করেছিল বিশ্বের ক্রীড়ামোদি মানুষ। অকুণ্ঠ প্রশংসায় তাঁকে অভিনন্দন জানাতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস যে থর্পের স্বদেশবাসী অনেকেই তাঁর সাফল্যকে মেনে নিতে পারেননি। অনেকেই হয়ে পড়েছিলেন ঈর্ষাকাতর। সেই সঙ্কীর্ণমনা লোকগুলো আমেরিকার অ্যাথলেটিক ইউনিয়নের কাছে জিম থর্পের নামে অভিযোগ উত্থাপন করল যে তিনি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আগে পেশাদারী বেসবল খেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

যথারীতি জিমের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হল— অলিম্পিকের রীতিবিরুদ্ধ কাজ তিনি করেছেন কিনা।

খেলাধুলায় নিবেদিত প্রাণ ও আদর্শের নিষ্ঠাবান পূজারী জিম সত্যকে এতটুকু বিকৃত না করে অভিযোগের উত্তরে জানালেন, "আমি ছাত্রাবস্থায় সহপাঠী ছাত্রদের সঙ্গে ওই খেলায় যোগদান করেছিলাম। সেদিন যে ছাত্ররা আমার সঙ্গে মাঠে খেলেছিলেন তাঁরা কেউই পেশাদার ছিলেন না। সকলেই শৌখিন খেলোয়াড় হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আমি তখন একজন অনভিজ্ঞ স্কুলের ছাত্র মাত্র এবং আন্তর্জাতিক খেলাধুলার বা অলিম্পিকের আইন-কানুন কিছুই জানার সুযোগ আমার ছিল না"।

অবিকৃত এই সত্যভাষণে কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারেন নি আমেরিকার অ্যাথলেটিক ইউনিয়ন, যাঁরা তাঁকে অপেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে স্টকহলমে পাঠিয়েছিলেন।

১৯১৩ খ্রিঃ জানুয়ারী মাসের শেষ নাগাদ অলিম্পিকের বিজয়ীর তালিকা থেকে জিম থর্পের নাম মুছে দেওয়া হল। নিরলস সাধনা ও বহু কষ্টে যে স্বর্ণপদক দুটি তিনি

লাভ করেছিলেন, তা ফিরিয়ে নেওয়া হল তাঁর কাছ থেকে। আরও আশ্চর্য যে, জিম থর্পের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া পদকগুলিই পুনরায় উপহার দেওয়া হয়েছিল দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সুইডেনের এইচ.উইস ল্যান্ডারকে। প্রথম স্থান অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয় তাঁরই নাম।

এরপর ১৯১৩ খ্রিঃ থেকে ১৯১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পেশাদারী বেসবল খেলোয়াড় হিসাবে জিম থর্প অজস্র অর্থ উপার্জন করেন।

১৯১৯ খ্রিঃ বেসবল খেলা থেকে অবসর নেন জিম থর্প। তিনি এরপর রাগবী খেলার সংগঠনের কাজে ব্রতী হন। রাগবী অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি হন তিনি।

১৯২০ থেকে ১৯২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত নিউইয়র্ক জায়ান্টস ছিল আমেরিকার শ্রেষ্ঠ রাগবী দল। জিমই ছিলেন এই দলের প্রাণপুরুষ। রাগবী খেলায় প্রভূত অর্থ উপার্জন করে ১৯২৯ খ্রিঃ তিনি অবসর নেন।

খেলাধুলার জগৎ থেকে বিদায় নিলেও অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপূর জিম নিশ্চেষ্ট বসে থাকেন নি। অংশ নিলেন অভিনয় জগতে। এই ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই।

মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার জিম থর্পের জীবনী অবলম্বনে একটি ছবি তুলেছিলেন। ছবির নাম দেওয়া হয়েছিল ব্রোঞ্চম্যান। এই ছবির মাধ্যমে জিম থর্প-এর পারদর্শিতা দেখে পৃথিবীর সকল দেশের অসংখ্য মানুষ অপরিসীম আনন্দ লাভ করেছিলেন।

জিমের জীবনের একটা অধ্যায় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এবং বিভিন্ন খেলাধুলার উপদেষ্টা হিসেবে অতিবাহিত হয়। ১৯৩৭ খ্রিঃ ওকলাহোমাতে ফিরে এসে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন জিম।

১৯৪০ খ্রিঃ খেলাধুলার একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে জিম বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল, খেলাধুলার উপকারিতা, খেলাধুলায় উন্নতি লাভের উপায়, খেলার সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক প্রভৃতি।

১৯৪৩ খ্রিঃ ওকলাহোমার আইন-সভা আমেরিকার অ্যাথলেটিক ইউনিয়নের কাছে অনুরোধ জানান যাতে জিম থর্পের অলিম্পিক রেকর্ড স্বীকার করে নেওয়া হয়। এবিষয়ে আইন সভাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন দুজন রেড ইন্ডিয়ান সদস্য।

আইন সভার অন্য একজন রেড ইন্ডিয়ান সদস্য অ্যাথলেটিক ইউনিয়নের কাছে প্রস্তাব করেন জিম থর্পকে বিখ্যাত কোন কলেজে শরীর শিক্ষার উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন প্রস্তাবই গ্রাহ্য হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে জিম আমেরিকার স্থল ও নৌবাহিনীতে কাজ করেন।

জিম বিবাহ করেছিলেন তিনবার। ১৯১৩ খ্রিঃ ইভা মিলার, ১৯২৬ খ্রিঃ ফ্রিডা প্যাট্রিক এবং ১৯৪৫ খ্রিঃ প্যাট্রিকা গ্লাভিন এসকিউকে বিবাহ করেন। অনেক

পুত্রকন্যার পিতা থর্পের শেষ জীবন ছিল খুবই করুণ ও বিষাদময়। জীবনে অজস্র অর্থ উপার্জন করেছিলেন কিন্তু শেষ বয়সে চরম অর্থকষ্টে তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রাজপথের পাশে একটা ট্রেলার গাড়ির মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর মৃতদেহ।

চৌষট্টি বছর বয়সে বিশ্বের অবিস্মরণীয় ক্রীড়া প্রতিভা জিম থর্প মৃত্যুবরণ করেন।

অলিম্পিকে জিম থর্পের সাফল্যের তালিকা আজও বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করে। তালিকাটি এই রকম—

পেন্টাথলনঃ

ব্রডজাম্প— প্রথম—দূরত্ব ২৩ ফিট ২ ইঞ্চি।

ডিসকাস ছোঁড়া— প্রথম— দূরত্ব ১১৬ ফিট ৮.৪ ইঞ্চি।

বর্শাছোঁড়া— তৃতীয়— দূরত্ব ১৫৩ ফিট ২$\frac{১৯}{২০}$ ইঞ্চি।

২০০ মিটার দৌড়—প্রথম—সময় ২২.৯ সেকেন্ড।

১৫০০ মিটার দৌড়— প্রথম— সময় ৪ মি ৪৪$\frac{৪}{৫}$ সেকেন্ড।

ডেকাথলনঃ

১৫০০ মিটার দৌড়—প্রথম—সময় ৪ মি ৪০$\frac{১}{২০}$ সেকেন্ড।

১১০ মিটার হার্ডলস— প্রথম —সময় ১৫$\frac{৬}{১০}$ সেকেন্ড।

হাইজাম্প— প্রথম— উচ্চতা ৬ ফিট $\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি।

সটপট— প্রথম—দূরত্ব ৪২ ফিট ৫.৩ ইঞ্চি।

১০০ মিটার দৌড়— তৃতীয়—সময় ১১$\frac{১}{৫}$ সেকেন্ড।

ডিসকাস ছোঁড়া — তৃতীয়— দূরত্ব ১২১ ফিট ৩.৯ ইঞ্চি।

পোলভল্ট— তৃতীয়—উচ্চতা ১০ ফিট ৮ ইঞ্চি।

ব্রডজাম্প— তৃতীয়— দূরত্ব ২২ ফিট ৫.৩ ইঞ্চি।

বর্শা ছোঁড়া— চতুর্থ— দূরত্ব ১৪৯ ফিট ১১.২ ইঞ্চি।

৪০০ মিটার দৌড়—চতুর্থ— সময় ৫২$\frac{১}{৫}$ সেকেন্ড।

মোট পয়েন্ট— ৮,৪১২.৯৬।

জেসি ওয়েন্স



দারিদ্র্য, অভাব-আভিযোগ যে মানুষের অদম্য প্রতিভাকে একনিষ্ঠ সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না, সকল বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে প্রতিভা তার নিজের বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে নেয় জেসি ওয়েন্সের কঠোর সংগ্রামী জীবন এই সত্যের অন্যতম উদাহরণ।

নিদারুণ দারিদ্র্য তাঁকে কখনো ব্রতচ্যুত করতে পারেনি। জীবনের সকল ক্ষেত্রের পার্থিব বাধা-বিঘ্নকে তিনি হাসিমুখে উপেক্ষা করে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করেছেন।

বিশ্বের ক্রীড়াক্ষেত্রে দৌড় ও লাফানোর প্রতিযোগিতায় এই নিগ্রোবীর যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেন, তা আজও অম্লান হয়ে রয়েছে।

মানুষের পক্ষে যে কত কম সময়ে কতটা দূরত্ব দৌড়ে অতিক্রম করা সম্ভব, শারীরিক ক্ষমতায় কতটা দূরত্ব দীর্ঘ লাফ দিয়ে পার হওয়া সম্ভব তার দৃষ্টান্ত রেখে জেসি ওয়েন্স পৃথিবীর মানুষকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করেছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে হিটলারের আবির্ভাব এক বিপর্যয়কর ঘটনা। ১৯৩৬ খ্রিঃ। হিটলারের দাপটে সেই সময় সন্ত্রস্ত পৃথিবীর সমস্ত শক্তি। এরই মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলাধুলার আসর অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় হিটলারের জার্মানীতে।

১৯৩৬ খ্রিঃ অলিম্পিকে ওয়েন্স ১০০ মিটার দৌড় ১০.২ সেকেন্ডে, ২০০ মিটার দৌড় ২০.১ সেকেন্ডে, লংজাম্পে ২৬ ফুট $৫\frac{৫}{১৬}$ ইঞ্চি অতিক্রম করে এবং ৪×১০০ মিটার রিলেতে আমেরিকার রিলে দলকে বিজয়ী করে একাই চারটি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

জেসি ওয়েন্স এই অলিম্পিকে যে চারটি বিষয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন সেই চারটি বিভাগেই বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি হয়েছিল। সেই আসরের ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ের সময় এবং লংজাম্পের দূরত্বের রেকর্ড আজও রয়েছে অম্লান। পরবর্তীকালে ওয়েন্স লংজাম্পে নিজস্ব রেকর্ড ভঙ্গ করে ২৬ ফুট $৮\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন যে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছিলেন আজও তা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রেকর্ড হিসাবে অম্লান হয়ে রয়েছে।

জেসি ওয়েন্সের সাফল্যে পৃথিবীর মানুষ সেদিন এমনই অভিভূত হয়েছিলেন যে তাঁরা বার্লিন অলিম্পিককে জেসি ওয়েন্সের অলিম্পিক বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

এই শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবীরকে সম্মান জানাতে সেদিন সম্ভ্রান্ত আমেরিকান এবং নাৎসী জনসাধারণের কাছে চামড়ার সাদাকালোর বর্ণবিদ্বেষ বাধা হয়ে ওঠেনি। সংবাদপত্রে জেসি ওয়েন্সের অবিশ্বাস্য সাফল্যকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল—

''A record of such commanding excellence demands explaination. A theory has been advanced that through some physical characteristic of the race involving the bone and muscle construction of the foot and leg the Negro is ideally adapted to the Sprints and Jumping events.''

আমেরিকার অন্তর্গত ডেকটার আলাতে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে ১৯১৩ খ্রিঃ ১২ই সেপ্টেম্বর জেসি ওয়েন্সের জন্ম। তাঁর পিতার নাম হেনরী ক্লেভল্যান্ড ওয়েন্স এবং মাতার নাম এমা ফিটজারেল্ড।

ক্লেভল্যান্ড ওয়েন্স ছিলেন একজন সামান্য চালাইকর। এই কাজের আয় থেকে সংসারের খরচ সংকুলান হত না। কয়েক একর চাষের জমি ছিল। সেই জমির উৎপাদিত তুলো ও শস্য বিক্রি কবে জমিদারের খাজনা দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকতো তা দিয়ে কোন রকমে সংসার ঠেকা দেবার চেষ্টা করতেন।

চাষী পরিবারের ছেলে এই জেসিকে সাত বছর বয়স থেকেই বাবার সঙ্গে খামারে কাজ করতে হতো। এই কাজের ফাঁকে যখন সুযোগ মিলত তখন স্কুলে যেতেন।

স্কুলটা ছিল বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে। কিন্তু পথটা এমনই খারাপ ছিল যে বর্ষার দিনে সেই পথে চলাচল করা সম্ভব হত না। ফলে বর্ষার দিনগুলোতে স্কুলে যাওয়া প্রায় হতই না বলা চলে।

তবে পড়াশুনার প্রতি ছিল জেসির যথেষ্ট আগ্রহ। প্রখর বুদ্ধি আর মেধা পেয়েছিলেন জন্মগত ভাবেই। ফলে যতটুকু যা পড়াতেন বা শুনতেন সহজেই তা বুঝে নিতে পারতেন।

অভাবের সংসারের প্রয়োজনেই জেসির মেজবোন লীলা মে একটা চাকরি নিয়ে ক্লেভল্যান্ডে চলে গিয়েছিলেন। একবার ছুটিতে বাড়িতে এসে সংসারের বেহাল অবস্থা দেখে সপরিবারে ক্লেভল্যান্ডে গিয়ে বসবাস করবার জন্য পিতাকে পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে যেতে তিনি রাজি হলেন না।

কিন্তু ১৯২২ খ্রিঃ, জেসির বয়স তখন নয় বছর মাত্র, এক প্রকার পোকার আক্রমণে খামারের ফসল নষ্ট হয়ে গেল। বাধ্য হয়েই তখন ক্লেভল্যান্ড ওয়েন্সকে বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে ক্লেভল্যান্ডে চলে যেতে হল। জেসির বড় দাদা প্রেনটিসও সঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখানে বাপ-বেটা দুজনেই সৌভাগ্যক্রমে কাজ পেয়ে যান। মাস তিনেক পরে জেসি, তাঁর মা ও অন্যান্য ভাই বোনেরা বাবার কাছে ক্লেভল্যান্ডে চলে আসেন।

এই নতুন জায়গায় এসেই জেসির প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়। তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হল স্থানীয় সেন্টক্রেয়ার প্রাথমিক স্কুলে।

সংসারে অভাব অনটন লেগেই ছিল। তার মধ্যেই কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশুনা চালিয়ে গেলেন জেসি।

বোল্টন স্কুলের পাশেই ছিল ফেয়ারমাউন্ট জুনিয়ার হাইস্কুল। পাশাপাশি থাকার ফলে প্রায়ই এই দুই স্কুলের মধ্যে খেলাধুলার প্রতিযোগিতা হতো। ছাত্রদের উৎসাহে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্যই জেসি দৌড়নো ও লাফানোর অনুশীলন আরম্ভ করেন।

ফেয়ারমাউন্ট স্কুলে খেলাধুলা নিয়মিত পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। খেলাধুলার আকর্ষণেই জেসি মাকে রাজি করিয়ে এই স্কুলে ভর্তি হয়ে যান। এখানে এসেই তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু চার্লি রিলের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

চার্লি রিলে ছিলেন ফেয়ারমাউন্ট স্কুলের ট্রাক কোচ। ছেলেদের তিনি ট্রাক ও ফিল্ডের বিভিন্ন রকম শিক্ষা দিতেন। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গেই তিনি এই কাজটি করতেন। চার্লি ছিলেন পাকা জহুরী। বালক জেসিকে দেখেই তিনি তার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে যান। তাঁর ধারণা হয় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে জেসি ট্রাক ও ফিল্ডে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারবে। ফলে জেসিকে তিনি আলাদা ভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা নিলেন।

স্কুল ছুটির পরে অন্যান্য ছেলেরা বাড়ি চলে যেত। কিন্তু চার্লি সেই সময়ে জেসিকে নিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়তেন। অনুশীলন শেষ হলে জেসিকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন পার্কে। হাঁটতে হাঁটতে, কখনো কোন গাছের ছায়ায় বসে সেই সময় তিনি জেসিকে পৃথিবীর বড় বড় দৌড়বীরদের কৃতিত্বের গল্প শোনাতেন। সেসব কাহিনী মুগ্ধ হয়ে শুনতেন জেসি—তাঁর মনেও স্বপ্ন জেগে উঠত।

ফেয়ারমাউন্ট স্কুলের নিয়ম ছিল, এখানে দৌড়তে হলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট ও অভিভাবকের সম্মতি আনতে হতো। জেসি যখন মাকে এই কথা বললেন, তিনি অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তখন মাকে গোপন করে মেজবোন লীলা মেকে দিয়ে অভিভাবকের অভিমতপত্রে সই করিয়ে জেসি স্কুলদলের অন্তর্ভুক্ত হলেন।

চার্লি রিলের স্নেহচ্ছায়ায় এবং প্রশিক্ষণে ক্রমশই জেসির উন্নতি হতে লাগল।

স্কুলে দৌড়নোর আলাদা ট্রাক না থাকায় জেসিকে বড় রাস্তার পাশেই দৌড়নোর অনুশীলন করতে হতো। এভাবেই বিভিন্ন দূরত্বে দৌড়ের অভ্যাস করে চললেন তিনি।

নিয়মিত অনুশীলনের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই জেসি ২৩ ফুট লংজাম্পে অভ্যস্থ হয়ে উঠলেন। ১২০ গজ নিচু হার্ডল ১৫.৩ সেকেন্ডে এবং ২২০গজ দৌড় ২৪.৭ সেঃ অতিক্রম করতে পারতেন। কিছুদিনের মধ্যেই ২২০ গজ দূরত্ব ২২.১ সেকেন্ডে দৌড় অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে উঠল।

ফেয়ারমাউন্ট স্কুলের পাঠ শেষ করে জেসি ভর্তি হলেন ইস্ট টেকনিক্যাল হাইস্কুলে। এখানে যেই শিক্ষকের কাছে তিনি অ্যাথ লেটিকস-এর শিক্ষা নিতেন তাঁর নাম হল এডওয়েন। জেসি কিন্তু তবুও প্রতিদিনই তাঁর শিক্ষাগুরু চার্লির কাছে যেতেন এবং উপদেশ নিতেন। তাঁর চেষ্টাতেই জেসি ইস্ট টেকনিক্যাল স্কুলে শ্রেষ্ঠ অ্যাথলিট হিসেবে নিজের স্থান নির্দিষ্ট করে নিলেন।

এই সময়ে শিকাগোতে আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেসি ওয়েন্স এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এক বিস্ময়কর চমকের সৃষ্টি করেন।

ওয়েন্স ১০০ গজ দৌড়ে বিশ্বরেকর্ডের সমান সময়ে অর্থাৎ ৯.৪ সেকেন্ডে অতিক্রম করেন। এর সঙ্গে ছিল ২৪ ফুট ১১ ইঞ্চি ব্রড জাম্প এবং ২২০ গজ দৌড়। উভয় বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করে সমগ্র আমেরিকাতেই বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। রাতারাতি ওয়েন্সের নাম সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে আসতে থাকে অপ্রত্যাশিত সব প্রস্তাব। স্কুল থেকে পাস করবার পর ভর্তি হবার জন্য ওয়েন্সের কাছে ২৮টি কলেজ থেকে অনুরোধপত্র আসে। চার বছরের জন্য বৃত্তির প্রস্তাবও দেওয়া হয় কোন কোন কলেজ থেকে।

ওয়েন্স কিন্তু সমস্ত প্রলোভন এড়িয়ে নিজ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়েই যোগদান করেন।

সেই সময় ল্যারি স্নাইডার ছিলেন ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ ট্রাক শিক্ষক। তাঁর বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করলেন এবারে ওয়েন্স।

সংসারের অভাব ওয়েন্সের পেছনে লেগেই ছিল। ওহিওতে পড়বার সময়েও কখনো এলিভেটর অপারেটর হিসাবে, কখনো পেট্রোলপাম্পে কাজ করে সংসারে অর্থ সাহায্য করতে হতো।

১৯৩৫ খ্রিঃ ২৫শে মে দিনটি ওয়েন্সের জীবনে যেমন তেমনি খেলাধুলার ইতিহাসেও একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ওয়েন্স ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে ১২০ গজ দৌড়, ২২০ গজ নিচু হার্ডলস এবং ব্রডজাম্পে নতুন বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেন। ১০০ গজ দৌড়ের সময়েও তিনি বিশ্বরেকর্ডের সমান হন।

এবারে ওয়েন্স নিজ কৃতিত্বে আমেরিকার আশাভরসাস্থল হয়ে উঠলেন। আগামী বার্লিন অলিম্পিকে তাঁর যোগদানের বিষয়টি একরকম নিশ্চিতই করে ফেললেন আমেরিকার ক্রীড়াজগতের কর্তাব্যক্তিরা।

এরপর ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত হল আমেরিকার শ্রেষ্ঠ অ্যাথলিটদের প্রতিযোগিতা। সেখানেও সর্বাধিক সাফল্যলাভ করে ওয়েন্স নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন।

এই প্রতিযোগিতা চলাকালীনই সংবাদপত্রে একটা চমকপ্রদ খবর প্রকাশিত হল। খবরটা হল, ওয়েন্স কুইনকেলা নিকারসন নামে এক ধনীকন্যাকে শিঘ্রই বিবাহ করবেন।

নিজের গ্রামেই ছিলেন ওয়েন্সের বাল্য প্রণয়ী মিস সোলোমন। তিনি এই সংবাদ পেয়ে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর কথা ভেবে ওয়েন্স দ্রুত দেশে ফিরে এলেন এবং মিস সোলোমনের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। এর পরের ইতিহাস আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতের অবিস্মরণীয় ঘটনা। ১৯৩৬ খ্রিঃ বার্লিন অলিম্পিকে ফুরার হিটলারের সমক্ষেই ওয়েন্স ও তাঁর স্বজাতীয় নিগ্রোবীরেরা এক অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপন করলেন।

সেই সময় ওয়েন্স ২১ বছরের যুবক। হিটলারের পক্ষে একজন নিগ্রো যুবকের এই সাফল্য নির্বিকার চিত্তে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল জার্মানীর অ্যাথালিটরাই বার্লিন অলিম্পিকে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রথম দিনে হিটলার প্রত্যেকটি প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সঙ্গে করমর্দন করে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে ওয়েন্স ১০০ মিটার দৌড়ে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে তিনি করমর্দন করতে অস্বীকার করেন।

তৃতীয় দিনে ওয়েন্স ব্রডজাম্পে জার্মানির লাট্জ লংকে পরাজিত করে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সৃষ্টি করেন। সেদিনও হিটলার তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে অসম্মত হন।

চতুর্থ দিনেও ২০০ মিটার দৌড়ে ওয়েন্স নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। সেদিন আর হিটলার সহ্য করতে পারলেন না। নিগ্রো তরুণের উত্তরোত্তর অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে আক্রোশে ক্ষোভে তিনি এমনই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হলেন যে উত্তেজিতভাবে নিজের আসন থেকে উঠে ক্রীড়াঙ্গন ছেড়ে চলে যান।

এই ঘটনার পর দীর্ঘ পনের বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ১৯৫১ খ্রিঃ ওয়েন্স এলেন জার্মানিতে বেড়াতে। সেদিন আর হিটলার নেই। অনুপস্থিত তাঁর অনুগত অনুচরবৃন্দ, সেই রাজ্যপাটও বিগত। পরিচিত অলিম্পিক স্টেডিয়ামে এসে ওয়েন্স দেখতে পেলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আসনের সারিতে হিটলারের স্থানে উপবিষ্ট বার্লিনের মেয়র। এরপর ট্রাকস্যুট পরে ওয়েন্স যখন ধীরে ধীরে স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করতে থাকেন তখন চতুর্দিকের গ্যালারি থেকে পঞ্চাশ হাজার দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস ধ্বনিতে স্টেডিয়াম মুখরিত হয়ে ওঠে।

ওয়েন্স যখন দৌড় শেষ করলেন, মেয়র তাঁর আসন থেকে নেমে ওয়েন্সের সামনে দাঁড়িয়ে আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বললেন, "বন্ধু, পনের বছর পূর্বে এই ক্রীড়াঙ্গনে তোমার বিস্ময়কর প্রতিভাকে ফুরার হিটলার অপমানিত করেছিলেন, তোমার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে তোমার সঙ্গে করমর্দন পর্যন্ত করতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। সেই রাষ্ট্রনায়কের স্বেচ্ছাকৃত অপমানকর ব্যবহারের জন্য তোমার অন্তরে গভীর ক্ষত থাকা সম্ভব। আমি আজ তোমার সঙ্গে কেবল করমর্দন করেই ক্ষান্ত হব না। তোমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করব বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অ্যাথলিট হিসেবে, আমাদের সম্মানীয় অতিথি হিসেবে।"

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই বার্লিনের মেয়র ওয়েন্সকে দুহাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নেন।

অলিম্পিক প্রত্যাগত ওয়েন্সকে আমেরিকার জনসাধারণ বিপুলভাবে সংবর্ধিত করে তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিয়েছিল।

সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা লাভ করলেও রাষ্ট্রের কাছ থেকে ওয়েন্স কোন সম্মান পাননি। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের এই অবজ্ঞা ব্যথিত করেছিল ওয়েন্সকে। তিনি অচিরেই পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করেন।

ওয়েন্স বিশ্বাস করতেন, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে যে কোন শিশুকে সকল প্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত করে সুস্থ, সবল ও দরদী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এই কারণেই পেশাদার জীবনে দেখা গেছে অধিক সময় তিনি শিশুদের মধ্যেই অতিবাহিত করতেন।

বিশ্ববিখ্যাত অ্যাথলেট জেসি ওয়েন্স ১৯৫৫ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে পনের দিনের শুভেচ্ছা সফরে ভারতে এসেছিলেন।

এই সময় বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে অ্যাথলেটিকস-এর উন্নত কৌশল কি করে লাভ করা যায় সেই বিষয়ে শিক্ষা দান করেন।

পাভো নুরমী



বর্তমান বিশ্বের খেলাধুলার শ্রেষ্ঠ আসর হল অলিম্পিক গেমস। অলিম্পিকের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে আছে যেসব বিস্ময়কর প্রতিভার কর্মকৃতিত্বে তাঁদের মধ্যে দৌড়বীর পাভো নুরমী অন্যতম।

পাভো নুরমীর সাফল্যের কাহিনী লিখিত আছে ১৯২০ খ্রিঃ অ্যান্টওয়ার্পে, ১৯২৪ খ্রিঃ প্যারিসে এবং ১৯২৮ খ্রিঃ আমস্টারডাম অলিম্পিকের ইতিহাসের পাতায়।

এই তিনটি অলিম্পিক আসরে দূরপাল্লার দৌড়ের ৬টি বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন নুরমী। ৩টি বিভাগে লাভ করেছিলে দ্বিতীয় স্থান। এই অবিশ্বাস্য কীর্তি অর্জন করা আজও পর্যন্ত অন্য কোন অ্যাথালিটের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সর্বমোট ৯টি বিভাগে সাফল্য লাভ করেছিলেন নুরমী।

নুরমীর প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড অবশ্য বর্তমানে আর একই অবস্থানে নেই কিন্তু এক সময়ে তিনি যে কীর্তি স্থাপন করেছেন তা আজও বিশ্বের সকল অ্যাথলিট শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

পাভো নুরমীর দীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পর্যালোচনা করলে রূপকাহিনীর মতই মনে হয়। নুরমী তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন ১৯২৪ খ্রিঃ প্যারিস অলিম্পিকে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরদের মাত্র একঘণ্টা সময়ের মধ্যে পেছনে ফেলে ১,৫০০ ও ৫,০০০ মিটার দূরত্বের দৌড়ে বিজয়ী হয়েছিলেন তিনি। এরপর দীর্ঘ ১১ বছর ধরে দূর পাল্লার দৌড়ে একের পর এক বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন তিনি।

নিজে যে রেকর্ড গড়েছেন, পরে সেই রেকর্ড নিজেই ভঙ্গ করেছেন। তাঁর অ্যাথলিট জীবনের ইতিহাস এমনি রেকর্ড ভাঙ্গাগড়ারই ইতিহাস। যেখানে যখন দূরপাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, সেখানেই পেয়েছেন বিজয়ীর জয়মাল্য।

গোটা জীবনে অসংখ্য দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন, জয়ের পর জয়লাভ করেছেন। আর প্রত্যেকটি দৌড়ের পরেই তিনি উৎসাহে বলে উঠেছেন, "পরের দৌড়ে আমি আরও ভাল করব।" এমনি প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিলেন তিনি। নিজের চেষ্টা ও সাধনা বলে যে মানুষের পক্ষে দৌড়ের সময়কে দিনের পর দিন উন্নত করা সম্ভব, এই সত্য নুরমীর জীবনে বারবার প্রমাণ হয়েছে।

নিজের দৌড়ের সময়কে উর্ধ্বমুখী করবার জন্য নুরমী প্রত্যেকটি দৌড়ে স্টপ ওয়াচ ব্যবহার করতেন। দৌড়তেন যন্ত্রচালিতের মত। ক্লান্তি বা অবসাদ বলে তাঁর দেহে কিছু ছিল না। ঘড়ির সময় দেখে তাই তিনি অবলীলায় বাড়িয়ে নিতে পারতেন তাঁর ক্লান্তিহীন পা দুটির গতি।

নুরমীর অসাধারণ সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল দৃঢ় মনোবল আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি। এর সহায়তায়ই তিনি দীর্ঘদিন একের পর এক ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'স্টপ ওয়াচ' ব্যবহার করার জন্য অনেক সময় তাঁকে ব্যঙ্গ ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু নুরমীর সাফল্যের পর সেই সমালোচনাকারীদেরই তাঁকে দেখার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে।

নুরমীর ছিল এক অদ্ভুত খেয়াল। প্রত্যেক দৌড়েই তিনি নতুন নতুন জুতো ব্যবহার করতেন। কেবল তাই নয়, ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বের দৌড়ের জন্য তাঁর জুতোর রঙও হতো ভিন্ন রকমের। এই রঙীন জুতো পরা পা যখন দৌড়তে শুরু করত তখন তাঁর দৌড়ের ভঙ্গিমা দর্শকদের মনেও মাতন তুলত। তাঁর দৌড়ের ভঙ্গি ছিল যথার্থই মনোরম।

দৌড়ে ছিল ঝড়ের গতি, আবার নুরমী নিজে ছিলেন ফিনল্যান্ডের অধিবাসী। তাই অনেকেই তাঁর নাম দিয়েছিলেন ফ্লাইংফিন।

পাভো নুরমীর জন্ম হয়েছিল ফিনল্যান্ডের অন্তর্গত হেলসিঙ্কির অদূরবর্তী 'এবো' নামক স্থানে। দৌড়ের প্রতিভা ছিল জন্মগত। তাই বাল্যকাল থেকেই দৌড়ের প্রতি ছিল

প্রবল আকর্ষণ। নয় বছর বয়স থেকেই তাঁর দৌড়ের প্রতিভা প্রকাশ পেতে থাকে। একবার ট্রলি গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে বন্ধুদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন।

সংসারের দায়িত্ব ছিল বাবার ওপর। নুরমীর যখন ১২ বছর বয়স সেই সময় তাঁর বাবা মারা যান। ফলে বাবার বড় ছেলে হিসেবে সংসারের সব দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর ওপর। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এই সময় তাঁকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু অসীম মনোবল নিয়ে তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন।

কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি দৌড়ের নেশা ত্যাগ করতে পারেন নি। সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরে বাড়ি ফিরে রাতের অন্ধকারে একাকী দৌড়ের অনুশীলন করতেন। সেই সময় মাঠ থাকত জনহীন। সঙ্গীহীন নুরমী মাঠ ছাড়িয়ে বনের ধার দিয়ে মাইলের পর মাইল দৌড়ে যেতেন।

নিজের সম্বন্ধে সবসময়ই অত্যন্ত সচেতন থাকতেন নুরমী। দৈহিক ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সর্বপ্রকার প্রলোভন ও নেশা থেকে দূরে থাকতেন। মাছ, মাংস, মদ বা সিগারেট কোন কিছুই তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারত না। সিনেমা দেখতেন ক্বচিৎ কখনো।

নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন আর কৃচ্ছ্রতার মধ্যদিয়ে কাটে দীর্ঘ ছয়টি বছর। এই সময়টা ছিল নিজেকে প্রস্তুত করার পর্ব। কেননা, এই ছয় বছরে তিনি কখনো কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেননি। নুরমীর স্বপ্ন ছিল দৌড়ে বিশ্ব জয় করা। এই দুর্লভ সম্মান অর্জন করতে হলে যে নিজের শরীরকে সুগঠিত ও শ্রমসহিষ্ণু করে গড়ে তুলতে হবে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন পূর্ণ সজাগ।

নুরমী ১৯১৯ খ্রি ফিনল্যান্ডের সৈন্যবিভাগে যোগদান করেন। এই কর্মজীবনেও তিনি একদিনেব জন্যও তাঁর দৌড় অনুশীলনে শৈথিল্য করেননি।

দৌড়ের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নুরমীর প্রিয় ছিল ৫,০০০ মিটার ও ১০,০০০ মিটার দৌড়। এই দূরত্বের দৌড়ে ক্রমে তাঁর কৃতিত্বের খ্যাতি দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে।

নুরমী প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ১৯২০ খ্রিঃ অ্যান্টওয়ার্প অলিম্পিকে।

এই আসরে ফিনল্যান্ডের হয়ে ৫,০০০ মিটার দৌড়ে শেষ পর্যন্ত নুরমী খ্যাতনামা দৌড়বীর গুইলমটের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। দ্বিতীয় স্থান লাভ করলেন। কিন্তু ১০,০০০ মিটার দৌড়ে এই পরাজয়ের পাল্টা জবাব দিলেন। গুইলমটের বিরুদ্ধে দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ করলেন।

এই ফলাফলের পরে নুরমীর সম্বন্ধে বিশ্বের দৌড়বীরদের মধ্যে আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়।

১৯২৪ খ্রিঃ প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় অলিম্পিক ক্রীড়া। এই আসরে নুরমী দৌড়ের যে ইতিহাস সৃষ্টি করেন তা ছিল যেমন বিস্ময়কর তেমনি অবিশ্বাস্য। এই কৃতিত্বের বলেই তিনি বিশ্বের ক্রীড়ারসিক মানুষের মনে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেন।

প্যারিস অলিম্পিকে নুরমীর সাফল্য ছিল অলিম্পিকের ইতিহাসেও অভূতপূর্ব। মাত্র একঘণ্টা সময়ের মধ্যে ১,৫০০ মিটার দূরত্ব ৩ মিনিট ৫৩$\frac{৩}{৫}$ সেকেন্ডে এবং ৫,০০০ মিটার দূরত্ব ১৪ মিঃ ৩১$\frac{১}{৫}$ সেকেন্ডে দৌড়ে অতিক্রম করে নুরমী উভয় প্রতিযোগিতায় নতুন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন।

অলিম্পিকের ইতিহাসে নুরমীই ছিলেন প্রথম দৌড়বীর যিনি মাত্র একঘণ্টার মধ্যে ওই দুই দূরত্বের দৌড়ে বিজয়ী হয়েছেন।

এরপরের বিজয় ছিল আরও চমকপ্রদ। বাকি ছিল ১০,০০০ মিটার দৌড় ও ৩,০০০ টিম রেস। ফ্লাইংফিন পাভো নুরমী অবলীলায় এই দুটি দৌড়ে প্রথম স্থান লাভ করলেন।

৩,০০০ মিটার দৌড়ের সময় ছিল ৮ মিঃ ৩২ সেকেন্ড। এটিও ছিল রেকর্ড।

প্যারিসে অনুষ্ঠিত সপ্তম অলিম্পিকে নুরমী চারটি স্বর্ণপদক ও তিনটি অলিম্পিক রেকর্ডের অধিকারী হয়েছিলেন।

ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই দৌড়ের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নুরমীর কাছে দৌড়নোর আমন্ত্রণ আসতে থাকে।

দৌড়বীরের দেশ হল আমেরিকা। নুরমী ১৯২৫ খ্রিঃ আমেরিকা আসেন। এখানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী দৌড়বীরদের সঙ্গে নুরমীর দৌড়ের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

সকলের আগ্রহের কেন্দ্রে ছিলেন নুরমী। তিনি কাউকে হতাশ করলেন না। প্রথম দিনের প্রতিযোগিতাতেই নুরমী বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করে বিজয়ী হন।

দ্বিতীয় দিনেও ভিন্ন দূরত্বের দৌড়ে অপরাজেয় থাকেন নুরমী। এই দৌড়ে নুরমীর সময় আবার একটি বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করল। তৃতীয় দিনেও ঘটল একই ঘটনা। তিনদিন তিনটি বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করে আমেরিকাবাসীদের হৃদয় জয় করে নেন নুরমী।

কিন্তু এই তিন দিনের সাফল্য ছিল সূত্রপাত। এরপর কখনো শিকাগোতে কখনো নিউইয়র্কে, এমনি করে বিভিন্ন শহরে দৌড়ের পর দৌড়ে বিজয়ী হয়েছেন।

আমেরিকা সফরে এসে নুরমী ১৬টি বিশ্বরেকর্ড ও ৩৮টি বিভিন্ন ট্র্যাক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। এই সফরে এসেই তিনি দুই মাইল দূরত্বের দৌড় নয় মিনিটেরও কম সময়ে অতিক্রম করে দূরপাল্লার অদ্বিতীয় দৌড়বীর রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯২৮ খ্রিঃ আমস্টারডাম অলিম্পিকে বলতে গেলে রাজকীয় মহিমা নিয়ে আবির্ভূত হলেন নুরমী। ততদিনে দূরপাল্লার দৌড়ানোর বয়সের প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছেন তিনি। কিন্তু পাভো নুরমী এখনো পাভো নুরমী। অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার তিনি।

নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সৃষ্টি করলেন অবলীলায়। ১০,০০০ মিটার দৌড় মাত্র ৩০ মিনিট ১৮$\frac{৪}{৫}$ সেকেন্ড সমাপ্ত করে রেকর্ড সৃষ্টি করলেন।

৫,০০০ মিটার দৌড়েও তাঁর অত্যদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশিত হল। শুরু থেকেই সকলকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু দৌড়ের শেষ সীমার কাছাকাছি এসে নুরমীর স্বাভাবিক গতি শ্লথ হতে থাকে। নুরমী ঘন ঘন পেছনে ফিরে তাকাবার চেষ্টা করতে থাকেন। দর্শকদের মধ্যেও উত্তেজনা ও সন্দেহ সোচ্চার হয়ে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী রিটোলা নুরমীকে অতিক্রম করে সীমা-রেখার ফিতা স্পর্শ করে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দৌড় শেষ হবার পর অনুরাগী দর্শকদের নানান প্রশ্নের উত্তরে নুরমী বললেন, রিটোলা আমার বন্ধু ও স্বদেশবাসী—তার কাছে পরাজিত হওয়া আমার কাছে অগৌরবের মনে হয় না।

এরপর ৩,০০০ মিটার স্টিপল চেজেও নুরমী দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

শেষ পর্যন্ত অলিম্পিকে নুরমী লাভ করলেন ৬টি স্বর্ণ পদক ও ৩টি রৌপ্যপদক।

দৌড়ে নব নব ইতিহাস সৃষ্টিকারী পাভো নুরমী তাঁর প্রতিভার গৌরবে ফিনল্যান্ডকে গৌরবান্বিত করেছেন। প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে তাঁর স্বদেশবাসী জনসাধারণ কার্পণ্য করেননি। জাতীয় বীরের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন তিনি, তাঁর নাম ফিনল্যান্ডের ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

নুরমী রাষ্ট্রের কাছ থেকে পেয়েছেন অর্ডার অব হোয়াইট রোজ পদবী এবং গোল্ড মেডেল অব মেরিট পদক।

ফিনল্যান্ডের রাধানীর রাজপথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নুরমীর ব্রোঞ্জমূর্তি স্থাপিত হয়েছে তাঁর জীবিতকালেই। সেই মূর্তি অতিক্রম করে যাবার সময় দেশ-বিদেশের মানুষেরা মস্তক অবনত করে নুরমীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করেন।

অলিম্পিক কমিটিও নুরমীর প্রতিভাকে সম্মানিত করেছেন হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে তাঁকে পুতাগ্নির দ্বারা অলিম্পিক দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করার দায়িত্ব দিয়ে।

১৯২১ খ্রিঃ থেকে ১৯৩১ খ্রিঃ পর্যন্ত ছিল নুরমীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময়ে তিনি যে বিশ্বরেকর্ডগুলি সৃষ্টি করেছেন সেগুলি হলো—

১৯২১ খ্রিঃ

৬ মাইল দৌড়—সময় ২৯ মিঃ ৪১.৪ সেঃ

১০,০০০ মিটার দৌড়—সময় ৩০ মিঃ ৪০.২ সেঃ

১৯২২ খ্রিঃ

৫,০০০ মিটার দৌড়—সময় ১৪ মিঃ ৩৫.৪ সেঃ

২,০০০ মিটার দৌড়—সময় ৫ মিঃ ২৬.৩ সেঃ

৩,০০০ মিটার দৌড়—সময় ৮ মিঃ ২৮.৬ সেঃ

১৯২৩ খ্রিঃ

১ মাইল দৌড়—সময় ৪ মিঃ ১০.৪ সেঃ

৩ মাইল দৌড়—সময় ১৪ মিঃ ১১.২ সেঃ

১৯২৪ খ্রিঃ

৪ মাইল দৌড়—সময় ১৯ মিঃ ১৫.৩ সেঃ

৫ মাইল দৌড়—সময় ২৪ মিঃ ৬.২ সেঃ

১,৫০০ মিটার দৌড়—সময় ৩ মিঃ ৫২.৬ সেঃ

৫,০০০ মিটার দৌড়—সময় ১৪ মিঃ ২৮.২ সেঃ

১০,০০০ মিটার দৌড়—সময় ৩০ মিঃ ৬.২ সেঃ

জনি উইসমুলার



প্রেম ও হিংসা-দ্বন্দ্বের সঙ্গে অতুলনীয় বীরত্ব গৌরবে এবং বিস্ময়কর অভিনয় গুণে টারজানের বিভিন্ন ছায়াছবি চলচ্চিত্র জগতের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেক্ষাগৃহে বসে আজও এসব ছবি উপভোগ করেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের দর্শক সাধারণ।

এইসব ছবি দেখতে বসে মুহুর্মুহু শিহরণ জাগে দর্শকের মনে। নায়ক টারজানের দৈনন্দিন জীবন কাটে অরণ্যের গভীরে বাঘ, সিংহ, হাতি, গন্ডার প্রভৃতির সঙ্গে মরনপণ যুদ্ধ করে। কখনো তিনি বিপন্নকে উদ্ধার করবার জন্য পাহাড়ের চূড়া থেকে খরস্রোতা নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, কখনো বন্যজন্তুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করছেন লতারগুচ্ছ মুঠি চেপে ধরে ঝুলে এক গাছ থেকে অন্য গাছে আরোহন করে।

পরম শক্তিমান এই নায়কের শক্তিমত্তা ও বীরত্ব দেখতে দেখতে স্তব্ধ বিস্ময়ে দর্শকচিত্তে বারবার আন্দোলিত হতে থাকে একটি প্রশ্ন—কে এই বিস্ময়কর মানুষ যাঁকে অতিমানব না বলে উপায় থাকে না!

টারজানের বিস্ময়কর ভূমিকায় অভিনয় করে যিনি গোটা বিশ্বের মানুষের হৃদয় জয় করেছেন, তাঁর নাম জনি উইসমুলার। তাঁর অন্য পরিচয় তিনি অপরাজেয় সন্তরণবীর। একাধারে জল ও স্থলের শৌর্যময় বীর। কেবল আমেরিকাই নয় সমগ্র বিশ্বে সন্তরণ বীরদের আদর্শ।

উইসমুলার ৬৭টি সাঁতার রেকর্ডের গৌরবের অধিকারী। দূরত্বের হিসেবে ৫০ গজ থেকে আধ মাইল পর্যন্ত সাঁতারের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন মাত্র ষোল বছর বয়সেই—১৯২৪ খ্রিঃ। অষ্টম অলিম্পিকে সাঁতারের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম একাকী তিনটি স্বর্ণপদক লাভ করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

চারবছর পরে ১৯২৮ খ্রিঃ আমস্টার্ডাম অলিম্পিকেও উইসমুলারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সন্তরণ জগতে উইসমুলারের আবির্ভাব ছিল নাটকীয়, বলা চলে এক অস্বাভাবিক ঘটনা। শৈশবে তাঁর শরীর ছিল খুবই দুর্বল। বহু চিকিৎসার পর চিকিৎসক উপদেশ দিলেন কোন ওষুধপত্র নয়, নিয়মিত সন্তরণেই তাঁর সুস্থ ও সবল দেহ লাভ করা সম্ভব।

কতকটা ভয়ে এবং কতকটা অবজ্ঞায় সেদিন উইসমুলার ডাক্তারের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ভর্ৎসনা লাভের পর কিশোর উইসমুলার সকাতরে জানিয়ে ছিলেন, জীবনে তিনি কখন জলে নামেন নি—তাঁর পক্ষে কি করে সাঁতার কাটা সম্ভব!

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের উপদেশে ও পিতামাতার অনুরোধ উপরোধে উইসমুলারকে জলে নামতে হয়েছিল।

বাড়ির কাছেই ছিল ডেসক্রেনস নদী। বয়স তখন তেরো ছুঁয়েছে। উইসমুলার এই নদীর কিনারে ঘোলাটে জলে জীবনে প্রথম সাঁতার অভ্যাস শুরু করেন।

গোড়ার দিকে অবশ্য দু-চার মিনিটের বেশি জলে থাকতে পারতেন না। অনিচ্ছার সঙ্গেই তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল এই ব্যবস্থা। তাই বিরক্তি এসে যেতো অল্পেতেই। এছাড়া জলেরও কেমন একটা ভয় ছিল। কোন রকমে কয়েক মিনিট হাত-পা নাড়াচাড়া করে জল থেকে উঠে আসতেন।

কিন্তু সাঁতারে আসাটা নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবার ফলে জলে থাকার সময়ও ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে লাগল। ক্রমে বিরক্তি কেটে গিয়ে আসক্তি জন্মাল। ভয় দূর হয়ে মনে এলো ভালোবাসা। বাড়ল আগ্রহ। ফলে নিজের চেষ্টাতেই একদিন সাঁতার শিখে গেলেন।

পরে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, একদিন যে জলে নামতে গিয়ে ভয়ে সঙ্কুচিত হয়েছেন, সেই জলই হল তাঁর আনন্দের সঙ্গী—দিনের বেশিরভাগ সময়টাই কাটতে লাগল নদীর জলে।

সাঁতার শেখার পর ধীরে ধীরে নানান গতিবেগও রপ্ত করে নিলেন উইসমুলার সহজাত দক্ষতায়।

তখনকার দিনের দক্ষ সাঁতারুরা মিচিগ্যান হ্রদের জলে সাঁতারের কৌশল অনুশীলন করতেন। উইসমুলার তীরে বসে একমনে তাঁদের সাঁতারের কৌশলগুলো দেখতেন। পরে নিজে তা অনুশীলন করতেন।

নিজের চেষ্টাতেই এভাবে একদিন সাঁতারের বিভিন্ন কৌশল উইসমুলারের করায়ত্ব হল। সাঁতারকে মনেপ্রাণে ভালবেসে ফেলেছিলেন উইসমুলার। তাই বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার জন্য নাম লেখালেন ইলিনিয়াম অ্যাথলেটিক ক্লাবে। এখানে সাঁতারের গুরু হিসাবে পেলেন বিল বেচারকে। উপযুক্ত গুরুর উন্নত শিক্ষার ফলে উইসমুলারের প্রতিভা দ্রুত বিকাশ লাভ করতে থাকে।

এরপর এল আত্মপ্রকাশের আহ্বান। ১৯২১ খ্রিঃ উইসমুলার প্রথম অবতীর্ণ হলেন আমেরিকার জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায়।

সেই সময় তাঁর বয়স ষোল বছর। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাঁতারুরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। ফলে প্রত্যেকটি বিভাগেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত প্রবল। কে কোন বিভাগে জয়ী হবেন আগে হিসেব কষে তা বলার উপায় থাকত না।

উইসমুলার ছিলেন সাঁতারের জগতে সম্পূর্ণ নবাগত—অপরিচিত তো বটেই। তিনি যখন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন তাঁর সাফল্যের বিষয়ে তাই কারোর মনেই কোন আগ্রহ বা কৌতূহল সঞ্চার করতে পারেনি। তবে তাঁর শিক্ষক বিল বেচার ছিলেন আশান্বিত।

প্রতিযোগিতা শেষ যখন হল তখন উইসমুলার আর উপেক্ষিত রইলেন না। দেখা গেল সন্তরণ জগতে অখ্যাত ও নবাগত উইসমুলার সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতা ৫০ গজ ও ২২০ গজ সাঁতারে বিজয়ী বলে ঘোষিত হলেন। এই সুবাদে জনি উইসমুলার নামটি পরিচিতি লাভ করল আমেরিকার সন্তরণ রসিক মহলে।

সাফল্যের জয়যাত্রা শুরু হলো এইভাবেই। উৎসাহিত উইসমুলার নিজের প্রতিভাকে উন্নত করার জন্য নিয়মিত সাধনা আরম্ভ করলেন। ফলে অচিরেই আমেরিকার সন্তরণ জগতে পুরনো সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠার গৌরবের অধিকারী হতে লাগলেন উইসমুলার। ৫০ গজ থেকে ৮৮০ গজ দূরত্বের সাঁতারে বিভিন্ন নতুন রেকর্ডের পাশে উইসমুলারের নাম স্থায়ী হয়ে যায়।

কেবল ফ্রিস্টাইল সাঁতারেই নয়, ব্যাক স্ট্রোক ও পিঠ-সাঁতারেও তিনি নতুন রেকর্ড স্থাপনে সক্ষম হন।

সেই সময়ে অলিম্পিকের ১০০ মিটার সাঁতারে রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন ডিউক কোহানামাকো। ১৯১২ খ্রিঃ স্টকহলমে অনুষ্ঠিত পঞ্চম অলিম্পিকে এবং ১৯২০ খ্রিঃ অ্যান্টোয়ার্পে অনুষ্ঠিত সপ্তম অলিম্পিকে কোহানামাকো ১০০ মিটার সাঁতারে নতুন রেকর্ড স্থাপন করে বিজয়ী হয়েছিলেন। ১৯২৪ খ্রিঃ প্যারিস অলিম্পিকে উইসমুলার ও কোহানামাকো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন।

সাঁতার আরম্ভ হওয়ার সঙ্কেত পাবার সঙ্গে সঙ্গেই উইসমুলার তীব্র গতিতে এগিয়ে যেতে থাকেন। প্রবীণ ও নবীনের এই প্রতিযোগিতা অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন সমগ্র দর্শকমণ্ডলী।

উইসমুলারকে ধরবার জন্য ডিউক প্রাণপণ করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। ডিউককে পেছনে ফেলে মাত্র ৫৯ সেকেন্ডে উইসমুলার ১০০ মিটার অতিক্রম করে বিজয়ী হলেন।

৪০০ মিটার সাঁতারেও উইসমুলারের গতিবেগ সকল প্রতিযোগীকে পরাজিত করল। তিনি এই দূরত্ব অতিক্রম করলেন মাত্র ৫ মিনিট ৪.২ সেকেন্ডে।

সেবারে ১০০ মিটার ও ৪০০ মিটারে প্রথম স্থান অধিকার করা ছাড়াও উইসমুলার ৮০০ মিটার সাঁতারে বিজয়ী হয়ে আমেরিকা দলকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন।

অলিম্পিকের সাঁতারে বিজয়ীদের মধ্যে উইসমুলারই প্রথম ব্যক্তি যিনি তিনটি স্বর্ণপদক লাভের গৌরব লাভ করেছেন।

১৯২৪ খ্রিঃ এই বিস্ময়কর সাফল্যের পর উইসমুলারের নাম আমেরিকার ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়।

এরপর ১৯২৮ সালে অলিম্পিকের আসর বসল আমস্টার্ডামে। সেবার আমেরিকার দলের নেতৃত্ব করলেন উইসমুলার।

এই অলিম্পিকে ১০০ মিটার সাঁতারে নিজের গড়া রেকর্ড ভঙ্গ করলেন উইসমুলার নিজেই। ৫৮.৬ সেকেন্ডে সময় নিয়ে তিনি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে পরপর দুবার বিজয়ীর স্বর্ণপদক লাভ করলেন।

সেবারেও ৮০০ মিটার সাঁতারে উইসমুলারের কৃতিত্বের জন্যই আমেরিকান দল পুনরায় সাফল্যলাভ করল।

প্রতিযোগিতামূলক সন্তরণ থেকে উইসমুলার অবসর নেন ১৯২৯ খ্রিঃ। সেই সময় পর্যন্ত তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অক্ষুণ্ন।

সন্তরণবীর উইসমুলার ছিলেন সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান। অবসর নেবার পর তিনি দর্শকচিত্ত জয় করবার জন্য আবির্ভূত হলেন ছায়াছবিতে। টারজানের বিভিন্ন ছবিতে নামভূমিকায় তিনি যে অভিনয় করলেন, তাতে সমস্ত বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হল।

কায়াতে অসামান্য কীর্তির অধিকারী উইসমুলার ছায়াতেও অবিশ্বাস্য কীর্তি স্থাপন করলেন। সন্তরণের ক্ষেত্রে তাঁর দৃপ্তভঙ্গিমা, জল কেটে অগ্রসর হবার কৌশল ও সাবলীল গতিবেগ দর্শকচিত্তকে উদ্বেলিত করত। তাঁর ক্রীড়াকৃতিত্বের গৌরব সগর্বে বুকে ধারণ করে আছে বিশ্ব অলিম্পিকের ইতিহাস।

অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রাণবন্ত ও মনমাতানো দক্ষতা ও দুঃসাহসিক ক্রিয়াকৌশল রুপোলী পর্দার বুকে অক্ষয় অমলীন হয়ে আছে।

সব মিলিয়েই জনি উইসমুলার স্বয়ং হয়ে রয়েছেন ইতহাস।

গোবর গোহ



জীবিত অবস্থায় কিংবদন্তী হবার সৌভাগ্য হয় খুব কম মানুষেরই। এই দুর্লভ গৌরবের অধিকারী ছিলেন বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মল্লবীর গোবর গোহ। ইনিই বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতে কুস্তিবিদ্যায় সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সমকালে সমকক্ষ কুস্তিগীর ভারতবর্ষে কমই ছিল।

বাংলার বিশ্বখ্যাত কুস্তিগীর গোবর গোহের জন্ম ১৮৯২ খ্রিঃ ১২ই মার্চ, কলকাতার মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে এক পালোয়ান পরিবারে। জন্মের সময়েই গোবর গোহ এমন মোটা ছিলেন যে ডাক্তাররা তাঁর জীবন সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি বেঁচে ছিলেন কেবল নয় গৌরবময় দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন।

গোবর গোহর আসল নাম ছিল যতীন্দ্রচরণ গুহ। তবে ডাক নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতামহ অম্বিকাচরণ গুহ ছিলেন সুখ্যাত কুস্তিগীর। ইনিই বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম কুস্তিতে সমগ্র ভারতবর্ষে খ্যাতি অর্জন করেন।

অম্বিকাচরণ ছিলেন কলকাতার নামকরা ধনী। পারিবারিক কুস্তির ধারা বজায় রাখার জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করে গেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে শরীর চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করে দুর্বল বাঙ্গালী জাতিকে সজীব ও সতেজ করে তোলা।

গোবর গোহর জ্যেঠামশায় ক্ষেত্রচরণ গুহ যৌবনে ভারত-বিখ্যাত কুস্তিগীর হয়েছিলেন। কলকাতায় তাঁর আখড়া ছিল কলকাতা ও পশ্চিম অঞ্চলের নামকরা কুস্তিগীরদের আড্ডা।

গোবরবাবুর তের বছর বয়সে তাঁর জ্যেঠামশায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর পর কুস্তির চর্চা ও বংশের মর্যাদা ধরে রাখবার মত উপযুক্ত কেউ ছিলেন না। এই সময়ে এগিয়ে আসেন গোবর গোহর বাবা রামচরণ গুহ। তিনি ছেলেকে শরীরচর্চার আখড়ায় নামিয়ে দিলেন।

রামচরণ নিজেও যৌবনে কুস্তি করতেন। এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহও ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ছেলেকে নিজের হাতেই কুস্তির প্যাঁচ শেখাতে আরম্ভ করলেন। এখানেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি। পুত্রের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তিনি পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের বড় বড় পালোয়ানদের আখড়ায় গোবরকে নিয়ে গেছেন।

গামা, কাল্লু, রাহমনী প্রভৃতি বড় বড় পালোয়ানরা নিযুক্ত হয়েছিলেন গোবরকে কুস্তি শেখাবার জন্য। এঁদের উপযুক্ত তালিমে গোবরের জন্মগত প্রতিভা বিকাশিত হতেও বিলম্ব হয় না।

গোবরবাবু কালে দিগ্বিজয়ী কুস্তিগীর হয়ে বাঙালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। পিতার উৎসাহ প্রেরণা ও উপদেশই ছিল তাঁর এই কৃতিত্বের মূলে। পরিণত বয়সে স্মৃতিচারণ করবার সময় তিনি আবেগবিহ্বল কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর পিতার কথা বলতেন।

বাঙালী দুর্বল একথা যে মিথ্যা তা নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করবার জন্য রামচরণ গোবরকে উৎসাহিত করতেন। বলতেন, 'ঈশ্বরের দেওয়া শরীরটার অযত্ন করো না, প্রাণপণ সাধনা কর, ফলাফল তিনিই দেবেন।'

রামচরণ তাঁর পিতার সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গোবরকে বলতেন, 'তোমার দাদামশায়ের সঙ্কল্পকে রূপদান করবার চেষ্টা করতে ভুলো না। তাঁর অতৃপ্ত আত্মা তোমার দিকেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছেন।'

বলাবাহুল্য পিতার এই আগ্রহ ও প্রত্যাশা গোবর নিজের জীবনে সার্থক করে তুলেছিলেন।

বর্তমানে যেটি বিদ্যাসাগরস্কুল, তখন তার নাম ছিল মেট্রোপলিটন স্কুল। গোবর এই স্কুল থেকেই এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর কিছুকাল ইংলন্ডে শিক্ষালাভ করেন। পরে আমেরিকা থেকে ডাকযোগে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

গোবর প্রথম ইউরোপ যান ১৯১০ খ্রিঃ সতের বছর বয়সে। তিনমাস পরেই অবশ্য দেশে ফিরে আসেন।

বিলেত থেকে ফিরে আসার পর গোবর বিয়ে করেন। বিয়ের দুবছর পরেই তিনি পুনরায় বিলেত গমন করেন। তাঁর সেই সময়ের ইউরোপ ভ্রমণ সম্পর্কে বিলাতের কাগজে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তার তর্জমা প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার বিখ্যাত প্রবাসী পত্রে। বিবরণটি ছিল এ রকমঃ "গোবর ভারতের অন্যতম বালক পালোয়ান। তার ওজন তিন মন। কিন্তু দুই মন ওজনের একটা হাঁসলি গলায় পরে (who wears a collar, 160 lbs. in weight.)।

হ্যাম্পস্টেডে একটি বাড়ির পিছনে একটি বাগানে আমি গোবরকে প্রথম দেখি। ঘাসের উপর একটি মাদুর বিছান, তার উপর সেই অদ্ভুত বিশালকায় প্রায় তাঁরই মত প্রকান্ড ইংরাজ পালোয়ান ফিনলেনের সঙ্গে কুস্তি লড়ছিল। ফিন খুব হাঁপাচ্ছিল। গোবরকে বেদম্ করতে খুব চেষ্টা করছিল, কিন্তু গোবর কোন ক্রমেই বেদম হচ্ছিল না।

গোবর সবেমাত্র কুড়ি বৎসর অতিক্রম করেছে। কিন্তু কী ভীষণ যুবা। দৈত্যের মত তাঁর দেহ। সে একটা প্রকান্ড বালকের মত—চোখ উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত। জীবনটা

তাঁর কাছে আনন্দ ও সৌন্দর্যে ভরা। সে এখন বলবান এবং বলশালিতার গৌরব খুব অনুভব করে।

গোবর বিলাতী খাদ্য ছোঁয় না। তার চাকররা সব রেঁধে দেয়। সে খুব পক্ষীমাংস ও মাখন খায়। তা ছাড়া বাদাম চিনি প্রভৃতি দিয়ে তৈরি এক রকম উপাদেয় জিনিস (সরবৎ) তার ভারী প্রিয়। সে মদ স্পর্শ করে না। সিগার মাসে হয়তো এক-আধবার টানে।

তাঁর দুজোড়া মুগুর আছে। এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন পঁচিশ সের। আর এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন এক মন দশ সের।"

বিদেশে গোবর কুস্তিতে প্রথম সাফল্য লাভ করেন ১৯১৩ খ্রিঃ ২৭শে আগস্ট। এই দিন তিনি স্কটল্যান্ডের মস্ত ওজনদার পালোয়ান জিমি ক্যাম্বেলকে পরাজিত করে স্কটিশ চ্যাম্পিয়নশিপ পান।

ওই একই বছরে ৩রা সেপ্টেম্বর গোবরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এডিনবরার অলিম্পিকবিজয়ী জিমি এসেনের সঙ্গে। বিজয়ী গোবর লাভ করেন চ্যাম্পিয়ন শিপ অব ইউনাইটেড কিংডম পদক।

ইতিপূর্বে বীর মুষ্টিযোদ্ধা কার্পেন্টিয়ার ছাড়া এত অল্পবয়সে এই সম্মান আর কেউ পাননি।

এরপর গোবর প্যারিসে গমন করেন। সেখানে সুপ্রসিদ্ধ নোভো সার্ক টুর্নামেন্টে ইউরোপের বড় বড় পালোয়ানের সঙ্গে তাঁর লড়াই হয়। প্রত্যেকেই গোবরের কাছে পরাজিত হন। এঁদের মধ্যে জার্মান কুস্তিগীর বিখ্যাত কার্ল শাপ্টে র সঙ্গে লড়াইটি ছিল উল্লেখযোগ্য।

দুজনেই ছিলেন প্রায় সমান শক্তিমান। লড়াই চলেছিল তিনঘণ্টা পঁচিশ মিনিট যাবত। প্যারিসে গোবরের কুস্তিচর্চার সহযোগী ছিলেন বিখ্যাত পালোয়ান বিস্কো, ডিক্ শিকত ও জর্জেস হ্যাকেনস্মিত প্রমুখ।

বিদেশে বিজয় অভিযান সম্পূর্ণ করে গোবর ১৯১৫ খ্রিঃ দেশে ফিরে আসেন। এবপর অভিযান শুরু হল স্বদেশে। সেই সময় ভারতের কোলাপুর মহারাজের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান ছিলেন গণ্পু। তাঁর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য গোবর ১৯১৬ খ্রিঃ কোলাপুর যান।

কোলাপুরের মহারাজ নিজেও ছিলেন দক্ষ কুস্তিগীর। তিনি সোৎসাহে লড়াইয়ের বন্দোবস্ত করলেন। যথাসময়ে লড়াই হল জবরদস্ত। পুরো দুইঘণ্টা গোবর ও গণপুর মধ্যে কুস্তি হল। কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারলেন না।

ভারত বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন বড় গামা। ১৯২০ খ্রিঃ তাঁর সঙ্গে গোবরের কুস্তির আয়োজন হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই লড়াই অনুষ্ঠিত হতে পারল না। কুস্তির নির্ধারিত তারিখের আটদিন আগেই প্রবল ডিপথেরিয়ায় গোবর শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

গোবরের প্রধান শিষ্য ও অনুচর ছিলেন বনমালী। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ১৯২০ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে গোবর আমেরিকা যান। ভারতীয় কুস্তিগীরদের মধ্যে গোবরই ছিলেন প্রথম যিনি সরকারীভাবে আমেরিকায় গৃহীত হয়েছিলেন।

মার্কিন দেশে সমস্ত বিখ্যাত পালোয়ানের সঙ্গেই গোবর কুস্তি লড়েছেন। ১৯২১ খ্রিঃ ২৪শে আগস্ট সান ফ্রান্সিসকো শহরে অ্যাড স্যান্টেলকে পরাজিত করে তিনি লাইট হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়ে বিশ্বখ্যাতিলাভ করেন।

আমেরিকায় অবস্থানকালে গোবর কুস্তি লড়েছেন স্ট্রাংলার লুই, যুভিস্কো ব্রাদার্স, জো স্টেচার প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মার্কিন কুস্তিগীরদের সঙ্গে।

স্ট্রাংলার লুই ছিলেন সেই সময়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর। তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ে প্রথম রাউন্ডে গোবর পরাস্ত হন। দ্বিতীয়বার পরাস্ত হন লুই। কিন্তু তৃতীয়বারে কুস্তির নিয়ম ভেঙ্গে ফাউল করে লুই গোবরকে ফেলে দেন। যথারীতি প্রতিবাদ জানানো হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিচারক লুইকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন।

হল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ন পালোয়ান হকি ড্রাককেও আমেরিকাতেই হারিয়েছিলেন গোবর। এই লড়াই হয়েছিল ১৯২১ খ্রিঃ ১৯শে এপ্রিল।

হাজার ডলার গ্যারান্টিমানি, টিকিট বিক্রির ৩০ শতাংশ ভাগ ও নিজের পছন্দসই রেফারি—এই তিনটি শর্ত ছিল ড্রাকের। তাহলে তিনি গোবরের সঙ্গে লড়বেন। গোবর তিন শর্তেই রাজি হয়ে লড়াইতে নামলেন।

সেই সময়ে তাঁর বয়স ২৯। ওজন ২৪৫ পাউন্ড। সেই সঙ্গে মনে ছিল দুর্জয় সাহস।

লড়াইয়ের দিন যথারীতি অনুশীলনের শেষে সারা দুপুর বিবেকানন্দের একটা বই পড়ে কাটালেন গোবর।

সন্ধ্যা ছটা নাগাদ ঘরে তৈরি লেমনেড খেয়ে সঙ্গী বনমালীকে নিয়ে লড়াই করতে বেরিয়েছিলেন।

লড়াই-এর শুরু থেকে শেষ অবধি গোবরেরই প্রাধান্য ছিল। ড্রাক তার পাশ্চাত্যের কৌশলে কিছুতেই কব্জা করতে পারছিলেন না গোবরকে। গোবর মাঝে মাঝে দু-চারটি ভারতীয় এমন প্যাঁচ ঝাড়ছিলেন যে সাহেবরা রীতিমত ঘাবড়ে যাচ্ছিল। তার মধ্যে হাফ নেলসন ছিল গোবরের বাঁধা। শেষ মুহূর্তে প্রয়োগ করতেন। এই প্যাঁচেই তিনি এক সময় ড্রাককে তুলে এমন আছাড় মারলেন যে অনেকক্ষণ তাঁর আর উঠবার ক্ষমতা রইল না।

গোবরকে অভিনন্দন জানিয়ে ব্রডওয়ে অডিটোরিয়ামের দর্শকরা উল্লাসে ফেটে পড়লেন। ছয় বছর আমেরিকায় থেকে ১৯২৬ খ্রিঃ শেষ দিকে গোবর দেশে ফিরে এলেন। ১৯২৮ খ্রিঃ কলকাতা কংগ্রেসের সময় ছোট গামার সঙ্গে গোবরের কুস্তি হয়। এই লড়াইতে গোবর পরাস্ত হন।

এরপর গোবর তাঁর পিতামহর সঙ্কল্প রূপায়িত করার কাজে মনোনিবেশ করেন। দেশের ছেলেদের মধ্যে শরীরচর্চার অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় নিজের ব্যায়ামগারেই শরীরচর্চা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে উৎসাহী তরুণরা এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শরীর গঠনের মাধ্যমে পৌরুষদীপ্ত জীবন লাভ করেন।

নিজের আখড়ার আবাসেই গোবর আটাত্তর বছর বয়সে ১৯৭০ খ্রিঃ পরলোক গমন করেন।

ডবলিউ জি গ্রেস



ইংলন্ডের ক্রিকেট ইতিহাসের নবযুগের প্রবর্তক ও বিশ্বক্রিকেটের অবিস্মরণীয় প্রতিভা ডবলিউ জি গ্রেস ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি খেলার যা কিছু সৌন্দর্য ও দর্শনীয় সকল কিছুর অধিকারী। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান রূপেই স্বীকৃত।

এই দুরন্ত খেলোয়াড় দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে একের পর এক সেঞ্চুরী করে ক্রিকেটের ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সেই খেলোয়াড়কে কি বলা যায়, যিনি ৪৭ বছর বয়সে এক মাসের মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দলগুলির বিরুদ্ধে হাজার রান করবার কৃতিত্ব লাভ করেন! তাঁর অবিশ্বাস্য প্রতিভা ও অদম্য প্রাণশক্তির তুলনা কোথায়?

ইংলন্ডে যখন ক্রিকেট খেলা ছিল বিশেষ জনসাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই সময় তাঁর খেলার কলানৈপুণ্য লর্ডস মাঠ থেকে শুরু করে পল্লীর নিভৃত প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কেবল তাই নয়, যেই সময় ক্রিকেট খেলায় বোলারদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাদের সেই একচ্ছত্র অধিকারকে উপেক্ষা করে ডব্লিউ জি গ্রেস নিজের খুশিমত অবাধে রান সংগ্রহ করে দর্শকদের স্তম্ভিত করে দিতেন।

প্রথম শ্রেণীর খেলায় ১২৬টি সেঞ্চুরী ও মোট ৫৪,৮৯৬ রান সংগ্রহ এই অমর প্রতিভার কৃতিত্ব প্রমাণ করে।

তবে কেবল শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান বললেই গ্রেস-এর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর সাফল্য সমানভাবে স্মরণীয় বোলিং ও ফিল্ডিং-এও। ক্রিকেটের ক্রীড়া কৌশল ছিল তাঁর নখদর্পণে। তিনি কোন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ঠিক সেই ধরনের বল করতেন

যে ধরনের বলে তিনি খেলতে অপটু। আর এভাবেই গোটা জীবনে ২,৮৭৬টি উইকেট লাভ করেছেন। কৌতুকের হলেও একথা সত্য যে বহু ব্যাটসম্যানই তাঁর নিখুঁত বল ধরা ও অব্যর্থ বল ছোঁড়ার কৌশলে ব্যাট করার সুযোগই করে উঠতে পারেন নি।

গ্রেস ছিলেন একাধারে ব্যাটসম্যান, বোলার ও ফিল্ডার। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে খেলোয়াড়, সুন্দর ও আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

খেলায় তাঁর কোন বিচারের বিরুদ্ধে কোনদিন কেউ অভিযোগ করার সুযোগ পায়নি। ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন তিনি নিখুঁতভাবে মেনে চলতেন। তাঁর খেলোয়াড়ি মনোভাব কেবল যে খেলার মাঠেই সীমাবদ্ধ থাকত তা নয়, তাঁর প্রতিদিনের জীবনের কাজের মধ্যেও সেই ভাব সব সময় বজায় থাকতে দেখা গেছে।

সম্পূর্ণ নাম উইলিয়াম গিলবার্ট গ্রেস। তাঁর জন্ম ১৮৪৮ খ্রিঃ ১৮ই জুলাই। পিতার নাম ছিল হেনরী মিলস। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান। পেশা ছিল ডাক্তারি। সঙ্গত ভাবেই দরিদ্র আর্ত মানুষের সেবাতেই একরকম জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তিনি।

গ্রেস তাঁর ক্রিকেটের প্রতিভা পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। ক্রিকেট খেলায় মিলসের কেবল উৎসাহই ছিল না, তিনি নিজেও ছিলেন দক্ষ খেলোয়াড়। গ্লসেস্টার কাউন্টি ক্রিকেট দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি।

গ্রেসের মায়ের নাম ছিল মার্থা পোকক। তাঁর আগ্রহেই গ্রেস ক্রিকেটের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন বাল্য বয়স থেকেই।

মা উপহার দিয়েছিলেন একটি ছোট্ট ব্যাট। শিশু গ্রেস সেটি বাগিয়ে ধরে বাড়ির ফুলবাগানের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ওপর দাঁড়াতেন আর বল ছুঁড়ে দিতো পরিচারিকা। এভাবেই ক্রিকেট খেলাকে ভালবাসতে শিখেছিলেন গ্রেস।

বাল্যবয়সের হাজারো কাজ-অকাজের মধ্যেও তাঁর মন পড়ে থাকতো ব্যাট আর বলের দিকে। কোন অবস্থাতেই এক দিনের জন্যও ক্রিকেট খেলা বাদ পড়ত না। অনেক দিনই এমন হয়েছে, খেলতে যাবার আগে উইকেট খুঁজে পাওয়া গেল না কিংবা বল করবার মত কাউকে জোগাড় করা গেল না।

কিন্তু গ্রেস দমতেন না অতটুকু। দেয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে উইকেট এঁকে নিতেন। তারপর তার সামনে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে পড়তেন। এরপর ওই অবস্থাতেই পাড়ার ছেলেদের কেউ না কেউ নয়তো আস্তাবলের কোন সহিসকে বল করবার জন্য হাঁকডাক করে জুটিয়ে নিতেন। মোটকথা প্রতিদিনই গ্রেসকে ক্রিকেট খেলতে হবে তা যে করেই হোক না কেন।

ধর্মভীরু পরিবারে শান্তির অভাব ছিল না। বাইরের ঝড়ঝাপ্টা সেখানে আঁচড় কাটতে পারত না। কাজেই বাবা ও মার কাছে ক্রিকেট খেলার উৎসাহ ও প্রেরণা অবিচ্ছিন্নভাবেই লাভ করেছেন গ্রেস।

তাঁর এক দাদা ছিল—একরকম পিঠোপিঠি দুভাই যখন একটু বড় হল, তাদের বাবা নিজে ব্যাট হাতে নিয়ে তাঁদের খেলা শেখাতে লাগলেন।

ক্রিকেট পিচ তৈরি করবার জন্য বাড়ির বাগানের ফুলন্ত গাছগুলি উপড়ে ফেলা হল। ছেলেদের খেলার সুবিধার জন্য নিজহাতে লাগানো গাছ উপড়ে ফেলতেও ইতস্ততঃ করেননি তিনি।

বাড়ির ভাইবোনরা মিলে মার্চ মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত নিয়মিত বাড়ির পিচে বাবার কাছে ক্রিকেট খেলার শিক্ষা নিতেন। খেলার প্রয়োজনে অনেক সময় বাড়ির চাকরবাকরদেরও হাতের কাজ ফেলে এসে জুটতে হতো।

বয়স যখন নয় হল, গ্রেস জীবনে প্রথম ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলেন। খেলা হয়েছিল পশ্চিম গ্লসেস্টারের বিরুদ্ধে, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাবা।

সেই খেলায় বালক গ্রেস মাত্র তিন রান করেছিলেন। কিন্তু বিপক্ষদলের কোন বোলারই সেদিন তাঁকে আউট করতে পারেনি।

গ্রেসের বড় ভাইয়ের নাম এডওয়ার্ড মিলন গ্রেস। ইংলন্ডের ক্রিকেটের ইতিহাসে তিনি ই. এম. নামেই বিখ্যাত। কিশোর বয়সেই সেরা ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে দেশে। কিন্তু প্রথম তিন বছরে ১৯ ইনিংসে খেলে গ্রেস মাত্র ২২ রান সংগ্রহ করলেন। ফলে তাঁকে নিয়ে মা বাবা দুজনেই ভাবনায় পড়লেন। ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পরিবারে এই হতাশাজনক ব্যাপারটা মেনে নেওয়া হবে কেন? ফলে মায়ের কাছে বরাদ্দ হয়ে গেল নিত্য বকুনি।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে আত্মীয় পরিজনরা পর্যন্ত গ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন।

গ্রেসের বাবা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। মাঝে মাঝে দলে লোক কম হলেও ভালো ফিল্ডিং করার জন্য তিনি তাঁকে দলে নিতে লাগলেন।

এইভাবে ক্রমে গ্রেস ১২ বছরে পা দিলেন। এই সময় ১৮৬০ খ্রিঃ ক্লিফটনের বিরুদ্ধে খেলে তিনি ৫০ রান করলেন। এই ঘটনা হতাশার মধ্যে আশার আলো জাগিয়ে তুলল। পরিবারের সকলের মনই কিছুটা হাল্কা হল গ্রেস-এর সম্বন্ধে।

কিন্তু আশার আলো স্থায়ী হল না। পরবর্তী তিন বছরে আবার সেই ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি। এর পরে কারোর পক্ষেই গ্রেস সম্বন্ধে আর কোন আশা ভরসা ধরে রাখা সম্ভব হল না। তাঁকে তাঁরা একরকম হিসেবের খাতা থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে ঘটনা সংঘটন যেমন কালের অনিবার্য নিয়ম তেমনি অঘটনও সেই নিয়মের সঙ্গেই বাঁধা। পৃথিবীতে অঘটন কিছু কম ঘটে না। কিন্তু কোনটা ঘটনা আর কোনটা অঘটন তার হিসেব কে করবে? যে ছেলে ছেলেবেলায় বইখাতার ধার ঘেঁষতে চায় না—শিক্ষকমশাইরা জবাব দিয়ে দেন এই বলে যে এ ছেলের কোনকালে লেখাপড়া হবে না, পরবর্তী জীবনে দেখা যায় সেই ছেলেই বিশ্বের জ্ঞানীগুণী মহলে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। অঙ্কে যে ছেলের মাথা মোটে খেলে না,

সেই ছেলেই কি বিশ্বের অদ্বিতীয় গণিতজ্ঞ হয়ে ওঠেনি? পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজিরের অভাব নেই।

Morning shows the day প্রবাদবাক্যটি অবশ্যই কথার কথা। সবসময়েই যে এই কথা সত্য হয় না গ্রেস-এর মত প্রতিভাবানদের জীবনই তার বড় প্রমাণ।

পনের বছর বয়সে গ্রেস হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রোগটা কঠিন নিউমোনিয়া। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হলো তাঁকে। সময়টা ১৮৬৩ খ্রিঃ।

রোগভোগের পর যখন সুস্থ হয়ে উঠলেন, তাঁর শরীরে দেখা গেল অদ্ভুত পরিবর্তন। ছিলেন ক্ষীণকায়, হয়ে উঠলেন বিরাটকায় বলশালী এক পুরুষমানুষ।

অসুস্থতার জন্য খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এবারে কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন পিচে। এই বছরেই প্রথম খেলায় ৩০০-এর কাছাকাছি রান সংগ্রহ করে ফেললেন।

বছর শেষ হবার মুখেই প্রতিভার চমক দেখতে পেল সকলে। ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ দলগুলির বিরুদ্ধে খেলে প্রতি ইংনিংসে গ্রেসের গড় রান সংখ্যা দাঁড়াল ২৬। এইভাবেই ইংলন্ডের ক্রিকেট খেলার আকাশে নতুন জ্যোতিষ্কের শুভাবির্ভাব ঘোষিত হল।

সেই যুগে ছিল বোলারদের প্রাধান্য। তাঁরা হতেন ব্যাটসম্যানদের চাইতে অনেক বেশি পারদর্শী। কাজেই একশত রান সংগ্রহ করা যে রীতিমত কঠিন ব্যাপার ছিল তা না বললেও চলে। সেকারণেই শতরানের গৌরবও ছিল তেমনি। যিনি তা সংগ্রহ করতে পারতেন তিনি লাভ করতেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

গ্রেস-এর দাদা ই এম.যখন এম. সি.সি.-এর হয়ে কেন্টের বিরুদ্ধে ১৯২ রান করে ইংলন্ডের ঘরে ঘরে আলোচ্য হয়ে উঠলেন, এই ঘটনা গভীর প্রভাব বিস্তার করল গ্রেসের মনে। তিনি মনে মনে শপথ নিলেন, তাঁকে আরও বড় হতে হবে—আরও বড় কৃতিত্ব অর্জন করতে হবে।

সন্তানের প্রতিভা বিলম্বে হলেও মা-ই বুঝতে পারেন প্রথম। গ্রেসের জীবনেও সেই ঘটনাই ঘটল। একদিন তাঁর মা ইংলন্ডের অধিনায়ক জর্জ পারকে একটি চিঠিতে জানালেন, "ই এম. আজ একজন দক্ষ ও কুশলী খেলোয়াড়। ইংলন্ডের দলে নিয়মিত স্থানলাভ করলে, আমার বিশ্বাস সে দেশের সুনামকে বাড়িয়ে তুলতে পারবে। কিন্তু আমার আরো একটি ছেলে আছে, ই এম.-এর ছোট সে। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আরও বেশি আশা রাখি। তার ব্যাক প্লে-এর তুলনা হয় না"।

মায়ের কাছ থেকে তাঁর ছেলে সম্পর্কে এমন নিশ্চিত বিশ্বাসে ভরা চিঠিটি যে সেদিন এম.সি.সি দলের অধিনায়ককে স্তম্ভিত করেছিল তাতে আর সন্দেহ কি।

যাইহোক, দেখা গেল মাত্র ১৬ বছর বয়সেই গ্রেস 'জেন্টলম্যান' দলের অন্তর্ভুক্ত হলেন। তাঁকে খেলতে হবে 'প্লেয়ার'দের বিরুদ্ধে।

সেইকালে পেশাদারী খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত 'প্লেয়ার'দল ছিল অসম্ভব শক্তিশালী। জেন্টলম্যান দল কখনোই তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না।

নানাভাবেই তারা জয়ী হবার চেষ্টা করত। কখনো ১৫/১৬ ফিল্ডিং করে, উইকেট ছোট করে, এমনকি প্লেয়ারদলের কয়েকজনকে নিজেদের দলে টেনে নিয়েও অধিকাংশ খেলাতেই জেন্টলম্যান দলকে হার স্বীকার করতে হত। তাদের পরাজয়ের ইতিহাস বড়ই দীর্ঘ। ১৮০৬ খ্রিঃ থেকে ১৮৬৫ খ্রিঃ মধ্যে ৬০ বারের প্রতিযোগিতায় মাত্র ১৪বার জেন্টালম্যান দল বিজয়ী হতে পেরেছে।

কিন্তু গ্রেসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্লেয়ার দলের সাফল্যের ক্ষেত্রে ধস নামতে দেখা গেল। গ্রেস ছিলেন একাধারে ব্যাটসম্যান, বোলার ও ফিল্ডার। পেশাদারী খেলোয়াড়দের প্লেয়ার দলের বিরুদ্ধে তিনি এক স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ালেন। এই দুই দলের সাফল্যের ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল।

১৮৬৫ খ্রিঃ থেকে ১৮৮৩ খ্রিঃ-এর মধ্যে দুই দলে খেলা হয়েছে ৪১বার। জেন্টলম্যান দল তার মধ্যে বিজয়ী হয় ২৯বার। বলাই বাহুল্য যে এই অভূতপূর্ব সাফল্য সম্ভব হয়েছিল গ্রেসের অসাধারণ ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং-এর ফলেই।

লর্ডস মাঠে শক্তিশালী এম. সি. সি. দলের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় গ্রেস সংগ্রহ করেছিলেন ৫০ রান। এই খেলার মধ্যেই নিহীত ছিল তাঁর উত্তর জীবনের উজ্জ্বল সাফল্যের ইঙ্গিত। বিজয় অভিযানের সূত্রপাত হয়েছিল সেই খেলা থেকেই।

১৮৬৬ খ্রিঃ গ্রেস চারবার সেঞ্চুরী ও একবার ডবল সেঞ্চুরী করেন। তিনিই ছিলেন শৌখিন খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথম যিনি এই কৃতিত্বের অধিকারী হন।

১৮৬৯ খ্রিঃ গ্রেসকে ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান রূপে স্বীকৃতি জানানো হলো। এই সময়ে তাঁর বয়স একুশ। ক্রমেই বোলারদের চোখের ঘুম কেড়ে নিতে লাগলেন গ্রেস। তাঁর রক্ষণকৌশল ভেদ করে উইকেট লাভ করা বোলারদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। দেখা গেল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রেসকে ক্যাচ আউট হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। একবার এক খেলায় গ্রেস দুশ রান করার পর উইকেটরক্ষক দুঃখ প্রকাশ করলেন এই বলে যে, মাত্র তিনবার তিনি বল ধরবার সুযোগ পেয়েছেন।

সমসাময়িক সময়ে শ্রেষ্ঠ বোলার ছিলেন জে.সি.স। তিনি কেবল সবচেয়ে বেশি ২০বার গ্রেসের উইকেটে বল লাগাতে পেরেছিলেন। গ্রেসের অবিশ্বাস্য ব্যাটিং কৌশল সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—

"I put the ball where I please, and Mr. Grace puts it where he please."

মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের অনুরোধে গ্রেস ১৮৭৩ খ্রিঃ একটি দল নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফর করেন। এই সফরে ব্যাটিং-এ তাঁরই ছিল প্রাধান্য।

১৮৭৮ খ্রিঃ কেন্টারবেরী মাঠে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন গ্রেস। এই বছর ১১ই ও ১২ই আগস্ট কেন্টের বিরুদ্ধে গ্লসেস্টারশায়ারের হয়ে খেলে ৩৪৪ রান করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। তা কেবল সমসাময়িক কালের নয়। সর্বযুগের খেলোয়াড়দের কাছেই চিরবিস্ময় রূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য।

এই ঐতিহাসিক খেলার একদিন পরেই খেললেন নটসের বিরুদ্ধে। গ্রেস সংগ্রহ করেন ১৭৭ রান।

এর পরেই ছিল শেফিল্ডে ইয়র্কসায়ারের বিরুদ্ধে খেলা। এই খেলায় ৩১৮ রানে অপরাজিত থাকেন। এই নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি সংগ্রহ করেন ৮৩৯ রান।

কিছুদিন পরেই গ্রেস খেললেন গ্রিমস বি দলের সঙ্গে। উভয় দলেই ২২ জন করে খেলোয়াড়। গ্রেসকে আউট করবার জন্য বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। একে একে প্রত্যেকেই বল করলেন। কিন্তু দুর্ভেদ্য রক্ষণব্যূহে থেকে গ্রেস ঝড়ের গতিতে রান সংখ্যা বাড়িয়ে গেলেন। বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়ের হাতই প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাঁর বলের গতি রুদ্ধ করতে পারেনি।

উইকেটে অবিচল গ্রেস একমুখ দাড়ি নিয়ে সকৌতুকে দেখেন একে একে ২২ জন খেলোয়াড়ই আউট হয়ে গেলেন।

সেদিন গ্রেস খেলা শেষ করলেন ৪০০ রানের সঞ্চয় বৃদ্ধি করে। সেদিন খেলোয়াড়, দর্শক, সমর্থক যারাই মাঠে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই গ্রেসকে 'ক্রিকেট খেলার অতিমানব' বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন।

সেই সময়ে ইংলন্ডের সিংহাসনে মহারানী ভিক্টোরিয়া অধিষ্ঠিতা। রানীর দরবারে রাজ্যের সকল ক্ষেত্রের প্রতিভাধরই যথাযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করে। ইংলন্ডের ক্রিকেট খেলায় যিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন, যাঁর প্রতিভার স্পর্শে ইংলন্ডের ক্রিকেট খেলায় নবযুগের উদ্বোধন হল, তাঁর প্রতিভা কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে মহামান্য রানীর দরবারে কোন মর্যাদাই পায়নি। এই নিয়ে দেশের পত্রপত্রিকায় সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় নি।

এ যেন নিয়তিরই এক নিষ্ঠুর পরিহাস—কোন মর্যাদাসূচক পদবীই গ্রেসের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। আমৃত্যু কেবল ডবলিউ.জি. গ্রেসই থেকে গিয়েছিলেন তিনি।

একত্রিশ বছর বয়সে ১৮৭৯ খ্রিঃ গ্রেস এডিনবরা থেকে এল. আর. সি. পি এবং ডারহাম থেকে এফ.আর.সি. এস উপাধি লাভ করেন।

চারটি সন্তানের জনক গ্রেসের ডাক্তারী পরীক্ষায় এই সাফল্যের পর ইংলন্ডের সমর্থকেরা তাঁকে ৪০ গিনির একটি ঘড়ি, সেই সঙ্গে ১,৪৫৮ পাউন্ডের চেক উপহার দেন। দাতার তালিকায় অন্যতম ছিলেন প্রিন্স অব ওয়েলস, যিনি পরবর্তীকালে হন এডওয়ার্ড দি সেভেন।

১৮৯৫ খ্রিঃ ৪৭ বছর বয়সে তাঁর দেহ যখন অশক্ত হয়ে আসতে থাকে, সেই সময় তিনি এক মাসের মধ্যে সহস্র রান করে ইংলন্ডের ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন।

একান্ন বছর বয়সেও গ্রেস অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

গ্রেসের জীবনের সর্বশেষ খেলা ১৯১৪ খ্রিঃ ২৫শে জুলাই। তখন তাঁর বয়স ৬৭ বছর। রীতিমত তিনি বার্ধক্যে উপনীত। এই খেলায় আউট না হয়ে ৬৯ রান করতে সমর্থ হন।

মাত্র ৯ বছর বয়সে জীবনের প্রথম খেলায় অপরাজিত থেকে যে জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল, গৌরবদীপ্ত যৌবনের পরে বার্ধক্যে সেই খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত তাঁর বিজয়ের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

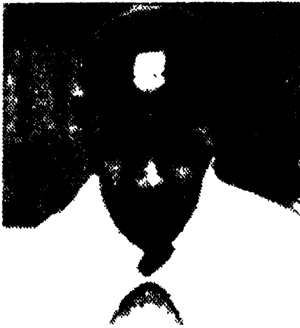
এই কারণেই ডবলিউ জি গ্রেস সর্বকালেব শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের তালিকায় সসম্মানে স্থান করে নিয়েছেন।

১৯১৫ খ্রিঃ ২৩শে অক্টোবর ৬৭ বছর বয়সে ক্রিকেটবীর গ্রেস অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিশ্ববাসীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গ্রেসের অমর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইংলন্ডের বিখ্যাত পত্রিকা 'ক্রিকেট অ্যান্ড ফুটবল' লিখেছিল—

'In history's volumes his famous renown,
The fame of the Grace brothers three- -
May time immemorial serve as a crown
To honour great W.G.'

রণজিৎ সিংজী



যাঁর প্রতিভাকে আশ্রয় করে বিশ্বের খেলাধুলার আসরে ভারত প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে, যিনি ছিলেন বিশ্বের ধুরন্ধর এবং ভারতের অদ্বিতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়, ইংলন্ডের শহরে গ্রামে এককালে যাঁর নাম রূপকথার নায়কের মত প্রচারিত হয়েছে, তিনিই হলেন রণজিৎ সিংজী। তাঁর অপূর্ব ক্রীড়া সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েই প্রথম ইউরোপের জনসাধারণ ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের বিষয়ে সচেতন ও সজাগ হন।

সেইকালে ইংলন্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ক্রিকেট খেলা। স্বভাবতঃই ইংলন্ডের ক্রিকেট-কর্তারা ভারতীয়দের সম্বন্ধে ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব পোষণ করতেন। তাঁরাই সেদিন সমস্ত অনাদর অশ্রদ্ধা বিস্মিত হয়ে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন রণজিৎ সিংজিকে। কেবল তাই নয়, জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁরা সাগ্রহে তাঁর সাহায্য বরণ করে নিয়েছিলেন।

রণজিৎ সিংজীর বৈশিষ্ট্য ছিল, ক্রিকেট খেলার ছকে-বাঁধা নিয়মের পরোয়া না করে সকল প্রকার আক্রমণকে তুচ্ছ করে দিয়ে স্বকীয় ভঙ্গীতে দ্রুত রান তুলবার পারদর্শিতা ছিল তাঁর করায়ত্ত। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যার জন্যই ইংলন্ডের জনসাধারণ তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'রানগেন সিংজী'।

স্বকীয় ভঙ্গিমায় বল মারবার কৌশল, উইকেট থেকে উইকেটে ছুটবার ক্ষিপ্রতা—ইত্যাদি দুর্লভ গুণের বলেই তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে নিজের স্থানটি নির্দিষ্ট করে নিতে পেরেছিলেন। রণজিৎ সিংজীর প্রতিভার অন্যতম সাক্ষ্য হল, প্রথম শ্রেণীর খেলায় ৭২ বার শতরান করবার গৌরব।

রণজিৎ সিংজীর ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সময় ক্রিকেট জগতের অন্যতম বিস্ময়-প্রতিভা ডব্লিউ. জি. গ্রেস বলেছিলেন ঃ

"I assure you that you will never see a batsman to beat I am Saheb if you live for a hundred years."

ইংলন্ডের বিখ্যাত পত্রিকা ডেলি নিউজ লিখেছিল, "The king of cricket will come no more .... the well-graced actor leaves the stage and becomes only a memory ..... Prince of a little state but king of a great game ..... he is not a miser hoarding up runs, but a milionaire spending with a liberal yet judicioues prodigality .... this batting can be compared with Asquith's oratory."

লর্ড সেলসবেরী রণজিৎ সিংজী সম্বন্ধে বলেছিলেন, "He was a black man playing cricket for all the world to see as if he were a white man."

ভারতের নবনগরের জামসাহেব জাম বিভাজীর দত্তক পুত্র ছিলেন রণজিৎ সিংজী। তাঁর জন্ম ১৮৭৭ খ্রিঃ ১০ই সেপ্টেম্বর।

রাজপরিবারে লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও বাল্য বয়সেই পারিবারিক ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছিল সিংজীকে। সিংহাসনের অধিকার থেকে বিচ্যুত করবার জন্য পড়াশুনার নাম করে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইংলন্ডে। তার আগে রাজকোটের রাজকুমার কলেজে তিনি নয় বছর পড়াশুনা করেছিলেন।

এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন চেস্টার ম্যাকনাটেল। ক্রিকেট খেলায় তাঁর ছিল প্রবল উৎসাহ। নিজেও ছিলেন দক্ষ খেলোয়াড়—কেমব্রিজ ব্লু। তাঁর কাছেই সিংজীর ক্রিকেট খেলার প্রথম হাতেখড়ি।

ক্রিকেট খেলায় সহজাত প্রতিভা ছিল সিংজীর। ম্যাকনাটেলই তার প্রতিভার পরিচয় জানতে পেরেছিলেন প্রথম। বুঝতে পেরেছিলেন রাজপরিবারে পালক রাজকুমার হলেও ভবিষ্যতে ইনিই ক্রিকেটের সত্যিকার রাজার আসন লাভ করবেন।

রাজকোট থেকে ইংলন্ডে পড়তে এলেন সিংজী। অদ্ভুত যোগাযোগ এই যে, সেই সময়েই ম্যাকনাটেলও ইংলন্ডে ফিরে এসেছেন। এখানে তাঁর সাহচর্য ও সহযোগিতা সিংজীর প্রতিভার বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

ম্যাকনাটেল নিজে সঙ্গে করে সিংজীকে ইংলন্ডের বড় বড় খেলা দেখাতে নিয়ে যেতেন। খেলার মাঠেই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

সিংজী কেমব্রিজে আসেন ১৮৮৯ খ্রিঃ। ভর্তি হন ট্রিনিটি কলেজে। তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয় কলেজের রেভারেন্ড বরিশ-এর সংসারে। পড়াশুনা চলতে থাকে তাঁরই তত্ত্বাবধানে।

রাজ্যের অধিকার থেকে সিংজী বঞ্চিত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু রাজকুমার হিসেবে বিদেশে সবরকম সুযোগ সুবিধাই তিনি পেতেন। সেই সুবাদেই তিনি সেন্ট ফেথ স্কুলে খেলাধুলার চর্চা করবার সুযোগ পেয়ে যান।

এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন আর. এস. গুডচাইল্ড। ক্রিকেট খেলায় তাঁরও ছিল প্রবল উৎসাহ। সিংজীর খেলার সহজাত নৈপুণ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁর ক্রিকেট খেলার প্রতিভা যাতে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি নিয়মকানুনের বাধা অপসারিত করে ডান হাওয়ার্ড, রিচার্ডসন, লকউড ও ওয়াট প্রমুখ বিখ্যাত পেশাদারী বোলারদের সঙ্গে সিংজীর অনুশীলনের সুযোগ করে দেন। কেমব্রিজের পার্কার পিচের সঙ্গে ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে উঠতে থাকে সিংজীর সম্পর্ক। এখানেই তাঁর প্রতিভা প্রথম বিকশিত হবার সুযোগ পায়।

সিংজী ক্রিকেটের ছক বাঁধা নিয়মকানুনের খুব একটা ধার ধারতেন না। রান তুলবার জন্য তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে বেপরোয়াভাবে ব্যাট চালনা করতেন। তাঁর খেলার এই বৈশিষ্ট্য এমনই ছিল যে তিনি যখন মাঠে ব্যাট হাতে নামতেন, তাঁর মার দেখার জন্য চারপাশে রীতিমত ভিড় জমে যেত।

ব্যাট চালনার এই স্বকীয় রীতির জন্য সিংজী অল্পদিনের মধ্যেই ইংলন্ডের ক্রিকেট সমাজের আলোচনা ও সমালোচনার পাত্র হয়ে ওঠেন।

সেই সময় কেমব্রিজের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন। একদিন তিনি ভিড় দেখে পার্কার পিচের কাছে এসে সকৌতুকে লক্ষ করতে লাগলেন। সেই সময় তীব্র বেগে ছুটে আসা একটা বলকে সিংজী হাঁটু গেড়ে বসে ব্যাট হাঁকিয়ে বাউন্ডারীর দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জ্যাকসন সবিস্ময়ে দেখলেন, বল মারার পরই সাবলীল ভঙ্গিতে সিংজী অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে রান তুলে চলেছেন।

এবারে রীতিমত আগ্রহী হয়ে উঠলেন জ্যাকসন। তিনি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলেন। প্রতিবারেই লক্ষ করলেন সিংজীর খেলা একেবারেই চিরাচরিত নিয়মরীতির বাইরে। কিন্তু খেলার এই ভঙ্গি তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হলেও ব্যাপারটা জ্যাকসন খুশি মনে মেনে নিতে পারলেন না।

জ্যাকসন ছিলেন ক্রিকেট খেলার সনাতন রীতির মারের পক্ষপাতী। বিজ্ঞানসম্মত খেলনরীতিই তাঁর পছন্দ। ধীরে ধীরে তিনি বিরক্তি নিয়েই পিচের ধার থেকে সরে এলেন।

কিন্তু অন্য দর্শকরা তখন মুগ্ধদৃষ্টিতে উপভোগ করছে সিংজীর খেলা। আর তাদের হর্ষোৎফুল্ল কোলাহল ও করতালি ধ্বনিতে মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হচ্ছে মাঠের বাতাস।

সিংজী কিন্তু তাঁর খেলার নিজস্ব ভঙ্গি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। মারের কায়দাকানুন সবই ছিল তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন,"I found a great difference between the English style and my own."

সিংজীর খেলার মান ক্রমশঃই উন্নত হয়ে চলেছিল। তিনি এমন ক্ষিপ্র গতিতে রান তুলতেন যে শোনা যায় একই দিনে বিভিন্ন দলের হয়ে খেলে তিনটি সেঞ্চুরি করেছিলেন।

সিংজীর নিজস্ব ঢঙে 'লেগ গ্লান্স' মার ছিল অনবদ্য। মারের এই বিশেষ ধারার সাহায্যে যে কোন ধারার আক্রমণকে প্রতিহত করে তিনি অনায়াসে অসংখ্য রান তুলতে পারতেন। 'লেগ গ্লান্স' মারবার সময় সিংজীর ডান পা থাকতো অনড়, অপূর্ব দক্ষতায় দেহ সম্পূর্ণ বাঁকিয়ে কব্জির সাবলীল চালনার দ্বারা তিনি ব্যাট হাঁকাতেন। ব্যাটে লাগামাত্রই বল এমন তীব্রগতিতে উৎক্ষিপ্ত হত যে প্রায় সময়ই বিপক্ষদলের খেলোয়াড়রা চোখে বল দেখতে পেতেন না। যদি বা কখনো দেখতে পেতেন বুলেট গতির সেই বলের গতিরোধ করতে তাঁরা সাহস পেতেন না। সিংজীর লেগ গ্লান্স মারের তীব্রতা বিষয়ে ডেলি টেলিগ্রাফও মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা লিখেছিল—" .... it goes to leg and boundary like a shell from a7-pounder, immense, audacious, unstappable."

রণজিৎ সিংজীর জীবনী লিখেছিলেন রোলান্ড ওয়াইল্ড। তিনি তাঁর এই বিশেষ মার সম্বন্ধে লিখেছেন,"Thus was born the greatest scoring stroke ever known. For Ranjit Singhji, with his right foot perforce immovable, still refused to play on the defensive. To the amazement of the bowlers he twisted his body, flicked his wrists, and smashed the ball round the leg. They sent him good length balls and he treated them in the same manner. They declared that it was risky, unconventional and in fact 'not cricket'. His reply was to score *fours* off them."

রণজিৎ সিংজীর মারের এই তীব্র গতি খেলার জীবনের শুরু থেকে অবসর নেবার সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি তাঁর খেলায় বরাবর একটা রীতি মেনে

চলতেন, তা হল, আক্রমণই শ্রেষ্ঠ রক্ষণ। তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায় সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকতেন—বল এলেই মারতে হবে—সোজা হোক বাঁকা হোক, ধীরে কিংবা জোরে যে ভাবেই বল আসুক না কেন। তাঁর এই মনোবল এসেছিল খেলার দক্ষতা ও নৈপুণ্য থেকে, তা বলাই বাহুল্য। কেমব্রিজের রেভারেন্ড বরিশ বরাবরই সিংজী সম্বন্ধে ছিলেন আশাবাদী। ফলে তাঁর দিক থেকে প্রেরণা ও উৎসাহের ঘাটতি ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন হয়ে দাঁড়াল যে সিংজী সবকিছু ভুলে খেলা নিয়েই মেতে উঠলেন। খেলাই হয়ে উঠল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। রেভারেন্ড বরিশ কেবল নয়, শুভানুধ্যায়ীরা প্রায় সকলেই বুঝে গেলেন, এই ছেলের লেখাপড়া আর হবে না। ক্রিকেটই সব গ্রাস করেছে!

সিংজী কিন্তু সকলের ধারণাই পালটে দিলেন। ১৮৯২ খ্রিঃ পরীক্ষায় যথারীতি উত্তীর্ণ হলেন এবং যথাসময়ে ট্রিনিটি কলেজে ভর্তিও হলেন। সেই সঙ্গে রেভারেন্ড বরিশের সংসার থেকেও নিজেকে আলাদা করে নিলেন। পৃথক ঘর ভাড়া করলেন সিডনি স্ট্রীটে।

দেখেশুনেই বাড়িটি নিয়েছিলেন সিংজী। তাই নিজের মনের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতেও কার্পণ্য করলেন না। অর্থও তার জন্য ব্যয় হল জলের মত।

সিংজীর এই নতুন বাসাটি রীতিমত স্মরণীয় হয়ে আছে। পরবর্তীকালে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট প্লেয়ারদের অনেক আনন্দমুখর দিন কেটেছে এখানে, হয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা।

ইতিমধ্যে যথেষ্টই পরিচিতি এবং খ্যাতি লাভ করেছেন সিংজী। কিন্তু হলে হবে কি, কেমব্রিজ দলে তখনো পর্যন্ত ঠাঁই হয়নি তার। রক্ষণশীল ইংরেজরা একজন অশ্বেতাঙ্গকে দলে নেবার ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ। ইংরেজ বা খ্রিষ্টান ছাড়া কেমব্রিজ দলে সেই কালে কোন খেলোয়াড়ের ঠাঁই পাওয়া ছিল একরকম অসম্ভব ব্যাপার। সিংজী এই দুয়ের কোনওটিই নন, কাজেই ইচ্ছা থাকলেও তা পূরণের আশা ছিল না।

এইসময়ে, ১৮৯২ খ্রিঃ ইংলন্ডের একটি ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসে। দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বে ছিলেন লর্ড হক। আবার দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে এসেছিলেন কেমব্রিজ দলের অধিনায়ক স্ট্যানলি জ্যাকসন।

ইংরেজদের এই দলের ভারত সফর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাঁরা নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরলেন। তাঁরা ভালভাবেই বুঝে গেলেন যে অশ্বেতাঙ্গ হলেও ক্রিকেট খেলাতে তাঁরাও কিছু কম যান না।

এই মনোভাব পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল হল এই যে জ্যাকসনকে সিংজী সম্বন্ধে নাক উঁচু ভাব সংবরণ করতে হল এবং তিনি অবিলম্বে কেমব্রিজ দলে স্থানলাভ করলেন।

এই সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন সিংজী। তাই তা কাজে লাগাতেও খুব একটা সময় নিলেন না। অবিলম্বেই তিনি কেমব্রিজ দলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৮৯৩ খ্রিঃ তিনি ইউনিভার্সিটি ব্লু লাভ করলেন।

এরপর তিনটি বছর দেখতে দেখতে অতিবাহিত হয়ে গেল। ১৮৯৬ খ্রিঃ সিংজী ইংলন্ডের টেস্ট দলে স্থানলাভ করলেন। এর আগে আর কোন ভারতীয় ইংলন্ড দলে স্থান লাভের যোগ্য বিবেচিত হননি।

অবশ্য এই সুযোগলাভের আগে সিংজীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এম. সি. সি. দলে সভাপতি লর্ড হ্যারিস খোদ ছিলেন সিংজীর নির্বাচনের ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু সিংজীর খেলার প্রতিভায় অন্যান্য সদস্যেরা এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাদের ঐকান্তিক আগ্রহকে উপেক্ষা করতে পারলেন না হ্যারিস।

দেশের সম্মানরক্ষার একটা তাগিদও অবশ্য দলের সভাপতির ছিল। তাই সিংজীকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট দলের অন্তর্ভুক্ত করতে হল।

সিংজীর দাবি ছিল অনুচ্চারিত এবং তা হল তাঁর খেলা। তা তিনি প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হলেন প্রথম টেস্টেই ৬২ ও ১৫৪ (নট আউট) রান করে। অবাক হবার কিছুই ছিল না যে তাঁর দ্বিতীয় ইংনিংসে অপরাজিত ১৫৪ রানই দেখা গেল সমূহ পরাজয়ের হাত থেকে ইংলন্ডকে রক্ষা করল।

এই বছরেই শেষ দিকে আর এক চমক সৃষ্টি করলেন রণজিৎ সিংজী ২,৭৮০ রান করে ব্যাটিং এভারেজে প্রথম স্থান অধিকার করে। তাঁর রান সংখ্যার রেকর্ড যে ডব্লিউ. জি. গ্রেসের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়ে নতুন রেকর্ড হিসেবে গণ্য হলো তা বলাই বাহুল্য।

সিংজীর এই সাফল্যকে অভিনন্দিত করার জন্য কেমব্রিজে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় ইংলন্ডের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিংজীকে অভিনন্দিত করলেন।

ওই বছর ১৮৯৬ খ্রিঃ ছাড়াও ১৯০০ খ্রিঃ এবং ১৯০৪ খ্রিঃ এই দুইবার সিংজী ইংলন্ডের ব্যাটিং এভারেজে শীর্ষস্থান লাভ করেন।

১৮৯৫ খ্রিঃ তিনি দল বদল করে যোগ দিলেন সাসেক্স দলে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেন।

ইংলন্ড দল ১৮৯৭-৯৮ খ্রিঃ অস্ট্রেলিয়া সফরে গেল। সিংজী এই দলে সাদরে অন্তর্ভুক্ত হলেন। প্রথম টেস্টটি অনুষ্ঠিত হল সিডনিতে। এই খেলায় সিংজী ১৭০ রান করেন। কেবল তাই নয়, অসুস্থ অবস্থায় ১৮৮৯ খ্রিঃ ১৮৯ রান করে সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করলেন।

অস্ট্রেলিয়া সফরে সিংজী সর্বমোট ১০৭২ রান করেন। তাঁর এই রানসংখ্যার রেকর্ড ইংলন্ডের ব্যাটসম্যানদের প্রতিষ্ঠিত রেকর্ডকে ভঙ্গ করে নবতম রেকর্ড হিসাবে গৃহীত হল।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে খেলাগুলি হয়েছিল তাতে সিংজীর সংগৃহীত রান সংখ্যা ছিল ৯৮৫ এবং ব্যাটিং-এর গড় ছিল ৪৪.৭৭।

ইংলন্ডের হয়ে সিংজী মোট ১৪টি টেস্ট খেলেছিলেন। তাতে ইংলন্ডের ব্যাটিং এভারেজে তিনবার প্রথম স্থান, তিনবার দ্বিতীয় স্থান এবং একবার তৃতীয়স্থান লাভ করে অভূতপূর্ব কীর্তি স্থাপন করেন।

১৮৯৯ খ্রিঃ ইংলন্ড দলের সঙ্গে টেন্টব্রিজ মাঠে অস্ট্রেলিয়ার যে খেলা হয় তাই ছিল সিংজীর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সর্বশেষ অধিনায়কতা। এই খেলায় দলের নিশ্চিত পরাজয় ঠেকিয়েছিলেন সিংজী। ওই বছরে তাঁর রান সংখ্যা ছিল ৩,০০০।

এই বছরেই তাঁর অধিনায়কতায় এমেচার টু দি নিউ ওয়ার্ল্ড নামে একটি শক্তিশালী ক্রিকেট দল ফিলাডেলফিয়া অ্যাসোসিয়েটেড ক্লাবের আমন্ত্রণে ফিলাডেলফিয়া সফর করে।

রনজিৎ সিংজীর গৌরবোজ্জ্বল খেলোয়াড় জীবনের চরম উৎকর্ষতা দেখা যায় ১৯০৮ খ্রিঃ। ওভাল মাঠে সারের বিরুদ্ধে সাসেক্স দলের হয়ে। এই খেলায় তিনি ডবল সেঞ্চুরী করার গৌরব অর্জন করেন।

এই দলের হয়ে তিনি খেলেছিলেন বারো বছর। এর মধ্যে কাউন্টি ক্রিকেটের ব্যাটিং অ্যাভারেজে তিনি নয়বার প্রথম স্থান এবং দুইবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

১৯০১ খ্রিঃ সিংজী সাসেক্স দলের হয়ে টনটন মাঠে সমারসেট দলের বিরুদ্ধে খেলে অপরাজিত থেকে যান ২৮৫ রান করে। এটিই তাঁর জীবনের সর্বোচ্চরান সংখ্যা।

১৯২০ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি নিয়মিত প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। সাসেক্স দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বও তাঁর ওপরেই ছিল।

১৮৯৭ খ্রিঃ রণজিৎ সিংজির বিখ্যাত ক্রিকেট বই জুবিলী বুক অব ক্রিকেট প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি তাঁর জীবনে প্রায় ২৫,০০০ রান সংগ্রহ করেন। এই রান সংখ্যার গড় ছিল প্রতি ইনিংসে ৫৬ রান। তিনি একমাসের মধ্যে তিনবার ১০০০ রান সংগ্রহ করেন।

রণজীর বিশেষ মার ছিল লেগ গ্লান্স। এ ছাড়াও একটি বিখ্যাত মার ছিল তাঁর যা আজ পর্যন্ত কোন খেলোয়াড়ের মধ্যে দেখা যায় নি।

এই বিশেষ মার প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার জ্যাকসন এক জায়গায় বলেছেন, "বোলার বল করছেন—বল হয়তো সোজাসুজি কিংবা একটু অফে তীব্রভাবে উইকেটের দিকে ছুটে আসছে—এই ধরনের বলে রণজী উইকেটে অবিচল থাকতেন এবং শুধুমাত্র হাতের কব্জীর অপূর্ব দক্ষতায় নিমেষমধ্যে ব্যাটটিকে এমনভাবে চালনা করতেন যে মাঠভর্তি দর্শক শুধু দেখতে পেতেন বলটি অন সাইডের বাউন্ডারীর দিকে তীব্রভাবে ছুটে আসছে।

বিস্ময়ে হতবাক বোলারের মুখ থেকে বেরিয়ে আসত––একমাত্র রণজীর পক্ষেই এমন মার সম্ভব। খেলোয়াড়েরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করতেন।"

রণজীর প্রতিভার অনন্যতা কেবল তাঁর রান সংখ্যার মধ্যেই নিহীত নয়। তাঁর খেলার মধ্যে দর্শকরা পেতেন অনাবিল আনন্দ আর খেলোয়াড়ী উত্তেজনা। তাঁর ব্যাট চালনার ভঙ্গিমা দেখার জন্য সারা মাঠ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকত।

বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক সি.বি.ফ্রাই ক্রিকেট জগতের বিগ ফোর নামে যে চারজন খেলোয়াড়ের নাম করেছেন তাঁরা হলেন, ডবলিউ জি গ্রেস, ভি.টি ট্রাম্পার, রণজিৎ সিংজী ও ডন ব্রাডম্যান।

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে ক্রিকেটের ইতিহাসের অমর প্রতিভা সিংজী ১৯৩৩ খ্রিঃ ২রা জুন ইহলোক ত্যাগ করেন।

ক্রিকেটবীর রণজীর জীবনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস—

	ইনিংস	নটআউট	রান	সেঞ্চুরী	এভারেজ
টেস্ট খেলায়—	২৬	৪	৯৮৫	২	৪৪.৭৭
জেন্টলম্যান প্লেয়ার্সের খেলায়—	২৫	১	৬৬৮	১	২৭.৮৩
কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির খেলায়—	১৫	২	৩৮৬	—	২৯.৬৯
কাউন্টি খেলায়—	২৯৭	৩৬	১৬,১৯৪	৫১	৬২.০৩
অন্যান্য খেলায়—	১৩৭	১৯	৬,৪৫৯	১৮	৫৪.৭৩
মোট	৫০০	৬২	২৪,৬৯২	৭২	৫৬.৩৭

গোষ্ঠ পাল



বাংলার সর্বকালের প্রিয় ফুটবলার গোষ্ঠপালের নাম বাঙালী জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাক হিসেবে এই বরেণ্য বঙ্গ- সন্তানকে তখনকার দিনে 'চাইনিজ ওয়াল' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃ তিনি রক্ষণভাগে যে ব্যূহ রচনা করতেন তা ভেদ করা কখনোই প্রতিপক্ষের সাধ্যে কুলিয়ে উঠত না।

সেই কালে সাহেবদের বিরুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণে যে আলোড়ন ও উত্তেজনা সৃষ্টি হতো তা কেবল মাঠের চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ থাকতো না; তাঁর শৌর্য বীর্য পরাধীন ভারতের জনজীবনে জাতীয় চেতনা উদ্দীপিত করত।

সাহেবরা খেলা করত বুটপরা অবস্থায়। আর স্রেফ খালিপায়ে তাদের আক্রমণ গোষ্ঠপাল কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ করতেন। বহু দূর থেকে অভ্রান্ত নিশানায় তিনি কিক করতে পারতেন। আর সেই বলে থাকতো বুলেটের গতি।

জীবদ্দশায় একজন ফুটবলার এবং সর্বোপরি একজন মানুষ হিসেবে তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে যে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন, তখনকার দিনে অপর কোন ফুটবলারের জীবনে তা সম্ভব হয়নি।

বাঙালী ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের মধ্যে বাঙাল এবং ঘটি—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল এই দুই প্রতিপক্ষ দলকে কেন্দ্র করে বিভাজন এবং বিরুদ্ধবাদিতা প্রবাদতুল্য। মোহনবাগান দলের খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন নবীন কিংবা বাঙাল অথবা ঘটি নির্বিশেষে সকলের কাছেই গোষ্ঠপাল আজও সমান জনপ্রিয়।

অবিভক্ত বঙ্গের ফরিদপুর জেলার জোভেস্বর গ্রামে ১৮৯৬ খ্রিঃ ২০শে আগস্ট গোষ্ঠপাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পিতামাতার একমাত্র সন্তান। কিন্তু জন্মের মাত্র দুমাস পরেই পিতৃহারা হন। বিধবা মায়ের স্নেহ আদরে ও সতর্ক যত্নে বড় হতে থাকেন।

বাল্যবয়স থেকেই গ্রামের মাঠে সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলা শুরু করেন। স্কুল ছিল গ্রাম থেকে অনেক দূরে। তাই যাতায়াতের অসুবিধার জন্য মায়ের তত্ত্বাবধানেই বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করেন।

আটবছর বয়সে, ১৯০৪ খ্রিঃ পড়াশুনার জন্য মা তাঁকে নিয়ে চলে আসেন কলকাতার কুমোরটুলিতে। এখানেই বাড়ির কাছে সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্‌টিটিউশনে পড়াশুনো শুরু হয় তাঁর।

ফুটবল খেলার প্রতি ঝোঁক বরাবরের। এখানে এসেও ভিড়ে গেলেন ফুটবল দলের সঙ্গে।

স্কুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন সরোজ রায়। তাঁর সঙ্গে কুমোরটুলি পার্কের পশ্চিমদিককার গোলপোস্টের পেছনে নিয়মিত ফুটবল খেলা শুরু করেন গোষ্ঠপাল। বস্তুতঃ প্রকৃত ফুটবল খেলার সঙ্গে পরিচয় তাঁর এখানেই ঘটে এবং খেলার প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হতে থাকেন।

পাড়াতেই ছিল ক্যালকাটা ইউনিয়ন ক্লাব। ১২ বছর বয়সেই এই দলে স্থান লাভ করলেন তিনি। কিন্তু সে সময়ে তাঁর খেলার প্রতিভা এমন কিছু প্রকাশ পায়নি যা থেকে বোঝা যায় উত্তরকালে তিনিই ভারতবিখ্যাত ফুটবলার রূপে জাতির গৌরব হয়ে উঠবেন।

মোহনবাগানের খেলোয়াড় রাজেন সেনের আনুকূল্যেই গোষ্ঠপালের জীবনে উত্থান সম্ভব হয়ে ওঠে।

১৯১১ খ্রিঃ ২৯শে জুলাই আই. এফ. এ শিল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের ঐতিহাসিক খেলায় রাজেন সেন ছিলেন সেন্টার হাফ। তিনিই আকস্মিকভাবে

আবিষ্কার করেছিলেন গোষ্ঠপালকে। সেদিন তাঁর নজরে না পড়লে গোষ্ঠপাল চায়নিজ ওয়াল হতে পারতেন কিনা সন্দেহ। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রতিভার বিকাশ লাভের অনুকূলে কারো না কারো অবদান থাকেই। গোষ্ঠপালের জীবনে ছিলেন তেমনি রাজেন সেন।

কলকাতায় স্কুলে গরমের ছুটি পড়লে প্রায় প্রতিবছরই গোষ্ঠপাল মায়ের সঙ্গে ভাগ্যকুলে মামাব বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। মামাদেরও ছিল ফুটবলে প্রচন্ড উৎসাহ। তাঁদের প্রেরণায় তাঁর প্রতিভা বিকাশলাভের সুযোগ পায়।

১৯১২ খ্রিঃ ঘটনা। সেবার একরকম জোর করেই গোষ্ঠপালের মামারা তাঁকে মুকুন্দলাল শিল্ডের খেলায় ভাগ্যকুলের হয়ে খেলতে নামিয়ে দেন। ভাগ্যের যোগাযোগই বলতে হবে, ওই দলেই সেন্টার হাফ ছিলেন রাজেন সেন।

গোষ্ঠপাল খেলেছিলেন রাইট হাফে। তখন তাঁর বয়স ষোল। সেদিন এই অখ্যাত তরুণটির খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন দুঁদে ফুটবলার রাজেন সেন।

কথায় বলে জহুরীই জহর চেনে। রাজেনবাবু সেদিন খেলা শেষ হলে কিশোর গোষ্ঠপালকে কাছে ডেকে আনেন। পরিচয় জেনে নিয়ে একসময় চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলেন, "মোহনবাগান দলে খেলবে তুমি?"

মোহনবাগান দলের নাম তখন বাংলার মানুষের মুখেমুখে। ১৯১১ খ্রিঃ আই. এফ. এ. শিল্ড খেলায় শক্তিশালী শ্বেতাঙ্গদেব পরাজিত করে মোহনবাগান আলোড়ন সৃষ্টি করেছে দেশ জুড়ে। হয়ে উঠেছে সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ এক সংগ্রামী প্রতীক। বিখ্যাত সব খেলোয়াড়ের প্রতিভার আলোয় এই দল আলোকিত।

স্বপ্নের এই দলে খেলার আমন্ত্রণ পেয়ে তরুণ গোষ্ঠপাল স্তম্ভিত হয়ে যান। আনন্দে উত্তেজনায় কথা হারিয়ে ফেলেন তিনি। তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আহ্লাদে পিঠ চাপড়ে দেন রাজেন সেন। পরে তাঁর কলকাতার ঠিকানা লিখে নেন।

পরের বছরেই, ১৯১২ খ্রিঃ রাজেন বাবু গোষ্ঠ পালকে মোহনবাগান দলে নিয়ে আসেন। সেই সময় দলের নিয়মিত ব্যাক রেভারেন্ড সুধীর চ্যাটার্জী অবসর নেবেন বলে স্থির করেছেন। তাঁর অবর্তমানে ভুতু সুকুলের সঙ্গে ব্যাকে কে খেলবে এই চিন্তায় কর্মকর্তারা ভাবিত ছিলেন।

গোষ্ঠপাল বরাবরই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তিনি তখন হাফের প্লেয়ার। অথচ তাঁর ট্যাকলিং ক্ষমতা ভেল্কি দেখায়। পায়েও রয়েছে রক্ষণভাগের প্লেয়ারের লম্বা জোরালো কিক। এই নিয়েই তিনি ১৯১৩ খ্রিঃ থেকে মোহনবাগানের হয়ে খেলতে শুরু করেন।

গোড়ায় বৃষ্টিভেজা মাঠে ব্ল্যাক ওয়াচের বিরুদ্ধে রাইট হাফে খেলতে নেমে গোষ্ঠপাল পুরোপুরি ব্যর্থ হন।

পরের ম্যাচ ছিল ডালহৌসির সঙ্গে। কর্মকর্তারা গোষ্ঠপালের পজিশন নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছিলেন। ভুতু সুকুল সকলের সব আপত্তি উপেক্ষা করে একরকম জোর করেই গোষ্ঠপালকে ব্যাকে নিজের পাশে খেলালেন।

রীতিমত চ্যালেঞ্জ ছিল সামনে। গোষ্ঠপাল কিন্তু সসম্মানেই এবারে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। এরপর থেকে এই পজিশনেই সারা জীবনের মত স্থায়ী আসন নিয়ে নিলেন তিনি। ১৯১২ খ্রিঃ থেকে ১৯৩৫ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর দলের হয়ে রাইট ব্যাকে খেলেছেন তিনি।

ফুটবল খেলা থেকে গোষ্ঠপাল অবসর নেন ১৯৩৫ খ্রিঃ। তার আগের দিন পর্যন্ত এই জায়গায় তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভাবা যেত না।

যতদিন তিনি ফুটবল খেলায় ছিলেন ততদিন অটুট সম্মানের সঙ্গেই খেলেছেন। দলের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় তিনি ছিলেন অপরিহার্য।

মোহনবাগান ছাড়া অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক খেলাতেও অংশ নিয়েছেন গোষ্ঠপাল। সিভিল বনাম মিলিটারি, ইউরোপিয়ান বনাম ইন্ডিয়ান, সম্মিলিত রেল বনাম বাছাই দল এবং লিগ চ্যাম্পিয়ন বনাম অবশিষ্ট দল—সর্বত্রই গোষ্ঠপালের ডাক পড়েছে সবার আগে।

সিংহলের বর্তমান নাম শ্রীলঙ্কা। ১৯৩৩ খ্রিঃ গোষ্ঠপাল ভারতীয় দল (আই. এফ. এ) নিয়ে সিংহল সফরে যান।

পরের বছর তিনি ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হন। সেই বছরই তাঁর দল নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অসুস্থতার জন্য দলের সঙ্গে যেতে পারেননি।

দীর্ঘ ফুটবল জীবনে খেলার মাঠে গোষ্টপাল চীনের প্রাচীর নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তৎকালীন দৈনিক ইংলিশম্যান তাঁকে প্রথম এই নাম দিয়েছিল।

সময়টা ছিল ১৯২০ খ্রিঃ। এই সময় বর্মার (বর্তমান নাম মায়ানমার) একটি দল কলকাতায় খেলতে আসে। আই. এফ. এ. শিল্ডের প্রথম রাউন্ডেই মোহনবাগানের খেলা পড়ে বার্মার দলের সঙ্গে।

মাঠে নেমে যেন ভেল্কি দেখাতে থাকে বার্মিজ ফুটবলারেরা। তাদের ক্রমাগত ঝটিকা আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা। কিন্তু এত করেও বার্মিজ ফুটবলাররা কিন্তু গোষ্ঠপালকে টলাতে পারলেন না। তিনি রক্ষণভাগে দাঁড়িয়েছিলেন বিশাল এক প্রাচীরের মত। সেই প্রাচীরে ধাক্কা লেগে বার্মিজ ফুটবলারদের সমস্ত আক্রমণ ভোঁতা হয়ে যায়। বল নিয়ে তাদের কারোর পক্ষেই গোলের দিকে এগনো সম্ভব হয়নি।

পরের দিন ইংলিশম্যান কাগজে বড় বড় হরফে গোষ্ঠপালকে চাইনিজ ওয়াল নামে অভিহিত করা হয়। সেই থেকে গোষ্ঠপালের আর এক নাম হয়ে যায় চাইনিজ ওয়াল।

অবশ্য একথা ঠিক যে গোষ্ঠপালের খেলায় উমাপতি কুমারের মত শৈল্পীক সুষমা ছিল না। কিন্তু তিনি খেলতেন অত্যন্ত কার্যকরভাবে। তাঁর পায়ের বল ছিল অসম্ভব শক্তিশালী। এই গুণের জন্যই তিনি প্রতিটি খেলায় বিপক্ষ দলের সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পারতেন।

খেলতেন ব্যাকে কিন্তু অনেকখানি জায়গা জুড়ে। মাঠে দাপিয়ে বেড়াতেন সিংহের বিক্রমে। তাঁর ট্যাকলিং কভারিং এবং অনুমান ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁর সাইডপুশ সেই সময়ের শক্তিশালী ইংরাজদের কাছেও ছিল জীবন্ত আতঙ্কের মত। মিলিটারি সাহেবদের যম ছিলেন গোষ্ঠপাল।

পরাধীন দেশের ব্রিটিশ রাজকে লাঞ্ছিত অপমানিত ও কোনঠাসা দেখার জন্য চির বিদ্রোহী বাঙালীজাতির মন উদগ্রীব হয়ে থাকত। তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত নায়কের সন্ধান তাঁরা পেয়েছিলেন খেলার মাঠে গোষ্ঠপালের মধ্যে। তাঁর দুরন্ত খেলার কাছে ব্রিটিশদের বারবার ভূলুণ্ঠিত অপমানিত হতে দেখে বাঙালীজাতি আঞ্চলিকতা ও ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে পরম আদরে তাঁকে বুকে তুলে নিয়েছিল। এই বিচারেও, পরাধীন যুগে জাতীয় চেতনা উজ্জীবনেও গোষ্ঠপালের পরোক্ষ অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

গোষ্ঠপালের খেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর শটের জোর। চাইনিজ ওয়ালের শট ছিল প্রবাদের মত।

একবার বাহবা নেবার লোভে দশম মিডলসেক্সের সেন্টার ফরোয়ার্ড এলসন কাছ থেকে গোষ্ঠপালের কামানের গোলার মত শট বুক দিয়ে আটকাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বুকে বল লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান।

আর একবার কায়দা করে লাফিয়ে দেহের পেছন দিক দিয়ে গোষ্ঠাপালের শট আটকাবার চেষ্টা করেছিলেন ডালহৌসির লেফট আউট। বেচারা বলের সঙ্গে ১০-১৫ হাত দূরে ক্যালকাটার মেম্বার স্ট্যান্ডে উড়ে গিয়ে ছিটকে পড়েছিলেন। সেইযুগে তাঁর সমকক্ষ শক্তিমান ফুটবলার দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না।

ফুটবল ছাড়াও হকি, ক্রিকেট এবং টেনিস খেলাতেও গোষ্ঠপাল যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। এই খেলাগুলিতেও তিনি মোহনবাগানের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

সেই সময়ে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বাংলার 'ডবলু জি গ্রেস' সারদারঞ্জন রায়। এই কলেজে পড়বার সময় তাঁর উৎসাহে গোষ্ঠপাল এইসব খেলায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তিনি মোহনবাগানের হয়ে হকি খেলেছেন পাঁচ-ছয় বছর ধরে, টেনিস ক্লাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট খেলাতেও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অংশ নিয়েছেন।

ভারত সরকার সর্বকালের প্রিয় ফুটবলার গোষ্ঠপালের প্রতিভার স্বীকৃতি জানিয়েছেন ১৯৬২ খ্রিঃ পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেন।

১৯৭১ খ্রিঃ গোষ্ঠপালের গৌরবময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

যিশুখ্রিস্ট



প্যালেস্টাইনের একটি ছোট্টগ্রাম নাজারেথ। পাহাড় আর তৃণভূমি ঘেরা ছোট্ট সুন্দর গ্রাম। এখানে বাস করে এক সূত্রধর, তার নাম যোসেফ। সেই গ্রামেরই বাসিন্দা কুমারী মেরীর সঙ্গে যোসেফের বিয়ে স্থির ছিল। দুইজনেই প্রতীক্ষা করে আছে সেই শুভ দিনের যেদিন সমাজের সকলের সামনে পুরোহিত তাদের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করবেন।

ইতিমধ্যে একদিন মেরী এক রাত্রে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। এক আলোকময় পুরুষ, নিজেকে তিনি পরিচয় দিলেন দেবদূত গ্যাব্রিয়েল বলে, তিনি শিয়রে আবির্ভূত হলেন। অভিভূত মেরি বিস্ময় বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে রইলেন সেই আলোকময় দিব্য পুরুষের দিকে।

গ্যাব্রিয়েল বললেন, ঈশ্বরের এক বার্তা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। কিছুদিনের মধ্যেই তোমার কোলে জন্ম নেবেন এক দেবশিশু। তুমি তাঁর নাম রাখবে যিশু। তিনি হবেন দুঃখী মানুষের পরম পরিত্রাতা।

মেরী চমকে উঠলেন। তাঁর তো এখনো বিয়ে হয়নি; তিনি সন্তানবতী হবেন কি করে? সেকথা সবিনয়ে নিবেদন করলেন তিনি।

দেবদূত তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, তোমার যিনি সন্তান হবেন তিনি ঈশ্বরেরই অংশ—তাঁর আত্মা থেকেই যিশুর জন্ম। তাঁকে নিয়ে তুমি চিন্তা করো না।

বক্তব্য শেষ করে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন দেবদূত গ্যাব্রিয়েল। আনন্দে অভিভূত হলেন কুমারী মেরী। কিন্তু এই আনন্দের বার্তা কি তিনি কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারবেন?

মেরীর দিদি এলিজাবেথ থাকেন পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে। তাঁর স্বামীর নাম জ্যাকারিয়াস। দুজনেই ধর্মপ্রাণ মানুষ। একটি সন্তানের জন্য দিবারাত্র তাঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান।

ঈশ্বর তাঁদের প্রার্থনা শুনতে পেলেন। একদিন দুজনে দৈববাণী শুনলেন—শীঘ্রই তোমাদের সন্তান হবে, তার নাম রাখবে যোহন। মানুষের কল্যাণের জন্য জন্ম নিচ্ছেন ঈশ্বরপুত্র, যোহন হবে তাঁর অগ্রদূত।

দৈববাণী একদিন সত্য হয়ে দেখা দিল। সন্তান এল এলিজাবেথের গর্ভে।

কয়েকমাস পরে মেরী এলেন তাঁদের বাড়ি। জানালেন তাঁর স্বপ্নের কথা। সকলেই অনুভব করলেন—এ যোগাযোগ ঈশ্বর নির্দিষ্ট।

কিছুদিন দিদির বাড়িতে কাটিয়ে আবার নাজারেথে ফিরে এলেন মেরী। তখন তিনি সন্তানসম্ভবা।

যোসেফ জানতে পারলেন বিয়ের আগেই মেরী মা হতে চলেছেন। লজ্জায় দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন তিনি। স্থির করলেন মেরীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

কিন্তু সেই সঙ্কল্প রূপায়ণের আগেই একদিন স্বপ্নে দেখা দিলেন দেবদূত গ্যাব্রিয়েল। বললেন—কুমারী মেরী পরম পবিত্র, তাঁকে ত্যাগ করো না। মানব পরিত্রাতা ঈশ্বরপুত্র তাঁর গর্ভে এসেছেন।

যোসেফের আর কোন সংশয় রইল না। ঈশ্বরপুত্রের গর্ভধারিণী যিনি হবেন তাঁকে পত্নী রূপে পাওয়া যে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। নিঃসংশয়ে তিনি মেরীকে বিবাহ করলেন।

কিছুকাল পরে রোমের সম্রাট অগস্টাস সীজার তাঁর রাজ্যের সর্বত্র লোকগণনার নির্দেশ দিলেন। বলা হল, দেশের সমস্ত নারীপুরুষ যেন নিজ নিজ শহরে গিয়ে খাতায় নাম লিখিয়ে আসে।

নাজারেথ থেকে নিকটবর্তী শহর বেথলেহেমের দূরত্ব সত্তর মাইল। যোসেফ সেখানে এলেন মেরীকে নিয়ে। মেরী তখন আসন্ন প্রসবা।

বেথলেহেমে অসংখ্য মানুষের ভিড়। অন্য কোথাও থাকার জায়গা না পেয়ে যোসেফ স্ত্রীকে নিয়ে এক আস্তাবলে আশ্রয় নিলেন। সেই রাত্রেই দীনহীন সেই আস্তাবলে জন্ম নিলেন যিশু। বেথলেহেমের কোন মানুষ জানতে পারল না মানবের পরিত্রাতা ঈশ্বরপুত্র যিশুর আবির্ভাবের কথা।

কিন্তু সেই রাত্রেই বহুদূরে রাখাল বালকদের কাছে পৌঁছে গেল সেই শুভবার্তা। সারাদিন মাঠে মাঠে ভেড়া চরিয়ে রাতের বেলা তারা সকলে জড়োসড়ো হয়ে ঘুমিয়ে ছিল মাঠে।

গভীর রাতে চতুর্দিক আলোর দ্যুতিতে উদ্ভাসিত করে সেখানে আবির্ভূত হলেন দেবদূত। রাখাল বালকদের বললেন, দীনদরিদ্র লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তিদাতা ঈশ্বরপুত্র যিশু বেথলেহেমে আস্তাবলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তোমাদের সেই বার্তা জানাতে ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন।

রাখাল বালকেরা আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠল। রাত ভোর হতেই তারা এসে

হাজির হল সেই আস্তাবলে। মেরী মায়ের কোলে আলোর দীপ্তি মাখানো শিশু যিশুকে দেখে তারা নয়ন সার্থক করল। অন্তরের প্রণাম জানিয়ে তারা ফিরে গেল নিজেদের কাজে।

ইহুদীদের প্রথা অনুযায়ী জন্মের আট দিন পরে মন্দিরে গিয়ে শিশুর নামকরণ করতে হয়। যোসেফ ও মেরী তাঁদের পুত্রের নাম রাখলেন যিশু।

মেরী পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত যোসেফ সেই আস্তাবলেই রয়ে গেলেন।

এমনি সময়ে একদিন পূর্বদেশের তিন পন্ডিত এসে উপস্থিত হলেন সেই আস্তাবলের দরজায়। তাঁরা প্রণাম নিবেদন করতে এসেছেন ঈশ্বরপুত্রকে।

এই তিনি পন্ডিত একদিন আকাশে এক নতুন উজ্জ্বল তারা দেখতে পেয়ে গণনা করে জানতে পেরেছিলেন—ওই তারা কোন মহাপুরুষের আবির্ভাবের বার্তা নির্দেশ করছে।

কিন্তু কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন সেই মহাপুরুষ? আকাশের তারাকে লক্ষ করেই তাঁরা অগ্রসর হয়ে চললেন পশ্চিম দিকে।

সেই সময় প্যালেস্টাইনে রাজত্ব করতেন ইহুদীদের অত্যাচারী রাজা হেরড। তিনি ছিলেন রোমের সম্রাট সীজারের অধীন। প্যালেস্টাইনের রাজধানী হল জেরুজালেম।

প্রাচ্য দেশের তিন পন্ডিত এসে পৌঁছলেন এখানে। তাঁরা রাজার কাছে এসে ইহুদীদের নতুন রাজা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন জানতে চাইলেন।

হেরড নতুন কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব কল্পনা করে চমকে উঠলেন। কিন্তু মনের ভাব তিনি বুঝতে দিলেন না প্রাচ্যদেশের পন্ডিতদের। বললেন, রাজপরিবারে ইতিমধ্যে নতুন কোন শিশুর জন্ম হয়নি।

পন্ডিতেরা জানালেন, প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে লেখা রয়েছে রাজার রাজা জন্মগ্রহণ করবেন বেথলেহেমে। আমরা যে তাঁরই সন্ধানে বেরিয়েছি।

হেরড বললেন, তবে বেথলেহেমেই তাঁর সন্ধান আপনারা পাবেন। তাঁর দর্শন পেলে আমাকে জানাবেন, আমিও গিয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আসব।

সেই নতুন তারা তখনো আকাশে জ্বলজ্বল করছিল। তাকে অনুসরণ করে পন্ডিতেরা বেথলেহেমের পথে অগ্রসর হয়ে চললেন।

একসময় তাঁরা দেখতে পেলেন তারাটি একটি কুটিরের ওপরে এসে আকাশে স্থির হয়ে আছে। তাঁরা তখন বুঝতে পারলেন ওখানেই রয়েছেন রাজার রাজা ঈশ্বরপুত্র।

কুটিরে মাতা মেরীর কোলে তখন শুয়েছিলেন শিশু যিশু। পন্ডিতেরা তাঁর উজ্জ্বল কান্তি আর দিব্য রূপ দেখেই চিনতে পারলেন। তাঁরা নতজানু হয়ে নানা উপহার দিয়ে অভিষেক করলেন মহামানবের।

ফেরার পথে দৈববাণী শুনতে পেলেন তিন পন্ডিত—তোমরা জেরুজালেম যেও না—নিজেদের গৃহে ফিরে যাও।

এদিকে ইহুদীদের নতুন রাজার কথা শোনার পর থেকে প্রচন্ড উদ্বেগের মধ্যেই ছিলেন। আশা করেছিলেন, পন্ডিতদের কাছ থেকে সন্ধানটা জানা গেলে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বীর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

কিন্তু পূর্বদেশের পন্ডিতদের ফিরে আসার সময় পার হয়ে যাবার পর সেনাপতিকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, সদলবলে বেথলেহেমে গিয়ে যেন প্রতিটি নবজাত শিশুকে অবিলম্বে হত্যা করা হয়।

হেরডের অনুচরদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হতে লাগাল বেথলেহেমের অসংখ্য অসহায় শিশু। মায়েদের বুক ফাটা কান্নায় ভারী হয়ে উঠল বেথলেহেমের আকাশ।

যোসেফ ও মেরী তাঁদের শিশুসন্তানকে রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁরা হেরডের শাসনের সীমা ছড়িয়ে রাতারাতি শিশুপুত্রকে নিয়ে মিশরে পাড়ি জমালেন।

মিশরে তাঁরা নিরাপদেই রইলেন বছর কয়েক। ইতিমধ্যে অত্যাচারী শাসক হেরড মারা গেলেন। যোসেফ নিশ্চিন্ত হয়ে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে আবার নাজারেথে ফিরে এলেন।

ইহুদীদের পবিত্র তীর্থস্থান হল জেরুজালেম। প্রতিবছর নিস্তারপর্ব উপলক্ষে এখানে দেবতার মন্দিরে ইহুদীরা সমবেত হয়ে উৎসব পালন করে।

বহুপূর্বে ইহুদীরা মিশরের অধীনতামুক্ত হয়ে প্যালেস্টাইনে নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিল। স্বাধীনতা ফিরে পাবার দিনটিকে স্মরণ করেই প্রতিবছর নিস্তার উৎসব পালন করা হয়। বারো বৎসর বয়স হলে ইহুদীরা এই উৎসবে যোগ দেবার অধিকার পায়।

মেরী আর যোসেফ নিজেরা কয়েকবার এই উৎসবে গেছেন। সেবার তাঁরা বারো বছরের বালক যিশুকে নিয়ে জেরুজালেম গেলেন।

মন্দিরে দেবতার সামনে পুজো হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়েছে সেখানে।

মন্দিরের পশুবলির দৃশ্য দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন কিশোর যিশু, তাঁর মনে হল, নিরপরাধ একটি প্রাণীকে হত্যা করে এ কেমন পুজো, এতে কার মঙ্গল হওয়া সম্ভব?

পুরোহিতরা একজায়গায় বসে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্মালোচনা করছিলেন। যিশু এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাদের আলোচনা শুনলেন। কিন্তু তাঁর মন ভরলো না। মনে হল, সবই যেন কেমন প্রাণহীন শুষ্ক আলোচনা। মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতাকে ভালবাসার প্রসঙ্গ তাঁর কাছে দুর্বোধ্য মনে হল।

নিস্তার উৎসবের প্রথম স্মৃতি নিয়ে মা বাবার সঙ্গে যিশু বাড়ি ফিরে এলেন। যিশুর পরে যোসেফ ও মেরীর আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল। যোসেফের একার পরিশ্রমেই সকলের ভরণপোষণ চলত।

যিশুর কাজের বয়স হয়েছিল, এবারে তিনিও বাবার সঙ্গে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ শুরু করলেন।

এভাবেই কেটে গেল আরও কয়েকটি বছর। যিশুর যখন উনিশ বছর বয়স হল, সেই সময় রোমসম্রাট অগাস্টাস সিজারের মৃত্যু হল। তাঁর সিংহাসনে বসলেন নতুন সম্রাট। দেশের রাজনীতিতেও ঘটল পরিবর্তন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যিশুর মধ্যেও ঘটেছিল আত্মিক পরিবর্তন। তিনি উপলব্ধি করতেন এই বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে তিনিও যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। চারপাশের মানুষের দুঃখ, বেদনা, দারিদ্র্য, মানুষে মানুষে বিভেদ, সবই তাঁকে ব্যথিত করে তোলে।

তাঁর মনে হত, মানুষের এই দুঃখ পাপ, এসবই ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। এই কথা তাঁকেই সকলকে বুঝিয়ে বলতে হবে—তাদের দেখাতে হবে স্বর্গ ও শান্তির পথ।

রোমের নতুন সম্রাটের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জুডিয়াতেও নতুন শাসনকর্তা হলেন পন্টিয়াস পাইলেন। এই নতুন শাসকের শাসনে অল্পদিনের মধ্যেই সৃষ্টি হল বিভীষিকা।

এই সংকট সময়ে প্যালেস্টাইনে এক নতুন ধর্মগুরুর আবির্ভাব হল। তিনি হলেন মেরীর দিদি এলিজাবেথের পুত্র। যিশুর আগেই যাঁর জন্ম হয়েছিল। অল্পবয়স থেকেই তিনি দেশের নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর মানুষকে ঈশ্বরের বাণী শুনিয়েছেন।

তিনি বললেন, মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের পুত্র আবির্ভূত হয়েছেন, তিনিই সকলের সব পাপ দূর করে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাবেন।

যোহনের কথা যিশুও শুনতে পেলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য একদিন এলেন জর্ডন নদীর তীরে।

সেই সময় যোহন এক টুকরো পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে মানুষকে ঈশ্বরের কথা বলছেন। বহু মানুষ চারপাশে জড়ো হয়ে তাঁর কথা শুনছে। যিশু নিকটে এসে শুনতে পেলেন যোহন বলছেন তোমরা সকলে এসো, আমি জর্ডন নদীর পবিত্র জলে তোমাদের স্নান করিয়ে দীক্ষা দেব। আমার পরে যিনি আসবেন তিনি তোমাদের সব পাপ দূর করবেন। তোমরা তোমাদের পাপকর্মের জন্য অনুতাপ কর। শীঘ্রই সকলের মুক্তি হবে।

দলে দলে মানুষ যোহনের কাছে এসে দীক্ষা নিতে লাগল। যিশুও অন্তরের প্রেরণায় এগিয়ে গিয়ে জর্ডনের জলে স্নান করলেন। তারপর যোহনের কাছে দীক্ষা নিলেন।

আর সেই সময়েই যিশু যেন শুনতে পেলেন এক অলৌকিক কণ্ঠস্বর—তুমি আমার প্রিয়, তোমার মধ্যেই আমি আছি। তুমিই ঈশ্বরপুত্র।

নিজের মধ্যে যেন এক নতুন প্রাণের সঞ্চরণ অনুভব করলেন যিশু। অবিশ্বাস্য এক স্বর্গীয়ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন তিনি।

দীক্ষার পর ঘরে ফেরার প্রেরণা আর পেলেন না যিশু। এক আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি চলে এলেন জুডিয়ার মরুপ্রান্তরে এক ছোট্ট পাহাড়ে। এখানেই এক

পাথরের আড়ালে তিনি ধ্যানাবিষ্ট হলেন। শুরু হল যিশুর সাধনজীবন।

দীর্ঘ চল্লিশ দিন একই ভাবে নিবিষ্ট ঈশ্বর চিন্তায় কেটে গেল। শুষ্ক মরুর প্রচন্ড সূর্যতাপ, কত ধূলিঝড়, রাতের হিমেল বায়ুপ্রবাহ বয়ে গেল শরীরের ওপর দিয়ে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর।

একদিন জ্যোতির্ময় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর অন্তরাকাশ। নিজের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করলেন ঈশ্বরের প্রকাশ।

এক নতুন প্রজ্ঞার দিব্য প্রেরণা নিয়ে ধ্যান ভঙ্গ করলেন যিশু। এবার তাঁকে পথে নামতে হবে—প্রচার করতে হবে ঈশ্বরের বাণী। পাপের পথ থেকে ঈশ্বরের পথে মুক্তি দিতে হবে মানুষকে।

গ্রামের পথে চলতে চলতে যিশু শুনতে পেলেন গুরু যোহনকে বন্দি করেছেন অত্যাচারী রাজা এন্টিপাস। এই রাজা নিজের বৈমাত্রেয় ভাই ফিলিপের বিধবা স্ত্রীকে বলপূর্বক বিয়ে করে প্রজাদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। প্রজাদের কাছে নিজেকে নিষ্পাপ প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে তিনি স্থির করেছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাধু যোহনকে দিয়ে তার নির্দোষিতার কথা বলিয়ে নেবেন। তাই ডাকিয়ে নিয়েছিলেন যোহনকে।

ধর্মাত্মা যোহন কিন্তু রাজার পাপাচরণ সমর্থন করতে পারেন নি। রাজার নানা প্রলোভন, শাস্তির ভয় কোন কিছুতেই তিনি কাতর না হয়ে সত্য পথেই অবিচল ছিলেন। ক্রুদ্ধ রাজা তাই তাঁকে বন্দি করে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন।

বাবা ভাই বোন, আত্মীয় পরিজন সকলের মায়া ত্যাগ করে যিশু এগিয়ে চললেন অনির্দেশ পথে সত্যের বার্তা বহন করে। স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর দিব্য অবয়ব।

পথে যেতে যেতে যাঁরা তাকে দেখতে লাগল তাঁরাই আকৃষ্ট হল। গালিলেয়া পৌঁছলে এক মহিলা যিশুকে দেখে সকলকে বলতে লাগলেন, ইনিই সেই ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ। বহুদিন পূর্বে মহর্ষি ইসাইয়া এঁর আবির্ভাবের কথাই ঘোষণা করেছিলেন। গুরু যোহনও বলেছেন এঁর কথা।

হাঁটতে হাঁটতে যিশু এসে পৌঁছলেন সমুদ্রোপকূলবর্তী শহর কাপার্নাউমে। এখানে থেকেই তিনি শুরু করলেন তাঁর ধর্মপ্রচার। তিনি সকলকে আহ্বান করে বললেন, শুভক্ষণ উপস্থিত হয়েছে, ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তোমাদের দুয়ারে উপস্থিত। অনুতাপে পাপতাপ দূর হয়, তোমরা অনুতাপ কর।

মানুষের পাপ ব্যাধি, কলুষতা মুক্ত করার উদ্দেশে যিশু এগিয়ে চললেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

বহু কুষ্ঠরোগী, খঞ্জ, আতুর তাঁর অলৌকিক স্পর্শে সুস্থতা লাভ করল। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানতে পেরে দুঃখী তাপী মানুষ দলে দলে ছুটে আসতে

লাগল যিশুর কাছে। পাত্র-অপ্রাত্র নির্বিশেষে তিনি সকলকে করুণা বিতরণ করতে লাগলেন।

শিষ্যদের মধ্য থেকে যিশু দেশ দেশান্তরে তাঁর বাণী প্রচারের জন্য বিশেষ বারোজনকে বেছে নিয়েছিলেন। এঁরা হলেন, পীটার, অ্যান্ড্রু, যোহন, যাকোব, বার্থলোমিও, ফিলিপ, থোমা, মথি, যাকোব, সিমন, যিহুদা আর জুডাস।

যিশু তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'ইতিপূর্বে যে সব মহাপুরুষ মানব মুক্তির বাণী প্রচার করে গেছেন, আমি তাঁদেরই উত্তরসূরী। আমার কাছে যারা আসবে তারা মুক্তির পথ জানতে পারবে।'

তিনি আরও বললেন, 'যারা অন্তরে দীনহীন তারাই স্বর্গরাজ্যের প্রকৃত অধিকারী। যারা অনুতাপ করে, তারাই সান্ত্বনা লাভ করবে। অন্যদের দয়া কর, বিনয়ী ও পবিত্র হও। যারা মানুষে মানুষে বিভেদ করবে না, তারাই ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান।'

যিশুর মানবপ্রেম ও অলৌকিক দয়ার জয়গানে মুখর হয়ে উঠল চতুর্দিক। তাঁর প্রচারিত প্রেমধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করতে লাগল।

প্রাচীন ইহুদী ধর্মমতে বিশ্বাসী ইহুদী পুরোহিতরা যিশুর জনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল।

তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। তারা তাদের অনুগত অভিজাত সম্প্রদায়কেও প্ররোচিত করে তুলল। রোম সাম্রাজ্যের শাসকদের হাতে যিশুকে তুলে দেবার জন্য স্বার্থান্বেষী দল ঘোষণা করল, যে যিশুকে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

একবার যিশু বেথানি গ্রামে ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে উপদেশবাণী প্রচার করছেন। সেখানে এক কৃষক তাঁকে একটি গাধা দান করল। সেই গাধায় চেপে তিনি উপস্থিত হলেন জেরুজালেমে। যথারীতি জনগনের মধ্যে উপদেশ প্রচার করতে লাগলেন তিনি।

এদিকে ফরাসি ও ইহুদী পুরোহিতরা যিশুকে বন্দি করবার জন্য চক্রান্তে লিপ্ত হল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল যিশু-শিষ্য বিশ্বাসঘাতক যুডাস। যিশু রোমান প্রহরীদের হাতে বন্দি হলেন।

যিশু নিজেকে ইহুদীদের রাজা বলেছেন, ঈশ্বরপুত্র বলে প্রচার করে ঈশ্বরের অবমাননা করছেন এই অপরাধে ইহুদীদের প্রধান যাজক তাঁর মৃত্যু দন্ড বিধান করলেন।

দন্ডাদেশ শুনে যিশু নির্বিকার রইলেন। সমস্ত নির্যাতন, বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা তিনি নির্বিবাদে সয়ে চললেন।

প্রধান যাজকের বিচার ও দন্ডাদেশ সমর্থন জানাতে বাধ্য হলেন রোমান বিচারপতি পিলেত। স্থির হল ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে ঈশ্বরদ্রোহী যিশুকে।

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যিশুকেই বধ্যভূমিতে ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে হল।

বধ্যভূমি হল গলগাথার মাঠে। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত যিশু ক্রুশ বয়ে নিয়ে চললেন। তাঁকে প্রহরা দিতে লাগল সৈন্যরা। জলভরা চোখে তাদের অনুসরণ করে চলল অসংখ্য মানুষ। সৈন্যদের ভয়ে তাদের মুখে কোন কথা নেই।

একজন চোর আর একজন দস্যুকেও যিশুর সঙ্গে দন্ড দেবার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল বধ্যভূমিতে।

কটিবাসমাত্র রেখে সমস্ত পোশাক খুলে নেওয়া হল যিশুর। ক্রুশে বেঁধে দুই হাতের তালু, পায়ের পাতা, কোমরে পুঁতে দেওয়া হল বড় বড় পেরেক। মাথায় পরিয়ে দেওয়া কাঁটার মুকুট।

রক্তাক্ত যিশু নির্বিকারে সহ্য করলেন সেই অমানুষিক যন্ত্রণা। পাপী তাপী দুঃখী অনাথ আতুরের উদ্ধারের জন্য, মানুষকে ভালবাসার কথা শেখাবার জন্য আবির্ভাব হয়েছিল তাঁর।

তাই পাপীদের অবুঝ বিকার তিনি ক্ষমা সুন্দর মহিমায় সয়ে গেলেন। কেবল একবার আকাশপানে চোখ তুলে তিনি বললেন, 'পিতা, এরা জানে না এরা কি করছে, এদের তুমি ক্ষমা করো।'

সকালবেলা ক্রুশবিদ্ধ করা হয় যিশুকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজনও বাড়তে লাগল। মা মেরী সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

দুপুর হতেই আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল কাল মেঘে। যিশু মৃদুহাসি মুখে বললেন, 'হে পিতা, আমাকে তুমি গ্রহণ করো।' সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন যিশু। এই সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র বত্রিশ।

বিচারপতি পিলেতের অনুমতি পেয়ে সৈন্যরা যিশুর মৃতদেহ নামিয়ে আনলে, যিশুর এক ভক্ত ইহুদী তা গ্রহণ করলেন সমাহিত করার জন্য। পাহাড়ের গায়ে এক ছোট গুহায় যিশুর মৃতদেহ শুইয়ে দিয়ে বড় বড় পাথর দিয়ে গুহার মুখ ঢেকে দিলেন তিনি।

গুহা পাহারা দিতে লাগল প্রহরীর দল। যিশুর কয়েকজন শিষ্য সমবেত হয়েছেন গুহার কাছে। সহসা এক জ্যোতির্ময় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গুহামুখ। দেখা গেল গুহামুখ উন্মুক্ত, ভেতরে যিশু নেই।

ক্রুশবিদ্ধ হবার চল্লিশ দিন পর গালিলির পর্বতে সমবেত শিষ্যদের দর্শন দিলেন যিশু। তিনি তাঁদের বললেন, 'সমস্ত মানুষের কাছে আমার উপদেশ পৌঁছে দাও, দীক্ষিত করো। যারা আমাকে বিশ্বাস করবে তারা অনন্ত শান্তির অধিকারী হবে। অনন্ত কাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব।'

এরপরই যিশু অন্তর্ধান করলেন। ঈশ্বরপুত্র ফিরে গেলেন তাঁর পিতার কোলে।

গুরু নানক



শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের জন্ম ১৪৬৯ খ্রিঃ ভারতের পশ্চিম পাঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোরের নিকটবর্তী তালওয়ান্দি গ্রামে। এই স্থানটি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত, নাম হয়েছে নানকানা সাহেব।

নানকের পিতার নাম মেহেতা কন্যানবাই। সকলে তাঁকে মেহতা কালু নামেই ডাকতো। নানকের মায়ের নাম ত্রিপতা।

নানক ছিলেন ধর্মপ্রাণ পিতামাতার একমাত্র পুত্র সন্তান। ছেলেবেলা থেকেই তিনি একান্তে নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন। কী এক ভাবের মধ্যে যেন নিমগ্ন হয়ে থাকতেন।

লেখাপড়া কিংবা বাড়ির কাজেকর্মে কোন বিষয়েই তাঁর তেমন আগ্রহ দেখা যেত না। তাঁকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন গোপাল পন্ডিত। সব সময় চুপচাপ বসে থাকতে দেখে তিনি একদিন নানককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, নানকের ঈশ্বরকথা, ধর্মকথা ছাড়া কিছু শুনতে বা জানতে ভাল লাগে না।

গোপাল পন্ডিত তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, এই শিশু অন্য দশটি সাধারণ শিশুর মত নয়। তিনি তারপর থেকে নানকের সঙ্গে ঈশ্বরীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।

নানকের শিশু মনে এই শিক্ষকের স্মৃতি স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কথা উল্লেখ করতেন।

যাইহোক স্কুলে তিন বছর যাতায়াত করে নানক গোপাল পন্ডিতের কাছে মাতৃভাষা শিক্ষা করলেন। পাঠশালার পড়া শেষ হলে নানককে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্রিজনাথ শর্মা নামে এক পন্ডিতের টোলে পাঠানো হলো।

নানকের আগ্রহ ছিল ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে, স্কুলের বাঁধাধরা পড়াশুনো তাঁর কাছে অসার বলেই মনে হতো। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কালু ছেলেকে এবারে সংসারের কাজকর্মের দায়িত্ব দিলেন।

গ্রামের পাশেই ছিল বিস্তৃত তৃণভূমি। নানককে প্রতিদিন সকালে সেখানে বাড়ির গরু ছাগল নিয়ে চরাতে যেতে হয়।

একদিন ক্লান্ত হয়ে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেই অবসরে তাঁর গরুগুলো পাশের এক ক্ষেতে নেমে ফসল খেতে শুরু করল। ক্ষেতের মালিক

দেখতে পেয়ে গরুগুলোকে ধরে নিয়ে গাঁয়ের জমিদারের কাছে নালিশ করল।

যথারীতি ডাক পড়ল নানকের। তিনি জমিদারের কাছে গিয়ে বললেন, আমার গরু কোন ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেনি।

জমিদারের লোকজন সেই ক্ষেতের মালিককে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখল নানকের কথা সত্যি। ক্ষেতের ফসলের কোন ক্ষতিই হয়নি।

এই ঘটনায় ক্ষেতের মালিক হতভম্ব হয়ে গেল। নানকের গরু ক্ষেতের অর্ধেক ফসল নষ্ট করে ফেলেছে সে নিজের চোখেই দেখে গিয়েছিল। নানকের মধ্যে কোন দৈবশক্তি আছে বিস্মিত হয়ে একথাই সেদিন সে ভেবেছিল।

একথা জানাজানি হবার পর গাঁয়ের মানুষরা নানককে সাধু মহাত্মা ভেবে সম্ভ্রমের চোখে দেখতে আরম্ভ করল।

আর একদিন এমনি গরু চরাতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেই সময় কাছাকাছি পথ দিয়ে গাঁয়ের জমিদার রাইবুলার যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, জঙ্গলের একটি বিষধর সাপ নিদ্রিত নানকের মাথার কাছে ফণা তুলে রোদ আড়াল করে রেখেছে। অভিজ্ঞ রাইবুলার বুঝতে পারলেন এই বালক সাধারণ নয়, নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ। এই ঘটনার পর থেকে তিনি নানককে খুবই শ্রদ্ধা করতেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর-সংসারের প্রতি নানকের ঊদাসীনতাও বাড়তে লাগল। প্রায়ই দেখা যেত তিনি নির্জনে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। গাঁয়ে কোন সাধু সন্ন্যাসী এলে তিনি তাঁদের কাছে গিয়ে ঈশ্বরের কথা ধর্ম উপদেশ শুনতে বসতেন।

ছেলের উদাসীনভাব দেখে কালু চিন্তায় পড়লেন। ভাবলেন বিয়ে দিয়ে ছেলেকে সংসারী করবেন। কিন্তু তার আগে তো একটা কাজকর্ম দরকার।

সেই সময় জমিদারী সেরেস্তায় কাজকর্ম পেতে হলে ফার্সি ভাষা জানতে হতো। কালু নানককে ফার্সি শেখাবার জন্য এক মৌলবীর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। তখন তাঁর বয়স বারো বছর।

কিন্তু এখানেও সেই ঈশ্বরের কথা, আর ধর্মের কথা। ফার্সিভাষা শেখাও মাঝপথে ইস্তফা দিতে হল।

জয়রাম নামে নানকের এক ভগ্নীপতি ছিলেন সুলতান দৌলত খাঁ লোদীর দেওয়ান। তাঁর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত উদাসী নানকের কাজকর্মের একটা হিল্লে হল। সুলতান তাঁকে গুদামঘর দেখাশোনার কাজে নিয়োগ করলেন। সময়টা তখন ১৪৮৫ খ্রিঃ।

নানকের কাজ ছিল, সারা দিনে গুদামে কত মাল আনা নেওয়া করা হত তার হিসাব রাখা। নানক এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গেই করতে লাগলেন।

গরীব দুঃখী মানুষ দেখলে নানকের মন কাতর হয়ে পড়ত। মাঝে মাঝেই তিনি তাদের গুদাম থেকে চাল ডাল দান করতেন। নিজেও যা মাইনে পেতেন, তার বেশির

ভাগটাই গরীব-দুখী মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। এদিকে বিষয়কর্মে নানকের মন বসেছে দেখে তাঁর বাবামা একদিন শুভ দিন দেখে নানকের বিয়ে দিলেন। নানকের স্ত্রীর নাম সুলখনি। পরবর্তীকালে নানক শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস নামে দুই সন্তানের জনক হন।

সংসারের সব কাজকর্মের মধ্যেও নানকের মন সর্বদা ঈশ্বর চিন্তায় ডুবে থাকত। সারাদিনের কাজের শেষে রাতে তিনি নিভৃতে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হতেন। ক্রমে তিনি তাঁর অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন।

তিনি বুঝতে পারলেন সংসারের ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁকে কাজ করতে হবে; ঈশ্বর তাঁকে সেই কাজের জন্যই পাঠিয়েছেন।

এরপর থেকে তিনি সংসারবন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল করে আনতে লাগলেন। একদিন সুলতানের চাকরি ছেড়ে দিলেন।

এখন অফুরন্ত অবসর। সারাদিন ঈশ্বরের নামগান আর ঈশ্বর প্রসঙ্গের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন।

নানকের ধার্মিকতায় আকৃষ্ট হয়ে গাঁয়ের লোকজন ধর্মকথা শুনবার জন্য তাঁর কাছে জড়ো হতে লাগল। তিনিও তাদের পরমানন্দে ঈশ্বরের কথা শোনাতেন। তাঁর কাছে জাতিধর্মের কোন বিচার ছিল না।

তিনি বলতেন, সকলেই এক পরমাত্মার সন্তান। ধীরে ধীরে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। তিনি শিষ্য ও ভক্তদের নিয়ে ভজন গান করতেন। নিজে লিখতেনও ভজন গান।

মর্দানা নামে এক চারণকবি এই সময়ে নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গেই থাকতে লাগলেন। তিনি যখন পরিব্রাজনে বের হতেন তখন মর্দানা থাকতেন সঙ্গে।

কিছুদিনের মধ্যেই নানকের শিষ্যসংখ্যা বাড়তে লাগল। তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই তাঁর কথায় আকৃষ্ট হতো আবালবৃদ্ধ সকলে।

নানক ছিলেন একেশ্বরবাদী। অপর কোন দেবদেবী তিনি স্বীকার করতেন না। তিনি বলতেন ভক্তি আর গুরুর কৃপাতেই মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।

একবার পরিব্রাজনে বেরিয়ে নানক এলেন আমিনাবাদে। সেখানকার দেওয়ান মালিক ভাগো ছিলেন অত্যন্ত অত্যাচারী। তার নিপীড়নে ও শোষণে সাধারণ মানুষ খুবই কষ্টের মধ্যে দিন কাটাত।

এখানে লালো নামে এক গরীব সূত্রধরের বাড়িতে উঠলেন নানক। লালো ছিলেন তাঁর শিষ্য।

মালিক ভাগো সাধুপুরুষ নানকের নাম আগেই শুনেছিলেন। তিনি নানককে আপ্যায়ন করবার জন্য বিরাট ভোজের আয়োজন করে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানালেন। নানক সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন।

এতে মালিক ভাগো ক্রুদ্ধ হলে নানক মালিকের স্বরূপ উদঘাটনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত খাদ্যবস্তু নিয়ে আসতে বললেন।

অনেক খরচপত্র করে বিরাট আয়োজন করেছিলেন মালিক ভাগো। তার আদেশে কর্মচারীরা পাত্র ভর্তি করে নানান খাদ্য এনে দিল। নানক একটি রুটি তুলে চাপ দিতেই তা থেকে ঝরে পড়তে লাগল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। এরপর তিনি ভক্ত লালোর কাছ থেকে আনা একখানা রুটি বার করে তা চাপ দিতেই ঝরে পড়তে লাগল দুধ।

নানক বললেন, তুমি লোভী ও নিষ্ঠুর। গরীব মানুষের রক্তঝরা ফসল দিয়ে আমার খাবার তৈরি করেছিলে। আর আমার শিষ্য দরিদ্র লালো তার সদ্য পরিশ্রমের অর্থ দিয়ে আমাকে সেবা করতে চেয়েছে, এই কারণেই তার তৈরি রুটি অতি পবিত্রতা থেকে দুধ ঝরে পড়েছে, আর তোমার রুটি থেকে পড়েছে গরীবমানুষের শরীরের রক্তের ফোঁটা।

এই ঘটনায় নানকের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে এবং নিজের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে ভাগো সকাতরে নানকের করুণা ভিক্ষা করলেন। নানক তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, কারো ওপরে অত্যাচার করো না, সৎ হও, পরিশ্রমী হও, তাহলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে।

সেই কালে সমাজ ছিল জাতিভেদ প্রথায় কলুষিত। ধর্মের নামে অধর্ম, স্বার্থপরতা, অনাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল। এক ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকে ঘৃণা করত। হিংসা আর দ্বেষ হয়ে উঠেছিল। সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষদের নিত্য সঙ্গী।

নানক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সমাজের এই কলুষ দূর করে মানুষে মানুষে গড়ে তুলতে হবে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক। সমাজের সেই বন্ধনের সূত্র করে তুলতে হবে ধর্মকে।

এরপর দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে নানক দেশে দেশে তাঁর ধর্মমত প্রচার করে বেড়িয়েছেন। মানুষকে সৎ ও ঈশ্বর বিশ্বাসী হবার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলতেন, ধনী দরিদ্র, উঁচু নীচু সব জাতের মানুষই এক পরম পিতার সন্তান। তাঁর চোখে সকলেই সমান।

যে মানুষ সৎ ও সরল বিশ্বাসী, সৎপথে জীবন যাপন করে কেবল সেই তাঁর কৃপালাভ করতে পারে।

ধর্মের নামে অনাবশ্যক আচার অনুষ্ঠান ও গোঁড়ামির নিন্দা করে তিনি বলতেন, কেবল অন্তরের ভক্তি আর বিশ্বাস দিয়েই ঈশ্বরকে লাভ করা যায় অন্য কিছুতে নয়।

একবার এক দুর্ধর্ষ ডাকাত, তার নাম সজ্জন, সে নানককে দেখতে পেয়ে সমাদর করে বাড়িতে নিয়ে এলো।

সজ্জন বাইরে ভালমানুষ সেজে থাকত। অচেনা মানুষ দেখলে আদর করে

তাদের বাড়িতে নিয়ে আসত, তারপর অনেক রাতে তার সর্বস্ব হরণ করে তাকে খুন করত। নানককেও একইভাবে হত্যা করা ছিল তার উদ্দেশ্য।

নানক ডাকাত সজ্জনের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাকে পাশে বসিয়ে গান গাইতে লাগলেন।

গানটির অর্থ ছিল এরকম, তীর্থক্ষেত্রে থাকে ভদ্র-দর্শন বক ও বাজপাখি। এরা জীবন্ত প্রাণী ধরে খায়। অথচ এদের দেখতে কত সুন্দর। কিন্তু অন্তরে এরা কত নিষ্ঠুর।

গানের মর্মকথা ডাকাত সজ্জনের মর্ম স্পর্শ করল। সে-ও তো ওই নিষ্ঠুর পাখিদের মতই হিংস্র হয়ে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে! অনুতাপে বেদনায় তার অন্তর কেঁদে ওঠে। সে অকপটে নিজের সমস্ত পাপ স্বীকার করে নানকের শরণ নিল।

দয়ালু নানক তাকে উপদেশ দিলেন, এতদিন পাপের পথে যে অর্থ উপার্জন করেছ, তা বিলিয়ে দাও গরীব দুঃখীদের মধ্যে। এবার থেকে সৎভাবে পরিশ্রম কর—আর ঈশ্বরের নাম গান কর।

সজ্জন তার যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। পরবর্তীকালে এই সজ্জনই ভারতে সর্বপ্রথম শিখদের গুরুদোয়ারা স্থাপন করেন।

ঘুরতে ঘুরতে নানক এলেন সৈয়দপুরে। সেই সময় পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদিকে পরাস্ত করে বাবর সসৈন্যে ভারতে প্রবেশ করেছেন। একের পর এক অঞ্চল দখল করে নিচ্ছে তার সৈন্যরা। চারদিকে বিশৃঙ্খলা, বাবরসৈন্যদের অত্যাচার আর ধ্বংসের তান্ডব। এই পরিস্থিতির মধ্যেই এগিয়ে চলেছেন নানক আর তাঁর নিত্যসঙ্গী মর্দানা।

সৈন্যরা শত্রুপক্ষের চর ভেবে দুজনকে কারাগারে বন্দি করল। নানক নির্বিকার। তিনি মুক্তপুরুষ, বাইরের মুক্ত পৃথিবী আর বন্দিনিবাস কারাগার তার কাছে কোন তফাৎ নেই।

সৈন্যরা নানককে যাঁতায় ডাল ভাঙ্গতে বসিয়ে দিয়েছিল। তিনি ভজনগান করতে করতে কাজ করে চললেন।

প্রহরীরা দেখল, নানক কেবল ডাল ঢেলে চলেছেন, যাঁতা আপনা থেকেই ঘুরছে। তারা এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে তখুনি খবর পাঠাল সেনাপতি মীর খানকে। তিনি এসে নানকের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলেন, তারা বড় ভুল করে ফেলেছেন। না জেনে একজন মহাপুরুষকে বন্দি করে রেখেছেন। তখুনি তিনি সসম্মানে মুক্তি দিলেন দুজনকে। এখানে প্রায় দু'মাসকাল বন্দি অবস্থায় থাকতে হয়েছিল নানককে।

মক্কা আর মদিনা হল মুসলমানদের দুই পবিত্র তীর্থস্থান। ঘুরতে ঘুরতে নানক এলেন মক্কায়। এই সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন দুজন মুসলিম সাধক। তাঁরা হলেন পীর সৈয়দ আহমদ হাসান ও পীর জালালুদ্দীন। নানকের সাধন ক্ষমতা দেখে এঁরা দুজনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

একদিন নানক মক্কার দিকে পা দিয়ে পথের পাশে শুয়েছিলেন। কয়েকজন মৌলবী তাঁকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, তুমি পা সরিয়ে শোও, জান না পশ্চিম দিকে আল্লাহ থাকেন।

নানক হেসে তাদের বললেন, ভাই, যেদিকে আল্লাহ থাকেন না, সেদিকে আমার পা ঘুরিয়ে দাও।

মৌলবী কয়জন নানকের পা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল। কিন্তু তারা দেখতে পেল, সেই দিকেও মক্কা। তারা বিস্মিত হয়ে দেখল, যেদিকে নানকের পা ঘোরায় সেই দিকেই মক্কা।

এই কান্ড দেখে হতবাক হয়ে গেল মৌলবীরা। নানক তখন বললেন, ভাই আল্লাহ কেবল মক্কাতেই থাকেন না, এই বিশ্বসংসার তাঁরই সৃষ্টি—এর সর্বত্রই তিনি রয়েছেন। যারা অজ্ঞান তারাই পুর্ব-পশ্চিমে ভেদাভেদ করে।

মক্কা ও মদিনা পর্যটনের পর নানক পবিত্র প্যালেস্টাইনেও গিয়েছিলেন। সবধর্মেই যে এক ঈশ্বরের কথাই ব্যক্ত হয়েছে, এই তীর্থপর্যটনের মাধ্যমে নানক তাই তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন।

নানক যখন যেখানে গেছেন. সেখানেই এক ঈশ্বরের কথা প্রচার করেছেন। সদুপদেশ দিয়ে মানুষকে ঈশ্বরীয় পথের সন্ধান দিয়েছেন। দীর্ঘ কুড়িবছর দেশে দেশে ঘুরেছেন নানক। যখন আবার দেশের পথ ধরলেন, তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বে উপনীত।

একদিন চলতে চলতে খুবই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। নির্জন এক প্রান্তর অতিক্রম করছিলেন শিষ্যদের নিয়ে। একজন শিষ্য গেলেন জল সংগ্রহ করতে। কিন্তু জল কোথাও পাওয়া গেল না।

তিনি ফিরে এসে জানালেন কাছেই গ্রামের পাশে একটা পুকুর আছে কিন্তু তাতে একফোঁটা জল নেই।

নানক তাকে বললেন, গুরুর নাম নিয়ে আবার সেখানে যাও, জল পাবে।

শিষ্যটি এবার সেখানে গিয়ে দেখল, শুষ্ক পুকুর জলে পরিপূর্ণ। অপূর্ব স্বাদ সেই জলের যেন অমৃত! দয়াময় গুরুরই এই লীলা বুঝতে পেরে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাঁর অন্তর পূর্ণ হল।

লোকে পরে এই পুকুরের নাম দিয়েছে অমৃতসর। সর মানে সরোবর। এই থেকেই অমৃতসর কথাটির উৎপত্তি।

শিখদের চতুর্থগুরু রামদাস ১৫৭৪ খ্রিঃ এখানেই একটি মন্দির স্থাপন করেন। আফগানরা এই মন্দির ধ্বংস করে ১৭৬২ খ্রিঃ। পরে ১৮০২ খ্রিঃ মহারাজা রঞ্জিৎ সিং ওই পুকুর সংস্কার করে স্বর্ণমন্দির স্থাপন করেন। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির শিখদের পবিত্র তীর্থস্থান।

নানক কর্তারপুর গ্রামে ফিরে এসে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করে এখান থেকেই তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার করতেন।

নানকের প্রচারিত ধর্মমত ছিল সহজ সরল ও অনাড়ম্বর। এর মধ্যে কোন গোঁড়ামি ছিল না। সকল ধর্মের মানুষই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল।

বয়স বেড়ে নানক বার্ধক্যে উপনীত হলেন। তিনি যে শিষ্যসমাজ গঠন করেছেন, তাঁর অবর্তমানে তাঁদের দায়িত্ব কার ওপরে দেবেন সে বিষয়ে চিন্তিত হলেন নানক।

তাঁর নিজের দুই পুত্র, শ্রী চাঁদ ও লক্ষ্মীদাস। শ্রীচাঁদ সাধু হয়ে সমাজ সংসার ছেড়ে সাধনভজন নিয়ে বনেই থাকেন। লক্ষ্মীদাস আবার ঘোরতর বিষয়ী—ঈশ্বর নয় অর্থই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। কাজেই এদের কারো ওপরেই ধর্মের বাণী প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া চলে না।

নানকের শিষ্যদের মধ্যে প্রধান যে কয়জন তাঁদের মধ্যে সকলেই ধর্মপরায়ন, ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং তাঁর প্রতি অনুগত। এক কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রধান শিষ্যদের মধ্য থেকেই গুরুগত প্রাণ লেহানাকে তিনি নির্বাচন করলেন।

নানক তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ঘোষণা করলেন, প্রিয় শিষ্য লেহানাই তাঁর অঙ্গ, তাঁর অবর্তমানে তিনিই ধর্মের বাণী প্রচারের অধিকার লাভ করবেন। নানক লেহনার নতুন নামকরণ করলেন অঙ্গদ। এইভাবেই গুরু নানকের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হলেন অঙ্গদ।

১৫৩৯ খ্রিঃ নানকের দেহাবসানের পরে এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিল।

উচ্চ কোটির সাধক পুরুষ নানক তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্ন পূর্ব থেকেই জানতে পেরেছিলেন। দিনক্ষণ তিনি শিষ্যদের জানিয়ে দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে শিষ্যরা দলে দলে এসে উপস্থিত হল গুরুর পদপ্রান্তে। সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত। নানক তাঁর হিন্দু শিষ্যদের বললেন, ফুল এনে তাঁর ডান পাশে রাখার জন্য। মুসলমান শিষ্যদের বললেন বাম পাশে রাখার কথা।

তারপর জানালেন, যাদের ফুল সতেজ থাকবে তারাই তাঁর দেহ সৎকারের অধিকার লাভ করবে। এরপর তিনি সকলকে প্রার্থনা ও নামগান শুরু করবার নির্দেশ দিলেন।

ভজন, নামগান ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে রাত কেটে গেল। ভোর হলে নতুন দিনের সূর্য উঠল।

শিষ্যরা সকলে দেখলেন তাঁদের পরমপ্রিয় গুরুর দেহ অদৃশ্য হয়েছে। সেখানে একাকার হয়ে রয়েছে রাশিরাশি তাজা ফুল। গুরুদেবের জয়ধ্বনি দিয়ে সেই প্রসাদী ফুলই সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শিষ্যরা গভীর শ্রদ্ধায় মাথায় তুলে নিলেন।

এই ভাবেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে মিলনের সেতু রচনা করে গেলেন গুরু নানক।

ঈশ্বর প্রেম ব্যক্ত হবার জন্য নানকের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল কবিত্বশক্তি। তিনি

অনেক ভজন রচনা করেছেন। আধ্যাত্মিক জগতের চিরকালীন সম্পদ এই ভজনগুলো জপজী নামক গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে।

নানক বলতেন, সৎ ও সাধুপুরুষেরা দেবতার চেয়েও বড়। কারণ সাধু মহাত্মারা কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। কিন্তু দেবতারা কামনা-বাসনার অধীন।

তিনি আরও বলতেন, গুরুর মধ্য দিয়েই মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। প্রকৃত সাধু ব্যক্তিই গুরু হওয়ার উপযুক্ত।

গুরু নানকের উপদেশ হল, পরনিন্দা না করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। নিজেকে যে জানে সে ঈশ্বরকে জানে। হিন্দু বা মুসলমান, এগুলো পরিচয় নয়। মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ।

শ্রীচৈতন্য



ভারত ইতিহাসের এক সংকটাপন্ন সময়ে পরিত্রাতা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য। তাই তাঁকে বলা হয় যুগাবতার। অর্থাৎ যুগের প্রয়োজনে অবতীর্ণ মহামানব।

সেই সময়ে ভারতের শাসন দন্ড মুসলমানদের হাতে। ইসলাম ছিল রাজধর্ম। এক ঈশ্বরের উপাসনা ও সরল উদার এক মতবাদ হল ইসলাম। এতে ছিল না জাতি বা বর্ণ নিয়ে ভেদাভেদ, ধনী দরিদ্রের পার্থক্য। শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র সকলেরই ছিল মসজিদে প্রবেশের অবাধ অধিকার। মক্তব বা মাদ্রাসায় সকলেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত।

এর পাশাপাশিই এদেশের হিন্দু সমাজ ছিল সংকীর্ণ গোঁড়ামিতে শতধাবিভক্ত। জাতিভেদ প্রথা ছিল এতই প্রবল যে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষদের ছিল না শিক্ষালাভ বা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার।

অস্পৃশ্য বলে সমাজের উচ্চবর্ণ ও তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নানা অত্যাচার উৎপীড়ন তাদের সইতে হত। ধর্মের ক্ষেত্রেও ছিল নানান সম্প্রদায়। আর সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ।

সমাজের এই নিষ্ঠুর নিপীড়নে অবহেলিত অবমানিত অস্পৃশ্য মানুষদের কাছে ইসলামের উদার মতবাদ স্বভাবতঃই নিরাপদ ও মর্যাদাকর মনে হয়েছিল। তারা কেউ স্বেচ্ছায়, কখনো সুলতানী সৈন্যদের অত্যাচারের ভয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

করতে লাগল। হিন্দুসমাজের এই অবক্ষয়ের যুগেই আবির্ভাব হয় শ্রীচৈতন্য দেবের।

নবদ্বীপের মায়াপুরে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৪৮৬ খ্রিঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী শ্রীচৈতন্যের জন্ম। তাঁর ছেলেবেলার নাম ছিল নিমাই। পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী।

নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ ষোল বছর বয়সেই সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি।

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কয়েক বছরের মধ্যেই জগন্নাথ মিশ্র মারা গেলেন। বালক নিমাইকে লালন পালনের সব দায়িত্ব চাপল শচী দেবীর ওপরে।

বাল্যকাল থেকেই নিমাই ছিলেন যেমনি মেধাবী তেমনি চঞ্চল। তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল গঙ্গাদাস পন্ডিতের চতুষ্পাঠীতে।

কয়েক বছরের মধ্যেই নিমাই নানা শাস্ত্রে সুপন্ডিত হয়ে উঠলেন। সেই সঙ্গে হলেন অত্যন্ত অহংকারী।

বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে নিজেই এবারে টোল খুললেন কিশোর নিমাই। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর পান্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে ছাত্র এসে ভর্তি হতে লাগল তাঁর টোলে।

কৈশোর বয়স উত্তীর্ণ হলে শচীদেবী পুত্রের বিবাহ দিলেন। নিমাইয়ের স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী দেবী।

সেই সময়ে নবদ্বীপের পন্ডিতদের খ্যাতি ছিল ভারতজোড়া। কেশব ভারতী নামে এক মহাপন্ডিত এলেন নবদ্বীপে। তিনি তর্কযুদ্ধে দেশের অন্যান্য পন্ডিতদের পরাস্ত করেছেন। এবারে লক্ষ নবদ্বীপের পন্ডিতমন্ডলী, তাহলে ভারতবিজয় সম্পূর্ণ হয়।

কেশব ভারতীর নামডাক শুনে নবদ্বীপের পন্ডিতবর্গ তো তটস্থ। কেবল নিমাই তাঁর সঙ্গে বিচারে অবতীর্ণ হলেন। কেশব মুখে মুখে গঙ্গার স্তব রচনা করলেন। তা শুনে সকলেই মুগ্ধ। কিন্তু নিমাই তাঁর শ্লোকে নানা প্রকার অশুদ্ধি নির্ণয় করে বিদেশী পন্ডিতকে পরাস্ত করলেন। এর ফলে নিমাইয়ের পান্ডিত্যের খ্যাতি আরও বাড়ল।

এরপরে নিমাই কিছুদিনের জন্য পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গেলেন। সেই সময় নবদ্বীপে ঘটল এক দুর্ঘটনা।

সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবী মারা গেলেন। ফিরে এসে এই সংবাদ পেয়ে নিমাই শোকে দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন।

কিছুদিন পরে শচীদেবী নিমাইয়ের আবার বিবাহ দিলেন। এবারে মিশ্রপরিবারে গৃহলক্ষ্মী হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

বিবাহের অল্পকাল পরে নিমাই স্বর্গত পিতার পিন্ডদান করতে গেলেন গয়া ধামে। সেখানে বিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শনের পর তাঁর মধ্যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা

দিল। তাঁর মধ্যে জন্ম হল কৃষ্ণ অনুরাগী এক প্রেমিক সাধকের। অহঙ্কারী পন্ডিত নিমাই হলেন কৃষ্ণসাধক।

নবদ্বীপে ফিরে এলে সকলেই নিমাইয়ের পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হল। কৃষ্ণনাম করতে করতে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায় তাঁর। কখনো টোলের ছাত্রদের নিয়ে নামসংকীর্তনে মেতে ওঠেন। সদা বিনয় নম্র শান্তভাব। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া উদ্বেগে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

সেকালে নবদ্বীপে বৈষ্ণব সমাজের প্রধান ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় মূর্তি বৃদ্ধ আচার্য ভাবোন্মত্ত নিমাইকে দেখেই চিনতে পারলেন। এ যে মানব দেহধারী তাঁরই আরাধ্য দেবতা।

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তিনি নিমাইকে বরণ করলেন। নিমাই হয়ে উঠলেন নবদ্বীপ বৈষ্ণব সমাজের প্রধান পুরুষ।

এবার থেকে হরিনাম গানে মুখর হয়ে উঠল কেবল অদ্বৈত প্রভুর গৃহাঙ্গনই নয়, নবদ্বীপের আকাশ বাতাস।

সাধারণ মানুষের মধ্যেও জাগল নামের জোয়ার। তাঁরাও জাতিবর্ণের বিভেদ ভুলে সংকীর্তনে যোগ দিলেন।

নিমাইয়ের মানব প্রেমই ছিল এই কীর্তনানন্দের প্রধান আকর্ষণ। তিনি সমাজের উচ্চনীচ সকলকেই সমান জ্ঞান করতেন—সকলের মধ্যেই তাঁর আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতেন। তাই অস্পৃশ্যতা ভেদাভেদ কিছুই তিনি মানলেন না। প্রেমানন্দে সকলকে বুকে টেনে নিলেন।

সমাজের অস্পৃশ্য অবহেলিত মানুষদের মধ্যে এবারে যেন নতুন জোয়ার জেগে উঠল। ব্রাহ্মণ আর উচ্চবর্ণের মানুষদের কেবল ঘৃণাই যারা এতদিন পেয়ে এসেছে, মানুষ হিসাবে তারাও যে কারু চেয়ে ছোট নয়, নিমাইয়ের উদার ধর্মমত সেকথাই তাদের জানিয়ে দিল।

কিছুদিনের মধ্যেই নিমাই অনুরাগী বিরাট এক ভক্তমন্ডলী গড়ে উঠল নবদ্বীপে। তাদের মধ্যে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন অদ্বৈত আচার্য সহ শ্রীবাস, মুরারী, গদাধর ও যবন হরিদাস।

নগর কীর্তনের খোল করতালের শব্দে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস যখন মুখর হয়ে উঠেছে সেই সময়ে নবদ্বীপে উপস্থিত হলেন এক তরুণ অবধূত। তাঁর নাম নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দের জন্ম রাঢ় অঞ্চলের একচাকা গ্রামে। পিতার নাম হাড়াই ওঝা, মায়ের নাম পদ্মাবতী। এঁরা ছিলের রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বৃন্দাবন থেকে নানাস্থান ভ্রমণ করতে করতে তিনি উপস্থিত হয়েছেন নবদ্বীপে।

নিমাইকে দেখেই আকৃষ্ট হলেন তিনি। নিত্যানন্দ হলেন নিতাইয়ের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের প্রধান।

আচার্য শ্রীবাসের অঙ্গনেই প্রতিদিন সমবেত হয়ে ভক্তরা নামগান করেন। নিতাই এবারে স্থির করেন এই প্রেমময় কৃষ্ণনাম ছড়িয়ে দিতে হবে আচন্ডালে। তিনি যবনভক্ত হরিদাস আর নিত্যানন্দের ওপরে দিলেন নগরকীর্তনের ভার।

নিত্যানন্দ হিন্দু ব্রাহ্মণ আর হরিদাস মুসলমান। তাঁদের ওপরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে নিমাই তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে এভাবেই জানালেন তীব্র প্রতিবাদ।

বৈষ্ণবরা নগরের পথে পথে ঘুরে কীর্তন করেন। কেউ দু'বাহু তুলে হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন তাঁদের সঙ্গে।

আবার কেউ দূরে দাঁড়িয়ে উপহাস করে, নিমাইয়ের ঔদ্ধত্যে সমাজের আশু সর্বনাশের কথা ভেবে শঙ্কিত হয়।

সমাজপতিরা এবারে নিমাইকে জব্দ করবার মতলব আঁটে। জগাই মাধাই দুই নগর কোটাল; এদের তারা নিমাইয়ের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে তোলে।

পাপাচারী ব্রাহ্মণ সন্তান জগাই মাধাই একদিন নিমাইয়ের কীর্তন দলে হামলা চালাল। মাধাই কলসীর ভাঙ্গা টুকরো ছুঁড়ে নিত্যানন্দের মাথায় আঘাত করল। অঝোরে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এই আঘাত অগ্রাহ্য করেও নিত্যানন্দ দুই অত্যাচারীকে হরিনাম করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন—

মেরেছ কলসীর কানা
তাই বলে কি প্রেম দেব না।

রক্তাক্ত নিত্যানন্দকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন নিমাই। সকাতর অনুনয়ে তাঁর ক্রোধ শান্ত করেন নিত্যানন্দ।

এই দৃশ্য দেখে অনুতাপে লজ্জায় মাথা নত হয় জগাই মাধাইয়ের। তাঁরাও মুখে হরিনাম নিয়ে নিমাইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জয় ঘোষিত হয় প্রেমধর্মের। উদ্ধার হয় অত্যাচারী জগাই মাধাই।

এই ঘটনার পর থেকে চতুর্দিকে সমবেত কীর্তন আর নামগানের জোয়ার বইতে থাকে। নবদ্বীপ হয়ে ওঠে নববৃন্দাবন।

সেই সময়ে বাংলার সুলতান ছিলেন হোসেন শাহ। তাঁর অধীনে চাঁদ কাজী শাসন করতেন নবদ্বীপ। তিনি ছিলেন প্রবল হিন্দু বিদ্বেষী।

বৈষ্ণবদের দলবদ্ধ হয়ে নগরসংকীর্তন করা বন্ধ করবার জন্য তিনি হুকুম জারি করলেন।

ভক্তমন্ডলী বিচলিত হলেও নিমাই সকলকে নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায়ই নগর কীর্তন নিয়ে পথে বার হলেন। সেদিন কেবল বৈষ্ণবরাই নয়, দলে দলে সাধারণ মানুষও কীর্তনের দলে যোগ দিল।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন নিমাই। তাই তাঁর আহ্বান সাড়া জাগিয়েছিল সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের অন্তরে। ফলে সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর কীর্তনের দল পরিণত হল এক বিপুল জনস্রোতে।

মেঘের গর্জনের মত কীর্তনের ধ্বনি শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন চাঁদ কাজী। তাঁর প্রাসাদরক্ষীরাও প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। প্রাসাদের বাইরে এসে আত্মসম্পর্ণ করলেন কাজী সাহেব।

নিমাইয়ের মধুর সম্বোধন ও তাঁর আন্তরিক ব্যবহার পেয়ে মুগ্ধ হলেন চাঁদ কাজী। স্বেচ্ছায় সংকীর্তনের ওপর থেকে বাধানিষেধ তুলে নিলেন তিনি।

এখানেও প্রেমের অমোঘ শক্তির বলেই নিমাই সেদিন অবাধ ধর্মাচরণের স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন। গয়াধাম থেকে ফিরে আসার এক বছরের মধ্যেই ঘটল এসব ঘটনা।

সকল মানুষের দুঃখ বেদনা ভেদাভেদ ও লাঞ্ছনা দূর করবার জন্যই আবির্ভাব হয়েছিল নিমাইয়ের। তাই কেবল নবদ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না তাঁর কর্মপ্রবাহ।

তিনি এবারে বৃহৎ জগতের কল্যাণের লক্ষে নিজেকে উৎসর্গ করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি সন্ন্যাস নেবার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

নিমাইয়ের সংকল্পের কথা কেবল জানতে পারলেন নিত্যানন্দ প্রমুখ কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ।

১৫১০ খ্রিঃ ২৬শে মাঘ গভীর রাতে জননী ও স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার গভীর নিদ্রার মধ্যে গৃহত্যাগ করলেন নিমাই। গঙ্গা পার হয়ে গিয়ে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তাঁর নতুন নাম হল শ্রীচৈতন্য।

এরপর অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে নীলাচলে রওনা হবার সঙ্কল্প নিলেন তিনি। তাঁর বিরহে ভক্তরা কাতর হয়ে পড়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করে সকলকে দর্শন দিলেন। জননী শচীদেবীও এসে পুত্রের সঙ্গে দেখা করে গেলেন।

নীলাচলে প্রভু জগন্নাথের দর্শন লাভের জন্য উড়িষ্যায় রওনা হলেন শ্রীচৈতন্য। তাঁর সঙ্গী হলেন কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্য।

সমস্ত পথ ভাবে বিভোর অবস্থায় কাটল। জগন্নাথ দর্শনের জন্য তাঁর মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

উড়িষ্যায় পৌঁছে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেই ভাব বিহ্বল চৈতন্যদেব চেতনা হারিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন।

সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের গুরুদেব মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম।

দিব্য ভাবে উদ্ভাসিত শ্রীচৈতন্যের প্রেমবিহ্বল অবস্থা দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের গৃহে।

বাসুদেব সার্বভৌম ছিলেন বেদান্তবাদী পন্ডিত। কেবল উৎকল নয়, ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিভাব তাঁর ভাল লাগে না। জ্ঞানের পথে ভাবিত করবার জন্য তিনি শ্রীচৈতন্যের কাছে প্রতিদিন বেদান্তের ব্যাখ্যা করতে থাকেন।

সাতদিন কোন কথা না বলে শ্রীচৈতন্য সার্বভৌমের ব্যাখ্যা শুনে গেলেন। পরে তাঁর ভুল-ত্রুটিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিলেন। পান্ডিত্যের অহমিকা চূর্ণবিচূর্ণ হল সার্বভৌমের।

তিনি বুঝতে পারলেন শ্রীচৈতন্যের অসাধারণত্ব। তাঁরই পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করলেন তিনি।

সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য মাত্র ২৪ বছরের এক তরুণ। তাঁর কাছে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পন্ডিতের আত্মসর্ম্পনের সংবাদে পন্ডিত সমাজে বিস্ময়ের সঞ্চার হল।

শ্রীচৈতন্যের ঐশীশক্তি সম্বন্ধে কারোরই আর দ্বিধা রইল না। শ্রীচৈতন্যের প্রেম ধর্মের আকর্ষণে মাতোয়ারা হল নীলাচলের মানুষ।

কিছুকাল উড়িষ্যা বাসের পর শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভারতের তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন। এবারে তিনি নিঃসঙ্গ—নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে হরিনাম হল একামাত্র সঙ্গী। পথে যেতে যেতে নগরে গ্রামে সর্বত্র ভাববিহ্বল শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণনাম বিতরণ করলেন।

তাঁর প্রচারিত প্রেমধর্মের স্পর্শে পরিবর্তন ঘটে কত পাপীতাপীর জীবনে, দস্যু তস্কর প্রভৃতির জীবনে আসে নতুন জীবনের স্পর্শ।

দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বর, ত্রিবাঙ্কুর, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র প্রভৃতি একের পর এক তীর্থ দর্শন করেন শ্রীচৈতন্য। তাঁর আবির্ভাবে প্রেমধর্মের জোয়ারে ভেসে যায় দক্ষিণ ভারত।

দুবছর পরে আবার নীলাচলে ফিরে আসেন শ্রীচৈতন্য। ব্যাকুল শিষ্যরা তাঁদের ধ্যানের দেবতাকে ফিরে পেয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। কৃষ্ণনামগানে মুখর হয়ে ওঠে নীলাচলের পথঘাট।

বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার আত্মিক যোগ থাকলেও শ্রীচৈতন্য উপলব্ধি করলেন, তাঁর অবর্তমানে বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য একজন উপযুক্ত মানুষের দরকার।

তাঁর সঙ্গে যে ভক্তশিষ্যরা পরবাসে এসেছিলেন তাঁদের মনও নবদ্বীপে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে আদেশ করলেন, তিনি যেন সংসারী হয়ে বাংলার গৃহী মানুষদের মধ্যে গিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন।

বয়সে নিত্যানন্দ ছিলেনশ্রীচৈতন্যের চেয়ে আট বছরের বড়। এতদিন ছিলেন

ব্রহ্মচারী ও অবধূত। শ্রীচৈতন্যের আদেশ পেয়ে তিনি বাংলায় ফিরে এসে বিবাহ করলেন।

তাঁর স্ত্রীর নাম জাহ্নবীদেবী। তিনিও ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ও ধার্মিক। পরবর্তীকালে বহু ভক্ত তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হন।

নীলাচলে চলে আসার পর থেকে প্রতিবছর শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করবার জন্য নবদ্বীপ থেকে ভক্তরা আসতেন। তাদের কাছেই শচীদেবী পুত্রের সংবাদ পেয়ে অশান্তমনকে শান্ত করবার চেষ্টা করতেন।

শ্রীচৈতন্যকে দেখার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মায়ের অন্তরের টানেই শ্রীচৈতন্য নীলাচল ত্যাগ করে নবদ্বীপের পথে রওনা হলেন। সেই দিনটা ছিল বিজয়া দশমী, ১৫১৪ খ্রিঃ।

শিষ্যদের সঙ্গে নামগান করতে করতে কাটোয়ায় এসে পৌঁছালেন শ্রীচৈতন্য। সেখান থেকে এলেন কুমারহট্ট গ্রামে শ্রীবাসের গৃহে। তারপর শান্তিপুর হয়ে পৌঁছলেন নবদ্বীপে।

শ্রীচৈতন্যের আগমনে যেন উৎসব শুরু হয়ে গেল চারদিকে। সেই সময়ে স্থানীয় মুসলমান শাসকরাও যোগদান করেছিলেন সেই আনন্দ উৎসবে।

শচীমাতা এলেন পুত্রকে দেখতে। বিষ্ণুপ্রিয়ার আসায় বাধা ছিল। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীমুখ দর্শন নিষিদ্ধ। কিন্তু স্বামীকে দর্শনের ব্যাকুলতায় কোন বাধানিষেধ মানলেন না বিষ্ণুপ্রিয়া।

শ্রীচৈতন্যের কাছে এসে প্রণাম করলেন তিনি। তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া হও· —এই বলে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন শ্রীচৈতন্য।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিজের পাদুকা দান করলেন শ্রীচৈতন্য। আজীবন এই পাদুকার সেবাপূজাতেই জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তার মধ্যেই তিনি তাঁর অন্তরের আরাধ্য দেবতার উপস্থিতি অনুভব করতেন।

বাংলার সমাজ জীবনে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম এক নব জাগরণের সৃষ্টি করেছিল। সমাজের অগণিত মানুষ যখন উচ্চবর্ণের অত্যাচারে অপমানে অতিষ্ঠ হয়ে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করছিল, ভাঙ্গন ধরেছিল হিন্দু সমাজে। বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্য। এই জাতীয় অবক্ষয় রোধ করেছিলেন শ্রীচৈতন্য। সেই কারণেই তাঁর আবির্ভাব বাঙ্গালী জাতির তথা বাংলার ইতিহাসের এক বিশিষ্ট ঘটনা।

আট মাসকাল নবদ্বীপে ছিলেন শ্রীচৈতন্য। তারপর ফিরে এলেন পুরীতে। দুমাস পরেই রওনা হলেন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবন, প্রয়াগ ও কাশীতে রইলেন আট মাস। সেখান থেকে ফিরে বাংলায় রইলেন দুই মাস। এভাবে পরিব্রাজন ও তীর্থদর্শন সম্পূর্ণ করে ১৫১৬ খ্রিঃ মে মাসে ফিরে এলেন পুরীতে। অবশিষ্ট জীবন তিনি পুরী থেকে আর কোথাও যাননি।

১৫১০ খ্রিঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী প্রথমবার জগন্নাথ দর্শনের পর থেকে জীবনের বাকি চব্বিশ বছর পুরীধামই ছিল শ্রীচৈতন্যের স্থায়ী ঠিকানা।

শ্রীচৈতন্যের উপস্থিতির ফলে সেদিনের ওড়িশা হয়ে উঠেছিল মানুষের এক মিলনতীর্থ। সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে ভক্তরা আসতেন তাঁকে দর্শন করতে।

জগন্নাথ মূর্তি দর্শনের জন্যও যুগ যুগ ধরে তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় ওড়িশায়। সকল তীর্থযাত্রী পুরীর মন্দিরের অচল জগন্নাথের সঙ্গে সচল জগন্নাথ শ্রীচৈতন্যকেও দর্শন করে ধন্য হতেন। ঈশ্বরের মহিমান্বিত রূপ তাঁর মধ্যেই সকলে প্রত্যক্ষ করতেন।

শ্রীচৈতন্য প্রতিদিন একবার করে যেতেন জগন্নাথ দর্শনে। নিত্য দর্শনের সময় তিনি দাঁড়াতেন জগন্নাথ মন্দিরের সামনে গরুড় স্তম্ভের পাশে। তিনি গরুড় স্তম্ভে হাত রেখে দাঁড়াতেন। তাঁর আঙুলের ছাপ এখনও এই স্তম্ভের গায়ে লেগে রয়েছে বলা হয়। এখানে দাঁড়িয়ে বিভোর হয়ে তিনি জগন্নাথদেবকে দেখতেন।

রথযাত্রার সময় রথের আগে শ্রীচৈতন্য তাঁর ভক্ত পরিকরদের নিয়ে নাচতেন ও গাইতেন।

প্রথম যেদিন তিনি পুরীতে আসেন, সেদিন ছিলেন ঈশ্বর প্রেমে অর্ধোন্মাদ। এখানে বাস করতে করতে তিনি প্রায় পাগলই হয়ে গেলেন।

দাক্ষিণাত্য বাংলা বৃন্দাবন ইত্যাদি জায়গা ঘুরে আসার পর তিনি একটানা আঠারো বছর পুরীতে কাটিয়েছিলেন। সেই আঠারো বছরের শেষ বারো বছর ছিল তাঁর উন্মাদের জীবন।

ভগবানের জন্য ভক্তের ভালবাসা ও অনুরাগ কত গভীর হওয়া সম্ভব শ্রীচৈতন্যের জীবন ছিল তার দৃষ্টান্ত। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন চিন্তা তাঁর মধ্যে ছিল না। ঈশ্বরের নামে তিনি জগৎ ভুলে গিয়েছিলেন, নিজের দেহবোধও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

কখনো চেতনাহীন অবস্থায় ছুটে যেতেন সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের নীল জল দেখে মনে করতেন, ওই তো কৃষ্ণ। তিনি পড়ে থাকতেন সমুদ্রের তীরে। সমুদ্রে ঝাঁপও দিয়েছিলেন তিনি।

শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের তারিখ ১৫৩৩ খ্রিঃ ২৯শে জুন। সেদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে তিনি ভাববিহ্বল অবস্থায় গরুড়ধ্বজের কাছ থেকে সরে গিয়ে মন্দিরের মূল গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন।

সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যখন রাত্রির নবম প্রহরে মন্দিরের দরজা খোলা হয়, দেখা যায় শ্রীচৈতন্য মন্দিরে নেই। প্রচার করা হল শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের সাথে লীন হয়ে গেছেন।

শ্রীচৈতন্যের এই অন্তর্ধান কিছু সংখ্যক ভক্ত মেনে নিলেও সকলে মেনে নেননি। পরবর্তীকালে বহু ঐতিহাসিক ও শ্রীচৈতন্যভক্ত তথ্যানুসন্ধানীর চেষ্টায় প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

জগন্নাথ মন্দিরে যেসব পূজারীর হাতে আজ পূজার ডালি সাজিয়ে জীবন সার্থক মনে করেন পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীরা, সেদিন এই পূজারীর দলই শ্রীচৈতন্যকে মন্দিরের মধ্যে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। তাঁর দেহটি পর্যন্ত গোপন পথে অজ্ঞাত স্থানে স্থানান্তরিত করে দেয় তারা।

জাতিবর্ণ ধর্ম নির্বিশেষ সকল মানুষের মধ্যে প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন শ্রীচৈতন্য। এর বাইরে তিনি অন্য কোন ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেননি। কোন ধর্মগ্রন্থও রচনা করেন নি। মানবীয় চেতনার পূর্ণবিকশিত রূপবিগ্রহ ছিলেন তিনি। মানুষে মানুষে বিভেদ মুছে দেবার ব্রতই ছিল তাঁর জীবনসাধনা। সন্ন্যাসী হলেও তিনি আত্মমুক্তিকামী বা মানবতা বিমুখী ছিলেন না। সেই আকর্ষণেই হাজার হাজার মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসত, লাভ করত জীবনের আলো।

স্বামী বিবেকানন্দ



স্বামী বিবেকানন্দ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কেবল এটুকুই তাঁর পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন জাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তির সাধক। ঈশ্বর প্রেম ছিল তাঁর কাছে মানব প্রেম ও স্বদেশ প্রেমের নামান্তর। এক কথায় মানুষই ছিল তাঁর আরাধ্য দেবতা। আর এই মানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

এই কারণেই তিনি ভারতের এক যুগন্ধর পুরুষ। আর জগতের সকল মানুষের কাছেই এক আদর্শ মহামানব। সর্বযুগে সর্বদেশে বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা তাই হয়ে থাকবে চির আধুনিক।

উনবিংশ শতক হল বাংলার নবজাগরণের যুগ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে—শিক্ষা সাহিত্য ধর্ম সংস্কৃতিতে উঠেছে পরিবর্তনের ঢেউ। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই সমাজে ঘটিয়ে চলেছেন আধুনিকতার আলোক-সম্পাত।

এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

১৮৬৩ খ্রিঃ ১২ই জানুয়ারি কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে এক শিক্ষিত ধনী

পরিবারে বিবেকানন্দের জন্ম। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কলকাতার নামকরা আইনজীবী। মা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন দয়ালু ধর্মপ্রাণ মহিলা।

বিবেকানন্দ ছিলেন পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর ডাক নাম বিলে, পোশাকী নাম নরেন্দ্রনাথ।

ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অসম্ভব সাহসী আর কৌতূহলী। সব কিছুই তাঁর যাচাই করে দেখার অভ্যাস। মায়ের দয়া, মমতা আর পিতার উদারতা তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে।

বাড়ির শিক্ষা শেষ হলে নরেনকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় মেট্রোপলিটন ইনসটিটিউটে। স্বভাব-চঞ্চল হলেও পড়াশুনায় তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। ফলে স্কুলে সব বিষয়েই তিনি ছিলেন সবার সেরা ছাত্র। খেলাধুলা এবং শরীরচর্চাতেও তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল।

ছেলেবেলা থেকেই শরীর চর্চা করতেন, কুস্তি বক্সিং ও ক্রিকেট খেলায়ও ছিল সমান দক্ষতা। সুঠাম দেহের অধিকারী নরেন্দ্রনাথের উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

১৮৯৭ খ্রিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নরেন্দ্রনাথ জেনারেল এসেম্বলী ইনসটিটিউশনে এফ. এ. ক্লাশে ভর্তি হন। এই কলেজের অধ্যক্ষ কবি দার্শনিক হেস্টির সান্নিধ্যে এসে তিনি বিভিন্ন দেশের দর্শন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

সেই সময়ে সমাজের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে ব্রাহ্মসমাজ। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেও তাঁদের অতিরিক্ত ভাবাবেগ এবং মানুষকে ঈশ্বরের অবতার সাজিয়ে পূজা করা তিনি পছন্দ করতেন না। তবে আহারে পোশাকে, আচারে ব্যবহারে ব্রাহ্মদেরই অনুসরণ করতেন তিনি। ব্রাহ্মদের সংস্পর্শে এসে নিয়মিত ধ্যান করাও অভ্যাস করেছিলেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন অনুশীলনের ফলে সত্যকে জানবার প্রবল ব্যাকুলতা জন্মেছিল নরেন্দ্রনাথের মধ্যে। ঈশ্বর কে? জীবন কি? এইসব প্রশ্ন তাঁর অন্তরে প্রতিনিয়ত আলোড়ন তুলত। অনেক সাধু সন্ন্যাসী পন্ডিত ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা রেখেও কোন সদুত্তর পাননি তিনি।

১৮৮০ খ্রিঃ ঘটনা। সিমলা পল্লীতে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে প্রথম ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তরুণ নরেন্দ্রনাথের। নরেনের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ঠাকুর তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার আমন্ত্রণ জানান। অবশ্য এফ. এ পরীক্ষার ব্যস্ততার জন্য নরেন সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি।

পরীক্ষার পরে নরেনের সামনে উপস্থিত হল এক কঠিন পরীক্ষা। বিশ্বনাথ দত্ত স্থির করলেন পুত্রের বিবাহ দেবেন। কিন্তু সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হবার কোন ইচ্ছাই

নরেনের ছিল না। তিনি সরাসরি তাঁর অভিমত অভিভাবকদের জানিয়ে দিতে বিলম্ব করলেন না।

এই সময় একদিন তিনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে। তিনি শুনেছিলেন ঠাকুরের কাছে গেলেই তিনি সত্যের সন্ধান জানতে পারবেন।

রামকৃষ্ণের সরল ব্যবহার, আন্তরিক কথাবার্তা এবং ভাববিহ্বলতা দেখে মুগ্ধ হলেন নরেন। ঠাকুরও তাঁকে দেখামাত্র তাঁর সুপ্ত প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক শক্তির সন্ধান পেলেন। নরেনকে তিনি যথার্থ ত্যাগী বলে সম্বোধন করলেন।

নরেনের যুক্তিবাদী মন যথাযথ পরীক্ষা না করে কোন কিছুকে মানতে রাজি ছিল না। তাই ঠাকুরকে তিনি আদর্শ পুরুষ হিসেবে প্রথমে মেনে নিতে পারেন নি।

তবু ঠাকুরের মধুর ব্যবহারের আকর্ষণে নরেন বারবার দক্ষিণেশ্বরে ছুটে যেতেন। ঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন, কখনো অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁকে গানও শোনাতেন। তাঁর অন্তরে থাকত ব্যাকুল ঈশ্বর জিজ্ঞাসা।

একদিন নরেনের জিজ্ঞাসার উত্তরে ঠাকুর সহজ সরলভাবে উত্তর দিলেন, ঈশ্বরকে তিনি দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, নরেনকেও তিনি ঈশ্বর দর্শন করাতে পারেন।

নরেন ঠাকুরের আন্তরিক কথাগুলিকে অবশ্য ভাবাবেগের উক্তি বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তাঁর সংশয় দূর হতে চায় না।

একদিন ঠাকুর নরেনকে স্পর্শ করলেন। সেই ক্ষণিকের স্পর্শ মাত্রই নরেনের অন্তর্জগতে যেন এক আলোড়ন সৃষ্টি হল। অর্ধচেতন অবস্থায় উপলব্ধি করলেন তিনি যেন এক অসীম অনন্তলোকে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন।

আতঙ্কে তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, ওগো, তুমি আমার একী করলে, আমার যে বাবা আছেন, মা আছেন—

পুনরায় স্পর্শ করে ঠাকুর নরেনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। সুস্থ হয়ে নরেন ভাবলেন, ঠাকুর এক মস্ত যাদুকর, সম্মোহন করে তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন।

এরপর থেকে যখনই তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, সর্বদা সতর্ক থাকতেন যাতে ঠাকুর তাঁকে সম্মোহিত করতে না পারেন।

এদিকে বি.এ পরীক্ষা দেবার কিছুদিন পরেই নরেনের পিতার মৃত্যু হল। বিশ্বনাথ দত্ত ওকালতি ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন কিন্তু মৃত্যুকালে সংসারের জন্য কোন সঞ্চয়ই রেখে যেতে পারেন নি। ফলে সংসারে নেমে এল বিপর্যয়। এই অবস্থায় সদ্যবিধবা জননীর অসহায় অবস্থা, ছোট ভাইবোনদের দুঃখ ভরা মুখ দেখে নরেনের অন্তর বেদনায় ভরে উঠত। এই দুঃসময়ে সংসারের অকৃতজ্ঞ মানুষের এক কদর্য রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করলেন।

শিশু সন্তানদের মুখে অন্ন যোগাবার জন্য মায়ের পরিশ্রম ও কষ্ট দেখে নরেন আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনিও পথে নামলেন চাকরির সন্ধানে। এর মধ্যেই তিনি যেতেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর অন্তরের বেদনা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ঠাকুর। তাঁর একটা কাজের সংস্থান করে দেবার জন্য নানাজনকে তিনি বলতে লাগলেন।

ঠাকুরের আশীর্বাদে ও নরেনের চেষ্টায় কিছুদিনের মধ্যেই এটর্নি অফিসে নরেনের একটা চাকরি জুটল। কিছুদিন পরেই তিনি বিদ্যাসাগর মশায়ের মেট্রোপলিটন স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেলেন।

কিন্তু যাঁর কর্মক্ষেত্র বিশ্বমানবের কর্মশালায় সামান্য শিক্ষকতার চাকরি কিংবা সংসার বা অর্থ ইত্যাদির বন্ধনে তিনি আবদ্ধ থাকেন কি করে?

ঠাকুরের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃই দুর্নিবার হয়ে উঠছিল। ঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গ পাবার আশায় তিনি ব্যাকুল হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসতেন। ঠাকুরও কথায় কথায় নির্দেশ করতেন বিশ্বমানবের দুঃখ মোচনের জন্যই নরেনের আবির্ভাব হয়েছে—তিনি স্বর্গের সপ্ত ঋষির এক ঋষি।

ইতিমধ্যে ১৮৮৫ খ্রিঃ ঠাকুরের গলায় ক্যানসার রোগ ধরা পড়ল। নরেনের উদ্যোগে ভক্তরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলো কাশীপুরে একটি ভাড়া বাড়িতে। কাশীপুর উদ্যানবাটী নামে যা পরে তীর্থমর্যাদা লাভ করেছে। ঠাকুরের সেবাযত্নের জন্য রইলেন রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, লাটু প্রমুখ ভক্তরা। চাকরি ছেড়ে দিয়ে নরেন এসে মিলিত হলেন ওঁদের সঙ্গে—চিরদিনের মতো আশ্রয় নিলেন ঠাকুরের শ্রীচরণে।

গুরুসেবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলত সাধন ভজন ধ্যান ও শাস্ত্রচর্চা। ঠাকুরকে ঘিরে উদ্যানবাটী হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ ভক্ত-শিষ্যদের আশ্রম। উত্তরকালে যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গঠিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এখানেই তার সূচনা হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ তাঁর আদর্শ ও উপদেশ জগতে প্রচারের জন্য শিষ্যদের মধ্যে আঠারোজনকে সন্ন্যাস প্রদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নরেন ছিলেন অন্যতম। ঠাকুর তাঁকেই সবচেয়ে ভালবাসতেন।

১৮৮৬ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট রামকৃষ্ণ মহাসমাধি লাভ করলেন। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি নরেনকে সমর্পণ করে গিয়েছিলেন যাতে তিনি তাঁর আরব্ধ কর্ম সম্পাদান করতে পারেন।

নরেন গুরুর উদার ধর্মভাবনা, সর্বজীবের প্রতি সেবা, সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শকে আত্মস্থ করেছিলেন। ঠাকুরের দেহাবসানের পর এবারে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল বৃহত্তর ভারতের দিকে।

ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যদের থাকবার জন্য এবারে উদ্যানবাটী ছেড়ে দিয়ে বরানগরে একটি বাড়ি ঠিক করা হল। সেখানেই আশ্রয় নিলেন সকলে। ঠাকুরের অবর্তমানে নরেনই হয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী সংঘের প্রধান। তাঁরই পরিচালনায়, সকল

দুঃখ কষ্টকে জয় করে সাধনা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা বলে সকলেই হয়ে উঠেছিলেন রামকৃষ্ণের আদর্শ শিষ্য।

কাশীপুর এবং বরানগরের আশ্রমজীবন ছিল শক্তি সংগ্রহের কাল। কিছুদিন গুরুর সান্নিধ্যে এবং নিয়মিত ধ্যান তপস্যা, শাস্ত্রপাঠ, আলোচনার মাধ্যমে সন্ন্যাসী ভক্তরা সেই শক্তিই সংগ্রহ করলেন।

এরপর একদিন নরেন তাঁর সতীর্থদের পরামর্শ দিলেন, এবারে ঠাকুরের আদর্শ প্রচারে নামতে হবে—ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে গিয়ে ঠাকুরের কথা শোনাতে হবে।

বহুযুগ সঞ্চিত কুসংস্কার ও কুশিক্ষা দূর করে সকলকে আলোকের সন্ধান দিতে হবে।

১৮৮৮ খ্রিঃ নরেন ভারত পরিক্রমায় বহির্গত হলেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তিনি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন। দেশজুড়ে অশিক্ষা. দারিদ্র্য, আর ধর্মের নামে অধর্মের প্রসার প্রতিপত্তি দেখে তিনি বিচলিত ও মর্মাহত হলেন।

পরিব্রাজক জীবনে ভারতের সামগ্রিক পরিচয় যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ তেমনি নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেও ধীরে ধীরে অহংমুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অন্তর থেকে দূর হয়েছিল জাত্যাভিমান, নারী পুরুষে ভেদজ্ঞান।

এই পরিব্রাজন কালে নরেন যেখানে গেছেন হিন্দুধর্মের বাণী প্রচার করেছেন, মানুষকে উদ্বুদ্ধ হবার শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বত্রই তিনি সাদরে গৃহীত হয়েছেন। যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁর অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব, পান্ডিত্য জ্ঞান ও উপলব্ধির গভীরতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ অভিভূত হয়েছেন। এই সময়েই খেতুরির মহারাজা অজিত সিংহ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরিব্রাজক জীবনে নরেন কোথাও বিদিষানন্দ কোথাও সচ্চিদানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। খেতুরির মহারাজাই তাঁকে বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তখন থেকে স্বামীজি এই নামেই নিজের পরিচয় দিতেন।

সমস্ত ভারত ভ্রমণ শেষ করে ১৮৯২ খ্রিঃ বিবেকানন্দ এসে পৌছলেন দক্ষিণ ভারতের কন্যাকুমারিকায়। এখানে সমুদ্রের বুকে ভারত ভূখন্ডের শেষ প্রস্তরখন্ডের ওপরে ধ্যানাসনে বসে তিনি তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি ভারতের এক নতুন ছবি যেন দেখতে পেলেন।

গভীর বেদনার সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করলেন আপামর ভারতবাসীর সর্ববিধ মুক্তির সাধনাই তাঁর প্রকৃত সাধনা। ঘুমিয়ে থাকা মানুষগুলিকে জাগিয়ে তোলার কাজই হবে তাঁর জীবনব্রত।

কন্যাকুমারীকা থেকে মাদ্রাজে এলেন বিবেকানন্দ। এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায়

ও ছাত্রসমাজ তাঁর উদার ধর্মালোচনা ও উপদেশ শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন তাঁরা।

বিবেকানন্দের প্রভাব লক্ষ করে মাদ্রাজ কলেজের খ্রিস্টান অধ্যাপক মুধলিয়র স্থির করলেন এই নবীন হিন্দু সন্ন্যাসীকে তর্কে পরাস্ত করে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

তাঁর ধারণা ছিল বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তির দ্বারা স্বামীজির আধ্যাত্মবাদকে পরাস্ত করে খ্রিস্ট ধর্মের জয় ঘোষণা করা।

যথাকালে কিন্তু সবই গেল পাল্টে। স্বামীজির দিব্যরূপ, শান্ত পবিত্র মুখশ্রী আর তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ উপদেশাবলী শুনে মুধলিয়র হয়ে পড়লেন হতভম্ব স্তব্ধবাক। ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সমস্ত অহংকার চূর্ণ হল তাঁর, তিনি স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

এই সময়ে আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই সংবাদ বিবেকানন্দ কয়েকজন মাদ্রাজী ভক্তের মুখে জানতে পারলেন। তাঁর শিষ্যবর্গ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে স্বামীজি এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

সোৎসাহে চাঁদা তুলে ৫০০ টাকা তাঁরা স্বামীজীকে দিয়ে তাঁদের অভিপ্রায়ের কথা নিবেদন করলেন।

আকস্মিক এই প্রস্তাবে বিহ্বল হয়ে পড়লেন স্বামীজী। কিন্তু তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ সচেতন। শিষ্যদের সংগৃহীত সমস্ত অর্থ দরিদ্র সেবায় ব্যয় করার উপদেশ দিয়ে তিনি বললেন, আমি সন্ন্যাসী, সংকল্প করে কোন কাজ করা ঠিক নয়। যদি তা ভগবানের ইচ্ছা হয়; তিনিই উপায় নির্ধারণ করবেন। তোমাদের ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই।

মাদ্রাজ থেকে স্বামীজী এলেন হায়দ্রাবাদে। এখানে বিপুল অভ্যর্থনা পেলেন তিনি। এখানেও সকলে তাঁকে অনুরোধ করলেন শিকাগো ধর্মসভায় যোগদানের জন্য।

কিন্তু স্বামীজি তখনো পর্যন্ত মনস্থির করে উঠতে পারেননি। তিনি তাঁর অন্তরের আহ্বান শোনার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইলেন।

এই সময়ে একদিন স্বামীজির ভাব দর্শন হল। তিনি দেখলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ তাঁকে সমুদ্র পার হয়ে বিদেশযাত্রার স্পষ্ট ইঙ্গিত জানালেন। তবুও তাঁর সংশয় দূর হচ্ছিল না।

শেষপর্যন্ত তিনি মাতা সারদা দেবীর কাছে তাঁর বিদেশযাত্রার বিষয়ে মতামত চেয়ে পত্র দিলেন। স্নেহময়ী মাতা সানন্দে পুত্রকে বিদেশযাত্রায় অনুমতি দিলেন।

মায়ের অনুমতিপত্র পেয়ে স্বামীজি নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি বিদেশযাত্রার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

শিষ্যরাও তাঁর যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে খেতুরির মহারাজার দূত এসে জানাল, স্বামীজির আশীর্বাদে মহারাজার পুত্রসন্তান লাভ হয়েছে। রাজদূত তাঁকে আমন্ত্রণ করে খেতুরিতে নিয়ে গেল।

মহারাজই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীজির আমেরিকা যাত্রার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর জন্য রেশমের আলখাল্লা, পাগড়ি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবই কেনা হলো। জাহাজের একটি প্রথম শ্রেণীর কেবিনও স্বামীজির জন্য রিজার্ভ করা হল।

স্বামীজি শিকাগো অভিমুখে যাত্রা করলেন বোম্বাই বন্দর থেকে ১৮৯৩ খ্রিঃ ৩১শে মে।

শিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত হবার কোন আমন্ত্রণপত্র স্বামীজির ছিল না। ছিল না প্রয়োজনীয় অর্থও। তিনি যখন আমেরিকায় পৌঁছলেন তখন নিতান্তই, একজন অপরিচিত অনাহূত সন্ন্যাসীমাত্র।

তখনো ধর্ম সম্মেলনের বেশ কিছুদিন বাকি ছিল। অজানা দেশে অচেনা পরিবেশে দৈবাৎ বিবেকানন্দের দেখা হয়ে গেল মিঃ জে.এইচ রাইটের সঙ্গে। স্বামীজির ব্যক্তিত্ব ও পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি ধর্মমহাসভার সঙ্গে যুক্ত মিঃ বনিককে এক চিঠি লিখে বিবেকানন্দের হাতে দিলেন। শিকাগো যাওয়ার টিকিটও তিনি কিনে দিলেন।

সন্ধ্যা নাগাদ বিবেকানন্দ শিকাগো এসে পৌঁছলেন। আশ্রয়হীন ভারতীয় সন্ন্যাসী প্রবল শীতের রাতটা কাটালেন স্টেশনের মালগুদামের সামনে এক প্যাকিংবাক্সের মধ্যে বসে।

এরপর মিসেস জর্জ ডবলিউ হেইল নামে এক বয়স্ক মহিলা বিবেকানন্দকে ধর্মসভায় যোগদানের ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করলেন।

যথাসময়ে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মসভার অন্তর্ভুক্ত হলেন।

এর পরই ঘটল ভারতীয় সন্ন্যাসীর আমেরিকা বিজয় তথা বিশ্ববিজয়ের অভূতপূর্ব ঘটনা। ১৮৯৩ খ্রিঃ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ধর্মসভার প্রথমদিনেই বক্তৃতা দিয়ে অসামান্য স্বীকৃতি লাভ করলেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ নিজেই লিখেছেন, "...... যখন আমি আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃগণ বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালি ধ্বনি হইতে লাগিল যে কান যেন কালা করিয়া দেয়। তারপর আমি বলিতে শুরু করিলাম। .... পরদিন সব খবরের কাগজ বলিতে লাগিল আমার বক্তৃতাই সেইদিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছে। সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল।"

এরপর বিবেকানন্দ বোস্টন, ডিট্রয়েট, নিউইয়র্ক, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুকলীন প্রভৃতি শহরে বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্য ও ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে ইংলন্ড ও

আমেরিকায় বহু নরনারী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁদের মধ্যে মিস মার্গারেট নোবল অন্যতম।

পরবর্তীকালে তিনি গুরুর সঙ্গে ভারতবর্ষে এসে ভারতবাসীর কল্যাণেই জীবন উৎসর্গ করেন। তিনিই হলেন ভগিনী নিবেদিতা।

১৮৯৭ খ্রিঃ বিবেকানন্দ দেশে ফিরে আসেন। লাভ করেন বীরোচিত সংবর্ধনা। দেশসেবার কাজে তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "ওঠো, জাগো,—লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে থেমো না।"

১৮৯৭ খ্রিঃ বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন এবং মিশনের কেন্দ্র হিসেবে বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৯ খ্রিঃ। মানবসেবাই হল এই মিশনের মূল আদর্শ।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ বাংলায় উদ্বোধন এবং ইংরাজিতে প্রবুদ্ধ ভারত নামে দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকা যান ১৮৯৯ খ্রিঃ। সেখানে বেদান্ত শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে দেশে ফিরে তিনি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, রামকৃষ্ণ হোম ও রামকৃষ্ণ পাঠশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন।

বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে থেকেও বক্তৃতা ও রচনার মাধ্যমে ভারতের যুবকদের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রেরণার সৃষ্টি করেছিলেন। পরোক্ষভাবে পরাধীন দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁর গভীর প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। বস্তুতঃ বিবেকানন্দ ছিলেন আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টা।

দেশকে নতুন জাতীয়তা ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন বিবেকানন্দ। সংস্কার ও আচারের অবরণ মুক্ত করে ভারতাত্মার প্রকৃত স্বরূপকে জাগ্রত করেন। বিশ্বমানবতার অঙ্গনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশ্বের সম্মুখে তিনি উপনিষদের বাণীকেই তুলে ধরেছিলেন।

বলেছিলেন, "মানুষের অন্তরে যে দেবত্ব আছে তাকে জাগিয়ে তোলাই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।"

বাংলা সাহিত্যেও বিবেকানন্দের দান অসামান্য। সরল কথ্যভাষার অন্যতম প্রধান প্রচারক তিনি।

অত্যধিক পরিশ্রমে বিবেকানন্দের শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। শেষদিকে তিনি বেশির ভাগ সময়ই ধ্যানমগ্ন থাকতেন। ১৯০২ খ্রিঃ ১লা জুলাই রাত ৯টা ৫০ মিনিটে এই ধ্যানের মধ্যেই তিনি মহাসমাধিতে লীন হন। এই সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৯ বছর ৬ মাস।

ইংরাজি ও বাংলায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন বিবেকানন্দ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পরিব্রাজক, বর্তমান ভারত, ভাববার কথা, প্রাচ্য ও পাশ্চত্য, Karmayoga, Rajayoga, Tnanayoga, Bhaktiyoga প্রভৃতি।

হজরত মহম্মদ

লোহিতসাগর আর পারস্য উপসাগরের কোলে আরবের মরুদিগন্তে সুপ্রাচীন মক্কানগরী। এই নগরীর এক নিভৃত কুটিরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে, আনুমানিক ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের, সোমবার শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে নিখিল মানবতার মূর্ত প্রতীক বিশ্বনবী হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হজরত আবদুল্লা। মাতা আমিনা।

হজরত মহম্মদের অপর নাম আহমদ। মহম্মদ কথাটির অর্থ হল চরম প্রশংসিত। আর আহমদ কথার অর্থ চরম প্রশংসাকারী। এই দুই নামেরই প্রকৃত অর্থবহনকারী ছিল এই মহামানবের পবিত্র জীবন।

একদিকে তিনি ছিলেন বিশ্বনিয়ন্ত স্রষ্টার দ্বারা সর্বত্র চরম প্রশংসিত। আবার অপরদিকে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে সেতুবন্ধন স্বরূপ এবং স্রষ্টার চরম প্রশংসাকারী।

বিধাতার প্রেরিত যে সকল মহাপুরুষ মানবজাতির জন্য অনন্ত কল্যাণ ও আশীর্বাদ বহন করে মাটির পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, মানবজাতির সর্বকালের চরম ও পরম আদর্শরূপে দেদীপ্যমান থাকেন, জন্মের বহু পূর্বে থেকেই তাঁদের অবির্ভাবের কথা নানাভাবে ঘোষিত হয়ে থাকে।

হজরত মহম্মদও ছিলেন প্রতিশ্রুত এবং সর্বশেষ পয়গম্বর। আবির্ভাবের বহু পূর্বেই এই কথা নির্ধারিত হয়েছিল। তাঁকে উপলক্ষ করেই অপরাপর যাবতীয় সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করেছিল।

হজরত মহম্মদের পূর্বসুরী হজরত আদম, হজরত নূহ, হজরত মুসা, হজরত ইব্রাহিম, হজরত ঈশা প্রমুখ পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বর ও তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ সর্বশেষ পয়গম্বরের নিশ্চিত আবির্ভাবের কথা জানতেন।

আর তা জানতেন বলেই তাঁরা সকলেই হজরত মহম্মদের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

তৎকালীন পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থেও তাঁর গুণগান ও শুভাগমনের বার্তা ঘোষিত হয়েছে দেখা যায়।

বেদ পুরাণ, জেন্দাবেস্তা, দিঘ-নিকায়া, তওরাৎ, জব্বুব, বাইবেল, ইঞ্জিল প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলিতেই স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির শুভ আবির্ভাবের আভাস ব্যক্ত হয়েছে।

হিন্দুদের ভবিষ্যপুরাণে উল্লেখ পাওয়া যায় এভাবে—

"এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিতঃ
মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখা সমন্বিতঃ

নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থলনিবাসিনম্
গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্থাপ্য পঞ্চগব্যসমন্বিতৈঃ
চন্দনাদি তিরভ্যার্চ তুষ্টাব মনসা হরম
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনে
ত্রিপুরাসুরনাশয় বহুমায়া প্রবর্তিনে।"

এখানে বলা হয়েছে, যথাসময়ে 'মহামদ' নামে সেই ব্যক্তি, যার বাস মরুস্থলে (অর্থাৎ আরবদেশে) তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের নিয়ে আবির্ভূত হবেন। হে আরবের প্রভু, হে জগৎগুরু, তোমাকে আমি বন্দনা করি। জগতের সমুদয় কলুষ নাশ করবার বহু উপায় তুমি জান। তোমাকে নমস্কার।

অল্লোপনিষদ নামক প্রচীন গ্রন্থের একস্থানে দেখা যায় বলা হচ্ছে—

"হোতারমিন্দ্রোঃ হোতারমিন্দ্রোঃ মহাদুরিন্দ্রাঃ।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং বারম পুণং ব্রহ্মাণ অল্লম।।
অল্লোরসুলমহম্মদকং বরস্য অল্লো অল্লাম।
আদল্লাহ্বুকমে ফকম আল্লাবুক নিখাতকম।।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ সকল গুণের অধিকারী, তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞ। মহম্মদ আল্লাহ্র রসুল। আল্লাহ্ জ্যোতির্ময়, অব্যয়, অদ্বৈত, চির পরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভু।

বাইবেলেও হজরত মহম্মদের আবির্ভাব বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

যিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্বেই সাধু যোহনের জন্ম হয়েছিল। তিনি ছিলেন যিশুর মাসির ছেলে। ঈশ্বরপুত্রের আবির্ভাবের বার্তাবাহী ছিলেন তিনি।

সাধু যোহন অল্পবয়সেই গৃহত্যাগ করে বিশ্বস্রষ্টার গুণগাথা মানুষকে শোনাতে থাকেন। এরপর একসময় তিনি সকলকে বাপ্তাইজ (Baptize) করতে থাকেন। এই সংবাদ জানতে পেরে জেরুজালেম থেকে ইহুদীরা কয়েকজন সাধুকে তাঁর পরিচয় জানবার জন্য পাঠান।

সেই সাধুপুরুষরা যোহনের নিকটে এসে কিছু প্রশ্ন করেন। তার উত্তরে সাধু যোহন যে কথা বলেন, তার মধ্যেই মহম্মদ-এর শুভাবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বাইবেলে যিশু নিজেও একজায়গায় বলেছেন—

"Nevertheless I tell you the truth. It is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter will not come unto you : but I depart, I will not send him unto you (John.chap 17.7-8)

"If you love me, keep my commandments. And I will pray and He shall give you another comforter that he may abide with you for ever (John chap.14:15-16)

যে শান্তিদাতার কথা এখানে বলা হয়েছে, তিনি হজরত মহম্মদ ছাড়া আর কেউ নয়। কেন না একমাত্র তিনি ছাড়া যিশুখ্রিস্টের পরে আর কোন পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়নি।

পার্সীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তা ও দসাতির। হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের কথা সুস্পষ্টভাবে এখানে পাওয়া যায়। আহ্মদ নামটিরও এখানে উল্লেখ পাওয়া যায়।

"Naid te Ahmad dragoyeitim framraomi spetame Zarathustra yam dahmam vangnim afritim. Yunad hake hahi humananghad hvakanghad Hushyan thand hudaenad."

অর্থাৎ আমি ঘোষণা করছি, হে স্পিতাম জরথুস্ত্র পরমপবিত্র আহ্ম যিনি ন্যায়বানদিগের আশীর্বাদ স্বরূপ, নিশ্চয়ই আবির্ভূত হবেন। যাঁর নিকট থেকে তোমরা সৎচিন্তা, সৎবাক্য সৎকার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করবে।"

বস্তুতঃ জগৎ ও জীবের মঙ্গলের জন্যই চরম সংকটকালে সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিরূপে মহাপুরুষদের আবির্ভাব হতে দেখা যায়। যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান জীবনে যখন কলুষ-কালিমা সঞ্চিত হয়েস্রষ্টার সৃষ্টিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়, সেই সময়েই সত্য ও ন্যায়ের সম্মার্জনী দিয়ে মহাপুরুষগণ সংস্কারের কাজে ব্যাপৃত হন। এভাবে ভগ্ন জীর্ণ পুরাতনের ধ্বংস স্তূপের ওপরেই গড়ে ওঠে নতুন ইমারত—প্রবর্তিত হয় নতুন যুগের।

হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের সময়েও আরবের সমকালীন অবস্থার দিকে তাকালে আমরা একই দৃশ্য দেখতে পাই। সেই সময় আরবজাতির অবস্থা ছিল অতীব শোচনীয়।

খুনকা বদলা খুন এই ছিল সেখানকার সামাজিক নীতি। বংশ পরম্পরায় চলত এই নেশা—রক্তের বদলে রক্ত ঝরাবার প্রয়াস।

আর অবিচার, ব্যভিচার, খুন, ডাকাতি, নারীহরণ, মদ্যপান ইত্যাকার যত দুর্নীতি ও অন্যায় কর্ম সবই পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত ছিল আরবদের চরিত্রে। নিষ্প্রাণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মূর্তিপূজা আর অন্ধ কুসংস্কারে মানুষের সৎ গুণাবলী আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছিল।

৩৬০ টিরও বেশি মূর্তি পবিত্র কাবা ঘরে রক্ষিত ছিল। আরবরা নিয়মিত সেসব মূর্তি পূজা করত।

জাতির ধাত্রীস্বরূপ যে নারীজাতি সমাজে তাদের অবস্থান নির্ণয় করেই কোন জাতির সভ্যতা ও অগ্রগতির পরিচয় লাভ করা যায়।

তৎকালীন আরবে নারীজাতির কোনরূপ সম্মান তো ছিলই না, তাদের চরম ঘৃণার চোখে দেখা হত।

তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করা হতো গৃহপালিত পশুর মতো। কোন পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হত। বিবাহবন্ধন বলে কোন কিছু ছিল না।

বিবাহিতা স্ত্রীকে যখন খুশি ইচ্ছা ত্যাগ করা চলত। একই নারী একই সময়ে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করত। মোটকথা সামাজিক শৃঙ্খলা বলে কোন বস্তু আরবে ছিল না।

আবার সেই সময়ে মানুষ বেচা-কেনার ব্যবসাও চলত পূর্ণ মাত্রায়, যাকে বলা হয় দাস ব্যবসায়। হাটে-বাজারে প্রকাশ্যভাবে দাস-দাসী কেনাবেচা হত। ইতিহাসবিদদের অভিমত, এই সময় কাবাগৃহের দেবদেবী মূর্তির সামনে নরবলির প্রচলনও ছিল।

এমনই সেই সমাজ যে তা মানুষের হলেও সেখানে পশু আর মানুষের বিশেষ পার্থক্য ছিল না বললেই চলে।

জোর যার মুলুক তার এই যেখানে নিয়ম-রীতি সেখানে ক্ষমতাবানের লোভ লালসা ও অত্যাচারে ধর্ম নীতি বলে যে কিছু থাকা সম্ভব নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই অন্ধকার যুগে নরপশুদের তান্ডব থেকে মানুষকে সত্য ও আলোকের পথ প্রদর্শনের জন্যই আবির্ভূত হয়েছিলেন বিশ্বনবী হজরত মহম্মদ।

স্রষ্টার রাজ্যে সৃষ্টির বিকৃতি মোচনের জন্যই তিনি এসে ঘোষণা করেছিলেন সেই আলোকময় শাশ্বত বাণী— লা ইলাহা ইল্লালা্লা মহম্মদুর রসুলুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়-- তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই। হজরত মহম্মদ তাঁরই প্রেরিত পয়গম্বর (রসুল)।

এই অমোঘ বাণীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইসলামের চরম সত্য। পরম প্রাপ্তি।

পবিত্র কোরানেই হজরত মহম্মদের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "রসুলকে যাহা আদেশ দিয়াছি, তাহা করিলে কোনই অন্যায় হয় না" (৩৩ঃ৩৮)।

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।" (৩৩ ঃ ২১)।

পবিত্র কোরান শরিফের সর্বত্র তাঁকে রসুলুল্লাহ— 'হে আমার রসুল' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এমন নিকট সম্বোধন আর কোন পয়গম্বরের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। যদিও সকল পয়গম্বরই পরমেশ্বরের প্রেরিত।

আদি পিতা হলেন হজরত আদম, তাঁকে বলা হয়েছে 'আদম সফিউল্লাহ'। হজরত নূহকে সম্বোধন করা হয়েছে নূহ নবীউল্লাহ বলে। হজরত ইব্রাহিমকে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। হজরত ইসমাইলকে ইসমাইল জীবিউল্লাহ ; হজরত মুসাকে মুসা মলিমুল্লাহ এবং হজরত ঈশাকে ইসা-রূহ-আল্লাহ বলা হয়েছে।

একমাত্র হজরত মহম্মদকে বলা হয়েছে মহম্মদ রসুলুল্লাহ। এই থেকেই প্রমাণিত হয় তিনি ছিলেন পূর্বাপর পয়গম্বরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে প্রিয়ভাজন।

মহম্মদ যেই বংশে জন্মগ্রহণ করেন তা আরবের অতি সম্ভ্রান্ত কুরেশ বংশ। তাঁর জন্মের পূর্বেই পিতা আবদুল্লাহ মারা যান। কয়েক বছর পরেই তিনি মাকে হারান। ছয় বছর বয়সের মধ্যেই তিনি এতিম হয়ে পড়েন।

শিশু মহম্মদ প্রথমে তাঁর ঠাকুর্দা ও পরে পিতৃব্য আবু তালিবের কাছে লালিত-পালিত হন।

মহম্মদের যখন বারোবছর বয়স সেই সময় তিনি চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়া যান। বাইরের জগৎ সম্পর্কে সেই প্রথম তাঁর অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটে। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকের সঙ্গে পরিচিত হন তিনি।

যৌবন বয়স পর্যন্ত মহম্মদকে পাহাড়ে, উপত্যকায় ছাগল ভেড়া চরাতে হয়েছে। সকলের সঙ্গেই সহজভাবে মেলামেশা করতেন তিনি। কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি হয়ে উঠেছিলেন পবিত্রতা ও নম্রতার প্রতীক। এই গুণের জন্য কোরায়েশরা তাঁকে শ্রদ্ধাবশতঃ নাম দিয়েছিল আল-আমিন বা পরম বিশ্বাসী।

সেই সময় মক্কায় এক ধনাঢ্য বিধবা মহিলা ছিলেন। তাঁর কাফেলা সুদূর সিরিয়া পর্যন্ত ব্যবসার কাজে যাতায়াত করত। মহম্মদের সুখ্যাতি শুনে তিনি তাঁকে তাঁর ব্যবসার কাজে নিযুক্ত করলেন।

মহম্মদ অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করলেন। তাঁর কর্মদক্ষতা ও সততায় মুগ্ধ হলেন খাদিজা। তিনি মহম্মদকে বিবাহ করলেন।

সেই সময় খাদিজার বয়স চল্লিশ আর মহম্মদের বয়স পঁচিশ। সময়টা ৫৯৫ খ্রিঃ। বয়সের এই পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের পারিবারিক জীবন সুখের হয়েছিল।

মহম্মদ ও খাদিজার দুই পুত্র ও চার কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তাঁদের জীবিতাবস্থায় একমাত্র কন্যা ফতিমা ছাড়া বাকি পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছিল।

খাদিজা মারা যান পঁয়ষট্টি বছর বয়সে। মহম্মদের তখন বয়স ছিল পঞ্চাশ।

বাল্য বয়স থেকেই মহম্মদ ছিলেন ধর্মপ্রাণ। বিয়ের আগে থেকেই তিনি মাঝে মাঝেই মক্কার উত্তর অংশে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জনে বসে পরমেশ্বরের উপসনায় মগ্ন হতেন।

বিবাহের পর একদিন তিনি যখন উপাসনায় মগ্ন সেই সময় ওহি বা ঈশ্বরাদেশ লাভ করলেন। দৈবাদেশ হল, পৌত্তলিকতা পাপ—সমাজ থেকে এই পাপ দূর করে আব্রাহাম প্রবর্তিত একেশ্বরবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহতালা এক এবং অদ্বিতীয়। যারা আল্লাহতালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারা তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে।

রোমাঞ্চিত কলেবর মহম্মদ এই আদেশ শ্রবণ করলেন। তাঁর অন্তরের ভক্তি বিশ্বাস আল্লাহ্‌তালার প্রতি নিবেদিত হল।

তিনি স্থির করলেন পৌত্তলিকতার অবসান ঘটিয়ে সমাজে এক আল্লাহ্‌র উপাসনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কিন্তু সেই কালের নানা বিবদমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত আরব সমাজে পৌত্তলিকতা দূর করা ছিল এক কঠিন কাজ। তথাপি পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি ঈশ্বরাদেশ প্রতিপালনে ব্রতী হলেন।

পৌত্তলিকপন্থী কোরায়েশদের মধ্যে ধর্মের নতুন কথা প্রচার করতে গিয়ে অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে মহম্মদকে।

বহুবার তাঁর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছে। তথাপি তিনি অবিচল বিশ্বাসে নিজের পথে এগিয়ে গেছেন।

মহম্মদ যে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন তার নাম ইসলাম। আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আত্মসমর্পণ ও তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি ভালবাসা প্রদান এই ছিল এই নব ধর্মের মূল কথা।

মক্কায় প্রথম যিনি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন তিনি একজন মহিলা। তিনি হলেন মহম্মদের সাধ্বীপত্নী খাদিজা। এরপর মক্কার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

এঁদের মধ্যে আবুবকর, হজরত-জামাতা আলী, জিয়াদ নামে এক মুক্ত ক্রীতদাসও ছিলেন।

অত্যন্ত সঙ্গোপনে ধর্মান্তঃকরণের কাজ চলতে লাগল—বছর চারেকের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা দাঁড়াল চল্লিশ জন।

কোরায়েশরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিমদের সম্পর্কে সম্যক সচেতন ছিল। তাঁরা নানাভাবে মহম্মদ এবং তাঁর অনুগামীদের উৎপীড়ন করত। অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত একদল মুসলমান আবিসিনিয়ায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হল।

কোরায়েশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আরেক দল মুসলিম পরের বছর আশ্রয় নিল সেখানে। মহম্মদ রয়ে গেলেন অবশ্য মক্কাতেই।

আবুতালেব ছিলেন ধর্মপ্রাণ। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলেও সর্বপ্রকারে মহম্মদকে কোরায়েশদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে লাগলেন। পৌত্তলিক কোরায়েশদের কোন প্রকার চাপের কাছেই তিনি মাথা নত করলেন না।

মহম্মদের জীবন মক্কায় দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস ও ভক্তির বলেই তিনি হাসিমুখে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে চলেছিলেন।

ইতিমধ্যে মহম্মদের জীবনে নেমে এল মস্ত আঘাত। তাঁর পতিপ্রাণা পত্নী খাদিজা ৬১৯ খ্রিঃ প্রাণত্যাগ করলেন। পরের বছরেই তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যু হল।

স্বাভাবিক ভাবেই বিধর্মী কোরায়েশরা এবারে বেপরোয়া হয়ে উঠল। মহম্মদ নিজে এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সংখ্যক নব্যমুসলিম কোরায়েশদের অত্যাচারে উৎপীড়নে শেষ পর্যন্ত মক্কা পরিত্যাগ করে যেতে বাধ্য হলেন।

মদিনার কয়েকজন তীর্থযাত্রী মক্কায় এসেছিলেন। তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁদের আনুকূল্যে মহম্মদের অনুগামীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মদিনায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

মদিনাতেও ধর্মান্তরকরণের কাজ চলতে লাগল। একবছরের মধ্যেই সেখানে নব্যমুসলিমদের সংখ্যা দাঁড়াল তিয়াত্তরজন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোক।

পরম বিশ্বস্ত অনুচর আবুবকর ও আলীকে নিয়ে মহম্মদ মক্কাতেই ছিলেন। এক রাতে কোরায়েশরা দলবদ্ধ ভাবে মহম্মদের বাড়ি আক্রমণ করল। আবুবকর গোপনে মহম্মদকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মক্কার অদূরে এক পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিলেন।

করুণাময় ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেখানে তাঁরা নিরাপদেই রইলেন। হিংস্র কোরায়েশরা অনেক খুঁজেও তাঁদের সন্ধান করতে ব্যর্থ হল।

জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করে হজরত মহম্মদ মদিনায় আসেন ৬২২ খ্রিঃ ২০শে জুন। তাঁর এই প্রস্থানকে বলা হয় হিজিরা। পরবর্তীকালে এই সময় থেকেই মুসলিমদের বর্ষপঞ্জী হিজরি সনের শুরু হয়।

মদিনায় মুসলিমরা মহম্মদকে সাদরে বরণ করে নিলেন। এখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে মুসলিমদের শহর গড়ে উঠল। ইসলামের প্রথম মসজিদ তৈরি হল মদিনায়।

মক্কার কোরায়েশরা মহম্মদের মদিনায় প্রস্থানের সংবাদ যথাকালে পেয়ে গেল। তারা এই ঘটনাকে ভালভাবে মেনে নিতে পারল না। তারা মহম্মদের অনুগামী মুসলিমদের বিধর্মী বলেই গণ্য করত। কাজেই এই বিধর্মীদের নির্মূল করবার জন্য তারা নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল।

এর ফলে মদিনার মুসলিমদের সঙ্গে মক্কার কোরায়েশদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিল দীর্ঘ দশ বছর ধরে।

হিজরতের পরবর্তী বছরে কোরায়েশরা দশ হাজার সশস্ত্র সৈন্যের বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করল।

যথাকালে মদিনার মুসলিমরাও অগ্রসর হল কোরায়েশদের প্রতিরোধ করবার জন্য। কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। মাত্র তিনশ তেরো জন।

মদিনা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে বদর নামক স্থানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হল। মক্কা থেকে এই স্থানের দূরত্ব ছিল অনেক বেশি—দুশো কুড়ি মাইল। কোরায়েশদের বিশাল বাহিনী আর কিছু মাইল অগ্রসর হলেই মদিনায় পৌঁছে যেত।

যাইহোক, বিপক্ষের বিপুল সংখ্যক সৈন্য দেখে মহম্মদ ভাবিত হলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে তিনি প্রিয়তম শিষ্য আবুবকরকে নিয়ে তাঁর তাঁবুতে এলেন। তারপর তিনি আল্লাহর আরাধনায় মগ্ন হলেন।

এরপর যুদ্ধ যখন শুরু হল মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলিম সৈন্যই অপরাজেয় হয়ে উঠল। কোরায়েশরা প্রাণপণ যুদ্ধ করেও নিজেদের পরাজয় রোধ করতে পারল না। অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে বহু কোরায়েশ প্রধানও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাল।

আধ্যাত্মিক চেতনার সত্তা হলেও মহম্মদের বাস্তব জ্ঞান ছিল অসাধারণ। লৌকিক ও অলৌকিকের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর যুদ্ধ কৌশলেই মক্কাবাসীদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল।

বদরের যুদ্ধে জয়লাভের ঘটনা মুসলিমদের নতুন প্রেরণায় উৎসাহিত করে তুলল। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, প্রথমবারের মত পরাজিত কোরায়েশরা মক্কায় পলায়ন করলেও পুনরায় তারা আক্রমণের চেষ্টা করবে।

তাই বিপুল উদ্যমে তাঁরা নিজেদের অনাগত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে লাগল। অবশ্য সব বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে মহম্মদের উপদেশ নির্দেশই ছিল তাঁদের পথ প্রর্দশক।

কোরায়েশরা একবছর ধরে শক্তি সংগ্রহ করল। যাদের নীতিই হল খুন কা বদলা খুন। বদরের যুদ্ধের পরাজয় তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই পরের বছরই তারা আবার বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হল।

কোরায়েশদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য মহম্মদের নেতৃত্বে মুসলিমরা খুলুদ নামক প্রান্তরে উপস্থিত হন। মদিনা থেকে মাত্র তিন মাইল উত্তরে ছিল খুলুদের অবস্থান।

এবারে মহম্মদের সঙ্গে ছিল একহাজার সশস্ত্র সৈন্য। তাব মধ্যে আবদুল্লা ইবন উবের নিজের নেতৃত্বে তিনশ সৈন্য নিয়ে কোরায়েশদের আক্রমণ করতে অগ্রসর হন। মহম্মদের সঙ্গে রইল সাতশ সৈন্য।

এবারেও উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল। উভয় পক্ষেই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে চলল। কিন্তু এবারে আর সহজে জয় পরাজয় নির্ণয় হল না।

কোরায়েশরা লড়াই করছিল মরিয়া হয়ে। তাদের অবিশ্রান্ত আক্রমণে বিপুল ক্ষতি স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের বাধ্য হয়ে পিছু হটে যেতে হল। কিন্তু তারা গড়ে তুলল প্রবল প্রতিরোধ। মক্কাবাসীরা এই প্রতিরোধ ভেদ করা যাবে না বিবেচনা করে সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিল।

এই দুই যুদ্ধে একটি বিষয় পরিষ্কার ছিল দিনের আলোর মত। তা হল, উভয় যুদ্ধেই আক্রমণকারী ছিল মক্কাবাসী কোরায়েশরা। তাদেব উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের ধ্বংস করা।

কিন্তু দুই যুদ্ধেই মহম্মদের ভূমিকা ছিল রক্ষণাত্মক। তিনি তাঁর অনুগতদের নিয়ে কেবল আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করে গেছেন।

এরপর একটি বছর নির্বিঘ্নেই কাটল। কিন্তু দ্বিতীয় বছরেই কোরায়েশরা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। তারা সহযোগী সম্প্রদায়দেরও একত্রিত করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করল। তাদের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল চব্বিশ হাজার।

প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে কোরায়েশরা পুনর্বার মদিনার ওপর আক্রমণ চালাল। প্রথমে চব্বিশ হাজার সৈন্য মদিনা অবরোধ করল। মুসলিমদের শক্তিশালী রক্ষণভাগ ভেদ করে অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

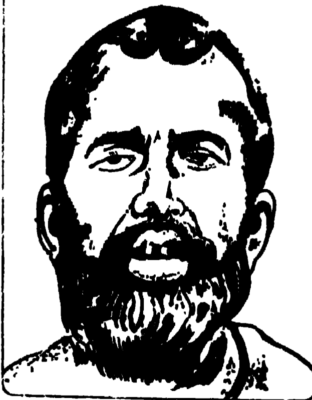
একই অবস্থানে দীর্ঘ একমাস অতিবাহিত হল। ইতিমধ্যে মক্কাবাসীদের বিপদ অন্যদিক থেকে এসে উপস্থিত হল। বিরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের তাঁবু উড়ে গেল, সমস্ত সমরায়োজন লন্ডভন্ড হয়ে গেল। তাদের রসদেও টান পড়ল।

শেষ পর্যন্ত কোরায়েশরা অবরোধ অপসারিত করল। হজরত অবাধে অনুচরদের নিয়ে জন্মভূমি মক্কায় তীর্থযাত্রা করলেন। মক্কাবাসীদের অনেকেই এবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। পরিশেষে বিনা রক্তপাতেই কোরায়েশরা আত্মসমর্পণ করল।

ইসলামের এই চূড়ান্ত বিজয়ের ফলে অবিলম্বেই পবিত্র কাবাঘর পৌত্তলিকতা মুক্ত হল। দেবদেবীর মূর্তিপূজার বদলে সেখানে পরমেশ্বর আল্লাহর উপাসনা প্রবর্তিত হল। মহম্মদের পরিচালনায় আরবদের উশৃঙ্খল সমাজে শৃঙ্খলা ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত হল।

নিজকার্য সম্পন্ন করে মহামানব হজরত মহম্মদ ৬৩২ খ্রিঃ দেহত্যাগ করলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ



ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জাগরণের ইতিহাসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান এক ব্যক্তিত্ব। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে তিনি অবতার রূপে স্বীকৃত। বস্তুতঃ তাঁর অতিলৌকিক জীবন, তাঁর অলৌকিক কর্মধারা ও অতিমানবিক অবদানের মধ্যেই রয়েছে তাঁর স্বরূপের প্রকাশ।

সমাজ যখন সর্বতোভাবে কলুষিত হয়ে ওঠে, স্বভাবতঃই সৎমানুষদের ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কাতরতা অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তাঁদের আন্তরিক আবেদনে আমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে স্বয়ং ঈশ্বরের শক্তি নেমে আসে মানুষের ধূলিমলিন পৃথিবীতে।

সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকেই তাঁরা যাপন করেন অসাধারণ জীবন। মানুষের চলার পথের পাথেয় রেখে তাঁরা আবার বিদায় নেন মাটির পৃথিবী থেকে।

এই বিশ্বাস কেবল ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চেতনার বিশ্বাস নয়, আদিকাল থেকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষই ঈশ্বর প্রেরিত এই শক্তি তথা অবতারের কথা স্বীকার করে গেছে এবং তাঁদের আরাধনা করে এসেছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় হজরত মহম্মদের কথা, যিশু খ্রিস্টের কথা। আমাদের দেশেও রয়েছেন এমনি গৌতম বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ অবতারী জীবন।

এই মহাপুরুষদের জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাঁদের ঈশ্বরীয় সত্তাকে যা একদিকে অলৌকিক জগৎ এবং অপর দিকে লৌকিক জগৎকে ধারণ করে রয়েছে।

ঈশ্বরের অবতার রূপে মানুষের পৃথিবীতে যাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই শুরু থেকেই অলৌকিকতার প্রকাশ ঘটেছে।

নেজরেথবাসী যোশেফের সঙ্গে বিবাহের পূর্বেই কুমারী মেরী হয়ে উঠেছিলেন গর্ভবতী। একটি দীনহীন আস্তাবলের মধ্যে তিনি জন্ম দিয়েছিলেন শিশু পুত্রের। তিনিই কালে অত্যাচারী রাজার সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে হয়ে উঠেছিলেন তাপিত মানুষের পরিত্রাতা।

ভারতবর্ষে এই ধরনের ঘটনাকে বিভিন্ন পুরাণে বহুভাবে স্বীকার করা হয়েছে। ইতিহাসে রয়েছে গৌতম বুদ্ধের জন্ম-কথা। সিদ্ধার্থ গৌতমের মাতা মায়াদেবী পুত্রের জন্মের পূর্বে স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি শ্বেত হস্তি ধেয়ে এসে তাঁর সত্তায় মিশে যাচ্ছে।

এই ধরনের অপার্থিব ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা বা যুক্তি আমরা পাই না। কিন্তু ইতিহাসই সাক্ষ্য প্রদান করে পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে বহুবার।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও এমনি অলৌকিকতা কিছু কম ছিল না। তবে তাঁর জীবনের অলৌকিকতা আরও কিছুটা বিস্তৃত হয়েছিল।

মাতা চন্দ্রমণির গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন দর্শন ও ব্যবহার আমাদের কাছে আরও মধুর, স্বর্গীয় হয়ে উঠেছে।

কামারপুকুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম আর তাঁর স্ত্রী চন্দ্রমণির ছিল ধর্মের সংসার। দুজনেই সমান সরল ও ঈশ্বরঅন্ত প্রাণ। একবার ক্ষুদিরাম গয়াধাম দর্শনে গেছেন। সেখানে স্বপ্ন দেখলেন, স্বয়ং নারায়ণ তাঁকে বলছেন, তিনি ক্ষুদিরামের সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন।

এদিকে ঠিক একই সময়ে, কামারপুকুরে একটি শিবমন্দিরের সামনে চন্দ্রমণিদেবী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় তিনি দেখলেন মন্দিরের বিগ্রহ থেকে একটা জ্যোতির্বলয় বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর দেহে মিলিয়ে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই চন্দ্রমণি অনুভব করলেন, তিনি গর্ভবতী

হয়েছেন। প্রতিবেশী রমণীরা চন্দ্রমণির কথা বিশ্বাস না করলেও গয়াধাম থেকে ফিরে এসে ক্ষুদিরাম কিন্তু অবিশ্বাস করতে পারলেন না।

তিনিও তো এই রকমই স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঈশ্বরের অহৈতুকী অনুগ্রহে দুজনেই পরিতৃপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

গর্ভাবস্থায় চন্দ্রমণি একদিন দুপুরে ঘরের দাওয়ায় বিশ্রামরত অবস্থায় দেখতে পেলেন হাঁসে-চড়া তিনমুখো এক দেবতা উঠোনে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর মুখটা বড় লাল।

রোদে দেবতার কষ্ট হচ্ছে ভেবে দেবতাকে অনুরোধ জানালেন খানিক বিশ্রাম করে কিছু মুখে দিয়ে যাওয়ার জন্য। দেবতা হেসে মিলিয়ে গিয়েছিলেন।

এমনি দর্শন উপলব্ধি এই অবস্থায় একাধিকবার ঘটেছে চন্দ্রমণির জীবনে। এই মত দর্শনের মাধ্যমে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে তিনি গর্ভে লালন করছেন এই জগতের রক্ষাকর্তাকে।

ঠাকুর যে অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই কথা অতি স্পষ্টভাবে নিজেই একদিন প্রকাশ করেছিলেন সংশয়ী নরেনের কাছে।

১৮৮৬ খ্রিঃ কাশীপুরের বাগানবাড়িতে রয়েছেন ঠাকুর। দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে মৃতপ্রায় অবস্থা তাঁর। সেই অবস্থাতেও ভক্তদের মধ্যে অমৃতকথা বিতরণের বিরাম নেই।

একদিন নরেন বসেছিলেন শয্যাপাশে। ঠাকুরের রোগক্ষীণ অবয়বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, এই অসহনীয় কষ্টের মধ্যেই যদি ঠাকুর স্বীকার করেন যে তিনিই ঈশ্বরের কার্য সম্পাদনের জন্য প্রেরিত অবতার তবেই বোঝা যাবে ঠাকুর সত্যিই তাই।

ঠাকুর নরেনের অনুচ্চারিত মনের কথার জবাব দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, "নরেন, এখনও তোর অবিশ্বাস .... যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানীং এই দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ"।

এরপর শ্রীশ্রী ঠাকুরের দিব্য জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাগুলো আমরা স্মরণ করব। তাঁর জন্ম তারিখ ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ খ্রিঃ। বাংলা ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় তিথি— বুধবার দিন। তাঁর ডাকনাম ছিল গদাধর এবং গদাই।

বাল্যবয়সে সামান্য পড়াশোনা যা করেছেন তা কামারপুকুর গ্রামে জমিদার লাহাবাবুদের পাঠশালায়। বাল্য বয়সেই ভাল গান গাইতে পারতেন, অভিনয় করতে পারতেন। ছবিও আঁকতেন, মাটি দিয়ে কুমোরদের মত মূর্তি গড়তে পারতেন।

ছ'বছর বয়সের মধ্যেই মোটামুটি লিখতে পড়তে শিখে গিয়েছিলেন। তবে 'চাল-কলা বাঁধা বিদ্যেতে' বিশ্বাস ছিল না। লাহাবাবুদের অতিথিশালায় সাধুদের কাছে এবং কথকদের কাছে রামায়ণ-মহাভারত শুনে ধর্মজগতের অনেক তত্ত্ব জেনেছিলেন। পুরাণের গল্প সুন্দর করে অন্যদের শোনাতে পারতেন।

ছয় থেকে সাত বছরের মধ্যেই দুবার ভাবসমাধি হয়। জগতের অন্যান্য অবতার পুরুষদের মতো রামকৃষ্ণও শিশুকাল থেকেই অবতার বলে পূজিত হয়েছিলেন।

কামারপুকুর গ্রামে চিনু শাঁখারী নামে একজন বয়স্ক ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন গদাধরকে পুজো করে বলেছিলেন, 'গদাই, জগৎ যেদিন তোমাকে পূজা করবে তখন এই পৃথিবীতে আমি থাকব না।'

এই চীনু শাঁখারীই শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবানরূপে প্রথম আরাধনা করেছিলেন। ১৮৫৪ খ্রিঃ উপনয়ন হয়। সেই সময় শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্য করে শূদ্রানী কামারনীর কাছে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির উদ্যোগে মা ভবতারিনীর মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছিল ১৮৪৭ খ্রিঃ ৬ই সেপ্টেম্বর। তিন বছরের মাথায় ১৮৫০ খ্রিঃ রামকৃষ্ণের দাদা রামকুমার কলকাতার ঝামাপুকুরে চতুষ্পাঠী নামে টোল খোলেন। টোলের কাজে সাহায্য করার জন্য রামকুমার ছোটভাই গদাইকে কলকাতায় নিয়ে আসেন ১৮৫৩ খ্রিঃ।

সেই সময় তাঁর বয়স সতেরো। গদাই কিন্তু এখানেও পড়াশুনার দিকে আর ঝুঁকলেন না। টোলের কাজের ফাঁকে দু-একটা বাড়িতে কিছুদিন পুজো করেছেন।

রাসমণির ভবতারিনীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৫ খ্রিঃ ৩১শে মে স্নানযাত্রার দিনে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠাই ছিল ধর্মপ্রাণ রানী রাসমণির জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। রামকুমার হয়েছিলেন মন্দিরের পুরোহিত।

গদাধর মা কালীর বেশকারীর কাজ মেনে নিলেন। তাঁর সহকারী নিযুক্ত হলেন ভাগ্নে হৃদয় ওরফে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। সময়টা ১৮৫৫ খ্রিঃ।

সেই বছরই গদাধর দাদার কাছে কালীপূজা শিখে নিলেন আর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে।

১৮৫৬খ্রিঃ রামকুমার দেহত্যাগ করলেন। সেই সময় গদাধর কালীমন্দিরের পূজারীর পদে স্থায়ী হয়েছেন। এই বছর থেকেই তাঁর দেবোত্তমভাব এবং অলৌকিক দর্শন ইত্যাদি ঘটতে লাগল।

১৮৫৯ খ্রিঃ গদাধর কামারপুকুরে এলে বৈশাখমাসে সারদামণির সঙ্গে বিয়ে হল। শ্বশুরবাড়ির কৃত্যাদি সম্পন্ন করে পরের বছর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। তাঁর অবর্তমানে কালীমন্দিরে পূজারী নিযুক্ত হয়েছিলেন হলধারী।

রাসমণি গদাধরকে সাধারণ পুরোহিত জ্ঞান করতেন না। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরীয় শক্তির প্রকাশ নানা সময়েই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং মাকালীর অংশ জ্ঞানেই তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন।

তাঁর জামাতা মথুরেরও গদাধরের মধ্যে আশ্চর্য দর্শন হয়েছিল। তিনিও তাঁকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন।

১৯৬১ খ্রিঃ রাসমণির দেহত্যাগের একবছর আগেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর আগমন ঘটেছিল দক্ষিণেশ্বরে। তিনি গদাধরকে তন্ত্রমতে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং শাস্ত্রবিদ পন্ডিতদের সমাবেশে তাঁর বিভিন্ন সাধনলক্ষণ বুঝিয়ে দিয়ে ঈশ্বর প্রেরিত অবতার বলে ঘোষণা করলেন। ব্রাহ্মণীর যুক্তি সভার সকলেই মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

রামকৃষ্ণের সাধনজীবন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। সখ্য, বাৎসল্য, মধুর সকল ভাবের সাধনাতেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন।

১৮৬৩ খ্রিঃ জটাধারীর কাছে রামমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে তিনি বাৎসল্যভাবের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

সেই সময়ের কলকাতার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন আদি ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। একদিন ব্রাহ্মসমাজে ধ্যানরত অবস্থায় তাঁকে দেখে ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন, 'ওরই ঠিক ফাৎনা ডুবেছে'।

১৯৬৫ খ্রিঃ গদাধর তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে নতুন নাম প্রাপ্ত হলেন—রামকৃষ্ণ। ঠাকুরের এই নামই সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বেদান্ত মতে সাধন গ্রহণের পর তিনি সিদ্ধি লাভ করেন।

যুগের প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। সমস্ত ধর্ম সমন্বয়ের বাণী তিনি প্রচার করেছিলেন। আমরা এক আশ্চর্য ঘটনা ঠাকুরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি যা পূর্বপূর্ব কোন অবতারের ক্ষেত্রে ঘটেনি। প্রতিটি ধর্মকেই তিনি নিজ জীবনে গ্রহণ করে তা সাধন করেছিলেন। এইভাবে তাঁর মধ্যে ঘটেছিল বিভিন্ন অবতারের সমাবেশ।

শম্ভু মল্লিকের বাগানে বাইবেল শুনে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন রামকৃষ্ণ। এই ধর্মের সাধন অবস্থায় তিন দিন তিনি যিশুর ভাবে আবিষ্ট হয়ে থাকেন। তারপর পঞ্চবটীতে একদিন যখন যিশুর কথা ভাবছেন, সেই সময় দেখতে পেলেন অপূর্ব দ্যুতিময় এক সুন্দর পুরুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন। রামকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন ইনিই ঈশ্বরপুত্র যিশু ঈশামসি।

আর একবার ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। গোবিন্দ রায় নামে এক সুফি সাধকের কাছে দীক্ষা নিলেন। ইসলাম ধর্ম সাধনকালে তিনি দীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট, গম্ভীর জ্যোতির্ময় পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

এইভাবে বিভিন্ন সময়ে রামকৃষ্ণের জীবনে দিব্যদর্শনের মাধ্যমে মহাপুরুষদের দর্শন ও মিলন সম্পূর্ণ হবার পরে এল ভাবপ্রচারের শুভকাল।

এই সময় থেকেই তাঁর চিহ্নিত ভক্তদের একে একে সমাগম হতে থাকে—পরবর্তীকালে এঁরাই তাঁর বাণী দেশে বিদেশে বহন করে যুগাবতারের আবির্ভাবকে সার্থক করে তুলেছিলেন।

তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সমাগম ঘটেছিল দক্ষিণেশ্বরের পাঁচটাকা

মাইনের কালীমন্দিরের পূজক রামকৃষ্ণের কাছে। ১৮৬৮ খ্রিঃ রাসমণির সম্পত্তির ব্যাপারে আইনজ্ঞ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন মাইকেল মধুসূদন। এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ঠাকুর নিজে এরকম বিবরণ দিয়েছেন—

"নারায়ণ শাস্ত্রী যখন ছিল, মাইকেল এসেছিল। মথুরবাবুর বড়ছেলে দ্বারিকবাবু সঙ্গে করে এনেছিল। ম্যাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমা হবার যোগাড় হয়েছিল। তাই মাইকেলকে এনে বাবুরা পরামর্শ করেছিল।

দপ্তরখানার সঙ্গে বড় ঘর। সেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি নারায়ণ শাস্ত্রীকে কথা কইতে বললাম। সংস্কৃতে কথা ভাল বলতে পারলে না। ভুল হতে লাগল । তখন ভাষায় কথা হল।

নারায়ণ শাস্ত্রী বললেন, তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে? মাইকেল পেট দেখিয়ে বলে, পেটের জন্য ছাড়তে হয়েছে।

নারায়ণ শাস্ত্রী বললে, যে পেটের জন্য ধর্ম ছাড়ে, তার সঙ্গে কথা কি কইব?

তখন মাইকেল আমায় বললে, আপনি কিছু বলুন।

আমি বললাম, কে জানে কেন, আমার কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না। আমার মুখ কে যেন চেপে ধরেছে।"

তবে সেদিন কিছু না বললেও রামকৃষ্ণ মাইকেলকে দুখানি রামপ্রসাদী গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

শ্রীমা সারদা দেবী প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন ১৮৭২ খ্রিঃ মার্চ মাসে মথুরবাবুর মৃত্যুর পরের বছরে।

রামকৃষ্ণ তাঁর স্ত্রীকে সাক্ষাৎ জগদম্বা রূপে ফলহারিনী কালীপুজোর দিনে পুজো করেছেন। পুজোর পরে সারদা দেবীর শ্রীচরণে তাঁর সাধনার সমস্ত ফল সমর্পণ করেছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর এরকম আশ্চর্য সম্পর্কের কথা জগতে রামকৃষ্ণলীলাতেই প্রথম দেখা গিয়েছিল।

রামকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রথম প্রচার করেন কেশবচন্দ্র সেন— ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায়। তাঁর সেই লেখা প্রকাশিত হলে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মহলই তাঁর নাম জানতে পারে।

এরপরে 'পরমহংসের উক্তি' নামে কেশবচন্দ্রের বই প্রকাশিত হলে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে সকল মহলেই আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্তরা হলেন, লাটু বা রাঘতু-রাম, বলরাম বসু, রাখালচন্দ্র ঘোষ, নরেন দত্ত, যোগিন্দ্রনাথ, নিত্যনিরঞ্জন, মহেন্দ্র গুপ্ত, বাবুরাম, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, শশিভূষণ চক্রবর্তী, কালীপ্রসাদ চন্দ্র, হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র ঘোষ, সারদাপ্রসন্ন মিত্র, গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। ১৮৮০ খ্রিঃ থেকে ১৮৮৫ খ্রিঃ মধ্যে এঁদের সকলের আগমন ঘটে।

১৮৮২ খ্রিঃ ৫ই আগস্ট ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাদুড়বাগানের বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। দুজনের এই সাক্ষাৎকার ইতিহাস হয়ে আছে। ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে বিদ্যাসাগর অভিভূত তৃপ্ত হয়েছিলেন।

নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে ১৮৮৩খ্রিঃ ২২শে মে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান শুনেছেন ঠাকুর। পরের বছর ২১শে সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা নাটক দেখতে যান।

চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নটী বিনোদিনী। ঠাকুর তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন, মা! তোর চৈতন্য হোক। গিরিশের সঙ্গে সেদিনই প্রথম পরিচয় হয়েছিল তাঁর।

শোভাবাজারে অধরলাল সেনের বাড়িতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঠাকুরের কথা হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রিঃ। দেবী চৌধুরানী, কৃষ্ণ চরিত্র প্রভৃতি বঙ্কিমের লেখা নিয়ে ঠাকুর যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনা করেছিলেন।

১৮৮৩ খ্রিঃ ১লা জানুয়ারি ঠাকুর কল্পতরু হয়ে এগারো জন চিহ্নিত ভক্তকে গেরুয়া কাপড় এবং রুদ্রাক্ষের মালা দান করেন। এঁরা সকলেই পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। একখানা কাপড় রেখে দিয়েছিলেন গিরিশের জন্য।

নরেনকে লোকশিক্ষার চাপরাস দান করেন ১৮৮৬খ্রিঃ। নরেন আপত্তি প্রকাশ করলে মন্তব্য করেছিলেন, 'তোর ঘাড় করবে'।

সেই বছরেই কলকাতার লোকদের ভার দিয়েছিলেন সারদাদেবীকে। বলেছিলেন "কলকাতার লোকগুলো অন্ধকারে কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।"

ঠাকুরের গলার রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসার জন্য তাঁকে দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথমে নিয়ে আসা হয়েছিল বাগবাজারে, পরে শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে উদ্যানবাটীতে।

এখানেই ১৮৮৬ খ্রিঃ নরেনকে যথাসর্বস্ব দিয়ে বললেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে ফিরে যাবি।'

শেষবারের মত নরেনকে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন ওই বছরেই। বলেছিলেন, "সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"

শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে বিদায় নিলেন ১৮৮৬ খ্রিঃ ১৫ আগস্ট। বললেন, "মনে হচ্ছে, জলের মধ্যে দিয়ে অনেক দূর চলে যাচ্ছি।"

১৮৮৬ খ্রিঃ ১৬ আগস্ট রাত একটা ২ মিনিটে ঠাকুর মহাসমাধিতে প্রবেশ করেন। পরদিন সন্ধ্যা ছটায় কাশীপুর মহাশ্মশানে ঠাকুরের পবিত্র ভাগবতী তনু চিতাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়।

বাঘা যতীন



বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন প্রশস্তি রচনা করে—

"বাঙ্গালীর রণ দেখে যা রে তোরা রাজপুত, শিখ, মারাঠী জাত,

বালাশোর, বুড়ি-বালামের তীর নবভারতের হলদিঘাট।"

নবভারতে হলদিঘাট বুড়ি বালামের তীরে যে সংগ্রামের কথা কবি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, তার সেনাপতি ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়— বাঘা যতীন নামেই যিনি সমধিক পরিচিত।

বাঙ্গালী ভীরু জাতি, অকর্মন্য, ইংরাজের এই অপপ্রচারের উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন বাঘা যতীন ও তাঁর অনুগামী যুবকেরা ১৯১৫ খ্রিঃ বালেশ্বরে মারণাস্ত্র হাতে সম্মুখসমরে যুদ্ধ করে। জাতির ইতিহাসে সেই কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়া মহকুমার ছোট্ট শান্ত গ্রাম কয়া। এই গ্রামেই ১৮৮০ খ্রিঃ ৮ই ডিসেম্বর যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতা শরৎশশী দেবী।

অল্প বয়সেই পিতৃহারা হয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ। তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল মাতা শরৎশশী।

পরোপকার বৃত্তি, দুঃসাহস ও অন্যায় প্রতিরোধ করার শিক্ষা যতীন্দ্রনাথ কৈশোরেই মায়ের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।

বাঘা যতীনের মা নিজেও ছিলেন বাঘিনী। গ্রামের পাশেই গড়াই নদী। তিনি বালক যতীন্দ্রনাথকে স্নান করাতে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দূরে ফেলে নিজেই সাঁতারে গিয়ে নিয়ে আসতেন।

এভাবে সাঁতার শিখে যতীন্দ্রনাথ একদিন বর্ষার ভরানদী সাঁতার পার হবার সাহস ও শক্তি অর্জন করেছিলেন।

বাঘিনী মায়ের শিক্ষাতেই গড়ে উঠেছিলেন দেশপ্রেমিক যতীন্দ্রনাথ, বিপ্লবী বাঘা যতীন।

কৃষ্ণনগরে মামার বাড়িতে থেকে স্কুলের পড়া শেষ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ। পড়াশোনার চেয়ে নানান খেলা, শরীরচর্চা প্রভৃতিতেই ছিল তাঁর বেশি উৎসাহ

স্থানীয় স্কুলে পড়বার সময়েই একদিন একটি পাগলা ঘোড়াকে কব্জা করে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের শক্তি সাহস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও তাঁর মন ছিল, স্নেহ, মায়া দয়ায় ভরা। যত সামান্য লোকই হোক, কারো কোন উপকার করার সুযোগ পেলে তিনি তা সানন্দে করতেন। তাঁর পরোপকারের বহু ঘটনা এখনো প্রবাদ হয়ে আছে।

যতীন্দ্রনাথের বাঘা যতীন নামটি কে দিয়েছিল তা জানা যায় না, কিন্তু নামকরণের ইতিহাসের সঙ্গে নামটিও অমরত্ব লাভ করেছে।

একবার নিজের জন্মস্থান কয়া গ্রামে এসেছেন যতীন্দ্রনাথ। সেই সময় গ্রামে বাঘের খুব উৎপাত চলছিল।

একদিন গ্রামবাসীরা বাঘের আস্তানায় হানা দিয়েছে। তাদের সঙ্গে বন্দুক হাতে আছেন যতীন্দ্রনাথের এক জ্ঞাতিভাই। একখানা পেন্সিলকাটা ছুরি সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্রনাথও আছেন তাদের সঙ্গে।

হঠাৎ বাঘ দেখা গেল, কিন্তু গুলি ছোঁড়া হলেও, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ক্রুদ্ধ বাঘ লাফিয়ে এসে যতীন্দ্রনাথের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি একহাতে বাঘের গলা জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে ছোরা চালাতে লাগলেন।

অসম সাহসে রীতিমত মরণপণ লড়াই করে শেষ পর্যন্ত বাঘটিকে তিনি মেরে ফেললেন।

নিজেও ক্ষতবিক্ষত হলেন। এরপর দীর্ঘদিন কলকাতায় চিকিৎসাধীন থাকতে হয়েছিল তাঁকে। এই দুঃসাহসিক অভিযানের পর থেকেই তিনি বাঘা যতীন নামে অভিহিত হতেন।

এর পরেও একবার এক বাঘিনীর মুখে পড়তে হয়েছিল যতীন্দ্রনাথকে। সেবার গুলি করে বাঘিনী মেরে তার তিনটি শাবককে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন।

১৮৯৮ খ্রিঃ যতীন্দ্রনাথ এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতা এসে সেন্ট্রাল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু কিছুদিন পরেই পড়া ছেড়ে স্টেনোগ্রাফী শিক্ষা করেন। পরে বাংলা সরকারের সেক্রেটারি হুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফার নিযুক্ত হন। শুরু হল যতীন্দ্রনাথের কর্মজীবন।

কিশোর বয়সেই পরাধীনতার গ্লানি, দাসত্বের অপমান যতীন্দ্রনাথের মনে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছিল। যুবক বয়সে সেই বেদনা তাঁর মনে আরও গভীর রেখাপাত করল। তিনি বুঝতে পারছিলেন মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ হল পরাধীনতা।

কি করে দেশ স্বাধীন করে মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচার পথ করা যায়, দেশের অগণিত মানুষের দুঃখ দূর করা যায় এই চিন্তাই যতীন্দ্রনাথকে সংগ্রামের পথ, বিপ্লবের পথের সন্ধান দেখিয়ে দিল।

১৯০৫ খ্রিঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশাত্মবোধের প্রেরণায় জেগে উঠল সারা দেশ। সেই আবর্তে যতীন্দ্রনাথ ভেসে গেলেন। অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করলেন।

এই ভাবেই স্বাধীনতার বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হল।

এই সময় থেকে যতীন্দ্রনাথের অবশিষ্ট জীবন হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক আপোশহীন সংগ্রামের ইতিহাস।

১৯১০ খ্রিঃ কলকাতায় আলিপুর বোমার মামলার তদ্বিরকারী বিখ্যাত সি-আই-ডি অফিসার মৌলভী শামসুল আলমকে গুলি করে হত্যা করলেন বীরেন্দ্র দত্ত গুপ্ত নামে এক যুবক।

পরে তিনি ধরা পড়লে, পুলিশ জানতে পারে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশেই এই হত্যাকান্ড হয়েছে। এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আরো কয়েকজনের সঙ্গে পুলিশ যতীন্দ্রনাথকেও গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ নানা প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে তাঁকে চালান করে দেওয়া হয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

যতীন্দ্রনাথ ও আরো কয়েকজন বিপ্লবীকে জড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যে মামলা করেছিল তা হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত।

১৯১০ খ্রিঃ মার্চ মাসে শুরু হয়ে ১৯১১ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হয়। এক বছর জেলে থাকার পর প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্সের বিচারে অভিযুক্তগণ সকলেই নিরপরাধী সাব্যস্ত হন।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার ফলে যতীন্দ্রনাথের নাম সরকারের বিরাগভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় উঠে গেল। ফলে তিনি মিঃ হুইলারের অধীন চাকরিটি খোয়ালেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তাই জেলা বোর্ডের কনট্রাকটরের কাজ নিতে হল।

এই কাজের জন্য নানা স্থানে ঘোরাঘুরির সময় যতীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, সরকাবী গুপ্তচরেরা তাঁকে সর্বক্ষণ নজরে রাখছে। এতে যতটা অস্বস্তি তাঁর হল, তার চেয়ে বেশি উদ্রেক হল বিরক্তি।

ইংরাজদের ওপরে ছিল যতীন্দ্রনাথের মর্মান্তিক বিতৃষ্ণা। কারণ যে কোন ইংরাজই সুবিধা পেলে এদেশীয়দের ওপর অত্যাচার করতে ছাড়ত না। দিনে দিনে তাঁর ইংরাজের প্রতি বিতৃষ্ণা ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিণত হল।

একবার ফোর্ট উইলিয়ামের কাছে গোরাবাজারে অন্যায় কাজের জন্য এক গোরা সৈন্যকে বেধড়ক পিটুনি দিয়েছিলেন তিনি।

আর একবার সরকারি কাজে দার্জিলিং যাবার পথে এক স্টেশনে কয়েকজন ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে খুবই মারামারি হয়েছিল।

বলা বাহুল্য অসম্ভব দৈহিক শক্তির অধিকারী যতীন্দ্রনাথ গোরা সৈন্যদের লাঞ্ছনার চূড়ান্ত করেছিলেন।

জাতীয় মর্যাদার প্রতি সজাগ দৃষ্টি ছিল যতীন্দ্রনাথের। সে কারণেই তিনি জাতীয় জীবনের সকল মান অপমানকে নিজের মান অপমান বলে গ্রহণ করতে শিখেছিলেন। তাই সমগ্র সত্তা তাঁর ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে নষ্ট সম্মান পুনরুদ্ধার করবার জন্য। উত্তরকালে এই উদ্দেশ্যের বেদীমূলেই তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, সন্ধ্যা প্রভৃতি বিপ্লবী দলগুলির সংস্পর্শে এসে যতীন্দ্রনাথ বিভিন্ন গুপ্ত সমিতিতে কাজ করতে থাকেন।

আলিপুর বোমা মামলায় যখন বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হলেন, তখন যতীন্দ্রনাথের ওপরেই অবশিষ্ট দলের নেতৃত্বের ভার পড়ল।

বাংলার গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথই প্রথম উপলব্ধি করেন যে শক্তিশালী ইংরাজকে ভরতভূমি থেকে চিরদিনের মত দূর করতে হলে এক শক্তিশালী এবং ব্যাপক সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজন। এই কাজেব জন্য বাংলার প্রধান বিপ্লবী গ্রুপগুলোকে একত্রিত করা দরকার।

তিনি আরও উপলব্ধি করলেন, অভ্যুত্থানের কাজে ইংরাজ বিরোধী রাষ্ট্রশক্তিগুলির সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।

বস্তুতঃ এর পর থেকেই সে যুগের বাংলার বিপ্লববাদী চিন্তাধারা যে সঙ্কীর্ণ খাত বেয়ে চলেছিল যতীন্দ্রনাথ তার গতি অন্যপথে চালিত করলেন।

বৈদেশিক সাহায্য চেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার যতীন্দ্রনাথ নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলসে কাজ করতেন স্বদেশী ভাবধারার এক তরুণ অবনী মুখার্জি। যতীন্দ্রনাথ তাঁকে দলে টানলেন এবং বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য জাপানে যেতে অনুরোধ করেন।

সেই সময় ব্যবসা ক্ষেত্রে জাপান ছিল ইংরাজের প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই যতীন্দ্রনাথ তাঁর বাস্তববুদ্ধি বলে বুঝতে পেরেছিলেন ইংরাজের বিরুদ্ধে গুপ্ত আন্দোলনে জাপানের সহানুভূতি পাওয়া যেতে পারে।

যতীন্দ্রনাথের পরামর্শে অবনী মুখার্জী ১৯১০ খ্রিঃ জাপান গেলেন কিন্তু তাঁকে নিরাশ হয়েই ফিরতে হল।

১৯১৪ খ্রিঃ ইউরোপের আকাশ মহাযুদ্ধের মেঘ আচ্ছন্ন করে ফেলল। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধল ইংরাজের।

এদিকে একই সময়ে অত্যাচারিত বিক্ষুব্ধ বাংলার শহরে শহরে সন্ত্রাসবাদী তরুণেরা ইংরাজ শত্রু নিধনের কাজে তৎপর হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে জার্মানিতে ভারতীয় ছাত্রদের উদ্যোগে জার্মান থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচারকার্য চালাবার জন্য বার্লিন কমিটি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যতীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ১৯১৫ খ্রিঃ পুনরায় অবনী মুখার্জীকে জাপানে রাসবিহারী বসুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এইভাবে একের পর এক যথাযোগ্য স্থানে যোগাযোগ ঘটিয়ে চীনের নেতা ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের কাছ থেকে ৫০টি পিস্তল, অনেকগুলি কার্তুজ ও বহু টাকা সাহায্য বাবদ পাওয়া গেল।

বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করতে হলে প্রচুর টাকার দরকার। যতীন্দ্রনাথ সেই টাকার সুরাহা করলেন স্বদেশী ডাকাতির মাধ্যমে।

রডা কোম্পানির ৫০টি মশার পিস্তল এবং ৪৬,০০০ রাউন্ড গুলি এবং ৪০,০০০ টাকা সংগৃহীত হল। অস্ত্রগুলি তৎকালীন বাংলার ৯টি বিপ্লবী উপদলের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম.এন.রায়) ও জীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর যোগাযোগের ফলে জার্মান সরকার এক জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র বাংলার বিপ্লবীদের পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে পাঠালেন বেশ কিছু অর্থসাহায্য।

স্থির হয়েছিল, হাতিয়া-সন্দীপ, বালকা ও বালেশ্বর এই তিন জায়গায় জার্মান জাহাজ থেকে অস্ত্র নামিয়ে নেওয়া হবে।

দুর্ভাগ্য যে ম্যাভরিকি নামের এই জাহাজ ১৯১৫ খ্রিঃ জুন মাসে ওয়াশিংটনের কাছে খানাতল্লাসীর ফলে সব অস্ত্রশস্ত্র আমেরিকান সরকার বাজেয়াপ্ত করল।

এরপব জার্মান কনসাল আরও তিন জাহাজ অস্ত্র ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। এ বিষয়ে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে সমস্ত যোগাযোগ করলেন রাসবিহারী বসু, ভগবান সিংহ ও অবনী মুখার্জী।

স্থির হল অস্ত্রবোঝাই জাহাজ তিনটির একখানা বালেশ্বরে এবং অপর দুটি গোয়া ও রায়মঙ্গলের কাছে আসবে।

বালেশ্বরে যে জাহাজটি আসছিল তাতে ছিল ২০০ পিস্তল, প্রচুর কার্তুজ, হাতবোমা ও বিস্ফোরক পদার্থ ও দুলাখ টাকা। অন্য দুটি জাহাজেও ছিল অনুরূপ পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র।

দুর্ভাগ্য যে প্রথম জাহাজটি ১৯১৫ খ্রিঃ ১৭ নভেম্বর আন্দামানের কাছে এলে, ব্রিটিশ রণতরী সেটিকে ডুবিয়ে দেয়।

এই সংবাদ পেয়ে অপর দুটি জাহাজ পথ ঘুরিয়ে মেকসিকো উপসাগরের দিকে

নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অস্ত্রশস্ত্রগুলি জাহাজের কর্তৃপক্ষ কম দামে জলদস্যুদের কাছে বিক্রি করে স্বদেশে ফিরে যায়।

যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অক্লান্ত চেষ্টায় যে ভারত-জার্মান সহযোগিতা গড়ে উঠেছিল, তা ব্যর্থ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজেরই জয় ঘোষিত হল।

জাতির দুর্ভাগ্য এই যে, ভারতের মাটি থেকে মীরজাফর, উমিচাঁদের দল এখনো বিলুপ্ত হয় নি। তাই অনন্ত সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল।

যে ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল তার নাম কুমুদনাথ মুখার্জি। এই লোকটি বিপ্লবীদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকারে কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল।

পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্য যতীন্দ্রনাথ চারজন সঙ্গী নিয়ে বালেশ্বরে এসে পৌঁছান। এই চারজনের নাম চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিষচন্দ্র। জার্মানদের পাঠানো অস্ত্রবোঝাই জাহাজের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন তাঁরা।

ইতিমধ্যে কোন গুপ্তচর মারফত সংবাদ পেয়ে বালেশ্বরের আশেপাশে পুলিশ ছড়িয়ে পড়ল। বিপ্লবীদের দিন কাটছে একরকম অনাহারে। এই অবস্থায় খাদ্যের সন্ধানে পাঁচজনে মিলে ঘুরতে ঘুরতে জনমানবহীন বঙ্গোপসাগরের তীরে বুড়ি বালামের কাছাকাছি উপস্থিত হলেন।

কাছেই একটা খাবারের দোকান ছিল। যতীন্দ্রনাথ সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে খাবার কিনে খেতে বসলেন। পথশ্রমে সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত, ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ।

সেই সময়ে পুলিশ কমিশনার অত্যাচারী টেগার্ট বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে কাছাকাছি অঞ্চলেই ছিলেন।

একদল বিপ্লবী খাবারের দোকানে খাবার খাচ্ছে, দোকানী এই খবর সকলের অজ্ঞাতে পুলিস ছাউনিতে পাঠিয়ে দিল।

খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই টেগার্ট একদল রাইফেলধারী পুলিস নিয়ে যতীন্দ্রনাথকে বন্দি করার জন্য ছুটে এলেন।

সদাসতর্ক যতীন্দ্রনাথ হাওয়ায় বিপদের গন্ধ পেয়ে সঙ্গীদের সতর্ক করে দিলেন, পালাবার চেষ্টা করলেন না। মরণকে তুচ্ছ করে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন।

১৯১৫ খ্রিঃ ৯ই সেপ্টেম্বর! এই দিনে বুড়ি বালামের তীর মরণজয়ী বিপ্লবীদের রক্তে পরিণত হয়েছিল রক্ততীর্থে।

পুলিস কমিশনার নিকটবর্তী হবার আগেই একটা তপ্ত বুলেট তাঁর কানের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে বিপ্লবীদের আক্রমণ-সঙ্কেত জানিয়ে দিল। গুলি ছুঁড়েছেন যতীন্দ্রনাথ।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিসও পাল্টা গুলি চালাল। শুরু হল উভয়পক্ষে গুলি বিনিময়।

সামরিক অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না বিপ্লবীদের। মাটির গর্তকে পরিখা রূপে ব্যবহার করে তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে চললেন।

মৃত্যুভয়হীন মুক্তিপাগল বিপ্লবীদের অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণের সামনে টেগার্টের বাহিনী বেশিক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিল না। তারা পিছু হটতে বাধ্য হল।

এই যুদ্ধ বালেশ্বরের যুদ্ধ বা Balasore Trench Fight নামে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে।

বিপ্লবীরা এই সুযোগে গ্রাম ছাড়িয়ে সাঁতরে নদী পার হলেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না এক ভিখারীবেশী দারোগা তাঁদের অনুসরণ করে চলেছিল। সে নদী পার হয়ে একটা গাছের ওপরে উঠে বিপ্লবীদের লক্ষ করতে লাগল। ছদ্মবেশী এই দারোগাটির নাম চিন্তামণি সাহু।

ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বিপ্লবীরা একটি বিরাট উই ঢিবি পেয়ে তার অন্তরালে আশ্রয় নিলেন।

ইতিমধ্যে অনুসরণকারী পুলিসবাহিনী দারোগা চিন্তামণির কাছে বিপ্লবীদের অবস্থানস্থল জানতে পেরে সেখানে এসে উপস্থিত হল।

তিনশত রাইফেলধারী পুলিস। এদের পরিচালনায় রয়েছে বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি ও মিলিটারি লেফ্‌টেনান্ট রাদারফোর্ড। কিছু সংখ্যক দেশীয় অফিসার তাদের সহায়তা করছিল।

দারোগা চিন্তামণি হাত দিয়ে উইঢিবিটি দেখিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তিন শত রাইফেল গর্জন করে উঠল। গুলি বর্ষণ করতে করতে তারা এগিয়ে চলল।

বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে কোন বন্দুকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এতে পুলিসের ধারণা হল বিপ্লবীদের হাতে দূরপাল্লার অস্ত্র নেই।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ যে কত বড় সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন, এই যুদ্ধের বিবরণ থেকে যুদ্ধবিশারদগণ তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

যতীন্দ্রনাথ তাঁদের মসার পিস্তল গুলিভর্তি করে নীরবে প্রতীক্ষা করছিলেন। এই পিস্তলের গঠন কৌশল এমনই যে বাঁট বাড়িয়ে নিলেই রাইফেলের মত কাজ করে।

এই অদ্ভুত অস্ত্রটি হাতে নিয়ে বিপ্লবীরা প্রশস্ত ঢিবির আড়ালে বেশ নিরাপদেই রয়েছেন। বিপক্ষের সমস্ত গুলিই ঢিবির গায়ে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

একসময় পুলিস বাহিনী নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেল। অমনি যতীন্দ্রনাথ আদেশ দিলেন—Fire—

পাঁচটি মসার পিস্তল সঙ্গে সঙ্গে বিপুল গর্জনে গুলি বর্ষণ শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে লেফটেনান্ট রাদারফোর্ডের ফৌজ হতাহত অবস্থায় মাঠের জলকাদায় গড়াগাড়ি যেতে লাগল।

কেউ আলের আড়ালে আশ্রয় নিল, কেউ মাঠে বুক মিশিয়ে পড়ে থেকে গুলি চালাতে লাগল।

বিপ্লবীদের সহায় ছিল বীরত্ব, সাহস, নৈপুণ্য আর জ্বলন্ত দেশপ্রেম। ব্রিটিশ পক্ষে

ছিল রাইফেলধারী তিনশত সৈন্য। সেদিনের লড়াইতে বিপ্লবীরা যে পরিমাণ সৈন্য সংহার করলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির নেই।

সহসা শত্রুপক্ষের বুলেটের আঘাতে যতীন্দ্রনাথের বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি চূর্ণ হয়ে গেল। ডান হাতেই তিনি মসার পিস্তল চালাতে লাগলেন।

সহসা একটি বুলেট চিত্তপ্রিয়র মাথায় বিদ্ধ হল। 'দাদা' বলে শেষ কথা উচ্চারণ করে তিনি যতীন্দ্রনাথের কোলে ঢলে পড়লেন।

বিপ্লবীজীবনের চরম আনন্দ ও গৌরব লাভ করে চিত্তপ্রিয় চিরপ্রিয় দলনেতার কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে স্বদেশের ইতিহাসে চিরঅমরত্ব অর্জন করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে শোকের অবকাশ নেই। বিগতপ্রাণ সহযোদ্ধার মৃতদেহ পাশে রেখেই চার বিপ্লবীকে অস্ত্রচালনা করে যেতে হল।

এই অসম যুদ্ধ চলল প্রায় তিন ঘন্টা। এই সময়ে রাদারফোর্ডের বাহিনী অজস্র গুলিবর্ষণ করেছে।

জ্যোতিষ মারাত্মকভাবে আহত হলেন। যতীন্দ্রনাথের পেটে একটি এবং চোয়ালে একটি গুলি বিদ্ধ হল। সঙ্গের টোটাও সব ফুরিয়ে গেল।

বিপ্লবীদের গুলি ফুরিয়ে গেছে, রাদারফোর্ডের বুঝতে বিলম্ব হল না। তারা ক্রমে এগিয়ে এসে বিপ্লবীদের ঘিরে ফেলল।

যতীন্দ্রনাথের শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। তিনি ফিলবিকে বললেন, ''The entire responsibility is mine. These boys are innocent, they have simply carried out my orders. Please see that no injustice is done to them under the British Raj.''

যতীন্দ্রনাথ সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে শেষ চেষ্টা করেছিলেন যাতে মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষকে ফাঁসি থেকে বাঁচাতে পারেন।

মুমূর্ষু যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বর হাসপাতালে পাঠানো হল। একদিন পরে, ১৯১৫ খ্রিঃ ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পরে বিশেষ আদালতের বিচারে মনোরঞ্জন ও নীরেনের ফাঁসির হুকুম হয়, জ্যোতিষের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

মাত্র ৩৬ বছর বয়সেই বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের নেতৃজীবন শেষ হয়। বিস্ময়কর ছিল তাঁর প্রতিভা, অচিন্তনীয় ছিল শক্তি ও বীরত্ব আর অপরিমেয় দেশ প্রেম।

যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পুলিশ কমিশনার টেগার্ট তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেছিলেন, **''I have met the bravest Indian. I have the greatest regard for him but I had to do my duty.''**

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট



অদ্বিতীয় ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ছিলেন ফ্রান্সের নবজাগরণের প্রাণপুরুষ, মহান সৈনিক এবং কল্যাণকামী জননায়ক। কিন্তু সমগ্র জীবনে তিনি অগণিত মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়েছিলেন। সমগ্র জাতিকে ঠেলে দিয়েছিলেন ধ্বংসের মুখে।

১৭৬৯ খ্রিঃ ফ্রান্সের কর্সিকা দ্বীপে নেপোলিয়নের জন্ম। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি রুশো-ভলতেয়ার মন্টেসক-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন।

সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের পর সতের বছর বয়সে ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করেন।

ইংরাজ বাহিনী ১৭৯৩ খ্রিঃ টুলো বন্দর অবরোধ করলে নেপোলিয়ান বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে বন্দর রক্ষা করেন।

এর দুবছর পরে ১৭৯৫ খ্রিঃ ফরাসী জনতা জাতীয়সভা আক্রমণ করলে নেপোলিয়ান তাদের নিরস্ত করে খ্যাতি অর্জন করেন।

১৭৯৬ খ্রিঃ ডাইরেক্টরী নেপোলিয়নকে ফরসী বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ করে ইতালি অভিযানে পাঠায়।

সেই সময় নেপোলিয়ানের বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। ইতালিতে অভিযানে কৃতকার্য হবার পর ১৮০০ খ্রিঃ ১৪ই জুন তিনি আঠারো হাজার সৈন্য নিয়ে অস্ট্রিয়ান বাহিনীকে আক্রমণ করেন।

নেপোলিয়নের এই অভিযানও সফল হয় এবং অস্ট্রিয়ান সম্রাট তাঁর সঙ্গে ক্যাম্পেনফরমিডর সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন।

বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য এইভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের জনগণের মন জয় করে নেন।

অস্ট্রিয়া অভিযানের পর ডাইরেক্টরী নেপোলিয়নকে ইংলন্ড আক্রমণের জন্য নিযুক্ত করে। নেপোলিয়ন কিন্তু সরাসরি ইংলন্ড আক্রমণ না করে কৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি অন্য দিকে অগ্রসর হয়ে মিশর আক্রমণ করেন এবং ১৭৯৮ খ্রিঃ ২১শে জুলাই বিখ্যাত পিরামিড যুদ্ধে জয়লাভ করেন। মিশরে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ফরাসীদের মিশরে বেশি দিন নির্বিঘ্নে কাটল না। অচিরেই বৃটিশ সেনাপতি নেলসন নীলনদের যুদ্ধে ১৭৯৮ খ্রিঃ ১লা আগস্ট ফরাসী নৌবহরকে বিধ্বস্ত করেন। পরাজিত নেপোলিয়ন কোনক্রমে ফ্রান্সে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন।

এই যুদ্ধে ফ্রান্সের ক্ষতি হলেও বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য নেপোলিয়নের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

মিশর থেকে ফিরে আসার পর (১৭৯৯ খ্রিঃ) নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরী ভেঙ্গে দিয়ে কনসালেট নামে এক নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৮০৪ খ্রিঃ ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং সাম্রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতির বিষয়ে সচেষ্ট হন।

এদিকে ফরাসীদের অভ্যন্তরীণ উন্নতি লক্ষ করে ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ইতালি প্রভৃতি রাজ্যগুলি দখল করে নেন।

উদ্বিগ্ন রাশিয়া ইংলন্ড ও অস্ট্রিয়া মিলে একটি রাষ্ট্রজোট গঠন করে। এটি ছিল ইউরোপের তৃতীয় রাষ্ট্রজোট।

নানান কারণে ইংরাজের সঙ্গেও ফ্রান্সের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ল। নেপোলিয়ন তাঁর বাহিনীকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত করলেন। ১৮০৫ খ্রিঃ ২১ শে অক্টোবর উলম-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার বাহিনী পর্যুদস্ত হলে সেনাপতি কম্যান্ডার ম্যাক ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

এরপর অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী নেপোলিয়নকে আক্রমণ করলে অস্টারনিজ নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ হয়। দুই রাষ্ট্রের মিলিত শক্তি নেপোলিয়নের কাছে পরাজিত হয়।

নেপোলিয়ান ইতালির রাজা বলে স্বীকৃত হলেন। এরপর তৃতীয় রাষ্ট্রজোট ভেঙ্গে যায়।

এতদিনের যুদ্ধে প্রাশিয়া ছিল নিরপেক্ষ। কিন্তু ফরাসী বাহিনীর অগ্রগতি লক্ষ করে প্রাশিয়া ফ্রান্সকে বাধা দেবার পরিকল্পনা করে। ১৪ই অক্টোবর জেনা এবং অস্টারলিজের যুদ্ধে প্রাশিয়া পরাজিত হয় এবং নেপোলিয়নের বাহিনী বার্লিনে উপস্থিত হয়। নেপোলিয়ন জার্মানিকে পুনর্গঠিত করলেন। রাইন রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করা হল।

প্রাশিয়ার পরাজয় রাশিয়াকে স্বাভাবিক ভাবেই ভীত করে তুলল। তারা নেপোলিয়নের অগ্রগতিকে বাধা দিতে অগ্রসর হলে ১৮০৭ খ্রিঃ ১৪ই জুন ফ্রিডল্যান্ড নামক স্থানে দুই বাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

যুদ্ধে রুশবাহিনী নেপোলিয়নের হাতে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়। ৭ই ও ৯ই জুলাই জার প্রথম আলেকজান্ডার নেপোলিয়নের সঙ্গে যে সন্ধি করেন তার নাম টিলজিটো সন্ধি।

এইভাবে উপর্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধের বিজয়ের ফলে কার্যত নেপোলিয়নই হয়ে উঠলেন ইউরোপের সর্বেসর্বা।

ইংলন্ডকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত না করে নেপোলিয়ন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। টিলজিটো-এর সন্ধির পর তিনি ইউরোপে ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠত্ব অবদমিত করবার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে না নেমে পরোক্ষ ব্যবস্থা নেবার সংকল্প করলেন। অর্থনৈতিক আঘাতই হবে সেই পরোক্ষ আঘাত। নেপোলিয়ন অবিলম্বে মহাদেশীয় ব্যবস্থা নামে এক অর্থনৈতিক অবরোধের নীতি গ্রহণ করলেন। এই নীতি গ্রহণের ফলে ১৮০০ খ্রিঃ স্পেন ও পর্তুগালে ফরাসী বিক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠল এবং স্পেনে ফ্রান্সের প্রভাব অনেকটাই ক্ষুন্ন হয়।

এই সুযোগ গ্রহণ করে অস্ট্রিয়া। ইংলন্ডের সমর্থনপুষ্ট হয়ে তারা আবার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৮০৯ খ্রিঃ ১৩ই মে ফরাসী বাহিনী ভিয়েনার অভ্যন্তরে উপস্থিত হয়। গোড়ার দিকে বিপর্যস্ত হলেও ৫ই জুলাই ওয়াগ্রামে যে যুদ্ধ হয় তাতে ফরাসী বাহিনী অনেকটা সামলে নিল।

কিন্তু বিপক্ষ বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করতে পারল না। তবে ইউরোপে নেপোলিয়নের আধিপত্য তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হল না।

এই পরিস্থিতিতে ১৮১২ খ্রিঃ ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে নেপোলিয়ন রাশিয়া অভিযানে অগ্রসর হলেন। রুশবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করে কিন্তু তারা পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে গ্রাম নগর ও খাদ্যশস্য ধ্বংস করে দিয়ে গেল। ফলে বিরাট সৈন্যবাহিনীর রসদ যোগানোর বিষয়ে নেপোলিয়ন নিশ্চিতভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়লেন।

বেরোডিনো নামক স্থানে উভয় বাহিনীর যুদ্ধ হয় ৭ই সেপ্টেম্বর। এই যুদ্ধে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হলেও ১৬ই সেপ্টেম্বর ফরাসী বাহিনী মস্কোয় প্রবেশ করে।

এই অভিযান যে নেপোলিয়নের ক্ষেত্রে চরম ভুল হয়েছিল তার প্রমাণ হয় যখন ফেরার পথে রুশ গেরিলাদের আক্রমণে ফরাসী বাহিনী একেবারেই পর্যুদস্ত হল।

নেপোলিয়ন যখন কোনক্রমে দেশে ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে মাত্র ৫০ হাজার সৈন্য ফিরতে পারল।

মহাপরাক্রান্ত নেপোলিয়নকেও পর্যুদস্ত করা সম্ভব, রাশিয়া এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হল। ফলে ইউরোপে নেপোলিয়নের শত্রুরাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা লাভ করল।

জার্মানি থেকে নেপোলিয়নকে বিতাড়নের পরিকল্পনা নিয়ে ইংলন্ড ও রাশিয়ার সঙ্গে ১৮১৩ খ্রিঃ প্রাশিয়াও যোগ দিল। কিন্তু ওই বছর ২রা এবং ২০ শে মে তারিখে

ল্যুটজেন ও ব্যুটজেনের যুদ্ধে নেপোলিয়ন সম্মিলিত রাশিয়ান ও প্রাশিয়ান বাহিনীকে পরাস্ত করলেন।

ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়াও নেপোলিয়ন বিরোধী জোটে যোগ দিল। এই সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে দ্বিতীয় বারের মত ফরাসীবাহিনীর যুদ্ধ হল লিপজিগে। ১৬ই থেকে ১৯ শে নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ চলে এবং নেপোলিয়ন মিত্রবাহিনীর কাছে পরাজিত হলেন।

১৭৯৩ খ্রিঃ পর থেকে এই প্রথম ফ্রান্সের পরাজয় ঘটল। এই পরাজয়ের পর থেকেই নেপোলিয়ন নিজ দেশেই জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করলেন।

ক্রমেই তাঁর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগল। গোটা দেশজুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠল। এককালে যে সকল ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর সাহায্যে উপকৃত হয়েছিল তাঁরাই হয়ে উঠল তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ।

১৮১৪ খ্রিঃ নেপোলিয়নের নিজস্ব সেনেটই তাঁর পদত্যাগ দাবি করল। পরিস্থিতির চাপে পড়ে সম্রাটকে ফ্রান্সের সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করতে হল। এলবার শাসনভার নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হল।

১৮১৫ খ্রিঃ মার্চ মাসে নেপোলিয়ন পুনরায় সিংহাসনের দাবি নিয়ে ফ্রান্সে উপস্থিত হলেন।

এই সময়ে সমগ্র ইউরোপ তাঁর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হল এবং ১৮১৫ খ্রিঃ ১৮ই জুন ওয়াটারলুর প্রান্তরে উভয়পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হল। যুদ্ধে নেপোলিয়ন ওয়েলিংটনের হাতে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলেন।

দুর্জয় বীর নেপোলিয়ন অবশেষে বন্দী হলেন। তাঁকে দক্ষিণ আটলান্টিকের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এখানেই ১৮২৯ খ্রিঃ বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নেপোলিয়নের জীবন ও কীর্তি নিয়ে পরবর্তীকালে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই বিপুল গ্রন্থরাজিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সেগুলো হল—(১) সমসাময়িক ব্যক্তিদের এবং তাঁর সেনাপতিদের জীবনকাহিনী।

(২) সমসাময়িকদের দ্বারা যেমন—Bourrienne, Las Cases, Forsyth, O Mears প্রভৃতি রচিত ব্যক্তিগত জীবনকথা এবং (৩) আধুনিককালে রচিত সমালোচনা মূলক গ্রন্থ সমূহ।

আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, Lanfrey, Jung, Seelay, O' Connor Morris, Walsley, Sloane প্রভৃতি।

কার্ল মার্কস



১৮১৮ খ্রিঃ ৫ই মে, জার্মানির রাইসল্যান্ডের ট্রিয়েরে এক ইহুদী পরিবারে কার্ল মার্কসের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন একজন আইনজীবী। ফলে ছেলেবেলায় বাড়িতে পড়াশুনার উপযুক্ত পরিবেশই পেয়েছিলেন মার্কস।

পরিবারটি ইহুদী হলেও পরে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এ বিষয়ে বালক মার্কসের কোনই তাপউত্তাপ ছিল না।

একেবারে বাল্য অবস্থা থেকেই তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠে স্বাধীনচেতা, উদ্দাম ও বিদ্রোহী মানুষের মনোভাব। নিজের কাছে যা ভাল মনে হতো তার বাইরে তাঁকে দিয়ে কিছুই করানো বা মানানো যেত না।

এই স্বভাবজাত গুণাবলীর গুণেই তিনি উত্তরকালে বিশ্বের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রূপে গণ্য হয়েছিলেন।

তাঁর চিন্তা ও ব্যক্তিত্ব বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তনের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে চিহ্নিত হয়েছিল।

স্কুলের পড়া শেষ করে আইন পড়ার জন্য মার্কস ১৭ বছর বয়সে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, পরের বছরে চলে যান বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বয়স মাত্র আঠারো, এই সময়েই মার্কসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ব্যারন ভন ওয়েস্ট ফ্যালেন-এর মেয়ে জেনিস-এর সঙ্গে। হৃদ্যতা জমে উঠতেও বিলম্ব হয় না।

তখনো পড়াশুনোর পাট চোকেনি, উপার্জনের পথ তো দূর অস্ত, তার ওপরে সাধারণ এক মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, তবু এমনই মনোবল আর আত্মপ্রত্যয় যে মার্কস ব্যারন ভনকে চিঠি লিখে নির্দ্বিধায় জানালেন, তিনি তাঁর মেয়ে জেনিকে ভালবাসেন, বিয়ে করতে চান।

মার্কসের ধৃষ্টতায় ব্যারন ভন ক্রুদ্ধ হলেও জেনির ভালবাসায় ছিল পবিত্রতা, আর মার্কসের প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধা। তারই বলে এক সময় তিনি তাঁর বাবাকে তাঁদের বিয়েতে সম্মতি দিতে রাজি করান।

উত্তরকালের রাজনৈতিক জগতে যিনি বজ্রনির্ঘোষে নিজের আবির্ভাব ঘোষণা করে পৃথিবীকে চমকে দিয়েছিলেন, এটা আশ্চর্য নয় যে তাঁরও জীবনে থাকতে পারে হৃদয়ানুভূতি ও আবেগের একটা স্বাভাবিক পর্যায়।

নিজেকে প্রকাশ করবার তাগিদে মার্কস তাঁর প্রণয়-পর্বে জেনিকে একের পর এক কবিতা লিখে পাঠাতেন।

১৮৪১ খ্রিঃ বার্লিনের অ্যাথেনিয়াম কাগজে প্রকাশিত দুটি কবিতাই মার্কসের প্রথম মুদ্রিত লেখা।

কবি হিসেবেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রের ধুরন্ধর তাত্ত্বিক কার্ল মার্কস।

মার্কস ডক্টরেট করেছিলেন জেনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

সেই সময়ে বার্লিনে নব্য হেগেলপন্থীরা প্রচলি কিছু ধ্যান-ধারণা এবং বাইবেলের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। মার্কসের সম্পর্ক তাদের সঙ্গে এবং ব্রুনো বয়ার সঙ্গে ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

তিনি এই সময়ে যে ধর্মবিরোধী আন্দোলনের সংস্পর্শে এলেন, সেই ধর্মবিরোধিতাই মূল ভিত্তি রূপে কাজ করেছিল উত্তরকালে তাঁর প্রবর্তিত রাজনৈতিক দর্শনের মূলে।

বন থেকে মার্কস চলে আসেন প্যারিসে। এখানে জেনির সঙ্গে তাঁর বিয়ের কাজ চুকল। জেনি পুরোপুরি ভাবেই হয়ে উঠলেন মার্কসের জীবনসঙ্গিনী—জীবন, চিন্তা ও কর্ম সকল ক্ষেত্রেই।

প্যারিসের ডোর ওরার্টস কাগজে প্রুশিয়া সরকারের বিরুদ্ধে মার্কস তীব্র আক্রমণাত্মক লেখা লিখতে শুরু করলেন।

ফলে প্রুশিয়া সরকারের অনুরোধে ফরাসি সরকারকে মার্কসকে দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ ঘোষণা করতে হল।

ফ্রান্স ছাড়বার আগেই মার্কসের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

এঙ্গেলস ছিলেন এক জার্মান বস্ত্র ব্যবসায়ীর সন্তান। বয়সে মার্কসের চাইতে বছর দুয়েকের ছোট। মার্কসের মত তিনিও ছিলেন মনেপ্রাণে বিপ্লবী চিন্তাধারার অধিকারী।

তিনি যখন ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁর বাবার ব্যবসার সূত্রে ছিলেন তখনই শ্রমিক আন্দোলনের নেতা রবার্ট ওয়েন প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

এঙ্গেলসের সঙ্গে মার্কসের প্রথম আলাপ হয়েছিল বনেই। তখন রাইনস্কি জুটা নামে হেগেলপন্থীদের বিপ্লবী চিন্তা ধারা নিয়ে একটি পত্রিকায় তিনি তাঁর আক্রমণাত্মক লেখা লিখতে শুরু করেছেন।

সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয় প্যারিসে ১৮৪৪ খ্রিঃ। এই ঘনিষ্ঠতার প্রভাব মার্কসের জীবনে ছিল অপরিমেয়।

দার্শনিক ব্রুনো বয়ার সম্পর্কে মার্কস এবং এঙ্গেলস দুজনেরই মতামত ছিল এই রকম, তাঁর মতবাদ নিতান্তই কেতাবী। বয়ার একজন শখের বিপ্লবী ছাড়া কিছু নয়।

১৮৪৪ খ্রিঃ তাঁরা যুগ্মভাবে বয়ারের বিরুদ্ধে একটি প্রচারপত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন।

জীবনের পদযাত্রায় একসঙ্গে পা ফেলবার সেই হল শুরু, আমৃত্যু এই সম্পর্ক দুজনের মধ্যে অটুট ছিল। এঙ্গেলস হয়ে উঠেছিলেন মার্কসের বন্ধু, শিষ্য, সহযোগী, তাঁর লেখার অনুবাদক এবং তাঁর দর্শনের প্রচারক। এখানেই শেষ নয়, এঙ্গেলসের চেষ্টাতেই মার্কসের অর্থাগমের স্থায়ি ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৯৪৫ খ্রিঃ এঙ্গেলস মার্কসকে ইংলন্ড নিয়ে আসেন। এখানে তখন সদ্য গড়ে উঠেছে জার্মান ওয়ার্কার্স এডুকেশনাল ইউনিয়ন। এঙ্গেলস কর্মকর্তাদের সঙ্গে মার্কসের পরিচয় করিয়ে দেন।

এখান থেকে ব্রাসেলসে ফিরে গিয়ে মার্কস গড়ে তোলেন জার্মান ওয়াকিং মেনস অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থা। এই সংস্থার প্রধান কাজ হল কমিউনিজমের নীতি শিক্ষন ও প্রচার।

মার্কস এই কাজে নেমে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা কমিউনিস্টদের একত্রিত করবার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করলেন। তার নাম দিলেন কমিউনিস্ট করেসপন্ডেন্স কমিটি।

সেই সময়ে এঙ্গেলসের চেষ্টায় প্যারিসেও একই ধরনের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠল।

তারপর ১৮৪৭ খ্রিঃ ব্রাসেলস, প্যারিস এবং লন্ডন কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে লন্ডনে হল প্রথম কংগ্রেস। এখানেই প্রথম গড়ে উঠল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট লিগ।

পরে এই লিগের পক্ষ থেকেই মার্কস এবং এঙ্গেলস প্রকাশ করেন বিখ্যাত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো যাকে বলা হয় মার্কসবাদের প্রথম অধ্যায়। এই ইস্তাহারের মূল ভিত্তি ছিল ইতিহাসের বাস্তববাদী চিন্তাধারা।

মার্কসের এই উন্নত চিন্তাধারায় হেগেলের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। তাকে বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তিনি বললেন, অর্থনীতি হচ্ছে উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সামাজিক ফসল।

আর এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সামাজিক প্রতিবিম্বই হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম।

বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণীর বিক্রি করবার মত আছে কেবল তাদের শ্রম, আর এই শ্রম ক্রয় করেই ঘটে ধনীক শ্রেণীর ক্রমোন্নতি।

অথচ সংখ্যাগত দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় ধনীকশ্রেণী হল সংখ্যালঘু। কিন্তু অর্থনৈতিক বলে বলীয়ান বলে তারা বিত্তহীন সংখ্যাগুরু শ্রেণীকে ক্রমাগত শোষণ করে যায়।

তবে এই শোষণের সূত্র ধরেই শ্রমিকশ্রেণী লাভ করে এমন একটি জীবন ও জীবনবিধি যার প্রভাবে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় অভিন্ন লক্ষ। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণী আর ধনীক সম্প্রদায়ের শর্ত মেনে চলতে সম্মত হবে না। এই ভাবেই পতন ঘটবে ধনীক শ্রেণীর এবং গড়ে উঠবে নতুন রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রই মেটাবে পরিবর্তিত উৎপাদন শক্তির প্রয়োজনকে।

এই যে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী, কমিউনিস্টরা হল এদেরই শ্রেণীসচেতন অংশ। এই অংশ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর পৃথক স্বার্থ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন, তাদের কাজের ব্যাপ্তি আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত।

এই প্রাথমিক বিবৃতির পরেই কমিউনিস্ট ইস্তাহারের কিছু সংস্কার মূলক দাবির শেষে বলা হল, কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে, কেবলমাত্র রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়েই প্রচলিত সমস্ত সামাজিক বিধির পতন ঘটানো সম্ভব হবে। সর্বহারাদের হারাবার মত যা আছে তা হল শৃঙ্খল, আর তাদের সামনে জয় করবার মত পড়ে আছে সমগ্র পৃথিবী। কমিউনিস্ট বিপ্লবের সামনে শাসক শ্রেণী কম্পিত হোক—বিশ্বের সর্বহারারা এক হও।

এই ইস্তাহার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মার্কসের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ইউরোপের চিন্তার জগতে কম্পন তুলল। বিপ্লবের সূত্রপাত হল ১৮৪৮ খ্রিঃ।

মার্কসকে বেলজিয়াম থেকে বহিস্কার করা হল। ততদিনে তাঁর স্বদেশভূমি জার্মানি ও প্যারিসে মার্কসবাদের দরজা খুলে গেছে। তিনি নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করলেন নিউ রাইনেসিক জুটা।

কিন্তু বিপ্লব হল ক্ষণস্থায়ী। জার্মানি ও প্যারিস মার্কসের জন্য নিষিদ্ধভূমি হয়ে গেল। এবারে মার্কসের স্থায়ি ঠিকানা হল লন্ডন।

এখানে মার্কসের ছিল না আয়ের কোন উৎস। ফলে পরিবারকে তীব্র দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই টেনে নিয়ে চলতে হল মার্কসকে—বছরের পর বছর। সংসারে ছিলেন প্রেমময়ী স্ত্রী, স্নেহময় সন্তান—দৈন্যের মধ্যেও এদের নিয়ে মার্কস তাঁর ব্যর্থতাকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু কতদিন সহ্য হয় দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ। সোহোর ভিন স্ট্রিটের ছোট্ট দুটি ঘরে অকালেই মৃত্যুবরণ করল প্রিয় দুটি সন্তান। মার্কস নিজেও আক্রান্ত হলেন নানা রোগে।

সন্তান হারা জননী দারিদ্র্যের জ্বালা, বেদনা সইতে না পেরে স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কিন্তু স্থিরলক্ষ মার্কস রইলেন অবিচল।

সেই তীব্র প্রতিকূলতার বেষ্টনীর মধ্যে মার্কসের জীবনে একখন্ড মরূদ্যানের মত একমাত্র সান্ত্বনা ছিলেন এঙ্গেলস।

এঙ্গেলস সেই সময় কাজ করছেন ম্যাঞ্চেস্টারে। সেখান থেকেই তিনি নিয়মিত অর্থ পাঠাতে থাকেন মার্কসকে।

যখনই যা প্রয়োজন হত, মার্কস নির্দ্বিধায় একমাত্র এই বন্ধু ও ভক্তটির কাছেই চাইতে পারতেন। কখনো বিমুখ হতে হয়নি তাঁকে।

কিন্তু মার্কসের জীবনের এ এক রহস্য যে, এঙ্গেলসের আন্তরিক বদান্যতাকে তিনি গ্রহণ করেছেন নিতান্তই ব্যবসায়িক আবেগে।

নিজের সম্পর্কে গর্ব ও গরিমা তাঁকে মানবিক আবেগের বলয়ের বাইরেই নিক্ষেপ করেছিল। তবুও এঙ্গেলস চিরকালই ছিলেন মার্কসের অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল শিষ্য।

১৮৫১ খ্রিঃ নিউইয়র্ক টাইম পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেলেন মার্কস। এঙ্গেলস এগিয়ে এলেন তাঁর শিক্ষকের সহযোগিতায়।

তিনি মার্কসের হয়ে লেখা পাঠাতে লাগলেন, তাঁর লেখা জার্মান থেকে অনুবাদ করে চললেন।

মার্কস তাঁর নীতির প্রতি এতটাই অনুগত ছিলেন যে যাঁরা তা পুরোপুরি মানত না বা গ্রহণ করতে পারত না তিনি তেমন সহযাত্রীদের একেবারে বাতিল করে দিতেন।

এই সকল কারণে রাষ্ট্রনৈতিক ধননীতির ভাবনা ও সাংবাদিকতার বাইরে অবশিষ্ট সময় তাঁর ব্যয় হত সহযাত্রীদের সঙ্গে বিতন্ডার মধ্য দিয়ে।

আবেদন নিবেদনের স্বর কখনো ফুটত না তাঁর কণ্ঠে। এমন ভাবে কথা বলতেন, যে মনে হত তিনি মানুষের ভাগ্যকে পাল্টে দেবার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন, যা বলছেন সেটাই ধ্রুব সত্য।

যাইহোক, সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যেও মার্কস তাঁর ক্যাপিটাল ইন জেনারেলের গবেষণার কাজে কখনো অবহেলা দেখান নি।

১৮৫৯ খ্রিঃ তাঁর গবেষণার প্রথম পর্ব 'এ ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি' প্রকাশিত হল।

এরপর ১৮৬৭ খ্রিঃ থেকে ক্যাপিট্যাল-এর প্রকাশ আরম্ভ হল। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রথম খন্ড টিই তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন।

ক্যাপিট্যালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়েছিল এঙ্গেলসের সম্পাদনায়। মার্কসের মৃত্যুর পরে যথাক্রমে ১৮৮৫ এবং ১৮৯৪ খ্রিঃ।

মার্কসের লেখার মধ্যেই সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ, অধিকার, দায়িত্ব, শ্রেণীহীন সরকার ও ধননীতি ইত্যাদি বিষয়ে যে ব্যাখ্যা ও মতামত ব্যক্ত হয়েছে তাই মার্কসবাদ বা মার্কসিজম নামে অভিহিত।

এই মতবাদই অনুপ্রাণিত করেছে লেনিনকে, যিনি অভিহিত হন রুশ বিপ্লবের স্থপতি রূপে।

মার্কসের মতে বিপ্লব অবধারিত। সর্বহারারা যেন তার জন্য নিজেদের প্রতিনিয়ত প্রস্তুত করে রাখার কথা ভেবে চলে।

ক্যাপিট্যাল লেখার সময়েই ১৮৬৪ খ্রিঃ মার্কসের সক্রিয়তায় গড়ে উঠল ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশান। তিনি হলেন এর সর্বেসর্বা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পকালের মধ্যেই বাকুনিন-এর সঙ্গে মতপার্থক্যগত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লেন।

কমিউনিস্ট লিগ গঠন করবার সময়ও একই ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী উইলিখ বাধা হয়ে উঠেছিলেন। মার্কস রাতারাতি সদর দপ্তরকে কোলোনে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে লিগকে আর বাঁচাতে পারেন নি তিনি।

এবারেও একই কৌশল নিলেন মার্কস। তিনি ইন্টারন্যাশনালের জেনারেল কাউন্সিল নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত করলেন।

এবারেও এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বিলুপ্তি ঘটল প্রথম আন্তর্জাতিকের।

ক্যাপিট্যাল-এর দ্বিতীয় খণ্ড রচনার কাজ চলেছে তখন। আর্থিক অনটন পূর্বের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। বাসও উঠিয়ে নিয়েছেন উত্তর লন্ডনে।

১৮৬৯ খ্রিঃ এঙ্গেলস তাঁর ব্যবসা থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি যথারীতি মার্কসের জন্য বার্ষিক সাড়ে তিনশ পাউন্ড বরাদ্দ করেছেন।

কিন্তু এত সত্ত্বেও প্রকৃতির রোষ থেকে উদ্ধার পেলেন না মার্কস। দারিদ্র্যের দীর্ঘ পীড়ন শরীরকে নির্জীব করে এনেছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ এগিয়ে নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল তাঁর।

মার্কস যে তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তাতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। শ্রমিকের শ্রমে যে পণ্য উৎপন্ন হয়, সেই শ্রমশক্তির মূল্য রূপে শ্রমিক তার সামান্য অংশই লাভ করে, মালিকেরা বিনা শ্রমে মুনাফা, সুদ ও খাজনারূপে বাকি অংশ উপভোগ করে।

তিনি আশা করেছিলেন যে শ্রমিক জাগরণের ফলে শোষক ধনীক শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং সমাজ বিকাশের শেষতম পর্যায়ে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটবে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ বিষয়েও মার্কস অবহিত ছিলেন। ব্রিটিশরা নিজেদের অজ্ঞাতেই যে ভারতে ধ্বংসাত্মক ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গেই পুনঃসৃজনাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, মার্কস তা লক্ষ করেছিলেন।

মার্ক্সীয় মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই পৃথিবীতে সর্ব প্রথম রাশিয়ায় সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীকালে পৃথিবীর আরও বহু দেশে মার্ক্সীয় দর্শনকে তত্ত্বরূপে গ্রহণ করে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করা হয়েছে।

মার্কসের তত্ত্ব হল ইতিহাস দর্শন এবং বৈপ্লবিক পরিকল্পনার সংস্কারের তত্ত্ব। এই মতবাদের অন্তর্নিহিত ভিত্তি হল ডায়ালেকটিকাল বস্তুবাদ বা Dialectical materialism।

১৮৪৮ খ্রিঃ কমিউস্ট ম্যানিফেস্টোতে তিনি বলেছিলে—(১) ভূসম্পত্তির যথাযথ বিলি এবং ওই ভূসম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব থেকেই রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহ(২) প্রগতিশীল ও উচ্চ পর্যায়ের আয়কর ব্যবস্থা পরবর্তন (৩) উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অধিকারের বিলোপ সাধন। (৪) একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঋণদান ব্যবস্থার কেন্দ্রী করণ (৫) পরিবহন ব্যবস্থা জাতীয়করণ (৬) ভূমির নতুন বিলি ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কারখানার সংখ্যাবৃদ্ধি (৭) কর্মক্ষম প্রতিটি ব্যক্তির চাকরি (৮) রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে সকল শিশুকে শিক্ষাদান এবং শিল্পকারখানায় শিল্প শ্রমিকের শ্রমের অবলুপ্তি।

এই ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছিল, কমিউনিস্টদের বিশ্বাস, সমসাময়িক যাবতীয় সামাজিক বিধিব্যবস্থার মূলোৎপাটন ঘটিয়ে এই লক্ষ পূরণ করা সম্ভব এবং মূলোৎপাটনের পদ্ধতিটি সশস্ত্র ও সহিংস হতে হবে।

মার্কস এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এঙ্গেলস ছিলেন এই ম্যানিফেস্টো সৃষ্টির মূল প্রবক্তা।

মার্কসবাদী সমাজপন্থীরা মার্কসের ইতিহাস বিশ্লেষণকে স্বীকার করেন কিন্তু সশস্ত্র পন্থায় সরকার উচ্ছেদকরনে বিশ্বাসী নন।

১৮৮৩ খ্রিঃ মার্কসের দেহান্তর ঘটে।

গোবিন্দ সিং



পঞ্চদশ শতাব্দীতে গুরু নানক এমন একটি সমাজ গঠনের উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে ছিলেন যেই সমাজে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, নারী-পুরুষ সমতা ও সমান সম্মান লাভ করবে। বিভেদ বা প্রভেদ বলে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা হবে না।

মানব মুক্তির এই বাণী নানক বহন করে নিয়ে গিযেছিলেন ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, তুরস্ক, মিশর ইত্যাদি দেশে।

নানকের মতবাদের প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাই শিখ নামে অভিহিত। নানক হলেন এই শিখ সম্প্রদায়ের স্রষ্টা।

নানকের আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করে শিখ সম্প্রদায়কে যিনি সঞ্জীবনী শক্তিতে সমৃদ্ধ করে বেঁচে থাকার ও এগিয়ে চলার শক্তি দান করেছিলেন, তিনি হলেন শিখ সম্প্রদায়ের দশম গুরু বা নেতা গোবিন্দ সিং।

ষষ্ঠগুরু হরগোবিন্দ সিং-এর সময় থেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। তার পাশাপাশি ছিল দোর্দন্ডপ্রতাপ মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতার আক্রমণ।

ফলে শিখ সম্প্রদায়ের সামনে দেখা দেয় অস্তিত্বের সঙ্কট। এই সংকট নিবারণ করে শিখদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন দশমগুরু গোবিন্দ সিং। তাঁর সময়েই শিখদের সঙ্গে ইসলামের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

গুরু গোবিন্দ সিংহের মূল মন্ত্র ছিল সামরিক শক্তি সংহত করা, ইসলাম ধর্মের ধর্মান্তরের প্রতিরোধ এবং পিতা তেগবাহাদুরের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ। শিখধর্মের সেবাব্রত অর্থাৎ বিনয় ও প্রার্থনার পরিবর্তে তিনি পরমেশ্বর ও তরবারির ওপর আস্থা স্থাপন করেন। তরবারিই ছিল তাঁর কাছে ভগবান।

ভাষা ও পরিচ্ছদ—এই দুটিই হল জাতীয় জীবনের প্রধান উপাদান। এই বিষয়ে গোবিন্দ সিং হিন্দু পারসিক সমন্বয়কে সার্থক করে তুলেছিলেন।

তিনি দুকুল অর্থাৎ পায়জামা ও কঞ্চুক অর্থাৎ আচকান পরিধান করেই সিংহাসনে বসতেন। এই পোশাকই গ্রহণ করেছে শিখ সম্প্রদায় তাদের জাতীয় পোশাক রূপে।

বিহারের পাটনা জেলায় ১৬৬৬ খ্রিঃ ২৬শে ডিসেম্বর গোবিন্দ সিংহের জন্ম। তাঁর আদি নাম গোবিন্দ রাই। তিনি ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের নবমগুরু তেগবাহাদুরের একমাত্র সন্তান। তাঁর মায়ের নাম গুজারি।

যার নাম অকাল তখৎ অর্থাৎ অনন্ত ঈশ্বরের সিংহাসন, তা নির্মাণ করেছিলেন গোবিন্দ সিংহের পিতামহ ষষ্ঠ শিখগুরু হরগোবিন্দ সিং। আত্মরক্ষা ও ন্যায় বিচারের জন্য তিনি তরবারিকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন।

হরগোবিন্দ দুটি তরবারি ব্যবহার করতেন। একটিকে বলা হত মীরী অর্থাৎ জাগতিক ক্ষমতার প্রতীক। দ্বিতীয়টিকে বলা হত পীরী অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রতীক।

গুরু হরগোবিন্দকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে বন্দী করেছিলেন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর। তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল গোয়ালিয়র দুর্গে।

একসময় সম্রাট জাহাঙ্গীর হরগোবিন্দকে মুক্ত করার আদেশ দিলেন। তিনি সেই আদেশ মানতে অসম্মত হয়ে সম্রাটকে জানালেন, অন্যান্য ভারতীয় নৃপতিদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তিনি নিজে মুক্ত হতে রাজি নন।

হরগোবিন্দর দৃঢ়তার কাছে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়েছিল মুঘল সম্রাটকে। তিনি অন্যান্য নৃপতিদের মুক্তি দান করলেন। এই ঘটনার পর থেকে হরগোবিন্দর নাম হয় বন্দিছোড় অর্থাৎ বন্দিদের মুক্তিদাতা।

পিতার দৃঢ়তা, আত্মিকবল ও বীর্য উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন

তেগবাহাদুর। তিনি মাত্র ১৩ বছর বয়সে কর্তারপুরে মোগল সৈন্যদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

তেগবাহাদুরের সময়ে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব বলপূর্বক হাজার হাজার হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদের ওপরেও নজর পড়েছিল আওরঙ্গজেবের। তিনি তাদেরও ধর্মান্তরিত করবার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন।

নিরুপায় ব্রাহ্মণরা তেগবাহাদুরের শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁদের বললেন, সম্রাটকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়, গুরু তেগবাহাদুর আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণরাও ইসলাম গ্রহন করবেন।

এই সংবাদ পেয়ে ধর্মান্ধ সম্রাটের আদেশে তেগবাহাদুরকে বন্দি করে ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য নিপীড়ন করা হতে থাকে। সমস্ত নির্যাতন সহ্য করেও স্বধর্ম ত্যাগ করতে সম্মত না হওয়ায় আওরঙ্গজেবের নির্দেশে তেগবাহাদুরের শিরচ্ছেদ করা হয় ১৬৭৫ খ্রিঃ ১১ নভেম্বর।

সেই সময় গোবিন্দ সিং ছিলেন নয় বছরের বালক। পিতৃহত্যার প্রতিশোধের আগুন বুকে নিয়েই বড় হয়ে উঠেছিলেন গোবিন্দ সিং।

কিছুকাল জন্মস্থান বিহারে বাস করে কৈশোরে তিনি ফিরে আসেন পিতৃভূমি আনন্দপুরে।

পিতা তেগবাহাদুর শিখ সম্প্রদায়ের দশম গুরু হিসাবে গোবিন্দ সিং-এর নামই ঘোষণা করে গিয়েছিলেন।

নিতান্ত অল্প বয়সেই গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল গোবিন্দ সিং-এর ওপর। ফলে অনেকেই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে মোগলদের অত্যাচার এবারে শতগুণে বৃদ্ধি পাবে।

নিজেদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই শিখরা গোবিন্দ সিংকে নিয়ে হিমালয়ের গভীর অরণ্যে পাওয়ান্তা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁরা যেখানে শিবির স্থাপন করেছিলেন তার পাশ দিয়েই প্রবাহিত ছিল যমুনা নদী।

পাটনায় যতদিন ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই গোবিন্দ পাঞ্জাবি ও ব্রজবুলি ভালভাবে শিখে নিয়েছিলেন।

নতুন শিবিরে আসার পর তিনি শিখলেন সংস্কৃত ও পারশি ভাষা। ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাতেও নিপুণ হয়ে উঠলেন।

গোবিন্দর সকল কাজের প্রেরণার মূলে নিভৃতে কাজ করেছিল পিতৃহত্যার প্রতিশোধস্পৃহা।

যৌবনে পদার্পণ করেই তিনি জীবনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের অনুগামীদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রশিক্ষণে শিখরা সাহসী ও রণনিপুণ হয়ে উঠল।

অনুগামী এই সমর শিক্ষায় শিক্ষিত শিখদের নিয়ে গোবিন্দ পরে একটি ছোট সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন।

হিমালয়ের যেই অংশে শিখরা সংগঠিত হয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে আশপাশের রাজা ও শাসকদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হল। প্রতিবেশী রাজপুত সামন্ত রাজারাই শিখ বাহিনীর প্রধান শত্রু হয়ে উঠেছিল।

১৬৮৬ খ্রিঃ ভাঙ্গলি নামক স্থানে রাজপুতদের সঙ্গে শিখদের যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে গোবিন্দ জয়লাভ করলেন।

পরের বছরেই তিনি নান্দুয়ান নামক স্থানে পাঞ্জাবের মোগল শাসকের সৈন্যদলকে পরাস্ত করলেন।

এমনি ছোটখাট সংঘাতের মধ্য দিয়ে গোবিন্দর প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল।

এক সময়ে সব খবর দিল্লীতে এসে পৌঁছল। সম্রাট আওরঙ্গজেব গোবিন্দর শৌর্য-বীর্য ও ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তিকে মোগল সম্রাটের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই গণ্য করলেন।

অবিলম্বেই তিনি গোবিন্দকে দমন করবার জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মোয়াজ্জমকে পাঠালেন।

গোবিন্দকে দমন করবার জন্য মোয়াজ্জম সরাসরি আক্রমণ না করে এক কৌশল গ্রহণ করলেন। তিনি গোবিন্দর অনুগামীদের ওপর নির্যাতন শুরু করলেন।

যুবরাজ মোয়াজ্জম ভেবেছিলেন, লেজ ধরেই মাথা আকর্ষণ করবেন, অনুগামীদের দমন করেই জব্দ করবেন গোবিন্দকে।

কিন্তু বাস্তবে ঘটল বিপরীত ঘটনা। মোয়াজ্জম যখন অন্যান্য শিখদের নিয়ে ব্যস্ত রইলেন, সেই অবসরে গোবিন্দ আনন্দপুরে একটার পর একটা শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তুললেন।

গভীর দূরদৃষ্টি বলেই তিনি বুঝতে পারলেন, অদূর ভবিষ্যতেই সম্রাট-পুত্রের দৃষ্টি পড়বে তাঁর দিকে। তাই দ্রুতগতিতে দুর্গ গড়ে তুলে তিনি আনন্দপুরকে দুর্জয় করে গড়ে তুললেন।

একই সঙ্গে চলল সৈন্য সংগঠন ও যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ। গোবিন্দর নির্দেশে লাঙ্গল, তন্তু ও লেখনী ত্যাগ করে শিখদের হাতে নিতে হল অসি। একটি ধর্ম সম্প্রদায় দেখতে দেখতে গোবিন্দর শিক্ষায় ও পরিচালনায় একটি সামরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হল।

গোবিন্দ সিং জাতি ধর্ম ভেদাভেদ দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শিখকে বিশেষ পোশাক ও পরিচ্ছদ ধারণ করবার নির্দেশ দিলেন। শিখদের সকলকে দিলেন নতুন পদবী সিং। অর্থাৎ সিংহ।

গোবিন্দ নিজেও তাঁর পূর্বের বংশগত পদবী ছেড়ে সিং পদবী গ্রহণ করলেন। শিখ সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্যও কাউর পদবী নির্দিষ্ট করে দিলেন। কাউর শব্দের অর্থ হল সিংহিণী।

এইভাবে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হল।

অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর এমন একটি অস্ত্র সজ্জিত নতুন সম্প্রদায় গোবিন্দ সৃষ্টি করলেন, যার নাম দেওয়া হল খালসা। এরাই হল গোবিন্দর সাধক-সেনানী।

নতুনভাবে নতুন প্রাণে প্রাণবন্ত হয়ে জেগে উঠল শিখজাতি। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিও দিন দিনই বৃদ্ধি পেয়ে চলল।

শিখদের এই জাগরণ ধর্মান্ধ মোগলদের আতঙ্কিত করে তুলল। তারা একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে শিখদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত শিখরা আনন্দপুর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ন্যায়, সত্য ও স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাতে গিয়ে গোবিন্দকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল তার তুলনা হয় না। তাঁর তিন পত্নী, চার পুত্র ও গর্ভধারিণী জননী মোগলদের হাতে নিহত হয়েছিল।

আনন্দপুর ছেড়ে গোবিন্দ চলে এলেন ছামকাউর নামক স্থানে। সেই সময় মাত্র চল্লিশ জন বিশ্বস্ত অনুগামী তাঁর সঙ্গে।

এখানে এসেও তিনি নিরাপদ মনে করছিলেন না। শিগগিরই অধিকতর নিরাপদ বিবেচনা করে সদলবলে চলে এলেন মুক্তেশ্বরে।

এই সময়েই পাতিয়ালা, নাড়া, ঝিন্দ এবং ফরিদকোটের মানুষ দলে দলে তাঁর দলে যোগ দিল। সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।

গোবিন্দর দুই শিশুপুত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল পাঞ্জাবের মোগল শাসক ওয়াজির খান। তার নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতায় অতিষ্ঠ হয়ে এবপর গোবিন্দ মোগল সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য দিল্লি রওনা হলেন।

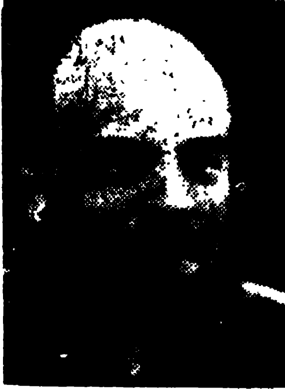
কিন্তু তাঁর দিল্লি পৌঁছবার আগেই সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হল। পথেই সেই সংবাদ পেলেন তিনি।

রাজধানী তখন স্থানান্তরিত হয়েছে আগ্রায়। গোবিন্দ নতুন সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আগ্রা গেলেন এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থান করলেন।

সম্রাটকে পাঞ্জাবের শাসকের অত্যাচারের বিস্তারিত বিবরণ দেবার পর আলোচনা প্রসঙ্গে গোবিন্দ বুঝতে পারলেন সম্রাট এই ব্যাপারে কোন প্রতিবিধান করতে আগ্রহী নন।

গোবিন্দ আর আগ্রায় থাকা বৃথা মনে করে ফিরে চললেন। এই ফেরার পথে মহারাষ্ট্রের নান্দের নামক স্থানে তিনি দুজন গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হলেন। সময়টা ১৭০৮ খ্রিঃ ৭ই অক্টোবর।

ভি. আই. লেনিন



লেনিনের সম্পূর্ণ নাম ভ্লাদিমির ইলভিচ উলিয়ানভ। বিশ্বের ইতিহাসের স্মরণীয় মহাবিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম হলেন লেনিন। বিপ্লবী দলে নাম লেখাবার পরে তিনি যে ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন, সেই লেনিন নামেই তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন।

লেনিনের এক দাদা ছিলেন রাশিয়ায় সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা। তিনি ছাত্রাবস্থায় ১৮৭৭ খ্রিঃ রুশ সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। পরে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। এই বছরেই ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে তাঁকে কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বহিষ্কৃত করা হয়।

লেনিনের মা কিন্তু পুত্রের এই শোচনীয় মৃত্যুর জন্য এতটুকু মুষড়ে পড়েন নি। তিনি ছিলেন অভিজাত, শিক্ষিত ও দৃঢ়চেতা এবং বিপ্লবীমনস্ক মহিলা। তাঁরই উৎসাহে তাঁর দুই পুত্র ও তিন মেয়ে অল্প বয়স থেকেই বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

ফলে মা হিসেবে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করবার মত মানসিক বলের অভাব ছিল না তাঁর।

লেনিনের বাবা ছিলেন জার নিকোলাসের আমলের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা। তাঁর কর্মস্থল ছিল ইউরোপীয় অংশের রাশিয়ার সিমরিস্ক। বড় ছেলের প্রাণদন্ডের এক বছর আগেই তিনি মারা যান।

স্বামীর মৃত্যুর পরেই লেনিনের মা পরিবারের সকলকে নিয়ে কাজান প্রদেশের গ্রামের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। এখান থেকেই লেনিনের মা ও বোনেরা বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন।

বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর থেকে লেনিনের মা ও বোনেরা সরকারি পুলিশ ও গোয়েন্দাদের সন্দেহভাজন হয়ে ওঠেন।

১৮৯১ খ্রিঃ লেনিন সেন্টপিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তিনি মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং শ্রমিকদের নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেন।

সেদিনের রুশ শ্রমজীবী মানুষের কাছে লেনিনের লেখা ইস্তাহার হয়ে উঠেছিল ধর্মগ্রন্থের মতই অবশ্যপাঠ্য ও প্রিয়।

লেনিন তাঁর দাদার মৃত্যুর পর থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদ বা উগ্রপন্থার দ্বারা রুশদেশে মার্ক্সবাদ বা সমাজতান্ত্রিক শাসন কায়েম করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। দীর্ঘ এবং স্থায়ী সামাজিক পরিবর্তন কখনো ব্যক্তিহত্যা বা গণহত্যার দ্বারা সম্ভব হয় না।

তিনি আরও বুঝতে পেরেছিলেন যে কোন দেশের সামগ্রিক পরিবর্তন আনতে হলে কৃষক, শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে।

এই উপলব্ধি থেকেই লেনিন, রুশদেশের তৎকালীন প্রভাবশালী সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

মার্কসের দাস ক্যাপিট্যালই ছিল লেনিনের প্রেরণার উৎস। তিনি গোপনে বিভিন্ন আলোচনা সভায় দেশের বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কৃষক-মজদুরের মধ্যে দাস ক্যাপিট্যালের বক্তব্য প্রচার করতে লাগলেন।

১৮৯৫ খ্রিঃ পর থেকে তাঁর প্রচারের বিষয় হয়ে উঠল মার্কসের দর্শন ও অর্থনীতি।

এই সময়ে তিনি রাশিয়া ছেড়ে মার্কসের নিজের দেশ জার্মানিতে গমন করেন।

বার্লিনে বিভিন্ন শ্রমিক সভায় লেনিন বক্তৃতা করেন। রাশিয়া থেকে বিতাড়িত যে সব সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী নেতা ও বুদ্ধিজীবী বার্লিনে অবস্থান করছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও লেনিনের এই সময় যোগাযোগ ঘটে।

কিছুকাল বার্লিনে ও পরে জেনেভায় নানা সভাসমিতিতে যোগদান করার পর লেনিন আবার রাশিয়ায় ফিরে আসেন।

দেশে ফেরার আগেই প্লেখানভের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয় লেলিনের। তখন থেকেই নানা বিপ্লবী সংস্থাকে সংগঠিত করে রুশ বিপ্লব রূপায়নের চিন্তা নিয়ে তিনি চিন্তা ভাবনা শুরু করেন।

তৎকালীন সময়ে রুশ দেশে ও ইউরোপে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পুরোধা রূপে পরিচিতি ছিল প্লেখানভের। তাঁরই প্রেরণায় লেনিন দেশে ফিরে গঠন করলেন ইউনিয়ন ফর দ্য লিবারেশন অব দ্য ওয়ার্কিং ক্লাশ নামে একটি সমিতি। এই সমিতির প্রধান লক্ষ ছিল রুশ শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে বিপ্লবের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

এই উদ্দেশ্যে একটি সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি বিদেশ থেকে নানান যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

সেই কাজও তিনি দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চললেন।

বিপ্লবের জমি তৈরির কাজের পাশাপাশি লেনিন আইন ব্যবসাও আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু দুটি কাজ একসঙ্গে চালাবাব বাধা ছিল অনেক। বিশেষ করে

পুলিশ তাঁকে যে ভাবে দফায় দফায় নিগৃহীত করছিল, তাতে বিপ্লবী কাজকর্ম খুবই বিঘ্নিত হচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তিনি আইনব্যবসায় ইস্তফা দিয়ে সর্বক্ষণের জন্য বিপ্লবের কাজে বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি রুশ পুলিশের হাতে বন্দি হলেন।

একবছর কারাবাসের পর তিনি সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। সময়টা ১৮৯৫ খ্রিঃ ডিসেম্বর। এই নির্বাসিত অবস্থাতেই তিনি ক্রুপস্কায়াকে বিবাহ করেন।

ক্রুপস্কায়া ছিলেন অসামান্য প্রতিভাময়ী এক তেজস্বী রমণী। লেনিনের বিপ্লবী জীবনের সূচনা লগ্নে এই রমণীর প্রেম লেলিনকে অসাধারণ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

জেলে বন্দি অবস্থাতেই লেনিন The Development of Capitalism in Russia গ্রন্থটি রচনা আরম্ভ করেন। নির্বাসনের দিনগুলিতে তিনি এই গ্রন্থ রচনার মধ্যেই ডুব দিলেন।

এদিকে ১৮৯৭ খ্রিঃ ক্রুপস্কায়াও গ্রেপ্তার হলেন। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে সাইবেরিয়ার একই কারাগারে দুজনে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। লেনিন ক্রুপস্কায়ার সান্নিধ্য লাভ করে গ্রন্থ রচনার কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চললেন। এই সময়ে তাঁরা উভয়ে মিলে সিডনি ও ওয়েবের The History of the Trade Unions গ্রন্থটি ইংরাজি থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন।

১৯০০ খ্রিঃ লেনিনের নির্বাসন দন্ড শেষে দেশে ফিরে আসার সুযোগ ঘটে। কিন্তু তাঁর রাশিয়ার যে কোন বড় শহরে বসবাস নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ফলে তাঁকে মিউনিখ, ব্রাসেলস, প্যারি, জেনেভা, লন্ডন প্রভৃতি স্থানে ঘুরে ঘুরে বাস করতে হয়।

এই সময়েই তাঁকে তাঁর আসল নাম ত্যাগ করে বিপ্লবী জীবনে স্থায়ীভাবে লেনিন নাম গ্রহণ করতে হয়।

ক্রুপস্কায়া রয়েছেন সঙ্গে, ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন, তবু বারবার এই বিপ্লবী দম্পতিকে জার্মান ও ইংরাজ গোয়েন্দা বাহিনীর দ্বারা বিব্রত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

সেই দুস্তর বাধার মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে লেনিন তাঁর বিপ্লবের আরব্ধকর্ম সম্পূর্ণ করে তুলবার সাধনায় ছিলেন অবিচল। তিনি এগিয়ে চলেছিলেন দৃঢ় পদক্ষেপে।

অক্লান্ত পরিশ্রমে যখনই শরীর মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, ক্রুপস্কায়ার প্রেরণা ও সাহচর্যে তিনি আবার নতুন শক্তিতে জেগে উঠেছেন।

জার্মানি থেকে লেনিন Iskra নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। রুশ দেশে সেই পত্রিকা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগল।

পত্রিকা সম্পাদনা ও ইশতাহার রচনা ছাড়াও তিনি সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে রুশ বিপ্লবের কাজকে ত্বরান্বিত করতে লাগলেন।

জার্মানিতে ও সুইজারল্যান্ডে তিনি একাধিকবার বহু বিপ্লবী কর্মীর সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়েছেন।

রুশ বিপ্লব সাফল্যের কাজে যাতে রুশ জনগণ, শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হয় তার জন্য সকল শ্রেণীর বিপ্লবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

এই সময়ে লেনিনের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন বিপ্লবী দল থেকে বহু বিপ্লবী লেনিনের বিশ্বস্ত অনুগামী হয়ে ওঠেন।

লেনিন যেসব ইস্তাহার রচনা করে প্রকাশ করতেন তাতে সাধারণ মানুষের উপযোগী সাবলীল ভাষায় তিনি মার্কসবাদের গভীর তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করতেন। ফলে বিপ্লবের চেতনা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সমগ্র রুশ ভূখন্ডে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

সরকারী কর্মচারি, পুলিশ, এমনকি সামরিক বিভাগের জনগণের মধ্যেও জারের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, বিপ্লবী মানসিকতা প্রসার লাভ করতে থাকে।

১৯০৫ খ্রিঃ জার দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনকালে একটি ভুখা মিছিল পিটার্সবার্গের জারের প্রাসাদের অভিমুখে যাত্রা করে। সেই সময় অতর্কিতে অপরিণামদর্শী জারের নির্দেশে পুলিশ মিছিলের ওপব গুলি বর্ষণ আরম্ভ করে। বহুলোক হতাহত হয়।

এই ঘটনার পরিণামে লেনিনের বিপ্লবক্ষেত্র দ্রুত পরিণতি লাভ করার সুযোগ লাভ করে।

দেশের প্রত্যন্ত পর্যন্ত পুলিশী নির্যাতনের ঘটনা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়ে চলল।

এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন লেনিন। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি দেশে ও বিদেশে বিপ্লবের প্রচারে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কখনো ফিনল্যান্ড থেকে, কখনো জার্মানি বা সুইজারল্যান্ড, কখনো জেনেভা থেকে তিনি রুশদেশে প্রয়োজন মত নির্দেশ পাঠিয়ে অথবা ইশতাহারে প্রচারের ব্যবস্থা করে দেশের বিপ্লবী আবহাওয়াকে বিস্ফোরণের পর্যায়ে পৌঁছে দিলেন।

১৯০৫ খ্রিঃ শেষ দিকে বিদেশ থেকে একবার গোপনে রাশিয়ায় প্রবেশ করে দেখে খুশি হলেন যে বিপ্লবের পটভূমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

১৯০৩ খ্রিঃ লন্ডনে অনুষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলনে লেনিন নেতৃত্বের অধিকার লাভ করেছিলেন।

এবারে, ১৯০৫ খ্রিঃ, তাঁর উদ্যোগে রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম সোভিয়েত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

লেনিন অনুধাবন করলেন কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের হাতে অস্ত্র তুলে নেবার সময় এগিয়ে এসেছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটলোও তাই। মাঝে মাঝেই শ্রমিক ধর্মঘট ও সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটতে লাগল।

পরে এই বিচ্ছিন্ন ঘটনা সমস্ত রুশভূখণ্ডে সামগ্রিক বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করে মানব ইতিহাসে এক নব যুগের দ্বারোদ্ঘাটন করল।

রুশ সম্রাটের সামরিক শক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল বিদ্রোহ দমনে। কিন্তু নির্মম অত্যাচার সত্ত্বেও রুশ জনগণের সম্মিলিত শক্তির মনোবল তারা বিন্দুমাত্র টলাতে পারল না।

১৯১৪ খ্রিঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে লেনিনকে কিছুকাল কারারুদ্ধ থাকতে হল। পরে তিনি মুক্ত হয়ে সুইজারল্যান্ডে চলে যান।

১৯১৬ খ্রিঃ লেনিন তাঁর গ্রন্থ 'সাম্যবাদ—ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত পর্যায়' রচনার কাজ সম্পূর্ণ করেন।

১৯১৭ খ্রিঃ রাশিয়ার Moderate Socialist-রা দেশে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করল। লেনিন সুইজারল্যান্ড থেকে স্বদেশে ফিরে এলেন।

লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ খ্রিঃ ৭ই নভেম্বর (তৎকালীন রুশ পঞ্জিকা অনুযায়ী ২৫ শে অক্টোবর) তাঁর বলশেভিক দল কমিউনিস্ট পার্টি এই নতুন নামে পরিচিত হল।

তিনি এই সময়েই সোশ্যালিস্টদের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে Soviet Republic of workers, Soldiers and Peasants নামে দেশের নামকরণ করেন।

এরপর তিনি Soviet Peoples Commission-এর সভাপতিরূপে প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা করে চললেন।

১৯১৮ খ্রিঃ ৩রা মার্চ জার্মানির সঙ্গে তিনি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এইভাবে বিপ্লবী লেনিন রাশিয়াকে একেবারে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করে নবজীবন দান করেন।

লেনিন ব্যক্তি মানুষটি আকারে ছোটখাট হলেও তাঁর চরিত্র ছিল বজ্রের মত দৃঢ়; কখনো আত্মস্বার্থের কথা ভাবেননি, দেশের মানুষের স্বার্থ চিন্তাই ছিল তাঁর সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূল প্রেরণা।

কঠোর পরিশ্রমে লেনিনের শরীর ভেঙ্গে যায় এবং ১৯২৪ খ্রিঃ ২১শে জানুয়ারি মস্কোর নিকটবর্তী গোর্কীনগরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন।

লেনিনের মরদেহ ভেষজ প্রক্রিয়ায় অবিকৃত রেখে ক্রেমলিনে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত হওয়া রুশবিপ্লব মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কি সেই রুশ বিপ্লব? লেনিনের জীবনের আলোকে আমরা তারই পরিচয় লাভ করব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব এবং বর্তমান শতাব্দীর রুশ বিপ্লবের মত আর কোন বিপ্লবই মানব সভ্যতাকে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি।

ফরাসী বিপ্লব শুনিয়েছিল সাম্যের জয়গান, রুশ বিপ্লবের ফলে মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে তা স্বপ্ন থেকে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

রুশবিপ্লবের সময়ে রাশিয়ার সম্রাট ছিলেন জার দ্বিতীয় নিকোলাস। রাজতন্ত্র তখন সম্পূর্ণ অক্ষম, অপদার্থ ও স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিল।

১৯০৪-৫ খ্রিঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয় জারশাসনের অপদার্থতাকে প্রকট করে তুলেছিল। ফলে ১৯০৫ খ্রিঃ রুশ জনগণ জারশাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানায়।

জার প্রথম দিকে রুশ জনগণের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করলেও কিছুকাল পরেই তা বাতিল করে নির্মমভাবে জনতার আন্দোলনকে দমন করেন।

কিন্তু দস্তয়েভস্কি, গোর্কি, টলস্টয়, তুর্গেনিভ প্রভৃতি সাহিত্যিক-দার্শনিকদের রচনাপাঠে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণ বিপ্লবের জন্য পরবর্তী সুযোগের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

ভলাদিমির উলিয়ানভ বা লেনিন ছদ্মনামে পরিচিত বিপ্লবী তরুণের নেতৃত্বে রাশিয়ায় বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলতে থাকে।

১৯০৩ খ্রিঃ বিপ্লবীদের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দিলে লেনিনের বিরোধীরা মেনশেভিক নামে একটি স্বতন্ত্র দল তৈরি করেন।

লেনিনের অনুসারী বিপ্লবী দলটির নাম হয় বলশেভিক। বলশেভিকরা ছিলেন সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্কসের আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোথাও দুর্বলতা দেখা দিলে সেখানেই শ্রমিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে বলশেভিকরাই রুশ বিপ্লবকে সফল করে তুলেছিলেন।

১৯১৪ খ্রিঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাতিধর্ম দল নির্বিশেষে রুশ জনসাধারণ স্বদেশের স্বার্থে জারতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সাময়িকভাবে জাতীয় পরিষদে দলগত বিভেদের অবসান ঘটায়।

কিন্তু উপযুক্ত রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে রুশ বাহিনী প্রতি পদক্ষেপেই জার্মান বাহিনীর কাছে পরাজিত হতে থাকলে সারা দেশে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

১৯১৭ খ্রিঃ গোড়ার দিকে সারা দেশে নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিলে পরিস্থিতি আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। শ্রমিকরা পেট্রোগ্রাড শহরে ধর্মঘট শুরু করল। রুশ সরকার মার্চের প্রথম দিকে সেনাবাহিনীকে শ্রমিকদের ওপর গুলি চালাবার নির্দেশ দিল।

কিন্তু সৈন্যবাহিনী আদেশ পালনে অসম্মত হয়। ফলে বিদ্রোহ দ্রুতগতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

গণবিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সৈনিক ও শ্রমিকরা সম্মিলিত ভাবে রাজধানীতে একটি সোভিয়েট বা পরিষদ গঠন করল।

জার পেট্রোগ্রাড পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠনের প্রতিশ্রুতি দিতে হল। জনসাধারণ জ্যারের পদত্যাগ দাবী করল।

জার দ্বিতীয় নিকোলাস এই চাপে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করলেন ১৯১৭ খ্রিঃ ১৫ই মার্চ। এটিই হল রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্ব যা মার্চ বিপ্লব নামে পরিচিত। এই সফল প্রথম পর্বের পর জাতীয় পরিষদ ফ্রিন্স লড্ভ-এর নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার স্থাপন করল।

কিন্তু এই সরকার জনগণের আশাকে বাস্তব রূপ দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে আবার দেশ জুড়ে গোলযোগের সূত্রপাত হয়। রাশিয়ার সর্বত্র শ্রমিক ও সৈন্যরা সোভিয়েট গঠন করে জোর প্রচারকার্য আরম্ভ করল।

শ্রমিকরা উচ্চহারে বেতন দাবি করে ধর্মঘট করল।

সৈন্যরা তাদের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের আদেশ অমান্য করে বিদ্রোহী হল।

কৃষকরা বলপূর্বক অভিজাত সম্প্রদায়ের জমি দখল করে নিল।

মে মাসেই ট্রটস্কি প্রমুখ নির্বাসিত বলশেভিক বিপ্লবীদের অনেকেই স্বদেশে ফিরে এলেন এবং তাঁরা নতুন উৎসাহে এই বিদ্রোহে প্রেরণা দিতে লাগলেন।

বলশেভিক নেতা লেনিন তার আগেই এপ্রিল মাসে সুইজারল্যান্ড থেকে জার্মানি হয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন।

এই অবস্থায় লড্ভ সরকারের নেতৃবর্গ বিতাড়িত হলেন এবং কেরেনস্কির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক মেনশেভিক দল সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করল।

জুলাই মাসে যুদ্ধে রাশিয়ার আরও বিপর্যয় দেখা দিল। হতোদ্যম ও নিরাশ রুশ সৈন্যরা গ্যালিসিয়ায় পরাজয় বরণ করলে ১৬ জুলাই হাজার হাজার শ্রমিক, নাবিক ও সৈনিক কৃষকের হাতে জমি, নিরন্নের মুখে অন্ন, জনসাধারণের মনে সুখশান্তি এবং সোভিয়েটের হাতে শাসন ক্ষমতার দাবিতে পেট্রোগ্রাড শহরের রাস্তায় নেমে পড়ল।

মেনশেভিকরা এই বিদ্রোহকে বিপ্লবের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করল। শক্তিশালী সরকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সেই মুহূর্তে লড়াইয়ের ক্ষমতা নেই দেখে লেনিন তখুনি এই বিদ্রোহকে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত করলেন না।

ফলে অজস্র হতাহতের মধ্য দিয়ে জুলাইয়ের বিপ্লবাত্মক দিনগুলি অতিবাহিত হয়ে গেল।

এর পরে কেরেনস্কি লেনিনের বিরুদ্ধে বিদেশী আর্থিক সাহায্য লাভের অভিযোগ তুললে লেনিন ফিনল্যাণ্ডে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

বলশেভিক নেতা ও কর্মীবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন। সশস্ত্র বলশেভিক রেড গার্ডদের নিরস্ত্র করা হল।

প্রধানমন্ত্রী কেরেনস্কি তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান করনিলভকে নিয়ে বলশেভিকদের একেবারে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিয়েও শেষ মুহূর্তে করনিলভ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারেন ভেবে মত পরিবর্তন করলেন। দুজনের মধ্যে এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ইতস্তত ভাবের ফলে সোভিয়েটের পক্ষে বলশেভিকদের পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করে তোলা সম্ভব হল।

অক্টোবর মাস নাগাদ সব মূল সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়ে কেরেনস্কি সরকার কার্যত ক্ষমতাহীন এক অপদার্থ সরকারে পরিণত হল।

ইতিমধ্যে লেনিন দেশে ফিরে এসে জনসাধারণকে জমি, রুটি ও শান্তি দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁর নির্দেশে ট্রটস্কির অধিনায়কত্বে বলশেভিকরা চূড়ান্ত বিপ্লবের জন্য তৈরি হতে লাগল।

১৯১৭ খ্রিঃ ৭ই নভেম্বর শুরু হয় সেই বিপ্লব। কেরেনস্কি সরকারের পতন ঘটল এবং তিনি দেশ ছেড়ে পালালেন।

পরদিনই লেনিন এক বাক্তিতায় মস্ত জমি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে জনসাধারণেব মধ্যে তা বন্টনের কথা ঘোষণা করলেন।

বলশেভিকদের তত্ত্বাবধানে ২৫শে নভেম্বর নির্বাচনের পর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পরিষদ গঠিত হল এবং ১৯১৮ খ্রিঃ ১৮ জানুয়ারি পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসল।

নির্বাচনে সাম্যবাদী বিপ্লবীরা পেয়েছিল প্রায় অর্ধেক আসন। এক চতুর্থাংশ পেয়েছিল বলশেভিকরা।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথম অধিবেশনের পরেই এক আদেশ বলে পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হল এবং সারা রাশিয়ায় সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হল।

ইতিমধ্যে লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে রাশিয়ার অংশ গ্রহণের নাম প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গ তাতে কর্ণপাত করল না। ফলে লেনিন

জার্মানির সঙ্গে পৃথকভাবে সন্ধি করতে চাইলেন। সুযোগ বুঝে জার্মানরা রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের প্রায় একতৃতীয়াংশ দাবি করল এবং শেষ পর্যন্ত ইউক্রেন অঞ্চল দখল করে নিয়ে রাশিয়াকে ব্রেস্টলিটোভস্কের অপমানজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর মিত্রশক্তিবর্গ রাশিয়ার বলশেভিক বিরোধী শক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য রাশিয়ায় সৈন্য পাঠালে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং বলশেভিক সরকারের পতন প্রায় আসন্ন হয়ে ওঠে।

এই সময়ে ট্রটস্কি বলশেভিক ফৌজকে সংগঠিত করে পূর্বতন জার বাহিনীর সেনানায়কদের সহযোগিতায় মিত্রপক্ষের ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন।

অসংগঠিত সেনানায়কদের অনৈক্য, তদুপরি রাশিয়ার সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কৃষকদের সমর্থনের অভাবে শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তির সৈন্যদের পরাজয় ঘটে এবং সারা রাশিয়ায় লেনিন পরিচালিত বলশেভিকদের পুনঃ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই প্রথম জনগণ নিজেদের অধিকার অর্জন করল।

বিপ্লবের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল দেশ পুনর্গঠন। এই কাজে হস্তক্ষেপ করে লেনিন প্রথমেই ঘোষণা করলেন এক রাষ্ট্রীয় সনদ, তা হল. যুদ্ধ নয় শান্তি।

এর পর জমিদার আর ভূস্বামীদের কাছ থেকে সমস্ত জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হল।

এই কাজ করতে গিয়ে দীর্ঘ চারবছর দেশের রাজতন্ত্রের সমর্থক ও অসংখ্য প্রতিবিপ্লবী দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হল। এইভাবেই লেনিনের রাশিয়ায় গড়ে উঠল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য শ্রমিক কৃষক ছাত্র শিক্ষক, সমস্ত প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোগিতা করল নতুন রাশিয়ার কর্ণধার লেনিনকে।

বিপ্লবী বসন্তকুমার বিশ্বাস



ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগের এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বিপ্লবী বসন্তকুমার দাস। সেই সময়ে এই তরুণ কাঁপিয়ে তুলেছিলেন কৃষ্ণনগর থেকে দেরাদুন-দিল্লী-লাহোর পর্যন্ত।

১৮৯৫ খ্রিঃ ৬ই ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার পোড়াগাছা গ্রামে দেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রতীক বসন্তকুমারের জন্ম। তাঁর বাবা মতিলাল বিশ্বাস ছিলেন রেলের একজন সাধারণ কর্মী।

সংসারের আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। সামান্য কিছু জমিজমা ছিল বলে কোন রকমে সংসার চলে যেত।

পারিবারিক সূত্রেই বসন্তকুমার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন।

ব্রিটিশ আমলের মধ্যযুগে এদেশে নীলচাষ নিয়ে দেশবাসীর মনে যথেষ্ট ক্ষোভ-বিক্ষোভ জমা হয়েছিল। নদীয়া জেলাও এই আবহাওয়ার বাইরে ছিল না।

সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে বসন্তকুমারের পূর্বপুরুষরা সেই ধূমায়িত ক্ষোভকে দাবানলে পরিণত করেছিলেন। তাঁদের প্রেরণায় ও পরিচালনায় সংগঠিত নীল চাষীরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বসন্তকুমারের সেই পূর্বপুরুষদের নাম ছিল দিগম্বর আর বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস।

বসন্তকুমার যখন মুড়াগাছা হাইস্কুলের ছাত্র তখন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলি। তিনি ছিলেন বিপ্লবী—স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন নির্ভীক সৈনিক।

পূর্বপুরুষদের এই গৌরবময় ইতিহাস বসন্ত কুমারের অজানা ছিল না। আর জানতেন মুড়াগাছা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলি। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বসন্তকুমার বিপ্লবমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ কয়েকজন বিপ্লবীর নাম জানতেন বসন্তকুমার। বিশিষ্ট বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে অমরেন্দ্রর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

রাসবিহারী যখন বাংলার বাইরে গোপনে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলছিলেন সেই সময় অমরেন্দ্রর মাধ্যমেই তিনি বিপ্লবী কর্মধারায় বাংলার তরুণদের জাগিয়ে তুলতেন।

এই তরুণরাই ক্রমে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশের মুক্তি আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক রূপে গড়ে উঠতেন।

অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ হল যথাসময়ে। তিনি বসন্তকুমারকে বিপ্লবী রাসবিহারীর কাছে রেঙ্গুনে পাঠান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যখন আধুনিক কোনও বোমার আবিষ্কার হয়নি সেই সময়েই বাংলার বিপ্লবীরা হাতবোমা তৈরি করতে শিখে গিয়েছিলেন।

লোহা দিয়ে তৈরি করা হত একটা ফাঁপা গোলাকার খোল। তার মধ্যে লোহার টুকরো, পেরেক ইত্যাদির সঙ্গে রাসায়নিক পদার্থ ভরে যে বোমা তৈরি হত তা ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী।

আরও উন্নত শ্রেণীর বোমা বানাবার কলাকৌশল বিদেশ থেকে শিখে এসেছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস। তারপর থেকেই বিপ্লবীদের মধ্যে বোমা তৈরি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল। সেই কালে বোমা তৈরিতে বাঙ্গালী বিপ্লবীরাই ছিল দেশের মধ্যে অগ্রণী।

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনশুরুর অব্যবহিত কালেই ১৯০৬ খ্রিঃ এবং ১৯০৭ খ্রিঃ নদীয়া জেলায় পর পর বিপ্লবীদের দুটো সম্মেলন হল।

প্রথমবারে সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। পি.মিত্র নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। বসন্ত-কুমারের তখন বালক বয়স। তিনি সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলনের কয়েক বছর আগেই বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় গুপ্ত সমিতি গঠনের জন্য যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীনকে বরোদা থেকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের চেষ্টায় কেবল বাংলায় নয়, সারা দেশেই গোপনে গুপ্তসমিতি গঠনের কাজ জোরদার হয়েছিল।

বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল কলকাতায়, ঢাকায়, রাঁচি-দেরাদুন ও কটকে। সুদূর লাহোরেও বিপ্লবীরা সংগঠিত হয়েছিলেন।

দেশের বাইরে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতার প্রচার করবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোর শিখদের সদর পার্টি এবং জার্মানিতে বার্লিন কমিটি নামে দুটি সক্রিয় সমিতিও গড়ে উঠেছিল।

ভারতে বিপ্লব সংগঠিত করার কাজে প্রবাসের এই দুটি সংস্থার তৎপরতা ছিল অবিশ্বাস্য।

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের সৈনিকরা যখন এভাবে দেশে বিদেশে গোপন প্রস্তুতি শুরু করেছে, সেই সময়েই বসন্তকুমার এলেন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সংস্পর্শে। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনের বছর। সময়টা ১৯১০ খ্রিঃ।

দুবছর আগেই ১৯০৮ খ্রিঃ কিশোর ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি বিহারের মুজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়েছিলেন বিদেশী বিচারপতি অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য। সেই ঘটনার পর গোটা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বিপ্লবের আগুন।

বীর ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লর সাহসিকতায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন বসন্তকুমার। দেশমাতৃকার মুক্তির প্রেরণার তলায় তলিয়ে গিয়েছিল অভাবী সংসারের দুঃখমোচনের চিন্তা।

তাঁর দেশাত্মবোধ ক্ষুদ্র সংসারের গন্ডি অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র দেশের বৃত্তে। দেশবাসীর মুক্তিই হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বপ্ন ও সঙ্কল্প।

গ্রামের বাড়িতে থাকার সময়েই তিনি গোপনে শিখে নিয়েছিলেন আগ্নেয়াস্ত্র চালনার কৌশল।

তাঁর এক সম্পর্কিত ভাই ছিলেন পুলিশের সাব-ইনসপেকটর। তিনি যখন বাড়িতে আসতেন তাঁর সঙ্গে থাকত ব্রিচ লোডার বন্দুকটি।

কিশোর বসন্তকুমার সেই বন্দুক নিয়ে সকলের অগোচরে বেরিয়ে পড়তেন পাখি শিকার করতে। বিলের দিকে গিয়ে অনেক সময় তিনি কুমিরও শিকার করতেন।

তারপর যথারীতি ফিরে এসে বন্দুকটি যথাস্থানে রেখে দিতেন। লক্ষ্যভেদ করার কাজে এভাবেই হাত তৈরি করে নিয়েছিলেন বসন্তকুমার।

অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগের পর কিশোর বসন্তকুমার চন্দননগর ও অন্যান্য স্থানে গিয়ে বোমা তৈরির কৌশলও রপ্ত করে ফেলেছিলেন।

১৯১০ খ্রিঃ রাসবিহারীর সংস্পর্শে আসার পর বসন্তকুমারের জীবনে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হল।

দেরাদুনে একটি গোপন বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তুলে সেখানেই সাময়িকভাবে অবস্থান করছিলেন রাসবিহারী। বসন্তকুমার উপস্থিত হলেন সেখানে।

প্রথম আলাপেই মুগ্ধ হলেন রাসবিহারী। দেশসেবায় আগ্রহী কিশোর বসন্তকুমারের মধ্যে আগামীকালের এক সম্ভাবনাময় বিপ্লবীকে প্রত্যক্ষ করলেন তিনি।

নিষ্পাপ, নিরলস, সাহসী ও বুদ্ধিমান বিপ্লবী কর্মীই যে তিনি দেশময় সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন।

রাসবিহারী কাছে টেনে নিলেন বসন্তকুমারকে। প্রথম থেকেই তিনি আস্থাভাজন করে নিলেন তাঁকে।

পাঁচ সদস্যের একটি গুপ্তচক্র গড়ে তুলেছিলেন রাসবিহারী। বসন্তকুমার সেই বিশেষ চক্রের অন্যতম সদস্য মনোনীত হলেন। তাঁর প্রশিক্ষণ চলল পুরোদমে।

দেরাদুন হল উত্তর প্রদেশের একটি পাহাড়ি শহর। শহরের চারপাশে সে সময়ে ছিল প্রচুর আমবাগান।

রাসবিহারী বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য এমনি একটি আমবাগানই বেছে নিয়েছিলেন। সেখানেই বসন্তকুমারের তালিম শুরু হল।

কিছু খুঁটি পরপর সেখানে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। সিগারেটের কৌটোয় মাটি ভর্তি করে বসন্তকুমারের হাতে দেওয়া হত। ওই কৌটো দূর থেকে খুঁটির দিকে তাক করে ছুঁড়তে হত।

বসন্তকুমার টানা তিন মাস এভাবে লক্ষ্যভেদে নিজেকে প্রস্তুত করলেন। এই তালিম ছিল সঠিক লক্ষ্যে বোমা ছোঁড়ার দক্ষতা আয়ত্তে আনার কৌশল।

গোপন আস্তানায় এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য যে কেবল আমবাগানের পোঁতা খুঁটিগুলি নয়, তা বসন্তকুমার ভালই বুঝতে পারতেন। কিন্তু জানতেন না কোন বিশেষ কাজের জন্য তাঁকে এভাবে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে।

ক্ষুদিরামের বোমা ছোঁড়ার ঘটনার কথা ততদিনে দেশের সকলেই জেনে গেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বসন্তকুমার বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁকেও হয়তো অবিলম্বে দেশমাতৃকাব মুক্তিসংগ্রামের কোন পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রশিক্ষণ শেষ হলে রাসবিহারী বসন্তকুমারকে সঙ্গে নিয়ে পাঞ্জাবের লাহোরে গেলেন ১৯১২ খ্রিঃ। এখানে আগেই তিনি গুপ্তসমিতি গঠন করেছিলেন।

বাঙ্গালী তরুণ বসন্তকুমারকে পুলিশের সন্দেহের বাইরে রাখার জন্য তিনি স্থানীয় একটি ওষুধের দোকান পপুলার ফার্মেসিতে কম্পাউন্ডারের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন।

এখানে একটি ছদ্মনামও বসন্তকুমারকে দেওয়া হল—বিপিন দাস।

লাহোরের আগরওয়ালা আশ্রম ছিল বিপ্লবীদের মিলিত হবার স্থান। ১৯১২ খ্রিঃ ১৩ অক্টোবর এখানে এক গোপন বৈঠকে উপস্থিত হলেন বসন্তকুমার। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আরও তিন তরুণ বিপ্লবী। এঁরা হলেন, লাহোরের বালমুকুন্দজি এবং দিল্লির দীননাথ ও অবোধবিহারী।

বিপ্লবী রাসবিহারী এই চার তরুণের কাছে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন।

ভারতের গভর্নর জেনারেল তখন লর্ড হার্ডিঞ্জ। তাঁরই উদ্যোগে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য যে বিপ্লবীদের ওপরে বড় রকমের আঘাত হানা তা বুঝতে বাকি ছিল না রাসবিহারীর।

যাই হোক, নতুন রাজধানীতে বড়লাটের অভিষেক উপলক্ষ্যে লর্ড হার্ডিঞ্জকে নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন হচ্ছে। সেই শোভাযাত্রায় বড়লাটের স্তাবক অনুচরেরা তাঁর অনুগমন করবে।

রাসবিহারী জানালেন বসন্তকুমারের কাজ হবে নিজেদের তৈরি বোমার আগুনে বড়লাটকে বরণ করা।

বসন্তকুমারের দেহমন যেন এমনি একটি কাজের জন্যই উন্মুখ হয়ে ছিল। আনন্দে উত্তেজনায় তিনি বারবার রোমাঞ্চিত হতে লাগলেন।

গত তিন মাস ধরে দেরাদুনের আমবাগানে যে লক্ষ্যভেদের প্রশিক্ষণ তাঁর হয়েছে, এতদিনে তার উদ্দেশ্য তাঁর কাছে পরিষ্কার হল।

রাসবিহারী বসন্তকুমারকে নিয়ে দিল্লি পৌছলেন ২৬শে ডিসেম্বর। আস্তানা নিলেন অধ্যাপক আমিরচাঁদের বাড়িতে। বিপ্লবীদলের অন্যতম সংগঠক ছিলেন আমীরচাঁদ।

দেশের বিপ্লবীদের উৎসাহ উদ্দীপনার বৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগরণ ঘটাবার জন্যই যে ব্রিটিশ শাসনের ওপর মহলের প্রতিনিধিদের খতম করা দরকার এই পরামর্শ ছিল আমীরচাঁদেরই।

এখানে পৌঁছেই রাসবিহারী দিল্লি শহরের একটি মানচিত্র সংগ্রহ করলেন। নিজে আগে ভাল করে দেখে বুঝে নিলেন। পরে রাত গভীর হলে তিনি বসন্তকুমারকে সঙ্গে নিয়ে পথঘাট চেনাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

প্রথমে তাঁরা উপস্থিত হলেন চাঁদনিচকে। সেখানে অদূরেই একটি ঝুলবারান্দাওয়ালা বাড়ি। সেদিকে দেখিয়ে রাসবিহারী বসন্তকুমারকে জানালেন, ওই বারান্দায় বড়লাটের শোভাযাত্রা দেখবার জন্য প্রীতমদাসজির বাড়ির মেয়েরা থাকবেন। বসন্তকুমারকে নারীর ছদ্মবেশে ওখানে মেয়েদের মধ্যে অপেক্ষা করতে হবে।

বড়লাট হার্ডিঞ্জকে নিয়ে রাজকীয় শোভাযাত্রা বের হল ১৯১২ খ্রিঃ ১৩ই ডিসেম্বর। সেদিনের অসম্ভব ঠান্ডা উপেক্ষা করেও হাজার হাজার মানুষ চাঁদনিচক থেকে রাজপথের দুধারে সার দিয়ে ভিড় করেছে। আগ্রহ কৌতূহলে আনন্দিত হচ্ছে জনসমুদ্র।

হাতির পিঠে রুপোর হাওদায় মণিমুক্তা খচিত সিংহাসনে বসে আছেন ব্রিটিশ ভারতের বড়লাট। তাঁর সামনে পেছনে বিশাল শোভাযাত্রা। ব্যান্ডে বাজছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জাতীয় সংগীত গড সেভ দ্য কিং-এর সুর।

সারিবদ্ধ অশ্বারোহী সেনাবাহিনী চলেছে পেছন পেছন। তাদের প্রত্যেকের হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ। শোভাযাত্রার সামনে পেছনে হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে অজস্র ইউনিয়ন জ্যাক।

পরিকল্পনা নির্ধারিত ছিল। জনৈকা লীলাবতীর পরিচয় দিয়ে বসন্তকুমার মহিলার বেশে নিজেকে ঢেকে প্রীতমদাসজির বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে মিশে ছিলেন।

পথের উল্টো দিকের ভিড়ের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী।

একসময় তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে বসন্তকুমার মহিলার বেশ পরিত্যাগ করে সাধারণ বেশে গিয়ে দাঁড়ালেন পাশে।

কিছুটা দূরেই ভিড়ের মধ্যে মিশে আছেন আর এক বিপ্লবী যুবক দিল্লির অবোধবিহারী। তাঁর হাতেও লুকনো রয়েছে বোমা।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে রাজপথ ধরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লর্ড হার্ডিঞ্জের রাজকীয় হাতি কাছাকাছি এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে নির্ভুল লক্ষ্যে বসন্তকুমার ছুঁড়ে দিলেন হাতের বোমা।

বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। লর্ড হার্ডিঞ্জের রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল হাতির পিঠের হাওদা থেকে।

সঠিক লক্ষ্যে নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করেছেন বসন্তকুমার। মুহূর্তের মধ্যে রাজকীয় শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

হার্ডিঞ্জ সাহেবকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। দেখা গেল সাংঘাতিকভাবে আহত তিনি, তবে জীবনহানির আশঙ্কা নেই।

ওদিকে নির্ভুলভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করে উধাও হয়েছেন বসন্তকুমার। পুলিশ বা সেনাবাহিনীর শ্যেনদৃষ্টি তাঁর কোন হদিশই পেল না।

দেরাদুন পৌঁছে দিন কয়েক আত্মগোপন করে রইলেন। পরে সেখান থেকে চলে গেলেন লাহোরে। আবার সেই ওষুধের দোকানে। বিপিন দাস সেই দোকানের এক সাধারণ কর্মচারী।

বড়লাট বেঁচে গেলেও আতঙ্কে কেঁপে উঠল ব্রিটিশ শাসকমহল। ইংলন্ডেও এই সংবাদ আলোড়ন তুলল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন-শোষণের প্রতিবাদ যে ক্রমশঃ সোচ্চার হতে শুরু করেছে তা ভালভাবেই বুঝতে পারল ব্রিটিশ প্রশাসন। সাধারণ কোন রাজকর্মচারী নয় খোদ বড়লাটকেই হত্যার চেষ্টায় এগিয়ে এসেছে পদানত ভারতবাসী।

বড়লাট হত্যার ষড়যন্ত্র তদন্ত করবার জন্য প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। খোদ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে এসে হাজির হল বিখ্যাত গোয়েন্দার দল।

দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা নাম দিয়ে একটা মামলাও শুরু হল লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর আক্রমণের ঘটনাকে নিয়ে।

বসন্তকুমার লাহোরেই রয়েছেন। ইতিমধ্যে রাসবিহারীর কাছে খবর এল, উত্তরবঙ্গের পাবনার দয়ানন্দ আশ্রমে ইংরাজ জেলাশাসক লর্ড গর্ডন ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র দত্তকে গুলি করে হত্যা করেছে। জেলাশাসকের সন্দেহ হয়েছিল, ওই আশ্রমের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংযোগ রয়েছে।

বিপ্লবীরা এবারে জেলাশাসক লর্ড গর্ডনকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে কর্তৃপক্ষ গর্ডনকে সুদূর লাহোরে বদলি করে নিরাপদ দূরত্বে পাঠিয়ে দেয়।

এইসব খবর পেয়ে রাসবিহারী লাহোরের বিপ্লবীদের নিয়ে গোপনে বৈঠক করলেন। স্থির হল, এখানেই অত্যাচারী গর্ডনকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে হবে। এই গুরুদায়িত্বও হাসিমুখে গ্রহণ করলেন বসন্তকুমার।

খবরাখবর সংগ্রহ শুরু হল। জানা গেল লাহোরের এক নৈশ ক্লাবে লর্ড গর্ডন সহ বহু ইংরাজ প্রতি সন্ধ্যায় জড়ো হয়। আনন্দফুর্তি আর সুরাপান করে। বসন্তকুমার সেই ক্লাবে আক্রমণ চালিয়ে গর্ডনকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হলেন।

একবছর আগেই ১৯১২ খ্রিঃ ডিসেম্বরে দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষোভ জমা হয়েছিল মনে। এবারে যাতে ব্যর্থ হতে না হয় তার জন্য নিজেকে সেভাবেই প্রস্তুত করে নিলেন তিনি।

১৯১৩ খ্রিঃ ১৭ ডিসেম্বর। এইদিন বসন্তকুমার নৈশক্লাবে যাওয়ার পথে একটি মারাত্মক বিস্ফোরক বোমা পেতে রাখলেন। কিছু সময় পরেই লর্ড গর্ডন সেই পথে যাবেন।

কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রথম উদ্যোগই ব্যর্থ হয়ে গেল। লর্ড গর্ডনের আসার আগেই এক চাপরাশি আচমকা সাইকেল চেপে ওই পথ দিয়ে যাবার সময় বোমা বিস্ফোরিত হয়ে গেল। চাপরাশিটি ঘটনাস্থলেই মারা গেল।

একবছরের মধ্যে দু'দুটো আক্রমণের ঘটনা ঘটে গেল। বিদেশী শাসকরা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা দিল্লির বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল। এবারে তাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত হল লাহোর।

নানান নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ঝানু গোয়েন্দারা বুঝতে পারলেন, দুটি বোমাই একই রকম মালমশলা দিয়ে তৈরি, দুটি ঘটনার সঙ্গে একই দল জড়িত।

সেই সময়ে বোমা তৈরির কাজে বাংলার বিপ্লবীদের দক্ষতার কথ সুবিদিত ছিল। সেই সূত্র ধরে ব্রিটিশ প্রশাসন বাংলায় ব্যাপক তল্লাশি শুরু করল। সেই সঙ্গে বড়লাট ও গর্ডন হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িতদের ধরবার জন্য মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করল।

দিল্লি-লাহোর দুর্ঘটনার যোগসূত্র আবিষ্কার হতে দেরি হল না। গোয়েন্দারা জেনে গেল, এই গোপন ষড়যন্ত্রের নায়ক হলেন রাসবিহারী বসু। তাঁর ভাবশিষ্য বসন্তকুমারের নামও তারা উদ্ধার করল।

পুলিশের গতিবিধি বুঝতে পেরে বিপ্লবীরা ছদ্মবেশে আত্মগোপন করলেন।

বসন্তকুমার লাহোর ছেড়ে এসে বাংলার গ্রামে আশ্রয় নিলেন। রাসবিহারী নবদ্বীপে আত্মগোপন করলেন।

১৯১৪ খ্রিঃ বসন্তকুমারের গ্রামের বাড়িতে তাঁর বাবা মারা গেলেন। খবর পেয়ে তিনি গোপনে পোড়াগাছা গ্রামে উপস্থিত হলেন। বাবার শেষ কাজ সম্পন্ন করবার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই উতলা হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

একদিন শ্রাদ্ধের জিনিসপত্র কেনার জন্য কৃষ্ণনগরে গেলেন। সেখানে যে আত্মীয়ের বাড়িতে তিনি উঠেছিলেন, সেখানেই শেষ পর্যন্ত এক আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন বসন্তকুমার।

সময়টা ১৯১৪খ্রিঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারি।

প্রায় একই সময়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আমিরচাঁদ, অবোধবিহারী বালমুকুন্দ প্রমুখ বিপ্লবীদের। এঁদের সকলকে দিল্লীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হল ১৬ই মার্চ। রাজদ্রোহ, ষড়যন্ত্র এবং বিস্ফোরক দ্রব্য রাখার অভিযোগ সকলের বিরুদ্ধে আনা হল।

বিচারের প্রহসন হল ২১শে মে দিল্লীর দায়রা আদালতে। এই বিচারে বিপ্লবীদের হয়ে সওয়াল করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

দিল্লীর বিচারে ফাঁসির হুকুম হল অবোধ বিহারী, বালমুকুন্দ এবং আমিরচাঁদের। বয়স কম বলে কিশোর বসন্তকুমারের বারো বছরের কারাদন্ড হল।

বসন্তকুমারকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলানোই ছিল ইংরাজ শাসকের উদ্দেশ্য। প্রথম প্রচেষ্টা ফসকে গেলেও তারা নিরস্ত হল না।

লন্ডন থেকে দুজন আইন বিশেষজ্ঞ আনা হল। তাদের পরামর্শে লাহোর হাইকোর্টে ইংরাজ সরকারের পক্ষে আপিল করা হল।

একরকম একতরফা ভাবেই লাহোর হাইকোর্ট ১৯১৫ খ্রিঃ ১০ ফেব্রুয়ারী রায় প্রকাশ করল—"Basanta Kumar Biswas will be hunged until death..." ফাঁসির দিন নির্দিষ্ট হল ১১ই মে।

বসন্তকুমারকে রাখা হল লাহোর জেলে। এইসময় তাঁর দাদা কামাখ্যচরণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন।

নির্ভীক নির্বিকার কিশোর বিপ্লবী তাঁর দাদাকে বলেছিলেন যে, মা যেন দুঃখ না করেন। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং অত্যাচারী লর্ড গর্ডনকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েচেন। মৃত্যুর পূর্বে এটাই তাঁর একমাত্র মর্মপীড়া। তবে "অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে আমি আবার ফিরে আসব।"

১৯০৮খ্রিঃ একই সংকল্প ঘোষিত হয়েছিল মৃত্যুপথযাত্রী অপর এক বিপ্লবী কিশোরের কণ্ঠে। তিনি হলেন শহীদ ক্ষুদিরাম।

নির্দিষ্ট দিনে, ১৯১৫খ্রিঃ ১১মে তারিখে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলে নিশীথ রাতে হাসিমুখে বসন্তকুমার ফাঁসির দড়ি গলায় তুলে নিলেন। সেই সময়ে বয়স তাঁর একুশ বছরও পূর্ণ হয়নি। মৃত্যুর আগে তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ধ্বনি তোলেন—বন্দেমাতরম! বন্দেমাতরম!

মার্টিন লুথার কিং



নিগ্রো জাতির মুক্তি ও জাগরণের ইতিহাসে চারজন মনীষীর দান অসামান্য। এঁরা হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন, এলিজাবেথ বিচার স্টো, প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং মার্টিন লুথার কিং।

যিশু খ্রিস্ট ও থরোর দর্শন এবং মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও বাণী থেকে সহিষ্ণুতা ও অহিংস প্রতিরোধের শিক্ষা লাভ করেছিলেন মার্টিন লুথার কিং।

সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত করে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বর্ণবৈষ্যম্যের মনোভাব এত প্রবল ছিল যে কোন মার্কিন নাগরিক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ বা নারী আত্মমর্যাদা বজায় রেখে মার্কিন জীবনের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারত না।

বর্ণ বৈষম্যের বিষ ঢুকে পড়েছিল স্কুলের পবিত্র গন্ডির ভেতরেও। শিশুকাল থেকেই মার্কিন শ্বেতাঙ্গ শিশুর ঘৃণা আর অবজ্ঞা পেত কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরা। পথেঘাটে যানবাহনে সর্বক্ষেত্রেই সাদা ও কালোর অমানবিক পার্থক্য।

মার্কিন সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই বেদনাময় পরিবেশ অনুশোচনায় বিদ্ধ করত।

আমাদের ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ জাতির অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে, দেশকে দ্বিখন্ডিত করে দূরপনেয় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়েছে জাতির কাঁধে।

মার্কিন দেশেও শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষ কুৎসিতভাবে মার্কিন জনজীবনকে পশ্চাৎমুখী করেছে। মানবিক মূল্যবোধ করেছে ধূলিলুণ্ঠিত।

নিরপেক্ষ আইনের চোখেও কালো সাদার বাহ্যিক পার্থক্য কৃষ্ণাঙ্গদের হেয় করে রেখেছিল।

জাতীয় জীবনের এই কলঙ্ক নির্মূল করবার জন্য আব্রাহাম লিঙ্কন জীবনপাত করেছেন। দাস প্রথার অবসান ঘটিয়ে নিগ্রো সমাজকে তিনি মানবিক অধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন।

মানুষকে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য আততায়ীর গুলিতে জীবন দিতে হয়েছিল তাঁকে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশের কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীর জীবন থেকে বৈষম্য ও বিদ্বেষের অভিশাপ দূর হয়নি। একই জলহাওয়ায় শ্বেতাঙ্গদের

পাশাপাশি বেড়ে ওঠা কৃষ্ণাঙ্গরা কেবল মাত্র চামড়ার রঙের পার্থক্যের জন্যই সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একই বিদ্বেষ ও ঘৃণার আবহাওয়া প্রবাহিত। ফলে সম্মানজনক বৃত্তি ও পেশার ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গরাই অগ্রবর্তী। নিগ্রো সমাজের নামমাত্র প্রতিনিধিত্ব মার্কিন গণতন্ত্রের কলঙ্ক হয়েই অবস্থান করেছিল।

মার্টিন লুথার এই জাতীয় বৈষম্যের প্রতিবাদে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোটি কোটি নিগ্রো শ্বেতাঙ্গ জনগণের সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত দেশের জন সমর্থন লাভ করেছিলেন।

অহিংসা এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের প্রতি মার্টিন লুথারের আস্থা তাঁকে সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের কাছে এক বরণীয় মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯২৯ খ্রিঃ ১৫ জানুয়ারী দক্ষিণ মন্টগোমারী রাজ্যের আটলান্টা শহরে এক নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান পরিবারে মার্টিন লুথারের জন্ম। তাঁর পিতা ও পিতামহ ছিলেন ধর্মযাজক।

এই যাজকবৃত্তির সঙ্গে নিগ্রো জাতির উন্নয়নের কার্যকে এঁরা ব্রত হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন।

পশ্চাদপদ নিগ্রো জাতির মানুষদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা ও ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের চেষ্টায় লুথার কিং-এর পিতা ও পিতামহ তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আর তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গদের সমতার দাবি প্রতিষ্ঠাকল্পে।

বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার জন্য মার্টিন কিং-এর পিতামহ রেভারেন্ড অ্যালফ্রেড ড্যানিয়েল উইলিয়াম স্থাপন করেছিলেন National Association to the Advancement of Coloured Peoples নামে সংস্থা।

এই বৃহৎ সংগঠনের মাধ্যমে শতাধিক বৎসর আগে থেকেই চলেছিল বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে নিগ্রোদের সংগ্রাম।

সংগঠনের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে পূর্বের আটলান্টিক উপসাগর পর্যন্ত। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সারা পৃথিবীর স্বীকৃতি লাভ করেছে এই সংস্থা।

ছাত্র হিসেবে লুথার কিং বরাবরই ছিলেন মেধাবী। শিক্ষা দীক্ষা বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বে যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ।

কলেজে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিদ্যা ও আইন বিষয়েও গভীরভাবে পড়াশোনা করেন লুথার কিং।

জর্জিয়ার আটলান্টায় বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অত্যন্ত কম বয়সেই তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এই সময়েই তিনি কোরেটা স্কট নামের অসাধারণ এক বিদুষীকে বিবাহ করেন।

পরবর্তীকালে কোরেটা স্কট লুথার কিং-এর জীবনে এক অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বিয়ের পরেই ১৯৫৫ খ্রিঃ আলবামার মন্টগোমারিতে ব্যাপটিস্ট চার্চে লুথার কিং যাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন।

ওই বছরেই বাসে নিগ্রোদের পেছনের সিটে বসার আইনের বিরুদ্ধে লুথার কিং আন্দোলন গড়ে তুললেন।

এই আন্দোলনের ফলে মার্কিন জনজীবনে নিগ্রোদের প্রতি যে অমানবিক বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত তার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

বাস ধর্মঘট সর্বাত্মক ভাবে সাফল্য লাভ করায় লুথার কিং নিগ্রোজাতির অবিসংবাদিত নেতা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

শ্বেতাঙ্গ মার্কিন সরকার লুথার কিং-এর জনপ্রিয়তায় আতঙ্কিত হয়ে তাঁর সঙ্গে আপোষ মীমাসাংয় আগ্রহী হন।

মন্টগোমারিতে মেয়রের নেতৃত্বে গঠিত হয় White Citizan Council নামে সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমে নিগ্রোদের সঙ্গে আলোচনা চলতে থাকে। কিন্তু নিগ্রো উন্নয়ন সমিতির নেতা লুথার কিং শ্বেতাঙ্গদের আপোষ আলোচনাকে অর্থহীন বিবেচনা করে আন্দোলন চালাতে বদ্ধপরিকর হন।

শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ সরকার লুথার কিংকে কারারুদ্ধ করে আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেন।

কিন্তু ফল হল বিপরীত। লুথার কিং-এর কারাবাস তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কাছে জাগ্রত নিগ্রোজাতির জনক রূপে পরিচিত করে তুলল।

সারা বিশ্বের মানুষ মার্কিন সরকারের প্রতি ধিক্কার বর্ষণ করলেন। বিশ্বের বিবেক জাগ্রত হল। লুথার কিং কারামুক্ত হলেন।

নিগ্রো জাতির উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষার আন্দোলন আরও জোরদার হল। এই আন্দোলনে লুথার কিং এক অসামান্য ভূমিকা পালন করলেন। ১৯৬৪ খ্রিঃ ওয়াশিংটনে প্রায় দুই লক্ষাধিক নিগ্রো সমবেত হয়েছিল তাঁর আহ্বানে।

১৯৬৫ খ্রিঃ সেলমা থেকে মন্টগোমারি পর্যন্ত নিগ্রোদের বিরাট অভিযানেও তাঁর নেতৃত্বের অবদান ছিল সর্বাধিক।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতিগত সমস্যাকে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ পথে পরিচালনার জন্য ১৯৬৪ খ্রিঃ লুথার কিংকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

পুরস্কারের সমস্ত টাকা তিনি দান করেন নিগ্রো জাতির উন্নয়নের স্বার্থে।

এরপর শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমতার দাবিতে তিনি সমগ্র দেশজুড়ে আরম্ভ করলেন Freedom March। তাঁর এই আন্দোলন ক্রমে জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

সমতার দাবিতে লুথার কিং-এর আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ মানুষদেরও সমর্থন লাভ করে। দিকে দিকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে কোটি কোটি কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন নাগরিকের বঞ্চনার প্রতিবাদে।

এই আন্দোলনের সাংগঠনিক কাজে যখন লুথার কিং উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, সেই সময়েই ১৯৬৬ খ্রিঃ আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারালেন তিনি। সেই সময়ে তাঁর বয়স মাত্র ৩৭ বছর।

লুথার কিং-এর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। সারা পৃথিবীতে ঘাতকের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনিত হয়।

আজ যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিগ্রো জাতির জাগরণের উন্মাদনা বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে, তার মূলে রয়েছে মার্টিন লুথার কিং-এর অবদান।

জওহরলাল নেহরু



প্রখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্ম এলাহাবাদে, ১৮৯৮ খ্রিঃ ১৪ই নভেম্বর। তাঁর পিতা মতিলাল নেহরু, মাতা স্বরূপরানী।

মতিলাল নেহরু ছিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী। ভারতের রাজনীতিতেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে বহুবার তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

মতিলাল নিজে জাতীয়তাবোধে প্রাণিত হলেও তাঁর পরিবারের পরিবেশ ছিল বিদেশানুগত।

এই আবহাওয়াতেই ধনীর বিলাস ও আদরে লালিত হয়েছিলেন জওহরলাল। তাঁর বাল্যের শিক্ষালাভ হয়েছিল ইংরাজ টিউটরের কাছে।

১৯০৫ খ্রিঃ জওহরলালকে বিলেত পাঠানো হল। সেখানে হ্যারোস্কুল, ট্রিনিটি কলেজ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বশেষে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ সর্বমোট সাত বছর অধ্যয়ন করেন।

রসায়ন, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়তে পড়তে তিনি সহসা উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে পড়া আরম্ভ করেন। পরে লন্ডন থেকে ১৯১২ খ্রিঃ দেশে ফিরলেন ব্যারিস্টার হয়ে।

এলাহাবাদে আইন ব্যবসায়ে কিছুকাল লিপ্ত থাকার সময়ে দিল্লির ময়দাকল

মালিকের কন্যা কমলার সঙ্গে জওহরলালের বিবাহ হয়। ১৯১৭ খ্রিঃ তাঁদের কন্যা ইন্দিরার জন্ম হয়। ১৯২৫ খ্রিঃ এই দম্পতি এক পুত্রসন্তান লাভ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই তার মৃত্যু হয়।

বিলেত যাবার আগের বছরে জওহরলাল পিতা মতিলালের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত তাঁর মধ্যে স্বাদেশিক চেতনার কিছুমাত্র উন্মেষ ঘটেনি।

দেশে ফিরে আসার পরেও তিনি ছিলেন বিদেশী ভাবধারায় ভাবিত। স্বদেশী চেতনা তাঁকে প্রথমদিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। অথচ তাঁর পিতা মতিলাল অগ্রগণ্য স্বদেশ সেবক হিসাবে যথেষ্টই সুপরিচিত ছিলেন।

ইতিমধ্যে গান্ধীজি বিদেশ থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। ১৯১৬ খ্রিঃ ডিসেম্বরে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, সেখানেই গান্ধীজির সঙ্গে জওহরলালের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে।

বাল্যাবধি জওহরলাল অ্যানি বেসান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁকে ১৯১৭ খ্রিঃ জুন মাসে ব্রিটিশ সরকার নানা নিপীড়নের পর অন্তরীণ রাখার আদেশ করে। এর ফলে অ্যানিবেসান্তের হোমরুলপন্থী জওহরলালের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তিনি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এইভাবেই জওহরলালের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পদার্পণের সূত্রপাত হয়।

অবশ্য জওহরলালের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তিলক বা বেসান্তের নীতিকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি। তাই গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর নিজের মনের সায় থাকায় তিনি গান্ধীজিকেই অনুসরণের সিদ্ধান্ত করেন।

সেই সময়ে রাওলাট অ্যাক্ট বা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডকে ঘিরে ভারতের রাজনীতিতে চলছিল প্রবল আলোড়ন। এসব ঘটনায় জওহরলালের চিত্ত গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

মতিলালের প্রতিষ্ঠিত The Independent পত্রিকার কর্ণধার রূপে জওহরলাল জ্বালাময়ী ভাষায় এসব ঘটনার প্রতিবাদ করলেন। এর পরেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসে যোগদান করলেন।

১৯২০ খ্রিঃ তিনি এলাহাবাদ কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এর পরে ক্রমে কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটিতে বিভিন্ন পদের অধিকারী হন।

১৯২৩ খ্রিঃ হন সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক, ১৯২৮ খ্রিঃ সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯২৯ খ্রিঃ লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। লাহোর অধিবেশনেই পূর্ণ স্বরাজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

এরপর ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৪৬, ১৯৫১, ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ খ্রিঃ যথাক্রমে লক্ষ্ণৌ, ফৈজপুর, দিল্লি, হায়দরাবাদ ও কল্যাণী কংগ্রেসের অধিবেশনে জওহরলাল আরও ছয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন।

এইভাবে ক্রমে তিনি কংগ্রেসকে একটি নির্দিষ্ট কার্যকরী কাঠামোর মধ্যে বিন্যস্ত করতে চেষ্টা করেন। ওয়ার্কিং কমিটিগুলিতে তাঁর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১৯১৯-২০ খ্রিঃ উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার কাজের মধ্য দিয়েই জওহরলাল গণ সংগঠনে কাজ করবার প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

পাশাপাশি গান্ধীজি প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি একাত্মভাবে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পান। এর ফলে তাঁকে ১৯২১-২২ খ্রিঃ কারাদণ্ড ও জরিমানার দন্ড ভোগ করতে হয়। পরবর্তীকালে নয় বছরের কারাদন্ড নয়বারে ভোগ করেন।

১৯৩৪ খ্রিঃ জুন থেকে ১৯৩৫ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কারাবাসকালে জওহরলাল তাঁর বহুখ্যাত আত্মজীবনী An Autobiography রচনা সম্পূর্ণ করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রিঃ।

১৯২৩ খ্রিঃ এলাহাবাদের পৌরসভার যে নির্বাচন হয় তাতে তিনি সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

কংগ্রেসের বাইরে এটিই ছিল তাঁর প্রথম নির্বাচিত পদ। এই পদ থেকেই তাঁর কর্মোৎসাহ চূড়ান্তবেগ লাভ করে।

তিনি প্রথম থেকেই নিয়মশৃঙ্খলা গড়ে তুলে পৌরসভার শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগে অসাধারণ কর্মস্রোত সৃষ্টি করেন। ১৯২৪ খ্রিঃ তিনি পৌরসভাব দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন।

প্রথম নির্বাচনে ২০-২১ ভোটে জয়লাভ করলেও ১৯২৮ খ্রিঃ পুনর্বার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একভোটে পরাস্ত হন।

ক্রমাগত কারাবাস জওহরলালের জীবনের অবশ্যপ্রাপ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই জীবন ধারার মধ্যেই ১৯৩১ খ্রিঃ পিতা মতিলালের মৃত্যু হয়। পাঁচ পছর পরেই ১৯৩৬ খ্রিঃ ঘটে স্ত্রী কমলার অকাল মৃত্যু।

পিতার সঙ্গে শেষ দেখা না হলেও প্যারোলে ছাড়া পেয়ে জওহরলাল স্ত্রীর কাছে আসতে পেরেছিলেন।

১৯৩৮ খ্রিঃ মারা গেলেন মাতা স্বরূপরানী। এইভাবে ব্যক্তিগত জীবনে যতই শূন্যস্থান বাড়তে লাগল, ততই সেই শূন্যস্থান পুরণ করতে লাগলেন দেশের সেবার কাজে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে। তিনজনের অভাব বহুজনের সান্নিধ্যে পূরণ হতে থাকল।

১৯৩৬ খ্রিঃ কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে জওহরলাল সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর দেশপ্রেম স্বদেশের গন্ডিকে অতিক্রম করে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়।

স্পেনের প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে তিনি নানাবিধ উদ্যোগ নেন এবং ১৯৩৮ খ্রিঃ স্বয়ং

স্পেনে যান। এই সময়ে ইংলন্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাবধারা তাঁকে প্রভাবিত করে।

১৯৩৯ খ্রিঃ তিনি কংগ্রেস গৃহীত National Planning Committee-এর চেয়ারম্যান হন। এতেই গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর চূড়ান্ত মতপার্থক্য দেখা দেয়।

তিনি USSR-এর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ঢঙে এদেশেও উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে চাইলে গান্ধীজি তার বিরোধিতা করেন। এই সময়েই শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

জওহরলাল চিন থেকে ফিরে এসে দেখেন যুদ্ধের ব্যাপারে গান্ধীজি ইংরাজদের পক্ষে। কিন্তু জওহরলাল ছিলেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। তিনি দেখলেন, ইংরাজদের সমর্থন করার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষচন্দ্র এবং গান্ধীজির প্রস্তাব ও পরামর্শ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন।

যদিও ১৯৪২ খ্রিঃ ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় গান্ধী ও জওহরলাল পুনরায় ঐকমত্যে ফিরে আসেন ও উভয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

কারাবাস থেকে মুক্তিলাভ করলেন ১৯৪৫ খ্রিঃ। এই সময় ক্যাবিনেট মিশনে মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং ভাইসরয়ের আহ্বানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেন ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ খ্রিঃ।

এর পরেই আসে স্বাধীনতার প্রত্যাশিত দিনটি এবং পূর্ব দিনেই দেশ ভাগ হয়ে জন্ম হয় পাকিস্তানের।

চোদ্দজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এবং জওহরলাল স্বাধীন ভারতবর্ষের সেই মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হয়ে আমরণকাল ওই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

স্বাধীন ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটময়। তেমনি বৈদেশিক নীতিও ছিল দুর্বল। অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে, সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সীমান্তে নিত্য সংঘর্ষ দেশকে দীর্ণ করে তুলেছিল।

এমনি একটি বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে জওহরলাল দেশের হাল ধরলেন। পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে এবং একটি নির্দিষ্ট বৈদেশিক নীতি উদ্ভাবন করে তাঁকে চলার পথ তৈরি করতে হয়।

১৯৫১-৫২ খ্রিঃ ভারতীয় সাংবিধানিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নতুন সরকারেরও প্রধান হন জওহরলাল।

এই সময়ে প্রেসিডেন্ট নাসের ও মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে যে জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল জওহরলাল তার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হলেন।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনের নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও জওহরলালের সাহিত্যপ্রাণ হৃদয়টি নানা রচনায় নিয়োজিত হয়েছিল।

Soviet Russia (১৯২৮ খ্রিঃ), কন্যা ইন্দিরাকে লেখা Letters from a Father to his Daughter (১৯২৪ খ্রিঃ), Glimpses of World History (১৯৩৪ খ্রিঃ), China, Spain and the War (১৯৪০ খ্রিঃ) The Discovery of India (১৯৪৬ খ্রিঃ) প্রভৃতি গ্রন্থে জওহরলালের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনী ও Discovery of India গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হয়। তাঁর ভাষণাবলীর সংকলন Speeches চারখন্ডে প্রকাশিত হয় (১৯৪৬-৬৪)।

১৯৬৪ খ্রিঃ ২৭শে মে জওহরলাল পরলোক গমন করেন।

কামাল আতাতুর্ক



১৮৮০ খ্রিঃ তুরস্কের সালোকিনায় এক চাষী পরিবারে কামাল আতাতুর্কের জন্ম। ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চলের যে অংশে তাঁদের বংশানুক্রমিক বসতি, তা ছিল পূর্ব ইউরোপের কট্টরপন্থী বিপ্লবীদের স্বভূমি। শিশুকালের বেপরোয়া স্বভাবের মধ্যে তাঁর জন্মভূমির ভাবটি যেন গ্রথিত ছিল।

জেদের সঙ্গে কামালের স্বভাবে যুক্ত হয়েছিল রাগী ও দুর্বিনীত ভাব। এই স্বভাবের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্কুলে সহপাঠী শিক্ষক সকলেরই বিরাগভাজন হয়ে উঠেছিলেন।

স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁকে সতের বছর বয়সে পাঠান হয়েছিল সামরিক শিক্ষার বিদ্যালয়ে। সেখানেও বেপরোয়া স্বভাবের জন্য সকলের ঘৃণা ভয় এবং একই সঙ্গে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন।

দুবছর সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে কামাল রীতিমত সৈনিক হয়ে উঠলেন। তিনি সাব লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত হন। এরপর ভর্তি হন ইমপিরিয়াল স্টাফ কলেজে।

একদল তরুণ তুর্কী অফিসার সেই সময়ে এই কলেজে 'পিতৃভূমি' নামে একটি বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এ সংগঠনের লক্ষ্য ছিল, সুলতান আবদুলের স্বৈরাচার ও বিদেশী ষড়যন্ত্রের কবল থেকে তুরস্ককে মুক্ত করা। কামাল অল্প সময়ের মধ্যেই সংগঠনের নেতা হয়ে উঠলেন।

সুলতানের এক গোয়েন্দা এই গোপন সংগঠনটির হদিশ পেয়ে গিয়েছিল। ফলে

একদিন গোপন ঘাঁটিতে সভা চলার সময়ে কামাল সহ অফিসারদের গোটা দলই ধরা পড়ে গেলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই খালাস পেয়ে গেলেন।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ এই তরুণ অফিসারদের আনুগত্য পাওয়ার আশায় কাউকেই শাস্তি দিতে চাইলেন না। তবে পিতৃভূমি নিষিদ্ধ ঘোষিত হল।

এরপর কামালকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দামাস্কাসে এক অশ্বারোহী বাহিনীতে। সেখানে পৌঁছেই কামাল বে-আইনী ঘোষিত পিতৃভূমির নতুন একটি শাখা খুলে ফেললেন।

সেই সময়ে ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চলে সুলতানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই বিদ্রোহের ঘটনা ঘটছিল। কামাল ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে কিছুদিনের মধ্যেই সালোনিকায় ফিরে এলেন।

এই সময়ে আহমেদ বে নামে একজন পিতৃভূমির সদস্য গোপনে জাহাজে চাপিয়ে কামালকে গাজা অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। কেননা ধরা পড়লে এবারে কামালের মৃত্যুদণ্ড ছিল অবধারিত।

কামাল এইভাবে ঘোরাঘুরির অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন সুলতানের বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থান আসন্ন হয়ে উঠেছে তা শুরু হবে সালোনিকা অঞ্চল থেকে। তাই তিনি অনেক চেষ্টা করে ১৯০৮ খ্রিঃ সালোনিকায় বদলি হয়ে এলেন।

সালোনিকায় এনভার নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস নামে একটি বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল।

এনভার বিপ্লবপন্থী হলেও ছিলেন স্বপ্নচারী—বাস্তবের সঙ্গে তাঁর ভাবনা চিন্তার সংযোগ ছিল কমই।

অপর দিকে কামাল ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী। ফলে উভয়ের যোগাযোগের কিছুদিনের মধ্যেই মতভেদ দেখা দিল। সংস্থার অন্যান্য সদস্যরাও ছিলেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। অথচ কামালের ধ্যানজ্ঞান ছিল কেবল তুর্কীদের জন্যই এক শক্তিশালী তুর্কীসাম্রাজ্য গড়ে তোলা। এদের কারো সঙ্গেই কামালের বনিবনা হবার কথা ছিল না।

১৯০৮ খ্রিঃ নিয়াজি নামে কামালের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সহযোগী কাউকে কিছু না জানিয়ে সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ম্যাসিডোনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান করে বসল। রাজনীতির বিচিত্র খেলায় নিয়াজিকে দমনের জন্য তুরস্ক সরকার যে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিল তারা নিয়াজির পক্ষেই যোগ দিল।

দেশের সর্বশ্রেণীর জনগণ দীর্ঘদিন থেকেই দাসত্ব আর অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছিল। সুযোগ পেয়ে সরকারী সৈন্যদল ও সাধারণ মানুষ দলে দলে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিতে লাগল। এনভার হয়ে উঠলেন সর্ববাদী নেতা।

বিপদের আভাস পেয়ে সুলতান একটি নতুন সংবিধানের কথা ঘোষণা করলেন এবং বিপ্লবীদের কিছু সংস্কার প্রস্তাব মেনে নিলেন।

সালোনিকার হোটেল অলিম্পাস চত্বর থেকে বিশাল জনসমাবেশের সামনে এনভার তাঁর জয়লাভের বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত করলেন। অখ্যাত কামাল নিরুপায় হয়ে সবই শুনলেন।

নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বহিষ্কৃত রাজনীতিকরা কনস্তানতিনোপলে ফিরে আসতে লাগলেন। তাঁরা অনভিজ্ঞ ও অদূরদর্শী বিপ্লবী নেতাদের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা সহজেই নিজেদের হাতে তুলে নিলেন। নিয়াজি খুন হলেন। এনভার ও কামালকে সামরিক কাজের ভার দিয়ে বার্লিন ও ত্রিপোলীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

স্বৈরাচারী সুলতান আবদুল হামিদকে দেশের লোক অভিহিত করত লাল শেয়াল বলে। তাঁর তৎপরতায় উৎকোচ দিয়ে সৈন্যদলকে শীঘ্রই বশীভূত করা সম্ভব হল। আর সারা দেশে এই মর্মে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হল যে নতুন উদারপন্থী শাসকরা বিদেশী চিন্তাধারার মাধ্যমে তুর্কী সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে চাইছে। একই সঙ্গে দালাল শ্রেণীর যাজক সম্প্রদায়কে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হল। তারা দেশবাসীকে জানাতে লাগল ইহুদী ও খ্রিস্টান বিদ্রোহীরা মিলে পবিত্র ইসলাম ও খলিফাতন্ত্রকে ধ্বংস করবার পরিকল্পনা করেছে।

ফল ফলতেও বিলম্ব হল না। একদল সেনাবাহিনী তাদের বিপ্লবী অফিসারদের হত্যা করল। পরে বিশাল এক জনসমাবেশে ইসলাম এবং সুলতানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করল।

এই সংবাদ পেয়ে এনভার বার্লিন থেকে কনস্তানতিনোপল-এ ফিরে এসে দৃঢ় হস্তে প্রতিবিপ্লব ধ্বংস করলেন। তারপর সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর এক অকর্মন্য জ্ঞাতিভাইকে সেখানে বসালেন। তবে আসল ক্ষমতা রইল বিপ্লবী সংস্থারই হাতে।

কামাল এনভারের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করতেন না। তাই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন।

১৯১২ খ্রিঃ সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, মনটিনিগ্রো ও গ্রীস সম্মিলিতভাবে তুরস্কের ওপর আক্রমণ চালাল। ইউরোপের ঘাঁটিগুলো থেকে তুরস্ককে বিতাড়িত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

যদি যথাসময়ে সরকারি বাহিনী তৎপর হয়ে এই আক্রমণ প্রতিরোধ না করত তাহলে তুরস্কের অস্তিত্বই বিপন্ন হত।

পরের বছরই তাদের তৎপরতায় ইউরোপে তুরস্কের ঘাঁটি অ্যাড্রিয়ানোপল তুরস্কের দখলে এসে গেল।

পরপর সাফল্য লাভের ফলে তুরস্কবাসীর কাছে এনভার-এর ভাবমূর্তি হয়ে উঠল ঈশ্বরের মত। তিনি রাজকীয় শোভাযাত্রায় সজ্জিত হয়ে অ্যাড্রিয়ানোপল-এ প্রবেশ করলেন।

অখ্যাত এক অফিসার কামাল এলেন শোভাযাত্রার বহু পেছনে।

এনভার বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে সৈন্য বাহিনীকে পুনর্গঠিত করার কাজ শুরু করলেন। লিমান ভন স্যান্ডারস নামে এক জার্মান জেনারেলকে আমন্ত্রণ করে আনলেন।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ কামাল প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ জানালেন। তিনি নানা স্থানে জনসভা সংগঠিত করে জনসাধারণকে জানালেন, জার্মানির সঙ্গে কোন মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হলে তা তুরস্কের ঘোরতর বিপদ ডেকে আনবে।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এনভাব কামালকে সোফিয়ায় সামরিক অ্যাটাশে করে নির্বাসনে পাঠালেন।

এরপরেই ইউরোপে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রাশিয়া তুরস্ক আক্রমণ করলে এনভার যে একলক্ষ তুর্কী সৈন্য তাদের দমন করবার জন্য পাঠালেন, প্রবল শীতে তাদের মধ্যে ৮৮ হাজার সৈন্য নিদারুণভাবে প্রাণ হারাল।

এদিকে ইংরাজদের পরিকল্পনা ছিল দার্দানিলেসের মধ্য দিয়ে ঢুকে কনস্তান্তিনোপল দখল করা। এই উদ্দেশ্যে তারা গ্যালিপলিতে ৮০ হাজার সৈন্য সমাবেশের সিদ্ধান্ত নিল।

গ্যালিপলিতে তুর্কী বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব ছিল কামালের ওপর। তাঁর যুদ্ধকৌশলে ইংরাজদের গ্যালিপলি অভিযানের সমস্ত আয়োজনই চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল।

কামাল বীরবিক্রমে কনস্তান্তিনোপলে ফিরে এলেন। তাঁকে তুরস্কের শ্রেষ্ঠ বীর বলে সম্মান জানানো হল।

কামালের এই সাফল্য কিন্তু ভালভাবে মেনে নিতে পারলেন না এনভার। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কামালকে ককেশাস-এর রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে রাশিয়ার গ্র্যান্ড ডিউক নিকোলাস সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন। এনভার ধারণা করেছিলেন, তুর্কী সৈন্য সেখানে অবশ্যই পরাজয় স্বীকার করবে।

কিন্তু কামালের ভাগ্য এবারেও ছিল সুপ্রসন্ন। বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার সৈন্যদল খুবই দিশেহারা অবস্থার মধ্যে ছিল। ফলে সহজেই কামাল তাদের পর্যুদস্ত করলেন।

এনভার বুঝতে পারছিলেন, কামালের জনপ্রিয়তা যেভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনাও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

এবারে কামালকে সরকারি কাজে বার্লিনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখান থেকে পাঠানো হল লিমানের অধীনে সিরিয়ার রণক্ষেত্রে।

১৯১৮ খ্রিঃ তুরস্ক বাহিনীর পরাজয় ঘটল ইংরাজ সৈন্যের কাছে। কামাল অমানুষিক চেষ্টা করেও পরাজয় এড়াতে পারলেন না।

যুদ্ধ শেষ হবার আগেই এনভার দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। বিপ্লবীদের কমিটি অব ইউনিয়ান অ্যান্ড প্রোগ্রেস ভেঙ্গে গেল। মিত্রবাহিনী কনস্তান্তিনোপল দখল করল। সেখানে সুলতানের গদিতে বসলেন বাহেদ্দীন।

কামাল তখনো হাল ছাড়েননি। তিনি মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর উদ্যোগে আঙ্কারায় এক জাতীয় সরকার গঠিত হল এবং কনস্তান্তিনোপলের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হল।

১৯২০ খ্রিঃ মিত্রশক্তি তুরস্কের জন্য সেভরের শান্তিচুক্তি ঘোষণা করল। কিন্তু চুক্তির অস্বাভাবিক শর্তগুলির বিরুদ্ধে সমগ্র তুরস্ক জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। এই সুযোগে কামাল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে কনস্তান্তিনোপলের দিকে অগ্রসর হলেন।

দীর্ঘ যুদ্ধের পর মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, অনেককেই ছুটি দেওয়া হয়েছিল। এই অবস্থায় গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী ভেনিজেলেসে মিত্রবাহিনীর কাছ থেকে প্রচুর সাজসরঞ্জাম কিনে নিয়ে তাঁর বাহিনীকে শক্তিশালী করে তুললেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কে গ্রীক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

এক বছরের মধ্যেই দেখা গেল তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ প্রায় সবটাই গ্রীসের কবলে চলে গেছে।

কেবল তাই নয় আঙ্কারায় গঠিত কামালদের নতুন সরকারকে নিশ্চিহ্ন করবার উদ্দেশ্যে গ্রীকরা অগ্রসর হতে লাগল।

কামালের জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সময় উপস্থিত হল। ১৯২১ খ্রিঃ জুলাই মাসে গ্রীক সৈন্য আঙ্কারা অভিযান করল। বহু সংখ্যক শক্তিমান সৈন্য ও সাজসরঞ্জামে সজ্জিত শত্রুবাহিনীর সঙ্গে এঁটে ওঠার মত উপযুক্ত আয়োজন কামালের ছিল না।

তিনি বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও সৈন্য নিয়ে ২০০ মাইল পিছিয়ে গিয়ে সাকারিয়া নদীর তীরে প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তুললেন।

মানব ইতিহাসের সম্ভবত হিংস্রতম লড়াইটি এখানেই হল গ্রীক ও তুর্কী সৈন্যের মধ্যে ২৪শে আগস্ট।

খ্রিঃস্টান এবং মুসলমানের বহু শতাব্দী ব্যাপী ঘৃণা বিবাদমান দুই বাহিনীর মধ্যেই মজুদ ছিল। তারা মরণপণ লড়াইয়ে মেতে উঠল।

চোদ্দ দিন ধরে চলল এক অবর্ণনীয় হত্যাকাণ্ড। রক্তে লাল হয়ে গেল সাকারিয়া নদীর জল।

শেষ পর্যন্ত গ্রীকরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হল। তুর্কী সৈন্যের অবস্থাও চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কামাল আর গ্রীক সৈন্যের পিছু ধাওয়া করবার ঝুঁকি নিলেন না।

এরপর রাশিয়ার সাহায্যে কামাল তাঁর সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করলেন। ফ্রান্সের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি করে সিরিয়ার সীমান্ত অরক্ষিত রেখেই ৮০ হাজার সৈন্য নিয়ে সরে এলেন।

ওই বছরেই ২৬শে আগস্ট কামাল গ্রীক ছাউনি অ্যাফিয়ান আক্রমণ করলেন। দু পক্ষেই প্রচন্ড গোলাবর্ষণ হল। কামালের যুদ্ধকৌশল এমনই ছিল যে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রীক বাহিনী দুভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে গ্রীকরা দিশাহারা হয়ে পালাতে লাগল। তাদের গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জামাদি পেছনেই পড়ে রইল।

গ্রীকরা সরাসরি সমুদ্রতীরে থ্রেসে গিয়ে পৌঁছল। তাদের ধাওয়া করতে হলে ইংরাজদের সৈন্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কামালের সন্দেহ হল, তারা তাঁকে দার্দানেলেস অতিক্রম করে হয়তো যেতে দেবে না।

সেই সময়ে ইংরাজরা ছিল যুদ্ধক্লান্ত। কামাল তাঁর তীব্র বাস্তববোধ প্রয়োগ করে বুঝতে পারলেন, এই সময়ে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারলে সাফল্য অনিবার্য।

তিনি সৈন্য বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন হাতিয়ার নিচু রেখে ইংরাজ শিবিরের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে।

তারা যেন বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব দেখিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। দার্দানালেস প্রণালী পর্যন্ত গিয়ে তারা থামবে।

ইংরাজরা কামালের সৈন্যদের নির্ভীকভাবে এগিয়ে যেতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। তাদের ওপর তুর্কীদের আটকে দেবার হুকুম ছিল। কিন্তু গুলি ছোঁড়ার হুকুম ছিল না।

ফলে খুবই সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হল। কোন পক্ষে একটা গুলির শব্দ হলেই ইংলন্ড ও তুরস্ক এক ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে।

শেষ পর্যন্ত দু তরফেই একটা রফা হল। যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব নিয়ে যে বৈঠক হল তাতে স্থির হল, মিত্রবাহিনী থ্রেস থেকে গ্রীকদের এবং কনস্তান্তিনোপল থেকে নিজেদের বাহিনী সরিয়ে নেবে।

বিনা রক্তপাতে প্রখর বাস্তববুদ্ধি বলে কামাল বিরাট জয়লাভ করলেন। তাঁরই আপ্রাণ পরিশ্রমে তুরস্ক আবার বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করল।

এরপর এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে কনস্তান্তিনোপলের সরকারের দখল নিয়ে নিলেন। বৃদ্ধ সুলতান বাহেদ্দীন পালিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ রণতরীতে আশ্রয় নিলেন।

কামাল সুলতানের ভাইপো আবদুল মজিদকে খলিফা-এর পদ দিলেন কিন্তু তাকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হল না।

পরের বছরে কামাল পিপলস পার্টি নামে একটি দল গঠন করলেন। সেই সঙ্গে কূটচাল চেলে সংসদীয় সঙ্কটের পরিবেশ তৈরি করে রাখলেন। পুরনো সরকার ভেঙ্গে দেওয়া হল। কিন্তু নতুন সরকার গঠনের পথও সুগম হল না।

এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পিপলস পার্টির সদস্য কামালুদ্দীন সংসদে প্রস্তাব করলেন নতুন সরকার গঠন করার দায়িত্ব কামালকে দেওয়া উচিত।

কামাল সংসদে এসে ঘোষণা করলেন, তুরস্ক হবে এক সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র এবং তিনি হবেন তার প্রথম প্রেসিডেন্ট, এই শর্তেই কেবল তিনি শাসন ক্ষমতা হাতে নিতে পারেন।

সংসদীয় অচলাবস্থা মোচনের অন্য কোন পথ ছিল না, কাজেই বাধ্য হয়েই সদস্যদের এই শর্তে রাজি হতে হল। কামাল তুরস্কে তাঁর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

খুবই দ্রুত পিপল পার্টি দেশের প্রতিটি গ্রামে তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করল। আগেই কামাল সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন, এবারে দেশের প্রতিটি স্তরের শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে নিলেন।

এর পরেও কামালের নিরঙ্কু স ক্ষমতা লাভের বাধা যা ছিল তা হল ইসলাম ধর্ম। তাঁর ইচ্ছা তুরস্ককে এক আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা। কিন্তু ইসলামের সারিয়তপন্থী পুরনো নিয়মকানুনের পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে তাঁর স্বপ্ন কখনোই সফল হবে না।

কামাল সিদ্ধান্ত নিলেন ইসলামের সাবেকী নিয়মকানুন সব বাতিল করে দেবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সরকারী খবরের কাগজগুলিতে ইসলামের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত প্রচার শুরু করলেন। সেই সঙ্গে বিরোধী খবরের কাগজগুলিতে সংবাদ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতে লাগল।

এই ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া যা হবার তাই হল। দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। ইসলামের মৌলবাদী ধর্মীয় নেতারা মসজিদে হাটে বাজারে মুস্তাফা কামালের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন্।

তাঁরা বলতে লাগলেন, মেয়েদের বোরখাপ্রথা তুলে দিয়ে দেশে নাচ-গান করতে দিয়ে কামাল ইসলামের সব নিয়মকানুনই ভেঙ্গে দিচ্ছেন।

এইসব অভিযোগের বিরুদ্ধে কামালও পাল্টা চাল চাললেন। তিনি অভিযোগ তুললেন যে দেশের প্রধান ধর্মগুরু খলিফা ইংলন্ডের সঙ্গে চক্রান্ত করে তুরস্ককে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন।

এখানেই থেমে থাকলেন না কামাল। কঠোর হাতে তাঁর বিরোধীদের দমন করতে লাগলেন। অনেক সংসদ সদস্যকেই খুন হতে হল।

১৯২০ খ্রিঃ কামাল এক আইন বলে দেশের খলিফাতন্ত্র রদ করে দিয়ে তুরস্ককে

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করলেন। এই সঙ্গে তিনি তাঁর বিরোধীদের জন্য প্রচ্ছন্ন হুমকিরও আভাস দিয়ে রাখলেন। ফলে সদস্যরা এই আইনের প্রতি সমর্থন জানাতে বাধ্য হলেন।

এদিকে কামালের প্রাক্তন সহকর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। তাঁরা দেশ জুড়ে গুপ্ত ঘাঁটি গড়ে তুলল।

কামাল যথাসময়েই তাঁর গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে সব খবর ও প্রমাণ পেয়ে গেলেন। অবিলম্বে এক অভিযান চালিয়ে তিনি তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করলেন। দেশের বৃহত্তম স্বার্থের খাতিরে তিনি বিরোধীদের ফাঁসিকাঠে ঝোলাতেও ইতস্ততঃ করলেন না।

এরপর কামালের চেষ্টায় অচিরেই তুরস্ক আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রে পরিণত হল। প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক অভ্যাস, ব্যবহার, আচার প্রথা, পোশাক-আশাক এমন কি পারিবারিক জীবনের সনাতন বিধি নিষেধের ঘেরাটোপ ভেঙ্গে সম্পূর্ণ এক নতুন তুরস্কের জন্ম হল।

কামালের তুরস্কে প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত ফেজ টুপি পরা নিষিদ্ধ হল, বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হল, স্ত্রীলোকেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্যকরা বন্ধ হল, প্রাপ্তবয়স্করা ভোটাধিকার পেল।

দেশের প্রচলিত আরবি বর্ণমালা পাল্টে পাশ্চাত্য দেশগুলির ব্যবহৃত ল্যাটিন বর্ণমালার প্রচলন হল।

কামাল ইসলামী সমস্ত আইন বদলে সুইজারল্যান্ড, জার্মানি ও ইটালির প্রচলিত আইন দেশে চালু করলেন।

কামালের চেষ্টায় তুর্কী সৈন্যদল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও দক্ষ সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। তিনি শক্তিশালী বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীও গড়ে তুলে ছিলেন।

আপাত দৃষ্টিতে মুস্তাফা কামালকে নির্মম স্বৈরাচারী শাসক মনে হলেও তাঁর মহান দেশপ্রেমের ফলেই প্রাচীনপন্থী খোলসমুক্ত হয়ে আধুনিক সুসভ্য তুরস্কের জন্ম সম্ভব হয়েছে।

১৯৩৮ খ্রিঃ কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন



আসল নাম চিত্তরঞ্জন দাশ। কিন্তু দেশবাসীর শ্রদ্ধা ভালবাসা তাঁকে দেশবন্ধু আখ্যায় ভূষিত করেছিল। তিনি ছিলেন দেশবাসীর প্রাণের মানুষ।

দেশবাসীর দুঃখদুর্দশাকে তিনি অন্তর দিয়ে নিজের বলেই উপলব্ধি করতেন। আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন প্রতিকারের, অকাতরে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন।

শ্রদ্ধায়-কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত দেশবাসী তাঁকে তাই দেশবন্ধু নামে আপনার করে নিয়েছে।

অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী চিত্তরঞ্জন যে সময়ে আর্বিভূত হয়েছিলেন, সেটা ছিল ভারতের নবজাগরণের যুগ।

বিদেশী শাসক ইংরাজের পদানত জাতির অন্তরে জেগে উঠতে শুরু করেছে জাতীয় চেতনা, স্বাধীনতার মূল্যবোধ। পরিবেশগত সমস্ত প্রভাব নিয়েই যেন তিনি জন্মেছিলেন।

১৮৭০ খ্রিঃ ৫ই নভেম্বর চিত্তরঞ্জনের জন্ম। পিতার নাম ভুবনমোহন দাশ, মাতা নিস্তারিণী দেবী।

ধনীর পরিবারে জন্মেও ধনের অহঙ্কার বা বিলাসী মনোভাব তাঁর মধ্যে কখনোই ফুটে ওঠেনি। অল্প বয়স থেকেই দয়া ও দান এই দুটি গুণ তাঁকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিল।

সহপাঠী সমবয়সীদের অভাব-অভিযোগ তাঁকে কাতর করে তুলত। চেষ্টা করতেন দুঃখী বন্ধুর দুঃখ দূর করবার।

পড়াশুনায় ছিল গভীর মনোযোগ। তেমনি খেলাধুলাতেও ছিলেন চৌকস। নেতৃত্বের সহজাত প্রতিভা সেই সময়েই তাঁর মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে। পিতামাতার সুশিক্ষার গুণে চিত্তরঞ্জনের অন্তার্নিহিত গুণাবলী সাবলীল ভাবেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

তাঁর মন ছিল, কোমল, সহানুভূতিশীল। স্বভাব ছিল নেতৃত্ব সুলভ। কিন্তু অন্যায় অথবা মিথ্যাকে কখনোই সহ্য করতে পারতেন না। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ করতেন।

১৮৮৬ খ্রিঃ চিত্তরঞ্জন এন্ট্রান্স পাশ করেন। এই সময়েই তিনি অসাধারণ বক্তৃতা করতে পারতেন। শিক্ষায়তনের বিতর্ক সভায় তাঁর সমকক্ষ হবার যোগ্যতা কারোর হত না। সহপাঠীরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সহজভাবেই মেনে নিতেন।

১৮৯০ খ্রিঃ বি.এ. পাস করবার পর আই.সি.এস পড়বার জন্য চিত্তরঞ্জনকে বিলেত পাঠানো হলো।

তৎকালীন সময়ে আই.সি.এস পাস করে প্রভূত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও অর্থ উপার্জনের লোভনীয় আকর্ষণ শিক্ষিত তরুণদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করত। চিত্তরঞ্জনের অন্তরে ছিল দেশপ্রেম। তিনি এই চাকরিকে দেশের কাজ করার সহায়ক রূপেই বিবেচনা করেছিলেন। চাকরি সূত্রে দেশের সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থার প্রকৃত অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করা যায়।

কেবল তাই নয়, ইংরেজদের আইনকানুন সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার এবং উপযুক্ত জবাব দেবার যোগ্যতা অর্জনের জন্যও আই.সি.এস হওয়াটাকে তিনি জরুরী মনে করেছিলেন।

বিলেতে এসে যথারীতি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন চিত্তরঞ্জন। কিন্তু তাঁর স্বভাবজাত তেজস্বীতাই হলো তাঁর কাল। ধুরন্ধর ইংরাজরা বুঝে গেল এই স্বাধীনচেতা যুবক কখনোই ইংরাজ শাসনের সহায়ক হবে না। তাঁর ক্ষমতা লাভ হবে বিপজ্জনক।

ইংরাজরা চিত্তরঞ্জনকে আই. সি. এস পরীক্ষার অনুমতি দিলেন না। চিত্তরঞ্জন এতে হতাশ হলেন না। তিনি স্থির করলেন, ব্যারিস্টারী পাশ করেই দেশে ফিরবেন।

এই সময়ে একদিন লর্ড সেলিসবেরি এবং জন ম্যাকলীন ভারতবাসীদের সম্পর্কে কিছু অপমানজনক মন্তব্য করেন।

দেশবাসীর অপমানে চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি লন্ডনে প্রবাসী ভারতীয়দের সংগঠিত করে একটি প্রতিবাদ সভা আহ্বান করলেন। সেই সভায় আমন্ত্রণ জানালেন ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডস্টোনকে।

সেদিনের সেই সভায় চিত্তরঞ্জনের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ এমন বুদ্ধিদীপ্ত ও তীক্ষ্ণ হল যে পরদিনই বিলেতের সমস্ত কাগজে সেই বিবরণ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হল।

ভারতীয় অভারতীয় সকল মহলেই চিত্তরঞ্জন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও স্বদেশী চেতনার জন্য প্রশংসিত হলেন।

ইংরাজরা ইতিপূর্বেই চিত্তরঞ্জনকে বিপজ্জনক ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করেছিল। এবারে তাঁরা তাঁর সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হল।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে চিত্তরঞ্জন স্বদেশের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের বিশিষ্টতা নতুনভাবে উপলব্ধি করলেন।

তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট রূপরেখা এই সময় থেকে ছকে নিলেন।

যথাসময়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৮৯৩ খ্রিঃ চিত্তরঞ্জন দেশে ফিরে এলেন। শুরু হলো তাঁর কর্মজীবন—আইন ব্যবসায়।

পিতা ভুবনমোহন একসময়ে অর্থবান রূপেই খ্যাত ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বভাবদাতা। বিপদে পড়ে কেউ তাঁর কাছে হাত পাতলে তিনি কখনো প্রত্যাখ্যান করতেন না।

ফলে নানা দিকে দানধ্যান ও অন্যান্য খাতে অর্থব্যয় করে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। শেষে নিঃস্ব হয়ে আদালত কর্তৃক দেউলিয়া প্রতিপন্ন হয়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জন যখন আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন সেই সময় তাঁর কাঁধে পিতার চল্লিশ হাজার টাকা ঋণের বোঝা।

পিতৃভক্ত চিত্তরঞ্জন অকাতরে পিতার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই আইন ব্যবসায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেন তিনি। ফলে প্রভূত অর্থাগমের সুযোগ হল। অবিলম্বেই তিনি পিতাকে ঋণমুক্ত করলেন এবং পিতার দেউলিয়া অপবাদ ঘোচালেন।

সেই সময় থেকেই চিত্তরঞ্জন তাঁর আয়ের একটা অংশ জনসেবার কাজে ব্যয় করার সঙ্কল্প করলেন।

পরাধীন স্বদেশের প্রতি কর্তব্যবোধ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের অন্তরে সচেতনতা পুর্ণভাবেই জাগরুক ছিল। আইন ব্যবসায় আরম্ভ করার কয়েক বছরের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

১৯০৮ খ্রিঃ আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ সহ জাতীয়তার পূজারী তরুণ বিপ্লবীরা বন্দী হন। চিত্তরঞ্জন বিনা পারিশ্রমিকে বিপ্লবীদের পক্ষ অবলম্বন করে মামলা নিজের হাতে নিলেন।

আসামী পক্ষের প্রধান কৌসুলী হিসেবে অরবিন্দ প্রমুখকে সমর্থন করতে গিয়ে আদালতে তিনি যে সওয়াল করেছিলেন, তা জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। অগ্নিযুগের ইতিহাসেও তা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

মামলার শেষ শুনানীর দিনে বিচারক এবং জুরীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, ''My appeal to you, therefore, is that a man like this who is being charged, charged with the offence with which he has been charged, stands not only before the bar in this court, but stands before the bar of the High Court of history and my appeal to you is this : the song after the controversy will be hushed in silence, long after this turmoil, the agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and love of huminity.....''

চিত্তরঞ্জন সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'এই মামলার শুনানী আদালতে শেষ হলেও মানব ইতিহাসের বিরাট বিচারালয়ে এই মামলার শুনানী চলতে থাকবে অনন্তকাল।

আজ যিনি আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন, যেদিন সব বিচার বিতর্কের অবসান হয়ে যাবে, আজকের আসামীও পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন, সেই অনাগত যুগের মানুষের কাছে, এই অরবিন্দই দেশপ্রেমের উদ্গাতা বলে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সমগ্র পৃথিবী তাঁকে সেদিন মানবতার পূজারী হিসাবে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করবে। তাই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ আইনের চোখে অপরাধ হতে পারে না। দেশপ্রেমের যেই বাণী প্রচারের জন্য আজ তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন, সেদিন সেই বাণীর তরঙ্গ দেশ দেশান্তরের মানুষের অন্তরে মহাভাবের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তুলবে।'

দেশবন্ধুর অসামান্য সওয়ালের পরে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। আইনের চোখে তিনি আর অপরাধী নন। বিপ্লবী মহানায়ক এক নতুন সত্তা নিয়ে কারাগারের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

দেশবন্ধুর সেদিনের ভবিষদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি। ইংরাজের চোখে অভিযুক্ত বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ আজ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত—তিনি ঋষি অরবিন্দ।

আলিপুর বোমার মামলার রায় বেরবার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের নাম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। দেশপ্রেমী ভারতবাসী অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তখন ঝড়ের তান্ডব। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন ব্যাপকভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

একদিকে জাতীয় কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন অপরদিকে সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত দেশপ্রেমী তরুণ সম্প্রদায়ের সহিংস আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে।

স্বাভাবিক ভাবেই এই সময়ে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর লক্ষ ইংরাজ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা আদায় করে দেশের দুরপনেয় দুঃখ ঘোচানো।

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের চরম কলঙ্কময় ঘটনাটি ঘটল ১৯১৯ খ্রিঃ। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের জনসভায় ইংরাজসৈন্য নির্বিচারে গুলি চালিয়ে শতশত নরনারীকে হত্যা করল।

এই নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে দেশময় তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করলেন ইংরাজের দেওয়া নাইট উপাধি।

দেশের এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভে দুঃখে ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠল চিত্তরঞ্জনের চিত্ত। আইন ব্যবসায় আঁকড়ে থাকা আর সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল কংগ্রেস। গঠিত হলো তদন্ত কমিটি। চিত্তরঞ্জন হলেন এই কমিটির অন্যতম সদস্য।

বিচলিত মর্মাহত গান্ধীজি ইংরাজদের দমনমূলক নীতির প্রতিবাদে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব দিলেন। সারা দেশ জেগে উঠল গান্ধীজির ডাকে।

আইনব্যবসা ত্যাগ করে চিত্তরঞ্জন সামিল হলেন স্বদেশী আন্দোলনে। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল নারায়ণ পত্রিকা। এই পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি প্রচার করতে লাগলেন স্বদেশের মর্মবাণী।

১৯২০ খ্রিঃ নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে গান্ধীজি ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। তবে তিনি এও জানিয়েছিলেন, এই অসহযোগ হবে অহিংস।

স্বাধীনতার আন্দোলন, কিন্তু গান্ধীজি তার প্রকৃতি নির্দিষ্ট করলেন, অসহযোগ এবং অহিংস শব্দ দুটি দিয়ে।

১৯২০ খ্রিঃ আগস্ট মাস থেকে দেশব্যাপী আরম্ভ হল আন্দোলন। সর্বস্তরের মানুষ দলে দলে সামিল হল এই আন্দোলনে।

ইংরাজ সরকার কিন্তু বসে থাকল না। তাদের দমননীতি কঠোর থেকে কঠোরতর হল।

কিন্তু পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের প্রেরণায় জাগ্রত জনতা ইংরাজের সমস্ত অত্যাচার নির্যাতনকে উপেক্ষা করে দেশের প্রত্যন্তরে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে লাগল। ইংরাজের রক্তচক্ষু তাদের নিরস্ত করতে ব্যর্থ হল।

চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বিপ্লবের পীঠভূমি কলকাতায় আরম্ভ হলো ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন।

ইতিপূর্বে বিলেতে আই.সি.এস পরীক্ষায় যোগ না দিয়ে দেশসেবার ব্রতকে জীবনের লক্ষ স্থির করে দেশে ফিরে এসেছেন সুভাষচন্দ্র। চিত্তরঞ্জনের স্বদেশ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ তিনি। গ্রহণ করলেন চিত্তরঞ্জনের শিষ্যত্ব।

কলকাতার আইন অমান্য আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠনের দায়িত্ব পেলেন সুভাষচন্দ্র।

তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে স্বদেশী খদ্দর কাপড় বিক্রি এবং কংগ্রেসের বাণী প্রচারে পথে নেমে এলেন।

এই আন্দোলনকে জোরদার করবার উদ্দেশ্যে এবং দেশবাসীর মনে উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য চিত্তরঞ্জন তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদেবী এবং পুত্র চিররঞ্জনকে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে এক অভূতপূর্ব জনজাগরণ ঘটল কলকাতায়।

১৯২১ খ্রিঃ ডিসেম্বরে চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার বরণ করলেন। পরদিনই গ্রেপ্তার হলেন তাঁর সহধর্মিণী বাসন্তীদেবী।

আগুনে যেন ঘৃতাহুতি হল। বাসন্তীদেবীর গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সমগ্র বাংলায় দেখা দিল তীব্র উত্তেজনা। টনক নড়ল ইংরাজ প্রশাসনের। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য সেদিনই মধ্যরাত্রে ইংরাজ শাসক বাসন্তীদেবীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল।

আন্দোলন কিন্তু চলতেই লাগল। দেশপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবকের দল দলে দলে গ্রেপ্তার বরণ করল সম্পূর্ণ অহিংসভাবে। স্কুল কলেজ, অফিস আদালত, হাট-বাজার সর্বত্রই আন্দোলনের স্রোত পৌঁছে গেল। দেশব্যাপী গণজাগরণের এমন নজির মানব ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা।

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র, বীরেন্দ্র শাসমল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। খিলাফৎ আন্দোলনের নেতারাও বাদ গেলেন না।

মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকেও গ্রেপ্তার করা হল।

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহ্যামের বিচারে চিত্তরঞ্জনের বিনাশ্রমে ছয় মাস কারাবাসের দন্ড হল।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইংরাজের দমন পীড়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল আন্দোলনের তীব্রতা। আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকল না। চোরিচৌরায় ঘটল চরম হিংসার প্রকাশ।

আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার আগেই গান্ধীজি বাধ্য হয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন।

অশান্ত ভারতবাসীকে শান্ত রাখার জন্য ইংরাজ সরকার ইতিপূর্বে ১৯১৯ খ্রিঃ শাসন সংস্কার আইন প্রবর্তন করেছিল। তাতে ভারতবাসীকে আইনসভায় প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

এই সংস্কার আইন ভারতবাসীদের সামনে একটি মহাসুযোগ বলেই গণ্য হল। কিন্তু গান্ধীজি স্বয়ং, চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, নেহরু প্রমুখ দেশের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ রয়েছেন কারাবন্দি। ফলে ভারতবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি হল হতাশা। তাদের উৎসাহ উদ্দীপনাও স্তিমিত হতে লাগল।

এদিকে খিলাফৎ আন্দোলনও বন্ধ হয়ে গেল। ফলে জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার যে মৈত্রীবন্ধন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে ছেদ পড়ল, দেশের মানসিক সঙ্কট হল তীব্রতর।

এই সময় চিত্তরঞ্জন আইনসভায় প্রবেশের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে বললেন যে সরকারের শাসনকার্য এবং দমনমূলক নীতির বিরোধিতা করতে হবে আইনসভায় নির্বাচিত হয়ে, ভেতরে থেকে।

গান্ধীজি এই সময় কারাগারে থাকায় তাঁর অনুগামীদের বিরোধিতায় এ নীতি কংগ্রেস কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়।

১৯২২ খ্রিঃ কংগ্রেসের অধিবেশন বসল গয়ায়। সভাপতিত্ব করলেন চিত্তরঞ্জন। এই অধিবেশনে আইনসভায় প্রবেশের প্রশ্নে নেতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন তাঁর অনুসারী মতিলাল, সত্যমূর্তি, হাকিম আফজল খাঁ, বিটলভাই প্যাটেল, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ নেতাদের নিয়ে স্বরাজ্যপার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করলেন। পরে অবশ্য এই পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

স্বারাজ্য পার্টির সভাপতি হলেন চিত্তরঞ্জন, সম্পাদক হলেন মতিলাল নেহরু। চিত্তরঞ্জনের তৎপরতায় এই দল ক্রমে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।

ইংরাজ সরকারের ঘোষণাক্রমে ১৯২৩ খ্রিঃ নভেম্বর মাসে আইনসভার নির্বাচন হল। চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করল।

বাজধানী দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দল ১০৫ টি আসনের মধ্যে ৪০টি আসন লাভ করল। জিন্নার নেতৃত্বে ২৪ জন মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

দুই দলের নেতাদের সমঝোতার ফলে মতিলালের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ দল গড়ে ওঠে। স্বরাজ্য দল ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে এই সময় যে চুক্তি হয় তা বেঙ্গল অ্যাক্ট নামে খ্যাত।

ঐক্যবদ্ধ শক্তির বলে আইন সভায় ইংরাজের বহু প্রস্তাব, এমন কি বাজেট প্রস্তাবও এই দল বাতিল করে দিতে সমর্থ হয়।

স্বারাজ্য পার্টির আদর্শ ও কর্মপন্থা প্রচারের উদ্দেশ্যে পার্টির জন্মলগ্ন থেকেই চিত্তরঞ্জন ফরোয়ার্ড নামে একটি ইংরাজি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এই পত্রিকার লেখার মাধ্যমে তিনি জনসাধারণের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারে সমর্থ হয়েছিলেন। স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠায় চিত্তরঞ্জনের এই ফরোয়ার্ড পত্রিকার প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর।

চিত্তরঞ্জনই কলকাতা করপোরেশনের প্রথম মেয়র হন এবং সুভাষচন্দ্র হন প্রথম প্রধান অফিসার।

ইংরাজ সরকার স্বরাজ্য দলকে দমনের জন্য ১৯২৪ খ্রিঃ বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করে। গ্রেপ্তার হন সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবন্দ।

চিত্তরঞ্জন এই সময় নিজের বাড়িতেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের আহ্বান জানান। গান্ধীজি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সরকারের নতুন অর্ডিন্যান্স জারির উদ্দেশ্য। তাই তিনি এরপর থেকে দেশবন্ধুকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে থাকেন।

অত্যধিক পরিশ্রমে চিত্তরঞ্জনের শরীর দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছিল। চিকিৎসকরা তাঁকে সুচিকিৎসা ও বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের শরীর স্বাস্থ্য জীবনের চাইতে দেশের মানুষের সেবাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন তিনি। তাই পরিশ্রম ও চিন্তা ভাবনার বিরাম ছিল না।

অসুস্থ শরীর নিয়েই আরাম কেদারায় শুয়ে তিনি আইনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

অসুস্থতা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। ফলে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁকে দার্জিলিঙে যেতে হল। দেশবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় চিত্তরঞ্জনের চিকিৎসা করতেন।

কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে চিত্তরঞ্জন মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে ১৯২৫ খ্রিঃ ১৬ই জুন দার্জিলিঙে পরলোক গমন করেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যু ছিল ইন্দ্রপতনের মত এক ভয়াবহ দুঃসংবাদ। দাবানলের মত তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। শোকে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেল ভারতবাসী।

মহাত্মা গান্ধী সহ দেশের বিশিষ্ট নেতারা ছুটে এলেন দেশের মহান নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখলেন,

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল প্রশস্তি রচনা করলেন,

দীনের বন্ধু, দেশের বন্ধু, মানব বন্ধু তুমি,
চেয়ে দেখ আজ লুটায় বিশ্ব তোমার চরণ চুমি।

চিত্তরঞ্জনের শেষ যাত্রায় কলকাতায় যে লোক সমাগম হয়েছিল তা আজও ইতিহাস হয়ে আছে।

দেশের সেবার জন্য দেশবন্ধু তাঁর সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর এই অসামান্য ত্যাগের ফলে সমগ্র ভারতের মানুষ অনুপ্রাণিত হয়, বাংলার মানুষ তাঁকে দেশবন্ধু অভিধায় ভূষিত করে।

পেশা পরিত্যাগ করে তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ তাঁদের অভ্যস্ত বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করে সর্বহারা সন্ন্যাসীদের মত জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হয়েছেন।

মৃত্যুর পূর্বে দেশবন্ধু তাঁর পৈতৃক বসতবাটি জনসাধারণকে দান করেন। এখন সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশবন্ধু নামাঙ্কিত চিত্তরঞ্জন সেবাসদন।

রাজনীতির কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও চিত্তরঞ্জন নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করতেন। সাহিত্যপ্রতিভা ছিল তাঁর সহজাত।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ পত্রিকা তৎকালীন সময়ে খ্যাতি লাভ করেছিল। মালঞ্চ সাগরসঙ্গীত ও অন্তর্যামী প্রভৃতি গ্রন্থ কবি ও লেখক হিসাবে তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব দান করেছে। তাঁর রচিত ডালিম গল্পের নাট্যরূপ ১৯২৪ খ্রিঃ মিনার্ভা মঞ্চে পরিবেশিত হয়।

আবদুল গফফর খাঁ



গান্ধীজির একান্ত অনুগামী সীমান্ত প্রদেশের আবদুল গফফর খাঁ তাঁর কর্মসাধনার জন্য ভারতবাসীর নিকট সীমান্তগান্ধী নামেই সমধিক পরিচিত।

১৮৩০ খ্রিঃ অবিভক্ত ভারতবর্ষের আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী তৎকালীন উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এক নিষ্ঠাবান সুন্নী পরিবারে আবদুল গফফর খাঁর জন্ম।

পারিবারিক ধর্মীয় পরিবেশে ছোটবেলা থেকেই তিনি সৎ নিষ্ঠাবান এবং আদর্শবাদী হয়ে গড়ে উঠেছিলেন।

যৌবনে অসাধারণ সাংগঠনিক পরিচয় দিয়ে তিনি নিজেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজির আগমন। সেই সময় থেকেই গফফর খাঁ গান্ধীজির অন্যতম অনুগামী হয়ে ওঠেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে গান্ধীজি ইংরেজের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গঠন করেছিলেন। গফফর খাঁ সেই সময় থেকেই গান্ধীজির অহিংসা ও সত্যনিষ্ঠার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষে যে দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল আবদুল গফফর খাঁ সেই নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

তৎকালীন তুরস্কের সুলতানকে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায় তাঁদের খলিফা বা ধর্মগুরু বলে মান্য করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক সরকার

মিত্রশক্তির বিরোধীপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। যুদ্ধের অবসান ঘটলে ইংরাজ সরকার তুরস্ক সুলতানের ক্ষমতা খর্ব করার প্রয়াসী হয়।

খলিফার এই অপমানকে ভারতীয় সুন্নী মুসলমানগণ তাঁদের ধর্মের অপমান বলেই গণ্য করেন। তাঁরা সমগ্র ভারত জুড়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন।

এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি ভ্রাতৃদ্বয়। সুন্নী মুসলমানদের ইংরাজ বিরোধী এই আন্দোলনই ভারতবর্ষের ইতিহাসে খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত।

গান্ধীজি এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমান, ভারতের দুই প্রধান জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার বাতাবরণ তৈরি হয়।

ভারতব্যাপী এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত গফফার খাঁ খোদা-ই-খিদমতগার অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবক নামে এক সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলেন।

সীমান্ত প্রদেশে খিলাফৎ ও গান্ধীজির অসহযোগ এই দুই আন্দোলনই সফলতা লাভ করেছিল। গান্ধীবাদী নেতা গফফর খানের অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই তা সম্ভবপর হয়েছিল।

এই সময় থেকেই তিনি সীমান্তগান্ধী আখ্যায় ভূষিত এবং বিশ্ব পরিচিতি লাভ করেছেন।

গফফর খাঁ ছিলেন সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে আদর্শবাদী জন নেতা। ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়েও আজীবন তিনি সকলপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নির্ভীক যোদ্ধার মত সংগ্রাম করেছেন।

মহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে মুললিম লীগ ভারতবর্ষ জুড়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। গফফর খাঁ এই সঙ্কীর্ণ নীতি কখনোই সমর্থন করেননি।

তিনি তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে মুসলিম লীগের বিদ্বেষমূলক নীতির বিরোধিতা করেছেন। তিনি নির্ভীক দৃঢ়তায় ঘোষণা করেছেন, হিন্দু মুসলমান কখনোই দুটি পৃথক জাতি নয়— দুটি সম্প্রদায় মাত্র।

তিনি ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে খণ্ডিত করে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

গান্ধীজি এবং গফফর খানের মত মহান নেতাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ভারত ভাগ হয়েছিল। জন্ম হয়েছিল নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের। সমাজকে সাম্প্রদায়িকতার বিষমুক্ত করতে গান্ধীজি যেমন ব্যর্থ হয়েছিলেন, গফফর খাঁকেও প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও হার মানতে হয়েছিল।

মুসলিম লীগের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রশ্রয় ও বৃদ্ধি লাভ করেছিল, সকলকেই মেনে নিতে হয় ভারতভাগের সিদ্ধান্ত।

১৯৪৭খ্রিঃ ভারতবর্ষ দ্বিখন্ডিত হল। ভারত ও পাকিস্তান নামে দুই পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীনতা লাভ করল।

হতাশ ক্ষুব্ধ গফফর খাঁ রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাঁর গ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তিনি সেখানে গিয়েই বসবাস করতে থাকেন।

যতদিন ভারত অখন্ডিত ছিল, গান্ধীজির ডাকা সকল আন্দোলনেই গফফর খাঁ ছিলেন অগ্রবর্তী সৈনিক।

গান্ধীজির ডাকা ১৯৪২ খ্রিঃ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে গফফর খাঁ ছিলেন প্রথম সারীর অন্যতম।

এছাড়া লবন আন্দোলন, ডান্ডি অভিযান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই অহিংস সত্যাগ্রহীদের অগ্রবর্তী ছিলেন তিনি।

তাঁর স্বক্ষেত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দেশ বিভক্ত হওয়ার আগে যে ধর্ম নিরপেক্ষশক্তির প্রভাব লক্ষিত হয়েছিল তার মূলেও ছিল গফফর খাঁ-এর ব্যক্তিত্ব ও সফল নেতৃত্ব।

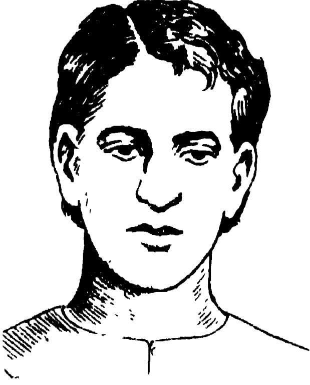
এই উপমহাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সমাজবাদী মানুষের কাছে আজও তিনি তাঁর উদার সনিষ্ঠ মত ও জীবনচর্যার জন্য আদর্শ পুরুষরূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

গফফর খানের স্বপ্ন ছিল, শ্রেণীহীন, শোষণহীন, ধর্মীয় ভেদাভেদ মুক্ত সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন সার্বভৌম অখন্ড ভারতবর্ষ গড়ে তোলা। আজীবন তিনি এই লক্ষ্যেই আপোসহীন সংগ্রাম করেছেন।

জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর ইংরাজের কারাগারের অন্তরালে কেটেছে। দেশ ভাগের পর তাঁর জীবনের শেষ পর্বের দিনগুলিও পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের রোষমুক্ত ছিল না। আমৃত্যু তিনি অখন্ড ভারতের সম্ভাবনার স্বপ্নই দেখে গেছেন।

১৯৮৭ খ্রিঃ ভারত সরকারের আমন্ত্রণে গফফর খাঁ এদেশে আসেন। ভারত সরকার তাঁকে ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। পরের বছরেই তিনি পরলোক গমন করেন।

ক্ষুদিরাম বসু



ছোট্ট একটা নাম ক্ষুদিরাম—কিন্তু কী বিস্ফোরক! নামটার পেছনে লুকিয়ে আছে অনেক রহস্যও। অনেকে বলেন বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম। আসলে তিনি হলেন তৃতীয়। তবে ফাঁসীর মঞ্চে যাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম বিপ্লবী।

অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ হলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। ১৯০৭ খ্রিঃ দেওঘর সংলগ্ন রোহিনী পাহাড়ে তিনি বোমার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

বোমা তৈরি করেছিলেন উল্লাসকর দত্ত। তাঁর কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে গিয়েই প্রচন্ড বিস্ফোরণে ঘটেছিল এই বিপর্যয়।

সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতি সরকার প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ। মন্ত্রগুপ্তির জন্যই এই খবর কেউ জানতেন না। পরবর্তীকালে উপরিউক্ত বিপ্লবীরা প্রকাশ্যে এ খবর স্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয় শহীদ হলেন প্রফুল্লচাকী।

ক্ষুদিরামের ফাঁসীর আগেই বাংলার এক অজ্ঞাত পরিচয় চারণের লেখা গান ছড়িয়ে পড়েছিল মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে—একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি............। সেই গান অমর হয়ে রয়েছে।

বিপ্লবী ক্ষুদিরামের জন্ম হয়েছিল ৩রা ডিসেম্বর ১৮৮৯ খ্রিঃ মেদিনীপুর জেলার মৈবনীতে। অনেকের মতে হাবিবপুরে। তাঁর বাবার নাম ছিল ত্রৈলোক্যনাথ বসু।

অল্প বয়সেই মা-বাবাকে হারিয়ে বড় দিদি অপরূপা দেবীর কাছে মানুষ হয়েছিলেন তিনি। ভাই-এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি পরে বলেছেন—

"এর আগে পরপর দুটো ভাই মারা গেছে, আর আমরা বাঙালী ঘরের অভিসম্পাত নিতে নিতে তিনটে বোন অজয় অমর হয়ে বেঁচে রইলাম—এ লজ্জা রাখবার যেন ঠাঁই পাচ্ছিলাম না। তাই ছোট ভাইটি যখন হল, কি আনন্দ আমাদের। নবজাতক ভাইটিকে আমি কিনে নিলাম তিন মুঠো ক্ষুদ দিয়ে।

আমাদের এদিকে একটা সংস্কার আছে, পরপর কয়েকটি পুত্রসন্তান মারা গেলে মা তার কোলের ছেলের সমস্ত লৌকিক অধিকার ত্যাগ করে বিক্রি করার ভান করেন। যে কেউ কিনে নেন কড়ি দিয়ে, নয়ত ক্ষুদ দিয়ে।

তিন কড়ি দিয়ে কিনলে নাম হয় তিনকড়ি, পাঁচকড়ি দিয়ে কিনলে নাম হয় পাঁচকড়ি। তিন মুঠো ক্ষুদ দিয়ে কিনলাম বলে ভাইটির নাম হল ক্ষুদিরাম"।

ক্ষুদিরাম প্রথমে তমলুক হ্যামিলটন স্কুলে ও পরে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় বিপ্লবী নায়ক সত্যেন বসুর।

সত্যেন্দ্রনাথ তখন ছাত্রমহলে সুপরিচিত নাম। ক্ষুদিরামের অসমসাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি ক্ষুদিরামকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকরতে বলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দেবার আগে তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করতেন, দেশের জন্য মরতে পারিস?

ক্ষুদিরামকেও তিনি একই প্রশ্ন করেছিলেন। ক্ষুদিরাম দ্বিধাশূন্য সহজ ভাবে জবাব দিয়েছিলেন—পারব বই কি!

এই ছোট্ট কথা কয়টির মধ্যেই ক্ষুদিরামের দেশের জন্য মমতা ও তেজস্বীতার প্রমাণ মেলে। এরপর থেকেই তিনি সাধারণ বাঙালীর নিরীহ জীবনযাপন ত্যাগ করে বিদ্রোহী জীবন বরণ করে নেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর কেন্দ্রের মধ্যে লাঠিখেলা, অসি প্রভৃতি খেলায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। পরোপকারপ্রিয়তা ও অলৌকিক সাহসিকতার জন্য তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

১৯০৫ খ্রিঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের ঝড় ওঠে। সেই সময় ক্ষুদিরাম দিদির আশ্রয় ত্যাগ করে চিরদিনের মত স্বদেশীদলের আশ্রয়ে চলে আসেন।

এই সময় থেকে তাঁর কাজ হল, লাঠিখেলায় উৎসাহ দান করা, আর বিলিতি দ্রব্য বয়কটের ছলে বিলিতি কাপড় পোড়ানো। বিলিতি কাপড়ের গাঁট লুঠ করা, আর বিলিতি লবনেব নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া। এর সঙ্গে পিস্তল ছোঁড়া অভ্যাস করা, প্রাচীর ডিঙ্গানো ইত্যাদি কাজও ছিল।

ক্ষুদিবাম তাঁর মন্ত্রগুরু সত্যেন্দ্রনাথের মতই পরের দুঃখে কাতর হয়ে পড়তেন। কেউ কোন বিপদে পড়লে ক্ষুদিরাম ও সত্যেন্দ্রনাথ উভয়েই জীবনপণ করে লেগে যেতেন সমাধানের জন্য।

আবার দেশের মঙ্গলের কাজে যদি কারো পেছনে লাগতেন, তার লাঞ্ছনার একশেষ করে ছাড়তেন।

এক বছর কাঁসাই নদীর বন্যায় গ্রাম ভেসে গেলে। রণপায়ে গিয়ে ক্ষুদিরাম সেখানে ত্রাণকার্য করেছিলেন।

গ্রামে আগুন লাগা, ওলাওঠা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হলে তাঁরাই দলবল নিয়ে জীবন বিপন্ন করে হলেও সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

১৯০৬ খ্রিঃ মেদিনীপুরে মারাঠাকেল্লায় কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী মেলা বসে। এই মেলা প্রাঙ্গণে সোনার বাংলা নামে বিপ্লবী পুস্তিকা বিলি করতে গিয়ে ক্ষুদিরাম প্রথম রাজনৈতিক অভিযোগে অভিযুক্ত হন।

ক্ষুদিরাম পুলিশের হাতে ধরা পড়লে সত্যেন্দ্রনাথই পুলিশকে ধমকে তাঁকে ছাড়িয়ে দেন। সেই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ কালেকটরীতে কেরানীর কাজ করতেন।

সত্যেন্দ্রনাথের পরামর্শমত পলাতক ক্ষুদিরাম পরে ধরা দিয়েছিলেন। কিন্তু অল্প বয়স বলে সরকারের পক্ষ থেকে মামলা তুলে নেওয়া হয়েছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ঘটে কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টা।

সেইসময় কলকাতার অত্যাচারী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড হত্যার জন্য বিপ্লবী দলের সিদ্ধান্ত হয়। তাঁর নিরাপত্তার জন্য সরকার মজঃফরপুরে তাঁকে বদলি করেন।

দলের আদেশে সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু এবং রংপুরের প্রফুল্ল চাকী রওনা হয়ে যান মজঃফরপুর। দুজনের কেউ কাউকে চিনতেন না। রেল স্টেশনেই দুই বিপ্লবীর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়।

আলাপ পরিচয়ের পর দুজনে আশ্রয় নেন একটি ধর্মশালায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুজনে নিঃশব্দে শুধু কিংসফোর্ডের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলেন।

কিংসফোর্ডের কোয়ার্টারের কাছেই ছিল ইউরোপীয় ক্লাব। এখানে ছাড়া কিংসফোর্ড বাইরে কোথাও যান না।

১৯০৮ খ্রিঃ ৩০ শে এপ্রিল। সেদিন কিংসফোর্ডের খেলার সাথী হলেন একজন বড় উকিল মিঃ কেনেডির পত্নী ও কন্যা।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ খেলা শেষ হল। মিস ও মিসেস কেনেডি কিংসফোর্ডের গাড়ির অনুরূপ একটি ঘোড়ার গাড়িতে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

বাইরে দুই বিপ্লবী প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। গাড়িটি গেট পার হয়ে আসতে না আসতেই প্রচন্ড শব্দে সমস্ত শহর কাঁপিয়ে একটা বোমা ফাটল। কেনেডি-পত্নী ও কন্যা সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলেন। বিধ্বস্ত গাড়ি একপাশে উল্টে পড়ল।

যাকে বধ করার জন্য ক্ষুদিরাম প্রফুল্লর এই বোমা নিক্ষেপ, সেই কিংসফোর্ডের অক্ষত গাড়িটি তখন মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

বোমা নিক্ষেপ করেই জুতো ফেলে রেখে দুই বিপ্লবী ছুটলেন দুই দিকে।

ততক্ষণে বোমা বিস্ফোরণের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে না যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না।

দুই বিপ্লবীর কেউ কারো পরিচয় জানেন না। জানানো হয়নি ইচ্ছে করেই। এটাই হল মন্ত্রগুপ্তি।

ক্ষুদিরামকে বলা হয়েছিল তাঁর সঙ্গীর নাম দীনেশ রায়। আর প্রফুল্ল জানতেন তাঁর সঙ্গীর নাম হরেন সরকার।

সারারাত লাইন ধরে হেঁটে পরদিন ভোরে চব্বিশ মাইল দূরবর্তী ওয়াইনী স্টেশনে পৌঁছলেন ক্ষুদিরাম।

ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রমে কাতর হয়ে পড়েছেন। অবসাদে ভেঙ্গে আসছে শরীর। একটা মুদি দোকানে এসে কিছু খাবার কিনে খেলেন।

অদূরেই দাঁড়িয়ে খৈনি টিপছিল দুই কনস্টেবল—ফতে সিং আর শিবপ্রসাদ মিশ্র। ক্ষুদিরামকে দেখেই তাদের সন্দেহ হল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ক্ষুদিরামের কাছে।

পুলিশ দেখেই ক্ষুদিরাম বিদ্যুৎগতিতে হাত দিলেন কোমরে। কিন্তু তার আগেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ফেলল দুই কনস্টেবল। পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম।

ওয়াইনি স্টেশনে ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন ১লা মে। চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল মিসেস ও মিস কেনেডির ওপর বোমা নিক্ষেপকারী আসামী রিভলবারসহ ধরা পড়েছে। মজঃফরপুরের পুলিশ সুপার মিঃ আর্মস্ট্রং ছুটে এলেন ওয়াইনিতে। সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী।

ক্ষুদিরামের সারা মুখে সলজ্জ স্মিত হাসি। যেন খেলা দেখছেন মজা করে।

আর্মস্ট্রং দেখে অবাক হলেন। এই হল কিনা খুনের আসামী! সারা মুখে শিশুর সারল্য মাখানো।

বন্দি ক্ষুদিরামকে নিয়ে বিকেল পাঁচটা নাগাদ আর্মস্ট্রং ফিরে গেলেন মজঃফরপুরে।

গোটা শহর ভেঙ্গে পড়েছে রেল স্টেশনে। পুলিশ সুপার আর্মস্ট্রং বন্দিবীরকে নিয়ে স্পেশাল ট্রেনে করে ফিরে এসেছেন। এই খবর তৎক্ষণে জানতে পেরে গেছে সকলে। তাই জনতা ভিড় করে এসেছে বাংলার এই বন্দিবীরকে একবার দেখে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে।

পুলিশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে ধীরে ধীরে মাটিতে পা দিলেন ক্ষুদিরাম। সারা মুখে ছড়িয়ে আছে মিষ্টি হাসি। সেই অবস্থাতেই তিনি একবার ঘুরে তাকালেন উৎসুক জনতার দিকে।

ধ্বনি তুললেন—বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম! তারপর নির্দিষ্ট ফিটন গাড়িতে উঠে পড়লেন।

স্টেশন থেকে সোজা ইউরোপীয়ান ক্লাব। তারপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ.সি.উডম্যানের কাছে জবানবন্দী।

ক্ষুদিরাম তাঁর জবানবন্দীতে বললেন, 'আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু, বাড়ি মেদিনীপুরে। এন্ট্রান্স ক্লাশ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। আমি এখানে এসেছিলাম কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য। তার মত উৎপীড়ক ম্যাজিস্ট্রেট ভারতে দ্বিতীয় নেই।

তাকে বধ না করে দুই জন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোককে যে আমি হত্যা করেছি, এজন্য আমার মর্মান্তিক যাতনা হচ্ছে।

মেদিনীপুর থেকে আমি এখানে এসেছি। হাওড়ায় আমার সহচর দীনেশের সঙ্গে দেখা হয়। দীনেশের সঙ্গে একটা বোমা ছিল। দীনেশ বোমা তৈরি করতে পারত।

আমার সঙ্গে দুটো রিভলবার ও কতগুলো গুলি ছিল। ওটা আমি কলকাতা থেকে কিনেছিলাম।

আমরা ৭-৮ দিন আগেই মজঃফরপুরে পৌঁছে ধর্মশালায় থেকেছি। আমরা সর্বদা কিংসফোর্ডের খবর নিতাম।

আমরা দেখলাম, কিংসফোর্ড কুঠি থেকে কয়েক গজ দূরের ক্লাব ছাড়া আর কোথাও যান না। একদিন কাছারিতে গিয়ে দেখলাম তিনি সেসনের বিচার করছেন। সেখানে বোমা ছুঁড়লে অনেক নির্দোষ মানুষের মৃত্যু হবে বিবেচনা করে বিরত হই।

৩০শে এপ্রিল কিংসফোর্ডের গাড়ি কখন ক্লাব থেকে ফিরে আসবে সেই প্রতীক্ষায় ছিলাম। একখানা গাড়ি আসছে দেখেই আমি বোমা নিক্ষেপ করেছিলাম।

আমাদের উভয়ের পা-ই খালি ছিল। বোমা নিক্ষেপের পর দীনেশ বাঁকিপুরের দিকে পালিয়ে যায়। আমি সমস্তিপুরের দিকে।

ওয়াইনি স্টেশনে এক মুদির দোকানে যখন জল খাচ্ছিলাম তখন দুজন কনস্টেবল আমাকে গ্রেপ্তার করে।

কলকাতায় এক গুপ্ত সমিতি আছে। সেই সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হয়েই আমি কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে এসেছিলাম। যদি ধরা পড়ি , তাহলে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা কববার জন্য পিস্তল সঙ্গে রেখেছিলাম।'

প্রফুল্ল যে আত্মহত্যা করেছে, একথা ক্ষুদিরাম জানতে পারেন ৩রা মে। মৃতদেহ নিয়ে আসা হল সনাক্ত কবার জন্য।

ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ডাক পড়ে ক্ষুদিরামের।

মৃত যে তাঁর সঙ্গী দীনেশ রায় সেকথা স্বীকাব কবলেন তিনি।

এরপর শুরু হল মামলা। দায়রা আদালতে বিচারযোগ্য মামলা বলে ২১মে তারিখে প্রাথমিক বিচারের জন্য ক্ষুদিরামকে হাজির করা হল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ই.বি. বার্থউডের আদালতে।

২৩শে মে তারিখে আবার একটি বিবৃতি দিলেন ক্ষুদিরাম। আগের বিবৃতির সঙ্গে এবারের বিবৃতির অনেক অমিল দেখা গেল।

ধরা পড়বার পর প্রথম স্বীকারোক্তির কালে ক্ষুদিরামের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে টেনে নিয়ে সঙ্গী প্রফুল্ল চাকীকে সব রকম বিপদ থেকে আড়াল করে রাখা।

প্রফুল্লর মৃত্যু হয়েছে জেনে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় বিবৃতিতে তিনি আর সে চেষ্টা করেননি। ক্ষুদিরামের দ্বিতীয় বিবৃতিটির মধ্যে নতুন কথা যা ছিল তা হল, মজঃফরপুরে আসার পাঁচ-সাতদিন আগে যুগান্তর অফিসে প্রথম দীনেশের সঙ্গে

তাঁর আলাপ হয়। পত্রিকা বিক্রির সূত্রেই তিনি যুগান্তর পত্রিকা অফিসে যাতায়াত করতেন।

তিনি বললেন, 'একদিন আমি যখন খেতে বসেছি, সেই সময় দীনেশ আমার কাছে আসে। সে আমার পরিচয় জানতে চায়। আমার নাম শুনে সে আমাকে চিনতে পারে। কারণ আমার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে পুলিশ একটা মামলা করেছিল। কথাবার্তার পরে সে আমাকে জানায় যে, একটা কাজ করতে পারলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যাবে।

আমি রাজি হই। তখন সে আমাকে শুক্রবার তিনটের সময় হাওড়া স্টেশনে দেখা করতে বলে। সেখানে সে আমাকে কিংসফোর্ডকে হত্যার কথা বলেছিল।

নানাভাবে বোঝাবার পরে আমিও রাজি হয়েছিলাম। দীনেশ আমাকে রিভলবার দিয়ে বলেছিল এগুলো কোথায় পেয়েছি সেকথা যেন কাউকে না বলি। প্রয়োজন হলে যেন অমূল্য দাসের নাম বলি একথাও বলেছিল।

৯ই জুন মঙ্গলবার মজঃফরপুরের এডিশনাল সেসন জজ মিঃ কনডফ-এর আদালতে বিচার শুরু হল।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করার দায়িত্ব নিলেন বাঁকিপুরের বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ মানুক এবং সরকারী উকিল বিনোদবিহারী মজুমদার। ক্ষুদিরামের পক্ষে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন মজঃফরপুরের একজন দেশপ্রেমিক আইনজীবী কালিদাস বসু। আর রংপুর থেকে এলেন সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং নৃপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরা দু'পক্ষের উকিলের সওয়াল জবাব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মামলা শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে নিষ্পত্তি হল, তাতে ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে বিচারক ক্ষুদিরামের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করলেন।

বিচারকের রায় ক্ষুদিরাম শুনলেন মুখে মৃদু হাসি নিয়ে। যে হাসি বরাবর তাঁর মুখে দেখা গেছে।

দর্শকদের আসনে বসেছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ সাহেব। অবাক বিস্ময়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন ক্ষুদিরামের মুখের দিকে। এই অসম্ভব দৃশ্য যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। নিজের মৃত্যুদন্ডাজ্ঞা শুনে এমন করে কেউ হাসতে পারে!

সাহেবের পাশেই বসেছিলেন এক বাঙ্গালী যুবক। তাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, Are you a Bengali Yough?

যুবক সম্মতি জানিয়ে বললেন, Yes।

Try to follow in the foot steps of your brother—একথা বলেই শ্বেতাঙ্গ সাহেবটি আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিনের খবরের কাগজে যে বিবরণ প্রকাশিত হল তা এরকম ঃ

একেবারে নির্বিকারভাবে ক্ষুদিরাম দন্ডাজ্ঞা শুনিলেন। কি নিম্ন আদালতের কমিটির নিকট, কি উচ্চ আদালতে সেসন জজের নিকট, মামলা শুনানী কালে ক্ষুদিরাম অধিকাংশ সময়ই নির্লিপ্তভাবে কাটাইতেন।

কখনো কখনো তাঁহাকে আসামীর কাঠগড়ায় নিদ্রিত অবস্থায় দেখা যাইত। আদালতে কি হইতেছে না হইতেছে, সে সম্বন্ধে ক্ষুদিরাম প্রায়ই উদাসীন থাকিতেন। প্রাণদন্ডযোগ্য অপরাধের অভিযোগে বিচারাধীন আসামীর এই নির্লিপ্তভাব এবং ঔদাসীন্য আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

মৃত্যু দন্ডাজ্ঞার পর ক্ষুদিরামকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখিয়া এবং তাঁহার নির্বিকার ভাব লক্ষ্য করিয়া বিদেশী রাজার স্বজাতীয় বিচারকের মনে সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণ জন্মিয়াছিল যে আসামীর প্রতি যে চরমদন্ড প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ফাঁসির হুকুমের পর জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার প্রতি যে দন্ডের আদেশ হইল তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ?

ক্ষুদিরাম হাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল- বুঝিয়াছি।

সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে ও বিনা পরিশ্রমে ক্ষুদিরামের মামলা চালিয়ে ছিলেন মজঃফরপুরের দেশপ্রেমিক আইনজীবী কালিদাস বসু এবং রংপুর থেকে আগত সতীশ চক্রবর্তী ও নৃপেন লাহিড়ী।

সাক্ষীদের জবানবন্দি ও দুপক্ষের উকিলের সওয়াল জবাবের পূর্বে সতীশবাবু বিচারপতি কর্নডফের অনুমতি নিয়ে বন্দি ক্ষুদিরামের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

ক্ষুদিরামের সঙ্গে সতীশবাবুর যে কথাবার্তা হয়েছিল সেই কোর্ট বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৮ খ্রিঃ ৮ই জুনের সঞ্জীবনী পত্রিকায়। সেই অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, এ থেকেই পরিস্ফুট হবে নির্ভীক বিপ্লবী তরুণ ক্ষুদিরামের মানসিক পরিচয়।

"রংপুরের উকীলবাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ক্ষুদিরামের সঙ্গে কিঞ্চিৎ কথাবার্তা বলিবার অভিপ্রায়ে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। জজ অনুমতি দিলেন।

ক্ষুদিরাম কাঠগড়ায় ছিলেন। অস্ত্রধারী পুলিস ও উকীলগণ কাঠগড়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্ষুদিরামের মুখে অন্তর্নিহিত তেজোগর্ব পরিস্ফুট, তাঁহার কথাবার্তায় কোনরূপ কুন্ঠা বা উদ্বেগের লেশমাত্র নাই।

সতীশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুদিরাম অবিচলিত ভাবে বলিতে লাগিল ঃ

মেদিনীপুর শহরে আমার বাড়ি। আমার বাপ, মা, ভাই, কাকা বা মামা কেহ নাই। কেবল আমার এক বোন আছেন। তাঁর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে। বড়টির বয়স আমার মতই হইবে।

বাবু অমৃতলাল রায়ের সহিত দিদির বিবাহ হইয়াছে। তিনি মেদিনীপুরের জজের হেডক্লার্ক। ইহারাই আমার একমাত্র স্বজন।

বাবু অবিনাশচন্দ্র বসু নামে আমার এক পিসতুত ভাই আছেন। তিনি আমার তত্ত্ববার্তা লন না।

আমি এন্ট্রান্স স্কুলের ২য় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছি। ২/৩ বৎসর হইল পড়া ছাড়িয়াছি। পড়া ছাড়িয়াই স্বদেশী আন্দোলনে কাজ করিতে আরম্ভ করি। সেই সময় হইতে আমার ভগিনীপতি অমৃতবাবু আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমার মা নাই। বাবা ১০/১১ বছর হইল মারা গিয়াছেন। আমার বিমাতা জীবিত আছেন। তিনি তাঁর ভাই সুরেন্দ্রনাথ ভঞ্জের নিকট থাকেন। সুরেন্দ্রনাথ ভঞ্জ কি করেন, কোথায় থাকেন, তাহা আমি জানি না।

—তুমি কাউকেও দেখিতে চাও কি?

—হ্যাঁ, একবার মেদিনীপুর দেখিতে চাই, আমার দিদি ও তাঁর ছেলেমেয়ে কটিকে দেখিতে চাই।

—তোমার মনে কোন দুঃখ আছে কি?

—না, কিছু না।

—তোমার কোন আত্মীয়ের নিকট কোন খবর দিতে বা তাহাদের কাহাকেও তোমার পক্ষের সাহায্যের জন্য এখানে আসিতে বলিতে চাও?

—না, তাঁদের কাছে কোন খবর পাঠাইতে আমার ইচ্ছা নাই। যদি তাঁরা ইচ্ছা করেন আসিতে পারেন।

—জেলে তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়?

—একরূপ ভালই। জেলের খাবারটা খারাপ। আমার সহ্য হয় না, তাতেই আমার শরীর খারাপ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর কোন খারাপ ব্যবহার করে না। একটা নির্জন ঘরে আমাকে দিন রাত বন্ধ করিয়া রাখে। কেবল একবার স্নানের সময় আমাকে বাহিরে আসিতে দেয়। একা থাকিতে থাকিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে কোন খবরের কাগজ বা বই পড়িতে দেয় না, পাইলে বড় ভাল হয়।

—তোমার মনে কোনরূপ ভয় হয় কি?

ভয়ের কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম হাসিয়া ফেলিল। হাসিয়া উত্তর করিল—কেন ভয় করিব?

—তুমি গীতা পড়িয়াছ?

—হ্যাঁ, পড়িয়াছি।

—তুমি কি জান যে, তোমাকে বাঁচাইবার জন্য রংপুর হইতে আমরা কয়েকজন উকিল আসিয়াছি? তুমি ত পূর্বেই তোমাকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছ।

নির্ভীক ক্ষুদিরাম মস্তক উন্নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন স্বীকার করিব না?

সকলে স্তম্ভিত হইলেন। সতীশবাবু বলিলেন—"ক্ষুদিরাম, ভগবানকে স্মরণ কর।"

বিচারের রায় সকলকে হতাশ করলেও কালিদাসবাবু আশা ছাড়লেন না। তিনি হাইকোর্টে আপীল করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কোর্টের অনুমতি নিয়ে কালিদাসবাবু ক্ষুদিরামের সঙ্গে জেলখানায় গিয়ে দেখা করলেন। ক্ষুদিরাম কিন্তু প্রথমে আপীলের দরখাস্তে সই করতে রাজি হলেন না। পরে পিতৃতুল্য মানুষটির পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে সই করলেন।

যথারীতি কলকাতা হাইকোর্টে আপীলের শুনানী হল। কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের রায় অপরিবর্তিতই রইল।

কালিদাসবাবু পরে বড়লাট বাহাদুরের কাছেও ক্ষুদিরামের প্রাণরক্ষার আবেদন জানালেন। কিন্তু তা-ও অগ্রাহ্য হল।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন ধার্য হল ১১ই আগস্ট। ততদিনে দুঃখিনী বাংলার পল্লীকবির অমর সঙ্গীত দেশের পথে প্রান্তরে বাউল ভিখারী, ছোট বড় সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুরু করেছে—

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।'

হিন্দুমতে শবদেহ সৎকার করবার জন্য ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকবার জন্য বেঙ্গলী কাগজের সংবাদদাতা উপেন্দ্রনাথ সেন সহ কয়েকজন আইনজীবী।

পরের ঘটনার বিবরণ উপেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'ক্ষুদিরাম' গ্রন্থে এ ভাবে লিখেছেন ঃ

"১১ই আগস্ট ফাঁসির দিন ধার্য হইল। আমরা দরখাস্ত দিলাম যে ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিব এবং তাহার মৃতদেহ হিন্দুমতে সৎকার করিব।....

.... আমি তখন বেঙ্গলী কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা। বোমা পড়া হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় সংবাদ সে কাগজে পাঠাইতাম। ......

...... আমি অতি গোপনভাবে বাড়িতে বসিয়া একটি বাঁশের খাটিয়া প্রস্তুত করাইলাম। যেখানে মাথা থাকিবে, সেখানে ছুরি দিয়া কাটিয়া বন্দেমাতরম লিখিয়া দিলাম।

ভোর পাঁচটায় ফাঁসি হইবে। পাঁচটার সময় আমি গাড়ির মাথায় খাটিয়াখানি ও আবশ্যকীয় সৎকারের বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, নিকটবর্তী রাস্তা লোকে লোকারণ্য। ফুল লইয়া বহুলোক দাঁড়াইয়া আছে। .....

....দ্বিতীয় লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা জেলের আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ডান দিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ।

দুইদিকে দুইটি খুঁটি আর একটি মোটা লোহার রড বা আড় দ্বারা যুক্ত, তারই মধ্যস্থানে বাঁধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে, তাহার শেষ প্রান্তে একটি ফাঁস।

একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিস। কথাটা ঠিক বলা হইল না। ক্ষুদিরামই আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে।

আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। স্নান সমাপন করিয়া আসিয়াছিল। শেষে শুনিয়াছি, খুব প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিয়া কারাবাসকালীন বর্ধিত চুলগুলি আঙ্গুল দিয়া বিন্যস্ত করিয়া নিকটবর্তী দেবমন্দির হইতে প্রহরী কর্তৃক সংগৃহীত চরণামৃত পান করিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের দিকে আর একবার চাহিল। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখানি পিছনে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হইল। একটি সবুজ রঙের পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামূল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হইল।

ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে ওদিকে একটুও নড়িল না। উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। একটি প্রহরী মঞ্চের একপ্রান্তে অবস্থিত একটি হ্যান্ডেল টানিয়া দিল।

ক্ষুদিরাম নিচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেন্ড ধরিয়া উপরের দড়িটি একটু নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।

..... আমরা জেলের বাহিরে আসিলাম। আধঘন্টা পরে, জেলের দুইজন বাঙ্গালী যুবক ডাক্তার আসিয়া খাটিয়া ও নূতন বস্ত্র লইয়া গেলেন।

নিয়ম অনুসারে ফাঁসির পর গ্রীবার পশ্চাৎ দিকে অস্ত্র করিয়ে দেখা হয় যে, পড়ামাত্র মৃত্যু হইয়াছিল কিনা। ডাক্তার দুইটি সেই অস্ত্রকরা স্থান সেলাই করিয়া ঠেলিয়া বাহির হওয়া জিহ্বা ও চক্ষু যথাস্থানে বসাইয়া, নূতন কাপড় পরাইয়া, দুইজনে খাটিয়া ধরিয়া মৃতদেহটি জেলের বাইরে আমাদের দিয়া গেলেন।

কর্তৃপক্ষের আদেশে আমরা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার দুই পাশে কিছুদূর অন্তর পুলিস প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পশ্চাতে শহরের অগণিত লোক ভিড় করিয়া আছে।

অনেকে শবের উপর ফুল দিয়া গেল। শ্মশানেও অনেক ফুল আসিতে লাগিল। একটি সাব ইনসপেক্টরের নেতৃত্বে বারোজন পুলিস শ্মশানের একপ্রান্তে বসিয়া রইল।

চিতারোহণের আগে স্নান করাইতে গিয়া ক্ষুদিরামের মৃতদেহ বসাইতে গেলাম।

দেখিলাম মস্তকটি মেরুদন্ডচ্যুত হইয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুঃখ-বেদনা-ক্রোধে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাথাটি ধরিয়া রাখিলাম। বন্ধুগণ স্নান করাইলেন।

তারপর চিতায় শোয়ানো হইলে রাশিকৃত ফুল দিয়া মৃতদেহ সম্পূর্ণ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কেবল উহার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি অনাবৃত রহিল।

দেহটি ভষ্মীভূত হইতে সময় লাগিল না। চিতার আগুন নিভাইতে গিয়া প্রথম কলসী জল ঢালিতেই তপ্ত ভষ্মরাশির খানিকটা আমার বক্ষে আসিয়া পড়িল। তাহার জন্য জ্বালা যন্ত্রণা বোধ করিবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না।

আমরা শ্ম'শানবন্ধুগণ স্নান করিতে নদীতে নামিয়া গেলে পুলিস প্রহরীগণ চলিয়া গেল। তখন আমরা সমস্বরে বন্দেমাতরম বলিয়া মনেরভাব খানিকটা লাঘব করিয়া যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে লইয়া আসিলাম একটা টিনের কৌটায় কিছু চিতাভষ্ম কালিদাসবাবুর জন্য। ......"

শহিদ ক্ষুদিরামের মৃত্যু ছিল জীবনাদর্শে উজ্জীবিত চরম অত্মোৎসর্গ। মানুষের ও দেশের কল্যাণ যাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ, এভাবেই যুগে যুগে তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। তাই মৃত্যু তাঁদের ছিনিয়ে নিতে পারে না। মৃত্যুর পরেও তাঁরা মানুষের স্মৃতিতে চিরঅমর হয়ে বেঁচে থাকেন।

বাংলার কাব্যে, সাহিত্যে সঙ্গীতে ও ইতিহাসের পাতায় এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই বিপ্লবীবীর ক্ষুদিরাম মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে আছেন। থাকবেন চিরদিন।

অরবিন্দ ঘোষ



"দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে, বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে অভ্যর্থনা।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যাঁর উদ্দেশ্যে এই প্রশস্তি রচনা করেছিলেন, তিনিই ঋষি-কবি, অগ্নিযুগের মহানায়ক ও সিদ্ধযোগী শ্রীঅরবিন্দ।

মুরারীপুকুরের গুপ্ত সমিতির সংবাদ পুলিশ জানতে পেরেছিল শ্রীরামপুরের নরেন গোঁসাই-এর কাছ থেকে। ফলে ইরাজের রাজশক্তি মানিকতলা বোমা মামলায় কারারুদ্ধ করেছিল অরবিন্দ, উল্লাসকর, দেবব্রত, কানাই দত্ত, সত্যেন বসু, উপেন ব্যানার্জি, হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) ও বারীন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের।

পরাধীন ভারতের সে এক গৌরবোজ্জ্বল দিন, যাঁরা এতদিন গ্যাবিবল্ডি, মাৎসিনী প্রভৃতির ত্যাগ ও কর্মসাধনার কথা বই পুস্তকে পড়ে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হতেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন, তাঁরা দেখতে পেলেন নবীন সম্ভাবনার অরুণিমা।

অরবিন্দের জন্ম হয়েছিল লন্ডনের নরউড পল্লীতে ১৮৭২ খ্রিঃ আগস্টে। তাঁর বাবা কালনানিবাসী ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ আই.এম.এস. ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের উত্তর সাধক। মা স্বর্ণলতা দেবী ছিলেন মনীষী ও স্বাধীন ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা রাজনারায়ণ বসুর কন্যা।

বাল্যবয়সেই ১৮৭৯ খ্রিঃ অন্য দুই ভাই বিনয়কুমার ও মনোমোহনের সঙ্গে অরবিন্দ কৃষ্ণধন ও স্বর্ণলতা বিলেত রওনা হন। সমুদ্রবক্ষে জাহাজেই জন্ম হয় বাংলার অন্যতম অগ্নিশিশু বারীন্দ্রকুমারের।

অরবিন্দ ছিলেন পিতার পাশ্চাত্য ভাবধারা ও মাতার ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতি এই দুই ধারার সম্মিলিত পরিণতি।

সাত বছর বয়সে অরবিন্দকে ম্যানচেস্টারের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। দুবছর পর সেন্টপলস স্কুলে। সেখান থেকে কেমব্রিজ ও কিংস কলেজে পড়াশোনা করে ট্রাইপোস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর পিতার ইচ্ছানুযায়ী আই.সি.এস পরীক্ষা দেন ১৮৯০ খ্রিঃ। একটি বিষয়ে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন ও দ্বিতীয় স্থান পান তাঁর সতীর্থ মিঃ বীচ ক্রফট।

এই মিঃ বীচ ক্রফট আলিপুর বোমার মামলায় অন্যতম বিচারক ছিলেন।

ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষা ছিল আই.সি.এস.-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরীক্ষার দিন অরবিন্দ উপস্থিত না হওয়ায় আই.সি.এস-এর সার্টিফিকেট তাঁর জুটল না।

সেই সময় ভারতের বরোদা রাজ্যের গাইকোয়াড় গিয়েছিলেন লন্ডনে। তিনি অরবিন্দের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বরোদা রাজ্যে নিয়ে এলেন।

শুরু হল অরবিন্দের কর্মজীবন। এই সময়ে সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় ছিলেন বরোদায়। তাঁর কাছে অরবিন্দ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পরে ভারতীয় দর্শন ও শাস্ত্রাদিতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

বরোদা স্টেটে কিছুদিন কাজ করার পর অরবিন্দ বরোদা কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপকের চাকরি গ্রহণ করেন।

প্রচুর উপার্জন করলেও তিনি খুবই সাধারণ ভাবে থাকতেন। সংসার ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বরাবরই ছিলেন উদাসীন।

এই সময়ে অরবিন্দর মামা যোগীন্দ্রনাথ বসুর নিকট সাহিত্য ও সংস্কৃতি শিক্ষা করেন। অবসর সময়ে যোগাভ্যাস করতেন মহাযোগী শ্রীবিষ্ণু ভাস্কর লেলে-এর সান্নিধ্যে।

বরোদা অবস্থানকালেই অরবিন্দ মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর ত্যাগ ও সাহচর্য ছিল অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন ও তপশ্চর্যার অন্যতম প্রেরণা স্বরূপ।

সেইকালে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চলেছে প্রচন্ড আলোড়ন। অরবিন্দ বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় এ বিষয়ে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছিল এই প্রবন্ধগুলির প্রতিপাদ্য।

মানবমুক্তির সাধক ও মহাযোগী অরবিন্দ বরোদায় ১৩ বৎসর অতিবাহিত করে নিজেকে প্রস্তুত করেন। ১৯০৬ খ্রিঃ ৩৪ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় আসেন।

সেই সময় কার্জন-ফুলারের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার চলেছে বাংলায়।

ইংরাজ রাজশক্তির রক্তমাখা রাজনীতিতে নির্যাতীত ও পর্যুদস্ত হচ্ছেন বাংলার জনগণ।

কলকাতায় এসে অরবিন্দ জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদে চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য কিছুদিন পরেই অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন।

এরপরেই অরবিন্দ প্রকাশ করেন বন্দেমাতরম পত্রিকা। সেই সময় তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখাগুলো ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের নব দিশারী।

কিছুদিনের মধ্যেই বন্দেমাতরম পত্রিকায় যোগ দিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ। এভাবেই অরবিন্দর যোগাযোগ ঘটল ভারতের বিপ্লববাদীদের সঙ্গে। অরবিন্দ দেশাত্মবোধের জাগরণে ভগবদসত্তার প্রেরণা অনুভব করতেন। তাই মুরারীপুকুরের গুপ্ত সমিতিতে প্রত্যহ গীতাপাঠ ও চণ্ডীপাঠ হত। পরবর্তীকালে গীতা বুকে নিয়ে শহীদরা হাসিমুখে ফাঁসীর মঞ্চে উঠেছেন।

মেদিনীপুর কংগ্রেস অধিবেশনে ও সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিসম্বাদে অরবিন্দ ব্যথিত হন। বালগঙ্গাধর তিলকের ১৮৯৮ খ্রিঃ মান্দালয় জেলে কারাবাস ও চাপেকরের আত্মত্যাগ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

পাঞ্জাবও জেগে উঠেছে সেই সময়। সর্দার অজিত সিংহের পাশে তাঁর দুই ভাই কিষেণ সিং ও সরণ সিং, অন্যদিকে লালা পিণ্ডিদাস, সুফী অম্বাপ্রসাদ, লালা বাঁকে দয়াল ও ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ। সর্দার অজিত সিং ও অম্বাপ্রসাদ গেলেন ইরানে মুক্তিসংগ্রামের ব্রত নিয়ে।

ইংরাজ রাজশক্তি ভাবতের এই নবজাগরণকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য চরম দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করল।

অরবিন্দর মাতামহ মনীষী রাজনারায়ণ বসু ঠাকুর বাড়িতে যুবকদের সংগঠিত করে গঠন করেছিলেন গুপ্ত সমিতি। ঋকবেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি ও মুক্ত তলোয়ার সাক্ষী রেখে ভারত উদ্ধারের শপথ নিতেন তাঁরা।

১৯০২ খ্রিঃ সিস্টার নিবেদিতা গোপনে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। দেওঘরের উপকণ্ঠে রোহিনী পাহাড়ে বিপ্লবী যুবকগণ বোমা তৈরি করে কার্যকারিতা

পরীক্ষা করতে গিয়ে সহকর্মী প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে হারালেন। তিনিই বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

অরবিন্দ তাঁর বন্দেমাতরম পত্রিকায় লিখলেন "The buruacracy has thrown the gauntlet, we take it up."

ইতিমধ্যে প্রফুল্লচাকী ও যতীন বসু দার্জিলিঙে ঘুরে এলেন। তারপর প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম গেলেন মজঃফরপুর— কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে। শহীদ হন প্রফুল্ল, ধরা পড়ে ফাঁসির দড়ি গলায় পড়ে আত্মবলিদান করলেন ক্ষুদিরাম।

ভাগ্যবিধাতা অরবিন্দকে বেশিদিন রাজনীতিক্ষেত্রে রাখেন নি। হঠাৎ মুরারীপুকুরের গুপ্তসমিতির সংবাদ পুলিশ পেল শ্রীরামপুরের নরেন গোঁসাইয়ের জবানবন্দীতে।

ফলে কারারুদ্ধ হলেন অরবিন্দ সহ উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, বারীন্দ্রকুমার, সত্যেন বসু ও কানাইলাল দত্ত প্রভৃতি।

১৯০৮ খ্রিঃ ৫ই মে অরবিন্দ কারারুদ্ধ হলেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

বিচারে কানাইলাল ও সত্যেনের ফাঁসির হুকুম হল। বাকি যাঁরা রইলেন তাঁদের নিয়ে মামলা চলতে লাগল এডিশনাল জজ মিঃ বীচ ক্রফট -এর আদালতে।

মামলার রায় জানা গেল ১৯০৯ খ্রিঃ ৬ই মে। বারীন ঘোষ ও উল্লাসকরকে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদন্ড।

অন্যান্য অনেকেরই একবছর থেকে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ হল।

অরবিন্দ মুক্তি পেলেন, তবে তখন তিনি আর শুধু বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ নন। কারাজীবনের অবকাশে ইতিমধ্যেই কখন বিপ্লবী অরবিন্দের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ, তাঁর নাম ঋষি অরবিন্দ।

অরবিন্দর মুক্তির ব্যাপারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অবদান ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসামী পক্ষের প্রধান কৌসুলী হিসেবে অরবিন্দকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি যে সওয়াল করেছিলেন, তা ইতিহাস হয়ে আছে।

কারাগারের নির্জনতায় অরবিন্দের ভগবদদর্শন হয়। একইরকম সৌভাগ্য হয়েছিল বিপিনচন্দ্র পালের। বক্সার জেলে নির্বাসন কালে কৃষ্ণকুমার মিত্ররও ভগবদ দর্শনলাভ হয়।

বরোদায় থাকতেই অরবিন্দের যৌগিক জীবন শুরু হয়েছিল। আলিপুর জেলে ঘটেছিল তার পূর্ণ পরিণতি।

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অরবিন্দ বলেছিলেন, তিনি জাতীয় জীবনের উৎস। দক্ষিণেশ্বরের মাটি পরমশ্রদ্ধায় একটি কাগজের প্যাকেটে নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন।

ক্লার্ক সাহেব তাঁর ঘরখানা তল্লাসী করবার সময় সেই মাটিকেই বিস্ফোরক দ্রব্য মনে করে মহা হাঙ্গামা বাঁধিয়েছিলেন।

আলিপুর জেলে পাশাপাশি তিনখানা ঘরের একটি ছোট সেলে অরবিন্দকে রাখা হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, "এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়াল সঙ্গী-স্বরূপ, যেন নিকটে আসিয়া ব্রহ্মময় হইয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। আলিপুরের নির্জন কারাবাসে অপূর্ব প্রেম-শিক্ষা পাইলাম।"

কারাজীবনে অরবিন্দর ভাবান্তর দেখে এমারসন সাহেব বাড়ি থেকে ধুতি, জামা ও পড়বার বই আনবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন বাড়িতে চিঠি লিখে গীতা ও উপনিষদ আনান হয় তাঁর জন্য।

অরবিন্দ বরোদায় থাকতেই আধ্যাত্মিক শক্তিবলে পরাধীন ভারতের মুক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই ১৯০৩ খ্রিঃ তিনি দেশের দিকে দিকে ভবানী মন্দির স্থাপন করেন। কর্মযোগীর আশ্রম গড়ে তুলবার নির্দেশ দিয়েছিলেন নর্মদা তীরে গঙ্গোনাথ আশ্রমে ও কলকাতার মুরারী পুকুরের বাগানে। যোগী শ্রীবিষ্ণু ভাস্কর লেলে যোগশিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁকে। বন্ধুবর দেশপান্ডে ও শ্রীমাধবরাও ওঁকারমন্ত্র জপ শিক্ষা দেন। এর ফলেই অরবিন্দ হয়েছিলেন স্থিতধী।

সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনে যখন লোকমান্য তিলক ও অরবিন্দের নেতৃত্বের জন্য সকলে আকুল তখন অনুনয়-বিনয়ের নরম-পন্থীগোষ্ঠী সেই সভা ভন্ডুল করে দিয়েছিলেন।

অরবিন্দ বললেন, "আমাদের এই জাতীয়তার আন্দোলন .... এ হচ্ছে একটি ধর্ম, যাকে আশ্রয় করে আমরা বাঁচতে চেষ্টা করব। এ একটা ধৃতি, যার সাহায্যে আমরা জাতির মধ্যে দেশবাসীর মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে চাই"। মুক্তিযজ্ঞের ঋত্বিক দেশকে দিলেন নতুন পথ।

রানাডেকে অরবিন্দ লিখেছিলেন, " যে যোগাবস্থা প্রার্থী তাহার পক্ষে জনতা নির্জনতা সমান হওয়া উচিত। শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণই সিদ্ধিলাভের পন্থা— প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম—সমস্ত অন্তঃকরণে শান্তি আসিল।"

অরবিন্দের ভাবান্তর দেখে জেলের ডাক্তার ডাঃ ভেলি সকালে ও বিকালে তাঁর বেড়াবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

অরবিন্দ জেল থেকে মুক্ত হয়ে দেখলেন চিদাম্বরম পিলে ১৯০৭ খ্রিঃ থেকে সাত বছরের জন্য কারারুদ্ধ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নয় জন নেতা নির্বাসনে।

লোকমান্য তিলক মান্দালয়ের কারাগারে, বিপিনচন্দ্র পাল ইংলন্ডের প্রবাসী।

কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যপন্থীরা স্যার রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করে ইংরাজদের করুণালাভের প্রত্যাশায় দিন গুণছেন।

অরবিন্দ ইংরাজিতে কর্মযোগীন ও বাংলায় ধর্ম নামে পত্রিকা প্রকাশ করলেন। তিনি ধর্ম পত্রিকায় লিখলেন,

"যাঁহারা দেশের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা ভয়ের পরিচয় রাখেন না, ভগবান ও বঙ্গজননী ভিন্ন কাহাকেও জানেন না ও মানেন না, তাঁহারা অগ্রসর না হইলে বঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে।"

কিন্তু ফল কিছুই হল না। মধ্যপন্থীগণের এমনই অবস্থা যে তাঁরা সভাসমিতি পর্যন্ত সাহস করে করতে পারেন না।

৩০ শে আশ্বিন রাখীবন্ধন উৎসবে নেতারা জাতীয় ঘোষণাপত্র পাঠ ও বিদেশী বস্ত্র বর্জন করলেন।

এদিকে ব্রিটিশ রাজশক্তি দমননীতি এমনই দৃঢ় করল যে দেশবাসীর মনোবল ভেঙ্গে পড়বার মত অবস্থা।

দেশের এই অবস্থা দেখে অরবিন্দ ধর্ম পত্রিকায় লিখলেন, "নিজের মধ্যে আত্মার বিশাল নীরবতায় ভগবান ও জীবের সংযোগ যে গভীর, অবিচলিত, অভ্রান্ত, শুদ্ধ,সুখ-দুঃখ জয়ী, পাপ-পুণ্যবর্জিত শক্তি সম্ভূত হয়, সেই মহাসৃষ্টিকারিণী, মহা-প্রলয়কারী, মহাস্থিতিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী মহাসরস্বতী, ঐশ্বর্যদায়িনী, মহালক্ষ্মী শক্তিদায়িনী মহাকালী, সেই তেজের সংযোজনে একীভূতা চন্ডী প্রকটিত হইয়া ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে কৃতোদ্যম হইবেন।"

অরবিন্দের বিপ্লববাদ মানবমুক্তির প্রেরণায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য। যে ব্রত নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল সেই ব্রত নিয়েই অরবিন্দ বাণীর কমল বন থেকে কঙ্করময়-রক্তঝরা বিপ্লবের পথে নেমেছিলেন। ভারতের তারুণ্য শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন।

অরবিন্দ তাঁর দিব্য জীবন গ্রন্থে লিখেছেন "একটি অখন্ড সোমধারা শুধু ব্যক্তি-জীবন নহে, সমগ্র বিশ্ব-জীবনের মধ্যে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। সেই ধারা হইল দিব্য জ্যোতিঃ ও দিব্য আনন্দধারা। সেই দিব্য জ্যোতিঃ ও দিব্য আনন্দকে লাভ করিতে হইবে এবং তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে। এই দিব্য আনন্দই সকল অস্তিত্বের মূল আনন্দ—আনন্দময় পরমপুরুষ।"

ভারত-জননী ছিল অরবিন্দের চিন্ময়ী সত্তা। তাই তিনি বলেছেন, "Mother India is not piece of earth, she is power, a Godhead, for all nations have such a Devi supporting their separate existence and keeping it in being."।

তিনি মহাশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করেছেন, "Mother Durga ! Giver of force and love and knowledge ..... in he battle of life in India's battle, we are worriors commisssioned by thee."।

ইতিমধ্যে বিপ্লবীরা বিচারক শামসুল আলমকে হত্যা করলেন। এই হত্যার মামলায় ইংরাজ সরকার অরবিন্দকে জড়িত করবার মতলব করল। বিশ্বস্ত সূত্রে

এই সংবাদ জানতে পেরে অরবিন্দ নিবেদিতাকে জানালেন। তারপর বাগবাজার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনা করে তিনি চন্দননগরে মতিলাল রায়ের বাড়িতে চলে যান। চন্দননগর হল ফরাসী সরকারের শাসনাধীন। ইংরাজ সরকারের নাগালের বাইরে।

চন্দননগর থেকে ১৯১০ খ্রিঃ ৪ঠা এপ্রিল জলপথে ফরাসী অধিকৃত পন্ডীচেরীতে পৌঁছালেন অরবিন্দ।

এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন নলিনীকান্ত গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সৌরীন্দ্রনাথ বসু ও বিজয়কুমার নাগ।

অরবিন্দ তখন যোগী। বিপ্লবের মাটি থেকে তিনি কর্মবন্ধন ছিন্ন করে গেলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর রোপিত বীজ শুধু অঙ্কুরিতই নয়, ভাবীকালে মহীরুহ হয়ে উঠবার সম্ভাবনায় উজ্জ্বল।

পরবর্তীকালের বিপ্লববাদ ব্রিটিশ রাজশক্তির মূলে যে চরম আঘাত করেছিল তাই তার প্রমাণ।

পন্ডীচেরী চলে যাবার চার বছর পরে অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর বাসভবনে মৃণালিনী দেবী ইহলোক ত্যাগ করেন।

পন্ডীচেরীতে অরবিন্দের ৪২তম জন্মদিনে আর্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়। ধীরে ধীরে তাঁকে কেন্দ্র করে সেখানে যোগাশ্রম গড়ে উঠল। নিজের যোগলব্ধ শক্তির প্রভাবে দেশের মুক্তি ও মানবাত্মার আত্মিক বিকাশ সাধনেই অরবিন্দ আত্মনিয়োগ করলেন। মানব-সমাজকে দিব্যজীবনের আদর্শ গ্রহণে তিনি আহ্বান জানালেন।

এই সময় ফরাসী-কন্যা মাদাম মীরা ও মঁসিয়ে পল রিসার অরবিন্দের দিব্যানুভূতিতে আকৃষ্ট হয়ে স্থায়ীভাবে পন্ডীচেরীতে বসবাস করতে থাকেন। তাঁরাই আশ্রমের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অরবিন্দ তাঁর তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন, ''মানুষ যদি নিছক প্রাণধর্ম ও মনোধর্মকে আশ্রয় করে থাকে, তাহলে মানব-সমাজে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ দূর হবে না। চাই নীতির আদর্শ—ধর্মের আদর্শ ....সমষ্টিগত ভাবে যদি আমাদের লক্ষ্য হয় ভাগবত উপলব্ধি; তাহলে মানব জাতির বিবর্তন অসম্ভব। তখনই মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান লুপ্ত হবে, উপলব্ধি করব একই হয়েছেন 'বহু', 'বহু' রয়েছেন 'একে'।''

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮খ্রিঃ ২৯শে মে ইউরোপে ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। যাবার পথে পন্ডীচেরীতেনেমে পুরাতন বন্ধু অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের তখনকার কথোপকথন ১৩৩৫ সনের শ্রাবণ সংখ্যার প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''শ্রীঅরবিন্দ আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য করে চেয়েছেন। 'সত্য করে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাইরের আলো জ্বালাবেন। ....

অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম, সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—অরবিন্দ। রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

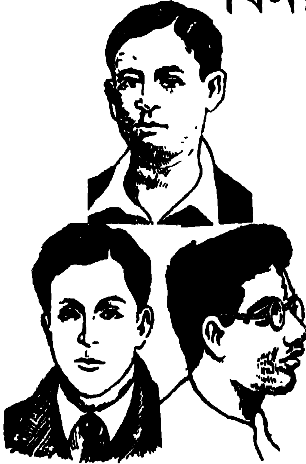
আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে অপ্রগলভ স্তব্ধতায়। আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

অরবিন্দ তাঁর বিশ্বাসের কথা জগদ্বাসীকে জানিয়েছেন, 'পৃথিবীতে অতিমানবের মহাপ্রকাশ হবে। আবার ধর্ম সংস্থাপন হবে, সবার হবে ভাগবত জীবন।'

১৯৫০ খ্রিঃ ৫ই ডিসেম্বর এই মহাপ্রাণ ঋষি নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

বিনয়-বাদল-দীনেশ



সময়টা ১৯৩০ খ্রিঃ ৮ই ডিসেম্বর।

শীতের আড়ষ্টতা কাটিয়ে জেগে উঠেছে কলকাতা নগরী। কর্মব্যস্ততার মধ্যে গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে মহানগরীর জমজমাট জীবন।

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ তিনটি যুবক পুরোপুরি সাহেবী পোশাকে সজ্জিত, এসে দাঁড়ালেন রাইটার্স বিল্ডিং-এর বড় গেটের সামনে।

কোনরকম ইতস্ততঃ না করে তিনজনই সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠে গেলেন। দেখা করতে চাইলেন কারা বিভাগের অত্যাচারী ইনসপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসন সাহেবের সঙ্গে।

অনুমতি কিংবা বাধা আসার আগেই তিনজনই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়লেন। সিম্পসন তখন নিজের টেবিলে বসে মনোযোগ দিয়ে জরুরী ফাইল দেখছিলেন। সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন। কিন্তু কিছু বুঝবার আগেই তিন যুবকের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন সিম্পসন।

সিসার তপ্ত বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া সিম্পসনের দেহ সঙ্গে সঙ্গেই নিথর হয়ে গেল।

এই তিন যুবকই হলেন বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ওরফে সুধীর গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। বিপ্লবী বাংলার তিন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এই তিন বিপ্লবীই বিনয়-বাদল-দীনেশ নামে দেশবাসীর কাছে পরিচিত।

গুলির শব্দ শুনে আলোড়ন পড়ে গেল রাইটার্সের অভ্যন্তরে। ছুটে এলেন রক্ষীর দল, পুলিশ বিভাগের অন্য অফিসাররা গুলি চালালেন তিন যুবককে লক্ষ্য করে। কিন্তু সবই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

ততক্ষণে বারান্দা পার হয়ে গুলি চালাতে চালাতে ওরা তিনজন পাসপোর্ট অফিসের সামনে চলে এসেছেন। উভয় পক্ষেই চলতে লাগল গুলি বিনিময়।

ইতিমধ্যে জরুরী বার্তা পৌঁছে গেছে পুলিশের হেডকোয়ার্টার লালবাজারে। দূরত্ব ঘটনা স্থল থেকে মাত্র মিনিট দুইয়ের পথ। ছুটে এল পুলিশবাহিনী।

ক্রমাগত গুলি চালিয়ে তিন যুবকই আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি ঘরে। পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হবার আগেই তিন জনেরই গুলি ফুরিয়ে গেল। এবারে ধরা পড়া ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু বিপ্লবীরা তো ধরা পড়ে না। তাদের যে আদর্শ হয় মারো নয় মরো। মারবার মত অস্ত্রের রসদ শেষ। এবারে যে পথ খোলা তা হল মরবার পথ।

তার জন্যও প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন বিনয়-বাদল-দীনেশ। দলনেতা বিনয়, তাঁর নির্দেশে তিনজনই পকেট থেকে বার করলেন উগ্র বিষ, অবলীলায় মুখে পুরে দিলেন। বিনয়ের মাথায় গুলি লেগে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তিনি আচ্ছন্নের মত বসে পড়লেন টেবিলের ওপরে।

দীনেশও আহত, পটাসিয়াম মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। বাদল প্রাণ হারিয়েছিলেন আগেই।

ততক্ষণে বীরদর্পে পুলিশ বাহিনী ঢুকে পড়ল ঘরে। তারা দেখল, একজন যুবকের প্রাণহীন দেহ মেঝেয় পড়ে আছে। তার পাশেই একজন সংজ্ঞাহীন। অপর যুবক টেবিলে মাথা রেখে বসে আছেন আচ্ছন্নের মতো। পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নাম বললেন বিনয় বসু।

তিন জনকেই হাসপাতালে পাঠানো হলো। বাদল হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই প্রাণ হারিয়েছিলেন। বিনয় ও দীনেশকে নিয়ে পড়লেন ডাক্তারের দল।

শেষ পর্যন্ত গুলির আঘাত ও পটাসিয়ামের আক্রমণ সত্ত্বেও বেঁচে গেলেন দীনেশ। বিনয়ও বেঁচে গেলেন, তবে মাথার আঘাতের জন্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রইলেন।

পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও এই দুই বিপ্লবীর কাছ থেকে কোন কথা বার করতে ব্যর্থ হল।

সুস্থ হয়ে উঠছেন বুঝতে পেরে চিকিৎসাধীন বিনয় মাথার ব্যান্ডেজ আলগা করে ক্ষতস্থানে আঙুলের খোঁচা দিয়ে ঘা বিষাক্ত করে তুললেন। এভাবে গ্রেপ্তার হবার পাঁচ দিনের মধ্যেই তিনি নিশ্চিত মৃত্যু সম্ভব করে তুললেন। জানতেন, সুস্থ হয়ে উঠলে পুলিশী নির্যাতনের ফলে মন্ত্রগুপ্তি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা। সব কথা জানার জন্য পুলিশ মরিয়া হয়ে উঠবে। তাই নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নিলেন।

১৯৩০খ্রিঃ ১৩ই ডিসেম্বর বিপ্লবীবীর বিনয় বসুর জীবন দীপ নির্বাপিত হল।

ইংরাজের ডাক্তার বাহিনী বহু চেষ্টায় মৃতকল্প দীনেশকে বাঁচিয়ে তুলল। সরকার বহু চেষ্টা করল, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে

পারল না। ফলে শুরু হলো তথাকথিত বিচার এবং যথারীতি দীনেশের ফাঁসির আদেশ হল।

বর্তমানে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সামনের লালদীঘি ও বাগানের নামকরণ হয়েছে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ, সংক্ষেপে বি-বা-দী বাগ।

কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংসে বীর ত্রৈয়ীর পুলিশের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়েছিল ১৯৩০ খ্রিঃ ৮ই ডিসেম্বর, ইতিহাসের পাতায় তাই অলিন্দ যুদ্ধ নামে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এই অলিন্দযুদ্ধের বীর সেনানীদের নামেই নামাঙ্কিত হয়েছে রাইটার্সের সম্মুখস্থ বাগান।

কিন্তু কারা এই বিনয়-বাদল-দীনেশ?

বিনয় বসুই ছিলেন অলিন্দ যুদ্ধের বীরত্রৈয়ীর নেতা। ১৯০৮খ্রিঃ ১১ই সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার রাইতভোর গ্রামে বিনয়ের জন্ম। তাঁর পিতার নাম রেবতীমোহন বসু।

কৈশোরেই বিনয় ঢাকার বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে আসেন।

বাংলায় গুপ্তসমিতি আন্দোলনের যুগে দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা নামে গড়ে উঠেছিল বহু দল উপদল। হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ঢাকায় গড়ে উঠেছিল মুক্তিসঙ্ঘ। সঙ্ঘের মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হত বেণু পত্রিকা।

হেমচন্দ্রের প্রভাবে বিনয় মুক্তিসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হলেন। বেণু গ্রুপের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপিত হল তাঁর।

১৯২৮খ্রিঃ গঠিত হয় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দল। সেই সময় বেণুগ্রুপের অন্যান্যদের সঙ্গে বিনয়ও বি.ভি দলকে দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করেন।

স্কুলের পড়া শেষ করে বিনয় ডাক্তারি পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকা মিডকোর্ট মেডিক্যাল স্কুলে। সেইসময়েই তিনি ২৯শে আগষ্ট ১৯৩০ খ্রিঃ দলের নির্দেশে ঢাকার কুখ্যাত পুলিশ অফিসার লোম্যানকে হত্যা করে আত্মগোপন করেন। এরপরই কারাধ্যক্ষ সিম্পসন ও স্বরাষ্ট্রসচিব মারকে হত্যা করার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়।

দলনেতার নির্দেশ অনুযায়ী তিনি দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্তকে নিয়ে ১৯৩০ খ্রিঃ ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংস-এ গিয়ে সিম্পসনকে হত্যা করেন।

অলিন্দযুদ্ধের অন্যতম সৈনিক বাদল গুপ্তও ছিলেন ঢাকার পূর্ব শিমুলিয়া অঞ্চলের ছেলে। তাঁর জন্ম ১৯১২ খ্রিঃ। পিতার নাম অবনীন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাঁর অপর নাম সুধীর গুপ্ত।

তিনিও ছিলেন গুপ্ত বিপ্লবী দল বি.ভির সদস্য। দলনেতার নির্দেশেই তিনি আই.জি.কর্নেল সিম্পসন হত্যার আয়োজনে যুক্ত হন।

বিনয় ও বাদল এই দুই জন অলিন্দযুদ্ধের সময়েই গুলি ফুরিয়ে গেলে সায়ানাইড বিষ খেয়ে ও মাথায় গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বিনয় সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ হারান। বাদল গ্রেপ্তার হবার পাঁচ দিন পরে মারা যান।

মৃতকল্প দীনেশকে বহু চেষ্টায় বাঁচিয়ে তোলা হয়। পরে বিচারে তাঁর প্রাণদন্ডাদেশ হয়।

দীনেশ গুপ্তর জন্ম ১৯১১ খ্রিঃ ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা জেলার যশোলং গ্রামে। তাঁর পিতার নাম সতীশচন্দ্র গুপ্ত।

কৈশোরেই গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়ে প্রথমে ঢাকায় ও পরে মেদিনীপুরে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন।

মেদিনীপুরের সংগঠন এমনই সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল যে সেখানে বিপ্লবীরা পর পর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করতে সমর্থ হয়।

১৯৩০খ্রিঃ ৮ই ডিসেম্বর বিনয় বসুর নেতৃত্বে দীনেশ ও বাদল কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ করে আই.জি সিম্পসনকে নিহত এবং কয়েকজন উচ্চ পদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীকে আহত করেন।

মৃত্যুদন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীদের সেলে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অবস্থানরত দীনেশ। মাত্র বিশ বছর বয়সের জীবনে তিনি যে সংগঠনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, অগ্নিযুগের ইতিহাসে তার নজির খুব কমই আছে। মৃত্যু ছিল যেন তাঁর পায়ের ভৃত্য। হাসতে হাসতে তাকে ব্যঙ্গ করেছেন পদে পদে।

মৃত্যু সম্পর্কে তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত ও উদাসীন। তাঁর কারা জীবনের দিনগুলিতে এই সত্য বেশি করে প্রকাশিত হয়েছিল।

খেতে খুব ভালবাসতেন দীনেশ। খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোন বাছবিচার ছিল না। যে কোনরকম খাদ্যবস্তু হলেই হল। নির্বিকারে তা গলাধঃকরণ করতেন।

তখনো তিনি সিম্পসন হত্যা-অভিযানে আসেননি। দলের সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত রয়েছেন গ্রামে।

সেই সময়ে বিপ্লবীদের বাধ্যতামূলকভাবে একটা কাজ করতে হত। সৈন্যব্যারাকে, নিজেকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলবার জন্য সকালে বা বিকালে মার্চ করা যেমন বাধ্যতামূলক, তেমনি বিপ্লবীদেরও প্রতিদিন মার্চ করে পাড়ি দিয়ে যেতে হত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

একদিন দলনেতা জ্যোতিষ জোয়ারদারের নেতৃত্বে সকলে মার্চ করে এগিয়ে চলেছেন বিক্রমপুর গ্রামের পথ ধরে।

একটানা হেঁটে এসে সন্ধ্যা নাগাদ গ্রামের একটা বাজারে যাত্রার বিরতি হল। এবারে হল ফেরার পালা।

সকলেরই খিদে। কিছু পেটে না দিলেই নয়। দলবেঁধে একটা মিষ্টির দোকানে গিয়ে জুটলেন।

গ্রামের বাজারের দোকান। মিষ্টি মজুদ থাকে সব সময়েই। সাজো বাসি সব খাবারই শেষ হয়ে গেল। পেট ভরেই খেলেন সবাই তৃপ্তি করে। এবারে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হবে ফিরতি পথে যাত্রা।

দীনেশ কিন্তু তখনো ছোঁক ছোঁক করছেন। আরো কিছু খেলে মন্দ হত না। কি খাওয়া যায়? আছে নাকি কিছু?

উঁকিঝুঁকি মেরে দেখলেন দোকানের কোণে এককড়াই চিনির সিরা রয়েছে। হাসি মুখে দোকানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওটাই দিন—চালান করে দিই। দোকানী তো কথা শুনে আঁতকে উঠলেন। সর্বনাশ। ওটা যে দিন কয়েকের বাসি, যেমনি টক তেমনি দুর্গন্ধ ওতে। ও জিনিস মুখে তুললে আর দেখতে হবে না— এখুনি ডাক্তার ডাকতে হবে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। দীনেশ খেতে চেয়েছেন যখন খাবেনই। দোকানী বাধা দেবার আগেই দুহাতে কড়াইটা তুলে নিলেন মুখের কাছে। এক চুমুকেই কড়াই ফাঁকা।

অসুস্থ কিন্তু হন নি দীনেশ। যেমন খেতে ভালবাসতেন তেমনি হজম করার ক্ষমতা ছিল দাপুটে।

১৯৩০ খ্রিঃ সেই স্মরণীয় ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্সে অভিযান করবার আগেই দীনেশ আর বাদল আস্তানা নিয়েছিলেন পার্ক স্ট্রীটের একটা গোপন জায়গায়। সেখান থেকেই যাবার কথা সেই দুঃসাহসিক অভিযানে।

মেটিয়াবুরুজে রাজেন গুহর বাড়ি। বিনয় সেখান থেকে এসে মিলিত হবেন এই দুজনের সঙ্গে।

অ্যাকসন স্কোয়াডের নিকুঞ্জ সেনের সঙ্গে আগের দিনই দীনেশ কড়ার করে নিয়েছেন, অভিযানে যাবার আগে পেটভরে খাওয়াতে হবে। মেনুটা ঠিক করে দেবেন দীনেশ নিজেই।

ঘন্টা দুয়েক পরেই তিন সৈনিক ঝাঁপিয়ে পড়বেন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। তার আগে তিনজনকেই কথামত ভরপেট খাইয়েছিলেন নিকুঞ্জ সেন। বেশি খেয়েছিলেন অবশ্য দীনেশ আর বাদল। লক্ষ করবার বিষয় হল সেদিনের বিপ্লবীদের মৃত্যুভয়হীন মানসিকতার কথা।

মৃত্যুবরণ করবার সংকল্প নিয়েই ঢুকতে হবে শত্রুর দুর্গে, তার আগে খাওয়া নিয়ে এমন হারজিত খেলা—অতটুকু ভয়ভাবনা নেই কারো মনে—ঈশ্বরের কী আশ্চর্য সৃষ্টি এই দেশপ্রেমীর দল।

দীনেশের খাওয়ার শেষ ঘটনা ঘটেছিল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ভেতরে।

বিচারের রায় তখন বেরিয়েছে। দীনেশ কনডেম্ড সেলে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণছেন। নিজেও তিনি জানেন সে কথা।

তাঁর মধ্যে কিন্তু ভাবান্তর নেই। চেহারাও টসকায়নি এক বিন্দু। জীবন নিয়ে যেন মজার খেলায় মেতে আছেন।

সহকর্মী সুনীল সেনগুপ্তরও দিন কাটছিল একই জেলে একনম্বর ওয়ার্ডে। দীনেশ ওয়ার্ডারের হাতে হঠাৎই সেদিন চিঠি পাঠালেন তাঁকে। ছোট্ট চিঠিতে লিখে জানিয়েছেন—না কোন আত্মীয়-বন্ধুর কথা বা মৃত্যু সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব কথাও নয়। লিখেছেন, 'একটু লুচি মাংস খাওয়াতে পারেন?'

দুদিন পরেই যাঁর ফাঁসির দিন নির্দিষ্ট তাঁর কাছ থেকে এমন চিঠি পেলে বুক তো ফেটে যাবার কথা। কিন্তু বিপ্লবীদের তো ভাবাবেগে ভেঙ্গে পড়লে চলে না। তাঁদের জীবন কঠিন কঠোর।

কিন্তু নীরবে চোখ মুছলেন সুনীল সেনগুপ্ত। জেলের ভেতরে লুচি মাংস কি করে জোগাড় করবেন তিনি? এ যে অসম্ভব এক ব্যাপার। তিনি নিজেও যে একজন বন্দী। এই জীবনে সাধ থাকলেও তা পূরণের সাধ্য তো নেই।

কিন্তু দীনেশ যে খেতে চেয়েছেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেও যে নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। ভেতরের তোলাপড়া ফুটে উঠছে মুখে চোখে।

জেলের অন্য আসামীদের মধ্যে ছিল মতি নামে একজন খুনী আসামী। বিশ বছরের কারাদন্ড ভোগ করছে সে। সুনীলের ভাবান্তর তার চোখ এড়াল না। এগিয়ে এসে জানতে চাইল, স্বদেশীবাবুকে আজ এমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন?

খুনী আসামী হলেও বন্দিজীবনের বন্ধু মতি। তার সহানুভূতির স্পর্শে নিজেকে আর ধরে রাখা সম্ভব হল না। সব কথা খুলে জানালেন।

শুনে কেমন গুম হয়ে গেল অমন ডাকসাইটে বেপরোয়া মানুষটা। খানিক্ষণ কি চিন্তা করে একসময় ধরা গলায় জানাল, জেল ক্যান্টিনের লোকজনের ওপর তার খানিকটা দাপট আছে, সে সেখান থেকে লুচির ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। তবে মাংসের কোন সুরাহা করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

মতি কথা দিল, যে করে হোক সে লুচির ব্যবস্থা করে দেবে।

কিন্তু মাংস, তার কি হবে? ভেবে কুল কিনারা করতে পারেন না সুনীল। দুপুর পার হল, বিকেল এল।

এই সময়ে বন্দিদের কিছুক্ষণের জন্য জেলের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। অবশ্য মৃত্যুদন্ডে দন্ডীত আসামীরা এই নিয়মের বাইরে। কনডেম্‌ড সেল ছেড়ে তারা বাইরে বেরতে পারে না।

মন তোলপাড়, মাথায় চিন্তার বোঝা—মাংস পাওয়া যায় কোথায়—। এই অবস্থায় একসময় সুনীল এসে দাঁড়ালেন বাইরের সেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে।

হঠাৎ চোখ পড়ে পাঁচিলের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা মুরগী। জেলেরই পোষা

এগুলো। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এসে গেল, যদি কোনক্রমে ওখান থেকে একটাকে ধরে নেওয়া যায় তাহলে কি মতিকে ধরে ক্যান্টিন থেকে রান্নার ব্যবস্থা হবে না?

মুহূর্তে মনস্থির করে ফেললেন সুনীল। একটা চাদর দিয়ে সমস্ত শরীর জড়িয়ে নিলেন। তারপর পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করলেন পাখিগুলোর দিকে। সন্তর্পণে।

দীনেশ মাংস খেতে চেয়েছেন। দুদিন পরেই তাঁর ফাঁসী। ওটুকু ব্যবস্থা যদি করতে না পারেন তাহলে সারাজীবনেও যে তিনি শান্তি পাবেন না।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াতে হল। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের ব্যানার্জীবাবু পেছন থেকে ডেকেছেন।

ভদ্রলোক কারাদন্ড ভোগ করছিলেন অন্য কি কারণে। রাজনীতির সঙ্গে সেই অপরাধের সংশ্রব ছিল না বলেই সম্ভবতঃ তাঁকে রাখা হয়েছিল ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে।

সেখানে অন্য কয়েদীদের তুলনায় সুযোগসুবিধা কিছুটা বেশি। আইন-কানুনের কড়াকড়িও এতটা নেই।

ব্যানার্জীবাবু সুনীলের অদ্ভুত বেশবাস দেখে কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন, এভাবে তিনি কোথায় চলেছেন?

সুনীল বলেই ফেললেন ব্যানার্জীবাবুকে মৃত্যুপথযাত্রী দীনেশের অন্তিম ইচ্ছার কথা! সেই ইচ্ছাপূরণের চেষ্টাতেই যে তিনি মুরগী ধরার জন্য ওৎ পেতে অগ্রসর হচ্ছিলেন নিঃসঙ্কোচে তা-ও জানালেন।

শুনে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন ব্যানার্জীবাবু। শেষে সুনীলকে আশ্বস্ত করে জানালেন, তিনি যে করে হোক ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড থেকে কিছু মাংস সুনীলের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

সে-রাতে সবার উপেক্ষিত খুনী আসামী মতির জোগাড় করে দেওয়া লুচি আর ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের ব্যানার্জীবাবুর জোগাড় করা কিছু মাংস যথাসময়ে সুনীল পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলেন দীনেশের সেলে।

দীনেশ মাংস-লুচি খেতে চেয়েছিলেন জীবনে শেষবারের মত। কিন্তু জেলের ভেতরে বন্দি জীবনে থেকে এটুকুর বাইরে আর কি করার ছিল সুনীলের। কিংবা মতি বা ব্যানার্জীবাবুর।

এগিয়ে এল ১৯৩১ খ্রিঃ ৬ই জুলাই। সেদিন ভোররাতে হাসতে হাসতে ফাঁসীর দড়ি গলায় তুলে নিলেন দীনেশ। বাংলামায়ের দামাল দুলালদের আর একজন প্রেরণার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন পৃথিবীর মাটি থেকে।

এই সম্পর্কে ৮ই জুলাই তারিখে কাগজে যে বিবরণ ছাপা হয়েছিল তা হলঃ

"বিশ বছরের বালক দীনেশ ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দিল। বালক যেমন নূতন খেলনা ব্যগ্র হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে লালায়িত হয়, অসীম রহস্যময় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইতে তাঁহার তেমনি সাধ হইয়াছিল।

মাতা-পিতা, স্নেহশীলা ভ্রাতৃজায়া সকলকে সে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে, মৃত্যু ভয়ঙ্কর নহে, সে মরণমালা। মরণমালা গলায় পরিয়া মরণজয়ী জীবনের জয়োল্লাসে চলিয়া গেল।

দীনেশ বাঁচিল না। তাঁহাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করা গেল না। খেদক্ষিন্ন নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস একটা জাতির পঞ্জর-পিঞ্জর কাঁপাইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। কম্পিত অধরোষ্ঠে কি কথা মৌন রহিয়া গেল, বোঝা গেল না। কেহ কি বুঝিবে?''

ফাঁসির অপেক্ষায় কারান্তরালে থেকে দীনেশ কয়েকটি চিঠি লেখেন তাঁর নিকট আত্মীয়দের কাছে। বিপ্লব সাধনায় ত্যাগব্রতীদের হৃদয়ের অপরিমেয় উদারতা এই পত্রগুলিতে পরিস্ফুট হয়েছে। সাহিত্যের বিচারেও এই পত্রগুলি খুবই মূল্যবান।

অলিন্দযুদ্ধের এই বীরত্রয়ীর নামেই কলকাতা শহরের লালদিঘি উৎসর্গ করা হয়েছে।

প্রফুল্ল চাকী



বীর বিনায়ক রাও দামোদর সাভারকর মহারাষ্ট্রে গুপ্ত সমিতি আন্দোলন সংগঠন করেন প্রথম। কিন্তু বাংলাও কিছু পিছিয়ে থাকেনি এ ব্যাপারে। দেখতে দেখতে হু হু করে গুপ্তসমিতি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শহরে গ্রামে।

যুগান্তর দলের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতার মানিকতলাতে। বারীন ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো), উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি এই দলের খুবই সক্রিয় কর্মী। দলের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য তাঁরা চারদিক থেকে বাছাই করে করে কর্মী সংগ্রহ করছেন।

অল্পসময়ের মধ্যেই বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক দেশপ্রাণ স্বাধীনতাকামী বীর যুবক গুপ্ত সমিতিতে প্রবেশ করলেন।

দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য একটি সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশিত হল। পত্রিকার নাম যুগান্তর। মুখপত্রের নাম যুগান্তর হওয়ার জন্য এই দলটি যুগান্তর দল নামেই পরিচিতি লাভ করেছিল।

বাংলায় প্রথম গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০২ খ্রিঃ। তার নাম হয়েছিল অনুশীলন সমিতি। ব্যারিষ্টার পি.মিত্র ছিলেন অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনবাদের জীবন-দর্শনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই নৈহাটীর বাসিন্দা পি.মিত্র গুপ্ত সমিতির নামকরণ করেছিলেন অনুশীলন সমিতি।

এই গুপ্ত সমিতিগুলিতে কুস্তি, লাঠিখেলা, কসরৎ, অসিখেলা, পিস্তল ছোঁড়া ইত্যাদি গোপনে শিক্ষা দেওয়া হত। ঘোড়া চড়া শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও কোন কোন দলে থাকত।

এসব দলের খরচ-পত্র চালাবার জন্য সমদরদীদের কাছ থেকে কিছু কিছু চাঁদা আদায় করা হত।

বারীন ঘোষ রংপুর থেকে প্রফুল্ল চাকীকে কলকাতার সমিতিতে এনে বিশেষ উদ্দেশ্যে তালিম দিতে শুরু করলেন।

প্রফুল্ল অবশ্য তার আগেই নিজেকে যথেষ্ট এগিয়ে রেখেছিলেন বিপ্লব আন্দোলনের কাজে।

১৮৮৮ খ্রিঃ রংপুরে জন্ম গ্রহণ করেন প্রফুল্ল চাকী। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ চাকী। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বগুড়ার বিহারগ্রামে।

রংপুরে স্কুলে পড়ার সময়েই বাড়িতে কুস্তির আখড়া তৈরি করেছিলেন প্রফুল্ল। সমবয়সীদের সঙ্গে কুস্তি ও নানাবিধ কসরৎ চর্চা করে তিনি শরীর গঠনে মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন।

আসলে সেই সময়টা ছিল পরাধীন জাতির জাগরণের যুগ। দেশের জনগণের স্বাধীন সত্তা ইংরাজের শাসন শোষণ ভেদ করে বেরিয়ে আসার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে।

শহর ও গ্রামের পরিবেশেও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিল। ফলে সেই পরিবেশে দেশ থেকে ইংরাজ বিতাড়নের একটা উন্মাদনা বালক বা কিশোরদের মনেও আপনা আপনি সঞ্চারিত হয়ে পড়ত।

স্বাধীনতাকামী কিশোর প্রফুল্ল স্কুলের পাঠ শেষ হবার আগেই ১৯০৩ খ্রিঃ বান্ধব সমিতিতে যোগদান করে সমাজ সেবার কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন। ক্রমে তিনি বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্মী হন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রফুল্ল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লাঠিখেলা ও মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষার দায়িত্ব নেন। তাঁর উপযুক্ত শিক্ষায় ছাত্ররা নিয়মনিষ্ঠ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে সৈনিকের মত গড়ে ওঠে।

১৯০৬ খ্রিঃ শেষ দিকে বিপ্লবী বারীন ঘোষের সঙ্গে প্রফুল্লর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর সাহসিকতা, উদ্যম ও স্বদেশচেতনার পরিচয় পেয়ে তিনি তাঁকে কলকাতায় যুগান্তর দলের কার্যালয়ে নিয়ে আসেন।

সেই সময়ে অত্যাচারী রামফিল্ড ফুলার ছিলেন পূর্ববঙ্গের ছোটলাট। কিছুদিনের মধ্যেই প্রফুল্লকে ফুলার হত্যার কাজে নিয়োজিত করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফুলার রক্ষা পেয়ে যান।

তারপর থেকে প্রফুল্ল মানিকতলার বোমার আড্ডায় এসে বাস করতে থাকেন।

১৯০৮খ্রিঃ কলকাতায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া, বিশেষ করে বিপ্লবী বালক সুশীল সেনকে বেত্রদন্ড দেওয়া ইত্যাদি কুকর্মের জন্যই বিপ্লবীরা কুখ্যাত কিংসফোর্ডকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কিংসফোর্ডকে নিরাপদ করার জন্য ইংরাজ সরকার তাকে মজঃফরপুরে বদলি করে কলকাতা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

দলনেতার নির্দেশে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল উপযুক্ত প্রস্তুতি সহ মজঃফরপুরে আসেন। তাঁরা প্রথমে একটা ধর্মশালায় উঠে কয়েকদিন কাটান কিংসফোর্ডের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে।

ইউরোপীয় ক্লাবের অদূরেই কিংসফোর্ডের আবাস। এখানে তাস খেলতে আসা ছাড়া তিনি আবাস ছেড়ে বাইরে কোথাও যান না। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ক্লাবের কাছেই আত্মগোপন করে রইলেন।

১৯০৮খ্রিঃ ৩০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ দেখা গেল কিংসফোর্ডের ফিটন গাড়িটি গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

সহসা মজঃফরপুর শহর কাঁপিয়ে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ হল। একরাশ ধোঁয়ার কুন্ডলীর মধ্যে বিধ্বস্ত ফিটন উল্টে পড়ল।

সেদিন কিংসফোর্ডকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই বোমা নিক্ষেপ হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন কিংসফোর্ড। গাড়িতে তিনি ছিলেন না। ছিলেন মিসেস ও মিস কেনেডি।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ভুল করে তাদেরই বোমা মেরে নিহত করেছিলেন। বোমা নিক্ষেপ করেই দুজন ছুটে চললেন রেল লাইন ধরে।

কেউ কারো পরিচয় জানতেন না। বিপ্লবী দলের মন্ত্রগুপ্তি অনুসরণ করে ক্ষুদিরাম জানতেন তাঁর সঙ্গীর নাম দীনেশ রায়।

প্রফুল্ল জানতেন তাঁর সঙ্গীটি হরেন সরকার ছাড়া কেউ নন।

ক্ষুদিরাম চলে গিয়েছিলেন ওয়াইনী স্টেশনের দিকে। আর প্রফুল্ল দৌড়েছিলেন চল্লিশ মাইল দূরবর্তী সমস্তিপুরের দিকে।

রাতটা দুজনেরই দুই পথে টানা হাঁটার ওপরে কেটেছে। পরদিন সকালে ওয়াইনী স্টেশনে পৌছে ক্ষুদিরাম ধরা পড়েছিলেন দুই কনস্টেবল ফতে সিং আর শিবপ্রসাদ মিশ্রর হাতে।

প্রফুল্ল নিরাপদেই পৌছেছিলেন সমস্তিপুর স্টেশনের কাছে। রেল কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চললেন স্টেশনের দিকে।

এমনি সময়ে বাধা দিলেন একজন সুপুরুষ বাঙ্গালী যুবক। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই প্রফুল্লকে বারণ করলেন স্টেশনের দিকে যেতে। বললেন, সময় হলে আমিই আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব। এখন আমার সঙ্গে আসুন।

অচেনা যুবকের আগ্রহ লক্ষ করে পকেটে রাখা পিস্তলে হাত ছোঁয়ালেন প্রফুল্ল। কিন্তু যুবকের সহজ সরল আন্তরিকতাকে তিনি অবিশ্বাস করতে পারলেন না।

অচেনা যুবকটি মুখে কোন কৌতূহল প্রকাশ না করলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে প্রফুল্লর আসল পরিচয় অনুমান করতে তাঁর দেরি হয়নি। তাই দেশের মুক্তিকামী প্রফুল্লকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন একজন বাঙালী হিসেবে কর্তব্যজ্ঞানে।

ভদ্রলোক একপ্রস্থ নতুন কাপড় ও জুতো কিনে এনে দিলেন প্রফুল্লকে। একে বিধ্বস্ত রাতজাগা ক্লান্ত অবসন্ন চেহারা, তার ওপর নগ্ন পদ। দুমড়ানো কুঁচকানো ধূলিকাদার ছোপ লাগা জামাকাপড়। প্রথম দর্শনেই পুলিশের সন্দেহ হবার মত চেহারা। তাই সাবধানতা হিসেবেই যে পোশাকপরিচ্ছদ পাল্টে ফেলা দরকার একথা তিনি বুঝিয়ে দিলেন প্রফুল্লকে।

নিজের আস্তানাতেই দিনটা রেখে দিলেন তিনি প্রফুল্লকে। সন্ধ্যার পরে সব দিক সতর্কভাবে দেখে নিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিলেন স্টেশনে। একান্ত আপন জনের মত তাঁর শুভ কামনা করলেন।

দেশপ্রেমিককে যে ভালবাসে সাহায্য করে সে যে নিজেও একজন দেশপ্রেমিক স্বাধীনতার পূজারী তাতে আর সন্দেহ কি। পরে এই দেশপ্রেমিক যুবকের পরিচয় জানা গিয়েছিল। তাঁর নাম ত্রিগুণাচরণ ঘোষ।

প্ল্যাটফর্মে তখন কলকাতার ট্রেনের জন্য অপেক্ষারত যাত্রীদের ভিড় জমে উঠেছে। প্রফুল্ল মোকামাঘাটের একটি টিকিট কিনে প্ল্যাটফর্মের এক কোণে গিয়ে বসে পড়লেন।

সেদিন প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন সিংভূমের কুখ্যাত পুলিশ সাব ইনসপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জী। ছুটি উপভোগ করে তিনি কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছিলেন।

প্রফুল্লর পায়ে নতুন জুতো দেখেই কেমন সন্দেহ হল নন্দলালের। এগিয়ে এসে অযাচিতভাবে প্রফুল্লর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন। কথায় কথায় তিনি বিপ্লবীদের সম্পর্কে গভীর সহানুভূতির কথাও ব্যক্ত করলেন।

এই গায়েপড়া ভাব প্রফুল্লর ভাল লাগল না। তিনি দ্বিধায় ও কুণ্ঠায় জড়সড়।

নন্দলাল ধীরে ধীরে কিন্তু সুকৌশলে অগ্রসর হয়। কথায় কথায় ব্যক্ত করল, ভোররাতে শহরের ব্যারিস্টার কেনেডি সাহেবের গাড়িতে বোমা ছুঁড়েছে কে বা কারা, ফলে মিসেস ও মিস কেনেডি মারা গেছেন।

খবরটা কানে যেতেই চমকে ওঠেন প্রফুল্ল। কিংসফোর্ড মারা যায়নি! পরিবর্তে তাঁরা হত্যা করেছেন দুটি অসহায় নিরপরাধ নারী!

প্রফুল্লর ভাবান্তর নন্দলালের চোখ এড়ায় না। তার সন্দেহ ঘনীভূত হয়। সে জানে একজন আততায়ী ওয়াইনীতে ধরা পড়েছে, অন্যজন পলাতক। এই সে নয় তো! নন্দলালের লোভী মন সজাগ হয়ে ওঠে। পলাতক আসামীকে ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে নিশ্চয় মোটা ইনাম পাওয়া যাবে।

নন্দলালের হাবভাব দেখে ও কথা শুনে বিরক্ত বোধ করেন প্রফুল্ল। তিনি বাধ্য হন কামরা পরিবর্তন করতে।

কিন্তু শিকারের সন্ধান পেয়েছে নন্দলাল তাকে কি সহজে ছাড়ে। মোকামা ঘাটে প্রফুল্লকে ঠিক খুঁজে বার করে নেয়।

ইতিমধ্যে এই অল্প সময়ের মধ্যেই প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করার অনুমতি আনিয়ে নিয়েছে। প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করতে গেলে সমস্ত ঘৃণা এবং ধিক্কারে দাঁতে ঠোঁটে কামড়ে তিনি শুধু বললেন, 'ছিঃ! এই আপনার কাজ। বাঙালী হয়ে একজন বাঙালীকে আপনি এভাবে ধরিয়ে দিচ্ছেন!'

বলেই পালাতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু দৌড়ে যেতে যেতে প্ল্যাটফর্মের শেষে পাহারাওয়ালার হাতে তিনি ধরা পড়লেন। সতেজে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রিভলভার বার করে নিজের কপালে লক্ষ স্থির করলেন। তারপরই গুলির শব্দের সঙ্গে তাঁর প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল প্ল্যাটফরমের ওপর।

প্রফুল্ল নিজের প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন বিপ্লবী মরতে কখনো ভয় পায় না। যে স্বাধীনতার পূজারী তাকে পরাধীন করে কার সাধ্য।

মৃত্যুর পরে প্রফুল্লর গুলিবিদ্ধ দেহটাকে মজঃফরপুর পাঠিয়ে দেওয়া হল। ক্ষুদিরামকে দিয়ে সনাক্ত করাবার জন্য। ক্ষুদিরাম দেখেই চিনতে পারলেন এবং সেকথা জানিয়ে পুলিশকে জবানবন্দী দিলেন।

এরপর প্রফুল্লর দেহ থেকে মুন্ডটা কেটে নিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সেই সময়ের সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রফুল্ল সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল (১৯০৮, ১৪ই মেঃ) তা হল ঃ

'ক্ষুদিরাম যে যুবকের মৃতদেহ দেখিয়া পুলিশের নিকট তাহাকে দীনেশচন্দ্র রায় নামে পরিচিত করিয়া দিল, তাহার প্রকৃত নাম প্রফুল্ল চাকী।

মজঃফরপুর হইতে প্রফুল্ল হাঁটিয়া সমস্তিপুর আসিয়া পৌছে ও সেখান হইতে একখানা নতুন কাপড় ও একজোড়া নতুন জুতা কিনিয়া বেশ পরিবর্তন করে। সমস্তিপুর হইতে হাওড়ার টিকেট লইয়া রাত্রির গাড়িতে মোকামাঘাটের দিকে রওনা হয়।

সমস্তিপুরে প্রফুল্লর নতুন কাপড়, জুতা, ফুলো পা দেখিয়া একজন পুলিশ সাব ইনসপেক্টরের মনে সন্দেহ জন্মিল। তাহার নাম নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মজঃ ফরপুরের গভর্নমেন্ট উকিলের নাতি।

নন্দলাল রাঁচিতে কার্যস্থলে যাইতেছিল। প্রফুল্লর প্রতি সন্দেহ হওয়াতে নন্দলাল গাড়িতে তাহার সঙ্গে এক কামরায় উঠিয়া বসিল এবং পুলিশের মতঠিক চতুরতার সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলিতে বলিতে দেশের বর্তমান অবস্থা ও রাজনৈতিক সংবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে এরূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিল যাহাতে প্রফুল্ল নন্দলালকে তাহারই মতাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করিল।

ইতিমধ্যে নন্দলাল মজঃফরপুরে গভর্নমেন্ট উকিলকে তারযোগে জিজ্ঞসা করিল যে সন্দেহের উপর প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে কিনা। ম্যাজিস্ট্রেটের মত লইয়া মজঃফরপুর হইতে গ্রেপ্তার হুকুম দেওয়া হইল। নন্দলাল তখন স্বমূর্তি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইল।

ফেরি স্টিমারে নন্দলাল ও প্রফুল্ল ঘাটে পৌছিল। প্রফুল্ল তরুণ বয়স্ক বালক। সে তখনও নন্দলালকে চিনিতে পারে নাই।

নন্দলাল স্বদেশের জন্য তাহারই মত বেদনা বোধ করে এবং তাহারই মতাবলম্বী দেখিয়া প্রফুল্ল তাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

স্টিমার হইতে ট্রেনে উঠিবার সময় প্রফুল্ল নন্দলালের জিনিসপত্র নিজের কাঁধে করিয়া বহিয়া লইল—নন্দলালকে কুলি নিযুক্ত করিতে দিল না। এদিকে নন্দলাল বরাবর স্টেশন মাস্টারের কাছে যাইয়া তাহাকে সকল কথা জানাইল; এবং প্রফুল্ল প্ল্যাটফর্মে আসিবামাত্র একজন কনস্টেবলকে হুকুম দিল—গ্রেপ্তার কর। প্রফুল্ল স্তম্ভিত হইল।

তাহার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। সে চিৎকার করিয়া বলিল, 'তুমি বাঙালী হইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছ?'

কনেস্টবল পশ্চাৎদিক হইতে প্রফুল্লকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। প্রফুল্ল সবলে কনস্টেবলকে ভূপাতিত করিল। পর মুহূর্তেই পিস্তল বাহির করিয়া প্ল্যাটফর্মের অপর দিকে কয়েক পা হাঁটিয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ অপর দিক হইতে আর একজন কনস্টেবল আসিয়া পড়িল। প্রফুল্ল এই কনস্টেবলের দিকে গুলি চালাইল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

এদিকে পতিত কনস্টেবল আবার অগ্রসর হইল। প্রফুল্ল দেখিল আর পালাইবার উপায় নাই। তখন দৃঢ়পদে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পিস্তল নিজের দিকে বাঁকাইয়া ধরিল।

পিস্তলের দুইবার আওয়াজ হইল—প্রথম গুলি বক্ষ ও দ্বিতীয় গুলি চিবুকের নিম্নদেশ বিদ্ধ করিল। তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে প্রফুল্লর মৃতদেহ ভূপাতিত হইল।

প্রফুল্লের মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য মজঃফরপুরে আনা হইল। বন্ধুর মৃতদেহ দেখিয়া ক্ষুদিরাম শোকাচ্ছন্ন হইল। সে বলিল ইহা তাহার বন্ধু দীনেশচন্দ্র রায়ের মৃতদেহ।

ইহার পর পুলিশের কর্তাদের হুকুমে প্রফুল্লের মৃতদেহ হইতে গলা কাটিয়া ফেলা হইল এবং একটা কেরোসিনের টিনে স্পিরিটে ডুবাইয়া প্রফুল্লর ছিন্নমস্তক কলিকাতায় আনা হইল। ভাল করিয়া সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই নাকি এরূপ করা হইয়াছে।"

৯ই জুন মঙ্গলবার মজঃফরপুর এডিশনাল সেসন জজ মিঃ কর্নভয়-এর আদালতে শুরু হল আসল বিচার। সঙ্গে রইলেন দুই এসেসর বাবু নাথনিপ্রসাদ ও জনকপ্রসাদ।

সরকার পক্ষের উকিল বাঁকিপুরের বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ মানুক এবং সহকারী উকিল বিনোদবিহারী মজুমদার। ক্ষুদিরামের পক্ষে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন মজঃফরপুরের একজন দেশপ্রেমিক আইনজীবী—কালিদাস বসু। আর রংপুর থেকে এলেন সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং নৃপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

এই মামলায় প্রধান সাক্ষীদের অন্যতম ছিল সেই সাব ইনসপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জী। তিনি সাক্ষী দিতে এসে বলেন,

"সিংভূম থেকে ছুটি নিয়ে গত ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত আমি মজঃফরপুরে ছিলাম। ১লা মে বাঙ্গালীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই ঘটনার কথা জানতে পারি (কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টা)।

ওই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় আমি মজঃফরপুর থেকে সিংভূমের দিকে রওনা হই। রাত্রে সমস্তিপুর স্টেশনের প্লাটফরমে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা হয়। তার পরনে নতুন ধুতি ও পায়ে নতুন পাম্পসু ছিল। মাথায় কিছু ছিল না।

সে আমাকে প্রশ্ন করে যে, মোকামা ঘাটের গাড়ি কখন ছাড়বে। আমি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকি। তার সঙ্গে মোকামা ঘাটের টিকিট ছিল। আমরা একই কামরায় উঠেছিলাম।

তার কথাবার্তা ও হাবভাব দেখে আমার সন্দেহ হয়। সমস্তিপুর থেকে গাড়ি ছাড়ার আগেই আমি আমার মতামত মজঃফরপুরের সিনিয়র গভর্নমেন্ট প্লীডার শিবচন্দ্র ব্যানার্জীকে এক টেলিগ্রাম করে জানাই যে, তিনি যেন পুলিস সাহেবের সঙ্গে দেখা করে একজন সন্দেহজনক লোককে গ্রেপ্তার করার জন্য একটি অনুমতিপত্র পাঠিয়ে দেন।

পরদিন ২রা মে সকাল সাড়ে দশটায় মোকামা ঘাট স্টেশনে সেই টেলিগ্রামের জবাব পাই। লোকটি মোকামা ঘাট পর্যন্ত আমার সঙ্গেই ছিল। আমার কথাবার্তায় বিরক্ত হয়ে পরে অন্য কামরায় চলে গিয়েছিল।

সকালবেলা মোকামা ঘাটে আমি তাকে আমার জিনিসপত্রের দিকে লক্ষ রাখতে অনুরোধ করি। তার আগে আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম।

গ্রেপ্তারের সময় দুজন সাক্ষীকে উপস্থিত রাখার জন্য আমি স্টেশন মাষ্টারের অফিসে যাই, কারণ তখন আমি দৃঢ় সঙ্কল্প যে লোকটিকে আমি গ্রেপ্তার করব।

দুজন লোক দেবার জন্য আমি স্টেশন মাষ্টারকে অনুরোধ করি। সঙ্গে সঙ্গেই তারা এলেন। ফিরে আসার সময় সাব ইনসপেক্টর শর্মার সঙ্গে আমার দেখা হয়।

মজঃফরপুর থেকে প্রাপ্ত পুলিস সুপারের তারের কথা শুনে আমি তখন সেই লোকটিকে বলি যে, তোমাকে আমি সন্দেহ করি। একথা বলে গ্রেপ্তার করার উদ্যোগ করতেই লোকটি ছুটে দৌড় দিল। সঙ্গে সঙ্গেই আমি চিৎকার করে উঠি।

বিপরীত দিক থেকে একজন রেলওয়ে কনস্টেবল এগিয়ে এল। ঠিক তখনই আমি একটি গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। কনস্টেবলটিকে লক্ষ করেই সেই বাঙ্গালী গুলি চালিয়েছিল।

এবার সাব ইনসপেক্টর শর্মার সঙ্গী পুলিসটি এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। মুহূর্ত বাদেই আমি পরপর দুবার গুলির শব্দ শুনতে পাই এবং লোকটির প্রাণহীন দেহ মাটিতে পড়ে যেতে দেখতে পাই।

সেই রাত্রেই মৃতদেহ নিয়ে আমি মজঃফরপুর ফিরে যাই। মহকুমা হাকিম মিঃ বার্ট এবং পাটনার পুলিস সাহেবও সঙ্গে গিয়েছিলেন। বারুনী স্টেশনে মৃতদেহের ছবি তোলা এবং সনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।"

প্রফুল্ল চাকীর সহযোগী এবং মজঃফরপুর কিংসফোর্ড হত্যাচেষ্টার মামলার অপব অভিযুক্ত ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ উৎসর্গ করলেন ১৯০৮ খ্রিঃ ১৮ই আগস্ট।

বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জীবন-কাহিনী অসমাপ্ত থেকে যাবে বিশ্বাসঘাতক পুলিস ইনসপেক্টর নন্দলালের জীবনের শেষ অধ্যায়টুকুর বিবরণ না দিলে।

নির্ভীক বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীকে যেই নরাধমের জন্য মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, বাংলার বিপ্লবীরা তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে বিলম্ব করেননি।

বাঙ্গালী বিপ্লবীকে ধরার প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের কাছ থেকে হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করল। চাকরিতেও পদোন্নতি হয়েছে। সুতরাং এই নগদ ইনাম পেয়ে তার মন খুশিতে ভরপুর।

একদিন, রাত তখন প্রায় আটটা। হাতে একতাড়া চিঠি নিয়ে নন্দলাল চলেছে কলকাতার সার্পেন্টাইন লেন ধরে।

এমন সময় পেছন থেকে ডাক শোনা যায়, দাঁড়াও। নন্দলাল পেছনে ফিরে তাকায়।

—আমরা ডেকেছি। দুই তরুণ পাশে এসে দাঁড়ায়।

নন্দলাল অপরিচিত তরুণদের দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি চাই তোমাদের?

—তোমাকে পুরস্কার দিতে চাই।

কথার সঙ্গে সঙ্গে—দ্রাম। দ্রাম। দ্রাম। পরপর তিনটি গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে রাতের পল্লীর নিস্তব্ধতা।

নন্দলালের মৃতদেহ পড়ে রইল গলির পথের ওপরে।

সেদিন নন্দলালের জন্য এই অভিনব পুরস্কারের ব্যবস্থা যিনি করেছিলেন তিনি হলেন সেই সময়ের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী নেতা স্বয়ং শ্রীশ পাল। তাঁর সঙ্গের বিপ্লবীর নাম ছিল রণেন গাঙ্গুলী।

বিপ্লবী শ্রীশ পাল কেবল নন্দলালকেই নয়, এমনি আরো বিশ্বাসঘাতককেই শায়েস্তা করেছিলেন। অগ্নিযুগের এক উল্লেখযোগ্য যোদ্ধা ছিলেন তিনি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু



ওড়িশার কটকশহরে ১৮৯৭ খ্রিঃ ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম। তাঁর বাল্যজীবনও কেটেছিল এই শহরেই। তাঁর পিতার নাম জানকীনাথ বসু, মাতার নাম প্রভাবতী দেবী। এঁদের আদি বাড়ি ছিল চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর পিতামাতার ষষ্ঠ সন্তান।

জানকীনাথ নিজে ছিলেন গরীবের ছেলে। কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করে ওড়িশার কটক শহরে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী ও উদ্যোগীপুরুষ।

কিন্তু উকিল হিসাবে আইনের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রতিভা ও কর্মশক্তিকে আবদ্ধ করে না রেখে জনসাধারণের কল্যাণকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও নিজেকে জড়িত করেন। বিভিন্ন জনহিতকর কর্মের জন্য তিনি সমগ্র ওড়িশায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন।

বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের জন্য জানকীনাথ ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে রায়বাহাদুর খেতাবে সম্মানিত হয়েছিলেন।

জানকীনাথ ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী প্রকৃতির মানুষ। সরকারী উকিল হলেও তিনি সরকারের অন্যায় অবিচারের সমালোচনা করতে দ্বিধা করতেন না।

দেশে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদে জানকীনাথ সরকারের দেওয়া রায় বাহাদুর খেতাব বর্জন করে লাঞ্ছিত দেশভক্তদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

সুভাষচন্দ্রের জননী প্রভাবতীও ছিলেন স্বামীর মতই আত্মসচেতন মহিলা। সকল ব্যাপারেই তাঁর আত্মমর্যাদাজ্ঞান ও তেজস্বিতা সকলের মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করত। প্রতিবেশী ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর মানুষের দুঃখ দুর্দিনে হৃদয়ভরা সহানুভূতি ও দরদ এই দম্পতির মধ্যে প্রকাশ পেত।

সুভাষচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল কটক শহরের প্রোটেস্ট্যান্ট স্কুলে—সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে। কিন্তু বালক বয়স থেকেই সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ইচ্ছা ও রুচি মেনে চলতে অভ্যস্থ হয়েছিলেন। তাঁর বিদ্রোহী প্রকৃতির অংকুর শৈশব জীবনেই ফুটে উঠেছিল। সাহেবী স্কুলের পরিবেশ ভাল না লাগায় তিনি সেখান থেকে নাম কাটিয়ে ভর্তি হলেন র‍্যাভেনস কলেজিয়েট স্কুলে।

বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী বেনীমাধব দাস ছিলেন র‍্যাভেনস স্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষক। তাঁর অমায়িক আচরণ, শিক্ষার ধারা, সর্বোপরি বাঙালীসুলভ পরিচ্ছদ সুভাষের মনের ওপর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

নেতৃত্বের স্বাভাবিক প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন সুভাষচন্দ্র। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ক্লাশের ছেলেদের নিয়ে একটা দল গড়ে তুললেন। তাঁর ক্লাশের ছেলেরা ছাড়াও অন্যান্য ক্লাশের ছেলেরাও তাঁর দলে যোগ দিল। বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের পরিচালনা করার ক্ষমতা সেই বয়সেই তিনি তাঁর দল গঠনের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র কেবল তাঁর ক্লাসেই নয়, সারা স্কুলের মধ্যেই ছিলেন সেরা ছেলে। বন্ধু প্রীতি ছিল গভীর। একবার যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসতেন, তাঁর সহৃদয়তায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হয়ে পাড়তেন না।

জীবনে তিনি অনেক বন্ধু লাভ করেছিলেন। ক্লাশে ছাত্ররা বরাবরই তাঁর অনুগামী থাকতো। ছাত্র-শিক্ষক সকলের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় আত্মীয়তার রূপ লাভ করেছিল।

কটক কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেনীমাধব মহাশয়ের আদর্শ, প্রকৃতি ও শিক্ষকোচিত গুণাবলী সুভাষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। স্কুলের ছাত্রজীবনেই তাঁর সংস্পর্শে সুভাষের আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ ঘটে।

বিবেকানন্দের তেজস্বীতা, গভীর স্বদেশপ্রাণতা, ভারতকে জগৎসভায় উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, আত্মজ্ঞান, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও নির্ভরতা, জীবনে কুমার-ব্রতের সৃজনীশক্তি—ছাত্রজীবনেই সুভাষচন্দ্রের মানসিক গঠন তৈরি করেছিল।

বাঙ্গালীর ঐক্যবন্ধনকে দুর্বল করার হীন উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার অজুহাতে ১৯০৫ খ্রিঃ বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করার উদ্যোগ নেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাঙ্গালী জাতি জাতীয়তার তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। ব্রিটিশের সঙ্গে অসহযোগ ঘোষণা করে বাংলায় হল রাখীবন্ধন উৎসব।

১৯০৫ খ্রিঃ ৭ই আগস্ট কলকাতায় এক বিরাট জনসভায় গৃহীত হল বিলাতী বর্জন প্রস্তাব। দলে দলে বাঙ্গালী নেমে পড়ল রাজনীতির সমরক্ষেত্রে।

এই আন্দোলনকে অবজ্ঞা করে, দাম্ভিক শাসক কার্জন ১৯০৫ খ্রিঃ ১৬ই আগস্ট বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করল।

১৯০৫ খ্রিঃ বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বললেন, "বঙ্গভঙ্গের ফলে যে বিরাট আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে, বাংলায় জাতীয় উন্নতির ইতিহাসে তা স্মরণীয়। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের পর এদেশে এই প্রথম জাতিধর্মনির্বিশেষে জনগণ অনুপ্রাণিত হয়েছে একই উদ্দেশ্যে। .... সমগ্র দেশ আজ বাংলার নেতাদের পশ্চাতে দন্ডায়মান..........।"

ভারতের জাতীয় আন্দোলন এইভাবে বাংলার মাটিতে লালিত হয়ে বাঙ্গালীর চেষ্টায় ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতে।

পিতার মুখে সরকারী দমননীতির প্রতিবাদ শুনে কিশোর সুভাষের মনেও ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে বিরাগের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর ছাত্রজীবনের এই বিরাগ ক্রমশঃ বিদ্বেষে পরিণত হয়ে ওঠে।

এই সময় একদিন সুভাষ জানতে পারলেন, স্বদেশী আন্দোলনের সহায়ক বিবেচনা করে ইংরাজ সরকার সরকারী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সুভাষ স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের সংগঠিত করে সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। সরকারী হাইস্কুলের শিক্ষক বেণীমাধব দাস, তাঁকে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে বদলী হতে হল। সুভাষ তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

পরের বছরেই ১৯১৩খ্রিঃ র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকেই সুভাষচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করলেন।

এরপর কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। আই.এ.পড়তে পড়তেই সুভাষ কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে সদগুরুলাভের উদ্দেশ্যে হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন, ব্যর্থ হয়ে কিছুদিন পরে ফিরেও এলেন।

১৯১৫খ্রিঃ আই.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে দর্শনে অনার্স নিয়ে সুভাষ প্রেসিডেন্সিতেই বি.এ পড়তে লাগলেন।

এখানেই তিনি উদ্ধত বিদেশী অধ্যাপক ই.এফ.ওটেনকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

পরে স্যার আশুতোষের সৌজন্যে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে দর্শন বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ছাত্রাবস্থায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

এই সময় তিনি এমন কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন যা উত্তরকালে তাঁর জীবনে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল।

বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সুভাষকে আই.সি.এস পরীক্ষার জন্য বিলেত পাঠানো হলো।

বিলাতে তখন ভারতীয়দের ইন্ডিয়ান মজলিস নামে একটি সমিতি ছিল। এই সমিতিতে সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা শুনে সুভাষ মুগ্ধ হয়েছিলেন। সুভাষ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবলে ভারতীয় ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেত সমর্থ হয়েছিলেন।

আই.সি.এস পরীক্ষায় সুভাষ চতুর্থ স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

এরপর তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ বি.এ ডিগ্রিলাভ করে দেশে ফিরে আসেন।

দেশসেবার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা সুভাষকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে তিনি সরকারী উচ্চপদের চাকরির প্রলোভন ত্যাগ করে দেশে ফিরেই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সুভাষকে পরামর্শ দেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে।

দেশবন্ধু তখন বাংলা তথা ভারতবর্ষের সকলের প্রিয় নেতা। তাঁর অসামান্য ত্যাগ, বাগ্মীতা ও রাজনৈতিক প্রতিভা সম্পর্কে সুভাষও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি দেশবন্ধুর কাছে দেশসেবার ব্রতে দীক্ষা নিলেন।

দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশবন্ধু তখন ন্যাশনাল কলেজ গড়ে তুলেছেন। তিনি সুভাষকে সেই কলেজের অধ্যক্ষপদের দায়িত্ব দিলেন। সেই সঙ্গে তাঁকে দেওয়া হল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচার বিভাগের দায়িত্ব।

এই সময়ে দেশ জুড়ে স্বেচ্ছাসেবক গঠনের আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। সুভাষের নেতৃত্বে অল্প সময়ের মধ্যেই সুনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে উঠল।

কিছুদিনের মধ্যেই গান্ধীজীর ডাকে দেশব্যাপী শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২১ খ্রিঃ ১০ই ডিসেম্বর, দেশবন্ধু, মৌলানা আজাদ, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকেও গ্রেপ্তার করা হল। দেশবন্ধু ও সুভাষের প্রায় তিন মাসকাল কারাদন্ড ভোগ করতে হয়।

১৯২২ খ্রিঃ উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যায় অসংখ্য মানুষ গৃহহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেই সুভাষ বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

উত্তরবঙ্গ-প্লাবন-সাহায্য-সমিতির সম্পাদক রূপে এই সময় তিনি আর্ত ও দুর্গতের সেবায় যে নিষ্ঠা ও তৎপরতার পরিচয় দেন তার জন্য বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। সমস্ত দেশে সুভাষের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

১৯২২খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে নীতিগত প্রশ্নে মত বিরোধের জন্য দেশবন্ধু পন্ডিত মতিলাল নেহেরুর সাহচর্যে কংগ্রেসের বাইরে স্বরাজ্যদল গঠন করেন। দেশবন্ধুর সহকারী রূপে সুভাষ এই নবগঠিত দলের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। দেশবন্ধু স্বরাজ্যদলের মুখপত্র ফরোয়ার্ড পত্রিকা প্রকাশ করলে, সুভাষের পরিচালনায় এই পত্রিকার খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯২৩ খ্রিঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সুভাষের অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভাবলে নির্বাচনে স্বরাজ্যদল জয়লাভ করল। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। ১৯২৪খ্রিঃ ১৪ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন।

ইংরাজ সরকার কিন্তু সুভাষের নিয়োগ সুনজরে দেখলেন না। ফলে তাঁর পক্ষে বেশিদিন এই পদে থাকা সম্ভব হয়নি। ছয়মাসের মধ্যেই সরকার নতুন এক অর্ডিন্যান্স বলে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করলেন। এই অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতাবলে এই সময় দেশের বিভিন্নস্থানে সন্দেহভাজন বহু যুবককেও গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রথমে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে, পরে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল সুভাষকে। কয়েকদিন পরেই পাঠিয়ে দেওয়া হল ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে।

সরকারের দমননীতির শিকার হয়েও সুভাষচন্দ্র ব্যবস্থাপক সভার জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন। লাঞ্ছিত জননায়ককে সেদিন এই নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশবাসী তাঁদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের মান্দালয়ে কারাবাস কালেই ১৯২৫খ্রিঃ ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জিলিংয়ে দেহত্যাগ করেন। জেলে বসেই নিদারুণ দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে সুভাষ অনুভব করলেন দেশবন্ধুর আরব্ধ কার্য তাঁকেই সম্পূর্ণ করতে হবে। বাংলাকে পরিচালনা করার দায়িত্ব নিতে হবে তাঁকেই।

মান্দালয়ের নির্জন কারাবাসে সুভাষের শরীর ভেঙ্গে পড়ল। দেশের জন্য উদ্বেগ ও দেশবন্ধুর অকাল প্রয়াণ তাঁর শরীরকে আরও বেশি জীর্ণ করল। কিছুদিনের মধ্যেই চল্লিশ পাউন্ডের বেশি ওজন কমে গেল তাঁর। দেহে প্রকাশ পেল ক্ষয়রোগের লক্ষণ। ১৯২৭খ্রিঃ শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তিনি।

সরকারী মেডিক্যাল অফিসার সুভাষের শরীরের অবস্থা আশংকাজনক বলে মত প্রকাশ করলে সরকার পক্ষ থেকে মোবার্লি সাহেব প্রস্তাব করলেন, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য যদি তিনি ইউরোপ চলে যান তবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে।

ইংরাজ সরকার তাঁকে নির্বাসনে পাঠাবার কৌশল করেছে বুঝতে পেরে সুভাষ ঘৃণাভরে সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

ইতিমধ্যে বাংলার গভর্নর হয়ে এলেন স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন। দীর্ঘ আড়াই বছর পরে ১৯২৭ খ্রিঃ ১৪ই মে সরকার সুভাষকে শর্তহীন মুক্তির আদেশ দিলেন। এই সংবাদে সারা দেশে বিপুল আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

কারামুক্ত হয়ে পাটনার এক সভায় অসুস্থ সুভাষ বললেন, 'দেশের বর্তমান অবস্থায় আমাদের অসুস্থ থাকা সাজে না।' যথার্থই, অসুস্থতা অগ্রাহ্য করেই তিনি আবার কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

দেশের জনজাগরণকে আয়ত্বে আনার নতুন কৌশল নিল ইংরাজ সরকার। ভারতের শাসন পদ্ধতি, শিক্ষা বিস্তার, প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য সরকার সাইমন তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে। এই কমিশনে কোন ভারতীয়কে স্থান দেওয়া হয়নি। ভারতবাসী সাইমন কমিশন বর্জন করে সারা ভারতে তুমুল বয়কট আন্দোলন শুরু করল।

সুভাষ বাংলা জুড়ে আন্দোলন সংগঠন করলেন। সেদিন স্কুল-কলেজের ছাত্ররা স্বেচ্ছায় কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগ দিলেন। নানা স্থানে গড়ে উঠল ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠান।

এই সময় শ্রমিক আন্দোলন সংগঠন করে সুভাষ দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলন সমর্থনে সুভাষচন্দ্রই পথ প্রদর্শক।

১৯২৮ খ্রিঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশন উপলক্ষে কলকাতায় সুভাষ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জেনারেল কমান্ডিং অফিসার রূপে সামরিক পোশাকে যে শোভাযাত্রা করেছিলেন তা এককথায় ছিল অভূতপূর্ব।

এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী আপোশ-রফামূলক স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সুভাষ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন, ".......আমরা কখনো এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না, আমরা চাই স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা আমাদের দূর ভবিষ্যতের আদর্শ নয়, বর্তমানেই আমাদের দাবী হচ্ছে স্বাধীনতা"।

সুভাষচন্দ্রের এই প্রস্তাব ১৩৫০-৯৭২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। কিন্তু পরের বছরেই কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেন, পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ।

এরপর সুভাষচন্দ্র গঠন করেন নিখিল ভারত স্বাধীনতা লীগ। তাঁকে সহযোগিতা করলেন জওহরলাল, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও অন্যান্য কয়েকজন নেতা। সঙ্ঘের আদর্শ, পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার।

১৯২৭ থেকে ১৯২৯ খ্রিঃ মধ্যে সুভাষ ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক। এই সময় সর্বদল সমিতি নামে যে সমিতি গঠিত হয় সুভাষ তারও একজন বিশিষ্ট সদস্য হন। এই সমিতি নেহেরু কমিটি নামেই সমধিক পরিচিত।

১৯২৯ খ্রিঃ সুভাষচন্দ্র নির্বাচিত হলেন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯৩১ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেন।

১৯২৯ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে বাংলার লাট অকস্মাৎ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভেঙ্গে দিলে জুন মাসে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল।

দেখা গেল, কংগ্রেস প্রার্থীরা হয় বিনা বাধায় না-হয় বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছেন। সুভাষেরই জয়জয়কার হল। এই বছরই আগষ্ট মাসে নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনীতিক দিবস পালন উপলক্ষ্যে সুভাষ কলকাতায় বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনা করলেন।

সরকার ভারতীয় দন্ডবিধির ১২৪ ধারা বলে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতাদের রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করল।

এই সময় লাহোর সেন্ট্রাল জেলে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম বন্দি যতীন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ কয়েকজন বন্দি রাজবন্দিদের প্রতি জেলবিভাগের অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করেন। এই নিয়ে সারা দেশ তোলপাড় হতে লাগল।

টানা ৬৩দিন অনশন কবার পর বাংলার সন্তান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যু হল। যতীন্দ্রনাথের মৃতদেহ আনা হল কলকাতায়। সুভাষ এই মহান শহীদের মৃতদেহ নিয়ে কলকাতায় যে শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন —কেবল দেশবন্ধুর শবযাত্রার সঙ্গেই তার তুলনা হতে পারে।

১৯২৯ খ্রিঃ ২৯শে সেপ্টেম্বর পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন, "পৃথিবীতে বিপ্লব আনতে হলে আমাদের চোখের সামনে এমন একটা আদর্শ তুলে ধরতে হবে যা বিদ্যুতের মত আমাদের শক্তিকে করবে সচকিত। এই আদর্শ স্বাধীনতা।

কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ সকলে সমান বুঝেন না। আমাদের দেশেও স্বাধীনতার অর্থের দেখা যাচ্ছে ক্রমঃবিবর্তন। স্বাধীনতা অর্থে আমি বুঝি ব্যক্তি ও সমাজ, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা শুধু রাষ্ট্রীয় বন্ধন মুক্তিই নয়।

ভারত স্বাধীন হবেই তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। রাত্রির পর দিবাগমের ন্যায় স্বাধীনতা আসবেই আসবে। আজ পৃথিবীতে এমন শক্তি নেই যা বেঁধে রাখতে পারে ভারতকে।"

ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে সুভাষ যে ধারণা পোষণ করতেন, কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের মতামত ছিল তা থেকে ভিন্ন। এই প্রশ্নেই সুভাষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদে ইস্তফা দিলেন।

লাহোর কংগ্রেসে ১৯২৯ খ্রিঃ মহাত্মা গান্ধী স্বায়ত্বশাসন সমর্থক প্রস্তাব উত্থাপন করলে সুভাষচন্দ্র তার বিরোধিতা করে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি জানালেন, স্বরাজের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা; ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন নয়।

কিন্তু অধিবেশনে সুভাষের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল, গ্রাহ্য হয় গান্ধীজির প্রস্তাব।

সুভাষের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পাঞ্জাবের ছাত্র ও যুবসমাজে বিরুপ উদ্দীপনার সঞ্চার করল।

লাহোর থেকে ফিরে এসে ১৯৩০ খ্রিঃ ৪ঠা জানুয়ারী সুভাষ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ও কর্পোরেশনের অলডারম্যানের পদ পরিত্যাগ করলেন।

জানুয়ারীর ২৩ তারিখেই রাজদ্রোহের অভিযোগে সুভাষ ধৃত হলেন ও নয় মাস সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করেন।

কারাগারে থাকা কালেই ১৯৩০খ্রিঃ ২২শে আগষ্ট তারিখের নির্বাচনে সুভাষ কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর মুক্তি লাভের পর তিনি মেয়রের কার্যভার গ্রহণ করেন।

১৯৩১খ্রিঃ ২৬শে জানুয়ারীতে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার পুলিশ কমিশনার আদেশ করেছিলেন যে শহরে কোন প্রকার সভা-শোভাযাত্রা করা চলবে না। সুভাষ এই আদেশ অমান্য করে এক শোভাযাত্রা বার করলেন। ময়দানের কাছে পুলিশের লাঠি চালনার ফলে সুভাষচন্দ্র আহত হন। তাঁর ছয় মাস কারাদন্ডের আদেশ হয়।

ভারতের বড়লাট আরউইন ও কংগ্রেসের তরফ থেকে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এক চুক্তি হয় ওই বছরেই ৮ই মার্চ। চুক্তির শর্ত অনুসারে বিভিন্ন জেলে বন্দি অন্যান্য রাজবন্দি এবং সুভাষচন্দ্র মুক্তি পেলেন।

১৯৩১খ্রিঃ কংগ্রেসের অধিবেশন হয় করাচিতে। এই অধিবেশনে যোগ দিয়ে সুভাষচন্দ্র গান্ধী-আরউইন চুক্তির তীব্র সমালোচনা করেন।

এই সময়েই হিজলী বন্দিশালায় পুলিশ নির্মমভাবে গুলি চালালে দুজন বন্দি নিহত ও অনেকে আহত হলেন।

ক্ষুব্ধ সুভাষ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও কলকাতা কর্পোরেশনে অল্ডারম্যান পদে ইস্তফা দিলেন। বন্দিদের ওপরে পুলিশের নির্মম আচরণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

এই সময়ে সুভাষচন্দ্র তৃতীয়বার বেঙ্গল রেগুলেশনে বন্দি হন। এক বছরের মধ্যেই জেলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য সরকার তাঁকে ইউরোপ পাঠালে তিনি সেই সুযোগে ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

১৯৩৬ খ্রিঃ দেশে ফিরে এলে পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একবছর পরেই মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৩৮ খ্রিঃ সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হন। পুনরায় ১৯৩৯ খ্রিঃ ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধিজীর সমর্থিত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে সভাপতিপদে নির্বাচিত হন। কিন্তু পূর্ণ স্বরাজের প্রশ্নে দক্ষিণপন্থী জোটের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এই সময়েই সুভাষচন্দ্র মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে এসে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে দেশগৌরব উপাধি দেন।

কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করে বাংলার বিপ্লবীদলগুলিকে সংগঠিত করার চেষ্টা করলে, কংগ্রেস দল থেকে তাঁকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কৃত কর হয়।

১৯৪০ খ্রিঃ সুভাষচন্দ্র একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানান। এই সময় হল ওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে সত্যাগ্রহ শুরু করেন এবং গ্রেপ্তার হন।

এই বছরেই কারাগারে অনশন করলে তাঁকে মুক্ত দিয়ে গৃহে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। অত্যন্ত বিশ্বস্ত কিছু সহযোগীর সহযোগিতায় পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ খ্রিঃ ২৬শে জানুয়ারী ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করেন।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্র কাবুল হয়ে রাশিয়া প্রবেশ করেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শক্তি সংগ্রহের জন্যই তিনি রাশিয়া হয়ে জার্মানীতে আসেন। এখানে এক শক্তিশালী বেতারকেন্দ্র থেকে তিনি ভারতের উদ্দেশে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন।

ইতিপূর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করেছিলেন। তরুণ সুভাষকে তিনি তাঁর আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব তুলে দেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

ভারতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে রাসবিহারী বসু ও ক্যাপ্টেন মোহন সিং গঠিত এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত রাজনৈতিক সৈন্যবাহিনীরই নাম আজাদ হিন্দ ফৌজ।

১৯৪২খ্রিঃ। দুনিয়া কাঁপানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চলছে পুরোদমে। এই সালের ২৮শে মার্চ খ্যাতনামা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু টোকিওতে ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভায় মিলিত হন।

এই সভায় স্থির হয় যে, জাপানের অধিকৃত সমস্ত স্থানের ভারতীয় অধিবাসীদের নিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ বা Indian Independence League স্থাপন করা হবে।

সেই সঙ্গে ভারতীয় সেনানায়কদের অধীনে ভারতের একটি জাতীয় সেনাবাহিনী বা Indian National Army গঠন করা হবে।

এই সিদ্ধান্তের ওপর ১৯৪২ খ্রিঃ ১৫ই জুন ব্যাঙ্ককে একটি বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সম্মেলনে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠিত হয়।

রাসবিহারী বসু উক্ত সঙ্ঘের সভাপতি পদে বৃত হন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতি পদে নির্বাচিত হন।

এই সম্মেলনে ৩৫টি প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে সুভাষচন্দ্র বসুকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

কিন্তু ঘটনাচক্রে টোকিও ও ব্যাঙ্কক সম্মেলনের পূর্বেই ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সূচনা হয়েছিল।

১৯৪১ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে মালয় উপদ্বীপে জাপানীরা ইংরাজ সৈন্যকে পরাস্ত করে। এর ফলে ১৪নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মোহন সিং আর একজন ভারতীয় এবং একজন ইংরাজ সেনানায়ক সৈন্যসহ জঙ্গলে পথ হারিয়ে জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

১৯৪২ খ্রিঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হয়। সেই সময় ব্রিটিশ সেনানায়ক ৪০,০০০ ভারতীয় সৈন্যকে জাপান সরকারের প্রতিনিধি মেজর ফুজিয়ারার হাতে সমর্পণ করেন। ক্যাপ্টেন ফুজিয়ারা এইসব সৈন্যকে মুক্তি দিয়ে মোহন সিং-এর হাতে সমর্পণ করেন।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং ভারতীয় সৈন্যদের সেই সময়েই আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ভালভাবে বুঝিয়ে দেন এবং যারা স্বেচ্ছায় এই দলে যোগদান করতে ইচ্ছুক কেবল তাদের নিয়েই ফৌজ গঠন করেন।

এইভাবে ব্যাঙ্কক সম্মেলনের পূর্বেই অন্ততঃপক্ষে ২৫,০০০ ভারতীয় সৈন্য ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর অধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয়। ১৯৪২খ্রিঃ আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত এই সংখ্যা বেড়ে ৪০,০০০ দাঁড়ায়।

টোকিও সম্মেলন থেকে ফিরে এসেই মোহন সিং ভারতীয় সামরিক নায়কগণকে নিয়ে এক সভা করেন এবং ১৯৪২খ্রিঃ এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজ বিধিবদ্ধভাবে গঠিত হয়। ১৯৪২খ্রিঃ ১লা সেপ্টেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম পরিকল্পনা নেতাজী সুভাষচন্দ্রই করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় গৃহে অন্তরীণ থাকাকালে সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ খ্রিঃ ১৭ই জানুয়ারী গোপনে কলকাতা ত্যাগ করেন এবং আফগানিস্তান ও রাশিয়ার মধ্য দিয়ে জার্মানীতে উপস্থিত হন।

ওই বছরের ২২শে জুন জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করেন, জার্মানদের হাতে বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে তিনি একটি সেনাদল গঠন করবেন এবং জার্মান সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হবেন।

জার্মান সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত হলে সুভাষচন্দ্র বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে সেনাদল গঠন করেন এবং জার্মান কর্মচারীদের সাহায্যে তাদের বিশেষভাবে সামরিক শিক্ষা দেন। এটিই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম প[illegible]িকল্পনা।

এই সময়েই জার্মানীর ভারতীয় সম্প্রদায় সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী উপাধি দেন এবং জয়হিন্দ বলে অভ্যর্থনার পদ্ধতি প্রচলন করেন।

সুভাষচন্দ্র কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন বার্লিনের মত একটি দূরবর্তী কেন্দ্র থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা সম্ভব নয়। তাই তিনি ব্যাঙ্কক সম্মেলনের আহ্বান গ্রহণ করেন এবং এক দুঃসাহসিক অভিযানে জার্মান সাবমেরিনে আফ্রিকার পূর্বদিকের সমুদ্র এবং সেখানে থেকে জাপানী সাবমেরিনে সুমাত্রা হয়ে টোকিও উপস্থিত হন ১৯৪৩ খ্রিঃ ১৩ই জুন।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ খ্রিঃ ২ রা জুলাই নেতাজী সিঙ্গাপুরে এলে তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।

রাসবিহারী বসু নিজে ৪ঠা জুলাই পদত্যাগ করে সুভাষচন্দ্রকে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি পদে বৃত করেন। ওই বছরেই ২৫শে আগস্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিপদ গ্রহণ করেন।

১৯৪৩ খ্রিঃ ২১শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্র সমবেত পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধিগণের সমক্ষে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ অর্থাৎ স্বাধীন ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন।

১৯৪৪ খ্রিঃ ১৯শে মার্চ আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রহ্মদেশের সীমানা পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং ২১শে মার্চ জাপানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ভারতের যে সব অংশ থেকে ইংরাজ সৈন্য বিতাড়িত হয়েছে সেসব স্থান নেতাজীর প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের শাসনাধীন হবে।

মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের পতন হলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর কোহিমায় অবস্থানের সিদ্ধান্ত হয় যাতে প্রয়োজন মতো তারা ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করে বঙ্গদেশ আক্রমণ করতে পারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজাদ হিন্দ ফৌজের এই পরিকল্পনা সাফল্যমন্ডিত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হয় এবং আমেরিকা বিপুল সৈন্য নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের পথে জাপানের দিকে অগ্রসর হলে জাপান ভারত আক্রমণের আশা ত্যাগ করে স্বদেশভূমি রক্ষার জন্য ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে।

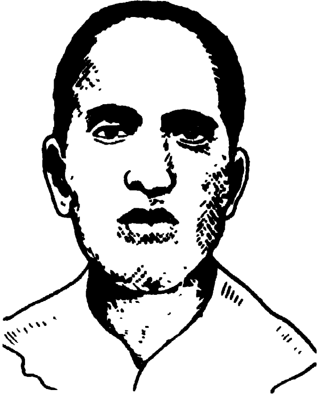
সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও পিছু হটতে হয় এবং এরপর ইংরাজ ও আমেরিকার বিপুল সেনাদল ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করলে কিছুকাল যুদ্ধ করার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণ করে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অসাধারণ সাংগঠনিক এবং সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর। এই বাহিনী ভারত সীমান্তের মধ্যে ২৪১ কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। ইংরাজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের ৪,০০০ সৈন্য নিহত হয়েছিল।

যদিও নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করতে সমর্থ হয়নি, তথাপি এই বাহিনীর অতুল পরাক্রম ও দেশপ্রেম, কষ্টসহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

১৯৪৫ খ্রিঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান আত্মসমর্পণ করলে নেতাজী তাঁর বাহিনীকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। এই সময় তাইহোকু বিমান বন্দরে একটি বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচার করা হয়।

মাষ্টারদা সূর্য সেন



চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে ১৯১৪খ্রিঃ বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। একজন ছাত্র হন্তদন্ত হয়ে হলে ঢুকল। কোন দিকে না তাকিয়ে তাড়াহুড়ো করে পরীক্ষকের কাছ থেকে খাতা ও প্রশ্নপত্র নিয়ে লিখতে বসে গেল ছাত্রটি।

বাড়ি থেকে বেরোতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই এই বিপত্তি! মাথা গুঁজে একমনে লিখতে শুরু করেছে ছেলেটি।

এমন সময় পরীক্ষক এসে দাঁড়ালেন সামনে। উঠে দাঁড়াতে বললেন ছেলেটিকে। জানালেন, তাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না। কারণ সে ডেস্কে বই রেখে টুকছে।

উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছেলেটি লক্ষ করল, সত্যিই ডেস্কের ওপরে বই রয়েছে। তাড়াহুড়ো করে পরীক্ষায় বসতে গিয়ে হাতের বইগুলো বাইরে রেখে আসতে ভুলে গিয়েছিল।

ছেলেটি নিজের অসাবধানতার কথা বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পরীক্ষক তার কোন কথাই কানে তুললেন না।

এই ব্যাপার শেষ পর্যন্ত অনেকদূর পর্যন্ত গড়াল। ছেলেটি পরীক্ষা দেবার সুযোগ তো পেলই না, উপরন্তু অসাধুতার অভিযোগে তাকে কলেজ থেকে বিতাড়িত হতে হল।

অভিভাবকরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। হিতৈষীরা পরামর্শ দিলেন, একটা নকল সার্টিফিকেট জোগাড় করে অন্য কলেজে ভর্তি হবার চেষ্টা করার জন্য।

ছেলেটি কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য কোন অসাধু উপায় গ্রহণ করতেই রাজি হল না। সে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে এলো মুর্শিদাবাদে। বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানাল।

উনিশ-কুড়ি বছরের এক তরুণের সৎসাহস ও সরলতা দেখে মুগ্ধ হলেন অধ্যক্ষ। তিনি বিনা দ্বিধায় ছেলেটিকে নিজের কলেজে ভর্তি করে নিলেন।

এই ছেলেটি ১৯১৭খ্রিঃ বহরমপুর কলেজ থেকেই সসম্মানে বি.এ পরীক্ষা। পাস করল।

এই সরল, সৎ, ঋজু ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছেলেটিই হলেন উত্তরকালের বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী তরুণ বিপ্লবীদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি মাষ্টারদা সূর্য সেন।

ছাত্রজীবনের ছোট্ট ঘটনাটির মধ্যেই তাঁর যে অসামান্য ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছিল তার বলেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণদের অবিসংবাদিত নেতা।

সূর্য সেন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর অন্যতম সহযোদ্ধা কল্পনা যোশি বলেছেন "বিপ্লবী নেতার কথা ভাবতে গেলে সাধারণতঃ যে চেহারাটি ভেসে ওঠে মাষ্টারদার মোটেই তা ছিল না। রোগা, ছোটখাট, স্বল্পভাষী, অমায়িক মানুষটাকে দেখলে বোঝার উপায় ছিল না, মানুষটা কোন জাতের। শুধু যারা তাঁর অতি নিকটে এসেছ তারাই জেনেছে কতটা নৈতিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি।"

মাষ্টারদা সূর্য সেন সম্পর্কেএমনই মন্তব্য শোনা গেছে বহুজনের কাছ থেকেই। বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আনন্দ গুপ্ত মাষ্টারদার সম্পর্কে তাঁর The Immortal Surya Sen গ্রন্থে লিখেছেন, "I still remember the day when I had the first privilage of meeting the immortal Surya Sen. One day I was told by late Ananta Singh," You are going to meet to-morrow the leader of our party on your way back from school. His name is Surya Sen. We all call him Masterda".

I still remember I could not help being worried.....

Next day I arrived at Ananta Singh's home at the appointed time. I looked around with keen enthusiasm. I found a very ordinary looking man seated in a corner, most of his head bold, I thought perhaps Masterda (Surya Sen) was yet to arrive. I looked at once at Ananta Singh. He immediately introduced me," This is Masterda about whom I had told you already,' and he left the room leaving me alone with Surya Sen. A stream of thought crossed my mind. Is this the famous man who leads the party and whose word is law to his followers? But contrary to my preconceined motion he looked very ordinary. I moved nearer and sat close to him. But no sooner had I looked at his eyes than I felt rather uncomfortable. I immediately had the feel of powerful (but unassuming) personslity behind his piercing pair of eyes."

আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ মাষ্টারদা সম্পর্কে তাঁর দলের কর্মীদের কাছ থেকে যেসব কথা জানা যায় কেবল তা থেকেই একটা গোটা মানুষের চরিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বিপ্লবী বিনোদবিহারী দত্ত লিখেছেন, "আমরা প্রতিটি মুহূর্তে জানতাম যে মাষ্টারদা ভুল করতে পারেন না, তিনি অভ্রান্ত। নেতার প্রতি অমন বিশ্বাস যেমন আমাদের মনে শক্তি দিয়েছে, তেমনই নেতার আদের্শের সক্রিয় শরিক রূপে নিজেদের ভাবতে পারতাম বলেই সকল কর্মে সেই বোধ আমাদের আত্মনির্ভর করেছে।"

বিনোদবিহারী দত্ত আর এক জায়গায় লিখেছেন, "দাদার সঙ্গে আছি। আমার নোংরা কাপড়খানা সাবান জলে ডুবিয়েছি। দূর থেকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসে ঝট করে দাদা তাঁর ভিজে গেঞ্জিটা তুলে নিলেন, ধুতে দিলেন না। বললেন, আমি মহান্ত নই! তুই, আমি এবং দলের প্রত্যেকে আমরা এক—আমরা বিপ্লবী। আজকে আমার গেঞ্জি ধুবি, কাল পা টিপবি—এসব চলবে না। এ করতে চাইলে আমার ধারে কাছে আসতে দেব না।"

আর এক জায়গায় বিনোদবিহারী দত্ত আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এই ঘটনা মহাবিপ্লবী সূর্য সেনের চরিত্রের পরিচয় আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরে আমাদের সামনে।

সূর্য সেনের চরিত্রের অলোকেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেই যুগের বিপ্লবীদের জীবন ও চরিত্র, দেশের ও দশের কল্যাণে যাঁরা দধীচির মত অকাতরে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

সেই সময় সূর্য সেন চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সভাপতি। একদিন তিনি কংগ্রেস অফিসে বসে আছেন। দেশের বাড়ি থেকে তাঁর দাদা এলেন দেখা করতে। পারিবারিক কোনও প্রয়োজনে তাঁর কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে।

সূর্য সেন মন দিয়ে সবই শুনলেন তাঁর দাদার কথা, উদ্বেগের ছাপ তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠল। কিন্তু দাদাকে কোন সাহায্য তিনি করতে পারলেন না। নিরাশ হয়ে দাদা ফিরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই কংগ্রেস অফিসে এল একটি অল্পবয়সী ছেলে। সে সূর্য সেনকে জানাল ফি-এর টাকা জোগাড় করতে পারেনি বলে সে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসতে পারছে না।

সূর্য সেন সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে ছেলেটির হাতে দিলেন।

বিনোদবিহারী দত্ত নিকটেই বসেছিলেন। তিনি সব ঘটনারই সাক্ষী। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, সঙ্গে এত টাকা থাকা সত্ত্বেও সূর্য সেন কেন তাঁর দাদাকে ফিরিয়ে দিলেন?

সূর্য সেন তাঁকে উত্তর করলেন, "এ টাকা তো আমার নয়। দেশবাসী কংগ্রেসকে দিয়েছে দেশের কাজের জন্য। ওই ছেলেটি গরীব মেধাবী ছাত্র। অর্থের অভাবে পরীক্ষায় বসতে পারছে না। এ টাকায় তার দাবি আছে।"

বিনোদবিহারী আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার পরিবার কি দেশের অংশ নয়? ওই টাকাতে তো তাঁরও দাবি থাকবার কথা।"

সূর্য সেন উত্তর দিলেন, "দাদা তো কংগ্রেস সভাপতির কাছে আসেননি। তিনি এসেছিলেন তাঁর ছোট ভাইয়ের কাছে। কিন্তু ওই ছেলেটি সাহায্য চাইতে এসেছিল কংগ্রেস সভাপতির কাছে। তাই ওই টাকাতে তারই দাবি আগে।"

এই হলেন বিপ্লবী মাষ্টারদা— সূর্য সেন। এই অসাধারণ মানুষটির জন্ম চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে।

সূর্য সেনের জন্ম সময় নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। কোন মতে ১৮৯৩খ্রিঃ ২৫অক্টোবর। আবার কেউ বলেন ১৮৯৪খ্রিঃ ২২শে মার্চ। অবশ্য বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার দ্বিতীয় তারিখটিই সমর্থন করেছেন।

সূর্য সেনের বাবার নাম রাজমণি সেন, মাতা শশিবালা দেবী। ছয় ভাইবোনের মধ্যে সূর্য সেন ছিলেন চতুর্থ।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন। কাকা গৌরমণি সেনের আদরে-শাসনেই বড় হয়ে ওঠেন তিনি।

বালক সূর্যকে প্রথমে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় গ্রামেরই দয়াময়ী উচ্চবিদ্যালয়ে। তারপর হরিশ দত্তের জাতীয় স্কুল থেকে ১৯১২ খ্রিঃ তিনি এন্ট্রান্স পাস করেন। কলেজ জীবন শুরু হয় চট্টগ্রাম কলেজে। এখানেই ঘটেছিল আগে উল্লেখ করা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি।

শেষপর্যন্ত ১৯১৭খ্রিঃ বহরমপুর কলেজ থেকে বি.এ পাস করে সূর্য সেন ফিরে আসেন চট্টগ্রামে।

সূর্য সেনের জীবনীকারদের অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে বহরমপুর কলেজে পড়বার সময়েই তিনি গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন।

তবে নোয়াপাড়া জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঠকালেই সূর্য সেন অম্বিকা চক্রবর্তী সহ আরো কিছু তরুণকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেমেন্দ্রলাল মুখোটি। তিনি ছিলেন বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী। কিছুদিন দুর্গাপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করবার পর তিনি যোগ দিয়েছিলেন নোয়াপাড়া জাতীয় বিদ্যালয়ে।

বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা সতীশ চক্রবর্তী। তাঁর সংস্পর্শে এসে সূর্য সেন বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। ফলে একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা মাথায় নিয়েই তিনি চট্টগ্রামে ফিরে এসেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন উমাতারা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে অঙ্কের শিক্ষক হিসাবে।

নিছক জীবিকার জন্যই তিনি শিক্ষকতাকে বেছে নেননি। তাঁর এই কর্মগ্রহণের পেছনে ছিল এক বৃহত্তর ও মহত্তর ভাবনা ও উদ্দেশ্য।

স্কুলে তিনি শুধু যে অঙ্ক শেখাতেন তাই নয়। অবসর সময়ে ছাত্রদের শোনাতেন দেশবিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী।

আন্তরিক ব্যবহারের জন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যেই হয়ে উঠলেন ছাত্রদের মাষ্টারদা। ক্রমে চট্টগ্রামের ছেলেবুড়ো সবারই মাষ্টারদা।

ছাত্র তৈরি করার পাশাপাশি সূর্য সেন নেমে পড়লেন সমাজ সেবার কাজে। এই উদ্দেশ্যে অনুগামী ছাত্রদের নিয়ে গড়ে তুললেন সাম্য আশ্রম। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সাহায্য করা, দুর্গতদের সেবা করা—এসবই ছিল এই সঙ্ঘের লক্ষ।

সূর্য সেন বিশ্বাস করতেন, ভারতকে স্বাধীন করতে হলে যুবকদের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে। তাহলেই তাদের নিয়ে ঘটানো সম্ভব হবে সশস্ত্র বিপ্লব।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন, তবে তার চাইতেও বেশি প্রয়োজন আদর্শবাদী একদল অকুতোভয় যুবকের, যাঁরা কোন বাধাকে বাধা বলে মানবে না। যাদের প্রাণের মায়া বলে কোন দুর্বলতা থাকবে না, থাকবে না কোন পিছুটান।

সূর্য সেন বুঝতে পেরেছিলেন যে আসুরিক বলের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করতে হলে বলপ্রয়োগ ছাড়া অন্য পথ নেই। মূল লক্ষ স্বাধীনতা, তা হিংসার পথে আসবে কি অহিংসার পথে আসবে—এই বিষয়কে তিনি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন না।

সাম্য আশ্রম গড়ে তোলার সময়েই সূর্য সেন অনুগামী হিসেবে পেলেন গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, চারুবিকাশ দত্ত, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, অনন্ত সিংহ, রাজেন দাস, গণেশ ঘোষ, যতীন রক্ষিত, সুখেন্দু দত্ত, রাখাল দে প্রমুখ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একদল তরুণকে।

অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তর প্রভৃতি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের আদর্শে সূর্য সেন চট্টগ্রামে গড়ে তুললেন একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা ১৯১৭খ্রিঃ। অনুরূপ সেন, নগেন সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, চারুবিকাশ দত্ত ও সূর্য সেন—এই পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত হল বিপ্লবী কমিটি। পরের বছর এই দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রমোদ চৌধুরী, আশরাফউদ্দিন, নির্মল সেন, উপেন ভট্টাচার্য, অনন্তলাল সিং এবং তাঁর বড়ভাই নন্দলাল সিং।

অনন্ত সিং পরে দলের সঙ্গে যুক্ত করেন গণেশ ঘোষকে।

সূর্য সেন ছিলেন এই তরুণ বিপ্লবীদলের অবিসংবাদিত নেতা। দলের প্রতিটি অনুগামী তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর মুখের কথায় হাসি মুখে প্রাণ দিতে পারতেন।

সংগঠনের সকল কাজেই সূর্য সেন কঠোরভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলতেন। দলের প্রতিটি কাজে লিপ্ত থেকেও অদ্ভুতভাবে নির্লিপ্ত থাকার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর।

সূর্য সেনের অনুমতি ছাড়া যেমন কোন কাজ হত না, তেমনি সকল বিষয়েই উপস্থিত কর্মী ও কর্মীনেতাদের প্রত্যেকেরই মতামত তিনি গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন।

মাষ্টারদা সূর্য সেনের ব্যক্তি জীবনেও ছিল আশ্চর্য স্বাতন্ত্র। বস্ত্র বা বাসস্থান বিষয়ে যেমন ছিলেন উদাসীন তেমনি খাদ্যের ব্যাপারেও ছিলেন নির্লিপ্ত। অন্তর ছিল স্নেহ-মমতায় পূর্ণ। কিন্তু পরিবারের ক্ষুদ্র গন্ডি তাঁকে কখনো বেঁধে রাখতে পারেনি।

স্কুলে কাজ নেবার পর পরিজনদের চাপে পড়ে বিয়ে করেছিলেন সূর্য সেন। তাঁর স্ত্রীর নাম পুষ্পকুন্তলা দেবী।

সাধারণ গৃহস্থের মতো অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে মাষ্টারদা স্ত্রীকে সুখী করতে পারেননি, সেই অর্থে তাঁর সংসার সুখ বলতে যা বোঝায় তা তিনি কোনদিনই পাননি। তবে মাষ্টারদার বড় কৃতিত্ব এই যে তিনি স্ত্রীকেও নিজের কর্মযজ্ঞে টেনে নিতে পেরেছিলেন।

পুষ্পকুন্তলা হয়ে উঠেছিলেন বহুমানুষের সুখ-দুঃখের শরিক। মাষ্টারদার অনুগামীদের মনে তিনি শ্রদ্ধার আসন করে নিতে পেরেছিলেন। পুষ্পকুন্তলা দেবী সম্পর্কে অনন্ত সিং তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "যিনি একদিন মাষ্টারদার জীবনে তাঁর স্ত্রীরূপে এসেছিলেন তিনি কেবল তাঁর ধর্মপত্নী ছিলেন, তা নয়—তিনি সূর্য সেনের অতিবিশ্বাসী বিপ্লবী সাথী ও সহযাত্রিনী ছিলেন।"

অনন্ত সিং তাঁর রচিত 'সূর্য সেনের স্বপ্ন ও সাধনা' গ্রন্থটি পুষ্পকুন্তলা দেবীকে উৎসর্গ করে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। খুব অল্প বয়সেই টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান পুষ্পকুন্তলা।

সূর্য সেনকে অনুপ্রাণিত করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের জীবনদর্শন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অসাধারণ সংগঠন ক্ষমতা। নিজের হাতে তিনি তাঁর অনুগামীদের ভবিষ্যৎ বিপ্লবের উপযুক্ত করে রীতিমত যোদ্ধাবাহিনী রূপে গড়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু শক্তিশালী ব্রিটিশ সরকারকে আঘাত হানতে গেলে অস্ত্রবলেরও প্রয়োজন। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন টাকার।

বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত করবার উদ্দেশ্যে মাষ্টারদা নতুন করে পরিকল্পনা ছকলেন।

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণ বিপ্লবীরা অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য নেমে পড়লেন। অসম-বাংলা রেলওয়ে কোম্পানির অফিসে হানা দিয়ে বিপ্লবীরা সংগ্রহ করলেন সতেরো হাজার টাকা।

এই ঘটনার দশদিনের মধ্যেই ১৯২৩ খ্রিঃ ২৪শে ডিসেম্বর নাগরখানার যুদ্ধে সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী ধরা পড়লেন। পরে অবশ্য তাঁরা ছাড়া পেলেন। কিন্তু অসম-বেঙ্গল রেলওয়ের টাকা চুরির মামলা চলতে লাগল অনন্ত সিং-এর বিরুদ্ধে।

সন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯২৪ খ্রিঃ জারি করলেন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স।১৯২৬খ্রিঃ সূর্য সেন চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়।

১৯২৬খ্রিঃ বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স বলে সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করা হল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু বিপ্লবীকেই এই সময় বন্দি করা হয়।

১৯২৮ খ্রিঃ একে একে সব রাজবন্দিরা মুক্তি লাভ করলেন।

কারামুক্তির পর সূর্য সেন মনস্থির করে ফেললেন, বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে হবে। তিনি সেভাবে যুবকদের সংগঠিত করার কাজও শুরু করলেন।

স্কুলের ছেলেদের গড়ে তোলার জন্য মাষ্টারদার নির্দেশে গড়ে উঠল ব্যায়াম সমিতি। শরীর চর্চার সঙ্গে সেখানে ছেলেদের স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার কাজ চলল।

এইভাবেই ক্রমে গড়ে উঠল, ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা। সূর্য সেন হলেন এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট।

মাষ্টারদার সহযোদ্ধা কল্পনা যোশী লিখেছেন, 'ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও বাংলার বিপ্লবীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আয়ারল্যান্ডের সংগ্রাম। আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির অনুকরণে চট্টগ্রামের এই বিপ্লবী দল তাদের দলের নামকরণ করল ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা।'

চট্টাগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ করার পরিকল্পনা সূর্য সেন দীর্ঘ দিন ধরেই মনে লালন করে আসছিলেন। তারই প্রস্তুতি হিসেবে গড়ে তুলেছেন চট্টগ্রাম রিপাবলিকান আর্মির সুদক্ষ যোদ্ধাবাহিনী।

এবারে তিনি সহযোগী সকলকে জানিয়ে দিলেন তাঁর কর্মসূচির কথা। সেই সঙ্গে দিনও স্থির করে দিলেন—আয়ারল্যান্ডের ইস্টার বিদ্রোহের দিন ১৯৩০খ্রিঃ ১৮ই এপ্রিল।

মুষ্টিমেয় অস্ত্রশস্ত্র সম্বল করে ব্রিটিশ শাসকের দুর্ভেদ্য অস্ত্রাগার এই দিন আক্রমণ করল একদল তরুণ। সাময়িকভাবে সফলও হল এই বিদ্রোহ।

চট্টগ্রাম পুলিশের হেডকোয়ার্টার সমেত অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার চলে আসে বিপ্লবীদের দখলে। চট্টাগ্রামের সঙ্গে অন্যান্য জেলাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য উপড়ে ফেলা হয়েছিল রেল লাইন, বিচ্ছিন্ন করা হয়, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যোগাযোগ।

ব্রিটিশ শাসনের পদস্থ কর্মচারীরা প্রাণ ভয়ে সপরিবারে জাহাজে করে মাঝ সমুদ্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। কয়েকদিনের জন্য চট্টগ্রাম হল স্বাধীন—ব্রিটিশ শাসন মুক্ত।

মাষ্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শহর ৪৮ ঘন্টার জন্য ইংরাজশাসন মুক্ত ও স্বাধীন ছিল। জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের মুখোমুখি সংঘর্ষ শেষ হবার পরেও তাঁরা টানা তিন বছর গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সৈন্যদের দৃষ্টি থেকে মাষ্টারদাকে আড়ালে রাখার উদ্দেশ্যেই বিপ্লবীরা এই যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তারের হাত থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছেন মাষ্টারদা।

কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

চট্টগ্রামের কাছেই গইরালা গ্রাম। সেখানে এক বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন মাষ্টারদা। এক জ্ঞাতি ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতায় ব্রিটিশ সৈন্যরা তাঁর সন্ধান পেয়ে যায়। মাষ্টারদা গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৩ খ্রিঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী।

অবশ্য পুলিশের ওই চর নেত্রসেন ও মাষ্টারদার গ্রেপ্তারকারী পুলিস মাখনলালকে পরে বিপ্লবীরা গুলি করে হত্যা করে।

ব্রিটিশ সরকারের আদালতে বিচারের নামে হল প্রহসন। বীর বিপ্লবী সূর্যসেনকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হল। ১৯৩৪ খ্রিঃ ১২ জানুয়ারি ঘাতকের হাতে সূর্য সেনের ফাঁসি হল।

ফাঁসির আগের দিন প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সূর্য সেন একটি চিঠিতে লিখেছেন—

"ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার ওপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। এই তো আমার মৃত্যুকে বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করার সময়। আমার ভাইবোন তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি, আমার বৈচিত্র্যহীন (কারাগৃহের) জীবনের একঘেয়েমিকে তোমরা ভেঙে দাও, আমাকে উৎসাহ দাও। এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কি রেখে গেলাম, শুধু একটি মাত্র জিনিস, তা হল আমার স্বপ্ন। একটি সোনালী স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথমে স্বপ্ন দেখেছিলাম। উৎসাহভরে সারা জীবন তার পেছনে উন্মত্তের মতো ছুটেছিলাম। জানি না, এই স্বপ্নকে কতটুকু সফল করতে পেরেছি। ......

আমার আসন্ন মৃত্যুর স্পর্শ যদি তোমাদের মনকে এতটুকু স্পর্শ করে, তবে আমার এই সাধনাকে তোমরা তোমাদের অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও যেমন আমি ছড়িয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের মধ্যে।

বন্ধুগণ, এগিয়ে চলো। কখনো পিছিয়ে যেও না। দাসত্বের দিন চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার লগ্ন আগত। ওঠো। জাগো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।"

মানবেন্দ্রনাথ রায়



ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বিপ্লবীযোদ্ধাদের মধ্যে কাজের সুবিধার জন্য অনেকেই বিভিন্ন সময়ে নানা ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন। বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মত এত বেশি ছদ্মনাম সম্ভবত আর কোন বিপ্লবীকে গ্রহণ করতে হয়নি।

তাঁর প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য। বিপ্লবী কাজে বিভিন্ন সময়ে মি.মার্টিন, হরি সিং, মি.হোয়াইট, মানবেন্দ্রনাথ রায়, ডি.গার্সিয়া, ডা.মাহমুদ, মি.ব্যানার্জী প্রভৃতি নাম তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। তবে মানবেন্দ্রনাথ নামটিই সর্বাধিক পরিচিত।

পৈতৃক নিবাস মেদিনীপুরের খেপুত গ্রামে। পিতার নাম দীনবন্ধু ভট্টাচার্য। পৈতৃক বৃত্তি যজন-যাজন পরিত্যাগ করে দীনবন্ধু ২৪ পরগণার কোদালিয়া গ্রামে শ্বশুরালয়ে বাস করতেন এবং আড়বেলিয়া গ্রামের বিদ্যালয়ে হেড পন্ডিতের চাকরি নেন।

এখানেই ১৮৮৭ খ্রিঃ ২২শে মার্চ মানবেন্দ্রনাথের জন্ম। শিক্ষারম্ভ পিতার স্কুলে। পরে ১৮৯৭খ্রিঃ হরিণাভি আংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯০৫খ্রিঃ তাঁর বাবা দীনবন্ধু ভট্টাচার্য মারা যান। সেই বছরই তিনি গুপ্ত বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ওই অঞ্চলে এলে তাঁর সংবর্ধনার জন্য ছাত্রদের মিছিল পরিচালনা করেন নরেন্দ্রনাথ। এই অপরাধে আরও ছয়জন সহপাঠীর সঙ্গে তিনিও হরিণাভি স্কুল থেকে বিতাড়িত হন।

পরে বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯০৬খ্রিঃ অরবিন্দ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ।

বর্তমানে যার নাম সুভাষগ্রাম, সেই সময়ে সেই স্থানের নাম ছিল চাংড়িপোতা। ১৯০৭খ্রিঃ নরেন্দ্রনাথ এখানকার স্টেশনে রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন। পুলিশ সন্দেহক্রমে নরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তি পান।

পরের বছরই নরেন্দ্রনাথের মা বসন্তকুমারীর মৃত্যু হয়।

মাত্র চোদ্দবছর বয়স থেকেই বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে তিনি দেশের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন।

এই সময় থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। বেলুর মঠে গিয়ে তিনি প্রায়ই স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। গীতার কর্মযোগের আদর্শে নিজেকে গঠন করার সংকল্প নেন।

মজঃফরপুর বোমা ও মুরারিপুকুর বোমা মামলায় বেশির ভাগ বিপ্লবী কর্মী ধরা পড়লে নেতৃত্বের দায়িত্ব নেন বাঘা যতীন অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সময় থেকেই যতীন্দ্রনাথের প্রধান সহকর্মীরূপে নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত সংগঠন পুনর্গঠিত করেন। এরপর থেকে পরি পূর্ণভাবে বিপ্লবের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। বাঘা যতীনের নির্দেশে দেশে ও বিদেশে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে লিপ্ত হন।

১৯১৪খ্রিঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় বিপ্লবীগণ ইংরাজের শত্রু জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জার্মানদের কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করার যে পরিকল্পনা বিপ্লবীরা গ্রহণ করেন, নরেন্দ্রনাথ তাতে প্রধান ভূমিকা নেন।

এই পরিকল্পনার রূপায়ণের অর্থ সংগ্রহের জন্য নরেন্দ্রনাথ দুটি ডাকাতির নেতৃত্ব দেন। ১৯২৪খ্রিঃ জানুয়ারী মাসে গার্ডেন রিচ ও ফেব্রুয়ারি মাসে বেলিয়াঘাটা এই দুটি ডাকাতিতে মোট ৪০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়।

ডাকাতির মামলায় নরেন্দ্রনাথের কারাবাস নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সর্বাধিনায়ক যতীন্দ্রনাথ ও পূর্ণদাসের নির্দেশে ধৃত রাধাচরণ প্রামাণিক ডাকাতির সমস্ত দায় নিজের কাঁধে নিয়ে স্বীকারোক্তি করেন। পরিণামে বিশ্বাসঘাতকের কলঙ্ক নিয়ে কারাগারেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর বৈদেশিক যোগাযোগের প্রয়োজনে নরেন্দ্রনাথ চার্লস মার্টিন ছদ্মনামে ১৯১৫খ্রিঃ বাটাভিয়া যাত্রা করেন। কয়েক মাস পরেই আবার ভারতে ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে বিদেশী জাহাজে অস্ত্র আমদানির কথা সরকার জানতে পেরে যায়। নানাস্থানে তল্লাশী ও ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। বালেশ্বরের রণাঙ্গণে ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ হারান অনেক বিপ্লবী। সর্বাধিনায়ক যতীন্দ্রনাথ আহত হয়ে হাসপাতালে মারা যান।

১৯১৫খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট নরেন্দ্রনাথ পুনরায় হরি সিং ছদ্মনামে দেশত্যাগ করেন।

ফিলিপাইনে অবতরণ করে নাম বদলে মিঃ হোয়াইট রূপে জাপানে পৌছে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এই সময়ে নতুন চিনের রূপকার সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে।

দেড় বছর দূর প্রাচ্যের প্রায় সব দেশ পরিভ্রমণ করে ১৯১৬খ্রিঃ নরেন্দ্রনাথ সানফ্রান্সিসকোতে উপস্থিত হন।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথের অস্ত্রসংগ্রহ অভিযানের নানা ঘটনা রোমহর্ষক গল্পের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। সানফ্রান্সিসকোতে পৌছেই খবরের কাগজে তিনি দেখতে

পেলেন, খবর ছাপা হয়েছে—'আমেরিকায় রহস্যময় বিদেশীর আগমন। ব্রাহ্মণ বিপ্লবী কি জার্মান গুপ্তচর'!

নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হতে হল। তিনি এখানে বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ছোটভাই প্রখ্যাত লেখক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। তাঁরই পরামর্শে ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়।

সেই বছরেই অক্টোবর মাসে মানবেন্দ্রনাথ চলে এলেন নিউইয়র্কে। এখানে পরিচিত হলেন ড.ডেভিডস্টার জর্ডন, আর্থার অপহাম পোপ, জ্যাক লন্ডন, ইসাবেলা ডানকান এবং ইভলিন ট্রেন্ট-এর সঙ্গে।

এখানে অবস্থানকালে মানবেন্দ্রনাথ বিপ্লবী হরদয়াল ও লালা লাজপত রায়ের মাধ্যমে ভারতের বিপ্লব পরিস্থিতির খবরাখবর পেতেন।

কিছুকাল পরে মানবেন্দ্রনাথ বিয়ে করলেন কলেজ ছাত্রী ইভলিন ট্রেন্টকে।

আমেরিকাতে নতুন নাম ও পরিচয়ে দশ মাসকাল মানবেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখ এড়িয়ে থাকতে পেরেছিলেন। ১৯১৭খ্রিঃ গ্রেপ্তার হলেন। পরে জামিনে ছাড়া পেলেন।

এবারে আবার নাম বদল করতে হল! নাম নিলেন ম্যানুয়েল মেন্ডিজ।

নতুন নাম নিয়ে তিনি চলে এলেন মেক্সিকোতে। কিন্তু এখানে এসেই আবার পূর্বনামে ফিরে গেলেন।

মেক্সিকোতে পরিচিত হলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জার সঙ্গে। পরে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন এল পুয়েবলো পত্রিকায়।

আমেরিকায় থাকাকালীন মানবেন্দ্রনাথ র‍্যাডিক্যালদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের প্রভাবেই প্রথম মার্কসবাদ পড়েন। সেখানে ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম সোস্যালিস্ট ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য হয়েছিলেন।

মেক্সিকোতে মানবেন্দ্রনাথ সোস্যালিস্ট পার্টি পরিচালিত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং মেক্সিকোর সোস্যালিস্ট পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত করেন। সময়টা ১৯১৯খ্রিঃ। পার্টির নাম হল দ্য কমিউনিস্ট পার্টি অব মেক্সিকো।

এভাবেই রাশিয়ার বাইরে মানবেন্দ্রনাথই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির প্রবর্তন করেন।

মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্য বলশেভিক বিপ্লবের অন্যতম যোদ্ধা মাইকেল বোরোদিন রাশিয়া থেকে গোপনে আমেরিকায় এসেছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দারা তাঁর সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য বোরোদিন মেক্সিকোতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

মানবেন্দ্রনাথ ও বোরোদিনের সাক্ষাৎ হলে অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বোরোদিন মানবেন্দ্রনাথকে রাশিয়ায় যাবার আমন্ত্রণ জানান।

১৯১৯খ্রিঃ মানবেন্দ্রনাথ ও ইভলিন রাশিয়ায় আসেন। এখন তাঁর ছদ্মনাম হয়েছে ডি. গার্সিয়া।

পরের বছর মস্কোতে অনুষ্ঠিত সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল-এ অংশ গ্রহণ করেন। এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল রোল অব কমিনটার্ন। লেনিন, স্তালিন, বুখারিন এবং ট্রটস্কি প্রভৃতি এই বিষয়ে থিসিস পেশ করলেন।

কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি অবিলম্বে নিজস্ব থিসিস পেশ করেন এবং সেটিই এই কংগ্রেসে লেনিনের থিসিসের পরিশিষ্ট রূপে গৃহীত হয়।

মানবেন্দ্রনাথ কমিনটার্ন-এর মধ্য এশিয়ার ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। স্থির হয়েছিল ১ থেকে ৮ই জুলাই বাকু শহরে অনুষ্ঠিত মধ্য এশিয়ার সম্মেলনে মানবেন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু তিনি সেখানে না গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সহ তাশখন্দ রওনা হন।

এখানে থিবা শহরে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির কয়েকজন পলাতক সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হন। পরে তাঁদের সঙ্গে ইরানী বিপ্লবীদের সংগঠিত করে লাল ফৌজের একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গড়ে তোলেন।

এই সৈন্যদলের সাহায্যে মানবেন্দ্রনাথ সুকৌশলে মেকোটকোয়েটা সড়ক ও ট্রান্সকাস্পিয়ান রেলপথকে ব্রিটিশ অধিকার মুক্ত করেন। ফলে সোভিয়েত সীমান্ত নিরাপদ হয়।

এরপর বোখারায় মানবেন্দ্রনাথ সোভিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে তিনি ফরগনা দখলের জন্য যে দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন তাতে তিনি জয়লাভ করেন।

মস্কোয় ১৯২২খ্রিঃ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে মানবেন্দ্রনাথ তাতে যোগ দেন। তিনি অন্যতম সভাপতি নিযুক্ত হন।

এই সময়েই বিপ্লবী অবনী মুখার্জীর সঙ্গে যৌথভাবে রচিত India in Transition গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

মস্কোতে টয়লার্স অব দ্য ঈস্ট নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবেন্দ্রনাথ এখানে উচ্চপদ লাভ করেন।

১৯২২খ্রিঃ মানবেন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থার কার্যকরী সমিতির বিকল্প সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৪খ্রিঃ সভাপতি মন্ডলীর অন্যতম এবং বিশিষ্ট সম্পাদক হন।

১৯২৪খ্রিঃ লেনিনের মৃত্যু হয়। সেই সময় চীনদেশে বিপ্লব পরিকল্পনায় কার্যরত ছিলেন বোরোদিন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে মানবেন্দ্রনাথকে চীনে পাঠানো হয়।

কিন্তু বোরোদিনের সঙ্গে মত বিরোধ দেখা দিলে তিনি ১৯২৭খ্রিঃ চীন থেকে বহিষ্কৃত হন। চীনের এই ঘটনাই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনে মানবেন্দ্রনাথের পতনের সূচনা করেন।

১৯২৮খ্রিঃ স্ত্রী ইভলিনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

এই বছরেই কমিনটার্ন-এর ষষ্ঠ কংগ্রেসে তাঁর অনুপস্থিতিতেই ডিকোলাইজেশন থিসিস লেখার জন্য মানবেন্দ্রনাথ নিন্দিত হন, কমিনটার্ন থেকেও তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। এভাবেই খুব অল্পসময়ের মধ্যেই মানবেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট সমাজচ্যুত হয়ে পড়লেন (১৯২৯খ্রিঃ)।

অতঃপর বার্লিন হয়ে তিনি ১৯৩০খ্রিঃ ডা.মাহমুদ ছদ্মনামে ভারতে ফিরে আসেন। কিন্তু পরের বছরেই বর্তমান মুম্বই শহরে গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর ছয় বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

কারামুক্তির পর কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে যোগ দেন। কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে তিনি কোন প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হন।

১৯৪০খ্রিঃ মানবেন্দ্রনাথ ভারতে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পিপসল পার্টি গঠন করেন।

১৯২৫খ্রিঃ প্রথমা পত্নী ইভলিনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের বছর তিনেক পর ইউরোপীয় কৃষক সমিতির সম্পাদিকা এলেন গেটমচককে তিনি বিবাহ করেছিলেন। ১৯৩০খ্রিঃ যখন তিনি ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন, তখন এলেন তাঁর সঙ্গে আসেন এবং দেরাদুনে বাস করতে থাকেন। এখানেই ১৯৬৫খ্রিঃ মানবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

আবুল কাসেম ফজলুল হক



অবিভক্ত বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় জননেতা ফজলুল হক-এর জন্ম ১৮৭৩খ্রিঃ ২৮শে আগস্ট বরিশাল জেলার চাখার গ্রামে। তাঁর পিতা কাজী ওয়াজেদ আলী ছিলেন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী।

১৮৮৯খ্রিঃ ফজলুল স্থানীয় জেলা স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পাশ করেন। পরে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ-এ, ও রসায়ন, পদার্থ ও গণিতে অনার্স সহ্ বি.এ এবং ১৮৯৫খ্রিঃ গণিতে এম.এ পাশ করেন।

১৮৯৭খ্রিঃ ল পাশ করার পর ১৯০০খ্রিঃ থেকে বরিশালে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। এই সূত্রেই মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সান্নিধ্যে আসেন। এই সময় থেকেই ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত বলা চলে। অশ্বিনীকুমারের উপদেশ ও নির্দেশে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বরিশাল শহর মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন এবং বাখরগঞ্জ জেলা বোর্ডের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন এবং জয়লাভ করেন।

১৯০৫খ্রিঃ ঢাকায় যে মুসলমান রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক তাতে যোগদান করেন। ঢাকার নবাবের পরামর্শে তিনি মুম্বইতে মহম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে পরিচিত হন। সেই বছরেই ঢাকায নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

১৯০৬ খ্রিঃ ফজলুল হক পূর্ববঙ্গের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। পরে সমবায় বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রারের পদেও কাজ করেন। অবশ্য পদোন্নতি না হওয়ায় ১৯১১ খ্রিঃ সরকারী চাকরি ত্যাগ করেন।

এরপর কলকাতায় এসে হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় শুরু করেন। একবছর সময়ের মধ্যেই কর্মক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জন করেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল। দুবছর পরেই ১৯১৩ খ্রিঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগেব সেক্রেটারি ও নিখিল ভারত মুসলিম লিগের জয়েন্ট সেক্রেটারির পদ লাভ করেন। এই সময়েই সুবক্তা হিসেবে তিনি খ্যাতিমান হন।

ফজলুল হকের উদ্যোগে কলকাতায় ১৯১৬ খ্রিঃ টেইলর ও কারমাইকেল ছাত্রাবাস তৈরি হয়।

১৯১৮ খ্রিঃ ফজলুল হক নিখিল ভারত মুসলিম লিগের সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি পদ লাভ করেন।

১৯১৯ খ্রিঃ জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নৃশংস হত্যাকান্ড হয় তাব তদন্তের জন্য কংগ্রেস যে তদন্ত কমিটি নিয়োজিত করে ফজলুল হক তার সদস্যভুক্ত হন।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় নবযুগ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ফজলুল হক এই পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম ছিলেন।

১৯২৪ খ্রিঃ তিনি কয়েকমাসের জন্য বাংলার শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ফজলুল হকের যোগাযোগ ছিল নিবিড়। বিভিন্ন সময়েই তিনি দেশের নিপীড়িত বঞ্চিত কৃষক-প্রজাসাধারণের সমস্যার কথা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। ১৯২৬ খ্রিঃ তিনি কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৭ খ্রিঃ বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা পার্টি স্থাপন করেন ও তার সভাপতি হন।

১৯৩৫ খ্রিঃ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। কিন্তু বিরোধী পক্ষের বিরোধিতায় পরে পদচ্যুত হন।

১৯৩৭ খ্রিঃ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় আইনসভায় সদস্য নির্বাচিত হন এবং পুনরায় কর্পোরেশনেব মেয়র হন।

এই বছরের নির্বাচনে মুসলিম লিগ ও ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা দল প্রায় সমান সমান আসন লাভ করে। কিন্তু ফজলুল হকই বাংলার প্রধান মন্ত্রী হন এবং কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

১৯৪০ খ্রিঃ নিখিল ভারত মুসলিম লিগের সম্মেলনে ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোব প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও পাশ করান। কিন্তু পরের বছরেই মহম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিলে লিগ থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন। এর ফলে বাংলায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এবারে হকসাহেব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

১৯৪৭ খ্রিঃ দেশভাগের পর ফজলুল হক কিছুকাল ঢাকায় ওকালতি করেন। পরে ১৯৫৩ খ্রিঃ পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হন। পরে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন এবং একটি শাসনতন্ত্র তৈরি করেন।

১৯৫৬ খ্রিঃ পাকিস্তানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। তার পূর্বেই হক সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। দুই বছর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬২ খ্রিঃ ঢাকায় লোকান্তরিত হন।

যুক্ত বাংলার অন্যতম জননেতা ফজলুল হক সুবক্তা হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণে তাঁর চিন্তা ও ধারণার সামগ্রিক পরিচয় লাভ করা যায়, মানুষ ফজলুল হকের পরিচয়ও উদ্ভাসিত হয়। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত বক্তৃতার অংশ নিচে দেওয়া হল।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে ১৯৪১খ্রিঃ ১২ই আগস্ট বাংলার বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী এ. কে ফজলুল হক একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করে এক অনবদ্য ভাষণ দেন। তিনি বলেন,

"শব্দের মালা গেঁথে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা সহজ কথা নয়।

গত কয়েকদিন ধরে সমগ্র পৃথিবীর অগণিত মানুষ রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কিন্তু আমি বাঙ্গালী হিসেবে বলতে গিয়ে অনুভব করছি যে, আমাদের পক্ষে এই তথ্য কখনোই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় যে, রবীন্দ্রনাথ এই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, আমাদের ভাষায় কথা বলেন এবং এই মহান ব্যক্তি বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে একটি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর রচনাবলী কেবলমাত্র গ্রন্থের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না, তাঁর লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অন্তরেও তা জীবন্ত থাকবে। ঠিক এই মুহূর্তে আমার কবি টেনিসনের ইন মেমোরিয়াম কাব্যের বন্ধুর মৃত্যু উপলক্ষ করে রচিত সেই সুন্দর লাইনগুলি মনে পড়ছে। সেখানে তিনি বলেছেন, "উই ফিল ইট অলমোস্ট হাফ এ সিন টু পুট ইন ওয়ার্ডস দি গ্রীফ উই ফিল, ফর ওয়ার্ডস লাইক নেচার হাফ রিভিল অ্যান্ড হাফ কনসিল দি সরো ইউদিন।"

আমরা যতই শ্রদ্ধা নিবেদন করি না কেন, তবুও মনে হবে যেন ঠিক মত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হল না।

তিনি মহান ছিলেন—একথা বলাই যথেষ্ট নয়। তিনি কবি হিসেবে মহান ছিলেন। তিনি দার্শনিক হিসেবে মহান ছিলেন। তিনি শিক্ষাবিদ হিসেবে মহান ছিলেন। তিনি মানব দরদী হিসেবে মহান ছিলেন। তিনি তাঁর গানের মধ্যে মহান ছিলেন। তিনি তো কেবলমাত্র কবিতাই রচনা করেননি, তাঁর সমগ্র জীবনই ছি'ল কবিতা। আমরা বাঙ্গালী হিসেবে অনুভব করি যে, তিনি তো কেবলমাত্র বাংলা দেশের বা ভারতের ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমগ্র সভ্য মানবজাতির। এই বিষয়ে যাঁদের দক্ষতা আছে তাঁরা আরও অনেক কিছু আলোচনা করবেন। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে, এখানে তাঁর মহাপ্রয়াণে যে গভীর শোক আমরা প্রকাশ করছি, তা ব্যক্তি হিসেবে করছি না, কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবেও করছি না, মহান বাঙ্গালী জাতির অংশ হিসাবেই করছি।

আমরা আজ গর্বিত যে, আমাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত একজন ব্যক্তি ছিলেন যাঁকে সমগ্র সভ্য জগৎ শ্রদ্ধা নিবেদন করে।"

১৯৪২খ্রিঃ ২০শে জুন হিন্দু মুসলিম ঐক্য সম্মেলন উদ্বোধন করে ফজলুল হক এক অনবদ্য ভাষণে তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের সমালোচনার উত্তর দিয়ে বলেন—

"আমি নিশ্চয় মুসলিম সমাজের যারা কলঙ্ক, তাদের প্রতিনিধিত্ব করি না। যারা ইসলামের মূল নীতি অনুসরণ করে অন্য সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে চান, আমি সেইসব মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত।

একজন প্রকৃত মুসলমানকে তাঁর প্রতিবেশীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হতেই হবে। তাই রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য হিন্দু ভাইদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার কথা কোন প্রকৃত মুসলমান চিন্তা করেন না।"

ফজলুল হক আরও বলেন, "হিন্দু ও মুসলমানদের উপলব্ধি করতে হবে যে তাঁদের একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে হবে; প্রয়োজন হলে একই মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য একসঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। যাঁরা মুসলমানদের বোঝাচ্ছেন যে, মুসলিম সমাজের মুক্তি অর্জিত হবে বিভেদ এবং অনৈক্যে, ঐক্যে নয়, তাদের চালাকি সাধারণ মুসলমানেরা বুঝতে পেরেছেন। কারণ ইসলামের শিক্ষা শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে সহায়ক।

শান্তি বজায় না থাকলে অভ্যন্তরীণ মৈত্রী বিঘ্নিত হয়। আর মৈত্রীর ভাব না থাকলে মনের সম্প্রসারণ সম্ভব নয়।"

১৯৫৪ খ্রিঃ ৩০শে এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক কয়েকদিনের জন্য কলকাতা সফরে আসেন। এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গবাসী সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। কয়েকটি সম্বর্ধনানুষ্ঠানে ফজলুল হক তাঁর ভাষণে বাঙ্গালীর প্রাণের কথা ব্যক্ত করেন।

৩রা মে নেতাজী ভবনে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বাঙ্গালী এক অখন্ড জাতি। তাঁহারা একই ভাষায় কথা বলে এবং একই সুসংহত দেশে বাস করে। তাঁহাদের আদর্শ এক এবং জীবনধারণের প্রণালীও এক। বাঙ্গালী অনেক বিষয়ে সারা ভারতকে পথ প্রদর্শন করিয়াছে এবং দেশ বিভাগ সত্ত্বেও জনসাধারণ তথাকথিত নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তের ঊর্ধ্বে থাকিয়া কাজ করিতে পারে। ...

আজ আমাকে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনে অংশ গ্রহণ করিতে হইতেছে। আশা করি 'ভারত' কথাটির ব্যবহার করায় আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। আমি উহার দ্বারা পাকিস্তান ও ভারত উভয়কেই বুঝাইতেছি। এই বিভাগকে কৃত্রিম বিভাগ বলিয়াই আমি মনে করিতে চেষ্টা করিব। আমি ভারতের সেবা করিব।"

শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন,

"আমি ভারতের এই দুইজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের নিকট হইতে মাতৃভূমির সেবায় নিঃস্বার্থ কর্মের প্রেরণা লাভ করিয়াছি। ...

আমি তাঁহাদের নিকট হইতে এই মহান সত্য শিক্ষা করিয়াছি যে, ভারতীয় হিসাবে আমরা দল এবং সাম্প্রদায়িক বিবেচনার ঊর্ধ্বে।"

গ্রান্ড হোটেলের সুপ্রশস্ত হলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁকে ৪ঠা মে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এখানে তিনি বাংলায় ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পূর্ববঙ্গে বঙ্গভাষার জন্য উৎসাহ বেশি। এমনকি, বঙ্গভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করার জন্য পূর্ববঙ্গে একটি ক্ষুদ্র শিশুও প্রাণ বিসর্জন দিতে

প্রস্তুত। আসুন, আমরা রাজনীতি ভুলে গিয়ে আমাদের মহান সংহতির ধারক শ্রেষ্ঠ ভাষার ঐতিহ্যের কথা চিন্তা করি। ...

বাংলার মঙ্গল, বাংলা ভাষার সেবা, বাঙ্গালী জাতির উন্নতি ও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনসাধারণের সেবায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি নিয়োজিত করাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।''

তিনি সেদিন আরো বলেছিলেন, ''দুই বাংলার মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই। এই কৃত্রিম সীমারেখা আমি মানি না।''

সত্যেন্দ্রনাথ বসু



১৯০২খ্রিঃ থেকে ১৯০৮খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলায় যে বিপ্লবী ক্রিয়াকর্ম চলে তার একজন প্রধান কর্মী ও নেতা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

১৮৮২ খ্রিঃ ৩০শে জুলাই মেদিনীপুরে সত্যেনের জন্ম। তাঁর পিতার নাম অভয়চরণ বসু। ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সত্যেনের জ্যেঠামশায়। মায়ের নাম তারাসুন্দরী বসু।

ছেলেবেলা থেকেই সত্যেনের স্মৃতি-শক্তি ছিল খুব প্রখর। ছয় বছর বয়সে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়েছিল মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে। এখানে প্রতি বছরই পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানটি ছিল তাঁর বাঁধা।

সত্যেনের চরিত্রে শৈশব অবস্থা থেকেই যে সব গুণ প্রকাশ পেয়েছিল তা হল, চরিত্রবল, অমায়িক ব্যবহার, মনোবল ও সত্যবাদিতা। তাঁর অকপট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হতেন।

১৮৯৭খ্রিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে মেদিনীপুর কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৯খ্রিঃ এই কলেজ থেকেই এফ.এ পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর কলকাতায় এসে সিটি কলেজে বি.এ ক্লাসে ভর্তি হন।

কলকাতায় পড়াশুনা করবার সময়েই সত্যেন একবার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁর মা তাঁকে নিয়ে কিছুদিন ওয়ালটেয়ারে থেকে ১৯০২খ্রিঃ মেদিনীপুরে ফিরে আসেন।

এই বছরেই মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনো সেখানে দীক্ষা ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা ছিল না। বরোদা থেকে অরবিন্দ মেদিনীপুর আসেন

১৯০২খ্রিঃ শেষ দিকে। তিনিই প্রথম গুপ্ত সমিতির কয়েকজনকে দীক্ষা দেন। সত্যেন ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

অরবিন্দ ছিলেন সম্পর্কে সত্যেনের ভাগনে—রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র।

কিছুদিনের মধ্যেই মেদিনীপুরের মিঞা বাজারের একটি বাড়িতে কুস্তির আখড়া খোলা হয়। সেখানে বিপ্লবীদের লাঠিখেলা, তরবারি চালনা, সাইকেল চড়া, ঘোড়ায় চড়া, বক্সিং, বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত।

এই আখড়া উদ্বোধনের দিনে উপস্থিত ছিলেন ভারত হিতৈষিণী স্বনামধন্য ভগিনী নিবেদিতা। তিনি আখড়ার যুবকদের উৎসাহিত করবার জন্য বিপ্লব সম্পর্কিত বেশ কিছু বই-ও দান করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আখড়ার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা।

১৮৯৯ খ্রিঃ এফ.এ পরীক্ষায় পাশ করবার আগের বছরেই সত্যেনের পিতৃবিয়োগ হয়েছিল। তিনি যখন গুপ্ত সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, সেই সময় তাঁদের সাংসারিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। তাই তিনি খড়্গপুরে কেল্‌নার কোম্পানির হোটেলে কেরানীর চাকরি গ্রহণ করেন।

চাকরি করবার সময় সত্যেন স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লববাদের প্রচার করতে থাকেন। বেশ কিছু উৎসাহী তরুণ তাঁর বিশেষ সহকর্মী হয়ে ওঠেন। তিনি তাদের চরিত্রগঠনে সাধ্যমত সাহায্য করতেন।

এই সময় সত্যেন নানা প্রকার রাজনৈতিক পুস্তক, ইতিহাস, সাময়িক পত্রাদি পড়তেন, অন্যদেরও পড়াতেন এবং সেই সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

১৯০৫খ্রিঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে সত্যেন্দ্রনাথ কেলনার কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে মেদিনীপুরের কালেকটরিতে করনীকের চাকরি নেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে গুপ্তসমিতির বিপ্লবীদের উৎসাহ ও কর্মপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সত্যেন্দ্রনাথ এই সময় মেদিনীপুরে একটি ঘরভাড়া নিয়ে আড্ডা খোলেন। এই আড্ডার নাম দেন তাঁতশালা। একটা তাঁতে সব সময়ই একখানা কাপড় প্রস্তুত অবস্থায় এখানে দেখা যেত।

কিছুদিন পরেই আলিপুর বোমার মামলার অভিযুক্ত আসামী নিরাপদ রায় ওরফে নির্মল রায়, বিভূতিভূষণ সরকার এখানে এসে জোটেন। তারপর আসেন মেদিনীপুর থেকে ক্ষুদিরাম ও শচীন। তাঁতশালা বেশ গুলজার হয়ে ওঠে।

কোথায় কোন বিলিতি কাপড়ের দোকানে আগুন লাগাতে হবে, স্বদেশী-প্রচারের বিরোধী কাউকে কিভাবে শায়েস্তা করা হবে, শহরের বাইরে কোন হাটে পিকেটিং করতে হবে, কিংবা বিলিতি মাল-বোঝাই নৌকা কোথায় ডুবিয়ে দিতে হবে—এই ধরনের নানাপ্রকার কাজের আলোচনা এই তাঁতশালায় হত। সত্যেন্দ্রনাথই ছিলেন একাধারে মন্ত্রণাদাতা, উদ্যোক্তা, আর সকল কাজের অগ্রণী নেতা।

১৯০৭খ্রিঃ মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। তার সমস্ত আয়োজনের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। কর্মীসভা ডাকা, চাঁদা সংগ্রহ করা, স্বেচ্ছাসেবক দল সংগঠন, মন্ডপ প্রস্তুত, ডেলিগেটগণের অভ্যর্থনার আয়োজন ইত্যাদি সব কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব ছিল সত্যেন্দ্রনাথের ওপর।

আগের বছরেই ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুরে কৃষিশিল্প প্রদর্শনী খোলা হয়। সেই সময় সোনার বাংলা নামে একটি পাম্পলেট বিলি করায় ক্ষুদিরাম প্রথম রাজনৈতিক অভিযোগে অভিযুক্ত হন। এই প্রদর্শনীর সহকারী সেক্রেটারি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ এবং তিনিই সোনার বাংলা পুস্তিকাটি বার করেন।

ক্ষুদিরাম পুলিশের হাতে ধরা পড়লে সত্যেন্দ্রনাথই ধমকে তাঁকে ছাড়িয়ে নেন। সেইসময়ে তিনি কালেকটরিতে কেরাণীর চাকরি করেন। পুলিশকে তিনি বলেন, ক্ষুদিরাম ডেপুটির ছেলে, তাকে গ্রেপ্তার করলে বিপদ হবে। পুলিশ ক্ষুদিরামকে ছেড়ে দেয় বটে, পরে নিজের ভুল বুঝতে পারে।

সত্যেন্দ্রনাথের নামে মোকদ্দমা হয় এবং তিনি তাঁর চাকরিটি খোয়ান।

পরে অবশ্য মোকদ্দমা তুলে নেওয়া হয়। আর চাকরি থেকে বিমুক্ত হয়ে সত্যেন স্বদেশের কাজে পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

এরপরেই মজঃফরপুরের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। জজসাহেব কুখ্যাত কিংসফোর্ডকে মারার জন্য কলকাতার গুপ্ত সমিতি থেকে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে পাঠানো হয়।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়ি ভুল করে দুই তরুণ বিপ্লবী কিংসফোর্ডের পরিবর্তে মিসেস ও মিস কেনেডিকে বোমা মেরে হত্যা করে বসেন।

এরপর ক্ষুদিরাম ওয়াইনি স্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দেন।

আর প্রফুল্ল কালকাতার পথে মোকামা ঘাটে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে নিজের পিস্তলে আত্মহত্যা করেন।

ক্ষুদিরামের জবানবন্দী থেকে পুলিশ কলকাতার বিপ্লবীদের গোপন আস্তানাগুলির সন্ধান পেয়ে সেখানে থেকে প্রায় সকল কর্মীকেই গ্রেপ্তার করে। এরপরেই শুরু হয় মুরারী পুকুরের ষড়যন্ত্র মামলা ও আলিপুরের বোমার মামলা।

এই মামলার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যোগাযোগ আবিষ্কার করে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে প্রথমে মেদিনীপুর জেলে রাখা হয়, পরে সেখান থেকে আলীপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

আলিপুর জেলে এসেই সত্যেন্দ্রনাথ নরেন গোঁসাই এব রাজসাক্ষী হবার কথা জানতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই বিশ্বাসঘাতক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেন।

মজঃফরপুর বোমা বিস্ফোরণের পরে কলকাতা থেকে একে একে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অরবিন্দ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম দাস.

নরেন গোঁসাই, সত্যেন বসু, কানাইলাল দত্ত প্রভৃতি সহ আরো অনেককে। শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক মানিকতাল বোমার মামলা।

নরেন গোঁসাই বিশ্বাসঘাতকতা করে গোপনে পুলিশের কাছে গোপনে স্বীকারোক্তি করে রাজসাক্ষী হয়েছে মুক্তির লোভে। পরপর ছয়দিন বিবৃতি দিয়ে পুলিশকে সে কিছুই বলতে বাকি রাখেনি।

ফলও ফলল শিগগিরিই। বিপ্লবীদের অন্যান্য সঙ্গীরাও ধরা পড়তে লাগলেন। চন্দননগর কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়, ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিলরঞ্জন রায়, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ দাস, বিজয় ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু সহ আরো অনেকেরই ঠাঁই হল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

নরেন সম্পর্কেও পুলিশ যথেষ্ট সর্তকতা অবলম্বন করেছে। বন্দী বিপ্লবীদের মধ্য থেকে তাকে সরিয়ে রাখার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতালের এক ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে। তাকে পাশে থেকে প্রহরা দিচ্ছে শ্বেতাঙ্গ প্রহরী হিগিনস ও একজন শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডার।

জেলে এসেই অসুখের ভান করে প্রথম থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ হাসপাতালে থাকার বন্দোবস্ত পাকা করে নিয়েছিলেন। তিনি হাঁপানী রোগী সেজেছেন। এখানে এসেই নরেন গোঁসাই-এর খবরটা পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তও স্থির হয়ে গেল। তা জানালেন একমাত্র প্রবীণ বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাসকে।

পরিকল্পনা মত বাইরে থেকে একদিন রিভলবার গোপনে এসে পৌঁছল সত্যেনের হাতে। কিন্তু সেটা পছন্দ হল না। যেমন বেয়াড়া সাইজ তেমনি পুরনো মডেল। নতুন মডেলের একটা ভাল জিনিস চাই।

দিন কয়েকের মধ্যে তা-ও এসে গেল জেলের ভেতরে। একটা ভাল কাপড়ে মুড়ে কানাইলালের হাতে সেটা পৌঁছে দেওয়া হল। বলেছেন, সত্যেন অসুস্থ। এই ফলমূলগুলো পৌঁছে দাও তার কাছে।

কানাই সত্যেনের মতলবের কথা কিছুই জানতেন না। তবে নরেন গোঁসাই-এর কথা তাঁর অজানা ছিল না।

নরেনকে ছেলেদের কেউই সহ্য করতে পারত না। সুশীল সেন নামে একজন যে নরেনকে গলাটিপে অথবা ইঁটের আঘাতে হত্যা করার সঙ্কল্প নিয়েছিল তা-ও তাঁর অজানা ছিল না। কৃষ্ণজীবন নামে একটি ছেলে তো একদিন নরেনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে একটি লাথিই বসিয়ে দিয়েছিল।

তারপরেই জেল কর্তৃপক্ষ নরেনকে হাসপাতালে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তার জন্য সেখানে পাহারায় মোতায়েন হয়েছে ইউরোপীয়ান প্রহরী হিগিনস ও একজন শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডার।

সত্যেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিশ্বাসঘাতক নরেনকে খতম করবেন। তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে কানাইও তাঁর সঙ্গী হলেন। স্থির হল, দুজনে মিলেই এই নরেন-নিধন যজ্ঞ সম্পন্ন করা হবে।

১লা সেপ্টেম্বর মামলার তারিখ। ওই দিন নরেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক বিবৃতি দেবে বলে জানিয়েছে। সত্যেন স্থির করলেন সেই বিবৃতি দেবার আগেই নরেনকে শেষ করতে হবে।

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে বেশ জামাই আদরে রয়েছে নরেন। তার একমাত্র কাজ সত্যেনকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাজসাক্ষী হিসেবে তৈরি করা। সেই কাজেই সে সেদিন সকালে এসেছে সত্যেনের কাছে।

তার আগেই কানাই পেটের যন্ত্রণার অছিলায় হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

কাগজকলম নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন সত্যেন। নরেন আসতেই তিনি নিরিবিলি তার সঙ্গে কথাবলার ওজর দেখিয়ে হিগিনসকে তার সঙ্গীসহ বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।

এবারে শুরু হল দুজনের কথাবার্তা। নরেন জানাল, তার বাবা মামলার পোকা। তিনি তাকে জানিয়েছেন, সব কথা খুলে বললেই সে খালাস পেয়ে যাবে। এরপর সে সোজা চলে যাবে বিলেত।

সত্যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জামার পকেটে হাত রেখে বললেন, বিলেত না গিয়ে আর কোথাও গেলে হয় না!

নরেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, আর কোথায় যাব?

—কেন, যমের বাড়ি।

বলতে বলতেই সত্যেন পকেট থেকে রিভলভার বার করে গুলি করলেন নরেনকে।

গুলিটা লক্ষভ্রষ্ট হয়ে উরুতে লেগেছিল। আর্তনাদ করে উঠে নরেন উরু চেপে ধরে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সত্যেন তাকে দ্বিতীয় গুলি করবার সুযোগ পেলেন না।

পরিকল্পনা মত কানাই তখন নিচে হাসপাতালের বারান্দায় ছিলেন। গুলির শব্দ কানে যেতেই তিনি দোতলার দিকে ছুটলেন। হাতে তাঁর উদ্যত রিভলভার।

সত্যেনের হাত থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নেবার জন্য হিগিনস ধস্তাধস্তি শুরু করেছিল। কানাই ওপরে গিয়ে দ্বিতীয় প্রহরীটিকে ধমকে নরেনের পলায়নের পথ জেনে নিলেন।

উন্মত্তের মত ছুটে গিয়ে নাগাল ধরে ফেললেন কানাই। দ্রাম। দ্রাম। দ্রাম।

গুলিবিদ্ধ হয়ে নর্দমায় আছড়ে পড়ল নরেন বেপরোয়া ও মরীয়া কানাই রিভলভারের সবকটা গুলিই নিঃশেষ করে তারপরে নিশ্চিন্ত হলেন।

যথারীতি জেলের পাগলা ঘন্টি বাজল। সেপাই শান্ত্রীর দল বেরিয়ে পড়ল। সরকারের দুর্ভেদ্য কারাগারের ভেতরে বিপ্লবীরা যে এমন সংঘাতিক কান্ড ঘটিয়ে বসবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

বন্দি হলেন সত্যেন ও কানাই। আলিপুরে দায়রা জজ মিঃ এফ.আর.রো-এর আদালতে শুরু হল মামলা। তাদের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ, জেলের ভেতরে সরকারী সাক্ষী নরেন গোস্বামীকে হত্যার চেষ্টা।

সত্যেনের পক্ষে আইনজীবী নিযুক্ত হলেন ব্যারিস্টার এ.সি.ব্যানার্জী ও উকিল নরেন্দ্রকুমার বসু।

আবার সেই বিচারের প্রহসন। যথারীতি সত্যেন ও কানাই-এর হল প্রাণদন্ডের হুকুম। সত্যেনের ফাঁসির দিন ধার্য হল ২১শে নভেম্বর ভোর পাঁচটায়।

ফাঁসির দিন নির্দিষ্ট হবার পরে সত্যেনের সঙ্গে অনেকেই দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর ভগ্নী সুরবালা দেবী সাক্ষাৎ করতে গেলে সত্যেন মায়ের উদ্দেশে তাঁকে বলেছিলেন—

"সুবোধ (ছোটভাই) স্বেচ্ছায় আমেরিকায় গিয়েছে, তাঁর (মায়ের) ধন তাঁরই আছে। কিন্তু চর্মচক্ষে তিনি আর তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। সেইরূপ আমিও অত্যন্ত ইচ্ছা ও আগ্রহের সঙ্গে নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক হৃদয়ে অন্য এক ধামে যাচ্ছি। আমি সেখানেও তাঁরই থাকব। কেবল আমার দেহ থাকবে না। অতএব তিনি যেন আমার জন্য খেদ না করেন। তাঁকে ভেবে দেখতে বলো, আমার আত্মাকে বিনাশ করার কারও সাধ্য নেই।"

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের পাতায় ১৯০৮ খ্রিঃ ২১শে নভেম্বর দিনটি রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা রয়েছে। বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষী এক মহা প্রাণ সেদিন মাতৃমুক্তির বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল।

১৯০২ খ্রিঃ সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশ-মুক্তির যে কঠোর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন সে ব্রত তাঁর উদযাপন হয় ফাঁসির মঞ্চে।

এবারে আর ভুলের পুনরাবৃত্তি করলেন না ইংরাজ শাসক। তাঁর শবদেহ জনতার হাতে তুলে না দিয়ে নিজেরাই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে।

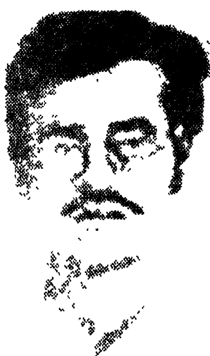
কেবল মাত্র দশজন আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সত্যেনের চিতাভস্ম পর্যন্ত বাইরে আনতে দেওয়া হয়নি।

এ.সি.রায় বলে এক ভদ্রলোক সত্যেনের শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সত্যেনের কয়েকজন আত্মীয় সহ বন্ধুও ছিলেন।

সত্যেনের ফাঁসি হয়ে যাবার পর একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিস সুপারিন্টেন্ডন্ট তাঁদের নিকটে এসে বললেন, "You can go now. The thing is over. Satyendra died bravely. Kanai was brave, but Satyendra was braver."

সেই সময় পার্শ্ববর্তী একজন সার্জেন্ট জানালেন, "When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake. When said, Satyendra, be ready, he answered, well, I am quite ready and smiled. He steadily walked to the gallows. He mounted it bravely and bare it all cheerfully—a brave lad."

কানাইলাল দত্ত



বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের জন্ম ১৮৮৮ খ্রিঃ ৩১শে আগস্ট চন্দননগরে। তাঁর পিতার নাম চুনিলাল দত্ত।

শৈশবে বোম্বাইয়ে, পরে চন্দননগরে ডুপ্লে বিদ্যামন্দিরে ও হুগলী মহসীন কলেজে শিক্ষালাভ করেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েই তিনি বিলাতি বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে বিপ্লবী দলের মুখপত্র যুগান্তর পত্রিকার পরিচালক চারুচন্দ্র রায়ের কাছে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন।

বি.এ পরীক্ষার পরেই কানাইলাল কলকাতার গুপ্ত বিপ্লবী দলের কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

১৯০৮খ্রিঃ মানিকতলা বোমা মামলায় অস্ত্র আইনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন।

কানাইলাল ছিলেন নিরলস কর্মী। যেমন মেধাবী তেমনি বিশ্বস্ত।

এবারে কিন্তু হাসপাতালের দিকে যেতে যেতে একটা আবিষ্কার করে ফেললেন কানাই।

ফলের পুঁটলিটা কেমন অস্বাভাবিক রকমের ভারি ঠেকছে সন্দেহ হতেই নতুন কাপড়ের ঢাকনা খানিকটা সরালেন।

তারপরেই চমকে উঠলেন, সেই সঙ্গে উল্লসিতও। একটা আস্ত আধুনিক রিভলবার। বুঝতে পারলেন, তাঁকে বাদ দিয়েই কিছু প্ল্যান করা হচ্ছে। কিন্তু তা তো হতে দেওয়া যায় না। দেশের কাজে কানাইয়ের অংশ থাকবে না—এ কী করে হয়?

সত্যেনের কাছে এসেই ধরে পড়লেন কানাই। তাঁকে বলতে হবে সব ঘটনা। এড়ানো গেল না তাঁকে। বাধ্য হয়েই সত্যেনকে সব ঘটনা খুলে বলতে হল। শুনে কানাই বললেন, আমাকেও সঙ্গে নিতে হবে।

সত্যেন তাঁকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তাঁর নিজের হাতে গড়া ক্ষুদিরাম চলে গেছে, প্রফুল্লও গেছে।

এবারে তাঁকেও যেতে হবে। তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্য থাকবে কানাইলাল আর অন্যান্য বিপ্লবীরা।

কিন্তু কানাইলাল কোন কথাই শুনলেন না। জেদ ধরে বসলেন, তিনিও সঙ্গে থাকবেন।

অগত্যা রাজী হতে হল সত্যেনকে। তিনি জানালেন, সামনের পয়লা সেপ্টেম্বর মামলার তারিখ। ওইদিন নরেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবৃতি দেবে। তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হবে না; তার আগেই শেষ করে ফেলতে হবে।

কানাই তো উল্লাসে আত্মহারা। কিন্তু নরেনকে নাগালে পাওয়া যাবে কি করে?

সত্যেন জানালেন, নরেন রয়েছে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে। একেবারে জামাই আদরে। সদাসতর্ক প্রহরী হিগিনস রয়েছে তার প্রহরায়। এর মধ্য থেকেই কাজ হাসিল করতে হবে।

অস্ত্র এসে গেছে হাতে। এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে ফাঁদ পাতলেন সত্যেন। তিনি নরেনকে খবর পাঠালেন জেলের টানা-হ্যাঁচড়া আর সহ্য হচ্ছে না। তিনিও রাজসাক্ষী হতে রাজি—ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার সঙ্গেই বিবৃতি দেবেন।

গোঁসাই খবরটা ওপরওয়ালা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল। তারা সত্যেনের ইচ্ছা অকৃত্রিম কিনা যাচাই করে খুশি হয়ে তাঁর রাজসাক্ষী হবার আর্জি মঞ্জুর করল।

পুলিশের নির্দেশে নরেন এবার সত্যেনকে উপযুক্তভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার দায়িত্ব পেল। সে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড থেকে হাসপাতালে এসে এসে সত্যেনকে তালিম দিতে লাগল।

বিপ্লবীদের বিশ্বাস নেই, তারা কখন কি করে বসে। সেই কারণে নরেন যখন হাসপাতালে সত্যেনের কাছে আসত, তার সঙ্গে প্রায়ই থাকত হিগিনস ও লিন্টন নামে দুজন শ্বেতাঙ্গ।

দিনের পর দিন হাসপাতালে ডেকে এনে সত্যেন নরেন গোঁসাইয়ের সঙ্গে দিব্যি খাতির জমিয়ে তুললেন। নরেনের উৎসাহের অন্ত নেই। সত্যেনের মত লোক যদি Carrobarator রূপে অপরাধ স্বীকার করে তাহলে আর তার ভাবনা কি। দন্ড মকুব তো হবেই তার, চাই কি সপরিবারে বিলাত গিয়ে রাজার হালে দিন কাটাতেও পারবে।

সত্যেনের সঙ্গে নরেনের সাক্ষাৎ ক্রমে নিয়মিত হয়ে উঠল। নরেন আগের দিন সত্যেনকে যা যা শিখিয়ে পড়িয়ে যায়, যেভাবে কথা বলতে বলে যায়, পরদিন সত্যেন সব উল্টেপাল্টে খিচুড়ি পাকিয়ে তাকে শোনান।

কিন্তু এমন হলে তো চলবে না। দুজনের বিবৃতির সঙ্গতি থাকতে তো হবে। এ

জন্য নরেন তার বিবৃতি বারবার সত্যেনকে পড়ে শোনায়। সতর্ক হতে উপদেশ দেয়।

সত্যেনও গভীর মনোযোগের ভান করে ভাল করে শেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর মনে থাকে না।

শেষ পর্যন্ত দুর্বল স্মরণশক্তির অছিলা তুলে তিনি লিখিত এজাহার আদালতে পড়ে শোনাবার অনুমতি চান। পুলিশের কর্তা তাঁর আবেদন সানন্দে মঞ্জুর করেন।

এতদিন ছিল শোনার পালা। এবারে শুরু হলো সত্যেনের লেখার পালা। রোজ একটু একটু করে এজাহার লেখা হতে থাকে।

আগস্ট মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত সত্যেনের খেলা এভাবেই চলতে থাকে। পরের দিন ১লা সেপ্টেম্বর। সেদিন দেবব্রত, ইন্দ্রনাথ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আটজনের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী নরেনের জবানবন্দী দেবার কথা।

সত্যেন্দ্রনাথ নরেনের কাছে জানতে পারেন, আরও অনেক নতুন নাম সেদিন প্রকাশ হবে। ফলে দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ধৃত হবেন। বিপ্লবীদের কাজের মেরুদন্ড এর ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে।

সত্যেন এই দিনটির প্রতীক্ষাতেই রয়েছেন। কানাইলালের সঙ্গে পরামর্শ হয়ে যায় তাঁর। নরেনকে নিকেশ করার চেষ্টা আগে তিনি করবেন। কোন কারণে তা ব্যর্থ হলে কানাইলাল চেষ্টা করবেন।

কাজটা সারা হবে ডিস্পেনসারীর মধ্যে। সেখানেই সত্যেন নরেনকে ডেকে আনবেন। কানাই ডিস্পেনসারীর বারান্দায় থাকবেন। দাঁত মাজার অছিলায়। সশস্ত্র অবস্থাতেই থাকবেন। যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল যে হত্যার পরিকল্পনা পাকা করলেন, তার সম্পর্কে কয়েকটি কথা জানা দরকার।

নরেন গোঁসাই ছিল শ্রীরামপুরের জনৈক ধনী জমিদারের আদরের দুলাল। ফলে যৌবনে যতটা দুর্নীতিপরায়ণ হওয়া সম্ভব তার কিছুই তার বাকি ছিল না।

বখাটেগিরি করতে করতেই তার স্বদেশী হওয়ার বাসনা জাগে। ১৯০৬খ্রিঃ গোড়ার দিকে সে রামদাস মুখোপাধ্যায় ও বাঁকুড়ার সুরেন ব্যানার্জীর চিঠি নিয়ে কলকাতায় যুগান্তর অফিসে এসে চেষ্টাচরিত্র করে বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং দলভুক্ত হয়।

অরবিন্দ তাঁর কারাকাহিনীতে নরেন গোঁসাই সম্পর্কে লেখেন "গোঁসাইয়ের কথা নির্বোধ ও লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হলেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। তাঁহার তখন বিশ্বাস ছিল যে, তিনি খালাস পাইবেন। তিনি বলিতেন, আমার বাবা মোকদ্দমার কীট, তাঁহার সঙ্গে পুলিস কখনো পারিবে না। আমার এজাহার ও আমার বিরুদ্ধে যাইবে না, প্রামাণিক হইবে পুলিশ আমাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া এজাহার করাইয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি পুলিসের হাতে ছিলে সাক্ষী কোথায়?"

গোঁসাই অম্লানবদনে বলিলেন, "আমার বাবা কতশত মোকদ্দমা করিয়াছেন, এসব বেশ বোঝেন। সাক্ষীর অভাব হইবে না। এইরূপ লোকই approver হয়!.....

অন্য বালকদের ন্যায় তাঁহার শান্ত ও শিষ্ট স্বভাব ছিল না। তিনি সাহসী, লঘুচেতা এবং চরিত্রে, কথায় কর্মে অসংযত ছিলেন। ধৃত হইবার কালে নরেন গোঁসাই তাঁহার স্বাভাবিক সাহস ও প্রগল্‌ভতা দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু লঘুচেতা বলিয়া কারাবাসের যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ ও অসুবিধা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল।

তিনি জমিদারের ছেলে, সুতরাং সুখে বিলাসে, দুর্নীতিতে লালিত হইয়া কারাগৃহের কঠোর সংযম ও তপস্যায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন আর সেইভাব সকলের নিকট প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যে কোন উপায়ে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার উৎকট বাসনা তাঁহার মনে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। প্রথম তাঁহার এই আশা ছিল যে নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন যে পুলিস তাঁহাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া দোষ স্বীকার করাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট জানাইলেন যে তাঁহার পিতা সেইরূপ মিথ্যাসাক্ষী জোগাড় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনেই আর একভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার পিতা ও একজন মোক্তার তাঁহার নিকট জেলে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, শেষে ডিটেকটিভ শামসুল আলমও তাঁহার নিকট আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গোপনে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। এই সময়ে হঠাৎ গোঁসাইয়ের কৌতূহল ও প্রশ্ন করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল বলিয়া অনেকের সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারতবর্ষের বড় বড় লোকের সহিত তাঁহাদের আলাপ বা ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা, গুপ্ত সমিতিকে কে কে আর্থিক সাহায্য দিয়া তা পোষণ করিয়াছিলেন, সমিতির লোক বাহিরে বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কে কে ছিল, কাহারা এখন সমিতির কার্য চালাইবেন, কোথায় শাখা-সমিতি রহিয়াছে ইত্যাদি অনেক ছোট-বড় প্রশ্ন বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রকে করিতেন।

গোঁসাই-এর এই জ্ঞানতৃষ্ণার কথা অচিরাৎ সকলের কর্ণগোচর হইল এবং শামসুল আলমের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কথাও আর গোপনীয় প্রেমালাপ না হইয়া Clean Secret হইয়া উঠিল।

ইহা লইয়া অনেক আলোচনা হয়, এবং কেহ কেহ ইহাও লক্ষ্য করে যে এইরূপ পুলিস দর্শনের পরই সর্বদা নব নব প্রশ্ন গোঁসাইয়ের মনে ফুটিত। বলা বাহুল্য, তিনি এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পান নাই।

যখন প্রথম প্রথম এই কথা আসামীদের মধ্যে রাষ্ট্র হইতে লাগিল, তখন গোঁসাই স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন যে পুলিস তাঁহার নিকট আসিয়া রাজার সাক্ষী হইবার জন্য তাঁহাকে নানা উপায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমাকে কোর্টে

একবার এইকথা বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি কি উত্তর দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি কি শুনিব! আর শুনিলেও আমি কি জানি যে তাঁহাদের মনের মত সাক্ষী দিব?"

তাহার কিয়ৎদিন পরে আবার যখন এই কথা উল্লেখ করিলেন, তখন দেখিলাম ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াইয়াছে! জেলে Identification parade-এর সময় আমার পার্শ্বে গোঁসাই দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেন, পুলিশ কেবলই আমার নিকটে আসে। আমি উপহাস করিয়া বলিলাম, আপনি এই কথা বলুন না কেন যে সার আন্দ্রু ফ্রেজার গুপ্ত সমতিরি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

গোঁসাই বলিলেন, সেই ধরনের কথা বলিয়াছি বটে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আমাদের head এবং তাঁহাকে একবার বোমা দেখাইয়াছি।

আমি স্তম্ভিত হইয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কথা বলিবার প্রয়োজন কি ছিল?

গোঁসাই বলিলেন, আমি .ওদের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িব। সেই ধরনের আরও অনেক খবর দিয়াছি। বেটারা carroboration খুঁজিয়া মরুক। কে জানে এই উপায়ে মোকদ্দমা ফাঁসিয়াও যাইতে পারে।

ইহার উত্তরে আমি কেবল বলিয়াছিলাম, এই নষ্টামি ছাড়িয়া দিন। উহাদের সঙ্গে চালাকি করিতে গেলে নিজে ঠকিবেন।

জানিনা, গোঁসাইয়ের এই কথা কতদূর সত্য ছিল। আর সকল আসামীদের এই মত ছিল যে আমাদের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য তিনি এই কথা বলিয়া ছিলেন। আমার বোধ হয় যে তখনও গোঁসাই approver হইতে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় হন নাই, তাহার মন সেই দিকে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল সত্য। কিন্তু পুলিসকে ঠকাইয়া তাঁহাদের কেস মাটি করিবার আশাও তাঁহার ছিল।

চালাকি ও অসদুপায়ে কার্যসিদ্ধি দুষ্প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রেরণা। তখন হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, গোসাই পুলিসের বশ হইয়া সত্যমিথ্যা তাঁহাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা বলিয়া নিজে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিবেন।

একটি নীচ স্বভাবের আরও নিম্নতর দুষ্কর্মের দিকে অধঃপতন আমাদের চক্ষের সম্মুখে নাটকের মত অভিনীত হইতে লাগিল। আমি দিন দিন দেখিলাম, গোঁসাইর মন কিরূপে বদলাইয়া যাইতেছে, তাঁহার মুখ, ভাবভঙ্গী, কথাবার্তারও পরিবর্তন হইতেছে।

তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার সঙ্গীদের সর্বনাশ করিবার যোগাড় করিতেছিলেন, তাহার সমর্থনের জন্য নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তি বাহির করিতে লাগিলেন। এমন interesting psychological study প্রায় হাতের নিকট পাওয়া যায় না।"

১৯০৮ খ্রিঃ ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার দিন সকালে সত্যেনের আহ্বানে নরেন এসেছিল হাসপাতালে। সেই সময় তার প্রহারায় ছিল হিগিনস ও লিন্টন নামে দুই শ্বেতাঙ্গ প্রহরী।

সত্যেন্দ্র দোতলায় ডিসপেনসারীর মধ্যে একটি বেঞ্চিতে বসেছিলেন। কানাই দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন।

নরেনকে দেখেই কানাই বারান্দায় চলে যান। তিনি দাঁত মাজার ভান করে অপেক্ষা করতে থাকেন। কান সজাগ রাখেন ঘরের দিকে। ঘরের ভেতরে দুচার কথার পরেই সত্যেন নরেনকে গুলি করেন। গুলি উরুতে বিদ্ধ হয়।

বাপরে বলে আর্তনাদ করেই নরেন ঘর থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসে। হিগিনস ছুটে যায় সত্যেনকে ধরতে।

ধস্তাধস্তিতে হিগিনসের মণিবন্ধে গুলি লাগে। সে সত্যেনকে ছেড়ে দিয়ে নরেনের অনুসরণ করে।

কানাই নরেনকে পালাতে দেখেই বিপুল বিক্রমে তার পশ্চাদ্ধাবন করেন।

হাসপাতালের গেট পার হয়ে নরেনের কাছাকাছি পৌঁছে কানাই দ্রাম। দ্রাম। গুলি চালাতে থাকেন। গুলি খেয়ে নরেন সেখানেই স্নানঘরের পাশে নর্দমার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান।

এই সময় নরেনের দেহরক্ষী শ্বেতাঙ্গ কয়েদী লিন্টন কানাইকে ধরতে গেলে তার গুলিতে লিন্টনের কপালের চামড়া ছড়ে যায়। সে সভয়ে পিছিয়ে পড়ে। এই সুযোগে কানাই নরেনকে আর একবার গুলিতে বিদ্ধ করেন।

সত্যেনও এগিয়ে আসেন। দুজনে শেষ গুলিটি পর্যন্ত নরেনের ওপর বর্ষণ করেন। সব মিলিয়ে তাঁরা নয়টি গুলি ছোঁড়েন। তার মধ্যে চারটি নরেনের শরীরে বিদ্ধ হয়।

এরপর জেলের পাগলা ঘন্টি ভোম্বা (whistle) বেজে ওঠে। সশস্ত্র পুলিস সৈন্যরা এগিয়ে এসে সত্যেন ও নরেনকে বন্দি করে।

মামলায় সত্যেন নিজের পক্ষে উকিল দিলেও কানাই কোন উকিল দিলেন না। কয়েদীর পোশাকেই মামলা চলাকালীন তিনি আদালতে হাজির হতেন। সাফ সাফ বলতেন, আমিই মেরেছি নরেনকে। ঘটনাচক্রে সত্যেন কাছে থাকলেও এ ব্যাপারে তার কোন অংশ ছিল না। আমি একাই মেরেছি।

মামলা চলেছিল আলিপুরের দায়রা জজ মিঃ এফ.আর রো-এর আদালতে।

মিঃ রো কানাইকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি রিভলভার পেলে কোথায়?

কানাইলাল হেসে জবাব দিয়েছিলেন, কে দিয়েছে! দিয়েছে ক্ষুদিরামের আত্মা।

—সরকারী খরচে কোন উকিল রাখতে চাও?

—ধন্যবাদ। তার কোন প্রয়োজন নেই।

বিচারে কানাইয়ের সাজা হল প্রাণদন্ড। হাইকোর্টও এই দন্ড বহাল রাখলেন।

কারাগারে কানাই গানে গল্পে মশগুল হয়ে থাকতেন। তাঁর ওজন বেড়েছিল ১৬ পাউন্ড। এ ছিল এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। মৃত্যুদন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর মনে যে মৃত্যু সম্পর্কে কোন বিকার ছিল না এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে।

জেলখানায় কানাইলালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তাঁর অশ্রুমুখী মা।

কানাই হাসি-উদ্ভাসিত মুখে তাঁকে বলেছিলেন, 'এতদিন তুমি ছিলে আমার মা। আর আজ, আজ তুমি সারা বাংলাদেশের মা। একি কম ভাগ্যের কথা।

১৯০৮ খ্রিঃ ১০ই নভেম্বর ফাঁসির দিন ধার্য হয়েছিল। রাত শেষ হবার আগেই হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জু গলায় পড়ে বীরের মৃত্যু বরণ করলেন কানাইলাল।

সেদিন জেল-গেটের বাইরে এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। বীর কানাইকে শেষবারের মত একবার দেখে ধন্য হবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ।

একসময় শবদেহ বাইরে নিয়ে আসা হল। অবিরাম শঙ্খধ্বনির সঙ্গে শুরু হল মহিলাদের লাজ বর্ষণ।

হাজার হাজার মানুষ শবানুগমন করল। শোকযাত্রা অগ্রসর হতে থাকল কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে।

সেদিন শিশু-বৃদ্ধ, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী নির্বিশেষে পুষ্পবর্ষণ করেছেন শবদেহ। কানাইয়ের স্পর্শধন্য সেই পুষ্প দেবতার প্রসাদী ফুল রূপে সংগ্রহ করে কপালে ছুইয়েছেন কানাইয়ের দেশবাসী।

কালীঘাটের পূজারী ব্রাহ্মণগণ মায়ের প্রসাদী ফুলের মালা এনে দিয়েছিলেন আমাদের পাগলী মায়ের পাগল ছেলের শবদেহে। এ মালা কানাই ছাড়া আর কাকে মানায়।

অনন্ত সিং

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক অনন্ত সিং-এর অক্লান্ত পরিশ্রম, সংগঠন নৈপুণ্য ও পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল।

অসাধারণ সাহস; শৌর্য, বুদ্ধি ও সংগঠন ক্ষমতার জন্য অনন্ত সিং মাষ্টারদার একজন বিশ্বাসী অনুগামী হতে পেরেছিলেন।

জন্ম ১৯০৩খ্রিঃ ১লা ডিসেম্বর চট্টগ্রামে। পিতার নাম গোলাপ সিং। তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন আগ্রা অঞ্চলের অধিবাসী।

বাল্যকাল থেকেই অনন্ত ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির। পড়াশুনার চাইতে খেলাধূলা ও শরীর চর্চাতেই উৎসাহ ছিল বেশি। স্কুলে পড়ার সময়েই সূর্য সেনের সংস্পর্শে আসেন। অনতিবিলম্বেই তিনি অসাধারণ সাহসিকতা ও বুদ্ধির জন্য মাষ্টারদার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

অনন্ত স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কার্তুজ ও বোমা বানাবার কৌশল শিক্ষা করেছিলেন। উত্তরকালে বিপ্লবের কাজে তাঁর এই শিক্ষা খুবই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল।

অনন্তর বোমা বানাবার ফর্মুলা একজন সাহেবের নামে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯২১খ্রিঃ অসহযোগ আন্দোলনকালে অনন্ত তাঁর নিজের স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে অনন্ত বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার কাজে মনোযোগী হন।

মাষ্টারদা ১৯১৮খ্রিঃ চট্টগ্রামে যে বিপ্লবী কমিটি গঠন করেছিলেন অনন্ত ছিলেন তার অন্যতম সদস্য।

মাষ্টারদা বুঝতে পেরেছিলেন, শক্তিশালী বিদেশী সরকারকে উপযুক্ত আঘাত হানতে হলে কেবল মনোবল নয়, অস্ত্রবলেরও প্রয়োজন। আর অস্ত্রের জন্য প্রয়োজন টাকার। তাই তাঁর নির্দেশে তাঁর অনুগামী বিপ্লবী দল অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

অনন্ত এই উদ্দেশ্যে চলে এলেন আগরতলায়। গোপনে যোগাযোগ আরম্ভ করলেন রাজবাড়ির অস্ত্রাগারের রক্ষীদের সঙ্গে। অসাধারণ কূট কৌশলী অনন্ত অবিলম্বে প্রচুর কার্তুজ বার করে নিতে সক্ষম হলেন সেখান থেকে।

এরপর তিনি অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নিলেন ১৯২২খ্রিঃ শেষের দিকে। চট্টগ্রাম শহর থেকে দূরে এক মহাজনের বাড়িতে সঙ্গীদের নিয়ে হানা দিলেন।

এই ডাকাতি সফল হলেও সংগৃহীত অর্থ তাঁদের হতাশ করল। মাত্র ছ'শো টাকা পাওয়া গেল।

এরপর বাধ্য হয়েই মোটা পরিমাণ টাকা কোথায় পাওয়া যায় তা নিয়ে দলের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

বহু আলাপ-আলোচনার পরে অনন্ত প্রস্তাব করলেন আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের টাকা লুঠের পরিকল্পনা। যথারীতি প্রস্তাব গৃহীত হল।

১৯২৩খ্রিঃ ১৪ই ডিসেম্বর ডাকাতি সফল হল এবং রাতারাতি বিপ্লবীদের হাতে এসে গেল সতেরো হাজার টাকা।

এই টাকা লুঠ করবার সময় অনন্তর দলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পুলিসকে পরাভূত করে অনন্ত ও তাঁর সঙ্গীরা পাহাড়ে পালিয়ে যান। পরে সন্দীপ হয়ে কলকাতা আসার পথে ধরা পড়ে যান। অবশ্য পরে ছাড়া পেয়ে যান।

এরপর চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে পুনরায় বিপ্লবী কাজকর্ম আরম্ভ করেন।

১৯২৪খ্রিঃ জারি হল ১নং বেঙ্গল অর্ডিনান্স। সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ইংরাজ সরকার চারদিকে যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার আরম্ভ করল। এই সময় অনন্ত ধৃত হন এবং চার বছর কারাগারে থাকেন।

কারামুক্ত হবার পর চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে মাষ্টারদার নির্দেশে ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন। বিপ্লবী সংগঠনকে শক্তিশালী করবার জন্য তরুণদের দলে আনার জন্য এই সময় থেকেই তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মহাবিপ্লবী গণেশ ঘোষকে তিনিই নিয়ে আসেন মাষ্টারদার কাছে।

ব্যায়াম সমিতিতে ছাত্রদের শরীর চর্চায় তালিম দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে চলতে থাকে তাদের ধীরে ধীরে স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার কাজ।

এইভাবেই গড়ে উঠল চট্টগ্রাম রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা। সূর্য সেন হলেন তার প্রেসিডেন্ট।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ করার পরিকল্পনা মাথায় রেখেই মাষ্টারদা দলের কর্মী সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাদের সামরিক কৌশলে শিক্ষা দিয়ে একটি সুগঠিত বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এই উদ্যোগে অনন্ত ছিলেন তাঁর প্রধান সহযোগী।

সবদিকে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে মাষ্টারদা দলের সকলকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিলেন। দিনও স্থির হল ১৯৩০খ্রিঃ ১৮ এপ্রিল।

এই প্রসঙ্গে অনন্ত সিং পরে মাষ্টারদার সম্বন্ধে লিখেছেন, "সংগঠন ও প্রস্তুতির পথে জটিল সমস্যার সমাধান, গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা ও অতি সংকটজনক মুহূর্তে বৈপ্লবিক নির্দেশ দান প্রভৃতি মাষ্টারদার জীবনের আড়ম্বরহীন, প্রকাশহীন গভীরতম দিক। চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহকে সার্থক করেছে তাঁর সেই অপরিহার্য ভূমিকা। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা ও নিদরুণ ক্ষয়ক্ষতি থেকে শিক্ষা নিয়ে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে মাষ্টারদা যদি তাঁর নিজস্ব বিশেষ ধারায় সংগঠন পরিচালিত না করতেন, তবে তাঁর অবর্তমানে অন্য যে কোন বিপ্লবী নেতার অবস্থানেও ব্রিটিশ সরকার চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিত।"

দক্ষ সর্বাধিনায়কের মত মাষ্টারদা তাঁর পরিকল্পনা ছকেছিলেন অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে। তিনি এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে একদল সুগঠিত যুবককে সহযোদ্ধা করে নিলেন প্রথমে। তারপর কি কায়দায় অস্ত্রাগার আক্রমণ করে দখল করা হয় তার বর্ণনা দিয়েছেন মনোরঞ্জণ ঘোষ তাঁর বইতেঃ

"১৮ এপ্রিল, ১৯৩০খ্রিঃ, প্রতিটি পোষ্ট মাষ্টারদা পরিদর্শন করেন। সব ঠিক, জিরো আওয়ারের জন্য সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। ঘড়ির কাঁটা দশটা উনত্রিশের

দাগ পেরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ত্রিশের দাগে আসে। অন্ধকারে আদেশ শোনা যায় Get Ready।

ছেলেদের পরনের ধুতি ও গায়ের চাদর খসে পড়ে—নিমেষের মধ্যে রূপান্তর হয়, খাকি শর্টস ও শার্ট পরা সৈনিক—আক্রমণের নির্দেশ আসে......।

রেললাইনের ওপর ঝুঁকে পড়ে কয়েকজন ফিশ প্লেট সরায়। হাতুড়ির আওয়াজ ওঠে ঘটাং ঘটাং—রেল লাইন ফাঁক হয়ে যায়।

অক্সিলারি ফোর্সের আর্মারি।

পাহাড়ি পথ বেয়ে তীব্র বেগে মোটর আসে। দরজার প্রহরী হাঁকে—হুকুমদার? গাড়ি থেকে জবাব আসে—ফ্রেন্ড! গাড়ি ভেতরে ঢুকে যায়।

অস্ত্রাগারের প্রহরীটি দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়ির সামনের আসন থেকে ইউনিফর্ম পরা একটি ছেলে নামে। পিছনের আসনের দরজা খুলে আর্দালির মতো সেলাম করে সে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নামেন লোকনাথ বল।

পাহারাদার সান্ত্রী তাঁকে বড় অফিসার ভেবে সেলাম করে। গর্জে ওঠে লোকনাথের রিভলবার। লুটিয়ে পড়ে সান্ত্রীর দেহ। উপবিষ্ট পাহারাদারের দিকে গুলি ছোঁড়েন বিপ্লবী লোকনাথ। প্রাণভয়ে পালায় তারা। তাদের ফেলে যাওয়া রাইফেল হস্তগত করে ছেলেরা।

লোকনাথ হুকুম করেন, Take your position.

চারদিকে চারজন ছেলে দাঁড়িয়ে যায়।

গন্ডগোল শুনে বাংলো থেকে বেরিয়ে আসেন মেজর ফেরল। বন্দুকের শব্দ হয়। লুটিয়ে পড়েন ফেরল। ভেতর থেকে ছুটে আসেন মেমসাহেব। ফেরল বলেন, Ring up the police।

টেলিফোনের অফিসে অপারেটরের মাথার পিছনে ঠেকে রিভলবারের নল। চেয়ার উল্টে ফেলে অপারেটর পালায়। অম্বিকা চক্রবর্তীর ইঙ্গিতে কয়েকজন কী-বোর্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।

অস্ত্রাগার। লোহার দরজার সঙ্গে বিরাট কাছি দিয়ে মোটর বাঁধা হয়েছে। গাড়ি গর্জন করে—ঝন ঝন করে ভেঙ্গে পড়ে লোহার দরজা। ছেলেরা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, 'বন্দে মাতরম। স্বাধীন ভারত কি জয়।'

ভেতরের গরাদ দেওয়া দরজার ওপর বড় বড় স্লেজ হ্যামার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন নির্মল প্রমুখ। সে দরজাও ভেঙ্গে যায়। ছেলেরা ছুটে নিয়ে বন্দুক, রিভলভার তুলে নেয়। গুলি-বারুদে ভরে নেয় হ্যাভারস্যাক।

হঠাৎ দূরে একটা গাড়ির হেড লাইট।

হুঁশিয়ার, একটা গাড়ি আসছে।

অস্ত্রাগারের বারান্দায় এরা রাইফেল তুলে টিপ করে দাঁড়ায়, সান্ত্রী চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করে; Who comes there ?

গাড়ির গতি কমে আসে, জবাব আসে General Singh।

Pass- Work?

Independence !

Pass !

অনন্ত সিংহের গাড়ি ভেতরে প্রবেশ করে। সান্ত্রী পা ঠুকে স্যালুট করে।

অনন্ত সিং গাড়ি থেকে নামেন। লোকনাথ বল এগিয়ে আসেন। —দখল করেছি অস্ত্রাগার।

অনন্ত সিং করমর্দন করে বলেন, We have -captured everything with no casualty.

স্বাধীন ভারত কি জয়। বন্দে মাতরম! ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

পতাকা উত্তোলন দন্ডের কাছে ছেলেরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়।

খোলা তলোয়ার হাতে বিপ্লবী সেনাপতিরা সূর্যসেনকে অভ্যর্থনা করে আনেন। তিনি ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সকলে সামরিক কায়দায় পতাকাকে অভিবাদন জানায়। মাষ্টারদা নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা দেন।.......

বিপ্লবীদের হেড কোয়ার্টার্সে বৈঠক বসেছে। কথার মাঝখানে হঠাৎ শোনা যায় মেশিন গানের শব্দ। বিপ্লবী নেতারা বিদ্যুৎবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। গণেশ ঘোষ অর্ডার দেন, Lie down! Lie down !

একটু দূরে জল কলের উঁচু টিলার ওপর মেশিনগান এনে বসিয়েছে সাহেবরা!

মেশিন গানের আওয়াজ ছাপিয়ে গণেশের গর্জন শোনা যায়—Fire! Open Fire!

গুলি চলে। অন্ধকারের মধ্যেই দু পক্ষ গুলিবর্ষণ করে। কিছুক্ষণ পরে অপর পক্ষের গুলি থামে।

বিপ্লবীরা পরামর্শ করেন; এ জায়গা নিরাপদ নয়। ওরা উঁচুতে রয়েছে। একটু কাছেই চাঁদ উঠবে। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাবে আমাদের।

ঘটনাচক্রে দলছুট হয়ে পড়েন গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং।

এদিকে বিপ্লবীরা মার্চ করে। অম্বিকা মাষ্টারদাকে বলেন, আমার মনে হয়, পাহাড়ে যাওয়া ভাল। লুকোবার জায়গা পাওয়া যাবে।

হুকুম হয় Double up ! To the hills! পার্বত্য পথের চড়াই ভেঙ্গে ওঠেন বিপ্লবীরা—লতা ধরে, পরস্পরের হাত ধরে, কাঁধে পা দিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, ভারী বন্দুকগুলিও হাতে হাতে টেনে তোলা হয়। ১৯ এপ্রিল বিপ্লবীদের নাগরখানা পাহাড়েই কাটে।

পুলিসের অস্ত্রাগার থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গুলিবারুদ তুলে নেওয়া হল। মাষ্টারদার অনুমতি নিয়ে পেট্রোল ঢেলে-অস্ত্রাগারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল।

এই সময় দুর্ভাগ্যক্রমে এক সহযোদ্ধা হিমাংশুর শরীরে আগুন ধরে যায়। আহত অবস্থায় তাঁকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য আরও কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে গাড়িতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বিদ্রোহের প্রথম পর্যায় সম্পন্ন হবার পর এইভাবে অনন্ত ও তাঁর সঙ্গীরা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরে চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে তাঁরা চন্দননগরে আশ্রয় নেন।

ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলা শুরু হল। সহকর্মীদের বিচার ও জেলে নির্যাতনের সংবাদ পেয়ে বিচলিত হলেন অনন্ত। তিনি গোপন আশ্রয় ত্যাগ করে কলকাতা পুলিস কমিশনারের অফিসে উপস্থিত হন এবং আত্মসমর্পণ করেন।

চট্টগ্রাম মামলায় মোট ৩৬ জনের বিচার হয়। তাতে অনন্ত সিং সহ দশজনের দ্বীপান্তর হয়।

১৯৪৬ খ্রিঃ অনন্ত মুক্তিলাভ করেন। জেলে অবস্থান কালেই মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। বাইরে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

শেষ জীবনে এই বিপ্লবী একজন বিতর্কিত ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। কয়েকটি ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে তাঁকে ১৯৬৯ খ্রিঃ থেকে ১৯৭৭ খ্রিঃ পর্যন্ত জেলে থাকতে হয়।

অসুস্থতার কারণে মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে তিনি ছাড়া পান। ১৯৭৯ খ্রিঃ ২৫শে জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

বিপ্লবী অনন্ত সিং-এর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ, অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম, মাষ্টারদা, স্বপ্ন ও সাধনা, কেউ বলে ডাকাত কেউ বলে বিপ্লবী প্রভৃতি।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী



ভারতের কাথিয়াবাড় প্রদেশের পোরবন্দর নামক স্থানে এক প্রাচীন বেনিয়া পরিবারে ১৮৬৯ খ্রিঃ ২রা অক্টোবর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাবা গান্ধী এবং মাতা পুতলী বাঈ।

মোহনদাসের পূর্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে কাথিয়াবাড় প্রদেশের পোরবন্দর নামক স্থানের দেওয়ান ছিলেন।

বাল্য ও শৈশবের শিক্ষা কাথিয়াবাড়ের সমাপ্ত করেন মোহনদাস। এরপর বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি অধ্যয়ন করেন। পরে দেশে ফিরে এসে বোম্বাই হাইকোর্টে আইনব্যবসা আরম্ভ করেন।

১৮৯৩ খ্রিঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের একটি জটিল মামলার প্রয়োজনে তিনি নেটাল যাত্রা করেন। পরে সেখান থেকে ট্রান্সভাল যাত্রা করেন।

১৮৯৪ খ্রিঃ মোহনদাস মুষ্টিমেয় ভারতীয়দের নিয়ে নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় নেটাল সরকার এশিয়াটিক এক্সক্লুশন অ্যাক্ট অর্থাৎ এশিয়াবাসী বিতাড়ন নামক একটি আইন পাস করেন। মোহনদাস এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের ধন্যবাদভাজন হন।

নেটালে ও ট্রান্সভালে ভারতীয়দের দুরবস্থার বিষয় সাধারণকে এবং সরকারকে জানাতে ১৮৯৫ খ্রিঃ মোহনদাস ভারতে আসেন। তার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যবাদী শ্বেতাঙ্গরা তাঁর প্রতি অত্যান্ত রুষ্ট হন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল দীর্ঘকাল আগে। তাদের বংশধরদের একাংশ বুয়র নামে পরিচিত ছিল। এই বুয়রদের অধিকাংশেরই উপজীবিকা ছিল কৃষি। ট্রান্সভালে তাদের একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই অঞ্চলে ইংরাজদের ক্ষমতা ও প্রভাব যথেষ্ট ছিল। তারা একটি নিরঙ্কুশ ইংরাজ উপনিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টায় সচেষ্ট ছিল।

১৮৩৪ খ্রিঃ ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় বুয়ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এরপর ১৮৭৮ খ্রিঃ জুলুদের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ বাঁধলে, বুয়রদের সঙ্গেও বিরোধ বাঁধে। পরিণতিতে ট্রান্সভালের বুয়রদের প্রজাতন্ত্রটি ইংরাজ উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে ১৮৮০-৮১ খ্রিঃ শুরু হয় প্রথম বুয়র যুদ্ধ।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-বুয়র যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৯৯ খ্রিঃ এবং শেষ হয় ১৯০২ খ্রিঃ। ১৮৯৯

খ্রিঃ যুদ্ধ শুরু হলে মোহনদাস সেখানকার ভারতীয়দের নিয়ে ইণ্ডিয়ান এমবুলেন্স কোর গঠন করেন।

১৯০১ খ্রিঃ গান্ধীজি ভারতে ফিরে এসে বোম্বাই হাইকোর্টে পুনরায় ব্যারিস্টারি শুরু করেন। কিছুকাল পরে মিস্টার চেম্বারলেন নেটাল পরিদর্শনে এলে গান্ধীজি সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান।

এরপরে গান্ধীজি ট্রান্সভালের সুপ্রীম কোর্টের এটর্নির কাজে নিযুক্ত হন। ১৯০৩ খ্রিঃ তিনি ট্রান্সভাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৪ খ্রিঃ জোহান্সবার্গে ভারতীয় পল্লীতে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। গান্ধীজি রোগীদের শুশ্রূষার জন্য সেখানে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেই রোগাক্রান্ত রোগীদের পরিচর্যা করেন।

কিছুকাল পরে গান্ধীজি নেটালে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন নামে একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৩ খ্রিঃ ট্রান্সভালে এশিয়াটিক ল এমেন্ডমেন্ট অর্ডিন্যান্স জারি হয়। গান্ধীজি এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা করে জনমত গঠন করে আন্দোলন শুরু করেন।

১৯০৭ খ্রিঃ গান্ধীজি ও তাঁর কতিপয় সহচরকে কারারুদ্ধ করা হয়।

দেশে ফিরে এসে তিনি আহমেদাবাদে একটি সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করেন। এই সময়ই সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি দেশের প্রধান প্রধান স্থানগুলি পরিদর্শন করেন।

সেবামূলক কাজের জন্য ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজিকে কাইজার-ই-হিন্দ পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে ক্ষোভ বিক্ষোভ প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯১৬ খ্রিঃ বিহারের চম্পারন জেলায় সেখানকার কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে নীলকর সাহেবদের বিবাধ বাঁধে। গান্ধীজি সেখানে গিয়ে বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করেন।

ইতিমধ্যে কায়রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলে গান্ধীজি সেখানে পৌঁছে দুর্গতদের সেবায় নিযুক্ত হন এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

১৯১৮ খ্রিঃ মন্টেগু চেমসফোর্ড এদেশে আসেন। তখন গান্ধীজির ঐকান্তিক চেষ্টায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে একখানি আবেদনপত্র প্রদান করা হয়।

এই সময় রাউলাট বিল নামক একটি আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাব হয়। এতে ভারতীয়দের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাশের আশঙ্কায় দেশজুড়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়।

অন্যদিকে খেলাফৎ সমস্যাও জটিল হয়ে ওঠে। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য গান্ধীজি বড়লাটকে একটি পত্র লেখেন।

এই সময় গান্ধীজির নেতৃত্ব লাভ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নবজীবন লাভ করে।

এই সময় পাঞ্জাব ও দিল্লীতে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালিয়ে ব্রিটিশ সরকার অমানবিক হত্যাকান্ড চালায়।

এই দুঃখজনক ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েও কোন প্রতিকার হল না।

খেলাফৎ সমস্যা ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য গান্ধীজি সরকারের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা বর্জন করার আহ্বান জানান।

১৯২০ খ্রিঃ তিনি তাঁর সরকার প্রদত্ত কাইজার-ই-হিন্দ পদক ফিরিয়ে দেন।

১৯২০ খ্রিঃ নাগপুর অধিবেশনে গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস ঘোষণা করে ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ পথে পূর্ণ স্বরাজ লাভই হলো কংগ্রেসের লক্ষ। কংগ্রেস তার দাবি আদায়ের জন্য অহিংসা ও অসহযোগের ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে গান্ধীজির নেতৃত্বে প্রথম জাতীয় জাগরণ হয় ১৯২১ খ্রিঃ তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে।

ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কেও জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই সময়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খেলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করা হয়।

১৯২২ খ্রিঃ মার্চ মাসে রাজদ্রোহমূলক বিবেচিত হওয়ায় সেসনের বিচারে গান্ধীজির ছয় বৎসরের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। দুই বৎসর কারবাসের পর সরকার গান্ধীজিকে মুক্তি দেন।

১৯৩০ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে গান্ধীজি দেশজুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকার দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে কঠোর হাতে এই আন্দোলন দমন করে।

কয়েকজন জননেতা সহ গান্ধীজিকেও কারারুদ্ধ করা হয়। ফলে সমগ্র ভারত জুড়ে ব্রিটিশবিরোধী অনুভূতি উত্তাল হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন চলতে থাকে।

এরপর গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষ্যে গান্ধীজি বিলাতে গিয়ে প্রধান প্রধান রাজনীতিক দিগকে এবং মন্ত্রিবর্গকে ভারতের দাবির কথা জানান। এরপর বিলেত থেকে দেশে ফিরে এসে গান্ধীজি আবার কারারুদ্ধ হন।

এই সময়ে তিনি হরিজন আন্দোলন ও পল্লী-উন্নয়নের কাজে নিজেকে সমর্পণ করেন।

১৯৩১ খ্রিঃ গান্ধীজি পুনরায় দ্বিতীয়বার গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ইংলন্ড যান।

১৯৪২ খ্রিঃ তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস দেশব্যাপী ভারতছাড় আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনে গান্ধীজি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

১৯৪৫ খ্রিঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ ও মিত্রপক্ষ জয়লাভ করে। ১৯৪৬ খ্রিঃ মীরাট অধিবেশনে কংগ্রেস আবার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানায়।

১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট ভারত দেশভাগের মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। সেই বছরেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য গান্ধীজির নোয়াখালি সফর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৪৮ খ্রিঃ ৩০শে জানুয়ারী দিল্লিতে এক প্রার্থনা সভায় গান্ধীজি এক আততায়ীর হাতে নিহত হন।

গান্ধীজির জীবন, দর্শন ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি জাতির জনক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার



ভারতের প্রথম বিপ্লবী মহিলা শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তাঁর জন্ম চট্টগ্রামে ১৯১১ খ্রিঃ ৫ই মে। পিতার নাম জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার।

প্রীতিলতার ছাত্রজীবন কাটে প্রথমে ঢাকায় ও পরে কলকাতায়। ঢাকায় থাকার সময়েই সেখানকার বিপ্লবী সংগঠন দীপালী সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন। কলকাতায়ও ছাত্রীসঙ্ঘের উৎসাহী কর্মী ছিলেন।

আই.এ. পরীক্ষায় তিনি ঢাকা বোর্ডে মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় ডিস্টিংসন সহ পাস করেন।

এরপর চট্টগ্রামে ফিরে এসে নন্দনকানন স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার পদে যোগ দেন।

ইতিপূর্বে বহরমপুর কলেজ থেকে বি.এ. পাস করার পর মাষ্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রামে এসে উমাতারা উচ্চ ইংরাজি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।

চট্টগ্রামে একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই মাষ্টারদা শিক্ষকতার বৃত্তি নিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি সমাজ সেবার কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।

এইভাবে অনুগামীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তিনি ধীরে ধীরে গঠন করেন চট্টগ্রাম রিপাবলিকান আর্মি। এই সংগঠনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধাবাহিনী মাষ্টারদার নেতৃত্বে ১৯৩০ খ্রিঃ ১৮ এপ্রিল মুষ্টিমেয় অস্ত্রশস্ত্রকে সম্বল করে ব্রিটিশ শাসকের শক্তির উৎস দুর্ভেদ্য অস্ত্রাগার আক্রমণ করে।

সাময়িকভাবে সফল হয় এই বিদ্রোহ। বিপ্লবীদের সফল তৎপরতায় চট্টগ্রাম সারা ভারতের বিপ্লবতীর্থ বলে পরিচিত হয়।

সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদার নেতৃত্বে ৬৫ জন অসমসাহসী যুবক ২টি অস্ত্রাগার ও পুলিস লাইন এবং ডাক ও তার অফিস একযোগে আক্রমণ করে দখল করেন।

চট্টগ্রামে মাষ্টারদার দলই ভারতে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ইউনিফর্ম পরে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।

মাষ্টারদার বিপ্লবীদলেরই অন্যতমা ছিলেন প্রীতিলতা। অস্ত্রাগার দখলের পূর্বে মাষ্টারদার নির্দেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়।

অস্ত্রাগার দখলের পরে মাষ্টারদা তাঁর ৬০ জন অনুগামী যোদ্ধাকে নিয়ে শহর ছেড়ে পাহাড় অঞ্চলে চলে যান।

১৯৩০ খ্রিঃ ২২শে এপ্রিল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়ে জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের আক্রমণ করে। দুই পক্ষে সারাদিন প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। বিপ্লবীদের কয়েকজন প্রাণ হারান।

শেষ পর্যন্ত মাষ্টারদা অনুগামীদের নির্দেশ দেন; যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যান। আর যাঁরা চিহ্নিত তাঁরা যেন জেলা ছেড়ে অন্যত্র আত্মগোপন করেন। মাষ্টারদা নিজেও আত্মগোপন করেন।

জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ শেষ হওয়ার পরে বিপ্লবীরা গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন আরও তিন বছর। তাঁদের লক্ষ্য ছিল একটাই—ব্রিটিশ সৈন্যদের দৃষ্টি থেকে মাষ্টারদাকে আড়াল করা।

অস্ত্রাগার আক্রমণে অংশ গ্রহণের পর প্রীতিলতা প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক কাজের ভার পান। তিনি জেলে বন্দি ও জেলের বাইরের আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

মাষ্টারদা ধলঘাটে আত্মগোপন করলে প্রীতিলতা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ভার পান।

১৯৩২ খ্রিঃ জুন মাসে ধলঘাটে বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে সরকার পক্ষের ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন এবং বিপ্লবীদলের নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের মৃত্যু হয়। মাষ্টারদা ও প্রীতিলতা পালিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন।

এরপরই সরকার থেকে প্রীতিলতাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

বিপ্লবীদলের লক্ষ্য ছিল পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ। কিন্তু প্রস্তুতি শুরু করেও এই কাজ সম্পূর্ণ করা যায় নি। মাষ্টারদা এই আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব দেন প্রীতিলতাকে।

চট্টগ্রামের সাহেব মেমদের ক্লাব সম্পর্কে প্রীতিলতাই প্রথম মাষ্টারদার কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। দেশের মানুষদের সঙ্গে সাহেবরা যে দুর্ব্যবহার করে, তার উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য তিনি উন্মুখ হয়েছিলেন।

মাষ্টারদার নির্দেশে প্রীতিলতার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র তরুণ ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

দিন স্থির হয় ১৯৩২ খ্রিঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার।

সন্ধ্যার পর ক্লাবে জমে উঠল ফুর্তি আর নাচ-গানের আসর।

ক্লাবের বাইরে প্রহরীরা যার যার নির্দিষ্ট স্থানে প্রহরারত। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রীতিলতা তাঁর সহযোদ্ধাদের ছড়িয়ে দিলেন।

ক্লাবের ভেতরে উন্মত্ত উল্লাসে মেতে উঠেছে সাহেব মেমের দল। জানালার আড়াল থেকে সবই দেখতে পাচ্ছেন প্রীতিলতা।

এই মুহূর্তে আনন্দ-মাতাল সাহেবদের দেখে বোঝার উপায় নেই যে এরাই কী নিদারুণ নির্মম আর দাম্ভিক হয়ে ওঠে ভারতীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করার সময়।

তীব্র আক্রোশে দাঁতে দাঁত পেষেণ প্রীতিলতা। অপেক্ষা করে থাকেন উপযুক্ত সময়ের। তার পরই চূর্ণ করতে হবে সাগর পারের ওই শ্বেতাঙ্গদের দম্ভ।

সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসরও জমে উঠল। মদের যেন ফোয়ারা বইছে ক্লাবের ভেতর। অনেকেই ইতিমধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।

এবারে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন প্রীতিলতা। বিপ্লবীর লক্ষ্য একটাই কর্তব্যসাধন নয়তো আত্মবলিদান। মাষ্টারদার এই শিক্ষা রক্তের সঙ্গে ধমনীতে প্রবাহিত।

নানা দিকে ছড়িয়ে আছেন অপর সহযোদ্ধারা। নেত্রীর নির্দেশের অপেক্ষায় তাঁরাও প্রহর গুণছেন।

সহসা গর্জন করে উঠল প্রীতিলতার হাতের অস্ত্র—ক্লাবের ভেতরে লুটিয়ে পড়ল একজন।

সঙ্কেত পেয়ে অন্যান্য বিপ্লবীরাও ক্লাব ঘিরে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করলেন।

মুহূর্তে চতুর্দিক লন্ডভন্ড। সাহেবদের আনন্দ-কোলাহল পরিণত হল ভয়ার্ত-আর্তনাদে।

নিহত হল একজন সাহেব—আহত অনেকেই। কয়েকজন পলাতক।

প্রীতিলতার নির্দেশে তাঁর সহযোদ্ধারা এবারে স্থানত্যাগ করলেন। নিজের জায়গায় স্থির থেকে প্রত্যেকটি সহকর্মীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিলেন প্রীতিলতা। তাঁর তো আগে গেলে চলে না, তিনি যে নেত্রী।

প্রীতিলতা স্থানত্যাগ করবার আগেই ইতিমধ্যে খবর পেয়ে পুলিসবাহিনী ঘিরে ফেলেছে ক্লাব চত্বর। নির্ভীক নায়িকা কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। দেখতে পেলেন তাঁকে দেখে পুলিস ছুটে আসছে।

গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই পুলিসকে বাধা দেওয়া গেল না। কিন্তু তাঁর জীবিত দেহ স্পর্শ করার সুযোগও তারা পেল না।

মৃত্যুকে তো নিজের সঙ্গেই বেঁধে রেখেছিলেন প্রীতিলতা—সাক্ষাৎ মৃত্যু পটাসিয়াম সায়ানাইড সঙ্গেই রেখেছিলেন।

মাষ্টারদাকে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করবার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন দলনেতা। তাঁকেই করেছিলেন অভিযানের নায়িকা, নির্দেশিকা।

গুরুর আদেশ যথাযোগ্যভাবে প্রতিপালন করতে পেরেছেন তিনি। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—জীবনের ব্রত সম্পূর্ণ।

পুলিস নিকটে এগিয়ে আসার আগেই প্রীতিলতা কালান্তক বিষ সায়ানাইড পুরে দিলেন মুখে। প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ব্রিটিশ শাসকের পুলিসবাহিনী বীরাঙ্গনা প্রীতিলতার প্রাণহীন দেহটাই নিয়ে গেল।

গণেশ ঘোষ



চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের ফিল্ড মার্শাল বিপ্লবী গণেশ ঘোষের জন্ম ১৯০০ খ্রিঃ ২২শে জুন পিতার কর্মস্থল চট্টগ্রামে। তাঁদের আদি নিবাস ছিল যশোহর জেলার বিনোদপুর। তাঁর পিতা বিপিনবিহারী ঘোষ ছিলেন রেলকর্মচারী।

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে পড়বার সময়েই বন্ধু অনন্ত সিং-এর মাধ্যমে মাষ্টারদা সূর্য সেনের সংস্পর্শে আসেন।

সূর্য সেন সেই সময়ে উমাতারা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি স্কুলের ছেলেদের নিয়ে সমাজ সেবার কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় সেই সময় গড়ে ওঠে 'সাম্য আশ্রম'।

এই সংগঠন গড়তে গিয়েই সূর্য সেন সহকর্মী ও অনুগামী হিসেবে পেলেন গিরিজাশংকর চৌধুরী, চারুবিকাশ দত্ত, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, অনন্ত সিংহ, রাজেন দাস, যতীন রক্ষিত, সুখেন্দু দত্ত, রাখাল দে, প্রমুখ দেশপ্রেমে ভরপুর একদল তরুণকে।

গিরিজাশংকর ও চারুবিকাশ দত্ত এসেছিলেন গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতি থেকে।

অপর এক বিখ্যাত বিপ্লবী সংগঠন যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন সূর্য সেন নিজে। অনন্ত সিং পরে নিয়ে এসেছিলেন গণেশ ঘোষকে।

অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল প্রভৃতি বিপ্লবী সংগঠনগুলির আদর্শে সূর্য সেন চট্টগ্রামেও একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলেন।

১৯২১ খ্রিঃ দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলে স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, চট্টগ্রাম বার্মা অয়েল কোম্পানির ধর্মঘট, স্টিমার কোম্পানির ধর্মঘট ও আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট প্রভৃতিতে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

১৯২২ খ্রিঃ গণেশ ঘোষ কলকাতায় এসে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউশনে ভর্তি হন। এই প্রতিষ্ঠানেরই বর্তমান নাম যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

এখানে পড়ার সময়েই ১৯২৩ খ্রিঃ বোমা তৈরির মামলায় সন্দেহক্রমে গণেশ ঘোষ গ্রেপ্তার হন। পরে প্রমাণ অভাবে মুক্তি পান।

১৯২৪ খ্রিঃ ভারতরক্ষা আইনে দেশজুড়ে বিপ্লবীদের ধরপাকড় শুরু হলে গণেশ ঘোষকেও আটক করা হয়। চার বছর তাঁকে কারারুদ্ধ থাকতে হয়। কারাবাসের পরে চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে পুনরায় সূর্যসেনের সঙ্গে বিপ্লবের কাজে যোগ দেন।

১৯২৮ খ্রিঃ কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে সূর্যসেনের নেতৃত্বে আরও কয়েকজনের সঙ্গে গণেশ ঘোষও প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন।

১৯২৯ খ্রিঃ চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন মাষ্টারদা। সেই সময় তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে যে বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেন তার সদস্য ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ।

এই পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারেই মাষ্টারদার দলের নাম রাখা হয়, ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ করার পরিকল্পনা মাষ্টারদা দীর্ঘদিন থেকে মনে লালন করছিলেন। তারই প্রস্তুতি হিসেবে তিনি অনুগামী তরুণদের নিয়ে গড়ে তোলেন একটি সুদক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধাবাহিনী যাদের নিয়ে চট্টগ্রাম রিপাবলিকান আর্মি।

এই সংগঠনের আদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়ে গণেশ ঘোষ বলেছেন, 'সূর্য সেন বুঝতে পেরেছিলেন কেবলমাত্র সামরিক পেশিবলের ওপর যে শাসন প্রতিষ্ঠিত, বল প্রয়োগ ছাড়া সেই ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের মাটি থেকে উৎপাটিত করা যাবে না। ভারতের স্বাধীনতা হিংসার পথে আসবে না অহিংস উপায়ে আসবে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে তিনি মনে করতেন না।''

চট্টগ্রামে একটা কাপড়ের দোকান খুলেছিলেন গণেশ ঘোষ। এটা ছিল তাঁর গোপন বিপ্লবী জীবনের আড়াল মাত্র।

শক্তিশালী বিদেশী সরকারকে আঘাত হানার জন্য ইতিমধ্যে মাষ্টারদার নির্দেশে বিপ্লবীরা স্বদেশী ডাকাতির মাধ্যমে বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

এইভাবে যখন আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ সেই সময় মাস্টারদা সকলকে জানিয়ে দিলেন তাঁদের কর্মসূচির কথা, গণেশ ঘোষের কথায় যা "মৃত্যুর কর্মসূচী।"

মাস্টারদা দিনও ঠিক করে ছিলেন ১৯৩০ খ্রিঃ ১৮ই এপ্রিল।

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পর্যালোচনা করে গণেশ ঘোষ পরবর্তীকালে সূর্য সেনের পরিকল্পনা ও কর্মসূচিকে লেনিনের কৌশলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "মাস্টারদার নেতৃত্বে আমরা বৈপ্লবিক তাগিদে যে রকম সামরিক প্রোগাম রেখেছিলাম তার ইঙ্গিত Lenin 1905 খ্রিঃ দিয়ে গেছেন।"

মাস্টারদার অধিনায়কত্বে চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের যে স্বেচ্ছাবাহিনী গঠিত হয়েছিল গণেশ শোষ ছিলেন তার জি. ও. সি.

মাস্টারদার পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে ও নির্ধারিত সময়ে চট্টগ্রাম রিপাবলিকান আর্মির নির্ভীক সেনাবাহিনী অস্ত্রাগারের উদ্দেশ্যে অভিযান করল।

এই সম্পর্কে মাস্টারদার বিশ্বস্ত অনুগামী বিনোদবিহারী দত্ত লিখেছেন—

"১৯৩০, ১৮ই এপ্রিল। চট্টগ্রামে পুলিশ লাইন, রেলওয়ে ম্যাগাজিন হাউস, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন অফিস একই সাথে আক্রমণ করে দখল করা হলো। এদিকে কলকাতা ও চট্টগ্রামে রেল চলাচল বন্ধ করে দিয়ে সারা চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের করতলগত। সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করে পুলিশ লাইনে সমবেত হলেন।

পুলিশ লাইনে অস্ত্রাগারের শিখরে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হল।

অস্ত্রাগার পরিবেষ্টন করে বিপ্লবী রক্ষীরা রাইফেল হস্তে দাঁড়ালেন। মাস্টারদার প্রধান সহকর্মীরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মাস্টারদাকে ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির সর্বাধিনায়কের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করলেন।

মাস্টারদা প্রশান্ত চিত্তে এই সম্মান ও অভিনন্দন গ্রহণ করেছিলেন সত্য। কিন্তু আনন্দে উৎফুল্ল হতে দেখা যায় নি। তাঁর স্বাভাবিক শান্ত এবং দায়িত্বপূর্ণ প্রদীপ্তি এখনও ছবির মতো চোখে ভেসে ওঠে। তিনি দাঁড়িয়ে ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চিটাগাং ব্রাঞ্চের ঘোষণাপত্র গম্ভীর কণ্ঠে পাঠ করলেন। সেদিনই তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন।

ইতিমধ্যে ওয়াটার ওয়ার্কসের ওপর থেকে শত্রুপক্ষের লুইস গানের গুলি বর্ষণ আরম্ভ হল। মাস্টারদার প্রধান লেফটেনান্ট অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল সবাইকে ব্যূহ রচনা করে গুলির উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে উৎসাহ দিলেন এবং মাস্টারদার অপর দুজন পরামর্শদাতা ও বন্ধু নির্মল সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী অবস্থার মোকাবিলা করতে মাস্টারদার সাথে পরামর্শে নিযুক্ত হলেন।

আরম্ভ হল বিজয়ী বিপ্লবীদের সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সে কী ভীষণ গুলিবৃষ্টি। বিপ্লবীরা মাটিতে শায়িত অবস্থায় সেই লুইস গানের গুলির মোকাবেলা করে দক্ষ যোদ্ধার পরিচয় দিলেন।

ঘন্টা দেড়েক অবিরাম সংগ্রামের পর হঠাৎ নিস্তব্ধ হল শত্রুশিবির। "বন্দেমাতরম" ধ্বনিতে মুখরিত হল পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার। কিন্তু বিপ্লবীদের নেতৃস্থানীয় সকলের মনেই প্রশ্ন। "শত্রু দুর্বল হলেও এখনও শক্তি আছে। কারণ জেলের অস্ত্রাগার, প্রাইভেট বন্দুকের দোকান, ট্রেজারি হাউস ও একটি অস্ত্রাগার তখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। দিনের আলোতে স্বল্প সংখ্যক ছাত্র ও যুবক বিপ্লবীদের দেখলে শত্রুরা প্রবল আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে।... বিশেষ করে যখন তাদের হাতে তখনও কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে।

পুলিশ লাইনের ঢালু জায়গাও বিপ্লবীদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। সম্মুখের দিকে শালগাছের আড়াল ছিল বলে তখনও কেউ আহত হননি। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে লুইসগান ফিট করা হলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। এই দ্বন্দ্বমূলক চঞ্চলতার মধ্যেই অস্ত্রাগারে আগুন দিয়ে স্থানান্তরিত হবার প্রস্তাব অনুমোদিত হল।

মাস্টারদা নীরব সম্মতি জানালেন। কারণ প্রধান বিপ্লবী সৈন্যাধ্যক্ষদের ওপরে তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের কৌশলেও তিনি তাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গুলিবারুদ তুলে নিয়ে অবশিষ্ট অস্ত্রাগারে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল।

এই সময়ে এক দুর্ঘটনা ঘটল। হিমাংশু দেশলাই ব্যবহার করে বসল। তাতেই তার সারা শরীর পেট্রোলের আগুনে ধরে উঠল। সে চিৎকার করে ছুটোছুটি আরম্ভ করল। মনে হচ্ছিল, যেন একটা বৃহৎ আগুনের বৃত্ত বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে।

সারা শরীর আগুনে ঝলসে যাওয়ায় হিমাংশু যন্ত্রণায় করুণ আর্তনাদ আরম্ভ করলে অনন্ত সিং তাঁকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন।

গণেশ ঘোষও সেই গাড়িতে উঠলেন। যারা গেলেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও কেউ আর ফিরলেন না দেখে মাস্টারদা, নির্মলদা, অম্বিকাদা মিলে পরামর্শ ক্রমে সিদ্ধান্ত হল—পরবর্তী কর্মপন্থায় অগ্রসর হবার আগে অনন্তলাল ও গণেশের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

অথচ এদিকে শত্রুপক্ষেরও তাদের সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে। এখনও দূরের পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে লুইস গানের গুলি আসছে। অস্ত্রাগারের এই খোলা জায়গায় আর বেশি সময় অপেক্ষা করা সুবিবেচনার কাজ হবে না। এই অবস্থায় আজকের মত নিকটবর্তী কোন পাহাড়ে আত্মগোপন করে কাল পরবর্তী কর্মপন্থায় স্থিরভাবে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। এই

সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মাস্টারদা পাহাড়ি পথের বিশেষ অভিজ্ঞ অম্বিকাদাকে পাহাড় পথেই এগিয়ে গিয়ে আত্মগোপনের নির্দেশ দিলেন। .....''

তিনি আরও বলেছেন, ''পুলিশ-অস্ত্রাগার দখল করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের ওপর। সুতরাং সেই ১৮ই এপ্রিলের বিজয় গৌরব এই নেতৃদ্বয়েরই প্রাপ্য। আমি নিজের চোখে তাঁদের নির্ভীকতা ও আক্রমণাত্মক কৌশল দেখবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলাম।... বিপ্লবাত্মক প্রস্তুতির জন্য এই নেতৃদ্বয়ের শ্রম ও সাধনা ছিল অপরিসীম।''

ঘটনাচক্রে গনেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং সহ কয়েকজন বিপ্লবী প্রধান বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে তাঁরা ২২শে এপ্রিল ট্রেন ধরে কলকাতার পথে রওনা হয়ে পড়েন।

কিন্তু পথ বিপদমুক্ত ছিল না। ফেনী স্টেশনেই সন্দেহক্রমে পুলিস তাঁদের চ্যালেঞ্জ জানাল। প্রায় বন্দি হতে হতে রিভলভারের সাহায্য নিয়ে তাঁরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

কলকাতায় পৌঁছে যুগান্তর দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ হল। ফরাসী শাসিত চন্দননগরে তাঁদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হল।

পুলিস এখানেও রেহাই দিল না। ১৯৩০ খ্রিঃ ১লা সেপ্টেম্বর পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে সহবিপ্লবী মাখন ঘোষাল নিহত হলেন। গণেশ অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে বন্দি হলেন।

১৯৩২ খ্রিঃ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলায় দন্ডিত বন্দিদের সঙ্গে গণেশকেও আন্দামানে সেলুলার জেলে নির্বাসন দেওয়া হল।

১৯৪৬ খ্রিঃ গণেশ মুক্তিলাভ করেন। ফিরে এসে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

স্বাধীন ভারতে গণেশ ঘোষ ১৯৪৮ খ্রিঃ থেকে ১৯৫২ খ্রিঃ পর্যন্ত কারারুদ্ধ ছিলেন। কারামুক্তির পর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হয়ে বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পরপর তিনবার—১৯৫২ খ্রি, ১৯৫৭ খ্রিঃ ও ১৯৬২ খ্রিঃ নির্বাচিত হন।

১৯৬৭ খ্রিঃ দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন।

মাষ্টারদার সুযোগ্য সহকর্মী গণেশ ঘোষ তাঁর শেষ জীবন জনসেবার কাজেই ব্যয় করেন। ১৯৯২ খ্রিঃ ২২ শে ডিসেম্বর কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব



বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম ১৯২০ খ্রিঃ ১৭ই মার্চ। ফরিদপুর জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম লুৎফর রহমান।

নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান হয়েও ছাত্রাবস্থাতেই মুজিবর দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯৪২ খ্রিঃ ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থেকে ম্যাট্রিক ও ১৯৪৭ খ্রিঃ কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন।

কলেজে পড়ার সময়ই তিনি নিখিল ভারত মুসলিম স্টুডেন্টস লিগের সদস্যভুক্ত হন। সেদিনে কলকাতায় ছাত্রনেতাদের মধ্যে চট্টগ্রামের ফজলুলকাদের চৌধুরী, কাজী আহমদ কামাল, মহিরুদ্দিন প্রমুখ ছিলেন মুজিবরের প্রধান সঙ্গী।

১৯৪৩ খ্রিঃ তিনি অবিভক্ত বাঙ্গলাদেশের মুসলিম লিগের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল মুসলিম লিগের রাজনীতি দিয়ে।

এই রাজনীতিতে ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা অপর পক্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির কিছুকালের মধ্যেই তিনি প্রথম ধারণা থেকে সরে এসেছিলেন।

মুজিবের চিন্তা জগতের এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল প্রথমে শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর প্রভাবে পরে মওলানা ভাসানীর সান্নিধ্যে আসেন।

বস্তুতঃ তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্ব খন্ডিত হয়ে গিয়েছিল ১৯৪৭ খ্রিঃ শরৎবসু ও কিরণশংকর রায়ের সঙ্গে যখন সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম সার্বভৌম অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন।

ওই বছরই করাচিতে অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত মুসলিম লিগের সর্বশেষ কাউন্সিল অধিবেশন।

এই সভায় সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লিগের নীতির সংস্কারের প্রস্তাব করেন। তিনি চেষ্টা করেন সকল সম্প্রদায়ের নাগরিকদের প্রবেশাধিকার যুক্ত একটি রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তরিত করতে।

দুঃখের বিষয়, তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পূর্ববঙ্গ সরকার সোহরাওয়ার্দীর ওপর নানা প্রকার বাধানিষেধ আরোপ করেন। শেষ পর্যন্ত পূর্ববাংলা থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়। সোহরাওয়ার্দী চলে যান করাচিতে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর জোর দিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী। এই প্রশ্নেই তাঁর সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর মতভেদ হয় পরে। তখন সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ইঙ্গ মার্কিন ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির জন্যও তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এর ফলে আওয়ামী লিগের ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভাসানী দল থেকে বেরিয়ে এসে গঠন করেন ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি।

স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্নে মুজিব ছিলেন মৌলানা ভাসানীর অনুসারী। তিনি দলত্যাগ না করে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগে সাধারণ সম্পাদক হয়ে থেকে যান।

১৯৬৩ খ্রিঃ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পরে মুজিবই হলেন আওয়ামি লিগের সর্বেসর্বা। এবারে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে তিনি হয়ে উঠলেন ভাসানীর চাইতেও সোচ্চার।

তারই চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ১৯৬৬ খ্রিঃ উত্থাপিত ছয়দফা কর্মসূচির মধ্যে। মুজিবের ছয়দফা ঘোষণা বাঙ্গালীকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। মুজিবের মতে ছয় দফা ছিল বাঙ্গালীর মুক্তির জাতীয় সনদ।

ইতিপূর্বে ১৯৫২ খ্রিঃ ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অপরাধে প্রায় আড়াই বছর কারাদন্ড ভোগ করতে হয়েছিল মুজিবকে। এছাড়া ১৯৫৪ খ্রিঃ পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে গেলে বহু রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হন। ১৯৫৮ খ্রিঃ আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করলে বহুবার মুজিবকে কারাদন্ড ভোগ করতে হয়েছিল। তাই কারাবরণ মুজিবের কাছে নতুন কিছু ছিল না। কিন্তু ছয়দফা কর্মসূচি উত্থাপনের পরে তাঁকে যেভাবে নিগৃহীত হতে হয়েছিল তার কোন তুলনা হয় না।

সারা পূর্বপাকিস্তান জুড়ে সেই সময় মুজিব ঘুরে ঘুরে জনসাধারণকে ছয়দফা কর্মসূচি বুঝিয়েছেন। কিন্তু যেখানে যেখানে তিনি সভা করেছেন সেখানেই সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছে—তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কখনো যশোর থেকে তো দুদিন বাদে সিলেট কিংবা ঢাকা থেকে, পরদিন চট্টগ্রাম থেকে—এভাবে বার বার গ্রেফতার করে তাঁকে কারাগারে নেওয়া হয়েছে।

আদালতের আদেশে ছাড়া পেয়েছেন, কিন্তু পরে পরেই আবার অন্য মামলায় তিনি গ্রেফতার হয়েছেন।

সরকার এভাবে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে গেছে মুজিবকে জনসাধারণের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে। কিন্তু এই হয়রানির খেলায় সম্ভবতঃ পাকিস্তান সরকার এক সময় স্বয়ং হয়রান হয়ে পড়েছিল।

তাই মুজিবকে আটক করবার নতুন এক চাল চালল। দাঁড় করিয়ে দিল মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে মুজিবকে দাঁড় করানো হলো এক নম্বর আসামি হিসেবে।

১৯৬৮ খ্রিঃ এই মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে প্রেসিডেন্ট আয়ুব মুজিবকে কুর্মিটোলায় মিলিটারি জেলে বন্দি করে রেখেছিলেন।

পরের বছরেই অবশ্য ছাড়া পেলেন মুজিব। মুক্তিলাভের পরে ১৯৬৯ খ্রিঃ ঢাকায় মুজিবকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সেখানেই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু আখ্যায় ভূষিত করা হয়। এই সময় থেকেই মুজিব হয়ে ওঠেন পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত নেতা।

১৯৬৯ খ্রিঃ মুজিব কিছুদিনের জন্য লন্ডন যান। পরে গোলটেবিল বৈঠকে রাওয়ালপিন্ডি উপস্থিত থাকেন। ওই বছরেই গণআন্দোলনের চাপে আয়ুব খানের পতন ঘটে। পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসেন ইয়াহিয়া খান।

১৯৬৯ খ্রিঃ আওয়ামি লিগের কর্মসূচিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষিত হয়। ইতিমধ্যেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ধারার রাজনীতি কাজের মধ্য দিয়ে কাছাকাছি এসেছিল। এবারে সেই সম্পর্ক আরও সন্নিকট হবার বাতাবরণ তৈরি হল।

১৯৭০ খ্রিঃ সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনে আওয়ামি লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়লাভ করে। এই বিজয়ী দলের নেতা ছিলেন মুজিব।

পাকিস্তানে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল ১৯৭০ খ্রিঃ প্রথমবার। নির্বাচনের আগে ভাসানী দেশের অখন্ডতা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে ভাগের আগে জাতের দাবি উত্থাপন করলেন। কিন্তু তাঁর ডাকে মানুষ সাড়া দেয়নি।

এই নির্বাচনে দেশের মানুষ যেভাবে আওয়ামি লিগকে সমর্থন দেয় তা সংসদীয় ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা।

মহিলা আসন সহ জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন লাভ করেছিল আওয়ামি লিগ।

নির্বাচিত সদস্যরা প্রকাশ্যে শপথ নেন, তাঁরা ছয় দফার ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করবেন।

ভাসানী আরও এক ধাপ এগিয়ে যান। তিনি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানান।

পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। কিন্তু পরিষদে সংখ্যালঘু হয়েও তিনি দাবি জানালেন, তাঁর দলের সম্মতি ছাড়া কোনও সংবিধান রচিত হতে পারবে না।

ভুট্টো কৌশলে নিজের পক্ষে সমর্থন আদায় করলেন উচ্চ পর্যায়ের সামরিক অফিসারদের। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও সামরিক আইন প্রশাসক ভুট্টোর সঙ্গে একমত হলে জাতীয় পরিষদের আহূত অধিবেশন রাষ্ট্রপতি স্থগিত করলেন। ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল।

রাষ্ট্রপতির ঘোষণার বিরুদ্ধে মুজিবের নেতৃত্বে ১৯৭১ খ্রিঃ ১লা মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ চলে পূর্বপাকিস্তানে। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত যে অসহযোগ আন্দোলন চলে তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

মার্চ মাসের সাত তারিখে এক জনসভায় মুজিব ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

এই ঐতিহাসিক ভাষণে মুজিব প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাই জানিয়েছিলেন। তবে সংসদীয় রাজনীতির সীমাবদ্ধতা তিনি ভঙ্গ করেননি। পূর্ণ স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা থেকে বিরত ছিলেন।

এই ঘোষণার পর থেকে ক্যান্টনমেন্ট ও গভর্নর ভবনের বাইরে পূর্বপাকিস্তানের কোথাও পাকিস্তানের পতাকা ওড়েনি।

জঙ্গীশাহীর হুমকির জবাবে ১৯৭১ খ্রিঃ ১৫ মার্চ মুজিব একটি ঘোষণাদ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণশাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। বাঙ্গলাদেশের জনগণের মুক্তির উদ্দেশ্যই তাঁর এই কাজে প্রতিফলিত হয়।

পরদিন থেকেই দেশজুড়ে শুরু হয় নির্মম জঙ্গী নিষ্পেষণ। ২৫শে মার্চ রাত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপরে।

সম্ভবতঃ তার আগেই মুজিব আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন কিংবা সে ঘোষণা তাঁর নামে ২৬শে মার্চ প্রচারিত হয়েছিল।

২৫-২৬ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মুজিবকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। বলা চলে ওই তারিখেই জন্ম নিয়েছিল নতুন এক জাতি।

পশ্চিম পাকিস্তানেই শুরু হয়েছিল মুজিবের প্রহসন মূলক বিচারের আয়োজন। যে জেলে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল তার সামনে তাঁর চোখের সামনেই তাঁর কবর খনন করা হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহু অত্যাচার অসংখ্য হত্যার পর মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম সাফল্যমন্ডিত হয় এবং বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় ১৯৭১ খ্রিঃ ১৬ই ডিসেম্বর।

তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেছিল ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্যে। এর পরেই পাকিস্তানে জেনারেল ইয়াহিয়াকে সরিয়ে ভুট্টো রাষ্ট্রপতির আসন দখল করেন। বিশ্ব জনমতের চাপে তিনি মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

১৯৭১ খ্রিঃ ১০ জানুয়ারি মুক্তি লাভ করে বঙ্গবন্ধু মুজিব প্রত্যাবর্তন করেন স্বাধীন স্বদেশে এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নবীন রাষ্ট্রের কর্ণধার রূপে মুজিবের প্রধান কৃতিত্ব হল ১৯৭১ খ্রিঃ একটি সংবিধান রচনা। এই সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষিত হয় জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।

তাঁর অপর কৃতিত্ব হল ১৯৭১ খ্রিঃ জুনে অপেক্ষাকৃত অবাধ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন। তবে একথা সত্যি যে তাঁর কাছে মানষের যে প্রত্যাশা ছিল তার অনেকটাই পূরণ হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল যা হয়েছিল তা হল দেশের মধ্যবিত্তের স্বপ্নের সঙ্গে নিম্নবিত্তদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও যুক্ত হয়েছিল। তবে এই দুয়ের মধ্যে বিরোধও ছিল অনেক ক্ষেত্রে।

সদ্যসমাপ্ত যুদ্ধের ফলে অস্ত্রশস্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। বিভিন্নভাবে তার প্রায়োগও হচ্ছিল নানা দিকে।

অনিবার্যভাবেই দেশে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। এর পেছনে সরকার সমর্থকদেরও যে মদত ছিল না তা জোর দিয়ে বলা যায় না। ফলে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদীদের ভিড় ক্রমশই শক্তিকেন্দ্রে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নানা কারণে নতুন সরকারের প্রতি সামরিকবাহিনীও সন্তুষ্ট রইল না।

এই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অস্থিরতার ফল স্বরূপ দেশজুড়ে দেখা দিল দুর্ভিক্ষাবস্থা।

১৯৭১ খ্রিঃ ডিসেম্বরে শেখ মুজিব সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ও রাষ্ট্রপতির সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। নিজেই দায়িত্ব নিলেন রাষ্ট্রপতির।

এই ব্যবস্থার ফলে অবশ্য মুজিবের বাড়তি কোন ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়নি। কেননা জাতীয়পরিষদে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব তাঁরই ছিল, দলেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

তবে এই ব্যবস্থার দ্বারা যে-গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জন্য তিনি এতকাল সংগ্রাম করেছেন, সেই পথ থেকে সরে এলেন।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেবার পরেই সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের তিনি রাজনীতিতে নিয়ে এলেন।

১৯৭১ খ্রিঃ ১৫ আগস্ট কিছু সংখ্যক প্রাক্তন ও কর্মরত সামরিক কর্মকর্তার হাতে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হলেন। নৃশংস ছিল এই হত্যাকান্ড। শুধু মুজিব

নয়, তাঁর স্ত্রী, পুত্রদের সঙ্গে পুত্রবধূরা, আত্মীয়স্বজনসহ বাড়িতে উপস্থিত দলের কতিপয় কর্মী—ঘাতকরা কাউকেই রেহাই দেয়নি।

দীর্ঘ চব্বিশ বছরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের। আর শেখ মুজিব ছিলেন এই সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা। বাংলাদেশের জনক হয়েই তিনি বাঙ্গালির হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৯৯৫ খ্রিঃ বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়েল ট্রাস্টের উদ্যোগে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেমোরিয়াল যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায়।

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনটিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্মৃতি যাদুঘর রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেসার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৬১ খ্রিঃ নির্মিত হয়েছিল এই বাড়ি। ওই বছরই ১লা অক্টোবর বঙ্গবন্ধু সপরিবারে এই বাড়িতে বসবাস করতে আসেন। তখন থেকেই এই বাড়িটি হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রস্থল।

দেশের ও বিদেশের বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানীগুণী মনীষী জনের আগমন ঘটেছে এই ঐতিহাসিক বাড়িতে।

১৯৬২ খ্রিঃ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের পরিকল্পনা, ১৯৬৬ খ্রিঃ ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮-৬৯ খ্রিঃ মহান গণঅভ্যুত্থান এই বাড়ি থেকেই উৎসারিত। এই বাড়ি থেকেই পরিচালিত হয়েছিল ১৯৭০ খ্রিঃ ঐতিহাসিক সফল নির্বাচন।

পাকিস্তানি শাসকরা ১৯৬২ খ্রিঃ থেকে '৬৬ খ্রিঃ পর্যন্ত অসংখ্যবার এই বাড়ি থেকেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে।

১৯৭১ খ্রিঃ দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমলা শ্রেণী ইয়াহিয়ার সামরিক হুকুম অগ্রাহ্য করে যে নির্দেশনামা পালন করত তা বঙ্গবন্ধু এই বাড়ি থেকেই পাঠাতেন।

তাঁর সেই নির্দেশনামার ভিত্তিতেই অফিস-আদালত, ব্যাঙ্ক-বীমা সব সংস্থা পরিচালিত হত। এই বাড়ি কেবল বঙ্গবন্ধুর বাড়ি হিসেবেই স্মরণীয় নয়। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে জড়িত।

মুক্তিলাভের পর এই বাড়িতে বসেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে থাকার সময়েই ১৯৭৫ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে বঙ্গবন্ধু এই বাড়িতেই সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন।

জোসেফ স্তালিন



রুশবিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা ভি.আই লেনিনের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জোসেফ স্তালিন।

বিপ্লবের পরে জারের সাম্রাজ্যের সর্বপ্রান্তে সোভিয়েট শাসনকে সুদৃঢ় করার কাজে লেনিনের সহযোগী হিসেবে প্রধান ভূমিকা ছিল স্তালিনের।

স্তালিন নামটি আসলে ছদ্মনাম। লেলিনই প্রিয় শিষ্যকে এই নাম দিয়েছিলেন। স্তালিন কথার অর্থ হল লৌহমানব। এই নামটির মধ্যেই স্তালিনের চরিত্রের আভাস পরিস্ফুট।

লেনিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েট রাশিয়ায় লৌহ যবনিকার বাতাবরণ সৃষ্টি করে স্তালিন তাঁর নামের সার্থকতা নিরূপণ করেছিলেন।

বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল বিষয়েই মার্কসবাদ বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। রাশিয়ার বিপ্লববাদের প্রধান যোদ্ধারা মার্কসবাদের আন্তর্জাতিকতা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করলেও স্তালিন এতে ততটা গুরুত্ব দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বিপ্লবোত্তর রাশিয়াকে সংহত করার কাজকেই সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কেননা, জারতন্ত্রের পরাজয়ের পরেও বিপ্লবকে ব্যর্থ করার চক্রান্ত সক্রিয় ছিল।

প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শক্তি পশ্চিমী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল।

এই শক্তিকে দমন করবার জন্যই স্তালিনকে কমিউনিস্ট পার্টিকে সুসংহত ও শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হতে হয়েছিল।

লেনিনের মৃত্যুর পূর্ব থেকেই নেতৃত্বের ক্ষেত্রে স্তালিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন ট্রটস্কি, জেনেভিউ, কামেনেফ, বুকারিন প্রভৃতি সাম্যবাদী নেতৃবৃন্দ। কিন্তু এঁদের পরিমন্ডলে থেকেই স্তালিন অনেক বেশি শক্তিশালী নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। লেনিন অবশ্য মৃত্যুর পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর পরে সোভিয়েট শাসন ক্ষমতায় অনিবার্য ভাবেই একনায়কত্বের আবহ সৃষ্টি হবে। বাস্তবে ঘটেছিলও তাই।

লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট দেশে ধীরে ধীরে ক্রেমলিনে ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত হয়ে স্তালিনকে করে তোলে মহাশক্তিধর বিপ্লবীনায়ক। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত

ধ্বংসের উদ্দেশ্যে স্তালিন যে অভিযান চালান তাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন হাজার হাজার বিশ্বস্ত আদর্শবান কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য। বাদ যায়নি রুশ সামরিক বাহিনীও।

প্রধান প্রায় সকল সামরিক নেতাই হয় পদচ্যুত নয় নিহত হয়েছিলেন। এইভাবেই স্তালিন হয়ে উঠেছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী।

বিপ্লবের পরে স্তালিন গ্রহণ করেছিলেন বাস্তববাদী জাতীয়তাবাদী পথ। এই পথেই তিনি মার্কসীয় কমিউনিস্ট তত্ত্বকে নতুন এক লক্ষে প্রবাহিত করেন। বিশ্ববিপ্লবের চিন্তাকে সাময়িকভাবে সরিয়ে রেখে তিনি রুশদেশে রাজনৈতিক বিপ্লব তথা ক্ষমতা সংহত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে কৃষক, শ্রমিক সকল শ্রেণীর মেহনতি মানুষের কাছে নিজের বাস্তববাদী রাজনৈতিক চিন্তার যথার্থতা তুলে ধরেছিলেন।

স্তালিন ছিলেন রুশজনগণের কাছের মানুষ। রাশিয়ার জর্জিয়া প্রদেশে সাধারণ এক দরিদ্র চর্মকার পরিবারে তাঁর জন্ম। মায়ের ইচ্ছা ছিল, স্তালিন একজন বড় ধর্মযাজক হবেন। কিন্তু মায়ের সে স্বপ্ন সার্থক হয়নি। কৈশোরে পদার্পণ করেই স্তালিন নাম লেখালেন বিপ্লবী দলে।

অনেক কষ্ট স্বীকার করে মা তাঁকে জর্জিয়ার টিফলিসে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পড়া অসমাপ্ত রেখেই তিনি বিপ্লবীদলে যোগ দিলেন।

স্তালিন ছিলেন রাশিয়ার জনগণের প্রকৃতই কাছের মানুষ। তাঁর জন্ম হয়েছিল ককেসাশ পার্বত্য অঞ্চলের অন্যতম রাজ্য জর্জিয়ার অখ্যাত গোরি শহরে ১৯১৪ খ্রিঃ। পারিবারিকভাবে তিনি ছিলেন সার্ফ অর্থাৎ দাসচাষী পরিবারের চর্মকারপুত্র। পিতার নাম বিসোরিক্ত, মা একাতেরিনা।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর শরীর স্বাস্থ্য ছিল বেশ মজবুত। একবার বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য ক্ষুণ্ণ হয়নি।

দশবছর বয়সেই স্তালিন পিতৃহারা হন। ফলে মায়ের স্নেহে যত্নেই তাঁকে বড় হয়ে উঠতে হয়।

মায়ের স্বপ্ন-সাধ কিন্তু পূর্ণ করতে পারেননি স্তালিন। কৈশোরে পদার্পণ করেই স্কুলের পাঠ অসমাপ্ত রেখে নাম লিখিয়েছিলেন বিপ্লবী দলে। বিপ্লবীচেতনায় উদ্বুদ্ধ সেই জীবন ছিল পাদ্রীজীবনের চাইতে অনেক বেশি কঠোর ও কঠিন। বিপ্লবী দলে সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে নতুন এক জীবনে পদার্পণ করলেন স্তালিন।

মাত্র পনের বছর বয়সেই ১৯২৯ খ্রিঃ স্তালিন নিজের বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতায় সোভিয়েট রাশিয়ায় রাজনৈতিকভাবে গণতন্ত্রের বদলে পার্টিতন্ত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

স্তালিন নানান অভিধায় ভূষিত। তিনি দৃঢ়চেতা, একগুঁয়ে আবার বাস্তববাদী ও জাতীয়তাবাদী। বস্তুতঃ এই সকল গুণাবলীর প্রভাবেই লেনিনোত্তর রাশিয়ায়

অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শিল্পায়ন, বৈদ্যুতিকরণ ও সাক্ষরতার কাজ রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছিল।

এইসব কাজের মাধ্যমেই তিনি লেনিনের সার্থক উত্তরাধিকারী বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রতিবিপ্লবী চক্র সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন তিনি। এই চক্রকে নির্মূল করতে চরম নিষ্ঠুরতার পথ অবলম্বন করতেও তিনি দ্বিধান্বিত হননি। যদিও এই কাজের ফলে পার্টি গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চরিত্র হারিয়েছিল। শিক্ষা সংস্কৃতি, সামরিক—সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাটির সর্বাত্মক ও সর্বময় কর্তৃত্ব। দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বহারা একনায়কতন্ত্র।

১৯২৮ খ্রিঃ বহুভাষাভাষী ও বহুধা বিভক্ত সোভিয়েট রাশিয়ায় সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হয়। স্তালিন বজ্রের দৃঢ়তায় ও ঝঞ্ঝার দ্রুততার সঙ্গে এই পরিকল্পনাগুলির রূপান্তর ঘটিয়ে পশ্চাদপদ রাশিয়ায় আধুনিকতার জোয়ার এনেছিলেন।

তাঁরই উদ্যোগে মধ্য রাশিয়ার উষর প্রান্তর ছুঁয়ে লেনিনগার্ড থেকে ব্লাডিভস্টক পর্যন্ত বিশ্বের দীর্ঘতম রেলপথে বৈদ্যুতিকরণ করা হয়।

এছাড়া উদ্ধার করা হয় লক্ষ লক্ষ একর জমি যা বাঁধ ও খাল খনন দ্বারা কৃষিযোগ্য করে তোলা হয়। কৃষকদেরও আধুনিক প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত করে তোলা হয়।

স্তালিনের গ্রামোন্নয়ন ও কৃষিবিপ্লব সার্থক করতে গিয়ে অবশ্য অনেক সময়েই সারা সোভিয়েটের জনগণকে অশেষ দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে। বারবারই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ হয়েছে বিঘ্নিত। দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে দেশে— প্রাণ হারিয়েছে হাজার হাজার কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ।

শিল্পবিপ্লবের অভিযানও ছিল সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনার অঙ্গ। ফলে অগ্রগতি এসেছে দ্রুত। কয়েক দশকের মধ্যেই সাক্ষরতার সার্থক অভিযানের ফলে গ্রামীণ জীবনে এসেছে আধুনিক জীবনের স্বাদ।

মাঝে মাঝে হঠকারী চেষ্টা থাকলেও সামগ্রিক ভাবে দেশের উন্নতি সাধন করেছেন স্তালিন। বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্মমতে বিশ্বাসী ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্লিষ্ট সোভিয়েট সমাজতন্ত্রে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচীত হয় তার প্রধান পুরুষ ছিলেন জোসেফ স্তালিন।

সংগ্রামী স্তালিন বিয়ে করেছিলেন দু'বার। তাঁর প্রথমা স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও সরল প্রকৃতির নারী। তাঁর অকাল মৃত্যুর পরে তিনি বিয়ে করেন অ্যালিনিভাকে। দ্বিতীয়া স্ত্রী বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। কিন্তু তিনি জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনায় স্তালিনের তুলনায় কিছুমাত্র ন্যূন ছিলেন না।

স্তালিন তাঁর সমালোচনা সহ্য করতেন না। পার্টির রাজনীতিতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অসংখ্য নিরীহ পার্টিকর্মী ও নেতাকে তাঁর রোষে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

তবুও তাঁর স্বৈরাচারিতার সমালোচনা মাথা তুলতে পারত না। কিন্তু প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী অ্যালিনিভা।

একসময় প্রকাশ্যভাবে রুশপার্টির কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। স্তালিনের রক্তচক্ষু তাঁকে ভীত করতে পারেনি। ফলে স্তালিন বিরোধিতার ফল পেতে হল তাঁকে—রাজনৈতিক হত্যার শিকার হয়েছিলেন তিনি।

স্তালিনের শাসন ব্যবস্থায়, ত্রিশের দশকের শেষদিকে কারণে অকারণে হাজার হাজার মানুষকে সাইবেরিয়ার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে দাস শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পাঠানো হতো।

সাধারণ মানুষ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, পার্টির বিশ্বস্ত ও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, সামরিক নেতৃত্ব নানা ভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

স্তালিনের আমলে সোভিয়েট উৎপাদন ব্যবস্থায় দাস-শ্রম ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাচীন গ্রিসের দাস-শ্রম ব্যবস্থার সমপর্যায়ভুক্ত।

সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় কোথাও কোন রাষ্ট্রীয় কল বা কারখানা, যৌথ খামারে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত হতে দেননি স্তালিন।

নিষ্ঠুরতা ও নরহত্যার দ্বারা সোভিয়েট রাশিয়ায় স্তালিন যেভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কণ্ঠরোধ করেছিলেন তা কেবল হিটলারের কুকর্মের সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে।

স্তালিন জমানায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপরে জবরদস্তি হয়েছে, নিবর্তন মূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার করে ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হয়েছে। এভাবেই সোভিয়েট দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতার বীজ রোপিত হয়েছিল।

সর্বহারারাজ কথার আড়ালে স্তালিন যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করেছেন, বিশ্বের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

পাশাপাশি একথাও সত্যি যে স্তালিনের দৃঢ় নেতৃত্বের ফলেই সোভিয়েট রাশিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয় এড়িয়ে জয়ীর আসন লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই স্তালিনের পরিচালনায় সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীন বা পরাধীন দেশগুলিতে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

স্নায়ুযুদ্ধে অনেক সময়েই সোভিয়েট রাশিয়া এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। বস্তুত, স্তালিন আমলের সোভিয়েট শাসন বিশ্বে মর্যাদার আসন লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

লেনিনোত্তর রাশিয়ায় স্তালিনের সর্বহারার সরকার গণতান্ত্রিকতার বদলে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারে পরিণত হয়েছিল সত্য। কিন্তু তাঁর জীবিতকালেই রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে স্তালিন ভজনা ও বন্দনা এমন স্তরে পৌঁচেছিল যে স্তালিন হয়ে উঠেছিলেন এক গগনস্পর্শী মহানায়ক। অন্য কোন মহানায়ক তাঁর মত এমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দীর্ঘকাল এমন দীর্ঘতম এক ভূখণ্ডে ভোগ করেন নি। তাঁর শাসনে সঙ্ঘটিত অসংখ্য ভুল, নিষ্ঠুরতা ও গণহত্যার ব্যাপক বিস্তার কোন যুগের ইতিহাসকেই এমনভাবে কলঙ্কিত করেনি।

গত কয়েক দশক যাবৎ সোভিয়েট সমাজে যেরূপ অবক্ষয়, অনটন ও পশ্চাদগামিতা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটেছে তার জন্য স্তালিন নিদের্শিত পার্টির একনায়কতন্ত্রই দায়ী। কালের নিয়মে স্তালিনের জীবদ্দশাতেই রুশ কমিউনিস্ট পার্টি সিক্রেট পুলিশ বাহিনীর হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিল। সুবিধাভোগী নীতিহীন একশ্রেণীর মানুষের অমানবিক ক্রিয়াকলাপ লেনিনের অক্টোবর বিপ্লবের সুমহান আদর্শকে বিপন্ন করে তুলেছে। যার পরিণতি নয়ের দশকে সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কসইজমের পতন।

১৯৫৩ খ্রিঃ মার্চ মাসে লৌহমানব স্তালিন সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

মাও সে তুং



রুশ অক্টোবর বিপ্লবের পরে যে দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়, সে দেশ হল চীন। এই পরিবর্তনের মূলে যাঁর ভূমিকা ছিল সবেচেয়ে উজ্জ্বল তিনি হলেন মাও সে তুং।

জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রমিকের সরকার স্থাপনে লেনিনের যেমন কৃতিত্ব, চীনে জাপানের বিরুদ্ধে এবং চিয়াং কাইসেক পরিচালিত কোওমিনটাং দলের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে শ্রমিক-কৃষকের সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠায় মাও সে তুং-এর কৃতিত্বও তদ্রুপ। সমস্ত বিশ্বে মাও সে তুং অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ রূপে স্বীকৃতিলাভ করেন।

মাও-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যে, তিনি পাশ্চাত্যের মার্কস-লেনিনবাদের অন্ধ অনুকরণ না করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে, চীনের সাধারণ মানুষ, শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবীদের প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসারী করে গঠন করেছিলেন।

তিনি লেনিন প্রচারিত মার্কসের মতবাদকে চীনের জলবাতাস, ইতিহাস, ধর্মচেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এক অভিনব প্রাচ্য ধাঁচের সাম্যবাদ দেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কেননা তিনি জানতেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মানুষের চিন্তা, জীবনধারা ও সমাজভাবনায় যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই বাস্তব অবস্থাকে অবজ্ঞা করে সমাজবিপ্লব সার্থকতা মন্ডিত করা সম্ভব হবে না।

মহান নেতা মাও সে তুং-এর জন্ম ১৮৯৩ খ্রিঃ ২৬শে ডিসেম্বর হুনানের এক কৃষক পরিবারে।

ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে কৃষিকাজে সহায়তা করতে হতো তাঁকে। ফলে পড়ার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও স্কুলে যেতে পারতেন না। বাবাকে বলেও লাভ হত না, তিনি বলতেন, কৃষিকাজে মন দেবার কথা—লেখাপড়া করে কি হবে?

শেষ পর্যন্ত অদম্য আগ্রহ বশে মাও তাঁর এক ধনী বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করে স্কুলে ভর্তি হলেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই মাও স্কুলের পাঠ্য বইয়ের বাইরে বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়াশুনা করতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন। মনীষীদের জীবন ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের বই পাঠেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি।

চীনের ইতিহাস পাঠ করে মাও জানতে পারেন, ১৮৫০ খ্রিঃ থেকে ১৮৬৫ খ্রিঃ পর্যন্ত চীনে কৃষক সমাজের উদ্যোগে যে বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয় তার নাম তাইপে বিদ্রোহ।

এই সূত্রে জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী মহান নেতা সান ইয়াৎসেনের বিষয়েও অবহিত হন। চীনে কৃষক বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়েছিল তাঁরই নেতৃত্বে, অবসান ঘটেছিল চীনের মাংচু রাজবংশের প্রজানিপীড়নের।

মাও চীনের সেই তাইপে বিদ্রোহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং বুঝতে পারেন এই সংগ্রামী ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করেই চীনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিশ্চিত হবে।

১৯৪৯ খ্রিঃ চীনে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করলে. মাও সে তুং তাইপে বিদ্রোহ ও সান ইয়াৎসেনের আন্দোলনকে সাফল্যের প্রেরণাদাতৃ শক্তি হিসেবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই ছাত্র শিক্ষক কৃষক শ্রমিক সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গেই মাও ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারতেন। পিকিং অবস্থান কালেই তিনি পরিচিত হন চিও সু চিউ-এর সঙ্গে। এই পন্ডিত মানুষটির উদ্যোগেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

যৌবনে মাও চীন সফরে বেরিয়ে সাংহাইতে উপস্থিত হন। এখানে তিনি এক ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধকালে ইংরাজ ও ফরাসীরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তার প্রতিবাদে।

প্রথম মহাযুদ্ধে চীন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে যুক্ত ছিল। যুদ্ধ শেষ হলে জার্মানীর সুযোগ সুবিধা ভোগের অধিকার জাপানকে দেওয়া হয়েছিল এক চুক্তির মাধ্যমে। এর ফলে চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বিঘ্নিত হয়।

চীনে জাপানের অনুপ্রবেশ ঘটলে সমগ্র চীনে প্রতিবাদ আন্দোলন দেখা দেয়। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সান ইয়াৎসেন। এই সময়ে ইংলন্ড বা ফ্রান্সের কাছ থেকে কোন প্রকার সহযোগিতা না এলেও লেনিন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। ফলে ক্যান্টনের কুওমিনটাং শক্তি সান ইয়াৎসেনের নেতৃত্বে জাপানের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে।

এই সময়ের জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলন তরুণ মাওকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

১৯২০ খ্রিঃ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পাঠ করার পর মাও নিজেকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেন।

১৯২১ খ্রিঃ মে মাসে কমিউনিস্টপার্টির প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগ দিতে তিনি সাংহাই যান। এর কিছুদিন আগেই তিনি বিবাহ করেন।

রুশ দেশের বলসেভিক দল এবং চীনের কুওমিনটাং দল যৌথভাবে চীনে প্রতিরোধ ফ্রন্ট গড়ে তুলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলে। রাজনীতি শিক্ষার জন্য এই সময় সান ইয়াৎ সেনের উত্তরসূরী হিসেবে চিয়াং কাইসেককে মস্কো পাঠান হয়। দেশে ফিরে তিনি কুওমিনটাং দলের নেতৃপদে বৃত হন। ঘোষণা করা হয় সান ইয়াৎসেনের ত্রয়ীনীতি—জনগণের জন্য জীবিকা, খাদ্য, স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব অর্জনে কুওমিনটাং ও বলসেভিক উভয় দল যৌথভাবে আন্দোলন সংগঠিত করবে।

জাপানের আক্রমণের মোকাবেলা করবার জন্য চীনকে সদাসর্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত। মাও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিষয়ে দেশের কৃষকদের সচেতন করবার জন্য ও ব্যাপক জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ত্রিশের দশকের শেষ দিকেই মাও চীনে এক অসাধারণ শক্তিশালী সাম্যবাদী দল গড়ে তুলতে সমর্থ হন। সারা বিশ্বে তিনি প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

লেনিন সোভিয়েট রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে যেভাবে শ্রমিকের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ঠিক একই ভাবে চীনে মাও জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই

করে, চিয়াংকাইসেক পরিচালিত কুওমিনটাং দলের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে পরাস্ত করে কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন।

তবে তিনি পাশ্চাত্যের মার্কস-লেনিনের প্রচারিত মার্কসবাদকে পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করেন নি। তাঁর সাম্যবাদ ছিল চীনের ইতিহাস ও ধর্মচেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরবর্তীকালে এই প্রাচ্য ধারার মার্কসবাদই বিশ্বে মাওবাদ নামে স্বীকৃতি লাভ করে।

ত্রিশের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত চীনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান ছিলেন জেনারেল চিয়াং কাইসেক। ইনি ধীরে ধীরে সান ইয়াৎসেনের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ থেকে সরে যান।

মাঞ্চুরাজবংশের দুঃশাসন থেকে চীনা কৃষকদের মুক্ত করতে পারলেও সান ইয়াৎসেন জীবনের সায়াহ্ন বেলায় বুঝতে পেরেছিলেন কৃষকদের জন্য জীবিকা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। তিনি সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক চেতনা ও চিন্তাকে নিয়োজিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

সান ইয়াৎসেনের মন্ত্রশিষ্য চিয়াং কাইসেকও গুরুর আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করতে পারেননি। সামরিক ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাচীর ভাঙ্গা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মাও পার্টির পাদপ্রদীপের আলোয় এসে চীনা জনগণের প্রিয় নেতা সান ইয়াৎসেনকে যোগ্য মর্যাদা দিতে ভুল করলেন না। তিনি মাদাম সান ইয়াৎসেনকে কমিউনিস্ট পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

মাও-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ছিল সান ইয়াৎসেনের ইচ্ছার স্ফুরণ। ফলে মাদাম সান ইয়াৎসেন হয়ে উঠলেন চীনের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। আর সাম্যবাদী মাও সে তুং স্বীকৃতি লাভ করলেন চীনের একমাত্র জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে এবং তার পরবর্তী সময়ে মাও হয়ে উঠেছিলেন চীনের সাধারণ মানুষের মহান নেতা। আর তাঁর পরিচালনায় সান ইয়াৎ সেনের আদর্শে পুষ্ট সাম্যবাদী দল সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতায় এক মহাশক্তিশালী জনমুখী জনদরদী ও বাস্তববাদী দলে পরিণত হল। ফলে চারের দশক থেকেই চীনের প্রাচীর অতিক্রম করে মাও-এর নাম বিশ্বরাজনীতির দরবারে হয়ে উঠল পরিচিত নাম।

চীনের জনদরদী নেতা সান ইয়াৎসেনের দূরদৃষ্টি, উদারতা, কৃষকদরদ তাঁর উত্তরসূরী চিয়াং কাইসেকের মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। ফলে সান ইয়াৎসেনের মৃত্যুর পরই চীনে কমিউনিস্ট মতবাদী ও জাতীয়তাবাদী কুওমিনটাং দলের মানসিকতার বদল ঘটেছিল।

কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বদলে বৃদ্ধি পায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতা। এই ঘটনা মাও সে তুংকে যথেষ্ট আহত করে। কিন্তু চীনে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

১৯২৭ খ্রিঃ থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনটাং পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবের ফলে এই গৃহযুদ্ধ দুই দশকেরও বেশি সময় স্থায়ী হয়।

চিয়াং কাইসেক একদা মস্কো থেকে বলসেভিক পার্টির নিকট রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনিই পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার জোতদার ও সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। এর ফলে হতাশ চীনের মানুষ কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী কুওমিনটাং দলের প্রতি শ্রদ্ধা হারায় এবং সাম্যবাদী দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এদেরই সাহায্যে মাও প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং সরকারের বিরুদ্ধে জনআন্দোলন ক্রমেই দুর্বার করে তুললেন।

মাও সে তুং এবং চু-তে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সর্বপ্রথম হুনান, উত্তর কুকিয়েন প্রভৃতি অঞ্চলে সোভিয়েট গঠন করেন। এই সব অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টন করে কৃষক ও শ্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নবপ্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট সরকার অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ফলে অসহিষ্ণু চিয়াং কাইসেক উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত সোভিয়েট চীন সরকারকে উৎখাত করবার জন্য বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন।

মাও-এর নেতৃত্বে ৬,০০০ সমর্থক ১৯৩৪ খ্রিঃ থেকে ১৯৩৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বারো হাজার বর্গমাইল পায়ে হেঁটে দক্ষিণের হুনান, ফুকেন, ইয়াংসি থেকে উত্তর পশ্চিমের শেনানি প্রদেশে পিছিয়ে যান। পশ্চাদপসরণের এই ঘটনা মানুষের ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই দীর্ঘ পদযাত্রাকেই বলা হয় লংমার্চ যা বিশ্বের ইতিহাসে এক নব চেতনার বার্তাবাহক।

বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে বহু নদী, বরফঢাকা পর্বত, জনহীন প্রান্তর, জলাভূমি অতিক্রম করে পশ্চাদপসরণকালে মাও যে কঠিন মনোবল ও সামরিক কুশলতার পরিচয় দেন তার ফলে পরবর্তীকালে তিনি বিশ্বের একজন অসাধারণ সংগঠক ও অসামান্য সমরবিশারদ নেতা হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেন।

চূড়ান্ত সাফল্যের সঙ্গে সমগ্র চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর জীবনের অপরাহ্ন বেলায় মাও-কে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে চীনের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন।

মাও-এর জীবিতকালেই চীনের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ছাত্র ও শ্রমিক কৃষক শ্রেণী চৌ-এন-লাই-এর চিন্তা ও চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলে সমগ্র চীনে অনিবার্য হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক বিপ্লব যা ছিল দেশের সংহতি ও সুস্থিতির পক্ষে এক অগণতান্ত্রিক জনবিরোধী আন্দোলনের নামান্তর। দেশের প্রভুত ক্ষতির কারণ হয়েছিল তথাকথিত এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

এই বিধ্বংসী সাংস্কৃতিক বিপ্লব অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। চীনের পার্টির বিশ্বস্ত নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যেই ধিকৃত ও নিগৃহীত হন—কমিউনিস্ট পার্টির ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পার্টির মধ্যেই দেখা দেয় তীব্র মতবিরোধ। সংস্কারকামী উদারপন্থী নেতৃবর্গ জনসমর্থন লাভ করেন।

এই সময় থেকেই চীনে মুক্ত অর্থনীতির প্রতি চীনের সাধারণ মানুষ ও কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে অল্পকালের মধ্যেই চীনে মুক্ত অর্থনীতি জোরদার হয়ে ওঠে।

সংস্কারপন্থী নেতৃবর্গের এই আদর্শ ও পদক্ষেপের বিরোধিতা করতে গিয়ে মাদাম মাও সে তুং থেকে শুরু করে মাওপন্থী কট্টর নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হন। চীনের সাধারণ মানুষ ও কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এই নেতৃবর্গ গ্যাং অব ফোর নামে ধিকৃত হন।

বর্তমানে মাও-এর চীনদেশে কমিউনিস্ট পার্টি সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তের দ্বারা দেশে বিদেশী পুঁজির আহ্বান ও মুক্তবাণিজ্য নীতি সার্থক ভাবে অনুসরণ করে চলেছে।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ



বিপ্লবী যুগের বিশিষ্ট বহ্নিশিখা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-এর অন্যতম পরিচয় তিনি অগ্নিপুরুষ ঋষি অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর জন্ম ১৮৮০ খ্রিঃ ৫ই জানুয়ারি।

ইয়ংবেঙ্গলের উত্তর-সাধক ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ আই. এম-এস এবং স্বাধীন ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা মনীষী রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতা দেবী—এঁরা হলেন শ্রী অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমারের জনক ও জননী।

ছেলেদের বাল্যকালেই কৃষ্ণধন দার্জিলিং-এর সেন্টপলস স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। পাঁচ থেকে সাত বছর বয়স হলে, তিন ছেলেকে নিয়ে তিনি ১৮৭৯ খ্রিঃ সস্ত্রীক ইংলন্ড যাত্রা করেন।

সমুদ্র বক্ষে জাহাজেই জন্ম হয় বারীন্দ্রকুমারের। এক বছর বয়স হলে তিনি মা ও দিদির সঙ্গে ভারতে আসেন।

১৯০১ খ্রিঃ দেওঘর বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাস করেন। পাটনা কলেজে

এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু ছয় মাস পড়ার পর ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পড়াশুনা সম্পূর্ণ না করেই পাটনা কলেজের কাছে একটি চায়ের দোকান খোলেন।

সেই সময়ে অরবিন্দ বরোদা কলেজে অধ্যাপনা করছেন। বারীন্দ্রকুমার ব্যবসায়ের মূলধনের আশায় বরোদায় অরবিন্দের কাছে আসেন। এরপর থেকেই তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়—তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

সেই সময় বঙ্গ দেশে পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন। দিনে দিনে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। এরই পাশাপাশি সঙ্গোপনে আরম্ভ হয়েছে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি প্রসারের কাজ।

১৯০২ খ্রিঃ প্রথম অনুশীলন সমিতি নামে যে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হল, তার সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র।

পি. মিত্রের বাড়ি নৈহাটিতে এবং তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেই তিনি পেয়েছিলেন রাজনৈতিক প্রেরণা ও দীক্ষা। তাই তিনি বঙ্কিমের অনুশীলনবাদের জীবন দর্শনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গুপ্ত সমিতির নাম দিয়েছিলেন অনুশীলন সমিতি।

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের দ্বারা ইংরাজ বিতাড়নের প্রথম স্বপ্ন দেখেন বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামের বীর যুবক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে তাঁরই নাম হয়েছিল নিরালম্ব স্বামী।

যতীন্দ্রনাথ বরোদায় এসে সৈন্যবিভাগে কাজ নিয়ে কয়েক বৎসর মিলিটারি ট্রেনিং গ্রহণ করে নিজেকে বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনার উপযোগী করে তোলেন।

এই সময়েই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় অরবিন্দের। তাঁরই প্রভাবে অরবিন্দ বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতারূপে ভারতের কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। বস্তুতঃ যতীন্দ্রনাথই ছিলেন বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের 'ভগীরথ'।

বরোদায় অবস্থান করেই গোড়ার দিকে অরবিন্দ কলকাতার গুপ্তসমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। বারীন্দ্র বিহার থেকে তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁকে সংগঠনের দায়িত্ব দিয়ে কলকাতায় পাঠান।

কয়েক বছর পরেই তিনি বরোদার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন এবং নিজেকে সর্বতোভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিমজ্জিত করেন।

কলকাতায় যুগান্তর দলের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মানিকতলায়, মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে। এখানে এসেই বারীন্দ্র, অবিনাশ ভট্টাচার্য, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংগঠনের কাজে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। দলে শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য তখন চারদিক থেকেই ছেলে সংগ্রহ করা হচ্ছে। কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরে যুগান্তর দলের শাখাও খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

গুপ্ত সমিতিগুলিতে কর্মীদের লাঠিখেলা, অসিচালনা, সাইকেল অভ্যাস, অশ্বারোহণ, বক্সিং, বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত।

বাংলার বিপ্লবপন্থীদের প্রেসিডেন্ট পি.মিত্রের কলকাতার আপার সার্কুলার রোডে একটি বাড়ি ছিল। এখানেই আগে থেকে অনুশীলন সমিতির কার্যালয় ছিল। সেখানে কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতির অনুশীলন চর্চা হত।

বারীন্দ্রকুমার প্রথমে এখানে এসেই কাজ আরম্ভ করেছিলেন যুগান্তর দলের কর্মী হিসেবে। এখানকার প্রধান কর্মী ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতৃত্বের প্রশ্নে কিছুদিনের মধ্যেই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে বারীন্দ্রের অন্তর্বিরোধ শুরু হয়। তা গড়াল অনেকদূর পর্যন্ত।

শেষ পর্যন্ত বরোদা থেকে অরবিন্দ কলকাতায় এলে এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। যুগান্তর দলের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় মানিকতলার মুরারিপুকুরে। তাঁরই পরিকল্পনায় এখানে বোমা তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়।

বিপ্লবী সংগঠনের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিজের স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রি করে মানিকতলার বাগানে বোমার কারখানা স্থাপনের অর্থ সরবরাহ করেছিলেন।

কেবল তাই নয়, পরবর্তী সময়ে বারীন্দ্রকুমার যখন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকীকে বোমা দিয়ে মজঃফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারবার জন্য পাঠান, তার যাবতীয় ব্যয় অমরেন্দ্রনাথ সরবরাহ করেছিলেন উত্তরপাড়ার রাজা প্যারিমোহনের পুত্র মিছরীবাবুর কাছে অর্থ সংগ্রহ করে।

এসব কাজ তিনি এমনই সংগোপনে করেছিলেন যে গোয়েন্দা পুলিশ কিছুই জানতে পারে নি।

সংগঠন গড়ার কাজে বারীন্দ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা সহ ওড়িশা ও আসামে ভ্রমণ করেন। তাঁর চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটিও তৈরি হয়।

পূর্ববঙ্গের ছোটলাট র‍্যামফীল্ড ফুলার ছিলেন খুবই অত্যাচারী। ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করবার উদ্দেশ্যে তাঁর অত্যাচার ও উৎপীড়ন বিপ্লবীদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল।

বারীন্দ্র ফুলার হত্যার পরিকল্পনা নিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রংপুর থেকে বিপ্লবী তরুণ প্রফুল্লচাকীকে নির্বাচন করে কলকাতায় নিয়ে আসেন। কিন্তু প্রফুল্ল চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

এরপর মজঃফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য বারীন্দ্র ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুরে পাঠালেন।

বিপ্লবীদের এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লর বোমায় নিহত হন মিসেস ও মিস কেনেডি নামে দুজন ইংরাজ মহিলা। কিংসফোর্ডের ফিটনগাড়িতেই বাড়ি ফিরছিলেন এই দুজন, গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না।

বোমা ছুঁড়ে দিয়েই প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম পলায়ন করেন। দুজন দুদিকে যান। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ বোমা বিস্ফোরণের অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ওয়াইনি স্টেশনের কাছে ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন, প্রফুল্লও কয়েকদিনের মধ্যে। পুলিশের লোক তাঁকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হলে মোকামাঘাট স্টেশনে প্লাটফর্মের ওপরে নিজের রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

মজঃফরপুরেই ক্ষুদিরামের বিচার হল। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নেন।

মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণের পরেই ইংরাজ সরকার দেশের চতুর্দিকে খানাতল্লাসী করে বিপ্লবী আন্দোলনের ও গুপ্তসমিতির ঘাঁটি আবিষ্কারের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা মানিকতলায় মুরারিপুর বাগানে বিপ্লবী আন্দোলনের এক প্রধান ঘাঁটি পুলিশ আবিষ্কার করে ফেলল।

এখানে পাওয়া গেল বোমা তৈরীর যন্ত্রপাতি, ডিনামাইট, বন্দুক, পিস্তল, রাইফেল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র এবং বোমা তৈরি ও গুপ্ত সমিতি সংগঠন শিক্ষার আবশ্যকীয় বই ও কাগজপত্র।

মুরারিপুকুরের পর কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে এবং বিভিন্ন জেলা থেকে খানাতল্লাসী করে সরকার বহু বিপ্লবী নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করে ফেলল।

অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, উল্লাসকর, সত্যেন বসু, কানাইলাল দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, নরেন গোঁসাই, চারুচন্দ্র রায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি জনা যাটেক গ্রেপ্তার হলেন।

সরকার এঁদের নামে ষড়যন্ত্রের মামলা রুজু করলেন। এই মামলা মানিকতলা বোমার মামলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এই মামলার বিচার হয়েছিল আলিপুর আদালতে ইংরাজ জজ বীচক্রফটের এজলাসে। মানিকতলা বোমার মামলা ১৯০৮ খ্রিঃ আরম্ভ হয় এবং প্রায় দুই বৎসর পরে শেষ হয়।

মামলা আরম্ভ হবার পরেই ধৃত আসামীদের মধ্যে শ্রীরামপুরের নরেন গোস্বামী নিজে মুক্তিলাভ করার আশায় রাজসাক্ষী হয়ে সকল আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য প্রস্তুত হয়।

গ্রেপ্তার হবার পরেই বারীন্দ্র নিজেও পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি করেন এবং অন্যান্য সহকর্মীদেরও স্বীকারোক্তি দিতে প্ররোচিত করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে বিপ্লব প্রচেষ্টার কথা জানানো। আর সবকিছু দায়িত্ব নিজেদের মাথায় টেনে নিয়ে অরবিন্দকে আড়াল করে রাখা। বারীন্দ্র তাঁর স্বীকারোক্তির সপক্ষে বলেছিলেন "Who did not mean or esepect to liberate our country by

killing a few Enghlishmen. We wanted to show people how to dare and die. My mission is osver''. দলের একমাত্র হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) স্বীকারোক্তি করেন নি।

১৯০৫-'৬ খ্রিঃ থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বৈপ্লবিক কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বি.এন.আর লাইনের নারায়ণগড় স্টেশনে ছোটলাটের স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দেবার জন্যে যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা ডিনামাইট পাতেন। কিন্তু কার্যকালে ডিনামাইট ভালভাবে ফাটল না।

কেবল প্রচন্ড একটা শব্দ হয়। ফলে লাটসাহেবের গাড়ি সামান্য দুলে উঠেছিল মাত্র। পরে পুলিশ তদন্ত করে গোটাকতক নির্দোষী কুলিকে ধরে চালান দেয় এবং আদালতে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণে কুলিদের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে সাত বৎসর থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মানিকতলা বোমার মামলা চলার সময়ে বারীন্দ্র তাঁর জবানবন্দিতে এই ট্রেন ওড়াবার রহস্য প্রকাশ করে বলেন এবং ওটা যে তাঁদেরই কাজ তা স্বীকার করেন। তাঁর এই জবানবন্দির ফলে নির্দোষ কুলিরা মুক্তিলাভ করে।

বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই চেষ্টা করেও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার স্বীকারোক্তি সম্পূর্ণ করতে পারেনি। তার আগেই জেলের ভেতরে বাইরে থেকে বিপ্লবীদের পাঠানো রিভলবার দিয়ে সত্যেন বসু ও কানাইলাল দত্ত মিলিতভাবে তাকে হত্যা করে চিরতরে তার কণ্ঠরোধ করে দেন।

বিচারে সত্যেন ও কানাই-এর ফাঁসি হল।

মানিকতলা বোমার মামলার অভিযুক্তদের মধ্যে দুজন এভাবেই বিদায় নিলেন, মামলার রায় বেরবার আগেই।

১৯০৯ খ্রিঃ ৬ই মে মামলার রায় বেরলো। বারীন ও উল্লাসকরকে দেওয়া হল মৃত্যুদন্ড।

উপেন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, বিভূতি সরকার, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ঋষীকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়কে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দীপান্তর।

পরেশ মৌলিক, নিরাপদ রায় ও শিশির ঘোষের দশ বছর কারাদন্ড। অশোক নন্দী, বালকৃষ্ণ হরিকানে আর শিশির সেনের সাত বছর। কৃষ্ণজীবন সান্যাল এক বছর। বাকী সকলে মুক্ত।

অরবিন্দও মুক্তি পেলেন, তবে তখন তিনি আর শুধু বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ নন। কারা জীবনে ইতিমধ্যেই তাঁর মধ্যে প্রকাশ লাভ করেছেন জ্যোতির্ময় ঋষি অরবিন্দ।

বারীন্দ্র আর উল্লাসকরের মৃত্যুদন্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হল

হাইকোর্টে। ফলে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে এই দুজনকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দীপান্তর।

আলীপুর কোর্টের সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস মানিকতলা বোমার মামলা পরিচালনায় সরকার পক্ষের একজন বড় কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বিপ্লবী দলের রীতিমত একজন ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী।

অরবিন্দ বারীন্দ্র প্রভৃতি প্রধান নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হবার পর বিপ্লবীদলের পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ওপর। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাঠালেন চারু বসুকে। তিনি দিনদুপুরে আলিপুর আদালতে আশু বিশ্বাসকে গুলি করে হত্যা করেন।

আশু বিশ্বাসকে শেষ করে যতীন্দ্রনাথ নজর দিলেন সামশুল আলমের ওপরে।

সামশুল আলম ছিলেন কলকাতা পুলিসের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট। মানিকতলা বোমার মামলা পরিচালনায় সরকার পক্ষের সবচেয়ে বড় করিতকর্মা লোক। ইনি প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন বোমার মামলার আসামীদের যেন অনেক কয়জনকে ফাঁসিতে লটকাতে পারেন।

মিথ্যা প্রমাণ এবং সাক্ষী প্রস্তুত করার কাজে ইনি ছিলেন মহা ধুরন্ধর। বারীন্দ্রপ্রমুখ বোমার মামলার আসামীরা আদালতের খাঁচাব ভেতরে দাঁড়িয়ে সামশুল আলমকে দেখে গান করতেন—

ও হে সামশুল
তুমি সরকারের শ্যাম, আমাদের শূল।
কবে ভিটেয় তোমার চরবে ঘুঘু
তুমি চোখে দেখবে সরষের ফুল।।

সামশুলের ভিটেয় ঘুঘু চরাবার গুরুভার নিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ। তাঁর মৃত্যু দণ্ডই নির্ধারণ করেছিলেন তিনি। মানিকতলা বোমার মামলার তদন্তের কর্তৃত্ব নিয়ে তিনি বিপ্লবীদের সর্বনাশ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁকে রেহাই দেওয়া যায় না।

কিন্তু সামশুল মস্ত ঘুঘু, তাকে বাগে পাওয়া ভয়ানক শক্ত। তিনি সর্বদা অতি সাবধানে থাকেন। ইংরাজ সরকার তাঁকে সদাসর্বদা সতর্ক প্রহরায় রাখার ব্যবস্থা করেছে। তাকে নাগালে পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু বিপ্লবীদের অভিধানে তো অসম্ভব কথাটা লেখা থাকে না। অসম্ভবকে সম্ভব করাই তাঁদের কাজ।

সামশুল আলমকে হত্যার জন্য যতীন্দ্রনাথ নির্বাচন করলেন তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্য বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে।

১৯১০ খ্রিঃ ২৪শে জানুয়ারি দুপুরবেলা বীরেন তাঁর অপর সঙ্গী সতীশ

সরকারকে নিয়ে হাইকোর্টে এলেন। বীরেন সামশুলকে চিনতেন না, সতীশ চিনতেন। বীরেনকে দেখিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

বীরেন হাইকোর্টের বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। সামশুল যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাচ্ছিলেন, তখন বীরেন তাঁর সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি সামশুল আলম?

সামশুল হাঁ বলে জবাব দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বীরেন পকেট থেকে রিভলবার বার করে সামশুলের বুকে গুলি কবলেন।

পলক মধ্যে বিপ্লবীদের শত্রু সামশুল আলম বারান্দায় লুটিয়ে পড়লেন। আর চারদিক থেকে খুন খুন বলে চিৎকার করে রক্ষী, প্রহরী, চাপরাশী আরদালীর দল ছুটে এল বীরেনকে ধরতে।

তখনো বীরেনের রিভলবারে কয়েকটি গুলি অবশিষ্ট ছিল। সেই গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তিনি বারান্দা দিয়ে নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু এক সময় গুলি ফুরিয়ে গেল, বীরেন ধরা পড়ে গেলেন। বন্দি অবস্থায় পুলিসের অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেও দলের কোন কথা প্রকাশ করেন নি বীরেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়েছিল।

মানিকতলা বোমার মামলার আসামী বারীন্দ্রকুমার ১৯০৯ খ্রিঃ থেকে ১৯২০ খ্রিঃ পর্যন্ত কারারুদ্ধ ছিলেন।

মুক্তিলাভের পর পন্ডিচেরীতে অরবিন্দর আশ্রমে কিছুদিন ছিলেন বারীন। সেই সময় বিখ্যাত বিজলী পত্রিকা প্রকাশ করেন।

প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ করে সংসারী হয়েছিলেন তিনি। ১৯৫০ খ্রিঃ থেকে দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

বারীন্দ্রকুমারের রচিত গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল, দ্বীপান্তরের বাঁশি, পথের ইঙ্গিত, আমার আত্মকথা, অগ্নিযুগ, ঋষি রাজনারায়ণ, The Tale of My Exile, Sri Aurobindo প্রভৃতি।

১৯৫৯ খ্রিঃ ১৮ই এপ্রিল বারীন্দ্রকুমারের মৃত্যু হয়।

ভগৎ সিং



১৯২২ খ্রিঃ গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার পর ভারতীয় রাজনীতিতে দলাদলি ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল। ১৯২৭ খ্রিঃ নাগাদ এই অস্থিরতা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এল। সেই সঙ্গে চারদিকে দাবি উঠল প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক সংস্কারের।

ভারতের দিকে দিকে জেগে উঠল নবজীবনের সাড়া। স্বাধীনতা ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার, আমরা চাই স্বাধীনতা।

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই অস্থিরতা লক্ষ্য করে বড়লাট লর্ড আরউইন একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন গঠন করার কথা ঘোষণা করলেন।

এই কমিশনের নাম সাইমন কমিশন। নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন প্রখ্যাত উদার নৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট সাংবিধানিক আইন বিশারদ স্যার জন সাইমন। তাঁর নামানুসারেই কমিশনের নাম হয়েছে সাইমন কমিশন।

কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন ভাইকাউন্ট বার্নহ্যাম, লর্ড স্ট্র্যাথকোনা, স্টিফেন ওয়েলিস, এডওয়ার্ড ক্যারোগান, মেজর এটলি ও কর্নেল লেনফক্স। কোন ভারতীয়কে এই কমিশনে নেওয়া হয়নি।

ব্রিটিশ সরকার নিয়োজিত এই কমিশন ১৯২৭ খ্রিঃ ভারতে এলো।

এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল ১৯১৯ খ্রিঃ সংস্কার আইন ভারতে কতটা কার্যকর হয়েছে তা পর্যালোচনা করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে রিপোর্ট পেশ করা। কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ না করায় ভারতে এই কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হল। কংগ্রেস ছাড়া মুসলিম লিগ সহ অন্যানা রাজনৈতিক দলগুলো কমিশনের গঠনতন্ত্রের নিন্দা করে।

যেখানে কমিশন যাচ্ছে, সেখানেই হচ্ছে হরতাল। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে—গো ব্যাক সাইমন।

কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ সর্বত্রই একই দৃশ্য। ১৯২৮ খ্রিঃ ৩০শে অক্টোবর কমিশন এলো লাহোরে। সমগ্র পাঞ্জাব সেদিন উত্তাল। কালো পতাকা হাতে কমিশনকে ধিক্কার জানাতে পথে বেরলো বিরাট মিছিল। মিছিলের পুরোভাগে পাঞ্জাবের অবিসংবাদী নেতা লালা লাজপৎ রায়। তিনিও ধ্বনি তুলছেন—গো ব্যাক সাইমন।

পুলিসবাহিনী তৈরিই ছিল। ইঙ্গিত পেয়ে হিংস্র হায়নার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের ওপর। এলোপাথারি চলল লাঠি।

পুলিশের লাঠির নির্মম প্রহারে প্রবীণ নেতা লালাজির সর্বাঙ্গ রক্তে লাল হয়ে গেল। তবু তিনি অবিচল কণ্ঠে ধ্বনি তুলছেন—গো ব্যাক সাইমন—সাইমন ফিরে যাও।

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে একসময় জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন লালাজি। সেই জ্ঞান আর কোন দিনই ফিরে এলো না তাঁর।

হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই। কয়েকদিন ধরে টানা চলল যমে-মানুষে টানাটানি। সব চেষ্টা ব্যর্থ করে শহীদ হলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নির্ভীক যোদ্ধা লালা লাজপৎ রায়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যোজিত হল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল এই দুঃসংবাদ। বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল ভারতবাসী। কিন্তু অন্যায় তারা মুখ বুজে মেনে নিতে রাজি ছিল না।

ওরা শাসক—সর্বক্ষমতার অধিকারী। হলেই বা ভারতবাসী পরাধীন—লালাজির হত্যার বিচার করবার অধিকার তো কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

স্বাধীনতাকামী তরুণের দল রক্তের অক্ষরে শপথ নিলেন—বিচার আমরাই করব।

পাঞ্জাবের বীর বিপ্লবী ভগৎসিং, শুকদেব রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ শপথ নিলেন—লাইফ ফর লাইফ। এছাড়া আর কোন হিসাব আমরা মানব না।

পুলিসের বড়কর্তা মিঃ স্কটের হুকুমে সেদিন মিছিলের ওপরে আক্রমণ চালিয়েছিল পুলিস বাহিনী। তাকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এই অন্যায় কাজের জন্য। মিঃ স্কটের ক্ষমা নেই।

একমাস পরে ১৭ই ডিসেম্বর। সেদিন অপরাহ্ণ চারটে সাঁইত্রিশ মিনিটেব সময় দেখা গেল পুলিস দপ্তরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন ভগৎ সিং, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ বিপ্লবীগণ।

তাঁরা আগেই খবর নিয়ে জেনেছেন, মিঃ স্কটের অফিস থেকে বেরিয়ে আসার সময় এটাই। সেই জন্য তাঁরা রিভলবার তৈরি রেখে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন।

হঠাৎ দেখা গেল মিঃ স্কট মোটর সাইকেল নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পলকের মধ্যে রাজগুরুর হাতের অস্ত্র গর্জন করে উঠল—দ্রাম—দ্রাম—।

রাজগুরুর অব্যর্থ গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন মিঃ স্কট। তবু নিশ্চিত হবার জন্য এবারে গর্জন করল ভগৎ সিংয়ের হাতের অস্ত্র। গুলির শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে এলেন একজন ইউরোপীয়ান সার্জেন্ট আর মিঃ স্কটের দেহরক্ষী চন্দন সিং।

চন্দ্রশেখর আজাদ এবার অস্ত্র তুললেন। তাঁর অব্যর্থ গুলিতে মুখ থুবড়ে পড়ল চন্দন সিং।

হৈ-চৈ চিৎকার চ্যাঁচামেচির মধ্যে কে কোথায় পালিয়ে গেল কেউ তার হদিস পেল না।

বিপ্লবীদের দুর্ভাগ্য, সেদিন মস্ত বড় ভুল হয়েছিল তাঁদের। গুলিতে সেদিন নিহত হয়েছিলেন একজন পুলিস অফিসার মিঃ স্যান্ডার্স—স্কট নন।

এরপর যা হবার তাই শুরু হল। তদন্ত আর নির্বিচারে গ্রেপ্তার। সরকার হত্যাকারীর সন্ধানে মরিয়া হয়ে উঠল।

প্রতিবাদে ফুঁসে উঠল বিপ্লবী তরুণের দল। অভিনব উপায়ে তাঁরা সরকারকে তাঁদের চ্যালেঞ্জের ঘোষণা জানালেন।

হত্যাকান্ডের চারদিন পরে, ২৯শে ডিসেম্বর শহরে সর্বত্র এক ইস্তাহার বিলি করা হয়েছে। তাতে বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ঃ

'এতদ্বারা মহামান্য সরকার ও পুলিসবাহিনীকে অবগত করা হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে কেউ স্যান্ডার্সের হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলে, হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির সামরিক অধিকর্তার তরফ থেকে তাকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে।'

কয়েকদিন পরেই ভগৎ সিং চলে এলেন কলকাতায় কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য। বিপ্লবের পীঠভূমি কলকাতা। বাংলার বিপ্লবীরা সাদরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কিছু অস্ত্রশস্ত্র আর গোটা কতক বোমা নিয়ে ভগৎ সিং ফিরে গেলেন লাহোরে। এবারে তাঁর সংকল্প আরো শক্ত আঘাত হানতে হবে যাতে সাগরের ওপারে শাসকের আসন টলে ওঠে। গোটা সাম্রাজ্য তোলপাড় হয়। বিপ্লবীদের একটাই বীজমন্ত্র, কর্তব্য সাধন কিংবা শরীর পাতন।

স্বাধীনতা তো হেসেখেলে আসে না। তার জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে হয়। জাতিকে হতে হয় নির্ভয়। বিপ্লবীদের তাই তাদের সবচাইতে প্রিয় জিনিসটিকে বন্ধক রেখেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। হাসতে হাসতে তাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেন।

বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়া ইংলন্ডে তাঁর বিচারকালে আদালতে দাঁড়িয়ে বিপ্লবীদের বীজমন্ত্র দৃপ্তকণ্ঠে প্রচার করে বলেছিলেন ঃ

"The only lesson required in India at present is to learn how to die and the only way to fetch it is by dieing ourselves."

বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়াই প্রথম শহীদ যিনি বিদেশের কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত ভগৎ সিং। প্রাণ উৎসর্গ করতে হবে অকাতরে। মৃত্যুভয়ে ভীত সাধারণ ভারতবাসীকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

পরিকল্পনা রূপায়িত হল ১৯২৯ খ্রিঃ ৬ই জুন। দিল্লীর অ্যাসেমব্লিতে সেদিন কতকগুলি জরুরী বিল নিয়ে আলোচনা হবে। বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন মিঃ সাইমন আর স্পীকার বল্লভভাই প্যাটেল।

আলোচনা শুরু হয়েছে এমনি সময়ে দুই বলিষ্ঠ তরুণ গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ইস্তাহার ছড়িয়ে দিলেন গোটা অ্যাসেমব্লি হলে। সঙ্গে সঙ্গেই হল প্রচন্ড বিস্ফোরণ—বুম্‌ম্‌বুম্‌—

ধোঁয়ায় ঢেকে গেল চতুর্দিক। হৈ হৈ চিৎকার চেঁচামেচি।

ধোঁয়া সরে গেলে চিৎকার উঠল—কে—কে করেছে এমন কাজ?

হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে ধীর অবিচলিত ভাবে এগিয়ে গেলেন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। তাঁরা জানালেন, 'কাউকে হত্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তা যদি থাকত তাহলে সাইমন এতক্ষণ ওখানে বসে থাকতে পারতেন না। আমাদের উদ্দেশ্য পাবলিক সেফটি বিলের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো।'

"It takes a loud voice to make the deaf hear. —Let the government know that while protesting against the public safty and Trade Dispute Bills and call our murder of Lala Lajpat Rai, on behalf of the helpess Indian mas, we want to emphasise the lesson often repeated by history that it is easy to kill individuals but you can not kill ideas. Great empires crumbled while ideas survive .....

We are sorry to admit we attach great sanctity to human life. But the sacrifice of individuals at the alter of great revolution that will bring freedom to all rendering exploitation of man by man impossible in inevitable. Long live Revolution."

একটা মাত্র বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গোটা ভারতবর্ষের সঙ্গে তোলপাড় হয়ে গেল ইংলন্ড।

এরপরই শুরু হল ব্যাপক গ্রেপ্তার। একে একে গ্রেপ্তার করা হল শুকদেব, রাজগুরু, যতীন দাস প্রমুখ বিপ্লবীদের। যতীনদাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কলকাতায়। তারপরই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় লাহোরে।

গ্রেপ্তারের পর পরবর্তীকালে যতীন দাস দীর্ঘ তেষট্টি দিনের অনশনের পরে দেহরক্ষা করে স্বাধীনতা সংগ্রামেব ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের যোজনা করেছিলেন।

১৯২৯ খ্রিঃ ১০ই জুলাই শুরু হল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

প্রধান আসামী ভগৎ সিং, শুকদেব, বটুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরু, যতীনদাস প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ। মোট চব্বিশ জন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং স্যান্ডার্স হত্যা।

যতীন দাস চলে গেলেন তেষট্টি দিন অনশনের পরে।

ঐতিহাসিক লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় আদালতে ভগৎ সিং যে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছিলেন, সারা দেশ, সারা পৃথিবী সেদিন চমকে উঠেছিল।

তিনি বলেছিলেন, "Revolution does not necessarily involve sanguinary strife, not is there only place in it for individual vendetta. It is not the cult of bobs and pistol. By 'Revolution' we mean that the present order of things which is baesed on manifest injustice must change.

There should be radical change to re-organise the society on a sociolistic basis, so that exploitation of man by man or of nation by nation is brought to an end ushering is an era of Universal peace.....

This is our ideal. It (our warning) goes unheeded and the present system of Government continues, a grim struggle must ensue to have the way for the consummation of the ideal of revolution."

এই বিবৃতির পরেই আর কিছু বক্তব্য আছে কিনা আদালত তা জানতে চাইলে ভগৎ সিং দৃপ্তকণ্ঠে ধ্বনি তুললেন—"ইনকিলাব— জিন্দাবাদ— ইনকিলাব— জিন্দাবাদ—"

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অভিযুক্ত বন্দিরা গলা মেলালেন—ইনকিলাব জিন্দাবাদ— বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

বিচার শেষ হল ৭ই অক্টোবর। ভগৎ সিং শুকদেব এবং রাজগুরুকে দেওয়া হল প্রাণদন্ড।

১৯২৯ খ্রিঃ ১০ই জুলাই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রথম শুনানী আরম্ভ হয়েছিল। ১৯৩০ খ্রিঃ ৭ই অক্টোবর দীর্ঘ পনের মাস পরে মামলার রায় বের হয়।

মাসিক ভারতবর্ষ (১৩৩৭, অগ্রহায়ণ) পত্রিকায় এই মামলা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল ঃ

"..... লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার আইনের ইতিহাসের দিক দিয়া বিশেষ স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, কারণ—এই মামলায় দুইবার বিচারক বদলাইতে হইয়াছে। দুইজন বিচারক স্বেচ্ছায় এই মামলা পরিচালনে অস্বীকার করেন এবং বড়লাট লর্ড আরউইনকে তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতার বলে বিচার শীঘ্র শেষ করিবার জন্য 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা আর্ডিন্যান্স' প্রয়োগ করিতে হয়।

আসামীরা এই অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদকল্পে আদালতে আসিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু আইন ও পুলিশ কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সুস্থ দেহে আদালতে আসার পরিবর্তে, এমনি ঘটনাবিপর্যয় হয় যে, কয়েক জনকে দোলায় চড়িয়া আসিয়া মামলা শুনিতে হইয়াছিল।

এই প্রহারের ব্যাপারের পর ট্রাইবুন্যালের সভাপতি জাস্টিস কোলস্ট্রিম ও কমিশনার আগা হায়দর এই মামলার সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাঁহাদের

শূন্যস্থানে নূতন বিচারক হইয়া আসিলেন জাস্টিস ট্যাপ ও স্যার আবদুল কাদের। বিচার শেষ হইল।"

রায়ের বিরুদ্ধে ভগৎ সিংয়ের পিতা সর্দার করণ সিং প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করবার জন্য আদালতে এক আবেদন পেশ করলেন।

এই কথা জানতে পেরে ভগৎ সিং তাঁর পিতাকে লিখলেন ঃ

"আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য আপনি স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারপতিদের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া আমি মর্মাহত হইয়াছি। এই কঠিন আঘাত স্থিরভাবে সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার এই আবেদন ভিক্ষা আমার মানসিক শাস্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিয়াছে।

আপনি আমার জীবনকে যতখানি মূল্যবান মনে করেন, আমি তাহা মনে করি না। আমার আদর্শকে বলি দিয়া আমার প্রাণকে রক্ষা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমার বহু সহকর্মীর অবস্থা আজ ঠিক আমারই মত গুরুতর। আমরা সকলে একই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং এতকাল একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আসিয়াছি। শেষ পর্যন্তও আমরা ঠিক সেই ভাবেই থাকিব। উহাতে আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি যত গুরুতরই হোক না কেন, কোন ক্ষতি নাই।

পূর্বে আমার যে অভিমত ছিল, আজও তাহা স্থির আছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করিলে বোরস্ট্যাল কারাগারে আমার যে বন্ধুগণ বন্দি হইয়া আছেন তাঁহাদের প্রতি আমার বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।" (ট্রিবিউন পত্রিকা থেকে গৃহীত)

জাতীয় বীর ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির হুকুম শুনে ভারতবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দিকে দিকে আওয়াজ উঠল—ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি হলে আমরা তা সহ্য করব না।

এই পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল গান্ধী ও বড়লাট লর্ড আরউইনের মধ্যে এক চুক্তির ফলে। এই চুক্তিকে দিল্লি চুক্তিও বলা হয়।

১৯৩১ খ্রিঃ ৫ই মার্চ গান্ধী আরউইন চুক্তিব শর্ত অনুযায়ী সরকার (১) নিপীড়ন মূলক আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করে নেন (২) হিংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগে রাজনৈতিক বন্দিদের ছাড়া অন্যান্য সব বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হবে। (৩) সমুদ্রতীরে বসবাসকারী অধিবাসীদের নিজেদের প্রয়োজনে লবন তৈরি করা এবং বিলিতী মদ ও বস্ত্রের দোকানে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং করা বিধিসম্মত হবে। সরকার স্বীকার করে নেন (৪) ভারতের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং সংখ্যালঘু শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার সব দায়দায়িত্ব সরকারের হাতে রাখা হবে।

শর্ত অনুযায়ী রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হল। কেবল মুক্তি পেলেন না বিপ্লবীরা।

৫ই মার্চ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করেই গান্ধীজি সিমলা থেকে এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, এই চুক্তি সর্বতোভাবে গৃহীত হলে, সহিংস কাজের জন্য যাঁদের ফাঁসির হুকুম হয়ে আছে, তাঁরাও মুক্তি পাবেন বলে তিনি আশা করেন।

কিন্তু দেশবাসী প্রচন্ড ক্ষোভ ও দুঃখের মধ্যে ২৩শে মার্চ জানতে পারলেন, দেশবাসীর সকল আবেদন অগ্রাহ্য করে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে সেদিন লাহোর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

পরদিনই করাচিতে কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হবার কথা। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী সেদিন করাচির পথে।

এর পরের ঘটনা ভগৎ সিংয়ের এক সহকর্মী মুক্তিপ্রাপ্ত অজয় ঘোষ জানিয়েছেন ঃ

"বাইরে এসে সেদিন বুঝতে পারলাম, ভগৎ সিংয়ের মূল্য আমাদের দেশের কাছে কতখানি। তখনকার দিনে যত সভা হত, সেখানে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে শ্লোগান হত—ভগৎ সিং জিন্দাবাদ।

ভগৎ সিংয়ের নাম তখন লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে শোনা যেত, প্রতিটি যুবকের বুকে আঁকা ছিল তাঁরই মূর্তি। আমার বুক আনন্দে ও গর্বে ভরে যেত, যখন ভাবতাম—এমন একজন লোকের সহকর্মী ছিলাম আমি—যাঁকে আমি চিনতাম।

.... ১৯৩১ খ্রি মার্চ মাস, কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনের ঠিক পূর্বে একদিন তাঁদের ফাঁসি হয়ে গেল। ভগৎ সিংয়ের বয়স তখন চব্বিশও পূর্ণ হয়নি।

আমি করাচির পথে এ সংবাদ পেলাম। যারাই শুনল, শিশুর মতই কেঁদে উঠল। আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম।

একটা ধূমকেতুর মত ভগৎ সিং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে ক্ষণিকের জন্য উদয় হয়েছিল। কিন্তু তাঁর এই ক্ষণিক উদয় ব্যর্থ হয় নি। কোটি কোটি লোকের দৃষ্টি ছিল তাঁর ওপর নিবদ্ধ। তাঁরা তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল নূতন ভারতের আত্মার প্রতীক।

মরণে নির্ভীক, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল সে। সে চেয়েছিল আমাদের এই দেশে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে তুলতে এক স্বাধীন গণতন্ত্রের প্রাকার।"

ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে, ভারতবর্ষে ইনকিলাব জিন্দাবাদ এই মহামন্ত্রের উদগাতা বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন।

মাতঙ্গিনী হাজরা



স্বদেশীযুগের অন্যতম বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম মেদিনীপুর জেলার হোগলা গ্রামে ১৮৭০ খ্রিঃ ১৭ই নভেম্বর। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস মাইতি। বাল্য বয়সেই বিবাহ হয় ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে। নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন মাত্র ১৮ বছর বয়সে। এরপর থেকেই তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেন সমাজ সেবার কাজে।

পাড়াপ্রতিবেশীর সমস্ত রকম বিপদ আপদে মাতঙ্গিনী ছিলেন পরম সহায়। নিজে অতি সাধারণভাবে জীবন নির্বাহ করতেন। কিন্তু মানুষের রোগশোকে আশপাশের গ্রামে গিয়ে পর্যন্ত সেবার কাজ করতেন। এই সকল কারণে লোকে তাঁকে গান্ধীবুড়ি বলে ডাকত।

১৯২৯ খ্রিঃ ৩১শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হয়।

পরের বছর জাতির কাছে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ জনপ্রিয় করে তোলার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠকে প্রতিবছর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস রূপে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৩০ খ্রিঃ ২৬শে জানুয়ারী দিনটিকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস রূপে ঘোষণা করা হয়। সেই সময় থেকে দেশের সকল প্রান্তে এই দিনটি যথোপযুক্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে প্রতিপালিত হতে থাকে।

১৯৩২ খ্রিঃ ২৬শে জানুয়ারী মেদিনীপুরে কংগ্রেস কর্মীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর এক শোভাযাত্রা বার করে। মাতঙ্গিনী এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন।

সেই বছরই আলিনান লবণ কেন্দ্রে লবণ প্রস্তুত করে তিনি আইন অমান্য করে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। পুলিশ মাতঙ্গিনীকে কারারুদ্ধ না করে পায়ে হাঁটিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে পরে ছেড়ে দেয়।

এরপর জেলায় চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন শুরু হলে মাতঙ্গিনী তার সঙ্গে যুক্ত হন। গভর্নর ফিরে যাও ধ্বনি দিয়ে তিনি শোভাযাত্রা বার করলে গ্রেপ্তার হন। পরে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বহরমপুর জেলে বন্দী থাকেন।

১৯৩৯ খ্রিঃ মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস মহিলা সম্মেলনে মাতঙ্গিনী প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেন। এইভাবেই গ্রামের এক সাধারণ গৃহবধূ নির্ভীক স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়ে ওঠেন।

এই সময়ে সারা ভারতে স্বাধীনতার দাবী জোরদার হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের আন্দোলনের পাশাপাশি বিপ্লবী সংগঠনগুলোও দেশের নানা প্রান্তে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ১৯৪২ খ্রিঃ ১১ই মার্চ ভারতে পাঠান।

দিল্লিতে পৌঁছে ক্রীপস ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এই সময় তিনি যেসব প্রস্তাব দেন তার মধ্যে ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কোন প্রস্তাব ছিল না। এছাড়াও, ভারতের প্রতিরক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কোন ইচ্ছাও ব্রিটিশ সরকারের ছিল না।

এই সকল কারণে কংগ্রেস ক্রীপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ক্রীপসের মিশন ব্যর্থ হয়। সঙ্গতভাবেই এরপর কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার সব প্রচেষ্টাই শেষ হয়ে যায়। পরিণতিতে কংগ্রেস তথা গান্ধীজির মনে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

এই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও খুব ঘোরালো হয়ে ওঠে। পৃথিবী জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহ—জাপান দুর্বার গতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ দখল করে নেয়।

ভারতবর্ষও যুদ্ধের আওতার বাইরে ছিল না। মাদ্রাজ ও কলকাতায় জাপানের বিক্ষিপ্ত আক্রমণ জনগণের মনে ত্রাস সঞ্চার করে।

জাপানী আক্রমণের মোকাবেলার জন্য এই সময় জওহরলাল নেহরু ও মৌলানা আজাদ ভারতবাসীর প্রতি সর্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানান। গান্ধীজি, সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দও ব্রিটিশ শক্তিকে উৎখাত করে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

এই সময় গান্ধীজি ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে হরিজন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

গান্ধীজির এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারাও মেনে নেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪২ খ্রিঃ ৮ই আগস্ট কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি ঐতিহাসিক ভারত ছাড় বা Quit India প্রস্তাব অনুমোদন করে।

প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতের কল্যাণের জন্য, বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য, পৃথিবী থেকে নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদের অবসানের জন্য ভারতে ব্রিটিশ

শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে গেলেই ভারতীয় প্রতিনিধিরা একটি সাময়িক সরকার গঠন করবেন ও সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা করবেন।

গান্ধীজির এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর দেশ জুড়ে সূত্রপাত হয় ভারতছাড় আন্দোলন। এই আন্দোলন চলে দুই বছর—১৯৪২ খ্রিঃ ৯ আগস্ট থেকে ১৯৪৪ খ্রিঃ ৫ই মে পর্যন্ত।

অল্প সময়ের মধ্যেই গান্ধীজির আহূত ভারত ছাড় আন্দোলন শহর থেকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন প্রদেশে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়।

এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও প্রকৃতি মারাত্মক হয়ে ওঠে বিহারে। সেখানে বহু সরকারী কর্মচারী নিহত হয়। সরকারী সম্পত্তিও ধ্বংস হয়। থানাগুলি জনগণ দখল করে নেয়। কোন কোন অঞ্চলে গণবিক্ষোভ হিংসাত্মক হয়ে ওঠে।

রেলের লাইন উপড়ে ফেলা হয়। টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হয়। ডাকঘর পুড়িয়ে সরকারের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করা হয়।

বোম্বাই, নাগপুর, কলকাতা, পাটনা প্রভৃতি শহরে স্বেচ্ছাসেবীরা সরকারী কার্যালয় ও আদালতে ব্রিটিশ জাতীয় পতাকা সরিয়ে ফেলে ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করেন। পুলিশ গুলি চালালে অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রাণ হারান। ফলে ক্রমেই গণবিক্ষোভ কংগ্রেসের অহিংস আদর্শ লঙ্ঘন করে হিংসাত্মক হয়ে উঠতে থাকে।

এই সময়ে বাংলার মেদিনীপুর জেলার আন্দোলন এক মারাত্মক গণ-বিদ্রোহের রূপ নেয়। তার ব্যাপকতা ও তীব্রতা বেশি হয়ে ওঠে তমলুক ও কাঁথি মহকুমায়।

১৯৪২ খ্রিঃ ২৯শে সেপ্টেম্বর তমলুকে হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন দিক থেকে মিছিল করে এসে মিলিতভাবে থানা ও আদালত দখল করার জন্য অগ্রসর হতে থাকে।

লক্ষকণ্ঠে ধ্বনি উঠছে—ইংরাজ ভারত ছাড়। ইংরাজ ভারত ছাড়—

সুসজ্জিত ইংরাজ সেনাবাহিনীও প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল আদালত চত্বরের বাইরে।

উদ্দীপ্ত শোভাযাত্রা ক্রমেই এগিয়ে আসতে থাকে। আতঙ্কিত সৈন্যবাহিনী মিছিল ছত্রভঙ্গ করবার জন্য গুলি চালাল।

আহত স্বেচ্ছাসেবকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে এগিয়ে আসেন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী। পতাকা তুলে ধরে নেতৃত্ব দিয়ে মিছিলকে এগিয়ে নিয়ে চলেন।

বুকে তাঁর অদম্য শক্তি, মুখে বন্দেমাতরম মন্ত্র আর ডান হাতে উত্তোলিত জাতীয় পতাকা।

সেনাবাহিনী এবারে গুলি চালাল মাতঙ্গিনীর পতাকা ধরা হাতে। কিন্তু তিনি পতাকা মাটিতে পড়তে দিলেন না। রক্তাক্ত অবস্থায় অন্য হাতে তুলে নিলেন।

কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হতে না হতে পতাকাধরা বাঁ হাতেও গুলি বিঁধল। কিন্তু তবু পতাকা পড়ল না। রক্তাক্ত দুহাতে পতাকার দন্ড বুকের সঙ্গে জাপ্টে ধরে এগিয়ে চললেন তিনি।

পেছনে জনতা এবারে ছত্রভঙ্গ হল না। সুশৃঙ্খলভাবে অনুসরণ করে চলল তাঁদের নেত্রীকে। তাঁর আদর্শে তারা উদ্বেল, উদ্বুদ্ধ।

কিন্তু এই মহান দেশপ্রেম, এমন দীপ্ত প্রেরণা সহ্য করতে পারল না ইংরাজ সরকার। এবারে তারা গুলি চালাল মাতঙ্গিনীর বুক লক্ষ্য করে।

দুহাতে জাতীয় পতাকা জড়িয়ে ধরে বন্দে মাতরম ধ্বনি দিতে দিতে লুটিয়ে পড়ল মাতঙ্গিনীর প্রাণহীন দেহ।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নির্যাতিত হয়েছেন অসংখ্য সংগ্রামী, অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন জানা অজানা কত শত বিপ্লবীকর্মী। এঁদের সকলের নাম বা পরিচয় আমরা ক'জন জানি। এই বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অতুলনীয় কীর্তি ইতিহাস সগর্বে তার বুকে ধারণ করে আছে।

আমাদের কাছে সব শহীদই এক ও অভিন্ন। সেখানে মাতঙ্গিনী হাজরা বা সূর্য সেন কি বাঘা যতীন বা অরবিন্দ কার অবদান বেশি সে কথা ভারতবাসী কখনো ভাবে না। তাই তাঁদের স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে সকল শহীদের অবদান। তাঁদের নির্বিচার আত্মত্যাগের ফলেই যে আজ আমরা ভারতবাসীরা ভোগ করছি স্বাধীনতা।

জোয়ান অব আর্ক



ফ্রান্সের মুক্তিদাত্রী বীরাঙ্গনা ও সন্ন্যাসিনী জোয়ান অব আর্ক-এর জন্ম ফ্রান্সের সীমান্ত প্রদেশের ছোট্ট গ্রাম ডমবেরিতে, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। সকলে তাঁকে ডাকতো জানেৎ নামে।

গৃহস্থ চাষী পরিবারের মেয়ে, শিশু বয়স থেকেই ঘরকন্নার কাজে মাকে সাহায্য করতেন জানেৎ। কখনো ভাইদের সঙ্গে মেষের পাল নিয়ে চরাতে যেতে হতো। সংসারের নানান কাজে ব্যস্ত থাকলেও সকলের সঙ্গে গীর্জায় প্রার্থনা সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন তিনি।

ক্রুশবিদ্ধ যিশুর বেদীর নিচে নতজানু হয়ে প্রার্থনায় বসে তন্ময় হয়ে যেতেন জানেৎ। শিশু বয়স থেকেই তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করতেন এক আশ্চর্য পবিত্রতা।

এইভাবেই গ্রামের মুক্ত পরিবেশে সকলেব স্নেহ ভালবাসার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। যখন তেরো বছরের কিশোরী, একদিন গ্রীষ্মকালে বাড়ির বাগানে বসে আছেন।

চারদিক নির্জন নিস্তব্ধ। এমনি সময়ে হঠাৎ তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁকে ডাকছে। চমকে তাকিয়ে দেখেন মাথার ওপরে সূর্যের আলোকে ম্লান করে দিয়ে অপূর্ব উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন এক দেবদূত। তাকিয়ে আছেন জোয়ানের দিকে।

হাতদুটি প্রার্থনার ভঙ্গিতে বুকের ওপর তুলে তন্ময় জোয়ান উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হল দেবদূত যেন কিছু বললেন। তারপরই আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুই বুঝতে পারলেন না। চোখের ভুল দেখলেন তা-ও ভাবতে পারছেন না। জোয়ান ছুটে গেলেন বাড়ির ভেতরে। সকলকে বললেন তাঁর অলৌকিক দর্শনের কথা। কিন্তু কেউই বিশ্বাস করলেন না তাঁর কথা, চোখের ভুল বলেই সিদ্ধান্ত করলেন।

কয়েকদিন পরেই জোয়ান আবার দেখলেন দিব্য আলোর বুকে সেই দেবমূর্তি। ওখানেই শেষ হয় না। প্রায়ই ঘটতে লাগল এমনি দর্শন। দেবদূতের উপদেশও শুনতে পেতে লাগলেন। একাগ্র মনে জোয়ান শুনতেন সেসব কথা।

একদিন গীর্জা থেকে ফেরার পথে দেবদূত তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, "জোয়ান, তোমার কাজের সময় উপস্থিত হয়েছে। যুবরাজ ডফিন রাজ্যচ্যুত। তুমি তাঁর কাছে যাও, হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত কর।"

নতজানু জোয়ান করজোড়ে জানালেন, প্রভু, আমি এক সাধারণ গ্রাম্য বালিকা, যুদ্ধবিদ্যা জানি না। আমি কি করে যুবরাজের হৃতরাজ্য উদ্ধার করব? তা ছাড়া তাঁর কাছে যাবার পথও আমি চিনি না।

দেবদূত অভয় দিয়ে বললেন, "তোমার পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না। প্রভুর আশীর্বাদ রয়েছে তোমাকে ঘিরে। ভয় করো না, তুমি গিয়ে সেনাপতি রবার্টের সঙ্গে দেখা করো। সেই তোমাকে ডফিনের কাছে পৌঁছে দেবে।"

জোয়ান বাড়ি ফিরে সকলকে জানালেন দেবদূতের নির্দেশের কথা। কিন্তু কেউই তাঁর কথা বিশ্বাস করল না। কেবল এক কাকা ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি জোয়ানকে আশ্বাস দিয়ে জানালেন, দেবদূতের নির্দেশ মত নিয়ে যাবেন সেনাপতির কাছে। পরদিনই এক ভাই আর কাকার সঙ্গে জোয়ান রওনা হলেন রবার্টের দুর্গের পথে। সেখানে পৌঁছে সব কথা জানালেন সেনাপতিকে।

জোয়ানের পবিত্র চেহারা, কথাবার্তা শুনে তাঁকে অনেকেই অবিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁদের অনুরোধেই সেনাপতি রবার্ট কয়েকজন সৈন্য সঙ্গে দিয়ে জোয়ানকে পাঠিয়ে দিলেন যুবরাজের কাছে।

সেই সময়ে ফ্রান্সের ঘোরতর দুর্দিন। ইংরাজদের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে বিপর্যস্ত। দেশের বেশির ভাগ অংশই ইংরাজদের দখলে চলে গেছে।

রাজা ষষ্ঠ চার্লস শেষ বয়সে হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গেছিলেন। তাঁর পুত্র ডফিন নাবালক। রাজ্যের হাল ধরবার মত কেউ নেই। চারদিকে বিশৃঙ্খলা। এই অবস্থায় ফ্রান্সের সামন্ত রাজারা যোগ দিয়েছে ইংরাজদের সঙ্গে। এমনকি পরলোকগত রাজা ষষ্ঠ চার্লসের বিধবা পত্নী ইসা বিউ ও বার্গান্ডির ডিউক ভিড়েছেন ইংরাজদের পক্ষে।

যুবরাজ ডফিন কোনক্রমে ইংরাজদের ঠেকাবার চেষ্টা করে চলেছেন। পিছু হটতেহটতে তিনি ফ্রান্সের দক্ষিণে চিনন শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর আশা-ভরসা নিঃশেষিত। সৈন্য মুষ্টিমেয়, ফলে তিনি শক্তিহীন। প্রতি মুহূর্ত শঙ্কায় কাটছে, কখন ইংরাজ সৈন্য এসে হানা দেয়। তারা অবরোধ করে রয়েছে অরলিয়েন্স শহর। তাঁর অনুচররাও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। ফ্রান্সের স্বাধীনতা-সূর্য বুঝি ইংরাজদের হাতে অস্তমিত হয়।

এমনি যখন অবস্থা, সতেরো বছরের কিশোরী জোয়ান ১৪২৯ খ্রিঃ জানুয়ারী মাসে এসে দাঁড়ালেন যুবরাজের সামনে। তাঁর গায়ে পুরুষের পোশাক, চোখে মুখে সরলতা মাখানো অপূর্ব দীপ্তি।

জোয়ান নির্ভীক অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, হে যুবরাজ, আমি ফ্রান্সের গ্রামের নগণ্য এক গ্রাম্য বালিকা। ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে আমি এসেছি দেশ থেকে শত্রু সৈন্যদের বিতাড়িত করবার জন্য। আপনি অবিশ্বাস করবেন না, আমার ওপরে আদেশ হয়েছে, আপনাকে রেইম শহরে সিংহাসনে অভিষিক্ত করবার জন্য। ঈশ্বরের ইচ্ছা, আপনিই হোন মহান ফ্রান্সের শাসনকর্তা।''

যুবরাজ শুনলেন জোয়ানের কথা। উপস্থিত অনেকেই তাঁর কথা অবিশ্বাস করল। নানা প্রশ্ন করতে লাগল তাঁকে।

ধীরে ধীরে সব কথার জবাব দিয়ে জোয়ান নতজানু হয়ে যুবরাজকে বললেন, হে যুবরাজ সব প্রশ্নের জবাব আমি দেব অরলিয়েন্সের যুদ্ধক্ষেত্রে। আপনি আমাকে সৈন্য দিন।

ডফিন ভাবলেন, সবই তো হারাতে বসেছেন। কে বলবে হয়তো সত্যি সত্যিই মেয়েটি দৈব-নির্দিষ্টা। দেখাই যাক না কি হয়। তিনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন।

কয়েকজন সেনাপতির অধীনে চারহাজার সৈন্যের এক ক্ষুদ্র বাহিনী রওনা হয়ে পড়ল অরলিয়েন্সের দিকে।

পথচলার অসুবিধা দূর করবার জন্য আগেই পুরুষের পোশাক পরে নিয়েছিলেন জোয়ান। এখন এক কালো ঘোড়ায় সওয়ারী হয়েছেন। তাঁর কোমরে তরোয়াল, হাতে সাদা পতাকা।

জোয়ান সসৈন্যে অরলিয়েন্সের রণাঙ্গনে এসে পৌঁছলেন ১৯২৯ খ্রিঃ ৩রা মে। ক্লান্ত সৈন্যরা বিশ্রাম নিতে লাগল। সেনাপতিরা স্থির করলেন, কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়ে পরে যুদ্ধ আরম্ভ করবেন।

পরদিন, ৪ঠা মে, জোয়ান নিজের তাঁবুতে ঘুমিয়ে আছেন। এমন সময় দেবদূতের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে উঠে বসলেন। দেবদূত তাঁকে অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ করবার আদেশ দিলেন। জোয়ানের নির্দেশে শিবিরের সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। তারপর সেনাপতিদের পরিচালনায় অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইংরাজ সৈন্যের ওপরে।

জোয়ান হাতে পতাকা নিয়ে, তেজোদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে চললেন সৈন্যদের সঙ্গে। তাঁকে দেখাতে লাগল যেন স্বর্গলোক থেকে নেমে আসা কোন দেবী।

ফরাসী বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে মুহূর্তে ইংরাজসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল তাদের মধ্যে— এক মায়াবিনী অশুভ শক্তির সাহায্য নিয়ে ফরাসীরা শক্তিমান হয়ে উঠেছে। তারা সভয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল।

বিজয়ী সৈন্যদল নিয়ে জোয়ান ৭ তারিখে প্রবেশ করলেন অরলিয়েন্সে। মুক্তির আনন্দে উদ্বেল জনতা চারদিক থেকে ছুটে এসে নতজানু হল তাদের মুক্তিদাত্রীর পদপ্রান্তে। জোয়ানের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল চারদিক।

জোয়ান সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এ জয় আমার নয়, জয় দাও ঈশ্বরের, আর যুবরাজ ডফিনের নামে।

জয়ের আনন্দে নতুন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল ফরাসী সৈন্যদল। অরলিয়েন্সের পর একের পর এক শহর তারা ইংরাজদের কবলমুক্ত করল। অবশেষে তারা এসে পৌঁছল পেটেয়ার (Patay) প্রান্তরে। সামনেই বিশাল ইংরাজ বাহিনী। এবারে তাদের সঙ্গে লড়তে হবে মরণপণ শেষ লড়াই।

ইংরাজ সৈন্যের তুলনায় ফরাসী বাহিনী অতীব নগণ্য। কিন্তু উদ্দীপনায় উদ্বেল তারা, মনে অদম্য বল। মূর্তিমতি প্রেরণার মত জোয়ান তাদের সঙ্গে।

পেটেয়ার রণাঙ্গণে সেদিন দুই অসম বাহিনীর যে মরণপণ যুদ্ধ হল, তাতে প্রাণ হারাল অধিকাংশ ইংরাজ সৈন্য। তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। অসংখ্য আহতের আর্তনাদ আর মুমূর্ষের কাতর ধ্বনির মধ্যে একসময় যুদ্ধ শেষ হল, বিধ্বস্ত পরাজিত হল ইংরাজ সৈন্য।

যুদ্ধের বীভৎসতা সহ্য করতে পারলেন না জোয়ান। দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আহতদের মাঝখানে ঘোড়া থেকে নেমে সকলের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করলেন।

এমনি সময়ে জোয়ান দৈববাণী শুনতে পেলেন—"জোয়ান, এবারে তোমার কাজ যুবরাজকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা।"

জোয়ান এবারে ঘুরে দাঁড়ালেন। সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন যুবরাজের প্রাসাদের দিকে। যুবরাজ সপারিষদ এগিয়ে এসে অভিনন্দন জানালেন জোয়ানকে। তারপর সকলে মিলে বিজয় উল্লাসে এগিয়ে চললেন রেইম শহরের দিকে। এখানেই সুদুর প্রাচীনকাল থেকে ফ্রান্সের রাজারা আনুষ্ঠানিকভাবে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছেন।

যুবরাজ ডফিন সদলে এসে রাইম শহরে পৌছলেন ১৪২৯ খ্রিঃ ১৪ই জুলাই। তিনদিন পরে গীর্জায় যুবরাজের কপালে পবিত্র তেল স্পর্শ করে তাঁকে ফ্রান্সের নতুন সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন প্রধান যাজক। তাঁর নতুন নামকরণ হল—সপ্তম চার্লস।

জোয়ান বেদীমূলে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন। তারপর সম্রাটের কাছে করজোড়ে আবেদন জানালেন, প্রভু, আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার আমাকে ঘরে ফিরে যাবার অনুমতি দিন। গ্রামে আমার পিতামাতা ভাইরা রয়েছে, আমি তাদের কাছে ফিরে যেতে চাই। চার্লস কিন্তু জোয়ানকে গ্রামে ফিরবার অনুমতি দিলেন না। তখনো পর্যন্ত রাজধানী প্যারিস ও কয়েকটি অঞ্চল ইংরাজদের দখলে রয়েছে। জোয়ানের সাহায্য ছাড়া সেসব অঞ্চল উদ্ধার করা যে সম্ভব নয় তা তিনি বুঝতে পারছিলেন। সে কথা জোয়ানকে জানিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন প্যারিস আক্রমণ করবেন।

প্যারিস আক্রমণের প্রশ্নে জোয়ান কিন্তু এবারে অন্তরের সাড়া পেলেন না। তিনি সম্রাটকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন।

চার্লস জোযানের কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি অবিলম্বে সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করে অগ্রসর হলেন এবং ইংরাজদের আক্রমণ করলেন।

এবারের যুদ্ধে কিন্তু ফল বিপরীত হল। ইংরাজ সৈন্য ও বার্গাণ্ডির ডিউকের সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণে চার্লস পরাজিত হলেন।

যাজক সম্প্রদায় ইতিপূর্বেই জোয়ানের জনপ্রিয়তাকে বিষনজরে দেখতে আরম্ভ করেছিল। তারা এবার সুযোগ বুঝে প্রচার করতে শুরু করল, জোয়ানের ধৃষ্টতার জন্যই ফরাসীবাহিনীকে পরাস্ত হতে হল। জোয়ান নিতান্তই সাধারণ মেয়ে তার কোন অলৌকিক ক্ষমতা নেই।

যাজক সম্প্রদায়ের সুরে সুর মেলাল সমাজের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা। জোয়ান সবই শুনলেন। কোন প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেল না। তিনি অন্তর থেকে বুঝতে পারছিলেন, ঈশ্বর যে কাজের জন্য তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, তা তিনি সম্পন্ন করেছেন, এবারে তাঁকে বিদায় নিতে হবে।

বার্গাণ্ডির ডিউক ইতিমধ্যে আর একটি ফরাসী শহর অবরোধ করেছেন খবর এল। সেখানকার বিপন্ন মানুষ সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন জানাল জোয়ানের

কাছে। বিচলিত জোয়ান সম্রাটকে শহরবাসীর সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠাবার জন্য আবেদন জানালেন।

চার্লস কিন্তু নতুন করে যুদ্ধে নামবার সাহস পেলেন না। সভাসদদের প্ররোচনায় তিনি সৈন্য পাঠাতে অসম্মত হলেন।

জোয়ান স্থির থাকতে পারছিলেন না। তিনি নিজের চেষ্টায় সামান্য কিছু সৈন্য যা সংগ্রহ করতে পারলেন তাই নিয়ে ইংরাজ সৈন্যের শিবিরের দিকে রওনা হলেন।

অসংখ্য শত্রুসৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে রাতের অন্ধকারে জোয়ান শহরে প্রবেশ করলেন। ইংরাজ আর ফরাসী সৈন্যের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল খন্ডযুদ্ধ। বিপুল সংখ্যক ইংরাজ সৈন্যের আক্রমণে অল্পসময়ের মধ্যেই জোয়ানের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

শহরের বাইরে যাবার তিনটি পথই শত্রু সৈন্য অবরোধ করে রেখেছিল। কাজেই পালাবার কোন উপায় ছিল না। তবু জোয়ান দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে সৈন্যদের নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সহসা ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন।

শেষ মুহূর্তে জোয়ান বন্দি হলেন বার্গান্ডির ডিউকের সেনাপতি জাঁ দ্য লুক্সেমবার্গের হাতে।

জোয়ানের অলৌকিক ক্ষমতার কথা ইংরাজ সৈন্যদের মধ্যেও প্রচারিত হয়েছিল। এবারে তাঁর বন্দিত্বের কথা প্রচারিত হতে জোর সাড়া পড়ে গেল। ইংরাজরা জোয়ানকেই তাদের পরম শত্রু বলে গণ্য করেছিল। এবারে তাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে।

সকলে সিদ্ধান্ত করল তাঁর জন্য এমন শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে যাতে সকলের মন থেকে তার সম্পর্কে অমূলক ভয় ভীতি মুছে যায়।

ইতিপূর্বেই ইংরাজরা জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় জোয়ানকে ধরে দেবার জন্য ১০,০০০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। বার্গান্ডির ডিউক পুরস্কারের লোভে জোয়ানকে তুলে দিল ইংরাজদের হাতে।

ইংরাজদের লোক দেখানো ভাল মানুষির অভিনয়ের তুলনা হয় না। সব অপরাধীর ক্ষেত্রেই তারা একটা প্রহসনমূলক বিচারের আয়োজন করে। জোয়ানের ক্ষেত্রেও শুরু করল বিচারের প্রহসন। বিচার শুরু হল ১৪৩১ খ্রিঃ ২১শে ফেব্রুয়ারি। ইংরাজদের সাহায্য করতে এগিযে এলো প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা আর নানা অঞ্চলেব ঈর্ষাকাতর ধর্মযাজকরা। এদের নিয়ে গঠিত হল বিচারক মন্ডলী।

জোয়ানের বিরুদ্ধে দুইটি প্রধান অভিযোগ দাঁড় করানো হলো। সেগুলো হল—(১) সে শয়তানের প্রতিনিধি ডাইনি হয়ে নিজেকে ঈশ্বরের আদেশপ্রাপ্তা বলে প্রচার করেছে (২) সে ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করে পাদ্রীদের অবজ্ঞা করেছে। এছাড়াও নানান রকমের ৭২টি অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

প্রতিটি অভিযোগেরই এক এক করে জবাব দিয়েছিলেন জোয়ান অকম্পিত দৃপ্ত কণ্ঠে। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য সেদিন একটি প্রাণীও এগিয়ে আসেনি। এমনকি যেই চার্লসকে সম্রাটের আসনে বসাবার জন্য জোয়ানকে অভিযুক্ত হতে হল তিনিও ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব।

সেদিন তিনি যদি সচেষ্ট হতেন তাহলে হয়তো জোয়ানকে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো মিথ্যা অভিযোগের শিকার হতে হতো না।

জোয়ানকে বলা হল, তিনি যে ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্তা এবং যে দৈব বাণীর কথা তিনি বলেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা একথা স্বীকার করবার জন্য। তা না হলে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হবে।

জোয়ান জবাবে জানালেন, "আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করি কি করে— তাহলে যে ঈশ্বরকেই অস্বীকার করতে হয়। আমি তা করতে পারি না, যা নিজের চোখে দেখেছি সবই অকপটে বলেছি, তার প্রতিটি কথা সত্য। কোন শাস্তির ভয়েই আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হব না।"

বিচারের রায় হল, জোয়ানকে পুড়িয়ে মারা হবে।

১৪৩১খ্রিঃ ৩০শে মে, সকালবেলা সৈন্য ছাউনিতে ১৯ বছরের তরুণী জোয়ানকে ইংরাজরা বিশ্বাসঘাতক ফরাসী ও যাজকসম্প্রদায়ের সহযোগিতায় নির্মম ভাবে আগুনে দগ্ধ কবে হত্যা করল।

কিন্তু সত্য চিরজয়ী। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু সেদিন ফরাসী জাতির অন্তরে যে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তাই ইংরাজদের ফ্রান্সের মাটি ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছিল জোয়ানের মৃত্যুর কযেক বছরের মধ্যেই।

১৪৫৫খ্রিঃ সপ্তম চার্লসের উদ্যোগে পোপ জোয়ানের বিচারের সমস্ত নথিপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ঘোষণা করেন, অন্যায় এবং মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করিয়ে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে জোয়ানকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

আরও পরে ১৯১১ খ্রিঃ পোপ ঘোষণা করেন জোয়ান ছিলেন দেশপ্রেমিক বীরাঙ্গনা এবং একজন খ্রিস্টান সাধিকা। তিনি প্রত্যক্ষভাবেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন।

আব্রাহাম লিঙ্কন



পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়জন মানবতাবাদী গণতন্ত্রপ্রেমী মহান রাষ্ট্রনায়ক জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন।

আমেরিকার কেন্টাফি প্রদেশের অখ্যাত এক গ্রামের ছুতোর পরিবারে ১৮০৯ খ্রিঃ জন্ম হয় লিঙ্কনের। তাঁর পিতা টমাস লিঙ্কন ছিলেন পেশায় ছুতোর মিস্ত্রী। লেখাপড়া তিনি কিছুই জানতেন না। হাতের কাজ করে কোন রকমে সংসার প্রতিপালন করতেন।

লিঙ্কনের যখন মাত্র চার বছর বয়স, সেই সময় তাঁর বাবা ইন্ডিয়ানা প্রদেশের অরণ্যময় অঞ্চলে এসে সপরিবারে বাস করতে থাকেন। এখানেই জনবিরল পরিবেশে প্রকৃতির কোলে লিঙ্কনের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়।

অরণ্যের একপ্রান্তে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঘর বানিয়েছিলেন লিঙ্কনের বাবা। কাঠের কাজ আর শিকার করে কোন প্রকারে সংসার চালাতেন। বাবার সঙ্গে কাজ করে লিঙ্কনও ছেলেবেলা থেকেই হয়ে উঠেছিলেন পরিশ্রমী। কাঠ চেরাই, মাছ ধরা ও চাষের কাজে তিনি বাবাকে সমানভাবে সাহায্য করতেন।

ছয় বছর বয়সে লিঙ্কন মাতৃহারা হন। তারপর থেকে তিনি আর ছোট বোন মিলে বাড়ির কাজকর্ম করতেন।

লিঙ্কনের বাবার পূর্বপরিচিত এক মহিলা তিনটি শিশু সন্তান নিয়ে অকালে বিধবা হয়েছিলেন। সংসারে একজন মহিলার প্রয়োজন বিবেচনা করে তিনি সেই মহিলাকেই বিয়ে করে সংসারে নিয়ে এলেন। হাসিখুশি স্বাস্থ্যবতী এই মহিলা ছিলেন যেমন পরিশ্রমী তেমনিই বুদ্ধিমতী। অল্পদিনেই তিনি সংসারের চেহারা ফিরিয়ে নিলেন।

লিঙ্কনের বাবা নিজে লেখাপড়া জানতেন না। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারেও তাই তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু তাঁর সৎমায়ের উৎসাহ ছিল এই বিষয়ে।

সেই অঞ্চলে কিছু শিক্ষিত লোকের চেষ্টায় একটা প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়েছিল। সৎমায়ের আগ্রহে লিঙ্কন সেই স্কুলে ভর্তি হলেন।

মাত্র একবছর এই স্কুলে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিলেন লিঙ্কন। তার মধ্যেই পড়াশুনার প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর মধ্যে। শহরের দোকান থেকে

লোকজনদের ধরে বই কিনিয়ে আনতেন তিনি। মাঠে কাজ করতে করতে সেই বই পড়তেন।

রাতে কাঠের আগুনের আলোয় বসে শ্লেটে অঙ্ক কষতেন। কিশোর বয়সে তাঁর প্রিয় বই ছিল বাইবেল— ঘুরে ফিরে অসংখ্যবার তিনি এই পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করেছেন।

তাঁর জীবনে বাইবেলের প্রভাব ছিল অতীব গভীর। উত্তরকালে তাঁর লেখায় ও বক্তৃতার মধ্যেও এই প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত নিজেদের গ্রামের আশপাশের অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও যান নি লিঙ্কন। এই সময়ে এক ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ নিয়ে কিছু পণ্য বিক্রয় করবার জন্য নিউ অর্লিয়েন্স বন্দরে যেতে হয়। একটি বড় নৌকায় চেপে বন্দরে পৌঁছে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন লিঙ্কন।

এক জায়গায় নিগ্রো শিশু নারী পুরুষদের দাস হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছিল। নিলাম ডেকে যে সব চেয়ে বেশি দাম দিতে পারছিল তার হাতেই তুলে দেওয়া হচ্ছিল দাসদের।

যারা যেতে রাজি হচ্ছে না কিংবা কিছু মাত্র অবাধ্যতা করছে তাদের নির্মমভাবে চাবুক মেরে শায়েস্তা করা হচ্ছিল।

এই অমানবিক দৃশ্য আর দাস-ব্যবস্থার রীতি জীবনে প্রথম দেখতে পেলেন লিঙ্কন। বেদনায় তাঁর মন ভবে উঠল। তিনি সেদিন এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে মনে মনে শপথ নিয়েছিলেন, যদি কোনদিন সুযোগ পান তাহলে এই জঘন্য প্রথার উচ্ছেদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।

সেবার নিউ অর্লিয়েন্সে পণ্য বিক্রয় করে প্রচুর লাভ করেছিলেন লিঙ্কন। পণ্যের মালিক ব্যবসায়ী খুশি হয়ে লিঙ্কনকে তাঁর নিউ সালেমের গুদামের ম্যানেজারের পদে চাকরিতে নিয়োগ করলেন।

কর্মজীবনে প্রবেশ করে অবসর সময়টুকু লিঙ্কন কাজে লাগালেন নানা বিষয়ের বইপত্র পড়াশুনা করে। মধুর ব্যবহারের জন্য এখানে সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সেই সুবাদে প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় নির্বাচন কেন্দ্রে কাজকর্ম দেখাশুনার দায়িত্ব পান।

নিজের অজ্ঞাতেই এভাবে রাজনীতির জগতের সঙ্গে লিঙ্কনের পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। ক্রমে তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

সেইকালে নিউসালেমে মুষ্টিমেয় লেখাপড়া জানা মানুষের মধ্যে লিঙ্কন ছিলেন অন্যতম। মধুর ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান, স্পষ্টবাদিতা এবং সহযোগিতা মূলক আচরণের জন্য তিনি এখানে অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

নিউসালেমে এক সরাইখানার মালিক হলেন জেমস রুটলেজ। লিঙ্কনের তিনি ছিলেন সব চেয়ে বড় সমর্থক। স্থানীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য তিনিই লিঙ্কনকে প্রথম উৎসাহিত করেন।

সরাইখানায় যাতায়াতের সূত্রে জেমসের মেয়ে অ্যানির প্রতি আকৃষ্ট হন লিঙ্কন। প্রথম পরিচয়েই তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন জানতে পারেন অ্যানি এক যুবকের বাগদত্তা, তখন জীবনে প্রথম নারীর সংস্পর্শে এসে আঘাত পেয়েছিলেন লিঙ্কন। তবে অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি সে আঘাত সামলে উঠেছিলেন।

যে ব্যবসায়ীর অধীনে লিঙ্কন কাজ করতেন, তার ব্যবসা পড়ে এসেছিল। লিঙ্কন চাকরি ছেড়ে দিয়ে একজন সঙ্গীর সঙ্গে ব্যবসা শুরু করলেন। সঙ্গীটির ছিল মদের নেশা। কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসা উঠে গেল।

এই সময় কয়েকজন অনুরাগী বন্ধুর উৎসাহে ইলিয়া প্রদেশের প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন লিঙ্কন। কিন্তু রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাবে নির্বাচনে পরাজিত হতে হয়।

নির্বাচনের ব্যর্থতার পর লিঙ্কন নিউ সালেমে বাড়ি বাড়ি চিঠিপত্র ও খবরের কাগজ বিলি করার পিওনের চাকরি নিলেন। এই সুযোগটাকে ভাল ভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি এবং এভাবেই বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল।

মালিকের বাড়ি পৌঁছে দেবার আগে তিনি কোথাও বসে খবরের কাগজগুলি খুঁটিয়ে পড়ে নিতেন। দিনের বেশিরভাগ সময়টা কাজের মধ্যে এইভাবে কেটে যেতো তাঁর।

রাতে বাড়ি ফিরে বসতেন নিজের বইপত্তর নিয়ে। সমস্ত রকম ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত পড়াশুনার কাজে তাঁর কখনো বিঘ্ন ঘটত না।

প্রথম বারে ব্যর্থ হলেও ১৮৩৪ খ্রিঃ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে লিঙ্কন জয় লাভ করলেন। এবারে নির্বাচন প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে আসতে হল ইলিনয়ে। পরিষদের কাজের অবসরে তিনি লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়াশুনা করতে লাগলেন। এই সময়েই আইন পরীক্ষা পাশ করে আইন ব্যবসা করার সঙ্কল্প তাঁর মনে জাগে।

ইতিমধ্যে ইলিনয়ে প্রদেশের রাজধানী স্থানান্তরিত হল স্প্রিংফিল্ডে। ফলে পরিষদ সদস্য হিসাবে কাজকর্মের প্রয়োজনে লিঙ্কনকেও যেতে হল সেখানে।

আইন বিষয়ে পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিলেন লিঙ্গন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৩৬ খ্রিঃ আইন ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। অসাধারণ মেধা ও কর্মকুশলতার গুণে আইনজীবী হিসেবে অল্পসময়ের মধ্যেই খ্যাতি অর্জন করলেন লিঙ্কন। তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তি ও জ্ঞানের কাছে প্রতিপক্ষকে সহজেই হার স্বীকার করতে হত। লিঙ্কন স্বভাবতই ছিলেন ন্যায়ের পক্ষপাতী। কোন অবস্থাতেই তিনি অন্যায়কে মেনে নিতেন না। সেইকারণে কোন মিথ্যা মামলা হাতে এলে সঙ্গে সঙ্গে তা ফিরিয়ে দিতেন।

আইন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্কন রাজনীতির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন। ১৮৩৮, ১৮৪০ খ্রিঃ দুবার তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন।

ব্যবস্থাপক সভার এক সদস্য ছিলেন স্টিফেন ডগলাস। ভাগ্যচক্রে এক নারীকে কেন্দ্র করে তার সঙ্গে এসময়ে লিঙ্কনের যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তার পরিণতি গড়িয়েছিল উত্তরকাল পর্যন্ত, ডগলাস হয়ে উঠেছিলেন লিঙ্কনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

এক সুন্দরী তরুণী, তাঁর নাম মেরি টড, তাঁর দিদিমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। চটপটে স্বভাব ও আকর্ষণীয় কথাবার্তা শুনে যুবকরা তাঁর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ল।

একদিন এক নাচের আসরে গেছেন লিঙ্কন আর ডগলাস। মেরিও উপস্থিত ছিলেন সেই আসরে। ডগলাসের আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহার ও ধোপদুরস্ত পোশাক সত্ত্বেও রুক্ষ ঢ্যাঙা চেহারার ঢিলেঢালা পোশাকের লিঙ্কনের প্রতিই আকৃষ্ট হলেন মেরি।

আলাপ পরিচয় কিছুটা গভীর হলে লিঙ্কন বিবাহের প্রস্তাব দেন। প্রথমে অমত করলেও শেষ পর্যন্ত ১৮৪২ খ্রিঃ লিঙ্কনকেই মেরি বিবাহ করলেন। বলাবাহুল্য, লিঙ্কনের বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে একমাত্র ডগলাস এই বিয়েতে খুশি হতে পারেননি।

বিয়ের পর লিঙ্কন উইলিয়ম হানডন নামে এক তরুণ আইনজীবীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আইন ব্যবসা শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাঁদের এই সম্পর্ক বজায় ছিল আমৃত্যু। পরবর্তীকালে হানডন লিঙ্কনের জীবনী রচনা করেন।

স্ত্রী মেরীর তাগিদে একসময় স্প্রিংফিল্ডের আইন ব্যবসায় ছেড়ে লিঙ্কন ওয়াশিংটনে এসে পাকাপাকিভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন।

মেরীর প্রবল ইচ্ছা লিঙ্কন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন। সেই মত লিঙ্কন পুরোপুরিভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করলেন এবং অল্পসময়ের মধ্যেই অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

দলীয় মনোনয়ন পেয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে যথাসময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লিঙ্কন ১৮৪৭ খ্রিঃ ওয়াশিংটন পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হলেন।

কিশোর বয়সে নিউ অর্লিয়েন্সের বন্দরে দেখা দাস ব্যবসায়ীদের বাজারের দৃশ্য লিঙ্কনের মনে জাগরুক ছিল। সংসদ সদস্য হবার পর প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল অনুরূপ একটি দৃশ্যের প্রতি।

ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ হোয়াইট হাউসের পাশেই গড়ে উঠেছিল নিগ্রোদাসদের একটি খোঁয়াড়। বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা নিগ্রোদের এই খোঁয়াড় থেকেই দক্ষিণের বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হত।

আমেরিকায় দাস ব্যবসা শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে কয়েকজন ওলন্দাজ বণিকের মাধ্যমে। তারা আফ্রিকা থেকে কুড়িজন নিগ্রোকে ধরে এনে জেমস টাউনে বিক্রি করে।

আমেরিকায় তখন সবে উপনিবেশ গড়ে উঠতে শুরু করেছে। বিভিন্ন কাজের জন্য শ্রমিকের প্রচন্ড চাহিদা। এই সুযোগকে কাজে লাগাল ইউরোপের একদল অর্থলোলুপ ব্যবসায়ী। তারা আফ্রিকা থেকে দলে দলে নারী পুরুষ ধরে এনে আমেরিকায় বিক্রি করতে আরম্ভ করল। লাভের লোভে এই ভাবেই একসময় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল নিগ্রো ক্রীতদাসের ব্যবসা। আমেরিকার সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চল জুড়েই ছিল নিগ্রো ক্রীতদাসের চাহিদা।

লিঙ্কন যেই সময়ে ওয়াশিংটন পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হলেন সেই সময় পর্যন্ত আমেরিকায় নিগ্রো ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল কুড়ি লক্ষের কাছাকাছি।

স্বাধীনতা ঘোষণার পরে দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে জনমত গড়ে উঠেছিল। ১৮০৮ খ্রিঃ ক্রীতদাস ব্যবসা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দাস ব্যবসা টিকে ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপকভাবে তুলো উৎপাদন হত। ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে যখন নতুন নতুন কাপড়ের কল তৈরি হতে লাগল, আমেরিকার তুলো রপ্তানি বেড়ে গেল। ফলে তুলো উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দক্ষিণাঞ্চলে শ্রমিকের প্রয়োজন আগের তুলনায় বেড়ে গেল। অর্থনৈতিক সুবিধার জন্যই স্বাধীনতা লাভের সময় থেকেই দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ লোক ছিল ক্রীতদাস প্রথার প্রবল সমর্থক।

লিঙ্কন মনেপ্রাণে ছিলেন দাসপ্রথার বিরোধী। তিনি পার্লামেন্টের সভায় কলম্বিয়া প্রদেশে দাস ব্যবসা বন্ধ করবার জন্য একটি বিল উত্থাপন করলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরোধিতায় সেই বিল অগ্রাহ্য হল।

এরপর রাজনৈতিক জগৎ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলেন লিঙ্কন। তিনি স্প্রিংফিল্ডে এসে আবার আইন ব্যবসয় আরম্ভ করলেন। রাজনীতিতে ফিরে যাবার ইচ্ছা হারিয়ে ফেললেন তিনি। কিন্তু বেশিদিন তিনি রাজনীতির অঙ্গন থেকে দূরে সরে থাকতে পারলেন না।

নিগ্রো ক্রীতদাসদের প্রতি অত্যাচার অবিচার দেখে বিচলিত হয়ে তিনি এই অমানবিক ব্যবসার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠলেন।

দৃঢ়স্বরে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে দেশের অর্ধেক মানুষ যখন ক্রীতদাস তখন স্বাধীনতা এক নির্মম রসিকতার নামান্তর। কোন জাতি এভাবে বেঁচে থাকতে পারে না।

সংগঠিত ভাবে প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে লিঙ্কন নিজের উদ্যোগে রিপাবলিক পার্টি নামে নতুন এক দল গঠন করলেন। পার্টির সংগঠক হিসাবে তিনি দলের রাজনৈতিক আদর্শের কথা যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ ভাষায় দেশবাসীর কাছে ব্যাখ্যা করলেন। এই সময় থেকেই লিঙ্কনের নাম চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলি দাস প্রথার সমর্থনের প্রশ্ন তুলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবি তুলল। ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য ডগলাস দাসপ্রথার সমর্থনে সোচ্চার হলেন। লিঙ্কন তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ জানালেন।

এইভাবে যৌবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবার দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করল। লিঙ্কন ও ডগলাসের বিতর্ক বাদানুবাদ দেশ জুড়ে আলোড়ন তুলল। কিন্তু দুজনেই সমান বাগ্মী। তবে লিঙ্কনের বক্তব্যে থাকত নৈতিকতা, আদর্শবোধ ও দেশপ্রেম। যুক্তির সঙ্গে আবেগ। সহজেই তাঁর বক্তব্য মানুষের হৃদয় স্পর্শ করত।

লিঙ্কন দক্ষিণাঞ্চলের দাবি নস্যাৎ করে ঘোষণা করলেন, আমেরিকা এক এবং ঐক্যবদ্ধ থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এরপর রিপাবলিকান দলের হয়ে লিঙ্কন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থী হলেন। আর ডেমোক্রেটিক দলের হয়ে প্রার্থী হলেন ডগলাস।

নির্বাচনে রাষ্ট্রের নেতৃত্বের দায়িত্ব জনগণ লিঙ্কনের হাতেই তুলে দিল। লিঙ্কন নির্বাচনে জিতলেন। ডগলাস হেরে গেলেন। লিঙ্কন হলেন আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট।

১৮৬১ খ্রিঃ লিঙ্কন সস্ত্রীক স্প্রিংফিল্ড ছেড়ে ওয়াশিংটনে চলে এলেন। মার্চ মাসের ৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি শপথ নিলেন। সেদিনই তিনি ঘোষণা করলেন, দেশ থেকে দাসপ্রথা উৎখাত করতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই দেশ বিভক্ত হবে না।

দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির টনক নড়ল। তারার বুঝতে পারল এবারে দক্ষিণের অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি হবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাউথ ক্যারোলিনার নেতৃত্বে আলবামা, ফ্লোরিডা, মিসিসিপি, লুসিয়ানা, টেক্সাস ও জর্জিয়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা এক যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হল। এই নবঘোষিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেন জেফারসন ডেভিস।

বাধ্য হয়েই দেশকে অখণ্ডিত রাখার জন্য লিঙ্কন দক্ষিণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। শুরু হয়ে গেল আমেরিকার রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ।

এই যুদ্ধের প্রথম লক্ষ ছিল ইউনিয়নের রক্ষা। দ্বিতীয় হল দাসপ্রথা উচ্ছেদ।

কিছুদিন যুদ্ধ চলার পর রাজনৈতিক দলাদলির সৃষ্টি হয়ে গেল। চূড়ান্ত বেসামাল অবস্থার মধ্যেও দৃঢ় হাতে হাল ধরে রইলেন লিঙ্কন। তারপর ১৮৬৩ খ্রিঃ ১লা জানুয়ারী চূড়ান্তভাবে ক্রীতদাসদের মুক্তি ঘোষণা করে আইনত দাসপ্রথার অবসান ঘটালেন তিনি।

এরপর লিঙ্কন দেশের উত্তর অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করলেন গ্র্যান্ট নামে এক প্রাক্তন ক্যাপ্টেনের হাতে। গ্র্যান্টের লৌহকঠিন দৃঢ়তা ও সাহসিকতা মুগ্ধ করেছিল তাঁকে।

গ্র্যান্ট অল্প দিনের মধ্যেই ডোনেলসন দুর্গের অধিকার করায়ত্ত করে ঝটিকা আক্রমণে দক্ষিণের কয়েকটি শহর দখল করে নেন। অবশেষে দক্ষিণের দুর্ধর্ষ সেনাপতি লীকে পরাজিত করে একের পর এক শহর দখল করে নিলেন। লী পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন রীচমন্ড শহরে।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ চলেছিল দীর্ঘ পাঁচ বছর। যুদ্ধ শেষ হলে লী আত্মসম্পর্ণ করেন।

লিঙ্কন সেনাবাহিনীর সঙ্গে রীচমন্ডে এসেছিলেন। এখানে নিগ্রোদের সমাবেশে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন "আমার দুঃখী বন্ধুরা, তোমরা সকলে মুক্ত, বাতাসের মত মুক্ত। 'দাস' এই নাম তোমাদের আর কখনো নিতে হবে না। স্বাধীনতা তোমাদের জন্মগত অধিকার।।"

ওয়াশিংটনে ফিরে এলে শত শত মানুষ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে সংবর্ধিত করল।

মানুষকে মানুষের জন্মগত অধিকার ফিরিয়ে দেবার দীর্ঘ দশবছরের সংগ্রাম এভাবেই সম্পূর্ণ করে অবশেষে এক দক্ষিণী গুপ্তঘাতকের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেন মানবতার অবিসংবাদী পূজারী আব্রাহাম লিঙ্কন।

জর্জ ওয়াশিংটন



ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে বেরিয়ে ইতালীয় নাবিক কলম্বাস ১৪৯২ খ্রিঃ আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকা। সেই সময় আমেরিকা ভূখণ্ডে বাস করত যারা তারা ছিল অর্ধসভ্য লাল মানুষ। কলম্বাস ইন্ডিয়া আবিষ্কার করেছেন এই ভ্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের নাম দিয়েছিলেন রেড ইন্ডিয়ান। এই মানুষেরা নিজেরাই জানত না কী পরিমাণ সম্পদ লুকিয়ে আছে তাদের দেশে। কলম্বাসের সুবাদে সেই সম্পদের সন্ধান জেনে গেল ইউরোপের মানুষ। তারা দলে দলে সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে লাগল।

স্পেনের লোকদের পরে আমেরিকায় এল ফরাসীরা। তারা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে উপনিবেশ গড়ে তুলল।

ইংরাজ ঔপনিবেশিকরা এলো সবার পরে। কিন্তু গায়ের জোরে তারা অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নিল। ক্রমে একসময় স্পেন ও ফরাসীরাও নিজেদের দখল হারাল।

সোনার লোভে ভাগ্যান্বেষী ইংরাজ যারা আমেরিকায় এসে উপনিবেশ গড়েছিল তাদের অধিকাংশ ছিল গরীব কারিগর, কৃষক আর ধর্মনিপীড়িত মানুষ। ইংলন্ডের রানীর সনদ নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি এই উপনিবেশগুলি শাসন করত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার মাটিতে কালেকালে একটা নতুন ইউরোপ গড়ে তোলা।

ইংলন্ড ছেড়ে আসা মানুষেরা কঠোর পরিশ্রম করে আমেরিকার মাটিতে যা উৎপাদন করত তার বেশির ভাগই চলে যেত ইংলন্ডে। ফলে ক্রমশই তাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে লাগল।

ইংলন্ডের শোষণ ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ইংলন্ডের শাসনের অধীনতা মুক্ত হয়ে নিজেদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার সঙ্কল্প গ্রহণ করল।

স্বাধীন আমেরিকার দাবী প্রথম যিনি উত্থাপন করেছিলেন, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যিনি, তাঁরই নাম জর্জ ওয়াশিংটন। তিনি ছিলেন স্বাধীন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট।

জর্জ ওয়াশিংটনের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইংলন্ডের নর্দাম্পটনসায়ার অঞ্চলের অধিবাসী। ভাগ্যান্বেষণে তাঁরা আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে ১৭৩২ খ্রিঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী জর্জ ওয়াশিংটনের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন বিশাল কৃষি খামারের মালিক। সেই খামারে গরু মোষ ইত্যাদি পশু প্রতিপালন করা হত। তামাকের চাষ হত।

জর্জ ছিলেন তাঁর পিতার দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রথম সন্তান। সৎমা মারা গিয়েছিলেন আগেই, লরেন্স নামে বৈমাত্রেয় এক দাদা ছিলেন কেবল।

লরেন্স থাকতেন তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। ভার্জিনিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি লর্ড ফেয়ারফ্যাক্স ছিলেন তাঁর শ্বশুর।

এগারো বছর বয়সে পিতৃহারা হলে জর্জকে লরেন্স নিজের কাছে নিয়ে এলেন। এখানেই তাঁর লেখা পড়া শেখার ব্যবস্থা হল। ফেয়ারফ্যাক্স পরিবারে সবশুদ্ধ বছর পাঁচেক ছিলেন জর্জ।

সেই সময় এক উপত্যকায় ষাট লক্ষ একর জমি জরিপ করবার জন্য যে সার্ভেয়ার দল পাঠানো হয়েছিল ফেয়ারফ্যাক্স জর্জকে সেই দলে সহকারী সার্ভেয়ার রূপে নিযুক্ত করেছিলেন।

তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে পরে তিনি জর্জকে প্রধান সার্ভেয়ার পদে নিয়োগ করেছিলেন। দুবছর এই পদে কাজ করেছিলেন জর্জ।

ব্যবসায়ের কাজে জর্জের দাদা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বার্বাডোজে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন দুরারোগ্য বসন্ত রোগ নিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত এই রোগেই তিনি মারা যান।

সেই সময় জর্জের বয়স মাত্র সতের বছর। দাদার মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী হলেন সমস্ত সম্পত্তির মালিক। বিশাল সম্পত্তি দেখা শোনার ভার পড়ল জর্জের ওপর। নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

লরেন্সের কোন সন্তান ছিল না। কয়েক বছর পরে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হলে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলেন জর্জ। জর্জ ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী। বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়েও ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। এবারে তিনি লব্ধ সম্পত্তির উন্নতি সাধনে মন দিলেন।

জমিতে উৎপাদন বাড়াবার জন্য তিনি কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিলেন, কৃষির ওপরে লেখা বিভিন্ন বই পড়াশুনা করলেন। সেচের উন্নতির জন্য আধুনিক ব্যবস্থার সাহায্য নিলেন।

এছাড়া পতিত জমি উদ্ধার করে কৃষিযোগ্য করে নিলেন। এই সঙ্গে পশুপালন ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করলেন।

খামারের কাজে প্রায় দুশো লোক নিযুক্ত ছিল। তাদের কাজেরও তদারকি ও বিলিবন্টন নিজে তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন।

জর্জ যেন একাই একশো জন হয়ে গোটা ব্যবস্থাটাকে অপচয় আর ত্রুটি থেকে আগলে রাখতে লাগলেন।

এই কঠোর পরিশ্রমের ফলও ফলল যথারীতি। সব ক্ষেত্রেই আশাতীত সাফল্য লাভ করলেন। লোকের মুখে মুখে উদ্যমীপুরুষ জর্জের প্রশংসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেও বিলম্ব হল না।

এই সময়ে ভার্জিনিয়ার ওহিও নদীর তীরে বিরাট অঞ্চল ছিল ফরাসীদের অধীন। তাদের সেই অঞ্চল থেকে সরাবার জন্য ভার্জিনিয়ার গভর্নর চিন্তাভাবনা করছিলেন।

এমনি সময়ে জর্জ ওয়াশিংটন সেনাবাহিনীতে কাজ কববাব ইচ্ছা জানিয়ে তাঁর কাছে আবেদন পত্র পাঠালেন।

গভর্নর জর্জকে বিশেষ দূত করে ফরাসীদের কাছে পাঠালেন। আদেশ দিলেন, অবিলম্বে ফরাসীদের এই অঞ্চল ছেড়ে যেতে হবে।

জর্জের দৌত্য ব্যর্থ হল। গভর্নরের আদেশে তখন জর্জকে সেনাবিভাগের লেফটেনান্ট কর্নেল পদে নিযুক্ত করা হল। ছশো সৈন্যের এক বাহিনী দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বিতর্কিত এলাকায় ফরাসীদের হটিয়ে দেবার জন্য।

জর্জ কৌশলে ফরাসীদের দুর্গ অধিকার করে তাদের বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করল। যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি মারা গেলেন।

কিছুদিন পরেই স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ান ও ফরাসী বাহিনী মিলিত ভাব ইংরাজদের আক্রমণ করলেন। এই আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য ইংরাজ সেনাপতি ব্রাডক-এর অধীনে ওয়াশিংটনকে পাঠানো হল।

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে শত্রুপক্ষকে আক্রমণের যে কৌশল জেনারেল ব্রাডক অবলম্বন করলেন তাতে ওয়াশিংটন খুশি হতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর পরামর্শে কান না দিয়ে ব্রাডক সরাসরি ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

এই যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দিলেও ব্রাডককে প্রাণ হারাতে হল। তাঁর যুদ্ধকৌশলের ত্রুটির জন্য বহু সংখ্যক ইংরাজ সৈন্যও মারা গেল।

ওয়াশিংটন নেহাৎ ভাগ্যবলেই প্রাণে রক্ষা পেলেন। কিন্তু তাঁর তিনটি ঘোড়াই গুলিবিদ্ধ হল, গুলির আঘাতে পোশাক হল ছিন্নভিন্ন।

কিন্তু এর মধ্যেই ওয়াশিংটন স্বপক্ষীয় বিপর্যস্ত সৈন্যদের পেছনে হটিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। সেদিন সাহসিকতার সঙ্গে এই কাজটি করতে না পারলে গোটা বাহিনীই প্রাণ হারাতো।

যুদ্ধক্লান্ত ফরাসীরা ইংরাজ সৈন্যদের অনুসরণ করেনি, ফলে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন ওয়াশিংটন ও তাঁর বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরা।

ভার্জিনিয়ার গভর্নর ব্রাডকের শূন্য পদে ওয়াশিংটনকে নিযুক্ত করলেন ১৭৫৫ খ্রিঃ। ওয়াশিংটন হলেন ভার্জিনিয়ার সৈন্যবাহিনীর প্রধান।

ভার্জিনিয়ার সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি পদে মাত্র তিন বছর কাজ করেছিলেন ওয়াশিংটন। এই সময়ের মধ্যেই নিজ বুদ্ধিমত্তা ও রণকুশলতার গুণে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন।

শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করবার জন্য ওয়াশিংটন নিত্য নতুন এমন সব কৌশল অবলম্বন করতেন যে শত্রুপক্ষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। মঝে মাঝেই তিনি সুকৌশলে ভুল তথ্য প্রচার করে শত্রুদের বিপথে চালিত করতেন। এই সকল কারণে তিনি আখ্যা পেয়েছিলেন ধূর্ত শেয়াল।

স্বাস্থ্যের কারণে তিন বছর পরে পদত্যাগ করে ওয়াশিংটন নিজের জমিদারি মাউন্ট ভার্ননে চলে আসেন। এই সময়েই তিনি বিবাহ করেন মার্থা ড্রানড্রিজ নামে এক ধনাঢ্যা বিধবাকে। তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছিল।

এরপর দীর্ঘ সতেরো বছর নিজের জমিদারির কাজে ব্যস্ত থেকেছেন ওয়াশিংটন। কিন্তু দেশের ঘটনাপ্রবাহ ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ছিলেন সজাগ। এই সতেরো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, ইংরাজদের শাসনাধীনে আমেরিকার অধিবাসীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ছাড়া আর কিছু নয়। যতদিন ইংরাজদের হাতে এদেশের শাসনক্ষমতা থাকবে ততদিন এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না।

সতেরো বছর পরে ১৭৭৪ খ্রিঃ আবার পাদপ্রদীপের আলোয় এলেন ওয়াশিংটন। সেই বছর তেরোটি মার্কিন উপনিবেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আয়োজিত হল ফিলাডেলফিয়ায়। ভার্জিনিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে এই সম্মেলনে যোগ দেন ওয়াশিংটন।

ইংলন্ডের পার্লামেন্টে যে সকল আইন পাশ হত তার ফলে বরাবরই আমেরিকার স্বার্থ ক্ষুন্ন হত। এছাড়া আমেরিকায় উৎপাদিত ফসলের সিংহভাগ চালান হয়ে যেত ইংলন্ডে সেখানকার লোকদের সুখভোগের জন্য। এই সকল নানা কারণে সম্মেলনে প্রত্যেক প্রতিনিধিই ইংলন্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন।

পরের বছরে দ্বিতীয় অধিবেশনে সর্বসম্মতি ক্রমে ওয়াশিংটন সমগ্র উপনিবেশের সেনাপ্রধান নিযুক্ত হলেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র ওয়াশিংটনেরই সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল। কাজেই গুরুত্বপূর্ণপদের দায়িত্ব যে উপযুক্ত হস্তেই অর্পিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথমে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ইংলন্ডকে নিজেদের দাবি-দাওয়া জানানোর ও আপসরফার চেষ্টা করা হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছল যে আমেরিকার মাতৃভূমি ইংলন্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া আর পথ রইল না। যুদ্ধই হয়ে দাঁড়াল একমাত্র সমাধানের পথ।

আমেরিকার তেরোটি প্রদেশের প্রতিনিধিরা সন্নিলিত সিদ্ধান্তের শেষে ১৭৭৬ খ্রিঃ ৭ই জুন আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে গঠন করা হল পরিচালন পরিষদ। এর প্রধান হলেন টমাস জেফারসন।

১৭৭৬খ্রিঃ ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র প্রচার করা হল তাতে প্রদেশগুলির ঐক্যের কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হল।

এরপরেই বিভিন্ন প্রদেশে আমেরিকানদের সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও শক্তিশালী ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর তুলনায় ওয়াশিংটনের আমেরিকান বাহিনী ছিল যথেষ্ট দুর্বল। এদের অধিকাংশেরই সামরিক শিক্ষা বা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না। উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। কিন্তু সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন সুশৃঙ্খল একটি বাহিনী সংগঠিত করতে পেরেছিলেন এবং এই বাহিনীর সাহায্যেই যুদ্ধ জয় করেছিলেন।

ব্রিটিশ সৈন্যের তিনটি বাহিনী তিনদিক থেকে এসে একজায়গায় মিলিত হয়ে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে এরকমই নির্দেশ ছিল ইংলন্ডের সামরিক দপ্তরের।

আমেরিকার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ সামরিক দপ্তরের নির্দেশ অনুসরণ করতে গিয়ে ব্রিটিশদের একটি বাহিনী বিস্তীর্ণ জলাভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল। ওয়াশিংটন সেই সুযোগে আক্রমণ করে তাদের পর্যুদস্ত করলেন। প্রাণ বাঁচাবার জন্য ইংরাজ সৈন্যরা তড়িঘড়ি জাহাজে চেপে ইংলন্ডে পাড়ি দিল।

ইংরাজদের অপর দুটি বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচ বছর মরণপণ লড়াই করতে হয়েছে ওয়াশিংটনকে।

নিজের বাহিনীর দুর্বলতার কথা ওয়াশিংটন জানতেন। তাই সৈন্যদের মনোবল ও উৎসাহ সজাগ রাখার বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। নিজের পদমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিলেন।

শত্রুসৈন্যের বন্দুকের মুখে ওয়াশিংটন নিজে অকুতোভয়ে এগিয়ে যেতেন। সৈনিকদের বিপদকে তিনি নিজের বিপদ বলেই গণ্য করতেন। সমস্ত বিপদ আপদ দুঃখ যন্ত্রণা তিনি সৈন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন। সুযোগ সুবিধার বিষয়ে কোন সৈনিকের যাতে কোন প্রকার অভিযোগ না থাকে সেই বিষয়ে তিনি সর্বদা তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন।

এই সকল কারণে সমগ্র বাহিনীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করেছিলেন ওয়াশিংটন। তাঁর আদেশ নির্দেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য সকলে প্রাণপণ চেষ্টা করত।

কেবলমাত্র সৈনিকদের শৃঙ্খলা ও অটুট মনোবলের জোরেই শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটন ইংরাজ বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হলেন।

১৭৮১ খ্রিঃ ইংরাজ সেনাপতি কর্নওয়ালিশ আমেরিকান বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ওয়াশিংটন লাভ করলেন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ী নায়কের গৌরব।

সেনাপতি হিসেবে নিজের কর্তব্য সম্পূর্ণ করে ওয়াশিংটন আবার নিজের জমিদারিতে ফিরে গেলেন। কিন্তু আমেরিকার মানুষ তাঁর অসামান্য কর্মকুশলতাকে দেশ গঠনের কাজে নিয়োজিত করতে চাইছিল। তাই এবারে তাঁকে হতে হল স্বাধীন আমেরিকার কর্ণধার।

১৭৮৭ খ্রিঃ সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে দেশে সংবিধান রচনা করেছিলেন, এবং ঐক্যবদ্ধভাবে জর্জ ওয়াশিংটনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। তিনি হন স্বাধীন আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি।

ওয়াশিংটন যে কেবল একজন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন তাই নয়। দক্ষ রাজনীতিবিদ ও প্রশাসক হিসেবেও তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপন করেছেন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করবার পর।

শিশু রাষ্ট্রের সংগঠনের কাজে তিনি কখনো রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভেদ বা কোন প্রকার সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেন নি। দলমত নির্বিশেষে যোগ্যতম ব্যক্তিকে তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের ভার অর্পণ করেছেন।

তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের অভ্যন্তরীন উন্নতির সাথে সাথে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং দেশকে দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

১৭৯৩ খ্রিঃ ফরাসী বিপ্লব শুরু হলে তিনি বিপ্লবীদের সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু

গ্রহণ করেছিলেন নিরপেক্ষনীতি। ফলে বিবদমান প্রতিটি দেশের সঙ্গেই আমেরিকার ব্যবসায়ের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। রাষ্ট্রপতি হিসেবে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন। ১৭৯২ খ্রিঃ তাঁকে দ্বিতীয়বারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়। তৃতীয় বারের জন্যও তিনিই নির্বাচিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির পদ তিনি আঁকড়ে থাকতে চান নি। অধিকতর যোগ্য ও সম্ভাবনাময় নেতৃত্বের জন্য প্রেসিডেন্ট পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ইংলন্ডে ক্রমওয়েল যেমন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ওয়াশিংটন তেমনি এক নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু ক্রমওয়েলের মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না তিনি, দেশের প্রতি কর্তব্যবোধে নিজের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করে গেছেন।

১৭৯৯ খ্রিঃ জর্জ ওয়াশিংটনের দেহাবসান হয়।

সান-ইয়াৎ-সেন

নবীন চীনের অগ্রদূত সান-ইয়াৎ-সেন জন্ম গ্রহণ করেন দক্ষিণ চীনের কোয়ান্টাং প্রদেশের এক অখ্যাত গ্রামে ১৮৬৬ খ্রিঃ ২রা নভেম্বর। তাঁর বাবা ছিলেন দরিদ্র চাষী। স্বভাবতঃই নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেই বড় হয়ে উঠতে হয়েছিল সানকে।

বাড়ির কাছেই ছিল মিশনারীদের একটা স্কুল। সান সুযোগ পেলেই সেখানে চলে যেতেন। একপাশে দাঁড়িয়ে দেখতেন তাঁর বয়সী ছেলেরা কেমন পড়াশুনা করছে।

ছেলের উৎসাহ দেখে সানের বাবা তাঁকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। মনের আনন্দে সান স্কুলে যাতায়াত শুরু করলেন।

মিশনারী স্কুলে ধর্মবিষয়ক শিক্ষাই ছিল প্রধান। বাচ্চাদের দুর্বোধ্য নানা বিষয় সেখানে তাদের মুখস্থ করতে হত, আবৃত্তি করতে হত।

সানের জানার আগ্রহ ছিল সহজাত। তিনি কোন কিছু না বুঝে মুখস্থ করতে চাইতেন না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে শিক্ষকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। ফলে প্রায়ই তাঁকে স্কুলের শিক্ষকদের কাছে শাস্তি পেতে হত।

আমেরিকানরা সেই সময় চীনে ব্যবসা করতে আসত। চীনের গ্রামের লোকেরা জানত, এই সাগরপারের মানুষদের অনেক টাকা। আমেরিকার সোনার খনির কথাও অজানা ছিল না তাদের।

সানের বাবা সারাদিনের কাজের শেষে বাড়ি ফিরে এসে যখন বিশ্রাম করতেন, সেই সময় সান এসে তাঁর পাশে বসতেন। নানান গল্প শুনতেন। সানের বাবার স্বপ্ন ছিল, বড় হয়ে তাঁর ছেলেও একদিন সাগর মানুষদের সোনার দেশে গিয়ে অনেক অর্থ আয় করে আনবে। সংসারের দুঃখ ঘোচাবে। সেই কথা তিনি গল্পচ্ছলে ছেলেকে বারবার মনেও করিয়ে দিতেন প্রতিদিন।

সানের এক বৃদ্ধা ঠাকুমা থাকতেন সেই গ্রামে। তিনি কিন্তু আমেরিকানদের পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, সাগর মানুষরা অদ্ভুত পোশাক গায়ে দেয়, কাঠি দিয়ে না খেয়ে লোহার হাতের মত জিনিস (চামচ) দিয়ে খায়, লোকগুলো নেহাৎই অসভ্য। সান যেন কোন দিনই তাদের দেশে না যায়।

দুজনের মুখে দুরকম কথা শুনে শিশু বয়সেই সানের মনে আমেরিকানদের সম্পর্কে কৌতূহল জেগে ওঠে। নানাভাবে তিনি তাদের সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করতেন।

পাশের গ্রামেই ছিল তিন ভাই। তারা আমেরিকায় গিয়ে অনেকদিন ছিল, সেখানের সোনার খনিতে কাজ করে অনেক অর্থ নিয়ে দেশে ফিরেছিল। তাদের কাছেই বালক সান একদিন শুনতে পেলেন, আমেরিকার মানুষেরা নিজেরাই তাদের দেশের রাষ্ট্রপতি ঠিক করে।

চীনের মাঞ্চু রাজারা যেমন চাষীদের ফসল, ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়, বিনা অপরাধে নির্দোষ লোককে কয়েদ করে রাখে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কখনো তা করতে পারে না।

কথাগুলো শুনে সানের খুবই ভাল লাগত। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে সে দেশের আরো অনেক কথা জানার চেষ্টা করতেন।

দেশের মাঞ্চুরাজাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করত চীনের সাধারণ মানুষেরা। তাই তাদের অন্যায় কাজেরও প্রতিবাদ করবার সাহস পেত না তারা।

একদিন সান শুনতে পেলেন, আমেরিকার সোনার খনিতে কাজ করা তিন ভাইকে ঈশ্বরপুত্র মাঞ্চুরাজা হত্যা করে তাদের ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে গেছে। অবস্থাপন্ন লোকদের সম্পদ এভাবেই চীনের রাজারা কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করত সেকালে।

সেই ঘটনার পরে প্রথম সানের মনে মাঞ্চুরাজার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জেগে উঠল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, সাগর পারের মানুষেরা অনেক ভাল, বড় হয়ে তিনি তাদের দেশেই চলে যাবেন।

সানের দাদা আ মেই হাওয়াই দ্বীপের হনলুলুতে থেকে ব্যবসা করতেন। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি অনেক দেশে ঘুরেছেন। শেষে হনলুলুতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই দোকান খুলেছেন, গড়েছেন মস্ত খামার।

কারবার দেখাশোনার জন্য তিনি পনেরো বছরের সানকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন।

সেই প্রথম দেশ ছেড়ে বিদেশে পা দিলেন সান। তাঁর মনে হল যেন এক নতুন জগতে এসে পড়েছেন। দাদা সেখানেই এক মিশনারী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন সানকে।

সানের আরম্ভ হল ব্যস্ত জীবন। স্কুলের পড়াশোনা আবার ব্যবসার কাজ দেখাশোনা করা একই সঙ্গে চলতে লাগল তাঁর।

মিশনারীদের স্কুলে ইংরাজি, অঙ্ক, ইতিহাস আর বাইবেল পড়তে হতো। পড়াশুনায় ছিল সানের গভীর আগ্রহ, তাই অল্প দিনের মধ্যেই তিনি স্কুলের সেরা ছাত্র হিসেবে শিক্ষকদের প্রিয় হয়ে উঠলেন।

ব্যবসায়ের কাজে দোকানে যখন তিনি বসতেন, তখন প্রায়ই সাগর পারের বিদেশী মানুষদের দেখতেন। আগ্রহ নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। মানুষগুলোর স্বাধীনচেতা ভাব দেখে সানের মনে প্রথম স্বাধীনতার স্পৃহা দেখা দেয়। দেশের মানুষদের কথা ভেবে তাঁর নিজেরই তখন দুঃখ ও লজ্জা হতো।

আঠারো বছর বয়সের মধ্যেই পশ্চিমের শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হয়ে উঠলেন সান। স্কুলেও সেরা ছাত্র হিসাবে পুরস্কার পেলেন।

দাদা আ মেই কিন্তু ছোটভাইয়ের সাহেবদের মত হাবভাব দেখে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

সান বলতেন, মাঞ্চুরাজারা দিনের পর দিন নানা ভাবে অত্যাচার করে আমাদের দেশের মানুষগুলোকে পশুর মত করে রেখেছে। তারা প্রাণখুলে হাসতে পর্যন্ত পারে না। আর সাহেবরা কেমন টগবগে— দেখলে মনে হয় দুনিয়ায় ওরা কাউকে পরোয়া করে না। অথচ ওদের চাইতে আমাদের সভ্যতা কত প্রাচীন, আমরা রীতিমত একটা সভ্যজাত। মাঞ্চুরা এই কথাটা একবারও আমাদের মনে করতে দিতে চায় না।

ভাইয়ের মুখে এসব বিপ্লবী কথাবার্তা শুনে দাদা শঙ্কিত হয়ে ভাবলেন, এ সবই ইংরাজি শিক্ষার ফল। আরো কিছুদিন এখানকার শিক্ষা পেলে সে পুরদস্তুর সাহেব হয়ে উঠবে— নিজের দেশের কথাই হয়তো ভুলে যাবে।

আ মেই বাবার কাছেই গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন সানকে।

আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত সান একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গ্রামে ফিরলেন। গ্রামের মানুষের কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস থেকে তিনি তখন মুক্ত। দেশের প্রাচীন প্রথা ও দেবদেবীদের ওপর থেকেও পুরোপুরি বিশ্বাস চটে গেছে তাঁর।

নিজের বিশ্বাস ও ভাবনার কথাই এবারে সান গ্রামের মানুষদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে প্রচার করতে শুরু করলেন। মাঞ্চুরা যে শাসনের নামে নানাভাবে শোষণ করে তাদের পশুতে পরিণত করে রেখেছে, উৎপীড়িতের মুখ বন্ধ করবার জন্য নিজেদের ঈশ্বরপুত্র বলে প্রচার করছে, এমনি সব কথা তিনি স্থানীয় মানুষদের শোনাতে লাগলেন।

তিনি আরও বলতেন, প্রজারা যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির শস্য দিয়ে অর্থ দিয়ে খাজনা দেয়, সেই অর্থে তো দেশের লোকের জন্য স্কুল তৈরি হতে পারে, রাস্তা তৈরি হতে পারে।

কিন্তু সেদিকে তো মাঞ্চুদের কোন নজর নেই, নিজেদের ভোগ বিলাস নিয়েই তারা মত্ত হয়ে রয়েছে। প্রজার দেওয়া অর্থেই তো তাদের যত সমৃদ্ধি—কিন্তু প্রজারা এমন দৈন্যদশায় থাকবে কেন, কেন সব অত্যাচার মুখ বুজে সইবে?

শত শত বছরের দাসত্বে থেকে গ্রামের মানুষেরা নিজেদের দাস আর রাজাকে দেবতা ভাবতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা সানের কথায় সায় দিতে পারল না। অনেকেই প্রতিবাদ করল, অভিশাপ দিল।

সান কিন্তু নিরস্ত হলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন অন্ধ ধর্মবিশ্বাস আর শিক্ষার অভাবই দেশের মানুষগুলোর মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। দেশকে পুনর্গঠন করতে হলে সবার আগে দরকার এদের মন থেকে ধর্মবিশ্বাস দূর করা আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

কিন্তু সেই দিকে অগ্রসর হবার আগেই সানকে কোয়ানটাং প্রদেশ ছাড়তে হল। দেবতা ও রাজার বিরুদ্ধে কথাবার্তা শুনে বিভিন্ন গ্রামের মোড়লরা একজোট হয়ে সানকে গ্রামছেড়ে কেবল নয়, প্রদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করল। তা না হলে যে রাজরোষে গোটা প্রদেশেই আগুন জ্বলবে!

সান-ইয়াৎ-সেন দেশ ছেড়ে এলেন হংকং। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নিজে প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে উঠতে না পারলে অপরকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব নয়। উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি ভর্তি হলেন কুইনস কলেজে। এরপর কলেজ থেকে পাশ করে ভর্তি হলেন ক্যান্টন মেডিক্যাল স্কুলে। এখান থেকে ডাক্তারি পাশ কবলেন ২৮ বছর বয়সে।

সান-ইয়াৎ-সেন ভাবলেন, এবাবে তিনি দেশে ফিরে দুঃস্থ মানুষের সেবার কাজ করবেন, সেই সঙ্গে মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলবেন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা।

ডাক্তারী পড়বার সময়েই সমভাবাপন্ন কিছু সহপাঠীকে নিয়ে সান-ইয়াৎ-সেন গড়ে তুলেছিলেন একটি বিপ্লবী দল।

সেই সময়ে দেশে নানা প্রান্তে ও বিদেশে আরো কিছু বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল। এদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল, দেশকে বিদেশীদের শোষণ থেকে রক্ষা করা, দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করে দুর্নীতি বন্ধ করা।

এই সংগঠনগুলো মাঞ্চু সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামবার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছিল। ক্যান্টনে ফিরে এসে সান ডাক্তারি আরম্ভ করলেন। কাজের ফাঁকে সংগঠনের কাজও চলতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যেই দলের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেল।

এরপরই সংগঠনের পক্ষ থেকেএকটি প্রচার পুস্তিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতে লাগল। তার এক সংখ্যায় সান লিখলেন, জনগণই হল দেশের মূল ভিত। এই ভিত যত শক্ত হবে দেশও হবে তত নিরাপদ।

মাঞ্চুরাজাদের গুপ্তচর বাহিনীও ইতিমধ্যে তৎপর হয়ে উঠেছিল। সান যখন অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনগুলির সঙ্গে মিলিত ভাবে ক্যান্টনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতি নেবার কথা ভাবছেন সেই সময়েই একদিন অতর্কিতে পুলিশের আক্রমণ ঘটল। দলের অধিকাংশ সদস্যই ধরা পড়লেন। কৌশলে পালিয়ে গেলেন সান।

কিছুদিন এখানে সেখানে আত্মগোপন করে থাকার পর তিনি ছদ্মবেশে হাওয়াই দ্বীপে চলে এলেন। শুরু হল তাঁর নির্বাসিত জীবন।

সানের পলায়নের কথা মাঞ্চু সরকার জানতে পেরে প্রত্যেক দেশের দূতাবাসে তাকে বন্দী করার কথা জানিয়ে দেওয়া হল। তাঁর মাথার জন্য ঘোষণা করা হল এক লক্ষ পাউন্ডের পুরস্কার।

সান বিচলিত হলেন না। দেশের মুক্তি যুদ্ধের সৈনিককে মৃত্যু ভয়ে ভীত হলে চলে না। মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেই কাজ করে যেতে হয় বিপ্লবীকে।

সান-ইয়াৎ-সেন এবারে দেশে দেশে ঘুরে দেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা, শাসক-শ্রেণীর উৎপীড়ন শোষণের কথা প্রচার করতে লাগলেন।

চীন বহুকাল থেকেই বিদেশী মানুষের কাছে ছিল অজ্ঞাত দেশ। অথচ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশভূমি ছিল চীন।

ইতালীয় পর্যটক মার্কোপলোই প্রথম বিদেশী যিনি চীন দেশে আসেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হলে বিদেশী বণিকরা এই প্রাচীন দেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে ক্রমে ক্রমে সেখানে উপস্থিত হয় পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজরা।

চীনসম্রাট ওই সব বিদেশী বণিকদের প্রশ্রয় দিতে চায় নি। তবু নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেই বিদেশী বণিকরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাণিজ্য করতে থাকে।

বিদেশীদের মধ্যে ইংলন্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসারপরিমাণই ছিল সব চেয়ে বেশি। এরা চীন থেকে চা, রেশম, ইত্যাদি কিনতো। আর চীনাদের কাছে বিক্রি করত আফিম্।

গোটা দেশ জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের আফিমের ব্যবসা। ফলে দেশের মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল আফিমের নেশা। চীন সম্রাট এই ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরেও অর্থলোভী ইংরাজ বণিকরা গোপনে ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগল। উৎকোচলোভী সরকারী কর্মচারীরাই তাদের সাহায্য করত।

শেষ পর্যন্ত আফিমকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ বণিকদের সঙ্গে মাঞ্চু সম্রাটদের বিরোধ চরমে উঠল। স্বদেশীয় বণিকদের সাহায্যে এগিয়ে এল ব্রিটিশ সেনা বাহিনী। ১৮৪০-৪২ খ্রিঃ ধরে দুই পক্ষে চলল যুদ্ধ। ইতিহাসে এই যুদ্ধই আফিম-এর যুদ্ধ নামে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হল চীনারা। ইংরাজরা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে পাকাপাকিভাবে ব্যবসা করার অধিকারও আদায় করল।

এই যুদ্ধের সুযোগে মার্কিনরাও ব্যবসা করতে নেমে পড়ল চীন দেশে। এতদিন ছিল চীন সম্রাটের শোষণ। সেই সঙ্গে এবারে যুক্ত হল ইংরাজ ও মার্কিন বণিকরা।

দেশের জমির মালিক ছিল জমিদাররা। তারা খাজনা আদায়ের নামে কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের সিংহভাগই জবরদস্তি করে আদায় করত। এছাড়া রাজকর্মচারীরাও

নানা অছিলায় লোকের সম্পত্তি অধিকার করত। অসহায় চীনের সাধারণ মানুষ কোন প্রতিবাদ করারই সুযোগ পেত না।

বিদেশী-বণিকরাও কিছু কম ছিল না। আফিমের নেশা ধরিয়ে দিয়ে তারা নানা কৌশলে শোষণ করত চীনাদের। তাদের বাধা দেবার কোন ক্ষমতাই ছিল না মাঞ্চু সম্রাটদের। ফলে চাষীরা দিন দিনই নিঃস্ব রিক্ত হতে লাগল।

মাঞ্চু সম্রাটদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৮৫১ খ্রিঃ। হং সিং চুয়ান নামে এক ব্যক্তি ছিলেন এই বিদ্রোহের নেতা। বিদেশী সৈন্যের সহায়তায় মাঞ্চু সম্রাট এই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। ইতিহাসে এই ঘটনা তাইপিং বিদ্রোহ নামে পরিচিত হয়েছে।

চীন সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশী বণিকরাই হয়ে উঠল দেশের পরোক্ষ শাসক। দেশের এমনি দুরবস্থার কালেই সান-ইয়াৎ-সেনের আবির্ভাব ঘটল। তিনি চীনের দুরবস্থার কথা প্রবাসী চীনাদের সাহায্যে বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন।

নিজের দেশে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও তার জন্য প্রস্তুত করে নিতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি সান-ইয়াৎ-সেন। বিদেশে যেখানেই গেছেন, সেখানকার সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভের চেষ্টা করেছেন।

ইংলণ্ডে থাকার সময়ে বৈপ্লবিক কাজ কর্মের ফাঁকে যে সময়টুকু পেতেন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামেই কাটাতেন। তিনি পড়তেন সমাজ সংস্কারক ও দার্শনিকদের জীবন ও রচনাবলী।

এই সূত্রেই কার্ল মার্কসের রচনাবলী তিনি পাঠ করেন। পরে লেনিন ও অন্যান্য রাশিয়ান বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

১৮৯৯ খ্রিঃ জাপানে এসে সান-ইয়াৎ-সেন তাঁর সংগঠনের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। ইংলন্ড আমেরিকার চাইতে এখান থেকেই স্বদেশেব সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার সুবিধা ছিল বেশি।

বিদেশে থেকেই দেশের মাটিতে অনুগামী বিপ্লবীদের মাধ্যমে প্রচারকার্য আরম্ভ করলেন সান-ইয়াৎ-সেন। চেষ্টা বিফল হল না। চীনেব নিপীড়িত মানুষদের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল গণ চেতনা। অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের খোলস ছেড়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠতে লাগল নতুন এক চীন। বিভিন্ন সংস্কারের দাবি ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠতে লাগল চারদিকে।

মাঞ্চু সম্রাটরা এই গণচেতনার পরিণতি ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য জনসাধারণের দাবি মেনে নিয়ে ১৯০৬ খ্রিঃ সম্রাজ্ঞী জু-সি প্রশাসনিক সংস্কারের কথা ঘোষণা করলেন।

এই সংস্কারের মধ্যে ছিল আংশিকভাবে ঋণ মকুব, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও সেনাবাহিনী পুনর্গঠন।

সান-ইয়াৎ-সেন কিন্তু এই সংস্কার প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য রাজতন্ত্রের উচ্ছেদই একমাত্র পথ। তিনি বিপ্লবী দলের প্রথম সম্মেলন আহ্বান করলেন টোকিওতে।

এই সম্মেলনেই প্রথম গঠিত হল প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবী দল। দলের নামকরণ হল কুওমিনটাং। সান দলের লক্ষ্য ও আদর্শ ঘোষণা করে জানালেন দেশ পুনর্গঠনের কাজে তিনটি বিষয়ই হবে প্রধান।

সেগুলো হল, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা, গণতান্ত্রিক সরকার গঠন এবং প্রজারা যাতে নিজেদের সম্পদ নিজেরাই ভোগ করতে পারে তার জন্য জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন।

তিনি তাঁর দলের আদর্শ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, শান্তি আমাদের মুখ্যকাম্য। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রই আমাদের লক্ষ।

সান ইয়াৎসেনের সমর্থনে এগিয়ে এল অগণিত চীনা ছাত্র, যুবক, কৃষিশ্রমিক। এদের সঙ্গে হাত মেলালেন, চিয়াং কাইসেক সহ দক্ষিণ চীনের সামরিক বাহিনীর নেতৃবৃন্দ। চীনা ব্যবসায়ীরা রাশি রাশি অর্থ তুলে দিল তাঁর হাতে।

দেখতে দেখতে গড়ে উঠল বিরাট মুক্তযোদ্ধা বাহিনী। বিপ্লব ছড়িয়ে পড়তে লাগল দিকে দিকে।

কিন্তু রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আঘাত হানার চেষ্টা ব্যর্থ হয় সানের। কেবল একবার নয়। পর পর দশবার। কিন্তু তবু তিনি মনোবল হারালেন না।

নতুন করে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় সান আমেরিকা গেলেন। সেখানেই খবর পেলেন ১৯১১ খ্রিঃ ১০ই নভেম্বর চিয়াং- কাইসেক-এর নেতৃত্বে বিপ্লবী মুক্তিবাহিনী সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে ন্যানকিং শহর দখল করে নিয়েছে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তাঁর নাম।

আমেরিকার পর ব্রিটেন, ফ্রান্স হয়ে সান ১৯১২ খ্রিঃ ৫ই জানুয়ারি এসে পৌঁছলেন নানকিং। আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হলেন তিনি।

এর কয়েক দিন পরেই, ১২ই জানুয়ারী, কয়েক শ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে মাঞ্চু রাজবংশের নাবালক সম্রাট পদত্যাগ করলেন। সমস্ত চীনে প্রতিষ্ঠিত হল নতুন প্রজাতন্ত্র। সান ইয়াৎসেন হলেন নতুন প্রজাতন্ত্রে কর্ণধার। এই সময় তাঁর বয়স ছেচল্লিশ বছর।

সান ইয়াৎ সেনের স্বপ্ন ছিল, দেশের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে, সামরিক বাহিনীর প্রত্যেক দলের মধ্যে এবং অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার সকল স্তরের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধশালী এক নতুন চীন গড়ে তুলবেন। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন সফল করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গড়ে তুলবার আগেই দেশের অন্যতম রাজনৈতিক দল লিবারেল পার্টির হাতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা তুলে দিতে হল।

লিবারেল পার্টি উদার রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। এই দলের নেতা

ছিলেন সমাজ সংস্কারক ইউয়ান-শি-কাই। প্রজাতন্ত্রী নতুন চীনেব রাষ্ট্রপতি হলেন শি-কাই।

কলেজের এক ছাত্রী সুন্দরী চিং লিং সুং ছিলেন সানের অনুরাগী। তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল সানের সেক্রেটারী। কিছুদিনের মধ্যে তাকে বিয়ে করলেন সান।

ইতিপূর্বেও একবার বিয়ে করেছিলন সান। কিন্তু সে বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। চিং লিং হলেন সানের যোগ্য সহধর্মিনী।

ক্ষমতা হাতে পেয়ে শি-কাই আর উদারনীতিতে বিশ্বাসী রইলেন না। হয়ে উঠলেন ক্ষমতাকামী একনায়ক। সান শিং-কাই-এর স্বৈরাচারের প্রতিবাদ জানালেন। শি-কাই সানকে বন্দি করার হুকুম দিলেন অনুগত সামরিক বাহিনীকে।

প্রাণের দায়ে রাতারাতি জাপানে পালিয়ে যেতে হল সানকে। আবার শুরু হল স্বৈরাচারী একনায়ক শি-কাই-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। নানকিং-এ সান-এর অনুগত বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করল, কিন্তু পরাজিত হল।

শি-কাই নিজেকে চীনের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি মারা গেলেন। ক্ষমতা দখল করলেন জেনারেল চেং। তাঁর সঙ্গে যোগ দিল দেশের জমিদার সম্প্রদায়।

সান-এর নেতৃত্বে এবং দেশের ছাত্র কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতায় দেশজুড়ে শুরু হল গৃহযুদ্ধ।

১৯২১ খ্রিঃ গণ অভ্যুত্থানে পতন ঘটল জেনারেল জেং-এর। সানের জাতীয়তাবাদী দল ক্যান্টনে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করল। সান হলেন এই সরকারের রাষ্ট্রপতি।

ইতিমধ্যে রাশিয়ায় বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। চীনের এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের অপর কোন দেশ থেকে সান সাহায্য পাননি।

এরপর সান রাশিয়ার আদর্শে চীনের গঠন মূলক কাজে হস্তক্ষেপ করবেন। কিন্তু সেই সুযোগ তিনি পেলেন না। ১৯২৫ খ্রিঃ দেশের রাজনৈতিক দলগুলির যুক্ত অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১২ই মার্চ তারিখে তাঁর সংগ্রামী জীবেনর চির অবসান ঘটে।

সানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন চিয়াং-কাইসেক। দেশের বিরোধী শক্তিগুলিকে কঠোর হাতে তিনি দমন করলেন। তবে তিনি কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাস করতেন না। তাই চীনে কমিউনিস্ট দলগুলির সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক ছিন্ন করে চীনে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন।

আধুনিক চীনের উত্থানের পেছনে সান-ইয়াৎসেনের অবদান অবিস্মরণীয় চীনের ৮০০ বছরের রাজতন্ত্র উৎখাত করে তিনিই প্রথম প্রজাতন্ত্র গঠন করেছিলেন। বিদেশী শাসক ও শোষকদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন চীনকে। বিলম্বে হলেও তাঁর সমৃদ্ধ নতুন চীন গঠনের স্বপ্ন স্বার্থক হয়েছে।

আলেকজান্ডার দি গ্রেট



দিগ্‌বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজান্ডার ছিলেন মেসিডোনিয়া রাজ্যের অধিপতি ফিলিপের পুত্র। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে গ্রীস দেশ অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মেসিডোনিয়া ছিল এমনি একটি রাজ্য।

ফিলিপ ছিলেন সাহসী ও কুশলী যোদ্ধা। সিংহাসনের অধিকার লাভ করবার পরেই তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে সুদক্ষ এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন। এরপর একের পর এক রাজ্য জয় করে সমগ্র গ্রীসদেশে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আলেকজান্ডার ছিলেন তাঁর পিতারই মত বীর, সাহসী ও রণকুশলী এবং পরবর্তীকালে হয়েছিলেন দিগবিজয়ী। কথিত হয়, জন্মের সময় থেকেই তিনি পিতার শ্রী সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ফিলিপের সৈন্যবাহিনী যখন বীরদর্পে একের পর এক রাজ্য জয় করে চলেছে সেই সময়ে, সময়টা খ্রিস্টপূর্ব ৩৫৬ অব্দ, একই সঙ্গে তিনিটি শুভ সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছায়।

সেগুলো হল—অলিম্পিকের ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় তাঁর ঘোড়া বিজয়ী হয়েছে, সেনাপতি পারমেনিও ইলিরিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে এবং রানী অলিম্পিয়াসের একটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেছে। রানীর এই পুত্রই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন বীর আলেকজান্ডার।

পুত্র সম্পর্কে রানী অলিম্পিয়াসের মনে এক অদ্ভুত ধারণা জন্মেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন আলেকজান্ডার দেবতার সন্তান। কথিত হয়, তিনি আলেকজান্ডারের জন্মের পূর্বে স্বপ্ন দেখেছিলেন, দেবতা সাপের রূপ নিয়ে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করেছেন।

মায়ের সান্নিধ্যে থেকে আলেকজান্ডারের মনেও এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে দেবতার অংশ থেকে তাঁর জন্ম। আমৃত্যু এই বিশ্বাস তাঁর মধ্যে অটুট ছিল।

রাজা ফিলিপ অধিকাংশ সময়েই যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে লিপ্ত থেকেছেন। ফলে পিতার সাহচর্য বেশি লাভ করার সুযোগ হয়নি আলেকজান্ডারের। তাই বাল্য বয়স থেকেই মার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

ছেলেবেলা থেকেই সুগঠিত শরীর লাভ করেছিলেন আলেকজান্ডার। দেব

বালকের মতই ছিলেন রূপবান। সব চেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হল, তাঁর শরীর থেকে সব সময় অপূর্ব একটা সুগন্ধ পাওয়া যেত।

রাজকার্যের ব্যস্ততার মধ্যেও ফিলিপ পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে অবহেলা করেন নি। রানী অলিম্পিয়াসের এক আত্মীয় লিওনিদোসকে তিনি পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক চেষ্টায় ও যত্নে আলেকজান্ডার অঙ্ক ও ইতিহাসের সঙ্গে অশ্বারোহন ও তীরন্দাজীতেও সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।

ইতিহাসের বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে আলেকজান্ডারের সবচেয়ে প্রিয় ছিল মহাকবি হোমার রচিত ইলিয়াডের কাহিনী। মহাবীর অ্যাকিলিস ছিলেন তাঁর প্রিয় চরিত্র।

বস্তুতঃ সেই শৈশব থেকেই যুদ্ধবিগ্রহ, বীরত্ব, বিপদ-বাধা—এই সব তাঁকে আকর্ষণ করত। নিজেও কিশোর বয়স থেকেই হয়ে উঠেছিলেন বীরোচিত সাহসের অধিকারী। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সহজাত তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

পুত্রকে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বুঝতে পেরে রাজা ফিলিপ এবারে তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। মহাজ্ঞানী অ্যারিস্টটলকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়ে ম্যাসিডনে নিয়ে এলেন।

অ্যারিস্টটল নিয়েজা গ্রামে নিমপাস মন্দিরের সন্নিকটে নির্জন নিরালা পরিবেশে তাঁর শিক্ষায়তন গড়ে তুললেন। এখানে তিনি ছাত্রদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে নাটক, কবিতা, গল্প ইত্যাদি বিষয়ও এখানে শিক্ষা দেওয়া হত।

আলেকজান্ডারও ভর্তি হলেন অ্যারিস্টটলের শিক্ষায়তনে। এখানে তিনি তিন বছর শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, মহাজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের শিক্ষা আলেকজান্ডারের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশ্বজয়ী হবার প্রেরণা ও শিক্ষা তিনি শিক্ষাগুরু অ্যারিস্টটলের কাছেই পেয়েছিলেন।

গুরুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন আলেকজান্ডার। আজীবন এই শ্রদ্ধা তাঁর অটুট ছিল। পরে, ম্যাসিডনের সিংহাসনের অধিকার লাভ করে অ্যারিস্টটলের গবেষণার সমস্ত দায়িত্ব নিজেই বহন করেছিলেন।

রাজা ফিলিপ একবার বাইজেনটাইন অভিযানে যাত্রা করলেন। যাবার আগে আলেকজান্ডারের ওপর রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। সেই সময় তাঁর বয়স ষোল।

রাজধানীতে ফিলিপ অনুপস্থিত, রাজ্যের দায়িত্বে ছেলেমানুষ আলেকজান্ডার, এই সুযোগে বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন নেতা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল।

কিশোর আলেকজান্ডার কিন্তু কিছু মাত্র বিব্রত বোধ করলেন না। তিনি বীরদর্পে

সৈন্য বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং বিদ্রোহী নেতাদের পরাজিত করলেন। পরে সকলকে বন্দি করে রাজধানীতে নিয়ে এলেন।

যুদ্ধজয়ের আনন্দ আলেকজান্ডারের মনে নেশা ধরিয়ে দিল। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে প্রথম যে দেশ জয় করলেন, নিজের নামে সেই দেশের নামকরণ করলেন আলেকজান্দ্রাপোলিস।

সেই সময় অ্যাথেনিয়া ও থেবান রাজ্যের মিলিত শক্তি ম্যাসিডনের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই যৌথ শক্তির মোকাবিলার জন্য ফিলিপ সমর অভিযানের উদ্যোগ নিলেন। এই অভিযানে তিনি তরুণ পুত্রের ওপর ভার দিলেন অশ্বারোহী বাহিনীর।

এই অভিযানে আলেকজান্ডার তাঁর অসাধারণ বীরত্ব, সাহস ও যুদ্ধ কৌশলের পরিচয় দিলেন। ঝড়ের বেগে নিজের বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রু সৈন্যদের পর্যুদস্ত করলেন।

যুদ্ধজয়ের পরে রাজধানীতে ফিরে এসেই দুঃসংবাদ পেলেন আলেকজান্ডার। রাজা ফিলিপের বিবাহ অনুষ্ঠান চলছে, পুনর্বার বিবাহ করছেন তিনি। অবিলম্বে তিনি উপস্থিত হলেন পিতার বিবাহানুষ্ঠানে।

সেই সময় নতুন রানীর কাকার সঙ্গে অকস্মাৎ আলেকজান্ডারের বিবাদ উপস্থিত হলে ফিলিপ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সকলেই তখন পানে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন।

সেই অবস্থাতেই ক্রুদ্ধ ফিলিপ ছোরা বার করে পুত্র আলেকজান্ডারের দিকে ছুটে এলেন। কিন্তু পানোন্মত্ত অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলেন না; মাটিতে পড়ে গেলেন। এই দুর্ঘটনা না ঘটলে সেদিন পিতাপুত্রের মধ্যে কি অবস্থার সৃষ্টি হত বলা যায় না।

কিন্তু দুজনের মধ্যে সম্পর্ক এই দিনের ঘটনার পর থেকে ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যেতে লাগল। যাই হোক, কয়েক বছরের মধ্যেই এই অপ্রীতিকর অবস্থার অবসান ঘটল নিয়তির বিধানে।

আলেকজান্ডারের যখন কুড়ি বছর বয়স, রাজা ফিলিপ সেই সময় অকস্মাৎ আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালেন।

পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসন অধিকার করলেন আলেকজান্ডার। নতুন রানীর কন্যাকে হত্যা করা হল। রানী অলিম্পাসের চক্রান্তে নতুন রানী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলেন। আলেকজান্ডারের ভবিষ্যৎ এইভাবে নিষ্কণ্টক হয়ে গেল।

ঐতিহাসিকদের অভিমত, রানী অলিম্পাসের চক্রান্তের ফলেই মৃত্যু ঘটেছিল রাজা ফিলিপের। পুত্রের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করবার উদ্দেশ্যেই তাঁকে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

ফিলিপের মৃত্যুর সুযোগে ম্যাসিডনের চতুর্দিকে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

অধীন রাষ্ট্রগুলি পরপর স্বাধীনতা ঘোষণা করতে লাগল। ফলে আলেকজান্ডার একরকম শত্রুপরিবেষ্টিত হয়ে পড়লেন।

এই অবস্থায় ম্যাসিডনের নেতৃস্থানীয় প্রবীণেরা আলেকজান্ডারকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। কেননা শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় কোন প্রকার সামরিক উদ্যোগ করলে ম্যাসিডনের স্বাধীনতা বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

সাহসী বীর আলেকজান্ডার কিন্তু এই পরামর্শ গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁর মনে হল এই অবস্থায় মৈত্রী প্রস্তাব হবে দুর্বলতার নামান্তর। সামরিক বল প্রয়োগ ছাড়া শত্রুদলনের কোন বিকল্প হয় না।

তিনি অবিলম্বে সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বীরদর্পে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

আলেকজান্ডার ছিলেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ—শত্রুদের এমন ভাবে দমন করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কখনো তাদের বিদ্রোহের সুযোগ না থাকে। আলেকজান্ডার প্রথমেই আক্রমণ করলেন থেবেস রাষ্ট্র। গ্রীক সৈন্যবাহিনী শত্রুদের সমস্ত রকম বাধা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে নগরে প্রবেশ করল।

নির্বিচারে নগর ধ্বংস করেই তারা নিবৃত্ত হল না। হাজার হাজার নগরবাসী তাদের হাতে প্রাণ হারাল।

ত্রিশ হাজার লোককে বন্দি করা হল। পরে বন্দিদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হল।

নগর লুণ্ঠন করে প্রচুর সম্পদ সংগৃহীত হয়েছিল। আলেকজান্ডার সেসব সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। উৎসাহ উদ্দীপনায় নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠল সৈন্যবাহিনী।

থিবস বিজয়ের পরে আলেকজান্ডার অগ্রসর হলেন দক্ষিণ দিকে। কোন কোন রাষ্ট্র তাঁর অগ্রগতিকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের বাধা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। একে একে দক্ষিণের সমস্ত দেশই তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হল।

এরপরে আলেকজান্ডার উপস্থিত হলেন কর্নিথে। আলেকজান্ডারের বিজয় অভিযানকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা বিবেচনা করে অবিলম্বেই গ্রীসের সমস্ত রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে তাঁকে তাঁদের প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি জানাল।

সকল রাষ্ট্রের নেতৃত্ব লাভের পর আলেকজান্ডার সম্মিলিতভাবে এশিয়া অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন এবং শুরু হল তার প্রস্তুতি।

অল্পসময়ের মধ্যেই বিশাল এক সুগঠিত বাহিনী সংগঠিত হল। বাহিনীতে ছিল ত্রিশ হাজার পদাতিক, চারহাজার অশ্বরোহী।

আলেকজান্ডার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, পারস্য আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি প্রথম এশিয়া অভিযান করবেন। কিন্তু এরই মধ্যে ম্যাসিডোনিয়ানসের অধিপতি

থ্রেসের বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। কাজেই আপাততঃ সেই দিকেই নজর দিতে হল তাঁকে।

ম্যাসিডোনিয়ানস রাষ্ট্র ছিল পর্বতবেষ্টিত। চারদিকের খাড়া পাহাড় এই রাষ্ট্রকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করত। ভেতরে প্রবেশের একটি মাত্র পথই ছিল। তার নাম সিপকা পাস।

রাজা থ্রেসের এই পথ ঘিরেই তাঁর সৈন্যবাহিনী জড়ো করলেন। আর একদল রাখলেন পাহাড়ের ওপরে যাতে তারা ওপর থেকে পাথর বা অস্ত্র ছুঁড়ে আক্রমণ করে শত্রু সৈন্যদের নিহত করতে পারে।

আলেকজান্ডারের সুদক্ষ সেনাবাহিনী বারবার চেষ্টা করেও সঙ্কীর্ণ গিরিপথে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা পাথরে দলে দলে সৈন্য মারা পড়ল।

রণকুশলী আলেকজান্ডার এই বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন মাথার ওপর ঢাল উঁচু করে ধরে হাঁটু মুড়ে অগ্রসর হয়।

তাঁর নির্দেশে সারিবদ্ধ সৈন্যরা পরস্পরের ঢাল দিয়ে এমনভাবে নিজেদের আচ্ছাদন তৈরি করে ফেলল যে ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা পাথর তাতে ঠেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। কাউকেই হতাহত করতে পারল না। এইভাবে গিরিপথ ধরে অগ্রসর হয়ে আলেকজান্ডারের বাহিনী এক সময়ে নগর দখল করে নিল।

থ্রেসের সৈন্যদের কিছু মারা পড়ল নগর রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করে, অধিকাংশই প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। আলেকজান্ডার নগর অধিকার করে আগুন ধরিয়ে দিলেন চতুর্দিকে। মুহূর্তে লেলিহান অগ্নিশিখা গ্রাস করে নিল থ্রেসের রাজধানী।

এরপর, খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৪ অব্দে আলেকজান্ডার তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এশিয়া অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

গ্রেনিকাস নদীর তীরস্থ হেলসম্পটে পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন আলেকজান্ডার। নদীর অপর পারেই পারস্য সম্রাট দারায়ুসের বিশাল সৈন্যছাউনি। তাঁর সৈন্য সংখ্যা একলক্ষেরও বেশি।

বিশাল সৈন্যবাহিনীর অধিকারী হয়েও দারায়ুস নিজে ছিলেন ভীরু ও দুর্বল প্রকৃতির। তাছাড়া তাঁর সৈন্যদলে ছিল শৃঙ্খলার অভাব।

যথাসময়ে দুই পক্ষে শুরু হল ঘোরতর যুদ্ধ। পারস্যের দুই সেনানায়ক যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন।

আলেকজান্ডার রথের ওপরে থেকে যুদ্ধ করতেন। তাঁকে চিহ্নিত করে পারস্যের দুই সেনানায়ক দুই দিক থেকে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করলেন।

আলেকজান্ডার যখন একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন সেই সময় দ্বিতীয় সেনানায়ক ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আলেকজান্ডারের মাথা লক্ষ্য করে কুঠার দিয়ে আঘাত করল।

বিদ্যুৎগতিতে সরে গিয়ে মাথা রক্ষা করলেন আলেকজান্ডার। কিন্তু তাঁর

শিরস্ত্রাণ ছিটকে পড়ে গেল। এবারে অরক্ষিত মাথা লক্ষ্য করেই পারস্য সেনানায়ক দ্বিতীয়বার আঘাত করবার জন্য হাতের কুঠার উত্তোলিত করল।

অদূরেই উপস্থিত ছিলেন আলেকজান্ডারের বন্ধু ক্লিটাস। তিনি বিদ্যুৎগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে এসে পারস্য সেনানায়কের বুক তীক্ষ্ণ বর্শায় বিদ্ধ করলেন। ক্লিটাসের তৎপরতায় সেদিন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন আলেকজান্ডার।

কিন্তু ভবিতব্যের গতি এমনি বিচিত্র যে, একদিন আলেকজান্ডারের হাতেই প্রাণ হারাতে হয়েছিল ক্লিটাসকে।

দুই পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধে দারায়ুসের বাহিনী ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তাদের পক্ষের ২৫০০০ সৈন্য ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দেখা দিয়েছে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা।

অবস্থা প্রতিকূল বুঝতে পেরে দারায়ুস প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলেন। তাঁর পরিবার পরিজন রয়ে গেল অরক্ষিত অবস্থায়।

পারস্য সম্রাট দারায়ুসের পতনের পর অপরাজেয় হয়ে উঠলেন আলেকজান্ডার। কোন বিপক্ষ বাহিনীর সৈন্য বেষ্টনীর তো কথাই নেই, প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য বাধাও আর তাঁর অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারল না।

দুরন্ত নদী তিনি পার হতেন সুকৌশলে, দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় অতিক্রম করতেন নির্ভীক তৎপরতায়। কোন বাধাকেই আর বাধা বলে গ্রাহ্য করতেন না তিনি।

তিনি অপরাজেয় শক্তির অধিকারী, দেবরাজ জিউসের পুত্র—এই বিশ্বাস তাঁকে ক্রমশই দুর্দমনীয় করে তুলেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, স্বর্গের দেবতারা রয়েছেন তাঁর সহায়, কাজেই তিনি অপরাজেয়—পৃথিবীর কোন শক্তি তাঁর বাধা হয়ে উঠতে পারে না।

ক্রমে টায়ার নগরী অধিকার করে আলেকজান্ডারের বাহিনী ঝড়ের বেগে উপস্থিত হল গর্ডিয়াম নগরে।

এখানে ছিল বিখ্যাত গর্ডিয়ামের দড়ির ফাঁস। প্রবাদ ছিল যে এই দড়ির বাঁধন যে আলগা বা ছিন্ন করতে পারবে সে সমগ্র এশিয়ার অধিপতি হতে পারবে।

যুগ যুগ ধরে বহু শক্তিশালী যোদ্ধা চেষ্টা করেও সেই দড়ির ফাঁস আলগা বা ছিন্ন করতে পারেন নি। আলেকজান্ডারও এই প্রবাদের কথা শুনেছিলেন। তিনি গর্ডিয়ামের দড়ির ফাঁসের কাছে গিয়ে তাঁর তরোয়ালের এক কোপে পলকের মধ্যে ছিন্ন করলেন দড়ির বাঁধন।

আলেকজান্ডারের দ্রুত সিদ্ধান্ত স্থির করবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এই ক্ষমতাবলেই তিনি যাত্রাপথের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী হতে পেরেছিলেন।

দারায়ুস ছিলেন সমগ্র পশ্চিম এশিয়া মিশর ও পারস্যের অধিপতি। হেল-

সম্পটের যুদ্ধে পরাজিত হলেও তিনি পলায়ন করে অন্য জায়গায় গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

সিডনাস নদীর কূলে আরবেলার রণক্ষেত্রে অবিলম্বেই মুখোমুখি হল দুই পক্ষের সেনাবাহিনী।

পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অধিপতি দারায়ুসের সৈন্য সংখ্যাও ছিল বিশাল, প্রায় দশ লক্ষ। আর আলেকজান্ডারের পক্ষে ছিল মাত্র দু লক্ষ সৈন্য। যা পারস্য সম্রাটের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ।

কিন্তু দারায়ুসের বাহিনীতে ছিল শৃঙ্খলার অভাব। তুলনায় আলেকজান্ডারের সৈন্যদল ছিল শৃঙ্খলাপরায়ন ও সংহত। ফলে আলেকজান্ডারের অশ্বারোহী বাহিনীর দ্রুতগতি আক্রমণে পারসিকবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়নপর হল। মারা পড়ল অসংখ্য সৈন্য। আবারও পরাজিত হলেন দারায়ুস। পরিবার পরিজন ফেলে রেখে তিনি প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলেন।

সেই সময় পারস্যের রাজধানী পার্সোপোলিশ ছিল পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ নগরী। আলেকজান্ডার এই নগরী অধিকার করলেন। রাজপ্রাসাদের সকলকে বন্দি করে নিয়ে আসা হল আলেকজান্ডারের সামনে।

বন্দিদের মধ্যে ছিলেন দারায়ুসের মা, স্ত্রী ও দুই কন্যা। আলেকজান্ডার তাঁদের মুক্তি দিয়ে সসম্মানে প্রাসাদে ফিরিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে পলাতক দারায়ুস একজন আততায়ীর আঘাতে আহত হলেন। সেই অবস্থায় তাঁকে গ্রীক সৈন্যরা বন্দি করল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি যখন জানতে পারলেন আলেকজান্ডার তাঁর পরিবার পরিজনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেননি, তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে আলেকজান্ডারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন। কিছু পরেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

সম্রাটের মৃতদেহ নিয়ে আসা হল আলেকজান্ডারের কাছে। তিনি নিজের শরীরের আচ্ছাদন খুলে সম্রাটের মৃতদেহ ঢেকে দিয়ে সম্মান জানালেন।

এরপর সিরিয়ার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করে আলেকজান্ডার প্যালেস্টাইনও অধিকার করলেন।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৮ অব্দের মধ্যে সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য আলেকজান্ডারের পদানত হল।

আলেকজান্ডারের শৌর্যবীর্য ও যুদ্ধজয়ের কাহিনী লোকের মুখে মুখে এমন পর্যায়ে পৌঁচেছিল যে তাঁর নামেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত। যুদ্ধের আগেই প্রতিপক্ষ পরাজয় স্বীকার করে নিত। বহু দেশ এভাবে আত্মসমর্পণ করে তাঁর পদানত হয়েছে।

আলেকজান্ডার যখন যে রাজ্য দখল করেছেন, নতুন শহর বা রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবার আগে তার শাসনভার দিয়ে যেতেন নিজের কোন সেনানায়কের

হাতে। এভাবে অগ্রসর হয়ে আলেকজান্ডার তাঁর বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে একসময় হিন্দুকুশ অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন।

সেইকালে গোটা ভারতবর্ষ ছিল ছোটবড় অসংখ্য রাজ্যে বিভক্ত। এদের মধ্যে ছিল না পারস্পরিক কোন ঐক্য। ফলে বিপদের দিনেও তারা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারল না গ্রীকবাহিনীর সামনে।

বিশাল ভারতভূমির কথা অজানা ছিল না আলেকজান্ডারের। তিনি তাঁর সৈন্য বাহিনীকে দুদলে ভাগ করে একদল পাঠালেন দক্ষিণ দিকে। দ্বিতীয় দল নিয়ে অগ্রসর হলেন উত্তর দিকে।

তক্ষশীলার রাজা অম্ভি প্রতিবেশী রাজা পুরুর শক্তি হ্রাস করার জন্য গ্রীকবাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তাঁর সহায়তায় গ্রীকদের প্রথম বাহিনীটি এগিয়ে চলল সিন্ধু নদের তীর ধরে।

আলেকজান্ডার উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে উপস্থিত হলেন তক্ষশীলায়। অম্ভি তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে প্রচুর উপঢৌকন দিলেন। প্রতিবেশী সমস্ত রাজাই বিনা যুদ্ধে আলেকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন।

চন্দ্রভাগা ও ঝিলাম নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের ছোট একটি রাজ্যের রাজা ছিলেন পুরু। একমাত্র তিনিই আলকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার না করে ঝিলামের তীরে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন।

গ্রীকসৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে রাজা পুরু ও তাঁর সৈন্যবাহিনী অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। কিন্তু অবশেষে গ্রীকবাহিনীর হাতে পুরু বন্দি হলেন। তাঁকে আলেকজান্ডারের কাছে উপস্থিত করা হল।

শৃঙ্খলিত পুরুকে আলেকজান্ডার প্রশ্ন করলেন, রাজা, আমার নিকট আপনি কেমন ব্যবহার আশা করেন? পুরু দৃপ্তভঙ্গীতে জবাব দিলেন, রাজার সঙ্গে রাজার মত।

পুরুর বীরত্ব দেখে আলেকজান্ডার আগেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। এবার নির্ভীক উত্তর শুনে তাঁর সঙ্গে বীরের মতই ব্যবহার করলেন। পুরুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন, তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ আরো কিছু অঞ্চল উপহার দিলেন।

পুরুর সৈন্যদের বীরত্ব গ্রীকবাহিনীর মনোবলে চিড় ধরিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া, দীর্ঘ কয়েকবছর ক্রমাগত যুদ্ধ করে তারা ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল। তারা আর অগ্রসর হতে চাইল না। বাধ্য হয়েই আলকজান্ডারকে স্বদেশের পথে প্রত্যাবর্তন করতে হল।

ব্যাবিলনে পৌঁছে তিনি কয়েকমাস বিশ্রাম করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে উত্তর আফ্রিকা জয় করবেন। কিন্তু অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। সময়টা ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দের ২রা জুন। এগারো দিন অসুস্থ থাকার পর

দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের জীবনাবসান হয়। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৩ বছর।

পৃথিবীব্যাপী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন ছিল আলেকজান্ডারের। কিন্তু স্বল্পকালীন জীবনে সে স্বপ্ন তাঁর অপূর্ণই রয়ে গেল। জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তিনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকেছেন। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা এমনই ছিল যে ঐতিহাসিকরা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট অভিধায় ভূষিত করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপন করেছেন।

এক দানবীয় শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন আলেকজান্ডার। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বুদ্ধি ও সাহস। ফলে শক্তির দম্ভে তিনি এমনই নৃশংস হয়ে উঠতেন মাঝে মাঝে যে তাঁর অন্তর্নিহিত মহত্ত্ববোধ ও উদারতা চাপা পড়ে যেত। বস্তুতঃ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মহত্ত্ব উদরতা, গঠনমূলক প্রতিভা ও বীরত্ব তাঁর চরিত্রকে গৌরবান্বিত করেছিল।

অপর দিকে খ্যাতি, গৌরব ও প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল দ্বিগ্বিজয়ের পৈশাচিক উন্মাদনা। বহু গ্রাম, নগর, জনপদ তিনি ধ্বংস করেছেন, কেবল নিজের ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য নির্বিচারে হত্যা করেছেন হাজার হাজার মানুষ। তিনি হয়ে উঠেছিলেন ধ্বংস আর মৃত্যুর প্রতিভূ। ইতিহাস তাঁর নাম সেই ভাবেই ধারণ করে আছে।

অ্যাডলফ হিটলার



ধ্বংসের মূর্তপ্রতীক রূপে যদি রক্ত-মাংসের কোন মানুষের নাম নির্দেশ করতে হয়, তবে মানবসভ্যতার ইতিহাসের সেই ঘৃণালিপ্ত নামটি নিঃসন্দেহে অ্যাডলফ হিটলার। তাঁর কীর্তি যা ইতিহাসে পৃথিবীর সবচাইতে ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুরতম কুকীর্তি রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে তা স্মরণ করতে গেলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

অর্থ সম্পদ, পারিবারিক আভিজাত্য এবং শিক্ষাদীক্ষাহীন এই মানুষটিই একটি বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধের স্রষ্টা, হতে চেয়েছিলেন সমগ্র জার্মানীর তথা পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতা, পৃথিবীজোড়া মানব জাতিকে পদানত করার অভিসন্ধি নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ সংহার করেছিলেন নির্বিকারে। বস্তুতঃ হয়েও উঠেছিলেন বিশ্বের ত্রাস।

কিসের জোরে এই মানুষটি পৃথিবীজুড়ে জ্বালিয়েছিলেন ধ্বংসের দাবানল? কে

তাঁকে শক্তি জুগিয়েছিল পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার অভিযানে ? সে হল তাঁর অদম্য মনোবল, ব্যক্তিত্ব আর আকাশছোঁয়া উচ্চাশা।

অথচ এই দুর্লভ সহজাত গুণ নিয়ে জন্মে কোন মানুষ ইতিহাসে স্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করে সহজেই হয়ে উঠতে পারতেন মানবজাতির প্রাতঃস্মরণীয় গৌরবের অধিকারী ব্যক্তিত্ব।

অস্ট্রিয়া ও ব্যাভেরিয়ার মাঝামাঝি ব্রনাউ নামের এক অখ্যাত শহরতলীতে ১৮৮৯ খ্রিঃ ২০শে এপ্রিল জন্মেছিলেন হিটলার।

তাঁর পিতা ছিলেন একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের কনিষ্ঠতম কর্মী। তিন পত্নী আর তাদের সন্তানদের নিয়ে অর্ধাহারে অনাহারের মধ্যেই বলতে গেলে তাঁর দিন কাটত। হিটলার ছিলেন তাঁর পিতার তৃতীয় পত্নীর তৃতীয় সন্তান।

ছেলেবেলাতেই হিটলারের পরিণত জীবনের স্বরূপ ফুটে উঠেছিল। তিনি ছিলেন অসম্ভব একগুঁয়ে, জেদী আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির। এর সঙ্গে অস্বাভাবিক ভাবেই যেন সহাবস্থান করত একটি কল্পনাপ্রবণ শৈল্পীক মন।

শুনলে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে যে তিনি শৈশব থেকেই ছবি আঁকতে পছন্দ করতেন।

ছয় বছর বয়সেই হিটলারকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় অবৈতনিক স্কুলে। পড়াশুনায় মেধা থাকলেও ছবি আঁকার ব্যাপারেই ছিল তাঁর ঝোঁক। কোনরকমে স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করেই ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে বসতেন।

তাঁর বাবার ইচ্ছে ছিল স্কুলের পড়া শেষ করে হিটলার কোন কাজকর্মে ঢুকে পড়বেন —সংসারের ভার কিছুটা লাঘব হবে তাঁর।

বাবার ইচ্ছার কথা জানা সত্ত্বেও কিন্তু হিটলার এগারো বছর বয়সেই স্কুলের পাট চুকিয়ে দিলেন। ঠিক করলেন পাকাপাকিভাবে ছবি আঁকায় মনোযোগ দেবেন। হবেন নামকরা চিত্রশিল্পী।

এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় আর্টস্কুলে ভর্তির পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। ফলে আর্টস্কুলে শিক্ষা লাভের ইচ্ছার ওখানেই ইতি টানতে হল।

সংসারের অনটনের আঁচ এড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। তাই বাধ্য হয়েই চাকরির সন্ধান করতে লাগলেন।

চাকরির সন্ধানে যখন হন্যে হয়ে ঘুরছেন, সেই সময় মা মারা গেলেন। একমাত্র মায়ের বন্ধনই সংসারের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিল তাঁকে। এবারে সেই বন্ধন ছিন্ন হতে স্বাধীন জীবনের দ্বার খুলে গেল তাঁর সামনে।

ভাগ্যান্বেষণে চলে এলেন ভিয়েনায়। অজানা অচেনা জায়গায় শুরু হলো তাঁর কঠোর জীবন-সংগ্রাম।

হিটলারের ভিয়েনার জীবন শুরু হলো জন মজুরের কাজ দিয়ে। কিছুদিন পরে আরম্ভ করলেন মাল বওয়ার কাজ। এরপর ধরলেন রং বিক্রির ব্যবসা।

এতসব করেও যখন দুবেলা অন্নসংস্থান হচ্ছে না সেই সময় রোজগারের সহজ একটা পথ বের করলেন মাথা খাটিয়ে। হিটলারের আসল চরিত্র এবার থেকেই আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পেল। হিটলার অশ্লীল ছবিএঁকে গোপনে বিক্রি আরম্ভ করলেন।

এই সময় হিটলারের মন আর একটি বিষয়ের সন্ধান লাভ করল। নানা কারণে ইহুদীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জেগে উঠতে লাগল তাঁর মনে।

সেই সময়ে জার্মানীর ব্যবসাক্ষেত্রে ইহুদীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অধিকাংশ কলকারখানা, সংবাদপত্র ইত্যাদির মালিকানা ছিল ইহুদীদেরই।

তারাই বলতে গেলে দেশের অর্থনীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করত। খাটাখাটুনির কাজে নেমে এই ব্যাপারটা যখন ধরা পড়ল, হিটলার ভালভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না।

জার্মানদের দেশে বসে তাদের ওপরই ইহুদীরা প্রভুত্ব করবে একজন খাঁটি জার্মান হয়ে কি করে তিনি মেনে নেবেন।

দুঃখকষ্টের বোঝা যদি কিছুটা লাঘব হয় এই আশা নিয়ে হিটলার ভিয়েনা ছেড়ে মিউনিখে এলেন ১৯১২ খ্রিঃ। কঠোর সংগ্রামের মধ্যে এখানে কাটলো দুটো বছর। এলো ১৯১৪ খ্রিঃ।

ইউরোপে বাঁধল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এতদিনে যেন বাঁচার মত একটা পছন্দমত পথ পেয়ে গেলেন হিটলার। সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে যোগ দিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হিটলার যথেষ্ট সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন পদোন্নতি হয় নি।

যুদ্ধ শেষ হল দেশজোড়া তীব্র হাহাকার অভাব আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে। এই সুযোগে জন্ম নিল নানা রাজনৈতিক দল আর বিপ্লবী সংগঠন। বিরুদ্ধ শক্তির এই ঘাঁটিগুলির ওপর গোয়েন্দাগিরি করার কাজে কর্তৃপক্ষ হিটালারকে নিয়োগ করলেন।

দেশে সেই সময় লেবার পার্টি ছিল সবচেয়ে বড় আর শক্তিশালী। তীক্ষ্ণবুদ্ধি হিটলার প্রথমে সাধারণ সদস্য হিসেবে এই দলে নাম লেখালেন। আশ্চর্য কর্মকুশলতা গুণে বছর না ঘুরতেই তিনি হয়ে উঠলেন পার্টির প্রধান। তাঁর উদ্যোগে দলের নতুন নাম হল ন্যাশানাল ওয়ার্কাস পার্টি। পরবর্তীকালে হিটলারের এই দলেরই নাম হয়েছিল নাৎসী পার্টি।

পার্টির প্রধান হিসাবে হিটলার প্রথমেই জনসাধারণের কাছে পঁচিশ দফার এক কর্মসূচী পেশ করলেন। এতে তিনি প্রধানত যে বিষয়টির ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলেন তা হল, জার্মান জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ না করলেও তাঁর উদ্দেশ্য যে সমস্ত অধিকার জার্মানদের হাতে কেন্দ্রীভূত করা, তা অপ্রকাশ্য থাকল না।

১৯২০ খ্রিঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী নাৎসী দলের এক কেন্দ্রীয় সভায় হিটলার তাঁর পঁচিশ দফা দাবি উত্থাপন করলেন।

এরপরেই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেন হিটলার। স্বস্তিকা চিহ্নযুক্ত দলের পতাকা প্রকাশ করলেন।

জার্মান জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে নাৎসী দল খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হল। তিন বছরের মধ্যেই সদস্য সংখ্যা প্রায় ষাট হাজারে পৌঁছল। স্বাভাবিক ভাবেই জার্মান রাজনীতিতে নাৎসী দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করে বসল।

মিউনিখে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন রাজনৈতিক দল যাতে না থাকে সেই উদ্দেশ্যে হিটলার ইতিমধ্যেই গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। তিনি গ্রেপ্তার হলেন। বিচারের পর তাঁকে এক বছরের জন্য ল্যান্ডসবার্গে এক পুরনো দুর্গে বন্দি করে রাখা হল।

কারবাস থেকে মুক্তিলাভের পর পূর্ণ শক্তিতে রাজনৈতিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হিটলার। তাঁর দলের মতবাদ আগের চাইতে আরও বলিষ্ঠ ও দৃপ্ত ভঙ্গীতে প্রচার করতে শুরু করলেন।

দেখতে দেখতে তিনি জার্মানদের মনে স্থান করে নিলেন। জনপ্রিয় নেতা হিসেবে খ্যাতিলাভ করলেন। জার্মান যুবকরা দলে দলে নাৎসী দলে নাম লেখাতে লাগল।

১৯৩৩ খ্রিঃ জার্মানীতে যে সাধারণ নির্বাচন হল অনুষ্ঠিত তাতে বিপুল সংখ্যার ভোটে হিটলারের ওয়ার্কাস দল বিজয়ী হল। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারল না।

পার্লামেন্টে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৬৪৭টি। তার মধ্যে তাঁর দল পেল ২৮৮টি। এই নির্বাচনের ফলাফল থেকে হিটলার যে শিক্ষা লাভ করলেন তা হল ক্ষমতা দখল করতে হলে কেবল নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না, অন্য পথ অবলম্বন করতে হবে।

সেবার কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় হিটলার পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিলেন। তারপর স্বমূর্তি ধারণ করলেন তিনি। শুরু করলেন ঘৃণ্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

কিছুদিনের মধ্যেই বিরোধী দলগুলির প্রথম সারির অনেক নেতা খুন হলেন। মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করিয়ে অনেককে জেলবন্দি করা হল। ওখানেই থেমে থাকলেন না তিনি। বিরোধী দলের মধ্যে কৌশলে নিজের দলের লোক ঢুকিয়ে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে দিলেন।

হিটলারের এই চক্রান্তে অল্পসময়ের মধ্যেই বিরোধী পক্ষ একরকম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অনিবার্যভাবে তিনি হয়ে উঠলেন নাৎসী দলের সর্বেসর্বা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জার্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তা।

হিটলারের এই আকস্মিক উত্থান সম্ভব করে তুলেছিল তাঁর ২৫দফা কর্মসূচীর প্রধান বিষয়, তা হল ইহুদী বিরোধিতা। সুকৌশলে জার্মানদের মধ্যে ইহুদী বিদ্বেষের বীজ রোপন করে রাতারাতি এভাবেই তিনি তার ফল চয়ন করলেন। তাঁর নাৎসী বাহিনীকেও তিনি দেশ থেকে ইহুদীদের বিতাড়নের উপযুক্ত করে গড়ে তুলে ছিলেন।

পরের ধাপেই, ১৯৩৪ খ্রিঃ হিটলার রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শক্তিকেও কুক্ষিগত করলেন। তিনি হলেন সৈন্য বাহিনীর প্রধান। তাঁর অন্য নাম হল ফুয়েরার অব জার্মান অর্থাৎ জার্মানীর নেতাজী।

পূর্ণক্ষমতা করায়ত্ত কবে হিটলার এবার দেশজুড়ে ব্যাপক ইহুদী বিদ্বেষের চাষ শুরু করলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে বোঝাতে শুরু করলেন, দেশের প্রধান প্রধান শিল্প-বাণিজ্য ইহুদীদের দখলে। তাদের জন্যই জার্মানরা নিজেদের দেশে কোনঠাসা হয়ে আছে আর সমস্ত সুযোগ সুবিধা একচেটিয়া ভোগদখল করে চলেছে ইহুদীরা। জার্মান জাতির সমস্ত দুঃখ-কষ্টের জন্য দায়ী ইহুদী গোষ্ঠীই।

এই প্রচারের ফল ফলতেও বিলম্ব হল না। দেশের নানা প্রান্তে ইহুদী নির্যাতনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটল প্রথমে। তারপর শুরু হল পরিকল্পিত ভাবে সংগঠিত আক্রমণ, লুঠতরাজ, হত্যা।

এইভাবে দেশব্যাপী নির্যাতন শুরু করে ইহুদীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন এই ছিল হিটলারের উদ্দেশ্য।

১৯৩৫ খ্রিঃ দেশে নতুন একটি আইন চালু করে নাগরিকদের দুটি ভাগে ভাগ করে ফেললেন। জার্মানদের নাম হল জেন্টিল আর ইহুদীদেব নাম হল জু। হিটলার ঘোষণা করলেন জার্মানরাই হল পৃথিবীর আদি সভ্যজাতি আর্যবংশসদ্ভুত। ইহুদীরা অনার্য—জার্মান দেশে বসবাসকারীমাত্র।

আর্যদের প্রয়োজনে অনার্যদের এই দেশ ছেড়ে যেতে হবে। হিটলারের বিভিন্নমুখী প্ররোচনায় দেশজুড়ে মাথাচাড়া দিল তীব্র ইহুদীবিদ্বেষ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে জার্মানী কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। পরাজয়ের পর ইউরোপের মিত্রপক্ষ ও জার্মানদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তা হল ভার্সাই চুক্তি। এই চুক্তির ফলে জার্মানীর সমস্ত ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান ঘটিয়ে হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন হিটলার। তিনি ধীরে ধীরে নিজের শক্তি ও ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভার্সাই চুক্তির সর্তগুলিও অস্বীকার করতে শুরু করেছিলেন। এই ভাবেই অগ্রসর হয়ে একসময় তিনি নিজেকে জার্মানির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে নিজেকেই তিনি জার্মানীর ফুয়েরার বা প্রধান রূপে ঘোষণা করলেন।

দেশের জনসাধারণের মনেও তিনি সুকৌশলে পাকাপোক্ত করে নিলেন নিজের জার্মানজাতির পরিত্রাতার ভাবমূর্তিটি।

দেশের নানাবিধ অভাব অভিযোগ, দারিদ্য, ক্রমবর্ধমান বেকারিত্ব মোটকথা জার্মানদের সর্বপ্রকার দুরবস্থারই সুযোগ করে দিয়েছে দেশের বর্তমান শাসনব্যবস্থা। এই শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে ইহুদীরা। সুতরাং জার্মানদের ভাগ্য ফেরাতে হলে তাদের বিতাড়নের মাধ্যমে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন এনেই তা সম্ভব এই কথা নানাভাবে প্রচার করে হিটলার নিজের আসনটি নির্দিষ্ট করে নিলেন।

সুপরিকল্পিতভাবেই হিটলার তাঁর দেশের সামরিক শক্তির বৃদ্ধির দিকে সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করলেন। কয়েকজন সুদক্ষ সমর নায়ক ও প্রচারবিদকে সহযোগী হিসেবে পেতেও বিলম্ব হল না। তারপর তাদের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন সীমান্তে বিপুল সংখ্যায় সৈন্য সমাবেশ করলেন।

ভার্সাই চুক্তির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকুকে পদদলিত করে হিটলার এক-তরফাভাবে রাইনল্যান্ড অধিকার করে নিলেন। তারপর অস্ট্রিয়া আর ইতালিকেও ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করলেন।

সেই সময় মুসোলিনী ছিলেন ইতালির সর্বাধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে ফ্যাসীবাদী শক্তি ও নাৎসী জার্মানী বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা ছকে ফেলল। সেই সূত্র ধরেই ইতালি প্রথমে আলবানিয়া ও পরে ইথিওপিয়ার কতকাংশ দখল করে নিল।

অপর পাশে হিটলার ডানজিগ ও পোলিশ করিডর দাবি করে বসলেন পোল্যান্ডের কাছে। তাঁর উদ্দেশ্য সৈন্য সমাবেশ করে এই অঞ্চলটিকে সুরক্ষিত করা।

হিটলারের এই অযৌক্তিক দাবি সঙ্গত ভাবেই পোল্যান্ড সরকার প্রত্যাখ্যান করলেন।

জার্মানীর সামরিক শক্তি সম্পর্কে পোল্যান্ডের কোন ধারণাই ছিল না। তাই তারা আশা করেছিল, হিটলারের আক্রমণ ঘটলে ইউরোপের শক্তিবর্গের সাহায্যে জার্মানবাহিনীকে অনায়াসেই পরাস্ত করতে পারবে।

ভার্সাই চুক্তির শর্ত হিটলার যখন একের পর এক লঙ্ঘন করে চলেছেন, সেই সময় ইংলন্ড ও ফ্রান্স নিজেদের নিরাপত্তার জন্য হিটলারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উৎসাহিত হয়নি। হিটলারের চাইতে কমিউনিস্ট রাশিয়াই সেই সময় হয়ে উঠেছিল ইউরোপীয় দেশগুলোর কাছে মহা শত্রু স্বরূপ। তাই তারা হিটলারকে বাধা দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

ইউরোপের দেশগুলির সুবিধাবাদী নীতির সুযোগটাই নিয়েছিলেন হিটলার। ১৯৩৯ খ্রিঃ ১লা সেপ্টেম্বর হিটলারের জার্মানবাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করল। আর সেই দিন থেকেই শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

পোল্যান্ডকে পরাস্ত করার পরই জার্মানবাহিনীর অগ্রগমন শুরু হল। এরপর হিটলারের দখলে এলো নরওয়ে ও ডেনমার্ক। পরে আক্রান্ত হল ফ্রান্স। দুপক্ষের তুমুল যুদ্ধের পর ফরাসী বাহিনী পরাজিত হল।

ইউরোপের অপরাপর দেশও যুদ্ধ থেকে সরে থাকতে পারল না। দেখতে দেখতে সমগ্র ইউরোপ আফ্রিকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন।

ফ্রান্স জয়ের পর যুগোস্লাভিয়া আর গ্রীস জার্মানদের দখলে এল। ফরাসীদের পরাজয়ের পরেই ইতালী জার্মানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এবারে যোগ দিল রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া। ফলে সমগ্র দক্ষিণ ইউরোপ জুড়ে জার্মানদের নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

জার্মানবাহিনী যখন একের পর এক যুদ্ধজয় করে চলেছে সেইসময় হিটলার দেশজুড়ে শুরু করলেন নারকীয় ইহুদী নিধন। হিটলারের এই নৃশংসতা মানব সভ্যতার এক কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করেছে।

হাজার হাজার ইহুদীকে নির্বিচারে বন্দি করা হয়। তাদের জনবসতিহীন সীমান্ত অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে বন্দিনিবাসে রাখা হল। সেখানে তাদের মারা হল নির্মম যন্ত্রণা দিয়ে।

গুলি খরচ কমাবার জন্য হিটলার গ্যাসচেম্বার তৈরি করলেন। চারদিক বন্ধ বিশাল এক ঘরে; দুশোজন করে ইহুদীকে ঢুকিয়ে দিয়ে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস ছেড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের মেরে ফেলা হত। মৃতদেহগুলিকে বার করে এনে বাইরে পুঁতে ফেলা হত।

এইভাবে তিনবছরে হিটলার প্রায় ৬০লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করে নৃশংসতার চূড়ান্ত ঘটিয়েছেন।

ফ্রান্সের পতনের পর হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলেন ১৯৪১ খ্রিঃ ২২শে জুন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিটলারের জীবনের সব চেয়ে বড় ভ্রান্তি ছিল রাশিয়া আক্রমণ।

প্রথমে জার্মান বাহিনী জয়ী হতে থাকলেও শেষ পর্যন্ত রুশ লাল ফৌজের মরণপণ লড়াইয়ের মুখে পরাজিত হয়।

রাশিয়ায় যখন যুদ্ধ চলছে, ঠিক সেই সময়েই হিটলারের নির্দেশে রোমেল আফ্রিকায় যুদ্ধ শুরু করেন। এইভাবে ইউরোপ ও আফ্রিকা জুড়ে যুদ্ধের লেলিহান শিখা প্রজ্জ্বলিত করলেন হিটলার।

এশিয়ায় জাপান জার্মানীর পক্ষে যোগ দেয় এবং আমেরিকার পার্ল হারবার বন্দর বিধ্বস্ত করে। ফলে আমেরিকাও প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

ইংরাজ সেনাপতি মন্টগোমারি রোমেলকে পরাজিত করলেন। ইতালিতে ফ্যাসিবিরোধী জনগণ মুসোলিনীকে হত্যা করল। ছয়মাস যুদ্ধের পর রাশিয়ার স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানবাহিনী লাল ফৌঝের কাছে আত্মসমর্পণ করল। স্বভাবতই

অনেক সেনাপতি হিটলারের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন। অনেকেই তাকে হত্যার চেষ্টা করলেন।

বাধ্য হয়ে, সঙ্গীদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে হিটলার সর্বক্ষণের জন্য ট্রেঞ্চে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এই সময় তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিলেন প্রণয়িনী ইভা ব্রাউন।

অসাধারণ সংগঠন শক্তি, বুদ্ধি ও প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও হিটলার ছিলেন বিকৃত মানসিকতার শিকার। ফলে সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেও ক্ষমতালাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তিনি নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছিলেন।

চারদিক থেকে যখন জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ আসতে লাগল, সেই সময়, ১৯৪৫ খ্রিঃ ৩০শে এপ্রিল রাশিয়ার লাল ফৌজ বার্লিন অবরোধ করে ফেলল। নিরুপায় আশাহত হিটলার কাল বিলম্ব না করে ট্রেঞ্চের মধ্যে আত্মহত্যা করলেন। একই সঙ্গে ইভাও বিষ খেয়ে হিটলারকে অনুসরণ করেন।

হো চি মিন

অকুতোভয় সৈনিকের মত যিনি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন স্বদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ভিয়েৎনামের প্রাণপুরুষ সেই চিরসংগ্রামী মানুষটিকে বিশ্বের মানুষ গ্রহণ করেছে বিপ্লবের প্রতীক রূপে, আলোকের দিশারী রূপে। অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর শৌর্যের অধিকারী এই অবিস্মরণীয় মানুষটির নাম হো-চি-মিন। অবশ্য দেশের মানুষের কাছে আঙ্কেল নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন ১৮ বছর বয়সে। এই সংগ্রাম ছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতার সংগ্রাম। নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্যেই ৭৯ বছর বয়সে জীবনপাত হয়, স্বদেশের স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ করা তাঁর ভাগ্যে হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এই সংগ্রামী সৈনিক পৃথিবীর মানুষের মনে লাভ করেছেন চিরস্থায়ী আসন—অমরত্ব।

নখেআন হল ভিয়েতনামের একটি প্রদেশ। এই প্রদেশের অখ্যাত এক গ্রামে ১৮৯০ খ্রিঃ ১৯শে মে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে হো চি মিনের জন্ম। তাঁর বাবার নাম ছিল নগুয়েন মিন হুয়ে।

হোয়ের প্রকৃত নাম নগুয়েন য়ান থাট। তিন ভাইবোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ।

ছেলেবেলা থেকেই কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হতে থাকেন হো। আশ্চর্যভাবে ওই বয়স থেকেই তিনি এ বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। তাই যথাসাধ্য বাবাকে খেতের কাজে সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন। খেলাধুলায় মেতে থেকে সময় নষ্ট করা তিনি একদম পছন্দ করতেন না।

বাল্য বয়সে মায়ের কাছে গল্প শুনতে ভালবাসতেন হো। বীর মানুষদের গল্পই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করত।

এ সংসারে মায়ের সান্নিধ্যই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। এগারো বছর বয়সে মাকে হারিয়ে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন তিনি।

মায়ের অকাল মৃত্যু হোয়ের জীবনে এক বিরাট আঘাত হয়ে বাজল। চিকিৎসার অভাবে রুগ্ন মায়ের মৃত্যুকে তিনি যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। পরিণত বয়সেও এই স্মৃতি তাঁকে বিহ্বল করে তুলত।

১৯০১ খ্রিঃ হোকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। পড়াশুনায় গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর। কৃতিত্বের সঙ্গেই পাঠশালার পাঠ শেষ করলেন।

গ্রামে বড় স্কুল ছিল না। হোকে ভর্তি করে দেওয়া হল হুয়ে শহরের স্কুলে।

শহরের পরিবেশে এসে হো প্রথম বুঝতে পারলেন, তাঁদের দেশ শাসন করছে ফরাসীরা। তাঁরা স্বাধীন নয়, পরাধীন। নিজেদের দেশে তাঁদের কোন অধিকার নেই।

হো যেই স্কুলে পড়তেন, তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন ফরাসী। অন্য শিক্ষকরা ভিয়েৎনামী। তাঁদের সকলকে প্রধান শিক্ষকের মর্জি-মেজাজ মেনে চলতে হয়। আর ছাত্রদের মধ্যে যারা ফরাসী সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তারাই ভোগ করতে পায়। সামান্য পান থেকে চুন খসার অপরাধে কঠোর সাজা ভোগ করতে হয ভিয়েৎনামী ছাত্রদের। এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার কোন পথ নেই।

এইভাবেই চলছিল দীর্ঘদিন। শেষ পর্যন্ত আর ধৈর্য রক্ষা সম্ভব হল না ভিয়েৎনামী ছাত্রদের। উঁচু ক্লাশের ছাত্ররা একদিন ঠিক করল তাঁরা সমবেত ভাবে প্রতিবাদ জানাবে।

একদিন ক্লাশে ঢুকলেন প্রধান শিক্ষক। স্কুলের নিয়ম মত ছাত্ররা উঠে দাঁড়িয়ে শিক্ষককে সম্মান জানাল। দেখা গেল কেবল ফরাসী ছাত্ররাই উঠে দাঁড়িয়েছে, ভিয়েৎনামী ছাত্ররা সকলেই যার যার সিটে বসে রয়েছে।

এতো রীতিমত অপমান। রাগে ফেটে পড়লেন প্রধান শিক্ষক। ভিয়েৎনামী ছাত্রদের এমন সাহস কি করে হয় তা ভেবে তিনি অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠলেন।

ক্লাশের সেরা ছাত্র হো। শান্ত স্বভাবের এই ছেলেটিকেই প্রধান শিক্ষক নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জানতে চাইলেন—কাদের প্ররোচনায় ছাত্ররা তাঁকে অপমান করল।

হো কিন্তু কোন কথারই জবাব দিলেন না। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এবারে রাগে গর্জন করে উঠলেন প্রধান শিক্ষক। চিৎকার করে তিনি জানতে চাইলেন, কেন ভিয়েৎনামী ছাত্ররা তাঁকে অপমান করেছে?

এবারে মুখ খুললেন হো। দৃঢ় অকম্পিত কণ্ঠে হো জানিয়ে দিলেন, ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ করে তিনি যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করছেন তারই প্রতিবাদ জানিয়েছে তাঁরা।

সবকথা জানালে পরিণতি কি হবে বিলক্ষণ জানা ছিল হোয়ের। তবু নির্ভীক দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি প্রধান শিক্ষকের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ জানাতে কুণ্ঠিত হলেন না।

সেদিন প্রবল ক্রোধে উন্মত্তের মত বেত চালিয়ে প্রধান শিক্ষক হোয়ের শরীর রক্তাক্ত করে দিয়েছিলেন। নীরবে সবই সহ্য করেছিলেন তিনি।

কিন্তু সেদিনই গাঁয়ের শান্ত লাজুক ছেলেটির মধ্যে নতুন এক মানুষের জন্ম হল। পরাধীনতার যন্ত্রণা কিশোর হো অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলেন। সঙ্কল্প নিলেন, পরাধীনতার এই গ্লানি থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। তার জন্য জীবন-মরণ সংগ্রাম তিনি করবেন।

এরপরই নতুন খাতে প্রবাহিত হল হোয়ের জীবন। তিনি নিজের দেশের ইতিহাস, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করলেন। এভাবে জানতে পারলেন মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কিভাবে সংগ্রাম করেছে, লাঞ্ছিত হয়েছে।

হো লক্ষ্য করলেন সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সবদেশেই এক। একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সমস্ত পরাধীন দেশে।

আজকে যে দেশ উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম নামে পরিচিত, পূর্বে তা ছিল ইন্দোচীনের অংশ—টংসিন, আনাম, কোচিন চায়না প্রভৃতি অঞ্চলে বিভক্ত।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফরাসী ধর্মযাজকরা এখানে আসে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। শ্বেতাঙ্গরা এই একই কৌশলে পৃথিবীর দেশে দেশে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে।

সেই সময়ে ভিয়েৎনামের সম্রাট ছিলেন মিং মাং। তিনি যাজকদের দেশের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। ফরাসী যাজকরা বছর কয়েক নিজেদের ধর্মচর্চার আড়াল নিয়ে থাকলেও অচিরেই তাদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল।

দ্রারিদ্যক্লিষ্ট, শোষিত ভিয়েৎনামীদের মধ্যে তারা ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করেন। কিছু পাওয়ার লোভে পড়ে তারা দলে দলে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। এই সুযোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল উপাসনালয়।

সম্রাট বিদেশীদের এই আচরণ সহ্য করলেন না। স্থানীয় মানুষরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তাদের আক্রমণে অনেক ধর্মযাজককে প্রাণ হারাতে হল, অনেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল ফ্রান্সে।

এই ঘটনার প্রতিশোধ নেবার জন্য বিরাট সৈন্যবাহিনী ভিয়েৎনামে পাঠালেন ফরাসী সম্রাট। ১৮৬০ খ্রিঃ তারা সায়গনে অবতরণ করল। ভিয়েৎনাম সরকার বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফরাসী সৈন্যদের কাছে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হল।

সেই প্রথম সায়গনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আস্তানা গাড়ল। ১৮৮৩ খ্রিঃ মধ্যেই সমগ্র ভিয়েৎনামে ফরাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। স্বাধীনতা হারাল ভিয়েৎনাম। প্রতিবাদের কোন পথ আর রইল না। নির্মম অত্যাচার আর পীড়ন বরাদ্দ হল প্রতিবাদীদের জন্য।

বিশ শতকের প্রথম দিকেই ভিয়েৎনামে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় চেতনার সঞ্চার হতে থাকে। স্বাধীনতার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন সংগঠিত হতে লাগল।

হুয়ে শহরে এই সময়ে গোপনে একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ১৮ বছর বয়সে হো চি মিন এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। দলের হয়ে গোপনে জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার কথা প্রচার ও প্রচারপত্র বিলি করলেন তিনি গোড়ার দিকে।

অত্যাচারী ফরাসীদের বিতাড়িত করতে না পারলে যে এ দেশের মুক্তি নেই এই কথা তিনি পৌঁছে দিতে লাগলেন সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে।

একদিন পুলিসের হাতে ধরা পড়ে প্রচন্ড মার খেলেন হো। ক্ষতবিক্ষত শরীরে শয্যাশায়ী থাকতে হল কয়েকদিন। ফরাসীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাঁর মনে আরও তীব্র হয়ে উঠল এই ঘটনার মধ্য দিয়ে। এরপরেই তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন বিপ্লবী আন্দোলনের কাজে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা।

ফরাসী সরকার গোয়েন্দাবাহিনীর মাধ্যমে বিপ্লবীদের খবরাখবর সংগ্রহে তৎপর হয়ে উঠল। ষড়যন্ত্রের একটা পরিকল্পনাও তারা বানচাল করে দিতে সক্ষম হল।

এরপরেই শুরু হল ধরপাকড়। অধিকাংশ বিপ্লবী নেতাই ধরা পড়লেন। আত্মগোপন করলেন হো।

কিন্তু গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে একের পর এক আস্তানা বদল করে কতদিন আর চলা যায়।

এই সময় সহযোদ্ধাদের সহযোগিতায় তিনি বিদেশগামী একটি জাহাজে নাবিকের কাজ নিয়ে পশ্চিম দেশে পাড়ি জমালেন।

হোয়ের দেশ ছাড়ার উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা।

পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের সঙ্কল্প যাঁর মনপ্রাণ জুড়ে সদা আলোড়িত নাবিকের কষ্টসাধ্য কাজে অভ্যস্ত হতে তাঁকে বেগ পেতে হবে কেন। হো দিব্যি মানিয়ে নিলেন।

জাহাজে দেশ থেকে দেশে ঘুরতে ঘুরতে একসময় হো এসে পৌঁছলেন ফ্রান্সে। এখানেই আশ্রয় নিলেন শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু এখানে ফরাসীদের দেখে তাঁব বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না। ভিয়েৎনামেও

ফরাসী তিনি দেখেছেন। তারা যেন নরদেহে এক একটি পশু বিশেষ। তাদের নৃশংসতা ও বর্বরতার তুলনা হয় না।

কিন্তু প্যারিসে দেখলেন ফরাসীরা ভদ্র মার্জিত, সাংস্কৃতিক চেতনায় সমৃদ্ধ, রীতিমত সুসভ্য জাতি।

যারা ভিয়েৎনামে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে তাদের সঙ্গে এদের কোন তুলনাই হয় না। তিনি স্থির করলেন, এই ফ্রান্স থেকেই তিনি সংগ্রহ করবেন তাঁর বিপ্লবের ইন্ধন।

একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই তো চাই। ঘোরাঘুরি করে একটা ছোট দোকানে কাজ জুটিয়ে নিলেন। কিন্তু বেশি দিন এক জায়গায় থাকতে ভরসা পান না, পাছে ফরাসী পুলিশের নজরে পড়ে যেতে হয়।

বারকয়েক কর্মস্থলের পরিবর্তন করলেন। এই সময়েই তাঁর পরিচয় হল কয়েকজন ফরাসী সমাজতান্ত্রিক নেতার সঙ্গে।ইতিপূর্বে মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সমাজবাদ প্রতিটি দেশ থেকে উপনিবেশবাদ শোষণ বঞ্চনা দূর করার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছে। মানুষে মানুষে সমতা ও মৈত্রী গড়ে তোলাই মহান সমাজবাদের লক্ষ।

সেই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আরো কয়েকজন বিপ্লবীনেতা প্যারিসে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হল হোয়ের।

প্যারিসে ফরাসী সোসালিস্ট পার্টির অধিবেশন হল ১৯২০ খ্রিঃ। সেই সময় হো ত্রিশ বছরের যুবক। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অনেক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদিলেন হো।

এই অধিবেশনেই হো তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় বিশ্বের প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরলেন নির্যাতীত ভিয়েৎনামের প্রকৃত চিত্র। ফরাসী শাসকদের শোষণ-নির্যাতনের তথ্য।

তিনি জানালেন, যারাই সামান্য প্রতিবাদ করছে কঠোর হস্তে তাদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। ভিয়েৎনামী নারীদের হতে হচ্ছে ফরাসী সৈনিক ও রাজ- পুরুষদের লালসার বলি।

হাজার হাজার তরুণের জীবন তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে চলেছে কারাগারের অন্ধ কুঠুরিতে।

দেশের মানুষ অমানুষিক পরিশ্রমে যা উৎপাদন করছে তা পাচার হচ্ছে বিদেশে, আর অনাহারে, অশিক্ষায় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পশুর মত জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে তারা।

হো কেবল তাঁর দেশের সমস্যার কথাই বললেন না, ভিয়েৎনামের মুক্তির জন্য আন্তরিকভাবে সকলের কাছে সাহায্য প্রার্থনাও করলেন।

রাশিয়া সেই সময় কিছু দিন হল সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনের শক্তি সামর্থ্যও সীমাবদ্ধ। হো তাঁর প্রত্যাশা মত সাহায্য না পেলেও নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেলেন।

হো এবারে স্থির করলেন, বাইরের কোন শক্তির সাহায্য ছাড়াই তিনি ভিয়েৎনামের মুক্তির সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। তাঁর শক্তি হবে দেশের মানুষের ঐক্য আর সাংগঠনিক প্রয়াস।

এরপর হো প্রতিষ্ঠা করলেন ভিয়েৎনাম কমিউনিস্ট পার্টি। যে সকল ভিয়েৎনামী রাজনৈতিক কর্মী প্যারিসে আত্মগোপন করেছিল তাঁদের নিয়েই তিনি গঠন করলেন এই রাজনৈতিক দল। সময়টা ১৯২০ খ্রিঃ।

বিদেশে সামান্য কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর উদ্যোগে গঠিত এই দলই পরবর্তীকালে সমগ্র ভিয়েৎনামে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বিশাল এক মহীরুহে পরিণত হয়েছিল।

সংগঠনের কাজের পাশাপশি পড়াশুনাও করে চলেছিলেন হো। ক্রমে লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, লেনিনের মতাদর্শ ও কর্মধারাই অনুসরণ করতে হবে তাঁকে। লেনিনের পথই প্রকৃত বিপ্লবের পথ।

প্যারিসে থাকার সময়েই হো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালিখি করতে থাকেন।

প্যারিসে পাঁচ বছর ছিলেন হো। তারপর সেখান থেকে গেলেন মস্কোতে। সেখানে একবছর থেকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের কাছ থেকে রুশ বিপ্লবের বিস্তাবিত ইতিহাস জেনে নিলেন। এই সময়ে তাঁর ভিয়েৎনাম সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রাভদা পত্রিকায় প্রকাশিত হল।

মস্কোতেই হোর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে। চীন থেকে কয়েকজন বিপ্লবী নেতা এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও পরিচিত হলেন হো।

দেশের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে বিদেশে থেকে যে তা সম্ভব নয় হো অবিলম্বে তা উপলব্ধি করলেন। কিন্তু ভিয়েৎনামে প্রত্যাবর্তন সম্ভব ছিল না। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে হো ১৯২৫ খ্রিঃ এলেন চীনের ক্যান্টন শহরে।

সেই সময়ে একাধিক বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল ভিয়েৎনামে। সরকার প্রতিটি সংগঠনকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল; সদস্য ও নেতাদের অধিকাংশকে বন্দি করে ছিল। যারা গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেছিল ক্যান্টনে।

ফাই বই চাও ভিয়েৎনামে সবচেয়ে বড় বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন। দেশের

স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য দেশের হাজার হাজার তরুণ তাঁর দলে যোগ দিয়েছিলেন।

এতবড় দল পরিচালনা করবার মত সাংগঠনিক দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব ফাই বই চাও-এর ছিল না। এছাড়া তাঁর সুনির্দিষ্ট কোন কর্মসূচীও ছিল না। ফলে অধিকাংশ সদস্যই দলের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল।

ক্যান্টনে এসে হো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের নিয়ে গড়ে তুললেন ভিয়েৎনাম বিপ্লবী তরুণ সংঘ। পরে এই দলই হয় ভিয়েৎনামের প্রধান রাজনৈতিক দল—থান নিয়েন।

সেই সময় চীনের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন কমিউনিস্ট বিদ্বেষী চিয়াংকাইশেক। তাঁর নির্দেশে চীনে ১৯২৭ খ্রিঃ হাজার হাজার কমিউনিস্টকে বন্দি করা হয়। হো আত্মগোপন করে রইলেন। পরে এক বৌদ্ধসন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে শ্যামদেশে যান এবং সেখান থেকেই দলের কর্মীদের নির্দেশ পাঠিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে তুললেন ছোট ছোট সংগঠন।

ইতিমধ্যে ১৯২৮ খ্রিঃ ফরাসী শাসকরা বহু ভিয়েৎনামী বিপ্লবী নেতাকে হত্যা করে কমিউনিস্ট আন্দোলন স্তব্ধ করবার চেষ্টা করল। সেই সময় হো ছিলেন হংকং-এ। তাঁর অবর্তমানেই বিচারে তাঁকে প্রাণদন্ড দেওয়া হল।

হো-চি-মিন গোপনে দেশত্যাগের আগেই পুলিসের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। কিছুদিন পরেই অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। সেখান থেকে গোপনে পালিয়ে তিনি মস্কো চলে যান। ১৯৩৪ খ্রিঃ থেকে ১৯৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি মস্কোতেই থাকেন।

ইতিমধ্যে ভিয়েৎনামে গঠিত হয়েছে ভিয়েৎনাম কমিউনিস্ট পার্টি। চীনেও কমিউনিস্ট পার্টি বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছে। জাপান চীন আক্রমণ করলে তাদের প্রতিহত করবার জন্য চিয়াংকাইশেক কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলালেন। গঠিত হল নতুন গেরিলা বাহিনী।

সুযোগ বুঝে হো মস্কো থেকে ফিরে এসে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিলেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় ফান ভন ডঙ এবং নুয়েন গিয়াপের সঙ্গে। পরবর্তীকালে হো-র অবর্তমানে তাঁরাই দলকে পরিচালনা করেছিলেন।

১৯৪১খ্রিঃ ছদ্মনামে ছদ্মবেশে দেশে ফিরে এসে হো এক চাষীর বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। সেই বছরই গোপনে ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের কথা ঘোষণা করা হল। রাষ্ট্রের নাম হল ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ডাক দেওয়া হল সর্বাত্মক বিপ্লবের।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময় হো চিয়াংকাইশেকের হাতে বন্দি হয়ে জেলে নিক্ষিপ্ত

হলেন। বন্দি অবস্থায় তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। সব অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করেও হো প্রাণে বেঁচে ছিলেন। শেষপর্যন্ত তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে গিয়াপের নেতৃত্বে সুসংগঠিত গেরিলা বাহিনী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ফরাসী বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাল।

জাপান সেনাবাহিনী ও ভিয়েৎনাম আক্রমণ করে বহু ফরাসী সৈন্য নিহত করল। গিয়াপ এই সুযোগে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সাহায্যে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল অধিকার করে নিলেন।

নিজেদের দিন শেষ বুঝতে পেরে ফরাসীরা অপদার্থ সম্রাট বা ওদাই-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করল। প্রতিবাদে হো ১৯৪৫ খ্রিঃ ২০শে আগস্ট দেশজুড়ে গণঅভ্যুত্থানের ডাক দিলেন।

ফরাসীদের সঙ্গে যোগ দিল ব্রিটিশ বাহিনী। এই সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হল ভিয়েৎনামী মুক্তিবাহিনী।

বিপ্লবীদের কাছে হো ছিলেন প্রেরণার আদর্শ। গেরিলা যোদ্ধাদের দিনে রাতে সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন তিনি। পাহাড়ে জঙ্গলে থেকে একই খাবার তিনি ভাগাভাগি করে খেয়েছেন। জয়ে পরাজয়ে তিনি তাদের উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শান্তি আলোচনার মাধ্যমেই দেশের স্বাধীনতা অর্জন কাম্য ছিল শান্তিবাদী হোর। রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আপোসহীন মনোভাব তাঁকে দীর্ঘ চারবছর ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

অবশেষে ভিয়েৎনামী জনগণের সাহায্যে এগিয়ে এল চীন ও রাশিয়া। অপরদিকে ফরাসীদের শক্তি বৃদ্ধি করল আমেরিকা। কিন্তু যুদ্ধের শেষ মীমাংসা হল দিয়েন বিয়েন ফুতে। ভিয়েৎনামে ৮০ বছরের ফরাসী শাসনের অবসান ঘটাল ভিয়েৎনামীদের বিজয়।

১৯৫৬ খ্রিঃ জেনেভায় আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের শর্ত অনুসারে বিভক্ত করা হল ভিয়েৎনামে। বাধ্য হয়েই দেশ বিভাগ মেনে নিতে হলো হোকে। উত্তর ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন হো চি মিন। নো দিন জিয়েস হলেন দক্ষিণের রাষ্ট্রনায়ক। ইনি ছিলেন ধনতান্ত্রিক আমেরিকার হাতের পুতুল। তার বকলমে আমেরিকাই রইল দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রশাসক।

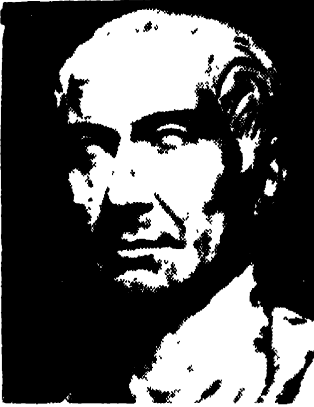
কিন্তু অত্যাচারী শাসক নো দিনের বিরুদ্ধে অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল দেশ। দাবি উঠল অখন্ড ভিয়েৎনামের। দক্ষিণের গণ আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন হো।

নো দিনকে সাহায্য করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমেরিকা। প্রকটিত হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন নৃশংস চেহারা। বৃষ্টির মত নাপাম বোমা বর্ষণ করে আমেরিকা ভিয়েৎনামীদের ধ্বংস করবার চেষ্টার ত্রুটি করল না।

কিন্তু হোচিমিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনামের সংগ্রামী মানুষ দুরন্ত মনোবলের সঙ্গে লড়াই করে সাম্রাজ্যবাদীদের সব অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে লাগল। যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই ১৯৬৯ খ্রিঃ ১০ই মে অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন হো। তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম বিনষ্ট হল না। প্রতিটি ভিয়েৎনামীকে আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করে তুলল। ভিয়েৎনামের মাটি থেকে বিতাড়িত হল আমেরিকা।

ভিয়েৎনামে উড্ডীন হল স্বাধীনতাব পতাকা।

জুলিয়াস সিজার



অদম্য শক্তির দম্ভ নিয়ে জন্মেছিলেন জুলিয়াস সিজার। ইউরোপের ইতিহাস তথা সভ্যতার ধারা এক হাতে পাল্টে দিয়েছিলেন তিনি। সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর। নিজ ক্ষমতাবলে তিনি রোমান সাম্রাজ্যের সীমানাকে উত্তর ও পশ্চিমে বিস্তৃত করেছেন, ইতিহাসে রেখে গেছেন চিরস্থায়ী স্বাক্ষর।

খ্রিস্টের জন্মের ১০২ বছর আগে যে মাসে সিজারের জন্ম, পরবর্তীকালে তাঁরই নামে সেই মাসের নামকরণ করে সম্মান জানানো হয়েছিল সিজারকে। মাসটির নাম হয়েছিল জুলাই।

রোমের যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে সিজারের জন্ম, সেই পরিবারটি বিশ্বাস করত তাঁরা স্বর্গের দেবতা ভেনাস এবং ইলিয়াসের বংশধর। মর্তের মানুষ হয়েও তারা স্বর্গের দেবতার সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। আবাল্যের লালিত এই ধারণাই সিজারকে করে তুলেছিল গর্বিত। তিনি নিজেকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে ভাবতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

যুবক জুলিয়াস ছিলেন তাঁর পিসেমশাই মহান জেনারেল ম্যারিয়াসের অনুগামী। তাঁর দল যখন রোমের ক্ষমতা দখল করল, জুলিয়াস তাঁর ত্যাগ ও বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ লাভ করলেন দেবতা জুপিটারের উপাসক পদ। জুপিটার ছিলেন রোমানদের প্রধান দেবতা। আর সেই দেবতার অর্চক হিসেবে জুলিয়াসের প্রভাব বৃদ্ধি পেল রোমান জনসাধারণের মধ্যে।

কিন্তু এই সৌভাগ্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না। কিছুদিন পরেই ম্যারিয়াসের মৃত্যু হল। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও হল হস্তান্তরিত। বিরোধী দলনেতা সুল্লা হলেন সর্বময়

অধীশ্বর। ফলে ম্যারিয়াসের অনুগামীদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হল, পদ হারিয়ে তাদের ছাড়তে হল রোম। সুল্লা সিজারকে ক্ষমা করতে রাজি হলেন, তবে একটি শর্তে। শর্ত হল, সিজারকে গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে যুক্ত যুবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হবে।

সিজার সম্মত হলেন না। ফলস্বরূপ সিজারকে ছাড়তে হলো রোম। সিজার তাঁর অনুগত সৈন্যবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। রওনা হলেন পূর্বদিকে। গলে এসে আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন নিজের মত করে।

এরপর তিনি রোমে ফিরে এলেন আইন শিক্ষার জন্য। রোডসে বিখ্যাত পন্ডিত অ্যাপেলেনিয়াস মোলোনের কাছে শিক্ষানবিশী শুরু করলেন।

কিন্তু এখানে এসে তিনি আকৃষ্ট হলেন নিকৃষ্ট আমোদ প্রমোদের প্রতি। শিক্ষনজীবনের নিষ্ঠা ও পবিত্রতা তিনি রক্ষা করতে পারলেন না।

সেই সময়ে রোমানদের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল জুয়া। সিজার প্রবলভাবে আসক্ত হয়ে পড়লেন জুয়ায়। দিনের বেশির ভাগ সময়টাই তাঁর কাটতে লাগল জুয়ার আসরে।

জুয়ার আগ্রাসী আকর্ষণে দিনে দিনে ঋণের বোঝা ভারি হয়ে উঠল সিজারের। ইতিহাস বলে এই সময়ে তাঁর ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়ে ছিল দুলক্ষ পাউন্ড।

এই সময়ে যেন ভাগ্যলক্ষ্মী ফিরে তাকালেন সিজারের প্রতি। তাঁকে নিযুক্ত করা হল স্পেনের গভর্নর পদে। কিন্তু ঋণের বোঝা না নামিয়ে কোথায় যাবেন তিনি। মহাজনেরা পথ আগলে দাড়াল। ঋণের টাকা মিটানোর আগে তারা সিজারকে কাছছাড়া করতে রাজি হল না।

বোমের বিখ্যাত ধনী ছিলেন ক্র্যাসাস। তিনিই এগিয়ে এলেন সিজারের ত্রাতা হিসেবে। সিজারের সব ঋণ পরিশোধ করে তাঁকে দায়মুক্ত করলেন তিনি। কথা রইল, আর্থিক সুদিন ফিরে এলে সিজার ক্র্যাসাসের সব টাকা মিটিয়ে দেবেন। ধনী ক্র্যাসাসের সঙ্গে বীর পম্পের সম্পর্ক ভাল ছিল না। সিজার অসাধারণ দক্ষতায় দুজনের বিরোধের নিষ্পত্তি করে পরস্পরকে বন্ধু করে তুললেন। পরবর্তীকালে বীর পম্পের সামরিক দক্ষতাই সিজারকে রোমের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি করে তুলেছিল।

ক্র্যাসাস, পম্পে এবং সীজার—এই তিনজনে মিলে রোমে যে শাসকচক্র গড়ে তুললেন তাই হল রোমের প্রথম ত্রয়ী শাসকচক্র। এই চক্র যখন রোমের ক্ষমতা দখল করল, সিজারের ওপরে বর্তাল সড়ক ও বনাঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব। অবশ্য সিজারের দৃষ্টি ছিল সামরিক বিভাগের প্রতি।

সেই সময়ে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে জার্মান উপজাতি রাইন নদীর তীরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা হয়ে উঠেছিল রোমের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী।

এইরকম পরিস্থিতিতে অতীতে রোম তার প্রতিপক্ষকে পূর্বদিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বরাবর চালিত করবার চেষ্টা করত। কিন্তু এবারে সিজার অন্য পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি জার্মানদের উত্তর-পশ্চিম দিকে বিতাড়িত করলেন।

এরপর সিজার আল্পসের অপর পারের অঞ্চলের দায়িত্বভার দাবি করলেন। তাঁর ইচ্ছা অপূর্ণ রাখা হল না। কিন্তু অচিরেই তাঁকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হল।

ইতিমধ্যে জার্মানরা নিজেদের পুনরায় শক্তিশালী করে তুলেছিল। তারা প্রবল বিক্রমে রোমের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল।

বর্তমানের সুইজারল্যান্ড অঞ্চল থেকে জার্মানরা একসময় বিতাড়িত করেছিল হেলভিশদের। তারাও একই সময়ে রোমানদের কাছে দাবি জানিয়ে বসল ১২১ খ্রিঃ পূর্বাব্দ থেকে আটলান্টিকে পৌঁছবার যে অঞ্চলিটি রোম দখল করে রেখেছে তার ওপর দিয়ে তাদের যাতায়াতের অধিকার দিতে হবে।

সিজার একই সময়ে দুমুখো সমস্যার সম্মুখীন হলেন। কিন্তু অসাধারণ সামরিক দক্ষতার বলে প্রথমে দ্বিতীয় সমস্যাটির মোকাবিলা করলেন তিনি। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে তাঁর সেনাবাহিনী সংগঠিত করলেন। তারপর অতর্কিতে হেলভিশদের আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে হেলভিশরা পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

এই জয়ের পরে সিজারকে বলা হল জার্মানদের বিষয়ে মনযোগী হবার জন্য। তাদের হাত থেকে গলগোষ্ঠীগুলিকে অবিলম্বে রক্ষা করা দরকার।

সিজার প্রথমে জার্মান রাজ অ্যারিভিসটাসের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। কিন্তু সেই বৈঠক ব্যর্থ হল। তখন রাইনের এপার থেকে আক্রমণ চালানোই স্থির হল। অবিলম্বে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে জার্মানদের সরিয়ে দিলেন সিজার।

পরবর্তীকালে ৫৭খ্রিঃ পূর্বাব্দে উত্তর গলে নার্ভি এবং বেলজিদের উত্থান ঘটলে তাদের দমন করতে সিজারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। এই সময়ের বেলজিয়াম যুদ্ধের বিবরণ সিজার লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেই ইতিহাস ১৯১৪ খ্রিঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েও গর্বের সঙ্গে স্মরণ করা হত।

জার্মানরা হটে গেলেও পরের বছরেই তারা গলের দিকে অগ্রসর হল। সেই সময়ে সিজার ব্যস্ত ছিলেন ব্রিটেনের ভেনেশি ও অন্যান্য উপজাতিদের দমনের যুদ্ধে। এদের পরাজিত করার পর তিনি আরও একবার আগ্রাসী জার্মানদের রাইনের অপর পারে বিতাড়িত করেন।

একেরপর এক বিজয়ে যেমন সিজারের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছিল সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছিল রোমেরও গৌরব।

কিন্তু সিজার, যিনি নিজেকে দেবসম্ভূত বলে বিশ্বাস করেন তাঁর পক্ষে এই সামান্য যুদ্ধজয়ীর গৌরব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। তাঁর লক্ষ ছিল শাসন ক্ষমতার প্রতি—তিনি চেয়েছিলেন শাসক হতে। বলাবাহুল্য তাঁর সেই স্বপ্নও একদিন সফল হয়েছিল।

ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত দৃষ্টি রেখেই তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। বিজিতদের নাগরিকত্ব দিতে তিনি দ্বিধা করেন নি। শাসন ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত তাঁর সময়ে রোমের ঐতিহ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল বৃহত্তর ইউরোপে। তাঁর চেষ্টায় ছোট ছোট জনগোষ্ঠী শক্তিশালী হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছিল। ইউরোপের কৃষকসম্প্রদায়েরও প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল তাঁর শাসনকালে।

সিজারের সংস্কার কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল বড় বড় সড়ক নির্মাণ। এইভাবে দূর দূর অঞ্চলের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ সৃষ্টি করেছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের নাগরিকদের মধ্যে এর ফলে সংহতি ও আদান-প্রদানের সুযোগ হয়েছিল।

সিজারকে বারবার বিব্রত করেছে রাইনের পর পারের উপজাতিগুলির উপর্যুপরি আক্রমণ। কিন্তু সুকৌশলে একসময় তিনি তাদেরও দমন করেছেন। জার্মানদের আক্রমণ করবার জন্য তিনি খৃঃপূর্ব ৫৫ অব্দে রাইন নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করেন। কিন্তু জার্মানদের বিতাড়িত করে ফিরে এসেই সেই সেতু ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

এরপরে সিজার নিজের সেনাদলকে কয়েকটি বাহিনীতে বিভক্ত করে ব্রিটেন আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তাঁর এক একটি বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই থেকে ছয় হাজার পর্যন্ত।

অশ্বারোহী বাহিনী সহ মোট পাঁচটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে সিজার ব্রিটেন আক্রমণ করেছিলেন। টেমস নদীর পাড় পর্যন্ত তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছিল। গলে ফিরে যাবার আগে তিনি এই অধিকৃত অঞ্চল থেকে করও দাবি করেছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই কর আর আদায় করা হয়ে ওঠেনি।

ব্রিটেন অভিযানে সিজারের প্রভাব স্থায়ী হবার অবসর পায়নি। পরবর্তী দুই বছরের মধ্যেই তাঁকে গলদের দিকে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। উপজাতিগুলিকেও অধীনে আনার জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৫২ অব্দে গল নেতা ভার্সিল গেটোরিক্সের সঙ্গে জারগোভিয়ায় সিজারের যে যুদ্ধ হয়, তাতে তিনি পরাজিত হলেও ঝড়ের বেগে অ্যালেসিয়া দখল করে নিয়েছিলেন। সেখান থেকেই শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত গলবাহিনীকে তিনি পরাস্ত করেছিলেন।

সিজার গলকে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ করে নিয়েছিলেন এবং রীতিমত বার্ষিক কর আদায় করতেন।

কর আদায় করেই নিশ্চিন্ত থাকেননি তিনি। নানাভাবে গলদের বশীভূত রাখবার চেষ্টাও করেছেন।

যেখানে যা কিছু ভাল তা আত্মস্থ করার অসামান্য দক্ষতার ঐতিহ্যবাহী ছিল রোম। সেই সঙ্গে তারা জানত জয়ের ফলাফলকে কিভাবে নিজেদের কাজে লাগাতে হয়।

অন্যের কাছ থেকে অকৃপণভাবে চিন্তাধারা গ্রহণের পাশাপাশি তারা অধিকৃত অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করত। এরফলে তারা স্বেচ্ছায় রোমানদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে দ্বিধা করত না। সিজার সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করে গলদের ও উপজাতিদের বন্ধুতে রূপান্তরিত করতে যথোপযুক্ত চেষ্টা করেছেন।

বহিঃশত্রু গলদের জয় করার পরেই যেন আকস্মিকভাবে ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল সিজারের। রোমে অভ্যন্তরীণ শত্রুরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সিজার অবশ্য এবিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, তাঁর ব্যর্থতার সুযোগ নিয়েই বিপদ মাথা চাড়া দিতে পারে। দেখা গেল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরেও তিনি বিপদমুক্ত থাকতে পারলেন না।

রোমে যে শাসক ত্রয়ী চক্র ৫৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গড়ে উঠেছিল পরবর্তী তিনবছরের মধ্যেই তার ভাঙ্গন দেখা দেয়। ক্র্যাসাস সিরিয়ায় নিহত হবার পর রোমের ক্ষমতার আকাশে রইলেন কেবল সিজার আর পম্পে। দুজনেই তখন ক্ষমতার মধ্যগগনে। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল।

পম্পে কৌশলে সেনেটের পক্ষ অবলম্বন করলেন। ইতিমধ্যে সিজারের অধিনায়কত্বের সময়কাল উত্তীর্ণ হলে সেনেটে দাবি উঠল, সিজার এবার তাঁর বাহিনী ভেঙ্গে দিন। এ দাবি ছিল অসাংবিধানিক।

সিজার তাই ভিন্ন পথ নিলেন। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে দ্রুত ইতালীর সীমান্ত-বর্তী নদী রুবিকনের পরপারে চলে এসে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

এই যুদ্ধে পম্পে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। পূর্বউপকূলে ব্রিন্দেশি পর্যন্ত সিজার তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন।

স্পেনে তখনো পর্যন্ত পম্পের একটি বাহিনী অপরাজিত রয়ে গিয়েছিল। তাই সিজারের সামনে কাজ ছিল দুটি। প্রথম হল সেনাপতি বিহীন একটি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করা এবং দ্বিতীয় হল বাহিনীহীন নায়ক পম্পের পশ্চাদ্ধাবন করা।

মোটামুটিভাবে এই কাজ শেষ করেই সিজার রোমে ফিরে এলেন। এবারে তিনি কন্সাল নির্বাচিত হলেন।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৮ অব্দে সিজার পূর্বাঞ্চলে থেশানির ফ্যারশালস অভিযান করলেন। পম্পে পরাজিত হয়ে মিশরে পালিয়ে গেলেন। সেখানেই তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

পম্পের অনুসরণ করে সিজার মিশরে উপস্থিত হলেন। তিনি জানতেন না যে এখানেই রয়েছে তাঁর সর্বনাশের ফাঁদ। তিনি মিশরের রানী ক্লিওপেট্রার রূপের বাঁধনে বন্দি হয়ে পড়লেন। তাঁর আর রোমে ফেরার তাড়া থাকে না। ইতিহাসবিদদের অভিমত, এখানে সিজার ও ক্লিওপেট্রার একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে।

সিজারের অনুপস্থিতিতে তাঁর শত্রুরা সুযোগের সদব্যবহার করতে ভুল করল

না। তারা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করে শক্তিমান হয়ে উঠল। সিজার যখন রোমে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি রীতিমত শত্রু পরিবেষ্টিত।

কিন্তু শত্রুদের কোন রকম সুযোগ নেবার আগেই এশিয়া মাইনরের দিকে অভিযান করে সিজার পম্পের পুরনো এক সহযোগী পন্টাসের রাজা ফারনাসেসকে পরাজিত করলেন। সিজারের বিজয়ের ইতিহাসে এই অভিযান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়েই তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত উক্তি—ভিনি, ভিডি, ভিসি। অর্থাৎ এলাম, দেখলাম এবং জয় করলাম। এই অভিযানের শেষে বিদ্রোহ দমন করবার জন্য সিজারকে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আফ্রিকা পর্যন্ত অগ্রসর হতে হয়েছিল।

ইতালিতে ফিরে এসেই সিজারের জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। তিনি নিজেকে একনায়ক হিসেবে ঘোষণা করলেন কিন্তু এই দম্ভই সিজারের কাল হল।

ক্ষমতা দখলের স্বল্পকালের মধ্যেই সিজার সুশাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। আল্পসের ওপারের অঞ্চলেও উপজাতিগুলিকে ভোটাধিকার ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা দান করলেন। ক্যালেন্ডার সংস্কার করলেন। বিভিন্ন জনস্বার্থের পরিপুষ্টি বিধান করলেন।

সিজারের আত্মশ্লাঘা এতটাই বৃদ্ধি পেল যে তিনি নিঃসংশয়ে নিজেকে দেবতা বলে ভাবতে লাগলেন। প্রজাদের কাছেও দেবতার সম্মান দাবি করলেন।

অজেয় দেবতার প্রতি—এই বাক্য খোদিত করে তিনি নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন মহান রোমের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মূর্তির মধ্যে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিজারকে একদিন আকস্মিক ভাবে প্রাণ হারাতে হল সেনেট হাউসে পম্পের মূর্তির পাদদেশে ঘাতকের ছুরিকাঘাতে। ইতিহাসের সাক্ষ্য হল, সিজারের মিত্ররাই তাঁকে খুন করেছিল। মৃত্যুর পূর্বে সিজারের সর্বশেষ উক্তি ছিল—হায়, ব্রুটাস, তুমিও! তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর সাফল্যই প্রলুব্ধ করেছিল তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের।

গ্যারিবল্ডি



আধুনিক ইতালির স্রষ্টা মহান বিপ্লবী গ্যারিবল্ডির জন্ম ১৮০৭ খ্রিঃ ৪ঠা জুলাই, নাইস-এ অঞ্চলে। সেই সময় নাইস ছিল ফরাসী সম্রাটের অধীন।

জন্মসূত্রে ফরাসী নাগরিক হলেও গ্যারিবল্ডির বাবা ও মা দুজনেই ছিলেন ইতালিয়ান। ১৮১৫ খ্রিঃ নাইস পিডেমন্ট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই গ্যারিবল্ডি নিজেকে ইতালিয়ান বলেই মনে করতেন।

ষোল বছর বয়স হতেই একটা জাহাজে 'কেবিন বয়'-এর কাজ নিয়ে গ্যারিবল্ডি সমুদ্রযাত্রা করলেন। জাহাজের জীবনেই তিনি ক্রমশ দক্ষ নাবিক রূপে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন।

মার্সাই বন্দরের এক কাফেতে তিনি প্রথম ঐক্যবদ্ধ ইতালির বিষয়ে প্রথম আলোচনা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন রূপায়িত করার কাজে নেমেই তিনি ঐক্যবদ্ধ ইতালির অনন্যসাধারণ জননায়ক রূপে বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

সেই সময়ে ইতালির বিভিন্ন রাজ্যের কর্তৃত্ব ছিল অস্ট্রিয়ার ওপরে। এই রাজ্যগুলি যারা শাসন করত তারা প্রত্যেকেই ছিল স্বৈরাচারী রাজা। তাদের শাসন ও অত্যাচারে ক্রমশই জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছিল।

এমনি যখন পরিস্থিতি, মাৎসিনি নামে এক মহান পুরুষের আবির্ভাব ঘটল ইতালিতে। তাঁর স্বপ্ন ছিল ঐক্যবদ্ধ ইতালি সংগঠন করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইয়ং ইতালি নামে এক গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। গ্যারিবল্ডি ছিলেন এই বৈপ্লবিক দলের সক্রিয় সদস্য।

পিডেমেন্টের শাসকরা ছিল বৈপ্লবিক ভাবধারা ও যে কোন বৈপ্লবিক কার্যকলাপের ঘোরতর বিরোধী। এই সকল ক্রিয়াকলাপ নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে তাদের তৎপরতার ত্রুটি ঘটত না।

স্বাভাবিকভাবেই ইয়ং ইতালির সক্রিয় সদস্য গ্যারিবল্ডির অনুপস্থিতেই পিডেমেন্টের শাসকরা তাঁকে মৃত্যুদন্ড দিলেন।

গ্যারিবল্ডি এক জাহাজের সেকেন্ড মেটের চাকরি নিয়ে রিও-ডি-জেনেরো চলে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি ইয়ং ইতালির এক শাখা সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

ব্রাজিলে বিপ্লব শুরু হয় ১৮৩৭ খ্রিঃ। অনিবার্যভাবে গ্যারিবল্ডিও বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। এই সময়ে অ্যানিটা নাম্মী এক জেলের স্ত্রীকে একরকম বলপূর্বকই গ্যারিবল্ডি নিজের সঙ্গিনী করে নিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে এই অ্যানিটা গ্যারিবল্ডির সুযোগ্য সঙ্গিনী হয়ে উঠেছিলেন। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তিনি নির্ভীকভাবে বন্দুক হাতে যুদ্ধ করেছেন। গ্যারিবল্ডি তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ব্রাজিলীয় নারীযোদ্ধা আমাজন'।

বিপ্লবীদের একটি জাহাজ নিয়ে গ্যারিবল্ডি যখন সমুদ্রে ভাসেন তখন তাঁর অধীনে ছিল আরও তিনখানা জাহাজ। সঙ্গে ছিল অ্যানিটাও। শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে তিনটি জাহাজ ডুবে গেলে গ্যারিবল্ডি অ্যানিটা ও সহবিপ্লবীদের সঙ্গে স্থলপথে পলায়ন করেন।

১৮০৪ খ্রিঃ প্রথম সন্তানের জন্মের পর গ্যারিবল্ডির মনে হল, বৃথাই বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে তিনি মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন। তিনি মান্টিভিডিও গিয়ে কিছুদিন একাজ সে কাজের পর এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ নিলেন। প্রথম সন্তান জন্মের দুইবছর পরে ১৮৪২ খ্রিঃ তিনি অ্যানিটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করলেন।

উরুগুয়েতে বসবাস কালেই গ্যারিবল্ডি ভাগ্যচক্রে এক ভয়াবহ যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। প্রতিবেশী আর্জেন্টিনা উরুগুয়ের স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুললে মান্টিভিডিওকে রক্ষার জন্য গ্যারিবল্ডি এক ইতালিয়ান বাহিনী বা লিজিয়ন গঠন করলেন। এই বাহিনীর পোশাক ছিল লাল কোট। আর প্রতীকী পতাকায় ছিল আগ্নেয়গিরির সঙ্গে কালো রং।

পরবর্তীকালে এই প্রতীক ও লাল কোট-এর খ্যাতি সমগ্র ইউরোপে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই যুদ্ধে ছোট্ট রাষ্ট্র উরুগুয়েকে সাহায্য করবার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স নৌবহর ও অভিযাত্রী সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিল। এদের সহযোগিতায় নিজের ইতালিয়ান বাহিনী বা লিজিয়ন নিয়ে যুদ্ধ করে জয়লাভ করলেন। তাঁর প্রিয় মান্টিভিডিও রক্ষা পেল। উরুগুয়ে সরকার বীর গ্যারিবল্ডিকে জেনারেল পদে উন্নীত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

১৮৪৬ খ্রিঃ পোপ গ্রেগরীর মৃত্যুর পর নবম পায়াস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তাঁর সংস্কারমুখী নীতি ইতালির স্বাধীনতাকামী জনগণকে আশান্বিত করে তুলল।

এদিকে দক্ষিণ আমেরিকার রাজনীতিতে বিতশ্রদ্ধ হয়ে গ্যারিবল্ডি সস্ত্রীক ১৮৪৮ খ্রিঃ তাঁর ৬০ জন লিজিয়ন নিয়ে ইতালিতে ফিরে এলেন। এখানে তিনি লাভ করলেন রাজকীয় সংবর্ধনা। যুবকেরা দলে দলে এসে লিজিয়নে নাম লেখাতে লাগল।

কিছুদিন পরেই ১৬০ জন লিজিয়ন সঙ্গে নিয়ে জেনোয়ার দিকে যাত্রা করলেন। পিডেমেন্টের রাজা চার্লস অ্যালবার্ট অস্ট্রিয়ান সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। গ্যারিবল্ডি তাঁর নিজস্ব বাহিনী নিয়ে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করলেন।

এইসময় মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে তিনি যে শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিলেন তাতে দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আগ্রাসী রাজশক্তির কাছে তিনি হয়ে উঠলেন মূর্তিমন্ত আতঙ্ক।

ইতিমধ্যে পোপের পার্শ্বচর কাউন্ট পেলেগ্রিনো রোসি আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। প্রাণভয়ে পোপ রোম ছেড়ে নেপলসে আশ্রয় নিলেন। ফলে ১৮৪৮ খ্রিঃ সামরিক বাহিনী শাসনভার হাতে নিল। অন্তর্বর্তী গণপরিষদ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের নির্দেশ দিল। অবিলম্বে ইতালির রোমে প্রথম স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত হল।

কিন্তু এই অন্তর্বর্তী সরকারকে ভেঙ্গে দেবার জন্য পোপ ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, স্পেন ও নেপলসের কাছে আবেদন জানালেন। গ্যারিবল্ডি নতুন সরকারকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তাঁকে রোমান সৈন্যদলে লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদ দেওয়া হল। তাঁর অধীনে রইল ৫০০ জন সৈন্য। অবশ্য পরে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ১০০০ জনে বর্ধিত করে নিলেন। এরপর তিনি এই বাহিনীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেবার কাজে নিযুক্ত হলেন।

রোম পুনরুদ্ধারের জন্য পোপের আহ্বানে প্রথম সাড়া দিলেন ফরাসী সম্রাট লুই নেপোলিয়ন। ৮,০০০ ফরাসী সৈন্য সিভিতা ভেডিয়াতে অবতরণ করল। কিন্তু রোমের অধিবাসীরা তাদের বন্ধু হিসেবে মেনে নিতে পারল না, তারা গুলিগো না নিয়ে এই বাহিনীকে আক্রমণ করে বসল।

গ্যারিবল্ডির সুশিক্ষিত বাহিনী নিতান্ত ছোট হলেও তাদের আক্রমণে এঁটে উঠতে না পেরে ফরাসী সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করল।

নেপলসে পোপের আশ্রয়দাতা রাজা ফার্দিনান্দ এবারে ২০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী রোমে পাঠালেন। গ্যারিবল্ডি তাঁর গেরিলা বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই বিশাল বাহিনীকেও পর্যুদস্ত করলেন।

মাৎসিনিকে নেতা নির্বাচিত করে রোমের জন্য তিনজনের এক শাসক গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছিল। এবারে মাৎসিনি গ্যারিবল্ডিকে রোমে ডেকে পাঠালেন। সেখানে এক ফরাসী কূটনীতিক ফার্দিনান্দ দ্য পেলস-এর মাধ্যমে এক শান্তি চুক্তি তৈরি হল।

অস্ট্রিয়ানদের হাত থেকে রোমান প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে ফরাসী সৈন্যরা নিযুক্ত থাকবে। কিন্তু অনতিবিলম্বেই এই শান্তিচুক্তি অগ্রাহ্য করে ফ্রান্সের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ওদিনো অকস্মাৎ রোম আক্রমণ করে বসল।

গ্যারিবল্ডি ও তাঁর সৈন্যদল অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন, রোমের পতন হল। সস্ত্রীক গ্যারিবল্ডিকে আবার পালাবার বন্দোবস্ত করতে হল। তিনি সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে নিয়ে স্থলপথ ধরলেন। পথের ধকল অ্যানিটা সইতে পারলেন না। একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। স্ত্রীর মৃতদেহ গ্রামবাসীদের দায়িত্বে দিয়ে গ্যারিবল্ডি এসে আশ্রয় নিলেন ট্যাঙ্গিয়ারে, সার্ডিনিয়ার রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে।

সেই মুহূর্তে ইতালির কোন রাজ্যই গ্যারিবল্ডির পক্ষে নিরাপদ ছিল না। তাই ১৮৫০ খ্রিঃ তিনি আমেরিকায় চলে গেলেন। সেখানে একাকীত্ব অসহনীয় হয়ে উঠলে কারমেল নামে ৪০০ টনের ছোট্ট একটি জাহাজের দায়িত্ব নিয়ে চীনে চলে এলেন।

চীনেও বেশিদিন ভাল লাগল না। ১৮৫৪ খ্রিঃ পুনরায় পিডেমেন্ট রওনা হলেন। পথে কিছুদিন লন্ডনে কাটিয়েছিলেন। তারপর নাইসে সন্তানদের কাছে ফিরে গেলেন।

১৮৫৫ খ্রিঃ গ্যারিবল্ডির ভাই মারা গেলেন। পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি থেকে এই সময় প্রচুর অর্থ তাঁর হাতে এল। তাই দিয়ে তিনি ক্যাপরেরা দ্বীপের অর্ধেকটা কিনে নিয়ে চাষবাসের কাজে মন দিলেন।

এদিকে ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে চলেছিল বিচিত্র খেলা। পিডেমেন্টের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কাউন্ট কাভুর। সম্রাট ভিক্টর ইমানুয়েলের সম্মতি নিয়ে তিনি ফরাসীসম্রাটের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে স্থির করেছিলেন ১৮৫৯ খ্রিঃ বসন্তকালে ফ্রান্স এবং ইতালি মিলিতভাবে অস্ট্রিয়া আক্রমণ করবে। যুদ্ধজয়েব পরে নাইস ও স্যাভয় এই দুটি ভূখণ্ড ফ্রান্সকে দিয়ে দিতে হবে।

যুদ্ধের আগে ক্যাপরেরা দ্বীপে জাহাজ পাঠিয়ে গ্যারিবল্ডিকে জেনোয়ায় নিয়ে আসা হল। এখানে কাভুরের সঙ্গে আলোচনার পর গ্যারিবল্ডি বুঝতে পারলেন তাঁর স্বদেশভূমিকে ঐক্যবদ্ধ করবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে। নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আবার জ্বলে উঠলেন গ্যারিবল্ডি।

অবিলম্বে তিনি তাঁর অনুগত পুরনো স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করলেন। তাদের জন্য একটি যুদ্ধ সঙ্গীতও রচনা করে দিলেন। ২৬শে এপ্রিল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নামার আগে তাঁর সঙ্গে প্রথমবারের মত স্বয়ং সম্রাট ভিক্টর ইমানুয়েলের এই সময়ে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হল।

ক্যাভুর ছিলেন ধূর্ত কুটনীতিক। তিনি স্থির করেছিলেন এই যুদ্ধকালে গ্যারিবল্ডিব জনপ্রিয়তাকে দেশবাসীর মনোবলকে অটুট রাখতে কাজে লাগাবেন। যুদ্ধ পরিচালনার মত কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়ে তাঁর গৌরব বৃদ্ধির কোন সুযোগ আর দেওয়া হবে না।

সম্রাটের সঙ্গে দেখা করে গ্যারিবল্ডি তাঁর স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে যে কোন স্থানে যুদ্ধ করবার অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন। ফলে কাভুরের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধে গ্যারিবল্ডি জয়লাভ করলেন। দেশবাসীর কাছে তিনি মুক্তিদাতা এক মহান দেবপুরুষ রূপে গৃহীত হলেন। তাঁর খ্যাতি গগন স্পর্শ করল। গ্যারিবল্ডি হয়ে উঠলেন জীবন্ত কিংবদন্তী।

এরপর থেকে তাঁর উপস্থিতি দরকার হত না, তাঁর নাম শুনেই অস্ট্রিয়ান সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে লাগল। ঈর্ষাকাতর কূটনীতিকদের সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গ্যারিবল্ডি দেশের অবিসংবাদিত নায়ক হয়ে উঠলেন। সম্রাট স্বয়ং তাঁকে বীরত্বের জন্য পিডেমেন্টের সর্বোচ্চ সম্মান সোনার পদক দিয়ে অভিনন্দিত করলেন।

ইতিমধ্যে সলফারিনোর যুদ্ধে ফরাসীরা জয়লাভ করল। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ৩য় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এক চমকপ্রদ শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করলেন। এই চুক্তির ফলে ইতালির পোপের সভাপতিত্বে অনেকগুলি রাজ্যের এক সংঘরাষ্ট্র গঠিত হল।

টাসকানি, রোমাগনা এবং মোডেনা রাজ্যের সম্মিলিত সেনা বাহিনীর প্রধান হলেন গ্যারিবল্ডি। কিন্তু নোংরা রাজনীতির খেলায় বিরক্ত হয়ে কিছুদিন পরেই তিনি এই পদ ছেড়ে দিলেন।

এরপর ইতালির স্বাধীনতার জন্য তিনি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কাজে মন দিলেন। "মিলান রাইফেলস সাবসক্রিপসন ফান্ড" নামে একটা তহবিল গড়লেন। জনসাধারণের দানে বিপুল অর্থ সংগৃহীত হল। তা দিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র কিনে ভবিষ্যতের জন্য মিলানে রেখে দেওয়া হল।

গ্যারিবল্ডি সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। সেই সুযোগ আসতেও বিলম্ব হল না। সিসিলিতে বিদ্রোহ দেখা দিল। দুটি পুরনো জাহাজে করে ১০৮৯ জন সৈন্য নিয়ে গ্যারিবল্ডি সিসিলিতে উপস্থিত হলেন।

৩য় নেপোলিয়নের বাহিনীতে ছিল উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ও সুশিক্ষিত ২০ হাজার সৈন্য। গ্যারিবল্ডির রোমাঞ্চকর অবিশ্বাস্য ঘটনায় পূর্ণ জীবনের এটাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। একাধিক যুদ্ধে তিনি চমকপ্রদ জয়লাভ করলেন।

১৮৬০ খ্রি মে মাসে যুদ্ধ শুরু করে তিন মাসের মধ্যেই গ্যারিবল্ডি সিসিলি অধিকার করে নিজের অধীনে নিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে নেপলস রাজ্য আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে মেসিনা প্রণালী পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করে ফেললেন।

কাভুর ও তার সরকার নানাভাবে গ্যারিবল্ডির অগ্রগতি রোধ করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। গ্যারিবল্ডির বিজয় বাহিনী ৭ই অক্টোবর নেপলস শহর অধিকার করে নিল।

নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী এখনো জয়ের স্বপ্ন দেখছিল। গ্যারিবল্ডি শেষবারের মত সেই স্বপ্ন চুরমার করে দিলেন ভলটার্নো নদীর যুদ্ধে। গ্যারিবল্ডির কীর্তি ও কৃতিত্বে বিচলিত সম্রাট ভিক্টর ইমানুয়েল পিডেমেন্টের একদল সৈন্য নিয়ে তড়িঘরি গ্যারিবল্ডির সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গ্যারিবল্ডির গৌরবে দাবি বসানো। সম্রাট এসেই হুকুম করলেন, গ্যারিবল্ডি যেন তাঁর স্বেচ্ছাসেবী লালকোট বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। তিনি একবারও এই বিজয়ী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন না কিংবা আহত স্বেচ্ছাসেবীদের দেখতে হাসপাতালেও গেলেন না। তবে নেপলসের রাজার সদ্য ছেড়ে যাওয়া সিংহাসনটি অধিকার করতে তাঁর বিন্দুমাত্র ভুল হল না। তিনি বিজয়ী নায়ক গ্যারিবল্ডিকে পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করতে চাইলেন। কিন্তু গ্যারিবল্ডি সবকিছুই প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি ফিরে গেলেন তাঁর ছোট্ট দ্বীপ ক্যাপরেরাতে।

ক্রমাগত যুদ্ধের ক্লান্তি ও অমানুষিক পরিশ্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল গ্যারিবল্ডির। নিজের জন্য যে ছোট্ট অনাড়ম্বর ঘরটি তিনি নির্মাণ করেছিলেন শেষ জীবনে এখান থেকে প্রায় বেরতেনই না। অসংখ্য যুদ্ধ জয় করেছেন এই কিংবদন্তী বিপ্লবী। কিন্তু কখনো নিজের জন্য কিছু চাননি। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল নিতান্তই সাদামাটা। জীবনের শেষ লগ্নে যেন দুরন্ত অভিমানে নিজেকে একান্তে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর সেই দীনহীন কুটিরের সম্মুখেই ভিড় করতেন বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিরা।

শেষ দিকে গ্যারিবল্ডি তাঁর আত্মজীবনী লেখায় হাত দিলেন। ৭৩ বছর বয়সে একাকীত্ব ঘোচাবার জন্য নাতির ধাত্রী ফ্রান্সেসকাকে বিয়ে করেছিলেন।

১৮৮২ খ্রিঃ ২রা জুন ফ্রান্সেসকাকে পাশে রেখেই এই অনন্যসাধারণ বীরপুরুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

লিয়েন ট্রটস্কি



রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্ববিদ নেতা ট্রটস্কির প্রকৃত নাম লিও দাভিদোভিচ্ ব্রনস্টেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে লেনিনের উত্তরসূরি হিসাবে সর্বাগ্রে যাঁর নাম করা হতো তিনি লিয়ন ট্রটস্কি।

১৯১৭ খ্রিঃ বিপ্লবের মাধ্যমে জারতন্ত্রের অবসান, বলশেভিক দলের ক্ষমতা দখল ও সোভিয়েত রাশিয়া গঠন—সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গেই ট্রটস্কির নাম জড়িত।

মহান রুশ বিপ্লবকে যাঁরা সমগ্র বিশ্বে সংঘটিত করতে চেয়েছিলেন সেই মুষ্টিমেয় রুশবিপ্লবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য।

ট্রটস্কির জন্ম ১৮৯৭ খ্রিঃ ২৬শে অক্টোবর ইউক্রেনের ইয়ানেভিকায় এক অবস্থাপন্ন চাষী পরিবারে। তাঁর পিতার নাম ডেভিড ব্রনস্টেন। মায়ের নাম আন্না।

বাল্যবয়সে স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা করেছেন ট্রটস্কি। আটবছর বয়সে পড়াশুনার জন্য তাঁকে পাঠানো হয় ওডেসায়। সেখানে তিনি থাকতেন সম্পর্কিত এক দাদার বাড়িতে। তিনি ছিলেন উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী। এই দাদার সাহচর্যেই ছেলেবেলা থেকে ট্রটস্কি উদার চিন্তাভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হন।

স্কুলের পড়া শেষ হবার আগেই ট্রটস্কি মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৯৬ খ্রিঃ তিনি গুপ্ত সোসালিস্ট দলের সঙ্গে জড়িত হন।

স্কুলের পড়া শেষ করে ভর্তি হলেন ওডেসা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সময়েই তিনি গোপনে দক্ষিণ রাশিয়ার শ্রমিক ইউনিয়নের সংগঠনের কাজ করতে শুরু করেন।

বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে দুবছরের মধ্যেই গ্রেপ্তার হতে হয় তাঁকে। কারাবাস ভোগ করতে হয় সাড়ে চার বছর। এরপর তাঁকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়।

নির্বাসনে থাকার সময়েই ট্রটস্কি বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম আলেকজান্দ্রা সোকোলোভস্কায়া। তখনো পর্যন্ত তিনি লিও দাভিদোভিচ ব্রনস্টেন।

দেশে থাকা নিরাপদ ছিল না। তাই বিদেশে পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে তাঁকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সংগ্রহ হল জাল পাসপোর্ট। পাসপোর্টে ছদ্মনাম লেখা হল ট্রটস্কি। পরবর্তীকালে এই নামেই তিনি বিশ্বপরিচিতি লাভ করেন।

জাল পাসপোর্ট নিয়ে ট্রটস্কি চলে এলেন লন্ডনে। দেশে থাকা স্ত্রীর সঙ্গে কিছুদিন পরেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাঁর।

লন্ডনে রুশ বিপ্লবী সোসাল ডেমোক্রেট দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হল ট্রটস্কির। লেনিনের এই সহযোগী বিপ্লবীরা 'দ্য স্পার্ক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ট্রটস্কি এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

রাশিয়ান সোসাল ডেমোক্রেটিক ওয়ার্কার্স পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল ১৯০৩ খ্রিঃ লন্ডনে ও ব্রাসেলসে। এই সম্মেলনে ট্রটস্কি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সমর্থনে তাঁর বক্তব্য রাখেন।

কিন্তু তাঁর এই মতামত লেনিন এবং বলশেভিক দলের নেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হল না। মতভেদকে কেন্দ্র করে পার্টি ভেঙ্গে গেল। বাধ্য হয়ে ট্রটস্কি মেনশেভিক দলে চলে এলেন।

১৯০৫ খ্রিঃ মধ্যেই রাশিয়ায় বৈপ্লবিক কাজকর্ম জোরদার হয়ে উঠল। ক্রমেই বিপ্লব চূড়ান্ত পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছিল। ট্রটস্কি স্বদেশে ফিরে এসে জার বিরোধী নানা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন।

একবছরের মধ্যেই আবার গ্রেপ্তার হলেন ট্রটস্কি। কারাবাসকালে তিনি তাঁর স্থায়ী বিপ্লব মতবাদ নিয়ে একটি বই লেখেন।

১৯০৭ খ্রিঃ তাঁকে পুনরায় সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হল। এবারেও যথারীতি পালালেন। গেলেন ভিয়েনায়। ১৯১৪ খ্রিঃ ইউরোপে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

এই যুদ্ধে রাশিয়ার অংশ গ্রহণের প্রশ্নে প্রবল বিরোধিতা করল সোসাল ডেমোক্রেটরা। ট্রটস্কিও একইভাবে নিন্দা করলেন।

যুদ্ধের সময় ট্রটস্কি ভিয়েনা থেকে গেলেন প্রথমে সুইজারল্যান্ড, পরে প্যারিসে। কিন্তু যুদ্ধবিরোধী মতামত ব্যক্ত করার জন্য তাঁকে ফ্রান্সে বা স্পেনে থাকতে দেওয়া হল না। তিনি চলে এলেন নিউইয়র্কে।

১৯১৭ খ্রিঃ ট্রটস্কি এখানে নিকোলাই বুখারিনের সঙ্গে যোগ দিলেন। বুখারিন ছিলেন বলশেভিকদের অন্যতম নেতা। তিনি রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশিত 'নভিমির' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ট্রটস্কিও পত্রিকার কাজে যুক্ত হলেন।

রাশিয়ায় ইতিমধ্যে জারতন্ত্রের পতন ঘটেছে। জনগণের বিপ্লব চূড়ান্ত সাফল্যের পথে। এই বিপ্লবকে চিরস্থায়ী বিপ্লব মনে করে ট্রটস্কি পেট্রোগ্রাদে ফিরে এলেন এবং মেনশেভিক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

এই সময়ে পুনরায় বলশেভিক দলের নেতৃত্বে বিভেদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। গঠিত হল তথাকথিত উদারপন্থী সরকার। এই সরকারের নেতৃত্বে রইলেন কেরেনস্কি। ট্রটস্কি গ্রেপ্তার হলেন ১৯১৭ খ্রিঃ।

জেলে থাকা অবস্থায় এক অভাবিত ঘটনা ঘটল। তাঁকে বলশেভিক দলের সদস্যভুক্ত করা হল। একই সঙ্গে তাঁকে নির্বাচিত করা হল কেন্দ্রীয় সমিতিরও সদস্য পদে।

মাসখানেক কারাবাসের পর মুক্তি পেলেন ট্রটস্কি। কিছুদিন পরেই তিনি পেট্রোগ্রাদ সোভিয়েত অব ওয়ার্কার্স এবং সোলজার ডেপুটিস-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

পেট্রোগ্রাদ ক্রমেই বলশেভিকদের দখলে চলে এলে ৬ই নভেম্বর কেরেনস্কির পতন হল।

ট্রটস্কি ঘোষণা করলেন, সোভিয়েত কংগ্রেসকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর নেতৃত্বাধীন মিলিটাবি রিভোলিউশনারি কমিটি সর্বদা প্রস্তুত।

কেরেনস্কির পতনের একদিন পরেই, ৭ই নভেম্বর লেনিন আত্মপ্রকাশ করলেন এবং বলশেভিক বিপ্লবের নেতৃত্ব হাতে তুলে নিলেন। বিপ্লবী সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্বে ট্রটস্কিই বহাল রইলেন।

কেরেনস্কি যথারীতি পেট্রোগ্রাদ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সদাতৎপর ট্রটস্কি তাঁর সেই উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিলেন।

সফল বিপ্লবের পর গঠিত হল সোভিয়েত রাশিয়া, ক্ষমতায় এল বলশেভিক দল। নতুন সরকারের ফরেন কমিশনার নিযুক্ত হলেন ট্রটস্কি।

নতুন পদের দায়িত্ব গ্রহণের পর ট্রটস্কির প্রথম কাজ হল যুদ্ধলিপ্ত শক্তিগুলির মধ্যে শান্তি স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে ব্রেস্ট-লিতোভস্কে শান্তি বৈঠক আহ্বান করা হল।

এই বৈঠকে জার্মানি যে সব শর্ত আরোপ করল ট্রটস্কি তার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। বৈঠক ব্যর্থ হল। পেট্রোগ্রাদে ফিরে এসে তিনি জার্মানির শর্তের সমালোচনা করলেন।

ট্রটস্কি জার্মানির আরোপিত সন্ধি চুক্তির বিরোধিতা করলেও লেনিন জার্মানির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছাই ফলবতী হল এবং তাঁর মতামতই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হল।

ট্রটস্কি ফরেন কম্‌মিশর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে যুদ্ধবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্তার পদে নিয়োগ করা হল।

এবারে ট্রটস্কি উদ্যোগ নিলেন লালফৌজ বাহিনী সংগঠনের কাজে। এই সময়ে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি পেলেন। সেগুলি হল গৃহযুদ্ধ প্রতিহত করা এবং বৈদেশিক আক্রমণ মোকাবেলা করা।

এই সময়ে ট্রটস্কি সেনাবিভাগের অনুকূলে বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী কিছু নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু যোসেফ স্তালিনের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক গোঁড়া নেতা ট্রটস্কির নীতি ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন।

অবশ্য এই বিরোধিতা অসার প্রমাণ করে দিল সুগঠিত লাল ফৌজের সাফল্য। ফলে ট্রটস্কির হাত আরও শক্তিশালী হল।

অসাধারণ বাস্তববাদী ট্রটস্কি সেনাবিভাগের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পেশাদারি নীতি প্রয়োগ করে সাফল্য লাভ করেছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও তাঁর নীতি ছিল অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ও বাস্তবতামুখী। এই সকল কারণে নেতৃত্বের প্রশ্নে সোভিয়েত রাশিয়ায় লেনিনের পরেই তাঁর নাম চিহ্নিত হয়ে যায়।

১৯১৯ খ্রিঃ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর পাঁচ সদস্যের অন্তর্ভুক্ত হলেন ট্রটস্কি। দেশের পুনর্গঠনের প্রশ্নে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি লেনিনের সঙ্গে একমত হতে পারতেন না। তবে প্রায়োগিক বিচারে তাঁর মতামত কখনোই লেনিনকে অতিক্রম করতে পারেনি। যদিও প্রশাসনিক বুদ্ধিমত্তার বিচারে তিনি ছিলেন লেনিনেরও ওপরে।

ট্রটস্কির জীবনীকাররা মন্তব্য করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন না রাজনৈতিক পেশাদারিত্বের অপ্রতুলতার কারণে।

লেনিন মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লেন ১৯২২ খ্রিঃ। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠল, লেনিনের পরে কে নেবেন সোভিয়েত রাশিয়ার দায়িত্ব!

দলের ভেতরে এবং বাইরে জোর আলোচনা চলল। দেখা গেল ট্রটস্কির প্রতিই সকলের লক্ষ। স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রমশ ট্রটস্কির নাম—তিনিই হবেন লেনিনের স্থলাভিসিক্ত।

কিন্তু ঈর্ষা সর্বত্রগামী। দেশগঠনের নিঃস্বার্থ কর্মেও তার বিষাক্ত স্পর্শ যুক্তি-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দিতে কম শক্তিশালী নয়। পলিটব্যুরোর ঈর্ষাকাতর কিছু নেতার বিরোধিতা প্রবল হয়ে উঠল।

ট্রটস্কির বিপক্ষে আরও কয়েকটি নাম তুলে ধরা হল। তাঁরা হলেন ক্যামেনভ, স্তালিন এবং জিনোভেভ।

১৯২২ খ্রিঃ নাগাদ লেনিন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। ত্রয়ী নেতৃত্বের কর্মকুশলতার বিচার বিশ্লেষণের কাজে তিনি ট্রটস্কিরই সাহায্য নিলেন। এই সময়ে তিনি আমলাতন্ত্রের সংস্কার বিষয়ে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যনীতির ক্ষেত্রে ট্রটস্কির মতকেই সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

নেতৃত্বের প্রশ্নে স্তালিন এবং ট্রটস্কির বিরোধ এতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে লেনিন স্বয়ং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি স্তালিনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পরামর্শ দিলেন ট্রটস্কিকে। তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্তালিনের প্রভাব অক্ষুণ্ণই রইল।

শেষ পর্যন্ত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা ছাড়া আর পথ রইল না। ট্রটস্কি স্পষ্টই জানালেন, কেন্দ্রীয় কমিটি দলের গণতান্ত্রিক কাঠামো ভঙ্গ করে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্রয় দিচ্ছে।

কেবল তাই নয় দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণে দলের চরম ব্যর্থতার সমালোচনাও করলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

এই প্রকাশ্য প্রতিবাদের পরে ট্রটস্কির বিরুদ্ধেও পাল্টা আক্রমণ চলল। তাঁকে বলা হলো বিভেদকামী। আরও বলা হল তিনি সকল প্রকার সুযোগ নিজের পক্ষে টানবার চেষ্টা করছেন।

দলের এই সংকট সময়ে আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন ট্রটস্কি। ফলে তাঁর পক্ষে আর আক্রমণের প্রতিউত্তর দেওয়া সেই সময়ে সম্ভবপর হল না। তাঁর এই সাময়িক নীরবতার সুযোগে সাংগঠনিক শক্তির জোরে স্তালিন জয়ী হয়ে গেলেন।

১৯২৪ খ্রিঃ জানুয়ারীতে দলের ১৩তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সমাবেশে স্তালিন ও তাঁর সমর্থকরা ট্রটস্কির নিন্দা করে তাঁর সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে দিলেন।

ট্রটস্কির প্রভাবের কথা চিন্তা করে তাঁর ডানা ছাঁটারও ব্যবস্থা হল। চতুর্মুখী আক্রমণের মাধ্যমে জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা হতে লাগল, রুশ বিপ্লবে ট্রটস্কির অবদান কত সামান্য ছিল। তাঁর স্থায়ী বিপ্লবের মতবাদকেও ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হল। ১৯২৫ খ্রিঃ মধ্যেই ট্রটস্কিকে সমর বিভাগের দায়িত্ব থেকে অপসারিত করা হল।

বস্তুতঃপক্ষে স্তালিন ও ট্রটস্কি এই দুই নেতার মধ্যে মূলতঃ বিরোধ ছিল একটি বিষয়ে। স্তালিন সমর্থন করতেন একদেশীয় সমাজতন্ত্র। অপর পক্ষে ট্রটস্কি ছিলেন বিশ্ববিপ্লবের প্রবক্তা।

পরের বছরেই ১৯২৬ খ্রিঃ ট্রটস্কির পলিটব্যুরোর পদও কেড়ে নেওয়া হল। সেখানেই শেষ হল না। এক বছরের মধ্যেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকেও তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল।

ধাপে ধাপে সুকৌশলে কোণঠাসা করে ফেলা হচ্ছিল ট্রটস্কিকে। ১৯২৭ খ্রিঃ বিপ্লবের দশম বছরে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে সেই কাজ সম্পূর্ণ করা হল। এরপর ১৯২৮ খ্রিঃ ট্রটস্কি ও তাঁর অনুগামীদের সোভিয়েত রাশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্বাসনে পাঠানো হল।

নির্বাসনকালেই ট্রটস্কি আত্মগোপন করলেন। দেশের বাইরে অজ্ঞাতবাসে থাকা কালে তিনি তাঁর আত্মজীবনী এবং রুশ বিপ্লবের ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

ইতিমধ্যে জার্মানিতে হিটলারের উত্থান ইউরোপ জুড়ে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। ট্রটস্কি সমগ্র বিশ্বকে যে একটি সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আনার স্বপ্ন দেখতেন, হিটলারের উত্থানে তা চুরমার হয়ে গেল।

১৯৩৩ খ্রিঃ ট্রটস্কি গেলেন ফ্রান্সে। সেখানে গড়লেন ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল।

সোভিয়েত সরকারের চাপে পড়ে তিনি নরওয়েতে যেতে বাধ্য হলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৬ খ্রিঃ মেক্সিকোয় রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নিরাপদ করলেন।

লেনিন যাঁকে নিজের উত্তরসুরি হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন রুশ বিপ্লবের অন্যতম তাত্ত্বিক যোদ্ধা সেই ট্রটস্কিকে দেশে ও দেশের বাইরে দেশদ্রোহীরূপে চিহ্নিত করা হল।

মেক্সিকোতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার সংকল্প ছিল ট্রটস্কির। কিন্তু স্তালিনের দীর্ঘ হস্ত এখানেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর নিযুক্ত এজেন্টরা ট্রটস্কিকে অনুসরণ করল। ১৯৪০ খ্রিঃ ২০ শে আগস্ট মেক্সিকোর কোয়াকনের বাড়িতে তাঁকে হত্যা করা হল।

রুস্তমজী ভিকাজী কামা

তখন এদেশের শাসন ক্ষমতা বিদেশী ইংরাজের করায়ত্ত। পরাধীন ভারতবাসী তাদের পদানত দাস মাত্র। পরাধীনতার লাঞ্ছনা আর অপমান মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। ভারতবাসীর মনেও ততদিনে জেগে উঠেছে নিজের দেশে নিজের অধিকার ফিরে পাবার চিন্তা।

কিন্তু সব ক্ষমতা তো বিদেশীর হাতে। অধিকার কেউ কি সহজে ছাড়তে চায়? অনেক কলাকৌশলে ওরা এই দেশ শাসনের অধিকার লাভ করেছে। একদিন এসেছিল বণিকের বেশে ব্যবসা করতে, তারপর রাতারাতি একেবারে শাসনক্ষমতা দখল করে বসল। সেই অধিকার তারা কেন সহজে ছাড়তে চাইবে?

কিন্তু ততদিনে ভারবাসীও ভাবতে শিখেছে, বুঝতে শিখেছে—নিজের দেশে নিজেদের অধিকার হারিয়ে পরাধীন থাকা পাপ। ওটা হল মাতৃভূমির বন্দিদশা। ওই বন্দিদশা থেকে দেশকে মুক্ত করতে না পারলে নেই দেশবাসীর মুক্তি। হবে না দেশের উন্নতি।

দেখতে দেখতে একদল স্বাধীনতাকামী মানুষ ইংরাজ বিতাড়নের কলাকৌশল ও পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠল গোপনে।

এই সময়ে আর একদল লোকও ছিল যারা রাজভাষা ইংরাজি শিখে ইংরাজদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে নিজেদের ইংরাজ সাহেব ভেবে আনন্দ পেত। ইংরাজদের খুশি করাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। আসলে তারাই ছিল দেশের প্রধান শত্রু।

এমনি একটি ইংরাজভক্ত দেশীয় পরিবারেই বিয়ে হয়েছিল মহারাষ্ট্রের মেয়ে রুস্তম ভিকাজীর। বিয়ে হল বটে কিন্তু স্বামীর ঘর তিনি করতে পারলেন না।

রাজভক্ত স্বামী মিঃ কে আর কামার চিন্তাভাবনার সঙ্গে তিনি নিজের চিন্তা মেলাতে পারলেন না।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বুকে ছিল পরাধীনতার জ্বালা, মনে ছিল গ্লানি। তাঁর চিন্তা জুড়ে ছিল মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির ভাবনা। স্বামীর ঘর তাই করতে পারলেন না রুস্তমজী ভিকাজী—বিয়ের পর যাঁর নাম হয়েছিল মাদাম কামা।

সংসার ছেড়ে পথে নেমে এসে মাদামকামা ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করার ব্রতকেই জীবনের আদর্শ করে নিলেন। পরাধীন দেশবাসীর দুঃসহ অবস্থা দেখে তিনি নিরন্তর মর্মযাতনা ভোগ করতেন। নিরুপায় আক্রোশে অস্থির হয়ে উঠতেন, কিন্তু কাজে অগ্রসর হবার পথ ছিল বন্ধ। এতদিনে পথ তাঁকে নিজেই যেন কাছে ডেকে নিল।

মাদাম কামা সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন ইংরাজ সাধারণ আঘাতে বিচলিত হবার জাতি নয়। তার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে গেলে চাই শক্তি সঞ্চয়, শক্ত আঘাত, আর সুপরিকল্পিত প্রস্তুতির মাধ্যমেই তেমন আঘাত সম্ভব।

ততদিনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। এদিকে সেদিকে ঘটছে বিক্ষিপ্ত ঘটনা। মারা পড়ছে দু-চারজন করে ক্ষমতাশালী ইংরাজ।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বিপ্লবীদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল অস্ত্রশস্ত্রের। তার অভাবে তাদের কাজ পরিকল্পনা মত অগ্রসর হচ্ছিল না। মাদাম কামা দলের বাইরে থেকেই বিপ্লবীদের এই অসুবিধাব কথা বুঝতে পারলেন। মাদাম কামা স্থির করলেন অস্ত্র আনাতে হবে বাইরে থেকে। এই সুযোগ নিতে হবে ইংরাজের শত্রুদেশ গুলোর কাছ থেকে।

মাদাম কামার চিন্তাভাবনা যখন একটা বৃহৎ সংগঠনের পরিকল্পনা হয়ে তাঁর সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করে তুলছে সেই সময়েই হঠাৎ তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। সুযোগ বুঝে দেশমাতৃকার এই একান্ত সেবিকা চিকিৎসার উদ্দেশ্য নিয়ে লন্ডনে এসে পৌঁছলেন।

বিদেশে এসেই বিরাট কর্মক্ষেত্র পেয়ে গেলেন মাদাম কামা। প্রথমেই তিনি সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজে ব্রতী হলেন। সেই সঙ্গে চলল ভারত-প্রেমিক সগঠনের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগের কাজ। বিদেশ থেকে দেশের মুক্তিকামী বিপ্লবীদের যাতে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা সম্ভব হয় প্রধানতঃ সেই বিষয়েই চলল মাদাম কামার আন্তরিক প্রয়াস।

এই সময় ভারত থেকে পলাতক অনেক বিপ্লবী ও দেশকর্মীর সঙ্গেই তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। এঁদের সকলের কাছেই মাদাম কামা হয়ে উঠেছিলেন প্রেরণার উৎস।

বাংলার বিপ্লবী দলের অন্যতম সংগঠক ছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ তাঁর ভাই বারীন ঘোষ প্রমুখ। তাঁদের চেষ্টা চলছিল বোমা তৈরির। কিন্তু কে শেখাবে তাঁদের বোমা তৈরির কলা কৌশল? হেমচন্দ্র কানুনগোকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়েছিল বোমা তৈরির কৌশল শেখার জন্য। মাদাম কামা তাঁর জন্য বিলেতে একটি লেবরেটরি তৈরি করে দিলেন, বিস্ফোরক পদার্থ তৈরিতে দক্ষ একজন বিদেশীকেও নিযুক্ত করে দিলেন প্রশিক্ষণের জন্য।

ইতিমধ্যে মাদাম কামার উদ্যোগে কয়েকটি পত্রপত্রিকার প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। তাদের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে চলেছে জোর প্রচার। বন্দেমাত'রম নামে একটি সমিতিও এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

কিছুকাল পরেই জার্মানীর স্টুর্টগার্ট শহরে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সময়টা ১৯০৭ খ্রিঃ ১৮ই আগস্ট। এই সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিলেন মাদাম কামা।

পুণ্যভূমি ভারত বিদেশী ইংরাজের শাসনমুক্ত হবে। স্বাধীন ভারতের মুক্ত আকাশে উড্ডীন হবে জাতির স্বাধীনতার প্রতীক—একটি জাতীয় পতাকা, মাদাম কামা মনের নিভৃতে এই স্বপ্ন লালন করে আসছেন আবাল্য। এবারে সেই স্বপ্নেরই সার্থক রূপায়ন দেখা গেল সভাপ্রাঙ্গণে তাঁর হাতে।

সেই সময়ে ভারতের কোন রাজনৈতিক দলের পতাকা ছিল না। বীর সাভারকর এ বিষয়ে গভীর চিন্তার পর ত্রিবর্ণরঞ্জিত তারকা চিহ্নিত পতাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কঠোর পরিশ্রমে তাঁর পরিকল্পনার রূপদান করেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)।

বীর সভারকরের নির্দেশ মত মাদাম কামা ও সর্দার সিং রানা ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে সম্মেলনে যোগদান করেন। মাদাম কামা ভাষণ দানকালে উক্ত পতাকা শ্রোতাদের সম্মুখে তুলে ধরে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন, "This flag of Indian Independence. Behold it is born. It is already sanctified by the blood of martyred Indian youths. I call upon you gentlemen to rise and salute this flag of independence. In the name of this flag I appeal to you all lovers of freedom all over the Continent to co-operate with this flag in freeing one fifth of the human rance."

অন্যান্য দেশের পতাকার পাশাপাশি উত্তোলিত হল ভারতের একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। অভিবাদন জানানো হল এই জাতীয় পতাকাকে।

সেই প্রথম উদ্ভাবিত হল ভারতের জাতীয় পতাকার রূপ। বর্তমানের আশোকচক্র লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা মাদাম কামা উত্তোলিত পতাকার পরিকল্পনার ভিত্তিতেই রূপায়িত।

মাদাম কামার বিপ্লববাদ প্রচার এ সময়ে কেবল ইংলন্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমেরিকা গিয়েও তিনি সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে প্রচারের কাজ করেন।

মাদাম কামার কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকার এতকাল ধৈর্যের সঙ্গে লক্ষ করছিল। ১৯০৯ খ্রিঃ সরকার তাঁকে ইংরাজের রাজত্ব থেকে বহিষ্কারের আদেশ ঘোষণা করে।

মাদাম কামাকে বাধ্য হয়ে লন্ডনের বাস উঠিয়ে ফরাসী রাজ্যের প্যারিসে চলে আসতে হল।

ভারতে এবং ভারতের বাইরে ততদিনে বিপ্লবীদের কাজ জোরদার হয়ে উঠেছে। ভারতের বিপ্লবীরা মাদাম কামার কাছ থেকে গোপনে পেতে লাগলেন অস্ত্রশস্ত্রের জোগান, বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা।

মহারাষ্ট্রের বীপ্লবী বীর সাভারকর এই সময়ে লন্ডনে বাস করছিলেন। একটি হত্যাকান্ডের ব্যাপারে পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মাদাম কামা তাঁকে প্যারিসে নিজের কাছে এনে রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একদিন লন্ডন পুলিশের হাতে তাঁকে বন্দি হতে হয়।

এর পরের ঘটনা বড়ই চমকপ্রদ।

বিচারের উদ্দেশ্যে ধৃত সাভারকরকে ভারতে চালান করা হল জাহাজে। সাভারকর গোপনে খবর পাঠালেন মাদাম কামাকে যেন পথের কোথাও তিনি এমন ব্যবস্থা করে রাখেন যাতে জাহাজ থেকে পালিয়ে তিনি ইংরাজের নাগালের বাইরে পৌঁছতে পারেন।

বন্দি সাভারকরকে নিয়ে ব্রিটিশ জাহাজ লন্ডন ত্যাগ করে ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরের কাছে এলে রক্ষীবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে বীর সাভারকর জাহাজের পোর্টহোল থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু সাঁতরে ফরাসী উপকূলে ওঠার পর তিনি ফরসী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তারা তাঁকে ইংরাজ বাহিনীর হাতে তুলে দিল।

মাদাম কামা পূর্বের সংবাদ অনুযায়ী সাভারকরকে রক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বন্দরে পৌঁছতে তাঁর একটু বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। তিনি যখন সশস্ত্র সঙ্গীদের নিয়ে পৌঁছান, তখন দেখতে পান বন্দি সাভারকরকে নিয়ে পুলিশের লোক জাহাজে উঠছে।

মাদাম কামা দমবার পাত্রী ছিলেন না। বিদেশের মাটিতে রক্ষা করতে না পারলেও স্বদেশে ইংরাজের জেল থেকে সাভারকরকে ছাড়িয়ে আনার সব রকম চেষ্টাই তিনি করেছিলেন।

সাভারকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ভারতের নাসিকের ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটকে যে পিস্তলটি দিয়ে হত্যা করা হয়, সেই ব্রাউনিং পিস্তলটি সাভারকর ইংলন্ড থেকে পাঠিয়েছিলেন।

সেই অভিযোগ খন্ডনের জন্যও মাদাম কামা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। প্যারিসের ব্রিটিশ কনসাল জেনারেলকে তিনি জানিয়েছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার পর নাসিকে বিপ্লবীরা যে পিস্তলটি ফেলে যায় সেটি সাভারকর পাঠাননি, পাঠিয়েছিলেন তিনি নিজে।

কিন্তু আদালত এ সত্ত্বেও সাভারকরের বিচার করেছিল এবং তাঁর দীপান্তরবাসের দন্ড হয়েছিল।

এরপর থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এই বীরাঙ্গনা যেন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর দুঃসাহস যেন আরও বেড়ে গেল।

১৯১৪ খ্রিঃ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল। যুদ্ধের সময় ফরাসীবন্দরে ইংরাজ পক্ষের বহু ভারতীয় সৈন্য ছাউনি ফেলে অস্থায়ীভাবে বাস করছিল। মাদাম কামা গোপনে সৈন্যদের ছাউনিতে গিয়ে ভারতীয় সেনাদের ভারতের শত্রু ইংরাজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরামর্শ দিতে থাকেন।

এই প্রচারের ফল ফলতেও বিলম্ব হল না। সৈন্যদের মধ্যে উত্তেজনা ও আলোড়ন দেখা দিল।

মাদাম কামার এই গোপন কাজের খবর ইংরাজ সরকারের কানে পৌঁছতে সময় লাগল না। ফরাসী সরকারকে তারা অনুরোধ করল মাদাম কামাকে বন্দি করে ইংরাজের হাতে সমর্পণ করতে।

ফরাসী সরকার মাদাম কামাকে বন্দি করলেন বটে, কিন্তু তাঁকে ভারতে পাঠালেন না। নিজেদের ভিটি নামক দুর্গে তাঁকে আটক করে রাখলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী ভারতীয় নারীর এই প্রথম কারাবাস। পরবর্তিকালে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী নারী বন্দি হয়েছেন, দেশের কাজে জীবনোৎসর্গ করেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁদের প্রেরণার উৎস ছিল মাদাম কামার ত্যাগ ও দেশভক্তির আদর্শ।

কারাগারে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে ফরাসী সরকার মাদাম কামাকে মুক্তি দেন। মুক্ত হয়ে বাইরে এসেই দুর্জয় এই বীরাঙ্গনা আবার পূর্ণ উদ্যমে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তিনি ইংরাজের প্রতিপক্ষ সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াব সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। রাশিয়ার সরকারকে তিনি জানালেন, ভাবতের জনসাধারণ বিপ্লবের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পেলেই তারা ইংরাজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করতে পারেন।

এই বিপ্লবী নেত্রীর আবেদনে রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা লেনিন মাদাম কামাকে রাশিয়া যাবার আমন্ত্রণ জানালেন।

কিন্তু ততদিনে বিলম্ব হয়ে গেছে। মাদাম কামার শরীর তখন ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। রাশিয়া আর তাঁর যাওয়া হল না।

অনেক কষ্টে সরকারী অনুমতি সংগ্রহ করে প্রায় ত্রিশ বছর পর পঁচাত্তর বছর বয়সে ১৯৩৬ খ্রিঃ আগস্ট মাসে ভারতমাতার অগ্নিকন্যা মাদাম কামা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

এরপর বেশিদিন তিনি বাঁচেন নি। জীবনের সর্বস্ব দিয়ে বিদেশের মাটিতে থেকে যে অক্লান্ত সংগ্রাম তিনি সুদীর্ঘকাল করে গেছেন তার সার্থক পরিণতি তিনি দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম, অতুল আত্মত্যাগ আজও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। করা হবে আগামী দিনেও।

বালগঙ্গাধর তিলক



ভারতের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম মহান নায়ক, সুবিখ্যাত রাজনীতিক ও পন্ডিত বালগঙ্গাধর তিলকের জন্ম ১৮৪৬ খ্রি ২৩শে জুলাই দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত রত্নগিরি নামক স্থানে ঐতিহ্যসম্পন্ন মহারাষ্ট্রীয় চিত্‌পাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বংশের অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিলকের পিতার নাম ছিল গঙ্গাধর রামচন্দ্র।

১৮৭৬ খ্রিঃ তিলক ডেকান কলেজ থেকে স্নাতক এবং ১৮৭৯ খ্রিঃ প্রথম শ্রেণীতে আইন শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও তাঁর পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বেদ-বেদান্ত ও বৈদিক সংহিতার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় তিনি সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় দেন।

স্বদেশীয় সাহিত্য সংস্কৃতির পাশাপাশি পশ্চিমী রাজনীতি ও চিন্তাধারার সঙ্গেও তাঁর একাত্মতার অভাব ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন ইউরোপীয় প্রথার অন্ধ অনুকরণ নয়, ভারতীয় সনাতনী প্রথাতেই ভারতীয় জনজীবনে আধুনিকতার রূপান্তর সম্ভব।

রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় তিলক বিদেশী শাসকের কাছে আবেদন নিবেদনে বিশ্বাসী ছিলেন না। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকাকে অব্যাহত রাখেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যখন স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভে ব্যস্ত হয়েছে, সেই সময় তিলকের 'স্বরাজ আমার **জন্মগত অধিকার**' এই দাবি ভারতীয় রাজনীতিকে সচকিত করে তুলে।

একমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভাব—এই প্রশ্নে তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে ১৯০৭ খ্রিঃ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৯২০ খ্রিঃ কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন।

পরবর্তীকালে উভয় দলের মিলন ঘটিয়ে জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন রচনার মধ্যে তিনি তাঁর মত ও কর্মধারায় অনেকাংশে সফল হন।

আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁর জাতীয়তাবাদ নরমপন্থী কংগ্রেসীদের আবেদন নিবেদন মূলক জাতীয়তাবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তিলকের মতে জাতীয়তাবাদ মূলতঃ ভাবগত হলেও বস্তুর মাধ্যমেই তা মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই হিন্দুধর্মীয় নেতাদের পুনর্জাগরণের ভাবধারার সাথে রাজনৈতিক চিন্তাধারার ঐক্য ঘটিয়ে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি সূচনা করলেন গণপতি পূজা ও শিবাজী উৎসবের।

স্বদেশপ্রেম এবং ধর্মীয় ভাব ও ভাবনায় তিলক ছিলেন বহুল পরিমাণে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দ দ্বারা প্রভাবিত।

মূলতঃ জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রচারক হলেও গান্ধীপূর্বভারতে জাতীয়তাবাদ প্রকাশ ও বিকাশে তাঁর সার্থক ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

লোকমান্য তিলকের বিরাট ব্যক্তিত্ব, গভীর পাণ্ডিত্য, অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভা, সর্বভারতীয় নেতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ইংরাজ শাসকের ভয়ের কারণ ছিল।

১৯১৮ খ্রিঃ ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ বলেছিলেন, ''I fear only one man in India he is Mr. Tailk.''

স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলিতভাবে মারাঠী ও কেশরী নামে দুখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। একটি ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক রূপেও তিনি কাজ করেন।

লোকমান্য তিলকের জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ এত তীব্র ছিল যে, ভীত সন্ত্রস্ত ইংরাজ সরকার তাঁকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে একাধিকবার অভিযুক্ত করে। ১৮৮২ খ্রিঃ কোলাপুর মানহানি এবং ১৮৯৭-'৯৮ খ্রিঃ রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে কারাদন্ড ভোগ করতে হয়।

১৯০৮-'১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজদ্রোহাত্মক অপরাধের অভিযোগে মান্দালয় জেলে অন্তরীণ থাকতে হয়।

এইভাবে ক্রমাগত বন্দি থাকার ফলে বন্দিজীবনই তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল পরিচিত গার্হস্থ্যজীবন।

১৯১৪ খ্রিঃ কারামুক্তির পর তিলক ১৯১৮ খ্রিঃ বিলাত যান।

১৯১৬ খ্রিঃ লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে তিলক কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের আন্দোলনগত ঐক্যস্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

জাতীয়তাবাদী তিলকের সঙ্গে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, বিপ্লবী বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর প্রমুখের সঙ্গেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। সাভারকর প্রতিষ্ঠিত মিত্রমেলা ও অভিনব ভারত নামে গুপ্ত সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল।

লোকমান্য তিলকের প্রেরণাতেই ১৯০৩ খ্রিঃ নেপালে বোমার কারখানা তৈরি হয়েছিল।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তিলক ছিলেন একাধারে অভিজ্ঞ রাজনীতিক, সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত, বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, আইনজ্ঞ। মারাঠি গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা ও অনন্যসাধারণ নেতা।

উগ্র জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক বলে স্বীকৃতিলাভ করলেও তিনি বিপ্লবের কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক মতবাদ; পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেন নি। তাছাড়া স্বয়ং বিপ্লবী নায়ক বলেও পরিচিত হতে পারেন নি।

কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেম ও অসাধারণ বাগ্মিতা বহু দেশপ্রেমিক নেতা ও কর্মীকে অনুপ্রাণিত করেছে।

তিলক ছিলেন সর্বক্ষেত্রেই বাস্তববাদী। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলার বাস্তবতা তিনি বারবার স্বীকার করেছেন। রাজনীতিক চিন্তা ও চেতনায় মহাত্মার সঙ্গে মতপার্থক্য থাকলেও অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনাকে তিনি সমর্থন জানান।

লন্ডনে হোমরুল লিগ স্থাপন (১৯১৬ খ্রিঃ) এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ব্রিটিশ শ্রমিকদলের পরিচিতি ঘটানো (১৯১৯ খ্রিঃ) তিলকের অবিনশ্বর কীর্তি।

মারাঠি ও কেশরী পত্রিকায় তিলকের বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও সময়ানুসারী সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই সকল রচনা তাঁর বিচক্ষণতা স্বদেশপ্রেম ও বাগ্মিতাকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

The orion তিলকের আর্য সভ্যতার উৎপত্তি ও তাৎপর্য সম্পর্কিত একটি পান্ডিত্যপূর্ণ মূল্যবান রচনা। তাঁর লেখা গীতা রহস্য ও The Arctic Home in the Vedas গ্রন্থ দুখানি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

১৯২০ খ্রিঃ ১লা আগস্ট লোকমান্য তিলকের জীবনাবসান ঘটে।

বিপিনচন্দ্র পাল



ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৫৮ খ্রিঃ ৭ই নভেম্বরে শ্রীহট্ট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামচন্দ্র পাল।

ছেলেবেলায় শ্রীহট্ট শহরে একজন মৌলভীর কাছে ও পরে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে বিপিনচন্দ্র পড়াশুনা করেন। ১৮৭৪ খ্রিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েও স্কলারশিপ লাভ করেছিলেন।

পরে কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে দুবছর এবং কলকাতার চার্চ মিশনারী সোসাইটিতে একবছর পড়াশুনা করেন কিন্তু গণিতের জন্য আই. এ. পাশ করতে পারেন নি।

কিন্তু পরিচিত মহলে সাহিত্যে ও ইংরাজি ভাষায় তাঁর জ্ঞানের জন্য যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

কলকাতায় অধ্যয়নকালেই বিপিনচন্দ্র সংস্কারপন্থী ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৭৭ খ্রিঃ শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। পরিণতিতে তাঁকে পিতার ত্যাজ্যপুত্র হতে হয়।

পরবর্তীকালে অবশ্য পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে না পেরে পুনরায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১৮৭৯ খ্রিঃ বিপিনচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি কটকের একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতপার্থক্য হেতু কিছুকাল পরে এই কাজ ছেড়ে দেন। পরে শ্রীহট্ট, কলকাতা, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা করেন।

১৮৮১ খ্রিঃ বোম্বাইয়ে এক ব্রাহ্ম বাল্য-বিধবাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। বাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় ফেরার সময় তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৮৮৭ খ্রিঃ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয় অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকে অস্ত্র আইন প্রত্যাহারের দাবী সমর্থন করে বক্তৃতা করেন।

১৮৯৮ খ্রিঃ বৃত্তি পেয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়বার জন্য বিলাত গিয়ে একবছর অক্সফোর্ডে থাকেন। ভারতে ফিরে আসেন ১৯০১ খ্রিঃ। এখানে তিনি নিউইন্ডিয়া নামে একটি ইংরাজি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

তৎকালীন ভারতে যে সকল মনীষী জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। তাঁর জাতীয়তাবোধের সঙ্গে ছিল ধর্মবোধ এবং আধ্যাত্মিকতার সংযোগ। রাজনীতি ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের দীক্ষাগুরু ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর বাগ্মিতা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। তিনি কংগ্রেসের প্রগতিশীল শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং নব্য বাংলার রূপায়ণে নেতৃত্ব দান করেছিলেন।

বিশ শতকের প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে ওঠে ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ আরম্ভ হয়। ১৮৫৭ খ্রিঃ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই প্রথম ইংরাজ বিতাড়নের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়।

কিন্তু সেই বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর থেকে ক্রমাগত ভারতের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হতে থাকে।

সিপাহী বিপ্লব ছিল ভারতে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লব। তা ব্যর্থ হয়েছিল। প্রথম বিপ্লবী শহীদ ব্রাহ্মণযুবক মঙ্গলপাণ্ডে ব্যারাকপুরে অশ্বত্থবৃক্ষে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে আত্মোৎসর্গ করেন।

সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হলেও তার প্রভাবে ভারতের দিকে দিকে ধ্বনিত হয়ে উঠল ঘুম ভাঙ্গার গান। পরাধীন ভারতবাসীর অন্তরে গুঞ্জরিত হয়ে উঠল স্বাধীনতার নান্দীপাঠ।

এরপর থেকেই ভারতে নানাভাবে আরম্ভ হয়ে গেল মুক্তিসাধনা। সাহিত্যে ও দেশের ভাববাদে প্রচারিত হতে লাগল স্বাধীনতার আদর্শ। ঋষি বঙ্কিম রচনা করলেন আনন্দমঠ। স্বামী বিবেকানন্দর প্রচারিত আদর্শবাদের মধ্যেও দেশের তরুণ সম্প্রদায় পেল স্বাধীনতার উদ্দীপনা। ভারতে সংগঠিত হল জাতীয় কংগ্রেস।

এরই কিছুকাল পরে মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশে সংগঠিত হল বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি। বাংলা দেশে গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লববাদ প্রাতষ্ঠায় প্রথম হোতা শ্রী অরবিন্দ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার পি.মিত্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ। এঁদেরই উদ্যোগে ও চেষ্টায় বাংলাদেশে ১৯০২ খ্রিঃ কলকাতায় প্রথম গুপ্ত সমিতি অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। এর কয়েক বছর পরে শ্রী অরবিন্দ বরোদার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় আসেন এবং নিজেকে সর্বতোভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করলেন।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশজুড়ে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সখারাম গণেশ দেউসকর, অশ্বিনীকুমার প্রমুখ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলাদেশে বয়কট আন্দোলন বা বিলাতী বর্জন আন্দোলন গড়ে তুললেন।

সুরেন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্র বজ্রনির্ঘোষে ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাতিকে জাগিয়ে তুললেন। তাঁদের কণ্ঠের জলদগম্ভীর মন্ত্র এবং অগ্নিময় ভাষণ সেদিন বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে বিদ্যুৎ-শিহরণ জাগিয়ে তুলল। তাঁদের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মানুষকে একেবারে যুদ্ধের উন্মাদনায় ক্ষিপ্ত করে তোলে।

চারদিকে আরম্ভ হল জনসভা, মিছিল ও বিলাতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব। ক্রমশ ইংরাজ সরকার আরম্ভ করলেন দমন ও পীড়ন। ভয় দেখিয়ে, নির্যাতন করে, অত্যাচার চালিয়ে তারা আন্দোলনকে বানচাল করবার চেষ্টা করলেন।

এবারে বাংলাদেশে শুরু হল সরকারী দমন নীতির সঙ্গে বাংলার নির্ভীকতা ও আদর্শবাদের সংঘর্ষ।

সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে সেদিন শত শত স্বদেশী নেতা ও কর্মী বাংলাদেশের শহরে পল্লীতে বক্তৃতা করে স্বদেশীমন্ত্র ও বিলাতি বর্জন প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন।

রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে বিপিনচন্দ্র ছিলেন পরিপূর্ণ স্বরাজবাদী। তিনি বয়কট বা Passive resistance আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন।

বাংলার বিলাতি বর্জন কর্মপদ্ধতির ওপরে এক প্রবল গণআন্দোলন গড়ে উঠল। একদিকে যেমন এই প্রকাশ্য স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে লাগল অন্যদিকে সঙ্গোপনে আরম্ভ হয়ে গেল বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির প্রসার।

বাংলার সুরেন্দ্রনাথ তখন নিখিল ভারতের একচ্ছত্র নেতা। তিনি ভারতের সমস্ত প্রদেশকে জাগ্রত করলেন; কংগ্রেসের মধ্যে নিয়ে এলেন এবং ভারতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেন। তার আগে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ভারতীয় চেতনা বলে কিছু ছিল না। প্রত্যেক প্রদেশ নিজ নিজ প্রদেশকেই স্বদেশ বলে মনে করত। সমস্ত ভারতের কথা কেউ ভাবত না, নিখিল ভারতকে নিজের স্বদেশ বলে ধারণা করতে পারত না। সুরেন্দ্রনাথই তাঁর অলৌকিক প্রতিভা, দেশপ্রেম ও বাগ্মিতার দ্বারা প্রথম ভারতবর্ষে এই ভাবধারার সৃষ্টি করলেন। সমস্ত প্রদেশকে জাগ্রত করে, একত্র করে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত করে নিখিল ভারতবাসীর মনে এক অখন্ড ভারতীয়-চেতনা সৃষ্টি করলেন।

তাঁর নেতৃত্বের প্রভাব চলাকালীন সময়ে এল তাঁর নেতৃত্বের বিরোধী এক শক্তি এবং ভাববাদ। এই নতুন ভাববাদ সুরেন্দ্রনাথের ভাববাদ অপেক্ষা অধিক উগ্র, উত্তপ্ত ও অগ্রগামী। এই নতুন ভাববাদের হোতা হলেন তিনজন গণমান্য নেতা। এই ত্রি-নেতৃত্বের নাম লাল-বাল-পাল-এর ত্রিত্রয় (Trinity) অর্থাৎ পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বাংলার বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্ব।

এই নেতৃবৃন্দ সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামী দলকে চ্যালেঞ্জ করে তাঁদের আখ্যা দিলেন মডারেট বা মধ্যপন্থী নরম দল বলে। নিজেদের স্বরূপকে তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন এক্সট্রিমিস্ট বা চরমপন্থী দল বলে।

এই লাল-বাল-পাল-পরিচালিত চরমপন্থী দলেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন পরে শ্রী অরবিন্দ।

চরমপন্থী দলেরই পরিপূর্ণ সাহায্য এবং উৎসাহ লাভ করে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশে গুপ্তসমিতির আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বস্তুতঃ বাংলাদেশে চরমপন্থী আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক, প্রচারক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।

চরমপন্থী তথা বিপ্লবপন্থীদের মুখপত্র বন্দেমাতরম পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খ্রিঃ আগস্ট মাসে। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হন বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁর পরে সম্পাদক হন শ্রী অরবিন্দ। পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুবোধচন্দ্র মল্লিক, হরিদাস হালদার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় বিপিনচন্দ্র কাগজের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে মানিকতলা মুরারীপুকুরের বাগানে বোমার কারখানা আবিষ্কার হলে অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে অরবিন্দও গ্রেপ্তার হলেন। ইংরাজ সরকার সকলের বিরুদ্ধে আরম্ভ করল রাজদ্রোহিতার মামলা। সেই সময় বিপিনচন্দ্র পুনর্বার বন্দেমাতরম সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অরবিন্দের মামলায় সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিপিনচন্দ্র মৌন অবলম্বন করলে আদালত অবমাননার দায়ে কারাদন্ড ভোগ করেন।

১৯০৭ খ্রিঃ স্বদেশী ও স্বরাজের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বিপিনচন্দ্র মাদ্রাজে বক্তৃতা করেন। তাঁর এই বক্তৃতাবলী সমগ্র দক্ষিণভারতে জাগরণের সৃষ্টি করেছিল। পরের বছর তিনি পুনর্বার বিলাত যান। বিলাত অবস্থানকালে বিপিনচন্দ্র Swaraj এবং Indian Student নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। Swaraj পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর The Actiology of the Bomb ın Bengal প্রবন্ধের জন্য তিনি রাজরোষের কবলে পড়েন। বিলেতে তিনবছর অবস্থানের পর স্বদেশে ফিরে এলে বর্তমান মুম্বইতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯১৬ খ্রিঃ বাল গঙ্গাধর তিলক হোমরুল গঠন করলে বিপিনচন্দ্র পুনর্বার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি তিলকের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯১৮ খ্রিঃ ভারতের শাসন সংস্কার বিষয়ে মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরের বছরে, ১৯১৯ খ্রিঃ বিপিনচন্দ্র একটি কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তৃতীয়বার বিলাত যান।

১৯২১ খ্রিঃ গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করলে বিপিনচন্দ্র তার বিরোধিতা করেন এবং নিন্দিত হন। এরপর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বিপিনচন্দ্র মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার এবং স্ত্রী শিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। চিদম্বরম পিল্লাই তাঁকে 'স্বাধীনতার সিংহ' বলে অভিহিত করেছিলেন।

বিপিনচন্দ্রের প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিটি শাখায় ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ। তাঁর বিভিন্ন রচনা এবং বক্তৃতার মধ্যে এই সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় বিধৃত রয়েছে।

১৯১২ খ্রিঃ থেকে ১৯১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত লেখাই ছিল তাঁর মুখ্য কাজ। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী হল—শোভনা, ভারত সীমান্তে রুশ, মহারানী ভিক্টোরিয়ার জীবনী, জেলের খাতা, নবযুগের বাংলা, সত্তর বৎসর (আত্মচরিত), চরিত্রচিত্র, সাহিত্য ও সাধনা, রাষ্ট্রনীতি, মার্কিনে চারিমাস, Indian Nationalism, Nationality and Empire, Swaraj and the present situation, The Basis of Social Reform, The soul of India, The New Spirit, Studies of Hinduism, Memoirs of My life and Time প্রভৃতি।

নিউ ইন্ডিয়া ও বন্দেমাত্‌রম ছাড়াও তিনি আরও অনেক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সেগুলি হল পরিদর্শক, দি হিন্দু রিভিউ, দি ডেমোক্র্যাট, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রভৃতি।

১৯৩২ খ্রিঃ কলকাতায় বিপিনচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

রানী এলিজাবেথ

রানী এলিজাবেথ ছিলেন ইংলন্ডের টিউডর বংশের রাজা অষ্টম হেনরীর মেয়ে। অবশ্য তাঁর জন্মের বৈধতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু তাঁর পিতৃপরিচয় কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। তিনি জন্ম সূত্রেই তাঁর পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধি, কূটনৈতিক দক্ষতা, সৌজন্যহীন অহংভাব, মাত্রাতিরিক্ত ঔদ্ধত্য, চূড়ান্ত বিবেকহীনতা ও শিক্ষানুরাগ।

বয়স পঁচিশ পূর্ণ হবার আগেই ১৫৫৮ খ্রিঃ এলিজাবেথ ইংলন্ডের সিংহাসনে বসেন। তাঁর আগে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ষষ্ঠ এডওয়ার্ড ও ভগ্নী মেরী স্বল্পকাল রাজত্ব করেছিলেন।

এলিজাবেথের রাজত্বকালকে ইংলন্ডের ইতিহাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সময় বলা হয়। শুধু রাজনীতি বা পার্লামেন্টের সঙ্গে দ্বন্দ্ব নয়, তাঁর রাজত্বকাল সাহিত্যে এক অসাধারণ যুগ বলে প্রতিপন্ন হয়। ইংলন্ডের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অনেকেই এই সময় আবির্ভূত হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেক্সপীয়র, মরলো,

বেন জনসন, স্পেনসার, লিলি, গ্রীন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও সাহিত্যিক। তাঁর সময়েই নাট্য সাহিত্যের চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে যা ইংরাজি সাহিত্যে এলিজাবেথীয় নাটক বা Elizabethan Drama নামে পরিচিত। আর এই সময়ের ইংলন্ডকে বলা হত West of the singing birds.।

এলিজাবেথের জন্ম ১৫৩৩ খ্রিঃ। পিতা অষ্টম হেনরী তাঁকে খুশি মনে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন কোন পুরুষ বংশধর তাঁর অবর্তমানে টিউডর বংশের ঐতিহ্যের ধারা বহন করে চলবে। তাই অজস্র বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি অ্যানবোলিনকে রানী করেছিলেন। কিন্তু অ্যান তাঁকে পুত্র সন্তান উপহার দিতে পারেন নি। এই অপরাধেই হয়তো তিন বছরের শিশুকন্যাকে ফেলে রেখে অ্যান বোলিনকে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে শিশু এলিজাবেথের সাথী হয়েছিল একাকীত্ব, ভীতি, বেদনা এবং দুঃখ। খুব ছোট বয়স থেকেই মৃত্যুভয়ে তাঁকে শঙ্কিত থাকতে হত। তাঁর ছেলেবেলার বেশিভাগ সময়টাই কেটেছে বন্দিদশায়। তবে তাঁকে সাহচর্য দিত বৈমাত্রেয় ভাই এডোয়ার্ড। আর পেয়েছিলেন ভালো গৃহশিক্ষক ও পড়বার মত প্রচুর পুস্তক।

অষ্টম হেনরী মারা যান ১৫৪৭ খ্রিঃ। ইংলন্ডের সিংহাসনে বসলেন দশবছরের বালক ষষ্ঠ এডোয়ার্ড। তাঁর অভিভাবক হয়ে রইলেন মামা ডিউক অব সমারসেট।

এডোয়ার্ড ছিলেন শারীরিকভাবে দুর্বল ও অথর্ব। তিনি যে পরিপূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় কোনদিনই পৌঁছতে পারবেন না তা অবিদিত ছিল না। ফলে নতুন রাজার রাজত্বের অল্পকালের মধ্যেই ঘনিয়ে উঠল ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের কালো মেঘ।

অষ্টম হেনরীর উইল অনুযায়ী উত্তরাধিকারী হিসাবে এডোয়ার্ডের পরেই অ্যারাগনের ক্যাথারিনের কন্যা মেরী টিউডরের নাম ছিল। সব শেষে নাম ছিল এলিজাবেথের।

এদের দুজনের কাছেই বিপদ স্বরূপ ছিল ফ্রান্সের দঁফের স্ত্রী ও অষ্টম হেনরীর বড়বোন মার্গারেটের নাতনী এবং স্কটল্যান্ডের সিংহাসনের উত্তররাধিকারী মেরী স্টুয়ার্ট। ইংলন্ডের সিংহাসনে তাঁর দাবিও কিছু কম জোরালো ছিল না।

যাই হোক, এহেন পরিস্থিতিতে কুটিল ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত ঘিরে ফেলতে লাগল ইংলন্ডের রাজসিংহাসনকে।

ষষ্ঠ এডোয়ার্ড মামার তত্ত্বাবধানে কয়েক বছর রাজত্ব করার পরেই ষোল বছরে পা দেবার আগেই মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র।

এই সময়ে এলিজাবেথের সৎবোন মেরী তৎপরতার সঙ্গে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন দুর্গের অন্তরীনে। এই সময়ে তিনি প্রাণে রক্ষা পেলেন স্পেনের ফিলিপ ও তাঁর বাবার হস্তক্ষেপের ফলে।

মেরী ইংলন্ডের সিংহাসনে রাজত্ব করলেন পাঁচ বছর। সেই সময় এলিজাবেথের জীবন কেটেছে লর্ড সেমুর-এর রাজসংসারে। সেমুর ছিলেন অষ্টম হেনরীর শেষ রানী ক্যাথারিনের দ্বিতীয় স্বামী। বয়সে তিনি স্ত্রীর চেয়ে অনেক ছোট ছিলেন। বিমাতার নতুন স্বামীর সংসারে এলিজাবেথ রূপ ও গুণে সুদর্শন সেমুরের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন।

১৫৪০ খ্রিঃ ক্যাথারিন যখন মারা যান সেই সময় তাঁর বয়স পনের। সদ্য যৌবনে পা দিয়েছেন। সেমুর সরাসরি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এলিজাবেথকে বিবাহ করে ইংলন্ডের সিংহাসন দখল করা। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়।

মেরীর রাজত্বকালে প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল। প্রোটেস্ট্যান্ট শহীদদের রক্তে ইংলন্ডের মাটি লাল হয়ে উঠেছিল।

একটার পর একটা ভুল ও অন্যায় পদক্ষেপের ব্যর্থতার মধ্যেই ১৫৫৮ খ্রিঃ নিঃসন্তান অবস্থায় করুণ মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল মেরীকে। এই বছরেই নভেম্বর মাসে এলিজাবেথ ইংলন্ডের রানী হলেন।

সর্বক্ষেত্রে এক বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে শাসনদন্ড হাতে নিলেন এলিজাবেথ। চরম অর্থসংকটে ধুঁকছে তখন ইংলন্ড। মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। দেশের ধর্মবিরোধও চরমে।

এই সংকট মোচনের জন্য এলিজাবেথ সিংহাসনে বসেই প্রথমে তাঁর মন্ত্রীসভার অনুমোদন নিয়ে এক উপদেষ্টা মন্ডলী গঠন করলেন।

এলিজাবেথের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর প্রথম পদক্ষেপেই। তিনি উপদেষ্টা মন্ডলী গঠন করেছিলেন, সর্ববিষয়ে এদের উপদেশ ও মতামতও গ্রহণ করতেন। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত করতেন তিনি তাঁর নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধি ও চিন্তাকে। এরপর যে সিদ্ধান্ত তিনি নিতেন তা হত সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব।

এলিজাবেথের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উইলিয়ম সেসিল। দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি এই পদে থেকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে রানীর সেবা করে গেছেন। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এক ঐতিহাসিক বলেছিলেন, এমন এক রানীর উপযুক্ত কর্মচারী তিনি ছিলেন, যাঁর ডান হাত কি করছে তা কখনোই বাম হাত জানতে পেত না।

বলাই বাহুল্য, রানী এলিজাবেথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই মন্তব্যের মধ্যেই বিধৃত।

রাজ্যের অর্থসংকট দূর করবার জন্য এলিজাবেথ প্রচন্ডভাবে ব্যয় সংকোচ করে এবং ব্যাপক হারে কর বসিয়ে কয়েক বছরের মধ্যেই দেশকে ঋণমুক্ত করলেন।

রানী প্রথম এলিজাবেথ আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঐতিহাসিকরা অনেকেই এমন অভিযোগ তুলেছেন। এই অভিযোগ যে একেবারেই অমূলক তা নয়।

তৎকালীন ইংলন্ডের অভ্যন্তরীন রাজনীতি ও বৈদেশিক নীতিকে অনেকাংশেই জটিল করে তুলেছিল এলিজাবেথের ব্যক্তিগত জীবনচর্যা। যুবসম্প্রদায়ের ভালবাসার প্রতি তিনি লালায়িত ছিলেন। তাঁর মোহিনী রূপে মোহিত হয়েছেন অনেকেই। বলা হয়ে থাকে এসেক্স-এর সঙ্গেই তাঁর প্রেম সবচেয়ে গভীরতা লাভ করেছিল।

এলিজাবেথ ব্যক্তিগত জীবনে পছন্দ করতেন জাঁকজমক, আড়ম্বর এবং বিলাসিতা। রাজকীয় কোন অনুষ্ঠান বা শোভাযাত্রা তাঁর সময়ে এমন বর্ণাঢ্য ও জলুসপূর্ণ হত যে জনসাধারণের চোখে ধাঁধা লেগে যেত। তিনি স্বয়ং এসবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এর ফলে জনসাধারণের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন উৎসাহ ও প্রেরণার প্রতিমূর্তি।

ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এলিজাবেথ নিজে ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট। কিন্তু ধর্মীয় মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে তিনি প্রশয় দিতেন না। তিনি জানতেন যে তাঁর দেশে বিদ্রোহ ও রাজদ্রোহের বীজ বপন করবার জন্য একদল বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচারকদের স্পেন থেকে পাঠানো হয়েছিল। এই ক্যাথলিক ধর্ম সংস্কারকদের প্রভাবে ইংলন্ডের জনজীবনের ধমনীতে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এলিজাবেথ ক্যাথলিকদের ওপর নির্যাতন না করে পারলেন না। অবশ্য তাঁর নিজের হাতে তৈরি চার্চ অব ইংলন্ড তৈরি হবার পরেই কোন কোন ঐতিহাসিক এমন মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন।

আবার একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে, ইংরাজ শাসকদের মধ্যে একমাত্র এলিজাবেথই বুঝতে পেরেছিলেন যে ধর্মীয় নির্যাতনের অভিযোগ শাসন ব্যবস্থার ওপর বিরাট কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দেবে। সেকারণেই কেবলমাত্র ধর্মীয় মত পার্থক্যের দরুন কোন মানুষকে হত্যা করার চেষ্টাকে তিনি অপরাধ হিসেবেই গণ্য করতেন।

এটা ঠিক যে ক্যাথলিকদের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও এলিজাবেথ কখনো তা বাইরে প্রকাশ করতেন না যাতে তাঁকে বৃহৎ সংখ্যক প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরাগভাজন করে তোলে।

১৫৬৮ খ্রিঃ লংসাইড-এর যুদ্ধে পরাজিত হবার পর স্কটল্যান্ডের রানী মেরী সীমান্ত পার হয়ে ইংলন্ডে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিলেন। এলিজাবেথ তাঁর সৎবোনের এই প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন কারাগারে।

সৎবোন মেরী এলিজাবেথের প্রিয়পাত্রী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর কারাবাসের প্রধান করণ ছিল তাঁর ধর্মবিশ্বাস। একজন ক্যাথলিককে আশ্রয় দিয়ে তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট ইংলন্ডের বিরাগ ভাজন হতে চাননি। মেরীকে দীর্ঘ আঠারো বছর কাটাতে হয়েছিল বিভিন্ন দুর্গে স্থান পরিবর্তন করে।

এলিজাবেথের স্বর্ণময় রাজত্বের গৌরবময় দিন হিসেবে গণ্য করা হয় ১৫৮৮ খ্রিঃ ১৭ই নভেম্বর তারিখটিকে। এই দিন তিনি তাঁর প্রিয় স্বদেশভূমি ইংলন্ডকে চরম বিপর্যয় ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

নেদারল্যান্ডস এবং আমেরিকায় স্প্যানিশ জাহাজের ওপর ইংরাজ অভিযানকারীরা অত্যাচার করা ছাড়াও নানাভাবে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছে এই অভিযোগ পেয়ে স্পেনের রাজা ফিলিপ শত্রুপক্ষকে জব্দ করবার জন্য তার রণতরীর বহর পাঠিয়ে দিলেন।

স্প্যানিশ আর্মাডার আক্রমণের পরিণতির আশঙ্কা করে এলিজাবেথকেও লন্ডন ত্যাগ করে চলে যেতে বলা হল। অনেকেই সেদিন এই শঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠলো যে এই সুযোগে দেশের অভ্যন্তরে ক্যাথলিকরাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

এলিজাবেথ কিন্তু মনোবল হারালেন না। তিনি দুর্জয় মনোবল নিয়ে টিলাবেরিতে এক সমাবেশে সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে একজায়গায় বললেন, 'আমার প্রিয় এবং বিশ্বস্ত দেশবাসীর প্রতি যেদিন আমার মনে একতিল সন্দেহ বা অবিশ্বাস দেখা দেবে, এমন দিনে একমুহূর্তের জন্যও আমি প্রাণ ধারণ করতে চাই না। আমি জানি আমি একজন নারী। শরীরগত কারণেই আমি ক্ষীণ ও দুর্বল। কিন্তু তাই বলে দেশের প্রতি ভালবাসা কোন পুরুষের চাইতে আমার কম নয়। আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছে যে পারমা, স্পেন কিংবা ইউরোপের কোন যুবরাজ আমাব রাজ্যের সীমান্ত লঙ্ঘনের চেষ্টা করবে।''

এলিজাবেথের বক্তব্যের অন্তর্গত উদ্দেশ্য সৈনিকদের অন্তর স্পর্শ কবল। তারা মিলিত কণ্ঠে রানীর বক্তব্যের সমর্থনে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

ভাগ্যের এমনই বিচিত্র যোগাযোগ যে ঠিক সেই সময়েই একজন দূত এসে রানীকে জানাল যে ঈশ্বরের সহায়তায় ইংরাজরা স্পেনীয় আর্মাডাদের হটিয়ে দিয়েছে।

এলিজাবেথের গৌরবময় রাজত্বের সোনালী অধ্যায়ের চূড়ান্ত বিকাশ এখানেই শেষ হল, শৌর্য, মহত্ত্ব ও কূট বুদ্ধিকৌশলের বলে চরম বিপর্যয় ও ধ্বংসের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধানে আবার অহংকারী ও তেজী এই মহিলাই ধীরে ধীরে একদিন হারিয়ে গেলেন দেশবাসীর অন্তর থেকে। প্রজ্বলন্ত অহংকারই হয়েছিল তাঁর পতনের কারণ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রেমের অন্তহীন বুভুক্ষা। সুদর্শন তরুণ ও স্বেচ্ছাচারী নাইট এসেক্স-এর হৃদয়হীন ব্যবহারই এলিজাবেথকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধস্ত করে দিয়েছিল।

শেষপর্যন্ত এসেক্সকে প্রাণ দিতে হয়েছিল ফাঁসিকাঠে ১৬০১ খ্রিঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী। আর সেই সঙ্গে এলিজাবেথেরও বেঁচে থাকার অহংকার ও প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হল।

এরপর আর মাত্র বছর দুই বেঁচেছিলেন এলিজাবেথ। টিউডর বংশের রাজসিংহাসন শূন্য করে ইংলন্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

চিরকুমারী এলিজাবেথ কেন বিবাহ করেননি তার কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের গবেষণার অন্ত নেই। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তাঁর গুরুতর কোন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ছিল।

প্রকৃত সত্য যাই হোক না কেন, তিনি যে তাঁর স্বদেশ ইংলন্ডকে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়



পশ্চিমবঙ্গের এক মফস্বল অঞ্চলের এক মহিলা দীর্ঘদিন থেকে মাথার যন্ত্রণায় ভুগছেন। দেশের নামী দামী বহু চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থা অনুযায়ী ওষুধপত্র খেয়েছেন, টোটকা চিকিৎসাও করিয়েছেন কম না, কিন্তু কিছুতেই মাথার যন্ত্রণা কমেনি। দীর্ঘদিন থেকে ভুগে ভুগে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন মহিলা—এ রোগ বুঝি আর সারল না।

কিন্তু সর্বশেষ চেষ্টা হিসাবে ভদ্রমহিলার স্বামী তাঁকে নিয়ে এলেন কলকাতায় এক চিকিৎসকের কাছে। দেশজোড়া নামডাক সেই চিকিৎসকের। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী বলে পরিচিত তিনি। একমাত্র এই চিকিৎসককেই রুগী দেখানো বাকি ছিল।

প্রতিদিন সকালের দিকে কিছু সময় বিনা পারিশ্রমিকে রুগী দেখতেন সেই চিকিৎসক। নিজের বাসভবনেরই একটি ঘরে তিনি বসতেন। ঘরের প্রান্তে তাঁর বসার চেয়ার। দরজা দিয়ে ঢুকে রুগীকে হেঁটে ডাক্তারবাবুর সামনে গিয়ে বসতে হয়।

ঘরে ঢোকা আর হেঁটে গিয়ে আসনে বসার সময়ের মধ্যে ডাক্তারবাবু তাঁর রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে রোগনির্ণয় করে নিতেন। এমনই ছিল তাঁর দক্ষতা। প্রায় সময়ই রুগীকে মুখ ফুটে তার রোগের কষ্টের কথা বলতে হত না। ডাক্তারবাবু রুগীর দেহের লক্ষণ, চলাফেরা ও চেহারা দেখেই রোগ নির্ণয় করে ফেলতেন এবং রুগীকে তার রোগ উপসর্গের কথা শুনিয়ে দিতেন। পরে সেই মত ব্যবস্থাপত্র লিখে দিতেন।

প্রতিদিনই শহরের এবং বহু দূর দূর অঞ্চল থেকে বহু দুরারোগ্য রোগে অসুস্থ মানুষ ভিড় করত ডাক্তারবাবুর বাসভবনে। সেই মহিলাকেও তাঁর স্বামী নিয়ে

এলেন একদিন। তিনি যথাসময়ে ঘরে ঢুকে ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ডাক্তারবাবুর সামনের আসনে বসলেন।

এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহিলাকে লক্ষ করছিলেন ডাক্তারবাবু। মহিলা আসন নিতেই তিনি মৃদু হেসে বললেন, চব্বিশঘণ্টা মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। আলোর দিকে তাকাতেও কষ্ট হয়?

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে ভদ্রমহিলার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের রেখায় আশ্চর্য একটা আরামের হাসি যেন ছোঁয়া দিয়ে গেল। তিনি বিহ্বলভাবে আরো কিছু কষ্টের কথা সকাতরে ডাক্তারবাবুকে জানালেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, কোন ওষুধপত্রের দরকার হবে না, এখন থেকে যেই সিঁদুরটা আপনি ব্যবহার করেন সেটা আর করবেন না। বাজারের ভাল কোন সিঁদুর ব্যবহার করবেন। কিছুদিন দেখুন, এরপর আমাকে জানাবেন।

বলাবাহুল্য দূষিত সিঁদুরের বিক্রিয়া থেকেই সেই মহিলা স্থায়ী মাথাযন্ত্রণার শিকার হয়েছিলেন এবং ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মত সিঁদুরের ব্র্যান্ড বদল করবার পর থেকেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

এই ধন্বন্তরী চিকিৎসকটির নাম ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। যিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কর্মকৃতিত্বের জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

দীর্ঘ শালপ্রাংশু চেহারার এই মানুষটি তাঁর সময়ে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রূপে দেশে বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর আর এক পরিচয় তিনি ছিলেন আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার। স্বাধীনতা লাভের পর তাঁর চেষ্টাতেই পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্নমুখী উন্নয়নের সূত্রপাত হয় এবং বলাচলে তাঁরই পরিকল্পিত পথ ধরেই পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি এখনো অব্যাহত রয়েছে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিবারের আদি নিবাস ছিল চব্বিশ পরগনা জেলার টাকী শ্রীপুরে। তাঁর জন্ম পিতার কর্মস্থল বিহারের পাটনা শহরের বাঁকিপুরে ১৮৮২ খ্রিঃ ১লা জুলাই। তাঁর পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মাতার নাম অঘোরকামিনী দেবী।

১৯০১ খ্রিঃ বি.এ পাশ করবার পর বিধানচন্দ্র কলকাতায় চলে আসেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করবার জন্য তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৯০৬ খ্রিঃ এল.এম. এস এবং ১৯০৮ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি উপাধি লাভ করেন।

এরপর প্রাদেশিক মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিয়ে চিকিৎসক হিসেবে বিভিন্ন প্রদেশে ঘোরেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিধানচন্দ্র ১৯০৯ খ্রিঃ বিলাত যাত্রা করেন।

সেইকালে দেশে সুচিকিৎসার অভাবে বহু মানুষ নানাবিধ দুরারোগ্য রোগে ভুগে প্রাণ হারাত। দেশে শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসকদেরই দাপট। কিন্তু কজন আর তাদের কাছে পৌঁছতে পারে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রের এই দুরবস্থা বিধানচন্দ্রকে পীড়িত করত। তাই চিকিৎসাশাস্ত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বিলাত যাত্রা করেন ১৯০৯ খ্রিঃ। সেখানে দুই বছর থেকে এম. আর-সি.পি এবং এম.আর.সি.এস ও পরে এফ.আর.সি.এস উপাধি অর্জন করেন।

বর্তমানে যেটি নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ, সেকালে তার নাম ছিল ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল। বিলাত থেকে ফিরে এসে বিধানচন্দ্র এখানে চিকিৎসকরূপে যোগদান করেন। সেই সঙ্গে নিজেও চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সুচিকিৎসক রূপে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেই সঙ্গে দেশের সমাজ জীবনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ তৈরি হতে থাকে।

১৯১৬ খ্রিঃ বিধানচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। দুই বছর পরে ১৯১৮ খ্রিঃ তিনি ক্যাম্বেলের সরকারী চাকরি ছেড়ে দেন। যোগদান করেন কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে, মেডিসিনের অধ্যাপক পদে। বর্তমান আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজের নামই সেকালে ছিল কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ। এখানে কর্মরত অবস্থাতেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আন্দোলন সেই সময় উত্তাল হয়ে উঠেছে। মত বিরোধের প্রশ্নে দেশবন্ধু ততদিনে কংগ্রেসের বাইরে স্বরাজ্যদল প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মতিলাল নেহরু প্রমুখ দেশবিশ্রুত নেতৃবৃন্দ।

বাংলা তথা ভারতের অবিসংবাদিত জননেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাবে বিধানচন্দ্র রাজনীতিতে যোগ দেন ১৯২৩ খ্রিঃ। তাঁর স্বরাজ্য দলের হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধানচন্দ্র বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

এরপর ১৯২৮ খ্রিঃ কলকাতা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৩১-৩২ খ্রিঃ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হলেন।

বিধানচন্দ্র ছিলেন দেশপ্রেমিক, সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভীক। ১৯৩১ খ্রিঃ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি অকুতোভয়ে কলকাতা কর্পোরেশনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই সময়ে বোম্বাই থেকে কলকাতা ফেরার পথে ওয়ার্দা স্টেশনে বিধানচন্দ্র গ্রেপ্তার হন।

সকল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও চিকিৎসক হিসেবে দেশের জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে তিনি কখনো শৈথিল্য করেন নি। চিকিৎসক হিসেবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা তিনি একদিনের জন্যও বিস্মৃত হননি।

ফলে চিকিৎসক হিসেবে কেবল দেশেই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তিনি খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

১৯৩৫ খ্রিঃ বিধানচন্দ্র রয়্যাল সোসাইটি অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন এবং ১৯৪০ খ্রিঃ আমেরিকান সোসাইটি চেস্ট ফিজিসিয়ানের ফেলো নির্বাচিত হন।

১৯৩৭ খ্রিঃ তিনি বাংলার পার্লামেন্টারী কমিটির সভাপতি হন এবং কংগ্রেসের নির্বাচন পরিচালনা করেন। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এভাবে ক্রমশই বিধানচন্দ্রের প্রভাব ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৪২ খ্রিঃ বিধানচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এসসি. উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৪৭ খ্রিঃ বিধানচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরূপে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ খ্রিঃ ২৩শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এই পর্যায় থেকে বিধানচন্দ্রের কর্মময় নতুন জীবনের সূত্রপাত হয়। প্রখ্যাত চিকিৎসক ও রাজনীতিজ্ঞ বিধানচন্দ্র হলেন পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার—তাঁর গঠনমূলক কর্মধারা বহুবিচিত্রপথে বিকশিত হবার সুযোগ লাভ করল।

স্বাধীনতার পরে আদি বঙ্গদেশের এক তৃতীয়াংশ ভূমিভাগ নিয়ে গঠিত হয়েছিল ক্ষতবিক্ষত সমস্যা জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ। এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা ছিল বিধানচন্দ্রকে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল করে পাঠানো। তাঁর জন্যই এই পদটি নির্দিষ্ট হয়েছিল।

সেই সময়ে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও সত্যনিষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ। কিন্তু নানাবিধ চক্রান্তের শিকার হয়ে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদ ছাড়তে হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সেই শূন্য আসনে অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই বিধানচন্দ্র আসীন হলেন এবং আমৃত্যু এই গুরু দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

প্রথম থেকেই তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। বিধানচন্দ্রই প্রথম স্বাধীন ভারতকে এর প্রথম নির্বাচন কমিশনারকে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর নাম সুকুমার সেন।

শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপরই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। বিধানচন্দ্র তাই রাজ্যের এই দুই দিকে প্রথম থেকেই বিশেষভাবে নজর দিলেন।

শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটাবার জন্য তিনি নানাভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এই রাজ্যের চটকলগুলির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অর্থাৎ পাট আসত প্রধানতঃ পূর্ব বাংলা থেকে।

দেশবিভাগের ফলে পূর্ববাংলা হয়ে গেল ভিন্ন দেশ। ফলে রাজ্যের চটশিল্পে দেখা দিয়েছিল চরম সংকটজন অবস্থা।

এই অবস্থার মোকাবেলার জন্য বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে পাট চাষের বন্দোবস্ত করলেন।

এছাড়া বিধান নগর উপনগরী, কল্যাণী উপনগরী, রাষ্ট্রীয় পরিবহন, হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন কল্যাণী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বেন্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের বিভিন্ন প্রকল্প—এই সকল কিছু প্রতিষ্ঠার মূলেই ছিলেন কর্মবীর বিধানচন্দ্র রায়। এক কথায় বলা চলে স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গের রূপায়নে বিধান রায়ের গঠনমূলক প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সর্বতোভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন।

ব্যবসায়ী হিসেবেও বিধান রায় তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। শিলং হাইড্রো ইলেকট্রিক কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন তিনি। জাহাজ, বিমান ও ইন্সিওরেন্স ব্যবসায়ের সঙ্গে যোগ ছিল তাঁর।

১৯৪৮ খ্রিঃ থেকে ১৯৬২ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ চোদ্দ বছর একটানা বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন। ১৯৬১ খ্রিঃ ভারত সরকার তাঁকে ভারতরত্ন উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে।

১৯৬২ খ্রিঃ ১লা জুলাই কর্মরত অবস্থাতেই কলকাতার রাজভবনে আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার কর্মবীর ও দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মার্কো পোলো



বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় পর্যটক। ১২৫৪ খ্রিঃ ভেনিস শহরে জন্ম। তাঁর পিতা নিকোলো পোলো ভেনিসের একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। পিতা ও কাকার সঙ্গে মার্কো পোলো ১২৭১ খ্রিঃ মাত্র সতেরো বছর বয়সে পোপ দশম গ্রেগরীর দূতরূপে চীন দেশে আসেন।

দেশ থেকে যাত্রা করে আর্মেনিয়া, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়ার মালভূমি, তুর্কীস্তান, গোবি মরুভূমি প্রভৃতি পার হয়ে চীনদেশে পৌঁছতে তাঁদের দীর্ঘ চার বছর সময় লেগেছিল। তৎকালীন চীন সম্রাট কুবলাইখান তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানান। দীর্ঘ সতেরো বছর ১৩১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত চীন সম্রাটের অধীনে কাজ করেছিলেন।

ইউরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে মার্কো পোলোই সর্বপ্রথম ভ্রমণকাহিনী লেখেন বলে জানা যায়।

মার্কো পোলোর লিখিত বিবরণ থেকে সমসাময়িক কালের ভারতবর্ষ, চীনদেশ

ও এশিয়ার অনেক দেশ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ১৩২৪ খ্রিঃ মার্কো পোলোর মৃত্যু হয়।

পর্যটক পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত ঃ

১২৭১ খ্রিঃ মাঝামাঝি বাবা নিকোলো পোলো আর কাকা মেফিয়ো পোলোর সঙ্গে আর্মেনিয়ার লায়াস বন্দর থেকে মার্কো পোলোর স্থলযাত্রা শুরু।

পোলোরা শুনেছিলেন এশিয়া নামে একটি বড় দেশ আছে। সে দেশের রাস্তাঘাট নাকি সোনা দিয়ে মোড়া। আর সেই দেশের একচ্ছত্র অধিপতি সম্রাট কুবলাই খান। তাঁর প্রাসাদ নাকি স্বর্গরাজ্যকেও হার মানায়।

এই জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে বাবা ও কাকার সঙ্গে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন মার্কো। তাঁদেরই এক বন্ধু কুল্লাউ হন তাঁদের পথপ্রদর্শক।

ক্রমে তাঁরা কোগানি, কাইসারা, সারাস্তা, আরজিনগন পার হয়ে কুর্দস্থানে এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে জর্জিয়ায়। এখানেই তাঁরা রক্তপায়ী অ্যাভিগি শকুন দেখতে পান। এই অতিকায় পাখিগুলো ঘোড়া গাধা অবলীলাক্রমে থাবায় আঁকড়ে তুলে নিয়ে যায়।

জর্জিয়া থেকে যাত্রা শুরু হয় পারস্যের দিকে। বাগদাদের বসরা বাণিজ্যকেন্দ্রে পৌঁছে মার্কোরা কুবলাই খানকে উপহার দেওয়ার জন্য দুটি বহুমূল্য মুক্তোর মালা কিনলেন।

বসরা থেকে পারস্য উপসাগর অতিক্রম করে কেরম্যান শহরে যাবার পথে একদল দস্যুর হাতে পড়লেন তাঁরা। অনেক কিছুই হারাতে হলো। তবে ভাগ্যক্রমে মুক্তোর মালা দুটি বেঁচে গেল।

পারস্য উপসাগরের ভেতর দিয়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করে তাঁরা উপস্থিত হলেন আর্মজ প্রণালীর বন্দর আবাসে। এখান থেকে পশ্চিম তাতার প্রদেশের শাসনকর্তার কাছে সম্রাটের সনদ দেখিয়ে তাঁরা একশ রক্ষীর সাহায্য পেলেন। দীর্ঘ মরুপথে এই রক্ষীরাই তাঁদের রক্ষা করবে।

কয়েকটি উট কিনে নিয়ে দীর্ঘ মরুপথ পায়ে হেঁটে পার হয়ে বাম শহরের পথে তাঁরা আবার পড়লেন ডাকাতের হাতে। বেশ কিছু জিনিসপত্রের সঙ্গে কুল্লাউ সহ পাঁচ জন সঙ্গীকে ধরে নিয়ে গেল ডাকাতরা।

এগিয়ে চলার বিরাম নেই তবু মার্কোদের। ক্রমে ক্রমে পেছনে ফেলে এলেন কোহিস্তানের পর্বতমালা, কাশগড় ইয়ারখন্দ, খেটান, পিয়েন, কারাকোরাম, কিউনলুন। এরপর দীর্ঘ এক মাসে পাড়ি দিলেন বিপজ্জনক তাকলামাকান মরুভূমি। এসে পৌঁছলেন টাঙ্গুর হামি শহরে। তারপর কান সু, সু-চৌ পার হয়ে পৌঁছলেন কান-চৌ শহরে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে চীনের বিখ্যাত প্রাচীর। মহামান্য কুবলাই খানের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এখান থেকেই। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার জন্য এখানে কয়েকদিন ব্যয় হল সম্রাটের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে। তারপর তাঁরা যাত্রা করলেন অভীপ্সিত পথের দিকে।

মাঝ পথেই সম্রাটের লোকেরা সাড়ম্বরে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল।

রাজপ্রাসাদের তোরণ অতিক্রম করতেই মার্কোরা দেখতে পেলেন তোরণের দুইধারে অজস্র সান্ত্রী পরিবেষ্টিত স্বয়ং সম্রাট কুবলাই খান অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন মার্কোদের। তাদের মনে হল, এত আনন্দ, এত অভ্যর্থনা, এত সম্মান তাঁরা জীবনে আর কোথাও পাননি। তাঁরা যেন এক রূপকথার রাজ্যে এসে পৌঁচেছেন।

মার্কো কুবলাই খান-এর দরবারে একটা সামান্য চাকুরি পেয়ে গেলেন। তারপর দেখতে দেখতে কুড়ি বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে মার্কো রাজদরবারের কর্মচারীদের মধ্যে সবার প্রিয় হয়ে উঠেছেন। স্বভাবের নম্রতায়, আলাপের মাধুর্যে এবং বুদ্ধির চাতুর্যে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। সম্রাট কুবলাই খান-এর দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠলেন মার্কো। মার্কোর বুদ্ধি পরামর্শ ছাড়া সম্রাটের একমুহূর্ত চলে না—কি রাজদরবারে কি অন্দর মহলে। কিন্তু মার্কোর এই একচ্ছত্র প্রতাপে রাজদরবারের বেশকিছু কর্মচারী অসন্তুষ্ট হলেন। তারা মার্কোকে হিংসা করতে শুরু করলেন। ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব দেখা দিল তাদের মধ্যে। অচিরেই তারা মার্কোর চরম শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন তাউলুং। তাউলুং মার্কোকে অপদস্থ করবার চক্রান্ত করেও শেষ পর্যন্ত কিছু করে উঠতে পারলেন না। মার্কোর তেজস্বিতা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং বুদ্ধির চাতুর্যে তাউলুং সহজেই পরাজিত হলেন এবং ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দেশ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। তাউলুং দেশত্যাগী হয়েও মার্কোর প্রতি প্রতিশোধ নিতে ভুললেন না। তিনি নানারকম ফন্দিফিকির খুঁজতে লাগলেন।

মার্কো সেই সময় কিয়াংনান প্রদেশের গভর্নর। মূল ঘাঁটি থেকে এই প্রদেশটি দীর্ঘ ছয় মাসের পথ। ফলে এতদূর থেকে এই প্রদেশের শাসনকার্য চালানো খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। তাছাড়া একজন বিদেশীর শাসনকার্য পরিচালনা কিয়াংনান প্রদেশের প্রজারা মেনে নিলেও পাশের দেশ চেয়ানবেনের রাজা তা মেনে নিতে পারলেন না। ফলে তিনি তাউলুং-এর প্ররোচনায় কিয়াংনান আক্রমণ করে বসলেন।

তাউলুং চেয়ানবেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একদল সৈন্য নিয়ে গুপ্তপথে অগ্রসর হতে লাগলেন মার্কোর শিবিরের দিকে।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তাউলুং একজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠালেন মার্কোর গোপন আস্তানা খুঁজে বের করবার জন্য। সেই লোকটি আর কেউ নয়, কেরম্যানের পথে দস্যু কর্তৃক অপহৃত কুল্লাউ। অপহরণ করে দস্যুরা প্রথমে তাকে দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেয়। সেখান থেকে কোকনর এবং কোকনর থেকে হাতবদল হয়ে চেয়ানবেনের শাসনকর্তার সৈন্যবিভাগে স্থান পায় কুল্লাউ। কিন্তু কুল্লাউ-এর মনে ছিল মার্কোর প্রতি অপরিসীম স্নেহ ও ভালবাসা। তাই যখন তাউলুং তাকে গুপ্তচর করে মার্কোর শিবিরের সন্ধানে পাঠালেন, তখন কুল্লাউ মনের আনন্দে মার্কোর কাছে গিয়ে খুলে বললেন তাউলুং-এর উদ্দেশ্য; সন্ধান দিলেন গোপন পথের।

মার্কো অবিলম্বে শত্রুমুক্ত হলেন। কিন্তু এবারে দীর্ঘদিন পর দেশের জন্য তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠল। নিকলো এবং মেফিয়ো দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকায় দেশে ফিরবার জন্য তাঁরাও অনেক দিন থেকে উন্মুখ হয়ে ছিলেন। কিন্তু কুবলাইখান কিছুতেই মার্কোদের ছাড়তে রাজি হন না।

সম্রাটের দূরসম্পর্কীয় এক ভাইপো ছিলেন পারস্যে। তার নাম অরগন খাঁ। তাঁর পত্নী বলগান খাতুন চেঙ্গিজ খান-এর পুত্র জজাতির কন্যা। তিনি হঠাৎ ১২৭৭ খ্রিঃ পরলোক গমন করলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি অরগন খাঁকে এই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর নিকট আত্মীয়া ছাড়া আর কেউ রাজমহীষীর স্থান দখল করতে পারবে না এবং সেই পত্নী নির্বাচন করবে তাতার সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি কুবলাইখান। বলগান খাতুনের মৃত্যুর পর অরগন খাঁ তাঁর এই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্য কুবলাই খান-এর কাছে তিনজন রাজকর্মচারীকে পাঠালেন। কুবলাই খান নির্বাচন করলেন কোগতিন নামে ষোল বছরের এক তরুণীকে। কিন্তু পাঠাবেন কার সঙ্গে? তখন ট্রান্স অক্সিয়ানার একটি ছোট প্রদেশে জজাতির এক বংশধরের সঙ্গে কুবলাই খান-এর এক ভাই-এর তুমুল যুদ্ধ চলেছে। তাই তিনি ওই পথে অরগন খাঁ-এর তিনজন মাত্র কর্মচারীব সঙ্গে কোগাতিনকে ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত মনে করলেন না।

কুবলাই খান মার্কোদের হাতে কোগাতিনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং সর্ত রইল কোগাতিনকে পারস্যে পৌঁছে দিয়ে দেশের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে যত শীঘ্র সম্ভব মার্কোরা আবার ফিরে আসবেন এদেশে।

কুবলাই খান-এর এই শর্ত মার্কোরা সহজ ভাবেই মেনে নিলেন। ১২৮৯ খ্রিঃ মাঝামাঝি কোন এক সময়ে হীরে-জহরৎ মণি-মুক্তো এবং দানসামগ্রী বোঝাই জাহাজে উঠলেন কোগাতিন ও মার্কোরা। সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে চোদ্দটি জাহাজ ভাসল অকূল দরিয়ায় আর এক মহাদেশের উদ্দেশ্যে।

একটানা চার বছর ক্রমাগত ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চললেন তারা। একে একে যবদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা পেরিয়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে দিয়ে আন্দামান ও সিংহল দ্বীপ হয়ে যখন তাঁরা সোজা পারস্য উপসাগরের মধ্যে হরমোজের বিখ্যাত বন্দরে এসে পৌঁছলেন ততদিনে তাঁদের অনেক লোক মারা গিয়েছে। মারা গিয়েছে অরগন খাঁ-এর বিশিষ্ট দুজন কর্মচারীও। অরগন খাঁ নিজেও তখন পরলোকে। কুমার গাজান-এর সঙ্গে কোগাতিনের বিয়ে দিয়ে মার্কোরা দায়ভার থেকে মুক্ত হলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের কাছে পৌঁছল এক দুঃসংবাদ। তাতার সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি সম্রাট কুবলাইখান পরলোক গমন করেছেন।

তারপর একদিন দীর্ঘ বাইশ বছর পর মার্কোরা জাহাজ ভাসিয়ে ফিরে চললেন দেশে।

ইন্দিরা গান্ধী



ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ১৯১৭ খ্রিঃ ১৯ নভেম্বর উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দিরা ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর স্ত্রী কমলা নেহরুর একমাত্র কন্যা। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতন, জেনেভা এবং অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন।

জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ পারিবারিক পরিবেশে লালিত হয়ে এবং পিতা জওহরলালের উৎসাহে বাল্যবয়স থেকে ইন্দিরার মনে স্বদেশ প্রীতির বীজ রোপিত হয়। ১২ বছর বয়সে ১৯৩০ খ্রিঃ তিনি 'চরকা সংঘ' গঠন করেন। পরে প্রায় ৬০০০ ছেলেমেয়ে নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের কিশোর বাহিনী 'বানর সেনা' সৃষ্টি করেন।

১৯৩৮ খ্রিঃ ইন্দিরা কংগ্রেসের সদস্য হন। ফিরোজ গান্ধীর সঙ্গে বিবাহ হয় ১৯৪২ খ্রিঃ। বিবাহের কিছুদিন পরে 'অন্তর্ঘাতমূলক' কাজ করার অভিযোগে তিনি ১৩ মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৫৫ খ্রিঃ ইন্দিরা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্যা এবং ১৯৫৯-৬০ খ্রিঃ জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হন।

১৯৬৪ খ্রিঃ তিনি রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। জওহরলালের মৃত্যুর পরে লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৬৪-৬৬ খ্রিঃ শাস্ত্রীজির মন্ত্রিসভায় তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী হন ইন্দিরা।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পরে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিকাংশ সদস্যের ইচ্ছায় তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন।

১৯৬৯ খ্রিঃ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। তিনি দলীয় প্রার্থী নীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে সমর্থন না করে দলীয় সদস্যদের বিবেক-অনুযায়ী নির্দল প্রার্থী ভি. ভি. গিরিকে ভোট দিতে অনুরোধ করেন।

প্রধানত তাঁরই আগ্রহ এবং চেষ্টায় ভি. ভি. গিরি জয়যুক্ত হন। এই ঘটনা এবং মোরারজী দেশাইয়ের অর্থ দপ্তর স্বয়ং গ্রহণ এবং দেশাইয়ের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগকে কেন্দ্র করে জাতীয় কংগ্রেস সংগঠন কংগ্রেস বা আদি কংগ্রেস এবং নব কংগ্রেস—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

শ্রীমতী গান্ধী নব কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৭১ খ্রিঃ লোকসভা নির্বাচনে দলকে জয়ী করতে সমর্থ হন।

রাসবিহারী বসু



ইংরাজ রাজত্বের দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সম্পর্কে লিখেছিলেন। "...... Expert in make up. Rashbehari Bose could dress up himself either as a Punjabi or as an old Maharastrian in such a perfect manner that it was impossible to suspect him as one in disguise.

He would have been a great stage actor instead of a revolutionary if he so desired."

একজন বিচিত্রকর্মা উদ্যমী বিপ্লবীর পক্ষে বিভিন্ন ছদ্মবেশের আড়ালে নিজেকে গোপন করার দক্ষতা নিঃসন্দেহে তাঁর কর্মকুশলতার প্রমাণ।

বস্তুতঃ রাসবিহারী ছিলেন বিপ্লবীর বিপ্লবী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

পরাধীন জাতির স্বাধীনতা ব্যতিরেকে অপর কোন ধর্ম থাকতে পারে না, স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী পরাধীন ভারতের তরুণ সমাজকে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা জাগিয়েছিল। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে তাঁরা দলে দলে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

রাসবিহারীর জন্ম ১৮৮৬ খ্রিঃ ২৫শে মে। তাঁর পিতার নাম বিনোদবিহারী বসু। রাসবিহারীদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে। তাঁর পিতামহ

কালীচরণ বসু সেকালের একজন বিখ্যাত লাঠিয়াল ছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও শিক্ষায় অল্পবয়সেই রাসবিহারী ব্যায়ামপুষ্ট সুগঠিত দেহের অধিকারী হয়েছিলেন।

বিনোদবিহারী কার্যোপলক্ষে সিমলায় বাস করতেন। তিনি চন্দননগরে ফটকগোড়ায় একটি বাড়ি ক্রয় করে পাকাপাকিভাবে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। এই সময় তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছিলেন।

সুবলদহ গ্রাম ছেড়ে আসার পরে চন্দননগরে ডুপ্লে কলেজে রাসবিহারীর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। বর্তমানে এই কলেজের নাম কানাইলাল বিদ্যামন্দির।

ছাত্র হিসাবে রাসবিহারী ছিলেন মেধাবী। পড়াশোনায় তাঁর ছিল গভীর নিষ্ঠা।

একদিন ইতিহাস ক্লাশে শিক্ষকমশায়ের পড়ানো শুনে রাসবিহারীর মন তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। ইতিহাসের শিক্ষক বলেছিলেন, মাত্র চোদ্দজন ঘোড়সওয়ার এসে গৌড়রাজের রাজধানী অধিকার করে নিয়েছিল।

রাসবিহারী দাঁড়িয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ ইতিহাসের এই বিকৃতির প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, একটি সুরক্ষিত রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ মাত্র চোদ্দজন ঘোড়-সওয়ারের পক্ষে কখনওই অধিকার করে নেওয়া সম্ভব নয়। এ তথ্য অসত্য —বিকৃত।

এই প্রতিবাদের জন্য রাসবিহারীকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। বিরক্ত হয়ে রাসবিহারী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন। চন্দননগরে থাকা কালেই তিনি প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা চারু রায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতা।

রাসবিহারীকে কলকাতায় নিয়ে এসে মর্টন কলেজে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়।

এখানে পড়াশোনা করবার সময়েই একদিন এক অদ্ভুত কান্ড করে বসেন তিনি। সেইকালে বাঙালীদের সেনাবাহিনীতে নেওয়া হত না। যুদ্ধবিদ্যা শিখবেন বলে রাসবিহারী অভিভাবকদের অনুমতি না নিয়েই গিয়েছিলেন সৈন্যবিভাগে ভর্তি হতে। তাঁর স্বপ্ন ছিল শিবাজীর মত সৈন্যদল গঠন করে ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করবেন।

সৈন্যবিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য তিনি নিজেকে অবাঙ্গালী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। ধরা পড়ে গিয়ে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল তাঁকে।

এরপর পিতা বিনোদবিহারী পুত্রকে নিজের কর্মস্থল সিমলায় নিয়ে যান। কিন্তু রাসবিহারী আর পড়াশুনা করতে রাজি হলেন না। বিনোদবিহারী তাঁকে সিমলার সরকারী প্রেসে কপি হোল্ডারের কাজে ঢুকিয়ে দেন।

এখানে কাজ করবার সময় রাসবিহারী ইংরাজি ভাষা ও সেই সঙ্গে টাইপরাইটিং ও শর্টহ্যান্ড শিক্ষা করেন।

এই সময় কিছু সরকারী গোপন নথিপত্র প্রেসে ছাপা হচ্ছিল। রাসবিহারী সেই

গোপন তথ্যের কিছু অংশ স্থানীয় একটি ইংরাজী সংবাদপত্রের দপ্তরে পাচার করে দেন।

সরকারী গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সরকারী মহলে খুব হৈচৈ শুরু হল। বিনোদবিহারী তাঁর পুত্রকে বিলক্ষণ জানতেন। তিনি প্রেসের কাজ থেকে রাসবিহারীকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন।

অল্প কিছুদিন পরেই নিজের উদ্যোগে দেরাদুনের বনবিভাগে একটি চাকরি জোগাড় করে নিলেন রাসবিহারী।

এই কাজ পাওয়ার পর থেকেই বিপ্লবী রাসবিহারীর সত্তা জেগে উঠল। তিনি উত্তর ভারতে বিপ্লবী সংগঠন করার কাজে মনোযোগ দিলেন।

এই সময়ে বাল্যবন্ধু ও বিশিষ্ট বিপ্লবকর্মী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়ের মাধ্যমে মহাবিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বাঘা যতীন সেই সময় বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁর পরামর্শক্রমে রাসবিহারী উত্তরভারতে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব নিলেন।

ইতিমধ্যে চাকরিতে পদোন্নতি হয়েছে। সেই সঙ্গে চন্দননগরে চারু রায়ের বিপ্লবী সমিতি সুহৃদ সম্মেলনেও যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়েছে। একবার দেরাদুনে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন যুবক বসন্ত বিশ্বাসকে।

বোমা তৈরিতে দক্ষ বসন্তকে তিনি নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনার জন্য গোপনে প্রস্তুত করে তুলতে লাগলেন।

রাসবিহারীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই কাশীর শচীন সান্যাল, পাঞ্জাবের গদর পার্টির নেতা হরদয়াল, মারাঠী যুবক বিষ্ণু গণেশ পিংলে প্রভৃতি বিপ্লবী নেতার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। তাঁরা সকলেই রাসবিহারীকে উত্তর ভারতের নেতৃপদে স্বীকার করে নিলেন। তাঁরা তাঁর নির্দেশ মতই কাজ করে চললেন।

পিংলের তত্ত্বাবধানে অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে লাহোর অমৃতসর, মিরাট, দিল্লী, বোম্বাই (মুম্বই) এবং মাদ্রাজে (চেন্নাই) বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপিত হল এবং সর্বত্র রাসবিহারীর নেতৃত্ব স্বীকৃত হল।

রাসবিহারীর বিচক্ষণতায় পুলিসের গোয়েন্দা বাহিনীর অনুরূপ গুপ্তচর বাহিনী বিপ্লবী দলেও সৃষ্টি হল। তিনি সরকারী কর্মচারীদের সহায়তায় পুলিস বিভাগেও নিজস্ব গুপ্তচর নিয়োগ করতে সক্ষম হলেন।

এযাবৎকাল কলকাতা ছিল সমগ্র ভারতের রাজধানী। ১৯১২ খ্রিঃ দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল।

এই উপলক্ষে ২৫শে ডিসেম্বর চাঁদনি চকের রাস্তা ধরে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লিতে প্রবেশ করবেন ঘোষণা করা হল।

রাসবিহারী পরিকল্পনা ছকে ফেললেন। হাতির পিঠে দিল্লিতে প্রবেশের মুখেই

হার্ডিঞ্জকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হবে। ইংরাজকে এভাবে একটি শক্ত আঘাত করে বুঝিয়ে দিতে হবে ভারতে তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

নির্দিষ্ট দিনে রাসবিহারী নীরবকর্মী আমীর চাঁদের সহায়তায় বসন্ত বিশ্বাসকে বোরখা পরিয়ে চাঁদনিচকে মেয়েদের দলে মিশিয়ে রাখলেন।

যথাসময়ে ভাইসরয়ের শোভাযাত্রায় বসন্তের ছোঁড়া বোমা ফাটল। হার্ডিঞ্জ বোমার আঘাতে আহত হলেন। ভিড়, হৈ-হট্টগোল, জনতার দৌড়াদৌড়ির মধ্যে বসন্ত ও রাসবিহারী সাবলীলভাবে গা-ঢাকা দিলেন।

রাসবিহারী নির্বিঘ্নে কর্মস্থল দেরাদুনে ফিরে গেলেন। তিনি ছিলেন সরকারী কর্মচারী এবং তাঁর চালচলন কথাবার্তা ছিল সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে।

সন্ত্রাসবাদীদের ধরবার জন্য ইতিমধ্যে ইংরাজ সরকার চারদিকে ধরপাকড় শুরু করেছে। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে গোয়েন্দার দল। তাদের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল চাঁদনিচকের বোমা বিস্ফোরণের নায়ক হল দেরাদুনের বনবিভাগের কর্মচারী রাসবিহারী বোস।

রাসবিহারী বিপদের আঁচ আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রাতারাতি লাহোরে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। আর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, পরের বারে যেন ইংরাজ সরকারকে জোর ধাক্কা দেওয়া যায়।

ইতিমধ্যে খবর এলো ১৯১৩ খ্রিঃ ১৭ মে লরেন্স গার্ডেনে ইংরাজ রাজপুরুষদের একটি জরুরী সভা বসবে।

এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না রাসবিহারী। ইংরাজ রাজপুরুষদের নির্মম অত্যাচারে সাধারণ মানুষ জর্জরিত। এবারে সব কজনকে একসঙ্গে খতম করার পরিকল্পনা নিতে হবে।

যথাসময়ে বসন্ত বিশ্বাসকে টাইম বোমা দিয়ে সার্কিট হাউসে পাঠিয়ে দিলেন। বসন্ত নিখুঁতভাবে রাস্তার ওপরে বোমা পেতে রাখল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অসময়েই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়ে সাইকেল আরোহী এক দারোয়ান মারা গেল। বসন্ত পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেও পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়।

পুলিশ এবারে আরো তৎপর হয়ে উঠল। তারা মরিয়া হয়ে রাসবিহারীকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। সারাদেশে রাসবিহারীর নামে পোস্টার ছড়িয়ে দেওয়া হল। যে কেউ এই রাজদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেবে কিংবা তাঁর অবস্থানের সংবাদ দিতে পারবে তাকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

আত্মগোপন করে থাকলেও রাসবিহারী নিপুণ ছদ্মবেশের আড়াল নিয়ে নির্ভয়ে জনতার মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন। নানা সময়ে নানা বেশ নিতেন তিনি।

ইংরাজি বা বাংলা ছাড়াও হিন্দি, গুরুমুখী, মারাঠি, গুজরাতি ও উর্দু ভাষায় চোস্ত ছিলেন তিনি। ফলে বেশ পাল্টে পুলিসের চোখে ধুলো দিতে তাঁর কোন অসুবিধা হতো না। এজন্য তাঁকে বিস্তর ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়েছিল।

বিপ্লবী সহকর্মীরাও অনেকেই রাসবিহারীর আসল নাম জানতেন না। পাঞ্জাবে ও উত্তরভারতে অধিকাংশ স্থানে তিনি দরবারা সিং ও সতীশচন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন।

তাঁর একটি ছদ্মবেশের কথা শুনলেই বোঝা যাবে এব্যাপারে রাসবিহারীর দক্ষতা কি পর্যায়ের ছিল।

একবার কলকাতায় পুলিস গোপন সূত্রে খবর পেল রাসবিহারী বেলেঘাটায় একটি ঘাঁটিতে আসবেন।

বিপ্লবীদের এই ঘাঁটি আগে থেকেই পুলিসের নজরে ছিল। এবারে সেখানে নিশ্ছিদ্র জাল পাতা হল। যাতে পুলিসের হাত এড়িয়ে একটি মাছিরও পালাবার উপায় না থাকে।

যথাসময়ে রাসবিহারীর সন্ধানে বিপ্লবীদের ঘাঁটি ও আশপাশের অঞ্চলে পুলিসের চিরুণী তল্লাসী শুরু হল। পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজল, কিন্তু কোথায় রাসবিহারী। অথচ পাকা খবর ছিল তিনি ঘাঁটিতে প্রবেশ করেছেন।

ব্যর্থ হয়ে পুলিস বাহিনী ফিরে গেল। সেই সময় তাদের অনেকেরই চোখে পড়ল রাস্তার পাশের একটি বাড়ির বারান্দায় বসে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বৃদ্ধ আপন মনে বেহালা বাজিয়ে চলেছে। ঝানু গোয়েন্দা কর্তাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি যে এই শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ বেহালা বাদক বিপ্লবী রাসবিহারী। মহাবিপ্লবী রাসবিহারী এমনি সুকৌশলে অসংখ্যবার পুলিসকে বোকা বানিয়েছেন।

ভারতবর্ষে অসংখ্য বিপ্লবীসংগঠন ও বিপ্লবী ক্রিয়া কর্মের সংগঠক, বহু স্বনামধন্য বিপ্লবীর স্রষ্টা রাসবিহারী এমনই এক ব্যক্তি যাঁকে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও ব্রিটিশ রাজশক্তি কোন দিন গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। পৃথিবীর বিপ্লবীদের ইতিহাসে এ ঘটনার কোন নজির নেই।

আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকে রাসবিহারী বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মসূচী চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইংরাজের শাসনাধীন ভারতবর্ষেও তার তপ্ত আঁচ পড়ল। ওই সঙ্কটকালকে রাসবিহারী তাঁর বৃহত্তর পরিকল্পনা রূপায়ণের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন।

দেশব্যাপী সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে সুকৌশলে ইংরাজ বিদ্বেষ ও স্বাজাত্যবোধ প্রচার আরম্ভ করলেন। একাজে তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন বিপ্লবী নেতা পিংলে, হরদয়াল, শচীন সান্যাল, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং নরেন ভট্টাচার্য তথা এম. এন. রায়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকজন দেশদ্রোহীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাসবিহারীর এই ব্যাপক কর্মসূচী মাঝপথেই বানচাল হয়ে গেল। পরিণামে বহু সংখ্যক দেশপ্রেমিক সিপাহী ও বিপ্লবীকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হল। বহু সিপাহীকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হল। কার্তার সিং, বিষ্ণু গণেশ পিংলে, হরনাম সিং প্রভৃতির ফাঁসি হল।

এবারে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে রাসবিহারী চলে এলেন বাংলায়। বিপ্লবীর অভিধানে তো ব্যর্থতা বলে কথা নেই। তিনি নতুন ভাবে পরিকল্পনা শুরু করলেন।

এদিকে পুলিস পাগলা কুকুরের মত ভারতবর্ষ জুড়ে রাসবিহারীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর ছদ্মবেশ ধারণের অসাধারণ ক্ষমতার কথাও আর তাদের অজানা নয়। এই অবস্থায় রাসবিহারীর গতিবিধি আশঙ্কাজনক হয়ে উঠল। তাঁর সহযোগী বন্ধুরা তাঁকে অবিলম্বে দেশত্যাগ করে জার্মানি বা অন্য কোন স্বাধীন দেশে চলে যাবার পরামশ দিলেন। তিনিও তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করে বিদেশের মাটিতে কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ জাপানে যাচ্ছেন বলে খবরের কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ঠাকুর পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্যোগী হয়ে রাসবিহারীর পাশপোর্টের ব্যবস্থা করে দিলেন। পি. এন. ঠাকুর নামে রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী হিসাবে তাঁর পরিচয় জানানো হল। কবির বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থাদি তদারক করবার জন্য তিনি জাপান যাচ্ছেন।

নির্দিষ্ট দিনে 'শনুকি-মারু' নামে একটি জাপানি জাহাজে প্রথম শ্রেণীর কেবিনে যাত্রী হিসেবে স্থান নিলেন রাসবিহারী।

ইতিমধ্যে কলকাতার পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্টের কাছে খবর পৌঁছে গেল বিপ্লবী রাসবিহারী জাপানি জাহাজে চেপে দেশত্যাগ করছেন।

সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি একদল সশস্ত্র সিপাহী নিয়ে জাহাজ ছাড়বার মুখে সেখানে এসে পৌঁছলেন। রাসবিহারী ছদ্মনামে জাহাজে আছেন ভেবে তিনি ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে যাত্রীদের তল্লাসী শুরু করলেন।

এক সময় টেগার্ট সাহেব পি. এন. ঠাকুরের কেবিনের সামনে এসে হাজির হলেন। রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত সেক্রেটারিটি তখন বই পড়তে পড়তে খোস মেজাজে সিগারেট টানছেন।

প্রথমত ঠাকুর পদবী তার ওপরে খোদ কবি রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি, কাজেই টেগার্ট আর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেবিনে ঢোকার প্রয়োজন বোধ করলেন না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে জাহাজ থেকে নেমে গেলেন।

জাপানে কোবে বন্দরে অবতরণ করে রাসবিহারী চিনের নেতা সান-ইয়াৎ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। পরে তিনি ভারতের নির্বাসিত নেতা লালা লাজপৎ রায় ও বিপ্লবী হেরম্বলাল প্রমুখের সঙ্গে মিলিত হলেন।

এই সময় জাপানের সুবিখ্যাত সোমা পরিবারের এক মন্ত্রিকন্যা তোসিকো রাসবিহারীকে একটি গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রাসবিহারী জাপকন্যা তোসিকোকে বিবাহ করেন এবং পরে জাপানের ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির সহায়তায় জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

জাপানে থেকেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন টোকিও ইণ্ডিয়ান লিগ। ১৯১৫ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে তিনি সাংহাইয়ের এক চীনার সাহায্যে বহু পিস্তল ও টোটা ভারতের বিপ্লবীদের জন্য প্রেরণ করেন। ব্রিটিশ পুলিস তৎপর হয়ে উঠলে এরপর আট বছর তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়।

ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। ১৯৪১ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে জাপান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। রাসবিহারীও একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

১৯৪২ খ্রিঃ ২৮শে মার্চ তিনি টোকিওতে ভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি সভা আহ্বান করলেন। উক্ত সভায় স্থির হয় যে, জাপানের অধিকৃত সমস্ত স্থানের ভারতীয় অধিবাসীবৃন্দকে নিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ বা আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ (Indian Independence League) গঠন করা হবে।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৪২ খ্রিঃ ১৫ই জুন ব্যাঙ্ককে একটি বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ গঠিত হয়। রাসবিহারী এই সঙ্ঘের সভাপতি পদে বৃত হন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিপদে নির্বাচিত হন।

এই সম্মেলনে গৃহীত ৩৫টি প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে সুভাষচন্দ্র বসুকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আগমনের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

বলাবাহুল্য ইতিপূর্বে ১৯৪০ খ্রিঃ ১৩ই ডিসেম্বর গৃহে অন্তরীন অবস্থা থেকে পুলিসের সতর্ক প্রহরা ভেদ করে সুভাষচন্দ্র গোপনে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে মস্কো হয়ে বার্লিনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং অস্থায়ী ভাবে স্বাধীন ভারত সরকারের সূচনা করেছিলেন। ইউরোপে তিনি ফ্রিস ইণ্ডিয়ান বা আজাদ হিন্দ বাহিনী পত্তন করেছিলেন। সেই সময় তাঁর সৈন্যবাহিনীতে মাত্র দেড় হাজার সৈন্য ছিল।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনের পরে ১৯৪২ খ্রিঃ শেষ ভাগে রাসবিহারী বার্লিনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ফোনে আলাপ করেন। ১৯৪৩ খ্রিঃ ২ রা জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন এবং ৪ঠা তারিখে রাসবিহারী তাঁর হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হলে তিনি মন্ত্রিসভার সর্বোচ্চ পরামর্শদাতার পদগ্রহণ করেন।

১৯৪৫ খ্রিঃ সমগ্র এশিয়ার মহান বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু টোকিওতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাসবিহারী ভারতবর্ষ সম্পর্কে জাপানী ভাষায় পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ডাঃ স্যান্ডারল্যান্ডের ইণ্ডিয়া-ইন বন্ডেজ গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে জাপ সরকার সেদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার The second order of the merit of the rising sun রাসবিহারীকে প্রদান করে সম্মানিত করেন। আমাদের দেশে বিপ্লবী মহানায়ক রূপে তিনি ভারতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে চিরজাগরুক রয়েছেন।

মাদার টেরিজা



মাদার টেরিজা—প্রেম, শান্তি ও আশ্রয়ের প্রতীক একটি নাম। নিপীড়ন, শোষণ ও নিষ্ঠুরতার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন যেসকল সাধু মহাত্মা অশেষ কষ্ট ভোগ করেছেন আজীবন. অকাতরে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন, মাদার টেরিজা তাঁদেরই শেষ উত্তরাধিকারী। আজকের যুগে এমন মানুষ দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

তৎকালীন যুগোস্লাভিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের একটি ছোট্ট গ্রাম স্কোপজে (Skopje)। এখানেই এক আলবেনিয় রোমান ক্যাথলিক কৃষক পরিবারে ১৯১০ খ্রিঃ ২৭শে আগস্ট মাদারের জন্ম। তাঁর পিতার নাম নিকোলাস বোজাকসহিউ, পেশায় ছিলেন মুদি। তিনি মেয়ের নামকরণ করেছিলেন অ্যাগনেস গোনক্সহা বোজাকসহিউ (Agnes Gonxha Bojaxhiu)।

আলবেনিয়ার এই দরিদ্র দম্পতি কোনও দিন ভাবতে পারেননি তাঁদের অতি শান্ত কন্যাটি একদিন পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ মোচনের স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য নিজের জীবনকেই উৎসর্গ কববেন।

ছোট্ট মেয়েটি করুণাময় যিশু আর মাতা মেরির ছবির সামনে চোখবন্ধ করে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে যে শক্তির প্রার্থনা করতেন তা ছিল তাঁদের অজানা। ঈশ্বরের কাছে এই নীরব প্রার্থনাই ছিল মাদারের যাবতীয় শক্তির উৎস।

পরবর্তী জীবনেও যতই কাজ থাক প্রার্থনার সময়টি তিনি প্রায় সামরিক নিয়মের কঠোরতায় রক্ষা করেছেন।

অ্যাগনেসরা ছিলেন দুই বোন ও এক ভাই। তাঁর একটা পা ছিল কৃশ। শারীরিক এই বিকৃতির জন্য একটা লজ্জার আবরণ তাঁকে ঘিরে থাকতো সব সময়।

সাত বছর বয়সে অ্যাগনেস পিতৃহীন হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত যুগোস্লাভিয়ায় তাঁর মা অনেক কষ্টে লালন পালন করেন সন্তান কটিকে। মায়ের প্রেরণাতেই দরিদ্রের প্রতি দয়া ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস লাভ করেছিলেন অ্যাগনেস। অল্প বয়স থেকেই ধর্মীয় কাজকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি।

স্কোপজের পাবলিক স্কুলে পড়বার সময়েই সোডালিটি সংঘের মিশনারিদের কাজকর্মের প্রতি অ্যাগনেসের মন আকৃষ্ট হয়।

সঙ্ঘের পত্রপত্রিকাগুলি নিয়মিত পড়তেন তিনি। ওই পত্রিকাতেই ভারতের নানা খবর প্রকাশিত হত। তাঁর নিজের কথায়, "At the age of twelve I first knew I had a vocation to help the poor. I wanted to be a missionary."

স্কোপজে পাবলিক স্কুলের ক্লাশে যুগোস্লাভিয়ার জেসুইটদের চিঠি পড়ে শোনানো হতো। ওই সব চিঠিতে কোলকাতার কথাও বিশেষভাবে থাকতো। সে সব শুনে শুনেই কলকাতার প্রতি একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল অ্যাগনেসের মনে।

খবর নিয়ে জানতে পারলেন আয়ারল্যাণ্ডের লরেটো সঙ্ঘ ভারতে কাজ করছে। লরেটো সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় ডাবলিনে। যোগাযোগ করলেন তিনি। তারপর মায়ের অনুমতি নিয়ে যোগ দিলেন লরেটো সঙ্ঘে। গেলেন আয়ারল্যাণ্ডের বাথার্নহামে। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বছর।

সেই বছরেই, ১৯২৮ খ্রিঃ অ্যাগনেস জাহাজে ভেসে চলে এলেন কলকাতায়। যোগ দিলেন আইরিশ সন্ন্যাসিনীদের প্রতিষ্ঠান সিস্টারস অব লোরেটোতে।

সেই প্রথম বাংলার মাটি চরণ ছুঁয়ে তাঁকে বরণ করে নিল। সেই শুরুর দিন থেকেই অ্যাগনেস মনে প্রাণে হয়ে গেলেন বাংলারই মানুষ।

তখনো পর্যন্ত তিনি পুরো সন্ন্যাসিনী হন নি। শিক্ষানবিশী পর্ব শেষ করার জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দার্জিলিঙে।

দুবছরের পাঠক্রম শেষ করে গ্রহণ করলেন সন্ন্যাসিনী ব্রত। সিস্টার অ্যাগনেস হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। এন্টালি সেন্ট মেরিজ স্কুলের বাংলা বিভাগে শিক্ষায়িত্রী নিযুক্ত হলেন। তাঁর পড়াবার বিষয় ছিল ভূগোল ও ইতিহাস।

কুড়িবছর তিনি ওই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ১৯৪২ খ্রিঃ হন ওই স্কুলের অধ্যক্ষা। স্কুলে শিক্ষকতার সময়েই নিকটস্থ মতিঝিল বস্তির বাসিন্দাদের দারিদ্র্য, শিশুদের কষ্ট তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করে।

সেটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে শহর কলকাতার তখন নাভিশ্বাস। দুমুঠো ভাতের আশায়, একবাটি ফ্যানের আশায় দলে দলে গ্রামের মানুষ ভিড় করছে কলকাতায়, অনাহারে কুখাদ্য খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যাচ্ছে।

সিস্টার অ্যাগনেস এই সময়েই শুরু করলেন তাঁর কাজ। অচিরেই তিনি বুঝতে পারলেন পেছনে বন্ধন রেখে দরিদ্র আর্তের সেবা হয় না। এখনাকার অতি দীন ক্ষুধার্ত মানুষদের পাশে আশা-ভরসার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াতে হলে তাঁকে চার দেয়ালের গন্ডির নিশ্চিন্ত জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

১৯৪৬ খ্রিঃ ১০ই সেপ্টেম্বর। দার্জিলিং যাওয়ার সময় এক অলৌকিক উপলব্ধি হল তাঁর। তিনি যেন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ শুনতে পেলেন।

এই উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে মাদার নিজেই বলেছেন, "…. a call within a call ……… The message was clear. I was to leave the convent and help the poor, while living among them."

গরিবের সেবা করতে হলে গরিব হয়ে তাদের মধ্যে থেকেই তা করতে হবে। ঈশ্বরের এই আদেশ লাভের দিনটিকে আমৃত্যু স্মরণ করতেন মাদার। তিনি বলতেন দ্য ডে অব ডিসিশন—অনুপ্রেরণার দিন।

সিস্টার অ্যাগনেস থেকে মাদার টেরিজায় রূপান্তরিত হবার সেই ছিল সূত্রপাত। মাদার প্রতিষ্ঠিত মিশনারিজ অব চ্যারিটি এই দিনটিকে অনুপ্রেরণা দিবস হিসেবে পালন করে। সঙ্ঘ মনে করে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ খ্রিঃ তাঁদের সঙ্ঘের গোড়াপত্তন হয়।

মাদার সুপিরিয়রের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে অ্যাগনেস লোরেটোর কাজ ছেড়ে দিলেন। লোরেটো সন্ন্যাসিনীদের আলখাল্লা ছেড়ে অঙ্গে তুলে নিলেন মোটা নীলপাড় শাড়ি।

সেদিন তাঁর সম্বল বলতে ছিল পাঁচটি টাকা, একটি বাইবেল, ক্রসগাঁথা একটা জপের মালা। আর সঙ্গে ছিল অকল্পনীয় মনোবল আর ঈশ্বরে নির্ভরতা।

পিতৃদত্ত নাম বদলে নিজের নামকরণ করলেন টেরিজা। সিস্টার টেরিজা। ফ্রান্সের সাধ্বী টেরিজা ১৮৯৭ খ্রিঃ মাত্র ২৪ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। দরিদ্র এই সন্ন্যাসিনীই হলেন মাদার টেরিজার পথপ্রদর্শক।

পুরোপুরিভাবে কাজে নামবার আগে নিজেকে আর একটু গড়েপিটে নেবার দরকার। পাটনায় গিয়ে দি সোসাইটি অব ক্যাথলিক মেডিক্যাল মিশনারিজ পরিচালিত একটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার ট্রেনিং নিলেন।

১৯৪০ খ্রিঃ ফিরে এলেন কলকাতায়। এসে উঠলেন লিটল সিস্টার্স অব দি পুয়োর সঙ্ঘের সন্ন্যাসিনীদের আশ্রয়ে। তারপর সেখান থেকে উঠে এলেন মতিঝিল বস্তির পাঁচটাকা ভাড়ার একটা ঘরে।

সেই বছরই তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। শুরু হল তাঁর দুর্গত মানবিকতার কল্যাণে কঠোর সংগ্রাম। এখানেই শুরু করলেন প্রথম স্কুল—গাছতলায় গুটিকতক বাচ্চাকে অ-আ-ক-খ শেখানোর মাধ্যমে।

পড়ানো শেষ করে তিনি যেতেন কর্পোরেশনের মেথরদের মহল্লায়। তাদের সংসারের খোঁজখবর নিতেন। অসুস্থদের সেবাসুশ্রূষা করতেন। তারপর বেরুতেন ভিক্ষায় অর্থ আর ওষুধ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

সারাদিন বস্তিতে আর পথে কাটিয়ে রাতে শুতে যেতেন লোয়ার সার্কুলার রোডে সেন্ট যোশেফ হোমে। বৃদ্ধাদের এই আশ্রমে তিনি তাদের সেবা করতেন।

১৯৫০ খ্রিঃ মাত্র আটজন সন্নাসিনী সঙ্গে নিয়ে ৬৪এ, লোয়ার সার্কুলার রোডে জন্ম নিল মিশনারিজ অব চ্যারিটি। এই রাস্তাটির নাম বর্তমানে জগদীশচন্দ্র বোস রোড।

কলাকাতার একটা ছোট্ট বস্তিতে প্রাণের প্রদীপ জ্বলাবার যে ব্রত নিয়ে একদিন মাদার যাত্রা শুরু করেছিলেন, আজ তা বিশাল এক কর্মযজ্ঞে পরিণত হয়েছে। কেবল ভারতে নয় পৃথিবীর দেশে দেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, অন্নসত্র, শিশুকেন্দ্র, মানসিক প্রতিবন্ধীকেন্দ্র, কুষ্ঠরোগীদের আবাসস্থল, যক্ষ্মা হাসপাতাল, অবাঞ্ছিত শিশু ও মৃত্যুপথযাত্রীদের আশ্রয় আবাস প্রভৃতি অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করে চলেছেন সেবিকারা।

পৃথিবীর ৫২টি দেশ জুড়ে মাদারের সেবাকেন্দ্র ছড়িয়ে। তাঁর মিশনারি অব চ্যারিটির বহু শাখা—কলকাতা শহরেই রয়েছে ৬০টি কেন্দ্র এবং শতাধিক সেবাকেন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে একশটিরও বেশি শাখা।

সারা বিশ্বজুড়ে মাদারের প্রতিপত্তি। তাঁর সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে রয়েছে পুরুষ কর্মীর দল। তাঁদের বলা হয় ব্রাদার অব মিশনারিজ। একই মননে, একই বিশ্বাসে সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে তাঁরাও সমান ভাবে কাজ করে চলেছেন।

প্রথমে মিশনারিজ অব চ্যারিটি ছিল কলকাতার আর্চ বিশপের অধীন। তারপর থেকে তা ভ্যাটিকানের পোপের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এসেছে। নিজের প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন বেঁধে দিয়েছেন মাদার স্বয়ং।

অন্যান্য রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের মত এই সংগঠনের সদস্যারাও দারিদ্র্য, সততা এবং নিয়মানুবর্তিতার শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র্যের শপথ অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করা হয়। মাদারের ভাষায়—"to be able to love the poor and know the poor we must be poor ourselves."

মাদারের যেমন, তেমনি তাঁর সন্যাসিনীদেরও সম্বল বলতে গুটি কতক নীলপাড় মোটা শাড়ি, একটি প্রার্থনার বই এবং একটি ক্রুশ। তাঁরা আত্মীয়স্বজনের কোন সাহায্য নেন না, নিজের প্রতিটি কাজ নিজের হাতেই করেন।

এযুগে অবিশ্বাস্য মনে হবে যে মাদার হাউসে কোনও বৈদ্যুতিক পাখা নেই। কেবল আগন্তুক আর অতিথিদের জন্য কয়েকটি আছে।

মতিঝিলের বস্তির শুরুর দিনগুলো থেকে মাদার হেঁটেই চলাফেরা করতেন। ১৯৬৪ খ্রিঃ তাঁর ব্যবহারের জন্য পোপ ষষ্ঠপল ভারতে এলে নিজের সাদা লিঙ্কন কন্টিনেন্টাল লিমুজিন গাড়িটি দান করেছিলেন। মাদার সেই গাড়ি ব্যবহার করেন নি। সেটাকে নিলামে বিক্রি করে কুষ্ঠরোগীদের আবাস নির্মাণ করেছিলেন।

কলকাতাকে কেন্দ্র করেই মায়ের সেবাব্রতের মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। কলকাতার বাইরে প্রথম আশ্রম তৈরি হতে মাদারের সময় নিতে হয়েছিল দশ বছর।

রাঁচি থেকে বেশ কিছু মেয়ে যোগ দিয়েছিল মাদারেব সঙ্ঘে। তাই তাদেরই তিনি উপহার দিয়েছিলেন কলকাতার বাইরের প্রথম আশ্রমটি– -সিস্টার্স অব চ্যারিটি (১৯৬০ খ্রিঃ)।

তারপর তিনি দিল্লীতে তৈরি করলেন শিশুভবন। এই ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। সঙ্গে ছিলেন সুইস রাষ্ট্রদূত এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন।